নারায়ণ

১ম সংখ্যা

৭ম বর্ষ,

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা] [অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল

বোঝা।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

সকল জ্বালা জঞ্জালের এই
বিষম ভারি বোঝা
এবার তোমার পায়ের কাছে
নামিয়ে দেব সোজা,

তারে তুমি যদি লীলার ছলে
পরশ কর চরণ তলে,
এক নিমেষে পাব আমার
সকল জনম খোঁজা—
আরাধনার নিধি আমার
পাবের উপায় সোজা।

পরশ ফলে সে জঞ্জালে
ফুটবে শতদল
সৌরভে তার ক্লিষ্ট গ্লানি
পাবে নবীন বল,

জীবন ভরা সকল জ্বালায়
গ্রন্থী দেব কমল মালায়,
লুটবে তখন সে ফুলহার
চেয়ে চরণ তল,
মাথার বোঝা ফুটবে পায়ে
কুসুম সুকোমল!

নারায়ণ।

বইতে পারি এ ভার আমার
　　　　শক্তি এমন নাই—
ব্যাকুল হিয়া এসেছে আজ
　　　　তোমার দোরে তাই

আঁখির জলের এ উৎসবে
তোমার কৃপার ফুল ফুটোবে,
কাঁদতে গিয়ে ঐ পরশে
　　　　পাগল হয়ে যাই—
ফেলতে বোঝা পায়ের কাছে
　　　　আজ—কে এলাম তাই

নারায়ণের নববর্ষ।

[শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ]

আজ নারায়ণের নববর্ষ। কাবিশয্যাশায়ী নারায়ণের প্রেম-ব্রজের ঘরে বঙ্গ-যশোদার কোলে তার এ বাল গোপাল রূপ। এই ছয় বছরের বাঙ্গলার দুলাল তোমাদের স্নেহক্ষীরে পুষ্ট হয়ে আজ সাতে পড়লো। তোমরা যারা শৈশবে যৌবনে বার্দ্ধক্যে—সদাই শিশু তাদের সহচর করে জীবনের বাঁশী হাতে নিয়ে সাহিত্যের ভাব-বৃন্দাবনে এ চির-শিশুর খেলা চলছে। যেখানে অভয়, আনন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতি, বাঁধন-হারার হাসি ও প্রেমের মাখামাখি, সেই খানেই সব চেয়ে বড় সৃষ্টি—সেই খানেই খেলা। এই রকম শৈশব কৈশোর যৌবনের বেহিসাব অবাধ মুক্তির আশা-রঙ্গীন খেলা যে খেলতে চাও, নারায়ণের ভাবের খেলাঘরে এস। খেলতে খেলতে অতিবৃদ্ধ কাকভূষণ্ডী তোমায় এ শিশু রূপ করে ধরে যদি মুখে পুরে ফেলে, তখন হয়ত তার উদরে গিয়ে দেখবে বিশ্ব জগতের রূপ রসের বাহার অনন্ত সৃষ্টি সেই খানেই চলছে।

ভগবান খেলছেন, [illegible] বড় প্রেমের অনন্ত রসের অহেতুক খেলা সে [illegible]।

পয়োধির বলে নব রচনায় সব গড়ে উঠবে—সে স্থষ্টি-শীর্ষে অতীব ঠাকুর মূর্ত্ত হবে। যুগে যুগে—যুগান্তরে সে জগত-রাধাকে এমনি করে পায়, তার প্রেমে সব রসাতলে যায়, তবু মাধুরী বিলায়। তাকে ভীষণে মধুরে কান্ত বলে' যে দেখেছে, সেই তার নিকুঞ্জের রাই, এত বড় বুকের পাটা না হ'লে কি এমন ঠাকুরের অঙ্কে ঠাঁই পায়।

তাই নারায়ণ নববর্ষে নূতন করে আবার বলছে,– নিজেকে হারাও, বাঁশী হয়ে থাক, সে অধরে রেখে চাঁপার আঙুলে তোমায় জগদাকারে বাজাক্। সেই ত তোমার ভরা আমি, সেই ত তোমার চূড়ান্ত-জীবন।

ণ

পূজা

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার]

(গান)

করেছি গো প্রাণের ঠাকুর
আজকে পূজার আয়োজন
পূজবো নানা উপচারে
অন্তরে এ আকিঞ্চন।

যেখানে যা' কিছু আছে,
এনেছি আজ তোমার কাছে,
রচেছি আজ আপন হাতে
মনের মত সিংহাসন।

চন্দন নিয়েছে তোমার
দেহ-সেবার ভার,
গোপন-গন্ধে পূর্ণ প্রতি
পরমাণু তার,

সে   সঙ্কল্প-সাধন-রত,
সাধিবে জীবন ব্রত,
আপনার অস্তিত্বটুকু
হেলায় দিবে বিসর্জ্জন।

কাননে কাননে গিয়ে
ক'য়েছি কুসুমকুলে,
আনন্দে বিভোর তারা
এসেছে স্বজন ভুলে,
আপনারে ডালি দিতে,
সাধ হ'য়েছে সবার চিতে,
হাসিমুখে ঐ চরণে
করবে আত্ম-সমর্পণ।

কোথায় তুমি লুকিয়ে আছ,
আজকে প্রকট হও,
যত্নে আনা উপচারে
দীনের পূজা লও,
আমার গভীর শঙ্খ রবে,
জগৎকে জাগা'তে হবে,
দাও আমারে শক্তি হেন
পূজা করি সমাপন।

হাত দু'খানি।

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

যদু পোদ্দার একজন জন্ম-শিল্পী। সে যখন বাল্যকালে পরাণশীলের দোকানে শিক্ষানবিসী আরম্ভ করে তখন হইতে তাহার ভবিষ্যৎ ওস্তাদির সূচনা হইয়াছিল।

সে যখন হইতেই যে কাজটী করিত,—তা সে কয়লা যোগানই হউক, আর হাপর খায় হাওয়া দেওয়াই হউক, দোকান ঝাঁট দেওয়াই হউক, আর গয়না সাফ করাই হউক, সবই সে এমন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে করিত, এমন আনন্দের সঙ্গে করিত, যে পরাণশীলের দোকানের প্রধান কারিগর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল যে 'এই ছেলেটী শেষে মস্ত কারিগর হ'বে।'

হইয়াছিলও তাহাই—প্রথম হইতে সুন্দরের দিকে ঝুঁকিয়া, সুন্দর করিয়া রাখা, সুন্দর করিয়া ঢাকা, সুন্দর করিয়া দেখা, সর্ব্বপ্রকারেই সে সুন্দর করিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিত। সে যেন প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিল, যে, অলঙ্কার জিনিষটা সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যই প্রস্তুত হয়। অতএব এই সোনারী জিনিষটার আগাগোড়াই সুন্দর হওয়ার দরকার। স্বর্ণকারের কার্য্যই যেন সর্ব্বপ্রকারেই সুন্দরের পূজা করা এই মন্ত্রই যেন কি এক অজ্ঞাত উপায়ে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই আজ, যখন সে পাকা কারিগর হইয়া নিজস্ব একটা দোকান করিয়া বসিয়াছে, তখনও সেই সুন্দরের দিকে, উজ্জ্বলের দিকেই তার ঝোঁক। সে যখন নিজের ক্ষুদ্র দোকানটিতে বসিয়া টুক্ টুক্ ঠুক্ ঠুক্ করিয়া এক মনে সোণার উপর ফুল, ফুলের উপর পাপড়িটীকে ফুটাইয়া তোলে, তখন তাহার মন কোন্ অজ্ঞাত. অদৃষ্ট একখানি সুন্দর হাতের রংটুকু, গোলত্বটুকু কমনীয়ত্বটুকুকে তাহার মনের সোণার উপর কল্পনার হাতুড়ি ঠুকিয়া গড়িয়া তুলে কে জানে?

দোকানটী খোলার অল্পদিনের মধ্যেই সে বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু সেও আজ প্রায় ৮।১০ বৎসরের কথা। সে গরীবের ছেলে, তাই তাহার বিবাহও তেমন অর্থশালীর ঘরে হয় নাই। কিন্তু সে অন্তরের সহিত সুন্দরকে চাহিত বলিয়াই বোধ হয় ভাগ্যদেবতা কৌতুক করিবার অভিপ্রায়েই একটী কালো কোলো সুস্থ সবল পাকা বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সঙ্গে তাহার জীবনকে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু বিধাতার পক্ষে যাহা কৌতুক মানুষের পক্ষে সব সময় যে তাহা কৌতুকপ্রদ হইবে, তাহা ত' বলা যায় না। এ-ক্ষেত্রেও বিধাতার কৌতুক আমাদের বঙ্কু স্বর্ণকারের পক্ষে কৌতুকপ্রদ হইল না।

এই দুর্ঘটনার নানা কারণের মধ্যে একটা কারণ এই ছিল; যে বঙ্কুর বধূ বিন্ধ্যবাসিনী ওরফে বিন্দু, বঙ্কুকে যত ভালবাসিত তদপেক্ষা বেশী ভালবাসিত বঙ্কুর ডায়মনকাটার ক্ষমতাটিকে। সে চাহিত বঙ্কু যে গহনা, যাহারই জন্য গড়াক না কেন, তাহা একবার তাহার কালো অঙ্গে না উঠিয়া যেন কোন গৌরাঙ্গে না

উঠে। আর কোনো সুন্দর অঙ্গে উঠিবার পূর্ব্বে তাহার কালো অঙ্গের স্পর্শ লাভ না করিয়া যেন কোনো অলঙ্কারই যদু পোদ্দারের দোকান না পরিত্যাগ করে।

কিন্তু সুন্দরের পূজারী যদুর ছিল ইহাতে মহা আপত্তি—কত দেবতা ব্রাহ্মণের জিনিষ, কত মাঠাকুরাণীদের জিনিষ, হয় ত কত দুর্গা ঠাকুরাণীর মত মা লক্ষ্মীর মত প্রতিমাদের জিনিষ, সেই সব জিনিস কি এমন করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতে আছে? কিন্তু উপায় নাই। তাহার চিত্ত যতই বিদ্রোহ করিত, তাহার চক্ষু ততই — হইয়া, মস্তক ততই কাম্রোর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই প্রবলা স্ত্রীর Sacrilegious কার্য্যে সম্মতি দিত। কিন্তু সবদিন ত মানুষ নিজের উপর এই অত্যাচার সহিতে পারে তাহা নয়। তাই সে একদিন অসাবধানে একটা ছোটো রকম বিদ্রূপ করিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিল সেই কথা স্মরণ করিয়া সে স্ত্রীর উক্ত প্রকার অসহনীয় কার্য্যও সহ্য করিয়া চলিত। সে ঘটনায় তাহার সমস্ত বিদ্রোহ একেবারে গৃহের বাহিরে পলায়ন করিয়াছিল, সেটি এই—

সে প্রায় চারি পাঁচ দিনের চেষ্টায় এবং মনের সমস্ত কল্পনা শক্তি সমস্ত উদ্ভাবন শক্তি, প্রাণের সমস্ত আগ্রহ দিয়া একজোড়া বালা প্রস্তুত করিয়া প্রভাতের প্রথম আলোকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছিল। ইচ্ছা, কোনো সুন্দর কোমল দু-খানি হস্তে পরাইয়া দেখে, যে তাহার প্রাণের সমস্ত সাধনা কতদূর সফল হইয়াছে। সময়টাও তখন ভাল ছিল না সমস্ত প্রভাতের শিশির কোমল আলো তখন সবে মাত্র তর্কশির ছাড়িয়া সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর জলের উপর পড়িয়াছে। নিকটের আমগাছটায় আমের মুকুলের গন্ধের মধ্যে কতকগুলা পাখীতেও অকারণে পুলকের কলরব করিতেছিল। এবং পুকুরের ওপারের বাঁধা ঘাটে একটী তরুণী অকারণে আসিয়া হেমবর্ণ পিতলের কলসীতে কাকচক্ষুজল তুলিয়া লইতেছিল। তাহার সুন্দর হাত দু'খানিও অত্যন্ত লোভনীয় ভাবে জলের উপর অপূর্ব্ব পরশ রাখিয়া কলসীটীকে ভরাইয়া জল পূর্ণ করিতেছিল।

যদু আমাদের নিতান্তই কাজের মানুষ। তাহার অন্যদিকে মন দিবার সময় নাই, অথচ আজ তাহার এই বালা দুইটীর জন্য দুইখানি হাতের বিশেষ প্রয়োজন হইল কেন? সম্পূর্ণ মানুষ নয়, কিছুই নয়—শুধু দু'খানি কোমল সুগোল সোণার বরণ হাত—যেখানে যদুর এই এত স্নেহের এত যত্নের সোণার পাতার বালা দু'গাছি উঠিয়া তাহার প্রাণের সুন্দরের পূজার পিপাসা মিটাইবে। ঐ ত চাটুয্যেদের কমলা, উহার হাতে দিয়া কি একবার দেখা যায় না যে কেমন

দেখায়? শুধু দেখাই ত? তা কি হয় না? চিরদিন কি কেবল এমনি সুন্দর জিনিষ গুলি তাহার হস্ত হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার কৌটায় ঢুকিয়া অজ্ঞাত অন্তঃপুরে চলিয়া যাইবে? সে কি একবার দেখিতে পাইবে না যে তাহার তিল তিল করিয়া প্রাণের সৌন্দর্য্য দিয়া গড়া জিনিষগুলি কাহার কোমল হাতদু'খানির কমনীয়তা কতখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছে? তাহার সাধনা কতখানি সার্থক হইয়াছে?

না গো না, তাহা হয় না—তাহা হইবার নয়। সে কেবল স্বয়ং আগুনের তাপে জলিয়া, হাত পুড়াইয়া, আঙ্গুলে ঘাঁটা পড়াইয়াই মরিবে, কিন্তু তাহার চরম সার্থকতা কখনই হইবে না।

সে সেইদিন প্রভাতে জাগিয়া পূর্ব্ব-রাত্রে শেষ-করা ঐ বালা জোড়া হাতে করিয়া কি যে মাথামুণ্ডু ভাবিতে লাগিল তাহার ঠিকানাই রহিল না। এমন সময় বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া বলিল, "কৈ দেখি, কেমন হ'ল?" যদুনাথ হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিয়া তাহার দিকে চাহিল, এবং তাহার অজ্ঞাতে তাহার হাত দু'খানা বিদ্রোহ করিয়া বালা দু'গাছি পশ্চাতে লুকাইয়া ফেলিল। বিন্ধ্যবাসিনী রাগিয়া বলিল "ওকি লুকুচ্ছ কেন? পরে দেখি, দাও না?"

যদুনাথ মুখ ফিরাইয়া বালা দু'গাছা তাহার হাতে দিল। বিন্ধ্যবাসিনী লোলুপ ভাবে দু'একবার নাড়িয়া চাড়িয়া শেষে দুইহাতে সেই দুই-গাছি প্রবেশ করাইয়া বলিল, "বাঃ বেশ দেখাচ্ছে. দেখ না?" যদুনাথের মতিচ্ছন্ন, কি দুষ্ট সরস্বতীর কারসাজী তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সে একবার আড়চোখে বালা দু'গাছির দিকে চাহিয়া বলিল "হ্যাঁ খাঁটী সোণা বটে—কষ্টি পাথরের উপর বেশ জলুস্ দিচ্ছে।" আর কোথা যায়! বিন্ধ্যবাসিনীর বিন্ধ্যগিরির ন্যায় অভিমান মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। সে তাড়াতাড়ি হাত হইতে বালা দু'গাছি খুলিয়া গবাক্ষপথে পুষ্করিণীর দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "আমার হাতে ত খারাপ দেখাইবেই গো- যাও ঐ কমলা বামনীর হাতে পরিয়ে দেখ গিয়ে,—বেশ দেখাবে।"

বিন্ধ্যবাসিনী দ্রুতবেগে ভিতরে চলিয়া গেল। যদুনাথও ভয়ে, দুঃখে এবং আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর ছুটিয়া বালা দু'গাছি কুড়াইয়া আনিতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর যাইবামাত্র দেখিল, চাটুয্যেদের কমলা ঘাটে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, "পোদ্দার দা, বিন্দু বৌর কি সোণার

বালা সস্তা হয়েছে নাকি, যে, অমনি করে সোণার জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলি? যদি ফেলেই দেয় ত' আমরা গরীব পড়সি রয়েছি, আমাদের ছুড়ে মারুক না।"

হায় রে আজিকার বসন্ত প্রভাতের বিফল শোভা! হায় রে অন্তরের অন্ধকারের জন্য মানব-মনের বিফল বহির্ভিসার!! হায় রে স্বর্ণকার যদুর মনের সোণাকে বাহিরে খোঁজা!! যাহাকে সে খুঁজিতে চায়, যাহাকে সে পাইতে চায়, সে কোথাও নাই,—কোথাও কখনো ছিল কি না তাহাও বলা যায় না। সোণার হাতে সোণার বালা দেখাও এ জগতে ভুল ভ্রান্তি; যদুনাথ সোণার তাহা দেখিতে পাইবে কি রূপে?

যাক, এমনি করিয়া ত দিন যায়। এমন সময় একদিন তাহার দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতিবাসীর মেয়ে কমলা আসিয়া বলিল,—"যোদাবাবু, অনেক কষ্টে এই সোনাটুকু জোগাড় হয়েছে, তুমি যদি একটু দয়া কর ত' অনেক দিনের একটা সাধ মেটে।"

সাধ! অনেক দিনের সাধ! কার সাধ? কমলার না যদুর? যদু অবাক হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দোকান ঘরের দরজার ফ্রেমের মধ্যে সোণার সন্ধ্যার সমস্ত সোণাটুকু আজিকে ঢালিতে বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে নাকি? এই কয়লা, এই ছাঁই, এই লোহার সিন্ধুক, এই সব ধুলো মাটীর মধ্যে স্বয়ং কমলা আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, দয়া কর।' হায় রে দয়া! সে দয়া করিবে? আমাদের মত না শ্রী সাক্ষাৎ সন্ধ্যা লক্ষ্মীর মত ও দেবতা!

কমলা তিন ভরি আন্দাজ ওজন সোনা যদুনাথের হস্তে দিল। যদুনাথ লোলুপ-নয়নে সেই সুগোল গৌরবর্ণ হাত দু'খানির পানে চাহিয়া নতবদনে বলিল, "কি করতে হবে?"

"দু'গাছা রুলি।"

"কি প্যাটার্নের হবে?"

"সে তোমার যেমন পছন্দ—"

"আমার?"

"হ্যাঁ, তোমার চাইতে কে ভাল বুঝবে?" আঃ দেখি, বাচাল! তুমি জন্ম জন্ম দেবী হয়ে জন্মাও—জন্ম জন্ম পতি পুত্র নিয়ে সুখে থাক, আর আমিও যেন জন্ম জন্ম তোমার হাতের রুলি গড়াতে পাই।

যদুর চক্ষে জল আসিল। এমন কথা সে একদিনও কাহারও মুখে শুনে

নাই। সে যে সুন্দরকে চিনে—তার অন্তরে যে সুন্দরের পদচিহ্ন পড়িয়াছে এ কথা আর কেহত কখনো বলে নাই। কমলা আজ এই সন্ধ্যায় সন্ধ্যা-লক্ষ্মীর মত আসিয়া তাহাকে বর ও অভয় দুই দান করিল।

যদুনাথ নত বদনে বলিল "কিন্তু একটা কথা, যদি—"

"কি কথা বল না? বাণী? তা—"

"বাণী? না না তা কেন? তোমার কলি গড়িয়ে দেব তার আবার বাণী? না—না তা নয়।"

"তবে কি?"

"আমি একবার গড়ান হ'লে তোমার হাতে পরিয়ে দেখব।" কমলা খুব জোরে হাসিয়া বলিল,—"পোদ্দারদা কি ক্ষেপলে না কি? এই আবার একটা কথা? পরিয়ে ত' দেখতেই হবে, নইলে ঠিক হবে কেন? বেশ, তা হলে এই কথা রইল। কিন্তু তিন ভরিতে হবে ত?"

"তা হবে, হতেই হবে, নইলে উপায় কি?"

"হ্যাঁ, আর যে নেই।"

"যদি দু'এক আনা বেশী লাগে, আমি নিজে দিতে পারি কি? দাম লাগবে না।"

"না—না সে কি কথা? তুমি কেন দিতে যাবে? বিন্দু বৌ শুনলে কি বলবে! ছিঃ তা কর না, ওতেই সেরে নিও পোদ্দারদা, নইলে বাবা রাগ করবেন,—তাঁকে লুকিয়ে মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন। আর যে আমার শাশুড়ী এই গড়িয়েছি শুনলেই কত কথা বলে পাঠাবে। না পোদ্দার দা, আর খরচা বাড়িও না—ওতেই যাহোক করে সেরে নিও।"

কমলা চলিয়া গেল। কিন্তু যদুনাথের মনের কথাটা চিরদিন না বুঝাই রহিয়া গেল। সে কি সত্য সত্যই কমলাকে সোণা দান করিতে চাহিয়াছিল? তা নয়—নয়—নয়। সে যাহাকে নিজের প্রাণের পুষ্প দিতে চাহিয়াছিল তিনি কি যদুর প্রাণের নিবেদন শুনিতে পান নাই—বুঝিতে পারেন নাই? হয় ত পারিয়াছিলেন, কিম্বা হয়ত পারেন নাই। কিন্তু ভাগ্যদেবতা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বুঝিয়াছিলেন—এবং তাঁহার বুঝা চিরদিনই "উল্টা বুঝিলি রাম" এই নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে।

ঘটিলও তাহাই। যদুনাথও কি জানি কেন রাত্রি জাগিয়া এবং লুকাইয়া লুকাইয়া আপন মনের মত করিয়া কলী দু'গাছি গড়াইয়া তুলিতে লাগিল।

কমলাও প্রতিদিন আসিয়া সকালে সন্ধ্যায় "কৈ দেখি না"—"কেমন হল একবার দেখাও না"—প্রভৃতি বৃথা তাগাদায় তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু কমলার দুই বেলা যাতায়াতের উপর বিন্ধ্যবাসিনীর হঠাৎ ভয়ঙ্কর কুনজর পড়িয়া গেল। সেও সময় অসময়ে দোকান ঘরে প্রবেশ করিয়া সকল জিনিষ নাড়িয়া ঘাঁটিয়া কমলার প্রার্থিত বস্তুটাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যদুনাথ এতই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল, এতই সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিন্দুর চক্ষু হইতে রুলি জোড়া লুকাইয়া রাখিত যে বিন্দু কোনো উপায়েই সে দুই গাছি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না; কেবল বৃথা আক্রোশে তাহার স্বামীর মনের সমস্ত আনন্দটুকু তিক্তরসে ভরিয়া দিবার চেষ্টা করিত। যদুও যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল যে রুলি দু'গাছি কমলার করকমলে না উঠিলে কিছুতেই অন্য কাহারো হস্ত স্পর্শ করিতে পাইবে না। তা' সে তাহার স্ত্রীই হউক আর যেই হউক। তাহার চক্ষুর তৃষ্ণাকে, তাহার অন্তরের পূজাকে সার্থক না করিয়া রুলি দু'গাছি কিছুতেই দিনের আলো দেখিতে পাইবে না।

কিন্তু ভাগ্য যেখানে বিরোধী, সেখানে মানুষের শক্তি কতটুকু। ভাগ্যদেবতার দুষ্টামীর কাছে যদুনাথের সমস্ত সাবধানতা বিফল হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি দরজা বন্ধ করিয়া খাটিয়া যদুনাথ দোকান ঘরেই রাত্রি যাপন করিয়াছে। প্রভাতে সেই অলঙ্কার জোড়া কমলাকে দিবার কথা—তাই তাহার রাত্রে নিদ্রা যাইবার অবসর ছিল না। প্রাণের সমস্ত শক্তিটুকু, সমস্ত আনন্দটুকু দিয়া সে গভীর রাত্রে রুলি জোড়া শেষ করিয়াছে। তারপর মাথার শিয়রে সে দু'গাছি রাখিয়া তাহার সেঁটাটের পাটীর উপরই গুটি শুড়ি মারিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তারপর কখন যে রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত হইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখিল তাহার সমস্ত দরজা খোলা, এবং বিন্ধ্যবাসিনী সেই রুলি জোড়া পরিয়া হাসিয়া বলিতেছে,—"কেমন? আমার আগে তোমার গড়া জিনিষ কেউ পরতে পাবে? কমলা বামনীর ভারি সাধ্যি! আমার এঁটো সহরের সবাই পরছে তিনি পরবেন না? ভারি ভক্তি! নাও তোমার ফুঁকো রুলি—এই রুলির জন্যে আমার এত রাত জাগা, এত লুকোচুরী!"

যদুনাথের হাতের গোড়ায় ইস্পাতের অনেক গুলো যন্ত্রই ছিল—হাতুড়ি ছিল, ছেনী ছিল, ডাইস ছিল, হাপর ছিল, এমন কি বাঁশের চোঙ্গাটাও ছিল। কিন্তু একটাও কাজে লাগিল না। যাহা কাজে লাগিল তাহা তাহার ডাগর বক্র চক্ষু

দুইটী। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিন্ধ্যবাসিনী একেবারে একবিন্দু হইয়া গেল। তারপর যখন সে চিৎকার করিয়া ডাকিল "বিন্দু!" তখনি বোধ হয় শুকাইয়া বিন্ধ্যবাসিনী একেবারে উবিয়া যাইবার মত হইল।

কিন্তু ঠিক সময়েই কমলা আসিয়া উপস্থিত। তাহার উপর চক্ষু পড়িবা-মাত্র যদুনাথ আবার যে যদু পোদ্দার সেই যদু পোদ্দারই হইয়া গেল। কমলা ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল "এই যে বিন্দু বৌ। কি হয়েছে ভাই, পোদ্দারদা অমন করে চেঁচাল যে।"

বিন্ধ্যবাসিনী তখন আবার বিন্ধ্যবাসিনীমূর্ত্তিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন চেঁচাল তা ওকেই জিজ্ঞাসা কর না। ভারি ত' দু'গাছা ফ্রুকো রুলি, তাই পরিছি ত' এত রাগ। নে তোর রুলি নিয়ে ধুয়ে খেগে যা'—এরই জন্তে সকাল নেই বিকেল নেই তাগাদা। এরই জন্তে রাত জেগে' দরজা লাগিয়ে খেটে মরা! আমি বলি কিইবা অপূর্ব্ব জিনিষ। ও মা কিছু না, দু'গাছি এই রকম রুলি! নে কমলি তোর রুলি নিয়ে পালা।"

কমলারও রাগ হইল। সে বলিল, "তা গবী'বর ঐ ঢের। কিন্তু তবু ত ওতেই তোমার লোভ পড়েছিল। তোমার যদি এতই ওতে ঘেন্না'ত' পরতে গিয়েছ কি করতে?"

"আমি কি আগে জানতাম? জানলে অমন জিনিষ ছুঁতাম নাকি?"

"না ছোঁও, নেই ছোঁবে, এখন দাও ত' আমাকে?" বিন্দু রুলি দুই গাছা ছুড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। কমলার এইবার খুবই রাগ হইল—সেও ঝগড়ায় কম পটু নহে। তাই সেও দু'কথা বেশ শুনাইয়া দিল। তারপর রুলি দুই গাছা তুলিয়া লইয়া বলিল, "না পোদ্দারদা, বেশ হয়েছে, ও যাই বলুক আমার খুব পছন্দ হয়েছে তুমি দুঃখ কর না।"

হায়রে দুঃখ। দুঃখ সুখ এই দুইটী মুখরা রমণীর বৃথা কলহে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রের পরিশ্রম, আশা, আনন্দ সমস্ত বেদনা-ভরা উদ্বেগ যা' কিছু তাহার প্রাণে জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল সমস্তই এক নিমেষে কোথায় পলাইয়াছে।

যদুনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ, পছন্দ হয়ে থাকে নিয়ে যাও, দিদি।"

"তুমি যে বলো দুলে পরিয়ে দেখবে?"

যদুনাথ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "না তা' আর কাজ নেই—তুমি নিজে পরে দেখ, ছোট বড় হয় ঘুরিয়ে দিয়ে যেও, ঠিক করে দেব।"

কমলা কুলি লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার হাত দু'খানির দিকে যদুনাথ আর চাহিয়াছিল কি না কেহ বলিতে পারে না।

সৌন্দর্য্য-সাধনা †

[শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন বি, এ,]

বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রূপে সুন্দরের উপাসনা কর্লেও সুন্দরের একটা চিরন্তন আদর্শ আছে। তার মাপকাটি দিয়ে প্রতি মানবের সৌন্দর্য্যানুভূতির উৎকর্ষা-পকর্ষের পরিমাপ নির্ণয় কোর্ত্তে হবে। যে এই সনাতন আদর্শের যত কাছে অগ্রসর হোয়েচে, সুন্দরের আসল মর্ম্মের সহিত সে ততখানি ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন কর্ত্তে পেরেচে। আর যে দূরে পড়ে আছে, তার জীবনও ব্যর্থ হয় নি,—কারণ সৌন্দর্য্যকে একদা গভীরভাবে—নিবিড়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবার শক্তিলাভ সে নিজের অজ্ঞাতে করে যাচ্ছে। সে এখন যেটাকে সুন্দর ভেবে তনুমনপ্রাণ তাতে ঢেলে দিয়েচে, তাকেই যেদিন অসুন্দর বলে নিশ্চিত বিশ্বাস হোয়ে যাবে সে দিনই সে দ্বিজত্ব লাভ কর্ব্বে। সেদিন—সেই নীরব উষার স্তিমিত শুকতারা-টির নীল সুন্দর তার গোপন চরণ ফেলে অকস্মাৎ ভাগ্যবানের মুদিত হৃদয়পদ্মের পাপড়ি খুলে দিয়ে যাবে; এতদিন যার মধ্যে সে আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিল, [illegible] বাতাস সেগুলিকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে, সেই খড়কুটার আবর্জ্জনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সাধক দূরস্থিত আকাশচুম্বী হিমালয়ের দিকে ছুটে যাবার জন্য ব্যাকুল হবে—সেদিনই বাস্তবিক তার সৌন্দর্য্যানুভূতির জীবনপ্রভাত। "[illegible] ললিত সুখে হৃদয় অধীর" মনে হবে "হায় শত যামিনীর [illegible] শুধু কামিনীর মালিকা।"

---

* লেখকের অপ্রকাশিত উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত।

† অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ [illegible] সাহিত্য সভায় পঠিত।

অতএব যে এই বিশ্বের নাট্যলীলা অক্ষুব্ধচিত্তে দেখে যেতে পারে সে মৃত্যুতানের প্রভাবকে ভয় করে না। সে যে-দৃষ্টি দিয়ে নিখিলের সমস্ত ঘটনা-বৈচিত্র প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছে তা' সমুদয় পতনমূর্চ্ছার পশ্চাতে অসুন্দরের অনিবার্য্য যবনিকাও তাকে দেখিয়ে দিচ্ছে—এক মঙ্গলময় চিরসুন্দর মহাপরিণতির দিক্ সেই সুপ্রসারিত দৃষ্টি লক্ষ্যবদ্ধ বলে। সৌন্দর্য্য যদি একটা বিলাসের জিনিষ না হয়ে বিশ্বদেবতার নিগূঢ় উদ্দেশ্য সফল করবার জন্ত জন্ম লাভ করে থাকে তবে নিশ্চয়ই তার হাত এড়ান যাবে না। আমরা পথে ঘাটে লক্ষ্য হারিয়ে যেতে পারি, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত কখনই হব না—তা' হলে দেবতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে, সৃষ্টি কলঙ্কিত হবে এবং সেই কুৎসিত জগতে আমরা এক মুহূর্ত্তের তরেও বাঁচতে চাইব না। মনে রাখতে হবে কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী। এ জন্মে না হলেও জন্মজন্মান্তরে আমরা চিরসুন্দরের সাক্ষাৎকার লাভ কর্ব্ব। সুন্দরের ললাটে বিধাতা যে জয়টীকা চিত্রিত করে দিয়েছেন তা' কখনও মুছে যাবার নয়। সৃষ্টির সূত্রপাত হতে সুন্দর অসুন্দরের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা কোরেচে, তাতে সে জয়লাভ কর্ব্বেই কর্ব্বে। সে প্রতি মানবকে চুম্বকের মতন আপনার হৃদয়ে অহরহঃ আকর্ষণ করচে—তার প্রমাণ ঐ মুক্ত উদার বাতাস—যা' আমাদের সেই চিরসুন্দরের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার জন্ত একখানা হালকা ভেলা,—তার প্রমাণ এই কঠিন শিলার বক্ষ ভেদ করে আপনাকে উদ্ধার করে যে পাগলিনীর মতন উন্মত্তবেগে বেরিয়ে আসবে—ঐ শুভ্র মন্দাকিনী ধারা—সুন্দরের অর্পিত প্রেমহার যে-বক্ষে দুলবে—তাকে গৈরিকের মতন পবিত্র কোরে দেবার জন্ত; তার প্রমাণ ওই আমাদের মাথার উপরে যে বিরাট্ উদার মহাপ্রাণ আকাশ পড়ে রয়েচে তার রবি শশী গ্রহতারা নিয়ে—যাদের আরাত্রিক দিয়ে সে আমাদের অভিসারের পথ চিরকালের জন্ত আলোকিত করে রেখেচে।

পূর্ব্বে বলেছি সৌন্দর্য্যের একটা চিরন্তন আদর্শ আছে। এই আদর্শটা কি তা' প্রবন্ধের শেষ দিকটায় বিবেচনা করা যাবে। এখন শুধু এইমাত্র বলে রাখা আবশ্যক মনে করি, যে, এই আদর্শের সঙ্গে মানবজীবনের উদ্দেশ্যের কোন বিরোধ নাই;—যে-সৌন্দর্য্য সেই উদ্দেশ্যকে সহায়তা না কোরে তাকে খর্ব্ব করে—অবসন্ন করে—তা' সৌন্দর্য্যই নয়—কলুর ঘানির মতন সে জিনিষটা এমন একটা কিছু, যা' মানুষকে কেবলই এক অভিশপ্ত উদ্দেশ্যহীনতার চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিছামিছি হতাশ ও পরিশ্রান্ত কোরে ফেলে।

মানুষ একটা মূলধন নিয়ে জগতে জন্মলাভ করে—তা হোচ্চে ভালবাসা। এই অপরিচিত মূলধনটা যে ব্যবসায়েই খাটান যাক না কেন তাতে লাভের আশু সম্ভাবনা আছে। আমাদের দোষ আমরা এই মূলধনের সব খানিক ব্যবহার করি না—কিংবা কৃপণ যক্ষের মতন তাকে পুঁজি কোরে রাখি। এই প্রেমরূপ সোণার কাঠী দিয়ে আমরা যাই কেন স্পর্শ করি না তা' প্রাণবান্ হোয়ে উঠ্‌বে। নিতান্ত ক্ষুদ্র জিনিষের মধ্যে সৌন্দর্য্য মূর্তিমান্ হোয়ে দেখা দেবে এবং তার ভাস্বরতা তার মাধুর্য্য তার বিভাস আমাদের দৃষ্টি বিমুগ্ধ ও আমাদের হৃদয় কোন্ নিগূঢ় পুলকে পরিপূর্ণ করে ফেল্‌বে। ভালবাসার যে-অফুরন্ত প্রস্রবণ মাতৃহৃদয়ে প্রবাহিত থাকে তার বিগলিত ধারাপুঞ্জে কাণাছেলেও প্রস্ফুটিত পদ্মেরই মতন উদ্ভাসিত থাকে। হৃদয়ে ভালবাসা নিয়ে আমি যা'ই দেখব তা'ই আমার কাছে অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলে দিবে।

কিন্তু সৌন্দর্য্যের নিজেরও ভালবাসা উদ্দীপিত করে দেবার একটা মস্ত বড় ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা তার আছে বলেই আমরা রূপের পায়ে আপনাকে বিকিয়ে দিই। যার মুখখানি সুন্দর তার পেছন পেছন ছুটি—নিশার নিঝুম নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন সকল জীব নিজকে একেবারে এলিয়ে দিয়েছে তখনও আঁধার আলোর সঙ্গম-স্বপনের সেই নিবিড় ভঙ্গিমায় ব্যাপ্তি-হীনতার মধ্যে "তাহারি হাসিটি জীবে হৃদয়ে তাহারি মূর্ত্তি জাগে।"

এতক্ষণ যে-প্রশ্নটার মীমাংসা হয় নাই এখন তার সমাধান করতে হবে। সেই প্রশ্নটি হচ্চে এই যে সুন্দর কাকে বলে এবং তার গুণ কি কি? এ জগতে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যে গুলিকে কথায় বুঝিয়ে দেওয়া অসাধ্য। সেগুলি প্রত্যেকের নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সাপেক্ষ। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এখানে বলা আবশ্যক সৌন্দর্য্য একটা বিশিষ্টরূপ বা জিনিষের মধ্যে স্থাণু হোয়ে বসে নাই—তাহা দেহমনে ছন্দোগানে জলেস্থলে আকাশে বাতাসে ফুলফলে সৃষ্টির সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে লীলায়িত করে দেখাচ্চে। একটার মধ্যে সৌন্দর্য্য আছে, অপরটার মধ্যে নাই, এরূপ যাঁরা মনে করেন তাঁরা অর্দ্ধসত্যের প্রচারক—তাঁদের দৃষ্টি সুপ্রসারিত ও সুস্থির হয় নি—কেননা তাঁরা একদেশদর্শী।

যিনি দেহের ও দৃশ্যজগতের রমণীয়তাকে সুন্দর বলে গণ্য করেন না—তিনি সুন্দরের একাংশমাত্র প্রত্যক্ষ করেছেন বলতে হবে। মানুষ শুধু তার মন বা আত্মা নিয়েই সমাপ্ত নয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই যে-একটা বিশিষ্ট বোধশক্তি

আছে তা' অস্বীকার কর্লে চলবে না। আমরা চক্ষু দিয়ে যে-সৌন্দর্য্য উপভোগ করি মন দিয়ে তা' গ্রহণ করি। সুতরাং আমার এই চর্ম্মচক্ষু দিয়ে যদি একটি সরল শিশুমুখের লাবণ্য দেখে উল্লসিত হই—তবে তাকে কেউ পাপ বলে গালাগালি দিলে আমি কিছুতেই তার সঙ্গে একমত হোতে পারি না! এই সৌন্দর্য্য দর্শন আমার কাছে একটা পরম সত্যিকার ব্যাপার,. একে অগ্রাহ্য কর্ব্ব কি করে?

কিন্তু প্রশ্ন উঠে—মানুষের দেহের কোন্ অংশটায় কি থাকার দরুণ তাকে আমরা সুন্দর নামে অভিহিত কর্ত্তে পারি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসাধ্য—কেন না- সৌন্দর্য্যকে শবব্যবচ্ছেদকারীর মতন কেটেকুটে দেখান যায় না—সেটা এমনি একটা কিছু বর্ণনাতীত—যা' এক নিমিষের মধ্যে আমাদের সমস্তখানি চিত্ত অভিভূত করে ফেলে এবং যা' তার সমস্ত শরীরখানিকে এক অনবদ্য গৌরবে মণ্ডিত করে রাখে। তবে সব দেশেই সৌন্দর্য্যের একটা লৌকিক ব্যাখ্যান আছে তাই আমাদের দেশে মেয়ে আজানুলম্বিত কেশ, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন ইত্যাদি লক্ষণের অধিকারী থাকলে তাকে সুন্দরী নাম দেওয়া হয়। কিন্তু এই প্রকার লৌকিক আদর্শ বা standardএর মূল্য কত তা' আপনারাই বিচার কোরে দেখ্‌বেন।

অনেক সময়ে দেখা যায়; যে অতিমাত্র সুন্দর, সে সমাজে ও গৃহে নিতান্ত অসুন্দর বলে দুর্নামের ভাগী হচ্ছে। এর কারণ খুঁজতে গেলেই আমাদের যেখানে হাত পাত্‌তে হয় তার নাম হচ্ছে হৃদয়। এ জিনিষটি সকলেরই আছে এবং এখানে যার মনুষ্যত্ব আছে তাকে জগতে সকলই সুন্দর বলে' উপাসনা কর্ব্বে। কিন্তু যার দৈহিক সৌন্দর্য্য আছে অথচ মানসিক সৌন্দর্য্য নাই—তার জন্য দর্শকমাত্রেরই হৃদয়-বেদনা গুমরে ওঠা উচিত—আর সে যা' দিচ্ছে তাও আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ না কর্লে আমাদেরই ক্ষতি। তার মত সৌন্দর্য্য আমরা পাই কোথা? ওরে সৌন্দর্য্য-পাগল! তার সুন্দর মুখখানি নিয়ে যদি তুমি অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে লুকিয়ে রেখে দিবস রাত্রি গোপনে তাকে চুম্বনে অভিষিক্ত কর, তবে বিশ্বদেবতার মুখখানিই আবেশে ঢলঢল করে উঠ্‌বে।

মনে করা উচিত নয় দেহে কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ থাক্‌লেই মানুষ, সুন্দর হয় এবং না থাক্‌লে কুৎসিত হয়। যে সেই সুন্দরকে প্রত্যক্ষ কোরে উপভোগ কর্‌বে তারও সুন্দর হওয়া চাই। দ্রষ্টাও সুন্দর কিনা, আমার মতে, তা দেখতে হোলে সর্ব্বপ্রথম জানা চাই সে প্রেমিক কি না। তার যদি ভালবাসা থাকে তবে তাকে জগতের যেখানেই বসিয়ে দেওয়া হোক না কেন সে সুন্দর

বই অসুন্দর কিছু দেখবে না। আমি এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন সায়ংকালে কোন গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বন্ধুকে একটু অন্যমনস্ক দেখে তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা কর্ত্তে গিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম উৎসুক ও সপ্রেম দৃষ্টি যার পেছন পেছন ছুটে যাচ্চে—সে এক খঞ্জ বালক আর এক বালকের কাঁধে হাত দিয়ে খুব উৎসাহের সহিত দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্চে। যখন সে জনতা ও দূরতার মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গেল তখন বন্ধু বল্লেন, "দেখেছ ছেলেটি কেমন সুন্দর—পাখানা খোঁড়া—সেদিকে কিছুমাত্র খেয়াল নেই—ভরা প্রাণে মৃগশিশুর মতন ছুটে যাচ্চে।"

যেখানে দেহ মনকে চালাচ্চে না কিন্তু মন দেহকে চালাচ্চে, সেখানেই সৌন্দর্য্য আছে—কেন না বিশ্বনিয়মের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রয়েছে, বিশ্বের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আপন ইচ্ছায় নিজমূর্ত্তিকে বিচিত্র আকারে চিরকাল প্রকটিত করে আসচে। আমাদের প্রত্যেকের কাছে যে সৌন্দর্য্য রয়েছে তাহা চিত্তসৌন্দর্য্য—অপার তাহার স্বাধীনতা—অনন্ত তাহার সৃজনী-শক্তি, অফুরন্ত অক্ষয় তাহার আনন্দ। এই সৌন্দর্য্য যা' সৃষ্টি করবে তাই সৌন্দর্য—এর ধারা যেখানেই নিঃসারিত হবে—সেখানে সবুজ ঘাস ফুটে বেরুবে—কমল-বন সৃষ্ট হবে—মলয় বাতাস বয়ে যাবে।

সভ্যতা আর কিছুই নয়—এই চিত্তসৌন্দর্য্যকে নানা আকারে নানা ভঙ্গিমায় উদ্‌ঘাটিত করে দেখাবার ব্যাকুল যুগান্তরের অসমাপ্ত প্রয়াস। কালের অন্ধকারে ঢেকে গেছে বুদ্ধের মুখখানা,—কিন্তু সেই সুন্দর ছবিখানা মনে আছে সকলের—সেই ছবি—রাজপুত্র সব ছেড়ে সন্ন্যাসী সাজছেন—সমস্ত জীব জন্তুর অকথিত কিন্তু গভীরতম বেদনার ভার বুকে নিয়ে তাদের সকলের জন্য অমৃত আনতে। মানব যে সৌন্দর্য্য বুঝতে পারে তার প্রমাণ এই, যে, ভাস্কর বড় বড় চোখ এঁকে সৌন্দর্য্যের তথাকথিত লক্ষণ বজায় রেখে এঁর মূর্ত্তি গড়েন নি। ভাস্কর গড়েছিলেন এমনি এক মূর্ত্তি যা' কঠোর সাধনায় উজ্জ্বল, প্রেমে পাগল, ত্যাগে ধূর্জ্জটী। আমাদের দেশে শত শত মন্দিরে এই দেবতার পূজো হয়েছে—কখনও সূর্য্যের নামে—কখনও বিষ্ণুর নামে—আর শত সহস্র সৌন্দর্য্য-ভক্ত লোক এঁরই পায়ে আপনাকে বিকিয়ে দিয়েচে।

কিন্তু যে সুন্দর তাকে সুন্দর বল্লে বেশী কি সফলতার পরিচয় দেওয়া হোলো? তবে যে এও পারে, বলতে হবে, সে এই পথে খানিকটা অগ্রসর হয়েচে। কিন্তু ভগবান এই দূষিত চোখে তাঁর অসুন্দর জগৎকে প্রত্যক্ষ

করছেন না—তাঁর কাছে ত সবই সুন্দর—সবই ভাল। তিনি সবই ত তাঁর দিকে টেনে নিচ্চেন, কাকেও ত বাদ দিচ্চেন না। আর আমি সেই অমৃতস্য পুত্র হোয়ে আমার দুয়ার কয়েকজনের জন্য খোলা রাখবো,—আর বাকী সবকে তাড়িয়ে দেব? একদেশদর্শিতা, অসম্পূর্ণতা নিয়ে মানুষ আমাকে কতখানি শেখাবে? আমাকে সৌন্দর্য্য শিখ্‌বার জন্য যেতে হবে তাঁরই কাছে, যিনি চিরসুন্দর—চির সত্য—চির শিব। ইনিই সৌন্দর্য্যের সেই সনাতন আদর্শ যার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেচি। আর এঁর কাছে দুর্ব্বলে যেতে পারে না—কারণ সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

এঁর কাছে না যেতে পারলে কিছুতেই আমাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচ্‌বে না—যে চোখ দিয়ে সৌন্দর্য্য দেখতে হয়—সে চোখ মিল্‌বে না—যে সৌন্দর্য্যের স্পর্শে হৃদয় দুলে উঠে, সে হৃদয় আস্‌বে না; বাইরের কলতানে অন্তরের নীরব বীণায় সঙ্গীত বেজে উঠবে না। তাঁর আভাস না পেলে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে যাবে। মনে হবে এ জগতে বিরোধই বেশী,—মিলন কোথায়? কালোর সঙ্গে সাদার ঝগড়া, শীতের সঙ্গে বসন্তের বৈষম্য, যৌবনের সঙ্গে বার্দ্ধক্যের বিবাদ—সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব সবই সত্য বলে মনে হবে। এই সমস্ত সৃষ্টিই যে সূত্রে মণিগণাইব তাঁরই গলায় অনাদিকাল থেকে দুলছে তা হয়ত মোমবাতি জ্বালিয়ে পাঠকক্ষে বসে মস্তিষ্কের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করবো—কিন্তু জীবন দিয়ে ত এই সার সত্য অনুভূত হবে না।

এই জন্য অন্তর দিয়ে অন্তরকে জান্‌তে হবে। আমাকে সেইখানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য যা' কিছু দরকার সবই এ জগতে আছে, কিন্তু সেগুলিকে কাজে লাগাতে হলে সঙ্গে আন্‌তে হবে আমার অন্তর। এই অন্তরের উদ্বোধন হবে ভাবসাধনা ও কর্ম্মসাধনা দিয়ে। ভাব বা Ideaই আমাদের মনের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার কোরে তাকে ভূমার সন্ধান দিতে পারে। আর এই ভাব, প্রেম, কর্ম্মের নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আপনাকে মূর্ত্তি দান করে। সাহিত্য, প্রকৃতি, সঙ্গীত, চিত্র ইহারা দেবলোক হোতে ভাবামৃত বহন করে মর্ত্তবাসীর দ্বারে দ্বারে তাহা বিলিয়ে দিচ্ছে। সাহিত্যের উদার কল্পনায় অপরিসীম আবেগে, স্বভাবের চির-যৌবনে, সঙ্গীতের কলতানে চিত্রের ইঙ্গিতে সুন্দরের গভীরত্ব ও অসীমতা আমাদের অনুভূতির গোচরীভূত হবে। মনে রাখতে হবে আমিই জগতে প্রথম সৌন্দর্য্য-সাধক নই—আমার পূর্ব্বে শতলক্ষ নরনারী সেই অমৃতের নামে ছুটেছে এবং এখনও ছুটছে—কখনও মহানিশায়

ঘন ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে—কখনও কল্লোলিনী নদীর শ্যামতটে দাঁড়িয়ে—কখনও নবোদিত সূর্য্যকে লক্ষ্য করে, কখনও অর্দ্ধচন্দ্রের দিকে কখনও রক্তরাঙা ক্রুশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে—কখনও ওপারের বাঁশরীর স্বর অনুসরণ কোরে! আমাদের সাধনার পথ এঁরা সহজ কোরে দিয়ে গিয়েছেন—আমাদের নিরাশ হবার কারণ নাই।

ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি। কিন্তু তাই বলে আমরা দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ বাদ দিয়ে যদি ভূমার সন্ধানে যাই তবে ভূমা ত মিল্‌বে না—তার বদলে মিল্‌বে প্রাণহীন মহাশূন্যতা—কেন না ছোট ছোট ব্যাপারগুলি নিজেদের কোন অপরাধে ছোট নয়,—তাদের আমরা ছোট চোখে দেখি বলেই তারা ছোট বলে প্রতীয়মান হয়। বড় চোখ দিয়ে যা' দেখ্‌ব তাই মহান্ হোয়ে দেখা দেবে, বড় হাত দিয়ে যা' ছুঁইব তাই দীর্ঘায়তন লাভ কর্ব্বে। আমাদের মনের ভিতর রয়েচে সংকীর্ণতা, অনুদারতা, তাই সোনাও আমার হাতের সংস্পর্শে এসে কলুষিত হোয়ে যায়।

শুধু মন দিয়ে সৌন্দর্য্য দেখা যায় না—আর শুধু দেহের দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না। দেহ ও মনের উদ্দেশ্য যখন একাকার হোয়ে যায়—যখন মনে যে সুন্দরের দেখা পাওয়া গেল বাহু দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করবার ইচ্ছা হয়—তাকে পাওয়া যায় না বলে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে—যখন মনের বিরহে দেহের বিরহ, দেহ হারালে মন কাঁদে—তখনই বুঝব আমাদের সৌন্দর্য্য সাধনা নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হোচ্চে।

আমার মনে হয় যাকে সমস্ত মন দিয়ে চাই, তাকে কোনদিন চর্ম্মচক্ষে না দেখে থাকলেও কি যেন এক চোখে তাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। চৈতন্য তাই সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে তাঁকে প্রতিবিম্বিত দেখ্‌তে পেতেন, তাই তাঁর ক্ষণে বিরহ, ক্ষণে মিলন। আমার এক বন্ধুর ভগিনী হঠাৎ কথার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে অতর্কিত মুহূর্ত্তে বলে ফেলেছিলেন যে তিনি এই বিশ্বের সব জায়গা সব জিনিষে তাঁর জীবন স্বামীর-চরণ দু'খানি দেখ্‌তে পান। তাই তাঁর কাছে সবই সুন্দর হোয়ে গেছে? রজনী সেন একবার গেয়েছিলেন :—

"আমি যেদিন তোমারে হৃদয়ে ভরিয়া ভাবি,
শাসন বাক্য মাথায় তুলিয়া রাখি,
কে যেন সেদিন আঁখি তারকায় মোহন তুলি বুলায়ে যায়,
সুন্দর তুমি সুন্দর সবই যেদিকে ফিরাই আঁখি।"

মনের এই সৃষ্টিশক্তির Surplus energy নাম দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ যে শক্তি যা' কিছু চর্ম্ম চক্ষে দেখে তার চেয়ে বেশী বর্ণনাতীত একটা কিছু দিয়ে তাকে মণ্ডিত কর্ত্তে পারে। এ হচ্চে জড়ের মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনুভব করা। এ হচ্চে মানুষের নিঃশ্বাস—যা' সমস্ত অপবিত্রতাকে সমস্ত অসুন্দরকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে। আমাদের ঋষি এই Surplus energy উপর মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে পেরেছিলেন তাই তাঁর আশ্রমে সবুজ ঘাস পাতা ফুল ফলের স্থান ছিল, সেখানে কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি কত রকমের বিহঙ্গম গান গেয়ে বেড়াত, চপল হরিণশিশুগুলি ইতস্ততঃ ছুটাছুটি কর্ত্ত, তটিনী তর্‌তর্ বেগে বয়ে যেত, সুশান্ত পবনের ঢেউএ-ঢেউএ ভেসে ভেসে আশ্রমের শিশুরা, নৃত্য কোরে বেড়াত, সুনীল আকাশের গায়ে কচি কচি নক্ষত্র শিশুরা চিক্‌চিক্ করে হাস্‌তো, তাদের হাসির রূপালী হিল্লোল আশ্রমের ঝাউগাছের কালো চুলগুলি পুলকে দুলিয়ে দিত, জ্যোৎস্নাধারায় আশ্রমের সে বিতান স্নিগ্ধ রূপার আভায় বিজড়িত হোয়ে যেত,—রাজার ঐশ্বর্য্য ঋষির পায়ে স্তূপীকৃত হোত, কিন্তু কই তাঁর ত চিত্তবিভ্রম হোত না—সুন্দরের ছবি তাঁর কাছে অমলিন হয় নি—তিনি মৃত্যুকে জয় কর্ত্তে পার্ত্তেন, জ্ঞানকে বরণ কর্ত্তে পার্ত্তেন, ভাবকে ধারণ কর্ত্তে জান্‌তেন। মানুষের এই যে ঘুমানো শক্তি আছে, তা জেগে উঠ্‌লে সে সবের মধ্যে সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ এবং সঞ্চারিত কর্ত্তে পারে—নব্য বিশ্বকে এই ভাবের উদ্বোধন কর্ত্তে হবে—তা হোলে তিনিও রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতার সুরের সহিত আপন সুর মিলিয়ে বল্‌তে পারেন,—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি—সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ

* * * *

যা' কিছু সৌন্দর্য্য আছে দৃশ্য গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে
প্রদীপের মত,
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়,
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়।"

* * * *

সৌন্দর্য্যসাধক একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পার্ব্বেন—যে সৌন্দর্য্য শুধুই ফুলের গন্ধে নাই,—তা বজ্রের অগ্নিতেও আছে; বাঁশরীতে কেবল তার সঙ্গীত বাজে না,

—কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যেও তাহা নিনাদিত হয়। জীবন শুধু সুন্দর নয়—মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। বসন্তের উল্লাস শুধু সুন্দর নয়, নটরাজ রুদ্রের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবনর্ত্তনেও তাহা বিকাশিত।

মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ জাগরিত হোলে প্রথম প্রথম তার মধ্যে একটা উন্মাদনার ভাব দেখা যেতে পারে। ঋষি এমার্সন সত্যই বলেছেন, "A certain tendency to insanity has always attended the opening of the religious sense in men as if they had been "blasted with excess of light", "ইউরোপীয় Renaissance এর সর্ব্বপ্রথম সাধক সৌন্দর্য্যপাগল পেট্রার্ক তাই পাহাড়ে পাহাড়ে উঠে কি এক পিপাসা মিটাতে ছুটে ছুটে বেড়াতেন। বিদ্যাপতির —

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

এমন একটি প্রতিমাকে আমাদের তাপিত বক্ষের উপর স্থাপন করে—যাতে বিশ্ব ও বিশ্বাত্মা, সসীম ও অসীম একেবারে মিলে গিয়েছে। বিদ্যাপতির বিরহ মানবের চিরন্তন বিরহ। এ ব্যথা কবে ঘুচিবে—কে জানে?

সম্মুখে যদি আঁধার জমে থাকে,—হে সংসারপথের মহাযাত্রী! নিরাশ হোয়ো না, কারণ;—

"এ বিশ্ব অন্ধপুরে চিরকাল তরে
পরম আশ্বাস আছে জাগ্রতের তরে,
সত্যেরে খুঁজিছে যারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কেহ তারা শূন্যহাতে ফিরে নাহি ঘরে।"

মোড় ফিরাও।

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার]

(গান)

অত যতন করে' খুঁজে মরিস
বল্ কোথায় রে তোর রতন আছে ?
সারা দুনিয়া খুঁজে মিলবে কি রে,
খুঁজে দেখ তাই নিজের কাছে।

কে করবে তার ঠিক ঠিকানা
হাজার দেখ না পাঁজি পুঁথি,
হাজার দেখ না বেদ-বেদান্ত
হাজার দেখ না স্মৃতি-শ্রুতি ;
মন যে রে তোর উড়ে বেড়ায়,
হাত দিলি নে কানের গোড়ায়,
শুধু এ ডাল ও ডাল ঘুরে মরিস,
কাকের পিছু পাছে পাছে।

তোর দিনে দিনে গেল বেড়ে
পাওয়ার চেয়ে খাওয়ার নেশা,
ক্রমে পাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে,
খাওয়াই যে তোর হ'ল পেশা,
বাড়ী ফেরার পথও গেলি ভুলে,
তুই সব খোয়ালি লাভে মূলে,
এক নিয়ে তুই বেরিয়েছিলি
মরলি এসে সাতে পাঁচে।

ঐ যে হাট করে' যায় একটি পুরুষ,
চল্ চোখ রেখে তার চরণ-পাতে,

সে যে ইঙ্গিতে ঐ ডাকছে তোরে
দিবে পৌঁছিয়ে তোর আস্তানাতে;
তোর বন্ধ ঘরের দরজা খুলে,
দেখবি সেথায় রতন জ্বলে,
তাই বলি ভাই, মোড় ফিরিয়ে
চল দেখি তার পাছে পাছে।

সুখের ঘর গড়া

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

যজ্ঞেশ্বরীর সে দিনের কীর্ত্তি দিন শেষ না হইতেই গ্রামময় রটিয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবার এই সৃষ্টিছাড়া অনাচার দাবানলের চেয়েও এক বিষম অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়াছিল। তারামণি জমিদার বাড়ীতে থাকার কালে—দাসীমহল হইতে তাহা শোনে। সে বাড়ী আসিয়াই পিসির কাছে তাহা উত্থাপন করে। পিসি সমস্ত শুনিয়া বলিল, "বলিইছি তো মা, দেবতার কৃপা না হলে অমন দয়ার মানুষ হয় না। অত উঁচু মন উঁচু নজর না হলে অত সাহসও হয় না; ওকি আমাদের মত রামী শামীর কাজ রে তারি।"

তারা তো অবাক। এমন অনাচারিণীর মধ্যে পিসি দেবীত্ব কোথা পাইল বুঝিতে পারিল না। সে কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তাকে জান না কি? আলাপ আছে?"

পি। ছেল না, আলাপ করে গেছে সে দিন, বড় লোকের মেয়ে, বৌ, আপনি বাড়ী বয়ে এসে আলাপ আপ্যায়িত করে গেল, তোর মেয়েদের কোলে পিঠে করে আদর করে সন্দেশ খেতে টাকা দিয়ে গেল। আহা! কি সুখের বাক্যি! যেন অন্নপুন্ন! হবে না কেন? কেমন ভাগ্যিমন্ত লোকের মেয়ে! সৎমায়ের পেটের ভাইকে সমস্ত বিষয় দিয়ে নিজে ব্যবসা করে ঐশ্বয্যি করে, আবার সেই ধন দৌলত পথের ভিখারীদের ঢেলে দিয়ে যায়?

তারামণির বিস্ময়ভাব মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিল। এমন মানুষ বাড়ী বয়ে আলাপ করিতে আসিল, আর সে দেখিতে পাইল না?

তা। পিসি একদিন গিয়ে দেখা করে আলাপ করে আসবো?

পি। যাবি বৈ কি! নীলুকে নিয়ে যাস্—ওকেও দেখ্তে চায়; বলে গেছে একদিন আস্‌বে তোর সঙ্গে দেখা করতে। বলে, 'তারা ঠাকুরঝি কখন্ বাড়ী থাকে পিসি—আস্‌বো দেখা করতে।'

তা। ওমা ছিঃ! তিনি আসবেন কেন? আমিই যাব। আজই যাই না—মনিব বাড়ীর সব কায় বে-তে গেছে, গুম্ভিরে কেউ থাক্‌বে না; আজ তো অপ্‌সর আছে।

পিসি। বেস্ তো যা। সন্‌ধিকেও নিয়ে যাস্, ভোলার মেয়ের সঙ্গে ওর ভাব আছে—

তা। আচ্ছা পিসি! ওরা কি বেহ্মজ্ঞানী? শাস্তর মানে না, বিচের আচার করে না—

পি। তা কেন হবে? হিঁদুর মেয়ে? আর কি জানি মা—বেহ্মও বুঝিনি—হিঁদুও বুঝিনি, বুঝি মানুষ আর দেবতা আর পশু। নোকনাথের বউ দেবতাই হবে। ওদের দেখ্‌লেও পুন্নি হয় মা।

তা। যাই তো নীলুকে নিয়ে যাব, গুষ্টীশুদ্ধ যেতে লজ্জা করে।

পি। তা বেস তাই যা, একলা যাস্‌নি, আহ্লাদির মা'কে পুকুরপাড় থেকে ডেকে নিস্।

তারামণি পুত্র নীলমণিকে লইয়া আহ্লাদীর সঙ্গে রহনা হইল। পথে ময়রার দোকান হইতে কিছু খৈচুর কিনিয়া আঁচলে বাঁধিল।

• • • • •

যজ্ঞেশ্বরী তখন কন্যা কিরণশশীর সঙ্গে একটা যুক্তি আঁটিতেছিল। তারামণি তার স্বামীর বাল্যবন্ধুর মেয়ে, সে রাঁধুনীগিরি করে, আর তার ছোট দুধের ছেলে পড়া ছাড়িয়া দাসবৃত্তি করে এ কথা শুনিয়া অবধি যজ্ঞেশ্বরীর মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। তারামণিকে না পারুক ছেলেটাকে দাসবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। নিজেরও ছোট খাটো অল্প আয়ের সংসার, আর একটা প্রাণীর ভার লইতে তিনি ইতস্তত করিতেছিলেন, ছেলে বা দেবর অসন্তুষ্ট হইতে পারে। তিনি মনে মনে এক ফন্দী ঠাহর করিয়া মেয়েকে বলিলেন, 'কিরণ তুই এক কাজ ধর্—তোর তে ছেলে নেই কোলে; ওই ছেলেটাকে

ভিক্ষাপুত্র কি পুষ্যিপুত্র করে নে—মাসহারা ত শ্বশুরবাড়ী থেকে পনেরো টাকা করে পাস্,—তোর ভাত কাপড়ের জন্তে ভাবতে হবে না—ওই গরীব বাউনের ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে মা, বড় পুন্নি হবে মা—তীর্থ ধর্ম্ম করবি বলে জন্মাছিলি ; কি হবে মা সে সব করে ? যেখানেই থাকবি মা দুর্গার পায়ের তলাতেই থাক্‌বি—আর তীর্থ কোথা ? একটা অসহায় অনাথকে মানুষ করে মা—সব তীর্থের সার হবে—

কিরণ। মা তোমার গর্ভে জন্মে যদি আমি অন্য মত করি, তা হলে আমার জন্মই মিথ্যে ; ঠিক্ বলেছ ! তুমি আজই নিয়ে এসে কাকার ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দাও—আমার কাছে থাক্‌বে, আমি আমার ভক্ত ভাগ করে খাবো—

য। কেন গা মেয়ে ? আমি খেতে দিতে পারবো না ? এত অভাব এখনো হয় নি যে আমরা পুরো পেট খেয়ে তোমাকে আধপেটা খাইয়ে পুন্নি করাবো—

কি। না মা, তা' ভেবে বলিনি। আচ্ছা বলিছি, ডলি, তুই শুনছিস্ ? ডলি কোনো উত্তর না দিয়া সেটাকে আহ্বান মনে করিয়া পিঠের চুল ধরিয়া কাঁধে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল মাত্র।)

য। ভিক্ষে-পুত্র নিলে আর কেউ কিছু বলবে না—ওটা ধর্ম্ম করার একটা অঙ্গ। বাবি ব্রততে তোর মাস গেলে চার টাকা গচ্ছে খরচ হয়, সেইটে দিয়ে ছেলেটার খরচ চলে যাবে—যাবে না ?

কি। কেন যাবে না ?

য। বড় পুন্নি মা, বড় পুন্নি। ছেলেটা হয়তো—বয়ে যাবে, এই বয়স হতেই বড় লোকের বাড়ী দাসবিত্তি—

কি। হয়তো কেন নিশ্চয়ই—; ছোট ছেলে বছর দশ হবে ; দেখতে শুনিছি বেশ, সুসঙ্গ না পেলেই কুসঙ্গে মিশলেই খারাপ হতে কতক্ষণ—

কার কথা কিরণ ? বলিয়া সত্ত ঘরে ঢুকিল। মাকে দেখিয়া ছেলে মহানন্দে হামা দিয়া গিয়া কোলে উঠিল।

কি। এই ভারামাসির ছেলেটার কথা হচ্ছে—বলছি বড় লোকের বাড়ীর চাকরগিরি করলে ক'দিন ভাল থাকবে ? না, কাকী ?

স। হ্যাঁ, যে বাড়ীর কাণ্ড ! মাগো—সে যাগ্—নাম করতেই হাজির ! তারা ঠাকুরঝি যে এসে বসে আছে দেখা করতে—হ্যাঁ দিদি ?

যজ্ঞেশ্বরী কাপড় শেলাই ফেলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। "এসেছে না কি ? এই ঘরে নিয়ে আয় না—ছেলেটা এসেছে ? আচ্ছা আমি যাচ্ছি—"

সদু। হ্যাঁ যারে পোয়ে এসেছে---

বাহিরে না গিয়া সদু দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া তারাকে ডাকিল। ইত্যবসরে যজ্ঞেশ্বরী আগাইয়া গিয়া—হাসিয়া তার হাতটি ধরিয়া আহ্বান করিল; বলিল, "এস ভাই এস, এস বাবা। সে দিন গিয়ে তোমাদের দেখ্‌তে পেলাম না। তারপর আর একদিন যে গিয়ে দেখা করে আসবো এ আর হয় না—

যজ্ঞেশ্বরীর প্রীতির হাসি, স্নেহের করস্পর্শ ও আদরের অভ্যর্থনার ভিতর এমনি একটা আন্তরিকতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে সে মুহূর্ত্তে অভিভূত হইয়া পড়িল। বড় ঘরের মেয়ে ধনীর পত্নীর কাছে সে রাঁধুনী চাকরাণীর জীব হইয়া যে এমন খাতির পাইবে তাহা স্বপ্নেও ধারণা করে নাই। বড ঘরের আদর ব্যবহার যে কেমন তাতো সে নিত্য দেখিতেছে।

সে বলিল:—আপনি কেন রোজ যাবেন? আমিই আসবো—তবে অবসর পাই না এই জন্যে—

য। 'আপনি' 'আজ্ঞে' 'হুজুর' এ সব কেন ভাই? তোমার বাবা আমার শ্বশুরের বন্ধু ছিলেন; সেই সূত্রে আমরাও ননদ ভাজ, দুই সই—ছিঃ ভাই 'আপনি' বলে লজ্জা দিস্‌নি—ওই ছেলে? এস বাবা (কোলে টানিয়া মস্তক চুম্বন করিয়া) তারা দিদি, খাসা ছেলে মেয়ে গুলি তোর ভাই; বয়সে ছোট বলে আর আদর করে তুই তোকারি আরম্ভ করলাম—কি বলিস্ সদু?

তা। বেশ কথা। ছোট বোন তো বটেই—নীলু তোর মামীকে গড় করেছিস্?

নীলু ইঙ্গিত মাত্রেই কর্ত্তব্য করিল। যজ্ঞেশ্বরী শিরশ্চুম্বন করিলেন।

য। আজ বুঝি ছুটী পেয়েছ?

তা। হ্যাঁ—

য। মেয়ে দুটীকে নিয়ে এলে না কেন? ভারি সুন্দর মেয়ে দুটী ভাই তোর; বডটী যেন দুর্গা প্রতিমা। যেমনি রং, তেমনি নাক, চোখ, তেমনি চুল—আমায় দেবে? বৌ কর্‌বো।

তারা। এমন সৌভাগ্য তার হবে, না আমার হবে!

য। সৌভাগ্যি বলছিস্ কেন?

তারা। তা নয় দিদি? আমিতো এই, পরের ঘরের দাসী, আর ঘর ছোট—

য। ছিঃ ছিঃ ঠাকুরঝি লজ্জা দিস্‌নি। যার ঘরে অমন দেবতুল্য পিসি সেই

ঘর ছোট ? আর পরের ঘরের দাসী বল্লি কেন ? গতর খাটিয়ে পয়সা রোজকার কল্লেই ছোট হয়, তারাদিদি ? আমার স্বামী তো সাহেব বেণের চাকর ছিলেন; ছেলেও তাই ? খেটে পেটের ভাত যোগাড় করায় অপমান কি ভাই! দায়ে পড়লে আমিও তাই করবো। তুমি যদি এ কাজ না করতে অপযশ হতো, করছ এতে তোমার যশ দি।

এ শুনিয়া তারা কি বলিবে ? তার বুকের ভিতর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। শুধু চোখের ভক্তি সরস চাহনিতে তাহা প্রকাশ পাইল।

তারা। দিদি তোমার মত মন কি সকলের ? তোমার মত ভাবেও কি সবাই ?

যজ্ঞেশ্বরী সৌদামিনীর মাথাটা কাছে টানিয়া কানে কানে ছেলেটীকে জল খাওয়াইবার কথা বলিল। সদু উঠিয়া গেল।

য। ছেলে কি ঐ বাড়ীতেই থাকে ? কি করে ? পড়ে শোনে তো—

তা। পড়া শোনা আর কই হচ্চে, ভাই, ভেবেছিনু মনিবরা একটু সুবিধা করে দেবে, তা হল নি—

য। তবে কি করে ওখানে ?

তা। থাকে, খায়, দায়; কাজ কর্ম্ম করে।

কিরণ। ওইটুকু ছেলে কি কাজ করে পিসি ?

তা। বাবুর ছেলেদের পড়বার ঘরে থাকে; চা করে, বইপত্র গুছোয়, ফাই ফরমাজ শোনে—

য। ভদ্দর লোক হয়ে বামুনের ছেলেকে দিয়ে ওই সব করায় কি করে, মা ? ওরা তো গন্ধ বেনে, না পিসি ?

তা। হাঁ—

য। আর ছোট বড়। এখন পয়সায় বড রে বাছা।

সদু আসিয়া যজ্ঞেশ্বরীকে ইঙ্গিত করিল, যজ্ঞেশ্বরী নিলুকে বলিল, "যাও তো, বাবা, তোমার মামীর সঙ্গে"—নীলু উঠিয়া গেল।

য। তারা ঠাকুরঝি আমার একটা কথা রাখবে ভাই ?

তা। (সবিস্ময়ে) কি কথা, দিদি ?

য। আমার মেয়ে কিরণশশীর একটা ভিক্ষে আছে তোমার কাছে।

তা। ও মা! কি কথা বলছো, দিদি! আমার কাছে তোমার ভিক্ষে ?

কিরণ। হ্যাঁ পিসিমা, কিছু মনে না করতো বলি—

তা। কি কথা, মা, আমাকে এত সংকোচ কেন?

কি। এমন জিনিষ চাইছি, যা দিতে রাজী হয় তো হবে না—

তা। (হাসিয়া) কি, শুনি না?

কি। বল না মা!

ম। কিরণ আমার ১৩ বছর বয়সে বিয়ের পরই বিধবা হয়, এখন বয়স হল ১৯, ২০। ওঁর ছেলেপুলে তো হয় নি—বড় সাধ তোমার নীনুকে ভিক্ষা-পুত্র নেয়, ওর ভার সমস্তই নেবে। খাওয়া পরা, লেখা পড়া শেখানো সমস্ত—কি বল?

তা। এই কথা! এই ভিক্ষে!! তা দিদি এ তো আমাকেই ভিক্ষে দেওয়া, এ তো আমার ভাগ্যি, ছেলেরও ভাগগি।

ভাবের আবেগে তারার চোখ জলে ভরিয়া গেল।

ম। কিরণ ভাসুরের কাছ হতে পনেরো টাকা মাসহারা পায়, ওতেই ছেলের খাওয়া পরা পড়া শুনো চলে যাবে, অনাথা বিধবারও পুষ্যি হয়, তোমারও ছেলেটী মানুষ হয়···মন্দ কি?

তা। তা দিদি এত করে বলছ কেন? এ উপকার যেচে তুমি করবে আর আমি তাতে বাধা দেবো? আমার যে বড় ভাগ্যি, বৌদি!

কিরণ। পিসিমা, তোমার ছেলে তোমারই থাক্‌বে, আমি তাকে শুধু মানুষ করে দেবো, যদি সে সুস্থ থাকে।

ম। পয়সার ভাগ্যিতো ওর নেই, তা না হলে শশুরের বিষয়ের তিন ভাগে সমান ভাগ পাবে তো? ওর ভাগ ওকে ভোগ করতে দিলে আজ ওর ভাবনা কি?

তা। তা ছেড়ে দিলে কেন? মামলা মোকদ্দমা করলে তো পাওয়া যায়?

ম। কে ও সব ঝনঝট্ করে, দেখে শোনে, তদন্ত তদ্বির করে, কে আছে বলে? ছেলেতো শুনতেই কুড়ি বছর খোকার বেহদ্দ। এখনো কাপড় পরতে গিয়ে কোঁচার চেয়ে কাছা বড় করে! দায়ে পড়ে চাকরী করছে বৈ তো নয়! ঠাকুর পো পাড়াগাঁয়ের মানুষ, ওর সাধ্যি কি সেই সব সহরে বিষয়ী দানা দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে, পয়সাই বা কই, ভাই? মালী মোকদ্দমা করি? করেও তো জোর ১৫৷২০ টাকা এখন মাসহারা পাবে, তা অমনিই পাচ্ছে—আর তা' ছাড়া ভাসুর দেওরের সঙ্গে ইতরপনা করতে ও রাজী নয়; পেটের

ছেলে থাক্‌তো লড়াই করতো, এক্‌লা বিধবার পেট্‌টা, চলে যাবে যেমন করে হোক্‌—

তা। তবে তীর্থ-ধর্ম্ম বার ব্রত এগুলোর জন্যে যা খরচ খরচা—

য। হ্যাঁ, তাই; তাই এমন ব্যবস্থা করে নিতে চাই যে, অল্প খরচে অধিক আর বেশী খাঁটী পুন্নি হয়—একটা গরীবের ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারলে, যা কোনো গরীবের কন্যাদায় উদ্ধার করতে পারলে, বা ধর একটা অনাথ আতুরকে একমুঠো খেতে দিলে ঢের বেশী পুন্নি হয়, ভাই। ওর বাপের ওই সব মত ছিল। তিনি যা ভাল বলে বুঝতেন আমরা তার চেয়ে কি বুঝবো?

নীলু জল খাইয়া আসিয়া মার কাছে বসিল। তাবার অন্তরে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হইতেছিল। এমন মানুষ, সে দেখে নাই; এমন প্রাণ জুড়ানো সান্ত্বনা সহানুভূতি সে পায় নাই; এমন সুন্দর কথাও সে শোনে নাই। পিসির তত প্রশংসাও যে এঁর গুণের শতাংশের একাংশকেও যোগ্য মর্য্যাদা দিতে পারে নাই, তারা মর্ম্মে মর্ম্মে তা অনুভব করিতেছিল। সে বলিল, ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "একুণি দিদি—একুণি, এ উপকার আমি জন্মে ভুলবো না, হাজার জন্মেও শুধ্‌তে পারবো না—"

য। উপকার তুমিও করলে, ও কথা বলুনি। তা হলে কিরণ একটা শুভদিন দেখে নীলুকে ভিক্ষা-পুত্র করেনে—তোর শুক্‌নো বুকটা সরস হয়ে উঠুক, দেখে আমার জন্ম সার্থক হোক; তাবা ঠাকুরঝি আসিস্‌ না মাঝে মাঝে? এবার যখন আসবি ভাই, সেই দুগ্‌গা প্রতিমে তোব মেয়েটাকে নিয়ে আসিস্‌—আন্‌বি?

তা। আন্‌বো—অত করে বলতে হবে কেন?

য। আসছে মাসে খুকীর ভাত—এ মাসে হল না—তখন সব খেতে আস্‌বে?

তা। তোমার পেসাদ খেতে আস্‌বো না তো কার খেতে আসবো, দিদি?

* * * * *

যজ্ঞেশ্বরীকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া তার পায়ের পুণ্য-ধূলি লইয়া তারা ছেলেকে লইয়া বাড়ী ফিরিল। ফিরিয়া আসিয়া পিসিকে সমস্ত কথা শুনাইল। পিসি বলিল, "তারি, কর্ত্তা যে বলতো মনিষ্যির মধ্যেই ভগবান থাকে, তা সত্যি লো, বড় সত্যি—ওই মানুষকে মুখপোড়ারা একঘরে করতে বলে! ওইতো

নিজের গুণে সকলকে একঘরে করে রেখেছে; ওর ঘরের ভিসিমেনার মাথা ঠেকাতে পারে ক'টা মানুষ এই গাঁয়ে আছে না? যাক্ মা তোর ছেলেটার একটা গতি হ'ল।

তা। পুরুৎ বাউনির আস্‌ফালুনি দেখে কে? ঘাটে সে দিন কি কেচ্ছাই না করলে, আবার বক'বাউনি তাতে যোগ দিয়ে আগুনে ঘি ঢালতে লাগ্‌লো।

পি। এসেছেলো। বড় মুখ করে আমার কাছে কুচ্ছো করতে ভাল মানুষের মেয়ের, আমিও ছকু চক্রবর্ত্তীর মেয়ে, তেমনি কুঁড়ন কেঁড়ে দিইছি—

তা। কাজনি মা কারুর সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করে।

পি। ওঃ তবে আর কি? নাথাটা কেটে নেবে? ছকু চক্রবর্ত্তীর মেয়ে কারো খেয়ে বসে নেই যে, মন যুগিয়ে কথা বল্‌বে—ঘরের চালার খড় জেলে ভাত সেদ্ধ করিছি; তবু কারো বাগানের কাটী কুঠোটায় হাত দিইনি—

* * * * * *

যজ্ঞেশ্বরীর সে দিন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়াতে অন্তর আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়া উঠে সেই দিনই ছোট যা ও দেবরকে মনোগত ভাব জানাইলেন।

ভো। এ ত ভাল কাজ, বৌদি! আমার আবার মতামত কি? আমি তোমার ছোট ভাই, যা বলবে তাই করবো! তবে কিনা—

য। কি?

ভো। বাবুর বাড়ী থেকে ছাড়িয়ে আন্‌লে বাবুর ছেলেরা আবার আমার ওপর খাপ্পা না হয়—

য। বাবু তো কুড়ী টাকার মনিব! তাঁকে অত ভয় কল্লে চলে না, বাউনের ছেলেট্যাকে চাকরের মত খাটাতে তাদের লজ্জা হয় না?

ভো। আবার শুনেছো তো?

য। কি?

ভো। সে দিন ঘাটে নাইতে গিয়ে পুরুৎ ঠাকরুনকে কি বলেছিলে? অগ্নিকাণ্ড বেধেছে?

য। কিছুই বলিনি, ভাই। যা বলিছি সে দিনতো এসেই শুনিইছি।

ভো। জীবন ভটচার্জ্জির পরিবার বলে অপমান করেছিলে?

য। যা যা বলেছিলাম তাতে কি অপমান করা হয়েছিল? তুমি কি বল?

ভো। আমি তো কিছুই অপমানের কথা বুঝলাম না।

য। তবে আর কি? চেপে যাও কথায় কান দিলেই কথা ভারি হয়। সে যাগ্! ছেলেটাকে তুমি ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিও। আমার কাছেই থাক্‌বে—কিরণ তার মাইনে দেবে বই পত্তর কাগজ কলমের খরচ দেবে—তুমি একটু আধটু গোবুর সঙ্গে বসিয়ে পড়া বলে দেবে না?

ভো। কেন দেব না, বৌদি? অনুরোধ কেন। হুকুম কর? তুমি তো শুধু বৌদিদিটি নও, তুমি আমাদের মা—ভুল বুঝিছিনু তোমাকে এতদিন—অজ্ঞানের অপরাধ নিওনি, বৌদি'!

য। আচ্ছা আচ্ছা! যাও—আমা, বেগুন চাবা এনে দাও—একটু মনিববাড়ীতে আড্ডা দেওয়া কমাও না? ব দেখ্‌তে পারি মোসাহেবী করা দেখ্‌তে পারিনি, মোসাহেবী করতে হয় আমাদের দু' বায়ের মোসাহেবী কর—

ভো। তামাক যোগাতে পারবে?

সদু। (চুপি চুপি) শুধু তামাক?

য। (ভয়ে) আবার কি? হ্যাঁ? ঠাকুরপো?

ভোলানাথ সদুর দিকে কটাক্ষ করিল—

স। না দিদি; চা আর বড় টেপা—

য। তাই রক্ষে। আমি ভাবলুম আর কোনো নেশা বুঝি।

ভো। আমি কি এমনি, বৌদি?

য। তুমি না হতে পার? তোমার সেক্রেটারী বাবুর আড্ডাটী বটে, কেবল পরচর্চ্চা, লোকের কুচ্ছো, এবার বুঝি আমার চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে? মুসলমানকে ছুঁয়ে নাইনি।—বাড়ী এসে খিড়কী পুকুরে যে ডুব দিয়েছিনু তা কেউ দেখেনি তো—

ভো। উঠেছে বটে!

য। উঠুগ্‌গে। ঘরের কেচ্ছা শুনতে সেখানে যেতে হবে না—

নির্দ্ধারিত শুভ দিনে কিরণশশী শাস্ত্রানুসারে তাবার ছেলে নীলমণিকে ভিক্ষাপুত্র করিয়া লইল। তদবধি সে ঐ বাড়ীতেই থাকে। রোজ একবার করিয়া মাকে দেখিতে যায়। পাছে আদর সোহাগের প্রাচুর্য্যে ছেলে ধর্ম্মমায়ের বেশী পক্ষপাতী হইয়া গর্ভধারিণীকে অনাস্থা করে, এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বরী তাহাকে সকাল সন্ধ্যা তারার কাছে পাঠাইয়া দিত। বালক কিন্তু ধর্ম্মমায়ের আদর যত্নের মিষ্টরস ও সমবয়সী গোবর্দ্ধনের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিয়া এ বাড়ী পারত পক্ষে ছাড়িতে চাহিত না। এ জন্যে তারার মনে লুকাইয়া একটু আধটু

অভিমান হইলেই সে নিজেকেই স্বার্থপর অকৃতজ্ঞ বলিয়া গাল দিত। মাতৃহৃদয়ের দুর্ব্বলতা কোনো কালেই দোষের নয়, এই যা'।

তার মন কথা

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

(১)

আমি যে মরণ-সোহাগী।
এমনি সে মোরে ফুরায়ে ফুরায়ে
তার মন কথা নিতি যায় করে,
(মোরে) মানস-পুতলি
গড়ে নেবে বলি
(এত) ভুল করে ভাঙা কি লাগি?

(২)

কি মরণ সুধাময় গো!—
স্বর্ণলঙ্কা মহা এ মোর লাবণী
ভেঙে ভেঙে আমি অনন্তের খনি,—
(হের) দুইটি বিনাশে
ঊষা সন্ধ্যা আসে;
(সব) সে মধুর নয়-নয় গো!

(৩)

মৃত্যু মাঝে সৃষ্টি রাজে রে!
ক্ষণস্থিতি-ধারা বিনাশেরি কোলে
অচিন ছন্দে বিশ্ব হ'য়ে দোলে,
জনমি জনমি
মরণেরে চুমি
ধ্বনি যে শ্রীরাগে বাজে রে।

(৪)

অনন্ত মরণ পল পল্‌ ভাঙা
এ জীবন সাটি বুনেছে গো রাঙা,
যে দিব্য বসন
পরি নিরঞ্জন
নর নারী বেশে সাজে রে

(৫)

ওগো সৃজনের পরশ
দ্রুপদ-দুহিতা অঙ্গ সাটী খানি
কি লীলায় মোরে নিতেছ গো টানি—
আমি হারা তুমি
স্বানুভব ভূমি
কবি চিন্তামণি সে রস!

(৬)

(মম) মরণ-মঙ্গল আ মরি!
এস এস কবে কত ডাকাডাকি।
মোর সনে ঘুমে এত সাধ নাকি?
(বুঝি) তব হৃদি জলে
(আহা) তুমি গো ডুবালে
ভরি দিতে মোর গাগরী।

শিল্প।

[শ্রীঅতুল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।]

আসল জীবনের সহিত সাহিত্য ও শিল্পের কত বড় সম্বন্ধ তাহা অনেকে জানেন না, আর অনেকে জানিতেও চাহেন না। অনেকে সাহিত্যের প্রতি বিরূপ, আর অনেকে ইহাকে একটা সখের বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন। আবার অনেকে ভাবেন সাহিত্য সাহিত্যিকের মনের খেয়াল—পাগলামো। তাই

আজকাল বাঙ্গলাদেশে মেকি সাহিত্যের অভাব নাই। সাহিত্য-চর্চা মানেই সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিতা, উপন্যাস ও মহাকাব্য লেখা এক প্রকার রোগ ও সখের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকজন শিল্পসেবক ব্যতীত জন সাধারণের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি অতি অল্পই। ইহার প্রমাণ আমাদের এ পর্য্যন্ত একখানি সম্পূর্ণ বঙ্কিম-জীবনী রচিত হইল না। যিনি আমাদের জাতীয় জীবনের পথ প্রদর্শক, যিনি আমাদের সর্ব্বপ্রথমে ভারতের এক একটি রত্নোদ্ধার করিয়া উপহার দিয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়াছেন যে বিলাতী বীজ দেশী মাটিতে পুতিলে ফসল ফলে না, যিনি আমাদের জাতীয় ইতিহাস প্রণয়নের পথ দেখান—তাঁহার একখানি ভাল জীবনী নাই—কত দুঃখের বিষয়। সহানুভূতি না থাকার অনেকে অনেক কারণ দেখাইতে পারেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, যে, যেখানে সত্যকার প্রাণের যোগ থাকে, প্রাণের বেগ সেখানে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবেই করিবে। আর শিল্প যে কত বড় শক্তি ধারণ করে তাহাও বোধ হয় তাঁহাদের জানা নাই। কিন্তু ইংরাজি সাহিত্য ও তৎপরে বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের দেশে যে কি এক নবযুগের সঞ্চার করিয়াছে, তাহা যদি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর এ ভাব থাকে না।

তাই বলিতেছিলাম যে শিল্পীর কাজ খেয়াল-সৃষ্টি করা নহে। এই জগতে সর্ব্ববস্তুতে,—বাহ্য-জগতে, অন্তর্জগতে, মানবের মহত্বে, উদারতায়, দুর্ব্বলতায়, নীচতায়,—যে সৌন্দর্য্য, নিহিত করিয়াছে, যে ভগবানের লীলা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা শিল্পী যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাহাকেই বাহ্য গঠন দিয়া দেখানই শিল্পীর কাজ। কোনও ব্যক্তির মনের মধ্যে জীবন—বাহ্য ও অন্তর—যে রূপ পাইয়া উঠিয়াছে, সেই রূপ প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ অর্থাৎ শিল্পী জীবনকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, বাহিরের জগৎ তাঁহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে 'রূপ' ধারণ করিয়াছে, তাহারই বাহ্য গঠনকে আমরা শিল্প বলি। যিনি মানব হৃদয়, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ ভেদ করিয়া যতটুকু এবং যে পরিমাণে সেই চিরন্তন সত্তার লীলা দেখিতে ও দেখাইতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণেই তত বড় শিল্পী।

১। এই প্রবন্ধের খসড়া দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হয়। গত বৎসর Croceএর "Science of Aesthetics and Linguistic Expression" আমার হাতে পড়ে। এই পুস্তক পাঠ করার পর, প্রবন্ধটি বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। লেখক।

মানবের মনের ভিতর এই যে রূপের সৃষ্টি, ইহা অনন্তকাল হইতে হইয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্ট হইয়া চলিবে। ইহার সঙ্গে শিল্পীর ভয়-বিস্ময়, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, সমস্তই অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে একজন দ্রষ্টা-আমি আছেন। তাঁহার সমস্ত বস্তুর রস-গ্রহণে ও দর্শনেই আনন্দ। সেই দ্রষ্টা এই যে সৃষ্ট জগৎ ইহা বড় আপনার। কিন্তু এই জগৎকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে গেলে, আমাদের সাধনার আবশ্যক। আমাদের মনের সমস্ত দরজার চাবি খুলিয়া রাখিতে হইবে—যাহাতে বহির্জগতের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-ঘৃণা, আনন্দ-ভয় মনের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া চিত্তে অঙ্কিত হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণ মানবে তাহা পারে না। শিল্পীরাই এই কাজের উপযোগী। তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সকল বহির্জগতের বিষয় গ্রহণে অপর ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিকতর সজীব ও তাঁহাদের হৃদয় অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন। তাঁহারা প্রত্যেক বাহ্য বিষয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সত্যকে উপলব্ধি করেন। আনন্দ ও দুঃখ উভয়কেই সমানভাবে বরণ করিয়া লইবার তাঁহাদের অপূর্ব্ব শক্তি আছে। বহির্জগতের বিষয় তাঁহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে রূপে পরিণত হয়, যাহা কিছু তিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পান, সেই গুলিকে তাঁহার সেই "দ্রষ্টা-আমি" প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের এক অপূর্ব্ব যোগসাধন করিয়া এক অখণ্ডরূপে পরিণত করে, আর শিল্পী আনন্দে আপনা-ভোলা হইয়া সেই সৌন্দর্য্য, সেই অপূর্ব্ব রূপ দেখেন এবং তাহাকে বাহ্য গঠন দিয়া অপর সকলকে দেখান।

এই যে অখণ্ড-রূপ কবি ও শিল্পীর মনে সর্ব্বদা সৃষ্ট হইয়া যাইতেছে, ইহা বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া কিংবা বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। ইহা তাঁহার সহজ-জ্ঞান বা intuition। এই যে সহজ-জ্ঞানের সাহায্যে মনের মধ্যে রূপের সৃষ্টি, ইহাকে ভাষার দ্বারা, রংএর দ্বারা কিংবা পাথরের দ্বারা এক বাহ্য মূর্ত্তি দিয়া প্রকাশ করার নাম শিল্প।

২। শিল্প ও সহজ-জ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে, এই যে intuition যাহাকে আমরা সহজ জ্ঞান বা সহজ-দৃষ্টি বলিয়াছি, তাহা বলিতে আমরা কি বুঝি এবং ঐ জ্ঞান আমাদের কিরূপেই বা জন্মে? এই জ্ঞানের বিশেষত্বই বা কি আর শিল্পীর সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কিরূপ? এই জ্ঞান ইচ্ছাকৃত কিনা? কিরূপেই বা এক এক

বিশেষ শিল্প-খণ্ড এক এক বিশেষ শিল্পীর ভিতর দিয়া সৃষ্ট হয়? সহজজ্ঞান জিনিসটা কি, কোন শিল্পীর জীবনের সহিত তাঁহার শিল্প কিরূপ ভাবে জড়িত? শিল্পীর শিল্প যে তাঁহার নিজস্ব বস্তু, তাঁহার উচ্চতর ও গভীরতর জীবনেরই যে একটা অংশ, তাহা আমরা এক এক করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি—বিচার-বুদ্ধি ও বোধশক্তি, মন, চিত্ত ও প্রাণ—এই কয়েকটি লইয়া মানবের অন্তর্জগৎ। তাহার মধ্যে "বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন যাহা দেখে শুনে, তাহা বুঝিয়া শরীর যন্ত্রকে পরিচালিত করে। পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিষয় সংযোগ হইলেই মন আন্দোলনের সৃষ্টি করে। চিত্ত মনের স্পন্দনে দৃষ্ট পদার্থের উপর প্রেম, ঘৃণা, ভয়, লোভ, উৎপাদন করে; প্রাণ ভোগের জন্ত শরীর যন্ত্রকে কার্য্য করায়" (যৌগিক সাধন)। এই প্রাণ-শক্তি মনের উপর কার্য্য-কারী না হইলে মন কোনও কার্য্য করে না। কিন্তু 'প্রাণের ইচ্ছা না হইলেও আমরা বাহ্য বিষয় জানিতে ও বুঝিতে পারি।

সচরাচর মানব দুই প্রকার উপায়ে জ্ঞান লাভ করে—ঐন্দ্রিয়িক ও যৌক্তিক। প্রথম, ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নীত বাহ্য-স্পর্শগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞাগ্রহণে যে জ্ঞান তাহাকেই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বলে। দ্বিতীয় পূর্ব্ব নানা ক্ষেত্রে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার ইন্দ্রিয়সমন্বিত বিষয় বিশেষকে বিচারশক্তি ও বোধশক্তি দ্বারা আলোচনা করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই যৌক্তিক জ্ঞান বলা হয়।

এখন দেখা যাউক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ঠিক কিরূপে জন্মে। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তুকে স্পর্শ করিবামাত্র, তাহার বিষয় আমরা একটা অস্পষ্ট আভাষ মাত্র পাই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পূর্ব্বে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি উহার সহিত মিশিয়া গেলে পর, মন ঐ গৃহীত বস্তু সম্পূর্ণরূপে বোধ করে, অনুভব করে, এবং তাহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞা গ্রহণ করে,—যথা ইহা এই, উহা ঐ। পরে তাহাকে নামাঙ্কিত করে; যেমন, ইহা আমার মার ছবি, ওখানি তোমার ছবি। এই ভাবে বস্তুর সে জ্ঞান উপলব্ধি হয়, তাহাই 'স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান।' এই বাহ্য-বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞা-গ্রহণ বা এই 'স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই' intuition বা সহজ-জ্ঞান বলে। আবার যে বস্তু সম্মুখে নাই, কিন্তু সে বস্তুকে কল্পনার দ্বারা মনের মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখার নামও intuition (সহজ-জ্ঞান)। অতএব যে কোন বস্তুর রূপ দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া সে জ্ঞান তাহাই intuition (সহজ-জ্ঞান)।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মনের সমস্ত কল্পনাই ঐন্দ্রিয়িক। মনে

যাহা দেখে, যাহা শুনে, সে তাহারই ধারণা করিতে পারে। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কল্পনা মনের ক্ষমতার বাহিরে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে intuition বা সহজ-জ্ঞানের সীমা এইখানেই। Intuition কি করে? বহির্জগতের বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে, ইহা তাহাদের একটা সমগ্র আকার দেয়, এক অখণ্ডরূপে পরিণত করে। কিন্তু পথের ধারে একজন দুঃখী, কুষ্ঠাক্রান্ত স্ত্রীলোকের ছবি প্রত্যক্ষ দেখাও যেমন সহজ-জ্ঞান, তেমনই ঐ দুঃখীকে দেখিয়া বিবাহ বৌয়ের দুঃখে ভরা অবশ শীর্ণ দেহখানি পথের ধারে যেন কাহার প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে—সেই ছবিখানি যখন মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তাহাকেও আমরা সহজ-জ্ঞান বলি। আর যে ঘরে আমি লিখিতেছি, সেই ঘর, দোয়াত আমার সম্মুখে রহিয়াছে—এই যে এই সকল আমি দেখিতেছি, ইহাই intuition (সহজ-জ্ঞান), আবার, আর একটা নগরে, আর একটা ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, এই যে আমার ছবি আমার মনের মধ্যে উদয় হইয়াছে, ইহাও intuition (Crocé)। অতএব দেখা যাইতেছে যে কোন বস্তুর রূপ-জ্ঞানকে (সেরূপ বাস্তবিক কোন বস্তুরই হউক বা হইতে পারে এমন কোন বস্তুর ছবিই হউক) সহজ জ্ঞান বা intuition বলে।

ঠিক সেই প্রকারেই মানবের দৃষ্টির সাহায্যে বাহিরের "জীবন" (এখানে জীবন বলিতে মানবের লীলাভূমি অন্তর্জগৎ, বাহ্য জগৎ ও প্রকৃতির লীলাভূমি বুঝাইতেছে) যখন মনের মধ্যে একটা সমগ্র রূপ পাইয়া উঠে, তখনও আমরা মনের মধ্যে-জীবনের রূপকেও intuition বলিব। যাহা 'রূপ' পাইয়া উঠে নাই, তাহা intuition বা সহজ-জ্ঞান নহে। যেমন, মানব জীবনের একটা অংশ আমার প্রত্যক্ষ হইল। প্রথমে ঘটনাজড়িত ব্যক্তিগুলির কার্য্যকলাপ, গতি বিধি, ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া প্রবেশ করায় মনের ভিতর একটা অস্পষ্ট অভিজ্ঞা উপনীত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্ব্ব অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার স্মৃতিরাশি —ঐন্দ্রিয়িক, যৌক্তিক ও ঔপদেশিক—এবং বুদ্ধির যে চিন্তা, ঐ অস্পষ্ট অভিজ্ঞার সহিত মিলিয়া গিয়া একটা সমগ্র জীব-লীলার ছবি স্পষ্ট হইয়া যায়, ইহাই intuition, ইহাই শিল্প, আর্ট। এখানে intuition ও আর্ট এক হইয়া গেল। আর বিচারশক্তি ও বোধশক্তির দ্বারা যাহা কিছু গড়িয়া তোলা হয়, তাহাকে শিল্প বলা চলে না। এইখানেই শিল্পীর sincerity।

রূপের প্রকাশ অনেক প্রকারে হইতে পারে। ভাষার দ্বারা, রেখার দ্বারা, রঙের দ্বারা, কিম্বা শব্দের দ্বারা রূপ ফুটাইয়া তোলা যায়। সকল প্রকার রূপ ভাষা

দিয়া গড়িয়া তোলা যায় না। কবি শব্দের দ্বারা, চিত্রকর রং ও রেখার সাহায্যে মনের মধ্যের রূপকেব বাহিরে গঠন দিয়া ধরিয়া রাখেন। আমাদের intuition বা সহজ-জ্ঞান, intuition বা সহজ-জ্ঞানই নহে, যদি আমাদের তাহাকে বাহ্য-গঠন দিবার ক্ষমতা না থাকে। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে না পারাতে, আমাদের অনেক ভুলে পড়িতে হয়। যেমন আমরা বলি যে, এই বস্তুটির সহজ-জ্ঞান আমাদের আছে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি এবং জানিয়াছি, কিন্তু ইহাকে বাহিরে গঠন দিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে আমরা উহা বুঝি নাই, আমাদের উহার সহজ-জ্ঞান হয় নাই; কেবল সাধারণ কাজ চালাইবার মত অস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়াছে মাত্র। যেমন, চিত্রকর, যাহা স্পষ্ট দেখে অন্যে তাহার অস্পষ্ট আভাষ মাত্র পায়। আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমি অমুকের "হাসি" স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু বস্তুতঃ আমরা উহার আভাষ পাইয়াছি মাত্র। চিত্রকর 'হাসির' প্রত্যেক লক্ষণটি দেখেন! কোনখানটা কুঞ্চিত হয়, কোন স্থান কি ভাবে বাঁকে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পান। (Croce)।

এখানে অনেকে এই প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, কবি কাব্যে, নাটকে বা উপন্যাসে সামাজিক, রাজনৈতিক, ও জীবন সম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্ন তুলেন ও তাহার মধ্যে অনেক বিচারবুদ্ধির বিষয়ও থাকে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পী ঐ সকল প্রশ্ন তুলেন না; কবি ঐ সকল এক এক জন নায়কের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ভাবে দেখেন। (Croce)

৩। শিল্প ও মানব জীবন।

(ক) বহির্জগৎ, মানবের অন্তর্জগৎ ও মানবজীবন ইহারাই সহজ-জ্ঞানের খাদ্য যোগায়। আমরা এই প্রাকৃতিক রহস্য, মানব-জীবন ও মানব-হৃদয় যত বেশী দেখিব আমাদের দৃষ্টি তত অন্তর্ভেদী হইবে। পৃথিবীর গূঢ়তর বিষয়, মানব জীবন ও হৃদয়ের জটিলতা, আমাদের নিকট অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে। ইহাতে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃতিলাভে অনেক বস্তুর গুহ্য রহস্য, যাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, তাহা স্পষ্ট দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে আমাদের সহজ জ্ঞানের বিস্তৃতি হয়। তখন কোন্ তারে কোন্ প্রকার মানব হৃদয় বাজিয়া উঠিবে, তাহা মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। মানবের দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব, পাশবতা, ক্ষুদ্রতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোন্ ব্যক্তি কি রকম অবস্থায় পড়িলে কি প্রকার কার্য্য করিবে, বহির্শক্তি ও অন্তর্শক্তি কি রকম চরিত্রের লোকের উপর কি প্রকার কার্য্যকারী হইবে, কি কি প্রকার চরিত্রের মানব একত্র হইলে

তাহাদের কার্য্যকলাপ কি রকম ভাবে চলিবে ও তাহার ফল কি দাঁড়াইবে, তাহা যেন তখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ তারে পৃথিবীর সুর বাঁধা আছে, Carlyle যাহাকে 'The inward harmony of coherence' বলিয়াছেন, তাহা কবি তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে পান।

শিল্পী মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি, কোন্ কার্য্য ভাল, কোন্ কার্য্য মন্দ, কোন্ কর্ম্ম করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, আর কোন্ কর্ম্ম করিলে নরকে যাইতে হয়, তাহার কিছুই বিচার করেন না। তিনি মানব জীবনের লীলা যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ও দেখাইয়া আনন্দলাভ করেন। ইহাতেই তাঁহার মহত্ব। দৃষ্টির গভীরতাতেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহার শিল্পের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। শ্রেষ্ঠ শিল্পী কেবল জীবনের একদিক দেখান না, জীবনের প্রত্যেক কোটরের চাবি খুলিয়া তাহার ভিতরের প্রত্যেক বস্তুটি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করেন। তিনি যে জীবনলীলা আমাদের দেখান, তাহা কোন্ ছন্দে সাজান ও কোন্ সুরে বাঁধা, তাহাই আমাদের তাঁহার কাব্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যদি আমরা তাঁহার কাব্য সম্যকরূপে বুঝিতে চাই। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাব্য তাঁহাদের জীবনের সার অংশ, তাহা তাঁহাদের জীবন হইতেই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহা বিচারবুদ্ধি দ্বারা স্তরে স্তরে সাজান নয়। তাঁহাদের রচনা তাঁহাদের জীবনের তারে তারে ছন্দে ছন্দে বাঁধা। Goethe র 'Wilhelm Meister' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন অনেকেই তাঁহাকে এই পুস্তক প্রকাশ করার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন, আর অনেকেই 'ইহার মূল ভাব ও উদ্দেশ্য এই' কিম্বা 'এই' বলিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। Goethe (গেটে) তাহার উত্তরে বলেন, 'Wilhelm Meister is one of the most incalculable productions. I myself can scarcely be said to have the key of it. People seek a central point, and that is hard and not even right. I should think a rich manifold life brought close to our eyes would be enough in itself without any express tendency, which after all is only for the intellect." উইলহেল্‌ম্ মুইষ্টার হিসাবের বাহিরের জিনিষ; আমিও ইহার অর্থ জানি না। সকল বস্তুর ভাবের কেন্দ্র খোঁজা এ এক বিড়ম্বনা। পরিপূর্ণ বিচিত্র জীবন চক্ষের কাছে ধরাই যথেষ্ট, তাহাকে লইয়া বিচার, গতি নির্ণয় বুদ্ধির বিড়ম্বনা। 'A rich manifold life brought close to our eyes' এই যে চোখের কাছে জীবনকে ধরা ইহাই গেটের শিল্পের আদর্শ।

৪। শিল্প ও দেশ কাল।

বঙ্কিম চন্দ্র বলিয়াছেন, "সাহিত্য ও নিয়মের ফল। সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।" সত্য সত্যই শিল্প দেশ, কাল, পাত্রের, সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। কারণ জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। সেই জন্য ভিন্ন সমাজে, ভিন্ন যুগে, ভিন্নদেশে, ভিন্ন প্রকার শিল্পের সৃষ্টি হয়। বিশেষ যুগে, বিশেষ দেশে, বিশেষ সমাজে, বিশেষ প্রকার আচার ব্যবহার চাল-চলন ও জীবনের আদর্শ থাকায়, সেই প্রকার আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও আদর্শের মধ্যে মানবে মানবে ঘাত প্রতিঘাত হইয়া জীবনের গতি এক বিশেষ ধারায় বহিতে থাকে। সেই যুগে, সেই দেশে, সেই সমাজে, যদি কোন উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্ট হয়, সেই শিল্পের গঠন ও প্রাণ সেই বিশেষ ধারার ভিতর দিয়াই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, "সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশ ভেদে, রাজ বিপ্লবের প্রকারভেদ সমাজ বিপ্লবের প্রকার ভেদ, ধর্ম্ম বিপ্লবের প্রকার ভেদ। ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।"

যুগভেদ, দেশভেদ ও সমাজভেদের জন্য জীবনের গতির এক বিশেষ ধারা থাকায়, শিল্পসৃষ্টির যে এক সীমা আসিয়া পড়ে, তাহা শিল্পী অতিক্রম করিতে পারেন না। বিশ্বসাহিত্য এই বিশেষ সাহিত্যের ভিতর দিয়াই, প্রকাশিত হয়। কবির কথায় বলিতে গেলে বিশেষকে বাদ দিয়া বিশ্বে পৌঁছান যায় না। সকল সমাজে, সকল যুগে মানব মানবই থাকে; অন্তরতম বস্তু, যাহা চিরসত্য তাহা ও চিরকালই এক থাকে। অতএব যে দেশের যে যুগের যে কোনও শিল্পী তাঁহার শিল্পে মানবজীবনের অন্তরতম বস্তু, যাহা চিরকালের জন্য সত্য, প্রস্ফুটিত করিয়া দেখান, তাঁহার শিল্প বিশ্বশিল্পে স্থান পায়। শিল্পী স্থূলকে স্থূল ভাবেই দেখেন না, স্থূলের মধ্যে যে সূক্ষ্মের রহস্য-বিকাশ, ভগবানের চিরন্তন লীলা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই দেখেন এবং দেখান।

৫। শিল্প ও শিল্পী।

আমরা সাহিত্য সমালোচনায় দেখিতে পাই প্রায় লম্বা লম্বা বড় বড় কথা ব্যবহার করা হয়। যথা ইনি idealist, উনি realist, ইত্যাদি। অমুক উপন্যাস খানি realistic, এখানি idealistic, এই নব্য লেখকটী realistic

school এর। য়ুরোপে আজকাল realistic school এর বা বস্তুতান্ত্রিকের চলন খুব বেশী আর realistic নামে অনেক কুৎসিৎ বস্তু বাজারে 'কাটতি' হইতেছে। এই realistic দলের ভিতর সত্যকার শিল্পী খুব অল্পই আছেন। অনেকেই কর্ত্তব্য বোধে সমাজের কুৎসিৎ জিনিসগুলি লোকের চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে নিজে সমাজসংস্কারক বলিয়া গণ্য হইবার জন্যও বটে—সেই সকল পুস্তক প্রকাশিত করেন। সেই দৃশ্যগুলিকে হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য সেইগুলিকে নানাপ্রকারে রঞ্জিত করিতেও ছাড়েন না। আর realistএরা বোধ হয় জানেন না যে যাহাকে তাঁহারা সত্য বলেন, দেশান্তরের ভিন্ন প্রকৃতির অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহা হয় ত বিসদৃশ দেখাইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিব্যক্তি জীবনে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, এবং জীবনের কার্য্যগুলিকে নিজ অভিজ্ঞতানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন ও তাহার বিচার করেন। যথা ফরাসি বিপ্লবকে Burke ও Godwin একভাবে দেখেন নাই (Dowden এর Studies in Literature এর ৯ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শেলী ও বায়রন একই সময়ে একই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও পৃথিবী ও মানবজীবনকে একেবারে ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছিলেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্র বাবুর সৃষ্ট 'সন্দীপ' ও 'নিখিলেশ'এর চিত্র সকলেই দেখিয়াছেন।

রুচি ও আচার, সংস্কার ও অবস্থা এবং সমাজের উপর মানবের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। প্রকৃতি ভেদে জীবনের অভিজ্ঞতা ও গতিরও ভেদ হয়। তাহা ছাড়া, ভালবাসা, ঘৃণা, ভয়, বিস্ময়, ও ভোগলিপ্সা, ইহারা সর্ব্বদাই আমাদের ঘিরিয়া আছে। ইহারা বহির্জগতের বস্তু নানা রঙে রঞ্জিত করিয়া আমাদের নিকট আনে, অন্তর্জগতও সেই পরিমাণে আমাদের কাছে অন্ধকার থাকে। মানব নিজেকেই শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যিনি যে পরিমাণ আপনার অন্তঃপ্রকৃতি বুঝিতে পারেন তাঁহার সেই পরিমাণে অপরকেও বুঝিয়া উঠা সহজ হইয়া পড়ে। এই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য করে আর একটা বস্তু—তাহা ভালবাসা। মানুষকে বুঝিতে গেলে, তাহাকে প্রথমে ভালবাসা চাই, তাহার কার্য্যে সহানুভূতি থাকা চাই। যিনি পৃথিবীর অনেক দেখিয়াছেন, অনেক ভাবিয়াছেন, অনেক দুর্ভোগ ভুগিয়াছেন, যিনি পামর সাধু পর্য্যন্ত নানাপ্রকার লোকের সংঘর্ষে আসিয়াছেন, যিনি মানবের ক্ষুদ্রতা ও মহত্ব দুই দেখিয়াছেন—তাঁহার মনের ময়লা ক্রমে পরিষ্কার হইয়া গিয়া মানব জীবন ও মানব-হৃদয়ের প্রতি তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভালবাসায় পরিণত

হইয়াছে। তিনিই তখন সত্যবস্তু দেখিতে এবং দেখাইতে পারেন। তিনি জীবনের মন্দ ভাগটা বাদ দিয়া, কেবল ভাল ভাগটা রাখিতে চেষ্টা করেন না। তিনি ভাল, মন্দ, ক্ষুদ্র, মহৎ, সকলের ভিতর এক নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় পাইয়া আনন্দে বিভোর হন, আর তাহাই আমাদের দেখান। উৎকৃষ্ট শিল্প-সৃষ্টি যে সে ব্যক্তির দ্বারা হয় না—সাধনার প্রয়োজন, চিত্তশুদ্ধি ও মন পবিত্র থাকা আবশ্যক।

এই উচ্চ অঙ্গের শিল্প-সৃষ্টির অধিকার দুই চার জনেরই হইয়া থাকে। আজকাল নাটক ও উপন্যাস লেখার এত ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে যে তাহা দেখিয়া দুঃখও হয়, হাসিও পায়। রবীন্দ্র বাবু সাহিত্যে অরাজকতা দেখিয়া, যখন বঙ্কিমচন্দ্রের শাসনদণ্ডের অভাব-বোধ করিয়াছিলেন, তখন অরাজকতার সূত্র-পাত মাত্র হয়; এখন সাহিত্যে অরাজকতা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। যাঁহাদের "দেবতার আশীর্ব্বাদ" নাই কিংবা যাঁহারা পৃথিবীর কিছুই দেখেন নাই, তাঁহারা যাহা নিজে দেখেন নাই কিংবা বুঝেন নাই, তাহা যেন অপরকে দেখাইবার বা বুঝাইবার "মিথ্যা চেষ্টা" না করেন। শরৎ বাবুর 'কিরণময়ীর' কথায় বলিতে গেলে, "এ সংসারে যে দু' চার জন 'হতভাগ্যের' এই নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দেবার সত্যকার অধিকার জন্মায় এ গুরুভার তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি অন্য কাজে মন দাও তাতে কাজও হয়, অকাজও কমে। অনর্থক ছাতের কোণে মুখ ভারি করে বসে বসে কল্পনা করে লাভ হবে না এ তোমাকে নিশ্চয় আমি বলচি। গিল্‌টি দিয়ে তোমার মত আনাড়িকেই ভোলাতে পারবে। কিন্তু যে লোক পুড়ে পুড়ে সোণার রং চিনেছে, এ দুঃখের কারবারে যার ভরাডুবি হ'য়ে গেছে তাকে ফাঁকি দেবে কি করে?" পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি, কিন্তু কথা হইতেছে যে কতজন সেই সৌন্দর্য্য বা 'open secret' দেখিতে পায়?

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভূমিকা।

বাংলায় বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত যুবকেরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সরকারী কাগজপত্রে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে তাহাদিগকে 'আনারকিষ্ট' (anarchist) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সর্ব্ববিধ শাসন প্রণালীর বিরোধী, ইংরাজীতে তাঁহাদিগকেই আনারকিষ্ট বলে। এরূপ কোনও দল ভারতবর্ষে আছে বা ছিল বলিয়া আমি জানি না। যে সমস্ত পরাধীন দেশে কোনও বৈধ উপায়ে বিদেশীয় শাসনযন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিবার উপায় থাকে না, সে সমস্ত দেশে স্বাধীনতাস্পৃহা জাগিয়া উঠিলে গুপ্তসভাসমিতির সৃষ্টি অনিবার্য্য। ইটালী, পোলাণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশে যে সমস্ত কারণে বিপ্লবপন্থীদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেই সমস্ত কারণগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই এখানেও বিপ্লবাগ্নির স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছিল। আমাদের শাসকসম্প্রদায়ও সেকথা বেশ ভাল করিয়া জানেন বলিয়াই তাড়াতাড়ি রিফর্ম বিলের শান্তিজল ছিটাইয়া দিয়া সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈধ উপায়ে স্বাধীনতালাভের আশা জাগিয়াছে বলিয়াই পুরাতন বিপ্লবপন্থীদিগের মধ্যে অনেকেই নূতনপন্থা অবলম্বন করিয়া স্বদেশসেবায় ব্রতী হইতেছেন। তাঁহাদের সে আশা সত্য কি ভ্রান্ত তাহা বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে একথা সম্পূর্ণ সত্য যে তাঁহারা আর যাহাই হউন, আনারকিষ্ট নহেন। বিপ্লবসমিতি গুলির ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। অতীতের অন্ধকারময় গহ্বর হইতে সে বিস্মৃত ইতিহাস আর টানিয়া বাহির করিবার আবশ্যকতা নাই। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভারতবর্ষে বিপ্লববাদের উৎপত্তির জন্য গবর্ণমেণ্ট যতটা দায়ী এত আর কেহই নহেন। আজ যে রিফর্ম বিল তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইতেছে তাহা যদি বিশ বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইত, এবং প্রত্যেক ইংরাজ যদি ভারতবাসীকে নিতান্ত 'নেটিভ নিগার' না ভাবিয়া মানুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিপ্লববাদের নামটী পর্য্যন্ত

শোনা যাইত কিনা সন্দেহ। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্ম গুপ্তসভাসমিতি স্থাপনের চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নহে কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ বিশেষ ফলদায়ী হয় নাই। সমস্ত বাংলাদেশ লর্ড কর্জ্জনকৃত অপমানে যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল সেই চাঞ্চল্য হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বিপ্লববাদের উৎপত্তি। বাঙ্গালীদের আত্মসম্মান-বোধ রাজপুরুষদিগের ব্যবহারে প্রতিপদে ক্ষুণ্ণ হইতেছিল বলিয়াই, ইংরাজাধিকারে তাহাদের মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভবনা ছিল না বলিয়াই বাঙ্গালীরা তাহাদের ক্ষীণ প্রাণের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া ইংরাজের দুর্জ্জয়শক্তি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সখ করিয়া কেহ আপনার কাঁচা মাথা লুটাইয়া দিতে যায় নাই। দেশের মধ্যে তখন যে প্রবল উত্তেজনা স্রোত বহিতেছিল, তাহাই আধার বিশেষে ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পরিণত হইয়া বিপ্লবকেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। যুগান্তর ঐরূপ একটী বিপ্লবকেন্দ্র মাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের তখন শীতকাল। সবে মাত্র সাধুগিরির খোলস ছাড়িয়া জোর করিয়া মাষ্টারীতে মনটা বসাইতেছি এমন সময় এক সংখ্যা "বন্দে মাতরম্" হঠাৎ একদিন হাতে আসিয়া পড়িল। ভারতের রাজনৈতিক আদর্শের কথা আলোচনা করিতে করিতে লেখক বলিয়াছেন—"We want absolute autronomy free from British control"। আজকাল এ কথাটা হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে খুব সস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু সে কালে বড় বড় রাজনৈতিক পাণ্ডারা মুখ ফুটিয়া ও কথাটা বাহির করিতেন না। একেবারে ছাপার অক্ষরে ঐ কথাগুলা দেখিয়া আমার মনটা তড়াং করিয়া নাচিয়া উঠিল। সে কালের নেতারা ভাবিতেন ঝিঙ্গা, আর বলিতেন পটোল। যখন self government সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার পিছনে colonial কথাটা জুড়িয়া দিয়া শ্যাম ও কূল দুইই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে আইনও বাঁচিত, হাত-তালিও পড়িত।

কিন্তু আমার কেমন পোড়া অদৃষ্টের লিখন! ঐ ছাপার অক্ষর গুলা ভোঁ ভোঁ করিয়া কাণের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিল। মনটা কেবল থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল—"আরে, ওঠ, ওঠ, সময় যে ছুয়ে গেল!" সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। শুইয়া শুইয়া স্থির করিলাম এ সব কথার

মূলে কিছু আছে কিনা খোঁজ লইতে হইবে। খোঁজ লইতে বাহির হইয়া যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত গুজব শুনিলাম তাহাতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। পাহাড়ের কোন্ নিভৃত গহ্বরে বসিয়া নাকি লাখ দুই নাগা সৈন্য তলোয়ার সানাইতেছে; হাতিয়ার সবই মজুত, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশও নাকি প্রস্তুত; শুধু বাঙলা পিছাইয়া আছে বলিয়া তাহারা কার্য্যে নামিতে একটু বিলম্ব করিতেছে। হবেও বা।

সেই সময় কলিকাতা হইতে "যুগান্তর" কাগজখানা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লোকে কানাকানি করে যে যুগান্তরের আড্ডাটা নাকি একটা বিপ্লবের কেন্দ্র। ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের এই সমস্ত মূর্ত্ত বিগ্রহ গুলি কি রকমের জীব তাহা দেখিবার বড় আগ্রহ হইল। আমি ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, আর পাঁচজনে মিলিয়া রাতারাতি ভারতটাকে স্বাধীন করিয়া লইবে এ'তো আর সহ্য করা যায় না।

কলিকাতায় যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম ৩৷৪টী যুবকে মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় কথা নয় এ বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত। কাল না হয় দুদিন পরে যুগান্তর অফিসটা যে গবর্ণমেণ্ট হাউসে উঠিয়া যাইবে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহমাত্র দেখিলাম না। কথায়, বার্ত্তায়, আভাসে, ইঙ্গিতে এই ধারণটা আমার মনে আসিয়া পড়িল যে এ সবের পশ্চাতে একটা দেশব্যাপী বড় রকমের কিছু প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

দুই চারিদিন আনাগোনা করিতে করিতে ক্রমে "যুগান্তরের" কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল। দেখিলাম প্রায় সকলেই জাতকাট ভবঘুরে বটে। দেবব্রত (ভবিষ্যতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বি, এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছিলেন; হঠাৎ ভারত-উদ্ধার হয় হয় দেখিয়া আইন ছাড়িয়া যুগান্তরের সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভুপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারের গৃহিণী' বিশেষ। যুগান্তরের ম্যানেজারি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর সংসারের অনেক কাজের ভারই তাহার উপর। বারীন্দ্রের সহিত আলাপ হইতে একটু বিলম্ব হইল, কেন না সে তখন ম্যালেরিয়ার জ্বালায় দেওঘরে পলাতক। তাহার হাড় ক'খানার উপর চামড়া জড়ানো শীর্ণ শরীর, মাঠের মত কপাল, লম্বা

লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, আর খুব মোটা একটা নাক দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে কল্পনা ও ভাবের আবেগে যাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে, বারীন্দ্র তাহাদেরই একজন। অঙ্কশাস্ত্রের জ্বালায় কলেজ ছাড়িয়া অবধি সারেঙ্গ বাজাইয়া, কবিতা লিখিয়া, পাটনায় চায়ের দোকান খুলিয়া সে যাবৎ অনেক কীর্ত্তিই সে করিয়াছে। বড় লোকের ছেলে হইয়াও বিধাতার কৃপায় দুঃখ দারিদ্রের অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এইবার ৫০্ টাকা পুঁজি লইয়া যুগান্তর চালাইতে বসিয়াছে। দেখা হইবার পর তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই হইবে।

ভারত উদ্ধারের এমন সুযোগ ত' আর ছাড়া চলে না! আমিও বাসা হইতে পুঁটলী পাঁটলা গুটাইয়া যুগান্তর অফিসে আসিয়া বসিলাম।

কিছুদিন পরে দেবব্রত 'নবশক্তি' অফিসে চলিয়া গেল; ভূপেনও পূর্ব্ববঙ্গে ঘুরিতে বাহির হইল। সুতরাং যুগান্তর সম্পাদনার ভার বারীন্দ্র ও আমার উপরেই আসিয়া পড়িল। আমিও "কেষ্ট বিষ্টু"দের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইলাম।

বাংলায় সে একটা অপূর্ব্ব দিন আসিয়াছিল! আশার রঙ্গীন নেশায় বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ।" কোন্ দৈবী স্পর্শে যেন বাঙালীর ঘুমন্ত প্রাণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ অজানা দেশের আলোক আসিয়া তাহার মনের যুগযুগান্তের আঁধার কোণ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিল। "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা হীন।" রবীন্দ্র যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা সেই সময়কার বাঙালী ছেলেদের ছবি।

হু হু করিয়া দিন দিন যুগান্তরের গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে গিয়া ঠেকিল।

ঘরের কোণে একটা ভাঙ্গা বাক্সে যুগান্তর বিক্রয়ের টাকা থাকিত। তাহাতে চাবি লাগাইতে কখন কাহাকেও দেখি নাই। কত টাকা আসিত আর কত টাকা খরচ হইত তাহার হিসাবও কেহ লইত না। যুগান্তর অফিসে অনেক গুলি ছেলেও মাঝে মাঝে আসিয়া খাইত ও থাকিত। তাহাদের বাড়ী কোথায়, তাহারা কি করে, এ সংবাদ বড় কেহ রাখিত না। এইটুকু শুধু জানিতাম যে তাহারা "স্বদেশী"; সুতরাং আমাদের আত্মীয়।

বাহিরে যাইবার সময় বাড়ীর সুমুখে দুই একটী লোককে প্রায়ই দাঁড়াইয়া

থাকিতে দেখিতাম ; আমাদের দেখিলে তাহারা কেহ আকাশ পানে চাহিত, কেহ সম্মুখের চায়ের দোকানে ঢুকিয়া পড়িত, কেহ বা সীস্ দিতে দিতে চলিয়া যাইত। শুনিতাম সেগুলি নাকি সি, আই, ডির অনুগৃহীত জীব।

দিন এইরূপে কাটিতে লাগিল। একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল যে যুগান্তরে যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে তাহা রাজদ্রোহ-সূচক। ভবিষ্যতে ওরূপ করিলে আইনের কবলে পড়িতে হইবে। আমরা ত হাসিয়াই অস্থির। আইন কিরে, বাবা? আমরা ভারতের ভাবী সম্রাট, গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তরাধিকারী—আমাদের আইন দেখায় কেটা? কে কার কড়ি ধারে?

একদিন কিন্তু সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িল। ইন্সপেক্টর পূর্ণ লাহিড়ী জনকত কন্‌ষ্টেবল্ লইয়া যুগান্তর অফিসে খানাতল্লাসী করিতে আসিলেন। যুগান্তরের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানাও তাঁর সঙ্গে ছিল। কিন্তু সম্পাদক কে? এ বলে 'আমি'। ও বলে 'আমি'। শেষে ভূপেনই একটু মোটা সোটা ও তাহার বেশ মানানসই রকমের দাড়ি আছে বলিয়া, তাহাকেই সম্পাদক বলিয়া স্থির করা হইল। ভূপেন আদালতে সাফাই গাহিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা যখন করিল না, তখন দেশে ছেলে ছোকরাদের মধ্যে একটা খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এ একটা নূতন আজগুবী কাণ্ড বটে। ভূপেন যাহাতে ত্রুটি স্বীকার করিয়া নিষ্কৃতি পায় সরকারী পক্ষ হইতে সে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু ভূপেন রাজী হইল না। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট কিঙ্গস্‌ফোর্ড তাহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে ঠেলিয়া দিলেন।

এই সময় হইতে দেশে রাজদ্রোহের মামলার ধুম লাগিয়া গেল। দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই যুগান্তরের উপর আবার মামলা সুরু হইল এবং যুগান্তরের প্রিণ্টার বসন্ত কুমারকে জেলে যাইতে হইল।

একে একে এরূপে অনেকগুলি ছেলে জেলে যাইতে লাগিল। তখন বারীন্দ্র বলিল—"এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ধরাশায়ী করিবার কোনই সম্ভাবনা দেখি না। এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে।" এই সঙ্কল্প হইতেই মানিকতলার বাগানের সৃষ্টি।

বারীন্দ্রদের মানিকতলায় একটা বাগান ছিল। স্থির হইল যে একটা নূতন দলের উপর যুগান্তরের ভার দিয়া যুগান্তর অফিসের জনকত বাছাই বাছাই ছেলে

লইয়া ঐ বাগানে একটা নূতন আড্ডা গড়িতে হইবে। যাহাদের সংসারের কোনও টান নাই, অথবা টান থাকিলেও অকাতরে তাহা বিসর্জ্জন দিতে পারে এরূপ ছেলেই লইতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম-জীবন লাভ না হইলে এরূপ চরিত্র প্রায় গড়িয়া উঠে না; সেই জন্য স্থির হইল যে বাগানে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি তখন সাধুগিরির ফেরত আসামী; সুতরাং পুঁথিগত মামুলী ধর্ম্মশিক্ষার উপর আমার যে বড় একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা নয়। বারীন্দ্র কিন্তু নাছোড়বন্দা। গেরুয়ার উপর তাহার তখন অসীম ভক্তি। একজন ভাল সাধু সন্ন্যাসীকে ধরিয়া আমাদের দলে পুরিতে পারিলে তাহার শিক্ষায় দীক্ষায় যে ছেলেদের ধর্ম্মজীবনটা গড়িয়া উঠিবে এই আশায় সে সাধু খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িল। কি করিব, সঙ্গে আমিও চলিলাম। কিন্তু যাই কোথা? আমাদের পাল্লায় পড়িবার জন্য কোথায় সাধু বসিয়া আছে? বরোদায় থাকিবার সময় বারীন্দ্র শুনিয়াছিল যে নর্ম্মদার ধারে কে নাকি একজন ভাল সাধু আছে। অতএব চলো সেইখানে। তাহাই হইল। কিন্তু যে আশা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা মিটিল না। সাধুজী তাঁহার কাটা জিহ্বাটী উল্টাইয়া তালুতে লাগাইয়া দমবন্ধ করিয়া থাকিতে পারেন। শুনিলাম তিনি নাকি ঐরূপে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত সুধাধারা পান করিয়া থাকেন। বিশ পঞ্চাশ রকমের আসনও তিনি আমাদের বাৎলাইয়া দিলেন এবং রকম বেরকমের ধৌতি বস্তির কসরৎও দেখাইতে ভুলিলেন না। কিন্তু আমাদের পোড়া মন তাহাতে উঠিল না। দুই তিন দিন বেশ মোটা মোটা ঘৃতসিক্ত রুটী ও অরহর-ডাল ধ্বংস করিয়া আমরা তাঁহার আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বারীন্দ্র কিন্তু নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নয়। আমায় বলিল—'দেখ, গিরিডির কাছে কোথায় একজন ভাল সাধু আছেন শুনিয়াছি, তুমি একবার সেইখানে গিয়া খোঁজ কর, আর রাস্তায় কাশীতেও একবার ঢুঁ মারিয়া যাইও। আমি এই অঞ্চলে আরও দিন কতক দেখি।' আমি 'তথাস্তু' বলিয়া গিরিডি যাত্রার নাম করিয়া সটান মানিকতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দিন কয়েক পরে শুনিলাম বারীন আর একটী সাধুকে পাকড়াও করিয়াছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ঝান্সীর রাণীর পক্ষে হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাহার পর সাধু হইয়া চুপচাপ এতদিন সাধন ভজন করিতেছিলেন; বারীন্দ্রের সংস্পর্শে আবার সেই বহুদিনের নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বারীন্দ্র তাঁহাকে লইয়া মধ্যভারতের কোনও তীর্থস্থানে একটা আশ্রম গড়িবার সংকল্প

করে ; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জলাতঙ্করোগে বাবাজীর মৃত্যু হওয়ায় সে সংকল্প আর কাজে পরিণত হইল না।

কিছুদিন পরে বারীন্দ্র আর একজন সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া দেশে ফিরিল। ঐ সাধুটী মধ্যভারত ও বোম্বাই অঞ্চলে একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরে তাঁহাকে আমিও দেখিয়াছি। তিনি যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বারীন্দ্র ফিরিয়া আসিবার পর একটা আশ্রম গড়িবার ঝোঁক আমাদের ঘাড়ে খুব ভাল করিয়াই চাপিল। কিন্তু মনের মত জায়গা মিলিল না। শেষে স্থির হইল যতদিন না ভাল জায়গা পাওয়া যায় ততদিন মানিকতলার বাগানেই আশ্রমের কাজ চলুক।

(ক্রমশঃ)

চির-অভিসার।

[শ্রীকালিদাস রায়।]

শ্যামের বাঁশরী পশিলে শ্রবণে
গৃহে না রহিতে পারি,
যাই যমুনায় ছলনার লাগি
ভরা গাগরীর বারি।
বেণুরবে কখন ডাকিবে গো সই
নাহি ঠিক তাই কান পেতে রই,
অভিসারিকার সজ্জা করিয়া
আর সব সাজ ছাড়ি।
কিঙ্কিণী আর কটীতে ধরি না
এ চরণে আর নূপুর পরি না—

দিনের আলোয় পথ চিনে আসি
পরে বই নীল শাড়ী।
আঁধারে চলিতে, শিখি পথে ঘাটে—
ছুটিতে বরিষা রাতে বনে মাঠে
অভ্যাস করি পিছলে চলিতে
আঙিনায় জল ঢালি।

বিশ্বের দরবারে ভারত।

[অধ্যাপক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ]

চৌরঙ্গীর তেলা রাস্তায় যখন চাকার কাঁচকঁচ শব্দ করিতে করিতে মন্থরগতি গোরুর গাড়ী আষ্টে পৃষ্টে বোঝা বহিয়া যায় আর তাহার পাশ দিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া মোটর ছুটে এবং টং টং করিতে করিতে ইলেক্ট্রিক ট্রাম বাতাসের মত চলে—তখন সে চিত্র দেখিয়া বিশ্বের মাঝে ভারতের স্থানের কথা মনে পড়ে। যুগযুগান্তর চলিয়া গেল, কত রাজ্য রাজধানী কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল, কিন্তু গোরুর গাড়ী তাহার সেই শাশ্বত কালজয়ী কাটামো খানা লইয়া সমান ভাবেই বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। কলিকাতার মত প্রকাণ্ড সহরে এত ব্যস্ততা এত ক্ষিপ্রতার মাঝেও সে লোপ পায় নাই—তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই। এত সস্তায় এমন বোঝা বহিতে কে পারিবে? না খাইয়া নামমাত্র পারিশ্রমিকে কে বিদেশীর বাণিজ্য গুদাম খোলসা করিবে? তাই গো-যান কলিকাতায় আছে—এবং সম্মানের সহিতই আছে—কারণ আর সব গাড়ী চাপা দিলে চালকের জরিমানা হয়, কিন্তু গোরুর গাড়ীর বেলায় যে চাপা পড়িবে তাহাকেই জরিমানা দিতে হয়।

আমরা Foot ball of modern civilisation—বর্ত্তমান সভ্যতার ফুটবল এ কথাটা ঠিক। কানাডা হইতে মারিল লাথি, অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়া পড়িলাম, অষ্ট্রেলিয়া হইতে লাথি খাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে এক সুটে একেবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। আমরা Citizens of the British Empire (ব্রিটিশ রাজ্যের পৌরজন)—তাই আমরা শ্বেতাঙ্গের সহিত একত্র রণক্ষেত্রে মরিতে পাই, তাহাদের খানসামা হইয়া

বাণিজ্য চালাই—বাগানের কুলী হইয়া Empireএর ধন সম্পদ বাড়াই। আমাদের প্রতিনিধি League of Nations এ বসেন, জগতের শান্তি-স্থাপন-বৈঠকে যোগ দেন, শেখানো বুলিটী আওড়াইয়া তোতা পাখীকেও লজ্জিত করিয়া তিনি আমাদের মুখ রক্ষা করেন। বিশ্বের দরবারে আমাদের কতই না সম্মান!

কবি বলিয়াছেন—"এ মহাদেশের প্রতি তৃণ পরে আছে বিধাতার করুণ দৃষ্টি, এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি।" স্বর্গের অপ্রত্যক্ষ বিধাতার দৃষ্টি কোথায় আছে জানি না, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ ভাগ্যবিধাতার দৃষ্টি এ মহাদেশের প্রতি তৃণ পরেই আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবগণ কি ভাবে পুষ্পবৃষ্টি করেন ঠিক ধারণা নাই, তবে আমাদের আরাধনার ধন গৌরাঙ্গ প্রভুগণ কি ভাবে আমাদের উপর পুষ্প চন্দন বর্ষণ করেন, তাহা কেরাণীর জাতি আমরা সকলেই জানি।

"ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা এসিয়ার তুমি তীর্থ-ক্ষেত্র।"

এই কি সেই ভারত। যে ভারতের তপোবনে প্রথম জ্ঞান-কিরণ-পাতে এসিয়া-ভূমি চক্ষু মেলিয়াছিল, জগত বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়াছিল, যেখানকার প্রেমের বার্ত্তা জ্ঞানের বার্ত্তা বহিয়া অনেক [illegible] দেশে দেশে ভ্রমণ করিত, অধ্যাত্মরাজ্য বিস্তারেই যেখানকার সম্রাটের [illegible] শক্তি ব্যয়িত হইত আজ সেই ভারতের বিশ্বের দরবারে স্থান কোথায়? "ছিল বা আপনি বীর কেশরী প্রতাপ জননী যে"—এখন "পরপদানত দলিতা লাঞ্ছিতা দীনা কাঙালিনী সে।"

ভারতের এই অবস্থাতেও পরিতৃপ্ত হন এমন ভারত সন্তান এখনো আছেন। সকল শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের বুদ্ধিটা এমনই আচ্ছন্ন হইয়াছে, যে, ভারতের এই মরণ আমরা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি। জনৈক [illegible] বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, যে, জগতের মাঝে ভারতবর্ষ যিশুখৃষ্টের মত মরিয়া, জগতের অত্যাচার সহিয়া, জগৎকে এক নবজীবন দিয়া যাইতেছে। কি চমৎকার কবিত্বময় ব্যাখ্যা!! "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন বেলা হ'ল মরি লাজে" অর্থাৎ 'হে ভগবান নিদ্রিত আমাকে তুমি জীবন প্রভাত হইতে না হইতে কেন জাগালে না—এখন বয়সের বেলা হইয়া গেল, তাই সে লাজে মরিতেছে"—এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও ঠিক একই প্রকারের।

বোঝার ভারে পিঠ ভাঙ্গিয়া গেল—আর তো চলিতে পারি না। বিনা

পয়সায় পাওয়া যায় এমন যে একমাত্র খাদ্য—যাহা জীবনে একবার খাইলে আর খাইতে হয় না—সেই মরণকালের খাবি খাইতে খাইতেও আমাদের কবিত্ব ঘুচিল না। জীবন মৃত্যুর রূপক দিয়া তখনও আমাদের মরণ পথের যাত্রাটার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতেছে—"চলিয়াছি জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া তোমার বোঝা বহিয়া তোমার দিকে, আসিতেছ কত জন্ম কত মৃত্যুর উপর দিয়া বোঝা নামাইতে আমার দিকে, চলিতে চলিতে খসিতেছে জীবনের পর জীবন বন্ধ, জানু নত হইতেছে তোমার আসার পথে চাহিয়া বারবার, দুই আঁখি ঝরিতেছে কত না বিরহে যুগযুগান্তে।" এই আধ্যাত্মিকতার কথা শুনিতে বেশ, পড়িতে বেশ। কিন্তু খরগোসের মত চোখ দুটি বুজিয়া থাকিলেই ব্যাধ তো আর ধরিতে পারিবে না। এই মোহ না ঘুচিলে আমাদের মরণপথের যাত্রা অগস্ত্য-যাত্রায় পরিণত হইবে।

কোথায় গেল আসিরিয়া, ক্যালডিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, রোম—কালের কবাল কবলে একে একে সকলেই নিপতিত। কিন্তু ভারত আজও বাঁচিয়া আছে—আজিও ভরদ্বাজ, কশ্যপের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার লোক ভারতে আছে। তাই এ জাতি—বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। উপযুক্ত চিকিৎসক চাই। হাত ছাড়িয়া গিয়াছিল—আবার যখন নাড়ী ফিরিয়াছে, তখন আশা আছে। মৃতসঞ্জীবনী প্রয়োগ করিলেই প্রাণ আবার সতেজ হইয়া উঠিবে। বিশ্বের চারিদিকে সকল কর্ম্মের মাঝে, প্রাণের প্রেরণায় সে সঞ্জীবনী মিশাইয়া আছে। ভারতের প্রাণ তাহার সহিত যোগ করিয়া দাও, সে আবার নূতন আবেগে স্পন্দিত হইবে, শুষ্ক তরু আবার মুঞ্জরিবে, মরা গাঙে আবার বাণ আসিবে—কেবল চাই এখন এমন একদল অকূলবিহারী নেয়ে যাহারা জয় মা বলিয়া এই জোয়ারে তরী ভাসাইয়া দিবে, অকূলেও কূল দিবে।

বিশ্বের দরবারে সবাই আসিল—আমরাও না গিয়াছি এমন নয়। ইংরেজী বাজনার দলে জয়ঢাক ঘাড়ে করিয়া গিয়াছি আমাদের পিঠে ঐ বৃহৎ যন্ত্রটাকে রাখিয়া ইংরেজ বাজাইয়াছে—আমরা কুঁজো পিঠ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিয়াই চলিয়াছি—সে যাওয়া তো আমাদের সার্থক যাওয়া হয় নাই। জগতের ধর্ম্মসভায় বিবেকানন্দ গিয়া কি এক নূতন সাড়াই দিয়াছিলেন, বিশ্বকবি সভায় রবীন্দ্রনাথ এক নূতন তন্ত্রী বাজাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক মহলে রামানুজম্, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্ল-চন্দ্র এত নূতন সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, ঋষি অরবিন্দের প্রাণের প্রফুল্ল সৌরভে পাশ্চাত্য নরনারী ছুটিয়া আসিয়াছে—ভারতের জয়ডঙ্কা বাজিয়াছে।

কিন্তু জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে, উৎসবের ময়দানে, ভারত তেমন করিয়া আসিল কৈ? সে কি তাহার জোঁয়াল ঘাড়ে করিয়াই চিরদিন চলিবে? ঘরের কাজ নিজের হাতে করিবার অধিকার সে কি পাইবে না? বিশ্বের দেয়ালি উৎসবে সে কি আপন হাতে আপন প্রদীপটি জ্বালিতে পাইবে না? সাড়ে সাত বৎসর আঁধারে থাকিয়া আজ যে দিনের উজ্জ্বল আলো তাহার চোখে ঝাপ্সা লাগাইয়া দিতেছে—সে ঝাপ্সা কি কাটিয়া যাইবে না—আবার কি ভারত চক্ষুষ্মান্ হইয়া নিজের ঠিক স্থানটি বিশ্বের দরবারে খুঁজিয়া লইবে না? সে শুভদিনের প্রতীক্ষায় আর কত দিন বসিয়া থাকিতে হইবে?

অনন্তানন্দের পত্র।

সে দিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যাবেলাই চায়ের পেয়ালা কোলে করে পণ্ডিত হৃষীকেশের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে রকম বেরকমের খোসগল্প করা যাচ্ছে, এমন সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে গোপাল দা' এসে উপস্থিত।

গোপাল দা'কে তোমার মনে আছে ত? দাদার যা' বয়স তা'কে ঠিক যৌবন বলা চলে না, কিন্তু এখনও বেশ নধর গোলগাল চুকচুকে চেহারা; আর দুপয়সা রোজগারের-সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মকর্ম্মেও মতিগতি হয়েছে। বার, ব্রত, উপবাস, হাঁচি, টিকটিকি প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণের অনেকগুলিই দেখা দিয়েছে, টাকের পিছনে একটি ছোটখাট টিকিও গজিয়েছে। দাদা লিখছেন এই পূজোর পর সস্ত্রীক গয়া দর্শন করবে।

ঘরে ঢুকেই একখানা ঠ্যাং ভাঙ্গা চেয়ারের উপর বসতে গিয়ে দাদা প্রায় ডিগবাজী খাব খাব হয়েছেন এমন সময় পণ্ডিত হৃষীকেশ চায়ের পেয়ালায় গোঁফজোড়া জুবড়ে চোখদুটি উঁচু করে খুব সহানুভূতিসূচক স্বরে বল্লেন—"দেখো, দাদা, ভাঙ্গা চেয়ারখানায় যেন বসো না।" দাদার চোখের কোনে সাত্ত্বিক প্রকৃতির ঈষৎ বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল, কিন্তু দাদা সেটুকু সামলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—

"এবার গয়ায় গিয়ে দেখে এলাম বুদ্ধদেবের দাঁত। সহজে কি মোহান্ত দেখাতে চায়; অনেক কাকুতি মিনতি করে তবে দর্শন পেয়েছি। অবতার

পুরুষের অঙ্গ কি না—এই এত বড়। আর কি মহিমা, ভায়া। অমন হাজার হাজার লোক সেখানে পুজো মানস করে আধিব্যাধি থেকে মুক্ত হচ্ছে।"

পণ্ডিত হৃষীকেশ ততক্ষণ নিজের পেয়ালাটী নিঃশেষ করে দাদার জন্য এক পেয়ালা ঢেলে ভুল করে নিজের মুখের দিকে তুলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বুদ্ধদেবের দাঁতের মহিমা শুনে সেটি আবার নামিয়েরেখে বল্লেন—"তা, আর হবে না! আমাদের বিটলেরাম বাবাজী ত ভক্তিতত্ত্ব কুজ্ঝটিকায় লিখেই গেছেন—"হরির চেয়ে হরি নামের বেশী মাহাত্ম্য, তা' বুদ্ধদেবের চেয়ে তাঁর দাঁতের মহিমা যে বেশী হবে, এতো জানা কথা।"

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে এ রকম বক্রোক্তি শুনে গোপাল দা' একটু ক্রুদ্ধ হবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মায় যে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল তা তাঁর অস্থি মজ্জা, মেদ, বসা, চর্ম্ম ফুঁড়ে বহিরঙ্গে প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই পণ্ডিতজী ফের বক্তৃতা সুরু করে দিলেন—

"শাস্ত্রে যে বলে অবতার পুরুষেরা আত্মভোলা, গোপালদা'র কথা শুনে সে সম্বন্ধে আজ আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। আহা। দেখ একবার তামাসা! বুদ্ধদেব নিজেই সংসারের আধিব্যাধির দাওয়াই খুঁজতে খুঁজতে হায়রাণ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের দাঁতের যে এত গুণ তা' যদি জানতেন, ত একটা কেন, বত্রিশটাই উপড়ে ফেলে গোপালদা'কে বখসিস দিয়ে যেতেন। বৌদিদিকে আর তা' হলে ঢোলকের মত এতগুলো মাদুলি বয়ে বেড়াতে হতো না।"

বক্তৃতার ঝাপটা লেগে চা'টা মারা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখে আমিই সেটার সদ্ব্যবহার করে নিজেকে একটু গরম করে নিলুম। কেন না দেখলুম যে, এই শনিবারের বারবেলায় পণ্ডিতজীব জিহ্বাখানি বেশ একটু বিষিয়েছে। কাউকে না কাউকে না ছুবলে তিনি ছাড়বেন না।

রাগে গোপালদা'র শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে অন্ধকার বর্ণ হয়ে দাঁড়াল। তক্তাপোষে একটা বিরাট চাপড় মেরে তিনি বল্লেন—

"কি সর্ব্বনেশে কথা। আমি দেখে এলাম বুদ্ধদেবের দাঁত, আর তুমি না বল্লেই হবে। অবতার পুরুষদের তুমি ঠাওরেছ কি? তাঁদের মহিমা যুগ-যুগান্তর ধরে থাকে।"

পণ্ডিত হৃষীকেশ বক্তৃতার পর গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবার জন্য এতক্ষণ আর এক পেয়ালা চা ঢালছিলেন। এক চুমুক খেয়ে জিহ্বাটা বেশ একটু শানিয়ে নিয়ে বল্লেন—

"সে কথা আর বল্‌তে! মহিমার জ্বালায় হাড় ভাজা ভাজা হয়ে উঠেছে। এলেন ত্রেতাযুগে অবতার রামচন্দ্র, আর ছেড়ে দিয়ে গেলেন দেশের মধ্যে এক পাল হনুমান! গেরস্তর বাগানে কলাটা, মূলোটা, বার্ত্তাকুটা কিছুই আর থাকবার জো নেই। তার পর দ্বাপরে এলেন শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র, ঢলাঢলি রস্তারক্তি ক'রে গেলেন, তার ছাপ এখনও দেশ থেকে মোছেনি। কলিতে নাকি এসেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ—আর ছেড়ে দিয়ে গেছেন দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে নেড়ানেড়ী। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে বাড়ীর ভিতর এসে—'জয় রাধে কৃষ্ট, দাও মা দুটি ভিক্ষে।" দিতেই হবে;—আর এদিকে চালের দর ১২৲ টাকা। আজকাল আবার গাঁয়ে গাঁয়ে অবতার গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মে দেশময় ত্যাগধর্মের মহিমা ঘোষণা করতে লেগে গেছেন। পুরাণো অবতারদের তবু দুটো ফুল বিল্বপত্র দিয়েই তুষ্ট করা যায়; কিন্তু এই হালফ্যাসানের অবতারদের বচনের ঠেলা সামলাতে পোড়া দেশের যে কত দিন লাগবে তা' ভগবানই জানেন।'

পণ্ডিত হৃষীকেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাকি চা টুকু শেষ করে নিলেন। গোপাল দা' কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তার ভাবটা স্ফুট ভাষায় ব্যক্ত হবার পূর্ব্বেই মা সরস্বতী আবার পণ্ডিতজীর জিহ্বায় ভর করে বোসলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে শূন্যে একটা টুস্‌কি মেরে বল্লেন,—

"চুলোয় যাক্ ত্যাগের কথা। ঘরের সম্পত্তির মধ্যে ত একটা বুড়ী ব্রাহ্মণী আর একটা সিংভাঙ্গা গোরু, তাও আবার দু' বছর থেকে দুধ দেয় না; সেগুলো না হয় কাম্িনী কাঞ্চনের দোহাই দিয়ে ত্যাগই করলুম। আর এই দুর্ভিক্ষের দিনে অবতার পুরুষদের হুকুম মত কোন দিন বা উপবাস, কোন দিন বা পান্তাভাত ভক্ষণ, তাও না হয় চলতে পারে। কিন্তু অবতারেরা যদি পাঁজি পুঁথি দেখে একটা ভাল দিন স্থির করে হুকুম করেন যে আজ পাঁচটা দশ মিনিট থেকে সাতটা বাইশ মিনিট পর্য্যন্ত সবাই মিলে কাঁদ, কাল ন'টা সাতর মিনিট থেকে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সবাই মিলে গড়ের মাঠে গিয়ে ডিগবাজী খাও, তা'হলে যে পৈতৃক প্রাণটা ত্রিতাপ্তই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এ সব যে দাঁত পুজো, খড়ম পুজো, কাঁথা পুজোরই উল্টা পিঠ।"

কথাগুলোর মধ্যে রাজনীতির একটু বোটকা গন্ধের আভাস পেয়ে তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্য আমি বল্‌লাম—

"ও সব সে কালে চল্‌তো, পণ্ডিতজী, আজকালকার ছেলেরা অত সহজে খাড় নোয়ায় না।"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"ঐ ত তোমাদের রোগ, ভায়া; পুরাণো বন্ধু একটু বেশ বদ্‌লে এলে আর তোমরা চিনতে পার না। মানুষের ধাত কি আর অত সহজে বদ্‌লায়? ছাপান্ন পুরুষ ধরে যারা খড়ম পূজো কোরে এসেছে, তাঁদের ঘাড়গুলি কা'রো না কা'রো পায়ের তলায় লটিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। যেমন তেমন একটা পেলেই হলো—হয় গুরুঠাকুর, নয় প্রভুপাদ, নয় মহাত্মা, নয় লিডার। ওসব এক জিনিসেরই কালভেদে ভিন্নরূপ। এঁরাই প্রোমোশন পেয়ে ক্রমশঃ অবতার হ'য়ে দাঁড়ান। তখন তাঁদের হাড়ে ভেল্কি হয়, দাঁতে রোগ সারে, চটিজুতার শুকতলা ভিজিয়ে খেলে একবারে পরমপদ প্রাপ্তি হয়।"

চটিজুতার কথা শুনে গোপাল দাও হেসে ফেল্লেন, কিন্তু পণ্ডিতজীর তখন বক্তৃতাটা মাথায় চড়ে গেছে। তিনি বল্লেন —

"না না, দাদা, এটা হেসে উড়াবার কথা নয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, এমন কি গার্হস্থ্যনীতিতে পর্য্যন্ত আমরা ঐ খড়মপূজাকেই সার সত্য বলে স্থির করে ফেলেছি। আমরা ফুল বিল্বপত্র হাতে করে বসে আছি, যেই একটি ছোট খাট মহাপুরুষের আবির্ভাব, অমনি শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে, ঢাক ঢোল কাঁশি বাজিয়ে, চামর ঢুলিয়ে, হেসে কেঁদে, নেচে গেয়ে এমনি একটা বীভৎস ব্যাপার করে তুলি যে মহাপুরুষটি যদি সাক্ষাৎ ভগবানও হন, ত তাঁর ভূত হয়ে যেতে বড় বেশী বিলম্ব হয় না। তারপর তার নাম, নখ, চুল নিয়ে দলাদলি আর মারামারি। তিনি কুস কবলেন কি ফ্যাস্ কবলেন, টুবু কবলেন কি টাক্ করলেন—এই নিয়ে গভীর আধ্যাত্মিক গবেষণা। এ সব কি ধর্ম্ম রে বাপ।— এ শুধু জড়ভরতদের জটলা, বক-ধার্ম্মিক লিমিটেড-কাম্পানীর আধ্যাত্মিক হুক্কা-হুয়া।"

গোপাল দা এতক্ষণ চুপ করে হ্যাবা গঙ্গারামের মত বসে ছিলেন। এইবার পণ্ডিতজীকে থামতে দেখে একটু সাহস পেয়ে বল্লেন—"তা' বলে ত আর বাপ পিতাম'র ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়তে পারি নে।"

পণ্ডিতজী লাফিয়ে উঠে বল্লেন "সে দোষত তোমার নয়, দাদা, দোষ তোমার ভগবানের। মনটা যার এখনও চার পায়ে হাঁটে, তাকে মানুষের আকার দিয়ে তার শরীরটাকে দু'পায়ে হাঁটান—একটা অত্যাচার বৈত নয়! মনটা আমাদের ক্রমাগত খুঁজছে কোথায় কার পায়ের তলায় পড়ে নাক রগড়াবে, তাই আমরা সব কাজেই একজন না একজন মুরব্বীর দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে

চাই। পরকালের ব্যবস্থা করতে হবে,—ত টেনে আন দু'চারটা মহাত্মাকে না হয় অবতারকে; দেশের স্বাধীনতা চাই ত আওড়াও মিল-বেনথামের বুলি; সমাজ গড়তে হবে ত নিয়ে এস ধার করে কনসের্ভেটিজম্, ঘরকন্না গড়তে হবে, ত ডাকো বাঙ্গা ঠানদিদিকে, না হয় ত পদী পিসিকে। মোট কথা কারো না কারো আশ্রয়ে পড়লে তবে আমরা থাকি ভাল। আমাদের মনগুলি যে এক একটী ঘোরখাটোকা পর্দানসিন বিবি। ভগবানের খোলা হাওয়া গায়ে লাগলেই তাঁদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়ে যাবে। আমাদের মনে মনে বেশ একটা ভয় আছে যে পাঁচজন মুরুব্বী মিলে ভগবানের এই সৃষ্টিটাকে ঠেকনা দিয়ে না রাখলে সৃষ্টিটা একদিন হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। তাই আমাদের কথায় কথায় পরের দোহাই, বাপ পিতামহের নাম করে নিজেদের সম্ভ্রম লুকিয়ে রাখা। নমঃশূদ্রের জল চল করতে হবে, ত দেখ পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য কি বলে গেছেন,—আর পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য যে এদিকে কবে মরে ভূত হয়ে গেছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই! যাঁরা জাত মানেন, তাঁরা দোহাই দেন পুঁথির, আর যাঁরা মানেন না তাঁরা দোহাই দেন ফ্রেঞ্চ রিভলিউসনের। দোহাই একটা দেওয়া চাই॥ নিজের বলতে আমাদের কিছু নেই। সমাজ আর ধর্ম্ম—বাপ ঠাকুরদাদার, দেশটা বিদেশীর; আর মনটা—যিনি দয়া করে ওটা গড়ে দিয়েছেন তাঁর। আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে খড়ম-পূজা আর কর্ম্মের মধ্যে পাদোদক পান। সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিত, আর ইংরাজী-পড়া গ্রাজুয়েট—সবাই কাণ ঐ এক পথে, তফাতের মধ্যে এই যে একজন গড়াগড়ি দেন পূর্ব্বমুখ হয়ে আর একজন পশ্চিম মুখ হয়, একজন মন্ত্র আওড়ান সংস্কৃতে, আর একজন আওড়ান ইংরাজিতে। ধর্ম্মের বেলায় সত্যপীর আর রাজনীতির বেলায় মন্টেগু।"

বক্তৃতাটা বেশ জমে আসছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে [illegible] কার শাঁখ বেজে উঠতেই পণ্ডিতজী থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন। ও: আজ যে পূর্ণিমা। আমরা বাহিরে বসে বক্তৃতা করছি আর ব্রাহ্মণী যে ঘরের মধ্যে সত্যপীরকে সিন্নি খাওয়াচ্ছেন। তার পরেই দরজায় শিকলি নেড়ে ডাক পড়ল—হুন্ হুন্ হুন্, হুন্ হুন্ ঠান্। আমি একটু উসখুস করছি দেখে পণ্ডিতজী বল্লেন, "যাও, ভায়া, সত্যপীরের কথা শোন গে। আজ তা' হলে এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।"

পণ্ডিতজী বেরিয়ে পড়লেন, আর আমি গোপাল দাদাকে সঙ্গে নিয়ে সত্যপীরের কথা শুনতে চল্লুম। পুরুত ঠাকুর তখন গলা ছেড়ে পড়ছেন—

"একথা শ্রবণ কালে যেবা অন্য কথা বলে
আর যেবা করে উপহাস,
লাঞ্ছিত সে সর্ব্ব ঠাঁই তাহার নিষ্কৃতি নাই
অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ।

পণ্ডিত হৃষীকেশের যে হঠাৎ কি সর্ব্বনাশটাই ঘটবে তাই ভেবে আমি শিউরে শিউরে উঠতে লাগলাম।

তোমার হাসি

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্]

আমি যখন আকাশ পানে চাহি
তুমি হাস
নিশীথ রাতের তারার সনে গাহি
তুমি হাস!
কাজের মাঝে হঠাৎ যখন বাজে
তোমার নামটি আমার বুকের মাঝে
তুমি আড়াল হতে মুখ বাড়িয়ে—বল
আমায় ভালবাস!
ভুবন জোড়া মোহন মেলা, মেলে'
বসে আছ
প্রেমের যখন একটি প্রদীপ জ্বলে
তুমি হাস॥

সাহিত্যে অনুভূতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

জীবনের জটিলতার কোনও সহজ মীমাংসা সাহিত্যিকের কাছে নাই, বরং সাধারণের নিকট যাহা সরল, সাহিত্যিকের কাছে তাহা অনেক সময়েই জটিল হইয়া উঠে! কারণ, তিনি কতকগুলি বাঁধিগৎ লইয়া বিচার করিতে বসেন না,—তিনি জানেন বিপরীত ঘটনার এক ফুৎকার এই বাঁধিগৎগুলি কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়—তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞানের নিকট যাহা দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ, সামঞ্জস্য-রহিত—শিল্পসৃষ্টিতে, ভাব ও রূপের অখণ্ড অভিব্যক্তিতে—তাহার এই দ্বন্দ্বের রূঢ়তা ঘুচিয়া যায়;—সমষ্টিকে ব্যষ্টির মধ্যে উপলব্ধি হয় এবং ব্যষ্টিও সমষ্টির মধ্যে ধরা দেয়,—নৈতিক সূত্রগুলি অধ্যাত্মসত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আর পরস্পর-বিরোধী রূপ ধারণ করে না,—জ্ঞানের সহিত ভাবের, ধর্ম্মের সহিত প্রবৃত্তির, সত্যের সহিত সৌন্দর্য্যের যে দ্বন্দ্ব তাহা অনেকটা তিরোহিত হইয়া যায়। * দর্শন ও বিজ্ঞান ইহা ঘুচাইতে গিয়া, ইহাকে আরও রূঢ় করিয়া তুলে। ধর্ম্মকে ধর্ম্মের কোঠায়, পাপকে পাপের কোঠায় রাখিয়া,—সত্য মিথ্যার মধ্যে দাঁড়ি টানিয়া চলিতে পারিলে জীবনের পথ যে ঋজু হইয়া আসে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতি যদি মানুষকে মানুষ না করিয়া একেবারে জড়ের অন্তর্গত করিয়া সৃষ্টি করিত, তবেই এ পথ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত। আমাদের দুঃখই ত এই যে আমরা জড়ও নই, আত্মাও নই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি আছে, কিন্তু সেটাকে বশীভূত করিয়া রাখিতে

* This antithesis does not merely display itself for our consciousness, in the limited region of our moral action * * but also in the contrast of the universal and particular, when the former is explicitly fixed over against the latter, just as the latter is over against the former, * * * * Intellectual culture and the modern play of understanding create in man this contrast which makes him an amphibious animal in as much as it sets him to live in two contradictory worlds at once * * * Art has the vocation of revealing the truth in the form of sensuous artistic shape, of representing the reconciled antithesis just described" Hegel's Introduction to Fine Art

পারি,—এমন মন্ত্র আমরা শিখি নাই। আমাদের পাপ পুণ্য যে আমাদিগকে কোথা দিয়া কোথায় লইয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দার্শনিক প্লেটোর গুহাবদ্ধ নরের ন্যায় আমরা ছায়া লইয়া বাস করিতেছি, কিন্তু আমাদের মায়ার ত কোনও অবধি নাই। আমাদের অন্ধকারে আলো, আলোতে অন্ধকার, দুঃখে সুখ, সুখেতে দুঃখ, পাপে পুণ্য, পুণ্যে পাপ। জীবনের যে দিকেই তাকাই না কেন, কেবল অসামঞ্জস্য—কেবল ত্রুটী। আবার আর এক দিক দিয়া গেলে, এ অসামঞ্জস্য ও ত্রুটী আমাদেরই রচিত *। আমরা যেদিন জিনিষের গুণ তাহার সত্তা হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছি,—অনুভূতির সাহায্যে তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সত্তার সহিত অভেদাত্মযোগ বোধ করিবার চেষ্টা করি নাই,—নিজের প্রয়োজনানুসারে জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়াছি, সেইদিন হইতেই অসামঞ্জস্যের ও ত্রুটীর আরম্ভ হইয়াছে। বাইবেল ঠিকই বলিয়াছে যে জ্ঞান বৃক্ষের ফলই এ জগতে পাপ ও দ্বন্দ্ব আনিয়াছিল।

বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে যাহা দূষনীয়, হেয় বলিয়া বোধ হয় সমগ্রভাবে ধরিতে পারিলে তাহার স্বরূপ বদলাইয়া যায়। যে সমুদ্র-মন্থনে অমৃত উত্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই আবার হলাহল আসিয়াছিল। যে বায়ুমণ্ডল সমস্ত জীবজগৎকে জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছে, তাহার মধ্যেই ত প্রাণান্তকর বিষের সন্ধান পাওয়া যায়। আয়াগো-চরিত্র না থাকিলে ওথেলো অসম্পূর্ণ হইয়া যাইত, দেস্‌দেমনা সুচতুরা বিষয়জ্ঞানসম্পন্না হইলে তাহার সতীত্ব স্ফুটিত না। সীতা-চরিত্রের অসাধারণ কমনীয়তা, এক হিসাবে তাঁহার হৃদয় দৌর্ব্বল্যই—তাঁহার পতিভক্তিকে এমন দৃঢ় ও তেজোদৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কোমল প্রাণা

* Bergson's Creative Evolution "Intelligence is characterised by an unlimited power of decomposing according to any law whatever, and of recomposing into any system whatever" Stewart's Exposition. "How different the experience of reality may be for those who are conscious of it in living it and for those who observe it by taking views of it * * Our intellectual nature is the device by which we observe reality as an external sphere of activity" Wildon Carr By intuition we place ourselves within the heart of reality and "experience qualitative change as a unity and not as a multiplicity." So the antinomies created by Intelligence are set at rest Stewart and Carr

পরাধীনা বঙ্গরমণীই একদিন হাসিতে হাসিতে পতির চিতায় আরোহণ করিয়া সহমরণে যাইত। রসে বিষ থাকিলেই যে গাছের ফল ও ফুল বিষাক্ত হইবে, এমন কোনও মানে নাই। ভালয় মন্দ, পাপ পুণ্যে বিজড়িত হইয়া সৃষ্টি আপন মাধুর্য্যে ফুটিয়া উঠিতেছে, যিনি সৃষ্টির একত্ব ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে চান, সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার নিকট আমাদের সমাজ-রচিত মনগড়া পাপধর্ম্মের পরিভাষা মূল্য থাকিতে পারে না। কলঙ্কিনী রাধার চরিত্র কলঙ্ক মসালিপ্ত হইয়া বীভৎস হইয়া উঠে না। প্রেমের আত্ম-বিস্মৃতি, আবেগের তন্ময়তা সমস্ত কলঙ্কের কালী মুছিয়া লয়। যুগে যুগে ছিন্নায় ছিন্না বাঁধিয়া যে চিতা জ্বলিতেছে তাহাকে পুড়াইতে পারে, এমন নরকের অগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই। যে নারী মহাত্মা যীশুর চরণ তাহার কেশ দিয়া মুছাইয়া দিয়াছিল, তাঁহার পাপ পুণ্যের বিচার করিবে কে? স্বয়ং ভগবানও তাহা করিতে সাহসী হইবেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের সাবিত্রী, হিরণ্ময়ী, বিনোদিনী প্রভৃতি পতিতা হইয়াও ত নারী-মহিমা হইতে বঞ্চিতা হয়েন নাই। এবং রবীন্দ্রনাথ পতিতা'র যে বন্দনা গীতি গাহিয়াছেন,—শিল্পীর একপ্রাণতা লইয়া তাহার হৃদয়ের গূঢ়-মর্ম্মটি যে মহত্তে ও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া দিয়াছেন তাহাকে অধর্ম্ম বলিতে পারে এমন ধর্ম্ম ত আমাদের নাই! কুন্দনন্দিনী তাহার সরল হৃদয়ের আত্মনিবেদনে মৃত্যুর অমরধামে চলিয়া গেল, আর বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পাপপুণ্যের জন্য সমাজের সংস্কার লইয়া মর্ত্তে পড়িয়া রহিলেন। সমাজ যাহা অস্পৃশ্য বলিয়া দূরীভূত, সাহিত্যে তাহা পরম প্রীতিতে সিক্ত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হইয়া উঠে। সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্ম ব্যবহারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখে, সাহিত্য অন্তর্জীবনের মানদণ্ডবিধান করিয়া থাকে। ব্যবহারিক জীবনের বিচার তাহাতে প্রয়োগ করিতে চাহিলে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড ছিন্ন করিয়া বিনষ্ট করিতে হয়। শকুন্তলা চরিত্র ব্যবহারিক জীবনে কোনো কারণে ঘটাইতে গেলে তাহা ভস্ম হইয়া যায়। সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মের কালে কালে পরিবর্ত্তন হইতেছে,—সাহিত্যে যে ধর্ম্ম আমাদের অন্তরে উন্মুক্ত হয় তাহা সনাতন, তাহা নিত্য। আদর্শের পূর্ণতা দিয়া অর্থাৎ সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মকে মুখ্য স্থান করিয়া অনুভূতিমূলক সাহিত্যের সমালোচনা উচিত নহে, কারণ, জীবনের অন্তরতম প্রদেশে সত্য ও মঙ্গলের যে নির্ম্মল ধারা প্রবাহিত হইতেছে, শতবার কর্ম্মে প্রতিহত হইয়াও যাহা প্রকাশের জন্য উন্মুখ,—যাহা অনুভূতির অস্পষ্ট আলোকে কখনও দেখা যায়, কখনও বা দেখা যায় না,—আদর্শের সেই গতিমান রেখাকে

এ সাহিত্যে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করে। কর্ম্মের বন্ধনে এ আদর্শকে বাঁধিয়া ফেলা চলে না, ভাবের বিকাশে ইহাকে মুক্ত করিয়া দেখিতে হয়। আদর্শের পরিণতি, কর্ম্মের সম্পূর্ণতা এইরূপ সাহিত্যে নাও পাওয়া যাইতে পারে। ইহা একটা মহত্ত্বের প্রেরণা আমাদের মধ্যে আনিয়া দেয়, একটা অনির্দ্দিষ্ট গতির দিকে আমাদিগকে সঞ্চারিত করে। ভাবের উন্মেষ ইহাতে আছে, কর্ম্মের স্থিতি ইহাতে নাই। এ সাহিত্যের প্রকৃতিই এই যে ইহা কর্ম্মকে ভাবের চঞ্চল, ক্ষণিক প্রকাশ বলিয়া বিবেচনা করে, বাহিরের চেয়ে অন্তরকেই বড় বলিয়া মানে। রাম-চরিত্রে অপূর্ণতা আমরা দেখি না কারণ যে আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া এ চরিত্রটী অঙ্কিত করা হইয়াছে,—সে আদর্শস্থানে পরিস্ফুট, স্থির, নির্দ্দিষ্ট,—ইহাতে একটা সমাপ্তির ভাব, একটা বিরোধের সমন্বয়, একটা পরিণতির তৃপ্তি দৃষ্ট হয়;—ঋষি যেন শুদ্ধ শান্ত সমাহিত চিত্তে কর্ম্মজগতের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া তাহাকে ভাবজগতে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারিয়াছেন; এবং ইহাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল কারণ সমাজেও তখন গতির চেয়ে স্থিতির দিক্‌টাই সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু এখন আমাদের "চলার আনন্দ" জগিয়াছে,— আমাদের সামনে যে পথ তাহা কত শত নূতন দেশে গিয়াছে আমরা জানি না, আমাদের মধ্যে যে ভাব, যে প্রেরণা কত নব উল্লাসে নিত্য উন্মেষিত হইতেছে, তাহাকে আকার দিব কি করিয়া,—কর্ম্মে তাহার সমাপ্তি কোথায়? এ যে অনুভূতির সামগ্রী,—ইহাকে জ্ঞানে ধরা যায় না। ভাবের সহিত কর্ম্মের বিরোধ আমরা কিছুতেই ঘুচাইতে পারি না।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা সমাচ্ছন্ন করিয়া, ভাবের গভীর সত্তা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং তাহারই সাহায্যে স্থূলদৃষ্টির অন্তরালে সাহিত্য যে স্বর্গরাজ্য গড়িয়া তুলিতেছে,—আমরা ভুলিয়া যাই যে তাহার সহিত আমাদের দেহের চেয়ে প্রাণের সম্পর্ক ঢের বেশী। যাহা স্থূল, যাহা বাস্তব তাহাই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সত্য নহে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে ব্যবধান মানুষ রাখিতে পারে না, সে সোণার সিঁড়ি গড়াইয়া, এ দুইটাকে সংযুক্ত করিয়া লয়। সেই জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম মরিয়াও মরে না; এবং শত যুদ্ধ ও বিপ্লব, জাতীয় স্বার্থপরতা ও নৃশংসতার মধ্য দিয়াও মানুষ নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়—এবং সমস্ত দৈহিক বিকৃতি অন্তরের সম্পূর্ণতায় সংশোধিত করিয়া লইতে চেষ্টা করে। সংসারের অপূর্ণতা, দোষ, পাপ ও অন্ধকার ভেদ করিয়া সত্যের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। কর্ম্মজগতের সঙ্কীর্ণতা, দোষ ও বিকৃতি

ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে ইহাদিগকে ভাবজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা উচিৎ নহে। সমাজ ও ব্যক্তিবিশেষে যাহা শ্রেয়ঃ, অন্যত্র তাহা হেয় হইতে পারে। মানব-মনের যে গভীরতম ধর্ম্ম ব্যক্তিগত জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রকাশকে মণি-মালার সূত্রের ন্যায় নিবদ্ধ রাখিয়াছে, যাহার অভিব্যক্তি কখনও পাপে, কখনও পুণ্যে,—যাহা কেবল 'কু' আর 'সু'র দ্বন্দ্ব নহে, অনেক স্থলেই যাহা 'সু' আর 'সু'র দ্বন্দ্ব ;—লৌকিক পাপ ও পুণ্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহা ক্রমশঃই ঊর্দ্ধে ছুটিয়া চলিয়াছে,—সাহিত্য সেই ধর্ম্মকেই ব্যক্ত করিতে চায়। যে জীবন দেবতা মানুষের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া পশুত্বের অন্ধতম গুহা হইতে কোন অজ্ঞাত জ্যোতির সন্ধানে আমাদিগকে প্রেরিত করিয়াছেন,—তিনিই আমাদের স্বধর্ম, তাঁহার ত কোনও বিনাশ নাই, এবং শিল্পীর অনুভূতি যখন সেই অন্তর ধর্ম্মে গিয়া পৌঁছে তখন তাহার সৃষ্টি অপূর্ব্ব নিত্য সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে এমন সরলতা এমন গভীরতা আছে যে আমাদের জ্ঞানসৃষ্ট জাল জঞ্জাল গুলিতে তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না,—তিনি একা একেবারে প্রাণের নিগূঢ় স্পন্দন অনুভব করিতে পারেন। সেইজন্য আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ভাল মন্দ, সামাজিক আচার নীতি ব্যবস্থা প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে পারে না।

মনুষ্য-জীবনের প্রথম হইতেই দুইটী ধারা সমভাবে প্রবাহিত হয়,—একটা জ্ঞানের আর একটা অনুভূতির *। জ্ঞানের চর্চ্চা যেমন আবশ্যক অনুভূতির চর্চ্চাও তেমনিই আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অনুভূতির চর্চ্চা কেমন করিয়া করিতে হয় আমরা ঠিক জানি না, ইহা যেন আপনা আপনিই আসিয়ে। সেই জন্য শিল্পশক্তি আমাদের নিকট একটা অনৈসর্গিক অভাবনীয় ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়,—ইহার কোনও ব্যাখ্যাই আমরা দিতে পারি না। জ্ঞান চর্চ্চা আমাদের এতই স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে প্রত্যেক জিনিষই আমরা জ্ঞানের দিক্ হইতে বুঝিতে চেষ্টা করি, কাজেকাজেই যে স্বভাবসিদ্ধ অনুভূতি লইয়া শিল্প সৃষ্টি অথবা সাহিত্য-রচনা হইয়া থাকে তাহাকে জ্ঞানমূলক করিয়া ফেলি। সাহিত্যের সমালোচনায় বিশ্লেষণ যতটা দরকার, অনুভূতি তার চেয়ে বেশী দরকার। কিন্তু জ্ঞান ও অনুভূতিকে আলাহিদা করিয়া দেখা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন, তাই আমরা একটীর মধ্যে আর একটীকে টানিয়া আনিয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দেই। সেক্ষপিয়রের নাটক পড়িতে গিয়া বিশেষজ্ঞের টীকা-

* Bergson's Creative Evolution.

টিপ্পনীতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ি। চরিত্রের বিশ্লেষণ ও সমালোচনায় কাব্য-সৃষ্টির সহজ অনুভূতি কমিয়া যায়,—তাঁহার নাটকের ভিতরে যে কত রূপক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও নৈতিক তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করি তাহা নিরূপণ করা যায় না। এ কথা ভাবিয়া দেখিনা যে তত্ত্বহিসাবে যাহার মূল্য অতি কম, ভাব-হিসাবে তাহা অমূল্য হইতে পারে, এবং অপরপক্ষে একটী অতি গভীর তত্ত্বও ভাব-হিসাবে ধরিলে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সেই একই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাতায় পাতায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও গীতার ব্যাখ্যা দেখিতে পাই ও রবীন্দ্রনাথে বেদান্তের ও বার্গসঁ'র দর্শনতত্ত্ব প্রমাণ করিতে বসি। এইরূপ করিয়া দেখিলে সাহিত্যকে অন্যান্য শাস্ত্রের সমভূমিতে আনিয়া ফেলিতে হয় এবং তাহার নিজের কোনও বিশেষ মূল্য থাকে না। দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদিতে যাহা পাই তাহাই যদি সাহিত্যের প্রতিপাদ্য হয় তবে কল্পনার লীলাচাতুরীর দ্বারা এগুলিকে ঘোরাল করিবার কি দরকার বুঝি না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বৈষ্ণবের সাহিত্য "বৈকুণ্ঠের জন্যই রচিত",—সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়া অনুভূতির দিব্য আলোকে ইহাকে পড়িতে হয়,—বাহিরের সম্পর্কটাকে বড় করিয়া দেখিয়া এ সাহিত্যের রসোপলব্ধি হয় না,—"অন্তরের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?" সাহিত্যিক যখন ভাবে তন্ময় হইয়া, কূর্ম্মের অঙ্গের মত তাঁহার সমস্ত বাহ্য প্রকৃতিকে,—জ্ঞান ও বুদ্ধিকে,—ভিতরে টানিয়া লইয়া আত্ম-সমাহিত হন,—তখন জিনিষের যে স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া অনুভূতির স্পন্দন হৃদয়ে খেলিয়া যায়,—সেই আনন্দ-হিল্লোলেই সাহিত্যের জন্ম। সাহিত্যিকের এমন একটী ক্ষমতা আছে যে তিনি স্থূল জ্ঞান ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া, বাহিরের বন্ধন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অন্তরের অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যান্ এবং প্রাণের অবাধ গতি অনুভব করিতে পারেন। * আমাদের সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের পশ্চাতে যে মহৎসত্তা লুকায়িত আছে,—ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন-সিদ্ধি ও ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন হইয়া যাহার উপলব্ধি আমাদের সম্যক হইতেছে না,—

* "He must withdraw within himself, feel himself living, and by acts of sympathetic insight, gain fleeting visions of the internal movements of the universe." "It is the perception, as it would perceive itself, if its apperception and its existence exactly coincided. It is consciousness; illuminating the throbbing heart of reality, but in no sense, interfering with or influencing it." Stewart's Exposition of Bergson's Philosophy.

ভাবের ক্ষণিক আলোকে যাহাকে আমরা এক মুহূর্ত্ত দেখিয়া পর মুহূর্ত্তেই হারাইয়া ফেলি,—সেই সত্তাকে প্রকাশ করিয়া মূর্ত্ত করাই সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে হইলে, ইহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখিতে চাহিলে,—প্রচলিত ভাষার এবং সামাজিক জ্ঞান, ধর্ম্ম ও রুচির অনেক সাহায্য লইতে হয়; কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে এইগুলি যেন কেবল সাঙ্কেতিক চিহ্ন, আভাস ও ইঙ্গিত,—যাহাদের মধ্য দিয়া সাহিত্যিক অন্তরের সেই দিব্য-জ্ঞান, অনুভূতির গভীরতা, ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন,—এগুলি মুখ্য নহে, গৌণ। কবির এই অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করা যায় না,—ইহা অনুভব করিবার, ইহাকে ভাষায় স্পষ্ট করিয়া ধরিলে ইহা জ্ঞানের বিষয় হইয়া পড়ে।

সাহিত্যের শ্লীলতা অশ্লীলতা, সুরুচি ও কুরুচি, এইরূপে অন্তরের দিক হইতে দেখিতে হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নগ্নমূর্ত্তিগুলির ভিতর প্রায়ই কুরুচির আভাস পাওয়া যায় না, শিশুর নগ্ন কান্তির মত তাহাদের মধ্যে কোনও অশ্লীলতা নাই। সমগ্রের অনুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রুচির বিচার যুক্তি-সঙ্গত নহে। বাস্তবিক, সৌন্দর্য্যের স্বরূপ তখনই বুঝিতে পারি, যখন রুচি-বিকার অগ্রাহ্য করিয়া ইহা নিজের মহীয়সী শক্তি প্রমাণ করে। সে সৌন্দর্য্য তেমন উচ্চ অঙ্গের বলিয়া বোধ হয় না, রুচির দৈন্যে যাহা ম্লান হইয়া যায়। প্রকৃত সৌন্দর্য্যে অর্থাৎ যেখানে অন্তরের সহিত দেহের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সেখানে এমন একটা স্বর্গীয় বিভূতি আছে যে তাহাতে কুরুচি আসিতেই পারে না। তাই বলিয়া এ কথা সত্য নহে যে রুচির বিকার সাহিত্যের অঙ্গহানি করে না। যাহা যত রুচি-বিরুদ্ধ সাহিত্য-হিসাবে তাহা তত নিকৃষ্ট কারণ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং রুচির বিকৃতি সৌন্দর্য্যের বিরোধী। কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের রুচি তাহার নিজের মধ্যেই নিহিত, অন্য কিছুর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। সুসভ্য, সুশিক্ষিত সমাজে যাহা কুরুচি-সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়, অশিক্ষিত অসভ্য সমাজের অনুরূপ ব্যবহারে হয়ত তাহা হয় না। সাধারণ প্রেমসঙ্গীতে এমন কি ভক্তি কবিতাতেও অনেক সময়ে যে কামুকতার ইঙ্গিত, দৈহিক লালসার যে উগ্রগন্ধ পাওয়া যায় বৈষ্ণব কবিতার অশ্লীলতা সে কুরুচির সমান দাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া রচনায় পবিত্রতা ও মাধুর্য্য, থাকিলে রুচির ত্রুটী অনেকটা সংশোধিত হইয়া যায়। সাহিত্যিকের অনুভূতির নির্ম্মলতা সমস্ত রুচি-বিকার নিমেষে ধৌত করিয়া লইতে পারে এবং অন্তরের লাবণ্য প্রকাশের অসম্পূর্ণতা অপরূপ সৌকুমার্য্যে মণ্ডিত করে। বৈষ্ণব-কবি

যে "নিবিড় প্রেমের সরস বরষা" হৃদয়ে নামাইতে চান, বাহির হইতে দেখিলে তাহা শুধু মেঘ আর শুধু অন্ধকার। কিন্তু প্রেমের তীব্র জ্বালা যখন নয়ন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বাহির হয়,—পরশ-লালসায়, গভীর আবেশে, দেহটা যেন বাতাসে মিশাইয়া লইতে চায় তখন বুঝিতে পারি কেমন করিয়া মদনের বাহিরের রূপ ভস্মীভূত হইয়া সমস্ত অন্তর্জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া দেয়। দেহের যে স্থূল সম্পর্ক হইতে এবং লালসার যে বুভুক্ষায় প্রেমের উৎপত্তি, যে হাবভাব বিলাস বিভঙ্গে ও যে চটুল চাহনির তড়িৎ বেগে ইহার পরিপুষ্টি, তাহাদের মধ্যেও যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা আছে—তাহারাও যেন ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইবার জন্ত উন্মুখ; এবং অনুভূতি-বৃদ্ধির সহিত কেমন করিয়া যে এই আবেগ-বিহ্বল মানবীয় প্রেম ভগবৎপ্রেমে অবসান হয়, হৃদয়ের উদ্বেলতা অতলস্পর্শের চিরশান্ত গভীরতার গর্ভে বিলীন হইয়া যায়—তাহা অনুভব করি বৈষ্ণব-সাহিত্যে। বৈষ্ণব কবি প্রেমের গভীরতা দিয়াই প্রেম-স্বরূপকে পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন;— এ প্রেম বৈধ কি অবৈধ সে বিচার করেন নাই। কারণ প্রেমকে প্রেম-ভাবে ধরিলে তাহার নির্ব্বিকার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চাহিলে, এ বিচার আসিতেই পারে না। প্রেমানুভূতিই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, রুচি-বাঁচাইয়া চলিতে তাঁহারা চাহেন নাই।

জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত বিষয়গুলিও সাহিত্যিকের অনুভূতিতে ভিন্নরূপ ধারণ করে। জ্ঞান সত্যালোচনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, সাহিত্য সত্যকে রূপে ফলাইয়া ভাব-বিকাশের সহায়-স্বরূপ করিয়া দেয়। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য অনেকেই পাঠ করিতেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অনুভূতির দ্বারা ইহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছেন, জ্ঞান ও বিশ্লেষণে ত তাহা পারা যায় না। সেকাল আমাদের কতদূরে, তাহার সহিত আমাদের যুগযুগান্তরের ব্যবধান—অথচ সেই সুদূরকে আবাহন করিয়া কবি মানব-মনের চিরন্তন ভাবগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং ভাবের ঐক্যদ্বারা শতশতাব্দীর বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন সংঘটিত করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য জ্ঞানের সাহায্যে পাঠ করিলে যে সত্যগুলি আমরা পাই,— তাহারা বিশিষ্ট, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিরহিত, খণ্ডখণ্ড বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ সত্য আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না, কারণ ভাবের সহিত ইহাদের যোগ নাই। কিন্তু অনুভূতি দিয়া দেখিলে এগুলি সংমিশ্রিত হইয়া যায়,—ইহাদের আর ভিন্ন ভিন্ন সত্তা থাকে না,—রূপের পর রূপের মধ্য দিয়া ভাবের ঐক্য সম্পাদন করে,—অন্তরের সংস্পর্শে একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া যায়। নবযৌবনা

বরষা যখন শ্যামগম্ভীর সরসতা লইয়া ঘনগৌরবে আইসে, তখন কবির মনে কোথা হইতে মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী, মধুরা বাজিয়া উঠে, চারিদিকে বধুরা শঙ্খনাদ ও হুলুরব করিতে থাকে; কোথাকার কোন ভাবাকুললোচনা মেঘমল্লার রাগিণীতে ভূর্জ্জপাতায় নব গীত রচনা করিতে বসে; কোন অভিসারিকা কদম্ব-রেণু শয়নে বিছাইয়া, নয়নে অঞ্জন আঁকিয়া কেশ পাশ কেতকী-কেশরে সুরভিত করিয়া, করবী ক্ষীণ কটিতটে গাঁথিয়া কাহার প্রতীক্ষায় স্মিত বিকশিত বদনে বসিয়া থাকে; কোন বিরহিণীর ক্ষুব্ধ বেদনা অন্ধতামসী যামিনীতে, দীপ্ত দামিনীর কোলে, জনহীন পথে কাঁদিয়া বেড়ায়,—যেন কোন্ মিলনের অতুলনীয় পুলক নীপশাখে ঝুলিতে থাকে, কুসুম-পরাগ ঝলকে ঝলকে ঝরিয়া পড়ে—অধরে অধরে অলকে অলকে মিলিয়া যায়। কবির কথায় ছাড়া এ অনুভূতির প্রকাশ কেমন করিয়া হইতে পারে? সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ষাবর্ণনায় যে স্নিগ্ধ শ্যাম কান্তি, যে উদাস গম্ভীর ভাব, যে ব্যাকুলতা, মিলনের যে উৎকণ্ঠা, যে ক্ষুব্ধ বেদনা, যে পুলকের নিবিড়তা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, কবির অনুভূতিতে তাহারাই যেন স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এ স্বপ্নরাজ্য ত একেবারে অলীক নহে,—ইহাকে শুধু কল্পনার মায়া বলা যায় না। অতীতের জ্ঞানের উপর ইহার ভিত্তি হইলেও,—এ সৌন্দর্য্যানুভূতি সমস্ত জ্ঞান ছাড়িয়া, প্লেটো বর্ণিত অতীন্দ্রিয় বাস্তবের মত সূক্ষ্মদেহে হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। কারণ বর্ষাসংশ্লিষ্ট এ ভাবগুলি ত কেবল সেকালেই সীমাবদ্ধ নহে; ইহারা দেশ ও কাল হারাইয়া, অতীতের জীর্ণ পুঁথি ছাড়িয়া, ভাবজগতের চিরসম্পদ্ হইয়া গিয়াছে এবং মানব মনে বর্ষার সহিত চির-বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। অনুভূতি যেখানে, সাহিত্য সেখানে—এবং ইহার গভীরতাই সাহিত্যের গভীরতা। সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় ভাবের অতিমাত্র স্ফূর্ত্তি—সর্ব্বপ্রকার বিশেষ সংস্কার এমন কি জ্ঞান চর্চ্চার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা-সে জ্ঞান আধ্যাত্মিকই হউক আর আধিভৌতিকই হউক—সাহিত্য-সৃষ্টির বিরোধী, কারণ ইহারা শিল্পীর একপ্রাণতা, চিত্তের সরলতা, অনুভূতির গভীরতা খর্ব্ব করিয়া দেয়। জ্ঞানকে ভাবের হেঁয়ালিতে পরিণত করিতে পারিলেই যদি সাহিত্য হইত, তাহা হইলে কালিদাস ও সেক্সপিয়র, বাল্মিকী ও হোমার আমাদের নিকট আজ ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেন। তাঁহাদের জ্ঞান ত আমরা সব লুটিয়াই লইয়াছি—পরন্তু ভাবের প্রাচুর্য্যে বাঙ্গালীকে কেহ পরাভূত করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

একটী রাতের পরিচয়।

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

ফিরিও না মুখ ভয় কোরো না
আসবে যে জন তোমার দ্বারে,
দুঃখ সে হোক্ মৃত্যু সে হোক্
বরণ করে' নিও তারে।
অচিন্ দেশের অতিথ সে যে
তিথির তরে তাহার আসা,
পথের শ্রান্তি দূর করিতে
তোমার ঘরে নিল বাসা।
কাট্‌লে রাতি, নিবলে বাতি,
আবার পথে যাবে চলে;
একটী রাতের গোপন কথা
তোমার কাণে যাবে বলে।
বিশ্ব গানের অমর-প্রাণের
বাউল সে যে পুলক ভরা,
যে বাঁধনে মুক্তি আনে
সেই বাঁধনে বাঁধবে ধরা।"
তাহার হাতে, গভীর রাতে,
প্রাণের বীণা তুলে দিও।
শুন্‌তে যে সুর পরাণ আতুর
সে সুরটিরে বাজিয়ে নিও।
জীর্ণ যে তার ছিঁড়বে সে তা'র
গভীর মৃদু করাঘাতে,
নূতন ক'রে আবার তারে
বাঁধবে সে জন নিজের হাতে
গানের শেষে বারেক হেসে
নবীন বীণা তোমায় দিয়ে,

ভাস্‌বে পথে আলোর রথে
তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে
পরাণ-খোলা আপন-ভোলা
একটি রাতের পরিচয়ে,
ভাঙবে যে ভয়, জাগ্‌বে অভয়,
মরণ-রাজার দোসর হ'য়ে।

গুরুদেব।

[শ্রীবীণাপাণি দেবী।]

দারিদ্র্যা কাদম্বিনীর সম্বলের মধ্যে একটি ছাগশিশু, একটি ময়নাপাখী ও একখানি কুঁড়েঘর, এই লইয়া তার এ বিপুল বিশ্বে বাস। সে যখন আপনাকে নিতান্ত নিঃসহায়, অবলম্বনহীন জ্ঞান করিয়াছিল, বিধাতা এই ছাগ শিশুটি তখন তাহার একমাত্র অবলম্বন করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আজিও সেই ছাগ শিশুটিই নিরাবলম্বনের অবলম্বন হইয়া তাহার 'কিছুনাই'রূপ সর্ব্বনাশের মধ্যে 'আছে'—বলিয়া তাহাকে অভয় দিতেছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে এই কুঁড়ে ঘরখানাই তাহার একমাত্র সম্বল। একখানি মুদিখানা দোকান ছিল, লোক অভাবে সেখানি উঠিয়া গিয়াছে। এমন কি পেটে যে পাঁচটা কাচ্চা বাচ্চা হইয়াছিল, তাহারও একটি নাই।

পাড়া পড়সীর দয়াতেই তাহার এই ভিটার ঘরখানি আছে নতুবা জমীদারের বাকী খাজনার দায়ে কোন দিন বিক্রয় হইয়া যাইত। সংসারে মাত্র নিজের একটা পেটের ভাত যোগাইতে যোগাইতে এখন কাদম্বিনীর হাতে বেশ দু'পয়সা হইয়াছে। এখন আর সে কাহারও ধার ধারে না। তবুও পাড়ার লোক তাহার উপকার বই অপকার করে না।

(২)

ভোরে উঠিয়া কাদম্বিনী ময়নাকে রাধাকৃষ্ণ বুলি শিখাইয়া, উঠানে ছড়া ঝাঁট দিল। ঘরের কাজ করিতে যাইতেছে, এমন সময় ও-বাড়ীর মোক্ষর পিসি ডাকিয়া বলিল, "ও দিদি, আজ মুড়ি ভাজতে ও-পাড়ায় যাব, তুমি যাবে কি?"

"আমার আর মুড়ি খাবে কে—যে ছিল সে ত আর"—বলিয়া কাদম্বিনী চোখে আঁচল দিয়া ঘরে উঠিল।

মোক্ষর পিসি রাসমণি ঘরের দাওয়ায় এক পা রাখিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ছোট্ট একটি নিশ্বাসের সহিত বলিল, "আর যা' হবার তাত হয়েই গেছে—যাক্ যাক্, বেটা পুত কেউ আপনার নয়। আমি বেশ আছি, আরও যদি ঐ মোক্ষ ছুঁড়ি না থাক্‌তো তবে আমি আরও বেশ থাক্‌তে পারতাম। ও দিদি, ভাখ, ভাখ্ তোর ঘরের উপর দিয়ে হাঁড়িচাঁচা ডেকে যাচ্ছে, আজ বা তোর বাড়ী কে আস্‌বে।"

কাদম্বিনী বাহিরে আসিয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "কাল থেকে দেখ্‌ছি বিড়েলে বোঝা নামাচ্ছে, আর ঐ অলক্ষুণে পাখীটা ডেকে ডেকে খুন হচ্ছে। দেখে ভয় হয়।"

"ওমা শোন কথা, ভয় কিসের দি'দি ?"

"গরীবের বাড়ী কুটুম্ব এলে ভয়ের কথাই বটে। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের বাড়ী আবার কুটুম কেন ?" বলিয়া কাদম্বিনী ঘরে উঠিয়া গেল।

মোক্ষের পিসি রাসমণি একটু হাসিয়া বলিল, "নে, গরীবের বাড়ী গরীব কুটুম এলে ত ভয় নাই—ভয় হল তোর বড় মানুষ কুটুম। আজ আমিই না হয় তোর বাড়ী কুটুম, দে দেখি একটা পান, খেয়ে যাই।"

(৩)

হাঁড়ি চাঁচার ডাকের গুণে কাদম্বিনীর বাড়ী গুরুদেব আসিয়াছেন। চোখের জলে. গুরুর পদধৌত করিয়া কাদম্বিনী. তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া পায়ের গোড়ায় পড়িল। গুরুদেব কাদম্বিনীর মাথায় ধোয়া মুছা শ্রীচরণ তুলিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সুখী হও।"

মাথা তুলিয়া, গুরুর পানে চাহিয়া. কাঁদ কাঁদ স্বরে কাদম্বিনী বলিল, "কি নিয়ে সুখী হব ঠাকুর ? আমার যে কিছুই নেই।"

গুরু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কাদি, তুই অমনিই সুখী হবি, গুরু-বাক্য কি নিষ্ফলে যায় ? তোর আর কিছুই লাগবে না। হাঁ, কাদি তোর সে ছেলে কই, পেন্নাম ত করলে না।"

কাদি চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর, বার বছরের ছেলে. আমার",—

"মারা গেছে ? তা বেশ। মা যারে নেয়, তারে কেউ রাখতে পারে না। কালী মা।"

কাদি পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হাই তুলিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ও কাদি, তোর ঐ বাহিরের আঙ্গিনায় যে পাঁটাটা চরে খাচ্ছে, ওটা কি তোর?"

কাদম্বিনী চোখ মুছিয়া বলিল, "হ্যাঁ ওটা আমারই পাঁটা,"—বলিয়া সে আবার চোখে আঁচল দিল।

ঠাকুর মুখখানি কিছু হাসি হাসি করিয়া বলিলেন, "বা দিব্য পাঁটাটি। অনেক দূর থেকে আসছি পাঁটা খুঁজতে। কই কাদি, প্রণামী কিছু দিলিনে?

কাদম্বিনী উঠিয়া ঘরে যাইতেই ঠাকুর বলিলেন, 'থাক, তুমি গরীব মানুষ, ও সিকিটা, আধুলিটায় ত আর আমার পেট ভরবে না। তার চেয়ে বরং ঐ পাঁটাটাই আমি নিয়ে যাব। অষ্টমীর দিন একটা নিখুঁত পাঁটার দরকার হবে, অনেক দূর ঘুরে এলাম, নিখুঁত পাঁটা আর চোখে পড়লো না। ভাগ্যে তোর এই নিখুঁত পাঁটাটা চোখে পড়েছে তাই এবারকার মত রক্ষে, নইলে আবার আমায় পাঁটা খুজতে কত রাজ্যি বিরাজ্যি যেতে হত।"

গুরুর মুখের পানে চাহিয়া ভয়চকিত দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া কাদি জোরের সহিত বলিয়া ফেলিল, "ওটা আমি দিতে পারবো না, ঠাকুর।"

ঠাকুর নরম সুরে গলার স্বর কিছু খাটো করিয়া বলিলেন, "সে কিরে— মার পূজোয় লাগবে। এত আর তুই আমায় দিচ্ছিস নে, মার পূজোর জন্য দিচ্ছিস, দিবিনে কেন?"

কাদম্বিনী বলিল, "মার পূজোয়ও আমি দিতে পারবো না।"

ঠাকুর পঞ্চমে স্বর তুলিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "সকলেই দিল, আর তুই দিবিনে?"

হাত জোড় করিয়া কাদি কাঁদিয়া বলিল, "আর যা' চাও ঠাকুর; সব দেব, কেবল ঐ পাঁটাটাই দিতে পারবো না।

"তোর আছেও ছাই" বলিয়া ঠাকুর হন হন করিয়া বাহির হইয়া যায় দেখিয়া কাদি পিছনে পিছনে গেল। বাহিরে আসিয়া ঠাকুর পাঁটাটার কান চাপিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, দেখিয়া কাদম্বিনী ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "ঠাকুর শোন ও পাঁটার বিত্তেন্ত। ও আমার ছেলের পাঁটা। আজ ছয় মাস হল ছেলে আমার মারা গেছে, যাবার বেলায়ও পাঁটার কথা তার মুখ থেকে সরে নি। ঠাকুর, রেখে যাও, পাঁটা আমি দেব না।"

তর্জ্জনি তুলিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তোকে মন্তর দেওয়াই আমার বৃথা হয়েছে। তুই ঘোর নারকী, পাষণ্ডী। মার পূজোয় লাগবে আর তুই—"

ক্রোধে ঠাকুরের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। গায়ের চাদর খুলিয়া পাঁটাটা বাঁধিয়া লইয়া ঠাকুর রওয়ানা হইয়া গেল। পাঁটাটা ম্যা—ম্যা রব করিতে করিতে পিছনে পিছনে চলিল।

কাদি মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল. পাঁটার ম্যা—ম্যা তাহার কানে আসিতে লাগিল মা—মা—মা। গুরুর কল্যাণে সে আজ দ্বিতীয় বার নিঃসন্তান হইল।

কে আসে !

[দরবেশ]

কে আসে—কে আসে নৃত্য-রত,
পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া দিয়া ?
নবোদিত অরুণের মত
তরুণ মাধুরী ছড়াইয়া ?
উদ্বেলিত দৃপ্ত সাগরের,
দূর শ্রুত গর্জ্জনের মত,
কা'র ধ্বনি দীর্ণ হৃদয়ের
গুপ্ত গৃহে শুনি অবিরত ?
কে আসে !

কে আসে—কে আসে চঞ্চলিয়া,
অঞ্চল পরশি মুক্ত-বায়ে ?
কুসুমের কান্তি মুরছিয়া,
চুম্বনের সুষমা ছড়ায়ে ?
হাসি বাঁশী গান আর মালা,
বিহগের সোহাগ-কাকলি,
গগনের চন্দ্রমা উজালা,
কা'র কথা কহিছে আকুলি ?
কে আসে !

কে আসে—কে আসে অন্ধকারে,
  রুদ্ধ দ্বার বিথার তিমিরে ?
বনানীর প্রান্তে প্রান্তে
  জাগাইয়া সুপ্ত পথটিরে ?
এক হাতে দণ্ড নির্মম,
  অন্য হাতে ভাণ্ড করুণার,—
মধুর ও ভীষণে সঙ্গম,
  জাহ্নবীতে অসি-বরুণার।
    কে আসে।

কে আসে—কে আসে দৃপ্ত বীর,
  আগ্নেয় দারুণ বাণ নিয়া ?
কেন এত হতেছি অধীর
  ছিনিবারে আমার এ হিয়া ?
কে আসে নব রথে চড়ি'
  ভাবনের মল্লিকা হাতে ?
কি দিয়া বরণ তারে করি,
  ভাবি তাই সকাল-সন্ধ্যাতে।
    কে আসে।

সে কি দূরে ? এসেছে কি কাছে ?
  বুঝিতে পারি না কিছু ঠিক।
এই মাত্র শুধু জানা আছে,—
  চিত্ত মোর হয়েছে নির্ভীক।
ওগো এস—এস গো ভীষণ।
  এস এস সুন্দর মাধুরী।
বিছাইয়া শাশ্বত আসন
  বসো মোর সর্বস্ব জুড়ি'

কাঁচার কোষ্ঠী।

[শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।]

তরুণ কাঁচার দল দেশের ভরসা। কারণ তারা জীবনে এখনও তাজা আছে,—এখনও রং ধরেনি, মচকায় নি, ঘা খেয়ে কালশিরে পড়ে গণ্ডারচর্ম্মও পায় নি। তারা এখনও তরল টল টলে নির্ম্মল আছে, তাই গতিতে স্রোতে টালমাটাল ঢেউয়ে তারা ভীষণে মধুরে মন হরা জিনিস। পতিত বিপন্ন দেশে যখন ডাক পড়ে, তখন মাথা দিতে বেহিসাবী আনন্দে সর্ব্বস্ব লুটিয়ে সর্ব্বস্বান্ত ফকির হ'তে, মরে জীবন ও অমৃত পেতে তারাই দলে দলে ছুটে আসে। এবার আবার ডাক পড়েছে, জাত কুল মজানো সর্ব্বনাশা ডাকই বুঝি আবার পড়েছে, তাই আদর্শের—জাতীয়তার রাজপথে কাঁচার দলের আজ এত ঠেলাঠেলি ও ভিড়, এত হাঁক ডাক আদর আবদার ও চোখ-রাঙানী। বর্ষার জগত ধোয়া জল নদী নালা খাল বিল বয়ে যখন বান ডেকে যায়, তখন তা'তে কাজও হয়, আবার অনেক অকাজও হয়,—কারণ কাজে অকাজের ছায়াবাজীতেই যে সৃষ্টি। তা' হউক,—কোন্ চাঁদেই বা কলঙ্ক নেই,—কোন্ আগুণ বাজারে লাগলে পীরের ঘর মানে? তাই বলছি কাঁচার দল যখন তখন যাকে তাকে বিচারে অবিচারে ঢিলটা পাটকেলটা মারে, বুড়ো এবং আধা-বুড়োদের অনেক সময় বেশ উত্তম মধ্যম রকম কলসীর কাণা খেতে হয়।

আমরা বুড়ো না হই, আধ-বুড়ো বটে, ঠিক সে নবীন যৌবন, সে নধর জামাইবাবিকী চেহারাটি আর নেই। এখন ডাঁসার পর পাক ধরেছে। তাই ঢিল পাটকেল খাবার ভাগ্য আমাদেরও হয়েছে। ঢিল পাটকেল এমন কি আস্ত থান ইটটাও বক্সিস পেলে তা' শিরোধার্য্য করব বই কি, কিন্তু মোড়লের যা' বল ভরসা কিনা বুদ্ধি, তাই দিয়ে কাঁচার কুষ্টী লিখতেও ছাড়বো না—বিজ্ঞতার বাঁকা হাসি ও ফাঁকা উপদেশ দিয়ে কাঁচার দলকে বিলক্ষণ রকম পাল্টা জবাব দেব। সেই আশায় আমার এ গৌরচন্দ্রিকা।

এই জন্য আজ আমি কাঁচার কুষ্টী তৈয়িরী করতে বসেচি। কাঁচা বা তরুণ দল নারায়ণের জাগ্রত বিগ্রহ, এ কথা মেনে নিয়ে বলি, কিন্তু—কাঁচা যে কাঁচা। কাঁচা ছোট, সেই হেতু কেউ কেউ ধানী লঙ্কার মত ঝাল এবং কেউ কেউ বা কয়ৎবেল বা পেয়ারার মত বিস্বাদ। বিস্বাদের চেয়ে ঝাঁঝালো ঝাল-ঝাল

কাঁচা ভাল, তবু তার তেজ আছে। সে জাতীয় কাঁচার রাগ বেশী ও বেহিসাবী রকম বেশী। আগে পিছে বিচার কোরে কাজ করে সেই জন যে কাঁচা হয়েও বুদ্ধি রাখে সংসারের ঝুনো বুড়োর মত। বুদ্ধি জিনিসটা ফলের ডাঁসা ও পাকা অবস্থায় মিষ্টত্বের মত বয়সে গজায়, তাই স্থির বুদ্ধির অভাবে কাঁচা কিনা তরুণেরা খামকা বেহিসাবী রাগে যখন তখন ঢিল পাটকেল ছোঁড়ে। এ গুণে কাঁচা "বড়" —কিনা রাজ-রাজড়ার সঙ্গে এক গোয়ালের গরু, কারণ বড়র মত কাঁচার বিষয়েও বলা যায়, যে,— "কাঁচার পিরীতি বালির বাঁধ

ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"

অশিক্ষিত ইতর সাধারণ যারা তারা অল্প-বুদ্ধি গুণে চিরকেলে কাঁচা, তাই তারাও এ দলের বারুদ জাতীয় জিনিস,—জ্বললে হুস্, নিভলে ঢুঁ ঢুঁ।

কাঁচা স্বভাবতঃই একরোখা, তাই সে রাগে ক্ষেপা ষাঁড়, আনন্দে সঙ্কীর্ত্তনের গৌর-নিতাই, ত্যাগে ঝুলিকাঁধে ফকির, ভোগে মদ মাতাল। জীবনে এত বেগ এত গতি এত একটানা সঙ্গমপাগল সাগরগামী স্রোত আছে বলে কাঁচার দাম অনেক; কিন্তু তারা যেদিকে যায় বান ডেকে বন ভেঙে আগুনধর্মী হয়ে যায় বলেই কাঁচা রাখতেও যেমন মারতেও তেমন। ভাল পালোয়ান চাই, মহাপ্রাণ ক্ষত্রিয় চাই, তবে এ তলোয়ার হাতে ধরে ঘা' দিয়ে আর্ত্তত্রাণ ও ধর্ম্মস্থাপনা করতে পারে; কাঁচা যদি ঠিক ঠিক দিশারী না পায় তা' হলে পরশুরামী রক্তগঙ্গা কাণ্ড বাধতে দেরী লাগে না।

কাঁচা বেগবান ও তরল জল বটে আর নির্মল স্বচ্ছ জলও বটে। তাই সে যেমন সুপেয় শ্রান্তিনাশক বলকারক তেমনি মুকুর-ধর্মী—তাতে যার তার প্রতিবিম্ব পড়ে যায়। এ দুনিয়ায় যার নিজের রং নাই, সে পরের রঙে রঙিয়ে থাকে; জল যেখান দিয়ে বয়ে যায়, দু'ধারের প্রতিচ্ছবি বুকে ধরে যায়। তাই তরুণরা আজ এর দলে, কাল ওর দলে নাম লিখিয়ে নাম কাটিয়ে বেড়াচ্ছে। নিজের একটা ঠাঁই হয় নাই বলেই পরের জমিতে রাহী জীবনে দু' দিনের আট চালা বাঁধতেই তাদের দিন যায়। কাঁচার এই নকল-নবিশী বড় বিড়ম্বনা। দুনিয়ার মালিকের সবই বিচিত্র, সে যা' গড়ে তা' এমনি পাঁচ মিশেল করে গড়ে, যে, কার বাপের সাধ্য বলে সেটা ভাল কি মন্দ। যেটা হয়তো খুব ভাল সেইটেই আবার খুব মন্দ। এ চতুর বাজিকরের সৃষ্টির বনে কমল তুলতে গিয়ে গায়ে কাদা লাগে, কাঁটায় হাত ছড়ে যায়, বিষধরে প্রাণে মারতে চায়; তবু সে ঢলঢলমাধুরী-গন্ধে-প্রাণকাড়া মধুতে-পাগল-করা কমল না তুললেই যে আমাদের নয়।

এত কথা বলতে হ'ল, কারণ কাঁচা বড় আবদারে। কাঁচা বলে আমার সঙ্গে সবাই কাঁচা হ'য়ে নাচ, পাগল হ'য়ে লাঠির দো হাতিয়া বাড়ীতে সব ভাঙ, রেগে খেই হারিয়ে আমার সঙ্গে সবাই চিল ছেঁড় আর গাল পাড়, এবং যাকে বলি তাকে কাঁধে করে কুলের ঠাকুর বলে নাই দাও। এইগুলি হ'লো বুড়োর কাছে পাকার কাছে ঝুনো ওস্তাদের কাছে কাঁচার আবদার। ঝুনো সাবধানী আর গঠন-প্রিয়, তাই কথাটা ঘুরিয়ে বলে, কাচা অমনি রেগে বলে, "একি হেঁয়ালী—একি ধূমমার্গ।" বাপু হে, ধূমের মত দরকারী জিনিস যে সংসারে বিরল তা' বুঝতে অনেক কাঠ খড় লাগে। বসে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাকটি যখন টানি, বিড়ি বা নেভিকাট সিগরেটটি ধরিয়ে যখন গোঁফে তা' দিতে বসি, তখন সেই তা' দেওয়ায় কত কত ভাবের ডিম যে তড় তড় করে ফুটে উঠে তা' তোমরা বুঝবে কি। ধোঁয়া বড় মগজ সাফ রাখে। রাত বিরেতে আঁধারের ধোঁয়ায় অনেক দরকারী কাজ কুয়াসায়ই চলে ভাল; কাজ সারতে আর কাজ খোয়াতে ধুঁয়োর লুকান মেঘের আড়ালে ওত পাতা—সে যে পাকা খেলোয়াড়ের চাল। তাই বলি, দাদাঠাকুর, তোমরা একটু ধূমমার্গী হও।

তোমরা গতি, আমরা ভরাট জল, তোমরা 'না'য়ের দিক আমরা "হাঁ"য়ের দিক, তোমরা তলোয়ার আমরা ঢাল। খুব কাঁচাও ভাল না, খুব তল্‌তলে পাকাও অকেজো। প্রাণে তরুণের বেগ আনন্দ ও সাড় নিয়ে যে পাকারও মিষ্ট রস রঙ ও আস্বাদ ধারণ করে সেই যুগের নেতা, তা' সে মনের মানুষ কাঁচার দলেই থাক্ আর পাকার দলেই থাক্। বুড়োর হাড়ে নবীন যৌবন—অকাল-জেঠা কাঁচা বড় দামী জিনিস।

আমাদের আদর্শ যদি বোঝ, তখন দেখবে শ্রীকৃষ্ণরূপী সারথির কত দরকার। আমাদের যুগের মনের মানুষ গরু চরাতে ওস্তাদ হবে, বাঁশী বাজিয়ে মানুষের চিরকেলে কুল নষ্ট করতেও হবে অদ্বিতীয়, দিব্য আরামে রথের উপর বসে বসে জ্ঞান বিচার করবে, তা' ছাড়া সাপের মাথায় ভেকাকে নাচাবে, উত্তরে যেতে শপথ করে বলবে দক্ষিণে যাচ্ছি, আর যা' যা' করবে তা বলা ঝুনোর অধর্ম্ম।

আমার এক বন্ধু আছে, সে ব্যক্তি আদৌ নিরীহ Goody goody ভাল মানুষ নয়। একদিন কোন পাড়ায় যাত্রা হচ্ছিল, আর সেই পাড়ার পাশে সে ছাতি মুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল। একটি বার তের বছরের এঁচোড়ে পাকা ছেলে যাত্রা শুনতে শুনতে ভাব লেগে গিয়ে গলি থেকে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে এসে বন্ধুর সামনে বেঁকে দাঁড়িয়ে বললো, "ওরে তুবাত্মন্!" আমার নিরীহ বন্ধুটি উল্টো দিকে

বেঁকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, "কি রে পামর!" কাঁচার কাজ ঐ যাত্রা শোনবার ছোকরার মত জীবন ভরে আধখাওয়া ভাবগুলো নিয়ে সবার সঙ্গে তাল ঠুকে হুঙ্কার করে বেড়ান। তার সবই থিয়েটারী ঢঙে অভিনয় বা গ্যাক্টিং, হুজুগই তার বার আনা; এটা যেমন জীবনের লক্ষণ, তেমনি অপরিণত মস্তিষ্কেরও লক্ষণ।

যেখানে প্রেমের হাটে অন্তর দেবতার বৈঠক বসেছে, যেখানে তার লীলাচরণ ছোঁয়ায় পাষাণ ভরে ফুল ফুটছে, জীবনের বিজলী থিকি থিকি লহর খেলছে যুগের ঠাকুর ভাব তরঙ্গে জগত গড়ছে, সেখানে প্রবেশ করতে কাঁচাকে বয়সের অধিক পাকতে হবে। নিজের আধ পয়সার ভাবের ঢাকী হয়ো না, একবার দুনিয়ার ঢাকে কাঠি দাও। জীবনের বাঁশের বাঁশীর সব রন্ধ্রে আঙ্গুল দিয়ে একবার সবার বুকের খেয়াল বাজাও দেখি, তবেই ত ত্রিশকোটীর হাত তোমার হাতে মিশবে। ছোট একটা দলের মতের কঞ্চি দিয়ে রাগের জোরে এ বাদ্য বাজে না, কারণ এ মৃদঙ্গে যে দলহারা বাঁধনহারা প্রাণকাড়া লয়ে দেশের সবটুকু প্রাণ দুলবে, তোমার আমার নাম ডুবে গিয়ে সবার সেই পারের নেয়ের পতিত-তরানো নাম কীর্ত্তনে মধুর হয়ে ভবে উঠবে। তাই বলি ভাই কাঁচা একটু ভাবের পাকে পাকো, আর যত পার তোমার ঐ ঢলঢল তারুণ্যে আমায়ও তরুণ করে নেও।

অক্ষয় দান।

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।]

পথে যেতে যেতে সহসা একদা হেরিনু সমুখে মোর,
লাজে-সঙ্কোচে রয়েছে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক দীন ঘোর।
শিথিল তাহার দেহ-বন্ধন—প্রাণে নাই সুখ আশা,
অযতনে পড়া ছাড়াবাড়ী সম জড়তা করেছে বাসা।
নিদাঘ তাপিত পত্রের মত যাতনা জ্বালায় দহি,—
ঘুরিয়া মরিছে নিয়তি দেবীর ক্রূর অভিশাপ বহি'।

জীর্ণ-মলিন বসন ভূষণ চিহ্ন দৈন্যতার,
রৌদ্রদগ্ধ তৃণের মতন রুক্ষ কেশের ভার।
কম্পিত-কর প্রসারিয়া সে যে ভিক্ষার্থ আশা করে—
মোরপানে চাহি' রহিল দাঁড়ায়ে কত সঙ্কোচ-ভরে!
ধরি দু'টি হাত করুণ-বচনে বলিলাম তারে 'ভাই,
ক্ষমা কর মোরে, দেওয়ার মতন সাথে আজ কিছু নাই।'
শুনি মোর বাণী সহসা কি জানি চোখে এল তার জল,
বলিল—"তোমার স্নেহের বচন পরশিল হৃদিতল।
ছিনু একদিন ধনীর তনয়,—বিলাস ব্যাধির ফলে—
ভিক্ষার ঝুলি বহি আজ আমি—দৈন্যের হার গলে।
হারায়ে ফেলেছি ধন-সম্পদ—পার্থিব সুখ-আশা,
অন্তরখানি ফেলিনি হারায়ে, বুঝি স্নেহ-ভালবাসা।
সার্থক আজ প্রভাত আমার, দিয়াছ যে নিধি ভাই,
অতুল মহান্ অক্ষয় দান—তুলনা তাহার নাই।"
অসীম পুলকে ভরি গেল বুক—অন্তরে উঠে বাজি,
'একি শুনিলাম ভিখারীর মুখে—একি কথা শুনি আজি!'
বাহুবন্ধনে জড়ায়ে আদরে কহিলাম তারে "ভাই,
তুমিও যে দিলে অক্ষয় নিধি তুলনা তাহার নাই।"

মনোহারী সভ্যতা।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

যে সভ্যতার বন্যায় আমরা আজ হাবুডুবু খাচ্চি, সে মনোহারী সভ্যতার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তীক্ষ্ণধার খড্গের আঘাতে গভীর ক্ষতের মত আমাদের প্রাচীন সভ্যতার নদীতটে ভাঙন ধরেছে—বন্যার স্রোতে দেশের রক্তের স্রোত মিশে যাচ্ছে, আমাদের সর্ব্বস্ব ঐ বানের জলে ভাস্‌ছে আর বিদেশী বণিকের হাটে সুলভ পণ্যদ্রব্য হয়ে স্তরে স্তরে ভরে উঠ্‌ছে।

"আমাদের ধর্ম্ম, রীতিনীতি, সমাজ-বন্ধন শ্লথ হয়ে আস্‌ছে। সমাজের নেতা

যাঁরা, তাঁরা বড় বড় বাঁধ বাঁধ্‌তে কত কসরতই না করলেন – কিন্তু কোন বাঁধই টিক্‌ল না ; একগলা গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গার স্তব, শাস্ত্রের আবৃত্তি করেও যখন কিছু হ'ল না, তখন সবাই হতাশ হয়ে পড়ল। বুড়োরা প্রমাদ গণ্‌লে, যুবকরা নৌকায় নৌকায় গান ধরলে "যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে ?" শিশুরা তো নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নাচ্‌তে নাচ্‌তে জলে খেলা করতে লাগল। একদল মেয়ে যুবকদের শিক্ষার অনুকরণ করতে লাগল ; কিন্তু মায়ের প্রাণ কেবল কেঁদে উঠছে—তারা পল্লীদেবতার চরণে বিল্বপুষ্প দিয়ে কত মানসিক করছে। মায়ের এ ব্যথার অশ্রু কে মোচন করবে ?

বড় বড় বাঁধ বেঁধেও বানের জলকে প্রতিরোধ করা গেল না যখন, তখন প্রতিকারের নূতন চিন্তা অবশ্য করতে হবে। ছোট-বড় খাল কাটতে হবে—নদীর জল ঐ সব খাল দিয়ে ছুটে যাবে, তার শক্তিটাকে আমরা বেঁধে আমাদের মাটীর উর্ব্বরতা বাড়িয়ে দিতে চাই,— সেদিন কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় হবে না—কাঞ্চন মূল্যই পাব

ইংরেজ বণিককে বন্যার জলস্রোতের মত সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যেতে দেবনা ; তাদের দিয়ে চাষবাস করবার আশা চিরদিন অসম্ভব থাকবে না—ইংলণ্ডে, আমেরিকায় যারা ভদ্র কৃষক (Gentleman farmer) সেজেছে, তাদের আমাদের দেশে জমি দাও, ঘরবাড়ী করে তারা বাস করে বাঙালী হ'ক, ভারতবাসী হ'ক। তারা দেশবাসী না হ'লে এদেশের প্রতি তাদের মমতা হবে না। তাদের মনোহারী সভ্যতাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে হিন্দুর সাধন-লব্ধ শ্রেষ্ঠ সভ্যতার মাঝে আকর্ষণ করে আন। আমাদের এই নূতন আহ্বান।

আর তারা যদি আমাদের দেশে দোকানদারী করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে স্বদেশে ফিরে নবাবী করবার মতলবই করে, আমাদের দেশে বাস না করে, আমাদের সমৃদ্ধ (prosperous) করেছে বলে গর্ব্ব করে, আমাদের নিয়ে তাদের ছোট বড় উপনিবেশ স্থাপন করে, স্বদেশ রক্ষার জন্য আমাদের লক্ষ লক্ষ জীবন আহুতি দিতে যারা নিজদেশের সমর-ক্ষেত্রে আহ্বান করে, আর স্বার্থ-সিদ্ধির পর এশিয়াবাসী বলে স্বদেশের সীমা রেখার ভিতর হ'তে বহিষ্কৃত করে দেয়—তাদের বল্‌তেই হবে আমরা তোমাদের ঐ মনোহারী সভ্যতা চাই না, ভারতের ও এশিয়ার সীমারেখার দিকে স্পষ্ট অঙ্গুলী-সঙ্কেত করে তাদের বোঝাতে হ'বে Asia for the Asiatics (এশিয়া এশিয়াবাসীদেরই), তোমরা তোমাদের দেশে ফের, যন্ত্রপাতি নিয়ে চাষবাস

কর, কলকারখানা চালাও, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক—আমরা আমাদেরই দেশে থাকব, এত বড় দেশ আমাদের, কোন অভাবের তাড়নায় কোন দিন তোমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করতে যাব না; তোমাদের শাদা চোখ পরিষ্কার করে দেখ রক্তচক্ষু, হলুদ চক্ষু; রুশ-চীনের ভয় ভেঙ্গে যাবে—আমাদের মাঠে যখন অপর্য্যাপ্ত ধান হবে, আমরা "সোণার তরী" ভরে তোমাদের কলে কারখানায়, কুটীরে প্রাসাদে প্রেমের মূল্যে বিক্রয় করে আস্‌ব—তোমাদের অভুক্ত রেখে আমরা আহারে তৃপ্তি পাব না, এমন "অমানুষী" শিক্ষা আমাদের কোন দেশগুরু কোন দিন দেয় নাই।

দেশে ফিরতে তোমাদের ভয় কি? সতর্ক থাক্‌তে চাও দেশকে অস্ত্রশস্ত্রে ঘিরে দুর্ভেদ্য দুর্গ সাজাও, সে দুর্গজয় করতে রুশ ও চীন সাহসী হবে না। ইওরোপে তোমাদের স্থান সঙ্কুলান হয়নি, আমেরিকা আবিষ্কার করে, অষ্ট্রেলিয়া ও মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করে, শতবর্ষ ভারতবর্ষের কামধেনু দোহন করেও তোমাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটেনি! ও তো ক্ষুধা নয়, ও ব্যাধি! ক্ষুধার অতিরিক্ত ভোগের আয়োজন করেছ, কিছু সঞ্চয় হয়নি, সব ক্ষয় হয়েছে। আজ তোমার কাগজের দুর্ভিক্ষ, কাপড়ের দুর্ভিক্ষ, অন্নেরও দুর্ভিক্ষ. পৃথিবীতে কয়লা কম, লোহা কম, সোণা রূপো হীরে কিসের কম্‌তি নেই—তোমার ক্ষুধা বেড়েছে, সন্তোষ হয় নি!

তোমাদের বৃহত্তর ইউরোপ (Greater Europe) আজ আমেরিকা, আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়ার তিনটি মহাদেশে ব্যাপ্ত, তোমাদের অফুরন্ত মাটী (Inexhaustible "Natural Resources") এশিয়াকে এশিয়াবাসীদেরই দিয়ে তোমরা আজ নিশ্চিন্ত হও—Dependency, Colony, Spheres of Influence, Mandatory এ সব কথার জাল ছিঁড়ে ফেল—তোমরা Democracyর (গণতন্ত্রের) প্রচারক, এশিয়াতে Despotism (স্বেচ্ছাতন্ত্র) প্রচার করে তোমাদের মহত্ত্ব-গৌরব বিস্মৃত হয়ো না।

এ বৃহত্তম মহাদেশের জঙ্গল কেটে, পাহাড়ে উপত্যকায় এশিয়াবাসী কুটীর নির্ম্মাণ করে উপনিবেশ স্থাপন করবে, তবু তোমাদের সোণার কেল্লার ইট ভাঙ্‌তে যাবে না, তোমাদের মত বিশ্বগ্রাসী অতৃপ্ত ক্ষুধা তাদের নেই। মনে রেখ, তুর্কী এশিয়াবাসী হ'লে তুর্কীর ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, কিন্তু খ্রীষ্টান গ্রীস, রুমেনিয়া, বুলগার একদিন তোমাদেরই চোখ রাঙাবে!

বর্ত্তমান যুগে শক্তিমদে অন্ধ হবে যে, সে নূতন আন্তর্জাতিক বিগ্রহের

সৃষ্টি করবে; যে সভ্যতাকে অগ্নিপরীক্ষা হ'তে আমরা লক্ষ লক্ষ জীবন আহুতি দিয়ে অর্দ্ধদগ্ধ, জীবন্মৃত অবস্থায় ফিরে পেয়েছি তাকে সঞ্জীবিত করতে হ'লে আন্তর্জাতিক মহামিলনের শঙ্খ এ যুগে বাজাতে হবে—আবার অগ্নি প্রজ্বলিত হয় যদি তবে এশিয়া বুঝবে "This is the beginning of the end of Western civilisation!" (পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্ব্বাণের এই সূচনা।)

ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকার—সে পথে আলো জ্বালবার কোন চেষ্টাই নাই; আইরিশদের স্বাধীনতা দিতে হ'লে, "Self determination" (জাতির স্বপ্রতিষ্ঠা) যারা প্রচার করে, তাদের ভারতেও "না জানি কি হয়"?—এ দুশ্চিন্তা, এ দুর্ব্বলতা কেন? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য তোমাদের—মানুষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দাও—এমন বৃহৎ দান জগতে কোন জাতি কখনও করেনি—ঐ গরিমাই বৃটিশ জাতির ভবিষ্যতের আলো।

গান।

(হাবিলদার কাজী নজরুল্ ইসলাম)

পূরবী—মধ্যমান।

(আজ) যুগের পরে ঘরকে ফিরে
মায়ের কথা পড়্‌লো মনে।
শূন্য ঘরে মন বসেনা
গুম্‌রে' মরে হিয়ার বনে।
আজো সে ঘর সবই আছে,
মা কেবলই নেই গো কাছে,—
ঐ দাওয়া আর ঐ কানাচে
আজো মায়ের স্বরটি স্বনে।
বক্ষ কারুর সইতে নারি, কণ্ঠ ছিঁড়ে কান্না আসে;
ওষ্ঠ চেপে যায়না রাখা রূপ যে তোমার চক্ষে ভাসে।
পার্‌লিন গো মা সাতটি বরষ
একটুকু ক্ষীণ স্নেহের পরশ,—
(ওমা) 'বুনো' তোমার হ'লনা বশ
চল্‌লো ফিরে ফের বিজনে।
হায়্‌লো স্নেহ বাঁধন-হারায় বাঁধতে গিয়ে ডোর স্বজনে!

আন্তর্জাতিক চিরন্তন শান্তি—
তাহার উপায় ও সম্ভাবনা।

(শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্ত এম, এ।)

ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের চিরন্তন আশা—শান্তি। দেশের ও জাতির আর্থিক ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানগরিমার সহিত ইহা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য কখন কখন সর্ব্ববিধ্বংসী সমরব্যাপারে পরাক্রমসম্ভূত তামসিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা কোনও জাতির অদম্য ভোগাসক্তি ও বলদর্পিত অহমিকার মূলে প্রচণ্ড আঘাত লাগিলা—পরমার্থচিন্তার স্রোত উচ্ছ্বসিত হইতে পারে কিন্তু সেই হিল্লোলসমূহকে একত্র বাঁধিয়া এক বিশাল তরঙ্গায়িত সাগরে পরিণত করিয়া জগৎকে এক উচ্চাঙ্গের সাত্ত্বিকভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন সেই সর্ব্বতাপহরা শান্তির। তাই হয়ত কবি আবেগোচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

Ring out a slowly dying cause,
And ancient forms of party strife ;
Ring in the nobler modes of life
With sweeter manners, purer laws,

মুমূর্ষু সে পুরাতন যাক্ চলি ধীরে,
ভেদ ব্যবধান যত করুক প্রয়ান
জীবনের উচ্চ পন্থা—আন তারে ফিরে,
মধুর সৌহার্দ্দভাব, মঙ্গল-বিধান।

এখন জিজ্ঞাস্য এই চিরন্তন শান্তি স্থাপনের উপায় ও ব্যবস্থা কি? যে শান্তিকে চিরস্থায়ী হইতে হইবে, তাহা সকল জাতির জীবনের পরিপোষক হওয়া প্রয়োজন, কাহারও আত্মরক্ষার পরিপন্থী হইলে উহা বালুভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদের ন্যায় অচিরে ভূমিসাৎ হইবে সন্দেহ নাই। অপর কথায় এমন কি প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অলৌকিক ভাবোদ্বোধন সম্ভবপর হইতে পারে যাহার জন্য যুগযুগান্তর ধরিয়া ক্লান্ত বিক্ষুব্ধ মানবাত্মা মঙ্গলবিধাতা পরমেশের উদ্দেশে গাহিতেছে—

বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে উর্দ্ধমুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান।
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে জয় জয় হোক্ তোমারি।

এই শান্তির মহারাগিণী পাশ্চাত্যের অকস্মাৎ চালিত তাণ্ডবলীলার প্রশস্ত ক্ষেত্রেও উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হইতেছে। বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রের পরিণাম-চিন্তাই যে এই শান্তিপর্ব্বের আবির্ভাবের হেতু তাহা ত বোধ হয় না। সেই সুরের মৃদুল ঝঙ্কার যে অশান্ত পাশ্চাত্যের মানস-বীণায় বহু দিন হইতেই অনুরণিত হইয়া আসিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সেখানেও এতকাল ছিল বহুলোকের এবং—এখন বোধ হয় সকলেরই অন্তরের বাসনা এই, যে, এমন একটা কিছু ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হউক যাহাতে ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা না থাকে। এখন চিন্তার বিষয় এইরূপ বিধিব্যবস্থা হইতে পারে কিনা এবং হইলেও তাহা স্থায়ী হইবে কিনা।

দুইটি জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলেই যুগপৎ কতকগুলি দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। যুদ্ধের উপশমের সহিত বিবদমান সত্ত্বের শেষ হওয়াই এখন আন্তর্জাতিক নিয়ম। জেতা বলিয়া বিজিতের কাছে কোনও আর্থিক উপঢৌকনের দাবি করা চলে না, এবং যুদ্ধকালীন সেই দাবির কিছু অবশেষ থাকিলে তাহা পরিশোধিত হইয়াছে বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হয়। সন্ধিস্থাপনের সময় বা পরে বিজিতের রাজ্যের যে অংশ অধিকার করা হইয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হয় এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোনও প্রকার বৈরিতা আচরণ করিলে তাহার যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধের সময় যে সকল ব্যক্তিগত অধিকার লোপ পাইয়াছিল তাহাদের পুনঃ স্থাপনও কর্ত্তব্য। এই কয়টি শান্তির অব্যবহিত পরের সর্ত্ত।

এই সকল সর্ত্ত বজায় রাখিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদের সন্তোষজনক মীমাংসার দ্বারা ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা দূর করিবার জন্য রাজনীতি-বিশারদগণকে প্রথমে একটি পৃথিবীব্যাপ্ত জাতিসংঘ স্থাপনের উদ্যোগ করিতে হইবে; সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সেই জাতিসংঘের উপরে একটি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইবে; এই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত জাতি-সমূহের মধ্যে রাজ-তন্ত্র ও পদমর্য্যাদা সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন উঠিলে সেই জাতিসংঘ তাহার সমাধান করিবার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথমতঃ সাধারণ জনসমাজকে জাতি নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান রাজনীতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ

করিয়া ছোট বড় জাতির কর্ত্তব্য পালনে তাহাদিগকে সমর্থ করিয়া তুলিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিবদমান বিষয়গুলির মীমাংসার জন্ত পৃথিবীর রাজ্য-সমূহকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া একটা মহাসমিতিতে পরিণত করিতে হইবে। ইহাই ইউরোপে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্ত রাজনীতিবিদ্‌গণের প্রথম সংকল্প। সেই সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রথম প্রয়াস হইয়াছিল ১৮৯৯ সালে, যখন রুশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকলাসের করুণ হৃদয় সমরবহ্নিজাত ধ্বংসস্তূপের বিভীষিকা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং যুদ্ধ পরিচালনের অপরিমিত ব্যয় দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহারই আহ্বানে Hague নামক স্থানে একটা বিরাট শান্তি-পরিষদ্ সমবেত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কেমন করিয়া পৃথিবীটাকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও কামানের অগ্নিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়া শান্তির ক্রোড়ে স্থাপিত করিতে পারা যায়। সেই প্রথম বৈঠকে ইহার আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হইলেও অনেক ছোট-খাট ত্রুটি থাকিয়া যাওয়ায় আসল কার্য্য কিছু হইতে পারে নাই, পরে ১৯০৭ সালের ইহার দ্বিতীয় বৈঠকে সেগুলির অনেকটা সংশোধন করা হইল।

ক্রমে ক্রমে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র যে মানবের রাজ্যজয়স্পৃহাকে ছাপাইয়া যুদ্ধবিগ্রহের উপর একটা ঘৃণা ও আতঙ্কের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা এই 'আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের চেষ্টাকে অনেকটা সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যুদ্ধের কঠোর বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে কোনও জাতি সৎসাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতারূপ পুরুষোচিত গুণ লাভ করিতে পারিবে না, একথাটা আংশিক সত্য। অবশ্য ইহা যথার্থ যে এই ঘোর আত্মতৃপ্তি ও বিলাসিতার যুগে কেবল ঐশ্বর্য্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পথ অনুসরণ করা একটা জাতির পক্ষে অকল্যাণকর ও তাহার উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ। কিন্তু সেই জন্তই কি অনুমান করিতে হইবে যে চিরস্থায়ী শান্তি একটা স্বপ্ন? যুদ্ধ ভিন্ন কি মনুষ্যত্ব সাধনের অন্ত উপায় নাই? বিশিষ্ট ব্যায়াম বা ক্রীড়ার দ্বারাও দৈহিক শক্তির পূর্ণ পরিণতি হইতে পারে আর আমাদিগের চারিদিকে ত অনন্ত স্বার্থত্যাগের কত উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি; ইহা যে কেবল ধর্ম্মানুরক্তি বা বিশ্বপ্রেমিকতা প্রণোদিত এমত নহে, কোথায়ও তাহা সত্যানুরাগজনিত, কোথায়ও তাহা রূপের বা নিঃস্বার্থপ্রেমের চরণে আত্মবলিদান, কোথায়ও বা তাহা নবাবিষ্কারের অদম্য উৎসাহ অথবা দুঃসাধ্য সাধনের বাসনায় স্বার্থত্যাগ; এবং এই সর্ব্বত্যাগী পুরুষগণের মধ্যে যাহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই, কখনও

সমরশিক্ষায় কোন ধারই ধারেন নাই, যুদ্ধক্ষেত্রও হয়ত কখন চক্ষে দেখেন নাই। বাস্তবিক যতদিন নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত করিতে হইবে, বন্য প্রান্তরভূমিকে মনুষ্যের বাসোপযোগী করিতে হইবে অথবা অসভ্য ইতরজাতিকে অজ্ঞানতিমির হইতে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আনিতে হইবে, ততদিন প্রকৃত কার্য্যান্বেষীর উৎসাহ ও পরিশ্রমের যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। যখন এখনও অনেক সাগর অতিক্রম করিতে অবশিষ্ট আছে এবং অনেক পর্ব্বত দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া পড়িয়া আছে, তখন প্রকৃত কার্য্যকুশলতা ও সৎসাহসের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। দহ্যমান গৃহমধ্যে যখন অগ্নিনির্ব্বাপক দল প্রবেশ করে, তখন তাহারা যুদ্ধস্থলের সৈনিক অপেক্ষা কি অল্প স্থিরবুদ্ধি ও সৎসাহসের পরিচয় দেয়? গার্হস্থ্য জীবনও নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের উচ্চতর পরীক্ষার স্থান। এমন অসংখ্য শ্রমসাপেক্ষ ব্যবসায় রহিয়াছে যাহাতে পরিচালকগণ ও কর্ম্মচারি-বৃন্দের পক্ষে শিক্ষিত সৈনিক অপেক্ষা অধিকতর আত্মসংযম ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয়। শান্তি কেবল বিলাস ও আলস্যের নিদান এমন ত কোন কথা নাই। ভীষণ নরহত্যাব্যাপারে লিপ্ত না হইয়াও ত লোকে পুরুষোচিত গুণাবলীর অধিকারী হইতে পারে। অবশ্য স্থায়ী শান্তির ক্রোড়ে নিঃশঙ্কশয়নে মানুষ অর্জ্জিত অর্থ আত্মসম্ভোগে বৃথা নষ্ট করিতে পারে; সত্য বটে ঘৃণিত পরান্মুখতা ও সুখপ্রিয়তা বহুজাতির তেজ ও শক্তি অপহরণ করিয়াছে, কিন্তু ইহা কি তাহা অপেক্ষা অধিক সত্য নয় যে অদম্য সমরাসক্তি কত সময়ে বিজেতৃগণকে বলদর্পিত মানবাকৃতি পশুতে পরিণত করিয়াছে এবং বিজিত দলকে বন্যজন্তুর মত অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে পলাইয়া ফিরিতে বাধ্য করিয়াছে। জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়ই ত পতনের ভয় আছে, পদস্খলন ত সর্ব্বত্রই হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া শান্তির কুফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি স্বেচ্ছায় সমরের জ্বালাময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইবে, ইহা যেন অনেকটা অগ্নির বিশুদ্ধি প্রদানশক্তি আছে বলিয়া এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়ার মত। কোনও তর্কশাস্ত্রের বিচারেই ত উহা প্রশংসার যোগ্য নহে।

প্রকৃত কথা কোন উন্নতিশীল রাজ্যই যুদ্ধের সরঞ্জাম একেবারে পরিত্যাগ করিতে সাহস করে না, ভয় হয় পাছে উহার অরক্ষিত অবস্থা দেখিয়া পরধন-লোভী প্রতিবেশী রাজ্যের হস্তকণ্ডূয়ন আরম্ভ হয় এবং ছলে বলে কৌশলে ইহাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রয়াস পায়; একেবারে কবলিত করিয়া লইতে না পারিলেও ত রাজকোষ লুণ্ঠন প্রভৃতি উৎপীড়নের দ্বারা ইহার উন্নতশীর্ষ জগতের

মাঝে মত্ত করিয়া দিতে পারে। এই কারণেই পরস্পরের প্রতি একটা বিজাতীয় অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব থাকায় সকল আত্মাভিমানী জাতিই উৎকণ্ঠিত ও সশস্ত্র শান্তির মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছে: এবং তাহাই এক রকম সহিয়া গিয়াছে; ইহাতে তাহাদিগের, অর্থাগমের উৎস কতটা শুষ্ক হইয়াছে এবং অর্থনীতিক ও সমাজনীতিক উন্নতি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া কত পশ্চাতে হটিয়া আসিয়াছে, ইহা তাহারা বুঝিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কতলোক এই নরহত্যা ব্যাপারে শিক্ষালাভ করিবার জন্য জাতীয় অর্থভাণ্ডারের বিশেষ ক্ষতি করিয়া কত লাভজনক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। সত্য কথা এই যে, শক্তিশালী জাতি তাহার আর্থিক উন্নতি বা আত্মসন্তোগ অপেক্ষা যাহা অনেক প্রিয় সেই স্বাধীনতা, সম্মান ও জগতে স্বীয় পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্বস্ব-পণ করিয়া যুদ্ধ করিবেই, এবং সেই হেতু অসংযমী ও পররাজ্যলোভী জাতিসমূহ একটা আন্তর্জাতিক শাসনে নিবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ থাকিবেই। যুদ্ধ চিরকালই নিষ্ঠুরতা ও ক্রুরতার নিদর্শন ছিল, ক্রমে উহা মূর্খতার পরিচায়ক হইয়া উঠিতেছে, কারণ সকল রাজ্য ও জাতির আর্থিক স্বার্থ এখন পৃথিবীব্যাপী ব্যবসায় ও বাণিজ্যে একই সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে।

এই জন্য চিরন্তন শান্তির স্থায়িত্ব সম্ভবপর করিতে হইলে প্রথম চেষ্টা হইবে একটা আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তির (international arbitration) ব্যবস্থা। বর্ত্তমানকালের জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সমাজগত ও বাণিজ্য-সম্পর্কিত সম্মিলন, সমুদ্রপথে ব্যবসায়ের অত্যধিক প্রসার এবং দেশ হইতে দেশান্তরে চলিষ্ণু অর্থের সরবরাহ, এই সকল কারণে—পৃথিবীর সভ্যজাতিগুলিকে একই স্বার্থসূত্রে এমনই আবদ্ধ করিয়াছে, যে, যদি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক বিচারকের হস্তে (International arbitration) বিবাদ মীমাংসার ভার দিয়া সহজে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ একটা উপায় থাকিতে এখন শক্তিশালী রাজ্যসমূহ স্বেচ্ছায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ ডাকিয়া আনিবে ইহার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কিন্তু ইহাও অসম্ভব নয় যে সময়ে সময়ে কোনও বিষয়ে অবিবেচকের ন্যায় দাবি পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা দ্বেষ ও ক্রোধের উদ্রেক করিয়া তুলিতে পারে এবং যেখানে ধীর বিবেচনার ফলে যুদ্ধের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইত, সেখানে চিত্তবিকার আসিয়া এক বিরাট সমর-বহ্নি জ্বালাইয়া তুলে। Hague সংসদের দুইটি বৈঠকেই (Hague conferences of 1899 and 1907) এই আকস্মিক বিপদের কথা আলোচিত

হয় এবং কিরূপে ইহাদের নিবারণের দ্বারা মধ্যস্থতার সাহায্যে বিবাদ নিষ্পত্তির পূর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু বন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। অজ্ঞতা-হেতু মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান সভা (International Commission of enquiry) স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ১৮৯৯ সালের হেগ সংসদের প্রথম বৈঠকে ধার্য্য হইল, যখন ভিন্নরাজ্যের মধ্যে কোন ও বিষয়ে মতদ্বৈধবশতঃ বিবাদ বাঁধিবার উপক্রম হইবে, তখন উভয় পক্ষের সম্মতি থাকিলে এইরূপ আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান সমিতির হস্তে বিবাদমীমাংসার ভার দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সংসদ কেবল মনোমালিন্যের হেতু ধার্য্য করিয়া সদ্ভাবস্থাপনের উপায় স্থির করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, উহা গ্রহণ করা বা না করা বিবদমান পক্ষের ইচ্ছাধীন রহিল। ১৯০৭ সালে Hague পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠকে ইহার কতকটা সংশোধন করা হইল। ইহার প্রথম সর্ত্তস্বরূপ স্থির হইল যে স্থায়ী বিচার সভায় (Permanent Court) বিবদমান দুই পক্ষের প্রত্যেকটি হইতে দুইটি নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে সভ্য করিয়া লইতে হইবে, ইহা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মত লইয়া সমিতির বৈঠকের স্থান ভিন্ন অপর স্থানেও গিয়া অনুসন্ধান পরিচালন করিবার ক্ষমতা পাইবে এবং ইহাও ধার্য্য হইল যে সর্ত্তে আবদ্ধ দেশ সকলকে প্রমাণ সংগ্রহ ও সাক্ষ্যগ্রহণ বিষয়ে ইহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে।

এই ব্যাপারে ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি চিত্তচাঞ্চল্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হেগ্ পরিষদ মধ্যস্থনির্ব্বাচনবিধি স্থির করিলেন এবং কোনও কোনও স্থলে বিশেষ মধ্যস্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। রাষ্ট্রনীতিবিদ্-গণের কথায় মধ্যস্থ বা mediatorএর এইরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করা হইল, যে বিবদমান শক্তিসমূহের অনুরোধে অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মধ্যস্থ বা mediator বিবাদের কারণ বিচার করিয়া সদ্ভাব স্থাপনের একটা সহজ উপায় স্থির করিয়া দিবেন। ইহা যে অলঙ্ঘ্য এবং অবশ্য প্রতিপাল্য এমন কোনও কথা নাই। ইহা অনেকটা বন্ধুর উপদেশ স্বরূপ, পালন করা বা না করা তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। হেগ্ পরিষদের শক্তিপুঞ্জ স্থির করিলেন যে বিশেষ মধ্যস্থতার প্রয়োজন হইলে বিবদমান রাজ্য দুইটির প্রত্যেকে এক একটী মিত্ররাজ্য নির্ব্বাচন করিবেন, সেই নির্ব্বাচিত মিত্ররাজ্য দুইটি বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ করিয়া উভয়ে যাহা কল্যাণকর স্থির করিবেন তাহাই যুদ্ধোন্মুখ রাজ্যদ্বয়কে গ্রহণ করিতে বলিবেন। এই উপায়োদ্ভাবনটি এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হইবার সুযোগ পায় নাই। এই মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া অনেকটা বিচারালয়ের বিচার পদ্ধতির মত। বিবাদোন্মুখ

জাতি দুইটি কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা কোনও রাজ্যকে মধ্যস্থ সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং উভয় পক্ষের মনোমালিন্যের হেতু শ্রবণ করিয়া এই মধ্যস্থেরা যে বিচার করিবে তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। অবশ্য অন্য কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। এই জন্যই অনেকে বিবেচনা করেন যে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য একটা আন্তর্জাতিক বিচারালয় গড়িয়া উঠিবে, ধর্ম্মাধিকরণে বিশিষ্ট কয়েকটি রাজ্য বিচারপ্রার্থী এবং তৎসংক্রান্ত যে কোন ব্যাপারই নিষ্পত্তির বিষয়। ইহাই Hague পরিষদে মধ্যস্থতার দ্বারা চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপনের উপায়োদ্ভাবন অদ্যাবধি যাহা হইয়াছে তাহার ইতিহাস।

কিন্তু জগতে ইহার কার্য্যকারিতার উপলব্ধি হইবার পূর্ব্বেই তাণ্ডবনর্ত্তনে এক বিশ্বগ্রাসিনা প্রলয়ঙ্করী রণরাক্ষসী আসিল। তাহার লোল জিহ্বার সম্মুখে চাকতপদে কোথায় লুকাইল সেই চিরস্থায়ী শান্তি কল্পনা। যখন আবার সেই রাজনীতিগগনের গভীর ঘনঘটা কাটিয়া গেল, তখন পুরাতন শান্তি কল্পনার আলোকরেখা প্রথমে চারিদিকে উঁকি দিতে লাগিল এবং ক্রমে সমগ্র আকাশে নূতন জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া দিল। তাই সমগ্র জগৎ যখন পরাক্রমদর্পসম্ভূত পাশবিক শক্তির তাণ্ডবলীলা দর্শনে ভীত হইয়া উঠিয়া শান্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তখন মন্থর চরণে দেখা দিল নূতন আশার বাণী স্বরূপ এক জাতি-সংঘ (League of Nations) স্থাপনের প্রস্তাব। যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণের দ্বারা চিরন্তন শান্তির ইহা একটা মোহন স্বপ্ন; কখনও ইহা সত্যে পরিণত হইবে কিনা তাহা কেবল ভবিষ্যৎই বিচার করিবে, কালই ইহার নিরপেক্ষ বিচারক। এই সংঘের সাধারণ সভ্যগণের প্রতিনিধি লইয়া ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইবে, নির্দ্ধারিত সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে ইহার বৈঠক বসিবে। প্রত্যেক রাজ্যের উহাতে একটী ভোট দিবার এবং তিনটি প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা থাকিবে। আবার বিশ্বের পঞ্চমহাশক্তির পাঁচটি প্রতিনিধি ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার দ্বারা নির্ব্বাচিত চারিটি প্রতিনিধি লইয়া ইহার পরিচালক সমিতি গঠিত হইবে। কোনও যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে তাহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ইহার বৈঠক বসিবে। সর্ত্ত-বদ্ধ রাজ্যসমূহ হঠকারিতার পরিচায়ক কোনও যুদ্ধে একেবারে প্রবৃত্ত না হইয়া বিবদমান বিষয়টির মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক মধ্যস্থ বা অনুসন্ধান সমিতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য হইবে। (ক্রমশঃ)

মর্ম্ম ও বেদনা।

(প্রসাদ)

ছিছি একি কথা কও।

কোন্ দিন আমি বলেছি তোমারে

তুমি গো আমার নও ?

কোন্ দিন আমি তোমারে লুকায়ে

গোপনে করেছি গান,

কোন্ দিন আমি আমার অশ্রু

বাতাসে করেছি দান ?

কোন্ দিন আমি কোন সে নিশীথে

কোন্ তেমাথার পথে,

চুপি চুপি গিয়া উঠিয়া বসেছি

কোন্ বিদেশীর রথে ?

চুপি চুপি আমি কর্ণে কি তার

তুলেছি তোমার নাম,

ইঙ্গিতে আমি দেখায়ে দিয়েছি

কোথায় তোমার ধাম ?

অধর-পরশ নিতে এসেছিল

অধরে যা' ছিল মোর,

চুরি করিবারে বাহুর বাঁধন

এসেছিল বটে চোর।

আঁধারের রচা বসন পরিয়া

চুপি চুপি ফেলে পা,

এসে মোর ঘরে দুয়ারে সে ধীরে

দিয়েছিল বটে ঘা ;—

শুন না কাহারো মিথ্যা সে বাণী

ওগো ও বেদনা সই,

তোমার কথাটি বলিনিক তারে,

সত্য কথাটি কই।

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

গত কংগ্রেস

(ভূমিকা)

আমার সকল কথাই বাজে কথা। বাজে কথার মহাগুণ এই যে, তা কাজের নয়, আর কাজের কথার মহাদোষ এই যে, তাতে কোনও কাজ হয় না। যে দেশে কাজের কথা বাজে কথা, সে দেশে বাজে কথা কাজের হলেও হতে পারে।

(কংগ্রেসের স্বরূপ)

নাগপুর কংগ্রেস এবার পগ্গধারী। টুপি, পাগড়ির হয় ফার্সি, নয় তুর্কি সংস্করণ অতএব সংক্ষিপ্ত ও অপভ্রষ্ট পগ্গ। খোলা মাথা খুব কম। পেটে বিদ্যা ও মাথায় বুদ্ধি থাকলে মুখে-চোখে তা ফুটে বেরয়। চেহারায় পরিচয় যে, অধিকাংশ ঢাকা মাথার ভিতরে কিছু নেই, অপর পক্ষে অধিকাংশ খোলা মাথার ভিতরে কিছু আছে। সে কিছু, বোধ হয় মগজ। এ কংগ্রেসে খোলা মাথা হেঁট হবে। ভোটের আদিম অর্থ বাহুবল, প্রমাণ ভোট হাত তুলে করতে হয়। বাহুবলের শক্তি একের সঙ্গে অপরের যোগে, বুদ্ধিবলের শক্তি আত্মগুণে। এ কংগ্রেসে যোগ গুণের উপর জয়লাভ করবে। কলেজস্কোয়ার, বড়বাজারের কাছে মার খাবে।

(প্রথম প্রধান ঘটনা)

শ্রীমতী আনি বেসান্তের কথারম্ভ। চতুর্দ্দিকে শিবারব। মহাত্মা গান্ধীর উত্থান ও শান্তিবচন পাঠ। শ্যাম শ্যাম (shame, shame) হুক্কাহুয়ার তিরোভাব। একটি চিত্রের স্মৃতিপটে আবির্ভাব। তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী আনি বেসান্তকে মাথায় করে দেশের লোকের পেট্রিয়টিক নৃত্য। বোঝা গেল পলিটিসিয়ানরা পলিটিক্সের দেবদেবীদের মাটির ঠাকুরহিসেবে পূজা করে। তিন দিন ধরে ঢাকের বাদ্যি ধুপ দীপ পুষ্পচন্দন, স্তুতি প্রণতির ছড়াছড়ি। তার পর বিসর্জ্জন। বোঝা গেল কংগ্রেস তার ধর্ম্ম বদলে ফেল্লে। আন্দাজ কচ্ছি, কংগ্রেসের নব-ধর্ম্ম হচ্ছে নারী-পূজার বদলে Hero-worship.

(দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা)

যা মনে করেছিলুম হলও তাই। বাঙালীর মস্তকের উপর অ-বাঙ্গালী-কংগ্রেসের আক্রোশ আর চাপা থাকল না। বড়বাজার কর্ত্তৃক কলেজ স্কোয়ারের উপর সহসা আক্রমণ। পগ্‌গধারী কর্ত্তৃক "নাংগা শিরের" উপর যষ্টিবৃষ্টি। রক্তপাত। দেখে খুশী হলুম বাঙলার যুবকদের শরীরে রক্ত আছে আর সে রক্ত লাল। কংগ্রেসের কর্ত্তা ব্যক্তিদের যুবকদের প্রতি জোর গলায় আদেশ—"দাঁড়িয়ে মার খাও, হাত তুলো না, শুধু মাথা নীচু করো"। দেখা গেল, কংগ্রেসের বাঙালী-নেতা উপনেতারা সব Tolstoi-র non-resistance মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। "অহিংসা পরম-ধর্ম্ম" এই বৌদ্ধ-জৈন মত, রুশিয়ার মহা-ঔপন্যাসিকের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে সাফাই হয়ে, "হিংসিত হওয়াই পরম পুরুষার্থ" এই আকার ধারণ করেছে। কিল খেয়ে কিল চুরি করা সকলের ধাতে সয় না। নিরপরাধ বাঙালী যুবকের ফাটামাথার রক্ত দেখে জনৈক জাত-বাঙাল অবিবেচক বাঙালী সাহিত্যিক শাস্ত্রের ভাষায় বললেন, "মূর্খস্য লাঠ্যৌ-ষধি"। কংগ্রেস-ক্যাম্পে সে ঔষধের উল্লাস সুরু হল কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। সকলকে অগত্যা passive-resistance শিরোধার্য্য করতে হল। তার পর আততায়ীদের পক্ষ হতে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে, তিনটী ভগ্নদূতের আগমন। একটি ভাটিয়া, একটী পাঞ্জাবী, একটি মাড়োয়ারী। তিন জনের মুখেই এক কথা। "হামলোক্‌কা আদ্‌মি তোম্‌লোক্‌কা মারা ত কেয়া হুয়া? জানে দেও। আবি ত বাঙালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী সব এক হো গায়া, সবকোই কারাগারেসাকে সন্তান, সব ভাই ভাই। ভাই ভাইকো শির তোড দিয়া, ইস্‌মে কেয়া গোস্‌সাকে বাৎ হুয়।" এই হচ্ছে fraternity-র হিন্দি অনুবাদ। আবিষ্কার করা গেল, নব কংগ্রেসের উহ্য ও গুহ্য সূত্র হচ্ছে বাঙালীর সঙ্গে অ বাঙালীদের Violent co-operation!

(সর্ব্ব প্রধান ঘটনা)

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক non-violent non-co-operation এর প্রস্তাব। বক্তৃতার মানে বোঝা গেল না। মোদ্দা কথা—ছ'মাসে স্বরাজ। তার জন্য কিছু করতে হবে না। কিছু না করলেই তা পাওয়া যাবে। পলিটিক্যাল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় সকলের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হওয়া। শুনতে কথাটা বৈদান্তিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অশাস্ত্রীয়। বেদান্ত-মতে কর্ম্মত্যাগের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, সেই

জ্ঞানের ফল মুক্তি। এ মত ঠিক উল্টো। জ্ঞান অর্জ্জন, সহযোগীতা-বর্জ্জনের বিরোধী। অতএব স্কুল-কলেজ পরিত্যজ্য। প্রশ্ন—কর্ম্মমার্গ জ্ঞানমার্গ দুই ত্যাগ করে, কোন্ মার্গ ধরে ছ'মাসে স্বরাজ্যে গিয়ে পৌঁছব? উত্তর—non-violent non-co-operation, পলিটিক্যাল স্ব-রাজযোগের একটি ক্রিয়া। সে ক্রিয়া হচ্ছে বালকের চিত্তবৃত্তির ও বাদ বাকী সকলের বিত্তবৃত্তির নিরোধ। এ ক্রিয়ার আশু ফল সাযুজ্য। কার সঙ্গে?—অপরাপর স্বাধীন জাতীর সঙ্গে। প্রস্তাবটা খুব পরিষ্কার নয়, কিন্তু মতলব বোঝা যাচ্ছে। মনে ও চরিত্রে যদি আমরা স্বাধীন হই, তাহলে জীবনে নিশ্চিত স্বাধীন হব। কথা ঠিক, কিন্তু "যদি" জিনিষটা এত অনিশ্চিত যে তার উপর কোনই ভরসা নেই। তা ছাড়া মনে স্বাধীন শুধু কথার জোরে এক মুহূর্ত্তে হওয়া যায় না। সে যাই হোক বিচার শোনা যাক্।

(বিচার)

কংগ্রেসে উক্ত প্রস্তাবের বিচার সুরু হল। নানা দেশের নানা জাতীয় কংগ্রেসওয়ালা সে বিচারে যোগ দিলেন। কি হ'ল তা বোঝা গেল না, কেননা কারও কথা স্পষ্ট নয়। কারও কারও কথা আবার এভাদৃশ অস্পষ্ট, যে তাঁরা পূর্ব্বপক্ষ কি উত্তরপক্ষ বোঝে কার সাধ্য। ইনি non-co-operation-এর পক্ষে, কিন্তু non-violent-এর বিপক্ষে। উনি non-violent-এর পক্ষে কিন্তু non-co operation-এর বিপক্ষে। কেউ বা উক্ত প্রস্তাবের প্রতি দফার দফারফা করতে প্রস্তুত কিন্তু সমগ্রটি গ্রাহ্য করেন। কেউ বা আবার প্রতি দফাটি গ্রাহ্য করে সমগ্রটি প্রত্যাখ্যান করলেন। দু' এক জন প্রস্তাবটি লম্বা করবার পক্ষে, আর পাঁচ জন সেটি খাটো করবার পক্ষে। দেখা গেল, প্রস্তাবটির অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কারও মতের মিল নেই, অতএব এ বিষয়ে সকলের পক্ষে একমত হওয়ায় কোনও বাধা নেই। যেখানে বুদ্ধিবলে কুলায় না, সেখানে বাহুবলে কুলায়, সুতরাং দেখা যাক ভোটে কি হয়।

(ভোট)

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট হল ৯৯৯, তার পক্ষে হল এক, অর্থাৎ—মহাত্মা গান্ধীর। তবে সেই এক ভোটেই যে প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গেল, তার কারণ সেই একের পিঠে ছিল অনেক গুলি 'শূন্য', সুতরাং গুণতিতে সে 'এক' অনেক হাজার হয়ে উঠল।

(উপসংহার)

"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।" Non-co-operation প্রস্তাব পাশ হবার পর কংগ্রেসের সভাপতি লালা লাজপত রায় কর্ত্তৃক তার উপর অসি চালন, তৎপরে বাঙালীর পরাজয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ। তাঁর দুঃখ বাঙালী কংগ্রেসের নেতৃত্ব খোয়ালে।

কংগ্রেস যদি বুরোক্রাসির সঙ্গে সহযোগীতা বর্জ্জনের প্রস্তাব না করে, বুরোক্রাসির প্রতিযোগীতা-অর্জ্জনের সংকল্প করতেন, তাহলে বোধ হয় বাঙালী তার নেতৃত্ব ফিরে পেলেও পেতে পারত। প্রতিযোগীতা অর্জ্জন কর্ম্মক্ষেত্রে সাধনা সাপেক্ষ, আর বাঙালী গত পোনেরো বৎসরে ঠেকে শিখেছে যে, কোনো মন্ত্রে সিদ্ধ হতে হলে ক্রিয়া চাই। এক বচনসার পলিটিসিয়ান ছাড়া বাঙলার আর কেউ নিষ্ক্রিয় হবার মাহাত্ম্য প্রচার করতে প্রস্তুত হবে না। কংগ্রেসের প্রস্তাবের অন্তরে আছে শুধু নিষেধ, নেই কোন বিধি। আর বিধিই মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, নিষেধ নয়। সমাজে "না"র শাসনে বাস করেই আমাদের এই দুর্গতি। জাতীয়-জীবন গড়ে তোলবার জন্য এখন যার বিশেষ প্রয়োজন সে হচ্ছে 'হাঁ"। Don't নয়, Do-ই হচ্ছে নবজীবনের একমাত্র বাণী। কেননা, "Don't" শাসনকর্ত্তার আদেশ ও "Do" মুক্তিদাতার উপদেশ।

আমার এ মত শুনে যদি কেউ ক্ষাপ্পা হন, তাঁর কাছে আমার একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অঙ্গীকার করবার পক্ষে আমার কোনরূপ বাধা নেই। উপাধি ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত, কেন না আমার কোনরূপ উপাধি নেই। Levee আমি এ যাবৎ শুধু ছাপার হরপেই দেখেছি এবং বন্ধগত্যা দেখবার আমার কোনরূপ অভিপ্রায় নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা আমার পায়ে সয় না, রাত্রি জাগরণ আমার ধাতে সয় না, আর বেশি মাথা নীচু করলে আমার পিঠে ব্যথা হয়। ছেলেদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে আমি সদাই প্রস্তুত, কেন না আমি নিঃসন্তান। ওকালতি ছাড়তে আমার কোনও আপত্তি নেই, কেননা ওকালতি আমি করি নে। মেসোপোটামিয়াতে কুলিগিরি কেরাণীগিরি করতে যাবার আমার কোনরূপ অভিপ্রায় নেই, অতএব সে অভিপ্রায়ও ত্যাগ করতে আমি সদাই প্রস্তুত।

আমি যে কংগ্রেসের প্রস্তাবের নীচে দেস্তখত করতে প্রস্তুত নই, তার প্রথম

কারণ, আমি যা বুঝি নে, তা বুঝি বলার অভ্যাস আমার নেই। আর তার দ্বিতীয় কারণ, আমি চাইনে যে দেশসুদ্ধ লোক আমার মত নিকর্ম্মা হোক। সবাই যদি বীরবল হয় ত দেশ আজ যা আছে কাল তার চাইতে বেশি লক্ষ্মী-ছাড়া হবে। তার চাইতে সকলের পক্ষে 'বল' বাদ দিয়ে 'বীর' হওয়া শতগুণে শ্রেয়।

বীরবল

আশ্বিন—সবুজ-পত্র।

বাঁধন-হারা।

* * * * * *

এই বেদনার আনন্দই আমাকে পাগল করলে, ঘরের বাহির করলে, বন্ধন-মুক্ত রিক্ত করে ছাড়লে, আর আজো সে ছুটেছে আমার পিছু পিছু উল্কার মত উচ্ছৃখলতা নিয়ে। দুঃখও আমায় ছাড়বে না, আমিও তাকে ছাড়বো না। সে যে আমার বন্ধু—প্রাণপ্রিয়তম সখা,—আমার ঝড় বাদলের মাঝখানে নিবিড় করে পাওয়া সাথী! এ পাওয়ার আনন্দের যে তীব্র নির্ম্মমতা ভরা মাধুর্য্য, তাকে এড়িয়ে যাবার সব শক্তি ঐ পথে-পাওয়া বন্ধু দুঃখই হরণ করেছে। তাই বাউল গানের অলস সুরে সামনের উদাসীন পথে আমার ক্রন্দন আনন্দ একটা একটানা-বেদনা সৃজন করে চলেছে, দিগন্তের সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের পানে প্রসারিত হয়ে গেছে সে পথ। বুকের ভিতর ক্রন্দন জাগে তার সেই চিরন্তন প্রশ্ন নিয়ে, "এ পথ গেছে কোন খানে গো কোন্ খানে?" মূক পথের সীমাহীন শেষের আধআব-ছায়া আঁখির আগে ক্লান্ত চাওয়ার মৌন ভাষায় যতই কইতে থাকে, "তা' কে জানে, তা' কে জানে!" এই অশেষের পথ পেতে ততই প্রাণ আকুলি বিকুলি করে ওঠে। তাতেও কত আনন্দ। এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা আর পথহীন পথচলার গাঢ় আনন্দ, তা' থেকে আমার অতৃপ্ত আত্মতৃপ্তিকে বঞ্চিত করবো কেন? তোরা অনুভূতিহীন আনন্দবিহীন পাথরের ঢেলা—হয়ত একে "সোণার পাথর বাটি" "বা "কাঁঠালের আমসত্ব"এর মতই একটা অর্থহীন অনর্থ মনে করে প্রশ্ন করবি, "যার সীমা নেই, শেষ নেই, সে অজানার পেছনে ছোটার আবার আনন্দ কি?" ঐ ত মজা! এই অসীমের সীমা খোঁজায়, নিরুদ্দেশের উদ্দেশের চেষ্টায় যে দীর্ঘ অতৃপ্তির আশা-আনন্দ, সেই ত আমার উগ্র আকাঙ্ক্ষার রোখ চড়িয়ে দিচ্ছে। শেষ হলে যে এ পথ চলারও শেষ, আর আমার আনন্দেরও শেষ, তাই আমি পথ চলি আর বলি,—যেন এ পথের আর শেষ না হয়। পাওয়ার আনন্দের

শান্তির চাইতে, তাই আমি না পাওয়ার আনন্দের অশান্তিকেই কামনা করে আসচি। যার জন্তে আমার এই অগস্ত্য-যাত্রা, আমার সেই পথ-চাওয়া ধনকে কি এই পথের পারেই পাব? সেও তবে কি আমার আশায় এই সীমার শেষে তার অনন্ত যৌবনের ডালি সাজিয়ে জন্ম জন্ম প্রতীক্ষা করে কাটাচ্চে? শুধু আমিই তাকে পেতে চাই? সে কি পথ চলে না আমার আশায়? না, না, সেও পেতে চায়, সেও পথ চলে; নৈলে কে আমায় আকর্ষণ করবে এমন চুম্বকের মত? কিসের এমন উন্মাদনা স্পন্দন আমার রক্তে রক্তে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটচে?—তার বাঁশী আমি শুনেচি, তাই আমার এ অভিসারে যাত্রা, আমার বাঁশী সে শুনেচে, তাই তারও ঐ একই দিক্‌-হারা পথে অভিসার যাত্রা। আমি ভাবচি আমার এ যাত্রার শেষ ঐ পথহীন পথের অদেখা পথিকের কুটীর-দ্বারে, পথের যে মোহানায় গিয়ে পথহারা পথিক ঐ চেনা বাঁশার পরিচিত বেহাগসুর স্পষ্ট শুনতে পায়। সে বেহাগ রাগে মিলনের হাসি আর বিদায়ের কান্না আলো ছায়ার মত লুটিয়ে পড়ে চারি পাশের পথে। কারণ, ক্লান্ত পথিক এই চৌমাথায় এসে মনে করে, বুঝি তার চলার শেষ হল; কিন্তু সেই পথেরই বাঁক বেয়ে বেহাগের আবাহন তাকে অন্য আর এক পথে ডেকে নেয়। তার পর সকালের পথ তাকে বিভাসের সুরে, দুপুরের পথ সারঙ্‌রাগে আর সাঁঝের পথ পুরবীর মায়াতানে পথের পর পথ ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। হায়, একি গোলক-ধাঁধা? কোথায় সে পথের বঁধু, যার বাঁশী নিরন্তর বিশ্বমানবের মনের বনে এমন ঘর-ছাড়া ডাক ডাকছে? যার অশরীরী ছোঁওয়া শয়নে স্বপনে জাগরণে সারা ক্ষণই বাইরে ভিতরে অনুভব করচি, সে শুধু দুষ্টামী করে পথই চলাচ্চে, ধরা দিয়ে ধরা দিচ্চে না? পেয়েও তবে এই না পাওয়ার অতৃপ্তি কেন? এর সন্ধান কে দেবে? যে যায় সে ত আর ফেরে না। এ অগস্ত্য-যাত্রার মানে কি?

দুঃখ বলেছে সে আমাকে ঐ পথের শেষ দেখাবে। সে নাকি আমার ঐ বঁধুয়ার সখা। কোন্ পিয়াল বনের শ্যামলিমার আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে চোখ চপল তার বাঁশী বাজাচ্ছে, তাই সে দেখিয়ে দেবে। তার সাথে গেলে সে এই লুকোচুরি ধরিয়ে দেবে। তাই দুঃখকে বরণ করেছি, তাকেই আমার পথের সাথী করেছি।”

মোস্‌লেম ভারত—ভাদ্র।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

মোসলেম ভারত।

রঙিন প্রচ্ছদটি লইয়া যেন তাজ-শিল্পীর মর্ম্ম-আসনটি পাতিয়া ভাদ্রের মোসলেম ভারত আসিয়া "নারায়ণের" দ্বারে ডাক দিয়াছে। ও আসনে বসিবার মানুষ যে এখনও কাজের দেউলে দেখা দেয় নাই, ভাই। তোমার আমার নিখিল ভারতের সে পরম দিশারী ত হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়; সে যে মানুষ। যে দিন তুমি আমি বুঝিব, সে, দেবতা আপনাকে ব্যক্ত করিতে হইলে মানুষের রূপ ধরে, সেই দিন প্রাণ শ্রদ্ধায় ভরিয়া মানুষকে ভাল বাসিতে শিখিব, বুঝিব জগতে ভাব-বৃন্দাবন যদি মূর্ত্ত দেখিতে হয় তবে হিন্দু ভুলিয়া মুসলমান ভুলিয়া মানুষকে দেখ। মানুষ যে মহাসমুদ্র, চারিদিকেই সে যে সুনীল বিস্তারে অকূলকে ছুঁইয়া বিরাজ করিতেছে,—তাই বলি, ভাই, মানুষই নমাজের মস্‌জীদ, মানুষই বরণা ও অসির সঙ্গমভূমি বিশেশ্বরের বারাণসী। হে মোস্‌লেম বঙ্গের তরুণ ঋষি মনসুর, তোমরা একবার এই যুগ-উষায় গীতছন্দে আকাশ প্লাবিয়া এই কথা বল বল মানব-জলধির মধুর মৃদুল তরঙ্গভঙ্গই এই হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব, ঈশাহিত্ব। মানুষ সবার বড়, ভগবানের পাদপীঠ; রূপ অরূপের এমন মেলামেশা—সাগর সীমায় আকাশের এমন চুম্বন আর কোথা পাইবে বল দেখি?

এবার ভাদ্রের মোসলেম ভারতে মোহম্মদ লুৎফর রহমানের "সম্রাট ও শাসন" উপভোগ্য। তাহার পর একটি উপমা-হারা কবিতা—জীবন সঙ্গীতের গায়ক শ্রীমান সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "অদরকারের না"। যখন জাতির মরা-গাঙ্গে কূল ডুবাইয়া জীবন-জোয়ার ভরা বাদরে বহিয়া আসে, তখন সে জীবন লীলায় অহৈতুক আনন্দেই পাগল, সে উতরোল জলতরঙ্গে হিসাব কিতাব থাকিলে গতির কবিত্ব—উলটপালটকরা নিতুই নব সৃজনের রাগ নষ্ট হইয়া যায়। যৌবন চিরদিনই সুখবিহ্বল, আনন্দে বিবশ রূপ দেখাইতেই তার চরিতার্থতা, জীবন মধু বিলাইতেই তার বাঁশী বাজিয়াছে। সুরেশের গানের একপদ নারায়ণের লীলার সাথী ভাই বোনদের শুনাইব—

"অদরকারের তরী মোদের
জানি কাহার শঙ্খ ঘোষে

সপ্ত সাগর ফিরবে অকারণ,
আজ যে মোদের বক্ষ হ'তে
মত্ত প্রাণের ঘূর্ণী রোষে
সকল প্রয়োজনের নির্ব্বাসন।—
ওই যে বাজে—শঙ্খ বাজে—
দিকে দিকে শঙ্খ বাজে—
বক্ষতলে শঙ্খ বাজি যায়,
ওরে নবীন তরুণ মাঝি
মাঝ দরিয়ার ঘূর্ণী মাঝে
ডুলবি যদি মরবি যদি
বাঁচবি যদি আয়।

আজ এই মাঝ দরিয়ার ঘূর্ণী বুকে এই দোলন এই মরণ এই বাঁচন জীবন-জল-বিভঙ্গে, তাই, যৌবন জল তরঙ্গে। জীবনের দোলায় ভয় কোথায়! তাহার পর হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লামের সেই অনুপম "বাঁধন হারা"। নজরুল ইসলাম অরূপ-রসের কবি তাহা জানিতাম, এবারকার "বাঁধন হারার" গোড়ায় তাহাকে প্রাই বাঘের মত কেমন যেন সুন্দর তবু ভয়ঙ্কর! কোন রস যদি অধিক হইয়া মাত্রা ছাড়ায় ছবি আঁকিতে রঙ যদি বেশি পড়িয়া যায়, লাজের অপাঙ্গে যদি বিলোল কটাক্ষ আসে, তাহা হইলে কবিত্বের হানি হয়। গোড়ায় তাহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু কোয়াটার গার্ডের হাবিলদারের ছবিটি আঁকিতে রঙ কোথায়ও বেশি পড়ে নাই। তাহার পর আবার সেই রূপ-অরূপের ভাবের রাস। এই রসে নজরুল যেমন ফোটে তেমন আর কোথায়ও নয়। এ অংশটুকু আমাদের পঞ্চপ্রদীপের ঘৃতের জোগান দিতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

উপাসনা।

কার্ত্তিকের উপাসনা—শারদীয়া সংখ্যা চিত্রসম্পদে ও নানা গুণে "বিয়ের কনে" হয়ে দেখা দিয়েছে। অবনীন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু কুমার, পুলিন ও অরবিন্দ প্রভৃতি নতুন ভারতের চিত্রকরের আঁকা প্রচ্ছদ ও চিত্রে মেয়ের গায়ে এক গা' গয়না।" অরবিন্দের 'খবরদারী' ব্যঙ্গ চিত্র—বড় চমৎকার হয়েছে, আমাদের 'ঠুঁটো' সমাজ-কর্ত্তার সমাজরক্ষা এই রকমই বটে। কলির চার পোয়া প্রায় পূর্ণ কিনা, এখন চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী, কাক তাড়াবার ভূত বানিয়ে রাস্তার গাছে গাছে

বেঁধে দেওয়া গেল,কিন্তু আহাম্মক কাক কি না সেই ভূতের মাথায় উড়ে এসে বসে ঠোকর মারে। আমরা ত্যাগ ভোগের সমন্বয়বাদী জীবনপন্থীর দল নাকি কলির অগ্রদূত! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কলির না সত্যের? শ্রীমান অরবিন্দ দত্ত আমাদের সুলেখক অতুলদা'র ছেলে, তাকে আমাদের অনুরোধ যে রঙের তুলিটা এই রকম কুঠার করে সে বেরিয়ে পড়ুক, একটা মারমুখো পরশুরাম বড় দরকার হয়েছে।

এবারকার 'আলোচনা' বড় সুন্দর হয়েছে। এটা হ'ল বিলেত-ঘেঁসা ঐ সব দেশে প্রজাতন্ত্রী যুগান্তরের কথা। তার শেষ চারটি লাইন তুলে দিই -"নারায়ণের উদ্বোধন কর। ভারতবর্ষ, তুমি যাঁহার স্থূল শরীর, তাঁহাকে আর একবার জাগাও, তোমার মনোময় রূপটিকে আর একবার ধ্যান কর,—মহালক্ষ্মীকে তুমিই বরণ করিতে পারিবে, অশান্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে তুমিই বিশ্বকে রক্ষা করিবে। নমো নারায়ণায়।" সুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্তের "সাময়িক সাহিত্যে" অনেক ভাববার কথা আছে,—"শ্রুতি মধুর নাচুনী ছন্দে ভাববিহীন শব্দ সম্ভারযুক্ত কবিতা"র বেণোজলে সত্যই আমরা আজকাল বিপদগ্রস্ত হয়ে আছি। এই শব্দের খেমটানাচের জন্মদাতা কবি দ্বিজেন্দ্র লাল, তাঁর মধ্যে তবু বস্তু ছিল, এখন এই কাক তাড়ানে কাঁসি বাদ্যে না আছে ভাব না আছে তত্ত্ব-মাধুর্য্য। কিন্তু গদ্যে বল কবিতায় বল নতুন কথা বলবে কে? ওস্তাদের বীণা ও পাখোয়াজ যে আর নাই, এখন যে বায়স্কোপ গ্রামোফনের "নকলী" যুগ!

হেমন্ত কুমারের "মরণ লীলা" আর অতুল বাবুর "উভয় সঙ্কট" এবার উপাসনার গলার হেমহার। "উভয়-সঙ্কট" প্রতি গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মীর পড়া দরকার। একটা মটর গাড়ীর পেছনে একটা মান্ধাতার আমলের গরুর গাড়ী জুড়ে দিয়ে হাঁকালে, যে প্রহসনের অভিনয় নয়, আমাদের ঘরে ঘরে নব্য শিক্ষিত সহুরে কর্ত্তা আর সেকেলে গৃহিণীর নিত্যকার জীবন ঠিক তেমনি হয়ে আছে। মটরের টানে গরুর গাড়ির প্রাণান্ত, আর গরুর গাড়ির ভারে মটরেরও খানায় ডোবায় কর্দ্দম-সমাধি।

পদচারণ।

কবিতার বই, গ্রন্থকার "সবুজপত্রে"র সম্পাদক, নবতন্ত্রের সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। মূল্য ৸৹ বার আনা। গ্রন্থকারের নিকট ৭।১ সানি পার্ক, বালিগঞ্জে, সবুজ পত্র অফিস ৩নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে এবং কমলা বুক ডিপো, ১৯৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

প্রমথ বাবুর কবিতা সত্যই "গন্তের কলমে লেখা"। এ মানস বালার অঙ্গে রত্ন অলঙ্কার কপালে কাঁচ পোকার টিপ সীঁথায় সিঁদুর পায়ে রাঙ্গা আলতা নাই, সন্তর্পনে স্নিগ্ধ বধূর পদক্ষেপের মত কবিতাগুলি সাদাসিধা রূপেতরা। কতকগুলি কবিতা শুধু বোঝাপড়ার কথা। কবি বলেন এ যুগে কবিরা—

গলা চেপে গায় প্রেমের গান
ভয়ে ভয়ে ছাড়ে প্রাণের তান

• • •

কবিতা কয়েদী, রাধার মত
দায়ে পড়ে করে গৃহিণী ব্রত।
বাঁশী বাজে বনে বসন্ত রাগে,
জটিলা কুটিলা দুয়ারে জাগে

সত্য সৃষ্টির মধ্যে নিছক আনন্দই আছে, নীতি আর রুচির দীঘল ঘোমটা সেখানে সাজে না। ভগবান আদৌ নীতির মরালিষ্ট নয়, কারণ সে যে সবার বড় কবি।

পদচারণের কবি বড় কথার সাজ সজ্জা ভাল বাসেন না,

ঢের ভাল তার চেয়ে • চলে যাওয়া গান গেয়ে
আপনার মনে
পলে পলে যাহা ফুটে, দলে দলে যায় টুটে
হৃদয়ের বনে।

তাঁর কবিতা সাদা মাধবী ফুল। কিন্তু রঙের কবি, রূপ-জৌলসের কবি অভিসারের প্রসাধনের কবিও ত আছে। ভগবানের লীলার গানে যে মূর্চ্ছনা গিটকারী তাল লয় সঙ্গতের অন্ত নাই। কবির কথায় বলি

মাটি আর আলো নিয়ে দিতে চাই ছুয়ে ঘিরে
সসীমে অসীম।

এই মাটির মধ্যেই রঙের ছড়াছড়ি শব্দ গন্ধের কত পাগলামি না ঘুমন্ত আছে। প্রমথনাথের দু' একটি কবিতায় সৃষ্টির জগৎ-ছন্দ ধরা পড়েছে, তা' অনুপম!—

পাও যদি খুঁজে কোথা অসীমের সীমা
দেখিবে সেথায় আছে দাঁড়ায়ে প্রতিমা॥

"ভাল তোমা বাসি", "প্রেমের খেয়াল" আর "কবির সাগর সম্ভাষণ"

বড় মধুর—ঐকটি লিখতে তাঁর অন্তর-দেউলের দুয়ার খুলেছিল। একটি এখানে না দিয়ে পারা গেল না—

প্রেমের খেয়াল।

প্রেমের দু'চার কবিতা লিখেছি
লিখিনি গান।
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি
শিখিনি তান।
কত না শুনেছি প্রণয় কাহিনী
কত না শুনেছি প্রেমের রাগিণী
পাতিয়া কান।
আপন মনের কখন গাহিনি
কাঁপান গান।

* * * *

তূরীতে ভেরীতে কখনো বাজেনা
তরল তান।
গরীব শরীরে কখন সাজে না
জরীর থান।
আছে যা' লুকায়ে ভাষার অন্তরে,
পার যদি দিতে মনের যন্তরে
হাল্‌কা টান,
তবে তা' আসিবে সুরের মন্তরে
ধরিয়া প্রাণ।
থাকে না কবির সাজান ভাষায়
ফুলের ঘ্রাণ
পড়ে না কবির সাজান পাশায়
মনের দান।
করো যদি তুমি আকাশ ফুলের
করো যদি তুমি অনন্ত ভুলের
মদিরা পান।
তা হলে গাহিবে প্রাণের মূলের
রসের গান।

প্রবর্ত্তকের নূতন বই।

আমাদের নব যুগের রসের .ভালুইকর/প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস আরও কতকগুলি নূতন মিষ্টান্ন দিয়েছেন,. তার মাধুর্য্য বলবার নয়, আস্বাদন করে বুঝবার। কারণ সেগুলি অরবিন্দের লেখা। অরবিন্দ এ নব জাগরণের ঋষি, জীবন-ছবির শিল্পী, মন্ত্রায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার দেবতা। তার লেখা বিশ্লেষণ করে দেখবার জিনিস নয়, অমৃত হাতে নিয়ে কে বিচার করতে বসে'বল? শুধু মানুষ খেয়ে বর্ত্তে যায়, সব ব্যর্থ বেদনাই চরিতার্থ করে নেয়। বইগুলির নাম ও দাম নীচে দিলাম; সবগুলিই ভবির.জমকাল সাজসজ্জা পরে উৎসববেশে .বাঁধাই হয়ে পাঠকের লোভে এসে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছা বইল এক দিন এ অমৃতের কিছুকিছু নারায়ণে দেব।

১। ধর্ম্ম ও জাতীয়তা—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

২। The Renaissance in India

ভারত জাগরণ—

৩। গীতা— ১।০ এক টাকা চার আনা।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়।

এক সত্যে হিন্দু-মুসলমান—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই উপদেশগুলি মহম্মদ খলিলর রহমান কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সোল এজেন্ট 'দি নিউ ইরা পাবলিসিং হাউস', ১৬৮ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৶০ আনা।

হিন্দু মুসলমানের মিলন উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিত। মহম্মদীয় ধর্ম্ম যে প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য ধর্ম্মের বিরোধী নহে তাহা গ্রন্থকার কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ঈশ্বরীয় বাণী অনন্ত, কোরাণেই যে ঈশ্বরের যাবতীয় ভাব ব্যক্ত হয় নাই, কোরাণ যে সকল সত্যের সন্ধান দিয়াছে তাহা ছাড়াও যে কত শত শত সত্য আছে তাহা কোরাণই স্বীকার করত স্বীয় অক্ষমতার সঙ্গে সেই অনন্ত পুরুষের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।" যে কেহ, যে কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, ঈশ্বর লাভের জন্য তাহাদের সকলের সাধনা এক হইতে পারে।" "কোরাণাদি পাঠ

বা মুখস্থ করিলেই উহার তাৎপর্য্য গূঢ় অর্থ বুঝা যায় না। কাঙ্গাল পীরেরা কোরাণাদির ভাষা না জানিলেও মর্ম্ম জানেন।" "মানুষের অন্তরের দেবতা যেমন এক, তেমনি বাহিরেও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হউক, সর্ব্বত্র মহাশান্তি বিরাজ করুক।"

পুস্তিকাখানির বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর। অধিকাংশ উর্দ্দু শব্দেরই ফুটনোটে বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে বাঙলা প্রতিশব্দ যেখানে পাওয়া যায় সেখানে উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার না করাই ভাল।

হাসির তোড়া—শ্রীমোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য বি, এ প্রণীত। মূল্য ৷৹ বার আনা। ঘোড়ামারা, রাজসাহী—এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের তিরোভাবের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্য হইতে হাস্য-রসের তিরোভাব হইয়াছিল। "হাসির তোড়ায়" সে অভাব কিয়দংশ দূর করিবে। সমাজের মধ্যে যত প্রচ্ছন্ন কপটতা ও 'ন্যাকামি" আছে কবির নিপুণ তুলিকাস্পর্শে গ্রন্থখানিতে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাসি স্বাস্থ্যের চিহ্ন। আশা করি এই বইখানি পড়িয়া বাঙালীর নিরানন্দ প্রাণে একটু হাসির তরঙ্গ উঠিবে।

মহাজন-সখা—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ কর্ত্তৃক চন্দননগর হইতে লিখিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

এই পুস্তকে বাংলা ও বেহারের প্রধান প্রধান হাট বাজার ও মোকামের বিবরণ ও তথায় কোন্ জিনিসের কত আমদানি ও কিরূপভাবে খরিদ ও চালান হয় ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। ব্যবসারের দিকে আজকাল বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই মতিগতি হইয়াছে; তাঁহাদের এ পুস্তক খানি বিশেষ কাজে লাগিবে।

রাজা সলোমনের রত্নাগার—শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনূদিত ও ২৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ভারত পরিষৎ লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানি সার হেনরি রাইডার হাগার্ডের King Solomon's Mines নামক ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদ। যাঁহাদের ইংরাজী ভাষার সহিত পরিচয় নাই তাঁহারা পুস্তকখানি বেশ উপভোগ করিবেন। ভাষা প্রাঞ্জল ও গল্পাংশ চিত্তাকর্ষক, বিশেষতঃ ইহাতে নায়ক নায়িকার ছড়াছড়ি নাই বলিয়া পুস্তকখানি বালকদেরও উপযোগী, বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর।

ঘর ও পর—শ্রীবসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। বি, এ ভাণ্ডার, গোন্দলপাড়া চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মার্কেটে ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাবে পাওয়া যায়।

পুস্তকখানির নাম "ঘর ও পর", কিন্তু ইহার আলোচ্য বিষয় সহানুভূতির সূত্রে গাঁথিয়া নূতন করিয়া সমাজ গঠন। ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে কি করিয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ও অল্পব্যয়ে শিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে, গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল হয়, কৃষকদিগের অর্থাগম হয়—এ সমস্ত বিষয় অল্প কথায় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সহজ এবং এ যুগের যাহা মূল কথা—সমষ্টিগত জীবন গঠন—সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থকার সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণের মধ্যে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

স্বদেশ রেণু—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।/০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

বাঙ্গালার ছেলে মেয়ে মায়ের কোলে শুইয়া শুইয়া "ছেলে ধরা" আর "জুজুবুড়ীর" গল্প শুনিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইতে আরম্ভ করে; সে ভয় আর শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত তাহাদের ছাড়ে না। ছেলে বেলা হইতে যাহাতে তাহাদের মনে একটু সাহস ও স্বজাতি-প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া ভবিষ্য জীবনে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলে, সেই উদ্দেশ্যে এই "ছড়া" গুলি রচিত। বাঙালীর ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীদের হাতে হাতে এই পুস্তিকাখানি বিরাজ করুক।

কর্ম্মের পথে—স্বামী স্বরূপানন্দের কতকগুলি উপদেশের সংকলন। চাঁদপুর, ত্রিপুরান্বিত কল্পতরু পাব্লিশিং হাউস হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য /১০ পয়সা।

উপদেশগুলি স্বামীজীর লিখিত পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"দেশ চায় মানুষ। যে মানুষ অশনি-আঘাতে নতশির হইয়া পড়িবেন না, যাঁহার তেজস্বিতা বিভীষিকা দেখিয়া ম্লান হইবে না, কামন-কলুষে জীবন-সাধনকে যিনি বিসর্জ্জন দিবেন না—দেশ চায় তেমন মানুষ। দেহ যাঁহার বজ্রের ন্যায়, বীর্য্য যাহার অপরিমেয়, মনুষ্যত্ব যাঁহার অভ্রভেদী, দেশ তেমন মানুষ চায়। দেশ চায় তোমাকে,—জাগ্রত তোমাকে—কর্ম্মের তোমাকে,—আত্মশক্তিতে চির-বিশ্বাসপরায়ণ তোমাকে। স্বদেশ তোমার সাধনা চায়, পতিতের উত্থানলাভে তোমার আত্মোৎসর্গ চায়।"

"মানুষ মানুষের 'দাস' নয়, সে তাহার স্নেহানুলিপ্ত কনিষ্ঠ। মানুষ মানুষের 'প্রভু' নয়, সে তাহার শ্রদ্ধাভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ। ভ্রাতায় ভ্রাতায় লঘু-গুরুর বিচার নাই, মনিব-গোলামের সম্বন্ধ নাই, একের হৃদয় অপরের হৃদয়কে অনুদিনই স্নেহের অনপনেয় বেষ্টনে আবরিয়া রহে।"

"বিশ্বের নেতৃত্ব যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি তোমাদের আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, শুধু আত্মোৎসর্গের প্রচণ্ড চেষ্টার মধ্য দিয়া তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবেন। পতিতোদ্ধার যাহার জীবনের ব্রত নয়, জনসেবার যূপকাষ্ঠে সকল স্বার্থকে যে বলি দেয় নাই, লাঞ্ছিতের বিষণ্ণ বয়ানে, নিরন্নের বিদগ্ধ জঠরে—আহতের শোণিতস্রাবে নিজের অস্তিত্বকে যে জন সর্ব্বময় দেখে নাই, তাহাকে নেতা বলিয়া মানিব না।"

"যে শিক্ষা আত্মসম্ভ্রমকে জাগাইল না, সে শিক্ষা কু-শিক্ষা। যে শিক্ষা স্বতন্ত্রবুদ্ধির বিকাশ করিয়া দিল না, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ! যে শিক্ষা পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচাইল না, সে শিক্ষা ব্যর্থ।

"যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী নিঃস্বার্থ পুরুষ, তাঁহাদেরই অস্থিখণ্ডে বজ্র নির্ম্মাণ হয়।"

ত্যাগ ও ভোগ।

[শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

আমাদের একটা কলঙ্ক রটিয়াছে যে আমরা নাকি ভোগবাদ প্রচার করিয়া ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক সাধনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বসিয়াছি। ত্যাগধর্ম্মী সাধুপুরুষেরা অনুমান করেন যে ভগবৎকৃপায় রাজনৈতিক আন্দোলনের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিলেও আমরা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য মোহ হইতে বিমুক্ত হইতে পারি নাই বলিয়া ধর্ম্মের মহান্ ও বিশুদ্ধ আদর্শটীর সন্ধান এখনও পাই নাই।

না পাইবারই কথা। ধর্ম্ম যে রাজনীতির ভয়ে মঠের মধ্যে ঢুকিয়া গেরুয়ার আড়ালে লুকাইয়া আছেন, এ সংবাদ ত আমরা জানিতাম না।

ত্যাগ আর ভোগ—এই দুইটা কথা লইয়া ল্যাঠালাঠি করিলে ত সে বিবাদ কোন কালে মিটিবে না, সুতরাং এই দুইটা কথার মূলে কি ভাবটা আছে তাহা একটু বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। যাঁহারা তথাকথিত ত্যাগবাদী তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদটা আচার্য্য শঙ্কর বেশ স্পষ্ট করিয়া অর্দ্ধশ্লোকেই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

"ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন"। জগতটা শুধু অজ্ঞানেরই নামান্তর! ইহার কোন পারমার্থিক সার্থকতা নাই। জগতের সম্বন্ধে ইহার মিথ্যাত্ব জ্ঞানই চরম জ্ঞান, জগতে মানুষের কর্মের সার্থকতা ঐ জ্ঞানটুকু লইয়া, ঐ জ্ঞানটুকু হইলে আর কর্মের প্রয়োজন নাই। জগৎ যখন মিথ্যা এবং ব্রহ্ম যখন সত্যস্বরূপ তখন জগতের সহিত সর্ব্ব সম্বন্ধ ত্যাগ না করিলে যে ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ অসম্ভব—ইহাই মায়াবাদের সিদ্ধান্ত। তবে ত্যাগপন্থীদের শাস্ত্রে যে কর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায় সে শুধু নিম্ন অধিকারীর চিত্তশুদ্ধির জন্য। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম-বাসনা কাটিয়া গিয়া চিত্তশুদ্ধ হইবে এবং চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মলাভ হইয়া যাইবে,—এই আশায় কর্ম্মের ব্যবস্থা। কিন্তু উচ্চ অধিকারীদের পক্ষে বিষয়সঙ্গ ত্যাগই ব্রহ্মলাভের প্রকৃত পন্থা। বৈরাগ্যই মুমুক্ষুর লক্ষণ।

এ মতবাদে 'জগতের উন্নতি' বলিয়া কোনও জিনিসের স্থান নাই। জগতটা চিরদিনই ট্যাড়া বাঁকা অশুদ্ধ ভ্রমসঙ্কুল রহিয়া যাইবে। কুকুরের ল্যাজের মত একবার টানিয়া সোজা করিয়া দিলেও পরক্ষণেই স্বভাবগত ধর্ম্মে উহা আবার বাঁকিয়া যাইবে। গোড়া খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদেরও জগৎ সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ ধারণা; আর আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে সোপেনহরও জগতকে এই চক্ষে দেখেন।

এই ত গেল ত্যাগধর্ম্মীদের কথা। এখন যাহাদের নামে এই ত্যাগী পুরুষেরা নাক সিঁটকাইয়া উঠেন তাহারা কি বলে দেখা যাক্। সকল দেশেই প্রাকৃত লোকে জিহ্বোপস্থ পরায়ণ। শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হইলেই তাহারা আর বড় একটা কিছু চায় না। ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই ইহাদের পক্ষে প্রধান ভোগ। কিন্তু প্রশ্ন এই, ভোগ বলিলে কি ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ মাত্র বুঝিতে হইবে? সুখ কি শুধু ইন্দ্রিয়গত? সুখের জন্য ত সকলেই লালায়িত। ত্যাগের খাতিরে ত্যাগ ত কাহাকেও করিতে দেখি না। যে বিষয়ে জীব সুখ পায় না, সে বিষয় ত্যাগ করিয়া সে অন্যত্র সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়। যে আপনার শরীরকে কষ্ট দিয়া স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দিনরাত খাটিয়া মরে, আপনার শরীর লালন পালন অপেক্ষা স্ত্রী-পুত্রের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই তাহার সুখ। স্ত্রী-পুত্র, ঘর সংসার ছাড়িয়া দেশের জন্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কাঁচা মাথা বলি দেয়, দেশের সহিত একাত্মবোধেই তাহার সুখ। বাস্তবিকই যাহার যেখানে একাত্ম বোধ, সেইখানেই তাহার সুখভোগের কেন্দ্র। যাঁহারা ঘর বাড়ী, মা বাপ ছাড়িয়া, নিজের প্রাণশক্তি শেষ করিয়া, মঠে বাস করিয়া মনে করেন—'সংসার ছাড়িয়া

আসিয়াছি',—তাঁহাদের পক্ষেও ঐ এক কথা। ভগবানকে লাভ করিবার সুখ বা সুখের আশা যদি তাঁহাদের না থাকিত, তাহা হইলে মঠভানী সৌধগুলি বনজঙ্গলে পরিণত হইয়া শিয়াল কুকুরের আড্ডা হইয়া উঠিত। ব্রহ্মপুরুষ যদি আনন্দময় না হইতেন, সুখভোগ বাসনা তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা যদি তাঁহার না থাকিত, তাহা হইলে কেই বা তাহার জন্য নাক টিপিয়া বসিত? কেই বা মায়া কাটাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিত? ব্রহ্মের সহিত একাত্মবোধ জনিত আনন্দ, ইন্দ্রিয়ের বা মনের ভোগ নহে, আত্মার ভোগ। মায়াবাদীরা নিজেও তাহা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—'ত্যাগমার্গ আর কিছুই নহে—উহা ক্ষুদ্রতম ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তম ভোগ্যবস্তু পাইবার উপায় মাত্র।'

কিন্তু বৃহত্তম ভোগ্যবস্তু কি? মায়াবাদী আচার্য্য শঙ্করের নজীর দেখাইয়া বলিলেন "নির্গুণ ব্রহ্ম। ইহাই মানুষের চরম অনুভূতি।" কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। শাস্ত্র, মহাপুরুষের বাক্য, এমন কি ঠাকুর রামকৃষ্ণের নজীর দেখাইয়া আমরা বলিতে পারি—"ব্রহ্মের ইতি করা যায় না।" ঠাকুরের নিজের অনুভূতিই ত বেদ বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, নির্ব্বিকল্প সমাধিই অনুভূতির চরম কথা নহে। "নেতি, নেতি" করিয়া অদ্বৈত উপলব্ধিই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য নহে। তাহার পরেও একটা "ইতি, ইতি" অবস্থা আছে। উহাকে নির্দ্দেশ করিয়াই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—'বেলের বিচি, খোলা ফেলিয়া শুধু শাঁসটুকুর হিসাব রাখিলে ওজনে কম পড়ে।'

ব্রহ্ম যে জন্য জগৎরূপে বিবর্ত্তিত, তাহা নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন, খামখেয়ালি ব্যাপার নহে। জীব আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিলেই জগতটা উড়িয়া যায় না। ব্রহ্ম উপলব্ধির পর জীব জ্ঞানতঃ ভগবানের লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয়, এবং ব্রহ্মের শক্তি জীবের মধ্যে তখনই ফুটিয়া উঠে। মন, বুদ্ধি, এমন কি শরীর পর্য্যন্ত তখন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্রহ্মানন্দে ভরিয়া যায়। মুক্ত ভাবে কর্ম্মের তখনই যথার্থ আরম্ভ। উহাই জীব-লীলার সার্থকতা। উহাই একাধারে ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ। ঐ অবস্থাকেই আমরা যথার্থ ভোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। ক্ষুদ্রতর ভোগের সহিত ত্যাগ ও বিচ্ছেদের সম্ভাবনা জড়িত। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা হইতেও নিম্নভূমিতে আসিয়া ত্যাগ বা বিচ্ছেদের যন্ত্রণা পাইতে হয়। কেবল, ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ যে অবস্থায় একীভূত তাহার আর বিরাম নাই। ঐ চরমভোগকেই

আমরা ধর্ম্মের পূর্ণাদর্শ বলিয়া মনে করি। ত্যাগপন্থীদের আদর্শ আংশিক ও অঙ্গহীন।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে সাধনের অবস্থায় কি ত্যাগের আবশ্যকতা নাই? মনকে ব্রহ্মমুখী করিবার পথে বিষয়সঙ্গ কি বাধা নহে? এ কথার উত্তরে আমরা বলি যে সৃষ্টি যদি ব্রহ্মের আত্মবিস্তারের ফল হয়, ত ব্রহ্মের সহিত বিষয়ের এরূপ একান্ত বিরোধী সম্বন্ধ স্থির করিবার কোনও কারণ নাই। যিনি এক, তাঁহার বহু হইবার প্রয়াসেই যদি সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে ত বহুর মধ্যে একের অনুভূতি সম্ভবপর হইবে না কেন? সৃষ্টি ও সৃষ্টি-কর্ত্তার মধ্যে এ সাপত্ন্যসম্বন্ধ কোথা হইতে আসিবে? প্রকৃতপক্ষে আমরা বিষয়ের স্বরূপও যথাযথ ব্যবহার জানিনা বলিয়াই বিষয়কে আমরা বাধা বলিয়া মনে করি। বিষয় আমাদের কর্ম্মের উপাদান। আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ যেখানে উহা আমাদের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে তাহার একমাত্র প্রতীকার আমাদের জ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধি করা, আপনাদের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া সে বাধা অতিক্রম করা। বিষয়কে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করিয়াই ব্রহ্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে হয়, বিষয়কে বর্জ্জন করিয়া নহে। বিষয়ের মধ্য দিয়া বিষয়াতীতকে পাইয়া মুক্ত ভাবে বিষয় ভোগই প্রকৃত পন্থা। বিষয়কে যাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সংসারে বিষ ও অমৃত বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কিছুই নাই। এক অবস্থায় যাহা বিষ, অবস্থান্তরে তাহাই অমৃত। যাহারা সাধন পথে অগ্রসর হইবার সময় বিষয় বর্জ্জন করিয়া চলেন, বিষয়ের প্রকৃতরূপ তাঁহাদের নিকট কখনও আত্মপ্রকাশ করে না; ব্রহ্মের পূর্ণরূপও তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। ভগবানের জগত লীলার শক্তি-কেন্দ্র হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে ক্ষুদ্রভোগের মধ্য দিয়াই মহত্তর ভোগের অধিকারী হইতে হয় এবং সর্ব্ববিষয় ভগবানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবানের লীলাকেন্দ্ররূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের চরম ভোগ।

এই ত ভোগের আদর্শ। কিন্তু আর একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা কথায় কথায় ত্যাগধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিয়া তথাকথিত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের আস্ফালন করেন, তাহাদের মুখের কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া আমাদের পক্ষে ভোগ ও ত্যাগের অর্থবোধ করাই দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। সাদা কাপড় ছেঁড়া হইলেও তাহার নাম ভোগ, আর গেরুয়া

বেণারসী শিল্কের হইলেও তাহার নাম ত্যাগ। যে দেশে পর্ণকুটীরের মধ্যে শাকান্নের নাম ভোগ সে দেশে মঠনামধারী প্রাসাদের মধ্যে লুচি, মোহনভোগ, চা, বিস্কুট ও সিগারেটের নাম ত্যাগ। বুড়া বাপ, স্ত্রীপুত্র, অনাথা ভগ্নী বা বুড় পিসি খুড়ীর জন্য দিন রাত শত লাঞ্ছনা সহিয়া হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের নাম ভোগ, আর নিদ্রালস চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঐ ঘৃণ্য ভোগ-পন্থীদিগের প্রদত্ত ভিক্ষালব্ধ অর্থে সখের দরিদ্রনারায়ণসেবার নাম ত্যাগ।" 'ভোগের চিত্র অপেক্ষা ত্যাগের চিত্রটা যে আমাদের দেশে বিশেষ ভাবেই উজ্জ্বল—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। হায়রে—

"কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস, গেরুয়ার বিলাসিতা!"

যাহারা সংসারের বোঝা ঘাড়ে করিয়া, শীর্ণ ক্লিষ্ট বুভুক্ষিতের উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য হাসিমুখে দেহপাত করিতেছে, আর যাহারা সে বোঝা পরের ঘাড়ে নামাইয়া দিয়া, পরান্নে উদর পূর্ত্তির ব্যবস্থা করিয়া সংস্কৃত শ্লোক বানাইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে যতি সূর্য্যসমপ্রভ ও গৃহস্থ তাহার নিকট খদ্যোৎ তুল্য—এ উভয়ের মধ্যে কে বেশী ধর্ম্মাত্মা? সমষ্টিকে ত্যাগ করিয়া ব্যষ্টির নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও উহা পারলৌকিক স্বার্থপরতার চূড়ান্ত সীমা।

প্রতিপক্ষ হয় ত বলিবেন—"জীবন সংগ্রামে ভীত বা ঐহিক স্বার্থসাধনেচ্ছু ব্যক্তিও যদি ত্যাগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমাজকে ও নিজেকে প্রবঞ্চনা করে, তবে ঐ প্রবঞ্চকের উপর দোষারোপ না করিয়া ত্যাগের মহান আদর্শের উপর কলঙ্কক্ষেপণ করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য?" আমরাও ত প্রতিপক্ষের কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে পারি—"কেহ যদি রাজর্ষি জনক হইবার পূর্ব্বে মুখের কথায় ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে প্রতারিত করে, ত তাহার জন্য কি জ্ঞান ও কর্ম্মের, ভোগ ও মোক্ষের সামঞ্জস্যের কথা মিথ্যা হইয়া যায়? দুই এক জনের দুর্ব্বলতার জন্য কি ভুক্তিমুক্তির মহান আদর্শে কলঙ্ক ক্ষেপন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য?" রাজর্ষি জনককে যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সামঞ্জস্যের জন্য ত্যাগ মার্গ অবলম্বন করিয়া হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হইয়া তপস্যা করিতে হইয়াছিল, এ কথা কোন সংসারে লেখে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে যোগ-যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য অতখানি উপদেশ দিলেন, তাহার মধ্যে এ কথা ত কোথাও বলেন নাই যে সে উপদেশ সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য তাহাকে পায়ে শিকল বাঁধিয়া হেঁটমুণ্ড হইয়া কিছুদিন ঝুলিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিয়া কথাটা চাপা দিলে ত চলিবে না; পূর্ব্বজন্মে তিনি ত্যাগপন্থী মোহান্ত ছিলেন।

এ কথা যদি ধরিয়াই লওয়া যায়, ত এ জন্মে সে ত্রুটি শুধরাইয়া লইবার জন্য তিনি যে কয় গণ্ডা বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গীতাতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল এমন ত মনে হয় না। ঋষিদের মধ্যে দেখিতে পাই অধিকাংশই বিবাহিত। যাজ্ঞবল্ক্যের একটা নয়, দুইটা বিবাহ। বেদব্যাস বিবাহিত; অধিকন্তু রাজবংশ লোপ পাইবার আশঙ্কা হইলে নিয়োগের জন্যও তাঁহার ডাক পড়িত। অথচ তিনি বেদবিভাগকর্ত্তা এবং পুরাণ ও মহাভারতের রচয়িতা। বশিষ্ঠের মা ষষ্ঠীর কৃপায় একটী শত সন্তান। তবুও রামকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি মঠ হইতে সন্ন্যাসী আমদানি করেন নাই। মোট কথা বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে "ত্যাগ পিশাচিকা" এ দেশের ঘাড়ে এত জোর করিয়া চাপিয়া বসে নাই।

আরও মজার কথা এই যে বুদ্ধদেব ত ছেলেবুড়া সকলকে দুঃখময় সংসার ছাড়িয়া নির্ব্বাণে লয় পাইবার ব্যবস্থা দিয়া গেলেন। আর আজ তাঁহার জন্য যাহারা ওকালতি করিতে নামিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে বুদ্ধদেবের শিক্ষার ফলেই নাকি ভারতবর্ষ ধনধান্যে, ঐশ্বর্য্য সম্পদে, জ্ঞান গরিমায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল! বটে!

সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রগুপ্তের সময় দেশ সনাতন আদর্শ ভ্রষ্ট হয় নাই, চাণক্যের উপর বুদ্ধদেবের ছায়া আসিয়া পড়ে নাই। সেই জন্যই গ্রীকদের হাত হইতে সে যাত্রা লোকে রক্ষা পাইয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা অশোকের বৈরাগ্য অবলম্বনের সঙ্গে দেশের পরাধীনতার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না—এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামক পুস্তিকায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, স্বামীজীর চটিজুতা পূজার পরিবর্ত্তে সেই কথাগুলি ফ্রেমে বাঁধাইয়া দেশের মঠে মঠে টাঙ্গাইয়া রাখিলে, বোধ হয় স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি অধিক সম্মান দেখান হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে সময় হইতে দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে বসিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া শক ও হুন জাতি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরে নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল দেখিয়াই ঋষিরা নূতন ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করেন। যে আদর্শ লইয়া এই নূতন অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করা হয় তাহার সহিত যে বুদ্ধ প্রচারিত বৈরাগ্য ধর্ম্মের সম্বন্ধ মাত্র নাই, একথা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। ঐ ক্ষত্রিয়কুল যদি ত্যাগপন্থী সংসারবিরাগী হইত, তাহা হইলে এতদিন হিন্দুজাতি যে নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়া থাকিত তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

ত্যাগপন্থীরা অনেকে বলেন—"কাল প্রভাবে ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে!" 'কাল' বেচারা কি করিবে? আমরা আজ যে বীজ বপন করি, কাল তাহারই ফল দেয় মাত্র। কাল ত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

ফল দেখিয়াই, বৃক্ষের গুণাগুণ নির্ণয় করা প্রশস্ত। আমাদের কথা যদি শুধু মতবাদ মাত্র না হইয়া অনুভূতিলব্ধ সত্য হয় তাহা হইলে অচিরেই সমাজ ইহার ফলাফল দেখিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে। এখন শুধু এইটুকুই আমাদের বক্তব্য যে ব্রহ্ম যে শুধু গুণাতীত তুরীয় সত্বা নহেন, তিনি যে গুণময় ও গুণভোক্তা, সবজীবই যে তাঁহার লীলাকেন্দ্র—এ সত্য উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার দিন আসিয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এই সত্য প্রতিফলিত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিবে।

চিত্র।

[শ্রীঅনাথনাথ বসু।]

প্রত্যূষ।

আমার এক প্রিয় আত্মীয়ের শবদেহ নিয়ে যখন শ্মশান ঘাটে এলাম তখন সূর্য্য ওঠে নাই। ঊষার সলজ্জ হাসিটী বাসরের মধুর রাত্রি প্রভাতের হাসিরই মত নির্ম্মল, সুন্দর। কলিকাতার গঙ্গার গর্ভ তখনও শীতের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট।

আমি দাঁড়িয়ে সেই শ্মশানের দৃশ্য দেখ্‌ছিলাম। আমার সঙ্গীরা চিতায় আগুন দিয়ে একটু দূরে তীরে বসে গল্প কচ্ছিলেন্। চারিপাশে চিতার রাশি সাজানো রয়েছে; কোথাও আগুন লেলিহান শিখা বিস্তার করে জ্বলে সেই প্রথম প্রভাতের অন্ধকার আলোটাকে রক্তরাগোজ্জ্বল করে তুল্‌চে, কোথাও বা সদ্য-নির্ব্বাপিত চিতার ভস্ম তুলে আত্মীয় প্রেতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ কর্চ্চে। কোথাও একজন বসে গতজীবন প্রিয়ের উদ্দেশ্যে অশ্রুসিক্ত নয়নে তার চিতার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে সেই মিলন বিরহের করুণ কাহিনীর মূর্ত্ত আকার দেখ্‌ছিলাম্।

সেই অতি পুরাতন শাশ্বত দিনের প্রশ্ন আবার মনে জেগে উঠ্‌লো। আমার

প্রিয় আজ আমার কাছে বসে আছ; কাল সে কোথায় থাকবে? দর্শন বিজ্ঞান সেটা ত' কোন দিন ঠিক্ করে বলতে পারে নি। কে যে সে কথা আমায় বলবে সেটা যে আমি বুঝ্‌তে পারি না। এত মিলন, এত বিরহ, এত সুখ দুঃখ ত্যাগ আশা এ সবার অবসান কোথায়? এত স্নেহ এত ভালবাসার সমাপ্তি কি ঐ একটা ছোট্ট প্রাচীর ঘেরা যায়গাটীতেই?

পাশে এসে একজন কে দাঁড়াল। তার দিকে ফিরে চাইলাম। এ দৃশ্য কি আমি কখনো জীবনে ভুলতে পার্‌বো? আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন বেশ্যা, তার তরুণ যৌবন, অরুণবরণরূপ—কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের মধ্যেও এমন একটা কিছু ছিল যেটা আমায় বলে দিয়েছিল, এ সৌন্দর্য্য গৃহের শ্রী নহে—এ পণ্য। তার মুখ একটু শুষ্ক, বিরস। তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল একজন বৃদ্ধা—তার হাঁকডাক শুনেই বুঝ্‌তে পারা গেল সে বাড়ীওয়ালী।

সেই ছোট্ট মেয়েটী,— কারণ মেয়ে ছাড়া তাকে আর কি বোলবো—তার কোলে একটী কাপড়ে জড়ানো কি রয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম সেটা কি? গা শিউরে উঠ্‌লো।

বৃদ্ধা গলার জোরে শীঘ্রই ছোট্ট একটুর চিতা সাজিয়ে নিল, আমি সরে দাঁড়ালাম। শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটী ঠিক্‌ই ছিল কিন্তু এবার যখন বৃদ্ধা তার হাত টেনে বল্ল—"নে, ওঠ্‌ এইবার শুইয়ে দে—অনেক দেরী হয়ে গেল"—তখন আর সে পারে না। তার চোখের দিকে চেয়ে দেখি চোখভরা জল। মনে হল যেন একবার সে সেই পুটুলিটাকে মুখের দিকে তুলছিল, বৃদ্ধা এতক্ষণ অন্যদিকে ব্যস্তছিল, দেরী দেখে যেমন মেয়েটীর দিকে চেয়েছে অমনি সে নামিয়ে নিল। তারপর যখন চিতার উপর শুইয়ে দিল, ওঃ সে কি কান্না—সে কান্নার শব্দ নেই, ছিল শুধু মৌন চোখের জল। ব্যক্তিতেই শান্তি, কিন্তু সে কেমন করে তার বুকের ভিতরে সঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের কান্নাকে ব্যক্ত করবে? সে যে বেশ্যা তার ত কাঁদতে নেই। আর চেয়ে থাকতে পার্‌লাম্‌ না, চোখ সরিয়ে নিলাম্‌।

শুনছিলাম বৃদ্ধা বল্‌ছিল—"নে, নে ঢের কান্না হয়েছে এইত সবে প্রথম, এমন আরও কত হবে।" কাণে আঙ্গুল দিলাম। নারী যখন নারীকে এই যায়গায় এইভাবে বিদ্রূপ কর্ত্তে পারে তখন তার নারীত্ব কতদূরে পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার মেয়েটীর দিকে চেয়ে দেখি সে অপলক দৃষ্টিতে সেই চিতার দিকে চেয়ে আছে, চিতা জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল—সে যে ছোট একটুকু চিতা—তবি চোখের জল শুকিয়ে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা

করলে—"কি হয়েছিল বাছা?" উত্তর শোনবার জন্ত সেই দিকে কাণ পেতে রইলাম্। "বাছা আমার"—তারপর সে যেন বুকের অসীম কান্না প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা করলো—"বাছা আমার তিনমাস ধরে ভুগ্‌ছিল"।

* * * * *

আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে যখন বাহিরে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালাম তখন সূর্য্যের রক্তকিরণ গঙ্গাবক্ষে বয়ার কাচে প্রতিফলিত হয়ে চোখে পড়ছিল। ও পারে ঘুস্থড়ির আর এপারের দূরে গোলাবাড়ীর কলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে বেড়ে উঠছিল। গঙ্গার তীরের মালগাড়ীগুলো ঘণ্টার শব্দ কর্ত্তে কর্ত্তে চলে যাচ্ছিল।

পাশেই একটী পাণওয়ালার দোকানের দিকে দৃষ্টি পড়্‌লো। সেখানে সেই মেয়েটী আর বৃদ্ধা আর দু' একজন লোক মিলে গোল মাল করে পান সিগারেট খাচ্ছিল।

চেয়ে দেখলাম মেয়েটীর মুখে চোখে কোথাও বিষাদের আভাষ মাত্রও নেই।

মুখ ফিরিয়ে ভাব্‌লাম—এই বিস্মৃতি, এইই কি আদর্শ, না, এইই পতনের লক্ষ্যস্থান?

সিদ্ধি

(শ্রীলীলা দেবী)

চাতক তৃষায় ব্যাকুল না হ'লে
　　মেঘের পড়ে না নীর,
শাবক ক্ষুধায় কাতর তবে তো
　　স্তন্তে ঝরিবে ক্ষীর।
কোরক গুমরি' ওঠে বেদনায়
　　তবে তো মলয় বয়।
আঁধার দুখেতে আকুল ধরণী
　　তবে তো অরুণোদয়।
সিদ্ধির মূল ব্যাকুলতা ধন
　　ভক্তিতে তাঁর বাসা,
চির নিশিদিন সেথায় তাঁহার
　　চলিতেছে যাওয়া আসা।
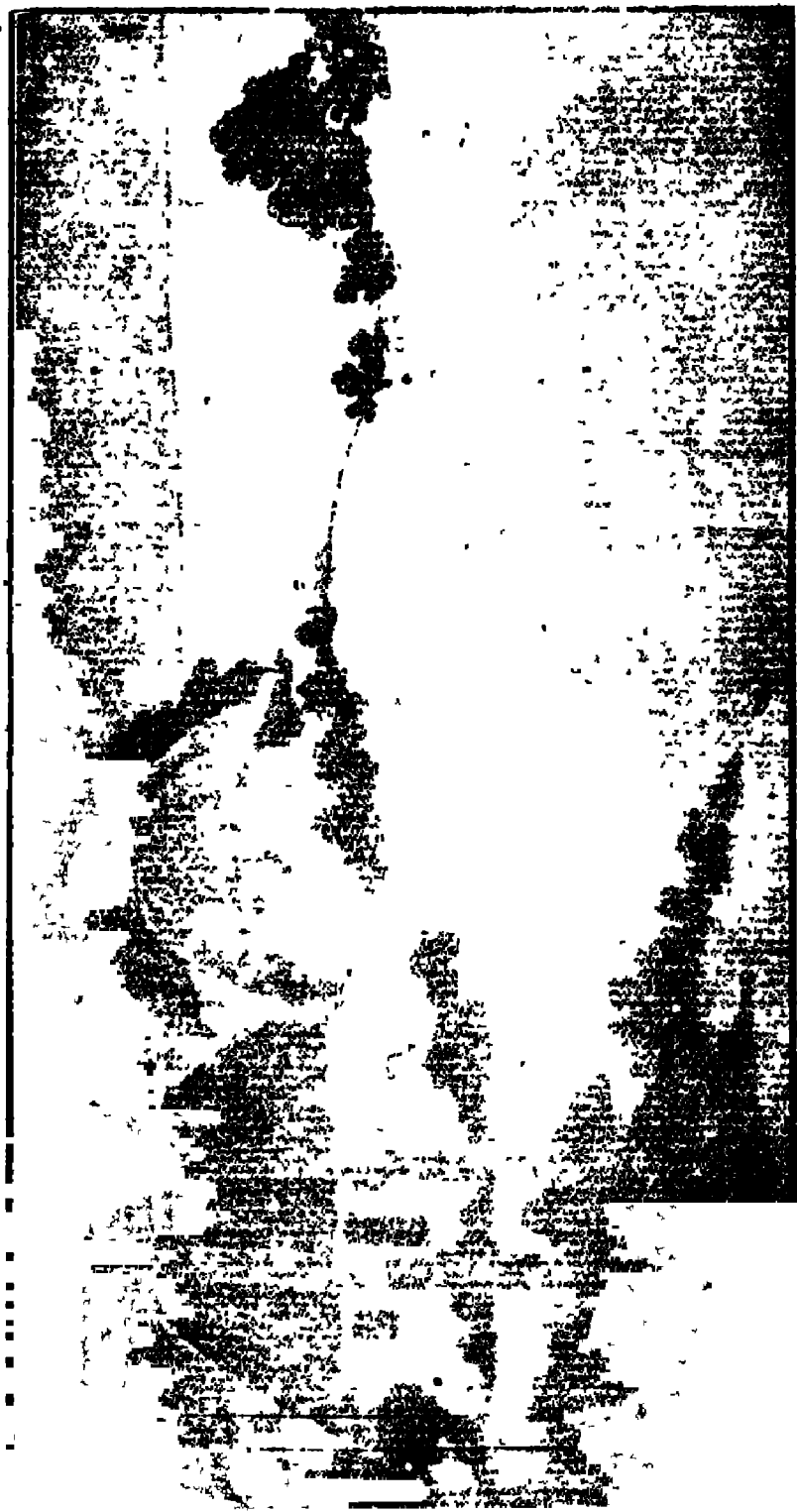
নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা] [পৌষ, ১৩২৭ সাল।

মিলন।

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।]

(গান)

আমি শুধু তোমায় চাই।
লোকের কথা শুন্‌তে গেলে
দিন যে আমার ফুরিয়ে যায়।

ডববো না আর অপবাদে,
পড়্‌বো না আর অবসাদে,
ধরার বোঝা বইবো মাথে
তা'তে কোন দুঃখ নাই।

আসে যদি ঝঞ্ঝা-বারি
মহাপ্রলয় ঘিরে,
(আমি) শান্ত সৌম্য গিরির মত
পেতে নিব শিরে,

আপন মনে আপনা হ'তে
বইবে সে যে সুধা-স্রোতে,
মিশবে সুখে স্রোতস্বিনী
সাগর-বঁধুর নীলিমায়।

তুমি আমায় রাখ্‌বে বেঁধে
তোমার আলিঙ্গনে,
আমি তোমায় মিশিয়ে নিব
দেহ. প্রাণ ও মনে;

তোমায় আমায় এ সংযোগে,
মগ্ন রব মহান্‌ ভোগে,
এ প্রেম মোরা সবার মাঝে .
বিলিয়ে দিব বসুধায়

চক্রে দেশ বাঁচবে।

[শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।]

এ সংসারে আমরা সব ভেঙে ভেঙে ভাগ করে নিয়ে ঘর করছি। এই আমার বাড়ী, ঐ তোমার ঘর; এই আমার গাঁ, ঐ তোমার সহর; এই আমাদের দেশ আমাদের জাত আমাদের ধারা, ঐ তোমাদের মুল্লুক তোমাদেব আচার বিচার, তোমাদের সভ্যতা। ভাগাভাগি ঘর কন্না না হ'লে মানুষের সুবিধা হয় না; তার কারণ মানুষের বুদ্ধি অল্প, সবটা এক সঙ্গে ধরতে পারে না, ধরতে গেলেও কোনটাই বুকের ধন করে সার্থক প্রেমে ধরা হয় না। আমাদের স্নেহ প্রেম দরদ মমত্ব একটু খানি, বৌটি ছেলেপুলে কয়টি আর মা বোনকে পেলে সবটা হৃদয় ঢেলে দিয়ে তাদের আশার ভাণ্ড ভরে দিতে পারি, সেবায় তাদের ধম্মছেঁড়া রকমের আপন করে নিতে পারি। কিন্তু দেশ সুদ্ধ জগৎ সুদ্ধ সবাইকে তেমন পারি না।

তাজ মহলের কারু—সেই শ্বেত পাথরের গায়ে মতি চুনীর আলপনা জলনা শিল্পমাধুরী ধরতে গেলে আমাদের বুদ্ধি সে অসীমকে ভাগ করে করে দেখে; এখানে একটি খিলান, ওখানে একটি চবুতারা, সেখানে একটুখানি মর্ম্মরের ঝিহি জাল বুনানী—এই করে দেখে দেখে আমরা সব তাজটা বুঝি। আনন্দে—নিথর সুখে জুড়িয়ে যাই সবটাকে বুঝে ও আস্বাদ্‌ করে বটে, কিন্তু এই অসীমকে বুঝার

রকমটা হ'লো। টুকরো টাকর৷ রয়ে, অল্পে অল্পে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে। ভগবান নিজেকে এ লীলার মাঝে দেখাচ্ছেন এমনি করে লীলার ফুলঝুরি তুলে, ফিনকির মাঝ দিয়ে, একটু আধটু পথ ভোলা মাধুরীর অলখ জাগিয়ে। এই হ'লো জীবনের ধারা।

আমাদের দেখ চোখ নাক কাণ আঙ্গুল জিব এই রকম বোঝবার জানবার দেখবার আস্বাদ নেবার সব ইন্দ্রিয় গুলিই এক এক চুমুকে একটু খানি পায়। জিব দিয়ে রসগোল্লা পানতোয়া খাই, এক একটা করে, তা' আবার ভেঙে ভেঙে চিবিয়ে চিবিয়ে জিবের ওপর উল্টে পাল্টে, একটু একটু পাই আর আনন্দের ধারা চলে। চোখ মেলে আগে আমি দেখি রূপসীর চাঁপালী নবনীত রূপের স্বপ্ন, তার পর দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখি ঢেউয়ে ঢেউয়ে অঙ্গঢাকা কালো চুল, তারপর চোখের আয়ত লাজমন্থর কালো তল, বিম্ব অধরের ধনুবঙ্কিম রেখা আর কাঁপা সরসতা, শেষে চোখ তুলে নামিয়ে ঘুরে ফিরে সর্বাঙ্গের সুঠাম ভঙ্গী কত করেই না দেখি, তবে তো আমার এ চিরসুন্দরের মাঝে জাগা সমাধি শেষ হয়।

সংসারে আমাদের জীবনে এইরূপে এককে পাই ভেদে আর ভেদকে পাই একে। এখানে সসীমে অসীমে জড়াজড়ি, পশুতে দেবতায় মাখামাখি,—ভেদ ফোটাচ্ছে অভেদকে, অভেদ ধরে আছে ভেদকে। যে এই দু'টোকে বোঝে সেই বোঝার মত বোঝে, জানার মত জানে, দেখার মত দেখে। যখনই আমরা একটাকে আত্যন্তিক করে ধরি, তখনি জীবন বেসুরো বাজে, তাল কেটে যায়। শ্রীধর্মমঙ্গলে আছে ইন্দ্রের সভায় নাচতে নাচতে অম্বরতী নটীর তাল কেটে গেছিল, সেই দোষে তাঁকে বল্লাবতী হয়ে মর্ত্ত্যে জন্ম নিতে হ'লো। আমাদেরও জীবনের সমাজের বা জাতীয় ধারার তাল কেটে গেলে স্বর্গচ্যুতি ঘটে, সে মানুষ সমাজ বা সে জাতি সেই দিন থেকে তিল তিল করে মরতে থাকে।

কিছুকাল থেকে ইউরোপ আর এসিয়ার এমনি করে জীবন নৃত্যে তাল কেটে গেছিল। ইউরোপ জীবনকে ধরেছিল মাতালের মত আঁকড়ে, সুখ বিলাস জ্ঞান কাজ ছুটাছুটি হুটোপাটি ছাড়া আর কিছু সে জানতো না, ঐটেকেই সাত কাহন ভাবতো। তার ফলে দুনিয়া-ভরে অভিশাপ উঠেছে, মড়ার মাথায় মাথায় পাহাড় হয়ে গেছে পরের ঘরে ডাকাতী রাহাজানী করে করে এখন যদুবংশ ধ্বংস হবার যোগাড়। মানুষ নিজের গর্ত্তে যে নিজে পড়ে, পাপের করাত যে আসতে যেতে কাটে, তার দৃষ্টান্ত আজ ভোগপাগল ইউরোপের ঘরে দেখে নিও।

এসিয়া অন্তরকে ধরেছিল ঠিক অমনি চোরের পুঁটলীর মত জড়িয়ে, তাই

এসিয়ার এতদিনকার ছবি হ'লো ধ্যানে মগ্ন মৌনী যতি আর তার মাথায় এক জোড়া বিদেশী নাগরা। আমরা দুনিয়া-ছাড়া কি এক উদ্ভুট্টি আত্মাকে খুঁজতে গিয়ে ইতোভ্রষ্ট-স্ততো নষ্ট হয়েছি, অরূপকে ধরতে গিয়ে রূপ অরূপের পরম ধনকে হারিয়েছি। যার বসবার ঠাঁই নেই, সে ধ্যান করবে কোথায় ? এপারে পাটনীর নৌকায় উঠবার ঘাট যার নেই, সে ওপারে যাত্রা করবে কোন ঘাটে তার পণ্য তরণী সাজিয়ে ? এ দিন-দুনিয়ার লীলারাজের দেবসভায় এসিয়া ও ইউরোপ—দুই নর্ত্তকীরই নাচের তাল কেটে গেছে, তাই বৈকুণ্ঠ আর ধরার যাতায়াতের পথ আজ বন্ধ, তাই বিশ্ব মানবের আজ এ স্বর্গচ্যুতি। তাই আজ ইউরোপ ভক্ষক আর এসিয়া ভক্ষ্য,—একজন বাঘ আর একজন হরিণ ;—দুই-ই পশু।

এই সঙ্কটের দিনে হা-ভাতের যুগে জীবনের তাল লয় ছন্দ ফিরিয়ে আনতে হবে, বাঁশীর সাতটা রন্ধ্রে আঙ্গুল দিয়ে সুরসপ্তকে ভরা রাগিণী বাজাতে হবে। আমরা খেতে পাচ্ছিনে, সুতরাং মার্ মার্ মার্, কেড়ে খা' কেড়ে খা'—এ হলো পুরোণো স্বার্থবাদী ইউরোপের পশুর কথা। কেড়ে নেওয়ার দু'টো দিক আছে, কাড়া-কাড়ি ; মারবার ওদু'টো দিক আছে, মারা-মারি : এক হাতে তালি বাজে না, খুন করতে গেলে খুনোখুনী হয়ে যায়। ইউরোপে এসে আমাদের দেশ কেড়ে নিয়ে ঐ পশুর যুক্তি আমাদের চূড়ান্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছে, ঐখানে ঐ বোঝার মাঝে আমরা সত্যি সত্যিই হেরে গেছি—পরাধীন হয়েছি। যে জাতির ভাব-দেহ ঘুচে আত্মঘাত ঘটেছে সেই পরাধীন। আমরা ভাবছিলুম দুনিয়ার ভেল্কি কাটিয়ে উঠে মনের পারে নির্ব্বাণের সুখ-কোয়ারা পাব, তাই ভগবান ঝুঁকিয়ে ধ্যান ভাঙিয়ে দিলেন। সেই ত ছিল একটা মস্ত বিরাট ভুল। এখন আবার যদি ইউরোপের দেখাদেখি ভোগের কসাইখানায় ঢুকি, মেরে লুটে পুটে জীবনের হাটে গুণ্ডাবাজী করে মানুষ হতে চাই, তা' হ'লে ত আবার যুগযুগান্ত ধরে ওদের ভুলই মক্সো করতে হ'বে, অন্ন নিয়ে কাড়াকাড়ির অবিরাম হয়রাণীতে অন্ন পেটে দেওয়া আর হয়ে উঠবে না।

তোমার সামনে তোমার বুক থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে যদি কেউ কেটে ফেলে, সে পশুবৃত্তি কি করুণ আর বীভৎস হয়ে বাজে। আর ঠিক ঐ কাজ একটা নয় অগুন্তি হাজার ঐ খুন দেশের নামে করে যখন বীর জয়ী হয়ে ফেরে, তখন সে পরদেশদ্রোহীর নগরে নগরে আনন্দ উৎসব পড়ে যায়! মানুষ যে কি সঙ তা' এইখানে বেশ বোঝা যায়। ন্যাশনালিটিও মাত্রা হারালে অতিবড় জঘন্য পাপে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন সে ন্যাশনালিটি বা দেশপ্রেমের নাম হয়

ইম্পিরিয়ালিজম্ বা রাষ্ট্রগৌরবের নেশা। এই নাশেনালিজম্ বা জাতীয়তার গুণ্ডাগিরিতে সমস্ত জগৎ আজ খুনে লালে লাল, কত শত হলদিঘাট কুরুক্ষেত্রে অশিবারূপে শ্মশান-নৃত্যে নাচছে। ইহসর্ব্বস্ব আর ইহ বিমুখ এই দুই তাল-কাটা সভ্যতায় আজ জগতের অর্দ্ধেক মানুষ নবাব আর অর্দ্ধেক গোলাম; গোলামী করতে করতে মানুষ যেমন পশুর অধম হয়, প্রভু হয়ে গোলাম চরাতে চরাতেও মানব-দ্রোহের পাপে বিজেতারও তেমনি ইহ জন্মেই রাক্ষস-গণ প্রাপ্তি হয়।

আজ এই নতুন যুগের যুগ-উষায় ইহবিমুখ ভারত বুঝেছে যে নর ও নারায়ণ এক, দেউল বিনা দেবতা সাজেন্না, জগতের শ্রীঅঙ্গময় রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে অরূপ নিরঞ্জনের সহজ পূজা দিবানিশিই চলছে। ভোগকে ছাড়লে ত্যাগের দেবতাকে প্রতিমাহারা করা হয়, নর-নারায়ণের সেবাই আনন্দবনের পথ। ব্যক্তিবাদী (Individualistic) ইউরোপও আজ সঙ্ঘজীবন সার করেছে, তারাও বুঝেছে সোণার খাঁচা নিয়ে কাড়াকাড়িই এতদিন সার হয়েছে। খাঁচার পাখী—সেই অরূপের ধন কখন যে সোণার খাঁচা ছেড়ে নীল আকাশে হারিয়ে গেছে তা' টের পাওয়া যায় নি। ফলে সহর নগর জনপদ ভরে ইমারত উঠেছে, আজোর মাল্যর ভোগের শোভাযাত্রা সে নগরপথে নিত্যই বাদ্য কলরবে চলেছে। কিন্তু নগরে নগর-লক্ষ্মীর আবির্ভাব নেই, এ যেন সুখের দুঃস্বপ্ন, শুধু দেহের দোকানদারী।

এতদিন ইউরোপে ব্যক্তিবাদ প্রবল ছিল, স্বামী তার দাবী কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিচ্ছিল, স্ত্রী তার পুঁটলী আলাদা বেঁধে নিজের ঘরে তুলছিল; প্রজা তার সত্ব দলীল অধিকার নিয়ে রাজার সঙ্গে হাঁক ডাক ঠেলাঠেলি করছিল। তারপর এলো ধনীদের আলাদা পঞ্চায়েত, ব্যবসায়ী দোকানদারের আলাদা পঞ্চায়েত, মজুরের আলাদা পঞ্চায়েত, নারীর আলাদা পঞ্চায়েত, কয়লার খনির কুলি, জাহাজের খালাসী, মোট বাহী, রেলের চাকর সবারই পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে ধুন্ধুমার পরিমাণ। ঐখানে ব্যক্তি গিয়ে সঙ্ঘজীবনের সুরু হল; কিন্তু তলিয়ে দেখো তখনও তার মধ্যে ব্যক্তির দাবী রয়েছে; তবে একা একা লড়া যায় না বলে জাতে জাতে পেষায় পেষায় থাকে থাকে সব আলাদা হয়ে দল বেঁধে নিজের নিজের পাওনা গণ্ডা আদায় করবার জন্যেই এই সঙ্ঘ। তাই সেখানে ধনের সঙ্ঘের সঙ্গে মজুরীর লড়াই, কয়লার ধর্ম্মঘট ব্যবসাদারের সঙ্ঘ ভেঙ্গে দেয়। এখনও দেখো ইউরোপে ঠিক পঞ্চায়েত গড়ে নি, কারণ পঞ্চায়েত মানেই যে পাঁচজনের স্বার্থ

দেখে ও পাঁচের হিতে কাজ করে। সঙ্ঘ যদি শুধু যত গাড়োয়ান আছে তাদের স্বার্থ দেখলো, তা' হলে ত এক জনেরই স্বার্থ দেখা হলো, শুধু কামার বা শুধু ছুতারের স্বার্থ নিয়ে মারপিট করলে যে নাপিত ধোপা চাষা পুরোহিত প্রভৃতি কত জনার স্বার্থ অবহেলা করা হলো। জীবনটা যদি শুধু কামারের হাপর নিয়ে চলতো তা' হলে ত ভাবনা ছিল না; কিন্তু কামারকে যে দু'সন্ধ্যা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে হয়, 'জোলার কাপড় না নিলে তার লজ্জা নিবারণ করে কে? জাতির জীবন মানেই তাই, সেই জীবনের শতমুখী স্বার্থ যে পঞ্চায়েতে বজায় রাখে, তারই নাম পঞ্চায়েত বা সঙ্ঘ বা চক্র। এই চক্রের চক্রেশ্বরই রাজা বা দেশপতি। এই চক্র দিয়ে অনন্ত জীবনকে ভেঙে ভেঙে ভেদের মধ্যে আস্বাদ করা যায়।

এই চক্র বিরাট বিশাল জিনিস, এর আদি অন্ত আছে কিনা সন্দেহ। দেখছো না মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা/হব-রঙা কামনা বাসনার হিসেব কিতেব নেই, মানুষ যে—"মৃদুল কাম তরঙ্গ-মোহন নীলাম্বুধি"।

এই কামনা বা প্রেরণার ঢেউ-দোলা সাগর—মানুষের জীবন এই পৃথিবী ধরে ধরে ভূমায় গিয়ে ঠেকেছে—তারই নাম সংসার-বট, এই জীবন-তরুর কথাতেই গীতা বলেছেন—"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্"।

গাছটা উল্টো, গোড়া এর ওপর দিকে আর ডাল পালা নীচে। তা' তো হবেই,—গোড়া যে ভগবানে, বৈকুণ্ঠে, আর ডাল পালা—শতমুখী সকল প্রকাশটা তার দুনিয়া-জোড়া। তা' হ'লেই দেখ সেই সঙ্ঘ সেই চক্র ঠিক, যা' এই জীবন-বটের ডালে ডালে পাতায় পাতায় রস আলো সার মাৎ জোগায়। দেশ জুড়ে চক্র গড়, সে চক্রে মুদি মাল্লা কুমোর ছুতোর যোগী ভোগী রাজা প্রজা সব যেন যে যার আঙিনায় সুখে থাকে আর এই চক্র-দেবতার নাটমন্দিরে সবাই সবাইকে খুঁজে পায়। সেখানে মাংসের ভার কাঁধে কসাই শঙ্করাচার্য্যকে সোঽহং তত্ত্ব শেখায়, সেই চক্রেই ত রুহিদাস জুতো বানায়, নানক দোকান করে, চণ্ডীদাস রজকীর পায়ে বিশ্ব মাতাকে জগৎ-রাধাকে কুড়িয়ে পায়। চক্র গড়, চক্র গড়, দেশময় চক্র গড়, পরম বাঁধনে মনের ডোরে প্রেমের রাসে এক হও, নইলে দুর্ভিক্ষ মহামারী ভয় লজ্জা তোমরা একা একা ঘুচাতে পারবে না।

ঋষির সাধ

[শ্রীরামদর্শনে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষির উক্তি]

(শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী)

(আমরা) চাইগো তোমারে চাই,
সাধ মিটাইয়ে সারা দেহ দিয়ে
লুটিতে তোমারে চাই।
শতবাধা শত বিপদ্ বিবাদ,
ভূষণ করিয়ে গুরু পরিবাদ,
চির সাথী করে' বিরহ বিষাদ,
যেন, মিলনের মধু খাই,
সারা দেহ, সারা পরাণটী দিয়ে
তোমারেই যেন পাই।
চিদ আনন্দ — ঘন রূপে, রসে,
সাধ নাই, সাধ নাই।
যেন, আমার আমার বলিয়া তোমারে
কামনার (ই) জয় গাই।
সংশয়ে ঘন কণ্টক বনে
তুমি হেসে'যেও নিতি নিজ মনে,
ক্ষুধিত তৃষিত কাতর পরাণে
মোরা র'ব পথ চাই,'
মনসিজমোহ, মধুর মূরতি,
কখন্ দেখিতে পাই।
যেন, দিগন্ত ঘেরা অন্ধকারের
সকল রন্ধ্র ছেয়ে,
তব সঙ্কেত নিঃস্বন উঠে
আহ্বান গান গেয়ে!

ও রাঙা চরণে জাতি কুল মান
অঞ্জলি ভরে' করে ফেলি' দান,
যুগান্ত ধরে' বাঁচি যেন মরে
অনন্ত দুখ পেয়ে,
তুমি যে আমারি এই আনন্দে—
র'ব আশাপথ চেয়ে।
হৃদি তীর্থের পূত স্নেহ-নীরে
অভিষেক হ'বে কভু,
কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব কখনো
তোমারে করিয়া প্রভু।
মা হ'য়ে বাড়াব' বক্ষ রুধিরে,
কেহ অভিমানে নয়নের নীরে,
তোমারে ভাসা'য়ে পিয়াময় হ'য়ে
আপনি ভাসিব তবু;
হৃদি তীর্থের পুণ্য উদকে
অভিষেক হ'বে কভু।
সকল ছন্দ সকল বন্ধ,
খুলিবে ব্যথার গীতে,
পলকে পলকে নব নব সাধ
জাগিবে সে লীলাটীতে।
নারী হৃদয়ের নবীন দৃশ্য,
চমকি চাহিয়া দেখিবে বিশ্ব,
নত হ'বে কত উদ্ধত শির
(সেই) পাবন তীর্থ টীতে,
চাই গো তোমারে নবীন লীলায়
ব্যাকুল নারীর চিতে!

কেরাণীবাবু।

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম এ]

শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে আসিয়া অতুলচন্দ্রের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে বুড়ির জন্য বেদানা লওয়া হয় নাই তো। তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার বাজারে বেদানা কিনিতে ছুটিলেন যা' দর বলিল সঙ্গে যে পয়সা আছে—তাতে একটার দামও হয়না। মৃত্যুশয্যায় শায়িত কন্যার শেষ ইচ্ছা বুঝি পিতা আর পূর্ণ করিতে পারিলেন না! তাড়াতাড়ি অফিস ছাড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঔষধপত্র সবই লইয়াছিলেন—কেবল আসল কথাটাই ভুল হইয়া গেল! এ দিকে ৫-৩৮ এর গাড়ী তো চলিয়া গেল। ভাবিলেন—"একবার বড় বাজারের দিকে যাই যদি একটু সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু অতটা দেরী করিয়া বাড়ী পৌঁছিলে মায়ের আমার খাওয়ার অবস্থা থাকিবে কি?" সাত পাঁচ ভাবিয়া অতুলচন্দ্র এক প্রকার ছুটিতে ছুটিতেই—বড়বাজারের দিকে চলিলেন—অল্প দামে বেদানা পাওয়া গেল—পকেটে লইয়া আবার ছুটিতে ছুটিতে শিয়ালদহ আসিয়া গাড়ী ধরিলেন।

(২)

"বুড়ী, কেমন আছিস্ মা, এই আমি তোর জন্যে বেদানা এনেছি, রস ক'রে দিই একটুখানি মুখে দে মা।" বুড়ার তখন শেষ অবস্থা, কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। রস মুখে দেওয়া হইল, পিতার দিকে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া, তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া, নিজের দশম বর্ষীয়া কন্যা উমাকে পিতার হাতে সমর্পণ করিয়া বুড়ী চিরদিনের মত অতুলের সংসার ছাড়িয়া চলিল। অতুলের গৃহলক্ষ্মী ইহ সংসার ত্যাগ করিবার পর হইতে তাঁহার এই বিধবা কন্যাটিই সংসার বজায় রাখিয়াছিল। যক্ষ্মা রোগে সেও আজ যমের সদনে চলিয়া গেল!

(৩)

বুড়ী তো গেল। বিজয়ের বিবাহ দিয়া একটি বৌ আনিতে পারিলে সংসারটা চলিতে পারে। তাহার বিবাহে কিছু টাকা পাইলে সেই টাকায় উমার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সামনেই বিজয়ের পরীক্ষা, প্রত্যেক পরীক্ষায় সে বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে বলিয়া অতুলচন্দ্রকে তাহার পড়ার খরচের জন্য ভাবিতে হয় নাই—উপরন্তু ছেলে পড়াইয়া টাকা আনিয়া সে সংসারে সাহায্য করিয়াছে।

বি, এ, টা ভাল করিয়া পাশ করিতে হইবে--তাই পিতা তাহাকে ছেলে পড়াইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন। কাল ফিএর টাকা চাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে-- এক সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাওয়া যায়, পিতা পুত্রে এই ভাবনাতেই বিষণ্ণ হইয়া আছেন।

(৪)

বেলা ১০ টা বাজিয়া গিয়াছে—টাকা কোথাও যোগাড় হইল না। অতুল আসিয়া বিজয়কে বলিলেন "বাবা, টাকা তো পাওয়া গেল না, ভগবান্ আমাকে সব দিক দিয়েই মেরেছেন। তোমার মা স্বর্গে গিয়ে বেঁচেছেন। ঘরে চাল কম প'ড়লে তার মাথা ধরত, না হয় তো পেটের অসুখ হত এই ক'রে সে নিজের গ্রাস তোদের দিয়ে তোদের মানুষ ক'রে গিয়েছে; অসুখের উপর হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে সে তোদের সেবা ক'রে গিয়েছে, সেই সতীলক্ষ্মী অনাহারে অনিদ্রায় অত্যাচারে তিলে তিলে মারা গিয়েছে। তার দেওয়া শেষ স্মৃতি একটা আঙটি আছে, সইটা বেচে যদি টাকা আনতে পারি, দেখি।"

(৫)

বিজয় বলিল—"বাবা তা কিছুতেই হবে না, আমার পরীক্ষা দেওয়া না হোক সেও ভাল, কিন্তু মায়ের সেই স্মৃতিটা গেলে বড় কষ্ট হবে, ঘটি বাটি বাড়ী ঘর সবই তো গিয়েছে—এখন ভালবাসার স্মৃতিটুকু বিক্রী ক'রে সব ঘুচাতে চাই না। আমি ঠিক করেছি—বিলাসপুরের মঠে গিয়ে মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হব—বাবা, আপনি অনুমতি দিন্।"

(৬)

অতুলচন্দ্র ছেলের কথায় সুখও পাইলেন, দুঃখিতও হইলেন। কি করিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া বলিলেন—"তাই যা বাবা, গৃহী হ'য়ে যে সুখ তোদের দিতে পেরেছি, তাতে আর কাকেও গৃহী হতে বলিনে। যা সেখানে গেলে, দুবেলা দুটো ভাল করেই খেতে পাবি, ভাতকাপড়ের অভাব কোনোদিনই হবে না। লোকে "মহারাজ" বলে সম্মান করবে, পায়ের ধুলো রাজ্যতেও মাথায় নেবে, তবে বাবা বি, এ, টা পাশ ক'রে সেখানে গেলে বোধ হয় তারাও তোকে বেশী খাতির করতো, লোকেও বেশী মানতো। চাই কি পরে তোর আমেরিকা বা বিলাত যাওয়াও ঘটতে পারতো। না:—ঐ আংটিটাই বেচে তোর টাকা আমি এনে দিচ্ছি।"

(৭)

স্বর্ণকার দোকানে গিয়ে সেই আঙটিটা দর করিতে করিতে অতুলের চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। নীলু স্বর্ণকার অতুলের বাল্যবন্ধু এবং প্রতিবেশী। সে এই আঙটির কথা জানিত। অতুলের চোখের জল তাহার চোখ এড়াইল না। সে বলিল—আমি তোমায় পঞ্চাশ টাকা ধার দিচ্ছি,—তুমি ভাই আংটি ফেরৎ নিয়ে যাও, ছেলে পাশ ক'রে রোজগার করলে শোধ দিও।" অতুলের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল—সে বলিল, ভাই নীলু, তুমিই আমার বন্ধুর কাজ করলে, আংটিটা তোমার কাছেই থাক, যখন টাকা দেবো ফেরৎ দিও—জান তো আমাদের অভাবের সংসার। যাই ভাই, বেলা হ'য়ে গিয়েছে, আপিস যেতে দেরী হ'য়ে যাবে, সাহেব না মেরে বসে। বুড়ীর শেষ দিনে এক ঘণ্টা আগে ছুটি চেয়েছিলাম, তাই মিথ্যাবাদী বলে গাল দিয়ে বেটা মারতে এসেছিল।"

(৮)

বিজয় বি, এ, পাশ করিয়াছে। গেরুয়া-রঙের সোণার চশমা, গিরিমাটিতে ছোপানো সোয়েটার, মশারি, পাঞ্জাবী ও মোজা, দু'বেলা রাজভোগ সদৃশ খাবার ও চা-বিস্কুট,—মোটর চড়া, তাকিয়া এবং গড়গড়ার স্বপ্নের মধ্যে সে অনুবীক্ষণের দ্বারাও ত্যাগ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া হতাশ মনে সন্ন্যাসী-ঘৃণিত সংসারীর জীবনই শ্রেয় মনে করিল। তিলে তিলে মরিয়া সারাজীবন ধরিয়া যাহারা তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে—সেই মাতা, পিতা ও ভগিনীর হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত গেরুয়ায় আজ তাহার সন্ন্যাসের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে।

ঋণ-শোধা।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

দিনের শেষে রাঙা মুখে
সূর্য্য যে এই ডোবে
ওগো নদীর যে ওই তীরে—
নীল আকাশে ছড়িয়ে পাখা
বিহগ কলরবে
ওগো ছুটে নিজের নীড়ে :—
তাদের আমি সুধাই-ওগো
এই সারাটা দিন
কাহার দেওয়া শোধ করেছ
অসময়ের ঋণ ?

গুন্‌গুনিয়ে ভ্রমর যে ওই
ফোটা ফুলের পাশে
ওগো কতই গাহে গান
শীতল উষার বিভোল হাওয়ায়
ওই যে কুসুম হাসে
(ওগো) কতই যে তার ঘ্রাণ ;—
তাদের আমি সুধাই ধীরে—
এই যে নিমেষ পল
কাহার দেওয়া ঋণটী ওগো
শুধ্‌ছ অবিরল ?

ফাগুন মাসে নিঝুম রাতে
জোছনা-রাণী দেখি
(ওগো) পিক্ কুকারি ওঠে,
কালো রাতের অন্ধকারে
কোন্ গুহাতে থাকি

(যবে) ঝিঁঝিঁর আওয়াজ ছোটে—
তাদের আমি সুধাই—ওগো
কাহার ঋণের ভার
গান গাহিয়া শোধ করিছ
আজকে অনিবার ?

গভীর যখন নিঝুম রাতি
সুধাই তখন ধীরে
(ওগো) হৃদয় দেবতা
ঋণ কি আমার আছে কিছুর
শুধ্‌তে হবে কিরে

ওগো কওসে বারতা ?
জীবনের ঋণ—কয় কে হাসি'—
আনন্দটা দিয়া
শুধ্‌তে হবে এই ভুবনে
ওরে অবোধ হিয়া।

সমাজের কথা।

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপন্‌ আপন অন্তরাত্মার, আপন আপন নিগূঢ় সত্তার চেতনায়ও প্রেরণায় চলে তবে সমাজে আর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থাকে না, সমাজে হয়, আনন্দেরই সম্মিলিত বহুল বিচিত্র সমৃদ্ধ সৃষ্টি। কিন্তু এই যে আদর্শ ইহা কি এতই স্পৃহনীয় ? দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠা না করিয়া সমাজকে সাম্যের মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইলেও তাহা করা কি উচিত কথাটি আরও তলাইয়া দেখা দরকার। প্রথমত অন্তরাত্মাকে, নিজের নিজের আসল সত্তা ও ধর্ম্মকে—নিজত্বকে ধরিতে হইবে। তাহা পাবা যায় কিরূপে ? দ্বন্দ্বকে সংঘর্ষকে উঠাইয়া দিতে চাই—কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ কি কেবলই আমাদিগকে বাহিরের দিকে টানিয়া লয়,

তাহা কি কেবল পরের পথের পরের ধর্ম্মের উপর আমাদের লোভ বা আক্রমণ চেষ্টার ফল ? বরং ইহাই কি বলা যায় না যে, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষই হইতেছে আত্মচেতনার নিজস্ব উদ্বোধনের উপায় ? পরের দ্বারা প্রতিহত হইয়া, পদে পদে বাধা পাইয়াই ক্রমে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে শিখি, নিজের পথ নিজের ধর্ম্ম খুঁজিয়া পাতিয়া লইতে বাধ্য হই। আমাদের প্রাণ আমাদের মন, আমাদের প্রয়োজনের তাড়া বা বাধ্যবাধকতার টান আমাদিগকে বাহিরের দিকে পরধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করে, স্বীকার করিলাম ; ফলে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষই আবার ফিরাইয়া আমাদিগকে ঘরমুখী করিতেছে না কি ? অপরের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে, বাধা বিপত্তিকে ঠেলিয়া ভাঙ্গিয়া চলিতে চলিতেই মানুষ আপন আপন শক্তির সামর্থ্যের পরিচয় পায়, অন্তরাত্মাকে প্রবুদ্ধ বিকশিত করিয়া তোলে। যেখানে বাধা বিপত্তি নাই, সকলেই যেখানে স্বেচ্ছামত চলিতে পূর্ণ অবকাশ পাইয়াছে সেখানে ত ভিতরের সত্তা ও শক্তি জোর বাঁধিতে পায় না, প্রতিভা খোলে না—তাহা চলে স্তিমিত-প্রবাহে, ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া চলিয়া চলিয়া। সত্যযুগ ধর্ম্মরাজ্য শান্তিকে সামঞ্জস্যকে পাইতে পারে, কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা নূতন নূতন সম্বন্ধে ভরাট হইয়া উঠিতে পায় না। সুখ ও স্বস্তিই আদর্শ নয় আদর্শ পূর্ণতর ঋদ্ধতর জীবন। দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বাধা বিপত্তিই ত জীবনের লুক্কায়িত বৈভব ফুটাইয়া ধরে। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই মানুষ নিজেকে পাইতে পাইতে চলিয়াছে, নিজেকে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে, নিত্য নূতন জ্ঞানে গরিমায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেছে। এই দ্বন্দ্ব যেখানে নাই সেখানে প্রত্যেকে নিজেকে পাইলে পায় ছোট স্কেলে, অল্পমাত্রায়, অন্তরাত্মার সেখানে পূর্ণ বিস্তারের টান পড়ে না।

তারপর দ্বন্দ্বের সাথে সাথে আছে বৈষম্য ; কিন্তু বৈষম্যকে দূর করিয়া সব একাকার করিবার চেষ্টায় লাভ কি ? বৈষম্যেরই জন্য জগতে আছে বৈচিত্র বৈশিষ্টাবৈষম্যের কুফল মানুষকে ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সুফলের অধিকারী ত মানুষই, এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন ? বৈষম্যের ফলে একদিকে যেমন পাই দীন দরিদ্র অজ্ঞানী অক্ষম, ঠিক অন্য দিকেই তেমনি পাই শ্রীমান বিভূতিমান জ্ঞানী সক্ষম, একদিকে যেমন আছে অতল গহ্বর, অন্যদিকে তেমনি আছে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। কেহ কাহারও সমান নয় অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপন আপন সত্তা ও শক্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, আপন আপন প্রতিভাকে খাটাইয়া জীবনে যতখানি তা যতটুকু পারিতেছে সফলতা লাভ করিতেছে। এই

ব্যবস্থার প্রসাদেই যে পারিতেছে উপরে উঠিয়া যাইতেছে, আর যে পারিতেছে না সে নীচে থাকিতেছে বা আরও নামিয়া যাইতেছে। যে যেমন অধিকারী তাহার তেমনি কর্মফল।—যোগ্যতমের উর্দ্বতন। যুদ্ধে যাহারা হারিয়া যায় তাহাদের জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি, তাহারা হারিবার উপযুক্তই—বিজয়ী যাহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়া দেখ, বৈষম্যের ও সার্থকতা বুঝিবে। শান্তি, সাম্য চায় কাহারা? যাহারা অশক্ত, যাহাদের নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই আপন যোগ্যতায় যাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই—পথের দুর্গমতা যাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তোলে, যাহারা চায় কেবল সুযোগ সুবিধা সহজ সুকর কিছু। সাম্যবাদের ফলে নীচে যাহারা পতিত তাহাদের লাভ কিছু হইতে পারে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপরে যাহারা, শ্রেষ্ঠ যাহারা, তাহাদিগকে নীচে নামিয়া আসিতে হয়, তাহাদিগকে খর্ব্ব করিতে হয় তাহাদের উদাত্ত সামর্থ্য। সাম্যবাদ সমর্থ অপেক্ষা অসমর্থকেই বেশী মূল্য বেশী মর্য্যাদা দেয়; কিন্তু ইহাতে হৃদয়বত্তা থাকিলেও, মোট জগতকে কি ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয় না? জগতে বৈষম্য যেখানে যত বেশী, সেখানে নিম্নতম স্তর যেমন পাই, উচ্চতম স্তরও তেমন পাই। নিম্নতমকে না রাখিতে চাও, উচ্চতমকেও তবে রাখিতে পাইবে না। যে সমাজে সকলে সমানভাবে মাঝারি ধরণের তাহাই ভাল, না যে সমাজে একদিক খুব ছোটও যেমন আছে আবার খুব বড়ও তেমনি আছে তাহাই ভাল?

সংঘর্ষ ও বৈষম্য না থাকিলে, মানুষের অন্তরাত্মা পূর্ণতা পায় না, সমাজে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট বৈচিত্র বলিয়া কিছু থাকে না। কিন্তু বাস্তবিক তাহাই কি? মানুষে মানুষে সংঘর্ষ মানুষের একটা ব্যক্তিত্ব বোধকে জাগাইয়া তোলে বটে, কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব তাহার আসল ব্যক্তিত্ব নয়, তাহার অন্তরাত্মা নয়, সেটি হইতেছে অহংকার বোধ। আর এই অহঙ্কার ত হইতেছে তামসিক অহঙ্কার, প্রাণের অন্ধ আবেগের ক্রিয়া। বস্তুতঃ, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ যে তামসিক অহংকারকে জাগাইয়া ধরে, তাহা মানুষকে আপন সত্য অহং—অন্তরাত্মা হইতে দূরেই লইয়া ফেলে, অন্তরাত্মার দূরে বাহিরে প্রয়োজনের বা সংস্কারের একটা খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণি-মধ্যে মানুষকে সবদ্ধ করিয়া রাখে। তাই আমরা বলিতেছি, অন্তরাত্মার পরিস্ফুরণের জন্য দ্বন্দ্বসংঘর্ষ দরকার নাই, দরকার ভিতরে একটা তপঃপ্রয়োগ, ঠাসাঠাসি রেশারেশি দরকার নাই, দরকার একটা মুক্ত বিস্তীর্ণ অবকাশ।

আর বৈষম্য না থাকিলে যে বৈশিষ্টত্ব থাকিবে না, এমনও কোন কথা নাই।

মানুষে মানুষে বৈষম্য আছে ও থাকিবে; কিন্তু সে বৈষম্য অর্থ এমন নয় যে, কাহাকেও নীচে আর কাহাকেও উপরে থাকিতে হইবে, উপরে যে থাকিবে সে নীচেকে চাপিয়া থাকিবে! জগতে যে বৈষম্যের খেলা আমরা নিত্য দেখি, সেটি হইতেছে অহংকারের বুভুক্ষার তারতম্য আর কৃত্রিম একটা অবস্থা ও ব্যবস্থা সেই বুভুক্ষার যে সুযোগ ও সুবিধা অথবা যে বাধা ও বিপত্তি আনিয়া দিতেছে তাহারই ফল। অন্তরাত্মায় যে বৈষম্য আছে, তাহা শক্তির বিভিন্ন ভাবমাত্র, ছোট বড় শক্তির বেশাবেশি নহে। বাহিরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে ঈর্ষা ও প্রতিযোগীতা দেখিতে পাই, তাহা সত্যকার বস্তু নয়, সেটি ব্যতিরেকী বা অভাবাত্মক (negative) জিনিষ, ভিতরের অন্তরাত্মার বস্তু হইতেছে স্বভাব ও স্বধর্ম্মের প্রবাহ। প্রত্যেকের অন্তরাত্মা এক এক ধরণের শক্তির বিভূতি, নিজস্ব শক্তিকে নিজস্ব ধরণে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিয়াই মানুষ প্রকৃত বৈশিষ্টকে বৈচিত্র্যকে সৃষ্টি করিতে পারে। অন্তরাত্মায় সকলই এক স্তরে দাঁড়াইয়া, তাই সকলেই সমান, তাহার অর্থ নয় যে সব একাকার। আপন আপন অন্তরাত্মার প্রতিভাকে সকলে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, প্রত্যেকের ক্ষেত্র পৃথক পৃথক—কাহার শক্তি বড় কাহার ছোট, কে উপরে, কে নীচে এ প্রশ্ন সেখানে আদৌ উঠে না তুলনা সেখানে চলে না, কারণ সকলেই অন্তরাত্মাকেই পাইয়াছে ও সৃষ্টি করিতেছে। অন্তরাত্মায় পুরুষে বড় ছোট নাই, উপর নীচ নাই, আছে শুধু নানা ভঙ্গী, বিভিন্ন ধরণ, বিচিত্র রঙ্।

দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বৈষম্যের ভিতর দিয়া ছাড়া মানুষ কখন অন্তরাত্মার উদ্বোধন করিতে পারে না, অন্তরাত্মার পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না—এ কথার অর্থ এই যে, মানুষকে জোর করিয়া না চালাইলে সে চলিতে চাহিবে না। মানুষের কর্ম্ম মানুষের সৃষ্টি হইতেছে কেবল বাহিরের চাপের জোরজবরদস্তির ফল—আনন্দের কর্ম্ম আনন্দের সৃষ্টি বলিয়া তাহার কিছু নাই। কিন্তু বেত্রাঘাত করিয়াই শিশুকে শিক্ষা দেওয়া চলে, এ ধারণা যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ত্তমানযুগে আর কাহারও নাই, সেই রকম জীবনের ক্ষেত্রেও সংঘর্ষ বা জোরজবরদস্তি করিয়াই যে কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্বোধন হয়, এ কথাও ন্যায়তঃ আর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। মানুষের সহজ ধর্ম্ম, তাহার নৈসর্গিক প্রেরণাই হইতেছে অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া ফুটাইয়া তোলা, তাহার ভিতরের সারবস্তুকে বাহিরে ছড়াইয়া ফলাইয়া ধরা। মানুষের অন্তরতম সত্তার মধ্যেই আছে একটা টান যাহার ফলে সেই সত্তা আপনা হইতেই আপনাকে বিকশিত করিয়া চলিতেছে

চায়। অন্তরাত্মার পরিস্ফুরণ প্রয়াস স্বয়ংসিদ্ধ, অন্তরাত্মার আনন্দই এই পরিস্ফুরণে। জোর জবরদস্তির দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের প্রয়োজন যে হইবেই, এমন কোন কথা নাই। এই দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের সুফল যে আমরা সময়ে সময়ে দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ অন্য পথ আমাদের চোখে পড়ে নাই, অন্য পথ আছে কি না তাহা জানিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা বা কৌতূহলও আমাদের তেমন হয় নাই। তাহা যদি হইত তবে বুঝিতাম, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ খুব ভাল হিসাবে ধরিলেও হইতেছে বড় জোর মন্দের ভাল (second best thing), আসলে কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ কিছুদূর উঠাইয়া ধরিলেও একেবারে চরমে, অন্তরাত্মার মধ্যে আমাদিগকে কখন পৌঁছাইয়া দিতে পারে না—প্রথমে সহায় হইলেও পরে তাহা বাধাই হইয়া দাঁড়ায়, অন্তরাত্মার সম্মুখে একটা যবনিকাই সে খাড়া করিয়া দেয়।

মানুষ যদি কেবল পশুই হইত তবেই বোধ হয় সংঘর্ষের লগুড়াঘাতে সে উপকার পাইত। কিন্তু মানুষের মধ্যে স্পষ্টই দেখিতে পাই, জাগিয়াছে একটা আত্মসংবিৎ—এই আত্ম-সংবিৎ নিজের শক্তিতেই শক্তিমান্, নিজের আনন্দের জোরেই নিজের পূর্ণ সার্থকতার দিকে চলিতে পারে ও চলিতে চাহে। দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ এই আনন্দকে দীর্ণ করিয়া দেয়, ঐ শক্তিকে ছিন্ন করিয়া ফেলে। মানুষের অন্তরাত্মা নিজের সামর্থ্যেই সমর্থ—রাস্তা যদি পরিষ্কার থাকে, ক্ষেত্র যদি উদার বিস্তৃত হয়, তবে নিজের বেগেই সে নিজে চলিতে পারে, আপন প্রতিভাতেই আপনার চরম সৃষ্টি করিতে পারে।

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, মানুষ যদি এতখানি স্বয়ংসিদ্ধ, তাহার অন্তরাত্মা যদি এত সমর্থ, তাহার আনন্দ যদি এত বলীয়ান তবে বাহিরের সংঘর্ষে কি আসে যায়? সংঘর্ষ বা সামামৈত্রী দুই-ই তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর, উভয়েরই অতীত সে। ফলতঃ দেখি না কি, শক্তিমান্ যে, প্রতিভাশালী যে, সর্ব্বাবস্থায় সে আপনার পথ করিয়া লইয়াছে—সুযোগ বা দুর্যোগ, অনুকূল বা প্রতিকূল কিছুরই সে তোয়াক্কা রাখে না, শান্তি বা সমর দুই-ই তাহার প্রতিভাকে উপচিতই করিয়া চলিয়াছে? বরং এই কথাই কি বলা যায় না যে, দ্বন্দ্বসংঘর্ষ-প্রতিকূল অবস্থাই হইতেছে অন্তরাত্মার শক্তির বা আনন্দের কষ্টিপাথর? সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় করিয়া অতিক্রম করিয়া টিকিয়া আছে যে সেই শক্তি সেই আনন্দই খাঁটি, তাহারই বর্ত্তিয়া থাকিবার অধিকার আছে? দ্বন্দ্বসংঘর্ষ সহায় না হউক, বাধা হিসাবেও ইহাদের সার্থকতা আছে, কারণ বাধা দিয়া ইহারা অন্তরাত্মার শক্তির সামর্থ্যের আনন্দের মূল্য যাচাই করিয়া দিতেছে।

এ কথা সত্য, আপাততঃ আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। মানুষ যতদিন অন্তরাত্মার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততদিন না হয় সংঘর্ষের বৈষম্যের একটা প্রয়োজনীয়তা থাকিল, কারণ ততদিন মানুষ পশুভাব হইতে একান্ত মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সংঘর্ষ ও বৈষম্যকে যদি চিরন্তন করিয়া রাখিতে চাই তবে উহাদের যে প্রয়োজন ঠিক তাহাই ব্যর্থ হইবে। সংঘর্ষ ও বৈষম্যের লক্ষ্য যাহাতে হয় সংঘর্ষও বৈষম্যকে ছাড়াইয়া সম্মিলন ও সাম্যের মধ্যে পৌছিতে, বাহিরের প্রতিযোগিতা যাহাতে আমাদিগকে লইয়া চলে অন্তরাত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে, পশুভাব পশুত্বকে অতিক্রম করিয়া যাহাতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে একটা দেবভাবে; সে রকম মনের অবস্থা ও সমাজের ব্যবস্থা যদি না তৈয়ার হইতে থাকে তবে ঐ সব উপায়ের আশ্রয়ের পূর্ণ সাথকতা নাই।

কিন্তু তাহা কি কখন হয়? সংঘর্ষ কি কখন আপনা আপনি সম্মিলনে, প্রতিযোগিতা একাত্মায়, পশুভাব দেবতায় পরিণত হইতে পারে? এ যেন যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ নিরসন করিবার প্রয়াস (The war that will end war) কিন্তু আজ কি অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, এস্বপ্ন আমাদের কত অমূলক— যুদ্ধ কেবল যে যুদ্ধেরই বীজ বপন করে? ভোগের দ্বারা ভোগ উপশম হয় না, বরং তাহা বাড়িয়াই চলে। সংঘর্ষ বা প্রতিযোগিতা মানুষের মধ্যে যে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, সেটা হইতেছে পশুর শক্তি, বড়জোর আসুরিক শক্তি। জোর জবরদস্তিতে যে শক্তি বল পায়, পাকা হয় তাহা আত্মার বল নয় সেটা শুইচ্ছ মনের প্রাণের মধ্যে জড়াইয়া আছে যে অহংকারের মাৎসর্য্য, দাম্ভিকতা। সংঘর্ষ প্রতিযোগিতা জোরজবরদস্তি অহংকারেরই খোরাক জোগায়, অহংকারকেই সঞ্জীবিত জীবন্ত শক্তিমান করিয়া তোলে। আবার অহংকারকেও কেবল অহং-কারেরই উপর ভর করাইয়া অন্তরাত্মায় পৌছান যায় না, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ভিতর দিয়া অহংকারকে অন্তরাত্মার চেতনায় রূপান্তরিত করা যায় না।

তারপর প্রতিভাবানদের কথা। আমরা দেখিতে পাই কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে—তাহা বাহিরের হউক, আর এমন কি ভিতরেরই হউক—যে প্রতিভা লালিত পালিত পরিপুষ্ট তাহার সৃষ্টিতে, তাহার ধর্ম্মে কর্ম্মে লাগিয়া আছে সেই দ্বন্দ্বের সংঘর্ষেরই একটা ছায়া, তাহাতে অন্তরাত্মার পূর্ণতা ধরা দিতে পারে নাই, সেখানে মিশিয়া আছে নীচের স্তরে অহংকারেরই একটা রেশ। নীট্‌শের মধ্যে দেখিতে পাই যে একটা অতৃপ্তি একটা চাঞ্চল্য একটা দুঃখ, তাহার কারণ কতকটা বটে জগতের মানুষের বাস্তব অবস্থা আর তাঁহার আদর্শোচিত জগৎ

মানুষ এই দুইএর মধ্যে বিপুল পার্থক্যের অনুভূতি—কিন্তু আসল কারণ তাঁহার ভিতরে সেই আদর্শেরই মধ্যে। নীটশের অন্তরাত্মার ছিল একটা আদর্শ একটা উপলব্ধি কিন্তু তাঁহার মনের প্রাণের উপলব্ধি আদর্শ সেই অন্তরাত্মার উপলব্ধি আদর্শকে সম্যক প্রকাশিত হইতে দেয় নাই, তাহাকে বিকৃত করিয়া ধরিয়াছে; তাই সেই অন্তরাত্মার অতৃপ্তিই শতভাবে ভঙ্গিমায় মনে প্রাণেও ছুটিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। নেপোলিয়নের অন্তরাত্মাও নেপোলিয়নের কর্ম্মে পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারে নাই (প্রমাণ তাঁহার নিজেরই অনেক কথা, বিশেষতঃ তাঁহার বন্দী-অবস্থার জীবন কাহিনী), নেপোলিয়নের জীবন—অন্ততঃ নেপোলিয়নের দিক হইতে—যে একটা ট্র্যাজেডি, তাহার কারণ আমরা বলিব এই যে তিনি সজ্ঞানে পূর্ণভাবে অন্তরাত্মার স্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই, অন্তরাত্মার মুক্ত জাগ্রত প্রেরণায় কর্ম্ম করেন নাই, তিনি দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের উপরে উঠিয়া দ্বন্দ্বকে সংঘর্ষকে চালান নাই, তিনি অন্তরাত্মাকে মনের প্রাণের মধ্যে নামাইয়া দিয়া, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়া তবে দ্বন্দ্ব সংযম করিয়াছেন, কর্ম্ম করিয়াছেন। বায়রণ অথবা গেটে অপেক্ষাও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মধ্যে যে পাই একটা উচ্চতর উদারতর নিবিড়তর কবিদৃষ্টি, তাহার কারণ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়া বাধাকে বিপত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি তাঁহার প্রতিভায় জগৎকে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরাত্মায় উঠিয়া গিয়া অন্তরাত্মার স্বতঃসিদ্ধ সহজ প্রেরণার বলে; আর বায়রণ বা গেটে নেপোলিয়নেরই মত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের স্তরেই অন্তরাত্মাকে একটা পর্দ্দার আড়ালে - সে পর্দ্দা যতই সূক্ষ্ম বা পাতলা হউক না কেন, পর্দ্দার আড়ালেই ফেলিয়া রাখিয়াছেন—গেটের মধ্যে ছিল চিন্তা-জগতের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, বায়রণের ছিল প্রাণ-জগতের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ। বাস্তবিক পক্ষে, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ যে প্রতিভাবানদের প্রতিভাকে ইন্ধন যোগাইয়া প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয় অথবা বাধা দিয়া তাহার দাম কমিয়া দিতেছে এমনও নয়। প্রতিভা-বানদের প্রতিভার ইন্ধন প্রতিভারই ভিতরে, প্রতিভার কষ্টিপাথরে প্রতিভা স্বয়ং।

দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হইতেছে মনের প্রাণের শরীরের ক্ষেত্রে—কিন্তু প্রতিভার উৎস যেখানে সেই অন্তরাত্মার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ নাই। অন্তরাত্মায় যতদিন উঠিতে পারিতেছি না, ততদিন অন্তরাত্মার যে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত স্বয়ংসিদ্ধ প্রেরণা তাহাই মনে প্রাণে শরীরে প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতেছে। এই চাপ দূরীভূত হইলে ভিতরের প্রেরণাও যে সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা নয়, বরং সেই প্রেরণা মুক্তপথে স্বরূপে স্বভাবে ফুটিয়া উঠিবে, মনে প্রাণে দেহে

সঞ্চারিত হইবে। বিরুদ্ধ শক্তির উপর ভর করিয়া দাঁড়ায় অহংকারের শক্তি, অহংকারই চায় আপন প্রতিষ্ঠার জন্য বিরুদ্ধ শক্তি; কিন্তু অন্তরাত্মার তাহা প্রয়োজন হয় না; অন্তরাত্মার শক্তি হইতেছে নিজের আনন্দের তপঃসৃষ্টি। অহংকার লুপ্ত হইলে অন্তরাত্মার বৈশিষ্ট লুপ্ত হয় না, বরং আপন প্রকৃত বৈশিষ্ট, উদার স্বাতন্ত্র্যই ভরাট হইয়া অন্তরাত্মার প্রতিভা তখন প্রবাহিত হইতে পারে।

দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের উপর—প্রতিযোগিতার উপর সমাজ যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মনে রাখিতে হইবে, সেটি একটি অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থামাত্র,বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ স্তরের সত্য। কেবল অন্তরাত্মার কোন ইঙ্গিত যতদিন মানুষের মধ্যে স্পষ্ট দেখা দেয় নাই, মানুষ যতদিন শুধুই মনের বাদ বিচার, প্রাণের অন্ধ আবেগ আর শরীরের আশু-প্রয়োজনের তাড়নায় চলিতেছে ফিরিতেছে, মানুষের 'আমি'র সীমা যতদিন এই ভোগায়তনের পরিসর টুকু অর্থাৎ মানুষ যতদিন পশু হইতে খুব বেশী বিভিন্ন নয়, ততদিন সমাজের মাৎস্য ন্যায় ব্যবস্থার প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। মানুষ যাহাতে জড় মৃত না হইয়া পড়ে, যাহাতে তাহার মধ্যে থাকে একটা প্রাণের স্পন্দন, জীবনের আবেগ সেই জন্য দরকার একটা বুভুক্ষা, একটা আত্মাভিমান। আত্মার বা অন্তরাত্মার জ্ঞান ও অনুভূতি মানুষের যখন নাই, তখন অহং এর এই ছোট আত্মাটি ভাল করিয়া চিনিতে হইবে বুঝিতে হইবে—তাহার শক্তির ও আসক্তির সকল দিক সকল সীমা দেখিয়া শুনিয়া লইতে হইবে। এই রকমেই অবিদ্যাকে যে ঘনীভূত করিয়া লইতেছে, সকল ছড়ান লুকান আঁধারকে একত্রিত কেন্দ্রগত করিয়া ধরিতেছে, কিন্তু পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তী পদবিন্যাসে বিদ্যার মধ্যে আলোকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য—উপর দিকে রাত্রি যত অগ্রসর হইতেছে ততই না দেশের অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে ?

কিন্তু অন্তরাত্মা যখন জাগিয়াছে, মানুষ অহংকারের উপরে, মন প্রাণ দেহের উর্দ্ধে তাহার গভীরতম সত্তার সন্ধান পাইয়াছে—উষার প্রথম রশ্মিটুকু যখন দেখা দিয়াছে—তখনও যদি সেই পূর্ব্বব্যবস্থা অনুসারেই সে চলিতে থাকে, তবে সেটা হইবে তাহার অধর্ম্ম, অভ্যাসের সংস্কারের জের মাত্র ; তখন তাহার ধর্ম্ম গতানুগতিকের কাঠামকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নূতন প্রাণবন্ত ব্যবস্থার সংস্থাপন —সবিতা যখন উদিত তখন সবিতারই ধর্ম্মে আমাদের কর্ম্মকে গড়িয়া সাজাইয়া উঠাইতে হইবে।

যদি জিজ্ঞাসা কর, অন্তরাত্মা জাগিয়া থাকিলে অন্তরাত্মাই ত আপন ইচ্ছামত আবশ্যকমত সব সৃষ্টি করিয়া লইবে, তবে আমাদের এ সব চেষ্টার প্রয়োজন কি

মূল্য কি, আমাদের এ সব ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পণ্ডশ্রম মাত্র কি নয়? এ কথার উত্তরে আমরা এখানে শুধু এই টুকু বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইব যে-আমাদের এই সব চেষ্টা এই সব শ্রম অন্তরাত্মারই প্রেরণার বিভিন্নরূপ, অন্তরাত্মারই আপন কর্ম্মের প্রণালীর অন্তর্গত।

মানবজাতির অন্তরাত্মা জাগিয়াছে কি না, মানুষ প্রাচীন পরিচিত অভ্যস্ত সমাজব্যবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবার মত প্রস্তুত হইয়াছে কি না, অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠানের অধিবাসী হইবার অধিকারী সে হইয়াছে কি না—এ প্রশ্নের মীমাংসা বিচারে সম্ভব নয়, ইহার মীমাংসা একমাত্র—দর্শনে পরিচায়তে। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে বৃথা প্রমাণ সাজাইবার যত্ন হইতে আমরা বিরত হইলাম।

তদ্‌গত।

[শ্রীকালিদাস রায়]

সখি—তোমার পায়ের পরশ পেতে
মোহন চূড়া হেলে থাকে
ঘুরে—বদন কমল-মধুর আশে
নয়ন-ভ্রমর ফাঁকে ফাঁকে।
তোমার তনু আলিঙ্গিতে
নেচে নেচে চুমা নিতে
লীলায়িত হলো তনু
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকে।
লুলিত এ বাহু দুটী
লতিয়ে পড়িছে লুটী
কটি তোমার কণ্ঠ তোমার
জড়াইতে পাকে পাকে॥
গতি বিধি জানাতে সই
পায়ে নূপুর পরে লো রই
তোমার লাগি বাজাই বাঁশী
বাঁশী রাধারাধাই ডাকে॥

নারীর সমানাধিকার।

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

সম্ভবে কিনা বর্ত্তমান যুগেও এখনও সমস্যা। সমানে সমানে সম অধিকার। সে সামঞ্জস্যের প্রকৃত স্বরূপ সন্ধানে বাঙ্গালীর শতাব্দীর পর শতাব্দীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে,—বস্তুটা এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এই ব্যর্থতা পণ্ডশ্রমের শূন্য দীর্ঘশ্বাসে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত করে নাই,—রাখিয়া গিয়াছে সভ্যতার ভাণ্ডারে দিবার অমূল্য সম্পদ। বৈষ্ণব সাহিত্যের সৌন্দর্য্য পিপাসা,—সেই কবিদিগের রমণী-কটাক্ষের শত প্রকারের বিশ্লেষণ শ্রেণীবিন্যাস, হাস্যের অধরকুঞ্চনের রেখার পর রেখাটীকে ধরিয়া নব নব ভাবের প্রতীক রচনা, —প্রতিপদক্ষেপ পদনখ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত—দেহের ভঙ্গিমার বিভিন্ন অর্থনির্দ্দেশ,—এ সমস্ত কেবলি যে জড়-দেহের উপর নির্নিমেষ নয়ন পাতের ফল তাহা নহে,—ইহারই উপর প্রতিফলিত অন্তর্লোকের আর একটা রহস্যময় প্রকাশ, এই ভাষা এই উপমা উৎপ্রেক্ষাবলীর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত দেখিতে পাই। বেশ বুঝিতে পারা যায় তাঁহাদের সে রূপতৃষ্ণা শুদ্ধ রূপের জন্যই নহে, রূপের মধ্য দিয়া প্রেমের —অরূপের তৃষ্ণাই সেখানে প্রবল।—এই দিক দিয়া তাঁহাদের বিচার করিলে বলিতে হয়, তাঁহাদের কাছে নারীত্ব হেয় হয় নাই, একটা মর্য্যাদাই পাইয়াছে। কিন্তু আজ,—এই বিংশ শতাব্দীতে অবিকল সেই শ্রেণীর মর্য্যাদাতে আমরা পরিতুষ্ট হইব না। এ মর্য্যাদা সেই নারীকে দেওয়া হইয়াছে যে নারীর পদবী হইতে আজ আমরা উঠিতে চাহিতেছি।—এ মর্য্যাদা আমাদের কাছে বৈদেশিক মর্য্যাদা। আমরা সে জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে ইহার দ্বারা নারীত্বের আংশিক তৃপ্তি হয় মাত্র,—পরিণতি আদৌ হয় না।

এই ভাবপ্রবণ প্রেমিকের দল আমাদের বুঝিতে আসিয়া আমাদের মধ্যে আপনাদের হারাইয়াও ফেলিয়াছেন, আর তাহার ফলে এমন অমৃত উঠিয়াছে যাহার আস্বাদ বাংলা আজও ভুলিতে পারে নাই,—কোনও দিন পারিবেও না। সেটাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই আমি চাহিতেছি যে ইহাকেও অতিক্রম করিয়া উঠিতে হইবে। এখানে তোমরা মাত্র একটা উপায়ের সন্ধান পাইয়াছ তোমাদের নিজেদের বুঁদ করিয়া রাখিয়া অনন্তের স্বাদটুকু পাইবার। জানিও ইহা প্রতিফলিত পদার্থ। চতুর্দ্দিক খিতাইয়া উঠিলে যে যোগৈশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠিবে,

অনেক সন্তর্পণে একটা দিক খিতাইয়া লইয়া সেখানে ও তো তাহারই একটু প্রতিবিম্ব দেখা মাত্র। পথের মাঝে একটী বৃক্ষতল পাইলে সেখানে অনন্তকাল বসিয়া বিশ্রাম চলে না। গন্তব্য আবাসের কথা মনে থাকা চাই।

শুধু বৈষ্ণব নহে, তান্ত্রিক সাধকের মধ্যেও দেখিতে পাই,—এই নারীকে প্রাত্যহিক প্রাকৃত সুখময় জীবনের অবজ্ঞা হইতে ঊর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা। এ সাধনায় পুরুষ প্রেমে নারী হয় নাই, পুরুষ থাকিয়াই,—রক্তমাংসের আস্বাদের মধ্য দিয়া নর নারীর ব্যবধানের মধ্যে মানুষে মানুষে যে উগ্রতা হিংস্রতা ফুটিয়া উঠে, সেটাকে শক্তিপ্রয়োগে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়া,—সরসতা ও সজীবতায় রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে অমানুষী চেষ্টা পাইয়াছে। ভারতের দুর্ভাগ্য, জড়ত্বের প্রভাবে এখানের বায়ুমণ্ডল আর্দ্রবাষ্পে সমাচ্ছন্ন, সঙ্কল্পের প্রাণময়ী বিদ্যুৎ-শিখা সহজেই স্তিমিতপ্রভ হইল,—সে প্রেরণা অনুষ্ঠানের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কতকগুলি উপধর্ম্মের প্রসূতি মাত্র হইয়াছে। হায়রে! এতখানি মঙ্গলেচ্ছার এমন পরিণাম!

ইহাই হয়। গতানুগতিকে নূতনে সন্ধি চলে না। মঙ্গল সঙ্কল্পটাকে সে দিন কেহ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করে নাই। সহজে কাজ সারিতে গিয়া ধর্ম্মের নামে একটা কুহক-সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছিল। মঙ্গল সঙ্কল্প ঘুলাইয়া উঠিবে বিচিত্র কি? —আর যাহাকে তুলিবার চেষ্টা তাহাকে তাহার আত্মদায়িত্ব সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে হয়। বালক বাখিয়া কাহাকেও মানুষ করা চলে না। এ সব কথা সে দিন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

এ সমস্ত সত্ত্বেও আমি ইঁহাদের কাহাকেও পরিত্যাগ করিব না।—ইঁহারাও যে সোপানের এক একটী ধাপ। যতটা হইয়া গিয়াছে আমি তাহারই পরিণতি চাহি। যে প্রেরণা পরকীয়া প্রেম উপধর্ম্মের উপলক্ষ্য, যে প্রেরণা পঞ্চ মকার চক্রের উপলক্ষ্য, আর গতানুগতিকের যে সতর্ক সন্দিগ্ধ শক্তিময় দৃঢ়তা ইহাদের বিরোধী, আমি সকলেরই অনুবর্ত্তন করি। এই সমস্ত নব নব মতের উত্থান সংগ্রাম পতন, তারপর উপধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়া গতানুগতিকের কুক্ষিতলে আশ্রয় লাভ, সমস্তকে শ্রদ্ধাপূত দৃষ্টি দিয়া অন্তরে অন্তরে চিনিয়া লইয়াই আমি সেই অভিজ্ঞতার উপর অতীত অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতা দিবার প্রয়াস পাইব। আমি জানি, আজ নয়, বাংলায় বহু বহু শতাব্দী ধরিয়াই আমাদের তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। নারীর উন্নতির আন্দোলন নাম আমি এই সমস্তকেই দিব। ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত ইহার পথ প্রদর্শক নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আন্দোলন ইহার

সূত্রপাত নহে। ইহারা সুদূরপ্রবাহিত একটী ধারার তরঙ্গ (Episode) ইহাই বলিতে পারি।

এ কথা কেহ বুঝিবে না যে আমাদের সম্বন্ধে হৃদয় বৃত্তির স্পষ্টতা, সত্যের উপলব্ধি, ভারতের আধ্যাত্মিকতারই অঙ্গবিশেষ। জগতের সহিত আপনার সম্বন্ধ নির্ণয়ই ত আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। আমাদের নারী ও নরের পরস্পর পার্থক্যের উপরই ত জগৎপ্রপঞ্চের ভিত্তি, সুতরাং এটার মধ্যে যত রহস্য আছে সমস্তের মীমাংসা না করিলে জগৎপ্রপঞ্চ চক্ষু হইতে মুছিবে কেমন করিয়া ?

অনন্ত চেষ্টার ব্যর্থতা স্তরে স্তরে জমিয়া নিরেট প্রস্তরাকারে বাঙ্গালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া একটা নিরাশার অন্তঃপুর রচনা করিয়াছে। ইহারই চলিত নাম গোঁড়ামী। এই পুরপ্রাচীর ভেদ করিয়া সেখানে তুলিতে হইবে চেতনার, আত্মার, তড়িৎ স্পন্দন। এবাব বার বার আত্মপরীক্ষার পর তবে যেন আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামি। যে অশুদ্ধতা বার বার দূষিত তড়াগের শৈবাল দামের মত সরিয়া আবার আসিয়া মুক্ত স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে এবার যেন অব্যর্থ হস্তে তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া পূতিপঙ্ক সহ চিরতরে বিনষ্ট করিতে পারি। এবারের কার্য্যে সত্যকার সাফল্য আনিতে হইবে। প্রত্যেক বারের পদ্ধতিতে যে ভ্রম প্রমাদ ছিল সে সমস্তই আমার ভগবান চক্ষের উপর দেখাইয়া দিতেছেন। যে দুর্ব্বলতা ছিল তাহার উপরে উঠিবার জন্য আমার ভগবান আকর্ষণ করিতেছেন। আজ সেই স্পর্শে প্রজ্বলিত অগ্নির মত তপশ্বাসী অন্তরাত্মা বলিতেছে তপঃ, তপঃ, তপঃ, !

নারীর উন্নতিতে শুধু নারীরই উন্নতি হইবে না,—হইবে জাতির উন্নতি। নারীর আত্মার উদ্বোধন একা তাহার জন্য নহে, ইহার উপর সমগ্র মনুষ্য স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন নির্ভর করিতেছে। এত বড় পরিণাম এত বড় জয় যাহাদের তপস্যার লক্ষ্য তাহারা আশ্বস্ত হও। তপস্যা আরম্ভ হইয়াছে। উত্তরসাধক স্বয়ং ভগবান। এস উদ্বুদ্ধ আত্মা সর্ব্বজড়তা নামাইয়া রাখ, সংশয় সন্দেহ তর্ক বিতর্ক কিছুই নহে। আপনাকে এই প্রবাহের মুখে সঁপিয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে তোমার চিৎপ্রকাশ কেমন প্রখর কিরণে জলিয়া উঠিয়াছে।

গোড়ার ভাব ধরিয়াই আমি অগ্রসর হইব। আমি হিন্দু। আমি জানি আমার হিন্দুত্ব আচারে নহে অভিমতে নহে অনুষ্ঠানে নহে আমার হিন্দুত্ব আমার সত্যে। আমার নিগূঢ় সিদ্ধ স্বভাবে। আমার স্বাভাবিক প্রেরণার বহর মধ্যে

একত্বের অনুভব চেষ্টায়। জানি ভারতের সমগ্র ইতিহাসের মধ্য দিয়া বহু বহু সংঘর্ষে এই অনুভবের পূর্ণতার উপরেই হিন্দুর হিন্দুত্ব আপনার বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। জানি হিন্দুর জাতীয়তা বিকাশে এখনও পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নাই। এখনও অনন্ত সম্ভাবনা। তাই আমার প্রেরণার স্বরূপ, আমার মধ্য দিয়া যাহা প্রকাশিত হইবে তাহা কি সমস্তই আমি বুঝিতেছি · · ·

নর নারীর বিভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যটাকে সত্য করিয়া দেখাটা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম একত্বে। ধর্ম্ম প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আত্মার মধ্যে পরস্পরের সাক্ষাৎকার। এই দিক দিয়াই আমি নরনারীর সমানত্বের উপর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিব। জানি অপর কোনও উপায়েই তাহা হইবে না। কোনও ফাঁকি নাই কোনও ইন্দ্রজাল নাই। পথ এই একমাত্র, যে পথে চলিলে অমোঘ ভাগবত বিধানে আপনিই সমস্ত সম্পন্ন হইবে।

বৈষ্ণব প্রেমের মধ্য দিয়া নারীকে তুলিতে গিয়া নারীত্বের কাছে আপনি প্রতিহত হইল। নারীর দিক দিয়াই সমষ্টির পতন হইল। শাক্ত আপনাকে বড় করিয়া নারীত্বকে উঁচাইয়া যাইবার সাধনা করিয়া ছিল পুরুষের দিক দিয়াই সমষ্টির পতন হইয়াছে। অতিপৌরুষ কিংবা অপৌরুষ কোনওটায় নারীত্বকে উঁচাইতে পারিবে না। নারীত্বের খোলস হইতে নারীকে বাহির করিতে হইলে স্বতন্ত্র একটা তৃতীয় পন্থা চাই। পথ সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান হইবে অস্ত্র। শক্তি প্রেম আধার হইতে অজস্র ধারেই ঝরিবে কিন্তু সে আধার ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত। তাহাতে আর "আমি" বলিয়া কিছু নাই। আছে ইচ্ছা, যে ইচ্ছা ভাগবত ভাব হইতে উদ্ভূত, আর চেষ্টা, যে চেষ্টায় জাতিভেদ নাই, সে আধিকারিক পুরুষের আপনার জীবন যজ্ঞ, কেবল সমষ্টির কথাই তাহার গ্রাহ্য।—এই পথের শেষেই একত্ব আসিবে।

ভাবটা পরিপাক করা বড় কঠিন, বুঝিয়া উঠাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইতেছে তাহা জানি। জীবন ছাড়িয়া উর্দ্ধে ব্রহ্মানন্দে বিভোর থাকিয়া একত্ব মধ্যে পার্থক্যকে ডুবাইয়া দেওয়া চলে,—অন্যত্র সম্ভবে না—বিশেষ আবার নরনারীর মধ্যে? আর এ পার্থক্যেরও ত একটা দিক আছে সেটা অনাদি অনন্ত সৃষ্টির চিরন্তন সামগ্রী। নর এবং নারী, এ ত মানুষের কল্পিত পার্থক্য নহে, এ ত স্রষ্টার সৃষ্টি বিশ্ববিধানের অঙ্গ। ইহাদের মিশাইয়া এক করিবে কি করিয়া? একি কখনও সম্ভব?

সম্ভব বৈকি, তবে সম্ভাবনার স্বাভাবিক দিকটা দেখিবার চক্ষু যে আমাদের

গিয়াছে। যে ভাবে সমস্ত ঘুরাইয়া দেখা আমাদের অভ্যাস তাহাতে এই সরল সত্য বুদ্ধিগোচর হইতে বহুদিন লাগিবে জানি।

আমি ত বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছি কোনও কিছুকেই আমি অস্বীকার করি না। আমি সমস্তেরই সার্থকতা স্বীকার করি। আমার এ একত্ব পার্থক্যকে ঘুচাইয়া নহে ত, সমস্ত পার্থক্যকে সামঞ্জস্যে শৃঙ্খলিত করিয়া,—তাহাদের খণ্ডের ধর্ম্ম-গুলিকে উপচিয়া দিয়া সেই প্লাবিত অগাধ অতলতার উপর।

যে ভাবে বিশ্ব বিধান অব্যাহত যে ভাবে প্রকৃতির সৃজন শক্তি অফুরন্ত, সেই ভাবের অনুপ্রেরণা উদ্দীপ্ত হইয়া নর নারী পরস্পর পার্থক্যের মধ্যে যে মাধুর্য্য যে রস তাহা স্বীকার করিবে কিন্তু লক্ষ্য থাকিবে তাহারই দিকে যে উদ্দেশ্য এই পার্থক্যের উৎসমূল। এই যৌন ও ভাগবত জীবনের একত্র সম্মিলন, একই ক্ষেত্রে জীবন ও সত্যের আস্বাদ এ সত্যই অপূর্ব্ব। সত্যই এখনও অনাবিষ্কৃত। কিন্তু ইহারই মধ্যে নর নারীর পূর্ণতা। তাহাদের পার্থক্যের সফলতা ও পরিণতি। আর ইহাই হিন্দুত্বের ভবিষৎ বিকাশ। বহুদিন হইতে এমনি একটা মীমাংসার জন্ত বাঙ্গালী বারেবারে বিচিত্র ভ্রমের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

নর নারী উভয়েই যখন এই একত্বের সাধনায় পরস্পরের মূলউৎস বুঝিতে পারিবে, সমগ্র জীবন যে একের ইঙ্গিতেই পরিচালিত তাহা বুঝিবে, তখন বহুর মধ্যেও একের মূর্ত্তিই পরিলক্ষিত হইতে থাকিবে। একত্বই থাকিবে লক্ষ্য, বহুত্ব হইবে উপায় মাত্র।—এইরূপে আমরা আধ্যাত্ম সাধনায় অন্তরে সমান হইব। বাহিরের সমান অধিকার সে ত তখন তাহারই অনিবার্য্য ফল।

সহজ দান।

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।]

তোমার অন্তর হ'তে যা, দেবার আছে,
তোমার মর্ম্মের মাঝে যে বাণী বিরাজে,
নির্ভয়ে সহজে তুমি তাহা দিয়া যাও,
সে বাণী অকুণ্ঠকণ্ঠে জগতে শুনাও।

ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে ল'য়ে ফিরি' দ্বারে দ্বারে,
বাড়ায়োনা নিতি আর নিজ দৈন্য-ভারে,
বাহিরের রত্ন—সে যে অন্তরের ছাই,
বাড়ে তাহে' কমেনা তো প্রাণের বালাই।
তার চেয়ে দিয়া যাও দুমুঠি ভরিয়া
তোমার প্রাণের গাথা নিঃশেষিয়া হিয়া;
হউক সে ক্ষুদ্র আজ সকলের কাছে,
সত্যের অমর বীজ তাহে রহিয়াছে।
এক দিন মুকুলিত হ'বে তার আশা,
ধ্বনিবে সহস্র কণ্ঠে তা'র মৌন ভাষা,
জাগিয়া উঠিবে সুপ্ত স্তম্ভিত ধরণী
একদা শুনিয়া তা'র মহাপ্রতিধ্বনি।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাণিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল তখন সেখানে চার পাঁচ জনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটিও পয়সা নাই, ছেলেরা সকলেই বাড়ী ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মা বাপদের কাছ থেকেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ছেলেদের আর কিছু জুটুক আর নাই জুটুক দুবেলা দু'মুঠা ভাত ত চাই! দু একজন বন্ধু মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন আর স্থির হইল যে বাগানে শাক সব্জীর ক্ষেত করিয়া বাকি খরচটা উঠাইয়া লওয়া হইবে। বাগানে আম, জাম, কাঁটালের গাছও যথেষ্ট ছিল। সেগুলা জমা দিয়াও কোন্ না দু দশ টাকা পাওয়া যাইবে? আর আমাদের খাইতেও বেশী খরচ নয়—ভাতের উপর ডাল আর একটা তরকারী। অধিকাংশ দিনই আবার ডালের মধ্যেই দুই চারিটা আলু ফেলিয়া দিয়া তরকারীর অভাব পুরাইয়া লওয়া হইত। সময়াভাব হইলে খিচুড়ীর ব্যবস্থা। একটা মস্ত

সুবিধা হইল এই যে বারীন তখন ঘোরতর ব্রহ্মচারী। মাছের আঁশটী পর্য্যন্ত বাগানে ঢুকিবার হুকুম নাই; তেল, লঙ্কা একেবারেই নিষিদ্ধ।

উপার্জ্জনের আরও একটা পথ বারীন্দ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—হাঁস ও মুরগি রাখা। কতকগুলা হাঁস ও মুরগি কেনাও হইয়াছিল; কিন্তু শেষে দেখা গেল যে তাহাদের ডিম ত পাওয়াই যায় না; অধিকন্তু তাহাদের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। কতক শেয়ালে খায় কতক বা লোকে চুরি করে। অধিকন্তু আমাদের পাড়া পড়শীদের আমাদের বাগানে মুরগি রাখা সম্বন্ধে বিষম আপত্তি। একদিন একজন হাড়ি তাড়ী খাইয়া আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া মুরগি পালনের যে রকম ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া গেল তাহাতে তাড়াতাড়ি মুরগি কয়টাকে বেচিয়া ফেলা ছাড়া আর আমাদের উপায়ান্তর রহিল না। হাড়ি বাবুটীর নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তা' না হইলে ব্রাহ্মণসভায় লিখিয়া তাঁহাকে একটা উপাধি জোগাড় করিয়া দিতাম।

আমাদের বাজে খরচের মধ্যে ছিল—চা। ওটা না থাকিলে সংসার নিতান্তই ফিকে ফিকে, অনিত্য বলিয়া মনে হইত। বিশেষতঃ বারীন চা বানাইতে সিদ্ধহস্ত। তাহার হাতের গোলাপী চা, ভাঙ্গা নারিকেলের মালায় ঢালিয়া চক্ষু বুজিয়া তারিফ করিতে করিতে খাইবার সময় মনে হইত যে ভারত উদ্ধারের যে কয়টা দিন বাকি আছে সে কয়টা দিন চা খাইয়াই কাটাইয়া দিতে পারা যায়।

প্রথম দিনেই বারীন আইন জাহির করিয়া দিল যে নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে। তা ত বটেই; বাগানের ভিতর ত আর বাহিরের লোককে ঢুকিতে দেওয়া যায় না—বিশেষতঃ পয়সার অভাব। কিন্তু চিরদিন বাড়ীতে মায়ের হাতের আর মেসে ঠাকুরের হাতের রান্না খাইয়া আসিয়াছি। আজ এ আবার কি বিপদ! পালা করিয়া প্রত্যহ দুই দুই জনের উপর রান্নার ভার পড়িল। সুতরাং আমাকেও মাঝে মাঝে রন্ধন বিদ্যার নিগূঢ় রহস্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেও ও বিদ্যাটা কখনও বড় বেশী আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই।

থালা, ঘটী, বাটীর নাম গন্ধ বাগানে বড় বেশী ছিল না। প্রত্যেকের এক একটা নারিকেল মালা আর একখানা করিয়া মাটীর সানকি ছিল; তাহাই আহারাদির পর ধুইয়া মুছিয়া রাখিয়া দিতে হইত। কাপড় সকলেই নিজের হাতে সাবান দিয়া কাচিয়া লইত; যাহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান, তাহারা পরের কাচা কাপড় পরিয়াই কাজ চালাইয়া দিত।

ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের নানা জেলা হইতে প্রায় ২০জন ছেলে আসিয়া জুটিল। তাহাদের মধ্যে ৫।৭ জন অধিকাংশ সময় কাজকর্ম্ম লইয়া থাকিত, আর যাহারা বয়সে একটু ছোট তাহারা প্রধানতঃ পড়াশুনা করিত। পড়াশুনার মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজনীতি ও ইতিহাস চর্চ্চা, আর কর্ম্মের মধ্যে বিপ্লবের আয়োজন। অনেক রকম ছেলে আসিয়া আমাদের কাছে জুটিয়াছিল। কলেজী বিদ্যার হিসাবে কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা মূর্খ, কিন্তু এখন মনে হয় যে অনন্যসাধারণ একটা কিছু সকলেরই মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইস্কুলের মাষ্টার মহাশয়দের কাছে যে সব ছেলে পড়া মুখস্থ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া গণ্য, অনেক সময় দেখিয়াছি তাহারা মনুষ্যত্ব হিসাবে "ভাল ছেলেদের" চেয়ে ঢের বেশী ভাল। ইংরাজীতে যাহাকে adventurous বলে, আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে সে রকম ছেলের স্থান নাই! ঘ্যান ঘ্যান করিয়া পড়া মুখস্থ করা তাহাদের পোষায় না; কাজে কাজেই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্যজ্যপুত্র। কিন্তু যেখানে জীবন মরণ লইয়া খেলা, যেখানে আমাদের ভাবী ডেপুটী-ম.র্কা ছেলেরা এক পা আগাইয়া গিয়া দশ পা পিছাইয়া আসে, সেখানে ঐ "দাগী" "বখাটে" "লক্ষ্মীছাড়া" ছেলেগুলাই হাসিতে হাসিতে কাজ হাসিল করে।

বাগানে ছেলেদের বারীনের কাছে রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম। দেবব্রতর তখন বাগানের কাজকর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু ছিল না, কিন্তু তাহার মনটা তীর্থস্থানে সাধু দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কাজ কর্ম্ম তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না।

প্রথমেই গিয়া আলাহাবাদে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় দুই চারিদিন পড়িয়া রহিলাম। বাজারের পুরি কিনিয়া খাই, আর লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকি। মাঝে মাঝে এক একবার উঠিয়া এ সাধু ও সাধুর কাছে ঢু মারিয়া বেড়াই। মাঝে একজন স্থানীয় বন্ধু জুটিয়া আমাদের 'ঝুসি' দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম গঙ্গার ধারে শিয়ালের মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া দুই চারিজন সাধু সেই গর্ত্তের মধ্যে বাস করিতেছেন। এক জায়গায় দেখিলাম একটী সিন্দুর মাখান রাম মূর্ত্তি, সম্মুখে ভক্ত প্রদত্ত চার পাঁচটী পয়সা, আর পাশেই একটী ছাইমাখা সাধু হাঁপানিতে ধুঁকিতেছেন। শুনিলাম মাটীর নীচে সাধুদের সাধন ভজনের জন্য অনেকগুলি ঘর আছে; কিন্তু আমাদের বন্ধুটীর নিকট সাধনের যে রকম বীভৎস বর্ণনা শুনিলাম তাহাতে দেবব্রতরও সাধু দর্শনের আগ্রহ অনেকটা কমিয়া গেল।

প্রয়াগ হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এক ধর্ম্মশালায় কিছুদিন পড়িয়া রহিলাম। মাঠের মাঝখানে একখানি ছোট কুঁড়েঘর বাঁধিয়া এক জটাজুটধারী বাঙ্গালী সাধু সেখানে থাকেন। প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিবামাত্র তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল তত্ত্বকথা ও থুথু সমান বেগে ছুটিতে লাগিল। বাবাজী আহারাদির কোনও চেষ্টা করেন না, তবে তাঁহার কাছে ভক্তেরা যা প্রণামী দিয়া যায়, তাঁহার একজন গোয়ালা ভক্ত তাহা কুড়াইয়া লইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সাধুকে দুধসাগু তৈয়ার করিয়া দেয়। ঐ দুধসাগু খাইয়াই তিনি জীবনধারণ করেন। থুথু ও তত্ত্বকথা সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি এক গেরুয়া পরিহিতা, ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী আমাদের কম্বল দখল করিয়া বসিয়া আছেন। দেবব্রত ব্রহ্মচারী মানুষ, স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে না; সে ত ভৈরবীকে দেখিয়া প্রমাদ গণিল। এই সন্ধ্যার সময় তাহার পর্ব্বত প্রমাণ বিপুল দেহ-ভার লইয়া বেচারা কম্বল ছাড়িয়া যায়ই বা কোথায়? ভৈরবীর আপাদ মস্তক দেখিয়া দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি চান?

ভৈরবী—"আমি সাধুসঙ্গ করতে চাই।"

দেবব্রত—"সাধুসঙ্গ করতে চান, ত আমাদেব কাছে কেন? দেখছেন না আমরা বাবুলোক, আমাদের পরণে ধুতি, চোখে সোণাব চশমা?"

ভৈরবী—"তা হোক, আমি জানি আপনাবা ছদ্মবেশী সাধু।"

ভৈরবী ঠাকরুণ সেখান হইতে নড়িবার কোনই লক্ষণ দেখাইলেন না। শেষে অনেকক্ষণ তর্কবিতর্কের পর দেবব্রতই রণে ভঙ্গ দিয়া সে রাত্রি এক গাছ তলায় পড়িয়া কাটাইয়া দিল।

কিন্তু ভৈরবী হইলে কি হয়, বাঙ্গালীর মেয়ে ত বটে। সকাল বেলা ঘুরিয়া আসিয়া দেখি, কোথা হইতে চাল ডাল জোগাড় করিয়া ভৈরবী রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন। বেলা ১০টা না বাজিতে বাজিতে আমাদের জন্য খিচুড়ী প্রস্তুত। কামিনী-কাঞ্চনে ব্রহ্মচর্য্যেব ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, কিন্তু কামিনীর রান্না খিচুড়ী সম্বন্ধে শাস্ত্রের ত কোন নিষেধ নাই, সুতরাং আমরা নির্ব্বিবাদে সেই গরম গরম খিচুড়ী গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে তবে ভৈরবী আহার করিতে বসিলেন। দেখিলাম বাঙ্গালীর মেয়ের স্নেহ-ক্ষুধাতুর প্রাণটুকু গৈরিকের ভিতর দিয়াও ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

বিন্ধ্যাচল হইতে চিত্রকূটে আসিলাম। ষ্টেসনে নামিতে না নামিতে ছোট বড় মাঝারি অনেক রকমের পাণ্ডা আমাদের উপর আক্রমণ করিল। আমরা

যে তীর্থ দর্শন করিয়া পুণ্য-সঞ্চয়ের বুদ্ধি হইতে চিত্রকূটে আসি নাই, এ কথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিয়া তাহাদের বুঝাইলাম। কিন্তু তাহারা ছিনেজোঁকের মত আমাদের সঙ্গে লাগিয়াই রহিল। তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় আমরা পাণ্ডাদের আস্তানা ছাড়িয়া নদীর ধারে একটা পোড়ো ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া আড্ডা গাড়িলাম। কিন্তু পাণ্ডাদের অদ্ভুত অধ্যবসায়। পাঁচ সাতজন আমাদের ঘিরিয়া বসিয়া রহিল। তীর্থে আসিয়া ঠাকুর দর্শন করে না—এ আবার কেমন তীর্থযাত্রী। তিন চার ঘণ্টা বসিয়া থাকিবার পর গালি দিতে দিতে একে একে সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল—কেবল একটী ১০।১২ বছরের ছোট ছেলে নাছোড়বান্দা। সে তখনও বক্তৃতা চালাইতে লাগিল। একখানি হাত আপনার পেটের উপর রাখিয়া আর একখানি হাত দেবব্রতর মুখের কাছে ঘুরাইয়া বলিল—"দেখ, বাবু—যে জীবাত্মা, সেই পরমাত্মা। আমাকে খাওয়ালেই তোমার পরমাত্মার সেবা করা হবে।" পেটের জ্বালার সঙ্গে পরমার্থের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া দেবব্রত হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"দেখ, তোর কথাটার দাম লাখ টাকা। তবে আমার কাছে এখন অত টাকা নেই বলে তোকে এ যাত্রা একটা পয়সা নিয়েই বিদায় হতে হবে।"

যে ঠাকুর বাড়ীতে আমরা পড়িয়া রহিলাম, তাহার চারিদিকে গাছে গাছে বানর ছাড়া আর কোন জীবের দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত না। সেখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে রেওয়ার রাজা বৈষ্ণব সাধুদের জন্য একটা মঠ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। সেখানে "আচারী" ও "বৈরাগী" প্রধানতঃ এই দুই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধুরা থাকেন। তাঁহাদের দুই একজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইত।

একদিন সকাল বেলা বসিয়া আছি এমন সময় সেখানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তিনি যুবা পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৩২।৩৩, পরিচয়ে জানিলাম তাঁহার জন্মস্থান গুজরাত; তাঁহার গুরুর আদেশ অনুযায়ী এই অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। আমাদের যে রাজনীতির সহিত কোনও সম্পর্ক আছে তাহা তিনি কি করিয়া টের পাইলেন, ভগবানই জানেন। দুই একটা কথার পরই তিনি আমাদের বলিলেন—"দেখ, তোমরা যে মনে কর, এ অঞ্চলের লোক দেশের অবস্থা বুঝেনা—সেটা মিথ্যা। সময় আসিলে দেখিবে ইহারাও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইয়া আছে।" আমরা কথাটা চুপ করিয়া শুনিলাম—

দেখি শ্রাদ্ধ কোন্ দিকে গড়ায়। তিনি বলিতে লাগিলেন—"দেখ, তোমাদের একটা কথা বলিয়া রাখি। বিশ্বাস কর ত কথাটা খুবই বড়, আর না কর ত বাজে কথা বলিয়া ফেলিয়া দিও। জগতে ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের জন্ম ভগবান্ আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন; তবে এখনও প্রকট হন নাই। তাঁহাকে নরদেহে টানিয়া আনিবার জন্যই যোগীদের সাধনা; সে সাধনা এবার সিদ্ধ হইবে। ভারতের দুঃখ তখনই ঘুচিবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এ সংবাদ জানিলেন কিরূপে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্বে হনুমানজীর সাধন করিতাম। অনেক সাধন করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় একবার নিরাশ হইয়া দেহত্যাগ করিতে যাই। সেই সময় হনুমানজী আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া এই আশার সংবাদ আমাকে দিয়া জান।" ব্যাপারটা সন্ন্যাসীর মাথার খেয়াল, কি ইহার মূলে কোন সত্য আছে তাহা ভগবানই বলিতে পারেন।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আমরা একবার অমরকণ্টক যাইব স্থির করিলাম। বিন্ধ্য পর্ব্বতের যেখান হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তি, অমরকণ্টক সেইখানে। কোন্ ষ্টেসনে নামিয়া কোথা কোথা দিয়া যে সেখানে গিয়াছিলাম এই দীর্ঘকাল পরে তাহার সবই ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু মনে আছে যে রাস্তায় একজন আসামী ভদ্রলোকের বাড়ী অতিথি হইয়া দিন দুই বেশ চব্যচোষ্য আহার করিয়াছিলাম। বিন্ধ্য পর্ব্বতটা কিন্তু আমাদের ভাল লাগিল না। পাহাড়টা কেমন নেড়া নেড়া মনে হইতে লাগিল। শৃঙ্গসম্বলিত হিমালয়ের কেমন একটা প্রাণকাড়া সৌন্দর্য্য আছে; বিন্ধ্যাচলের তাহার নামগন্ধও নাই। তিন চার দিন চড়াই উৎরাই এর পর যখন অমরকণ্টকে পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম উহা আশ্রমের উপযুক্ত স্থান একেবারেই নয়। চারিদিকে শুধু বনজঙ্গল আর মাঝখানে একটা ভাঙ্গা ধর্ম্মশালায় জনকয়েক রামায়ৎ সাধু বসিয়া গাঁজা খাইতেছে। যেখানে পাহাড় হইতে বুদ্ বুদ্ করিয়া নর্ম্মদার ধারা বাহির হইতেছে সেখানে নর্ম্মদা দেবীর একটা ছোট মন্দির আছে; তাহাও সংস্কারাভাবে নিতান্তই জীর্ণ। অমরকণ্টক এককালে যে বৌদ্ধদিগের তীর্থ ছিল তাহার নিদর্শন এখনও সেখানে বর্ত্তমান। ব্রহ্মদেশীয় পাগোদার মত অনেকগুলি কাঠের মন্দির সেখানে রহিয়াছে। কোন কোনটার মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি এখনও প্রতিষ্ঠিত, কোথাও না অন্য সম্প্রদায়ের সাধুরা বুদ্ধমূর্ত্তি সরাইয়া দিয়া রাম বা কৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। চারিদিকে শালবন, সেখানে বাঘের দৌরাত্ম্যও যথেষ্ট। আশপাশের গ্রাম হইতে গরু ছাগল প্রায়ই

বাঘে লইয়া যায়। যখন দুই চারজন মানুষকে লইয়া বাঘে টানাটানি করে তখন রেঁওয়া রাজ্যের সিপাহীরা এক শ' বৎসর আগেকার মুঙ্গেরী বন্দুক লইয়া গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করে। সাধারণ লোকেদের ও বাঘের হাতে মরা সহিয়া গিয়াছে। জঙ্গলে ঢুকিবার আগে তাহারা বাঘের দেবতার পূজা দেয়, তাহার পরেও যদি বাঘে ধরে, ত সেটাকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সাধুদেরও সেই অবস্থা, তবে তাঁহারা নর্ম্মদা পরিক্রম করিতে বাহির হইবার সময় প্রায়ই দল বাঁধিয়া বাহির হন। এই নর্ম্মদা-পরিক্রম আমার বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। অমরকণ্টক হইতে আরম্ভ করিয়া পদব্রজে নর্ম্মদার ধারে ধারে গুজরাত পর্য্যন্ত যাইতে ও গুজরাত হইতে পুনরায় নর্ম্মদার অপর পার ধরিয়া অমরকণ্টকে ফিরিয়া আসিতে চার পাঁচ বৎসর লাগে। কোন কোন স্ত্রীলোককে গণ্ডি খাটিতে খাটিতে নর্ম্মদা পরিক্রম করিতে দেখিয়াছি।

অমরকণ্টকের চারিধারে ১০।১২ ক্রোশ পর্য্যন্ত বনে জঙ্গলে ঘুরিলাম, কিন্তু আমাদের আশ্রমের উপযোগী স্থান কোথাও মিলিল না। পাহাড় হইতে অগত্যা নামিতে হইল। নামিয়াই দেখিলাম—বারীনের চিঠি বলিতেছে "শীঘ্র ফিরিয়া এস।"

ব্রাহ্মণ।

(শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিশ্বের দুয়ারে আজি হে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ।
বৃথা কেন শোক কর ব'সে,
ভেবে দেখ নিঃস্ব তুমি কিসে।
অনন্ত জ্ঞানের খনি হৃদয় তোমার,
অনন্ত ত্যাগের ফল প্রাণ,
সেই তুমি—ত্যাগাদর্শ জগতের,
চাহ কার দান?

শূন্যের অনন্ত পথে হে পুণ্য-ব্রাহ্মণ !
উঠেছিল আশ্বাসের গান,
তুমি—তুমি—তুমি তার প্রাণ।
লক্ষ্যভ্রষ্ট ছুটেছিল ব্যাকুলা ধরণী,
বেঁধে দিলে সুক্ষ্ম প্রেম ডোরে,
সেই তুমি—প্রেমাদর্শ জগতের,
ভাস আঁখি লোরে !

বনানী বাছিয়া নিলে হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ,
শম-দম-তপঃ শৌচ ক্ষমা—
তুমি মাত্র তোমার উপমা।
ক্ষত্রে প্রদানিলে তুমি সসাগরা ধরা,
ভিক্ষাবৃত্তি জীবিকা তোমার,
সেই তুমি—জ্ঞানাদর্শ জগতের,
কেন মোহ-ভার !

ধর্ম্মের আসনে বসি' হে কর্ম্মী-ব্রাহ্মণ,
জগতের শিক্ষা দিলে দান,
কেবা আছে তোমার সমান ?
তোমার কর্ম্মের ফল বৈশ্যে সমর্পিয়া,
ধর্ম্মমাত্র আশ্রয় তোমার,
সেই তুমি—ধর্ম্মাদর্শ জগতের,
কি অভাব তার !

শক্তির ভাণ্ডার তুমি হে মুক্ত ব্রাহ্মণ,
শক্তি নিজে শক্তি ভিক্ষা করে,
বসে আছ কাহার দুয়ারে !
সেবাব্রত প্রচারিলে শক্তির সন্ধান,
শূদ্র তার ফল মধুময়,
সেই তুমি—সেবাদর্শ জগতের,
কর কার ভয় !

হে কর্ম্মী, হে জ্ঞানী ত্যাগী, মুক্ত ব্রাহ্মণ!
বারেক উঠিয়া দেখ চেয়ে,
তোমারি সাধনা ফলে জেগে ধরণী,
তুমিই উজানে গেছ বেয়ে!

প্রতিবাদ।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।)

A Seeker after truth and Helper of his comrades
Thy charity extend, if not thy ear, friend—"

আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে' শ্রদ্ধেয় শ্রীযুৎ জগদানন্দ রায় মহাশয়ের নাম স্বাক্ষরিত 'ভৌতিককাণ্ড'-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখে পরম উৎসাহে পড়তে আরম্ভ করলুম এই আশায় যে প্রেততত্ত্ব যখন পাশ্চাত্যদেশের মনীষী বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা বহুকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচিত হচ্ছে, তখন আমাদের দেশের একজন জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখক নিশ্চয়ই কিছু নূতন তত্ত্বের সন্ধান দেবেন। কিন্তু প্রবন্ধটী পড়া শেষ করে বুঝলাম, রায় মহাশয়ের উদ্দেশ্য নয়, কোনো নূতন তত্ত্বের খবর দেওয়া, উদ্দেশ্য হচ্ছে এ জাতীয় আলোচনাকে মামুলি-যুক্তিতে বিদ্রূপ করে, হেসে উড়িয়ে দেওয়া। কাজেই খুব নিরাশ হলাম, শুধু নিরাশ বল্লে সব কথা খোলসা করে বলা হয় না, খুবই ব্যথিত হলাম; এবং রায় মহাশয়ের হাসিঠাট্টার সুর দেখে একটু রাগলামও বটে—যদিচ সে রাগে তাঁর কিছু এসে যাবে না, আমারই ঘরের ভাতের ধ্বংস হবে।

দুঃখ হল মনীষি বৈজ্ঞানিক সার অলিভারের প্রাণপণ সত্যসাধনাকে লক্ষ্য করে তিনি ব্যক্তিগত বিদ্রূপ করেছেন! এবং তাঁর জীবনব্যাপী আলোচনা গবেষণাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাঁর বিশ্বাস বা মতকে ব্যক্তিগত জরাদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। জগদানন্দ বাবু যে ইচ্ছা করে এই প্রবীণ সত্যসাধককে ঠাট্টা করেছেন তা মনে হয় না, এ তাঁর অজ্ঞতা ও নিজ বিশ্বাসের প্রতি অতি-শ্রদ্ধার ফল। একটা বিরুদ্ধ মতকে ঠাণ্ডামেজাজে শিষ্ট-আইনে আলোচনা করবার মত মনের উদারতা ও ধৈর্য্যের অভাব অনেক গুণী জ্ঞানীরই কাজে ও কথায় দেখা যায়, রায় মহাশয়কেও আমরা এই শ্রেণীর সমালোচক,

ভাবে দেখবো সে আশা করিনি বলে তাঁর প্রবন্ধের ধরণে আরো ক্ষুন্ন হয়েছি। আমি অন্ততঃ এইটুকু তাঁর কাছে আশা করেছিলাম যে, সাধারণ দরের লোকের চেয়ে গুণী-জ্ঞানী সত্যকামী ধরাপূজ্য পণ্ডিতদের মত বিশ্বাস সম্বন্ধে লিখিত পরিচয় দিতে গেলে তিনি একটু সাবধানে ভেবে চিন্তে কথা বলবেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। আমরা নির্দোষভাবে অনেক সময় মহাত্মনদের কাজ-কর্ম নিয়ে হাস্যরহস্য করতে গিয়ে তাঁদের প্রতি বড় অবিচার করে বসি, এবং সত্যপ্রচারের পক্ষেও বড় ক্ষতি করে বসি। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে হয়তো রায় মহাশয়ের একটা স্বভাব বা সংস্কারগত বিরাগ আছে, তা থাকতে পারে, অনেকেরই আছে ও ছিল; কিন্তু নিজের জন্মগত সংস্কারের খাতিরে একটা আধুনিক আলোচ্য তত্ত্বকে হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ সত্যপিপাসু পণ্ডিতকে বিদ্রূপ করাটা খুব রুচিসংগত কাজ বলে মনে হয় না।—রায়মহাশয় প্রবন্ধ শেষে মত প্রকাশ করেছেন—পুত্রশোকাতুর জরা জীর্ণ বুড়া লজের মতিগতি এখন সান্ত্বনার আশায় ভূতের আশ্রয় লইতেছে।

কিরূপ মানসিক তর্কপ্রণালী অবলম্বন করে যে রায়মহাশয়—সার অলিভারের প্রেতবাদে বিশ্বাস নিয়ে এ রকম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন তা বোঝা খুব শক্ত নয়। তর্কপ্রণালীটা হচ্ছে এই-যথা—'ভূতে প্রেতে বিশ্বাসটা অজ্ঞানী কুসংস্কারীর ধর্ম, সভ্য শিক্ষিত, উন্নত লোকের শোভা পায় না, বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়ে ভূতপ্রেতে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস খুবই লজ্জার কথা, মানসিক অপভ্রংশ, বা বুদ্ধিবিকার না হলে এমন মতিগতি হয় না, তা যদি হয় তবে লজ্‌ একজন বৈজ্ঞানিক হয়ে ভূতে বিশ্বাস করলেন কেন? ঘোর সমস্যা বটে! লজ্‌ যে একজন বড়দরের বৈজ্ঞানিক তার ভুল নেই, আবার ভূতে বিশ্বাসবান্, তারও ভুল নেই; এখন এমন কেন হল? লজ যে বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক জগতের মুখে কালি দিয়ে বসলেন! কি করে বিজ্ঞানের Prestige বাঁচানো যায়—এই হল রায়মহাশয়ের মনোগত সমস্যা। বিজ্ঞানের মুখ রক্ষা করতে গেলে বলতে হয় —'হয় লজ বৈজ্ঞানিক নয়' না হয় তাঁর Senile decayর বা পুত্রশোকের ধাক্কায় মতিগতি বিকল হয়েছে। কিন্তু লজ বড় বৈজ্ঞানিক অস্বীকার করা যায় না, ergo প্রতিপন্ন হচ্ছে বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোকে তাঁর এমন দুর্গতি ঘটেছে।'

সার অলিভারের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে রায় মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করেছেন সে গুঢ় তত্ত্বটী আমিও রায়মহাশয়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেই পেয়েছি। কারণ

একজনের কাজের কারণ নির্ণয় দূর হতে আর একজনকে করতে হলে তাঁর মনস্তত্ব-সাগরে ডুব দিতে হবেই।

আর রায়মহাশয়ের উদ্দেশ্যই যে বিজ্ঞানের মুখরক্ষা তা বোঝা যায় এই হতে যে তিনি লজ সাহেবকেই বাঁচাতে ব্যস্ত। সার কনান্ ডয়েলের প্রেতবিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামান নাই, কারণ সম্ভবতঃ এই, যে ইনিতো কল্পনা-কুশল গল্প লেখক, স্বভাবে খেয়ালী, ওঁর বিশ্বাস অবিশ্বাসে বিজ্ঞানের লাভ ক্ষতি নাই।

সে যাক। লজ সাহেবের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যে দায়িত্ব-হীন উক্তি করেছেন, সেরূপ দায়িত্বহীন উক্তি অন্ততঃ নির্দোষ রহস্যচ্ছলে করা হলেও অনেক সময় বড় অপ্রিয় ফলের ও তর্কের অবতারণা হয়। আমার মনে হয় এই কথা কটীতে রায়মহাশয় খুব সম্ভব না জেনে দুটী অপরাধ করেছেন, প্রথম সার অলিভারের মত প্রবীণ নিঃস্বার্থ বিজ্ঞানবন্ধুকে একটা ব্যক্তিগত স্বার্থের বশীভূত হওয়ার দোষে দুষী করেছেন। দ্বিতীয় একটা নূতন সত্য বা তত্বের রহস্যভেদের বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টাকে হেয় জ্ঞান করেছেন — আমি যদি এই অনুমান ভুলভাবে করে থাকি তাহলে রায়মহাশয় আমায় মাফ্ করবেন। তবে কেন যে আমি এই দুই সিদ্ধান্ত করলাম তার কারণ দেখাচ্ছি।

আমার প্রথম সিদ্ধান্ত রায় মহাশয়ের নিজ উক্তির উপর নির্ভর করেই হয়েছে। সরল ভাষার সিধা অর্থ ধরে মানে করলে তাঁর লিখিত উক্তি হতে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। যে কেউ এটা পড়েছেন তিনিই এমনি বুঝেছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত আমার প্রথমেরই করোলারী। কোনো এক নিরপেক্ষ তত্ব-অনুসন্ধিৎসুকে হীন স্বার্থ দ্বারা গবেষণায় নিযুক্ত বলে দোষারোপ করলে প্রকারান্তরে সেই তত্ব উদ্ঘাটনের পথে বাধা দেওয়া হয়। যাঁরা সত্যই এই ব্যাপারটা বুঝতে চান তাঁরা যদি আমার প্ররোচনায় বিশ্বাস করেন যে আমি অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী বা স্বার্থের লোভে, সুখের লোভে এই তত্ব আলোচনা করছি, তা হলে উৎসুক ব্যক্তিরা স্বতঃই এই তত্বে শ্রদ্ধাহীন হবেন। কাজেই যেখানে একজনের জীবনব্যাপী চেষ্টার ফলে একটা অজ্ঞাত জ্ঞান রাজ্যের রহস্য প্রকাশ হবার নিস্বার্থ চেষ্টা হচ্ছে এবং চেষ্টা সফল হলে মানুষের জ্ঞান বাড়বে, সেখানে সেই লোক বা তাঁর চেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের পারতপক্ষে খুব সাবধানী ও শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়াই উচিত।

রায় মহাশয় স্বমুখেই স্বীকার করেছেন যে যে বিষয়ে লজ, ক্রুকস্ ওয়ালেস্, জেমস্, সেজউইক প্রভৃতি বিজ্ঞানধুরন্ধরেরা তদ্গত তন্ময় হয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন, সে বিষয় হেসে উড়িয়ে দেবার মত জিনিস নয়, আর হেসে উড়িয়ে দেওয়ার দিনও নেই। রায় মহাশয় নিশ্চয়ই খপর রাখেন যে, পাশ্চাত্য দেশের যাবতীয় পণ্ডিতরাই হেসে উড়িয়ে না দিয়ে স্বচেষ্টায় একটা বৈজ্ঞানিক সভা করে আজ ৩০বৎসর যাবৎ এই তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। আর আলোচনা সভার কাজ লোক চক্ষুর বা জ্ঞানের অন্তরালেও হচ্ছেনা, প্রকাশ্য ভাবেই হচ্ছে।—এবং observation ও experiment এই দুই বিজ্ঞান সঙ্গত উপায়েই আলোচনা গবেষণা হচ্ছে—ফাঁকি জুয়োচুরী বা লোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে নয়। এবং রায় মহাশয় এও জানেন যে ঐ দুই উপায়ে (Obs. & Exp). প্রাপ্ত fact সত্য বলে সিদ্ধান্ত হলে বৈজ্ঞানিকরা তাদের কারণ নির্ণয় জন্য একটা Hypothesis করেন, এবং যে Hypothesis দিয়া বেশী ভাগ সত্য ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মে সহজ ভাবে ব্যাখ্যাত হয় তাকেই working hypothesis বলে গণ্য করা হয়। পরে নূতন facts আবিষ্কৃত হলে এবং উক্ত মতে ব্যাখ্যাত না হলে সেটাকে অগ্রাহ্য করা হয়। তিনি বিজ্ঞানাচার্য্য, তাঁকে এসব কথা শোনানো আমার ধৃষ্টতা মাত্র, তবে নিজের কথা পরিষ্কার করে বলতে হচ্ছে বলে এসব কথা। অলৌকিক এই সব ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে গবেষণা কারী পণ্ডিতেরা দুটী Hypothesis খাঁড়া করেছেন। প্রথম :—Telepathy অতীন্দ্রিয় উপায়ে ভাব চালনা। দ্বিতীয়—প্রেতঘটিত (Spirit Hypothesis)। সাইকিক্যাল রিসার্চকারীরা উপস্থিত দুইদলে বিভক্ত। একদল (অল্প সংখ্যক) Telepathy মতের সমর্থক। দ্বিতীয় দল প্রেতবাদী, ইহারা সংখ্যায় বহু। সার অলিভার এই দ্বিতীয় দলভুক্ত। উপরন্তু আজ ৩০ বৎসরেরও অধিক কাল হতে তিনি এই মতের সমর্থক। তিনি তখন মাত্র ৪০ কি ৫৫ বৎসর বয়স্ক। তখন তিনি পুত্র শোকাতুর হন নাই।

১৯১১ সালে প্রকাশিত তাহার Survival of Man নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"The first thing we learn, perhaps the only thing we clearly learn in the first instance is Continuity, etc. page 339। তাঁহার পুত্র রেমণ্ড ১৯১৫ সালে বর্ত্তমানযুদ্ধে মারা যান।

রায় মহাশয় একটু কষ্ট স্বীকার করে যদি অলিভার লজের রচিত গ্রন্থ গুলি বা প্রেতত্ত্ব সভার বিবরণী গুলি অপাঠ্য বলে অগ্রাহ্য না করে পড়েন তা হলে বুঝবেন প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস পুত্রশোকাতুর বুড়া লজের ভীমরতি নয়, পক্ষান্তরে বহু বর্ষব্যাপী ধীর গবেষণার ফল।

কোনো একটা নূতন মত আমার বুদ্ধির ধারণাতীত বলে বা হাল-ফ্যাশান অনুযায়ী নয় বলে যদি না মানি তাহলে আমি আমার প্রকৃষ্ট বুদ্ধির নিজে তারিফ করতে পারি, অন্য সত্যপ্রিয় বিবেচকরা তা করবেন না।

আর এক কথা বুড়া লজের ভীমরতি বা বুদ্ধিবিকার হলেও আর যত উক্ত মতাবলম্বী পণ্ডিতাগ্রগণ্য আছেন তাঁরাও কি ঐ রকম সব একটা স্বার্থের আশ্বাসে বা বিকৃত বুদ্ধিফলে এই মত মেনেছেন? আবার কেমন সব পণ্ডিত? যাঁরা জড় বিজ্ঞান শাস্ত্রের এক রকম জন্মদাতা বল্লেই হয়। রাসেল, ওয়ালেস্, উইলিয়ম ক্রুক্স, লম্ব্রোসো, রিসেট্, লর্ড র‍্যালে সব বিজ্ঞান ধুরন্ধর। দার্শনিক-রাজ হ্যারি বারর্স, সেজ উইক, উইলিয়ম জেমস্ এঁরাও কি বিকৃতবুদ্ধি? আমরা নকল ভাষায় যাঁদের বই পড়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের শুধু তকমা পেয়েছি এ-হেন আমরা যখন ও-হেন পণ্ডিতদের মতামত নিয়ে রহস্য বিদ্রূপ করবো তখন আমাদের উচিত একটু ভেবে চিন্তে মত প্রকাশ করবো। জোর আমি বলতে পারি, "সার লজ্ বা অমুকের সিদ্ধান্তটা তেমন মনে ঠেক্‌ছেনা। আমি সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ভাল করে ওজন করে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না"। এর বাইরে আমি যদি যাই বা কিছু বলি এবং অবহেলা করে বলি তা হলে লোকে আমার বুদ্ধির বা রুচির বাহবা দেবে না নিশ্চই।

আবার কেমন ধরণ গ্রাহ্য এই সব Evidence? Times পত্রিকার এক লেখক বলছেন "The standard of evidence required by Psychical Researchers is about five times stricter than that required to hang a man for murder. Mr. Podmores' standard is several degress stricter than that!" Dr. Haldar, Psy. Re. Page 6.

এমনি ভাবে ওজন করা হাজার হাজার evidence এই সভা সংগ্রহ করেছেন। এই সব evidence লব্ধ fact কোনো যথার্থ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এমনি ভাবে পরীক্ষিত সব সত্য ঘটনাকে কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন্ম-সন্দেহবাদী দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা বিদেহ-আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। অতঃপর আমি সে সব মানিনি

বলুলে প্রকারান্তরে দুটী কথা বলা হয়, প্রথম আমি অভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ—দ্বিতীয় আমি ছাড়া আর সব পণ্ডিত হয় বোকা, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হয় ইর্ষ্যাকরে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক। যদি আমার সর্ব্বজ্ঞ-আমি অভ্রান্ত হন তা হলে অবশ্য অপর যে সব 'তুমি' 'তিনি' তাঁরা মিথ্যাবাদী বা ভুলবাদী। এখন পাঠকদের ওপর ভার এইটার সত্য নির্ণয় করা যে সারাজীবন ধরে হাতে কলমে যে সব পণ্ডিত পরীক্ষা করছেন তাঁরা ভুল করছেন, কি উদাসীন আনাড়ী আমি ভুল করছি।

কেহ যদি আত্ম সমর্থনের জন্য বলেন এই সভার সংগৃহীত ঘটনা গুলা বা সাক্ষ্যপ্রমাণ গুলা যে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ তার প্রমাণ কি? উত্তরে এই বক্তব্য যে এই সভায় এমন সব নামজাদা সভ্য আছেন যাঁরা প্রেতবাদ আদৌ মানেন না, যাঁদের attitude ঘোর সন্দেহ বা অবিশ্বাসের—এমন সব লোকের চোখে ধুলা দিয়ে কাজ করবার সাহস প্রবৃত্তি বা শক্তি কারো হতে পারেনা—বিশেষ যখন গণ্যমান্য সত্যপিপাসু পণ্ডিতদের নিয়ে এই সভা।

রায় মহাশয় কি বলতে চান জানিনা। তাঁর যদি মনোগত ভাবটা এই হয় যে লজ বা কনান ডয়েল প্রভৃতির credulity অতিমাত্রায়; কেবল বিশ্বাস করবার ঝোঁকেই বিশ্বাস করেন, তা হলে তিনি সমস্ত তত্ত্ব না জেনে এদের উপর অবিচার করেছেন।

তিনি নিজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক তর্কে প্রেতবাদটা যে মিথ্যা বা ন্যায়সঙ্গত নয় প্রমাণ করতে গেলে তাঁকে এর বিরুদ্ধে বিশ্বাস্য সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে হত, পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের অন্ধ আশ্বাস বিশ্বাস বলে বিদ্রূপ করে ওড়ালে তাঁকে কেউ বাহাদুরী দেবে না। সে ক্ষমতা বা তদুপযোগী পড়া শুনা বা সময় যদি তাঁর না থাকে তা হলে তাঁর সম্ভ্রমের সঙ্গে বলা উচিৎ ছিল,—"বিষয় আমি জানিনি শুনিনি কিছু, বা আলোচনা করিনি, অন্ততঃ না জেনে শুনে পণ্ডিতদের জীবনব্যাপী গবেষনার নিতান্ত বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাইনি"। বিবেচক লেখকের পক্ষে এই ভাবটাই সমীচীন নয় কি? লজ সাহেব যেন বৃদ্ধ ও পুত্র শোক বিকৃত, ক্রুক্‌স্ ওয়ালেস্, জেমস্, লম্‌ব্রসো, সার কনান্ ডয়েল এঁরাও কি তাই?

পণ্ডিতপ্রবর ক্রুক্‌স্ উক্ত S. P. R. এর সভাপতি হয়ে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যে অভিভাষণ করেন তা হতে একটু তুলে দি, রায় মহাশয় ধৈর্য্য ধরে একটু শুনবেন কি?—"Thirty years have passed since I published an account of experiments tending to show that outside our scientific.

knowledge there exists a force exercised by *intelligence differing from the ordinary intelligence* common to mortals * * To ignore the subject would be an act of cowardice, an act I feel no temptation to commit—To stop short in any research that bids fair to widen the gates of knowledge, to recoil from fear or adverse criticism is to bring reproach on science." There is nothing for the investigator to do but to go straight on to explore up and down, inch by inch with the taper of reason, to follow the light wherever it may lead, even should it at times resemble a will o-wisp. I have nothing to retract." সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকপ্রবর Huxleyর জ্ঞানগর্ভ কথাক'টী ভুলবেন না—Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abysses Nature leads."

যথার্থ বৈজ্ঞানিকের এই মনোভাব, আর কার্য্যধারা ; এবং প্রবীণ বিজ্ঞানচার্য্য সার অলিভার এই ভাব ও এই ধারা বজায় রেখে ৩০ বৎসরব্যাপী সাবধান গবেষণার পর বল্ছেন—"Every kind of alternative explanation including the almost equally unorthodox one of *telepathy from living people* have been tried and these attempts have been perfectly legitimate. If they had succeeded, well and good, but in as much as in my judgment there are phenomena which they cannot explain and in as much as some form of spirit hypothesis given some postulates explains practically all I have found myself driven back on what I may call the commonsense explanation" Raymond page 369.

পাঠক দেখিবেন—সার লজ্ কেবল জ্ঞানের খাতিরে বিশ্বরহস্য ভেদ চেষ্টায় ব্যস্ত, পুত্রশোকাতুর হৃদয়ে আশ্বাস পাবার জন্যে ভূতের আশ্রয় নেন নি, অথচ তাঁর উপর এই মিথ্যা উদ্দেশ্য আরোপ করে রায় মহাশয় একজন নিষ্কাম সত্যসেবীর মর্য্যাদা লাঘব করেছেন মাত্র। আর লজ্ নিজে পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ হলেও ওয়ালেস্ ক্রুক্স্, জেমস্, ব্যারেট, মায়ার্স প্রভৃতি মনীষীরা সে রকম কোনো শোকের খাতিরে প্রেততত্ত্বের আশ্রয় নেন নি।

রায় মহাশয় বৈজ্ঞানিক লেখক এবং আচার্য্য, কাজেই তাঁকে আর ছুটা ধার করা চোখা কথা না শুনিয়ে থাকতে পারলাম না—কথা আমার নয়—ঐ বৃদ্ধ বাতিকগ্রস্ত লজ্ মহাশয়ের,—"Strange facts do really happen even tho' unprovided for in our sciences. Amid their orthodox relations they may be regarded as a nuisance. * * To avoid such alien incursion a laboratory can be locked, but the universe can not."

কোনো একটা অজ্ঞেয় তত্ত্ব হঠাৎ জ্ঞানগোচর হলে এবং তার কার্য্যপদ্ধতি আমাদের rule-and-thumb lineএর দ্বারা ব্যাখ্যাত না হলে আমরা ভারি উত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠি। এবং নিজেদের 'সর্ব্বজ্ঞ অভ্রান্ত আমি'র উপর আমরা এমনি বেশী বিশ্বাসবান যে 'প্রমাণসত্ত্বেও তাদের সত্যতা মানতেই চাইনে, অপর কেউ বিশ্বাস করবার কারণ পেলে তাকে নিজেদের তুলনায় বোকা এবং বিদ্‌কুটে মনে করি। ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত C. Flamman'on তাঁর "The Unknown" পুস্তকে একটা ভারি মজার গল্প বলেছেন, রায় মহাশয়কে সেইটি শোনাতে চাই। গল্পটী খুব বড় বলে, তার সার সঙ্কলন দিচ্ছি। আসল পুস্তকের ৩—৪পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। আমি (Famman'on) ফরাসী বিজ্ঞান সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। Dr. Moncil সেদিন Edisonএর Phonograph পণ্ডিত সভায় প্রথম নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখান। হঠাৎ আমাদের সভার এক সভ্য জনৈক নামজাদা পণ্ডিত—Dr. Moncilএর কাছে গিয়ে রেগে চোখ লাল করে বেচারী Moncilএর গলা ধরে চীৎকার করে বলে উঠলো Wretch, we are not to be made dupes by a ventriloquist"। পণ্ডিত প্রবর হচ্চেন M. Bouilland। ঘটনার তারিখ ১১ই মার্চ্চ ১৮৭৮ সাল। উক্ত পণ্ডিত তারপর ছ-মাস ধরে নিজে যন্ত্রটী পরীক্ষা করে মত প্রকাশ করেন "nothing in the invention but ventriloquism—it was imposible to admit that vile metal could perform work of human phonation!"

হায়রে মানুষ!—"this puny philosopher not six feet high"। বিশ্বের রহস্য সমুদ্রে আমাদের lead-line যে তলা পায় না তা মানবো না—মানবো কি? না অকূল রহস্য সমুদ্রটা আমারি এই দড়িরই মাপেরই গভীর!

কিন্তু খোলা-মন উদার-দৃষ্টি বিজ্ঞানজ্ঞানাভিমানীর ঠিক attitude হচ্ছে বিশ্বাস করা যে "even floating weeds of novel genera may foreshow a land unknown," এবং জ্যোতির্ব্বিৎ হর্শেলের কথায় এরূপ বৈজ্ঞানিকের উচিত "to believe that all things are not improbable and hope all things not impossible." সার অলিভার এই জাতীয় সত্যসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিক।

আচার্য্য Barrett ঠিকই বলেছেন যে, "The splendid and startling discoveries made by Sir W. Crookes in physical science were universally received with respect and belief but his equally careful investigation of psychical phenomena were dismissed by most scientific men as unworthy of serious attention!"

আচার্য্য লজ যখন তাঁর 'Lodge-coherer' বা গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বললেন তখন সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ, সেই লজ যখন বলছেন, যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে মানুষের আত্মা দেহান্তে সজ্ঞানে থেকে কাজ কর্ম্ম করে, খপরাখপর আদান প্রদান করে তখন তাঁর মাথা পুত্রশোকের ধাক্কায় বেকল হয়ে বস্‌লো।

মোট কথা দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ অজ্ঞ মানুষও যেমন অবিশ্বাস-অতিবিশ্বাসের দাস, শিক্ষিত সংস্কৃতবুদ্ধি পণ্ডিতও তেমনি অবিশ্বাস অতিবিশ্বাসের মোহে কাণ্ডজ্ঞান হারান।

নাস্তিক হিউম বলতেন—"আমি Miracle মানি না, কেন না এ সব ঘটনা মানুষ জাতের পূর্ব্ব-পরিচিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না।" তা যদি বৈজ্ঞানিকের মন্ত্র হয় তা হলে Arago যা বলেছেন তা ঠিক—"where should we be if we set ourselves to deny everything we do not know how to explain?" আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তো Radium এর কাণ্ড খাপ খায় না - তবে Radium তত্ত্ব কি মায়া? রজ্জুতে সর্পভ্রম?

এ যুগে জন্মে এই কথাটা আমরা যেন ভুলিনে যে পাগলা হ্যামলেট একটা বড় মস্ত সত্য কথা বলেছিল, There are more things in heaven and earth Horatio than are dreamt of in your proud science— আর চিরপোষিত আমাদের মত গুলার মাথায় উদ্ভট প্রেতবাদ যে লাঠি মেরেছে তার চেয়ে গুরুতর লাঠি মেরে বসেছেন আপনাদের Einstein।

যাক্‌। বৃদ্ধ প্রবীণ সত্যবন্ধু জ্ঞানসাধক সার্‌ আলভার সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের যে উদ্ভট অবিচারপূর্ণ ধারণা তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে 'অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ' শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয়ের যশঃ-ক্ষুণ্ণকর দু একটা কথা বলে থাকি তা সে একটা সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের অঙ্গ মনে করে তিনি যেন আমাকে মাফ করেন।

জীবন তরী।

(শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়)

পশ্চিমের ঐ নীল আঙিনায় তারার দীপটী জ্বালি
বিশ্বরাজের পূজার বেদীমূলে
অন্ধকারের ঘোমটা টানি নীরব সন্ধ্যারাণী
নামল গলে তারার মালা দুলে।
কি যেন এক মৌন ব্যথায় স্তব্ধ বসুন্ধরা
মনটা শুধু কাঁদছে অকারণে
দিগন্তের ঐ ধূসর তটে ঢেউয়ের মত আজি
চিত্ত আমার লুটায় ক্ষণে ক্ষণে।
তরণী এক মরাল সম শান্ত নদীর বুকে
চলছে কোথা নীরব অন্ধকারে
স্কন্ধে বহি গুণের বোঝা তিনটী মানুষ বীরে
আগিয়ে চলে জলের ধারে ধারে।
শ্রান্ত ক্ষত চরণ তাদের ক্লান্ত দেহের ভার
বইতে যেন চাহিছে না গো আর
হৃদয় তাদের শান্তি লাগি ব্যাকুল অনিবার
শিশু যেমন চায়রে বক্ষ মার।
থামা তোদের প্রাণের কাঁদন ওরে মাঝির দল
ঐ যে শান্তি ঐ যে আসে পিছে;
ঐ যে তোদের ফিরিয়ে নিতে দুইটী বাহুর বল
আনছে তরী কান্না কেন মিছে?

সকাল বেলায় প্রথম যাঁহার কোমল কঠিন কর
ঠেলে তোদের দিলেন কাজের মাঝে
ভাবিস কি তাঁর তোদের তরে ভাবনা কিছুই নাই
ভুলে তোদের রবেন তিনি সাঁঝে ?
উপলময় এ কঠিন পথের যত দারুণ ব্যথা
যত নিঠুর কাঁটার আঘাত পায়
যত প্রাণের শোণিত দিয়ে আঁকা দুখের কথা
সব যে বুকে বেজেছে তার হায়!
এমনি করে প্রতি উষায় পাঠান তিনি কাজে
আবার সাঁঝে বক্ষে তুলে লন
জীবন যখন শ্রান্ত হয়ে ঘুমের লাগি কাঁদে
মরণ রূপে আসেন প্রাণের ধন।
তরণী তার এমনি করে চলছে কোন পারে
কোথায় কবে পথের হবে শেষ ?
জীবন মরণ এমনি করে নাচছে ঘুরে ঘুরে
হায়রে কোথা সেই অচিনের দেশ।

সিনফিনের জন্মকথা।

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

১৮৪৮ ও ১৮৬৭ সালের বিদ্রোহ চেষ্টা নিষ্ফল হইবার পর আয়র্লণ্ডে সকলেই একরূপ বুঝিলেন যে বাহুবলে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করা এখন বিড়ম্বনা মাত্র। এ দিকে পার্লামেণ্টে একশত বৎসর ধরিয়া বিধিসঙ্গত আন্দোলনের ফল দেখিয়া হতাশ হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দয়া ধর্ম্ম, সুবিচার, ন্যায়সঙ্গত অধিকার—এক কথায় দুর্ব্বল সবলের নিকট যে সমস্ত বুলি আওড়াইয়া কৃপা ভিক্ষা করে—সে গুলি পার্লামেণ্টের কাণে সময়ে অসময়ে ধ্বনিত করিতে আইরিসেরা ছাড়ে নাই। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

আইরিসেরা দেখিল যে জাতীয় পরাধীনতার ফলে তাহাদের পেটের

ভাতও মারা যাইতে বসিয়াছে। ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ভার বহনের জন্ম ন্যায়তঃ তাহাদের যে কর দেওয়া উচিত, পার্লামেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে তাহার অপেক্ষা বাৎসরিক ৭৫০,০০০ পাউণ্ড অধিক আদায় করিয়া লইতেছে। ইংরাজ ব্যবসাদারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আইরিস ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ের কাজকর্ম্ম চালান হইতেছে। আইরিসদেব সওদাগরী জাহাজগুলি অনেকদিন হইল মারা পড়িয়াছে। দেশে লোহা, কয়লা প্রভৃতি যা' কিছু খনিজ দ্রব্য ছিল সেগুলা খনির মধ্যেই পড়িয়া আছে। সেগুলা বাহির হইলে পাছে ইংরাজ ব্যবসাদারদের ক্ষতি হয় এই ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা সে দিকে ফিরিয়াও চান না। লোকসংখ্যা এত দ্রুতবেগে কমিয়াছে যে ইউরোপে তাহার তুলনা মেলাই ভার। ইংরাজভক্ত "অলষ্টরেরই" লোকসংখ্যা সত্তর বৎসরের মধ্যে প্রায় আধাআধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্ত দুর্ঘটনা চুপ করিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় নাই। কারণ যে কি, তাহা সকলেই জানে ও বুঝে, কিন্তু সেই সর্ব্বনাশা কারণ দূর করিবার সামর্থ্য যে কাহারও নাই।

তা' হোক, কিন্তু মানুষ সহজে হাল ছাড়ে না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ তাহার আশ। স্বাধীনতা গিয়াছে, শ্রীসম্পদ গিয়াছে—কিন্তু জাতির প্রাণটুকু যতক্ষণ ধুকধুক করে ততক্ষণ সব ফিরিয়া পাইবার আশা যায় না। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা জাতির প্রাণ। আয়র্লণ্ডের সবই গিয়াছিল, কেবল একেবারে যায় নাই গেলিক ভাষা। জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষীণ আলো ঐ দীপেই মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আয়র্লণ্ডের অতীত যুগের গৌরবকাহিনী, আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখের ইতিহাস ঐ ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। বিদেশী আসিয়া সবই কাড়িয়া লইয়াছিল, কেবল অতীতের গৌরবমণ্ডিত সুখস্মৃতিটুকু বহুদিন পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু "জাতীয় শিক্ষা"র নাম দিয়া যে দিন হইতে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাদান আরম্ভ হইল, সে দিন হইতে "গেলিক" ভাষার কপাল পুড়িল। আইরিস ইতিহাসের পঠন পাঠন বন্ধ হইল, জাতীয়-ভাব-উদ্দীপক কবিতাদি পাঠ্যপুস্তক হইতে বহিষ্কৃত হইল, এবং পিতৃ পুরুষের নাম ভুলিয়া আইরিস বালকেরা আপনাদিগকে "ব্রিটিস" নামে পরিচয় দিয়া গৌরব বোধ করিতে শিখিল। দুই এক পুরুষের মধ্যেই জাতীয় "গেলিক ভাষা" মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা তখন "সিনফিনের" উৎপত্তি। বিদেশীকে অস্ত্রবলে দেশ হইতে তাড়াইবারও সামর্থ্য নাই; আর তাহার দ্বারে "ধরনা"

দিয়াও লাভ নাই দেখিয়া কয়েক জন আইরিস স্থির করিলেন যে বিদেশীর প্রভুত্বসর্ব্ব বিষয়ে অস্বীকার করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া দেশের সমস্ত কাজ যথাসম্ভব নিজের হাতে করিতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ স্বদেশী ভাবাপন্ন হওয়ারই নাম, আইরিস ভাষায়—সিনফিন।

আইরিসেরা দেখিলেন যে জাতীয় ভাব বাঁচাইতে গেলে আগে জাতীয় ভাষা সাহিত্য বাঁচাইতে হয়, এবং সেই উদ্দেশ্যেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে "গেলিক লিগ" নামক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাথলিক হোক, প্রোটেষ্টাণ্ট হোক, সকলেই এই সভার সভ্য হইতে পারিতেন। ধর্ম্ম বা রাজনীতিসংক্রান্ত কোন প্রশ্নই সেখানে উঠিত না। "লিগ" শুধু জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও প্রচারেই মনোযোগ করিতেন। কিন্তু জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাবও পুনর্জ্জীবিত হইতে লাগিল, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ফলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজনীতির সহিত গেলিক লিগের কোন সংশ্রব না থাকিলেও উহার প্রভাব ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একটা জাতি নবজীবনের আস্বাদ পাইয়া যখন জাগিয়া উঠে তখন তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্রবিশেষে আবদ্ধ থাকে না।

গেলিক লিগ স্থাপনের পর হইতেই নানাস্থানে "সাহিত্য-সভা" স্থাপিত হইতেছিল, সে গুলি প্রাচীন "ইয়ং আয়র্লণ্ড" দলের ভাবেই বর্দ্ধিত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার গ্রিফিথ "ইউনাইটেড আইরিসম্যান' নামক সপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়া জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রবল স্বদেশী ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের জন্য যেরূপ স্বতন্ত্র পার্লামেন্টের ব্যবস্থা ছিল, গ্রিফিথ তখন তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু আয়র্লণ্ডের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হইলেও তিনি তাহা লাভ করিবার জন্য বিপ্লবসৃষ্টির সমর্থন করিতেন না। তিনি বলিতেন:—"আয়র্লণ্ডের উপর ইংরাজের কোনও অধিকার আমরা স্বীকার করিব না। পার্লামেন্টে কোনও আইরিস সভ্য পাঠাইব না, কেন না তাহা হইলে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে ইংরাজের আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে আইন গড়িবার অধিকার আছে। তবে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও আমরা করিব না, অস্ত্রধারণ অন্যায় বলিয়া নহে, সে সামর্থ্য আমাদের আপাততঃ নাই বলিয়া। আমাদের জাতীয় জীবন আমরা আত্মশক্তিবলে গড়িয়া তুলিব। প্রথমে মানসিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল।"

গ্রিফিথ নিজে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টমূলক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেও যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী তাঁহাদের প্রবন্ধাদিও "ইউনাইটেড আইরিসম্যানে" প্রকাশিত ও আলোচিত হইত।

এই সমস্ত শিক্ষার প্রভাবে আয়র্লণ্ডে কতকগুলি নূতন নূতন স্বদেশী দল গড়িয়া উঠিতেছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত Cumann nan Gaedhal (কুমান না গেঢাল) ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। মুখ্যতঃ জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ব্যায়াম চর্চ্চা ও শিল্প বাণিজ্য বিস্তার, এবং গৌণতঃ আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করাই এ সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলে এ আদর্শ স্বীকার করিল না। তাহারা বলিল—"সাময়িক রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ রাখা চাই। দেশের বুকের উপর বসিয়া যাহারা রাজত্ব করিতেছে তাহাদের অস্বীকার করিব বলিলেই তো আর তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। দেশের শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া যখন একদিন না একদিন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেই হইবে, তখন শুধু জাতীয় সাহিত্য ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দিকে মন দিলে চলিবে না, দেশকে সংঘবদ্ধ করিয়া শক্তিমান করিয়া তুলিবার ব্যবস্থাও থাকা চাই।" এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য Cumann na nGaedhal (কুমান না গেঢাল) সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে) গ্রিফিথ যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তাঁহার আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়া উঠে। সভায় স্থির হয় যে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আর যাহাতে আইরিস সভ্য না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন পার্লামেণ্টের আইরিস সভ্যেরা স্বদেশের এই অপমানজনক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেশে থাকিয়া দেশরক্ষায় ব্রতী না হন ততদিন যেন বিদেশবাসী আইরিসেরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য না করেন।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর হইতেই প্রকৃত পক্ষে সিনফিনের জন্ম। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডবলিন সহরে জাতীয় পরিষদের (National Council) প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রিফিথ প্রস্তাব করেন যে ৩০০ সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া আয়র্লণ্ডের এক পার্লামেণ্ট গঠিত হউক। ইংরাজী পার্লামেণ্টের যে সমস্ত আইরিস সভ্য ওয়েষ্টমিনিষ্টারে যাইতে অস্বীকৃত, তাঁহারাও এ নূতন পার্লামেণ্টের সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। দেশের মধ্যে যত মিউনিসিপ্যালিটী বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সভা আছে সেগুলি যাহাতে এই পার্লামেণ্টের আদেশ অনুসারে চলে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আইন ভঙ্গ না করিয়াও যে যে উপায়ে আয়র্লণ্ডকে কার্য্যতঃ ইংরাজের শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা যায় জাতীয় পরিষদ তাহারই অনুসন্ধানে করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, প্রথমতঃ শিক্ষার ভার নিজেদের হস্তে লইয়া এমন একদল যুবককে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহারা দেশের কৃষি, শিল্পবাণিজ্য ও শাসন কার্য্য পরিচালন করিতে পারে। কাউন্টী সভার (County council) তত্ত্বাবধানে যত কিছু কর্ম আছে সেই সমস্ত কর্ম্মে প্রতিযোগী পরীক্ষার ফলে এই সমস্ত যুবককে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিলে ক্রমশঃ ইহাদের দ্বারা একটা "আইরিস সিভিল সার্ব্বিস" গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দূত রাখিয়া বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। আইরিস ব্যাঙ্ক সমূহ যদি আইরিস শিল্পের উন্নতির জন্য ঋণ না দেয়, তাহা হইলে লোকে যাহাতে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আইরিসদিগের তত্ত্বাবধানে নৌ-বাহিনীর সৃষ্টি করিতে হইবে। স্বদেশী শিল্পরক্ষার জন্য আয়র্লণ্ড হইতে ইংরাজী পণ্য বহিষ্কার করিতে হইবে এবং বিচার ভিক্ষার জন্য যাহাতে ইংরাজের দ্বারস্থ না হইতে হয় সে জন্য 'সালিসী' বিচারালয় স্থাপিত করিতে হইবে। এক কথায়, দেশের মধ্যে নিজেদের একটী স্বতন্ত্র শাসনবিভাগ গড়িয়া তুলিয়া হইবে। ইহাই সিনফিনের প্রথম অবস্থার কার্য্য-প্রণালী।

দুই বৎসর কাজকর্ম্ম বেশ উৎসাহের সহিত চলিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিনফিনের চীৎকার যেন অরণ্যে রোদন হইয়া দাঁড়াইল। ন্যাসনালিষ্ট (Nationalist) দলের নেতা রেডমণ্ড তখন পার্লামেণ্টের নিকট হইতে হোমরুল আদায় করিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ। সিনফিনের নেতারাও স্থির করিলেন যে এ সময় রেডমণ্ডকে বাধা দিয়া হোমরুল প্রাপ্তির অন্তরায় হওয়া সমীচীন নহে।

১৯১০ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত সিনফিন একরূপ নির্জীব হইয়াই পড়িয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য শক্তি ধীরে ধীরে আয়র্লণ্ডে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। তাহারাই ক্রমে ক্রমে সিনফিনের সহিত মিলিত হইয়া সিনফিনকে পুষ্ট করিয়া তুলিল।

ক্রমশঃ।

বিলাপবিধুরা।

[শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রেয়]

কিশোরী কহিছে ললিতায়—
মোদেরি কপাল গুণে গোপাল বিরূপ সখি,
সে দোষে কাহারে দোষা যায়!
আহুরী দাহুরী যবে গাহিবে মিলন গান,
অঝোর নিঝর ঝরে বাদয়ে বহিবে বান,
সুনীল ফেনিল জলে ভাসায়ে মধুর তরী,
কে পার করিবে যমুনায়?

তমাল তলায় যবে বুঝিতে বঁধুর মন,
ছলনা-নয়ন জলে ভাসাব আঁখির কোণ,
আপনা পাসরি সেই দুরজয় অভিমান,
কে বলো ভাঙ্গাবে ধরি পায়?
জটিলা কুটিলা মিলি গোকুল বিকুলি যবে
কালা-কলঙ্কিনী রাধা সবারে ডাকিয়া কবে
বাঁচাতে সরম হতে ফুটা কলসীর স্রোতে—
কে আর রোধিবে বল হায়?

বরজ বিপিনে যবে শিহরি কদম ফুল
মাতাল মধুপ তানে মজাবে কামিনীকুল
শাওন মেঘের তলে অধরে বিজুলী মাখি
কে আর ঝুলাবে রাধিকায়?

ফাগুনে ফাগুয়া লয়ে ব্রজের বালক সনে
গহন কানন ঢুঁড়ি বিনোদিয়া বৃন্দাবনে
বাহুতে বাঁধিয়া প্যারী হাতে লয়ে পিচকারী
কে আর রঙ্গাবে গোপিকায়।

নিপট কপট শঠ ছুড়ায়ে যাদুর নিদ
নিঠুর কঠিন করে পাঁজরে কাটিয়া সিঁদ
হরিয়া হরষভরে আঁধার নয়ন মনি
শ্যাম যেরে গেল মথুরায়।

সাহিত্যে অনুভূতি।

(অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার এম, এ)

সাহিত্য-সমালোচনার মুস্কিল এই যে সাহিত্যের বেশীর ভাগই অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে হয় এবং জ্ঞান ও অনুভূতির পার্থক্য বিভাগ করিয়া দেখা যায় না। চোখের দেখা কতটুকু এবং প্রাণের দেখা কতটুকু ইহার কেহ স্থির নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ভালবাসিলে যে কতখানি পাওয়া যায়, যে ভালবাসে নাই তাহাকে তাহা কেমন করিয়া বুঝান যাইবে? এই জন্য ইংরাজ-কবি সেলি প্রেমকেই সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গিয়াছেন। সত্যোপলব্ধি বা সত্যের জ্ঞান এক কথা, সত্যানুভূতি, ভাবের দ্বারা সত্যগ্রহণ আর এক কথা। সত্যোপলব্ধি যেন জানার জন্যই জানা, অথবা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জানা, চিকিৎসকের যেমন রোগীকে জানিতে হয় অথবা বৈজ্ঞানিক যেমন তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। সত্যানুভূতি যেন প্রেমের দৃষ্টিতে জানা, ইহা তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে চায় না, অথচ এ জানা কত বেশী, ইহা কত আপনার করিয়া লয়—ইহাতে এমন আত্মবিহ্বলতা আছে যে ইহা পাইতে চায় যতটুকু, দিতে চায় তার ঢের বেশী,—নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়াও ইহার আত্মতৃপ্তি হয় না। সেই জন্য অনুভূতি দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতে মানবের এত আনন্দ। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এত চর্চ্চা সত্বেও আমরা শিল্প ও সাহিত্য ছাড়িতে পারি না। চণ্ডীদাস যখন আবেগের উচ্ছ্বাসে জাতিকুলমান জলাঞ্জলি দিয়া, সামাজিক সংস্কার বিলুপ্ত করিয়া রজকিনী রামীকে 'বেদবাদিনী' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন—তখন তাহা কোনও নারী বিশেষে প্রযোজ্য হয় নাই। সেই মুহূর্ত্তে প্রেমের যে স্বরূপ তাঁহার চিত্তে জাগরূক হইয়াছিল

এবং নারী-হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া অখণ্ড মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল তাহারই সামনে তিনি যে গভীর প্রণতি অনুভব করিলেন,—যেন সেই গৌরবের চরণে ধূলির সাথে ধূলি হইয়া যাইতে চাহিলেন,—তখনকার তাহার মনের সেই ভাবটীকে আকুল হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার মধ্যে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, কামনার পরপারে ভোগবিরতির মধ্যে তাহাকে লয় করিয়া ধর্ম্ম ও প্রেমের সাম্য-স্থাপন করিয়া দিলেন। ভাবের যে গভীরতা এখানে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা চলে, ভাষায় সম্যক্ স্ফুট করা যায় না, কারণ, ইহা জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়া অনুভূতিতে মিশিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক এই তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করিবার জন্য যে চণ্ডীদাস ঐ কথাটী ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নহে। খুব সম্ভবতঃ ঐ কথাটী ব্যবহার করিবার পরেও তাঁহার মনে এ সব তত্ত্ব উদিত হয় নাই। তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তায় এই তত্ত্বগুলি অস্ফুট অবস্থায় নিহিত ছিল এবং প্রেমানুভূতির গভীরতা ভাবের সহজ ধর্ম্ম অনুসারে এগুলিকে ঐ একটী কথার মধ্যে স্ফুট করিয়া দিয়াছিল।

ঠিক এই একই প্রকারে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। সাহিত্যিক ভাবের দ্বারা অর্থাৎ অনুভব করিয়া সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। জ্ঞানের দ্বারা সত্যোপলব্ধি দর্শন বা বিজ্ঞান, এবং যখন ইহা ভাবের সাহায্যে হয়, তখন তাহা অনুভূতি। কোনও বিশেষ তত্ত্ব অথবা সত্য উপলব্ধি করিয়া কল্পনার দ্বারা সাহিত্যিক তাহাকে অলঙ্কৃত করেন না এবং তাহা করিলে শিল্প হিসাবে এ সাহিত্য শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। কখনও কখনও যেমন দেখা যায় যে অনেকের সঙ্গীতবিদ্যা না জানা থাকিলেও তাঁহারা সুন্দর সঙ্গীত আলাপন করিতে পারেন,—ইহা তাঁহাদের স্বভাবধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়—সাহিত্যিকেরও তেমনই একটী ধর্ম্ম আছে যাহাতে তাঁহারা স্বভাবতঃই প্রত্যেক সত্য ভাবের দ্বারা অনুভব করিতে পারেন, অধ্যাত্মচেতনার গভীরতা স্বভাব-নিয়মে সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলেন। মিল্টন তাঁহার মহাকাব্যে যে সত্যের প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন,—মানুষের নিকট ভগবানের বিভূতি প্রকাশ করিয়া জগতের ভিত্তি মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—সে হিসাবে ধরিলে তাহার কাব্য বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যাহা প্রতিপাদন করিতে চাহেন নাই, সম্পূর্ণতা,—সার্থকতার প্রতি যে উন্মুক্ত আবেগ তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার গভীরতা হইতে উৎসারিত হইয়া শয়তান,

আদর্শ ও হবার চরিত্রে এবং সহজ সৌন্দর্য্য বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে—তাহারাই আজ তাঁহার কাব্যকে বিশিষ্টতা প্রদান করিতেছে। সাহিত্যিকের যে জ্ঞান নাই তাহা নহে কিন্তু সে জ্ঞান তিনি তাঁহার সমগ্র সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারেন না। মাতা যেমন সন্তানকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভক্তি করে—এই ভালবাসা ও ভক্তির মধ্য দিয়াই যেন তাহাদের সমস্ত জীবন সার্থকতা লাভ করিতে চায়—সাহিত্যিকও তেমনই তাঁহার সমস্ত প্রাণ দিয়া অধ্যাত্মচেতনার সম্পূর্ণতা লইয়া কোনও বিশেষ জিনিষের অথবা সত্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এইরূপ ভাবে সম্বন্ধ-স্থাপনের নামই অনুভূতি। অনুভূতি বলিলে যে কি বুঝি, ইহার সংজ্ঞা কি - তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া না যাইতে পারে, এবং সাহিত্য-সমালোচনা হিসাবে বোধ হয় তাহার প্রয়োজনও নাই; তবে এইমাত্র বলা যায় যে ইহা জ্ঞানও নহে, কল্পনাও নহে—এমন কি ভাবময় কল্পনাও ইহা নহে—ইহা জ্ঞান, ভাব ও কল্পনার সেই সুষুপ্তি অথবা সাম্যাবস্থা*—যখন ইহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না,—জ্ঞানের সহিত ভাবের, ভাবের সহিত কল্পনার ব্যবধান লুপ্ত হইয়া মন একটী অনির্ব্বচনীয়তায় পূর্ণ হয় এবং জিনিষের স্বরূপ আমাদের নিকট পরিস্ফুট করিয়া তুলে। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে অনুভূতিতে আমাদের সমস্ত অধ্যাত্মসত্তা জাগত হইয়া মনের পরস্পরবিরোধী ভাবগুলির একটী সমন্বয় করিয়া দেয় এবং চৈতন্যের মুক্ত স্রোতে অবগাহন করিয়া প্রেমের আলোতে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। অনুভূতি থাকিলেই, সহানুভূতি থাকে, এবং জিনিষের সঙ্গে অথবা সত্যের সঙ্গে সমপ্রাণতা অনুভব করিয়া তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জন্মে। এইজন্য প্রচলিত ধারণায় সহানুভূতিমূলক কল্পনাকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে এত উচ্চ আসন দেওয়া হইয়া থাকে,—কিন্তু বাস্তবিক ইহা কেবল কল্পনা নহে,অনুভূতিমূলক কল্পনা যাহা বুঝিতে হইলে মানুষের সমগ্র অধ্যাত্মসত্তা বুঝা দরকার। জ্ঞানে নহে, বিজ্ঞানে নহে, সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সমগ্র মানুষকে পাওয়া যায়। মানুষের যাহা সাহিত্যে ধরা পড়ে না, ভাব-জগতের চিরসম্পদ হইয়া যায় না তাহাতে হাজার বাহ্যাড়ম্বর থাকুক না কেন,—সভ্যতার ফেনিল উচ্ছ্বাসে তাহা পরিপূর্ণ হউক

* Wordsworth মনের এই ভাবটীকে 'wise passiveness' বলিয়াছেন। এই ভাবটীর একটী অতি সুন্দর বর্ণনা তাঁহার Tintern Abbey সম্বন্ধীয় কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়।

না কেন—কালের স্রোতে আপনিই মিশিয়া যাইবে,—তাহা ক্ষণস্থায়ী,—চঞ্চল কিন্তু যাহা একবার অনুভূতির মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে,তাহার ভিত্তি এমন একটা চিরন্তন সত্যের উপর—যে ইহা অপ্রত্যক্ষকেও প্রত্যক্ষের চেয়ে মূল্যবান্ করিয়া দেয়। ইহাকে শুধু কল্পনার খেলা বলা উচিৎ নহে, কারণ ইহা জ্ঞানের চেয়েও গভীর। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যখন তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে এক অনির্ব্বচনীয় সুষমা ও শান্তি সমস্ত প্রাকৃতিক জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিয়াছেন,—তখন তাহাকে কি বলিব, তখন তাহা কি শুধু জ্ঞানের, না ভাবের, না কল্পনার? ইহা যে কেবল জ্ঞানের নহে,—সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে, কারণ জ্ঞান দিয়া ধরিলে এ সুষমা ও শান্তি সর্ব্বত্র দেখা যায় না, অথচ ভাব ও কল্পনা যে ইহাকে জন্ম দিয়াছে,—একথাও বলিতে পারি না কারণ আমাদের মনের সহজ প্রত্যয় বলিয়া দিতেছে যে এ সুষমা ও শান্তি যেন বাহ্য-প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে জড়ান আছে। এই অনুভূতি আমাদের নিকট এতই সত্য, এমন প্রত্যক্ষ যে আমাদের সমস্ত জ্ঞান একত্র হইয়াও ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারে না।

শিল্পী যেমন অনুভূতি দিয়া সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করেন, সমালোচকও তেমনই অনুভূতির সাহায্য ছাড়া শিল্পসৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর মতে সৃষ্টি ব্যাপারটাই এমন যে ইহা জ্ঞানে ধরা দিতে চায় না, কারণ সৃষ্টির মধ্যে যে অখণ্ড গতি বর্ত্তমান, জ্ঞানের নিকট তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রাণশক্তি হারাইয়া জড়ভাবাপন্ন গুণের সমষ্টি হইয়া যায়। সাহিত্যিকের রচনাগুলির প্রকৃত বিচার করিতে হইলে ইহাদিগকে সৃষ্টি হিসাবে দেখিতে হইবে, তত্ত্ব হিসাবে দেখিলে সব সময়ে বুঝা যাইবে না। সাহিত্য-রচনার ভিতর,—প্রত্যেক শিল্প সৃষ্টিতে -এমন অনেক জিনিষ প্রচ্ছন্ন থাকে যাহা পরে জ্ঞান ও সমালোচনার সাহায্যে তত্ত্বের আকার ধারণ করিতে পারে এবং এইরূপে সাহিত্যও পরোক্ষে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করে। বাস্তবিক একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আগে অনুভূতি, পরে জ্ঞান, আগে সাহিত্য, পরে দর্শন। ঋষিরা অনুভূতি দিয়া যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পাই বেদে—সেই অনুভূতির উপর যুক্তি ও তর্ক খাটাইয়া যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল তাহা পাই বেদান্তে। বেদই যদিও বেদান্তের ভিত্তি, তবুও ইহা পাঠ করিলে বৈদিক সাহিত্য ঠিক বুঝা হয় না। সেইরূপ কোরাণ সরিফ হইতে কত দর্শন আসিয়াছে—কিন্তু কোরাণের প্রকৃত

তাৎপর্য্য কোরাণেই আছে। এগুলিকে সাহিত্য-হিসাবে বিচার করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে ভাব-নিঃসৃত যাহা, তাহাকে জ্ঞানে পরিণত করিলেই তাহার স্বরূপ বদলাইয়া যায়। ধর্মের উৎপত্তি অনুভূতিতে, তাহার পরিণতি দর্শনে। এবং ধর্ম্ম যে চিরকাল ধরিয়া মানুষের মনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার একটি কারণ এই যে, ধর্ম্ম সাহিত্যের সহিত, সৌন্দর্য্যের সহিত এমন ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট—ভাবের সহিত এতই বিজড়িত। ধর্ম্মকে তত্ত্ব বিবেচনা করিলে,—ধর্ম্ম ধর্ম্মই থাকেনা—দর্শন ও নীতিশাস্ত্র হইয়া যায়। সাহিত্যে ধর্ম্মের যে আভাস আমরা পাই তাহা অনুভূতি-লব্ধ—তত্ত্বালোচনা নহে। তত্ত্বালোচনা যুক্তির, কার্য্যকারণ পরম্পরার অপেক্ষা রাখে, সাহিত্য ভাবের সরলতা ও গভীরতা দিয়া বিচার করে, তাহাকেই যেন আপ্তবাক্য বলিয়া মানে। সে মনে করে যে যাহার মহত্ত্ব ও বিশালতা তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে যাহার সৌন্দর্য্য ও কান্তি তাহাকে উচাটন করিতেছে, যাহার প্রেম ও মঙ্গলমূর্ত্তি তাহাকে বশীভূত করিয়াছে—তাহার আবার যুক্তি কি,—তাহার হৃদয়ই যে তাহাকে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য সাহিত্য হৃদয়ের ভাষায় আমাদের নিকট ধর্ম্মের কথা বলে,—জ্ঞানের ব্যাকরণ হয়ত তাহাতে অনেক অশুদ্ধি বাহির করিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের ভাষাতেই বুঝিতে হয়,জ্ঞান দিয়া তাহার কিছু কিছু সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের যেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবেই ধর্ম্ম-কবিতা, তাহাতে তত্ত্বের কথা বড় একটা নাই' কিন্তু ধর্ম্মের অনুভূতি আছে। তত্ত্ব ও নীতি শুষ্কতর্ক, ধর্ম্ম ও সাহিত্য সরস আনন্দ। তত্ত্ব ও নীতির পথে চলিতে হইলে সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথে, প্রতিপদে আত্মসংযম ও আত্ম চিন্তা দ্বারা নিজেকে চালিত করিতে হইবে, প্রত্যেক কর্ম্ম জ্ঞানের মানদণ্ডে তুলিয়া মাপিতে হইবে, সেই জন্য নীতির পথ এত জটিল,—এত সন্দেহাত্মক, ইহাতে আনন্দ নাই, মুক্তি নাই কিন্তু সাহিত্য যে আনন্দের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম-ভাব উন্মেষিত করে—তাহাতে আমাদের আত্মা মুক্ত হইয়া যায়,—অন্তরের অপরিজ্ঞাত রহস্যের সহিত এক হইয়া, প্রাণের অবারিত গতি অনুভব করে। যে প্রেম ও প্রণতি, যে বিস্ময়-জড়িত আনন্দ জাগাইয়া তুলে, তাহাতে হৃদয় আপনিই নমিয়া পড়ে।

মনে করুন সেই দিন.যেদিন কবি শান্ত উষার নির্ম্মল বাতাসে জাহ্নবী-তীরে তাঁহার প্রেয়সীকে স্নান-অবসানে শুভ্রবসনে পুষ্পরাজি তুলিতে দেখিয়াছিলেন,

তখন ঘুবে দেবালয়-তলে উষার রাগিনী বাঁশিতে বাজিয়া উঠিতেছিল;—তাঁহার সীঁথিমূলে যে অরুণ সিঁদুর রেখা এবং তাঁহার বাম বাহু বেড়িয়া যে শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখার মত শোভা পাইতেছিল, তাহারা যে মঙ্গলময়ী মুরতি যে দেবীর বেশ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে কবির হৃদয় সহসা সম্ভ্রমে ভরিয়া অবনতশির হইয়া পড়িয়াছিল,—সেই দিনকার সেই ক্ষণিকের দর্শনে সমস্ত হিন্দু জাতির যে সুপ্ত ধর্ম্ম-চেতনা তিনি জাগাইয়া দিয়াছেন তাহা ত শুধু চোখের দেখা নহে,—ইহাকে অনুভূতি দিয়া প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া দেখিয়া লইতে হয়, এবং সেই জন্যই ইহা নিত্যকালের সামগ্রী, চির পুরাতন হইয়া গিয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শিক্ষার-বিচিত্রতায় হিন্দুর পর্ণকুটীরের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না, জ্ঞানের অভিমানে বিমুগ্ধ হইয়া হিন্দু-সভ্যতার সেই দয়াময়ী ধর্ম্মস্বরূপিণী কল্যাণীকে আমাদের লাঞ্ছিত জীবনের স্তিমিত আলোকে ফেলিয়া রাখিয়া, প্রেমিকাকেই সখীবেশে সাহিত্য-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন! তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব দিয়াছেন; জ্ঞানের দিক হইতে ধার্ম্মিকের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কিন্তু শিল্পীর এক-প্রাণতা লইয়া ধর্ম্মের এমন সহজ অনুভূতিলাভ করেন নাই যাহার সাম্‌নে আমাদের মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে। জ্ঞানের কথা যিনি বলেন তিনি ধন্য, আরও ধন্য তিনি যিনি জ্ঞানকে অনুভূতিতে লয় করিয়া দেন।

অনন্তের যে অনুভূতি কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের, "নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো", এই গানটীতে মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে তাহার গভীরতা এতই বেশী যে ধর্ম্মতত্ত্বে ইহাকে ধরা যায় না,—ইহা যেন অন্তর-ধর্ম্মের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছে,—এবং ঝুড়ি ঝুড়ি আধ্যাত্মিক কবিতার অনুনাসিক "হা হুতাশ" ধ্বনি ইহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহে। বাস্তবিক অনুভূতির তাৎপর্য্যই এই যে ইহার মধ্যে প্রাণের সরল আবেগ আছে, ইহা লাভ করিতে হইলে চাই ঋষির অন্তর্দৃষ্টির সহিত বালকের শুভ্র সরল প্রাণ। এইরূপ কবিতা পাঠে বুঝিতে পারি ধর্ম্মের সংস্কারের সহিত ধর্ম্মের অনুভূতির কি পার্থক্য! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সাধারণ ধর্ম্ম-সঙ্গীতে ধর্ম্মের অনুভূতি বড় একটা পাওয়া যায় না, ইহারা যেন ধর্ম্মের বৈঠকী গান,—সুসজ্জিত প্রার্থনা-মন্দিরের বৈদ্যুতিক আলোকে গীত হইলে, এগুলি শুনিতে মন্দ লাগে না; কিন্তু প্রকৃতির উন্মুক্ত আকাশ-তলে যেখানে শত শত চন্দ্র তারকা ঝালরের মত ঝুলিতেছে, সেখানে ইহাদের প্রতি পদই যেন মানব-মনের সনাতন

ধর্মকে প্রতিহত করিতে থাকে। রাম প্রসাদের সঙ্গীতের স্বচ্ছ স্রোতে সংস্কারের অনিত্যতা তুচ্ছ করিয়া, সামাজিক সংস্কারকে আচ্ছন্ন করিয়া ধর্মের যে অনুভূতি সহজ আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে আজিকালিকার ধর্ম-সঙ্গীতে তাহা দেখিতে পাই না, কারণ এ গুলির রচয়িতাদিগের নিকট ধর্ম অনুভূতির বিষয় না হইয়া জ্ঞানের অথবা সংস্কারের বিষয় হইয়া গিয়াছে; এবং জ্ঞানের প্রকৃতিই এই যে ইহার কতখানি নিজের এবং কতখানি পরের তাহা ঠিক করা যায় না, বাঁধিগতের মত ইহাকে আওড়ান' চলে,—আর অনুভূতি যাহা তাহাকে অনুভব করিয়া পাইতে হয়,—এবং সেই জন্যই বোধ হয় জ্ঞানকে ভাবের মধ্যে 'খাপ খাওয়ান' এত কঠিন।

বর্ত্তমান সময়ের বাদ্য-যন্ত্রের বাঁধি সুরের সহিত পূর্ব্বেকার বাদ্য-যন্ত্রের যে প্রভেদ, জ্ঞানের সহিত অনুভূতির তেমনই প্রভেদ। অনুভূতি বিশেষভাবে ব্যক্তিগত হইয়াও ব্যক্তিত্বের বাহিরে, জ্ঞান সার্ব্বভৌমিক হইয়াও ব্যক্তিত্বের ভিতরে। জ্ঞানের সুর যেন সকলের জন্য বাঁধা হইয়া গিয়াছে,—তাহাতে ব্যক্তিত্বের কোনও প্রকাশ নাই,—মর্ত্ত্য-হৃদয়ের বিচিত্র লীলা, ঘাত-প্রতিঘাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বর্গের অমল কান্তি ধারণ করিয়াছে। অনুভূতির ঝঙ্কারে ভাবের ঐক্য থাকিলেও ইহা ব্যক্তি-বিশেষের নিকট বিভিন্ন রকমে ধ্বনিত হইয়া উঠে। সত্যকে যখনই অনুভব করি, তখনই তাহার স্বরূপ বদলাইয়া যায়,—তাহা জ্ঞানের রাজ্য ছাড়িয়া বিশেষভাবে ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে,—ভাব-বস্তুতে পরিণত হয়—আনন্দের স্পন্দনে শিল্পীর সত্তা তাহার সহিত মিশিয়া গিয়া এক অনাস্বাদিত রসের পরিচয় করাইয়া দেয়। সত্যানুভূতির ভিতর এই অনির্ব্বচনীয়তা আছে। এই জন্য আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে সাহিত্যকে রসের দিক হইতে বিচার করা হইয়াছে, কারণ মানব-মনের সহিত সত্যের সংযোগে যে বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার হয়, তাহাকেই রস বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা তাহা করেন না কারণ তাঁহারা মনে করেন যে ভাবের কোনও যুক্তি-সঙ্গত শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে না, ভাবের বিশ্লেষণ চলে না। প্রত্যেক ভাবের মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহা এক হইতে অন্যকে মূলতঃই পৃথক করিয়া দেয়। ভাব অনুভব করিবার, বিচার করিবার নহে। সে যাহাই হউক আমি আমার প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে "অনুভূতি" বলিলে যাহা বুঝি তাহা শুধু ভাব-বস্তু নহে—ভাবের গভীরতা দিয়া সত্যের একটী পূর্ণতর স্বরূপ লাভ করিবার প্রয়াস হইতে

ইহা সম্ভূত। মানুষ জ্ঞান দিয়া সৃষ্টির যে রহস্যের মধ্যে ঢুকিতে পারে নাই, যেন ভাবের গভীরতা দিয়া,—সমস্ত অধ্যাত্মসত্তাকে একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করে। সাহিত্যের নিম্ন স্তরে, রস- যেখানে ভাবের জন্যই ভাব, অর্থাৎ ভাবকেই মুখ্য জ্ঞান করিয়া সৌন্দর্য্যের মুখ্য দিয়া তাহার বিভিন্ন প্রকাশই সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। সাহিত্যের উচ্চস্তরে প্রজ্ঞা,—যেখানে ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াও সাহিত্য সমস্ত ভাবকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে,—এমন একটী অবস্থায় পৌঁছিতে চায় যেখানে অন্তরের দিব্যদৃষ্টি জীবনের গূঢ়তম প্রদেশকে আলোকিত করিতে পারে। ইহার নিম্নে জ্ঞান ও কল্পনা,—উচ্চে, সমস্ত জ্ঞান ও কল্পনা বিরোধ করিয়া একটা নির্ব্বিকল্প ভাব আত্মার গভীর অনুভূতি।

সেইজন্য সাহিত্য যতই উচ্চে উঠিতে থাকে ততই যেন ধর্ম্মের সহিত ইহার ব্যবধান লুপ্ত হইয়া যায়,—সাহিত্যের পরিণতি ধর্ম্মে। কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম্ম অনেক সময়েই লৌকিক ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণ ইহা অন্তরের অন্তরতম ধর্ম্মকেই ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারের স্তর ধর্ম্মের উপর জমিয়া আমাদের প্রাণের গতি আড়ষ্ট করিয়া রাখে, তাহাদিগকে সরাইয়া অন্তর্জীবনের প্রস্রবন মুক্ত করিয়া দেয়। সাহিত্যিক সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মের কথা না বলিলেও ধর্ম্মই সাহিত্যের প্রাণ। যাহার অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতির গভীরতা যত জিনিসের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, প্রাণের স্বরূপ—জীবনের গতি—তাঁহার নিকট তত ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে,—ততই তাঁহার রচনার আভাসে ও ইঙ্গিতে যেন কোনও অপরিজ্ঞাত রহস্য নিজেকে মূর্ত্ত করিতে চায়,—মানবের ভাষা তথায় পৌঁছিয়াও পৌঁছিতে পারে না:—জীবনের ক্ষুব্ধতা ও কর্ম্মের কোলাহল শান্ত করিয়া রাত্রির মৌন-গম্ভীর স্তব্ধতা লোকলোকান্তরে প্রসারিত হইয়া পড়ে।*

সাহিত্যের এই বিস্ময়-বিজড়িত রহস্যের ভাব কেবল ধর্ম্মগ্রন্থে নহে—সর্ব্বত্রই কমবেশী পরিমাণে দেখা যায়, এবং দুঃখ, শোক ও বিয়োগের মধ্যেও

* "This unique expression (Poetry) still seems to be trying to express something beyond itself" About the best poetry and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. * * * * His (the poet's) meaning seems to beckon away beyond itself or rather to expand into something boundless which is only focussed in it; something also, "which, we feel, would satisfy not only the imagination but the whole of us." Bradley's Oxford Lecturtes.

হৃদয়ে শান্তি ধারা বর্ষণ করে। এই রহস্যকে স্ফুট করিয়া দেখিতে চাহিলে,— নিজেকে এত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় যে জীবনের ব্যর্থতার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া উপহাসের অট্টহাসি শুনিতে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন কর্ডেলিয়ার মৃত্যু-শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া অসীম রহস্যাবৃত এই মানবজীবন আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, সকল দুঃখ, সকল দ্বন্দ্ব তিরোহিত করিয়া যেন একটা পূর্ণতার আভাস ফুটিয়া উঠে, আর একদিকে তেমনই এই রহস্যের বিশালতা আমাদিগকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলে, যে আমাদের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত অহঙ্কার একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এই রহস্য ধর্ম্মে যেমন স্ফুট হইতে পারে, সাহিত্যে তেমন পারে না, কারণ এইরূপ করিলে যে সৌন্দর্য্যোপলব্ধি সাহিত্যের ভিত্তি তাহা অনেকটা ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিই এই যে সে অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে চায়, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষের মধ্যে ধরিয়া দেয়,— এই হিসাবে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতেই তাহার আনন্দ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে বাদ দিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এই রহস্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে ধরিলে তাহা যেন ছায়াতে মিলিয়া যায়, তাহার আর কোনও সত্তাই থাকে না। সাহিত্যে যে "রূপ হইতে ভাবে, ভাব হইতে রূপে অবিশ্রাম যাওয়া আসা" দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে সম্ভবপর করিতে হইলে, এই রহস্যের ভাবটাকে একটু প্রচ্ছন্ন রাখিতে হয়। ধর্ম্ম-সাহিত্য অনেক সময়েই এই রহস্যের ভাবে অতিমাত্র পরিপূর্ণ এবং সেই জন্য তাহা শিল্প হিসাবে উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। অন্য সাহিত্যও যখন ইহাতে ভরপুর হইয়া উঠে, তখন আর তাহাতে শিল্পসৃষ্টির গূঢ় মর্ম্ম সম্যক্ প্রকাশিত হয় না। কেবল অনুভূতিই সাহিত্য নহে,—যদি সেই অনুভূতিকে সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত করিতে পারা না যায়। কিন্তু তাহা হইলেও এ কথা সত্য যে এই রহস্যের আভাস না থাকিলে সাহিত্য আমাদিগকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। কারণ কেবল জড়প্রকৃতির মধ্যে বিচরণ করিয়া, সসীমের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া মানুষ কখনই সার্থক-বোধ করে না! সে তাহার সমস্ত সম্পর্কের ভিতর দিয়া, তাহার সমস্ত জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য বোধ ছাড়াইয়া অসীমের একটা ক্ষীণ স্পন্দন অনুভব করিতে চায়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও সেলি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে গিয়া অক্ষয় সৌন্দর্য্যের দ্বারে উপনীত হ'ন; সেক্ষপিয়র মানব চরিত্রের মর্ম্ম বুঝিতে গিয়া জীবনের গূঢ়তম মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া বসেন, বৈষ্ণব কবিতার মোহমুগ্ধ মানবীয় প্রেম অনন্ত

প্রেম-স্বরূপে মিশিয়া যায়, আর রবীন্দ্র নাথ তাঁহার আবেগবিহ্বল হৃদয়ের চঞ্চলতা লইয়া কখন যে সেই অসীমের কূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—সেই মায়ামৃগ ক্ষণেকের জন্ত কখন যে তাঁহার লুব্ধ নয়ন প্রান্তে দেখা দিয়াছিল,—শুক্ল সন্ধ্যার সৌম্য সৌন্দর্য্যে অশ্রুবিগলিত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহা নিজেই বুঝিতে পারেন নাই, এবং যেদিন হইতে বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কাব্যে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন সেই দিন হইতেই যেন জ্ঞানের আলোকে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

বাঙ্গলায় 'অনুভূতি' কথাটার বিশেষ সুবিধা এই যে ইহা একদিকে যেমন কোনও কিছু অনুভব করা বুঝায় আর একদিকে তেমনই কোনও কিছু অনুভব করিয়া তাহার অন্তরের স্বরূপটী উপলব্ধি করিবার প্রয়াসকেও 'অনুভূতি' বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে এমন কোনও শব্দ নাই যাহা ইহার মত শিল্প ও সাহিত্য-সমালোচনার একটী দিক্ এমন সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারে। শুধু উপলব্ধি অনুভূতি নহে কিন্তু যখন উপলব্ধির দ্বারা ভাবের উদ্রেক হয় তখনই তাহা অনুভূতি, এবং ভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে যে একটী সহজ প্রত্যয় জন্মে,—যাহার দরুণ সত্যের সহিত আমাদের ব্যবধান লুপ্ত হইয়া সত্যকে পূর্ণতর বলিয়া বোধ হয়,—ভাব-প্রণোদিত সেই প্রত্যয়কেও 'অনুভূতি' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কারণ ইহাও অনুভব করিবার বিষয়, জ্ঞান দিয়া ইহাকে প্রতিপন্ন করা যায় না। বাস্তবিক যে জ্ঞান আমাদের অনুভূতির মধ্যে আইসে নাই, যাহার ভিতরে আমরা 'রস' পাই না, তাহার সহিত আমাদের প্রাণের কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হয় না,—বিচার-বুদ্ধির প্রখরতা, কর্ম্মজীবনের জটিলতা তাহাতে বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহা প্রাণের গতির সহিত যুক্ত হইয়া আমাদিগকে প্রসারিত মুক্ত করিয়া দিতে পারে না। সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে সে জড় জগতের ও যুক্তি-বুদ্ধির প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া, জীবনে সত্যানুভূতি বাড়াইয়া জ্ঞানের সহিত ভাবের, সত্যের সহিত সৌন্দর্য্যের বিরোধ ঘুচাইতে চেষ্টা করে; এমন কি বহিঃপ্রকৃতিকেও অন্তরের লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়া মর্ত্ত্যভূমির দ্বারা মানব-জীবন সমগ্রভাবে দেখিয়া অনন্ত-প্রসারিত রহস্যের মধ্যে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া দেয়।

প্রভাতে

অসীম হ'তে উথ্‌লে উঠে
আনন্দেরি ধারা,
অসীম তারি সুখের স্রোতে
হ'ল আপন-হারা,
স্বপন মাঝে সুপ্ত ছিল
মোহের উরসে,
অরুণ রাগে আশীস্‌ জাগে
মলয় পরশে।
ভ্রমর ফুলে মিলন আশে
বেড়ায় গুঞ্জরি,
গন্ধে গানে জাগায় প্রাণে
আশার মঞ্জরী,
গহন বন মোহন হ'ল
যাহার আলোকে
নিখিল বিশ্ব তাহার শিখা
প্রাণের পুলকে।

সুখের ঘর গড়া

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত)

যজ্ঞেশ্বরী দেবী স্নান-আহ্নিক সারিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। ইতিপূর্ব্বেই মলিনী চাতালের উপর আসিয়া বৃদ্ধা মুসলমানির প্রতি কৌতূহল পূর্ণ প্রশ্ন আরম্ভ করিয়াছিল। বৃদ্ধা তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়াছিল, তার উপর কি একটা অসহ্য গুপ্ত বেদনায় তার মুখমণ্ডল অত্যন্ত করুণ দেখাইতেছিল। বুড়ী

যা' পারিতেছিল দু' একটার উত্তর দিতেছিল। কিরণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নলিনীই তার উত্তর দিয়া বলিল "চেননি দিদি একে ? এ এস্মাইলের মা, ও তার বউ—আমাদের ছাত থেকে খালপারে যে তালপুকুর দেখতে পাওয়া যায় ঐখানে ওদের বাড়ী পুবদিকের ঘরটা এদের, কে সেটা পুড়িয়ে দিয়েছে। বুড়ীর বউ জল আনিলে, বুড়ী পরম আগ্রহে. ঢক্ ঢক্ করিয়া প্রায় বদনার অধিকাংশ জলটুকু তপ্ত বালির জমির মত শুষিয়া লইল। তার পর "আরে আল্লা!" বলিয়া এমন একটী তৃপ্তিসূচক শব্দ করিল যেন বুঝা গেল তার মহাপ্রাণীটী মহাশান্তি লাভ করিল। কণ্ঠ সরস হইলে বৃদ্ধা তখন কিরণ ও নলিনীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল। বউটী তখন বদনার বাকী জলটুকু ছেলের মুখে দিয়া শেষে নিজে একটু পান করিয়া চাতালের শীতল সানের উপর শুইয়া পড়িল।

যজ্ঞেশ্বরী উপরে আসিয়া দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শুভ্রসিক্ত বসন পরা স্নানোজ্জল গৌরবর্ণ সৌম্য গম্ভীর মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া বুড়ী কথা বন্ধ করিল; তার ভয় হইয়াছিল বুঝি ইনি জমীদার বাড়ীর কেহ হইবেন বা। বুড়ী প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে নলিনীর দিকে তাকাইল, নলিনী বুঝিয়া উত্তর দিল— "এ আমার জ্যাঠাই মা, সহর হতে' এসেছেন।" নলিনী বুড়ীর পরিচয় করাইয়া দিল—"জ্যেঠাই মা। এ এস্মাইলের মা আর ও তার বউ, ওইটে ছেলে—"। যজ্ঞেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন-"ছিঃ মা, ওইটে বল্‌তে হয় না, ওইটী বলো"। পরক্ষণেই ছেলেটীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন বৌ দিদি তোমার ছেলেটি তো—বেশ ঠাণ্ডা, ছেলেটী তখন ক্ষুধার আবদার জানাইয়া মাকে অপ্রস্তুত করিতেছে। যজ্ঞেশ্বরী কিছু পয়সা আঁচলে না বাঁধিয়া পথে ঘাটে বাহির হইতেন না। কয়েকটী পয়সা অলক্ষ্যে বাহির করিয়া নলিকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিলেন। নলি চাতালের পাশেই যে দোকান ছিল সেখানে ছুটিয়া গেল। এদিকে মা ও মেয়ে বুড়ীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন।

য। কোথা থেকে আসছ তোমরা

বু। তালিবপুর হতে মা, ঐঠেঁয়ে আমার বহিন্ থাকে তার বাড়িকে গিয়েছিনু মা! আর খোদাতাল্লা কি ঠাঁই রেখেছে মা!—

য। কেন? তোমাদের বাড়ী তো। এই গাঁয়ে নদীপারে না?

বু। ঘর বাড়ী কি আর দুষমনে রেখেছে, মা! মানুষ যার দুষমন হয়,

মা খোদাতালাও তার দুষমণি করে। (কপালে করাঘাত করিয়া) কাঙ্গাল গরীবের নসীবে বা সবাই দুষমন।

ব্যাপারটা কি যজ্ঞেশ্বরীর মনে খোলসা হইতেছিল না। নলিনী একটা ঠোঙ্গা করিয়া বাতাসা কিছু ও নারকেলের লাড়ু কয়েকটা এবং গামছার কোণে বাঁধিয়া চারটী মুড়কী আনিয়া জ্যাঠাইএর কাছে ধরিল। যজ্ঞেশ্বরী বুড়ীকে ও তার বৌ নাতিকে কিছু কিছু ভাগ করিয়া দিয়া খাইতে অনুরোধ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত দয়া ও মমতার পরিচয়ে বুড়ী ও বৌ অবাক হইয়া গেল। তাহাদের অন্তরাত্মা ক্ষুধার তাড়নায় জ্বলিয়া যাইতেছিল শুধু খাদ্য অভাবেই পুকুরের জলে উদর পূর্ণ করিয়াছিল। বুড়ী আগ্রহে মিষ্টান্ন হাত পাতিয়া লইয়া বৌ ও নাতিকে ডাকিয়া ভাগ করিয়া দিল। সভ্য সমাজের কৃত্রিম ভব্যতার তারা ধার ধারিত না, কাজেই "থাক্ থাক্, না-না, এসব কেন" প্রভৃতি শিক্ষা-বিকৃত ছদ্মভাবের মৌখিক মিথ্যাবাণী তাহারা বলিল না, বরং বলিল "এ দুষমন গাঁয়ে কে মা তুমি। বাঁচালে, মা, খিদের বাছাটার জান্ যাচ্ছিল।"

য। দুষমন গাঁ কেন গা?

বু। (এদিক ওদিক তাকাইয়া) দুষমনের গাঁ বৈ কি মা, গাঁয়ের জমীদার রাজা যদি দুষমন্ হয় তা হলে সবাই তাই হয় মা। কেউ কাছে এসে না, আহা বলে না। সাধ করে কি গাঁ ছেড়েছিনু মা?

য। কেন কি হয়েছিল।

ন। ওদের ঘর কে পুড়িয়ে দিয়েছিল জ্যাঠাইমা—

য। (বিস্ময়ে) কে? কে গা?

বু। আর কে মা? শত্তুর দুষমনে। রাজা জমীদারই শত্তুর, ওরাই দুষমন! আর কে—

য। কেন?

বু। অনেক কথা, মা। অনেক কথা। কাজ কি মা কাঙ্গালের কথায়?

য। আচ্ছা শুনবো এখন, তুমি খাও আগে—

বু। না মা। আমি খাবো? আমার ছেলের আগে জান বাঁচুক। এসমাইল আমার ফিরে এসুক তখন খাবো—এ মুখে খাবার দেবো কোন লাজে মা? হে দুষমন—হে শত্তুর। আরে আল্লা।

বুড়ী কাঁদিতে লাগিল—অঝোরে চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। মা ও

মেয়ে দু'জনেই বুঝিল গ্রামের জমীদারের কোনো গুরুতর অত্যাচারে এই বৃদ্ধার অসহায় অনাথ গুষ্টীর এই দুর্দ্দশা।

কিরণ। মা গো মা! যে গাঁয়ের কথাই শুনি জমীদারের অত্যাচারের গল্প শুনতে শুনতে আর কাগজে পড়তে পড়তে সারা হয়ে যাই!

ন। জমীদার না যমের ঢেঁকী কুমীর সব। ও গাঁয়েরও এই ভাগ্যি!

যজ্ঞেশ্বরী লক্ষ্য করেন নাই যে পুরোহিত-পত্নী ও সাহা-ঘরণী পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া উপরে উঠিয়াছে। যজ্ঞেশ্বরী অনেক পূর্ব্বে স্নান সারিয়া উঠিয়াছেন, তবু চাতালে এত দেরী কেন? কি ব্যাপার? ইত্যাদি জানিবার নিমিত্ত উভয়ে কৌতূহলে দমফাটার মত হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া তাই পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে আসিল। যজ্ঞেশ্বরী বুড়ীর কথায় ও নিজের ভাবে মগ্ন ছিলেন, পরের গতি বিধির অত শত খেয়াল করেন নাই। যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। যজ্ঞেশ্বরী-কৃত জমীদার মন্তব্য পুরোহিত পত্নীর কানে গেল। উহাদের দেখিয়াই যজ্ঞেশ্বরী কিরণকে ও নলিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। চাতালের উপর উপস্থিত হইয়া দুই জনকেই বিশেষতঃ পুরুৎ গিন্নি মুখটা বিকৃত করিয়া পায়ের কাপড় হাঁটুর উপর তুলিয়া, কেবল মাত্র আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া হাটিতে হাঁটিতে মুসলমানী দু'জনকে ইঙ্গিত করিয়া তিরস্কার করিলেন,—"এ যে এসমাইলের মা দেখ্‌ছি। এ কি বাছা তোদের কাণ্ড? মুছলমানের? মেয়ে তোরা হিঁদুর ঘাটে এসেছিস্, তা এক পাশে বসলেই তো পারতিস্? না, গোটা চাতালটা জুড়ে—কি এরুৎ কাণ্ড মা!—

সাহাপত্নী।—দেখো ঠাকুরুন! সব এঁটো পড়ে—ছিঃ। বল মা—

পুঁকি।—ও মা সত্যিই তো? ছিঃ ছিঃ কি মুছুলমেনে কাণ্ড গো! কি সব গোস্ত ফোস্ত খাচ্ছে নাকি গো? ছিঃ মা ছিঃ ছিঃ—

নলিনী। গোস্ত কেন খেতে যাবে? সন্দেশ বাতাসা খাচ্ছে দেখছনী—

পুঁগি। হ্যালো হ্যা থাম্ ভোলার মেয়ে বুঝি? কথা শিখিছিস্ তো খুব। (সাহা পত্নীকে) দেখো বাছা—এই সব পায়ের দাগ মাড়িওনি যেন—মাগো হিঁদুর ঘরেও জাতবিচের নেই মা—

কিরণ আর থাকিতে পারিল না। কি বলিতে যাইতেছিল। যজ্ঞেশ্বরী চোখ্ টিপিয়া দিলেন। পুরোহিতপত্নী ও সাহাগৃহিণী কোনো মতে শুচি ও আচার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সরকারি পথ ছাড়িয়া নেউগীদের নারিকেল বাগান

দিয়া বাড়ী ফিরিলেন। বুড়ীর বিশ্রাম শেষ হইলে সেও বৌ ও নাতি লইয়া উঠিল।

যজ্ঞেশ্বরী ও কন্যাদের লইয়া উহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার কৌতূহল এখনো চরিতার্থ হয় নাই। পথে যাইতে যাইতে আবার কথা তুলিলেন :—

য। গিছলে কোথা ?

বু। রাজাগাঁর হাঁসপাতালে মা—ছেলে সেখানে আধমরা হয়ে পড়ে আছে দেখতে গেছনু মা—আব যাব কোথা—

য। কি অসুখ ? হাঁসপাতালে কেন ?

বু। তবে শোনো মা—দুষমনের গাঁ, মা, কথা বলতে সাহস পাইনে—

য। তা হোক্ আমি তো দুষমন নই তুমি বল—

বু। না মা তুমি কেন দুষমন হবে। খোদা তোমার ভাল করুক মা—

য। ছেলের কি হয়েছে ?

বু। দুষমনে মা ঘরে আগুন জেলিয়ে দেয় তাই নিবুতে গিয়ে ছেলে আধ পোড়া হয়ে অজ্ঞেন হয়ে যায়—

য। কে ঘর জালিয়ে দেয়—

বু। দুষমনে, আবার কে গাঁয়ের রাজাই দুষমন—

য। কেন ?

বু। তবে শোন মা মোর নানীর ছেলে ইব্রাহিম, তাকে জমীদার বল্লে তোকে সাহেবের খানার এঁটো পরিষ্কার করতে হবে—তা মা সে বল্লে মুই তা জান গেলেও পারবোনা—হারামের গোস্ত খেলে সাহেব, মুসলমানে তা ছোঁবে মা ? তা সে করেনি। তাই জমীদার দরোয়ান দিয়ে তাকে আধমারা করে মা। সে রোখা জোয়ান ছেলে। জমীদারের নামে নালিশ করে—হা খোদা! খোদার কি চোখ আছে মা—

য। তার পর ?

বু। তার পর মা মোর ছেলে এসমাইল সাক্ষী দেবে বলে—সে নিজ চোখে দেখেছ্যালো কিনা—তা শুনে জমিদারের মুন্সী চৌধুরী—এসমাইলকে ডেকে মানা করে বল্লে—তুই সাক্ষী দিতে পারবিনি তা এসমাইল খুব রোখা মরদ, সেও বল্লে মা আমি সাক্ষী দিবুই—মাথার উপর খোদা থাকতে মিছে বলবুনি। আবার মোর জাত ভাই যখন বিপদে পড়েছে মুই তাকে বিপদে ভেসিয়ে যাব ?

কিরণ। বাঃ বেশত! গরীব হলে কি হবে মা? মনের তেজ দেখ?—

বু। হ্যাঁ মা যেমনি বুকের পাটা তেম্নি তেজ মা—তা মা খোদা কি দেখলে? সেই রাগে মা ছেলের ঘর জ্বেলিয়ে দিলে—ছেলে তো আধপোড়া হয়ে হাঁসপাতালে পড়ে আছে—আমি মা বহিনের বাড়ী এদের নিয়ে আছি, আবার সেখেনে যাচ্ছি মা,

কিরণ। কখন পৌঁছুবে?

বু। সেই বিকেল সাঁজ হবে মা। মরদম্না এক পহরেই চলে যায়— এই ছেলে নিয়ে বুড়ো মানুষ মা প্যাটে ভাত নেই—

য। তা এসমাইলের মা! আজ এ গাঁয়ে থাক, খাওয়া দাওয়া করে কাল যাবে?—

বু। দুষমন গাঁয়ে? না মা—ঘর কোথা?

য। এ বেলা আমার ওখানে খেয়ে যাবে—রাত্তিরে থেকে কাল যাবে—

বুড়ী কিংকর্ত্তব্য বুঝিতে না পারিয়া অন্যমনা হইয়া বধুর দিকে তাকাইল। বৌটী আনন্দে ইচ্ছা জানাইল। স্নেহক্ষুধার্ত্ত বিরহী অনাদৃত মন কোথাও একটু আন্তরিক স্নেহ মমতা যেখানে পায় সেই খানেই বশীভূত হইয়া পড়ে। এই আধ ঘণ্টার আলাপে বুড়ী ও বুড়ীর পুত্রবধু এই মাতৃহৃদয়া রমণী দুটীর পায়ে তাদের কৃতজ্ঞতা পূর্ণ ভক্তিসরস প্রাণ দুটী লুঠাইয়া দিয়াছিল। ভগবানের সংসারে অন্তরের ভালবাসা দিয়াই আপন পর বিচার হয়। আমাদের সংসারে আমরা কিন্তু রক্তের যোগ দিয়াই আপন পর নির্ণয় করি। অথচ পদে পদে আমাদের মাপ কাঠি বা বিচার লক্ষণের ভুল দেখি, তার ফলভোগ করি, তবু আমাদের চোখ খোলে না। ইশা, মুশা, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বড় বড় Prophet বা অবতারগণ কেন যে সব ভুলিয়া প্রেমের রাজ্য প্রচারেই ব্যস্ত হইতেন—মতের রাজ্য গঠনে নয় তা বেশ বোঝা যায়। "ভাল বাস, সকলকে ভালবাসে, ভালবেসে পরকে আপন কর, পরের জন্য মর, মরে বাঁচ—এতেই মুক্তি" এই তাঁদের ছিল একমাত্র শিক্ষার মন্ত্র। কিন্তু তাঁদেরই প্র-পরা-অপ এবং উপশিষ্যরা তাঁদেরই শিক্ষার দোহাই দিয়া মানুষকে ঘৃণা করিবার, পায়ে ঠেলিবার এবং দলিবার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বাঙ্গালা দেশ প্রেম-সন্ন্যাসী গৌর নিতাই এর শিষ্য বলিয়া গর্ব্ব করে। যে মহাপ্রভুরা হরিদাস যবনকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন জগাই মাধাই যে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন সেই মহাপ্রভুদের আধুনিক ভক্ত শিষ্যরা এমনি এক ছুঁৎ-মার্গ

গঠন করিয়া অপর সব নিম্নজাতিকে অস্পৃশ্য কলঙ্কে দাগী করিয়া রাখিয়াছেন যে দেখিলে শিহরিতে হয়, মনেই হয় না এই দেশেই মাত্র তিন শত বৎসর আগে এক দিগ্বিজয়ী মহাপ্রেমিক প্রেম বন্যা বহাইয়া ছোট বড় সাধু অসাধু; পণ্ডিত মূর্খ; স্পৃশ্য অস্পৃশ্যকে সকলকে এক স্রোতে ভাসাইয়া ডুবাইয়া মাতাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছিলেন। আদর্শের এমন অধঃপতন, আচারের এমন ব্যাভিচার ধর্ম্মের এমন ধর্ম্মনাশ কোনো দেশে এরূপ হইয়াছে কিনা জানি না।

যজ্ঞেশ্বরী বুড়িকে ও তার বৌ নাতিকে লইয়া নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পরম সমাদরে দাওয়ার উপর একটা কম্বল বিছাইয়া তাহাদের বসাইয়া কাপড় ছাড়িতে গেলেন।

বুড়ী বসিতে ইতঃস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কিরণ বলিল, "তা হোক, বসো —কম্বলের আসনে দোষ নেই—বসো ভাই।" বউটী অপ্রত্যাশিত 'ভাই' সম্বোধনে অভিভূত হইয়া পড়িল। তার চোখ ভিজিয়া উঠিল।—

পাড়াগাঁয়ের ছোট সীমার মধ্যে কোন গৃহস্থ কি করে তা বেশীক্ষণ অপরের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। সৌদামিনী রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল এসমাইলের মা দাওয়ার উপর কম্বলাসনে পরম আদরে উপবিষ্ট। এর আগে গেরস্থর ছোটখাটো কাজ কর্ম্মের উপলক্ষে এসমাইলের মা কতবার এ বাড়ীতে আসিয়াছে কিন্তু এমনতর আদর তো সে কখনো পায় নাই! একে গরীব চাষাভূষা তাতে মুসলমান জাতি। হিঁদু বাউন বিধবার বাড়ী এমন অভ্যর্থনা। বুড়ী যেন একটু কেমনতর হইয়া গেল। বিশেষ সৌদামিনীকে দেখিয়া।—সে যেন Apologyর স্বরেই বলিল "গিন্নিমা ছাড়লেনা যে মা, তাই এসে বসনু।"। সৌদামিনী বুঝিল দিদির কাণ্ড—সে অন্য কিছু না বলিয়া বলিল "তা বেশ তো, বসো বসো, এসমাইল তো হাঁস পাতালে? কেমন আছে? ফিরে এসেছে?—

বু। না মা। ভাল আছে, তবে উঠতে হেঁটতে পেরেনি, হপ্তা বাদে ছাডান পাবে গো।

সৌ। কোথা আছিস বউ নাতি নিয়ে?

বু। তালিবপুরে মা; বহিন বাড়ীতে—। আর খোদা ঠাঁই রেখেছে কি?

যজ্ঞেশ্বরী বুঝিয়াছিলেন তার এই উদ্ভট অভ্যর্থনা ব্যাপারে সদু হয়তো একটু ক্ষুন্ন হইবে, তাই সাফাই করিবার জন্য, বাহিরে আসিয়াই বলিলেন--সদু শুনিছিস ব্যাচারীর দুঃখের কথা!

স। আমরা তো দিদি আগে হতেই সব জানি।

য। তা ঠাকুরপো আর সেই বা কি করবে ?

স। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করবে এমন কি ক্ষমতা আর দিদি ?

য। তা তো বটেই, সদু, ওদের নেমতন্ন করে এনেছি আহা ব্যাচারীরা সমস্ত দিন কিছু খায়নি! না খেয়েই বাড়ী ফিরছিল, ধরে এনেছি—

স। বেশতো দিদি, তোমার যুগ্‌গি কাজ করেছ।

সদুর হৃদয় এক নবীন অনাস্বাদিত প্রীতি ও ভক্তিরসে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। ভালবাসা এমনি ছোঁয়াচে রোগ!

বাড়ীর সকলেই যেন একটা স্বর্গীয় আনন্দে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিল। অতিথি নারায়ণের পূজার উৎসবে গৃহস্থের প্রাঙ্গণটী যেন অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিল!

এমন সময় আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যশোদা দেবী পুত্র কোলে পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়া মুখুয্যে বাড়ী প্রবেশ করিল। যশোদা বাড়ী ঢুকিয়াই মুসলমানীদের রকে কুটুম্ব আদরে উপবিষ্ট দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! তার যেন বসিতে পা উঠিল না। যজ্ঞেশ্বরীকে দেখিয়া কৌতূহল দীপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ আবার কি বউদি ?

য। কি আবার ?

পাছে ব্যাচারীদের অসম্ভ্রম সূচক কোনো কথা যশোদা বলিয়া ফ্যালে এই ভয়েই আগে হইতেই বলিলেন—আমি ভাই এদের নেমতন্ন করে এনেছি—"

যশোদা। তা ভাল! পাল পার্ব্বনের দিন কুলিন বাউন পেয়েছ ভাল—

য। হ্যাঁ দিদি ভগবানের গড়া মানুষ—সব জীবের কুলীন তো বটে!

যশোদা। হিঁদু বাউনের বাড়ী ঘর—

য। যার যেমন রুচি প্রবৃত্তি দিদি! ওর ছিষ্টিকর্ত্তা আর আমার ছিষ্টিকর্ত্তা কি আলাদা ভাই, সে যাক্—ছেলের কি হয়েছে ? আহা কালী মূর্ত্তি যে ?

যশোদা। হ্যাঁ ভাই আজ দুদিন হতে পেটের অসুখ জর। এই দুধ খাওয়াছ তা বমি করে ফেল্‌লে—

য। পেটের অসুখে দুধ দিলে কেন ? ও যে বিষ—

যশোদা। আর কি ই বা দেব বল।

যশোদার কিন্তু আর বলিবার বা গল্প করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। ব্রাহ্মণের বিধবার বাড়ীর এই অনাচার কাণ্ডে তার সনাতন আচার বুদ্ধি একেবারে

হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। এই অদ্ভুত বার্ত্তা বাড়ী বাড়ী প্রচার করিবার জন্ত তাহা'র উদরাধ্মান ঘটিবার উপক্রম হইল। সে একটা অছিলা করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিল।

যশোদা। যাই ভাই রোগা ছেলে নিয়ে আর বস্‌বোনা—

যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন যে যশোদাদেবী রুগ্ন পুত্রের মঙ্গল চিন্তায় কতদূর উতলা হইয়াছে। মনোভাব চাপিয়া বলিলেন—তবে এস, দুধ দিওনা, ছেলেকে বারলি বা এরারুট যা হয় দিও, দুধে আরো পেট্‌ খারাপ করবে"—।

যশোদা। জানিতো ভাই, তা ওসব ঝন্‌ঝট্‌ করে কে? দোকান হতে এলো তো বারলি হবে-? যাই দেখি"। যশোদা চলিয়া গেল।

কিরণ হাসিয়াই অস্থির। বলিল—"পাড়া বেড়ানো বা পরচর্চ্চার ঝন্‌ঝট সয়, ছেলের সেবা শুশ্রূষার ঝন্‌ঝট্‌ সয় না -ধন্যি বাবা।"

যশোদা বাড়ী ফিরিবার পথে যতগুলি আত্মীয় অনাত্মীয়ের বাড়ী ছিল সব বাড়ীতে ঢুকিয়া যজ্ঞেশ্বরী দেবীর অনাচার কীর্ত্তি অতিরঞ্জন যোগে বর্ণনা করিয়া প্রায় দুই প্রহর অতীত করতঃ ভিটায় পদার্পণ করিলেন।

বার্ত্তা শুনিয়া ছেলে বুড়া, ছুড়ী বুড়ী যে যেথায় ছিল কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া মুখুয্যে বাড়ীতে ঢুকিয়া চক্ষু কর্ণের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া গেল। যাইবার সময় মন্তব্য অমন্তব্য যে দু একটা প্রকাশ না করিয়া গেল তা নয়। সৌদামিনী প্রথমতঃ অপবাদ ভয়ে কিছু সন্ত্রস্তা হইয়াছিল কিন্তু দিদির অপূর্ব্ব ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া গেল। সেও যেন বুকে বল ভরসা পাইয়াছিল।

রান্না বান্না শেষ হইলে যজ্ঞেশ্বরী পরম যত্নে বুড়ীকে ও তার বৌ ও নাতিকে সেই রকে বসাইয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। এমন সময় ভোলানাথ ও পুরুৎ বাড়ীর এক প্রতিবেশিনী এক বর্ষিয়সী বিধবা বাড়ী ঢুকিলেন। ভোলানাথ এসমাইলের মাকে ভোজননিরতা দেখিয়া অবাক হইল। সে সমস্ত পূর্ব্বাহ্ন বাড়ীতে ছিল না। নিকটের এক গ্রামে খড় কিনিতে গিয়াছিল। পথে বর্ষিয়সীর সঙ্গে দেখা হয়। বর্ষিয়সী লোকমুখে যজ্ঞেশ্বরীর কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া ব্যাপার দেখিতে আসিতেছিল। ভোলানাথের সঙ্গে দেখা হইতে বলিল, 'ছোট বউএর কাছে একটু কাজ আছে বাবা তাই যাচ্ছি।' ভোলানাথ বলিল 'বেশ তো চল।'

বর্ষিয়সীর নাম ইচ্ছাময়ী। লোকে তাকে ইচ্ছা ঠাকরুণ বলিত। ইচ্ছা-ঠাকরুণ যজ্ঞেশ্বরীর অতিথি সেবা দেখিয়া অবাক। নাক সিট্‌কাইয়া বলিলেন

"তোমাদের বাছা সব বাড়াবাড়ী, মুছুরমান খাওয়াবে তো উঠোন ছেল তো! আবার নিজেদের ঘর কন্নার ঘটী বাটী নোংরা করেছ?"

য। তা'তে কি মা? বেরাল কুকুরেও তো ঘটী বাটীতে মুখ দেয়।

ই। ওরা যে মুছুরমান গো। কি কথা মা তোদের?'

য। মানুষ তো বটে মা। কুকুর বেরালের চেয়ে তো ভাল?

ই। সে কি গো? ধর্ম্মাধর্ম্ম জাতবিচারে তো আছে?

য। জাত বিচের কি গরীব গেরস্থর বেলায় বাছা? তোমাদের জমীদার বাবু যে বাড়ীতে সাহেব এনে শুয়োর গরু খাওয়ালে তাতে তাদের জাত যায় নি?

ই। ঝগড়া করতে তো আসিনি বাছা। যার যা রুচি পিরবিত্তি হবে করবে—

য। তবে আর কেন? কথা তুল্লেই কথা শুনতে হয়—

ই। ছোট বউ কোথা লো?

সদু বাহির হইয়া আসিল।—'কেন গা পিসি?'

ই। সেই পঁইতের পয়সা কটা দিতে পারবি না?

সদু দু আনা পয়সা আনিয়া ইচ্ছাময়ীকে দিতে গেল। ইচ্ছাময়ী সরিয়া গিয়া বলিল—"রাখ ওই খেনে বাছা, ছুঁসনি যত তোদের খিষ্টানী কীর্ত্তি।"—সদু হাসিয়া মাটীতে পয়সা কটী রাখিয়া দিল। ঠাকরুণ তুলিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিয়া চলিলেন। মৃদু হাসিয়া কিরণ বলিল—'নেয়ে নেও ঠান দি—ছোঁয়া পয়সা।' ইচ্ছাময়ী ব্যঙ্গটুকু বুঝিল। বক্তার একবার মাত্র আক্রোশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ভোলানাথ ইত্যবসরে যজ্ঞেশ্বরীর কাছে সব কথা শুনিয়া লইল। 'হাঁ' 'না' কিছু না বলিয়া সে তেল মাখিতে বসিল। যজ্ঞেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন—"কি ঠাকুরপো? খুব চটেছ?"

ভো। কে? আমি? না—চটবো কেন বৌদি?

য। ম্লেচ্ছ কাণ্ড করছি?

ভো। আমি চটিনি তবে গাঁয়ে একচোট খুব ঢি ঢি পড়ে যাবে—

য। ভয় হয়েছে তা হলে?

ভো। ভয় আর কি? তবে একটা কথা জমীদার বাড়ীর কাজকর্ম্ম নিয়ে খোঁটা দিলে—জানই তো।

য। ঘর জালিয়ে দেবে? তা দিক্। তুমি নেয়ে এসে খেতে বসো।
যজ্ঞেশ্বরী অতিথি সেবায় মন দিলেন। ভোলানাথ স্নানে গেল।

ভোজনান্তে তৃপ্ত হইয়া বুড়ি নাতি লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। বৌটি গিয়া এঁটো স্থান পরিস্কার করিয়া ঘটী বাটী মাজিয়া উঠানের একপাশে রাখিল। তাদের ছোঁয়া বাসন হিন্দুর ঘরে কি করিয়া উঠিবে ভাবিয়া সে লজ্জিত ও চিন্তিত হইতেছিল। যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন "নাও মা এসে জিরোও, ও থাক্ ওই খেনে, গঙ্গাজল ছুইয়ে আগুন ঠেকিয়ে নিলেই শুদ্ধ হবে—তুমি এস।"

বৌটী নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়া বসিল।

বেলা পড়িলে তাহারা উঠিল। যজ্ঞেশ্বরীর জিদ সত্ত্বেও তারা ফিরিতে ব্যস্ত হইল। যজ্ঞেশ্বরী গত্যন্তর না দেখিয়া বলিলেন—"তা এস্‌মাইলের মা এসমাইল হাঁসপাতাল হতে ফিরে এলে যেন দেখা করে—আমার খালধারের বাগানে জায়গা দেব, ঘর তুলে থাকবে, সব গাঁ ছাড়া হবে কেন? আমার ঝাড়ের বাঁশ দেব ঘর তুলো।"—

বুড়ী কি বলিবে কেবল নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। চোখে শুধু ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অনেক পরে বলিল, "এসমাইল ফিরে এসেই তোমাদের পায়ের ধুলো নে যাবে মা খোদা তোমাদের ভাল করবে"

বুড়ী উঠিল। যজ্ঞেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া দুটী টাকা ও সের কয়েক চাল, কিছু আনাজ তরকারী সমেত বুড়ীকে আনিয়া দিল। বুড়ী পরম ভক্তিভরে জলভরা চোখে প্রীতির দান লইয়া সাষ্টাঙ্গে গড় করিয়া বিদায় হইল।

বুড়ীর ও তার বৌ দুজনেরই বুক কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং দুজনেরই চোখ্ ছাপাইয়া পড়িল।

উহারা চলিয়া গেলে, যজ্ঞেশ্বরী বাসনগুলি আগুন ছোঁয়াইয়া ঘরে তুলিল। সদু বুঝিতে পারিল সোণার স্পর্শে সেও সোণা হইয়া উঠিতেছে।

ক্রমশঃ

বাঁশী

(শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী)

বাঁশের বাঁশী নয় তো শুধু বাঁশের বাঁশী নয়
লক্ষ যুগের কান্না হাসি ওই বাঁশীতে রয়।
বদ্ধ ঘরে রইল যারা বদ্ধ বহুদিন
চক্ষে মনে আঁধার টানি মুক্তি-মুখহীন—
মুক্ত হল শান্তি পেল ভ্রান্তি হল দূর
শুন্‌তে পেয়ে মনে প্রাণে বাঁশের বাঁশী সুর।
হাজার বছর পার হয়েছে হাজার রাজা শেষ
ইতিহাসের বক্ষে তারি মিলবে দেখ লেশ,
কতই ওঠা কতই নামা ধূলায় হল লয়
বাঁশীর সুর যায় কি ভোলা! সম্ভব কি হয়?

• • • •

রাধার প্রাণে ফাগুন আসে যখন বাঁশী বাজে
মন যে তার ব্যাকুল করে বিঘ্ন ঘটে কাজে
বাঁশীর সুরে উজান বহে যমুনারি জল
কাঁটার বনে কুসুম ফোটে মধুর নিরমল।
চাঁদনি রাতে নাচনি হাওয়া কুসুম হতে ফুলে
বাঁশীর সুরে অবস হয়ে কেবল পড়ে ঢুলে।
শ্রাবন মেঘে আঁধার নামে দিগন্তের কূলে
স্বপন মায়া জড়িয়ে দিয়ে বর্ষা রাণীর চুলে,—
মন যে তার উদাস করে মুখ যে হয় ভার—
শুন্‌লে পরে বাঁশীর সুর কেবল বার বার।
ওরে আমার প্রাণের বাঁশী
না হয় তুই ওরে
কারো হাতে বাঁশের গড়া
বাঁশীর রূপ ধ'রে

ব্যাকুল সুরে ওঠ্ রে বেজে
বনের তীরে তীরে
সুরটি তার লাগ্‌বে এসে
আমার বুক ভরে—
বাইরে মোরে—নিক সে টানি
মুক্তি যেথা ভাসে
বংশীধারীর নীলসাগরের
শুভ্র ফেণা রাশে।

আন্তর্জাতিক চিরন্তন শান্তি তাহার উপায় ও সম্ভাবনা।

(শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত এম, এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জাতীয় সংঘ গঠনের প্রস্তাবটি এক নূতন মহাবিষ্কারের ন্যায় জগতে একটা আনন্দের উৎস ছুটাইয়া দিয়াছে—পৃথিবীব্যাপী একটা আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, যেন চারিদিকে আনাকদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি ইহা একটা নূতন আবিষ্কার? প্রকৃত পক্ষে এই League of Nations বা জাতিসংঘের পরিকল্পনাটি এক অতি প্রাচীন সংস্কারের নূতন অভিব্যক্তিমাত্র। সেই প্রাচীন কাল হইতেই কিরূপে দেশে শান্তিরক্ষা করিতে পারা যাইবে এবং কিরূপেই বা যুদ্ধের বিভীষিকা কতকটা দূর করা যাইবে এই উদ্দেশ্যে অবিরত প্রয়াস চলিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে যে এ চেষ্টা পরিণতির দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আছে। প্রথমতঃ একটা Congress of states বা রাষ্ট্রসমিতি ছিল, দ্বিতীয়তঃ ছিল, একটা পররাষ্ট্রদ্বারা মধ্যস্থতার ব্যবস্থা বা Arbitration of States, যেমন Sparta (স্পার্টা) ও মেসিডোনিয়া পরস্পর বিবাদোন্মুখ হইলে এথেন্স হইল তাহাদের মধ্যস্থ। এইরূপে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সকলের পক্ষেই মধ্যস্থতা-বিধি প্রচলিত ছিল। কি সমাজগত কি ব্যক্তিগত সকল আদর্শের মূলই ছিল তখন শান্তি। মধ্যযুগে

যখন নরহত্যা বা ছোট বড যুদ্ধ একটা দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে গণ্য ছিল, তখন লোকে শান্তি পাইবার জন্ত আশ্রয় লইত ধর্ম্মমন্দিরের অভ্যন্তরে। সেই সময়কার সামাজিক উন্নতি বা চিন্তাস্রোতের ধারার অনুসরণ করিলে মনে হয় যেন League of Nations বা জাতিসংঘের পরিকল্পনাটি—তখনও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের ধর্ম্মযাজকগণ মানবের এই যুযুৎসু ভাব দমন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা অধঃপতিত ও প্রপীড়িতের উদ্ধারের জন্ত নিঃসহায়ের সাহায্যকল্পে ও আর্ত্তের পরিত্রাণ মানসে শক্তির নিয়োগ করাইতেন, এইরূপে শক্তির সাধনা বা পরাক্রম প্রদর্শন ধর্ম্মের একটা অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছিল। রোমের অভ্যুদয়ের দিনে Pope বা তৎকালীন খ্রীষ্টজগতের প্রধান ধর্ম্ম যাজকই ছিলেন আন্তর্জাতিক বিচারক এবং কোনও মারাত্মক রকমের বিবাদ উঠিলে বিভিন্ন রাজ্যের বা জাতির তিনিই মধ্যস্থতা করিতেন। এইরূপে পোপের সুসময়ে যখন অসীম শক্তির তিনি অধীশ্বর ছিলেন, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের মধ্যে আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি বিচার করিতে পারিতেন, তখন কেবল মানবপ্রীতি, ন্যায়শক্তি ও শান্তিস্থিতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। আবার সেদিন যখন ফরাসী দেশে রাজপ্রাধান্য অসহ হইয়া উঠিয়া মহাবিপ্লবের সৃষ্টি করিল, তখনও সেই ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুদয়ে য়ুরোপে এই কথা জাগিয়াছিল। কিন্তু সারা জগৎকে একসূত্রে বাঁধিবার কল্পনা ফ্রান্সে জাতিগঠন করিয়াই তখনকার মত নিবৃত্ত হইল। উনবিংশ শতাব্দীতেও সেই কল্পনার ধারা বহিয়া আসিয়াছে, জাতিধর্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম্মকে অতীতের সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধিজনিত বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে। তাঁহারা বলেন বিজয়দৃপ্ত সেনাপতি যখন সগর্ব্বে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া অরিদল মথিত করিয়া ছুটে তখন সে স্বজাতির মূঢ় অহঙ্কার ও দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি। স্বদেশের সীমারেখা লইয়া ধরাবক্ষ বিদীর্ণ করিবার প্রয়াস অথবা বর্ণবৈষম্য ও আচারবৈষম্য লইয়া পণ্ডিত মূর্খের কোলাহল, সে শুধু অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতার নামান্তর।

চিরস্থায়ী শান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া Kant কতকগুলি প্রাথমিক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, রাজ্যরক্ষার্থ স্থায়ী বেতনগ্রাহী সৈন্ত উঠাইয়া দিতে হইবে, সাধারণ অস্থাবর সম্পত্তির মত কোনও রাজ্য হস্তান্তরিত করিলে চলিবে না, রাজ্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোন গোলমাল হইলে বাহিরের রাজা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না,

যুদ্ধের জন্ত জাতির নামে ঋণগ্রহণ বন্ধ করিতে হইবে—যুদ্ধাসক্তিদমনের পক্ষে ইহা অনেকটা কার্য্যকরী হইবে। আর সর্ব্বশেষে তিনি বলেন, বাণিজ্যের প্রসারের সহিত সকল দেশ একই স্বার্থসূত্রে বদ্ধ হইলে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপনের পথ অনেকটা সরল হইয়া যাইবে। মহাত্মা কোম্‌তও এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—বিশ্বমানবের সেবাই ইহার একমাত্র সমাধান। পরিবার জাতি বা রাষ্ট্রের স্বার্থ যেখানে বিশ্বমানবের মঙ্গলের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে বিশ্বহিতে সমুদায় স্বার্থবলিদানে সঙ্কোচ করিলে চলিবে না। মানুষ কেবল মানুষ বলিয়াই প্রেমাস্পদ এ ভ্রান্তটা সর্ব্বপ্রথমেই বদ্ধমূল করিতে হইবে। কিন্তু দুই চারিজন মহানুভব ব্যক্তির মনে এ ভাব ফুটিয়া উঠিলেও, জন সাধারণের উপর ইহার আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। সকল বিরোধ ও অশান্তির মূল যে দর্প, কাম ও কামনা; তাহার উৎপাটন এ পর্য্যন্ত হইল কৈ? এ তিমির দূর করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন জ্ঞানের আলোক, সে আলোক বিচ্ছুরিত হইবে ধর্ম্ম ও প্রেমের প্রদীপ হইতে। স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা অনেক আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপন কতটা অগ্রসর হইয়াছে? মোটকথা—মানুষকে যদি প্রকৃত মহত্বের পথ দেখাইয়া দেওয়া না যায়, মনের গ্লানি ধৌত করিবার প্রয়াস যদি না পাওয়া যায়, তবে ভ্রাতৃত্ব-ভাব স্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ মানুষ যদি ভাবে যে সে তাহার স্বেচ্ছাচারিতার পথে চলিয়া বেশ সুখ পাইতেছে, তবে প্রেমসাধন সে করিবে কেন?

কিন্তু যখন য়ুরোপের রাজনীতি-গগনে প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়া অনেক চিন্তা ও মানসিক ভাবের ওলট পালট করিয়া দিয়া গেল, তখন এই টুকরা টুকরা কল্পনা ধারা একত্র জমাট বাঁধিয়া মানুষের মনে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া বসিল। বাস্তবিক সেই সকল আলোচনা ও শিক্ষার দ্বারা সাধারণ স্তরের লোকেরও মানসবীণা এমন একটা উচু সুরে বাঁধা হইয়া গেল যে যেমনই এখন League of Nations বা জাতি-সংঘের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে অমনি উহা সহসা প্রহত হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের প্রশ্নটা প্রাচীন রাজনীতিবিদ্‌গণের পক্ষে যেমন তত কঠিন ছিল না, এখন তেমনি এ প্রশ্নটা ভীষণ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন ছিল কেবল এক ধর্ম্মাবলম্বী খ্রীষ্ট য়ুরোপ লইয়া কথা, কিন্তু এখন নূতন মহাদেশ আমেরিকা আসিয়া জুটিয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিষম সমস্যা হইয়াছে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ও আচার সভ্যতা দ্বারা

বিচ্ছিন্ন প্রাচ্যের সম্পর্ক লইয়া। অবশ্য যখন জাতি ধর্ম্ম ও সভ্যতা ভিন্ন হইয়াও এবং সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অবস্থিত হইয়াও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গগুলি মোটের উপর এমন সুন্দর মিলিয়া রহিয়াছে তখন আশা হয় আন্তর্জাতিক চিরন্তন শান্তিটা নেহাৎ স্বপ্ন নয় এবং সেই মিলন সেতুর কতকটা যেন এখনই বেশ দৃঢ়রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ ইতিহাসের সাক্ষ্য লইলে মনে হয় যে এই জাতি সংঘের ধারণাটা ক্রমেই যেন স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া আসিতেছে, সভ্যতাবিকাশের মূল হইতেই যেন ইহার ক্রমাগত প্রয়াস চলিয়াছে; এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ইহা বিশ্বকে বাগ্‌বিতণ্ডা ও যুদ্ধবিগ্রহের হাত হইতে ত্রাণ করিতে পারিবে। ইহাই যে সকল প্রয়াসের চরম পরিণতি এবং ইহার জন্যই যে এই ভীষণ জীবনসংগ্রাম ও ক্ষুদ্রলাভের রাজ্যে মানবাত্মা থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

আসল কথা চিরস্থায়ী শান্তির প্রশ্নটা বড়ই জটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয় যে, এক এক সময়ে মনে হয়—সমগ্র জাতিটার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়া আসিয়াছে। তাই অনেকে ইহা আদৌ কার্য্যকরী হইবে কি না এ বিষয়েই সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন মানুষের চিত্ত চাঞ্চল্যটা এত বেশী এবং অসদ্‌বৃত্তি ও স্বার্থপরতাটা এত প্রবল যে হয়ত কার্য্যকালে কোন কোন রাজ্য একটা সংঘ বা সমিতির হস্তে আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি অর্পণ করিয়া স্থির থাকিতে অস্বীকৃত হইতে পারে। অবশ্য উহারা স্বার্থসাধনের জন্য প্রথম প্রথম সর্ত্তাবদ্ধ থাকিতে সম্মতি দিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রয়োজন হইলেই চুক্তিপত্রকে a mere scrap of paper বা একটা বাজে কাগজ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারে এবং তখনই যে কল্পনাসৌধটি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, তাহা সহসা সশব্দে ভূমিসাৎ হইয়া উহার আশ্রয়ে নিঃশঙ্ক শয্যায় সুষুপ্ত লোকগুলিকে একবারে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া ফেলিবে। জগতে যখন এরূপ ব্যবহারের বহুসাক্ষ্য রহিয়াছে এবং এখনও যখন সেই দাম্ভিকতার ব্যত্যয় ঘটে নাই তখন এমন ধারণা কিছু ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না, কারণ ইহা খুবই সত্য যে মানুষ যতদিন না অসৎ কামনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, ততদিন সংসারে অমঙ্গল থাকিবেই সুতরাং যুদ্ধও থাকিবে। এই যে য়ুরোপের বক্ষ মথিত করিয়া একটা মহাপ্রলয় বহিয়া গেল, কতজন কত অর্থ সেই মহাস্রোতে ভাসিয়া গেল, এত করিয়াও য়ুরোপ আসিয়া দাঁড়াইল কোথায়?

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংগ্রাম বাধিয়া, পুরাতন রাষ্ট্রসম্বন্ধ একেবারে ওলট-পালট হইয়া গেল, প্রাচীন রাষ্ট্রশক্তি হৃতবল ও প্রনষ্টগৌরব হইয়া নিরাশার গভীর অন্ধকারের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মানুষের সব গিয়াও ত তাহার উচ্চাশা লোভ ও কামনা যায় না। রাজত্ব নাই, রাজশক্তি নাই, অথচ পরাজিত জাতির রাজ্যলোভ নষ্ট হয় নাই। দল বাঁধিয়া গোপনে গোপনে কত আয়োজন, কত ষড়যন্ত্র চলিতেছে। জাতিতে জাতিতে অসূয়া ও বিদ্বেষ প্রধূমিত হইয়া অন্তরের মাঝে এক ধূমায়মান সমরবহ্নি লুকাইয়া রাখিয়াছে, কেবল একটা সময়োপযোগী ফুৎকারের অপেক্ষা মাত্র। এইত গেল য়ুরোপের আন্তর্জাতিক অবস্থা। যুদ্ধ ত হইয়া চুকিয়াছে, কিন্তু পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কা যায় নাই। যুদ্ধের সময় শোনা গিয়াছিল বটে সকলেই যুদ্ধের চিরবিরামসাধনের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাই নাকি সভ্যজাতির ইতিহাসে শেষ যুদ্ধ। হয়ত যুদ্ধের মাঝখানে সরলভাবেই এরূপ সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, কারণ বিপদে পড়িলে মানুষ অশেষ প্রকার সাধু সঙ্কল্পই করিয়া থাকে, কিন্তু আজ এ কল্পনা ত ছায়াবাজির মত লয় পাইতে বসিয়াছে, কেই বা গ্রাহ্য করে আর কেই বা আমল দেয়। যুদ্ধের আশঙ্কা ত শেষ হয়ই নাই, বরং বাড়িয়া চলিয়াছে, এইরূপই ত অনেকের ধারণা। অবশ্য সন্ধি-সংসদ্ বসিয়াছিল, তাহার কাজও হইয়াছে, সন্ধিও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সন্ধি আর শান্তি ত এক নয়। সন্ধি চায় যুদ্ধের সেই সময়কার মত বিরাম, আর শান্তির উদ্দেশ্য সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করিয়া যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার পর্য্যন্ত নিবৃত্তি সাধন। এইরূপ শান্তি য়ুরোপে এখনও সুদূরপরাহত। কারণ ইহাই যে য়ুরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় অনিবার্য্য। আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে যে একমাত্র ত্যাগ ও প্রেমের দ্বারা শান্তিলাভ হয়, শান্তির অন্যপথ নাই। য়ুরোপে সে ত্যাগের শক্তি কই? এই জন্যই ত শান্তির বৈঠক উঠিতে না উঠিতেই একটা ভাগাভাগি ব্যাপার চলিয়াছে, তবে ইহা লইয়া যে এখনও একটা যুদ্ধ বাঁধে নাই, তাহার কারণ প্রবৃত্তি থাকিলেও শক্তি কোথায়? আত্মরক্ষায়ই যে সকলে এখন ব্যতিব্যস্ত। তাই ত দেখি League of Nations বা জাতিসংঘগঠনের সর্ত্তগুলির প্রথম খসড়া ও শেষ খসড়ার মধ্যে কত প্রভেদ,—ধর্ম্মের শাসন আর বন্ধুর উপদেশে যতটা ব্যবধান। এ যেন ঠিক অমৃত ভাণ্ডারের লোভ দেখাইয়া সাধারণ মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা।

অবশ্য এই যুদ্ধের শিক্ষার ফলে য়ুরোপের জাতীয়জীবন ক্রমে ক্রমে নূতন

ভাবে গঠিয়া উঠিতে পারে ; তবে অনেক সময় দুঃখের দিনের অর্জিত জ্ঞান সুখের দিনে মনে থাকে না। বিপদের সময় করুণাকাতর আঁখিই বিপদ কাটিয়া গেলে ভ্রুকুটি করিতে দ্বিধা করে না। আন্তর্জাতিক মিলন হয়ত সুব্যবস্থার মধ্যে আসিতে পারে, কিন্তু মানুষের অন্তর গ্লানিদূর করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কেবল বাহিরের ব্যবস্থায় স্থায়ী সুফলের আশা একটা মস্ত ভ্রম। অন্তরের প্রেরণাই ত বাহিরে ফুটিয়া উঠিবে। মানুষের প্রাণে যতদিন না মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, ততদিন শুধু কঠোর নিয়মের পেষণে তাহার স্বার্থবুদ্ধিকে নিস্তেজ করিয়া রাখিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা একেবারেই পণ্ডশ্রম। এই জন্যই ধর্ম্মশিক্ষা ও পরমার্থশিক্ষার প্রয়োজন। সাধারণ স্তরের মানুষকেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎসে স্নাত করিয়া আসিতে হইবে। মানবদেহের ক্ষণভঙ্গুরতা ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অস্থিরতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। মানব জীবনে সুখই যখন আদর্শ, তখন বুঝাইতে হইবে প্রকৃত সুখ কিসে? কামান্ধতা একেবারেই প্রশংসার যোগ্য নহে। সেই দুষ্পূর্য্য কামনা ও প্রলয়-করী হিংসা ত্যাগ করিয়া আর্ত্ত ও পীড়িতের দুঃখনিবারণের প্রয়াসে এবং জ্ঞান রাজ্যের নূতন নূতন বিজয়ের চেষ্টাতেই ত সুখ। অন্ধকারও দূর করা চাই, ভ্রাতৃভাবের আলোক আসিলে এই ঘনান্ধকার দূর হইবে ও সকলেই বুঝিবে যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম্ম এক বিশ্ব-ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। তখনই একটা সুন্দর ভ্রাতৃপ্রেম জাগিয়া উঠিবে। সেই 'প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই। তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে। সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। মৃত্যুর উপর বিজয়ী আত্মার মত, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনের উপর মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমর।" নীচ স্বার্থ, রুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা ও বিজাতিবিদ্বেষ দূর না হইলে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপনের সুখস্বপ্ন নিশ্চয়ই ফলিবে না। সত্য সত্যই তার ভিত্তি হইবে ভালবাসা। আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া দিয়া ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিতে হইবে। তখন জাতির ভবিষ্যৎ আপনিই গড়িয়া উঠিবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়া হয় না, জাতীয় উন্নতির পথ ভ্রাতৃভাবের মধ্য দিয়া, ভ্রাতৃহত্যায় নহে। কবি মিল্টনের অমর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারা যায় Who overcomes by force, hath overcome but half his foe -অর্থাৎ হৃদয়জয় শক্তি প্রয়োগে হয় না, ভাইএর মত ভালবাসিয়া আপনার করিতে পারিলেই

চরম জয়লাভ। ইহাই আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপায়। বঙ্গের প্রেমের ভিখারী চৈতন্য তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন, সাধক বিবেকানন্দ সর্ব্বসমন্বয়ের মন্ত্র ছড়াইয়া এই ভাবেরই উদ্বোধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহাই জগতের আদর্শ না হইলে শান্তির কল্পনা স্বপ্নতুল্য রহিয়া যাইবে। জগতই মানবজাতির মত-পরম চেষ্টাকেও যখন সৎপথে আনিবার ইচ্ছা জাগিবে, তখনই পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান হইবে, তাহার পূর্ব্বে নয়। যদি কখনও জগতের সকল লোকে বলদর্প ভুলিয়া বলিতে পারে—

> ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান,
> বিশ্বময় জাগারে তোর ভায়ের প্রতি ভায়ের টান,
> ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর,
> বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।

বাস্তবিক তখনই এই জটিল তত্ত্বের কত সহজ মীমাংসা পাওয়া যাইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, এইরূপ মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা একটা Utopian idea বা মস্তিষ্কবিকার জনিত কল্পনা মাত্র, কিন্তু ইহাও তেমনি সত্য যে এ চেষ্টা না হওয়া চাইই। কারণ যুগ যুগান্তরের সভ্যতাকে এক নিষ্ঠুর পদানত-সভ্য নাস্তিকতার হস্তে সমর্পণ করিতে সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে এবং যখন চিরন্তন শান্তি স্থাপন করিতে পারিলে যাহা এতদিন কেবল সংগ্রামে ও নরহত্যাব্যাপারে নিয়োজিত ছিল, মন কত শক্তি একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব উচ্চাঙ্গের মানবসমাজ গড়িয়া তুলিতে পাবে, তখন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং পররাজ্যসম্বন্ধে নিঃস্বার্থভাব উদ্বুদ্ধ করিতে সকলেই চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। সেই নবভাবের উদ্বোধনের জন্য এতকাল পরে সকলেই বলদর্পী পাশ্চাত্য ক্ষত্রশক্তিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আসিবে এই পরমার্থচিন্তার পীঠস্থানে এই সংযম তিতিক্ষার তপোবনে—

> যেথা একদিন বিরামবিহীন
> মহা ওঙ্কার ধ্বনি
> হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে,
> উঠেছিল রণরণি।
> তপস্যা বলে একের অনলে
> বহুরে আহুতি দিয়া

বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট্ হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের-
সাগর তীরে।

পথ

(শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী)

পরম প্রেমেঁ ধরতে বুকে সইবি শত জ্বালা,
বরণ ক'রে নিবি দুঃখে প'রতে সুখমালা।
মলিন মুখে সাজবে ভাল পরের সুখে হাস,
মনের কথা বাজবে ভাল পেলে ব্যথার শ্বাস।
পুলক দিয়ে ভ'রতে হৃদি পাগল সাজে সাজ,
দৈত্যতরী নেগো বেয়ে শান্তি-সাগর-মাঝে।
ধ্রুবলোকের পথটী সে যে বিশ্বপদে লুটী,
অমৃতরে আনতে ধেয়ে বিপদপানে ছুটি।
আঁধারখানির বক্ষ হতে ধরগো চেপে আলো।
সত্যজীবন সেথায় যেথা মৃত্যু দারুণ কালো॥

শরৎ সাহিত্যে মাতৃভাব।*

(শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্টের যে সকল উপাদান থাকায় তাঁহার উপন্যাস এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতির আবেগই সর্ব্বপ্রধান।* এই সহানুভূতি আছে বলিয়াই, সমাজের শাসন ও বিধি নিষেধের জন্য যে সকল প্রেম নিষ্ফল হইয়া করুণ কাহিনীর সৃষ্টি করিতেছে, তাহার বেদনা-সঙ্গীত শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মন্দিরে যেরূপ গভীর ও স্পষ্টস্বরে গাহিয়াছেন, তেমন আর কোন ঔপন্যাসিক পারেন নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র, প্রেমের এই নিষ্ফলতা ও তাহার কারণ মাত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বিবিধপ্রকারের বিভিন্ন সমাজের আদর্শ ও বিধি আমাদের সমক্ষে ধরিয়া তিনি আমাদের সামাজিক সমস্যার বিচার ও মীমাংসা করিয়াছেন। ইহা শরৎ বাবুর অসামান্য প্রতিভার অন্যতম কীর্ত্তি। কিন্তু এই সকল সামাজিক সমস্যা ছাড়া, তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ও সহানুভূতির দ্বারা গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যে সকল স্নেহ ও বাৎসল্য রসের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার জন্য সেই স্নেহ-বাৎসল্য যে দুঃখ ও ত্যাগের উপাদান হইয়াছে, তাহা তিনি তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় এমন অদ্ভুত ধরণে বিকশিত করিয়াছেন, যাহা বঙ্গ সাহিত্যের অভিনব সম্পদ ও শরৎচন্দ্রের অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তি। বস্তুতঃ সাহিত্য ও সমাজ বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং শরৎচন্দ্র যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয় এবং 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে আজকালিকার মস্ত সমস্যা —Rights of Women—সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু যেহেতু এগুলি সামাজিক ব্যাপার, ইহাতে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির মূল্য এবং প্রভাব কতকটা দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে। এবং সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাদেরও

* কলিকাতা "নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা ও সুহৃদ লাইব্রেরী" হইতে "স্বর্ণপদক" পুরস্কার প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান প্রভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু শরৎচন্দ্র বাৎসল্য রস ঢালিয়া 'রামের সুমতি' 'মেজদিদি' প্রভৃতি গল্পে যে মাতৃহৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার মূল্য বা প্রভাব দেশ-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে না., কারণ এই স্নেহ বাৎসল্য মানব হৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তি এবং যেহেতু 'The same heart beats in every human breast,(Matthew Arnold), ইহাদের প্রভাব সর্ব্বত্র, সকল সময় এবং সকল মানব হৃদয়েই সমান। এই জন্যই তাঁহার 'মেজদিদি' প্রভৃতি গল্পের ভারতবর্ষের বাহিরে London Timesও এত প্রশংসা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই মাতৃভাব দেখানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আজকালকার লেখকগণের অধিকাংশই দাম্পত্য ও স্বাধীন প্রেম লইয়াই ব্যস্ত, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছুটী' গল্পছাড়া আমাদের সাহিত্যে বাৎসল্য-রসের নিদর্শনের নিতান্ত অভাব ছিল, শরৎচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যে, সেই বাৎসল্যরস প্রচুর পরিমাণে ঢালিয়া দিয়া অমৃতের স্রোত বহাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' 'রামের সুমতি' 'মেজদিদি' 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি গল্পে এবং 'শ্রীকান্ত' 'অরক্ষণীয়া' 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি উপন্যাসে, তাঁহার এই অভিনব মাতৃভাব বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে। কোন্ গল্পে ও উপন্যাসে কিরূপ ঘটনার ভিতর দিয়া এই মাতৃভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিম্নে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

তাঁহার 'রামের সুমতি' 'বিন্দুর ছেলে', 'মামলার ফল' 'মেজদিদি' ও 'নিষ্কৃতি'তে আমরা দেখিতে পাই যে, পরের ছেলের প্রতি স্নেহপরায়ণা নারীর ভালবাসা, অভিমান ও পারিবারিক কলহের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

১। নারায়ণী—(রামের সুমতি)

'রামের সুমতি' গল্পের পাড়ার সেরা দুষ্টছেলে রাম, শ্যামলালের বৈমাত্র ভাই। শ্যামলালের স্ত্রী নারায়ণীর বয়স যখন ১৩ বৎসর, তখন রামের মা তাঁহার আড়াই বছরের পুত্র রামের ভার এই বালিকা বধূর হস্তে দিয়া পরলোকে গমন করেন। অন্য মেয়ে যে সময় পুতুল খেলা করে, সেই সময় হইতে পুতুলের পরিবর্ত্তে নারায়ণী তাঁহার এই দেবরটীকে মানুষ করিয়া আসিতেছে। এই গল্পে শরৎচন্দ্র সন্তানতুল্য রামের প্রতি, মাতৃসমা বৌদিদির বাৎসল্য দেখাইয়াছেন।

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, নারায়ণীর একটী পুত্র হইয়াছে, তাহার নাম গোবিন্দ। রাম আমাদের এখন ১৬।১৭ বছরের হইয়াছে। কিন্তু রাম

বৌদিদির অসাধারণ স্নেহের মধ্যে থাকিয়া এখনও ছোটবেলাকার মতই আছে। এতবড় বয়সেও সে নিজের হাতে ভাত খাইবে না, বৌদিদি হাতে করিয়া না খাওয়াইয়া দিলে তাহার খাওয়া হইবে না। তজ্জন্য পাড়ার লোকের নিকট নারায়ণীকে কত গঞ্জনা ও টিট্‌কারী সহ্য করিতে হয়। তাছাড়া, রামের দুষ্টামীর জন্যও তাহাকে কত কথা সহ্য করিতে হইত। নারায়ণী রামকে শাসনও করিত কিন্তু সে শাসন মায়েরই মত বৌদিদির একবারের শাস্তিতে যে টুকু কষ্ট হইত তাহার শতগুণ আদর পাইয়া রাম সে শাস্তির কথা ভুলিয়া যাইত। স্নেহ-বিহ্বলা নারায়ণীর বড় দুঃখ এই যে—'পাড়ার লোকে কেবল আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না।' কিন্তু এই মাটীর শাসন কিরূপ, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে। একদিন শসা চুরী করার অপরাধে নারায়ণী রামকে একপায়ে দাঁড়ানর শাস্তি দিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন দেখিল যে, রাম কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে তখন নারায়ণীর মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে বলিল "আচ্ছা, যা, হয়েছে, এমন আর করিসনে।" কাজেই স্পষ্টবাদী নেত্যকালী বলিয়া উঠিল—"আর শাসনও ভারী। ছেলে এক মিনিট একপায়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে ত পৃথিবী রসাতলে গেছে।' নারায়ণী-রামের এই স্নেহ ভালবাসার চিত্র আরও পরিস্ফুট হইয়াছে, যেদিন হইতে নারায়ণীর মা দিগম্বরী তাহাদের শান্তির মধ্যে আসিয়া পা দিয়াছে। নারায়ণী রামকে কোনদিন পর ভাবে নাই, কিন্তু দিগম্বরী আসিয়া অবধি রামকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন; এবং নারায়ণী যেদিন মায়ের মুখে শুনিল "কেন, বাড়ী কি ওর (রামের) একলাকার।" সেইদিন নারায়ণী মায়ের বুকের ভিতরট স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া, বোধকরি, বড় ভয় খাইয়াছিল।

মাতৃসমা এই বৌদিদির প্রতি রামের ভালবাসা যে কত গভীর, তাহা শরৎচন্দ্র সামান্য দুই একটি ঘটনা দ্বারা অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। দিগম্বরী ঠাকরুণ যেদিন 'শকুনি-হাড়-গোড়ের' ভয়ে, রামের কত সাধের অশ্বত্থগাছটী উঠান হইতে তুলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন, সেদিন রাম চীৎকার করিয়া রাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া নারায়ণী যখন তাহাকে বুঝাইল, "মঙ্গলবার দিন অশ্বত্থগাছ পুঁতলে বাড়ীর বড় বৌ ম'রে যায়" তখন রাম বৌদিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই—না, বৌদি?" আবার যেদিন রামের খাওয়া লইয়া মা ও মেয়ের মধ্যে খুব ঝগড়া হইয়া গেল, সেদিন নারায়ণী উপবাসী রহিল। রাম

নেত্যর কাছ হইতে মুড়ী লইয়া বাহিরে গেল। কিন্তু সে মুড়ী তাহার মুখে উঠিল না, তাহার কতবার মনে হইতে লাগিল, বৌদি উপোষ করিয়া আছে— সে তখনই মুড়ি গুলি জলের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

নারায়ণীর বাৎসল্যও কত গভীর, তাহা শরৎচন্দ্র একটী কথায় অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দিগম্বরীর ব্রাহ্মণ খাওয়াইবার দিন রাম যখন কিছুতেই তাহার কার্ত্তিক গণেশ মাছ দুটীর একটীকেও ধরিতে দিল না, তখন দিগম্বরী চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কবে ছোঁড়া মরবে যে, আমার হাড়ে বাতাস লাগবে—যেন তে রাত্তির না পোহায়।' এই অভিশাপ কাণে যাইবা মাত্র নারায়ণী বিদ্যুদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "মা"। যতই হউক দিগম্বরীও ত মা,—সন্তানের মুখে এই 'মা' কথাটী শুনিয়া দিগম্বরীর অন্তরাত্মা বোধ করি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। শরৎচন্দ্র সামান্য এই 'মা' কথাটীর দ্বারা যে মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে চরিত্রটী জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বোধ হয় মনস্তত্ত্বের এমন সুন্দর ইঙ্গিত প্রকাশ করিতে পারা যাইত না।

কিন্তু রামের ছোড়া কাঁচা পেয়ারাটা যে দিন দিগম্বরীকে না লাগিয়া নারায়ণীকে আঘাত করিল, সেই দিন শ্যামলাল দিব্যি দিয়া স্ত্রীকে বলিলেন "—যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোন দিন কথা কও, যদি কোন কথায় থাক, সেই দিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও।" এই বলিয়া তিনি সেই দিনই রামকে পৃথক করিয়া দিলেন। পরদিন রাম নিজের পৃথক রান্নাঘরে কাঁচাভাত রাঁধিয়া শুধুই তাহা খাইতেছে, একথা যখন নারায়ণীর কাণে পৌঁছিল, তখন তাহার মাতৃহৃদয়ে কান্না ঠেলিয়া বাহির হইবার জন্য মাথা ঠুকিতেছিল, কিন্তু নারায়ণী কিছু করিলেন না, শুধু নিজে উপোস করিয়া রহিলেন। কিন্তু তারপর দিন রাম রাঁধিলও না, খাইলও না, কারণ আজ দুইদিন তাহার বৌদিদি তাহাকে ডাকে নাই, তাহাকে বকে নাই। সারাদিন ভাবিতে লাগিল, পেয়ারাটার আঘাতে বৌদিদির কত না লাগিয়াছে। এই ভাবিয়া সে একটা কাঁচা পেয়ারা লইয়া নিজের কপালে একশ বার ঠুকিয়া ঠুকিয়া দেখিতে লাগিল, তাহাতে কতটা ব্যথা লাগিতে পারে। এমন অনিন্দ্যসুন্দর করুণচিত্র আর নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। অবশেষে সে মনে করিল, যদি কোথাও চলিয়া যাই, তা'হলে হয়ত বৌদি সুখী হইতে পারেন, এই ভাবিয়া রাম স্থির করিল—তাহার অজানা অচেনা মামার বাড়ী চলিয়া যাইবে।

এ দিকে গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নারায়ণীর জর হইয়াছে। তিনদিন কাটিয়া গিয়াছে। নারায়ণী যখন শুনিল, কাল রাম রাঁধেও নাই, খায়ও নাই, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, প্রাতে উঠিয়াই রান্না চড়াইয়া দিল। তারপর যখন রাম তাহার সেই অজানা অচেনা মামার বাড়ী যাইবার জন্য বৌদিদিকে টাকা চাহিয়া পাঠাইল, তখন নারায়ণী ভোলাকে বলিল, "যা ভোলা শীগ্‌গির ডেকে আন।" রাম আসিলে নারায়ণী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া হইয়া সাজান ভাতের থালার নিকট বসাইল। কিন্তু কে-ই বা খাইবে, আর কে-ই বা খাওয়াইবে। রাম বৌদিদির কোলের মধ্যে মুখ লুকাইল, আর বৌদিদির অশ্রুবৃষ্টিতে রামের মাথা পিঠ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। তিনদিন পূর্ব্বে তাহার স্বামী যে মাথার দিব্যি দিয়াছিলেন, একথা তাহার মনে ছিল, এই জন্যই সে তিনদিন নিজে খায় নাই, এবং রামকেও খাইতে দেন নাই, কিন্তু আর পারিল না, এবং তাহার মা যখন সেই খানটাতেই খোঁচা দিয়া বলিলেন, "যে এত বড় একটা দিব্যি দিলে, তার বুঝি হুকুমটাও একবার নিতে হবে না?" নারায়ণী এবার কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি জানবে মা, কার কাছে কখন আমি হুকুম পেয়েছি?... যাকে বুকে ক'রে এতটুকুকে বড় ক'রে তুলতে হয়, সেই জানে হুকুম কোথা দিয়ে কেমন ক'রে আসে। এখন একটু সামনে থেকে সরে যাও, দুটো খাইয়ে দিই। ও আমার তিন দিন অনাহারে আছে।" বলিতে বলিতে নারায়ণীর চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। আমরাও চোখের জলে আর পড়িতে পারি না,—চোখের জল মুছিয়া আবার যখন পড়ি, তখন দেখি,—নারায়ণী তাহার মাকে বলিতেছে, "তোমার খরচ পত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব, কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।", আর, রাম আস্তে আস্তে বলিতেছে, "না বৌদিদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হ'য়েছি।"

এমন বাৎসল্য-রস-অভিষিক্ত গল্প বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। ইংরাজ কবি Grey যেমন একমাত্র Elegyর জন্যই অমর হইয়াছেন, তেমনি শরৎচন্দ্র যদি এই একটী মাত্র গল্প—রামের সুমতি—লিখিতেন, আর কিছুই না লিখিতেন, তাহা হইলেও তিনি বঙ্গ সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিতেন। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—"প্রচলিত রাশি রাশি ছোট গল্পের করুণরস 'রামের সুমতি' গল্পের তুলনায় সিন্ধুর নিকট বিন্দু। নারায়ণী যেদিন স্বামীর শপথ উপেক্ষা করিয়া রামের জন্য রাঁধিতে বসিল, সেদিন তাহার মূর্ত্তি, র‍্যাফেলের অমর তুলিকায় আঁকা ম্যাডোনো মূর্ত্তির ন্যায় আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি।"

২। বিন্দু, (বিন্দুর ছেলে)

বিন্দুর ছেলে গল্পটীতে শরৎবাবু, অমূল্যর প্রতি তাহার খুড়ীমার অপরিমিত স্নেহ ও এই স্নেহবিবশা খুড়ীমার অপরিসীম বেদনা, অভিমানের মধ্য দিয়া পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

• যাদব ও মাধব দুই জনে বৈমাত্র ভাই, কিন্তু থাকিতেন সহোদর ভাইএর মতই, এমনি তাঁদের মিল ছিল। যাদবের স্ত্রীর নাম অন্নপূর্ণা আর মাধবের স্ত্রীর নাম বিন্দুবাসিনী। বড় ভাই যাদবের একটী মাত্র পুত্র সন্তান ছিল, তাহার নাম অমূল্য। মাধবের কোন সন্তানই ছিল না। ছোটবউ বড় লোকের একমাত্র মেয়ে, সুতরাং তিনি ছিলেন একটু অতিরিক্ত অভিমানিনী। বড় বউএর মাথার উপর সমস্ত সংসারের ভারটা থাকায় তিনি ছেলে মানুষ করবার অবসর পাইতেন না। সে ভারটা ছোটবউ আসিয়া লইল বিশেষতঃ একদিন ছোট-বউএর ফিট হইবার সময় অমূল্যকে কোলে ফেলিয়ে দিয়া অন্নপূর্ণা দেখিলেন বিন্দু মূর্চ্ছার কবল হইতে রক্ষা পাইল। সেইদিন হইতেই অমূল্য বিন্দুর কাছেই থাকিত এবং বড়বউ ও একদিন হাসিতে হাসিতে বিন্দুকে বলিয়াছিল, 'অমূল্যকে তুই নে।' সেই যে একদিন অন্নপূর্ণা বিন্দুকে বলিয়াছিলেন, 'অমূল্যকে তুই নে' তারই জোরে একদিন অমূল্যধনের দুধ জ্বালদিতে দেরী হওয়ায় সামান্য দুই একটা কথা কাটাকাটি হওয়ায় অভিমানিনী বিন্দু বড়বউকে দিব্যি দিয়া ফেলিল, "তোমার অতিবড় দিব্যি রহিল দিদি যদি কোনদিন আর অমূল্যর দুধে হাত দাও। আমারও দিব্যি রহিল, আর কোনদিন যদি তোমাকে বলি"। এই দিব্যি দেওয়া ব্যাপারটা হইতেই বুঝা যায় যে, বিন্দু অমূল্যকে কত ভালবাসিতেন, বিন্দুর বাৎসল্য কত গভীর। এইরূপে শুধু অমূল্যকে টিপ পরান আর কাজল দেওয়া নিয়ে বিন্দুর দিনগুলি কাটিতে লাগিল। ক্রমে যথা সময়ে অমূল্যধনের হাতে খড়ি দিয়া তাহাকে পাঠশালায় পাঠান হইল, সেদিন বিন্দু ছেলেকে এমন করিয়া সাজাইলেন যে দেখিয়া ছেলের মা অন্নপূর্ণা, পাচিকাকে বলিলেন, "ছেলে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তবু পেটে ধরেনি—তাহ'লে নাজানি ও কি করত!" ছেলেকে চোখের অন্তরাল করিয়াই বিন্দুর মনে হইল, বাড়ীতে পাঠশালাটা উঠাইয়া আনিলে হয় না! 'যদি কেউ ওর চোখে কলমের খোঁচাই দিয়ে দেয় তাহ'লে?" অন্নপূর্ণা সাতদিন সাতরাত বসে ভাবিলেও, এই খোঁচাখুঁচির কথা মনে করিতে পারিত না কিন্তু বিন্দুর তৎক্ষণাৎ তাহা মনে হইল, এমনই স্নেহময়ী বিন্দু। এই-

রূপে 'ঐ কাল ভূতের মত ছেলেটাকে' লইয়া বিন্দুর দিন গুলি কাটিতে লাগিল। ক্রমে বিন্দু একেবারে ভুলিয়া গেল যে অমূল্য তাহার পেটের ছেলে নয়। এধারে ফল এই হইল যে অমূল্য তাহার মা, অন্নপূর্ণাকে 'দিদি', আর বিন্দুকে 'মা' বলিতে লাগিল। কিন্তু বিন্দু স্নেহান্ধ ছিলেন না, অতিরিক্ত আদরে ছেলেটাকে মাটী করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। 'ছেলেকে দশের একজন ক'রে তুলতে হ'লে যে রকম চোখে চোখে রাখতে হয় সেই রকমই করিতেন এবং 'ছেলে বড় হবে দশের একজন হবে' ঐ একটা আশা নিয়েই তিনি বেঁচেছিলেন। তাই একদিন বলিয়াছিলেন "না, দিদি ও আশায় যদি কোন দিন ঘা পড়ে, তবে আমি পাগলি হ'য়ে যাব।" তাই যেদিন তাঁহার ঠাকুরঝি তাঁহার 'চওড়া-পাড়ের-কাপড় ফেরা দিয়ে পরা, 'দেখিবার মত টেরি ওয়ালা' পুত্র নরেনকে লইয়া এই গৃহস্থের মধ্যে আসিলেন, সেইদিন বিন্দুর মাতৃহৃদয়ে বড় ভয় হইয়াছিল। পাছে এই 'থিয়েটারে অ্যাকট করা' নরেনের সঙ্গে মিশিয়া তাহার অমূল্য খারাপ হইয়া যায়। তাই তিনি সর্ব্বদা অমূল্যকে আরও শাসনে রাখিতেন, এবং এই শাসন হইতে কেহ অমূল্যকে রেহাই দিবার চেষ্টা করিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই যে দিন আমপাড়ার অপরাধে স্কুলে অমূল্যর জরিমানা হইয়াছিল, এবং বিন্দুর ক্রোধ হইতে বাঁচাইবার জন্য অন্নপূর্ণা ছেলেকে লুকাইয়া টাকা দিয়াছিলেন, সেইদিন অন্নপূর্ণা অমূল্যর জন্য মাপ চাহিলে, অভিমানে ও ক্রোধে বিন্দু বলিয়া উঠিল, "আজ থেকে চিরকালের জন্যই মাপ করলুম, আর বলব না।" এই রূপে দুই একটা কথা হইতে হইতে বিন্দু অভিমানে ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার মাতৃসমা দিদিকে বলিয়া ফেলিয়াছিল, "তুমি নষ্ট কর কার টাকা শুনি ?" এই কথাটার পরিণাম এই হইল যে, দুই যাএর মধ্যে এমনি পাকা পাকি ঝগড়া হইয়া গেল যে বিন্দুর নূতন বাড়ীতে গৃহদেবতার পূজার দিন অন্নপূর্ণা নিজেও গেলেন না এবং তাঁহার স্বামী ও পুত্রকেও যাইতে দিলেন না। স্নেহময়ী বিন্দু অভিমানে যাহাই বলুক না কেন, তাঁহারা না আসায় তাঁহার মন গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতেছিল, কোন কাজেই তিনি মন দিতেছেন না দেখিয়া, মাধব গিয়া অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া আনিলেন। বিন্দু তাঁহাকে দেখিয়া অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অমূল্যকে ডাকিতে গেলেও সে আসিল না। অনেক রাত্রে যখন অন্নপূর্ণা বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তিনি জলস্পর্শ করেন নাই শুনিয়া বিন্দু অভিমানে যা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া এবং ভগবানের উপর

বিচারের ভার দিয়া, 'মুখে আঁচল গুঁজিয়া' কান্না রোধ করিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়াই উপুড় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরদিনও বিন্দুর অভিমান যায় নাই, কখনও সে অন্নপূর্ণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল, "ঐ একটা বংশধর—তার নাম ক'রে দিব্যি?" এদুঃখ তাঁহার রাখিবার জায়গা ছিল না, কিন্তু দিদি জলস্পর্শ করেন নাই তাহাতেও তাঁহার কম দুঃখ হয় নাই, তাই তিনি পাচিকাকে বলিলেন "রাগের মাথায় কে দিব্যি না করে, মেয়ে! তাই ব'লে জল স্পর্শ করলে না।"

অমূল্য এই কয়দিন বিন্দুর নূতন বাড়ীতে না আসিলেও সে বাড়ীর পাশ দিয়াই স্কুলে যাইত এবং বিন্দু 'লালছাতার আড়ালে' তাহার পরিচিত সেই চলনটী লক্ষ্য করিয়া তাহার মাতৃত্বের ক্ষুধা কতকটা মিটাইত। কিন্তু দুই দিন সেই ছাতাটী আর সেই চলন দেখিতে না পাইয়া বিন্দু নরেনকে ডাকিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নরেন বলিল, "টিফিনের সময় সে দুটো ছোলা ভাজা নিয়ে যায়, আর আমার খাবার দেখে ছুটে এসে বলে, 'কি খাবার দেখি নরেন দা।'—তাই ও ঐ রকম করে নজর দেয় ব'লে মা মাষ্টারকে ব'লে দিয়ে ওর কান ম'লে দিয়েছে।" কথা কয়টী শুনিয়া বিন্দুর হৃদয় চুরমার হইয়া গেল, তাহার ছেলে অমূল্য টিফিনের সময় দু'টী ছোলা ভাজা ভিন্ন আর কিছু খাইতে পায় না। বিন্দু দুই দিন প্রায় উপবাস করিয়া রহিল, তারপর বাপের পীড়িত সংবাদে বাপের বাড়ী বলিয়া গেল।

আজ একমাস তাহার ছেলেকে বিন্দু দেখে নাই। কতদিন হইতেই যে বিন্দু অনাহারে নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতে ছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। বাপের বাড়ী আসার পর বিন্দুর জ্বর ক্রমশঃ এত বেশী ও মূর্চ্ছা এত ঘন ঘন হইতে লাগিল যে, তাহার আশা প্রায় ছাড়িয়া দিতেই হইয়াছিল। এমনি অবস্থায়—একদিন বিন্দু চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহার স্বামীকে বলিল, "আমার সমস্ত অমূল্যের। শুধু হাজার দুই টাকা নরেনকে দিও, আর তাকে পড়িও, সে আমার অমূল্যকে ভালবাসে।"

কি অপরিসীম মাতৃস্নেহ! আজ অমূল্যর জন্ম বিন্দুর হৃদয় গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল—তাহার অমূল্যকে নরেন ভালবাসে—তাই বিন্দু নরেনকে টাকা দিতে ও পড়াইতে বলিল। কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহের চিত্র! ক্রমে মাধবের মুখে ঐ কথা যাদব শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ যাদব, অন্নপূর্ণা ও অমূল্য আসিয়া বিন্দুর বাপের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দুর আর

মরা হইল না. তাহার ছেলে আসিয়াছে, তাহার অমূল্য আসিয়াছে, সে কি আর মরিতে পারে? তাই বিন্দু বলিল, "দাও, দিদি, কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে দিয়ে তোমরা সবাই বাইরে গিয়ে বিশ্রাম করগে, আর ভয় নাই – আমি মরব না।"

কি সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি এই বিন্দু। কয়জন মা এই খুড়ীমার অপেক্ষা স্নেহশীলা হইতে পারেন। শরৎচন্দ্র এই চিত্রটী জীবন্ত করিয়াছেন, বিন্দুর গুণে দোষ মিশাইয়া। বিন্দু রক্তমাংসের জীব, তাহাতে গুণ আছে দোষও আছে। বিন্দুর অপরিসীম স্নেহ আছে, কিন্তু তাহার অতিমাত্রায় অভিমানও আছে। শরৎচন্দ্র চিত্রগুলি এইরূপভাবে জীবন্ত করিয়াছেন বলিয়াই, আমাদের মনে হয় যেন তাঁহার সৃষ্ট মানুষগুলি আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছে, মনে হয় সত্যই যেন বিন্দু আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "না ঠাকুরাণ, আমি মাথায় কাপড় রাখতে পারিনে, ছেলে বড় হয়েছে, মাথায় খোঁপা বাঁধলে দেখতে পাবে।" এই একটী কথায় শরৎচন্দ্র বিন্দুর মাতৃত্ব আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

৩। হেমাঙ্গিণী (মেজদিদি)

মেজদিদি নামক গল্পে শরৎচন্দ্র, পরের ছেলে যাহাকে বলে, সেই রকম পর কেষ্টর প্রতি 'মেজদিদি' হেমাঙ্গিনীর অনির্ব্বচণীয় মাতৃস্নেহ দেখাইয়াছেন।

যখন কেষ্টর মা মারা গেল, তখন জগতে আর কেহ নাই দেখিয়া, কেষ্ট আসিয়া তাহার বৈমাত্র বড়বোন কাদম্বিণীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কেষ্ট আসিয়া কিরূপ আদর পাইল, তাহা কাদম্বিণী যখন তাহার স্বামীর কাছে কেষ্টর পরিচয় দিতেছে তখনই সেই কথাগুলি হইতেই জানিতে পারা যায়। কাদম্বিণী স্বামীকে বলিতেছে, "তোমার বড় কুটুম গো, বড় কুটুম। নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর, পরকালের কাজ হোক।" কাদম্বিণীর বাড়ী আসিয়া অবধি কেষ্ট তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রান্ত আঘাত খাইতে লাগিল। কেষ্ট তাহার দুঃখী মায়ের নিকট আর কিছু না পাইলেও, পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইত। কিন্তু কাদম্বিণী দিদির বাড়ীতে সে যখন খিদের জ্বালায় কিছু বেশী ভাত খাইয়া ফেলিল, তখন কাদম্বিণী উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, তবেই হয়েছে। এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে।" এই কথায় কেষ্টর বুকে অপমানের যে তীব্র শেল বিঁধিয়াছিল, তাহা এক অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। কিন্তু 'মেজদিদি' হেমাঙ্গিণীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই কেষ্ট যখন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তখনই কেষ্ট হেমাঙ্গিণীর

আদরের আস্বাদ পাইল, হেমাঙ্গিণী কেষ্টর চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, "থাক্, থাক্, হয়েছে ভাই, চিরজীবি হও।" কেষ্ট মূঢ়ের মত তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, এদেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না। পরদিন হেমাঙ্গিণী যখন কেষ্টকে নিমন্ত্রণ করিয়া লুচি, রুই মাছের মুড়োর তরকারী, সন্দেশ, রসগোল্লা খাওয়াইল সেইদিন কেষ্ট বুঝিল, যে তাহার মায়ের মতনই স্নেহ সে আর একজন পরের কাছে পাইল ও পাইবে। হেমাঙ্গিণী তাহার কে? তাহার বৈমাত্রভগ্নীর যা বই ত নয়। তাই, "আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা-মা মনে করবি— একথা হেমাঙ্গিণী কেষ্টকে বলিবার পূর্ব্ব হইতেই, কেষ্ট হেমাঙ্গিণীকে মা বলিয়াই জানিয়াছিল। তাই খিদের সময় কেষ্ট হেমাঙ্গিণীর কাছে খাইতে চাহিয়াছিল, তাই সে বলিতে পারিয়াছিল—"কাল কিছু খাইনি মেজদি— কেষ্ট তাহার মেজদিদিকে কত গভীরভাবে ভাল বাসিত, তাহা তাহার সেই পেয়ারা আনা হইতেই বুঝা যায়। একদিন হেমাঙ্গিণীর সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল, এই সংবাদ পাইয়া কেষ্ট নিজের বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত দুপুরটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার মেজদিদিকে গোটাদুই কাঁচা পেয়ারা আনিয়া দিল। কেষ্টকে কেহই বলে নাই যে, হেমাঙ্গিণী পেয়ারা খাইতে চাহিয়াছে, তবুও মেজদিদির জ্বর হইয়াছে শুনিয়াই কেষ্ট এই অসময়ে কাঁচা পেয়ারা আনিয়া দিল, এই চিত্রের চমৎকারিত্ব বলিয়া বুঝানো যায় না। কিন্তু এধারে কেষ্টর জন্য মেজবউএর কোন দরদ কোন যত্ন কাদম্বিণীর বরদাস্ত হইল না, কাজেই কাদম্বিণী এই লইয়া হেমাঙ্গিণীর সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। হেমাঙ্গিণী সে ঝগড়া গায়ে পাতিয়া লইল না, দেখিয়া কাদম্বিণী মেজবউকে ছাড়িয়া দেবরটীকে পর্য্যন্ত বাক্যবাণ ছুড়িতে লাগিলেন। ক্রমে দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন বৈকালে হেমাঙ্গিণীর স্বামী বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেষ্ট তোমার কে, যে একটা পরের ছেলে নিয়ে দিন-রাত আপনা-আপনির মধ্যে লড়াই ক'রে বেড়াচ্ছ। আজ দেখলুম, দাদা পর্য্যন্ত ভারী রাগ করেছেন।" স্বামী স্ত্রীর এইরূপ বিবাদ হইবার পরই কেষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ হেমাঙ্গিণী কেষ্টকে বলিয়া উঠিলেন, "এখানে কি? কেন তুই রোজ রোজ আসিস বলত?" ভয়ে বিস্ময়ে কেষ্ট বলিল, "দেখতে এসেছি।" এই কথায় বিপিন হাসিয়া উঠিল, স্বামীর হাসিতে বিরক্ত হইয়া হেমাঙ্গিণী আজ কেষ্টকে বলিল. "আর এখানে তুই আসিস্‌নে, যা।"

কিন্তু কেষ্ট কি না আসিয়া থাকিতে পারে? হেমাঙ্গিনীর আবার দিন পাঁচ ছয় হইতে জ্বর হইয়াছে, সে জ্বর ছাড়ে নাই, শুনিয়া সন্ধ্যার সময় কেষ্ট তাহার মেজদিদিকে দেখিতে আসিয়াছিল কিন্তু তাহাকে আসিতে মেজদিদি নিষেধ করিয়া দিয়াছিল বলিয়া সে ভিতরে ঢুকিতে সাহস করে নাই। এমন সময় হেমাঙ্গিনীর পুত্র ললিত আসিয়া বলিল, "মা কেষ্ট মামাকে একবার আসতে দেবে? ঘরে ঢুকবে না—ঐ দোর গোড়া থেকে একটীবার তোমাকে দেখেই চলে যাবে।" এই প্রাণের টান দেখিয়া কি চোখের জল সম্বরণ করা যায়? হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল, সে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেজদিদি জিজ্ঞাসা করিল, "কান্না কেন?" কেষ্ট বলিল, "ডাক্তার বলে যে, বুকে সর্দ্দি বসেছে।" সেই দিন যাইবার সময় কেষ্ট বলিয়া গেল, "আমাদের গাঁয়ে বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি, পূজা দিলে সব অসুখ বিসুখ সেরে যায়।—একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও না মেজদি।" মেজদিদি বলিলেন "হ্যাঁরে কেষ্ট আমি তোর কেউ নই, তবে আমার জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর কেষ্ট কোথায় পাইবে? সে কি করিয়া বুঝিবে, যে, তাহার পীড়িত আর্ত্তহৃদয় দিবারাত্রি কাঁদিয়া তাহার মাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

পরদিন উমা আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে খবর দিল, কা'ল তাগাদা না গিয়ে কেষ্ট হেমাঙ্গিনীর কাছে বসিয়াছিল বলিয়া, তাহার মার হ'য়েছিল—এমন মা'র যে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মার খাইয়াও কেষ্ট তাহার মেজদিদিকে আবার দেখিতে আসিয়াছিল, সেই দিন মেজদিদি মুখে বলিলেন, "দূর হ বলছি।" কিন্তু ভিতরে, তিনি তাহাকে বুকের আরও কাছে টানিয়া আনিবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। রাত্রিতে স্বামীকে বলিলেন, "কোনদিন ও তোমার কাছে কিছু চাইনি আজ এই অসুখের উপর একটা ভিক্ষা চাইছি দেবে?" স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই।" হেমাঙ্গিনী উত্তর করিল, "কেষ্টকে আমাকে দাও।" স্বামীর কিছুতেই মত হইল না, অবশেষে হেমাঙ্গিনীর অভিমান-ক্ষুব্ধ অনেক কথার পর বলিলেন, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।" কিন্তু তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যে, হেমাঙ্গিনী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কেষ্ট কোথায় তাগাদা করিতে গিয়া তিনটা টাকা পাইয়াছিল, সেই টাকা তিনটা দিয়া মেজদিদির অসুখের জন্য কোন ঠাকুরের পূজা দিয়া একটা ঠোঙা করিয়া নির্ম্মাল্য ও সন্দেশ প্রসাদ মেজদিদি'র জন্য আনিয়াছে। ইহাতে

বড় বউ. এমন কি বড় কর্ত্তা পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিনীকে অপমান করিতে ছাড়িলেন না, তাঁহারা বলিলেন, হেমাঙ্গিনীই কেষ্টকে চুরী করিতে শিখাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তারপর বড়কর্ত্তা কেষ্টকে এমন নির্দ্দয় ভাবে মারিলেন যে, বোধহয়, মানুষ মানুষকে তেমন ভাবে মরিতে পারে না। সেই দিন সবে হেমাঙ্গিনীর পথ্য করিবার কথা, কিন্তু পাতের ভাত পাতেই শুকাইতে লাগিল। রাত্রিতে আজ আবার জ্বর আসিল, হেমাঙ্গিনী জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল। রাত্রিতে সে স্বামীকে বলিল, "কেষ্টকে আশ্রয় দাও, নইলে এ জ্বর আমার সারবে না। মা দুর্গা আমাকে কিছুতে মাপ করবেন না।—দেবে ?" বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছাইয়া বলিলেন, "তুমি যা, চাও, তাই হবে, তুমি ভাল হ'য়ে ওঠ।" কিন্তু হেমাঙ্গিনী ভাল হইয়া উঠিলেও যখন বিপিন কেষ্টকে আনিতে দিলেন না, তখন হেমাঙ্গিনী বলিয়া উঠিল, "আমার দুটী সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটী হ'য়েছে। আমি কেষ্টর মা।" এই বলিয়া 'কেষ্টর মা' হেমাঙ্গিনী বাপের বাড়ী যাইবার জন্য গাড়ী ডাকতে পাঠাইয়া, ছেঁড়া মাদুরে, গায়ের ব্যথার জ্বরে যেখানে কেষ্ট পড়িয়াছিল, সেই খানে গিয়া বলিল, "কেষ্ট, আয় আমার সঙ্গে, আমাকে বাপের বাড়ী আজ তোকে পৌঁছে দিতে হবে যে।" এই বলিয়া কেষ্টকে লইয়া তিনি গাড়ী চড়িয়া বসিলেন। যখন গাড়ী কিছুদূর চলিয়া গিয়াছে, তখন বিপিন ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে, মেজবৌ ?" "এ দের গ্রামে।" "কবে ফিরবে ?" হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে দেখাইয়া বলিল, "কখনও এর আশ্রয় জোটে, তবেই ত একা ফিরে আসতে পারব, না হয়, একে নিয়েই থাকতে হবে।" হেমাঙ্গিনীর এই মাতৃমূর্ত্তি, তাহার এ মুখের ভাব দেখিয়া বিস্ময়ে বিপিনের কণ্ঠস্বর নম্র হইয়া আসিল, তিনি বলিলেন, "মাপ কর, মেজ বৌ, বাড়ী চল।" মেজ বৌ যখন বলিলেন, "কাজ না সেরে কিছুতেই বাড়ী ফিরতে পারবো না।" তখন, বিপিন কেষ্টর ডানহাত ধরিয়া বলিলেন, "কেষ্ট, তোর মেজদিদিকে তুই বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই, আমি শপথ করছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না।"

এই গল্পে শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, প্রেমের ক্ষেত্র কত অসীম। প্রকৃত প্রেম ও স্নেহ কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। স্বামীর চেয়েও যে কেহ বেশী আত্মীয় হইতে পারে, এই গল্পে শরৎচন্দ্র সেই তত্ত্বই দেখাইয়াছেন।

স্নেহ যখন দুয়ার ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়, তখন কিছুতেই তাহার পথ রোধ করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

আবির্ভাব।

(শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়)

দুর্গম বন-কান্তার ছেদি' দুস্তর পথ হেলায় উত্তরিয়া
চক্রনেমির ঘর্ঘর রবে জগন্নাথের রথ এল বাহিরিয়া
অন্ধকারের যবনিকা ভেদি ছুটায়ে রুদ্ধ আলোর উৎস রাশি।
তরুণ অরুণ কিরণ প্রপাতে দিগ্বলয়ের জ্যোতি উঠে পরকাশি।
পার্থসারথি ধরেছে বল্গা তর্জ্জনী তুলি পথ নির্দ্দেশ করে'
অশ্বখুরের বিদ্যুৎ-বেগ, হ্রেষাব উঠিল গগন পবন ভরে,
আর্ত্তের তরে একি আহ্বান সঞ্চরি' উঠে প্রলয় অন্ধকারে
চঞ্চল আজি দুর্ব্বল প্রাণ, অর্গল কাঁপে নিষেধের কারাগারে;
বিশ্বের মহারাজ
নিখিল মরণ শঙ্কা হরণ অভয় দানিছে আজ।
আজিকে শুভ্র শঙ্খ নিনাদে আহ্বান কার ভবনে ভুবনে রটে?
এস বিশ্বের কল্যাণী নারী পূর্ণ করগো সব মঙ্গল ঘটে।
সিন্দুর লেপ, দাওগো এলোনা, আম্রশাখায় শুভের সূচনা কর
পূর্ণ কলসে শান্তির জল আপন কক্ষে আজি আনন্দে ধর।
এস হে মানব যজ্ঞশালায় হবিকাঠ দিয়ে জ্বালো জ্বালো হুতাশন,
বিশ্বের হিত সাধনার ব্রত অগ্নিমন্ত্রে কর আজ সমাপন।
মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি কেমনে সহিবে এই হীন অপমান
দেখ চেয়ে দেখ আলয়ে তোমার নহে নিদ্রিত, জাগ্রত ভগবান!
জেগেছেন দয়াময়
নাহিক বিবাদ, নাহি অবসাদ নাহি নাহি আর ভয়।
জগন্নাথের রথ চলে যায়, সেকি কম্পন ত্রস্ত ধরণী বুকে
অর্দ্ধেক পথে থমকি সূর্য্য তূর্য্যনিনাদ শোনে সারথীর মুখে,

পবন আজিকে স্তব্ধ নিশানে পথ ছাড়ি' ভয়ে দূরে করে পলায়ন
রথ ঘর্ঘরে প্রতি ঘরে ঘরে চিরনিদ্রিত মেলিতেছে দুনয়ন।
অলস আজিকে ত্যজিছে শয্যা, অসাড় আজিকে দিয়ে ওঠে দেহ নাড়া
অন্ধ আজিকে দেখে চোখ মেলে, বধীর আজিকে আহ্বানে দেয় সাড়া
ওরে হতমান পীড়িত অধম বুকে বল করি দাঁড়া দেখি পুরোভাগে
ওরে প্রাণহীন চিরদিনহীন দেখ দেখ বুঝি ভগবান বুকে জাগে।
এসেছেন ব্যথাহারী
বুকের পাষাণ দূরে ছুড়ে ফেল বিশ্বের নরনারী।
নাহি কার্ম্মুক ভয়াল ভীষণ, তীক্ষ্ণ শাণিত যোদ্ধার তরবারী
নাহিক চক্র অমোঘ অস্ত্র, জেগেছেন আজ সকল বেদনাহারী,
বর্ম্মে বর্ম্মে নাহি সংঘাত, নিষ্ঠুরাঘাতে শস্ত্রের ঝনঝনি
পাঞ্চজন্যে যুদ্ধ ঘোষনা হবে না হবে না, অগ্নিশায়ক উঠিবে না বনরনি!
আজিকে হইবে পাশব দলন দীপ্ত আঁখির বক্র চাহনি দিয়া
এক অঙ্গুলি হেলনে ত্রস্ত নিশ্চয় হবে নির্ভয় পাপ হিয়া।
অত্যাচারের খড়্গ খসিবে, অবিচারী রাজদণ্ড কাঁপিবে হাতে
ন্যায়ের মুকুট মুকুতাবিহীন দীনভাব লাজে মলিন হইবে মাথে,
আজিকে শক্তিময়;
নিরাশার ঘোর আঁধার মাঝারে দিতেছেন বরাভয়।
মানব-মানস কুরুক্ষেত্রে শত্রুমিত্রে হবে আজি মহারণ
সকল-স্বার্থে বিশ্ববাহিনী করিয়াছে আজ অটল মৃত্যুপণ;
আজিকে পার্থ-স্বার্থের তরে আসে নাই রথে পার্থ-সারথি হরি
নিখিলের সব সম্পদ ভাগ তৌলদণ্ডে দিবে বণ্টন করি,
আজি বিশ্বের রাজাসন খানি স্থাপন করিবে বিশ্বকমল 'পরে
রাজসভাতলে হইবে বিচার হৃত অসহায় কাঙাল জনার তরে।
চরণ-নখর হইতে ঝরিবে মুক্তির ধুলি, ভিক্ষার ঝুলি দূরে করে
ফেলে দাও
তুমি নহ দীন সম্পদহীন নির্ভয়ে আজ নয়ন তুলিয়া চাও।
এসেছেন নারায়ণ
এস হে ভক্ত হৃদয়-রক্ত-কমল কর চরণ।

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

সহজিয়া।

(শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি এল)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিপ্রলব্ধার কথা।

বাবা আমার নাম রেখেছিলেন জানকী। কিন্তু মা আমার সে নাম উল্টে দিয়ে রাখলেন উর্ম্মিলা, তবু ভাগ্য কি তাতে উল্‌টিয়েছে? জানকী নাম, বলে, রাখতে নেই, জন্ম দুঃখী হয়. কিন্তু উর্ম্মিলাই বা কি এত ভাল! মা জানকী ত' তবু তাঁর স্বামীর সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনে বনে কাটাতে পেয়েছিলেন, আমায় যে উর্ম্মিলার মত স্বামীকে পেয়েই হারাতে হয়েছে! মা আমার ভাগ্যটাকে যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন তাই আগে থাকতেই নাম বদলে দিয়েছিলেন। তবু বাবা ডাকতেন, "মা জানকী," এবং আমিও উত্তর দিতাম। কারণ আর যে যাই মনে করুক, আমি আমার বাবাকে জনক ঋষির চেয়ে কম ভক্তি করতাম না, করতে শিখিও নি, এবং সেই জন্য নিজেরও জানকী হবার পক্ষে আপত্তিও তেমন ছিল না।

মাও যে বাবাকে কম ভক্তি করতেন তা নয়, তবু কেমন যেন তাঁর ভয় করত। আমায় সীতাদেবীর মত যে বাল্যকাল হতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্যই উৎসর্গ করে রাখা হয়েছিল, এটা মা যেন সইতে পারতেন না। কেবলি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। কাজে কর্ম্মে সব সময়ই আমাদের গৃহ-দেবতা রামসীতার চরণে তুলসী দিয়ে আমার বাবার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতেন।

কিন্তু বাবার শরীরে মনে কাজে কর্ম্মে কোথাও ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না। উনি মাকে যখন তখন বুঝিয়ে দিতেন যে, "আমার জানকীর জন্য শ্রীরঘুনাথজী নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনিই আমার মা জানকীকে পায়ে টেনে নেবেন।" মা শিউরে উঠতেন, কিন্তু আমার জ্ঞান হওয়ার পর হতে মনে পড়ে আমি কখনো ভয় পাই নি। আমি কত সময় দোতালার ছাতে উঠে আমাদের গ্রামের "সরান" পথটা যেখানে মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে,

সেই দিকে চেয়ে আলসে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভাবতাম আমার সেই রামচন্দ্র ধূলো উড়িয়ে পতাকা উড়িয়ে তাড়কা বধ করে কোন দিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন।

বাবার এই ভাবটায় আমাদের যে কি রকম পেয়ে বসেছিল তা যে শুনবে সেই অবাক হয়ে যাবে। এমন কি বাড়ীর দারোয়ান ঘনবরণ সিং উৎসাহের চোটে একদিন নিজের নামটাই বদলে ফেলেছিল। ছিল ঘনবরণ, হয়ে গেল রামচরণ। আর এমনি তার হাড়ে হাড়ে রামভক্তি বিঁধে গিয়েছিল যে সে যা কিছু ছাপার অক্ষর সম্মুখে পেতো সবই রামপক্ষে ব্যাখ্যা না করে ছাড়ত না—এমন কি হনুমানজীর লেজটুকু পর্য্যন্ত বাদ যেত না। তার একদিনকার একটা ব্যাখ্যা আমার এখনো বেশ মনে পড়ে। কোথা হতে আমাদের গাড়োয়ান ছেদীলাল এক টুকরো কাগজ নিয়ে এসে দারোয়ানজীকে ধরে বসলে, "দারোয়ানজী, ইঠোতো দেখিয়ে, ইসকো মৎলব তো বাৎলাইয়ে।"

দারোয়ানজী তাঁর তুলসীদাস হতে চোখ তুলে, কাগজ খানা হাতে নিলেন। তারপর প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্লেন, "আরে ইয়ে তো বাংলে হরফমে সংস্কৃৎ হায়—রামো লক্ষ্মণম ব্রবীৎ।"

"মতলব কেয়া?"

"রামো রামচন্দ্র রঘুনাথজী, লক্ষ্মণ, লছমনজী সমঝা?

"হাঁ মহারাজ, উ তো সমঝা, উসকে বাদ?"

"অব্রবী ইসকো মৎলব অলবৎ মা জানকী হোগা, আউর ওহি যে হলন্ত ত হায়হু, ওহি হায় মহাবীর জীকো ছুম্ (লেজ)।"

আমাদের দরোয়ানজীর ব্যাখার অসাধারণ ক্ষমতা আগে হতেই সবাই জানতো, তাই আমাদের কোন আত্মীয়ের মুখ হতে ক্রমশঃ পাঁচ হতে হতে শেষে বাবার কাণেও পৌঁছেছিল। আমরা চেপে চেপে হাসাহাসি করছিলাম বটে, কিন্তু বাবা দারোয়ানজীরই দিক নিয়ে বলেছিলেন, "ভক্তি করে যা মনে করবে তাই ঠিক হবে, তোমরা কেউ হেসো না।"

জোরে হাসবার কারো তেমন জো ছিল না, কারণ একে আমাদের বাড়ী হল গ্রামের জমিদার বাড়ী। তার ওপর এমনি একটা আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্ব্বন, শাস্ত্র পাঠ, অতিথি সেবার হাওয়া সারা বৎসর ধরে বাড়ীতে বইত যে হাসি ঠাট্টা বাড়ী হতে প্রায় বিদায় নিয়েছিল। এমন কি যাত্রা গান কথকতা বা কীর্ত্তন যাই কিছু হোক না কেন, সমস্ত আনন্দের জিনিষের মধ্য

হাতে হাসির অংশটুকু বাদ না দিলে যেন আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সে সবের স্থান হত না।

আমি জমিদারের মেয়ে, তাই চাকর্ দাসীরও অভাব ছিল না। কিন্তু বন্ধু বলতে যা বোঝায়, সখী বলতে যা বোঝায় তাত ছোট বেলা কৈ কখনো পাইনি। যাকেই অন্তরঙ্গ করতে গিয়েছি সেই যেন কেমন একটুখানি দূরত্ব রেখে তবে কাছে এসেছে। আমি যেন কোন একটা অচেনা জগতের জীব, কি এক অজানা কারণে, বোধ হয় শাপভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসেছি। আমার সঙ্গে ভাল করে, প্রাণ খুলে যেন মিশতে নেই। সবারই পক্ষে আমার কথা শুনতে আছে, কাজ বললে তৎক্ষণাৎ করে দিতে আছে. আমার ঘরে ধূপ ধুনো ফুল চন্দন সবই দিতে আছে, কৈবল আমার গলা জড়িয়ে ধরে দুটো মানে-মৎলবহীন মিষ্টি কথা বলতে নেই।

এই জন্য আমাব মধ্যে ছোটবেলা হতেই এমন একটা জীব জেগে উঠেছিল যা একেবারেই এ দেশের নয়, সে জন্ত কি দেবতা তা এখনো ঠিক করতে পারিনি সে কখনও চাইত ছুটে বেরিয়ে নেচে কুঁদে অস্থির হয়ে সব শুচিত্ব সব দূরত্ব দূর করে ফেলে দিতে, আবার কখনো চাইত একদম একলা চুপ চাপ অশোক বনের সীতার মত বসে থাকতে। আর এই দোটানার মাঝখানে যে মানুষটা সমস্ত দিনের কাজকর্ম্মের মধ্যে ঘুরে বেড়াত সে যে কি ছিল, তা আমি বলতে পারব না, তার না ছিল হাসি না ছিল কান্না, না ছিল মান না ছিল অপমান, না ছিল রাগ না ছিল অনুরাগ।

(২)

যাক্, এমনি করে কতদিন কেটে গেল। তারপর হঠাৎ এমন দুটী লোক আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল, তারা যেন একেবারে আলো আর অন্ধকারের মত আলাদা। একজনের নাম হাসি, আর একজনের ঠিক নাম কি জানিনে কিন্তু বাবা বল্লেন তিনি একজন স্বামী। আমরাও তাঁকে স্বামী মহারাজ বলেই ডাকতাম। একজন এল ফাগুনের দিনের মত একরাশ আলো আর হাসি আর রূপ, আর সাজসজ্জার অতিশয্যত্ব নিয়ে, অন্যজন এলেন বর্ষার অন্ধকার রাত্রের মত গাম্ভীর্য্য নিয়ে জটাজুট সমাযুক্ত হয়ে, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তের সর্ব্ব-রিক্ত মহীশয়ত্ব নিয়ে। আর আমি পড়ে গেলাম মহামুস্কিলে, কারণ এ দুজনার একজনকেও ঠেকিয়ে রাখবার জো ছিল না।

হাসি এসে আমার চাল চলন অসন বসন দেখে হেসেই অস্থির। আর

স্বামী মহারাজ আমার ঐ সমস্তই লক্ষ্য করে বল্লেন, যে, আমা হতে কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা হবেন। হাসি আমার পূজা অর্চ্চনা পড়া শুনার ধুম দেখে রেগে সমস্ত বৈ কাগজ পত্র পুড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা দিলে। আর স্বামী মহারাজ তাঁর ঝুলি হতে একখানা পরমহংস সংহিতা বার করে আমায় উপহার দিলেন। একই বস্তু দুজনে দু রকম চোখে দেখছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সেই আঠার বছরের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিচার শক্তি সমস্তই হঠাৎ কেমন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অথচ দুজনের একজনকেও দূরে রাখতে পারলাম না। আমার চিরদিনকার শিক্ষা দীক্ষা যে সময় আমার ঐ স্বামী ঠাকুরের পায়ের কাছে বসিয়ে দিলে, ঠিক সেই সময়ই আমার অন্তরের অন্তরে যে মানুষটা ছিল সে যেন হাসির হাসির হাওয়ার মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমার কাণ দুটো, শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনত, মনও তাতে যে যোগ দেয় নি তা নয়, কিন্তু মনের যা মন তা যে হাসির দূর হতে টানাটানি অনুভব করছিল সেটা ত' মিথ্যে নয়।

এই হাসিটী ছিল আমার মামাত বোন। আমার মামা ক্রিশ্চান হয়ে গিয়েছেন বলে আমার দিদিমা তাঁর মাতৃহীনা নাতনীটীকে নিয়ে মামার কাছ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছেন। তাঁর আশা বোধ হয় এই ছিল, যে আমাদের সংস্রবে এসে হাসি তার সমস্ত ক্রিশ্চানী শিক্ষা দীক্ষা হাব ভাব, বিশেষতঃ তার অকারণ হাসির উচ্ছ্বাস টুকু ভুলে প্যাঁচা হয়ে বসবে। কিন্তু ফলে হল, 'উল্টা বুঝলি রাম'। সে এসেই বাড়ি শুদ্ধ মাতিয়ে তুললে। মা তার সংস্রবে পড়ে পূজা পাঠের অবসরে ঘর দুয়ার সাজান ধোয়া মোছায় একটু বেশী মন দিলেন; ঝিয়েদের কাজ কর্ম্ম বাড়া সত্বেও তারা মন খুলে গল্প গুজব লাগালে, আশ্রিত আশ্রিতারা একটু ভাল খাবার দাবার পেতে লাগল এবং তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। অতিথশালায়ও শুনলাম নাকি খরচ আর কাজ বেড়ে গেছে। ঝাড়ুদার বেহারা হতে আরম্ভ করে বাগানের মালী পর্য্যন্ত একটা শোভনতা রক্ষার মধুর অত্যাচারে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হয়ে ফিরতে আরম্ভ করলে। এমন কি বাবাও যেন ক্রমশঃ তাঁর কঠোর শুচিত্বের আবেষ্টনী হতে শোভন নির্ম্মলত্বের আবহাওয়ার পড়ে স্বস্তি অনুভব করলেন, অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হল।

স্বামী মহারাজ কিন্তু নিজের অগাধ গাম্ভীর্য্যের শিখরে অচল হয়ে বসে রইলেন। হাসি মাঝে মাঝে তাঁকেও নানা প্রকারে আক্রমণ করতে লাগল

কিন্তু তিনি এমনি একটা প্রশান্ত হাস্যে তার সকল প্রশ্ন তর্ক যুক্তিকে ঠেলে দিতে লাগলেন, যে, শেষে হাসি আর পারতপক্ষে তাঁর ত্রিসীমা মাড়াত না। ডাকলে বলত, "ওরকম হাজার বছরের আগেকার মানুষের কাছে গেলে অকারণে বুড়িয়ে যেতে হবে।"

আমি কিন্তু এই শান্ত গম্ভীর মানুষটাকে কিছুতেই বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকতে পারতাম না, যখন তখন গিয়ে কাছে বসতাম, এটা ওটা এগিয়ে দিতাম, যখন তখন যা তা প্রশ্ন করে তাঁকে ভাবিয়ে তুলতাম, না হয় এমন একটা উত্তর নিয়ে আসতাম যা সমস্ত দিন ধরে আমায় পেয়ে বসে থাকত। বাবা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতেন সেই সময়টা ছিল আমার সব চাইতে ভয়ঙ্কর সময়, কারণ সেই সময়টা আমায় উপস্থিত থাকতেই হ'ত—বাবার সেই রকম আদেশ ছিল। কিন্তু এই রকম বাধ্য হয়ে বসে থাকা বাধ্য হয়ে ধর্ম্ম কথা শোনা আমার যেন তেমন সইত না, তাই বাবা যখন থাকতেন না তখন যত ইচ্ছা এবং যেমন করে ইচ্ছা হত তেমনি করে স্বামী মহারাজের ঝুলিটা নেড়ে চেড়ে দেখতাম। এবং তাঁর সেই সময়ের অবাধ সঙ্গোপনভোগ হতে যা পেতাম তাই যেন প্রকৃত লাভ বলে মনে হত। মা দিদিমা বা অন্যান্য কোন সাধুসঙ্গলোলুপ আত্মীয়ের উপস্থিতিও যেমন এই অপূর্ব্ব মানুষটার ওপর একটা ভাব-গৈরিকের আচ্ছাদন ফেলত, তেমনি আমার সঙ্গও অনেক সময় যেন তাঁর মনের উপরকার সেই প্রবীণত্বের গৈরিকটা টেনে ফেলে দিয়ে ভিতরকার চিরন্তন কিশোর মানুষকে টেনে বার করত।

এঁর বয়স যে কত হয়েছিল তা বলতে পারিনে। বাবা বলতেন সত্তর পঁচাত্তর হবে—কিন্তু কিছুদিনের পরিচয়ের পর আমার তা মনেই হত না। আমার মনে হত যেন তিনি আমারই বয়সী। তাঁর চিমটে, তাঁর ধুনি, তাঁর ছাই ভস্ম, তাঁর কটা গোঁফ জটা কিছুই যেন তাঁকে বুড়ো করতে পারেনি। অন্তরের খোলা মাঠে অবাধে ছুটে ছুটে খেলে বেড়িয়ে তিনি যেন অন্তরে চিরকিশোরই রয়ে গিয়েছিলেন। না ছিল তাঁর খাওয়া দাওয়ার ঠিক, না ছিল শোয়া বসার সময়। বেড়াচ্ছেন ত বেড়াচ্ছেনই—বসে আছেন ত বসেই আছেন, গল্প করছেন ত গল্পই করে যাচ্ছেন, আবার চুপ করে আছেন ত এমনি চুপ যেন জন্ম হতে চির-মৌন। তাঁর গল্পের সময়ও দেখিছি চারদিকের আকাশ বাতাসও যেন গল্প করত, গম্ভীর আওয়াজে মুখর হয়ে উঠত। আবার তিনি যখন মৌন হয়ে থাকতেন তখন যেন মনে হত জগতের মধ্যে আওয়াজ বলে

কোনো পদার্থই নেই। আমাদের গীত শাস্ত্রে নাকি বলে যে দিনের প্রত্যেক অংশের এক একটা প্রধান সুর আছে, এমন কি ষড় ঋতুরও এক একটা নিজস্ব সুর আছে। সেই সুর নাকি আমাদের গীত-বিশারদের কাণে ধরা পড়েছিল, তাই বিভিন্ন সময়ের জন্য এবং বিভিন্ন ঋতুর জন্য বিভিন্ন রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছিল। আমি অত শত বুঝি না, কিন্তু আমাদের ন্যাসী মহারাজ যখন যা করতেন বা বলতেন তার সমস্তই যেন সময়ের সঙ্গে স্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যেত।

(৩)

কিন্তু হাসিরও আমার গুণ ছিল যে কত, তা বলে শেষ করতে পারি না। সে সারাদিন নানা কাজে ঘুরছে, কিন্তু দিনের শেষে দেখতাম একখানা একখানা চমৎকার ছবি তার ঘরের জানালার পাশে তৈরী হয়ে উঠেছে। কখন যে সে এত কাজ করে, ঘর সাজিয়ে, ছেলে পিলেদের খাইয়ে মুছিয়ে, রাজ্যের লোকের তত্ত্ব তল্লাস করে, এমন কি নানা রকম খাদ্য তৈরী করেও এই কলাবিদ্যার সময় পেতো তাও ধরতে পারতাম না, কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পারতাম যে তার প্রাণের হাসিটুকু তুলির মুখে ছবির ভেতর অতি সহজেই ফুটে উঠ্‌ত আর তা সহজেই ধরা যেত। সে যা আঁকত তাতে কেবল থাকত আলো আর আলো শুধু রং আর রং। গাছ পালা, জীব জন্তু নদী সমুদ্র, পাহাড় পর্ব্বত, সব তাতেই একটা সজীব আলোর সমাবেশ। সবই যে প্রকৃতির হুবহু নকল তা নয়, হয়ত সবটাতেই রংএর একটু আতিশয্যই থাকত, তবু যেন ঐ সব সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি হতে তার মনের মানুষটাকে আমি ধরতে পারতাম।

একদিনকার কথা বেশ আমার মনে পড়ে। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, সমস্ত আকাশ যেন মেঘে একেবারে অন্ধকার, সম্মুখের দীঘীর জলও কালো হয়ে এসেছে, আম কাঁঠালের গাছের মধ্যে অন্ধকার জমে এসেছে কিন্তু আমি তার ঘরে গিয়ে দেখি যে সে ছবি আঁকচে। যদিও সেটা বরষারই ছবি বটে কিন্তু তাতে সে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নানারঙের আলো ফুটিয়ে তুলেছে, আর একটা হরিণশিশু মাথা উঁচু করে অস্তমান সূর্য্যকে দেখছে। গাছের সবুজ পাতাগুলোর ডগা লালে লাল আকাশে নীলের সঙ্গে লালের মেশামিশি, আর একটা রামধনুর এক অংশ ছবির কোণায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমি বল্লাম "এ হতেই পারে না—রামধনু দেখা গেলে সূর্য্য দেখা যেতে পারে না।"

হাসি হেসে বল্লে,—"তা নাই বা গেল, তবু আমি তাই আঁকিব।"

এর ওপর তর্ক চলে না তাই তর্ক বন্ধ হল, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তর্ক চলতেই লাগল। একবার মনে হল বলি, যে, যা অসম্ভব তা কিছুতেই সুন্দর নয়, আবার তখনি মনে হল, যে, যা সুন্দর তাকে যে সম্ভবের মধ্যে ধরা দিতেই হবে তার মানে কি? যে যে জিনিষ কেবল নিয়ম মেনে চলে তাকে সুন্দর করে তুলতে হলেই ত তার মধ্যে নিয়ম-ছাড়াকে সৃষ্টি ছাড়াকে এনে ঢোকাতে হবে, নৈলে সৌন্দর্য্য যে কিছুতেই ফুটবে না। যা প্রত্যাশিতের মধ্যে অপ্রত্যাশিত তাই ত সুন্দর। যা নিয়মের মধ্যে অনিয়মিত তাই ত মনোমোহন।

হাসি তার ছবি থেকে মুখ তুলে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার তুলি দিয়ে আমার কপালে একটা টীপ পরিয়ে দিয়ে বল্লে, "এই দেখ এই ভুরু দুটোর মধ্যে যা ছিল না তাকে সৃষ্টি করে, প্রকৃতির নিয়মকে উল্টে দিয়ে তোমার কপালখানি কত সুন্দর করে দিলাম। চল দেখবে।

আমায় একখানা আয়নার সুমুখে দাঁড় করিয়ে সে এক মনে কি যে দেখলে তা সেই জানে, কিন্তু তার আদরের অপ্রত্যাশিত চুম্বনটুকু আমার প্রাণের মধ্যে এমন অপ্রত্যাশিতকে এনে দিলে যাকে নিয়ে আমি ঐ আয়না খানার সামনে অবাক হয়ে নিজের দিকেই চেয়ে রইলাম। আমার চেহারার মধ্যে কি যে দেখছিলাম ঠিক জানি না, কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছিল এই ত আমি আমার কাছে ধরা দিয়েছি। আমার যে 'আমিটাকে' এত তত্ত্ব দিয়ে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারছিনে, এই ত আমার সেই 'আমি' একটী আনন্দে ভরা চুম্বনে সুন্দর হয়ে স্থূল হয়ে আলোক বাতাস মাটীর সমষ্টি হয়ে আপনারই কাছে ধরা দিয়েছি। এই দেহ হয়েই ত আমি আপনাকে পেয়েছি। আমি ত' অধর নই, আমি যে পূর্ণ ভাবে ধরা পড়ে গিয়েছি।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার পর স্বামী মহারাজের কাছে গেলাম। কিন্তু দেখলাম তিনি চুপ করে বসে আছেন, আর বাবা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বসে আছেন। ইতিপূর্ব্বে কি কথা যে হয়েছে তা জানিনে—কিন্তু দু'জনে চুপ করে বসে আছেন দেখে আমার যেন কেমন ভয় করতে লাগল। কোনো কথাই বলতে পারলাম না, ধীরে ধীরে এক পাশে বসে পড়লাম। স্বামী মহারাজ ফিরেও চাইলেন না, কোনো কথাও বল্লেন না,

কিন্তু বাবা একবার আমার দিকে চেয়েই আবার তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। তার পর হঠাৎ বল্লেন, "তা হলে কি করব?"

স্বামী বল্লেন "তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে যাও, তা হলেই তাঁকে পাবে—তিনি আপনি এসে দেখা দেবেন, কিন্তু এখানে বসে থাকলে হয়ত পাবে না।"

কার কথা হচ্ছিল, কাকে পেতে হবে, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি অবাক হয়ে একবার এর পানে একবার ওর পানে তাকাতে লাগলাম। বাবাও কিছুক্ষণ বসে থেকে শেষে উঠে গেলেন।

আমি অবসর পেয়ে ভাবলাম একবার জিজ্ঞাসা করি, কার কথা হচ্ছিল, কিন্তু স্বামী মহারাজ তার অবসর দিলেন না। তিনিও হঠাৎ উঠে অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, শেষে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম স্বামী মহারাজ মৃদুস্বরে গান করছেন। তাঁকে কোনো দিন গান করতে শুনিনি, তাই হঠাৎ তাঁর মধুর গম্ভীর স্বর শুনে আমি চমকে উঠে, ধীরে ধীরে ঘরেব দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল—আমি সেই বিদ্যুতের আলোকে দেখলাম স্বামী রেলিংএর উপর হাত রেখে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে গান গাইছেন। কি যে গাইছিলেন তা মনে নেই এবং বোধ হয় হিন্দি গান বলে বুঝতেও পারিনি, কিন্তু গানটার বিষয় এইটুকু মনে আছে যে যেন সেটা প্রতীক্ষার গান, কিম্বা বিরহের গানই হবে। তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছিল যে এই এত বড় একটা আপ্তকাম পূর্ণকাম মানুষের মনের মধ্যে আবার এরকম করুণ সুরের উচ্ছ্বাস উঠল কেন?

তাঁকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখে আমি ফিরবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় তিনি কাছে এসে বল্লেন, "মা জানকি! তোমার জানকী নাম বদলে দিলাম, আজ হতে তুমি গৌরী, গৌরী হতে তোমার আপত্তি আছে?" আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম, দেখলাম, তাঁর মুখে হাসির লেশ মাত্র নাই, তার পরিবর্ত্তে একটা ঔৎসুক্যের ভাব ফুটে উঠেছে। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বল্লেন, "তোমাকে কি করতে হবে জান? একজন ঘরছাড়াকে ঘরে আনতে হবে,—গৌরী যেমন শ্মশানবাসী শিবকে গৃহবাসী মহাদেব করেছিলেন, তোমাকেও তেমনি একজনকে—কে সে জানিনে—

একজন মহাত্যাগীকে মহাযোগী করতে হবে, এই কাজের জন্যই তুমি জন্মেছ, এইটীই তোমার এ জগতে জন্মাবার কারণ—বুঝেছ?"

আমি চুপ করে মাটীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্বামী মহারাজ পায়চারী আরম্ভ করলেন। দু চারবার ঘুরে আবার কাছে এসে বল্লেন, "এইটাই তোমার অদৃষ্ট তুমি বোঝো, আর নাই বোঝ, মা, তোমা হতে এই কার্য্যই সিদ্ধ হবে। তোমার বাবাকেও তাই বুঝিয়েছি, আর তিনি আমার কথানুসারে কাজ কর্ব্বেন বলেছেন। তুমি গৌরী হতে পার্ব্বে না মা? একটী শিবকেও কি শব হতে না দিয়ে শঙ্কর করতে পারবে না?"

আমি কাতরভাবে বল্লাম, "কি করতে হবে বুঝিয়ে বলুন। যিনি ত্যাগী তিনি কি যোগী নন? যোগী তবে কে?"

"যিনি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করেন, যিনি অনাসক্ত হয়ে আসক্ত হন, এবং যিনি আসক্ত হয়েও অনাসক্ত থাকেন তিনিই যোগী। যিনি বিয়োগী তিনি কি যোগী হতে পারেন? যিনি সর্ব্বকে সত্য বলে স্বীকার করে মিথ্যা বলে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে যোগ-যুক্তাত্মা হয়ে অবস্থিতি করেন তিনিই যোগী। অন্য সমস্ত যোগই এই যোগের প্রাথমিক অবস্থা। তোমায় এমনি একটী যোগীকে তৈরী করতে হবে—পারবে না মা?"

আমি বল্লাম, "আমি আপনার কথা বুঝতে তেমন পারলাম না, তবে এইটুকু বুঝলাম যে কোনো একজন সন্ন্যাসীকে গৃহী করতে হবে, তাঁর মুক্তির পথ বন্ধ করে বন্ধনের পথ করে দিতে হবে। তাই যদি আমার অদৃষ্ট হয়, তাই করব।"

স্বামী এইবার খুব জোরে হেসে উঠলেন—এত জোরে হাসতে তাঁকে কখনো শুনিনি। তিনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে তাঁর আসনের উপর বসে বল্লেন, "মা মুক্ত না হলে কি পূর্ণরূপে বন্ধনের আনন্দ জানতে পারে? যে বদ্ধ জীব সে তো মুক্ত হবার জন্যই ছট ছট করছে, যে মুক্ত সেই পূর্ণ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে পারবে। যাক এসব কথা আর এখন নয়, যখন সময় হবে আপনিই বুঝতে পারবে। যখন তোমার প্রকৃত গুরুকে পাবে, যিনি সহজেই তোমার সমস্ত বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকেও মুক্ত করবেন নিজেও আনন্দ পাবেন, তখন আনন্দ পাবে, তখন আমার আজকের কথা বুঝতে পারবে। এখন যাও কাল ভোরেই স্নান করে আমার কাছে এস।"

আমি ধীরে ধীরে ভিতরে চলে গেলাম। পরদিন প্রভাতে তাঁর কাছে

গিয়ে দেখলাম, তিনি হোম করছেন শুনিলাম রাত্রি হতে এই কার্য্য হচ্ছে। বাবা তাঁর কাছে বসে আছেন। কেন যে এই অনুষ্ঠান তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে স্বামী নিজে আমায় ফোঁটা পরিয়ে দিলেন, শান্তিজল দিয়ে আশীর্ব্বাদী ফুল দিলেন। তার পর বাবার দিকে চেয়ে বল্লেন, "আমার কাজ শেষ হল, আজই আমি যাব। এর পর যা যা কর্ত্তব্য তুমিই করো। হয়তো আর দেখা হবে না কিন্তু আশা আছে, তোমার এই কন্যা হতে এমন একটা সত্য তুমি জানতে পারবে, যা তোমার কেন, অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু তুমি না জেনেও সেই সত্যের জন্য নিজেও তৈরী হয়েছ এই কন্যাকেও তৈরী করেছ। তোমার চিরদিনকার আশার রামচন্দ্র আসবেন, এবং এমন ভাবে আসবেন যাতে সেই চিরন্তন গোপন সত্য তোমাদের উপলব্ধি হবে। মা জানকী! তোমায় এই টীকা পরিয়ে দিলাম, তুমি আজ হতে কেবল তাঁরই যিনি কেবল তোমারি জন্য আসছেন, যিনি কেবল তোমারি। তোমারি হয়েই তিনি সবারই এবং সবারই হয়েই তিনি সর্ব্বাতীত।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাবা নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন, আমিও করলাম।

উপাসনা—অগ্রহায়ণ।

ছুঁৎমার্গ।

একবার এক ব্যঙ্গ-চিত্রে দেখিয়াছিলাম, ডাক্তার-বাবু রোগীর টিকি মূলে ষ্টেথিস্কোপ বসাইয়া জোর গ্রাম্ভারী চালে রোগ নির্ণয় করিতেছেন। আমাদের রাজনীতির দণ্ডমুণ্ড হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতার দলও আমাদের হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের মিল না হওয়ার কারণ ধরিতে গিয়া ঠিক ঐ ডাক্তার বাবুর মতই ভুল করিতেছেন। আসল স্পন্দন যেখানে, যেখান হইতে প্রাণের গতি-রাগ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে ষ্টেথিস্কোপ না লাগাইয়া টিকি-মূলে যদি ব্যামো নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ, রাজনীতির দিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানে প্রাণের মিলনের চেষ্টা করাও তেমনি হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ। সত্যিকার মিলন আর স্বার্থের মিলনে আসমান জমিন তফাৎ। প্রাণে প্রাণে পরিচয় হইয়া যখন দুইটি প্রাণ মানুষের-গড়া সমস্ত বাজে

বন্ধনের ভয়-ভীতি দূরে সরাইয়া সহজ সঙ্কোচে মিশিতে পারে, তখনই সে মিলন সত্যিকার হয়, আর যে মিলন সত্যিকার, তাহা চিরস্থায়ী, চিরন্তন। কোন একটা বিশেষ কার্য্য উদ্ধারের জন্য চির-পোষিত মনোমালিন্যটাকে আড়াল করিয়া বাহিরে প্রাণভরা বন্ধুত্বের ভান করিলে সে বন্ধুত্ব স্থায়ী তো হইবেই না, অপরন্তু সে স্বার্থও সিদ্ধ না হইতে পারে, কেননা মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া কখনও কোন কার্য্যে পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় না।

এখন কথা হইতেছে যে আসল রোগ কোথায়? আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোন ধর্ম্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কেননা একটা ধর্ম্ম কখনো এত সঙ্কীর্ণ অনুদার হইতেই পারে না। ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এইখানেই বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম্ম শুধু কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের। আর এই ছুঁৎমার্গ যখন ধর্ম্মের অঙ্গ নয় তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি বা খোদার উপর খোদকারী। মানুষের সৃষ্টি শৃঙ্খলা বা সমাজবন্ধন সাময়িক সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো শাশ্বত সত্য হইতে পারে না। এই জন্যই "সম্ভবামি যুগে যুগে"-রূপ মহাবাণীর উৎপত্তি। আমাদেরও "হাদিসে" সেইজন্য প্রতি-শত-বর্ষে একজন করিয়া "মুজাদ্দাদ" বা সংস্কারক আসেন বলিয়া লিখিত আছে। "বেদাৎ" বা মানুষের সৃষ্ট রীতিনীতির সংস্কার করাই এই সংস্কারকদের মহান লক্ষ্য। হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে এই ছুঁৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন্ প্রবেশ করিল তাহা জানিনা, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের মত একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্ব্বীর্য্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমরা ভাই-এর অধিকারের জোরে জোর করিয়া বলিতে পারি। আমরা যে তাঁদের সমস্ত সামাজিক শাসনবিধি একদিনেই উল্‌টাইয়া ফেলিতে বলিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে-সত্য হয়ত একদিন সামাজিক শাসনের জন্যই শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, তাহার কি আর মুক্তি হইবে না? বাঙ্‌লার মহাপ্রাণ মহাতেজস্বী পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতে যেদিন হইতে এই "ম্লেচ্ছ" শব্দটার উৎপত্তি সেইদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়। মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ্ করিয়া বলিতে পারি। এই ধর্ম্মেই নরকে

নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কি উদার সুন্দর কথা। মানুষের প্রতি কি মহান্ পবিত্র পূজা! আবার সেই ধর্ম্মেরই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মত হেয় জঘন্য এই ছুৎমার্গ বিধি। কি ভীষণ অসামঞ্জস্য। আমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দহন—পূত কালাপাহাড়ের দলকে সেইজন্য আমরা আজ প্রাণ হইতে আবাহন করিতেছি এই মান্ধাতার আমলের বিশ্রী বিধি-বন্ধন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে,—"আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা!" আমরা যে ধর্ম্মটাকেই একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি, ইহা মনে করিলে আমাদের ভুল বুঝা হইবে। আমরা অন্তর হইতেই বলিতেছি যে, আমাদিগকে সীমার মাঝে থাকিয়াই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। নিজের ধর্ম্মকে মানিয়া লইয়া সকলকে প্রাণ হইতে দু-বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। যিনি সত্যিকার ভাবে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠ, তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেম আপনা হইতেই আসে। যত ছোঁওয়া-ছুঁয়ির নীচ ব্যবহার' ভণ্ড বক-ধার্ম্মিক আর বিড়াল-তপস্বী দলেব মধ্যেই। ইহাদের এই মিথ্যা মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া ইহাদের অন্তরের বীভৎস নগ্নতা সমাজের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে। এইখানে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদিন আমরা এক ট্রেণে গিয়া উঠিলাম। আমাদের কামরায় মালা-চন্দন-ধারী অনেকগুলি হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা কামরায় প্রবেশ করিবামাত্র অর্থাৎ আমাদের মাথায় টুপী ও পগ্গ দেখিয়াই ছোঁওয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা তটস্থ হইয়া অন্য দিকে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই বেঞ্চেরই এক প্রান্তে বসিয়া এক পণ্ডিতজি বেদ বা ঐরূপ কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া ঐ ভদ্রলোকেদের শুনাইতেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই এবং আমাদের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া হাসিয়া আমাদের হাত ধরিয়া সাদরে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। ভদ্রলোকদের চক্ষু ততক্ষণে কাণ্ড দেখিয়া চড়ক গাছ! আমরাও তখন সহজ হইয়া পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি পণ্ডিত ও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলতিলক হইয়াও কি করিয়া আমাদিগকে এমন করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন, অথচ এই ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে দেখিয়াই একেবারে দশহাত লাফাইয়া উঠিলেন? ইহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, আমি হিন্দু-ধর্ম্মকে ভালবাসি ও সত্য বলিয়া জানি বলিয়াই বিশ্বের সকলকে সকল ধর্ম্মকে ভালো বাসিতে শিখিয়াছি। আমার নিজের ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস আছে বলিয়াই অন্য সকলকে বিশ্বাস করিবার ও প্রাণ দিয়া

আলিঙ্গন করিবারও শক্তি আমার আছে। যাহারা অন্য ধর্ম্মকে ও অন্য মানুষকে ঘৃণা করে বা নীচ ভাবে, তাহারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেরও কোন ধর্ম্ম নাই। তবে ধর্ম্মের যে ঘটাটা দেখ, তাহা অন্তরের দীনতা ঢাকিবারই ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।” ইহা বনানো গল্প নয়, সত্য ঘটনা। মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুর বিড়ালের মত এত ঘৃণা করা—মনুষ্যত্বের ও আত্মার অবমাননা করা নয় কি? আত্মাকে ঘৃণা করা আর পরমাত্মাকে ঘৃণা করা একই কথা। সেদিন নারায়ণের পূজারী বলিয়াছিলেন, ‘ভাই, তোমার সে পরম দিশারী সে না হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, সে যে মানুষ।” কি সুন্দর বুকভরা বাণী। এ যে নিখিল-কণ্ঠের সত্য বাণীর মর্ম্ম প্রতিধ্বনি। যাঁহার অন্তর হইতে এই উদ্বোধন বাণী নির্গত হইয়া বিশ্বের পিষ্ট ঘৃণাহত ব্যথিতদের রক্তে রক্তে পরম শান্তির সুধা ধারা ছড়াইয়া দেয়, তিনি মহা-ঋষি, তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার। যদি সত্যিকার মিলন আনিতে চাও ভাই, তবে ডাক ডাক, এমনি করিয়া প্রাণের ডাক ডাক। দেখিবে দিকে দিকে অবহেলিত জনসঙ্ঘ তোমার এই জাগ্রত মহা-আহ্বানে বিপুল সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা মাথা কুটিয়া মরিলেও তো প্রাণের সাড়া কোথাও পাইবেনা, যাহাকে পাইয়া তাহারা উল্লাসে নৃত্য করিবে তাহা বাহিরের লৌকিক “ভিটা” দিয়া মাত্র। অন্তরের ডাক মহা-ডাক, ডাকিতে হইলে প্রথমে বেদনায়—একেবারে প্রাণের আর্ত্তিভারে গিয়া এমনি করিয়া ছোঁওয়া দিতে হইবে। আর তবেই ভারতে আবার নূতন সৃষ্টি জাগিয়া উঠিবে। হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগন-তলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া মানব। তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম-বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি, “আমার মানুষ ধর্ম্ম।” দেখিবে, দশদিকে সার্ব্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জন-সঙ্ঘকে বুক দাও দেখি, দেখিবে এই স্নেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা কি বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলেই ভারতে মহা জাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়। মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ তুমি সত্য। মহাত্মা গান্ধীজি ধরিয়াছেন এই মহা সত্যকে,

তাই আজ বিক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘ তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন আনন্দের নাচ-নাচিতেছে। তোমরা রাজনীতিক যুক্তি-তর্কের চটক দেখাইয়া লেখাপড়া-শেখা ভণ্ডদের মুগ্ধ করিতে পার, কিন্তু অমন ডাকটি আর ডাকিতে পারিবেনা। আমরা বলি কি, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁৎমার্গটাকে দূর কর দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিনে সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সেস্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন, মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে,—মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা। হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ রোপণ করিতেছ তোমরা। অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, "ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই।" কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল। এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে? শুনিয়া শুধু হাসি পায়। এসো, যদি পার তোমার স্বধর্ম্মে প্রাণ হইতে নিষ্ঠা বাখিয়া আকাশের মত উদার অসীম প্রাণ লইয়া এসো। এসো তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিঘ্ন দু'পায় দলিয়া মানুষের মত উচ্চ-শিরে তোমার মুক্ত-বিথার নাঙ্গা মনুষ্যত্ব লইয়া। এসো, মানুষের বিরাট বিপুল বক্ষঃ লইয়া। সে মহা-আহ্বানে দেখিবে আমরা হিন্দুমুসমান ভুলিয়া যাইব। আমাদের এই তরুণের দল লইয়া আমরা আজ কালাপাহাড়ের দল সৃষ্টি করিব। আমরাই ভারতে আবার অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিব। যে রক্ষণশীল বৃদ্ধ এতটুকু "টুঁ" করিবে, তাহার গর্দ্দান ধরিয়া এই মুক্তির দিনে বাহির করিয়া দাও। যে আমাদের পথে দাঁড়াইবে, তাহার টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেল। শুধু মানুষ বাঁচিয়া থাক ভাই,—ভারতে শুধু চিরকিশোর মানুষেরই জয় হউক!

নবযুগ

নারায়ণের নিকষ-মণি।

দুনিয়ার দেনা।

"দুনিয়ার দেনা" এক খানি গল্পের সাজি। এতে সাতটি গল্প আছে—বোঝা বওয়া, ফকিরের ফাঁক, দশের দোসর, পথের মানুষ, কাপালিকের কপাল, সাঁঝের পাড়ি ও দুনিয়ার দেনা। বই খানি শ্রীমতী হেমলতা দেবীর লেখা।

হেমলতার লেখনী অমৃত মাখা। মেয়ের লেখা প্রায়ই ফিকে হয়, আমাদের দেশে তাদের জীবনও যেমন সাত গণ্ডীর কোণে গড়া বিত্ত নিঃসম্বল, তাদের লেখাও তেমনি দু দশটা কুড়িয়ে পাওয়া ভাবের হালকা ফেনায় ভরা। কিন্তু হেমলতার লেখায় ঋষির সাধনা ও দৃষ্টিখানি নারীর শুচিতায় কি যে অপূর্ব্ব বস্তু হয়ে উঠেছে তা' বলে বোঝাবার নয়।

'বোঝা বওয়া' গল্পটির মধ্যে থেকে একটু খানি নমুনা দিই—"তখন আমি বুঝলুম ব্যাপারটা কি? বল্লুম, 'মহারাজ, আমার ও কাজ করে বেতন নেবার যো নাই' আমি যে আমার ভক্তির আজ্ঞায় কাজ করে থাকি। বেতন নিলেই আমি মারা পড়বো।"

রাজা বল্লেন, "তবে তুমি বিনা বেতনেই আমার কোন একটা কাজ কর।"

"তাই হবে মহারাজ, কাল থেকে আমি প্রতিদিন আপনার দরবারের বড় দরজায় উপস্থিত থাকবো, যে কেউ রাজ দর্শনে আসবে তার সঙ্গে যদি কোন বোঝা থাকে তাই নামিয়ে নেওয়ার ভার আমার উপর রইল। আপনি যখন আমাকে নিজের মধ্যেই আটকে রাখতে চাইছেন তখন এই বাঁধার মধ্যে আমার ঐটুকু ফাঁক, ঐ বোঝা নামান টুকু দেখাতেই আমার আনন্দ।"

সেই থেকে যে আসে দরবারে তার বোঝা নামাই। এতে আমার শ্রান্তি নেই. ক্লান্তি নেই, শুধু কেবল তৃপ্তিই আছে।"

তাহার পর এ দরবারী বোঝা নামানর বাঁধা নিয়মও তার সইল না।

"আমি কিন্তু সেই দিন থেকে তাঁর রাজদরবারের বড় দরজার সামনে হাজির থাকবার বাঁধা নিয়ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। এখন আমি নিজের ইচ্ছামত রাজ দরবারের দরজায় গিয়ে দরবারী লোকের বোঝা নামাই, কখনো

রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সাধারণ পথিকদের বোঝা বই—যেমন আমার খুসী।"

নিজের আনন্দ স্বজনের বোঝা বয়ে মেয়ে-কবি হেমলতা তাঁর—"দেনা আমার দেনা, বেজায় আমার দেনা, দেনা আমার সবার কাছে"—সেই ঋণ যে ভাবে শোধ করেছেন, তা অক্ষয় কবচ হয়ে বাংলার সারদার আঁচলে বাঁধা থাকবে।

পল্লী ব্যথা।

পল্লীব্যথা কবিতার বই, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এই মালার মালাকর, মালার এক ছড়ার দাম ৲ টাকা।

পল্লীব্যথা পল্লীর অযত্নকণ্টকিত বিজন পথের ঝরা ফুল, এ ভাবের কবিতা নয়—প্রাণের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রে যে ব্যবধান তাহা ধরিতে গেলে, এক স্থানে পাই ভাবের মগ্ন-সমাধি কল্পনার কারুময় মর্ম্মর-স্বপ্ন, আর অপর স্থানে হেমচন্দ্রে পাই প্রাণের তর-তরে গঙ্গা,—হৃদয়-আঙ্গিনার ভরা সঙ্কীর্ত্তন। সাবিত্রীর কবিতায় ঘরের আলপনা আছে, "বাঁশের খুঁটি তাতে খানিক কোষ্টা বাঁধা" গ্রাম্য ছবি আছে, "কনে-চন্দনের উৎসব মঙ্গল স্নিগ্ধতা আছে,

"পিঁড়ে আমার নেপা পোঁছা সিঁদূর প'লে যায়গো তোলা
বাতায় গোঁজা দুলছে দেখো খোকামণির সোনার দোলা।"

পল্লীর শ্যামসজল কুঞ্জ মধুর প্রাণের দেবতা যদি রূপ ধরে তবে সে ত পল্লী বধু হইয়া—

"তাদের সকল পুণ্য ধর্ম্ম ছড়িয়ে আছে ঘাটে বাটে,'

* * * *

"তাদের হিয়ার ধৈর্য্য স্নেহ চিরদিনই অচঞ্চল।"

* * * *

"সিক্তবসনে হিন্দুনারী যে নিত্য ঘাটের কূলে
ধারা জল ঢালে আনত আননে অশথ-বটের মূলে,
ছোঁয়াইয়া মাটি-শিরে
নিজ ঘরে যায় ফিরে,
তোমরা বলিবে "অন্ধ এ প্রথা তোমাদেরই ভাল সাজে
তুচ্ছ গাছও পাথরের পূজা দেখে মরে যাই লাজে।

উজাড়িয়া ভরা ঝারি
ঢালে পবিত্র বারি
সে যে রমণীর অপূর্ণ সাধ পূর্ণ কলসে বয়
পুণ্যপরশে তীর্থ সলিল চির গৌরবময়"

এই পল্লী-দেবীর দেউল আজ উৎসবহীন, দেশ মরিয়াছে—তাই আজ দেশাত্মা রূপহারা। সে বেদনাও পল্লীব্যথায় করুণ হইয়া বাজিয়াছে—

"সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় জ্বলে না প্রদীপখানি।"

সাবিত্রীর হৃদয়খানি নারীর হৃদয়, কোমল বেদনায় সে যখন তুলি ধরে, তখন বর্ণে বর্ণে নারীত্বকে প্রাণ দেয়। হৃদয়ের যত কোমল বৃত্তি—করুণ ও কান্ত-রস স্নেহগলা হইয়া সাবিত্রীর কবিতায় প্রাণ পায়। এ কবি ভুলিয়া পুরুষ হইয়াছিল—অন্য ভাবের কবিতা লিখিতে গিয়া আমার মনে হয় সাবিত্রী এমন সফল হয় নাই।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়

রামমোহন রায় ও হিন্দুধর্ম্ম—শ্রীসুকুমার হালদার প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সামলং ফার্ম, রাঁচি হইতে প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই ৭০ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির মধ্যে জানিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমাদের তথা কথিত শিক্ষিত সমাজের জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলা শোনা কথাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম সভার' স্বরূপ কি, তাহা হইতে কিরূপে বর্ত্তমান ব্রহ্মসমাজ উদ্ভূত হইল, এবং ব্রহ্ম-সমাজ হিন্দু-সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব কেন বিস্তার করিতে পারিল না—তাহা এই পুস্তিকায় সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি ইংরাজীতে লিখিত না হইয়া বাঙলায় লিখিত হইলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য আরও সফল হইত।

পাশ্চাত্যধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা—সুকুমার হালদার প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রাঁচি সামলং ফার্ম হইতে প্রকাশিত।

ইউরোপীয়েরা বিশেষতঃ পাদরীরা অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের বর্ত্তমান সভ্যতা ও আধিপত্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মেরই ফলস্বরূপ। লেখক

ইতিহাস হইতে বহুবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইউরোপীয় জাতি সমূহের উন্নতি উহাদের কার্য্যক্ষমতা ও কার্য্যকুশলতার ফলেই ঘটিয়াছে, তাহার সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। বরং এ কথাই সত্য যে শিক্ষার বিস্তার বা সামাজিক বিষয়ে উদারতর মতবাদ প্রচার সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রতিপাদে বাধা দিয়াই আসিয়াছে। পুস্তকখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

নাটক ও নাটকের অভিনয়—ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ১০৬।৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে শ্রীঅবনিনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান—

পুস্তক খানি প্রধানতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ভ্রান্তি বিলাস' ও দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অবলম্বন করিয়া নাটক ও নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা। প্রবন্ধগুলি বহুপূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর আমাদের দেশে নাটক ও অভিনয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে কিন্তু অনেক গুলি কথা বর্ত্তমান কালের অভিনয় সম্বন্ধে ও বেশ খাটে। "নাটকের রচিত পাত্রের প্রকৃতি বুঝিতে না পারিলে অথবা বুঝিবার ত্রুটি থাকিলে অভিনয় না হইয়া যাত্রা হইয়া পড়ে। এক্ষণে আমাদের দেশে যে সকল অভিনয় হইতেছে তাহার মধ্যে এই ত্রুটীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।"

অভিনেতৃগণ পুস্তক খানি একবার পড়িয়া দেখিলে উপকৃত হইবেন।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]   [মাঘ, ১৩২৭।

দুখিনীর ধন।

(শ্রীসরলাবালা দাসী)

দুখিনীর ধন,
যাদু মোর, সোণা মোর, মাণিক রতন।
আমি মূর্খা, আমি নারী, কেমনে বুঝাতে পারি,
মনের কথন,—
গোপাল কি ধন?
শুধু এই জানি, বুঝি, ভিখারীর সেই পুঁজি,
দুখিনীর সেই শুধু সুখের স্বপন,
অমূল্য রতন।

আকাশে যে তারে তারে গাঁথা তারা-হার,—
অপূর্ব্ব সে বীণা যন্ত্রে—শুনেছ কি কোন দিন—
অপূর্ব্ব ঝঙ্কার?
শুনেছি, শুনি গো আমি দিবস রজনী—
সে অপূর্ব্ব ধ্বনি,
সপ্ত সুরে ঝঙ্কারিছে "মা, মা, মা, মা, জননি, জননি!"
সুধা-নিস্যন্দনী।
সে অমৃত পান করি যে হয় অমর,
তার কি—তাঁর কি আর আছে জরা জর?
অঞ্চলে যে বাঁধা তার অক্ষয় রতন,
দুখিনীর ধন।

সে ধন যে নয় হারাবার,
মা বিনা ভুবনে তাহা জানে কেবা আর ?
তাই তো সুমিত্রা পারে পাঠাতে কাননে
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে অঞ্চলের ধনে !
তাই তো রাক্ষস-মুখে পাঠায় জননী—
কুন্তী তার নয়নের মণি !
তাই স্নেহময়ী দেয় সপ্তরথীরণে
সুভদ্রা, বালক তার নয়ন-নন্দনে !
তাই গোচারণে যায় গহন কানন
যশোদা জীবন !

বাছারে আমার !
কি যে খেলা যুগে যুগে খেলিস্ তা কে বা জানে,
অনন্ত হ'লেও মন ধারণা না হয় ধ্যানে,
অনন্ত নয়ন শ্রান্ত পিপাসা না মিটে দেখিবার।
গোপালে গোপালে খেলা কে হারে কে জিতে,
কার সাধ্য পারে তা বুঝিতে ?
শর-শয্যা পাতি ভীষ্ম করিল শয়ন,
সবা হ'তে জয়ী সেই জন !
সপ্তবীর প্রহারিল ব্যূহ মাঝে যারে রুদ্ধ করি,—
মরণে অনন্তজয়ী শিশু সেই বিক্রম-কেশরী !
নির্ব্বাসনে বিশ্বজনে দেখাইল কৌশল্যা-কুমার,
রাজাসন নির্ব্বাসন দুই এক সম
মায়ের অঙ্গনে খেলা তার।

ত্যাগ ভোগ বিচার গহনে,—
কত ঋষি, কতমুনি, কত জ্ঞানবান গুণী
পথ ভুলে ফিরে আনমনে !
আমি ভাবি মা কেবল জানে এ বারতা,
ত্যাগ ভোগ রচা দুটী কথা !

সন্তান লালন তরে মায়ে কত ত্যাগ করে
সুখ ত্যজি দুঃখ করে সার,
সে কি জানে ত্যাগ সে তাহার ?
গোপাল রাখালী ত্যজে সিংহাসনে রাজা সাজে
কভু বা নিমাই ত্যজি সাধের সংসার
দণ্ড.কমণ্ডলু করে সার,
ত্যাগ ভোগ কি হবে নির্দ্ধার ?
সর্ব্বস্বত্যাগীর কাছে পুত্র যবে বিত্ত যাচে
কিরূপেতে হইবে নির্ণয়,—
সিদ্ধার্থ করেছে ত্যাগ, গ্রহণ সে নয় !

আজ তাই মানিয়াছি হার,
ছাড়িয়াছি সকল বিচার।
যত কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব, এটা ভাল ওটা মন্দ—
কে জানে কখন হয়ে গেছে একাকার।
গোপাল আমার।
তোর ও নির্ম্মল আঁখি জ্যোতিরাশি কি জানি কি
ধু'য়ে দিলে সব অন্ধকার।
বুঝা'ল সে, আছে আছে সবারি—সবারি মাঝে
বুঝা'ল সে, ত্যাগ ভোগ কি যে স্বাস্থ্য, কি যে রোগ,
কি জয় কি পরাজয় সিদ্ধান্ত না অন্ত পায় তার !
কে জানে জাগে যে কবে প্রাণ কোন্ মহোৎসবে ?
কে জানে কি খেলা ছলে আত্মোৎসর্গ বহ্নি জলে
নবদীপ্ত কোন্ প্রেরণার ?
নদী ভাঙ্গে কূলে কূলে কোন্ দ্বীপ গড়ে' তুলে,
কেবা জানে সেই সমাচার ?
প্রাণ যেথা প্রাণময় পরাজয়ে সেথা জয়,
বাছা রে আমার,
শিখালি, দেখালি তুই এই সত্যসার !

গোপাল আমার !
তোদের খেলার ছন্দে ভাল মন্দ বুঝি না তাহার !
এক সহস্রাংশু সেই জগত জীবন
শত দিকে শত করে কেন সে যে লীলা করে,
এক ইন্দ্রধনু কেন বিচিত্র বরণ ?
কেবা তা' করিবে নিরূপণ !
কেন যে আলোর পাছে ছায়া লুকাইয়া আছে,
সার্থকতা তার—
কোন্ বা অভ্রান্ত হেন করিবে বিচার !
আমি শুধু এই মনে জানি,
ছায়া যে, সার্থক সে ও কিরণ রশ্মির যবে
হয় অনুগামী।
আমি জানি পাবক আমার,
স্পর্শে পাপ পুণ্য হয়, তারে কি দেখাবে ভয় ?
দুঃখ যার আনন্দ পাথার—
পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র কোন্ শিক্ষা দিবে তারে আর ?
বালক সরল,
ভোলা সে আদরে কণ্ঠে ধ'রে হলাহল !
আমি মূর্খা, আমি নারী, কেমনে বুঝাতে পারি,
মনের কথন !
আমি শুধু এই বুঝি, ভিখারীর সেই পুঁজি
দুখিনীর ধন !
যাদু মোর, সোণা মোর, মাণিক রতন !

আর্টের সমজদারি।

(অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম-এ,)

আমাদের দেশে আর্টের চর্চ্চা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ভদ্র-লোকের গৃহ এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কলাবিদ্যা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সেকালে এই সকল বিদ্যা আয়ত্ত করা শিক্ষার একটি অঙ্গ ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা নায়ক নায়িকার কলাকুশলতার বহুস্থলে পরিচয় পাই। সুখের বিষয় এখন আবার কলাবিদ্যার চর্চ্চা কিছু কিছু আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে।

নিজে কলাবিদ্যা কুশল না হইলেও কলা বিদ্যার সমজদার হওয়াটাও বিশেষ দরকার। আমাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত তাঁহারা অন্যদিকে যতই শিখুন না কেন, " বিষয়ে তাঁহাদের মত গোমূর্খ কম্বই" পাওয়া যায়। Æsthetics নামক জিনিষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই।

আমাদের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, ব্যক্তিগত রুচি প্রকাশে কোনোখানেই জাতীয় আর্টের আদর নাই। বিদেশী আর্টের ঝুটা আমদানীতে আমাদের ঘরবাড়ী ছাইয়া গিয়াছে এবং একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই সকল নকলেব অসঙ্গতি সহজেই চোখে পড়িবে।

সরু সরু গলি নর্দামার গন্ধে পূর্ণ, দরজা জানালাহীন গৃহ ইহা লইয়াই আমাদের ভারতীয় নগর। কিন্তু চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি পড়িয়া দেখিলে, আমরা নগর বিন্যাসের কেমন সুন্দর পরিকল্পনা পাই। আমরা বাড়ী তৈরি করি—সে কোন্ আর্ট অনুসারে জানি না—ভারতীয় কলার নিদর্শন মাত্র তাহাতে থাকে না। আমাদের ঘর বাড়ী ইঙ্গবঙ্গ এমন এক ফ্যাসানে প্রস্তুত হয় যাহার মধ্যে আর্টের 'আ'ও খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

কেবল আমাদের মন্দির মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণে খানিকটা প্রাচীনভাব বজায় আছে। তবে মন্দিরের ভিতরকার ঠাকুরের উপর আজকাল অনেক রকম আর্ট চলিতেছে এবং মন্দিরের সাজসজ্জা আসবাবের মধ্যে বিলাতী জিনিসেরই প্রাধান্য হইতেছে। ইহার ভিতর অজ্ঞাতসারে যেখানে প্রাচীন আর্ট থাকিতেছে—সেখানেই সে কোনো প্রকারে বাঁচিয়া আছে।

আমাদের ঘরের আসবাবপত্র এবং সাজসজ্জার ভিতর ভারতীয় আর্টের কিছু মাত্র নাই। ছবিগুলি কেবল রং ঢালা, পোষাকপরিচ্ছদ সাহেবী পোষাকের বটতলা সংস্করণ মাত্র। আমাদের দেশের বড়লোকের বাড়ীর বাহিরে বিদেশী ঢঙের ন্যাংটা ষ্ট্যাচুর মেলা এবং ঘরের ভিতর ন্যাংটা মেমসাহেবের ছবির গুঁতো গুঁতি। কোচ, সোফা প্রভৃতিতে ঘর জোড়া। আমাদের সনাতন ফরাস আর তাকিয়া আজ কোথায় নির্বাসিত। পোষাক-পরিচ্ছদের তো কথাই নাই। বাপ মা পূজার সময় ছেলেকে একটি সাহেবী পোষাক কিনিয়া দিতে পারিলে ধন্য হন। যে সাহেবী পোষাক পরে না, তাহার পয়সার অভাব বুঝিতে হইবে। এই পোষাকের মধ্যে আর্ট নাই এমন কথা বলি না—কিন্তু তাহা বিদেশী এবং আমরা অনুকরণ করিতে যাইয়া সে আর্টের মস্তক চর্বণ করিয়া থাকি।

তারপর সূক্ষ্ম কলার কথা ধরা যাক। নৃত্য বিদ্যার বাস তো গণিকালয়েই হইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে যে নাচিতে পারে এবং সেই নাচের ভিতর আবার একটা আর্ট থাকিতে পারে—ইহা আমাদের কল্পনারও অতীত। অথচ এই অসম্ভব ব্যাপারটা আজও সাহেবদের ঘরে দুবেলা ঘটিতেছে এবং আমাদের দেশেও এককালে ঘটিত। ভদ্রলোকের সামনে নাচিতে পারে এমন দুঃসাহস যাত্রাদলের ছোকরা ভিন্ন এবং মেয়েদের মধ্যে থিয়েটারের গণিকা ভিন্ন আর কাহারও নাই।

তার পর সঙ্গীত। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে গান করিতে জানা হয় খৃষ্টানী অথবা ব্রাহ্ময়ানীর লক্ষণ। দুঃখক্লান্তি-পীড়িত বাঙালী-জীবনে আনন্দের ফোয়ারা যেন শুকাইয়া গিয়াছে। সারাদিনের খাটুনির পর পুত্রকন্যাদের মধুর সঙ্গীতালাপে গৃহখানি ভরপুর করিয়া আনন্দের স্রোত বহানো আজকাল যেন একটা ভীষণ অসম্ভবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। টপ্পা খেউড় প্রভৃতি হাল্কা সুরের গান হয়তো আমরা কিছু জানি, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের ধ্রুবপদ খেয়াল এখন কেবল কালোয়াতের আসরে শ্রোতার হাই তোলায় মাত্র।

আর্টের সমজ্‌দারি চাই। গান শুনিলেই হয় না—গান বুঝিবার ক্ষমতা অর্জন করা চাই। সকল চারুকলার বিষয়েই এই কথা খাটে। আমরা গানের কথাগুলি শুনিয়া গান বুঝিতে চাই, এ যেন গল্প শোনা। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর ষ্টাইলের কথা বলিতে গিয়া ইহাকে কালোয়াতী গানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। “চলতো রাজকুমারী” বলিয়া ওস্তাদ গান ধরিলেন,

নানাভাবে নানাভঙ্গে ঐ একই কথা কতবার ফিরিয়া ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন —সমজ্‌দার শ্রোতা রসে ভরপুর হইয়া বাহবা দিতে লাগিল, আর যাহারা রাজকুমারীর আধ ঘণ্টার মধ্যেও কোথায় যাওয়া হইল জানিতে পারিলেন না তাঁহারা নিশ্চয়ই একে একে বিরক্ত হইয়া আসর পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গীত যখন উচ্চ অঙ্গে যায় তখন রূপ ছাড়িয়া সে ভাবের মাঝারে নিজেকে বিসর্জ্জন করিয়া ফেলে। তখন সমজ্‌দারের কাণে কেবল সুরটাই ঘোরে—কথা কোথায় চলিয়া যায়। শেষে হয়তো শুধু শব্দবিহীন সাধাসুরের উপরই সমস্ত সঙ্গীতটি ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। তাল মান লয় ঠিক থাকিলেই হইল—রাগ রাগিণীর সৌন্দর্য্যেই প্রকৃত সমজ্‌দার তখন আত্মহারা।

কবিতাতেও এইরূপ আকারটা অবলম্বন মাত্র। সেক্‌স্‌পিয়র, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, ওয়াণ্ট হুইট্‌ম্যান প্রভৃতির ভিতর হয় তো কথার রিনিঝিনি বেশী নাই কিন্তু ভাবের গাম্ভীর্য্যে, চিত্রণের বৈচিত্র্যে এত বড় সৃষ্টি কবিতারাজ্যে আর কাহার আছে? কেবল কথার মারপ্যাচ এবং কতকগুলি শ্রুতিমধুর শব্দের উল্টেপাল্টা সংযোগেই কবিতা নয়। অবশ্য সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করাও আর্টের একটা দিক। কালিদাস, টেনিসন, সুইন্‌বার্ণ, রবীন্দ্রনাথে এই আকার ও ভাবগত আর্টের বেশ সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। কিন্তু আকারটাই কবিতার সর্ব্বস্ব নয়। ঐটিকে আশ্রয় করিয়া কবিতার প্রাণ অন্তর্নিহিত থাকে। a^2+b^2+2ab এই ফরমুলায় কি মজা আছে যে শুধু a, b পড়িয়াছে সে বুঝিবে না— তাহাকে গণিতজ্ঞ হইতে হইবে। তাই শব্দ জানিলেই, ভাষার আকারের সহিত পরিচিত হইলেই কবিতা বোঝা যাইবে না—ভাবের সহিত প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে হইবে। তবেই প্রকৃত সমজ্‌দার হইতে পারা যাইবে।

চিত্রেও তাই। ছবির বহিরাকৃতি নিখুঁত হইলেই আর্ট হইল না। তাহার জন্য তো ফটোগ্রাফ আছে। আর্ট কোথায়—ভাবের ব্যঞ্জনাতেই তো আর্ট। র‍্যাফেল অথবা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি আজ যে অমর সে, কেবল গোটা কতক মানুষের চেহারা আঁকিয়া নয়, মানব প্রকৃতির মূল্যবান কয়েকটি ভাবের দ্যোতনাকে তাঁহারা অমর করিয়া গিয়াছেন। মায়ের অনন্ত স্নেহ ম্যাডোনার ছবিখানিতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ভাব হিসাবে যে জিনিস মানব-জীবনে যতখানি বড় স্থান অধিকার করে, ছবিখানিও ততটা বড় স্থান আর্টে পাইবে। মনে করা যাক—একদল

কুকুর একটি শেয়ালকে মুরগী চুরির সময়ে অতর্কিতে ধরিয়া ফেলিয়াছে—মুরগী, শেয়াল এবং কুকুরের সেই অবস্থায় যে ভাবটি হয় ঠিক সেই ভাবটি চিত্রকর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা বলিব ছবিখানি বেশ হইয়াছে। কিন্তু আর একচিত্রে দেখি মৃত্যুশয্যায় শায়িত সম্রাট্ শাজাহান আগ্রা দুর্গ হইতে একবার জনমের মত প্রিয় মমতাজের সমাধি দেখিয়া লইতেছেন—আর্ট হিসাবে এই ভাবের চিত্রের স্থান মানুষের জীবনে ঢের উঁচুতে। হয় তো শাজাহানের হাত পা ঠিক ঠিক আঁকা হয় নাই—হয় তো তাজমহলের ছবিখানি তত স্পষ্ট বা নিখুঁত হয় নাই—কিন্তু ভাবসম্পদে এই সুন্দর চিত্রখানি স্রষ্টাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। এক গেলাস ঘোলের সরবৎ খাইয়া কি আমোদ হয় একজন কবি খুব চমৎকার ছন্দে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দরিদ্রকে নিজের শেষ পয়সাটি দান করিলে কি সুখ হয় আর একজন কবি তাহা হয় তো নিকৃষ্ট ছন্দে কিন্তু ভাবের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন—আমরা ভাবসম্পদের জন্য শেষোক্ত কবির নিকটই মাথা নত করিব।

অনেক সময় আমরা নিজেদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অথবা অভ্যাসের দাস বলিয়া ভাল জিনিসকেও অবহেলা করি। যেমন ভারতীয় চিত্রকলা বলিতেই আমরা নাক সিঁটকাইয়া উঠি। জিনিসটা কি তাহা হয় তো একদিনও বুঝিবার চেষ্টা করিলাম না। ভারতীয় দর্শন কি, একদিনও বুঝিলাম না—অথচ ভারতীয় দর্শনের কথা উঠিলেই গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিব—এ যে বড় অন্যায়। ভারতীয় চিত্রকলা বুঝিতে হইলে ভক্তির ভাব লইয়া কথাগুলি তলাইয়া বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্যতার এক একটি স্বতন্ত্র আদর্শ আছে। ভারতের তথা প্রাচ্যের আদর্শ অন্তর্মুখীন—পাশ্চাত্যের আদর্শ বহির্মুখীন। গ্রীক এবং রোমান আর্টের ভিতর চেহারার খুঁত পাওয়া যাইবে না। তাহার ভিতর অবাস্তবতা থাকিলেও তাহা বাহিরের আকৃতি হিসাবে নিখুঁত হইয়া ভিতরের সৌন্দর্য্যকে সমগ্রের সম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবে। মনে করুন একটি নিখুঁত মানবের ছবি—যেমন সুন্দর চোখমুখ, তেমনি হাত পা, তেমনি সব—কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ নাই, পূর্ণতায় যেন চারিদিকের সৌন্দর্য্য ভরিয়া উঠিয়াছে। এখানে অবাস্তবতা এই যে এরূপ মানব আমরা সংসারে পাই না—সকলেরই কিছু না কিছু খুঁত আছে কিন্তু এ মানুষটি ঠিক যেটি হইলে আমরা সন্তুষ্ট হই তাই। এই realistic idealism পাশ্চাত্যের আদর্শ। ভারতের আদর্শ তাহার ঠিক উল্টা।

কাউন্ট ওকাকুরা নামক জাপানী ভাবুক তাঁহার Ideals of the East নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে ভাবের দিক হইতে সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশই—এক বারে এক Asia is one !" তাই চীনা এবং জাপানী চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা করিলেই আমাদের প্রকৃত ভাবটি ধরা পড়ে। দুঃখের বিষয় আমাদের আর্টের বিশেষত্ব আমাদের বুঝিতে এত দেরী হইতেছে। হ্যাভেল সাহেব যখন আর্ট স্কুল হইতে বিদেশী ছবি গুলিবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ভারতীয় আর্টকে প্রথম স্থান দিলেন—তখন আমাদের দেশের সংবাদ পত্রের চীৎকারে তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। কিন্তু এখন ভাবুকমাত্রেই বুঝিতেছেন কি শুভক্ষণেই হ্যাভেল সাহেব এদেশে আসিয়া আমাদের চোখে আঙুল দিয়া আমাদেরই ঘরের রত্ন চিনিতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

সিষ্টার নিবেদিতার মত পাশ্চাত্য রমণীও দেখিয়া শুনিয়া ভারতীয় আর্টের ভক্ত হইয়া উঠিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় জীবনের নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চিত্রকলার পুনর্জন্ম হইল। সুদূর ফরাসী রুশিয়া ও আমেরিয়া প্রভৃতি দেশে সে চিত্রকলা সমাদর লাভ করিল। কেবল আমাদের ঘরের বিজ্ঞ সমালোচকগণ মুখ ফিরাইয়াও চাহিলেন না। বলিলেন—

কি আগুন লাগিয়ে দিলে ছবিতে
দেখে প্রাণে জাগে কবিতে
রং বিরং এর অগ্নি কণা
হাত দুটো ঠিক সাপের ফণা
মানুষাকে যায় না চেনা
মৎস্য কন্যা কিম্বা নারী
সেইটে বোঝাই শক্ত ভারী

ইত্যাদি—

এই সকল সমালোচনা করিবার পুর্ব্বে ভারতীয় চিত্রকলার মূল ভাবটি কি বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমে বোঝা দরকার আর্টের আকারটাই সব নয়—ভাবটাই প্রধান। আমরা যখন কবিতায় পড়ি—

ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত
করিকর যুগবর জানু সুবলিত

সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল
ইত্যাদি।

তখন যদি ভাবটি না ধরিয়া শুধু ভাষার কথায় কথায় ব্যাখ্যা করিয়া কবির বর্ণিত পুরুষকে ছবিতে আঁকি, তাহা হইলে চেহারাখানা কিরূপ দাঁড়ায় মনে করুন তো! গলায় গলগণ্ড- তাহার উপর সুদীর্ঘ দাড়ি হইলে তবে সিংহগ্রীব হইবে, আর শুঁড়ের মত জানু হইতে হইলে Elephantiasis রোগের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় নাই। পটল চেরা চোখ, এবং চাঁদের মত মুখ হইলেই তো সর্ব্বনাশ, অতখানি চোখ, ঐরূপ গোলাকার কলঙ্কযুক্ত মুখ—কে ভাল বলিবে জানি না। তাই শুধু ভাবটার ব্যঞ্জনামাত্র গ্রহণ করিতে হইবে—এ বিষয়ে কবিতাতেও যা, চিত্রেও কতকটা তাই।

ভারতের অন্তর্মুখী সভ্যতার আদর্শ অনুসারে বাহিরের আকারের প্রতি ভারতীয় চিত্রকলা তেমন নজর দেয় নাই। তাহার অর্থ এবং সার্থকতাও আছে।

অবনীন্দ্রনাথ একস্থলে বলিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র আঁকিতে হইলে তিনি কলেজ স্কোয়ারের সেই আধখানা মাথা কামানো কাট খোট্রা আকৃতিটি আঁকিবেন না। দয়ার সাগর গুণের বারিধি পরদুঃখে বিগলিত প্রাণ একজন বাঙ্গালীর মূর্ত্তি ধ্যান করিলে তাঁহার মনে যেরূপ আসে তিনি সেইরূপ আঁকিবেন—তাতে সে আসল চেহারার সঙ্গে মিলুক আর না মিলুক। এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা—শুনিয়া সকলে হয়তো অবাক হইবেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় চিত্রকলা এই ভাবেই চলিয়াছে। দীর্ঘ ছয় বৎসরের কঠোর তপস্যা ও অনশনের পর শাক্যসিংহ যখন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হইলেন, ভারতীয় শিল্পী তাঁহাকে জ্ঞানের পূর্ণদীপ্তিতে ভাসমান এক সুডৌল সোণার আকৃতি প্রদান করিল। এই আকারের ভিতর তাঁহার ভিতরকার spiritual life এর পূর্ণতা প্রকাশ করিল। যাঁহারা বুদ্ধদেবের এই অবস্থার আকৃতি দেখিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন কেমন সুন্দরভাবে ভিতরকার এই মস্ত বড় জীবনটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অভিব্যক্তি কি চমৎকার হইয়াছে। এইখানেই ভারতীয় চিত্রকলার বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য শিল্পী হইলে ছ'বৎসর উপবাস ও তপ সাধনার পর মানুষের ঠিক যেরূপ চেহারাটি হয় সেইরূপ আঁকিতেন। কিন্তু তার জন্য একজন ফটোগ্রাফার থাকিলেই চলিত। বুদ্ধদেবের প্রাণে

কি পূর্ণতা আসিয়াছে শিল্পীকে ধ্যানবলে তাহা অনুভব করিতে হইবে এবং দ্রষ্টাকে ভক্তকে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে—প্রাণহীন পাষাণ কাটিয়া অত বড় একটা প্রাণের পূর্ণতার পরিচয় দিতে হইবে—ইহাই ভারতীয় শিল্পীর আদর্শ। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই তাহাকে বাহির ভুলাইয়াছে। আগুশক্তির মহাশক্তির প্রসার বুঝাইতে হইবে—শিল্পী অমনি দশদিকে তাঁহার দশখানি হাত সৃষ্টি করিয়া দিলেন। রাস্কিনের ন্যায় পণ্ডিতলোকেও ইহার অর্থ না বুঝিয়া ভারতীয় শিল্পকলাকে barbaric বলিবেন- কিন্তু ভারতবাসী আমরা আমাদের হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন জিনিসকে না বুঝিয়া কেন যে তাহাদের সুরে সুর মিলাইতে যাই—তাহাই ভাবিয়া পাই না।

এ সম্বন্ধে ডাঃ কুমারস্বামী, হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি পড়িলেই সকলে কথাগুলি, ভাল করিয়া বুঝিবেন। রবিবর্ম্মার ছবির আদর দেশে চিত্রকলার সমাদর নাই ইহাই বুঝাইয়া দেয়।

আর্টের সমজ্দারি শিখার বিষয়। কাব্য বুঝিতে হইলে মনকে শিখাইতে হইবে, গান শুনিতে হইলে কানকে তৈয়ারী করিতে হইবে, চিত্র বুঝিতে হইলে চোখকে ঠিক ঠিক দেখাইতে হইবে তবে সমজ্দারি সম্পূর্ণ হইবে। শুধু কতকগুলি পোষা ধারণায় মনকে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

তিলেক যদি টান হতো

(দরবেশ)

তোমার পানে আমার প্রাণের
তিলেক যদি টান হতো,
সকল বাঁচন মরে' গিয়ে
এক নিমিষে প্রাণ পেতো
দুনিয়া ভরা নিষেধ-বিধান,
সকল আমার হতো সমান,
ধরণ-ধারণ করণ-কারণ
চরণ তলে মরিত,

আপন মনে খোস মেজাজে,
দেলটা আমার উঠ্‌তো বেজে,
সকল কাজে সকাল-সাঁজে
সমান বুলি ধরিত ।
কভু কেটে দীর্ঘ ফোঁটা
লাগিয়ে দিতাম পূজার ঘটা,
ঘণ্টা নাড়ায় পাড়ার লোকের
বিষম চমক লাগিত ;
কভু দেহে ভস্ম মাখি,
ধ্যান লাগাতাম নিথর আঁখি,
আসন-পাশে ধূনীর আগুণ
দিবস-নিশি জাগিত ।
কভু লয়ে মদের বোতল,
হাটের বাটে বাধাতেম গোল,
রঙ্গিণীদের ধরে আঁচল
মাতাল আঁখি ঢ়ুলিত ,
দেখে যেতো পাড়ার লোকে,
কিচ্ছু হয় না মদের ঝোঁকে,
হাজার নারীর বক্ষ-শোভায়
লক্ষ্য নাহি টলিত ।
যত রাজ্যের 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না'
তোমায় ছুঁয়ে হতো সোণা,
নিত্যানিত্য আমার চিতে
এক-ই সত্য জমাতো ,
আপন হাতে মাথা কেটে,
চরণ তলে দিতাম বেটে,
রক্তমাখা অধর আমার
নথর চুমে' ঘুমাতো ।
ওগো আমার তিলেক যদি
তোমার পানে টান হতো

সুখের ঘর গড়া

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত)

ভোলানাথের মেয়ের অন্নপ্রাশনের দিন দুই পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বরী নিজে নলিনীকে সঙ্গে লইয়া পাড়া নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছেন। পথে ব্রহ্মঠাকুরাণীকে ডাকিয়া লইলেন। অযাচিত ভাবে ধনীগৃহিণীর মুরুব্বিগিরি করিতে পাইয়া ঠাকরুণ বেশ একটু আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিলেন। ব্রহ্মঠাকরুণের বাড়িতে আসিয়াই যজ্ঞেশ্বরী বাড়ীর গৃহিণী অর্থাৎ ঠাকরুণের ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এই যে দিদি। কাল আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে হবে, অনেক দিন তোমাদের পেসাদ পাইনি"---ভাজ উত্তর দিবার আগেই তার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ননদ ঠাকুরাণী বলিলেন—"তা বৌমা তুমি ডাকলেও আমরা যাব, না ডাকলেও যাব তোমার বাড়ী কি আর আমাদের আলাদা—। কিলা বউ, বল?" ভাজ নতের ভিতর দিয়া একপাটী মিশি ঘসা দন্তপংক্তি বাহির করিয়া বলিল—'তা কি আর আলাদা। ও বেশতো ভাই। পেসাদী তোর জ্যেঠাইকে আসন দে বসতে। পেসাদী তখন অধোমুখে সিঁড়িতে বসিয়া মুড়িকে অনুপান মূলা সমেৎ চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিতেছিল। মুড়ি ভরা মুখে সে ব্যাজার হইয়া উত্তর দিল—"আমি মু-ই-ই-থাপ্পি যে।' তুই দে—"। যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন—"না না আসন চাইনি! আমাকে ভাই গোটা পাড়া ঘুরতে হবে, যাই! চল পিসিমা।" পিসি ঠাকরুণ দোক্তার কৌটাটী আঁচলে বাঁধিয়া পথ প্রদর্শক হইয়া চলিলেন। যজ্ঞেশ্বরীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'বাড়ুয্যে পাড়া সেরে যাবি তো?' যজ্ঞেশ্বরী 'হাঁ' 'না' কিছু বলিবার আগেই নলি বলিল "জ্যাঠাই মা, তারামণিদের বাড়ী হয়ে যাবে তো? তারমণি যে রাঁধবে?" যজ্ঞেশ্বরী হাঁ বলিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি বহুকাল গ্রামে ছিলেন না, অনেক নূতন বাড়ী দেখিয়া, সর্ব্বজ্ঞা ব্রহ্মঠাকুরাণীর দ্বারা কৌতূহলে চরিতার্থ করিয়া লইতে লাগিলেন। বাঁ দিকে গাজন তলার পশ্চিমে একটা নূতন কোঠা দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কার কোঠা' পিসিমা!" ঠাকরুণের মুখবিবর তখন গলিত দোক্তা রসে ভরিয়াছিল, ছেপ্ ফেলিয়া উত্তর দিবার আগেই নলি বলিল—"সেই যে জ্যাঠাইমা শুঁড়ীদের বৌ? ঘাটে সে দিন এসেছিল? সেই যে গায়ে অনেক গয়না পরা? সেই তাদের—

ওদের জ্যাঠাইমা—" বলা শেষ হইল না, ঠাকুরুণের এক দাপ্ ড়িতে ব্যচারী থত মত খাইয়া গেল। "থাম্ তুই! জগু শুঁড়ী গো, নন্দ শুঁড়ীর ব্যাটা। মাগীর কি দ্যামাক্ মা।" যজ্ঞেশ্বরী দেখিলেন বিপদ। গৃহস্বামীর পরিচয় জানিতে গিয়া গৃহস্বামিনীর চরিত্র আলোচনা আসিয়া পড়িল। তা আবার তাদেরই পাড়ার সরকারি রাস্তায়! গতিক ভাল নয় বুঝিয়া তিনি কথা চাপা দিয়া বলিলেন— "তারামণিদের বাড়ী কোন দিক দিয়ে যাচ্ছ পিসিমা।" ব্রহ্ম "ঠিক যাচ্ছি মা, ঠিক্ যাচ্ছি, বলে এই গাঁয়ে বুড়ো হয়ে চুল পাকালাম।—"যজ্ঞেশ্বরী—' তা না হলে তোমায় সাথী করিছি সাধে, মা?" পেহ্লাদের মা যেতে চেয়েছিল আমি বল্লাম ছিঃ তোর সঙ্গে যাব কি? যাইতো ও বাড়ীর পিসির সঙ্গে যাব গল্পি মান্সি গিন্নি বান্নী লোক—"। ঠাকরুণ বলিলেন—"তাতো বটেই বাছা। গাঙ্গুলীবাড়ীর বৌঝি নিয়ে এ গাঁ ওগাঁ করতে হলে বেহ্মঠাকরুণ না হলে চলে না"।

পথে ব্রহ্মঠাকরুণের গুণবান ভ্রাতুষ্পুত্র হুটবিহারীর সঙ্গে দেখা হইল। তার ঘাড়ে একধামা খইল ও হাতে এক বোঝা পাট। ঠাকরুণ দুর হইতে ভাইপোকে দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরীকে বলিলেন 'বৌ ওইটী আমার ভাইপো গো!' যে যা বলে বলুক তা—বাছা ঘরসংসারী খুব! দেখনা নিজেই বোঝা আনছে মাথায় করে, চাকরকে দিয়ে বিশ্বাস নেই।" চাকর যে আছে অথচ তাহাকে খাটানো হইতেছেনা ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য বেহ্ম ডাক দিয়া বলিয়া উঠিলেন "হাঁরে সেধো ছোঁড়া কোথা? তুই এই ভোর সকালে বোঝা বইছিস্—?" হুটবিহারী অত সতো বুঝিলনা, সরল ভাবে সত্য কথা বলিয়া ফেলিল "চাকর আবার কোন পুরুষে আমাদের ছিল গো?" বেহ্ম অপ্রস্তুত হইয়াও অপ্রস্তুত হইবার নয়, যজ্ঞেশ্বরীকে শুনাইয়া চুপি চুপি বলিল "ঘর সংসারের কোনো খপর খোঁজ রাখে কি? "যজ্ঞেশ্বরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া হুটবিহারীকে বলিলেন— "ঠাকুরপো কাল আমাদের বাড়ী খাটবার আর খাবার নেমন্তন্ন—বাড়ীতে বলে এসেছি যেও"। হুটবিহারী বলিল "হ্যাঁ যাব বইকি বৌদি, হুচি জিনিস বাদ দেবার ছেলে হুটবেহারী শর্ম্মা নন, তা জীবন ভট্টচাজ্জি যতই দল পাকিয়ে ভাংচি দিক্না—"। বলিয়া হুটবিহরী সোজা চলিল।

হুটুর কথাটা যজ্ঞেশ্বরীর কাণে ছ্যাঁৎ করিয়া লাগিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য হুটুর দিকে চাহিলেন। হুটু তখন বিশ গজ দুরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি বেহ্মঠাকরুণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো কি বল্লে, পিসি

ভটচাজ্জি ভাংচি দিচ্ছে ? কিসের ? কেন ?”—ঠাকরুন বলিলেন—“জীবন ভট্‌-চাজ্জি বুঝি ? জমিদার বাড়ীর পুরুৎ গো। দল পাকাবার একজন! তবে আর কি। ভয়ে বেহ্মঠাকরুন গর্তে ঢুকে থাকবে। ড্যাক্‌রা পুরুৎ মিনসেকে চরকি নাচন নাচাবুনি। চল তুমি কিছু না—”

কথায় কথা আসে। ব্যাপারটা এই। “নেউগী পুকুরের” সেদিনকার ঘটনাটার পর জীবন ভট্টাচার্য্যের 'প্রখরা পত্নী যজ্ঞেশ্বরীর কথায় ও কাজে নিজেকে অপমানিতা মনে করিয়া বিফলাক্রোশে গর্জ্জন করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। ফিরিয়াই রান্নাঘরের দাওয়াতে জলের ঘড়াটী ধুম্‌ করিয়া বসাইয়া দিয়া স্বামীপুঙ্গবকে শুনাইয়া ২ বলিলেন—“বড় লোক আছে, ওই আছে. তা বলে পুরুৎ দেবতার অপমান ? ঝাঁটা মারি তোর পাঁচা পয়সার মাথায়।” বলিয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন কাপড় ছাড়িতে। জীবন ভট্টাচার্য পরম নির্বিকার ভাবে উবু হইয়া রকে বসিয়া তামাক টানিতে ২ দেড়বিঘা ধানের জমিতে কত পাট্‌ উঠিতে পারে কাঙ্গালী মড়লের সঙ্গে তার হিসাব কসিতেছিলেন ও সঙ্গে ২ ছেলেকে ইংরাজী প্রথমভাগ হইতে "He is up"—"তিনি হন উপরে" এই সাধু অর্থ শিখাইতেছিলেন। গৃহিণীর মেজাজের প্রাতঃকালীন টেম্পাচারের হঠাৎ ব্যতিক্রমে তিনি হিসাব ভুলিলেন, এবং পাঠ্য বস্তুর মানে হারাইয়া ফেলিলেন। গৃহিণীর কাছে ব্যাপার সমস্ত শুনিয়া তাঁহার বিস্ফোরনশীল ব্রহ্মণ্যশক্তি দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিল। লোকনাথ মুখুয্যের পরিবারের স্পর্দ্ধা যে জমীদার রতন রায়ের কুল পুরোহিতের উন্নত মস্তককে খাটো করিতে উদ্যত হইয়াছে ইহা জীবন ভট্টাচার্য্য স্থির বুঝিলেন এবং উক্ত কার্য্যটী করিয়া যে যজ্ঞেশ্বরী দেবী কেউটে সাপের ল্যাজে পা দিয়াছে ইহা তিনি ক্রুদ্ধা পত্নীকে বুঝাইলেন। প্রতীকারও যে করা হইবে তাহা হুঁকার মস্তকস্থিত অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া দিব্য করিলেন। না করিলে সে দিন গৃহিণীর যে ক্রোধাগ্নি নিভিবে না ও উনানে আগুন জলিবে না তাহা ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ফলে জানিতেন।

জীবন ভট্টাচার্য্য তদবধি প্রতিশোধের উপায় ও সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এবং শীঘ্রই সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য স্থির করিলেন দল পাকাইয়া মুখুয্যে বাড়ী 'ব্রাহ্মণভোজন' বন্ধ করিবেন। কল্পনা কাজে পরিণত করিবার মতলবে জীবন ভট্টাচার্য্য ভোর না হইতেই বাড়ী বাড়ী গিয়া যজ্ঞেশ্বরীর অপরাধ কাহিনী বুঝাইয়া নিমন্ত্রণ রদ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। যদু আচার্য্যের মুদীর দোকানে আসিয়া জীবন ভট্টাচার্য্য আস্তানা পাড়িলেন। যে

দুই একজন ব্রাহ্মণ খরিদার আসিয়াছিল তাহাদের ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিলেন। ছুটবেহারী, তথায় উপস্থিত থাকায় সে ইহার প্রথম পরিচয় পায়, এবং পথি-মধ্যে পিসিকে সে সংবাদ দিয়া গেল। এইতো প্রথম ভাগ।

যদু আচার্য্যের দোকানে এক কিস্তি কাজ সারিয়া জীবন তারামণির পিসির কাছে উপস্থিত হইলেন। জীবন ভট্টাচার্য্য একরূপ নিশ্চিন্ত ছিল এই অসহায়া বৃদ্ধা ইঙ্গিত মাত্রেই তাহার কথায় বশ হইবে কেন না তারামণি তাহার যজমান বাড়ীতে কাজ করে, আর তাহারি চেষ্টায় তারামণি সে বাড়ীতে কাজ পাইয়াছে। 'খুড়ী বাড়ী আছ গা' বলিয়া জীবনকালি বৃদ্ধার কুটীরের উঠানে গিয়া উঠিলেন। তারার বড় মেয়ে তখন উঠান ঝাঁট দিতে-ছিল। জীবনকালির ডাক শুনিয়া সে তার মাতামহীকে খবর দিল। বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে জীবন বলিল "খুড়ী কেমন আছ? তারা কোথা?"

বৃ। কে ভোলানাথ? বস বাবা—

তারার মেয়ে ঠাকুরমার ভুল শোধরাইয়া দিয়া কানে কানে জীবন ভট্টাচার্জ্জির নাম করিল। নাম শুনিয়া বৃদ্ধার ভাবান্তর হইল, ভাবিল তারা আজ কাজে যাইতে পারিবে না বলিয়া বুঝি পুরুৎকে দিয়া তার মনিব গৃহিনী তলপ পাঠাইয়াছে। এই আন্দাজ করিয়াই বৃদ্ধা বিরক্তির স্বরে বলিল "কেন বাবা, সে তো কাল গিন্নিকে বলেই ছুটী করে এসেছে, তাকে মুখুজ্যে বাড়ী যেতে হবে, ভোলার মেয়ের ভাত, তারমণিকে বলে রেখেছে যজ্ঞি রাঁধতে হবে—।"

জীবন ভট্টাচার্য্য ভাবিতেছিল কথাটা পাড়িবে কি করিয়া, সে জানিত এই তেজস্বিনী বৃদ্ধা কাহারো খাতির রাখে না। জীবনকালি বলিল -"জানি বৈকি খুড়ী, তাই শুনেই তো ছুটে এলুম—সাবধান করে দিতে।"

বৃ। কিসের সাবধান? কেন?

জী। তারামণিকে ও বাড়ীতে রাঁধতে পাঠানো কি ভাল হচ্ছে খুড়ী?

বৃ। ভাল মন্দ রাঁধা রাধির আর কি? আর পাঁচজন দেখিয়ে দেবে, পারবে না কেন? আর ও নিন্দের রাঁধে কি?

জীবন জানিত বুড়ী কানে কম শোনে। সে কথাটা ঘুরাইয়া খোলসা করিয়া বলিল—"তা নয় খুড়ী, বলি বলছি কি—ভোলা মুখুজ্যের ভাজের কাণ্ডটা শুনেছ তো? তাদের সব খ্রেষ্টানী কীর্ত্তি মুছলমান ছুঁয়ে জাত খুইয়েছে, আর সেই বাড়ীতে তোমার ভাইঝিকে পাঠাচ্চ রাঁধতে? বাবুর পরিবার শুনলে কি বাড়ী ঢুকতে দেবে?—"

বৃ। কবে মুছলমান ছুঁয়ে জাত খেয়েছে তারি? কোন চোখ্‌খেকো দেখেছে শুনি?

জী। তারার কথা নয়, ভোলার ভাজের কথা বলছি, লোকনাথের পরিবার—শোননি খুড়ী সে দিনের ঘাটের ঘটনা আর বাড়ীর কাণ্ড?

বৃ। ওঃ কিরণের মার কথা বলছো? এই বের বুঝেছি, বল্‌তে হবেনে মনে পড়েছে; তারি বল্‌ছিলো বটে! তাকে নাকি তোমরা একঘরে করবে ঠিক করেছ? তাই আমাকে ভাংচি দিতে এসেছ—বটে? বলি হ্যাঁগো পণ্ডিতের ব্যাটা, এ গাঁয়ে জাতওয়ালা কটা আছে যে লোকনাথের পরিবারের জাত মারবে?

জী। খুড়ী বলছ কি?

বৃ। বল্‌ছি ঠিক ঠিক। বেশী না শুনুতে হয় যাতে তাই করো, ফল্‌না চক্রবর্ত্তীর মেয়ে কারো মুখ চেয়ে কথা বলেনে। হক্‌ কথা বলবো তাতে বন্ধু বেগড়ালে বেগড়াবেন। তারিতো যাবেই; তার চাকরী থাক আর যাক্‌।

জী। তোমাদের ভাল ভেবে—

বৃ। কাজ নি বাবা ভাল ভেবে। বলে দাদা বড় মরদী, আর দিদি বড় দবদী। মানুষকে তেষ্টার জল দিয়ে যজ্ঞেশ্বরীর জাত গেল; আর ফলনা গাঙ্গুলী এমন কীর্ত্তি করেও বাপের ঠাকুর হয়ে গাঁয়ের মধ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে! তোমরা বলে মুখ দেখাচ্ছ এই গাঁয়ে? যত বিক্রম বাহাদুরী অনাথা বিধবার জাত মেরে। শতেক ছিঃ তোমাদের—এই বলিয়া বৃদ্ধা ঘরে ঢুকিল। জীবনকালি হাতের কালি মুখে মাখিয়া বাহির হইয়া গেল!

ঠিক সেই সময়েই তারামণি স্নান করিয়া বাড়ী ঢুকিল। কন্যা তুলসী তাহাকে ঠাকুরমার বাগযুদ্ধের পরিচয় দিল। তারা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া পিসিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল। পিসিও সংক্ষেপে সমস্ত শুনাইল। বলিল "পুরুৎ মিন্‌সে শাসিয়ে গেছে তোর চাকরী থাক্‌বেনে বুঝলি তারু?" তারা বলিল—"তা ও গিয়ে গিন্নিকে লাগালেই কাজ যেতে কতক্ষণ?" পিসি—"জুটতেই বা কতক্ষণ? নে কাপড় ছেড়ে কাজে যা এখন।" তারা—"কিরণের মার সঙ্গে পথে দেখা হ'ল, তিনি আসছিলেন নেমন্তন্ন করতে আমি বারণ করলুম পিসিমা—আবার কষ্ট করে আসবেন?"—পি·"বেশ করিছিস্‌, এখন যা।" তারা—"ঘাটে ঐ সব কথা নিয়ে পুরুৎ গিন্নি খুব ঢাক্‌ পিটুচ্ছিল, আমি যেতে আমায় দেখে ঠেস্‌ দিয়ে দিয়ে কত কথা শুনালে পিসি।" পি—"শোনাগ গে। তার জিভ্‌ আছে শুনিয়েছে, লোকের কাণ আছে শুনেছে—;

এখন যা ; চাকরী কেমন করে যায় দেখে নেবো এখন—যা তুই। গিন্নিকে বলে ছুটি করে আসিস্—"।

• • • • •

জীবনকালি ভ্রমেও ভাবে নাই তারামণির পিসির কাছে এমন ভাবে অপদস্থ হইয়া আসিবে। মুখ খানাকে বিষ্ বিষ্ করিয়া ব্যর্থরোষ মনে চাপিয়া সে রসিক হালদারের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উঠিল। রসিক হালদার একজন নানাগুণের গুণীব্যক্তি। বয়স আন্দাজ ৩৫।৩৬। সে গ্রাম্য এম, ভি স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক, পোষ্টমাষ্টার। হোমিওপ্যাথীও চিকিৎসা করে, মহেশ ভট্টাচার্জ্জির সস্তা ঔষধ ও ব্লাডকের বঙ্গানুবাদের কৃপায় রসিক একজন "অ্যামেচার" চিকিৎসক হইলেও অল্পকালেই একজন পেশাদার বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা তার নামডাক হইয়া পড়ে। স্কুলের সেক্রেটারী বাবুর মজলিসে রসিক তবলা বাজাইত, বাবুর বয়স্যরা তাকে "আমচুর ডাক্তার" বলিয়া ডাকিত। রসিকের আর একটা মজলিসি বিদ্যা ছিল, সে একজন দাবাড়ে ছিল চৌকস্। যখন জীবনকালি তার চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইল তখন রসিক গেঁড়া সরকারের সঙ্গে বড়ে টিপিতেছিল। সরকারের রাজা তখন বেটক্করে কিস্তি খাওয়াতে আড়াই পাও চলিতে পারিতেছিল না, রসিকের একটা গজ শুঁড় উঁচাইয়া রাজা ব্যাচারীকে দ্বিতীয় কিস্তির ভয় দেখাইতেছিল। এবং একটা নগন্য ছোট বড়ে রাজার দুর্দ্দিন দেখিয়া পথ আগ্লাইয়াছিল, সরকার ব্যাচারী গালে হাত দিয়া রাজাবাহাদুরের প্রেষ্টীজ্ বাঁচাইতে ব্যস্ত ; সেই অবসরে রসিক ভট্টাচার্জ্জ্য মহাশয়ের অভিবাদন সারিয়া লইতে মুখ ফিরাইল। নামেও রসিক, কথাতেও রসিক। রসিক—"তার পর ভশ্চাজ্জি শুভাগমন কি মনে করে ?"

জীবন। সকাল বেলাই দাবায় বসেছ যে ?

রসিক। যুদ্ধের কি কালাকাল আছে ভশ্চাজ্জি মশাই ? রণং দেহি বলে শত্রু এলে ক্ষত্রিয় রক্ত কি ঠাণ্ডা থাকে ? (সরকারের দিকে আড় চখে দেখিয়া) ওখানে যায় না ভায়া, কোণে ঐরাবৎ শুঁড় খাড়া করে বসে আছেন—(জীবনের দিকে মুখ ফিরাইয়া)—কাজ কর্ম্ম নেই—শুধু কাজ নয়, খাওয়া দাওয়ার পাট্ নেই—কাজেই দুবাজি খেলা যাক।

জীবন। কাজ নেই কেন ?

রসিক। আজ যে ছুটী ? সেক্রেটারী বাবুর ছেলে হয়েছে কিনা তাই ছুটি—জানেন না ?

জীবন। ওঃ ঠিক বটে। তা খাওয়া বন্ধ কেন?

রসিক। গাঙ্গুলি বাড়ী একটা ভোজ আছে—

জীবন। আজ না আগামী কাল? ভুলে গিয়েছিলাম আজই তো বটে!

রসিক—(সরকারকে) কি ভায়া রাজার কি শেকড় বেরিয়েছে?—(জীবনের দিকে তাকাইয়া) কালতো আছেই, ভোলার মেয়ের ভাত, আজ কি একটা ফলদান ব্রত' উপলক্ষে গাঙ্গুলী বাড়ী ফলাহার আছে এটা প্রাইভেট্—

জীবন। ভোলার ওখানে নিমন্ত্রণ নিয়েছ না কি?

রসিক। নিশ্চয়ই, ব্রাহ্মণের মুখে এ প্রশ্ন খুবই অশোভন—

জীবন। উঁহু! অগ্রাহ্য করতে হবে—

রসিক। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য? বলছো কি ভশচাজ্জি? অকৌলিক কাজ?

জীবন। কেন? শোননি ভোলামুখুজ্যের ভেজের কাণ্ড কীর্ত্তি?

রসিক। (খেলার দিকে তাকাইয়া) ঢেলে সাজ সরকার! আর সামলায়না, নৌকো ওঠেনা ভায়া—

এই বলিয়া বিজ্ঞী রসিক হাতের বলগুলা ছকের উপর ফেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বসিয়া বলিল—"কি ভশচায্যি মশাই? কী কীর্ত্তি— ওঃ সেই মুছলমানকে জল দেওয়া? হ্যা, তা শুনেছি বৈকি—"

জীবন। তবে আর কি? বাউনের একটা জাত জন্মের বিচার আছে, এটাও ডোবাতে হবে? বলছ কি বাবাজী?

গেঁড়া সরকার মাং অবশ্যম্ভাবী জানিয়া ও মাথায় হাত দিয়া ছকে চোক লাগাইয়া ভাবিলেও যে রাজার অনন্ত কিস্তিত্ব ঘুচিবে না ইহা বুঝিয়া আবার ঢালিয়া সাজিতে সাজিতে অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"তা আছে বৈকি দা'ঠাকুর জাত বলে কথা! সেদিন ছোট রত্ন মোশাই (ভাগবতরত্ন উপাধিধারী এক পণ্ডিত্) নীলু কথককে বোঝালেন "জন্মাদাস্য জাতঃ" জন্ম থেকেই জাত, আর জাত থেকেই জন্ম! ঠিক কথা—দেখ হালদার—ঘোড়াটা আমার ওখান হতে উঠেই বাজিটা গেল!—

জীবন অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। "সে যাগ্, হালদার ও বাড়ী নেমন্তন্নে যেতে পারছ না—!"

রসিক। মাপ কর ভশচায্যি! আর যা বলো তা করতে পারি, ওইটে নয়, সেদিন রাঁধতে হবে না জেনে গিন্নি সম্বচ্ছরের বড়ি দিয়ে রাখবার প্ল্যান

করে আছে—আবার যদি গিয়ে বলি সেদিন রাঁধতে হবে তা হলেই হয়েছে আর কি !, আমার উভয় সঙ্কট হবে , দুকূল যাবে—

জীবন। কিচ্ছু হবে না আমার ওখানে সেদিন খেও—

রসিক। কেন খুড়ো বাদ সাধতে বসলে। বাবা বছরে তো একদিন চর্ব্বচোষ্য জোটেনে , চিরকালই গরীব বাউন ফলারের আশায় বেঁচে থাকা যদি বা জুটলো তাতে এই ঝগড়া ? জন্মটা তো বাবা পাটশাগ আর নুনভাতে কেটে যাচ্ছে, একদিন বা যদি একটু ভালমন্দ জুটছে, দোহাই ভশচাজ্জি মশাই—আর সুখের পথে—

জীবন। ওঃহো ভাবছ বুঝি আমি দল পাকিয়ে এই করছি ? সেক্রেটারী বাবুর ইচ্ছে মরজি না হলে—

রসিক সেক্রেটারী বাবুর নাম শুনিয়া বিচলিত হইল। ভাবিল ইনিও তো একজন অন্নদাতা। চর্ব্বচোষ্যের ভোজ্য না হোক দৈনিক পাটশাক ভাতের বটেতো ? রসিক ভাবিতে ভাবিতে বড়ে চালিতে লাগিল।

জীবন। সমস্ত ব্রাহ্মণরা একদল হয়েছে আর তুমি দলছাড়া হবে ? একতার অভাবেই তো—

রসিক। দেশের এমনি সব ভাল কাজ মাটি হয়ে যাচ্ছে। তা বটে। আচ্ছা দেখি খুড়ো—বাবু এর মধ্যে—বাও চালো সরকার—

জীবন খাড়া হইয়া উঠিয়া "তা না হলে আমি শুধু শুধু" বলিয়া কথা অসমাপ্ত করিয়া হুঁকাটা রসিকের হাতে দিয়া বলিল -"ভাল কথা। ডাক্তার রয়েছে জিজ্ঞেস করেই যাই আর কাকেও তো পেত্যয় হয় না—আমার ছোট মেয়েটার হাঁটুটা ফুলেছে ক'দিন হতে—কিছু অষুধ একটা দিতে পার ? "জীবন জানিত রসিকের দুর্ব্বলতায় ঘা দিতে পারিলে কাজ আদায় হয়। রসিক খেলাতে মত্ত থাকিতে জীবনকে জেরা করিতে লাগিল :—

প্র। হাঁটু ? কোন হাঁটু ?

উ। বাঁ হাঁটু।

প্র। রাতে বাড়ে না দিনে ?

উ। রাতে—হ্যাঁ, দিনেও বটে।

প্র। অমাবস্যায় না পূর্ণিমেতে ? রং ফর্শা না কালো? বয়স কত ? মেয়ে না পুরুষ ?

ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া রসিক কিস্তি উঠাইয়া বলিল "ক্যানথারাই-ডিস' মাৎ—এক ডোজেই ঠিক হবে।'

কন্যার ব্যাধির চিন্তায় তো জীবনের ঘুম ধরে নাই।

যজ্ঞেশ্বরীর যজ্ঞনাশ করিবার চিন্তায় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। সে "আচ্ছা অষুধ নিয়ে যাব এসে" বলিয়া নরহরি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর দিকে রওনা হইল। নরহরি গ্রাম্য দলাদলির একজন পাকা পাণ্ডা। এক সময়ে জীবন-কালির দক্ষিণ হস্ত ছিল। এখন বুড়া হইলেও কাহাকে 'একঘরে' করিবার ধুয়া উঠিলে নরহরির উগ্যম উৎসাহ যৌবনের মাত্রায় দেখা দিত। কিন্তু সম্প্রতি একটা পারিবারিক কুঘটনার পর হইতে অপরের জাত মারা ব্যাপারে বড় উচ্চ বাচ্য করিত না। তা ছাড়া বৈষয়িক কাজের গোলমালে এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাহাকে বড একটা আর পরচর্চ্চায় মাথা ঘামাইতে দেখা যাইত না।

জীবনকালি যখন 'হরিদা বাড়ী আছ' বলিয়া প্রাঙ্গনে পদার্পন করিল তখন নরহরি নাকে চশমা লাগাইয়া তারন মণ্ডলকে তমসুকের তামাদি হওয়ার সংবাদ দিয়া প্রার্থিত কর্জ্জপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা বুঝাইতেছিল। মাসাবধি কাল রোগে ভুগিয়া ব্যাচারী বীজধান বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে তথাপি ভট্টাচার্য্যের সুদ ও বৈদ্যের ঋন ভারে ব্যতিব্যস্ত, তার উপর কৃষাণীর তাব অন্তিম শয্যা। অবুঝ তারণ তথাপি নানা অ-মনুষ্যোচিত উপায়ে বাবা ঠাকুরের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় জীবনকালি আসিয়া আগমন উদ্দেশ্য সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

মনে মনে নরহরি এ সংবাদে বিশেষ কিছু আগ্রহ উৎসুক প্রকাশ করিল না, কেবল তারন মণ্ডলের কাতর প্রার্থনা কান না দিবার সুবিধা সুযোগ পাইয়া পরম বিস্ময়ে চোখ বাহির করিয়া ও মুখ ফাঁক করিয়া বলিল "বলছ কি ভায়া? হলো কি? ঘোর কলি বটে। গেরস্থ বাউনদের জাত মারবার চেষ্টা দেখিয়াছি যে? না ধর্ম্ম কর্ম্ম আর থাকে না? যাবে নাকি সব? জীবন— আমি তো ঘর ঘর মানা করে দিয়ে এসেছি। কার্য্যক্ষেত্রে কি দাড়ায় জানছিনি তো। মাগী খুব জাঁহাবাজ, নিজে বাডী বাড়ী নেমন্তন্ন করে বেড়াচ্ছে। দক্ষিণে নাকি বাউন ভোজনের এক এক আধুলি!" জানাইতো দাদা দারিদ্রি বাউনের জাত লোভ সামলানো—" এক আধুলী দক্ষিণা, পর্য্যাপ্ত চর্ব্বচোষ্য লেহ্য পেয়ের উপর! শুনিয়া মহাকৃপণ নরহরির পরম লোভ হইল। সগোষ্ঠি ভোজন; তার উপর অর্দ্ধতঙ্কা দক্ষিণা! ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—"তা ভায়া মুখুয্যে গিন্নির উচিৎ প্রায়শ্চিত্ত করে একাজে হাত দেওয়া! নয় কি? ধর এতে সব

দিক রক্ষে, অবিশ্যি সদ্ভাবও থাকে, অথচ গ্রামে ক্রিয়ে কর্ম্ম গেরস্ত বাড়ী বন্দ না হয়, ধর ঠিক্ কিনা?” জীবন বুঝিল হরিদা দুকুল বজায় রাখিতে এত ব্যস্ত কেন। বলিল—“না ভায়া। তোমার আমার মত বংশধর-ব্রাহ্মণের ছেলে যদি গ্রামের মধ্যে একটু জোর না দেখাই তাহলে কি ধর্ম্মাধর্ম্ম টিক্‌বে?” নরহরি হাতদিয়া নাকের ডগায় চশমাটা চাপিয়া ধরিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল “তা তারণ এখন যাও, ধর তোমার এটায় একটা বিহিত না হলে কি আর তোমাকে ঋণভারে গ্রস্ত করতে পারি? এই সংকান্তিতে তামাদি হবে, ওটা বদলে দিতে হবে—এখন তা হলে যাও—”

তারণ আর কি বলিবে? ‘দোহাই বাবা ঠাকুর দেখবেন—’ বলিয়া সে ছেঁড়া চাদরের খুঁটে করিয়া দেবতার পবিত্র পদরজঃ লইয়া চোখ বুঝিয়া প্রস্থান করিল। নরহরি জীবনের দিকে ফিরিয়া বলিল “হ্যাঁ, যা বল্‌ছ আচার ধর্ম আমরা না রাখ্‌লে কে রাখবে?” আচ্ছা তা তাই হবে—।” ‘তবে এখন উঠি’ বলিয়া জীবন উঠিল। নরহরি আর একবার বলিল—“নিদেন উপযুক্ত মর্য্যাদা ধরে দিয়ে মিটিয়ে ফেলুক না? কি বল জীবন?” “খেপেছ হরিদা? শিক্ষা দরকার?—সে সব হতেই পাবেনা।” “অবিশ্যি অবিশ্যি। সেও একটা কথা”। যজ্ঞেশ্বরীর উপর নরহরির আক্রোশের কারণ ছিল। তিনি নাকি তারি দু একজন খাতক কে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কাজেই যজ্ঞেশ্বরী একটু অপদস্থ বা জব্দ হইলে নরহরির মনে তৃপ্তি হয়। কাজেই সে ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিল।

জীবন তারপর একে একে বাকী কয় ঘর সারিয়া দ্বিপ্রহরে বাড়া ফিরিল। একমাত্র তাহার পিসি ছাড়া সকলেই জমীদারের পুরোহিতকে ভয় সম্ভ্রম করিয়া অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিয়াছিল মুখুজ্যে বাড়ী নিমন্ত্রনে যাইবে না। জীবনও কৃতকার্য্যতার আশ্বাসে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ও গর্ব্ব বোধ করিয়া কয়েক ছিলিম তামাকু পুড়াইয়া ফেলিল। কথঞ্চিৎ এই জন্যে যে সফলতা সম্বন্ধে তার যেখানে প্রধান বাধা সেই খানে কোনো আশা পায় নাই।

গণিকার সিদ্ধি।

(শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।)

মোরে — সুখে মজাইয়া বাঁধে রে।
রহি — পায়ের শিকলে সাধে রে।

এ পতনে মোর সরম বিকল
তার আঁখি দু'টি করে ছল ছল
হের — পতিতা অঙ্গে
পতিত পাবন
পরাণ কাড়িয়া কাঁদে রে।

তোদের — লাজে উপহাসে সে যে কাছে আসে
মোরে — পথে টেনে আনে তাহারি পিয়াসে
এ কলুষ ভরি
সে মধু যমুনা
বহে বলি রাধ বাধে রে।

ওগো — নারী যে করেছে করেছে অবলা
কি প্রেম শরণ তাহে প্রাণগলা।
ও চরণে ঠাঁই
দেবে বলে তাই
আমার — কত সুখে বাদ সাধে রে।

আমি — পথহারা তার স্বজন মাধুরী
তারি — অলখ জাগায়ে পথে পথে ঘুরি,
তনু ভরি হয়
তারি জয় জয়
কীর্ত্তন রূপ-ছাঁদে রে!

আমার বলিতে কিছু রাখে নাই
তাঁ'যে শ্রীঅঙ্গনে করেছে গোঁসাই
হের জীবন্ত মরণে
জগতের ধনে
পতিতা আঁচলে বাঁধে যে।

আহ্বান

(শ্রীসত্যবালা দেবী)

শীতের শীর্ণ পাতা বসন্ত বায়ুর দুর মর্ম্মর ধ্বনি,—শোনে গো শোনে, কাননে বনদেবীর সভাতলে নীবব ইঙ্গিতে আবাহন আয়োজন সজ্জা, সে চোখ মেলে দেখে গো দেখে। ছাপা থাকে না। অত উর্দ্ধে সেই গৌরব মণ্ডিত অত্যুগ্র চূড়া।—ভেবো না যেন সেখানে আর নীচেকার কোনও কথা পশে না। সব যায়,—এতটুকু পর্য্যন্ত! তরুলতার অঙ্গে অঙ্গে নূতনকে উদ্ভিন্ন করবার জীবন রস বিদ্যুৎ প্রবাহে ঝলকে ঝলকে আনাগোণা কর্ত্তে থাকে, তারই শিহরণে আপনার বৃন্তমূল সন্ধিচ্যুত হবে বলে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে, বাতাস যে ভরে উঠচে প্রতিকূল উপাদানে, আপনারই শ্লথ অঙ্গ রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিভ্রমে আরো যেন কার আগমণী তান সহসা ধরে ফেলচে,—সবই সে বুঝতে পারে। আরো সে বোঝে হবে হবে হবে যেতেই হবে। এ যে অমোঘ বিশ্ববিধান! বনভূমির এ রহস্য কথা কত বসন্তের পর বসন্ত গেছে,—বনে বনে ভ্রমণ করে জেনেছি বনদেবীদেরই মুখচ্যুত অশ্রান্ত হাস্য কৌতুকালাপে। ভুলিনি। কানে যে প্রতিধ্বনি জাগে!

এমনি আবার পুরাতনের মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়েছি,—অসহায় কালজীর্ণ নিঃশেষিত শ্বাস বৃদ্ধ! মনে দপ্‌ দপ্‌ করে প্রতি নিমেষে জলে উঠছে গো!—তার শঙ্কা অপভাষ প্রলাপ,—উঃ। সে যে বিয়োগান্ত নাটকের শেষদৃশ্য! সে যে বিদায়ের সকরুণ সঙ্গীত ধ্বনি। ভাগ্যলক্ষ্মি, হেসো না। মুখ গম্ভীর কর। তারে নিয়ে পরিহাস সহ্য কর্ব্ব না। সে যাবেই,—নিয়তির অমোঘ বিধান। তার কথা যেতে দেব না। তার সঞ্চিত সেই বেদনা রাশি,—তাও যেতে দেব না। আমার হৃদয় আছে, সেখানে স্থানও আছে।

ভারতের নারীশক্তি, তোমার পুরাতন প্রকাশের প্রতিমাখানি,—তারে গড়ে উঠতে দেখেছি, তার চারিদিকে ঐশ্বর্য্যের প্রাচীর কি দিয়ে কেমন করে ঘিরে উঠল তাও দেখেছি, আরও দেখেছি, কালে কালে সেই দেউল জীর্ণ হতে মলিন হতে বিদীর্ণ হতে, দেখেছি তার ফাটলে ফাটলে আগাছা গুল্ম বিশাল বৃক্ষ বাজি জন্মে উঠতে, তারপর দেখেছি, সর্ব্বশেষ দেখেছি, বিদীর্ণভিত্তি মন্দির মধ্যে দেউল চাপা হতে,—তোমার প্রতিমা চূর্ণ বিচূর্ণ হতে। তারপর কতদিনের কথা, কতদিন কেমন করে বোঝাব, দেখেছি শূন্য, সব শূন্য শূন্যময়। তোমার নাম আছে তুমি নাই, তোমার স্মৃতি আছে নিত্য নাই, পর্ব্ব আছে পূজা নাই! দেখেছি, নীরবে মর্ম্মপীড়া চেপে দেখেছি, পাষাণ হয়ে দেখেছি, বিরূপ জগতের বিচিত্র বিধান!—তুমি আছ, তোমার জন্য একটুক স্থান নাই! নির্নিমেষ নয়নে রুদ্ধশ্বাস হয়ে দেখেছি, কেমন করে তুমি রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে গেলে, সেই অপরূপ প্রতিমার প্রতি অণু পরমাণু কেমন করে কোথায় লুকাল,—কোন পথের ধূলায় মিশাল, কোন পঙ্কিল প্রবাহে মিশাল, কোথায় কার পাদপীঠ তলে ভূমিলীন হল।

তোমার শব আসন করে বিশ্বপাপ যে দুর্জ্জয় অহঙ্কারের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিল,—তার সকল নিগূঢ় তত্ত্ব, গোপন রহস্য, মর্ম্মের সঞ্চিত দুরভিসন্ধি,—অন্তর্যামী সব আমায় বলেছে গো। জানি, তারপর যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠল, সেও যে আমার চক্ষের উপর। তার সকল কৌশলই জানি।

যুগ যুগ সেই নব চিত্রিত ভৈরব করাল ভাগ্য চিত্র সম্মুখে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে চক্ষের উপর দেখেছি—রমণী প্রাণহীণা। রোমাঞ্চ হয়ে অনুভব করেছি দূর শূন্য মহাব্যোম পরিপূর্ণ করা সেই বিচ্ছিন্ন প্রাণের ক্রন্দন। কর্ণপটহে ভেসে এসেছে,—শোনাব কারে, বোঝা কে? তারা যে বলত ও বায়ু মর্ম্মর ও সমীরণ স্বন্ স্বনা। তারা যে তখন বিরূপ ভাবের ভাবুক।

কে তুমি পাগল একদিন সহসা ছুটে এলে?—হে অপরিচিত, হে অভাবিতপূর্ব্ব, অসীম বিস্ময় একটা দমকার উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত করে একি অপরূপ ফুটিয়ে তুললে তুমি। যা কখনও ছিল না যা কখনও কেউ ভাবে নি তোমার প্রতি করতালি ধ্বনিতে ধ্বনিতে তাই সব ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সব বিশৃঙ্খল সব এলোমেলো সব লণ্ডভণ্ড করে ছিঁড়ে ফুটে দিয়ে তারপর প্রলয় ঝড়ের অবসানে নিস্তব্ধ প্রকৃতির মত গম্ভীর চিত্তে তুমি ধ্যানে বসে গেলে। তখনও জগৎ জানেনি তুমিই শিব! বোঝে নি এ তাণ্ডব নৃত্য কার চরণক্ষেপ।

জানল, যে দিন চতুর্দ্দিক ভাসিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল তোমার উন্মীলিত তৃতীয় নেত্রচ্যুত কিরণ—নবীনের নব দৃষ্টি নব অর্থবোধের রূপ নিয়ে।

চুপ! স্বপ্ন হোক্ প্রলাপ হোক্ ভাঙ্গিয়ে দিয়ো না!—শেষ কর্ত্তে দাও। এতটুকু মনের এ সৌখিন ক্ষুদ্র বীচি ভঙ্গ নয়,—এ হৃদয়ের অতলস্পর্শী, আমার সমগ্রতার প্রবাহ, এরে বাঁধ দিয়ে রোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না!—বয়ে যেতে দাও!

* * * * *

মনের অন্তর দেশে যে সব নিয়ম জীবন্ত শক্তির প্রবাহ রূপ ধরে ছিল সে সব অনিয়মে রূপান্তর গ্রহণ করল! নিয়মের শূন্য বাক্য গুলি বাহ্য জগতের নীতির আকার নিয়ে দম্ভের বাহ্বাস্ফোটে জীবনের পরিচয় দিতে চায় কিন্তু যে জীবন নয় একটা অপর কিছুর ধাক্কার গতি সে আর কতক্ষণ চলে? দেখতে দেখতে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। অসাড়। মানব স্বভাব সনাতন ধারাচ্যুত হয়ে শত শত বিচিত্র কামনার দাস হয়ে পড়ল। পুরাতনের পুঁথিতে যার কোনও টীরই সম্মতি নেই! সে মরীচিকার মত কল্পিত সার্থকতার আত্মপ্রসাদে কয়েকদিন তারে ঠেকিয়ে রাখল মাত্র।—তারপর ভেসে গেল। মানব স্বভাব সেই টানে ভেসে চলে গেল। ব্যর্থরোষে হতভাগ্য পুরাতন শূন্য প্রেক্ষণে চেয়ে রইল। তার আপন পুঁথি তাঁরেই ব্যঙ্গ স্বরে বিদ্ধ কর্ত্তে লাগল।

শীতের শীর্ণ পাতা প্রতি বৎসর যে গান শুনিয়ে যায় পুরাতনের বুকে তারেই জমে উঠতে দেখলুম। আমি যে শুনেছি গো? মিলিয়ে দেখেছি। সব জানি।

যারা ছিল পিঞ্জরের পোষাপাখী—নির্ব্বিবাদে বুঝে আসছিল, "তারের জালের ফাঁক দিয়ে ওই যে দেখা যাচ্ছে নীল," ও মিথ্যা, মিথ্যা, উদ্ধত পক্ষ সেখানে গিয়ে প্রতিহত হয়, ওই যে সীমা, ওই পর্য্যন্তই সত্য, অতি সন্তর্পণে চাইতে হবে, ওরে ছাড়িয়ে আর যেন দৃষ্টি না যায়।" তারা একদিন জিজ্ঞাসা করল—"একি সত্য? হে বিজ্ঞ, এ কি সত্য? ওই অতটা ও কিছু নয় আর আমার এতটুকু এইই সব। আমি যে সন্তর্পণে চেয়েও ওরে চোখের আড় কর্ত্তে পাচ্ছি না। মনে সন্দেহ জাগচে এটাকে ওটার মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু, ওর রহস্য এর কাছে অচিন্ত্য।"

উত্তর হলো, কিন্তু সে উত্তরে মাধুর্য্য নেই;—স্বর কর্কশ, ভাব তর্জ্জন গর্জ্জনে ভরা!—উত্তর এলো—"সাবধান। এটা সত্য কি মিথ্যা সে বিচার তোমার নয়, তুমি পিঞ্জরে বন্দী। ইচ্ছা বলে তোমার কিছু নেই, তোমার আছে

বাধ্যতা! তোমায়, তুমি যেমন বসে আছ, থাকতেই হবে,—তুমি বাধ্য!" তারপর পাখী চুপ করেছে দেখে তখন বিজ্ঞের স্বর প্রসন্ন হল তখন সে স্নিগ্ধকণ্ঠে উপদেশ আরম্ভ করলে। বললে,—"মনে রেখো পোষাপাখী, এখনি যা বললুম মনে রেখো—এই তোমার স্মৃতি, নিশিদিন স্মরণ রাখতে হবে! তারপর শোনো এবার যা বলব শোনো এ তোমার শ্রুতি, যখন বলে যাব চুপ করে শুনতে হবে!" পাখী বুঝলে স্মৃতি শ্রুতিও বিজ্ঞের কাজ, তার নয়, তার কাজ একটী—কেবল একটী—চুপ করে বসে থাকা।

বিজ্ঞ আপন মনে বলে যেতে লাগল—

"—ওই যে সন্দেহ ওইই প্রলোভন,—সর্ব্বনাশের পথ। ওর উদয়ের সম্ভাবনা দেখালে শিউরে উঠো, একেবারে মূর্চ্ছিতের মত পড়ে যেও। ওই যে নীল ওরে দেখে ফেলার নাম পাপ। সেই পাপে পরিত্রাণ পেতে যত চোক বুঁজে থাকতে পারবে ততই হবে সংযম ততই হবে তপস্যা। দেখ কাজ কি? আমি চিরকাল বসে আছি বাপু বসে থাকাটাকেই জানি। আমার মধ্যে যখন চলা নেই তখন চলা পৃথিবীতেই নাই বা এলো?—আমি বিজ্ঞ আমার নীচে থাকার চেয়ে আরো বড় কাজ সে কি থাকতে পারে?—আর চলে লাভই বা কি? এমন নির্ভাবনায় ছোলা কাটতে পাবে না। গাছে গাছে ফল আহরণ করে খেতে হবে, হয়ত প্রতিদিনে নূতন স্বাদ! এ কেমন একটা অভ্যাস একটানা চলে আসচে সে প্রতিদিন পরিবর্ত্তন—অভ্যাস হতেই পাবে না!—"

—কিন্তু পাখী ততক্ষণে চুপ করেচে,—তার বলাও থেমেচে, শোনাও ফুরিয়াছে!—সে ছোলাও কাটে না, বসেও থাকে না, আবার চলতেও চায় না! তারে পিঞ্জরে ধরে রেখেও রাখা সার্থক নয়!

বিজ্ঞ চিৎকার করে ডাকলে,—পাখি! পাখি! পাখি!

—দেখতে পাচ্চে মাত্র যে পাখী পড়ে আছে,—থাকার আর কোনও চিহ্ন নাই।

দেখো বিজ্ঞ! ডাকবে ডাক, চেঁচিয়ো না। হাত নেড়ো না। ও সব চলারই পূর্ব্ব লক্ষণ,—যদি তোমাতে চলা এসে যায়!

বিজ্ঞের আর শোনবার সময় রইল না, উপদেশ দেবার ধৈর্য্য রইল না, সে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল, গড়াগড়ি দিতে লাগল। পিঞ্জর পিছনে রেখে বনে বনে ছুটে ছুটে ডেকে বেড়াতে লাগল—পাখি! পাখি! পাখি!

পাখি ত এখনো পিঞ্জরে পড়ে,—নেতিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। আছে সবাই দেখচে, কিন্তু বিজ্ঞের আজ একি বিভ্রম—সে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। পাখী যে নীলের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে ছিল,—সে বার বার সেই নীলের দিকে চায়। পাখী যে বনভূমির পানে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল সে কেবলই সেই বনভূমির দিকে ছুটে ছুটে যায়। সে বলে "উঠবে,—পাখী ওই বনে শাখার আড়ালে ডেকে উঠবে।" সে বলে "আসবে,—পাখী ওই নীলে পাখা এলিয়ে ভেসে আসবে।"

* * * *

আজ নবীনের নব শিহরণে যে প্রেরণা অশ্রান্ত আবেগে মেতে উঠেছে, সে ত একদেশদর্শী নয়। তোমায় একবার গড়ে উঠে ভেঙ্গে মিশিয়ে যেতে দেখেছি, তার পরিণামও দেখেছি। পাগলের নৃত্যের ডিমি ডিমি ডমরু তাল তন্দ্রা ঘুচিয়েচে। চোখ রগড়ে চেয়ে দেখেছি—একি। সে জগৎ আর নাই। সে কোথায়? ওগো। আমার নির্নিমেষ নয়ন যার উপর চেয়ে ছিল সে কোথায়? কে বলে দেবে কোথায়? কোথায় সেই শক্তির প্রতিমার ধ্বংশাবশেষ? প্রাণপণে ডেকেছি, সে ডাক প্রতিধ্বনি তুলেছে,—দূর হতে তুলেছে,—অতি দূর হতে তুলেছে—বড় কাছেও তুলেছে। আমার কণ্ঠে তুলেচে—আবার,—তোমরা কেউ বিস্মিত হয়োনা,—অপরের কণ্ঠেও তুলেচে, শত সহস্র লক্ষ কণ্ঠে তুলেচে—নূতন জগৎ পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

উল্লাসে অধীর হয়ে শুনলাম আমি যারে চাই আজ সবাই তারে চাইবে।

আনন্দে নয়নাশ্রু ভরে এলো—ডাক ফুরুল; আবার বসলুম দেখতে তেমনি করে অনিমেষে দেখতে, যুগান্ত ধরে আমি যে কেবল দেখেই আসচি।

এস ফিরে এস আবার তোমার প্রতিমা গড়ব, নূতন করে গড়ব, নব কল্পনায় গড়ব, আবার স্থাপনা করব নব কৌশলে, নূতন স্থানে স্থাপনা করব! আগেকার কথা ভুলে গিয়ে এস, সর্ব্ব অভিমান ত্যাগ করে এস, নূতনের ঘরে নূতন হতে এস। এস তবে—

মায়ার মূরতি, প্রেমের প্রতিমা,
  সংসার-মরুতে দয়ার লতা;
পূর্ণলক্ষ্মী যেন অঙ্গের মহিমা
  স্নেহ-সুধা-মাখা সরল কথা

পবিত্রতা পূর্ণ কোমল হৃদয়,
নারী অভিমানে পূরিত বুক,
উজ্জ্বল বরণ পবিত্রতা ময়,
পবিত্রতা ভরা প্রসন্ন মুখ।

—নবীন চন্দ্র।

এস গো! জগতের সে পূর্ব্বের অভিমান দম্ভ চূর্ণ হয়েচে! সে আজ তোমার কাছ থেকে তোমাকে চাইচে। আপন মূর্খতা বুঝেচে। আর এ কথায় মন প্রবোধ মানছে না—

ফুটে বঙ্গ অন্তঃপুরে যে কয় কামিনী
তার কি তুলনা হয় উদ্যান কুসুম চয়,
প্রত্যেক বাতাসে যারা হয় কলঙ্কিনী?

—নবীন চন্দ্র।

অথবা—
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয় মুখ চাহি মধুমাখা শরমে—
বঙ্গনারী পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে?

—হেমচন্দ্র।

এমনি ধারা আপনার গড়ে নেওয়া কামনার কাছে আজ তাদের কামনা প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে! আজ তারা নূতন সুর ধরেছে—যা তাদের অভ্যাসের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তারা স্তম্ভিত হয়ে নিজেদের ভ্রমের সৃষ্টির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে তার মূর্ত্তি দেখচে, শুষ্ককণ্ঠে বলচে—

চঞ্চল চিত্তের স্রোত—
কিবা সুখ দুঃখ তায়, স্থির না থাকিতে পায়,
ভেসে যায় স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের আকার
এই প্রেম বরিষায়, সেই স্রোত পূর্ণ-কায়,
এই মান নিদাঘেতে বিশুষ্ক আবার।

• • •

ওই বালিকার শূন্য হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার।

—নবীন চন্দ্র।

সুখে থাকে তারা, সুখে থাকে ঘরে,
পতি পদতল বক্ষঃস্থলে ধরে,
বিবাহিতা নারী—সখের খেলনা,
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন,
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন,
ইহারই সতী—বিঘত প্রমাণ
আশা, রুচি, স্নেহ, ইহাদেব প্রাণ,—
নারীর মাহাত্ম্য রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কত জন,
প্রণয় কি ধন নারীর তরে?
—হেমচন্দ্র।

এক অপূর্ব্ব জ্ঞান,—মৃত্তিকার অতি গভীর স্তরে আপনার প্রকাশের ভাষা খুঁজে নেবার ষড়যন্ত্র করছে শুনেছি। মানুষের রক্ত কণিকায়, হৃৎপিণ্ডের কক্ষে কক্ষে, মাংসের অণুতে অণুতে মন্ত্রণাসভা বসচে, বার্ত্তা আনাগোনা করচে। তার কণ্ঠধ্বনি সজোরে বলচে—"নূতন ত ঝরে পড়ে আপনার কর্ম্ম দেখাবে না, সে দেখাবে মাথা চাড়া দিয়ে ঠেলে উঠে। অভ্যন্তরের যে শক্তির এই প্রকাশকে বাহিরে ঠেলে দোবার বেগ আছে সে যদি কামনা হয় তবে আমাদের সাধনা সকাম।" সনাতন লজ্জা লজ্জিত হয়ে ফিরে গিয়েছে। সে ধৈর্য্যের অটল বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে, পাগলের নৃত্যে সব ভেঙ্গে গিয়েছে গো। আমি স্তম্ভিত হয়ে সব দেখেছি।

শোন নি তাই বাঙ্গালীর আদর্শ স্বরূপ কবিদেরও হৃদয়ে ঝটিকার প্রতি-ধ্বনি,—যে নারী লতা ধরণী এদেরই উপমায় উপমিত হয়ে এসেছে তাঁরা তাদেরই কণ্ঠে ভাষা দিয়েছেন—

কেনই থাকিব কিসেরি তরে,
তনু বাঁধা দিয়ে গৃহের ভিতরে?
কারাবন্দী সম চির হতাশ্বাস,
কেনই ত্যজিব এমন বাতাস,
এমন আকাশ রবির কিরণ
বিশাল ধরণী, রসাল কানন,

প্রাণী কোলাহল, বিহঙ্গের গান,
সাধের প্রমাদ—স্বাধীন পরাণ,
কেনই ত্যজিব কাহার তরে?
—হেমচন্দ্র।

আরও উচ্চ—স্বর স্বরসপ্তমে চড়ে উঠেছে, কবির কণ্ঠে বিশ্বকামনা কণ্ঠ পেয়ে নারীর মুখ দিয়ে বলিয়েছে—

যেই প্রেম, সেই প্রাণ
আমি নাহি জানি আন,
তোমাকে সঁপেছি প্রেম পিঞ্জরে কি রাখি নাথ?
যথা প্রেম, তথা প্রাণ, প্রেম নাথ—প্রাণনাথ।
—নবীনচন্দ্র।

এ সব কিসের লক্ষণ? আর কিছু নয়, হৃদয়ে জমে উঠেছে যে বিচিত্র কামনা, আপনার অবস্থাকে ছাপিয়ে উঠতে, মাথা চাড়া দিতে, গজিয়ে উঠতে—এ তারই ভাবোচ্ছ্বাস, তরঙ্গ মালা। নূতনের অভিনবত্ব এই যে এর মধ্যে একদেশদর্শী ভাব নেই। তাইই পুরুষ কবিদের পুরুষকণ্ঠের স্বর ঝঙ্কার একটু উদ্ধৃত করে দেখালুম। তারাও ভাবচে নারী আপনার অবস্থার উপরে উঠবার তপস্যা করবে কোন মনস্তত্ত্ব নিয়ে। নিজেরা আপন আপন সুবিধার যতগুলি শিকল তাদের কণ্ঠে পদে জড়িয়ে রেখেছিল,—এমনি সব কবিতার ছন্দে ঝন্ ঝন্ শব্দে তা খুলে ফেলে দিচ্চে। হৃদয় ভরে চাইচে,—আসুক নারীও আসুক।

তবে তুমি জাগো তবে তুমি দাঁড়িয়ে ওঠো,—ওগো এ আহ্বানে মূক বধির হয়ে থেকো না।—যেমন হয়ে গেছ তেমনটা যে তোমার সত্য নয় সে আজ সকলে স্বীকার করেচে।—আপন মনের বিভ্রমে এখন কি তোমার দিশেহারা হয়ে থাকলে চলে? তুমিও তোমার মনস্তত্ত্বের উদ্ঘাটন কর। আপনার অবস্থাকে বিচার কর, লক্ষ্য স্থির করে নাও। তার পর স্থির করে নাও কোন উপায় প্রয়োগে অবস্থা হতে লক্ষ্যে গিয়ে পৌছোবে। সেই যে যাত্রার পথ চিহ্ন, সেই যে আচরণের নিয়মাবলী, তারে ধরে ধরে দীপশিখার মত জ্বলে উঠুক বাঙ্গালার নারীশক্তি। একবার দেখিয়েছিলে, আর বার দেখাও কেমনটা তুমি গড়ে উঠতে পার।

শ্যামবিহনে।

(শ্রীকালিদাস রায়)

হলো না বসন্ত এবার বৃন্দাবনের বনে
প্রেমানন্দ বিহনে শ্যামচন্দ্রমা বিহনে।
কোকিল এসে কুহুরবে
মুহুর্ম্মুহুঃ ডাক্‌ল সবে
না পেয়ে হায় শব্দ সাড়া ফির্‌ল ক্ষুণ্ণমনে॥
দখিন পান এসে সবায় গেল ছুঁয়ে ছুঁয়ে
জাগল না কেউ, কীচক কানন বাজ্‌ল না তার ফুঁয়ে।
ফুট্‌ল না তায় কুসুমকলি
ছুট্‌ল না গুঞ্জরি অলি
তুলসী মঞ্জরীগুলি ঝর্‌ল ক্ষণে ক্ষণে॥
শীত অবসান হলে ভেবে পলাশ দিয়ে উঁকি
দেখে ধূলায় লুটায় যত ব্রজের ব্রজমুখী।
অমনি সে মুখ লুকাইল
গুম্‌রে দুখে শুকাইল
ফোটা এবার হলো না তার রক্তসরঙ্গনে॥
শোনিত রাঙা শাণিত সব শায়ক পিঠে বেঁধে
এসেছিলেন অনঙ্গদেব ফিরে গেলেন কেঁদে
অশ্রু পিছল পথে পড়ি
ফুলের ধনু গড়া গড়ি
শ্মশানে আর রঙ্গ তাহার চলবে বা কেমনে॥
হোলীই যখন হোলনা তার বৃথাই আয়োজন
ফুটতে গিয়ে গেল ফেটে নটকোণা রঙ্গন
গগন বনের অরুণিমা
তরুলতার তরুণিমা
ধূসর হয়ে ধূমল হয়ে মিলায় দিগঙ্গনে॥

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বারীনের চিঠি পাইয়াই তল্পি তল্পা গুছাইয়া রওনা হইলাম। তল্পির মধ্যে লোটা কম্বল আর তল্পার মধ্যে একগাছা মোটা লাঠি, সুতরাং বেশী দেরি হইবার কোনও কারণ ছিল না। বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, একেবারে "সাজ, সাজ" রব পড়িয়া গিয়াছে। কিংসফোর্ড সাহেব তখন একে একে সব স্বদেশী কাগজওয়ালাদের জেলে পুরিতেছেন। পুলিসের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশসুদ্ধ লোক হাঁফাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—"না, এ আর চলে না, ক' বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।" তথাস্তু। পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যখন সাহেবদের মধ্যে আণ্ড্রু ফ্রেসারের মাথাটাই সব চেয়ে বড়, তখন তাঁহারই মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা আগে করা দরকার। কিন্তু লাট সাহেবের মাথার নাগাল পাওয়া ত সোজা কথা নয়। চন্দননগর ষ্টেসনের কাছাকাছি একবার লাট সাহেবের ট্রেন উড়াইবার জন্য গোটা কয়েক ডিনামাইট কার্ট্রিজ রেলের উপর বাঁধিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু উড়া ত দূরের কথা—ট্রেনখানা একটু হেলিলও না। শুধু কার্ট্রিজ ফাটার গোটা দুই ফট্ ফট্ আওয়াজ শূন্যে মিশাইয়া গেল, লাট সাহেবের একটু ঘুমের ব্যাঘাত পর্য্যন্ত হইল না। দিন কতক পরে শোনা গেল যে লাট সাহেব রাঁচি না কোথা হইতে কলিকাতায় স্পেসাল ট্রেনে ফিরিতেছেন। মেদিনীপুরে গিয়া নারায়ণগড় ষ্টেসনের কাছে ঘাঁটি আগলান হইল। বোমা বিদ্যায় যিনি পণ্ডিত তিনি পরামর্শ দিলেন যে রেলের জোড়ের মুখের নীচে মাটির মধ্যে যেন বোমাটা পুঁতিয়া রাখা হয়, তাহার পর সময় মত তাহাতে "স্লো ফিউজ" লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া দিলেই কর্য্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু লাটসাহেবের এমনি অদৃষ্টের জোর যে বোমা পুঁতিবার দিন আমাদের ওস্তাদজী পড়িলেন জ্বরে, আর যাঁহারা কেল্লা ফতে করিতে ছুটিলেন তাঁহারা একেবারে "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস।" কাজেই বোমাও ফাটিল, রেলও বাঁকিল, কিন্তু গাড়ী উড়িল না। তবে ইঞ্জিন খানা নাকি জখম হইয়াছিল, এবং খড়্গপুরে ষ্টেসন

হইতে আর একটা ইঞ্জিন লইয়া গিয়া লাটসাহেবের স্পেসালকে টানিয়া আনিতে হয়।

এই গাড়ী-ভাঙ্গা পর্ব্ব সাঙ্গ হইবার পর চারিদিকে গুজব রটিয়া গেল যে রুশিয়া হইতে এদেশে নিহিলিষ্টের আমদানী হইয়াছে। পুলিসের কর্ত্তারা ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। সুতরাং আসামীরও অভাব হইল না। জনকত রেলের কুলিকে ধরিয়া চালান করা হইল; তাহারা নাকি পুলিসের কাছে আপনাদের অপরাধ স্বীকারও করিল। জজ সাহেবের বিচারে তাহাদের কাহারও পাঁচ, কাহারও বা দশ বৎসর দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। পুলিসের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া যখন আজকাল লোককে বিনা বিচারে অন্তরীণে রাখা হয়, আর লাটসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী পেয়াদা পর্য্যন্ত পুলিসকে নিভু্র্ল প্রতিপন্ন করিবার জন্য একেবারে পঞ্চমুখে বক্তৃতা জুড়িয়া দেন, তখন ঐ নারায়ণগড়ের ব্যাপার মনে করিয়া আমাদের হাসিও পায়, কান্নাও আসে।

এই সময় পুলিসের ঘোরাঘুরি একটু বাড়িয়াছে দেখিয়া আমাদের মনে হইল যে কিছুদিনের জন্য বাগানে বেশী ছেলে রাখিয়া কাজ নাই। আমরা ৪।৫ জন দেশটা একটু ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাগান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। গয়া হইয়া বাঁকিপুর পৌঁছিবার পর একদল উদাসী সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবী সাধুর সহিত মিশিবার সুবিধা হইয়া গেল।

গুরু নানকের প্রথম পুত্র শ্রীচাঁদ এই সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। ইহাদের মাথায় লম্বা লম্বা জটা; গায়ে ছাই মাখা, কোমরে একটু কম্বলের টুকরা পিতলের শিকল দিয়া আঁটা। গাঁজার কলিকা অষ্ট প্রহর সকলকার হাতে হাতেই ঘুরিতেছে। যাঁহারা ইহাদের দলপতি, তাঁহাদের ১০৮ ছিলিম গাঁজা না খাইলে মুখ দিয়া কথাই বাহির হয় না। তামাকু সেবা ও ইহারা করিয়া থাকেন, তবে তাহাও এমনি প্রচণ্ড যে তাহাতে একটান মারিলেই আমাদের মত পার্থিব জীবের মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। গাঁজা ও তামাকের এই সদ্ব্যবহার দেখিয়াই বোধ হয় গুরুগোবিন্দ সিং শিখদের মধ্যে গাঁজা ও তামাক খাওয়া রহিত করিয়া দিয়া যান।

সাধুদের দলে একটী ১০।১২ বৎসরের আর একটি ১৫।১৬ বৎসরের বাচ্চা সাধু দেখিলাম। আমাদের দেশের সৌখিন ছেলেরা যেমন কামাইয়া গোঁফ তোলে, ইহারাও তেমনি চাঁচর কেশে আটা লাগাইয়া জটা বানায়। সংসারটা

যে মরীচিকা, তা' ইহারা এত অল্প বয়সে কি করিয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল। শেষে জানিলাম যে ইহারা গরীবের ছেলে, সাধু হইলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে বলিয়া ইহাদের মা বাপ ইহাদের সাধুর দলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে।

সাধুরা ভোর বেলা উঠিয়া স্নান করে; অর্থাৎ মাথা ছাড়া আর সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া ফেলে। ১০।১২ দিন অন্তর জটা এলাইয়া এক এক বার মাথা ধুইবার পালা আসে। মেয়েদের খোঁপা বাঁধার চেয়ে ইহাদের জটাবাঁধা আরও জটিল ব্যাপার। পাকের পর পাক রাখিয়া চুলের গুছি দিয়া আঁটিয়া কেমন করিয়া সাজাইলে জটাগুলি বেশ চূড়ার মত মানানসই দেখায়, তাহা ঠিক করা একটা দস্তুর মত ললিত শিল্পকলা। সকালবেলা স্নানের পর ধুনি জালিয়া সকলে গায়ে ছাই মাখিতে লাগিয়া যান, সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্রপাঠও চলে। বেলা আটটা নয়টার সময় 'কড়াপ্রসাদের' বন্দোবস্ত। সত্যপীরের সিন্নি হইতে আরম্ভ করিয়া মা কালীর প্রসাদ পর্য্যন্ত এ বয়সে অনেক রকম প্রসাদই খাইয়াছি। কিন্তু এই কড়াপ্রসাদের তুলনা নাই। এটা আমাদের হালুয়ার পাঞ্জাবী সংস্করণ। অনিত্য-সংসারে এই ভগবৎ 'প্রসাদ'ই যে সার বস্তু তাহা খাইতে না খাইতেই বুঝিতে পারা যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-রসে মনটা ভিজিয়া উদাস হইয়া আসে। মধ্যাহ্নে তোফা মোটা মোটা নরম নরম ঘৃতসিক্ত পঞ্জাবী রুটি ও দাল—এবং রাত্রিকালে ও তদ্বৎ। দেখিতে দেখিতে চেহারাটা বেশ একটু লালাভ হইয়া উঠিল, আর মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল যে মাণিকতলার বাগানে পোড়া খিচুড়ীর মধ্যে আর ফিরিয়া গিয়া কাজ নাই। এই সাধুদের মধ্যেই জটাজুট রাখিয়া বৈরাগ্য-সাধনায় লাগিয়া যাই। কিন্তু কপাল যাহার মন্দ, তাহার এত সুখ সহিবে কেন?

নেপালে 'ধুনি সাহেব' নামে উদাসী সম্প্রদায়ের এক তীর্থস্থান আছে। সাধুরা সেইখানে তীর্থ দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। আমরা স্থির করিলাম তাঁহাদের সহিত রওনা হইব। কিন্তু আমাদের শ্রীঅঙ্গে তখন এক একটা গেরুয়া আলখেল্লা আঁটা, এবং উদাসী সম্প্রদায়ের ঐ গেরুয়াটা সম্বন্ধে বিষম আপত্তি। গেরুয়া-পরা সাধুদের উপর তাঁহাদের বেশ একটু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আছে। তাঁহারা নিজেদের ছাই-মাখা অবধূত-মার্গকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। সে কথাটা আমাদের জানা ছিল না, তাহা হইলে গেরুয়া না পরিয়া খানিকটা

ছাই মাখিয়াই বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু এখন উপায় ? একজন প্রবীন সাধু এই দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করিয়া বলিলেন যে আমরা যদি তাঁহাদের নিকট দীক্ষা লইয়া উদাসীদের সেবকরূপে গণ্য হই, তাহা হইলে গেরুয়ার সঙ্গে একটা রফা করা যাইতে পারে। আমরা ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠে তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলাম। আমাদের দীক্ষা দিবার আয়োজন হইল। একজন সাধু একটা বড় বাটীতে একবাটী চিনি গুলিয়া লইয়া আসিলেন। যিনি মঠাধ্যক্ষ তিনি ঐ বাটীতে আপনার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডুবাইয়া আমাদের তাহা খাইতে দিলেন। আমরা চোঁ চোঁ করিয়া তাহা খাইয়া ফেলিবার পর বৃদ্ধ আমাদের "এক ওঙ্কার সৎনাম কর্ত্তাপুরুষ" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ করাইয়া আমাদের পিঠে এক একটা চড় মারিয়া বলিয়া দিলেন যে আজ হইতে আমরা উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। দীক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায় আমাদের গেরুয়ার দোষ খণ্ডিত হইল। আমরাও ভক্তি, বিস্ময় ও পুলক ভরে আমাদের নূতন গুরুজীর পদধূলি মাথায় লইয়া কড়া-প্রসাদের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম।

তীর্থদর্শনে যাত্রা করিলাম আমরা ৫।৭ জন বাঙ্গালী, আর ঐ ৩০।৩৫ জন পাঞ্জাবী সাধু। কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে নামিবার পর যখন হাঁটাপথ আরম্ভ হইল, তখন বুঝিলাম ব্যাপারটা নিতান্ত সুবিধার নহে। কুশী নদীর ধারে ধারে গভীর জঙ্গল; আর তাহার মাঝ দিয়া ৫।৬ দিন ধরিয়া প্রত্যহ ১৫।১৬ ক্রোশ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আমার পায়ে ত গোদ নামিয়া গেল। কিন্তু সাধুদের ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, কাতরোক্তি নাই। দিনের পর দিন তাহারা রোদ মাথায় করিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়াছে।

"তরাই" অতিক্রম করিয়া ক্রমে নেপালে একটা ছোট শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। জায়গাটার নাম হনুমান নগর। অধিবাসী প্রায় সমস্তই হিন্দুস্থানী, অনেকগুলি মারোয়াড়ীর দোকান ও আছে, কিন্তু রাজকর্ম্মচারী সমস্তই গুর্খা। শহরের রাস্তাঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং বড় রাস্তার ধারে ধারে ফুট-পাথও আছে। নেপালকে ছেলেবেলা হইতে আমার একটু "জঙ্গলী" বলিয়া ধারণা ছিল, আজ সে ধারণা অনেকটা কাটিয়া গেল।

পাড়াগাঁয়ের পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম যে চালাঘর গুলি আমাদের দেশের চালা ঘরের চেয়ে ঢের বেশী সুশ্রী। যে দিকে চাও, যেন সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলিতেছে, কোথাও একটু বিষাদ বা দৈন্যের ছায়ামাত্র নাই। গ্রামবাসীরা সাধুদের বিশেষ ভক্ত। একদিন চলিতে চলিতে জরা[illegible] হইয়া একটা

গ্রামের ধারে মাঠের উপর পড়িয়াছিলাম। আমার সঙ্গীটী গ্রামের মধ্যে জল আনিতে গিয়া তাঁহার প্রকাণ্ড লোটা ভরিয়া দুধ লইয়া আসিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত সাধুকে কি জল দেওয়া যায়! শুনিলাম নেপালে সাধুদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ক্ষুধায় কাতর হইলে সাধুরা যে কোন স্থান হইতে আহার্য্য উঠাইয়া লইতে পারেন। তাহার জন্য তাঁহারা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন না।

'ধুনি সাহেবে' উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—চারিদিকে শুধু শাল বন আর শাল বন। একজন উদাসী সাধু—বাবা প্রীতম্ দাস—বহুকাল পূর্ব্বে এইখানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া তাঁহার ধুনি আজ পর্য্যন্ত সেখানে জ্বলিতেছে, এবং সেই ধুনি হইতেই এইস্থানের নামকরণ হইয়াছে। অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। বাবা প্রীতম্ দাসের দুই শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে আম খাইতে চাহিলে তিনি সিদ্ধির বলে দুটী শাল গাছে আম ফলাইয়া দিয়াছিলেন, আর সেই অবধি সেই দুটি শাল গাছে নাকি এখনও দুই একটা আম ফলে। গঞ্জিকাসিদ্ধি কি সোজা কথা!

তিন দিন সেই সিদ্ধপুরীতে বাস করিয়া আবার নরলোকে ফিরিয়া আসিলাম। বাংলাদেশের মাটী আমাদের নাড়ী ধরিয়া টানিতেছিল। ফিরিবার পথে একখানা কাগজে পড়িলাম যে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটকে কে গুলি করিয়াছে। বুঝিলাম এবার শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে।

বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বারীন সেখানে নাই। সে কংগ্রেস উপলক্ষে সুরাত গিয়াছে। সুরাতে যে সেবার একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবে তা' মেদিনীপুরের কন্‌ফারেন্সে গিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দুই একদিন পরে বারীন ফিরিয়া আসিল। সুরাতে নরম, গরম, অতি গরম সব রকম নেতারাই একত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বারীন যাহা সার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে তাহা সে এক কথায় বলিয়া দিল—"চোর, বেটারা চোর।"

সমস্বরে আমরা সকলেই ধ্বনি করিয়া উঠিলাম—

"কেন? কেন? কেন?"

বারীন বলিল—"এতদিন ন্যাস্তাতেরা পত্রি মোর আসছিলেন, যে তাঁরা সবাই প্রস্তুত, শুধু বাংলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না ঢুঁ। কোথাও কিছু নেই, শুধু কর্ত্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছে। দু' একটা ছেলে একটু আধটা করবার চেষ্টা করছে, তা'ও কর্ত্তাদের লুকিয়ে। খুব কসে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি।"

চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি বর্গীরা একেবারে খাপ খুলিয়া বসিয়া আছেন, আর আজ এই সব ফকিকারের কথা শুনিয়া মনটা বেশ খানিকটা দমিয়া গেল। কিন্তু বারীন বলিল—

"কুছ পরোয়া নেই। ওরা যদি সঙ্গে এল ত এল, আর তা যদি না হয়—"ত একলা চলরে"। আমরা বাঙলা দেশ থেকেই পাঁচ বছরের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে দেব। লেগে যাও সব আজথেকে ছেলে জোগাড় করতে।"

সুতরাং চারিদিক হইতেই একটা হৈ হৈ রৈ রৈ সাড়া পড়িয়া গেল। ক্রমাগতই নূতন নূতন ছেলে আসিয়া জুটিতে লাগিল, কিন্তু আমাদের পিছে যে পুলিস লাগিয়াছে এ সন্দেহ করিবারও নানা কারণ ঘটিল। ছেলেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিবার চেষ্টাও হইল, কিন্তু অত গুলা বাড়ী ভাড়া কবিবার পয়সা কোথায়? ছেলেদের খাইবার পয়সা জোটাই যে মুস্কিল। শেষে বৈদ্য-নাথের কাছে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া সেই খানেই বোমার আড্ডা উঠাইয়া লইয়া যাওয়া স্থির হইল। বাগানটা প্রধানতঃ নূতন ছেলেদের পড়াশুনা করিবার আড্ডা হইয়া রহিল। বোমার আড্ডায় উল্লাসকর আড্ডাধারী হইয়া বসিল, আমি ষষ্ঠী বুড়ী হইয়া বাগানে ছেলেদের আগলাইতে লাগিলাম। বারীন চিরদিনই কর্ম্মী পুরুষ, তাহাকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিবার হুকুম বিধাতা দেন নাই। সে সমস্ত কর্ম্মের কেন্দ্রগুলি তদারক করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

বাহিরে কাজকর্ম্ম তুমুল বেগে চলিতে লাগিল, কিন্তু এই সময় হইতে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শক্তির অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। এই যে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়া চলিয়াছি, ইহার শেষ কোথায়? এই যে এতগুলা ছেলেকে ক্রমশঃ মরণের মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছি, মরণের ভয়টা কি আমাদের নিজেদের মন হইতে সত্যসত্যই মুছিয়া গিয়াছে? আর তা'ও যদি হয়, ত দিনের পর দিন অন্ধের মত ছেলে গুলোকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইব? পথ যে নিজেদের চোখেই ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে! বারীনের মনে এ সময় কি হইত ঠিক জানিনা। কোন দুঃসাহসের কার্য্যে তাহাকে এ পর্য্যন্ত কখনও ভয়ে পিছাইতে দেখি নাই। তবে সেও যেন মাঝে মাঝে নিজের ভিতর ঢুকিয়া শক্তি সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত বলিয়া মনে হয়। একটা কিছুর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে

পারিলে আমাদের কাঁধের বোঝাটা যেন একটু হাল্কা হইয়া যাইত। এই জন্যই বোধ হয় যে সাধুটীর নিকট গুজরাতে সে দীক্ষা লয় তাঁহাকে এই সময় একবার বাংলাদেশে আসিবার জন্য সে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখে।

১৯০৮সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধুটী মানিকতলার বাগানে আসিয়া উপস্থিত হন। দুই চারি দিন আমাদের সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া তিনি বলিলেন –"তোমরা যে পন্থা ধরিয়াছ, তাহা ঠিক নহে। অশুদ্ধ মন লইয়া এ কাজে লাগিলে খানিকটা অনর্থক খুনোখুনির সম্ভাবনা। এ অবস্থায় যাহারা দেশের নেতৃত্ব করিতে চায় তাহাদের অন্ধের মত কাজ করা চলিবে না। ভবিষ্যতের পরদা যাঁহাদের চোখের কাছ থেকে কতকটা সরিয়া গিয়াছে, ভগবানের নিকট হইতে যাঁহারা প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তাঁহারাই এ কাজের যথার্থ অধিকারী। তোমাদের মধ্যে জন কয়েককে এই প্রত্যাদেশ পাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে।"

সাধনার ফরমাইস শুনিয়া ছেলেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। প্রত্যাদেশ না অশ্বডিম্ব। ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিব, তাহার মধ্যে আবার ভগবানকে লইয়া এত টানাটানি কেন?

সাধু বলিলেন—"সকলের জন্য এ সাধনা নয়, শুধু নেতাদের জন্য। যাহারা দেশের লোককে পথ দেখাইবে, তাহাদের নিজেদের পথটা জানা চাই। দেশ স্বাধীন করিতে হইলেই যে খুব খানিকটা রক্তারক্তি দরকার,—এ কথাটা সত্য না ও হইতে পারে।"

বিনা রক্তপাতে যে দেশোদ্ধার হইবে এ কথাটা আমাদের নিতান্ত আরব্য উপন্যাসের মত মনে হইল। আমরা একটু বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা ও কি সম্ভব?"

সাধু বলিলেন—"দেখ, বাবা, যে কথা আমি বলিতেছি, তাহা জানি বলিয়াই বলিতেছি। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু যে উপায়ে হইবে ভাবিতেছ, সে উপায়ে নয়। আমার বিশ বৎসরের সাধনার ফলে আমি ইহাই জানিয়াছি। চারিদিকের অবস্থা এক সময় এমনি হইয়া দাঁড়াইবে, যে সমস্ত রাজ্যভার তোমাদের হাতে আপনিই আসিয়া পড়িবে। তোমাদের শুধু শাসন-ব্যবস্থা প্রণালী গড়িয়া লইতে হইবে মাত্র। আমার সঙ্গে তোমরা জন কতক এস, সাধনার প্রত্যক্ষ ফল যদি কিছু না পাও, ত ফিরিয়া আসিও।"

সে দিন সাধু চলিয়া যাইবার পর আমাদের মধ্যে বিষম তর্কাতর্কি বাধিয়া গেল। বারীন ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"কিছুতেই নয়। কাজ আমি ছাড়বো না। বিনা রক্তপাতে ভারত উদ্ধার, এটা ওঁর খেয়াল। সাধুর আর সব কথা মানি, শুধু ঐটে ছাড়া।"

আমার মনটা কিন্তু সাধুর কথায় বেশ একটু ভিজিয়াছিল ; দেখাই যাক না, রাস্তাটা যদি কোন রকমে একটু পরিষ্কার হয়। নিজের সঙ্গে বেশ একটা বোঝা পড়া না হইলে কোন কাজেই যে মন যায় না।

আমি আর দুই একটী ছেলেকে লইয়া সাধুর সঙ্গে যাইব বলিয়া স্থির করিলাম। সাধু আর একদিন বারীনকে বুঝাইতে আসিলেন, কিন্তু পরের উপদেশ লইবার সু-অভ্যাস বারীনের একেবারেই নাই। কোন রকমে বারীনকে বাগাইতে না পারিয়া শেষে সাধু বলিলেন—"দেখ, এ রাস্তা যদি না ছাড়, ত তোমাদের অল্পদিনের মধ্যে ভীষণ বিপদ অনিবার্য্য।"

বারীন দুই হাত নাড়িয়া বলিল—"না হয় ধরে ঝুলিয়ে দেবে—এই বৈ ত নয়! তার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি।"

সাধু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"যা ঘটবে, তা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ।"

সে দিনের সভা ঐ খানেই ভঙ্গ হইল। সাধু ফিরিয়া যাইবার দিন স্থির করিলেন, কিন্তু সে দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, আমার পাও যেন ততই বাগান ছাড়িয়া উঠিতে চাহিল না। অনেক আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ এই বাগানের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে, আজ সেই গড়া জিনিস ছাড়িয়া কোন্ অজানা দেশে আপনার লক্ষ্য খুঁজিতে বাহির হইব? নির্দ্দিষ্ট দিনে সাধুর সহিত আর আমাদের যাওয়া হইল না। মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি একাই ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বঁধুয়া।

(শ্রীসুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

১

কাঙাল হইয়া ফিরি পথে পথে
মাগি তব দরশন।
কি জানি কখন্ হ'বে সুলগনে
ধন্য পরাণ-মন।
হৃদয় সতত রয়েছে জাগিয়া
শত কর্ম্মের মাঝে,
কর্ণকুহরে রহি রহি যেন
মধুর মুরলী বাজে!
কার রূপখানি হেরিতে নিয়ত
তৃষিত আকুল আঁখি।
বরণ করিয়া এ হিয়ার মাঝে
যতনে সাজায়ে রাখি!

২

তরুণ প্রভাতে নব আয়োজনে
ভরেছি পূজার থালা,
ভকতি-সূত্রে রেখেছি গাঁথিয়া
কত বন-ফুল মালা,
চন্দন-বাস মরিছে গুমরি,—
না হেরি অঙ্গখানি,
পূজার বিভব সার্থক হ'বে
কবে গৌরব মানি?
নমি বার বার পরম পুলকে
পরম দেবতা লাগি,
নবীন কিরণে অনুরাগ ভরে
রয়েছি নীরবে জাগি।

৩

বিছায়ে রেখেছি কমল-আসন
এ ধূলি-ধরণী-তলে,—
ধৌত করিব রাজীব চরণ
নয়ন—অশ্রু জলে।
যা দিয়েছে তাই সাজায়ে যতনে
রেখেছি পাত্র ভরি;
দুয়ারে বঁধুয়া আসিবে কখন্
অতিথির বেশ ধরি?
উপবাস মোর হবে গো সফল
আবাসে সে আসি যবে,
ভকত পরাণ—তৃপ্তির লাগি
দু'টী ফল মেগে লবে।

৪

দিবা অবসানে তৃষিত পরাণে
ব্যাকুল নয়ন জলে,
গোধূলি লগনে গাঁথি বরমালা
পরাবো বঁধুয়া-গলে।
বাজিবে শঙ্খ বঁধূ নাম ধরি,
প্রেমের আরতি-শেষে
রজনী-বাসরে রবো চির বাঁধা
বঁধুয়ারি পাদদেশে।
রুদ্ধ করিব হৃদয়-দুয়ার
হৃদয়ে রাখিয়া তাঁরে;
দেখিব বঁধুয়া তেয়াগি আমারে
কেমনে যাইতে পারে!

———•———

শরৎ-সাহিত্যে মাতৃভাব

(শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি,এ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(নিষ্কৃতি)

৪। সিদ্ধেশ্বরী ও শৈলজা

'নিষ্কৃতি' গল্পে শরৎচন্দ্র 'সিদ্ধেশ্বরী' ও 'শৈলজা' দুইটী মাতৃ-চরিত্র আঁকিয়াছেন, এবং দুইটীতে কিছু পার্থক্যও আছে।

সিদ্ধেশ্বরীর হৃদয় বাৎসল্য রসে কানায় কানায় ভরা, রাগ নাই, রোষ নাই। 'এ সংসারে তিনি ছেলে মানুষ করা ছাড়া সহজে কোন বিষয়েই কথা কহিতে চাহিতেন না।' তিনি, মেজবৌ ও সেজবৌ উভয়ের ছেলেকেই সমান চোখে দেখিতেন। তাই, মেজবৌ নয়নতারার পুত্র অতুল যেদিন সিদ্ধেশ্বরীর পুত্র হরিচরণকে 'ভ্যাঙালে' সেদিন 'ছোট খুড়ীমা' শৈলজার বুকে আঘাত লাগিল, কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী নিজে তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। 'কোন ছেলের কোন দুঃখ সহিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না', তাই অতুল যত দোষীই হউক, সব ছেলে যখন অতুলের সঙ্গে কথা বন্ধ করিল, তখন অতুলের দুঃখে সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহময় হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। আবার ছোটবৌ যেদিন ... গেল, সেদিন, শূন্য বিছানা দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বুক ফাটিয়া গেল, যে বিছানায় কানাই, খুদে, পটল, বিপিন, খেঁদি জায়গা জোড়া করিয়া থাকিত, সে বিছানা আজ খালি। সারারাত্রি চোখের জলে তাঁহার মাথার বালিস ভিজিয়া গেল। তাঁহার বদ্ধসংস্কার ছিল যে নিজে উপস্থিত না থাকিলেই ছেলেরা তাঁহাকে ফাকি দিয়া কম খায়। আজ পটল তাঁহার কাছে নাই—তাহার রাত্রি আড়াই প্রহরে ক্ষুধাপায়—আজ হয়ত তাহাকে উঠাইয়া খাওয়ান হয় নাই, আজ হয়ত তাহার পেটভরে নাই—সিদ্ধেশ্বরী সারা রাত্রি তাহাই ভাবিতে লাগিল। তা ছাড়া, সিদ্ধেশ্বরী যখনই যে ছেলেটার পানে চাহিতেন, তখনই দেখিতেন সে রোগা হইতেছে: এই সিদ্ধেশ্বরীর বাৎসল্য কত গভীর তাহা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত শরৎচন্দ্র সিদ্ধেশ্বরীর বুদ্ধিহীন যুক্তি ও তর্কে এমন ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা অন্য প্রকারে শত চেষ্টাতেও বুঝান যাইত না। ছোটবৌ ছেলে-

...'লইয়া চলিয়া গেলে সিদ্ধেশ্বরী তাঁহার স্বামীকে বলিতেছেন, "আচ্ছা, মানলুম যে পটলকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কানাইত তার পেটের ছেলে নয়।" সুতরাং তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কানাইকে যখন শৈল জোর করিয়া লইয়া গেছে, তখন নালিশ করিলে কোন ফল হইবে কিনা। এবং আরও ভাবিতে লাগিলেন—পটল তাঁহাকে ছাড়া থাকিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া হয়ত তাহার অসুখ হইতে পারে, একথা শুনিয়াও কি হাকিম রায় দেবেন না যে, সে তার জেঠাইমার কাছেই থাকুক। এই রকমে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, "কাল যদি মেজঠাকুরপোকে দিয়ে উকিলের চিঠি দিই, কি হয় তাহ'লে"—স্নেহময়ী সিদ্ধেশ্বরী যেন স্নেহে পাগল হইয়াছেন। তিনি যে শুধু ছেলেগুলিকেই ভাল বাসিতেন, তাহা নহে; ছোটবৌ শৈলকেও তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ছোটবৌ যখন সিদ্ধেশ্বরীর সহিত কথা কহিত না, তখন সিদ্ধেশ্বরী মুখে অভিমান ও রাগের কথা বলিলেও, বুকের ভিতরটায় দুঃখে গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে ছিলেন—একবার শৈল তাঁহার সহিত কথা কহিলে তিনি যেন বাঁচেন, কারণ তিনিই 'দশ বছরের মেয়েটাকে বুক দিয়া মানুষ করিয়া আজ এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। মেজবৌ নয়নতারার অনবরত 'লাগানি'র খোঁচায় সিদ্ধেশ্বরীর বাহিরটা একটু শক্তমত দেখাইলেও তাঁহার ভিতরটা পূর্ব্বের মতই নরম ছিল; এবং শৈলর উপর কোন দিনই তিনি বিশ্বাস হারান নাই।

বড়কর্ত্তা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার দিন মেজবৌ যখন বলিল, "ওখানে কিছু খেতে মানা ক'রে দিও" তখন সিদ্ধেশ্বরী তাহার মুখের মত জবাব দিয়া বলিলেন, "সে তুমি পার মেজবৌ, শৈলর গলা কেটে ফেললেও সে পারবে না।"

শরৎচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্র সুন্দর ভাবে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে, 'ছেলে মানুষ করা ভিন্ন সংসারের সমস্ত ব্যাপারেই অনভিজ্ঞ, এমন সরল মাতৃচিত্র আমাদের গল্পসাহিত্যে আর নাই।

শৈলজাও স্নেহময়ী, কিন্তু তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণা। তিনি আদর দিয়া ছেলেদের মাথা খাইতেন না। যাহা করা উচিত নয় ভাবিতেন, তাহা কিছুতেই করিতে দিতেন না;—তাই অতুল জুতাপায়ে রান্নাঘরে আসিলে এত ধমকাইয়াছিলেন। কৌলজা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং সিদ্ধেশ্বরী বলিতেন, শৈল আমার পুরুষ মানুষ হ'লে ... এদিন জজ হতো" কর্ত্তব্যপালনে ... শৈলর

বাহিরটা একটু কঠোর ঠেকিলেও তাহার স্নেহের এমন একটু ইহার শক্তি ছিল, যাহার জন্ত 'এ বাড়ীর মণি থেকে পটল পর্য্যন্ত সবাই ঐ শৈলর বশে।' এবং ছেলেরাও শৈলকে যথেষ্ট ভালবাসিত, — চিঠি লেখানির কথাপ্রসঙ্গে যেদিন সিদ্ধেশ্বরী অভিমানে ও রাগে বলিয়া উঠিলেন,—"তোর ছোট খুড়ী কি মরেছে?" তখন সিদ্ধেশ্বরীর কন্যা নীলা বলিয়া উঠিল,—"কেন তুমি আজ সংক্রান্তির দিনটায় আমাদের খুড়িমাকে মারিয়ে দিচ্চ মা।" খুড়িমার প্রতি এমনি তাহাদের অন্তরের টান। বস্তুতঃই শৈলজা ছেলেদের "ছোট খুড়ী" নয় "ছোট খুড়ী মা"ই ছিলেন।

৫। গঙ্গামণি (মামলার ফল)

"মামলার ফল" গল্পে শরৎচন্দ্র মাতৃহীন দুষ্ট ছেলে গয়ারামের প্রতি তাহার জেঠাইমা গঙ্গামণির মাতৃস্নেহ দেখাইছেন। শরৎচন্দ্র এই গল্পের মাতৃচিত্রটী একটু নূতন রকমে আঁকিয়াছেন। যে গঙ্গামণি গয়ারামকে ছেলের মত ভাল বাসেন, সেই গঙ্গামণি কিরূপে দারোগার সম্মুখে গয়ার মারা স্বীকার করিলেন, এবং নালিশে মত দিলেন, ইহা প্রথমতঃ অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে মানুষকে কত প্রকার বিরুদ্ধ অবস্থাচক্রে কত—বিরোধী মনোভাব লইয়া কাজ করিতে হয়। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের সুনিপুণ তুলিকার গুণে গঙ্গামণির চরিত্র দুর্ব্বোধ বা অস্বাভাবিক হয় নাই।

কিন্তু উল্লিখিত গল্পকয়টী ছাড়া, শরৎবাবুর কয়েকখানি উপন্যাসেও আমরা মাতৃচিত্র পাই—যথা 'পল্লীসমাজে' বিশ্বেশ্বরী 'অরক্ষণীয়াতে' ভামিনী এবং 'শ্রীকান্তে' রাজলক্ষ্মী।

(১) ভামিনী, 'পোড়াকাঠ' (অরক্ষণীয়া)

এগারো বৎসরের পর যেদিন দুর্গামণি তাঁহার অরক্ষণীয়া কন্যা জ্ঞানদার হাত ধরিয়া তাঁহার দাদা শম্ভু চাটুয্যের বাড়ী আসিলেন, সেদিন, পোড়া কাঠের মত রং ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট বৌ ভামিনীকে দেখিয়া এবং তাহার হাসি ও কথার শ্রী দেখিয়া দুর্গার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই পোড়া কাঠের বাহ্যাকৃতি দেখিয়া তাহাকে প্রেত লোকের অধিবাসিনী বলিয়া মনে হইলেও, তাহার ভিতরে স্নেহ ও সহানুভূতির বন্যধারা ছিল। গেনির জন্য ছড়া পাঁচন সিদ্ধ করিয়া আনিয়া যেদিন ভামিনী কহিলেন, "ওলো গেনি পাঁচন খা, ভাতে জল দিয়ে রেখেছি, চল, খাবি আয়' এবং গেনি পাঁচন বমি করিয়া ফেলায় যখন বলিলেন, "এসব বাবু-মেয়ে নিয়ে আমাদের গরীব

...লইয়া চলি...

দুঃখ... কেন বাবু?"—সেদিন এবং তখন আমরা বুঝতে পারি না যে, এই ... গুলোর ভিতরে 'পোড়াকাঠে'র কতটা স্নেহ ভালবাসা মিশান আছে। পোড়াকাঠের হৃদয়ের সহানুভূতি ও স্নেহের প্রকৃত পরিচয় আমরা সেই দিন পাই যেদিন শম্ভু, ...মিনীর ভাইয়ের সঙ্গে গেনির বিবাহের কথা উত্থাপন করে। শম্ভু, ভগ্নীর কন্যাদায় উদ্ধার করিবার জন্য যেদিন তাহার 'দোজবেরে' 'বদমাইস' শ্যালক নবীনের সঙ্গে গেনির বিবাহ দিবার জন্য দুর্গাকে ধরিয়া বসিলেন, সেইদিন ভামিনী চীৎকার ক...' বলিয়া উঠিলেন, "মামা, মামাশ্বি ফলাতে এসেছেন। নবীনের সঙ্গে বিয়ে দেব! ...গাড়ি গাঁজা খেয়ে পাচ ছেলের মা বৌটাকে আটমাস পেটের উপর লাথি মেরে মে... ফললে কিনা, তাই এমন সুপাত্তর আর নেই! গলায় দেবার দড়ি জোটে না ...মার ... ধিক্ ধিক্।" এই দিন আমরা দেখিতে পাই 'পোড়াকাঠে'র হৃদয় বে...ন। নবীন তাহার নিজের ভাই বটে, কিন্তু ভামিনী তাঁহার সেই গুণধর ভাইয়ে... গুণপনা জানিয়া শুনিয়া কোন্ প্রাণে তাহারই হাতে তাঁহার স্নেহের ভাগিনেয়ীকে তুলিয়া দিবেন? কেমন করিয়া 'অমন সোনার প্রতিমা বাঁদরের হাতে' দিবেন? ভামিনী দেবীর হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহের আরও পরিচয় পাই সেই দিন, যেদিন শুনি যে, গেনির অসুখের সময় তিনি তাঁহার সম্বলের মধ্যে সম্বল, রূপার গোট গাছটী বাঁধা দিয়া গেনির জন্য ডাক্তার আনাইয়া ছিলেন। এই কথা শুনিয়া দুর্গামণির চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িয়াছিল, এবং এই নিঃস্ব মামীটীর ভাগিনেয়ীর প্রতি এই অকৃত্রিম অপরিসীম স্নেহ দেখিয়া আমরাও চোখের জল সংবরণ করিতে পারি না। প্রথম দর্শনে ভামিনীর সম্বন্ধে দুর্গামণির যে ভাব মনে জাগিয়াছিল, আজ তাহা মনে হওয়ায় দুর্গামণি লজ্জায় মরিয়া গেলেন, তাই যাইবার দিন চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "না বুঝে অনেক অপরাধ তোমার চরণে ক'রে গেলাম, বৌ, —সে সব আমার মাপ ক'রো।"

(২) বিশ্বেশ্বরী (পল্লীসমাজ)

'পল্লীসমাজের' বিশ্বেশ্বরীর চিত্রে আমরা আর এক অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাই। বিশ্বেশ্বরী স্নেহময়ী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, বুদ্ধিমতী এবং পুণ্যবতী, কিন্তু তি... স্বার্থান্ধ নহেন। তিনি তাঁহার একমাত্র সন্তান বেণীকে ভাল বাসিতেন এ কথা বলা বাহুল্য—কিন্তু তিনি বেণীর জ্ঞাতি শত্রু 'রমেশকে'ও ভাল বা...তেন এবং 'রমা'কেও তিনি মেয়ের মত ভাল বাসিতেন। রমেশ ও রমা... তাঁহাকে

সাধনা—সে জন্য তাহাকে ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হইতে হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিজ হাতে হাল চাষ করিতেছেন না বলিয়া জমির ফল হইতে ইহাদিগকে শূদ্র বঞ্চিত করিতে পারে না, করিলে তাহাকে আত্মঘাতী হইতে হইবে।

অথবা অন্য দিক দিয়া, সমষ্টির দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা বলিব, জমি কাহারও নয়, জমি হইতেছে সকলের—ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যের ও শূদ্রের, কারণ সকলেই সমাজের এক একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ, প্রত্যেকেই অপর সকলকে আপন সামর্থ্যানুযায়ী যাহা দিবার দিতেছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে ঋণী। সকলেই হয়ত খাইবার পরিবার জিনিষ যোগাইতেছে না বা দিতেছে না, কিন্তু সকলেই দিতেছে যোগাইতেছে এমন জিনিষ যাহার বিনিময়ে তাহার প্রাপ্য খাইবার পরিবার জিনিষ। তবে এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে, জমি সকলের হইলেও ইহা গচ্ছিত আছে শূদ্রের হাতে, শূদ্রের কাজ (বৈশ্যের সহায়ে) এই গচ্ছিত ধনকে ফলাইয়া বাড়াইয়া তোলা। কিন্তু মোট আদায় বা লাভ যাহা হইবে তাহা ব্রাহ্মণ হউক ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক আর শূদ্রই হউক সকল বর্ণের মধ্যে একটা ন্যায্য পরিমাণে ভাগ বাটরা করিয়া দিতে হইবে। এখন দুটি প্রশ্ন এখানে উঠিবে। ভাগবাটরার ন্যায্য পরিমাণটা কি, তার মানদণ্ডটি কোথায়? আর কে এই ভাগবাটরা করিবে?

ভাগবাটরার পরিমাণ নির্ভর করিবে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রয়োজনের উপর অর্থাৎ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানটি বজায় রাখিতে ও আপন আপন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যাহা দরকার তাহার উপর। পরিমাণের একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট অনুপাত (fixed scale) থাকিতে পারে, যেমন আমাদের দেশে প্রাচীন ব্যবস্থায় রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পাইতেন ষষ্ঠভাগ অথবা সে অনুপাতকে অবস্থা অনুসারে বাড়ান কমান যাইতে পারে (sliding scale) যেমন কতকটা বর্ত্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবাটরার পরিমাণ অনুপাত ঠিক করিতে হইবে সকলে মিলিয়া, চারিবর্ণের প্রতিনিধি লইয়া,—তবে এ কাজ বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কর্ম্মেরই (function) ইহা অন্তর্ভুক্ত। বৈশ্য ও শূদ্র প্রয়োজনীয় তথ্য সব যোগাইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার উদার জ্ঞানে সত্য মীমাংসা ও ব্যবস্থা দিবেন আর ক্ষত্রিয় তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন, এই হিসাবে আমরা বলিতে পারি ব্রাহ্মণ হইতেছেন সমাজের legislative power আর ক্ষত্রিয় হইতেছেন

তার executive power. সকলে মিলিয়া অর্থাৎ এই ডেমোক্রাটিক উপায় ছাড়া, সমস্ত কার্য্যটির ভার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে কর্ম্মের অনুযায়ী বলিয়া—শুধু ক্ষত্রিয়েরই উপরেই ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রয়োজনের কথা আমরা বলিয়াছি; ইহা লইয়া অবশ্য মতভেদ ঝগড়াঝাঁটি, এমন কি লাঠালাঠি পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রয়োজনটি বড় করিয়া দেখিবেন, ঝোলের মাছ কোলের দিকে টানিয়া লইবেন, ইহাও স্বাভাবিক স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের দেশে communal representation লইয়া যে মারামারি চলিতেছে, তাহা দেখিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন তাঁহারা সংখ্যায় কম, সুতরাং তাঁহাদের প্রয়োজন বেশী, অতএব তাঁহাদের দাবিও বেশী, ব্রাহ্মণেতর জাতি সংখ্যাধিক্যের দোহাই দিয়া সেই একই সুতরাং ও অতএব প্রমাণ করিতেছেন। জমিদার শ্রেণী, বণিক শ্রেণী সকলেই একটা না একটা প্রয়োজনের হিসাব দেখাইয়া নিজের দাবি করিতেছেন। সেই রকম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিলেও তাহাদের মধ্যে রেষারেষির অভাব যে হইবে তাহা বলি কিসের জোরে? ক্ষত্রিয়ের উপর ভার দিলে, সে হয়ত জোর জবরদস্তি করিয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারে—আজ কাল রাষ্ট্র যাহা করিতেছেন? কিন্তু জোর জবরদস্তির ব্যবস্থা খাঁটি ব্যবস্থা নয়, তাহাতে সংঘর্ষের বীজ থাকিয়াই যায়। সেই জন্যই বলিতেছিলাম এ ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের পদ্ধতিই অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণেই ইহার ব্যবস্থা দিবেন। ব্রাহ্মণ অর্থই হইতেছে যাঁহারা সমাজের শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে ধর্ম্মে সাধনায় যাঁহারা সমাজের চক্ষুঃস্বরূপ। প্লেতো এই জন্যই চাহিয়াছিলেন Rule of the philosophers, আর খৃষ্টীয়ানেরা চাহিয়াছিলেন Reign of the saints, মানুষ ভয় করে অপরের স্বার্থের আক্রমণকে, কিন্তু যেখানে দেখি নিঃস্বার্থপরতা, সেখানে পরম দুর্বৃত্তও সহজেই মস্তক অবনত করে, অন্ততঃ দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য সেই খানেই মন্দের ভাল বিবেচনা করে। তবুও যদি কোন বিশেষ শ্রেণী এমন গৃধ্নু—এমন শক্তিশালী হইয়া উঠে—ভারতে এককালে ব্রাহ্মণই এই রকম হইয়া উঠিয়াছিল—যে কোন মীমাংসার সে ধার ধারিতে চায় না, চলিতে চায় নিজের জোরে, প্রতিষ্ঠা করিতে চায় নিজেরই একচ্ছত্র আধিপত্য, তবে সমাজ জীবিত থাকিলে একটা সমবেত প্রতিক্রিয়ার ফলে সে আধিপত্য চেষ্টা বিফল হইবে,

নতুবা সমাজ যদি পঙ্গু ও মৃতবৎ হইয়া থাকে ত কোন মীমাংসাই নাই, শক্তিমানের মীমাংসাই একমাত্র মীমাংসা। কিন্তু এটা হই'তেছে ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের কথা, আমরা বলিতেছি সুস্থ সমাজের কথা।

শুধু শ্রেণী হিসাবে নয়, ব্যক্তি হিসাবেও সমাজের বিত্তের বা অর্থের ভাগবাটরা থাকা দরকার। সমাজ সাক্ষাৎ ভাবে যদি ব্যক্তির সহিত লেনা দেনা না করিতে পারেন, তবে অন্ততঃ গোষ্ঠী-সঙ্ঘ বা পরিবার (group, guild or family) হিসাবে সে ভাগবাটরা করিয়া দিতে পারেন, গোষ্ঠী না হয় আবার নিজের মধ্যে সুবিধা ও প্রয়োজন মত ব্যক্তিক্রমে বিলি বন্দোবস্ত করিবেন, দিবা দিবেন। যে ব্যক্তি অথবা যে গোষ্ঠী যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যে বর্ণের ধর্ম ও কর্ম্ম পালন করিতেছে সেই শ্রেণীর বা বর্ণের প্রাপ্য অংশ হইতে এবং অংশ পাইবে। ইহাও নির্দ্ধারিত হইবে ব্যক্তির অথবা গোষ্ঠীর প্রয়োজন হিসাবে।

একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় পরস্পর হইতে ছিন্ন একেবারে পৃথক পৃথক স্তর নয়। এই বর্ণ-বিভাগ হইয়াছে মানুষের গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে। ব্রাহ্মণের বংশে বা ব্রাহ্মণের গোষ্ঠীতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম পায় নাই, ব্রাহ্মণের কাজ করিতে পারে না, করিতে চায় না—সে নিজের রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে যে বর্ণের কাজ করিতে চায় ও পারে সেই কাজ চাহিবার ও করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার থাকিবে। ব্রাহ্মণের এক ভাই যদি জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া না থাকে, সে যদি হল চালনা করে তবে তাহাকে শূদ্র বলিয়া গণনা করিতে হইবে আবার শূদ্রের এক ভাই মাটি ছাড়িয়া যদি কোন যাত্রুকের চেষ্টা করিতে চায়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিতে হইবে। অবশ্য, এ রকম কর্ম্ম পরিবর্ত্তনে মানুষের যে কিছু উত্থান বা পতন হইল তাহা নয়। ইহার তুলনা প্রাচীন কালের ব্যবস্থা নয়—প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ যদি ক্ষাত্রধর্ম, বৈশ্য বা শূদ্রের কাজ লইত তবে সেটা তাহার পক্ষে অধঃপতন বলিয়া বিবেচিত হইত আর শূদ্রের আদর্শ ছিল শূদ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিবে। ইহার তুলনা বরং আমাদের আধুনিক সমাজ হইতে দিতে পারি—বিভিন্ন বর্ণে—যে পার্থক্য তাহা হইতেছে বিভিন্ন চাকরী বা পেশার বেতন [illegible]। শুধু, বিভিন্ন চাকরী বা পেশাতে আয়ের যেমন বেশী কম আছে সেই রকম প্রাপ্য হিসাবে বর্ণে বর্ণে পার্থক্য থাকিলেও থাকিতে পারে।

তার পর আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজ আপন সম্পদ

ব্যক্তিকে ব্যষ্টিকে ও গোষ্ঠীকে সমান ভাবে হউক আর একটা বিশেষ অনুপাতে হউক বাঁটিয়া দিবে সত্য, কিন্তু প্রত্যেক ব্যষ্টিকে ও গোষ্ঠীকে দেখিতে হইবে সে যেন এই পাওনার ন্যায্য দাবি করিতে পারে অর্থাৎ তাহার চুপ চাপ বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সে যেন আপন ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া সমাজের শ্রী ও শক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার জন্য পুরস্কারের লোভ দেখান বোধ হয় উচিত হইবে না; যে যত কাজ দেখাইতে পারিবে তাহার প্রাপ্যের মাত্রাও বেশী হইবে, এ রকম বন্দোবস্ত হইলে কাজে ভেজাল প্রতারণা আরম্ভ হইতে বিশেষ দেরি হয় না। সমাজ যদি প্রত্যেককে গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্তি দেয়, তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, তবে মানুষের অন্তর্নিহিত কর্ম্মের প্রেরণা, সাফল্যের আনন্দ, তাহার অন্তরাত্মার সততার উপরই নির্ভর করা চলে না কি? এই সকল সিদ্ধান্ত, এই স্পৃহণীয় আদর্শের পথে আছে দুইটি বিঘ্ন, এক মানুষের আলস্যপরায়ণতা আর তার ঐশ্বর্য্য-লিপ্সা। প্রথম মানুষ বসিয়া বসিয়া খাইতে চায়, দ্বিতীয়ত সে শুধু খাইয়া পরিয়াই সন্তুষ্ট নয়, সে চায় ভাল খাইতে ভাল পরিতে, একটু হাঁক ডাক জাকজমক। দ্বিতীয় বিঘ্নের কথাটাই আমরা আগে বিচার করিব। মানুষের ঐশ্বর্য্যলিপ্সা কতখানিতে পরিতৃপ্ত হয় আর কতখানিতে হয় না তাহার মাপকাঠি আমাদের নাই, কিন্তু এ কথাটি জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে কিছু ভাল খাইতে পরিতে বা খানিকটা হাঁক ডাক জাকজমক করিতে খুব বেশী অর্থের দরকার হয় না। তারপর আমরা দেখি বাস্তবিক যাঁহারা বড়লোক—লক্ষপতি, কোটিপতি—তাঁহারাও সোনা দানা খান না বা হীরাজহরৎ পরিয়া বসিয়া থাকেন না, বেশী দূর নয়, আমেরিকা বা ইউরোপে যাবার দরকার নাই, আমাদের কলিকাতায় বড় বাজারে মাড়োয়ারীদের ঘরবাড়ী একটু দেখিয়া আসিলেই যথেষ্ট হইবে। ফলতঃ অর্থের ব্যবহারকে তত ভয় করিবার নাই, ভয় করিবার আছে অর্থের পুঁটুলি বাঁধাকে। অর্থের জন্য অর্থ-জমান, না খাইয়া না পরিয়া শুধু অর্থ-জমান—এই একটা ব্যাধি মানুষের মধ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু এই ব্যাধি কতখানি মানুষের স্বভাবের দোষ আর কতখানি সমাজ ব্যবস্থার দোষ তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পাছে আমার অভাব হয়, পাছে আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজনের অভাব হয়, এই আশঙ্কা কৃপণতার মূলে কতখানি বিশেষতঃ আজ কালকার দিনের এই সর্ব্ব সাধারণ কৃপণতার মূলে—তাহা মনস্তত্ত্ববিদেরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন।

সমাজের নূতন ব্যবস্থার ফলে ঐ আশঙ্কা যখন থাকিবে না তখন মানুষের কৃপণতা যে অনেকখানি দূরীভূত হইবে আর যতটুকু স্বভাবগত অন্তরাত্মাগত কৃপণতা থাকিয়া যায় তাহাও চারিদিকের হাওয়ার স্পর্শে ও শিক্ষাদীক্ষার আলোকে যে পরিষ্কার হইয়া যাইবে ইহাও আশা করা যায়—অন্ততঃ যে টুকু যেখানে থাকিবে সেটুকু মারাত্মক রকমের হইবে না। তারপর এখন যেমন সমাজে একদিকে উচল ঐশ্বর্য্য আর একদিকে অতল দৈন্য সে রকম বৈষম্যের পরিবর্ত্তে ভাগ বাটরার একটা সাম্য স্থাপিত হইলে, প্রয়োজনের বাড়া ঐশ্বর্য্য কিছু কিছু সকলের স্বভাবতই হইবে একথাও স্বীকার কবা যাইতে পারে। পৃথিবীর মাটির উৎপাদন ক্ষমতা অসীম না হইলেও বিপুল, কাড়াকাড়ি, অন্যায় রকম ভাগাভাগি না হইলে তাহাতেই প্রত্যেকের ঐশ্বর্য্য-লিপ্সা পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, আর মানুষের ঐশ্বর্য্য-লিপ্সারও কি কোনই সীমা নাই, সে লিপ্সা ছাড়া আরও অন্য প্রকার বলবত্তর লিপ্সা মোটেই নাই?

এখন আলস্যের কথা। বলা যাইতে পারে, যে অলস হইয়া থাকিবে সে কিছুই পাইবে না, না খাইয়া মরিবে,সমাজ হইতে বিতাড়িত হইবে। কিন্তু ভিতর হইতে যে সাড়া পায় না, স্বেচ্ছায় যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে গেলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কারণ এ রকম ভাবে খাঁটি কাজ কিছুই পাওয়া যাইতে পাবে না। আমাদের মনে হয় আলস্য জিনিষটা মানুষের স্বভাব নয়, মানুষের স্বভাবই হইতেছে কর্ম্ম করা—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ, তবে যে মানুষ কর্ম্ম করিতে চায় না বা অলস হইয়া পড়ে, তাহার কারণ সে মনের মত কাজ পায় না, ভিতরের প্রেরণা ও আনন্দ অনুসারে কাজ কবিবার সুযোগ ও সুবিধা তাহার নাই, বাহির হইতে কাজের ভার তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। বাহিরের চাপের ফলে, গতানুগতিক ধারায় বেশীর ভাগ মানুষকে সমাজে কাজ করিয়া আসিতে হইয়াছে—আলস্য আর কিছুই নয়, এই জোর জবরদস্তি করিয়া কাজ করিবার প্রতিক্রিয়া মাত্র। সমাজের ব্যবস্থান যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, এমন কি স্বৈরাচারেরও অবকাশ থাকে, তবে আশা করা যায় প্রথম প্রথম আলস্যের ও উচ্ছৃঙ্খলতার কিছু প্রাদুর্ভাব হইলেও অল্প সময়ের মধ্যেই একটা সহজ সাম্যাবস্থা আসিবে, নিজের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুযায়ী কাজ করিতে পারিয়া মানুষ আনন্দের সৃষ্টি সব অকাতরে করিতে থাকিবে আর সমাজেরও তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বর্ত্তমান সমাজের রোগের মূল হইতেছে এই যে প্রত্যেক মানুষকে সাক্ষাৎ ভাবে অন্নের চিন্তা করিতে হইতেছে, প্রত্যেক মানুষের কর্ম্মের আশু উদ্দেশ্য হইয়াছে কি করিয়া অর্থের সংস্থান হয়। মানুষ নিজের ভিতরের দিকে তাকাইতে পারে না, নিজের স্বভাব প্রবৃত্তি তলাইয়া দেখিবার—সুযোগ পায় না, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যেন তেন প্রকারে নিজের গতর বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি প্রবৃত্তি খাটাইয়া লইতে ব্যস্ত, সুবিধামত কোথায় আপনাকে বিক্রী করিয়া দিতে পারে তাহারই খোঁজ করিতেছে। মানুষের ভিতরের দেবতার এই যে দাস বা গণিকা বৃত্তি Prostitution of the soul—ইহারই অন্য নাম বর্ণসঙ্কর। বর্ত্তমান যুগে খাঁটি ব্রাহ্মণ নাই, ক্ষত্রিয়ও নাই—আছে শুধু বৈশ্য ও শূদ্র, অর্থাৎ সেই দুই শ্রেণী যাহাদের মূল লক্ষ্য হইতেছে অর্থের ও অন্নের জোগাড় করা।

বর্ত্তমান সমাজের সমস্যা হইতেছে এই বৈশ্য ও শূদ্রের দ্বন্দ্ব। আমরা শূদ্রের সংজ্ঞা পূর্ব্বে দিয়াছি এই, যাহারা মাটি হইতে কাঁচা মাল ফলায় আর বৈশ্যের সংজ্ঞা দিয়াছি এই যাহারা সেই কাঁচামাল দিয়া নূতন নূতন জিনিষ তৈয়ারী করে ও সে সমস্ত সরবরাহ করে। কিন্তু আধুনিক যুগে কলকারখানার প্রাদুর্ভাবের পরে সমাজের যে নূতন গড়ন হইয়াছে তাহাতে সে সংজ্ঞার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কলকারখানার সৃষ্টির ফলে নূতন একদল শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছে, ইহারা মাটি ছাড়িয়া আসিয়া কলকারখানার মজুর হইয়াছে। আর মাটি লইয়া যাহারা আছে, বাস্তবিক পক্ষে মাটি তাহাদের আর নাই, তাহারা মাটিতে কাজ করে বটে কিন্তু সে মাটির অধিকারী হইতেছে, সে মাটির ফল ভোগ করিতেছে, মাটির সাথে সাক্ষাৎ, শারীর সম্বন্ধ নাই যাহাদের সেই মহাজন ও জমিদার সম্প্রদায়। কলকারখানার মজুরেরাও গতর খাটায় বটে কিন্তু লাভের অংশ পায় কল কারখানার মালিক যাঁহারা—মূলধনী যাঁহারা। আজ কালকার শূদ্র হইতেছে চাষী ও মজুর, আর বৈশ্য হইতেছে মহাজন জমিদার মূলধনী। ফলতঃ আজকাল ধন উৎপন্ন করিতেছে শুধু শূদ্রেরাই, বৈশ্যেরা ধন উৎপন্নও করিতেছে না, যথাযথ সরবরাহ বা ভাগ বাটরার সাহায্যও করিতেছে না, শূদ্রদিগকে খাটাইয়া, উপরচাল দিয়া নিজের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করিতেছে মাত্র। সমাজের ধন বৃদ্ধি করিতেছে না, বসিয়া বসিয়া নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে তাই এই অলস বৈশ্য শ্রেণীর (idle capitalist class) বিরুদ্ধে শূদ্রশ্রেণী (Labour and peasant class) যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

ব্রাহ্মণে ও ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ ইউরোপীয় ইতিহাসে একটা বিপুল ঘটনা—কিন্তু সে যুদ্ধের শেষ হইয়াছে—চর্চ্চের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছে আর state এরও নিজের সে মহিমা নাই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়া এখন বর্ত্তমানে বৈশ্য শূদ্রের যুদ্ধে এক পক্ষের ছায়ায় ছায়ায় চলিয়াছে। ক্ষত্রিয় বা state এখন বৈশ্যের (capitalism) হাত ধরা—তাহার কারণ ও নিদান বিবৃত করিতে হইলে বিষয়টা অনেক দূর গড়ায়, তাই সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। চর্চ্চা অবশ্য নাই, যতটুকু আছে ততটুকুও স্বার্থ রাষ্ট্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির স্বার্থের সহিতই বিজড়িত। তবে নূতন একদল ব্রাহ্মণের উদ্ভব হইয়াছে—যাহাদের হারাইবার মত কোন সম্পত্তি নাই, যাহারা একরকম নিঃস্ব কারণ তাহাদের বৃত্তি অর্থকরী নয়, যেমন কবি, শিল্পী, দার্শনিক, সাহিত্যিক, অধ্যাত্ম সাধক—ইঁহারা একরকম সকলেই শূদ্রের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। শূদ্রের একাধিপত্য হইলে ইঁহাদের যে কিছু সুবিধা হইবে, Bolshevism এর ধরণ ধারণ দেখিয়া ত তাহা মনে হয় না। তবে বর্ত্তমানে উভয়েই নিঃস্ব, উভয়ের একই ব্যবস্থার বলি, তাই বোধ হয় এই সৌহার্দ্দ। সে যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম বর্ণসঙ্করের কথা, সেই কথাটাই আর একটু বলিব।

সমাজে খাঁটি ব্রাহ্মণ নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্রেণী বলিয়া কিছু নাই, কারণ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে অর্থোপার্জ্জনেরই একটা উপায় মাত্র। খাঁটি ক্ষত্রিয়ও সেই হিসাবে সমাজে নাই। এমন কি খাঁটি বৈশ্য ও শূদ্রও নাই আমরা বলিতে পারি, কারণ, কর্ম্ম হিসাবে সমাজে কেবল বৈশ্য ও শূদ্রই থাকিলেও, ধর্ম্ম হিসাবে নাই। বৈশ্য ও শূদ্র বৃত্তি লোকে অবলম্বন করিয়াছে, ভিতরের প্রবৃত্তি অনুসারে নয় কিন্তু বাহিরের তাড়নার চাপে। আর ধর্ম্ম যেখানে নাই, সেখানে কর্ম্ম কর্ম্মের খোলস মাত্র। আজকাল সকলের সকল কর্ম্মের এক উদ্দেশ্য ও এক পরিসমাপ্তি—নিজের নিজের উদরপূর্ত্তি। সমাজের সমষ্টিগত সত্তা বলিয়া যে কিছু আছে তাহা দেখিবার বা মানিবার কাহারও অবসর নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব। যাহাদের স্বার্থ এক রকম তাহারা মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যাহাদের স্বার্থ অন্য রকম তাহাদের সঙ্ঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি বলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বৈশ্যরাই একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে—আজকাল শূদ্রেরা সে আধিপত্য নিজেদের জন্য কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে। সমাজে মানুষের আর সব বৃত্তি প্রবৃত্তি যেন কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে সেখানে চলিয়াছে পশুর লড়াই।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সব একস্তরে নামিয়া আসিয়াছে—বিরাট হট্টগোলের মধ্যে সুবিধা মত পরস্পরে পরস্পরের টুঁটি চাপিয়া ধরিবার চেষ্টায় আছে।

কিন্তু আমরা যে রকম ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি, সমাজে যদি সেই রকম ব্যবস্থা হয়—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি অন্ততঃ জীবনধারণোপযোগী করিয়া মাটির স্বত্ব বা উপস্বত্ব ভাগ বাটরা করিয়া দেওয়া হয় আর প্রত্যেককে যদি চলিতে দেওয়া হয় অন্তরাত্মার প্রেরণা নিজের নিজের ধর্ম্ম অনুসারে, সমাজ যদি ব্যষ্টির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করে ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যষ্টির স্বধর্ম্ম সৃষ্টি সম্পদই কেবল আদায় করে তবে সমাজে সকল গোলমালেরই অবসান হয়। এ রকম সমাজ সম্ভব কি না, তাহা পরের কথা। কিন্তু আদর্শ সম্মুখে রাখিতে কোন দোষ নাই। আর সত্যই কি ইহা শুধু আদর্শ, শুধু স্বপ্ন? সমাজের নানা বিপ্লব নানা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া একটা ফল্গু প্রবাহ এই রকমই একটা 'পরি-সমাপ্তির দিকে ছুটিয়াছে না কি?

ডাক।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল]

রোজ নিশীথের তারকারা
গান গেয়ে সব ডাকে
"তোরা রোস নে মোহ্-পাঁকে।"
শুভ্র অমল কুসুমগুলি
গন্ধে রূপে বলে
"তোরা অনন্তে যা' চলে।"

মর্ম্মরিয়া দোলে শাখী
গাছে:পাখী ডাকে
বলে "জাগা আপনাকে"
কল্লোলিয়া নদী কহে
"গেয়ে যা'রে গান
কর অনন্তে প্রয়াণ!"

বধির হয়ে আছি মোরা
বদ্ধ অবিরাম—
সুপ্ত দিনযাম।
বজ্র তব নামাও বন্ধু
গান তব বাণ
জাগিয়ে তোল প্রাণ ॥

দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব ?

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বোমা প্রভৃতি আপদ্‌গুলার নামও আমরা জানিতাম না, আর, বাহাত্তর সালে কোন্ জন্মে কবে একবার আমাদের এই সোনার ভারতে দুর্ভিক্ষের পদধূলি পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়-বিদারণ আখ্যায়িকা শুনিলে আমাদের মনে হইত—আর এখন আমাদের ভয় নাই, এখন আমরা রামরাজ্যে বাস করিতেছি। যখন, যে দিকে চক্ষু ফিরাইতাম সেই দিকেই দেখিতাম প্রসন্নবদনে লক্ষ্মী হাসিতেছেন—সে এক দিন ছিল। তখন, আমার রঘুবংশের পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে, কুমার-সম্ভবও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ইতিমধ্যে একদিন, মাঘ-ভারবি না জানি কাণ্ডখানা কিরূপ—তাহা পাতা উল্টাইয়া দেখিতে গিয়া দিব্য একটি পাকা চঙের শ্লোক আমার চক্ষে পড়িল। তাহার শেষ চরণটি আজিও আমি ভুলি নাই, সেটা এই :—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ—হিতও যেমন মনোহারিও তেমি, এরূপ বচন দুর্লভ।" ইহার খোলাসা তাৎপর্য্য এই :—অপ্রীতিকর হিতবাক্যও সুলভ, আর, মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যও সুলভ, প্রীতিজনক হিতবাক্যই দুর্লভ। হিতবক্তার তবে তো দেখিতেছি মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়। তোমার শাস্ত্রে কি লেখে ?

॥ ২ ॥ আমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী হইবে কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন করে না—চোখ কাণ বুজিয়া তাহা বলিয়া ফ্যালাই ভাল ; যে শোনে সে শুনিবে, যে না-শোনে না শুনিবে, তুমি তো বলিয়া খালাস্! তুমি যদি জানিতে পারিয়া থাক যে গঙ্গার ঘাটে

কুমীরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, তবে সে কথা সহরময় রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে এটা সত্য যে, জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারো প্রাণে সহে না, তাহা এক কাণ দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্কসদনে প্রবেশ করে—শুদ্ধ কেবল ভদ্রতার অনুগ্রহে ভর করিয়া; কিন্তু প্রবেশ করিয়া যখন দেখে যে, হৃদয়দ্বারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে জায়গা না পাইয়া আর এক কাণ দিয়া সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যের কুহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কৃপাপাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, পরন্তু তাহাদের মধ্যেকার একজনকেও আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, সে কাহারো হিতবাক্য শুনিয়া সংশিক্ষা লাভ করিয়াছে। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে। বলিতেছি বটে "ঠেকিয়া শেখে" কিন্তু ঠেকিয়া শেখা বলে কাহাকে তাঁহা যদি শোনো, তবে তোমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিবে,—ঠেকিয়া শেখার আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানযাত্রী গামছা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছ "জলে নাবিও না—গঙ্গায় কুমীর দেখা দিয়াছে।" পাঁচজন তোমার সে-কথা হাসিয়া উডাইয়া দিয়া এক-কোমর জলে নাবিল, আর-পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক-হাঁটু জলে নাবিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। কোমর-জলের মহাবথীরা চকিতের মধ্যেই জলগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল,—ইহারই নাম ঠেকিয়া শেখা। হাঁটু-জলের অর্দ্ধরথীরা দ্রুতগতি ডাঙ্গায় উঠিল,—ইহারই নাম দেখিয়া শেখা।

॥ ১ ॥ শুনিয়া শিখিলেই তো আপদ চুকিয়া যায়, তাহা হইলে ঠেকিয়া শিখিতেও হয় না, দেখিয়া শিখিতেও হয় না। শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ কেন?

॥ ২ ॥ লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।

॥ ১ ॥ বেস্ যা হো'ক্ তুমি বলিলে! তুমি কি আর জান না যে, কচি বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, যুবা বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, প্রবীণ বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য? সত্য বলিতে কি—তোমার মতো লোকের মুখে "মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়াছে" এরূপ একটা আগা-পাছতলা রহিত বেথাপ কথা শুনিলে আমার কেমন কেমন ঠ্যাকে!

॥ ২ ॥ বলিলাম অ্যাক—শুনিলে আর। আমি বলিলাম "লোকের বয়স", তুমি শুনিলে "মনুষ্যের বয়স"।

॥ ১ ॥ আমি তো জানি মনুষ্য নামাই লোক।

॥ ২ ॥ সে দিন তোমার অষ্টম বর্ষীয় বালকটি যখন তোমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল, যে, "সকালে পড়া মুখস্থ করেছি, বিকালে পড়া মুখস্থ করেছি, আবার এখন রাত্রে পড়া মুখস্থ করিতে বলিতেছ। অতবার করে পড়া মুখস্থ ক'ল্লে **লোকে** পাগল হ'য়ে যায়," এ কথার প্রত্যুত্তরে তুমি যাহা তাহাকে বলিলে তাহা তো আমি **স্বকর্ণে শুনিয়াছি**। তুমি বলিলে "তোর এখনো গোঁপ দাড়ি ওঠে নি—তুই আবার **লোক** হলি কবে? যা' —পড়'গে যা'।" লোক শব্দের এইরূপ বিশদ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা তোমারই মুখে যখন আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তখন আমি কেমন করিয়া জানিব যে, তোমার অভিধানে মনুষ্য নামাই **লোক**—একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালকও **লোক**।

॥ ১ ॥ তুমিতো ঘর সন্ধানী (Detective) মন্দ না। বমাল শুদ্ধ আমাকে পাকড়া করিয়াছ। তোমার সঙ্গে কথা কহা দেখিতেছি বিপদ্। তুমি যদি, সখে, একটা কাজ কর—বড্ড ভাল হয়, আশ পাশের ফ্যাকড়া কথার চুলচেরা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া তুমি যদি আমাকে তোমার পেটের কথাটি পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া-খালিয়া বল, তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত গোল মিটিয়া যায়।

॥ ২ ॥ বলি তবে শোন—এটা তুমি তো জানই যে ঘুম-পাড়ানী মাসী-পিসীরা সেদিনকার ছেলেকে বড় হইয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখিলে আঁচলের কোণ দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলেন "আমি উহাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি।" ঘোড়া পেট থেকে পড়িয়াই ঘোড়া হয়, গোরু পেট থেকে পড়িয়াই গোরু হয়, কিন্তু মানুষের একি বিপরীত কাণ্ড—অন্যে তাহাকে মানুষ না করিলে সে মানুষ হয় না। কচি বয়সে মনুষ্য যখন পিতামাতার নিকট হইতে এক-মেটে শিক্ষা লাভ করে, তখন সে অর্দ্ধ মানুষ হয়; তাহার পরে পাঠদ্দশায় যখন শিক্ষকদিগের নিকট হইতে দোমেটে শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে চরিয়া খাইতে শেখে, তখনই সে পুরা-মানুষ হয়। কচি-বয়সে গৃহ মনুষ্যের জীবন-ক্ষেত্র, এই জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্য পানাহার করিতে শেখে, পায়ে হাঁটিতে শেখে, বসিতে দাঁড়াইতে

শেখে, মাতৃভাষা শেখে, জীবনের যত কিছু মুখ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার প্রণালী সমস্তই অবলীলাক্রমে শেখে। মনুষ্যের এইরূপ কচি বয়সের শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে, কিন্তু, শিক্ষা শব্দের বাচ্য নহে, কেননা এ বয়সে মনুষ্য-সন্তান শিখিব মনে করিয়া কিছুই শেখে না, তাহার মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ভগ্নীরা যাহা তাহাকে গিলাইয়া দ্যায়, তাহাই সে হাসিয়া খেলিয়া গলাধঃকরণ করে। বাচ্ছা-মনুষ্যের শিক্ষা একপ্রকার অযাচিত দান-গ্রহণ। আদিম জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্য ঐরূপ অযাচিত দান গ্রহণের পথ দিয়া জীবন-নির্ব্বাহের নানাবিধ অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার কার্য্যে অশিক্ষিত-পটুতা উপার্জ্জন করে। জীবনক্ষেত্র হইতে মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্রে ভর্ত্তি হয়, তখনই প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহার শিক্ষার গোড়া-পত্তন আরম্ভ হয়। মানস ক্ষেত্র কি? না বিদ্যালয়। বিদ্যালয়কে মানস-ক্ষেত্র বলিতেছি এই জন্য—যেহেতু মনোযোগই এ ক্ষেত্রের প্রধানতম শিক্ষা-প্রণালী। মনুষ্যের পঠদ্দশায় শিক্ষকের বাক্য মন-দিয়া না শুনিলে তাহার বিদ্যা-শিক্ষা অন্য কোনো উপায়ে ঘটিয়া ওঠা সম্ভবে না। পঠদ্দশার বয়সই প্রধানতঃ মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স। মনুষ্যের পঠদ্দশার বয়স অতীত হইলেই সেই সঙ্গে তাহার শুনিয়া-শেখার বয়স অতীত হইয়া যায়। মানস-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের, গুরুর, অধ্যাপক মহাশয়ের ছাত্রেরা মনোযোগের পথ দিয়া বিদ্যাবুদ্ধি উপার্জ্জন করে। বুদ্ধি পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে, মনুষ্য সন্তান, শিক্ষক যাহা বলে তাহাই শুনিয়া শেখে, বুদ্ধি পরিস্ফুট হইবার পরে—বুদ্ধি যাহা বলে তাহাই শুনিয়া চলে। বুদ্ধি-বিকাশের পালা সাঙ্গ হইলে মনুষ্য যখন মানস ক্ষেত্র হইতে কর্ম্ম ক্ষেত্র ভর্ত্তি হয়, অথবা যাহা একই কথা—বিদ্যালয় হইতে লোক-সমাজে ভর্ত্তি হয়, তখনই সে **লোক** হয়। মনুষ্য যত দিন বালক থাকে, ততদিন সে কাহারো নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না, পক্ষান্তরে, বুদ্ধির ফুটন্ত অবস্থায় লোক-সমাজের বাতাস গায়ে লাগিয়া বালক যখন লোক হইয়া ওঠে (ডারবিনের শাস্ত্রানুসারে বানর যখন নর হইয়া ওঠে) তখন গোঁপ দাড়ির প্রাদুর্ভাবে তাহার মুখের চেহারাও যেমন ফিরিয়া যায় পদগৌরবের প্রাদুর্ভাবে তাহার মনের ভাবও তেমি ফিরিয়া যায়, মন তখন বলে—"অন্যের নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিলে আপনার বুদ্ধিকে অপমান করা হয়।" এতগুলা কথা আমার পেটের মধ্যে ছিল, তাই তুমি যখন বলিলে "শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ কেন," আমি তাহার উত্তর দিলাম এই যে,

"লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।"

॥ ১ ॥ তুমি যাহা বলিলে—সবই সত্য, কিন্তু তথাপি ঐবিষয়টির সম্বন্ধে একটা বিষম ধন্দ আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে—সেটা'র একটা মীমাংসা আশু প্রয়োজনীয়, কথাটা এই :—মনুষ্য যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তখন, কচি বয়সে মাতা কিম্বা ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে; পঠদ্দশায় শিক্ষক তাহাকে সদুপদেশ দিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের পরামর্শ শুনিয়া চলিতে ভার বোধ করে, সে ব্যক্তি যদি কুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তবে কে তাহাকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে?

॥ ২ ॥ আমাদের দেশের একটি পুরাতন শাস্ত্রবচন এই যে, "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" ধর্ম্মকে যে রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করে। গৃহক্ষেত্রে পিতামাতা কচি বালকের **জীবনের** নিয়ামক, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরু বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের **মনের** নিয়ামক, কর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধি বিষয়ী লোকের **কর্ম্মের** নিয়ামক, এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এটাও তেমি দেখা চাই যে, কুশিক্ষা যেমন শিক্ষা নামের যোগ্য নহে, কুবুদ্ধি তেমি বুদ্ধি নামের যোগ্য নহে। সুবুদ্ধিই বুদ্ধি, আর, ধর্ম্মবুদ্ধিই সুবুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ। **কর্ম্ম**, করিবার বস্তু, **ধর্ম্ম**, ধরিয়া থাকিবার বস্তু। কর্ম্ম, বুদ্ধির **দাঁড়**; ধর্ম্ম, বুদ্ধির **হাল**। কর্ম্মক্ষেত্রের বিষয়ী লোকেরা যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তখন, তাহারা আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে পারে—কেবল যদি তাহারা ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথায় কর্ণপাত করে, তাহা যদি না করে, তবে আর নিস্তার নাই।

॥ ১ ॥ ধর্ম্ম, বুদ্ধির হাল, তাহা তো বুঝিলাম; কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইবে কোন্ দিক্ বাগে? কূল বাগে অবশ্য। তবেই হইতেছে যে, কূলের ঠিকানা-নির্দ্দেশ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। দাঁড়, তুমি বলিতেছ কর্ম্মকে, হাল বলিতেছ ধর্ম্মকে, ইহা শুনিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম, কূল তুমি বলিতেছ কাহাকে, সেইটিই এখন জিজ্ঞাস্য।

॥ ২ ॥ **কূল**, আমি বলি, **পুরুষার্থ**। পুরুষার্থ, স্বাধীনতা, স্বারাজ্য, মুক্তি, শব্দ বটে চারিটা—কিন্তু বস্তু একই। মনুষ্য-পক্ষী যখন আপন পক্ষে ভর করিয়া উড়িতে শেখে, উড়িতে শিখিয়া আপনি আপনার নেতা হয়;

তখন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ধর্ম্মবুদ্ধি স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে, আর, কুব্জা পাপ-বুদ্ধি ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ-পিঞ্জরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে। এক শ্রেণীর পক্ষী অধিদেবতার আহ্বান শুনিয়া মুক্তির মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সুপথে চলে, আর এক শ্রেণীর পক্ষী উপদেবতার আহ্বান শুনিয়া ক্ষণিক সুখের স্বর্ণপিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিপথে চলে, মনুষ্য যখন মানসক্ষেত্র হইতে বিদ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে স্বপদে ভর দিয়া দাঁড়ায়, তখন সে আপনাকে চালাইবার ভার আপন হস্তে টানিয়া লইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তো আব স্বাধীন হওয়া যায়.না। স্বাধীন হইতে হইলে স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই। যাঁহারা স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সুপথে চলেন তাঁহারা স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করেন, আর যাঁহাবা ক্ষণিক সুখেব স্বর্ণপিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া বিপথে চলেন, তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতার অযোগ্য হইয়া পড়েন। সুপথ-যাত্রীরা প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাধীনতাব যোগ্যতা উপার্জ্জন করেন, কাজেই তাঁহারা অভীষ্ট ফললাভে কৃতকার্য্য হন। বিপথ-যাত্রীরা গাছে না উঠিতেই এক কাঁদির জন্য আগ্রহান্বিত হন, কাজেই অভীষ্ট ফলে বঞ্চিত হন। পুরুষার্থের কূলে পৌঁছিতে হইলে তাহার প্রকৃত উপায় কি—তাহা বলি শোন :—

(১) কূলেব প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া ঠিক পথে হাল বাগাইয়া ধরিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই।

(২) রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা এবং কাজ শিক্ষা করিয়া মাঝ পথের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা চাই।

স্বাধীনতাও যা, স্বারাজ্যও তা, একই, তা'ব সাক্ষী স্বাধীন = স্ব + অধীন অর্থাৎ আপনি আপনার অধীন; স্বরাজ = স্ব + রাজ অর্থাৎ আপনি আপনার রাজা; দুয়ের ভাবার্থ অবিকল সমান। যাঁহারা স্বাধীনতা এবং স্বারাজ্যের কাঙ্গালী, তাঁহাদের দুইটি বিষয় সর্ব্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথম স্মর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের অধীনতা স্বাধীনতার সোপান, সৌরাজ্য (অর্থাৎ মঙ্গলরাজ্য) স্বরাজ্যের সোপান, ধর্ম্মবন্ধন মুক্তির সোপান।

দ্বিতীয় স্মর্ত্তব্য।

স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার বিপরীত পথ, নৈরাজ্য (অর্থাৎ অরাজকতা) স্বারাজ্যের বিপরীত পথ, উচ্ছৃঙ্খলতা মুক্তির বিপরীত পথ।

এই দুইটি বিষয় সর্ব্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য। স্বারাজ্য কিছু আর আমাদের পোষা কুকুর নহে যে, তাহাকে আমরা ডাক দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ অমনি সে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের পদলেহন করিতে থাকিবে। স্বারাজ্য লাভ করিতে হইলে একদিকে চাই ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিয়া স্বারাজ্য-ভোগের যোগ্যতা লাভ করা, আর একদিকে চাই রীতিমত জ্ঞান এবং কাজ শিক্ষা করিয়া বিধিমত প্রকারে অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা। সৌভাগ্যশালী জাপানীরা তাহাই করিয়াছে, আর সেই জন্য— তাহারা যে কার্য্যে হাত দিতেছে, তাহাতেই সোণা ফলিতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা যদি অশ্বর্দাহের উত্তেজনায় অথবা দুষ্ট সম্প্রদায়ের কুমন্ত্রণায় ঐরূপ যোগ্যতা এবং উপযোগ্যতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই ইউরোপীয় ভল্লুকের প্রতি গুলিগোলা চালাইতে আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তাহারা সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের নখের আঁচড়ে এবং দাঁতের কামড়ে ধনে প্রাণে মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জাপানীরা তাহাদের এই নিজ-বুদ্ধি-সম্ভূত নূতন উদ্যমের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে কেমন অপবাক্ষিতচিত্তে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—তাহা তো আর কাহারো দেখিতে বাকি নাই। তাহারা রাগের মাথায় চীন রাজ্যকে ছারখার করিয়া দিতে পারিত—তাহা তাহারা করে নাই, উল্টা আরো তাহারা চীনদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য যত্নের ত্রুটি করিতেছে না। তাহারা কন্‌গ্রেসবীরদিগের ন্যায় আপনা আপনির মধ্যে কামড়াকামড়ি আঁচড়াআঁচড়ি এবং চুসাচুসি করিয়া জাতীয় অধঃপতনের দিব্য একটা জমকালো সোপান গাঁথিয়া তুলিতে পারিত, তাহা তাহারা করে নাই, উল্টা আরো তাহারা প্রভূত ধন ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিয়া, আপনাদের মধ্যে যাহাতে বিবাদ বিসম্বাদের চিহ্নমাত্রও না থাকে, তাহার যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বল্পমাত্রও কালবিলম্ব করে নাই। রুষীয় বন্দীদিগের প্রতি শত্রুচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিত, তাহা না করিয়া বন্ধূচিত যত্নসমাদর এবং সম্মানপ্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ভারবোধ করে নাই। এরূপ জাতির জয় হইবে না তো আর কাহার জয় হইবে? আমাদের দেশের এই যে একটি

পুরাতন বাক্য "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়" ইহা অব্যর্থ বেদবাক্য। ধর্ম্মই যোগ্যতার নিদান, আর ডারুইনের কথা যদি সত্য হয়, তবে যোগ্যতাই জয়ের নিদান। ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ জনসাধারণই স্বারাজ্যলাভের যোগ্যপাত্র। জাপানের অধিবাসীরা ধর্ম্মকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিজয়লক্ষ্মী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আপন হস্তে জাপানের গলে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন "চিরজীবী হও" আশীর্ব্বাদ করিয়া। আমাদের দেশের স্বারাজ্য পন্থীদিগকে আমি তাই জোড়হস্তে বলি—"দেখিয়া শেখো। নচেৎ ঠেকিয়া শিখিতে হইবে।" ঠেকিয়া শেখা যে কিরূপ সর্ব্বনেশে শেখা, তাহা যে জানে সেই জানে। বিপথ-যাত্রী যখন উঠিতে পড়িতে, বসিতে দাঁড়াইতে, ঘা খাইয়া খাইয়া চৈতন্য লাভ করে, তখন সে বিপদে পড়িয়া বলিবার সময় বলে "এ পথে বাপ-মা বলিয়া ডাকিলে কেহ সাড়া দিবার নাই" অথচ চলিবার সময় চলে—কি সর্ব্বনাশ—সেই পথেরই আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ। ফল কথা এই যে, বিপথে চলা যখন যাহার প্রাণের সামিল হইয়া হাড়ে মিশিয়া যায়—নূতন লব্ধ জ্ঞানের নূতন পথে চলা তখন তাহার পক্ষে মৃত্যু তুল্য। একে তো এই দশা—তাহার উপরে যদি আবার বিপথ-যাত্রীর দুর্ব্বুদ্ধি ঘাড়ে চাপে, তবে আর রক্ষা নাই। তখন সে হিতবক্তার মুখপানে খট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া দম্ভ সহকারে বলে—"আমি বিনাশের পথে যাইব—আমার খুসী। তুমি বলিবার কে? আমি তোমার হিতবাক্য শুনিতে চাহি না।" ইহার উত্তরে ভদ্রলোকটি কিষ্ট-আর তাহাকে বলিবে—"খুব তুমি বাহাদুর" বলিয়া আপন মনে ইষ্ট দেবতার নাম জপিতে থাকে।

॥ ১ ॥ সভ্য জাপান সেদিনকার ছেলে বই না—তাহার গলা টিপিলে দুধ বেরোয়! পক্ষান্তরে সুসভ্য ইউরোপের বয়ঃক্রম হইতে চলিল চারি শতাব্দীর বেশী বই কম না। দেখিয়া যদি শিখিতেই হয়, তবে ইউরোপ আমেরিকার খ্যাতনামা মহাত্মাদিগের পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রণালী-পদ্ধতিই আদর্শ-পদবীতে দাঁড় করাইবার উপযুক্ত, তা বই একটা অকালপক্ব কচিছেলে'র কাণ্ডকারখানা দেখিয়া-শিখিবার জিনিসই নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে তো আর বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ইতিহাস-লেখকের অভাব নাই, তাহাদের লিখিত তরো-বেতরো স্বারাজ্যের তরো-বেতরো অভ্যুদয়-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার-বর্জ্জিত নৈরাজ্যের মধ্য হইতেই স্বারাজ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে।*

* নিঃ+রাজ=নীরাজ=রাজ-বর্জ্জিত। নৈরাজ্য=অরাজকতা।

॥ ২ ॥ ফরাসীস্ দেশের অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দীয় নৈরাজ্যের মধ্য হইতে কিরূপ স্বারাজ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা তো আর কাহারো দেখিতে বাকি নাই। সেটা যে একটা সর্ব্বনেশে কালসর্প। তেমন বিষাক্ত কালসর্প কোথাও আর দেখা যায় না। ইংরাজিতে তাহার নাম Revolution, আর দেশীয় ভাষায় তাহার নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। সেই সহস্রশিরা সর্পটাকে সুদূরদর্শী প্রথম নেপোলিয়ন খুব ভালমতেই চিনিতেন, আর চিনিতেন বলিয়া তাহাকে দমন করিবার জন্ম বিহিত বিধানে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু হইলে হইবে কি —ধর্ম্মের নামে নহে পরন্তু গর্ব্বস্ফীত জাতীয়-গৌরবের নামে তিনি তাহার বিষ-দাঁত ভাঙিতে গিয়াছিলেন তাই হিতে বিপরীত হইল। ঐ দুরন্ত কালসর্পটার কোপে পড়িয়া অবধি, তাহার বিষশ্বাসে জ্বলিয়া পুড়িয়া ফরাসীস্ দেশের অধিবাসীরা একদিনের জন্যও সৌরাজ্যসুখ যে কাহাকে বলে তাহা জানিল না। স্বারাজ্যের যোগাড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়া মার্কিনবাই বা কেন (জাপানীদিগের মতো) অত্যল্প কালের মধ্যে অবলীলাক্রমে আশাতীত ফল-লাভ করিল, আর ফরাসীসেরাই বা কেন আজও পর্য্যন্ত তাহাদের হেঁট মস্তক উত্তোলন করিতে পরাভব মানিতেছে? ইহার গোড়ার কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ভূতগত উচ্ছৃঙ্খলতার ভূত হইতে ফল হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মার্কিনদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল ধর্ম্মের উপরে, তাই তাহার ফল হইল নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য লাভ, ফরাসীসদিগের রাজ-নৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল অবিদ্যা দম্ভ মাৎসর্য্য এবং অধর্ম্মের উপরে, তাই তাহার ফল হইল জাতীয় অধঃপতন। পুরাকালের একটি শাস্ত্র বচন শ্রবণ কর:—

"অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ—অধর্ম্ম দ্বারা দুরাত্মাজনের সমস্তই হস্তায়ত্ত হয়," "ততো ভদ্রাণি পশ্যতি—তাহার পরে মঙ্গল দৃশ্য সকল দেখা যায়," "ততঃ সপত্নান্ জয়তি—তাহার পরে শত্রুদিগের উপরে জয় লাভ হয়," "সমূলস্তু বিনশ্যতি—তাহার কপালে কিন্তু লেখা আছে 'সমূলে বিনাশ"'। ধর্ম্মভ্রষ্ট ফরাসীস্ জাতির ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। তার সাক্ষী:—

(১) অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ।

অধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত ফরাসীস্ রাজ্য চক্ষিতের মধ্যে বিপ্লবকর্ত্তাদিগের হস্তায়ত্ত হইল।

(২) ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।

তাহার পরে চারিদিকে মঙ্গলের সুখস্বপ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিল, আর, সেই সুখ-স্বপ্নের আবেশে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আইঅরলণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ-বিদেশের ভ্রাতায় ভ্রাতায় কোলাকুলির ধুম পড়িয়া গেল।

(৩) ততঃ সপত্নান্ জয়তি।

তাহার পরে ভীষণ রক্তারক্তির মধ্য হইতে প্রথম নেপোলিয়ন মাথা তুলিয়া উঠিয়া তোপের ধমকে অর্দ্ধেক ইউরোপ আপনার বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে আনয়ন করিলেন।

(৪) সমূলস্তু বিনশ্যতি।

তাহার পরে ফরাসীস্‌দিগের স্বারাজ্য সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। বিদেশীয় রাজারাজড়ারা একযোট হইয়া তাহাদের চিরাভিলষিত স্বারাজ্যের মস্তকে বজ্রাঘাত করিল।

ফরাসীস দেশীয় ধর্ম্মদ্বেষী আদিম বিপ্লব-কর্ত্তারা যেরূপ একটা বিশাল মহা-যজ্ঞের ফাঁদ ফাঁদিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা দক্ষযজ্ঞেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। সে মহাযজ্ঞে বড় বড় দেবতাদের সবাইকেই বিহিত বিধানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সাম্যদেবীকে (Equalityকে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, মৈত্রী দেবীকে (Fraternityকে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, স্বাধীনতা দেবীকে (Libertyকে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কেবল শিবকে (মঙ্গলকে) এবং সতীকে (সদ্ধর্ম্মকে) অপমানিত করিয়া ঠেলিয়া রাখা হইয়াছিল। কুহকিনী অবিদ্যা-দেবীর ভানুমতী (enlightenment) নামের ভেল্কি বাজিতে দেশবিদেশে সাম্য ভ্রাতৃভাব এবং স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে হইবে—এই ছিল যজ্ঞকর্ত্তাদিগের প্রাণগত সংকল্প। এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপারের প্রস্তাবনা শেষে গড়াইল আসিয়া কোথায়—শুনিবে? ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ শ্রীসমৃদ্ধির সমস্ত আশাভরসা প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে সেণ্টহেলেনায় গোর প্রাপ্ত হইল, তাহার পরে তাহার ছিটা ফোটা যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকি ছিল, তাহা দ্বিতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলণ্ডে গোর প্রাপ্ত হইল। গড়াইল আসিয়া এইখানে।

পক্ষান্তরে মার্কিন দেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করে নাই—একটি কার্য্যেও হস্ত প্রসারণ করে নাই; অপর কোনো জাতির ন্যায্য অধিকারের অন্তঃপাতী সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিখণ্ডেও হস্তপ্রসারণ করে নাই, আবার তাঁহাদের নেতা যিনি ওয়াশিংটন তাঁহার

তো কথাই নাই! তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার ছিলেন বলিলেই হয়। তাই তাঁহাদের স্বারাজ্যের জয়-পতাকায় "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" স্বর্ণাক্ষরে জল্জল্ করিতেছে তারকা-বেশে।

॥ ১ ॥ তোমার ওকথা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম—যদি ইংরাজের নিকটে বুয়ারেরা যুদ্ধে পরাজিত না হইত।

॥ ১ ॥ কে বলিল বুয়ারেরা পরাজিত হইয়াছে—পরাজিত হইতে তাহাদের শত্রুপক্ষেরাই পরাজিত হইয়াছে। ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক যিনিই যাহা বলুন না কেন, যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, বিগত বুয়ার যুদ্ধে ইংরাজদিগের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ধনহানি, মানহানি এবং প্রতাপহানির একশেষ হইয়াছে। কিন্তু বুয়ারদের কি হইয়াছে? কিছুই হয় নাই। বরং তাহারা পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা জাতীয় গৌরব-সোপানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে বই একধাপও নীচে নাবে নাই।— আর যে এখন কোনো বলবান্ জাতি তাহাদিগকে ঘাঁটাইতে যাইবে, তাহার পথ চিরদিনের মতো অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বুয়ারদিগকে ধর্ম্মপুস্তক হাতে করিয়া রণে অবগাহন করিতে দেখিয়া ইংরাজ বাবুরা অতুল হাসিতে পারেন, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বঙ্গের ধামাধরেরা হাসির চোটে ভূত ভাগাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহারা সহস্র হাসিলেও আমার এ বিশ্বাস একচুলও টলিবে না যে, বুয়ারেরা যে পরাজিত হইয়াও জয়ী হইয়াছে, তাহার কারণই ঐ। কি? না ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া।

বৃথা আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। বুয়ারদের জাপানিদের এবং মার্কিন-দের প্রদর্শিত মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত কি আমাদের ন্যায় পথভ্রষ্ট এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট বিপথ পন্থীদিগের মনের এক কোণেও স্থান পাইতে পারে? তাহা হইলে আর আমাদের ভাবনা ছিল না! আমরা এতদিন ঠেকিয়া শিখিয়াও এখনো আমাদের ঠেকিয়া শিখিবার সাধ মিটিতেছে না। নৈরাজ্যই আমাদের স্বারাজ্যের আদর্শ, পিপীলিকার পক্ষই আমাদের জয়পতাকার আদর্শ, আর আমাদের রাজনৈতিক গোঁড়া-গুরুদিগের প্রসাদাৎ একটি জপমন্ত্র যাহা আমরা শিখিয়াছি তাহাই আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র, তাহা এই :—"ঈশ্বর চাহিনা—ধর্ম্ম চাহিনা—কেবল চাই স্বারাজ্য—খাঁটি স্বারাজ্য—যাহার গাত্রে ঈশ্বরের এবং ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই সেইরূপ নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য।"

॥ ১ ॥ তুমি এই যে সকল শক্ত শক্ত কথাগুলি বলিলে, তাহা হিতবাক্য হইতে পারে, কিন্তু মনোহারী একটুও না।

"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

আমি তাই বলি যে, তোমার ব্যবস্থানুযায়ী তিক্ত হিতবচনের সঙ্গে একটু আধটু মনোহারী বচনের অনুপান মিশাইয়া উহাকে সুখসেব্য করিয়া লইলে ভাল হয়। আমি একটা অনুপানের জোগাড় ক'রয়াছি—বোধ করি তাহা চলিতে পারে, তাহা এই :—

স্বারাজ্যপথের আমরা নূতন ব্রতী। সে পথে যাত্রা করিবার সময় পদে পদে আমাদের যে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতন ঘটিবে, তাহা ঘটিবারই কথা। পাঠশালার ছাত্রেরা যেমন লিখিতে লিখিতেই ক্রমে ক্রমে হাত তাহাদের পাকিয়া ওঠে, তেমি আমাদের দেশের স্বারাজ্য-পন্থীরা কোমর বাঁধিয়া কাজ করিতে করিতেই ক্রমে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপনা হইতেই ঠিক্ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। পথের মাঝখানে তাহাদিগকে বিভীষিকা দেখাইয়া নিরুদ্যম করিয়া দেওয়া উচিত হয় না।

॥ ২ ॥ কোনো পাঠশালার ছাত্র যদি আমাকে বলে যে, "লিখিতে লিখিতেই আমার হাত পাকিয়া উঠিবে, 'এটা ঠিক্ হয় নাই' 'ওটা ঠিক্ হয় নাই' বলিয়া লোককে বিরক্ত করিও না" তবে আমি তাহাকে বলিব এই যে, 'তোমার হাত পাকিবে তাহা তো জানি, কিন্তু চাও তুমি কি ? ইজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, না সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও—সেই কথাটি আমাকে ভাজিয়া বল।' 'যদি ইজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে যথেচ্ছা মতে লেচনী যেমন চালাইতেছ তেমি চালাইতে থাকো,' তাহা হইলেই ইজিবিজি লেখায় তোমার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে ; পক্ষান্তরে, তুমি যদি সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে আদর্শ লিপি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া, যত্নের সহিত তাহার প্রদর্শিত পথে লেখনী চালনা করিতে থাক, তাহা হইলেই ক্রমে তোমার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মতো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিবে। আমি তাই বলি যে, স্বারাজ্য-পন্থীরা যদি বিধিপূর্ব্বক অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই ক্রমে ভালোর দিকে, অর্থাৎ ইষ্টসিদ্ধির দিকে, তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে দেখিতে দেখিতে—তার সাক্ষী **জাপান** ; আর, তাহার পরিবর্ত্তে যদি অবিধিপূর্ব্বক স্বাভিমত কার্য্যে গড্ডলিকাপ্রবাহের

ন্যায় চোক কাণ বুজিয়া অগ্রসর হ'ন তাহা হইলে অনিষ্টসিদ্ধির দিকে তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে তর্‌তর্‌ করিয়া, তার সাক্ষী—ফরাসীস্ রাষ্ট্র-বিপ্লব। কাহাকেই বা আমি বলিতেছি বিধি, আর, কাহাকেই বা আমি বলিতেছি অবিধি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে প্রণিধান কর :—

অবিধি।

(১) গাছে না উঠিতেই এক কাঁধিব প্রত্যাশা!

(২) স্বারাজ্যের যোগ্যতা-লাভে জলাঞ্জলি দিয়া স্বারাজ্যের অধম নাট্যাভিনয়।

(৩) জন্মভূমি যেমন মাতা, ধর্ম্ম তেমি পিতা, এ কথাটি ভুলিয়া—বসিয়া-থাকিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার দৌরাত্ম্যে পিতাকে দেশ ছাড়া করিয়া—মাতাকে "সুজলা, শ্যামলা" প্রভৃতি ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্যালঙ্কার পরিধান করাইয়া কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা প্রদান।

বিধি।

(১) ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি ধরিয়া ধর্ম্ম ধরিয়া থাকিয়া স্বারাজ্যের যোগ্যতা উপার্জ্জন।

(২) রীতিমত জ্ঞান শিক্ষা এবং কাজ শিক্ষা করিয়া বিহিত প্রণালীতে অভীষ্ট-সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা উপার্জ্জন।

(৩) পুরাতন ভারতের ভগবদ্গীতা প্রভৃতি লোক-পূজ্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের বাক্যামৃত পানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া নব্য ভারতের হিতার্থে কাজের মতো কাজ করিয়া মানুষের মতো মানুষ হওয়া।*

* সংক্ষেপে বলিলাম, "গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যামৃতপানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া—কিন্তু এই ক্ষুদ্র কথাটির ভিতরে ভাব একটি যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা প্রকাণ্ড বিশাল, এমি বিশাল যে, তাহা রীতিমত বিবৃত করিয়া ব্যক্ত করিতে গেলে একটা বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। এখানে তাহার যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আভাস জ্ঞাপন করা ভিন্ন তাহার অধিক আর কিছুই হইতে পারে না। সে ইঙ্গিত-আভাস এই :—

খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল আছে, মুসলমানদিগের কোরাণ আছে; ভারতবাসীদিগের এখন তেমো কোনো একটা ধর্ম্মশাস্ত্র কি নাই? অবশ্যই আছে ভাগবদ্গীতা। গীতা যেমন আশ্চর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র; অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত গীতাশাস্ত্রের প্রভেদও তেমি আশ্চর্য্য প্রভেদ। তার সাক্ষী :—বাইবেলের পুরাতন বিধান য়িহুদিজাতির ঐকান্তিক পক্ষপাতী, বাইবেলের নববিধান খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক পক্ষপাতী, কোরাণ মুসলমানসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক

উদ্বোধন।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।]

১

এখনো যামিনী হয়'নি প্রভাত
আকাশে নিবে নি তারা।
এখনো প্রকৃতি ঘুমে অচেতন
নাহি তার কোন সাড়া॥
কে তুমি উদাসী চলিয়াছ পথ
যাবে কোন দেশে কিম্বা মনোরথ
পথ ছেড়ে কিগো চলেছ বিপথে
হয়েছ কি পথ-হারা?
এখনো যামিনী হয়নি প্রভাত
আকাশে নিবেনি তারা॥

২

ক্ষিপ্ত হইয়া ঘোর পথে পথে
কিসের ভিখারী তুমি।
কোন বনবাসে সুদূর প্রবাসী
যাবে কোন বন ভূমি॥

পক্ষপাতী, এমন কি তাহা কাফেরদিগের প্রতি খড়্গহস্ত; কিন্তু গীতাশাস্ত্রে পক্ষপাতের নামগন্ধও নাই—উল্টা আরো জগৎসুদ্ধ সর্ব্বপক্ষের সমন্বয় তাহার পাতায় গাঁথা রহিয়াছে। গীতাশাস্ত্র দেশ-কাল-জাতি-নির্বিশেষে পৃথিবীসুদ্ধ মনুষ্যমণ্ডলীর মহাশাস্ত্র। তা ছাড়া, তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানশাস্ত্র, ভক্তের ভক্তিশাস্ত্র, কর্ম্মীর কর্ম্মশাস্ত্র। এখানে আমি একটি ইংরাজি প্রবাদকেই সার করিতেছি—A word to the wise is sufficient। ত। বই, সবিস্তারে গীতাশাস্ত্রের গুণ-কীর্ত্তন একপ্রকার সমুদ্রে অর্ঘ্য প্রদান। ঈশ্বরারাধনার অমৃত রস, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল জ্যোতি, যোগের তেজোময় অধ্যাত্ম শক্তি, ধর্ম্মের ধৃতি, অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের পুরুষার্থসাধনোপযোগী যত কিছু পাথেয় সম্বল আছে, ভগবদ্গীতা পাঠে সমস্তই হাত মেলিয়া পাওয়া যায়। ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র জাতিবিশেষের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, তাহা মনুষ্যের ধর্ম্মশাস্ত্র—আমার ধর্ম্মশাস্ত্র। তাই তাহার বাক্যামৃতপানে আত্মা পবিত্র হয়—ভগভক্ত হয়—বিশ্বপ্রেমী হয়—কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহী হয়—সদানন্দচিত্ত হয়—অকুতোভয় হয়—তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় এবং মধুময় হয়; ভগবদ্গীতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মনুষ্য হিন্দু হয় না, মুসলমান হয় না, খ্রীষ্টান হয় না, ইহুদী হয় না, প্রটেষ্টাণ্ট হয় না, কাথালিক হয় না, হয় তবে কি? না মনুষ্য। অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য—মানুষের মতো মানুষ।

সেথা কি পাপিয়া পরিচিত তানে
গায় সাম গীতি মধুর মিলনে
হৃদয়ের বীণা বাজে কি গোপনে
ধীরে ধীরে দিয়ে সাড়া।
কে তুমি উদাসী চলিয়াছ পথ
হয়েছো কি পথ হারা?

কি মহা সাধনা জাগিয়াছে প্রাণে
সিদ্ধি মাগিছ কিসের লাগি
প্রবাসীর মত চলিয়াছ পথ
দ্বারে দ্বারে ভিখ মাগি।
সেথায় কি গেলে মিলিবে তাঁহারে
খুঁজে খুঁজে তুমি মরিছ যাঁহারে
নিবিড়ে নীরবে ভাবের মাঝারে
পায় গো যাঁহার সাড়া।
কে তুমি উদাসী চলিয়াছ পথ
হয়েছো কি পথ হারা॥

হায়! ছিলে বুঝি ঘুম-ঘোরে
দুরন্ত এক স্বপন হেরিয়া
নিমিষে তন্দ্রা গিয়াছে টুটিয়া
হতাশে পড়েছ ভূমিতে লুটিয়া
যেতে চাও পর পারে।
অলস নয়ন চাহে চারি ভিতে
কি যেন হারায় খুঁজিতে খুঁজিতে
দূরে চলে যায় ধরা দিতে দিতে
খুঁজে খুঁজে খুঁজে সারা।
এখনো যামিনী হয়নি প্রভাত
আকাশে নিবে নি তারা॥

নারায়ণ।

অমন করিয়া পাগল হইয়া
মিছে খুঁজে মরা ভাই।
ধরা দিয়ে যদি পলকে লুকায়
তাহারে ধরিতে নাই॥
মিছে কর ছুটা ছুটি
অকারণ লুটালুটি
বেঁধে নাও দেখি কটি
আপনি সে দেবে ধরা,
রুদ্ধ দুয়ার খুলে যদি যায়
মন্দিরে পড়ে সাড়া।
এখনো যামিনী হয়নি প্রভাত
আকাশে নিবেনি তারা॥

৬

ঐ শুন—ঐ দূরে—কোন অসীমের পর পারে
বাজিতেছে নব বাণী।
(আজি) সার্থক হবে সব আয়োজন
—সোণার স্বপন খানি॥
নূতন করিয়া করিবে গঠন
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যত পুরাতন
বাঁধিবে করিয়া শিথিল বাঁধন
ঢালিবে অমৃত ধারা।
এখনো যামিনী হয়নি প্রভাত
আকাশে নিবে নি তারা॥

জীবনের পথে।

[শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।]

(বিবেকানন্দ-সমিতিতে পঠিত)

যখন পেটে ভাত নেই, পরণের কাপড় নেই, মাথা গোঁজবার স্থান নেই, দাসত্ব যখন জাতীয়-জীবনের গৌরবের পরিচয়, ধর্ম্মাচার যখন জন্মগত আলস্যের সহচর্য্যা কামনা করে, সমাজের যখন প্রতিস্তরে একটা কালিমার দাগ মজ্জাগত সংস্কারের মত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এমন দিনে কলম ছেড়ে কাজে লাগলে অনেক সুবিধা হতো জানি, কিন্তু উক্ত কথারও একটা প্রয়োজন আছে মনে করি।

দূর, অতি দূর ভবিষ্যতের আশায় যে বসিয়া থাকিতে না পারে—অবশ্য তার জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে—ভিক্ষা হতে শান্তি, ভয় হতে মঙ্গল, মেষসুলভ নিরীহতা হতে কল্যাণ সব সময় হয় কি? তা যদি হ'তো—তা হ'লে ত ভারতের দুর্দ্দশা আজ এত হতো না। এখানে ত ভিক্ষুকের অভাব নেই, কাপুরুষের সংখ্যা নেই, সহ্য করবার ধৈর্য্যেরও ত সীমা নেই—বিবর্ত্তনবাদ জীব-জগতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করে জেনেছে—অনাদি কাল হতে এক অনন্ত অবিশ্রান্ত সমর চলছে উদ্ভিদে উদ্ভিদে, জীবে জীবে, উদ্ভিদে জীবে। আজ যে সকল মানব জাতি, যে সকল জীব জন্তু, লতা-গুল্ম-সুশোভিত বনানী বর্ত্তমান রয়েছে—এরাই ত সেই অতীত সমরের বিজয়-গরিমা। এরা প্রতিষ্ঠা-লাভ ক'রেছে শক্তির পরিচয়ে, সাধনার দিক দিয়ে—মৌনতা আর জড়তার ভিতর দিয়ে নয়।

মানব-চরিত্র-নীতি যাকে ধর্ম্ম বলে বরণ করেছে, তাদের এ আহবে স্থান কোথায়? পরার্থে যে প্রাজ্ঞ আপনার সমস্ত উৎসর্গ করে দেয় তার ত উন্নতি হয় না, সে ত দিগ্বিজয়ী হয় না, তার সন্তান সন্ততির ত ঋদ্ধি বৃদ্ধি লাভ হয় না। যে যুযুৎসু নয়, যে শত্রুকে ভালবাসতে চায়, যে অনিষ্টকারীরও ইষ্ট ক'রতে চায়—যুযুধান শত্রুকুল সহজেই তাদের নির্ম্মূল ক'রে দেয়। মানুষ যদি হিংসা না করত—লড়াই না করত—পশুহত্যা ও উদ্ভিদহত্যা কখনও না করত—তা হলে এ সৃষ্ট জগতে আজ শ্রেষ্ঠ জীব যে মানুষ, তার স্থান হতো

না। আত্মরক্ষা ও পরহিংসার জন্য জীবমাত্রকে স্রষ্টা দিয়েছেন নখ দন্তাদি প্রহরণ, আর মানুষকে দিয়েছেন তার বুদ্ধিতে আয়ুধের সৃষ্টি ক্ষমতা। এ ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করলে তবে ত নিজের বৃদ্ধি, তবে ত নিজের ঋদ্ধি, তবে ত নিজের কুশল। দয়া, অহিংসা প্রভৃতি উচ্চ প্রবৃত্তির ও কার্য্য কুশলতার ব্যবহার, মহান্ হৃদয় ভিন্ন হয় না। দুর্ব্বলের নিরীহতা, তার ভীরুতা, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অভাব হেতু বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্তির নিশ্চেষ্ট প্রতীক্ষা—এরই নাম কি ধৈর্য্য—তিতিক্ষা। শক্তিহীনতার নাম যদি বল সাধুতা, কাপুরুষোচিত নীচতার নাম যদি বল নম্রতা, বিদ্বেষিত শত্রুর অধীনতা স্বীকারের নাম যদি বল বশংবদতা, ঈশ্বরাদিষ্ট বিনয়, তা'হলে আমি বলব—চমৎকার!! স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলতে গেলে—বলতে হয়—"ভারত আজ যথার্থই শূদ্রপূর্ণ। এখন চেষ্টায় তেজ নেই, উদ্বেগে সাহস নেই, মনে বল নেই, অপমানে ঘৃণা নেই, দাসত্বে অরুচি নেই, হৃদয়ে প্রীতি নেই, প্রাণে আশা নেই—আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্ব্বলের যেন তেন প্রকারেণ সর্ব্বনাশের একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহন। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্য বস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতির অনুকরণে, ভাষার উৎকর্ষ অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকীরণে।"

ভাবুকতায় সূক্ষ্মস্নায়ু মণ্ডলী যতই কম্পিত কর না, উষ্ণ নিশ্বাসে যতই গভীর রাত্রি যাপন কর না, 'নলিনী-দল-গত-জলমতি তরলম্' যত ভাবে ইচ্ছা যতবারই বল না, তাতে কেউ মন্দ বলবে না—তাতেও একটা উত্তেজনা আছে, একটা উদ্দীপনা আসে। কিন্তু যখন সেই ভাব-তরঙ্গ অবসাদের হিমানীপ্রবাহে ক্রমে মিশে যায়, আর পড়ে থাকে এই পঙ্গু-সমাজের বক্ষের ওপর আরও কতকগুলি জড়ত্বের দেহপিণ্ড মাত্র— তখন, যে না বলে থাকা যায় না' ওগো, পরপারের পবিত্র পান্থ! তোমাদের সরল গম্ভীর ভাবুকতায় দেশ যে ডোবে ডোবে। হায়, মহত্ত্বের সন্তান তোমরা—কি অবস্থা আজ তোমাদের! আত্মসঙ্কোচের সংস্কারে প'ড়ে বুঝছ না যে নিজেকেই নিজে প্রতারিত করছ। যদি পরের জন্য, দেশের জন্য, বিশ্বের মাঝে তোমার আত্মোৎসর্গ দেখাতে পারতে—বুঝতাম তোমার বীর্য্য, তোমার শৌর্য্য, তোমার শিক্ষা, তোমার দীক্ষা! কিন্তু এত তা নয়। আপনাকে লুকিয়ে ফেলছ জড়তার, অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে। এ কি বিকট ব্যভিচার! আপনাকে ফুটিয়ে তোল অনন্ত কর্ম্মকুশলতার

মধ্য দিয়ে—তা হলেই দেখবে, তোমার জাতি, তোমার দেশ, তোমার ধর্ম আবার নব আলোকে রঞ্জিত হয়েছে ; জাতীয় ভাগ্যচক্রের উপর তোমার জাতীয় পতাকা আবার সগৌরবে উড়তে থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় আবার বলব—"সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহা জড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস, বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে * * সে-দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে। এখন চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি তৃষ্ণা, চাই পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত রাখিয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি—আর চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় বক্ত সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

আজ পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছে—যাদের প্রভুত্ব বিশ্ব মাথা পেতে নিয়েছে তারা বীর্য্যের মধ্য দিয়েই বিজয় লাভ করেছে। দৈন্যতা—দাস সুলভ চাটুকারিতার দ্বারা করে নি। পাশ্চাত্য শক্তিনিচয় বৌদ্ধনীতি নিয়ে ভারতে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করতে আসে নি। যারা বীর, যারা প্রভু, যারা শক্তিশালী তারাই ছিলেন আর্য্য,তারাই ছিলেন শিষ্ট, তারাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আর আজ—সেই সমাজের সন্তান কারা?—ধনহীন, বলহীন, শৌর্য্যহীন আমরা—ব্যাধিগ্রস্ত দাসত্বজীবী আমরা। দেশে ত্যাগী তপস্বীর অভাব নেই—কিন্তু সে তপস্যার শক্তি নির্ব্বিষ আস্ফালনেই পর্য্যবসিত।

এই ক্রীতদাসের মত বশ্যতাস্বীকার, এই কুকুরের মত পরাক্রান্তের নিষ্ঠীবন লেহন, এই হীন পরান্নোপজীবিতা—এই জঘন্য জীবন—তুমি আর কত দিন বইবে? ও যে তোমার সেই দেশ, সেই সুকৃতির আধার, সেই অমৃতের খনি, যেখানে একদিন দেবতারা বাস করতেন। ওই দেখ—সেই গঙ্গা, যমুনা, আজও তেমনি কলস্বরা, দুকূল প্লাবিনী, আপন মনে উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ছুটেছে—ঐ দেখ হিরণ্ময়ী সন্ধ্যা—আকাশের নীল হৃদয়ের উপর তোমার অতীত মহিমা গাইতে গাইতে ঘুমিয়ে পড়েছে, ওই সেই আরাবল্লির ধূম্রগিরি, হস্তিনার সেই ধর্ম্মপ্রাসাদ, গঙ্গোত্রির সেই পবিত্র, পূণ্য পূজ্য মহিমার সমারোহ। মুহূর্ত্ত প্রকৃতিস্থ হয়ে শোন তোমার দেশের কবি বিগলিত কণ্ঠে কি গাইছেন—

"ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মলিনে নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র।"

যে ভারতের প্রতি ধূলি কণাটি পর্য্যন্ত অতীত মহিমায় পূজ্য—সে ভারতের গরিমা আজ তোমাদের হাতে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ভারতে নেই কি—সবই ত আছে, শুধু এ ক্লৈব্য ঝেড়ে ফেল। চাই ধর্ম্মের প্রতি, দেশের প্রতি গভীর প্রীতি আর শ্রদ্ধা, স্বীয় স্বরূপজ্ঞানের ও প্রত্যক্ষানুভূতির উপর অনন্ত বিশ্বাস। আমাদের আদর্শ আজ কি—তাই ভাল করে বুঝতে হবে। ধর্ম্মের মায়াবাদ যেখানে অত্যধিক সংসারবিমুখীনতার প্রশ্রয় দিয়ে দুর্ব্বলতার নামান্তর হয়েছে তাকে দূরে ফেলে দিতে হবে। ধর্ম্ম যে শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা যে শক্তের ভূষণ—অক্ষমের নয়—এইটে ভাল করে জানতে হবে। ধর্ম্মের সাধনা—সে যে বীর্য্যের সাধনা—এ সাধনা, এ দীক্ষা না নিলে ত কিছুই হবে না। তাই বলি জড়ের সাধনা নিয়ে আর আত্মবঞ্চনা ক'রো না; পথ বেছে নেও—শৌর্য্যে না হয় বীর্য্যে। দেখছ না, জাতির জীবন প্রদীপ যেন নির্ব্বাণের প্রতীক্ষায় কাঁপছে।

আজ এখন আমরা এমন একটা স্থানে এসে পৌঁছেছি—যার সামনে জীবনের অনন্ত কর্ম্ম, পশ্চাতে মৃত কঙ্কাল পূর্ণ শ্মশান, একদিকে সৃষ্টি, অপরদিকে প্রলয়; একদিকে উত্থান, অপর দিকে পতন, একদিকে মুক্তি, অপরদিকে অনন্ত বন্ধন। এ আহবে পথ প্রদর্শক কারা? কোথায় ভারতের শক্তিসিদ্ধের দল—আজ তোমরা কোথায়? আজ যদি তোমাদের মিলিত দীর্ঘনিশ্বাস অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশ হতে নেমে আসে—তা হলে ত জাতির ভাগ্যচক্র এক দিনেই ফিরে যায়।

তবে, এস আদর্শ, এস মহান, এস দেশের উদার সুসন্তান, এস মোহ-বিমুক্তের দল—থাকো আমাদের পথ আলো করে, চল এ সাধন-জগতে, আমি বাহু তুমি শক্তি, আমি সাধনা তুমি সিদ্ধি। আর গাই উচ্চ কণ্ঠে—সেই গান—

"তোমার স্মৃতির মহিমা বর্ম্মে—চলে যাব শির করিয়া উচ্চ
যাদের মহিমাময় এ অতীত—তাহারা কখন নয় গো তুচ্ছ।"

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি।

রাজার অত্যাচারই বল আর সমাজের অত্যাচারই বল, দুর্ম্মূল্যতাই বল আর ইনফ্লুয়েঞ্জাই বল, ধর্ম্মের অর্থের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গলদ ঢুকিয়াছে বলিয়াই সকল প্রকার বিপত্তি আমাদিগকে একযোগে আক্রমণ করিয়া সংহার করিতে উদ্যত। গোড়ায় গলদ থাকিলে শাখাপ্রশাখায় স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রত্যাশা করা মূর্খতা। গোড়ার কথা এই ধর্ম্মে। প্রকৃত স্বরূপটা কি তাহা আমরা যতদিন না বুঝিব ততদিন সাত প্রকার সংস্কারের প্রয়াসই ব্যর্থ হইবে। ধর্ম্ম বলিতে আমরা যত দিন হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্ম বা অপর কোন বিশেষ "ধর্ম্মকে" বুঝিব, যতদিন কতকগুলি বিশেষ লৌকিক সংস্কারের মধ্যে আমাদের ধর্ম্ম গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিব, ততদিন আমাদের দুঃখরাশির একটিরও নিরাস হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা মুখে "ধর্ম্মের" ধাত্বর্থের ব্যাখ্যা করি, যাহা বিশ্বসংসারকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই "ধর্ম্ম" বলিয়া উদারতার ভাণ করি, কিন্তু ইহা বুঝিনা যে, ধর্ম্মের এই বিরাটরূপকে যে পরিমাণে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারিব, দুঃখের নিবৃত্তিও সেই পরিমাণে সুলভ হইবে। উদ্ভিদ্‌জগৎ, অনন্ত অসীম নক্ষত্রমণ্ডল, মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাদি সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর লোক-লোকান্তর, এই সমস্তকে ধরিয়া আছে যে বস্তু, আমরা সেই বস্তুকে ধর্ম্ম বা প্রেম বলি। একই বস্তুর দ্বারা বিধৃত, একই সত্তার বিবর্ত্তনে সৃষ্ট বলিয়া এই বিশ্বসংসারটাও একটা অখণ্ড বস্তু। সমগ্রসৃষ্টির মধ্যে এই অখণ্ডত্ববোধ বা একত্ববুদ্ধি যাঁহার যত দৃঢ়, ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানও তাঁহার তত পাকা।

* * * *

একদিকে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া কংগ্রেস-কনফারেন্স করিয়া, কলমবাজি গলাবাজি করিয়া যেমন উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছ, বাজার গরম রাখিয়াছ, বিলাতের লোকমতকে সুমার্জ্জিত করিবার জন্য অজস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিতেছ, তেমনি অপরদিকে ধর্ম্মের নামে দেশময় যে পশ্বাচার চলিতেছে, ভগবানের নামে তীর্থে তীর্থে যে শোষণ ও বীভৎস অভিনয় অবাধে চলিতেছে, লোকাচারের দোহাই দিয়া সমাজের বুকের উপর যে দৈত্যনৃত্য নিত্য চলিতেছে, শিক্ষা ও উদ্যোগের অভাবে পল্লীতে পল্লীতে যে মড়কের

উৎসব বসিয়াছে, তজ্জন্ত কয় কড়া কড়ি খরচ করিয়াছ, কতটুকু কণ্ঠস্বর ব্যয় করিয়াছ, কয় পংক্তি লিখিয়াছ?

রাজতন্ত্রকে উৎসাদিত করিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেই মানুষের সকল দুঃখের অবসান হইবে, এইরূপ একটা উন্মত্তের প্রলাপ বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

* * * *

এই যে লোকমত আর এই যে ভোটের দাবী, ইহা দেশাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত নহে, ইহার সহিত ধর্মের যোগ নাই, ইহার ভিতরে প্রেমের সুরটা বাজিয়া উঠিতেছে না।

* * * *

মানুষের স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। মানুষের সহিত মানুষের ধর্মের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই কল্যাণ নাই। মানুষ ত সত্য সত্যই স্বায়ত্তশাসন চায় না, স্বাধীনতার জন্যও তাহার অন্তরাত্মা পাগল নহে, সভ্যতার গর্ব্বের জন্য ত সে লালায়িত নহে, তাহার আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে দারুণ অতৃপ্তির যে তপ্তশ্বাস উঠিতেছে, তাহা প্রেমেরই জন্য। হাসিকান্নাময় এই সংসারে যেখানে সে একটুকু ভালবাসা পায়, সেইখানেই সে বিনামূল্যে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া নিজেকে বিকাইয়া দেয়। ভগবান বা ধর্ম্ম, এ সব কথা সে বোঝে না, বুঝিতে বিশেষ ব্যস্তও নহে। ঘরে বাহিরে সে কেবল মনের মানুষের, প্রেমের মানুষের সন্ধানে ফিরিতেছে। দুঃখদারিদ্র্যময় এই ধুলামাটীর সংসারের মধ্যেই শুধু প্রেমের অমৃতস্পর্শে আমাদিগের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতে হইবে। ভালবাসার মোহিনী শক্তি, ইন্দ্রজালের মত স্পর্শমাত্র দুঃখকে সুখে এবং দারিদ্র্যকে সম্পদে পরিবর্ত্তিত করে, অলসকে কর্ম্মী করে, কাপুরুষকে বীর করে, কৃপণকে দাতা করে এবং পশুকে মানুষ করে। শাসনতন্ত্রের শত সংস্কারের মধ্যে যুগযুগান্ত অন্বেষণ করিয়াও মানুষ স্বাধীনতার সন্ধান পায় নাই, আনন্দের অধিকারী হয় নাই। অখণ্ড বিশ্বমানব এক অখণ্ড প্রেমস্পন্দনে একসঙ্গে যদি জাগিয়া উঠে, তবেই সেটাকে প্রকৃত জাগরণ বলিব।

সংসঙ্গী (পৌষ)।

সাধকের প্রশ্ন।

তোমাদের মুখে আজকাল একটা কথা বড় বেশী রকম শুনিতেছি, কথাটা সঙ্ঘ। তোমরা সঙ্ঘ অর্থে ঠিক কি বুঝ জানি না, কিন্তু ও শব্দটা শুনিলে আমার যে একটু ভয়ই হয় তাহা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। সমাজ কথাটিই ত আছে, তবে সঙ্ঘের উপর এত জোর দেওয়া কেন? সঙ্ঘ শুনিলেই আমার মনে হয় মঠ অর্থাৎ একটা বিশেষ মত, বিশেষ সম্প্রদায়। সমাজের বুকে যে এইরূপ সম্প্রদায়, মত, মঠ উঠিল, উঠিয়া লোপ পাইল, কিন্তু সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি ত বড় কিছু হইল না—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
না তুয়া আদি অবসানা
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।

তোমরা শুনি সমস্ত সমাজকে লইয়া সমাজের সাথে মিশামিশি হইয়া চলিতে চাও, কোন রকম ধরাবাঁধা Institutionএর তোমরা নাকি ঘোর বিরোধী, সমাজ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া তাহার মাথায় ঘেরটোপের মত তোমরা বসিতে চাও না, সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সাধনার শক্তি মূর্ত্তিমান করিয়া ধরিতে চাও, তবে তোমাদের এ সঙ্ঘের অর্থ কি? আমরা ভয়ের কথাটিই তোমাদিগকে বলি, অনুধাবনের যোগ্য মনে কর, অনুধাবন করিয়া দেখিও। সঙ্ঘের সোজা অর্থ একভাবের ভাবুকদের একটা পরিবার। এক আদর্শের কর্ম্মী যাহারা, এক সাধনার সাধক যাহারা তাহারা তাহাদের কর্ম্মের, সাধনার সুবিধার জন্য সকলে মিলিয়া জোট বাঁধিয়াছে, ইহারই নাম ত সঙ্ঘ। তবেই দাঁড়াইল এই, যে যাহারা এই বিশেষ আদর্শ সাধনা কর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, করিতে চায় না বা পারে না, তাহারা তোমাদের সঙ্ঘের বাহিরে, তোমরা তাহাদের হইতে পৃথক। এখন এই যে সব বাজে লোক (Laity) ইহাদের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ অবশ্য তোমরা বলিবে এই, যে বাজে লোক একান্ত বাজে নয়, তোমরা তাহাদের হইতে পৃথক নও, তাহাদিকে ফেলিয়া দাও নাই, অস্বীকার কর নাই, তোমাদের কাজ তাদের মধ্যে কাজ করা, তাদেরকেও দলে টানা। এটা কিন্তু খুব নূতন কথা নয়, যাহারাই সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় গড়িয়াছে তাহারাই এ কথা বলিয়াছে, যাহারাই

একমতাবলম্বী তাহারাই একথা বলিতেছে ও বলিবে। কিন্তু এ ভাবে পার্থক্যটা ত আর ঘুচে না, স্বীকার না হয় করিলাম—মহম্মদীয় অথবা খ্রীষ্টিয়ানদের মত ছলে বলে না হউক, চৈতন্যের মত প্রেমের ভিতর দিয়া—তোমরা একটি একটি বা দলে দলে করিয়া লোক তোমাদের দলে ঢুকাইতে আরম্ভ করিলে, তবুও সমাজের যে ভাগটা বাহিরে পড়িয়া রহিল সে সম্বন্ধে কি? যদি বল সমস্ত মানবসমাজটা গ্রাস করিবে, তবে মানি বটে আদর্শ খুব জমকালো কিন্তু কোন্ দল, কোন্ সম্প্রদায়, কোন্ সঙ্ঘ তাহা পারিয়াছে?

আর সমস্ত মানবজাতিকে গ্রাস করিবার শক্তি যদি তোমাদের বাস্তবিকই থাকে, তাহা হইলেও আমার অশঙ্কা কিছু কমে না, বরং বাড়িয়াই যায়। সঙ্ঘবাদের বিরুদ্ধে আমি এই বলিতে পারি যে, সব মানুষকে সে এক ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করে। সমষ্টিকে উন্নত সমৃদ্ধ করিবার ব্যস্ততায় সে ব্যক্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। কি রকমে, বলিতেছি। সঙ্ঘ কথাটা বৌদ্ধদের। বৌদ্ধ সঙ্ঘবাদের তিন সূত্র।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
আর, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

সঙ্ঘ গড়া বা জোটবাঁধা দরকার, পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, একটা আদর্শের সাধনার জন্য অর্থাৎ একটা ধর্ম্মের জন্য। আর এই ধর্ম্ম দেয় কে, না, একজন মহাপুরুষ। মহাপুরুষেরা নমস্য, তাঁহারা জগতের উপকার করিতে আসেন ও উপকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মের ফলে কিছু যে অপকার হয় না তাহাও বলিতে পারি না। মহাপুরুষেরা এতই মহাপুরুষ যে মানুষের উপর সমাজের উপর জগতের উপর তাঁহারা চাপিয়া পড়েন—ব্যক্তিত্ব জিনিষটি অনেকখানি পিষ্ট ও লুপ্ত হইয়া যায়। মহাপুরুষ যে সত্যকে যে সাধনায় পাইয়াছেন তাহা তাঁহারই অন্তরাত্মার, তাঁহার নিজের স্বভাব ও স্বধর্ম্মের প্রকাশ, কিন্তু ঠিক সেই সত্য হুবহু সেই সাধনার ভিতর দিয়া অপরে যদি পাইতে চেষ্টা করে, তবে সেটা হইবে তাহার পক্ষে পরধর্ম্ম। প্রত্যেকের অন্তরাত্মা, স্বভাব ও স্বধর্ম্ম পৃথক পৃথক; সুতরাং পরের পথ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাতে চলিয়া নিজের পূর্ণ সার্থকতা ও সিদ্ধি নাই। মহাজনদিগের প্রভাবে তাঁহাদের সিদ্ধিতে, ঐশ্বর্য্যের, ক্ষমতার এমনি একটা কুহক, এমনি একটা মায়াবিনীশক্তি ঘিরিয়া থাকে যে মানুষ মোহিত হইয়া, আপনা

তুলিয়া তাঁহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে থাকে। ইহাতে মহাজনদের কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে, তাঁহারা যে বিশেষ কর্ম্ম সাধন করিতে আসিয়াছেন তাহা উদ্‌যাপন হইতে পারে. কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজের মানুষত্ব লইয়া কতখানি উঠিতে পারে তাহা বিচারের বিষয়। বলা যাইতে পারে মহাপুরুষ নিজের জন্য আসেন না, মহাপুরুষ মহাপুরুষ, কারণ তিনি সকলকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন. নিজের নিজত্বেই তিনি আবদ্ধ নহেন, তিনি চাহিয়াছেন পাইয়াছেন, এমন সত্য এমন সাধনা যাহা সকলের প্রত্যেকেরই নিজের অন্তরাত্মার কথা। এ কথা কতদূর সত্য জানি না—যত বড় মহাপুরুষই হউন কেন, নিজের ব্যক্তিত্বের বিশেষ ছাপ তাঁহার শিক্ষায় সাধনায় থাকিবেই বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি, শুধু ধরিয়া লওয়া নয়, বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ চৈতন্ত যাহাকেই দেখ না কেন ব্যক্তিত্বকে স্বধর্ম্মকে কে এড়াইয়াছে? তারপর, যদিই বা স্বীকার করি যে মহাপুরুষ হইতেছেন সকলের প্রতিনিধি, সকলেই তাঁহার মধ্যে দেখিতেছে পাইতেছে আপন আপন সত্তা, তবুও বলিতে হইবে এ সত্তা আমার বাহিরের সত্তা, বাহির হইতে তিনি যদি আমাকে নিয়মিত পরিচালিত করিতে চাহেন তবে আমার ভিতরের সত্তাটা পঙ্গু হইয়া পড়িবেই। এক তিনি যদি ঠুঁটো জগন্নাথ হইয়া থাকিতে পারেন তবেই আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বে স্বধর্ম্মে জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পাইব, নতুবা তিনি যদি ঠেলিয়া লইতে চাহেন তবে হয় আমরা হোঁচট্ খাইয়া পা ভাঙ্গিব, না হয়—শক্তিতে যদি কুলায়—তবে তাহারই প্রাণহীন ছায়া হইয়া পড়িব অথবা কেহ কেহ একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিব।

এইত গেল মহাপুরুষ আর তাঁহার ধর্ম্মের কথা। তারপর মহাপুরুষ তাঁহার ধর্ম্মকে বজায় রাখিবার জন্য, অথবা তাঁহার শিষ্য-সামন্ত তাহাদের পরিচিত প্রিয়সাধনা ও সত্যকে মানব জাতির কল্যাণকল্পে জাগাইয়া রাখিবার জন্য, বাড়াইয়া তুলিবার জন্য গড়েন একটা প্রতিষ্ঠান একটা সমবায়শক্তি অর্থাৎ সঙ্ঘ। কোন বিশেষ সঙ্ঘ না থাকিলে, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিলে ঐ মহাপুরুষের ঐ ধর্ম্মই প্রত্যেককে স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের স্বধর্ম্মের পথে সহায় হইয়া উঠিতে পারে, অবশ্য বলা যাইতে পারে এ রকমে কোন একটা কেন্দ্র না পাইলে সে ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে পারে, কিন্তু যে ধর্ম্ম আপন সত্যের বলে মানবজাতির মনে স্থান পায় না, ফুটিয়া উঠে না, যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে দরকার একটা পেলা (prop), সে কি লোপ

পাইবার উপযুক্তই নয়? যে ধর্ম্ম আকাশ বাতাসের মত সর্ব্বসাধারণে স্বাভাবিক ভাবে সর্ব্বত্র আহরণ করিতে পারে, তাহাই ত স্বধর্ম্মের উদ্বোধক, তাহা যেমন সাধারণ তেমনি আবার বিশেষ ধর্ম্ম। কিন্তু বিশেষ সঙ্ঘ হইতে যদি ধর্ম্মকে আহরণ করিতে হয়, সাধনা পাইতে হইলে যদি বিশেষ আশ্রমকে আশ্রয় করিতে হয় তবে ইচ্ছা থাকিলেও মানুষ সেখানে স্বাধীন স্বতন্ত্র হইতে পারে না, সকলের চেহারা ধরণ-ধারণ সেখানে আপনা হইতে এক রকম হইয়া আসে—নিবিড় ভ্রাতৃত্ব সেখানে জাগিতে পারে, বাহিরের একটা কর্ম্ম সকলে সমপ্রাণ হইয়া সম্মিলিত হইয়া সুসম্পন্ন করিতে পারে; কিন্তু সেখানে জাগে না ত জীবনের বৈচিত্র্য, শত অন্তরাত্মার শতেক বিভূতি। খরস্রোতে উপলরাজীর কোণ ধার সব যেমন ক্রমে ক্রমে মরিয়া যায়, মাজাঘষার ফলে সকলেই যেমন হইয়া পড়ে মসৃণ গোলগাল সেই রকম সঙ্ঘের সমষ্টিগত চাপে প্রত্যেক মানুষ আপন আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া সব একাকার হইয়া পড়ে।

হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্ম হিসাবে যে এতদিন এমন জাগ্রতভাবে টিকিয়া আছে তাহার কারণ আমি বলি যে হিন্দুসঙ্ঘ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। কোন একটি মহাপুরুষ এ ধর্ম্মকে জন্ম দেন নাই বা কোন প্রতিষ্ঠানে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। খৃষ্টধর্ম্ম খৃষ্টের নামে পরিচিত, খৃষ্টসঙ্ঘে মূর্ত্তিমান। মোসলেম ধর্ম্ম মহম্মদের নামে পরিচিত, মহম্মদীয় সঙ্ঘে মূর্ত্তিমান। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টার নাম নাই, ইহার ধরা বাঁধা কোন প্রতিষ্ঠান নাই। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথম দিয়াছিলেন এক মহাপুরুষ, একধর্ম্ম, এক সঙ্ঘ—কিন্তু বৌদ্ধ দীক্ষা কোথায় চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার মূল যে হিন্দুদীক্ষা তাহা এখনও সজীব! ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র যদি কেউ বুঝিয়া থাকে তবে তাহা বুঝিয়াছি। একদিন বৈদিক ঋষিগণ। বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিটক এক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ এক এক ধর্ম্মের মূলে আর, তাহা এক এক জনেরই উপদেশ—শিক্ষা দীক্ষা সাধনা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পিছনে এই রকম একজন মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ নাই—হিন্দুধর্ম্মের অপর নাম বৈদিকধর্ম্ম কিন্তু বেদ শত ঋষির শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনার আকর। প্রাচীনতম ঋগ্বেদের ঋষিরাও এ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে 'নবীন' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, 'পূর্ব্বকবি' দিগকে প্রণাম করিয়া আপনাদের কথা বলিয়াছেন।

আধুনিক যুগ হইতেছে বিশেষভাবে গণতন্ত্রের যুগ, সকলকে লইয়া সকলের সহিত সমানস্তরে দাঁড়াইতে হইবে এবং প্রত্যেককে প্রত্যেকের আপন

অন্তরাত্মার পথে চলিতে দিতে হইবে। আজকাল শিশুশিক্ষার প্রথম ও প্রধান সূত্র হইতেছে শিশু নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। শিক্ষার ভার আর একজন লইবে, ছাত্রকে জোর করিয়া শিক্ষা গলাধঃকরণ করাইবে অথবা ছাত্র শুধু শুনিয়া যাইবে আর মাষ্টার নোট লিখিয়া পড়িয়া মারা যাইবে (vicarious atonement) সে দিন আর নাই। রোগী নিজের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা নিজে করিবে, the patient must minister to himself—তোমাদের বুঝিতে হইবে এখন তোমাদের সঙ্ঘবাদ এই আদর্শের পরিপন্থী কি না।

প্রবর্ত্তক।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

বামুনের মেয়ে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শিশির পাবলিশিং হাউস। মূল্য ১৲ টাকা। ছাপা ও বাঁধাই ভালই।

শরৎচন্দ্রের (ইতিমধ্যেই বাঙ্গলা সাহিত্যের একজন স্রষ্টারূপে পরিগণিত হইয়াছেন বলিয়া, ইহাকে আমরা আর শরৎ বাবু বলিলাম না) এই বইখানা শেষ করিয়া উঠিবা মাত্র আমাদের মনে পড়িয়া গেল বার্ণার্ড শ'র একটি কথা। বার্ণার্ড শ এক জায়গায় বলিয়াছেন যে বাস্তবে জীবনটা বিয়োগাত্মকও নয় মিলনাত্মকও নয়—ট্রাজেডিও নয়, কমেডিও নয়, জীবনে দুইটি ভাবই মিলিয়া মিশিয়া চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে, সমস্ত হইতে মানুষ যখন একটি খণ্ড কাটিয়া লয়, তখনই তাহাতে ফুটিয়া উঠে হয় বিয়োগের না হয় মিলনের সুর, তাহা দেখা দেয় ট্রাজেডি অথবা কমেডিরূপে। শরৎচন্দ্রের এই বইখানাও জীবন হইতে কাটিয়া লওয়া একখানি পাতা। ইহাতে জীবনের সজীবতা সরসতা বাস্তবিকতা আছে, কিন্তু আর্টের একটা নিরেট গঠন, একটা নিবিড় অব্যর্থ পরিণাম (concentrated denoument) একটা সব শেষ (catastrophe) তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই। শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় বৈচিত্র্য অপেক্ষা তীব্রতা বেশী, নতুন বিষয় নূতন উপলব্ধি এই বইখানায় তিনি দেখাইতে পারেন নাই, তাই বোধ হয় পড়িবার পর কেমন একটা ফিকে ভাব থাকিয়া যায়। ফলতঃ, 'বামুনের মেয়ে'র আঁটঘাট "পল্লীসমাজের"ই আঁটঘাট, "বামুনের মেয়ের" মানুষ সব "পল্লীসমাজে"র মানুষেরই ছায়া। 'সন্ধ্যা' 'রমা'কে স্মরণ করাইয়া দেয়, 'অরুণ' 'রমেশের'ই দোসর, 'কালীতারা' বিশ্বেশ্বরীর ছাঁচে ঢালা এমন কি দুই জায়-

গাতেই আছে এক ঝগড়াটে মাসি। কিন্তু সে যাহা হউক, এক জায়গায় চিত্রটা খুব স্পষ্ট খুব স্ফুট খুব জোরালো হইলেও আর এক জায়গায় তাহার কোনটিও যে নাই তাহা নয়। শরৎচন্দ্র যাহাই লিখুন না কেন, আমরা কল্পনা করিতে পারি না তাহা কখন নীরস নির্জ্জীব হইতে পারে।

শরৎচন্দ্রের গল্প সমাজকে লইয়া। অনেকে গল্পের জন্য আদর্শের বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ বা সমাজের সাথে যৎসামান্য সম্বন্ধ রাখিয়াছেন কেহ বা তাহা মোটেও রাখেন নাই—অবশ্য বলি না সে জন্য তাঁহাদের সৃষ্টি কৃত্রিম, বরং ঐ ভাবেই তাঁহাদের জীবন্ত অনুভব বা উপলব্ধি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অনুভব উপলব্ধি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে সংসারের সমাজের মধ্য দিয়া। বাঙ্গালীর জীবন সত্যভাবে তীব্রভাবে ধরা পড়িয়াছে সমাজের, সমাজের বন্ধনের মধ্যে—আর বাঙ্গালীর সমাজের প্রকৃতমূর্ত্তি হইতেছে পল্লী সমাজ। সমাজের সাথে ব্যক্তির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সমাজ ছাড়া ব্যক্তির জীবন যে হইতে পারে না, হিন্দু সমাজ বিশেষভাবে তাহারই উদাহরণ। ব্যক্তি যেখানে স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছে সেখানে সমাজের মধ্যে হইলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লেনা দেনার ফলে আর একটা জীবন্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—তাহার উপাখ্যান অন্য রকম। মানুষের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে যে সামাজিক সাহিত্য সৃষ্ট হয়, সাহিত্য যে সমাজেরই হাত ধরিয়া চলে তাহার নিদর্শন ফরাসীতে যেমন পাই বাঙ্গলা ছাড়া আর কোথায় তাহা তেমন পাই না। সমাজের কোলের মধ্যে যে ঘর গৃহস্থালীর কথা বাঙ্গালীর জীবনে তাহাই আবার আরও সত্য আরও নিবিড়। শরৎচন্দ্রের কথা বাঙ্গালীর এই নিবিড়তম প্রাণের কথা—তাই এত সহজেই তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন।

সমাজের বিধি ব্যবস্থা নিয়ম কানুন জীবনকে নিয়মিত নিগড়িত করিতেছে। কিন্তু মানুষের আছে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রেরণা, অন্তরের টান, সে গুলির তৃপ্তির পথে দাঁড়ায় এই সব বিধিব্যবস্থা নিয়ম কানুন। তখন দেখা যায় সমাজের বন্ধনের মধ্যে আছে কত জোর জবরদস্তি, কত কৃত্রিমতা। শরৎচন্দ্রে এই প্রথম সংঘর্ষ ঘটনাচক্রের নাভি কেন্দ্র। 'বামুনের মেয়ে' আরম্ভই হইল এই সংঘর্ষ দিয়া—রাসমণি সমাজের মূর্ত্তিমান বিধিব্যবস্থা আর তাঁর নাতনী মানুষের সরল সহজ প্রেরণা। তারপর অস্পৃশ্য ছোটলোকদের আশ্রয়দাতা বিলাত ফেরত অরুণের সাথে বামুন-ঘরের মনকষাকষি, সমাজপতি জমিদারের

সমাজের রক্ষক ও ভক্ষক হইবার চেষ্টা সেই একই সংঘর্ষ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। পরিশেষে, জ্ঞানদার মূর্ত্তি ধরিয়াছে সেই নির্ম্মম সংঘর্ষের ভগ্নচূর্ণ অবশেষ।

সনাতনের সহিত স্বাভাবিকের যে দ্বন্দ্ব তাহা শুধু একের সহিত অপরের সম্বন্ধের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যকলাপও এই দ্বন্দ্বকে প্রমাণ করিতেছে। নিজের বেলায় আমরা যা খুসী তাই করি, অন্ততঃ করিতে চেষ্টা করি, পরের বেলায় কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান একেবারে সজাগ নির্ম্মম ন্যায়পরায়ণ। শরৎচন্দ্র দেখাইতেছেন, মানুষ স্বভাবকেই অনুসরণ করে, প্রাণের প্রেরণায় সে চলে, ধর্ম্মনীতি সামাজিকতা কোথাও উহার ভূষণ কোথাও আবরণ, কোথাও স্পষ্ট প্রতিবন্ধক। এমন শুচিবায়ুগ্রস্ত রাসমণি এক মুহূর্ত্ত আগে দুলে মেয়েকে স্পর্শ করিয়াছে এই কল্পনাতেই যিনি নাতনী-টিকে স্নান করাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও লাউএর ফালির লোভে সব ভুলিয়া গেলেন, বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ নাতনীকে দিয়া সে যথালভ্য জিনিষটি আনাইয়া লইলেন। জগদ্ধাত্রীও সমাজের নিয়ম মানিতে-ছেন সুবিধার জন্য, অনেকটা অন্ধভাবে তাহাতে যে তাঁহার প্রাণের সায় আছে, এজন্য নয়। জমিদার গোলোক চাটুর্য্যের নাম উল্লেখ করাই বাহুল্য।

কিন্তু সমাজের ব্যবস্থা এক হিসাবে যতই কৃত্রিম হউক না কেন, আর এক হিসাবে তাহা সামাজিক জীবনেরই অভিব্যক্তি। বাহিরের ব্যবস্থা যদি কোন না কোন রকমে এক জায়গায় আমাদের অন্তরের বস্তু হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহার উৎপত্তিও যেমন সম্ভব নয়, তাহা টিকিয়াও তেমনি কোন রকমে থাকিতে পারে না। অর্থাৎ সমাজের বিধান শুধু বাহিরের নিয়ম নয়, সেটা হইয়া পড়ে আমাদের অন্তরের সংস্কার। সংস্কারকে স্বভাব হইতে পৃথকভাবে ধরা অসম্ভব না হউক, খুবই কঠিন। সংস্কারে ও স্বভাবে যে দ্বন্দ্ব তাহা অন্তর্দ্বন্দ্ব। শরৎচন্দ্রে যে সংঘর্ষের কথা আমরা বলিতেছিলাম, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতেছে তাহার আর এক ধাপ। একদিনে স্বভাবের, প্রকৃতির দেওয়া টান আর এক দিকে সংস্কারের সমাজের দেওয়া টান, এই দুই টানের ভিতরে পড়িয়া কি রকমে দোল খাইতেছে, আপনাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে তাহাই শরৎচন্দ্রের গড়া প্রধান প্রধান মানুষ গুলির অন্তরের জীবনের ইতিহাস ও রহস্য। সন্ধ্যা বামুনের মেয়ে হইয়াও সহজ সরল স্বাভাবিক ভাবেই যে জাতিভ্রষ্ট অরুণকে ভালবাসিয়াছে ভালবাসিতেছে ইহাও সত্য, আর স্বভাব-গত একটা সংস্কারেরই বাধা পাইয়া সে ভালবাসা স্বপ্রতিষ্ঠ কুণ্ঠাশূন্য হইতে

[প]ারিতেছে না, ইহাও তেমনি সত্য। সন্ধ্যা যখন অরুণের কাছে আপনাকে [ঢ]ালিয়া দিতে চাহিল, অবস্থার বিপাকে সেটাকে দেখা গেল যেন বামুনের মেয়ে [দ]ায়ে পড়িয়া এমন কাজ করিতেছে, কিন্তু এই দায়ের পিছনে, এই দায়ের [স]াথে সাথেই ছিল একটা সহজ আত্মদান। অরুণ বামুনের মেয়ের বামুন-[গি]রিটাই দেখিল, দেখিল না সেই সাথে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে যে [ন]ারীর স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-নিবেদন।

সংঘর্ষ জিনিষটি শরৎচন্দ্রে আরও উপরে এক ধাপে উঠিয়াছে, আরও সূক্ষ্ম হইয়া দেখা দিয়াছে—বিশেষ সমাজকে এড়াইয়া শরৎচন্দ্র যেন মানুষকে লইয়া পড়িয়াছেন। স্বভাবে ও সংস্কারে যে দ্বন্দ্ব তাহা তখন স্বভাবেরই বিভিন্ন ধারায় ধারায় দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে। নিজের উপর নিজে রাগ করিয়া নিজে নিজেকেই কষ্ট দিয়া যে আনন্দ তাহা শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে নিজের উপরেই নিজে ফিরিয়া পড়িয়া আক্রমণ করা, এই যে প্রাণের স্বেচ্ছা যন্ত্রণাতোলা (self-torture) উহা দেখাইতে শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত—এটি যেখানে দেখাইয়াছেন সেখানে সে চরিত্র তত ফুটিয়াছে, সে আখ্যায়িকা তত তীব্র মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। অভিমানই শরৎ চরিত্রের প্রধান বৃত্তি, ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া আর সকল বৃত্তি খেলিয়াছে এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই এক অভিমান কতভাবে কত ভঙ্গিমায় কত চরিত্রের কত অবস্থার মধ্য দিয়াই না শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন। শরৎসাহিত্য যে বাঙ্গালীর কাছে এত মধুর এত নিবিড় এত চিত্তাকর্ষক তাহার একটা কারণ এইখানে নাই কি?

'বামুনের মেয়ে' বইখানিতে সন্ধ্যা চরিত্রটি ভুলিবার নয়। তার কারণ, মেয়েটি দুর্জ্জয় অভিমানী। অভিমান অর্থ যাহাকে কথায় বলে চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া, যাহার ফলে চণ্ডীদাসের রাধার মত শেষে বলিতে হয়—আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু। অভাগী মেয়েটি মায়ের উপর রাগ করিয়া অরুণকে লাঞ্ছিত করিল, অরুণের উপর রাগ করিয়া নিজের মাথা শেষে নিজে কাটিল।

শরৎচন্দ্রের এই বিশেষত্বটিই বিশেষ করিয়া দেখিবার জিনিষ। কারণ, বাংলা নাটকে বা উপন্যাসে জীবন্ত মানুষ বড় একটা দেখিতে পাই না। মানুষ গড়িতে গেলেই আমরা গড়িয়া ফেলি, বক্তৃতার সমষ্টি অথবা কাঠের পুতুল। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রে আর কিছু না থাকু, আছে টন্‌টনে প্রাণ। প্রাণের

তোড়, প্রাণের ঘূর্ণী শরৎচন্দ্রের মানুষের মর্ম্মকথা। তবে একটা গোটা মানুষ শরৎচন্দ্র আমাদিগকে দিয়াছেন কি না সন্দেহ। মানুষের প্রাণের একটা ধারা একটা তার লইয়া তিনি খেলিয়াছেন। সে তারটি সূক্ষ্ম, পাতলা, কসিয়া বাঁধা—একটা আঘাতের অপেক্ষা করিতেছে মাত্র, সে ধারা প্রথমেই হয়ত চোখে পড়ে না, একটুখানি তলে তলে চলিয়াছে সহজ সরল ভাবেই, কিন্তু বাধা পাইবামাত্র গর্জ্জিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, দিগ্‌বিদিক শূন্য হইয়া মারিয়াছে কি মরিয়াছে।

শরৎচন্দ্রে সেই সেই চরিত্রই সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে যেখানে দেখিতে পাই একটা অবাধ্য, কষ্টে বশীভূত চিন্তাবেগের খেলা, একটা স্নায়ব গতিকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা। এ যেন একটা স্প্রীংকে চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছি অর্থাৎ স্প্রীং যেন নিজেকেই নিজে চাপিয়া ধরিতেছে, কিন্তু চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় হওয়ায় অন্ততঃ তাহার পক্ষে—ছিটকাইয়া পড়িতেছে কিন্তু ছিটকাইয়া পড়িলেও আবার নিজেকে গুটাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে। এই 'সন্ধ্যা'তেই দেখুন না কেন, সহজ অবস্থায় তাহাকে ভালমানুষটিই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটা বিশেষ জায়গায় একটু আঘাত পাইবামাত্র সে ফোঁস করিয়া উঠিয়া ছোবল মারিয়া চলিয়া যায়। বেশ একটা কথা শুনাইয়া দিয়া অভিমান ভরে প্রস্থান সে কতবারই না করিল (পৃ ৮, পৃ ৫০, পৃ ৫৬, পৃ ৬৯, পৃ ৮১, পৃ ১৩২)। এক রকম ভাবে হঠাৎ প্রস্থান করাটা শরৎচন্দ্রে যেন একটা নিয়ম। জগদ্ধাত্রীর বেলাতেও এই রকম দেখি (পৃ ৩০, পৃ ৪৫)। অন্য ভাবে এই জিনিষটাই অনেক জায়গায় পরিণত হইয়াছে কটা পাগলামীর ধরণে মাথা থিয়েটারী ঢঙে।

র বিধি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়া সমাজিক সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া শরৎচন্দ্রে খেলিয়াছে স্বভাবের আদিম মৌলিক (primary, elemental) একটা কিছু দাবি। সে জিনিষ মানুষের মনের বস্তুও নয় হৃদয়ের বস্তুও নয়, যাহা হইতেছে মানুষের প্রাণময় স্তরের—সে দাবির টান বিশেষ ভাবে পড়িয়াছে যেন স্নায়ুমণ্ডলীর উপর। শরৎচন্দ্রের মানুষ একটা আদর্শের জীবন্ত মূর্ত্তি নয়—যেমন সোফোক্লিজের অন্তিকোণা সে-মানুষ সহজ হৃদয়াবেগের অনন্ত বিগ্রহও নয়—যেমন বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা। এ যেন প্রাণের একটি তার একটি স্নায়ু ভর করিয়া মানুষের একটা খণ্ডিত ভাগ (section) দেখাইতেছে আর সেইটিকেই গোটা মানুষ বলিয় বোধ হইতেছে। তাই শরৎচন্দ্রে স্বাভাবিক

নিত্য নৈমিত্তিক জিনিষই উপকরণ হইলেও, আবহাওয়াটা যেন কেমন স্বাভাবিক নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া বোধ হয় না। শিল্পীর যে ইহাতে দোষ হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে চাই না, কিন্তু শিল্পীর বিশেষত্বটি কি তাই বলিতেছি। শরৎচন্দ্রের একখানা বই পড়িতে গেলেই আমাদিগকে যেন প্রাণে মনে একটু দম দিয়া চড়া পর্দ্দায় উঠিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ এমন কি কপালকুণ্ডলাও যখন পড়ি তখন কিন্তু এ ভাব হয় না।

শরৎচন্দ্রের জীবন (অর্থাৎ যে জীবন তাঁহার শিল্পসৃষ্টিতে ধরা দিয়াছে) তাহা অনেক পোড়খাওয়া জীবন। সেই পোড়ানের ঝাঁজটা, একটা কুঁচ্‌কে-যাওয়া ভাবে তাঁহার জগতের অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় যেন, অনেক দোল খাওয়ার পর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে বটে কিন্তু মাথাটার মধ্যে এখনও রি রি করিতেছে। সেক্সপীয়রে যে অনুভব করি শত বিপর্য্যয়ের বিপুল বিচ্ছেদের মধ্যেও একটা স্থির সাম্য, বালজাকে সহজ স্বাভাবিক কার্য্য কলাপের মধ্যে পাই যে একটা নিবিড় গভীরতা, শরৎচন্দ্রে সে রকম প্রকৃতিস্থ ধাত ঠিক পাই না। তাই শরৎচন্দ্রে ততখানি গভীরতা পাই না, যতখানি পাই তীব্রতা, ততখানি অন্তরাত্মার প্রকাশ পাই না, যতখানি পাই প্রাণ-তরঙ্গের স্নায়ুসমূহের ঘোরালো তোড় ও জোর।

কিন্তু এই অনেক পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ জীবন একদিকে পাইয়াছে জীবনের খোলা সত্য, মামুলি জিনিষ নয়, মানুষের রক্ত মাংসের সহিত জড়িত কতক গুলি তাজা তক্‌ তকে বৃত্তি, আর একদিকে তেমনি সে জীবন সকল মানুষকে একটা উদার স্নেহভরে করুণাভরে আলিঙ্গন দিয়াছে। মানুষ কে মানুষ ভাবিয়া লইয়া, তাহার দোষ গুণ পাপ পূণ্য বিচার না করিয়া সরল ভাবে সকলের সহিত একপ্রাণ হওয়া শরৎচন্দ্রে একটা সৌরভের মত সব ছড়াইয়া উঠিয়াছে। স্বভাবই কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—এই স্বভাবকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ভাগ ভাগ করিয়া মানুষ ভালমন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাম দিতেছে। এই স্বভাব যখন বুঝিতে পারি ধরিতে পারি, তখনই হৃদয়ঙ্গম করি মানুষের মর্য্যাদা, সেই টুকু বুঝিতে পারিনা ধরিতে পারিনা বলিয়া, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আমাদিগকে বলিতে হয়—What man has made of man! প্রকৃত কবির শিল্পীর লক্ষণই এই উদার মানব-প্রীতি। মানুষের মধ্যে কোন একটা সত্যকে সুন্দরকে পাইতে হইলে, এই প্রীতির সম্বন্ধের তোরণ দিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। যে সমাজ মানুষকে মানুষ রূপে পাইতে

চাহিতেছে না, যাহার মধ্যে থাকিয়া মানুষের এমন দুরবস্থা সে সমাজকে পর্য্যন্ত কত প্রীতির চক্ষে আমাদের শিল্পী দেখিয়াছেন, সমাজের স্বভাব বুঝিয়া তাহাকেও সজল নয়নে আলিঙ্গন দিয়াছেন।

এইখানেই আমরা নিরস্ত হইলাম—মানব প্রীতিকে ছাপাইয়া প্রকৃতি-প্রীতি শরৎচন্দ্রে কেমন খেলিয়াছে, সেটাও অনুসন্ধান করিবার বিষয়। অনাবশ্যক প্রকৃতি বর্ণনা শরৎচন্দ্রে নাই, শুধু অলঙ্কারের রঙ ফলানের জন্য শরৎচন্দ্র প্রকৃতির দ্বারস্থ হন নাই। প্রকৃতিকেও শরৎচন্দ্র জীবন্ত কিছু বলিয়া অনুভব করিয়াছেন তাই তাহাকে বাজে মালমসলারূপেই ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার স্থান আমাদের আর হইল না।

আর শরৎচন্দ্রের রচনারীতি সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য মুলতুবি রাখিতে হইল। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরোয়া কথা বলিয়াছেন, ঘরোয়া কথার মত। তাঁহার ভাষাও সরল, সহজ অথচ সতেজ, গতিমান, শ্রীমান; এ ভাষা মন্থর ধীর স্থির নয়, এখানে আছে তীব্র ধার। এ ভাষাকে খুব স্বাভাবিক সুরে বোধ হয় পড়া যায় না, সামান্য একটু যেন নেশা করিয়া লইতে হয় কিন্তু ভাষায় অস্পষ্টতা জড়তা গুরু গম্ভীর ভারের লেশমাত্র নাই। ভবিষ্যতে সুবিধা পাইলে আমরা শরৎচন্দ্রের প্রতিভার এই দিকটা দেখাইব ইচ্ছা রহিল।

ভাব-সমর।

(শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার)

মৃত্যুর পর অন্ধকার—এটা অন্ধকার যুগ, যুগান্তের নিশার পর নবযুগের নবীন উষার উন্মেষের অপেক্ষায় ধরিত্রী গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মানুষের সাধনা ব্যর্থ, তপস্যা বিফল, ভাব স্তম্ভিত হয়ে গেছে—মৃত্যুর শ্মশানে শিব আজ পদদলিত, প্রকৃতি আজ অপ্রকৃতিস্থা, অন্ধকার ধরিত্রীর বুকে ভাবের জ্যোতিঃর নবজন্মের সম্ভাবনা কোথায়? তবে এ কলরব, আলোর এ চুম্‌কিবৃষ্টি উৎসারিত হ'ল কেন? ভাবের মুক্তি-কামনায় প্রকৃতি আজ মহাকালের বুকে নৃত্যশীলা বিভোরা, আত্মবিস্মৃতা। নবসৃষ্টির বিরাট অপেক্ষায় প্রকৃতি অধীরা!

মানুষের জীবন প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ করে স্থায়ী হ'তে পারে না, অনন্ত যে প্রকৃতির পরমায়ু, মানুষের জীবন ক্রমাগত সংগ্রাম করে সেখানে কয় সহস্র বৎসর টিকে থাকৃতে পারে? ব্যক্তির জীবন বা জাতির জীবন কালের অনন্ত সমুদ্রে শতাব্দীর সাধনা নিয়ে বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যাবে,—মানুষ যদি তার বিচিত্র সাধনা ভুলে যুগে যুগে উচ্চতর আদর্শে উন্নত না হয়। মানুষের সৃষ্ট নগর এক একটা বিরাট নাট্যশালা; নানা রংএ, নানা সাজে মানুষ চোখ মুখ লাল করে পথের মানুষকে সন্ত্রস্ত করে পথে পথে চলেছে! ছেলেবেলায় পয়সা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে বত্রিশ রকম ছবি দেখেছেন যাঁরা, তাঁরা বুঝ্‌তে পারতেন ঐ খাঁচাটীর ভেতর ছোট ছোট ছবি যেমন বড় করে দেখান হয়,—এ যেন তেমনই মন-প্রাণ ভুলান সুন্দর ফাঁদ। মানুষকে যুগে যুগে বুকে হাত দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে যে, মানুষ ফাঁদের মানুষ না, মুক্ত মানুষ। ফাঁদের জন্য সে সৃষ্ট হয়নি—পূর্ণ মনুষ্যত্বের সঙ্গমতীর্থ সাগর তার লক্ষ্য, বাঁধনহারা মুক্তি চায় তার অন্তরাত্মা, মানব সভ্যতার উচ্চতম ধাপে উঠে মন্দির-শীর্ষে স্বর্ণধ্বজ বেঁধে দিতে এখনও তার যুগযুগান্তরের সাধনা চাই।

মানুষের আদর্শ বা লক্ষ্য কি? উন্নত মনুষ্যত্ব। মানুষ বাইরের রাজ্যটা নিয়ে ভুলে ছিল, আজ সে অন্তর রাজ্যটা চায়, রূপ, ঐশ্বর্য্য চায় না সে, সে চায় রূপে আনন্দ, ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তি!

চায় কেন? রজনী শেষে উষার রক্তরবিরশ্মিগুলির মোহনস্পর্শে জীবজগৎ জাগরিত হয়ে কলরব করে কেন? দিনশেষে সন্ধ্যার বিলীনপ্রায় রক্তরশ্মিগুলি কোন আকর্ষণে ঘরের মায়া প্রাণের তারে বাজিয়ে যায়? প্রতি যুগসন্ধিক্ষণে কলরব আসে, তারপর আসে হয় আলো, নয় আঁধার! প্রকৃতির এই খেলা। দিনমণি মেঘের আড়ালে যায়, অন্ধকার পৃথিবীর বুক ছেয়ে যায়, মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যকিরণ স্পর্শে আলোর পিচকারীতে প্রকৃতি মেঘের গায়ে বিচিত্র রামধনু সৃজন করে, লাল-কাল, উঁচু-নিচু, ছোট-বড় ভেদ নাই, প্রকৃতির খেলায় সাতটী রং পাশাপাশি মেশামিশি যেমন আসে, তেমনই মিলিয়ে যায়! মানব সভ্যতার বিভিন্ন মেঘের স্তর নিয়ে প্রকৃতির এই যে বিচিত্র বিশ্বব্যাপী রামধনু সৃষ্টি—এরই কেন্দ্র জীবন-সূর্য্যটীর পরীক্ষা চলছে। প্রকৃতির এই জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে হয় অন্ধকারময় বিশ্বে আলোর পাপ্‌ড়িগুলি বিকশিত হবে, নয় ত নবসৃষ্টির আয়োজনে প্রকৃতিদেবীকে শতদল গুটিয়ে ফেলতে হবে। প্রকৃতিদেবী যুগযুগান্তর ধরে তার পাহাড়ে প্রমাণ নৈবেদ্য সাজিয়ে যার

আরাধনায় তন্ময় হয়ে আছে, সে নৈবেদ্য তাঁকে নিবেদন করবার উপযুক্ত দেবতা-পুরোহিত প্রকৃতিদেবীকে গড়তেই হবে।

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মাঝে মানুষ কতটুকু সময় প্রকৃতির কোলে খেলা করে? বৈজ্ঞানিকের হিসাবে সে সময় যতটুকু হ'ক, মানব-সভ্যতার পুঁথিতে সে বড় কম সময় নয়, কিন্তু মানুষ একই ভাবে ঐটুকু সময় খেলা যে করবে না, তার বিশিষ্টতা নিয়ে তার জীবনের অভিব্যক্তির ধারার ধাপে ধাপে সে উঠে এসেছে ও উঠে যাবে। মাঝে মাঝে এক একটা যুগসন্ধিক্ষণে এসে ক্ষণিকের তরে সে থমকে দাঁড়ায়, পাহাড়ের যে দুরারোহ সঙ্কীর্ণপথে এসে সে দাঁড়ায়, সেখান হ'তে সে অতিবাহিত শতাব্দীর দীর্ঘপথ ও দুরারোহ পথের একবার পর্য্যালোচনা করে লয়। মুক্তির যুগসন্ধিক্ষণ আসে, মানুষের আত্মা উন্নত নবজীবনে প্রতিষ্ঠা করে, আর তার সূচনা হয়—পুরাতনের বিসর্জ্জনে।

এই বিসর্জ্জনে বিষাদ হ'লে, মোহ এলে পূজা ব্যর্থ হয়—নবজীবনের প্রতিষ্ঠার শুভমুহূর্ত্ত বিফল হয়। পুরাতনকে প্রাণহীনকে ভাঙতে একটা বিষাদ আসে, নূতনের প্রাণপ্রতিষ্ঠার যুগে সে দুর্ব্বলতা পরিহার করা চাই, বিজয়া যে হর্ষবিষাদেরই দিন—প্রাণহীনের বিসর্জ্জনে বিষাদ, নূতন প্রাণের পূজার আয়োজনে হর্ষ যেমন স্বাভাবিক, জীবন্ত হয়ে প্রাণহীনকে বর্জন করার আনন্দ ও নবজীবনকে বক্ষা করার আশঙ্কাও তেমনই প্রবল। মানুষের জীবনে এ দিন এ শুভ মুহূর্ত্ত যতবার আসে ততবারই বিজয়া।

নূতনকে রক্ষা করতে বর্ত্তমানের বিচিত্র সাধনা চাই। জগতে বিলীনপ্রায় মগধের রাজ-অট্টালিকার স্মৃতিটুকু নূতনের আহ্বানে রাখতে চাই, কিন্তু তার [illegible] নিয়ে পূজা করলে নূতনকে গড়া হবে না। মানুষ তার মনুষ্যত্বকে পূজা না করে [illegible]পূজা করে, বুদ্ধ-শঙ্কর মানুষের সে ভুল ভাঙতে আসেন, কিন্তু মানুষ বুদ্ধ-শঙ্কর-মূর্ত্তি [illegible] পূজা করতে বসে যায়। চিত্রকর, ভাস্কর সেই মূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় তুলি বাটালি সঞ্চালনের কৌশল আবিষ্কার করে। ভুল করে সমান দুজনেই—যে অতীতের পুঁথি আবৃত্তি করে, নামাবলি গায়ে দিয়ে তিলক কেটে আচার-ধর্ম্ম পালন করে, আর যে শিক্ষার অভিমানে পশ্চিমের পুঁথি আওড়ে, হ্যাটকোট পরে এসেন্স মেখে "পাঁ ফাঁক করে সিগারেট" খেয়ে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করে। মানুষ যেদিন মনুষ্যত্বের আরাধনা করবে সকল বন্ধন সেদিন লুটিয়ে পড়বে, মুক্তি সেদিন মানুষের দ্বারে আসবে। নবজীবনকে অন্তরের মাঝে রূপ দিতে সকল মানুষই নিপুণ শিল্পী হবে। অন্তরে সে প্রেম একবার

উপলব্ধি করলে বিদ্বেষ থাকা দূরে থাক, বিশ্বকে বিলিয়ে দিয়েও যে সে প্রেম ফুরোবে না!

মানুষ আজ উন্নত পথের যাত্রী, তার পাথেয় এই বুক-ভরা প্রেম। প্রেমই পাথেয়, আর সব বোঝা; সভ্যতার বাঁধন যত বেড়েছে, জীবনের গতি তত কমেছে, বাঁধনও ততই ছিঁড়ে তার বোঝা হাল্‌কা করে নিয়ে মানুষ পথ চলেছে। যখনই উন্নত মনুষ্যত্বের চিন্তায় তার সহস্র বৎসরের দম্ভভরা সভ্যতা সঙ্কুচিত, আচার-ব্যবহার-ভরা সমাজ আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তখনই নবযুগের নবজীবনের সাড়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছে বলেই বাঁধন ছিঁড়ে জীবনের গতি বাড়িয়েছে। মানুষ হয়ে শুধু অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচলে চলবে না, তা'হলে ত প্রাণ থাকতে পচতে হবে। জীবনের স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ত্তভাব কোথায়? সে বৈচিত্র সে নবনব রূপমাধুর্য্যের আরাধনা কোথায়? দাম্ভিক যোগবর্ণ, বিজ্ঞান-বলে সভ্যতার মন্দিরের উঁচু ধাপে উঠে নীচের ধাপের মানুষটাকে "ছোট" বলে দেখেছে—ফলে মানুষ "নেশন" গড়ে জাতির বিরুদ্ধে অভিযান করেছে, স্বাধীনতার গৌরব ভুলে অতীতের গর্ব্বে অন্ধ মানুষ স্বরাজ্য হারিয়েছে, বিষয়-বৈভব বিসর্জ্জন দিয়ে ত্যাগে সে একেবারে মানুষের সংসর্গ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে। কিন্তু সবার "ছোট" নিখিল প্রকৃতিপুঞ্জ এ যুগে স্বরাট হতে, রাজপাট অধিকার করতে চেয়েছে।

পৃথিবী আজ একটী মহাদেশ, পৃথিবীর এক ধর্ম্ম, সে পয়সার ধর্ম্ম, মানুষের পৃথিবীতে একটী সম্বন্ধ সে ধনী ও নির্ধনের সম্বন্ধ, সর্ব্বত্র একজাতি সে ধনী, নির্ধনতার দাস—কোথায় মানুষের প্রাণ?

সুসভ্য মানুষ! যদি তোমার বুক-ভরা প্রেম নিয়ে আজ দীন-দরিদ্রকে বুকে দিতে চাও, তবে বোঝ যে আজ তোমার প্রাণের কৃষ্ণ যদি আসেন, তিনি তোমার এই ইটপাথরের সহরেই আসবেন—তোমার বৃন্দাবন, নদীপ্রান্তর আজ সব নির্জ্জন নিঝুম হয়েছে, মাঠে আর সে বাঁশী বাজবে না, দীনদরিদ্র নারায়ণ আজ তোমার সহরের কারাগারে সভ্যতার বন্ধনযন্ত্রণা ভোগ করছেন, তাই বাঁধনহারা মুক্তির সাড়া এই কারাগারে প্রবেশ করেছে;—প্রেমের অস্ত্র বিশ্বাস করে দৃঢ় চিত্তে গ্রহণ করবে যে, তার শৃঙ্খলভার নিমেষে ঘুচে যাবে।

ভারত আজ বিশ্বমানবকে পথের সন্ধান দিতে শেষ করে পাণিপথে চলেছে—ভাবের সমুদ্রতরঙ্গে পৃথিবী সন্তরন করে পাণিপথে ছুটে আসছে, এ ভাব-সমরে কামানের গর্জ্জন স্তম্ভিত, ভারতের নূতন ভাগ্যবিপর্য্যয়

সন্নিকট—এ যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে কি বিশ্বপ্রেমের জয় বিশ্বেশ্বরের অভিপ্রেত নয়? ভারত আজ ভারতমাতার বাণী পাণ্ডবজননী কুন্তীর আশীর্ব্বাদের সফলতা প্রার্থনা করে—"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

ছায়ানট

(হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইসলাম)

পথিক ওগো চল্‌তে পথে
তোমায় আমায় পথের দেখা,—
ঐ দেখাতেই দুইটি হিয়ায়
জাগলো প্রেমের গভীর রেখা।

এই যে দেখা শরৎ-শেষে,
পথের মাঝে অচিন্ দেশে,
কে জানে ভাই কখন্ কে সে
চলবো আবার পথটি একা।

এই যে মোদের একটু চেনার
আবছায়াতেই বেদন জাগে,
ফাগুন হাওয়ার মদির ছোঁওয়া
পূবের হাওয়ায় কাঁপন লাগে।—

হয় ত মোদের শেষ দেখা এই,
এম্‌নি ক'রে পথের বাঁকেই,
রইল শুধু চারটি আঁখেই—
চেনার বেদন নিবিড় লেখা।

সংক্ষিপ্ত-পুস্তক পরিচয়।

বিবেকানন্দ-চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। মূল্য ২॥• টাকা। প্রাপ্তিস্থান ভোলানাথ লাইব্রেরী, ৩• কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনী-লেখকেরা প্রায়ই দুই চারিটি অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা করিয়া রস জমাইয়া থাকেন; স্বামীজীর জীবনে অলৌকিক ঘটনার অসদ্ভাব না থাকিলেও গ্রন্থকার সেগুলির সাহায্যে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করেন নাই। স্বামীজীর জন্ম হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত মোটামুটি সমস্ত ঘটনাই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে, গ্রন্থকারের লিপি-কৌশলে মহাপুরুষের জীবন-নাটক অপূর্ব্ব বৈচিত্রে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে—কোথাও একটু "বুজরুকি" নাই, দার্শনিক বিতণ্ডা নাই, ভাব-বিলাসিতার উচ্ছ্বাস নাই। আমরা খাঁটি বিবেকানন্দকেই এ পুস্তকে দেখিতে পাই,— যিনি বলিয়াছিলেন—"I want to preach a man-making religion"। বাংলা ভাষায় ভাল জীবন-চরিতের সংখ্যা অতি অল্প, আলোচ্য পুস্তকখানি সে অভাব কতকটা দূর করিবে।

নিদ্রিত-নারায়ণ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৲• শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ইউরোপীয় কলকারখানাওয়ালা আসিয়া আমাদের দেশে যে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে অধ্যাপক রাধাকমল সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁহার এই নাটক খানিতে কুলি মজুরের দীনহীন প্রাণের কাতর ক্রন্দন যেরূপ তীব্র ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলা সাহিত্যে আর বড় কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কুলির জীবনে যে নারায়ণ "নিদ্রিত" তাঁহাকে জাগ্রত করাই গ্রন্থকারের সাধনা। তাঁহার এ সাধনা সিদ্ধ হউক।

স্বরলিপি

(গণিকার সিদ্ধি)

মিশ্র সারঙ্গ—কাওয়ালী।

[কথা—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার]

ন্‌া সা া | সা রা রা রা পা মা মা
মো রে — | সু খে ম জা — ই য়া

রা রা মা রা সা া ||
— রা — খে রে — ||

মা মা া | মা পা পা পা া পা পা া
র হি — | পা পে র শি — ক লে —

পা ধা মা পাধা ণা | ণা ণা া | ধা ধা া
সা — ধে রে — | র হি — | পা পে র

রা া পা পা া রা মা রা সা া ||
শি — ক লে — সা — ধে রে — ||

মা পা পা না া না া না র্সা র্সা র্সা
এ প ত নে — গো — র স ব ন

র্সা া র্সা া া না র্সা র্সা র্রা া
বি — ক — ল তা র আঁ খি —

র্রা র্সার্রা র্গার্মার্গা র্র র্রা র্সা ণা া
ছু টি —— ব রে ছ ল —

ণা । পা | মা পা পা না । না ।
ছ — ল | এ প ত নে — মো —

না র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা । । ণা
র স র ম বি — ক — ল তা

ণা ণা ধা ণা ধা ধা । ধার্সা ণা
র আঁ খি — দু টি — ক রে

ণা ধা পাধা গা । । | মা পা পা
ছ ল — ছ — ল | প তি তা

পা । পা । । পা ধা মা মা ধা
অ — ঙ্গে — — প তি ত পা —

পাধা ণা । ধা পা পা রা । পা পা
ব — ন প রা ণ কা — ড়ি য়া

রা রা মা রা সা । | (না সা ।) ||
— কাঁ — দে রে — | (মো রে —) ||

অবশিষ্ট অন্তরাগুলির স্বর প্রথম অন্তরার অনুরূপ।

পাত্র আবশ্যক

মেয়েটি বার বৎসরে বিবাহ হইয়া তেবয় বিধবা হইয়াছে। জাতিতে বৈদ্য। যাহার সহিত বিবাহ হয়, তাহার ছিল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, বরের পিতা তাহা গোপন করিয়া রাখেন। মা বাপের আদরের কন্যা, স্বামী কি ধন বুঝিল না; এই বয়সে তার ভরা হাটে আগুন লাগিয়া গেল। কোন সহৃদয় সুশিক্ষিত বৈদ্য-যুবক এই কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ৪।এ মোহনলাল ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার; কলিকাতা; নারায়ণ অফিসে সংবাদ লউন।

রাজগঞ্জ লাইব্রেরী।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] [ফাল্গুন, ১৩২৭ সাল।

বঙ্গভূমি

[শ্রীকালিদাস রায়।]

নমি শ্যামা ঘনশ্যামবসনা
করী-হরি শার্দ্দুল-আসনা।
মঠে মঠে পূজা তব তটে তটে বৈভব
দেশে দেশে তব যশোঘোষণা॥

ঘনবট সুশীতলা নবঘন কুন্তলা
সরসিজ বিলোচনা চারুনীপ কুণ্ডলা
উশীরাম্বুচর্চ্চিতা ধূপ দীপ অর্চ্চিতা
কুন্দ কুসুম সিত দশনা॥

স্নেহ তর খনিভরা, তরুভরা বনভূষা,
ধৃতফণি মণিমালা, ধৃতহেম মঞ্জুষা,
গিরি-বন্ধুর-দেহা বেতস-কুঞ্জ-গেহা
বিরচিত-ভাগীরথী রসনা॥

৯।

বাঙ্গালার সাধনা।

[শ্রীউষানাথ সেনগুপ্ত।]

শ্রদ্ধাস্পদ লালা লাজপত রায় প্রমুখ অনেকে আক্ষেপ করে বলেছেন, বাঙালী আত্মবিস্মৃতি হয়ে দিন দিনই পিছিয়ে পড়ছে। মাতৃপূজার পুরোহিতের হাতে আজ নাকি শঙ্খঘণ্টা পঞ্চপ্রদীপ আর নেই, আছে নাকি শুধু ভাঙ্গা কাঁসি আর নির্ব্বাপণোন্মুখ-দীপশিখা। কথাটা বাস্তবিকই যদি সত্য হয়, তা হলে সেটা যে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, তাতে আর সন্দেহ কি। আপাতদৃষ্টিতে সত্যই মনে হতে পারে যে ১৯০৫—১৯১২ সালের বাংলার সঙ্গে ১৯২০ সালের বাংলার কতখানি তফাৎ—সে যেন স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধান। কোথায় "যুগান্তরের" সেই উদাত্ত আহ্বান, প্রাণোন্মাদিনী জ্বালাময়ী বক্তৃতা, বোমা'র বিভীষিকা,—আর কোথায়ই বা আবেগহীন প্রাণহীন নিশ্চল স্থাণুর মত অবসাদ এবং জড়তা। মনে হয় যেন সোণার বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। *

বাংলা শ্মশান হতে পারে, কিন্তু সে মহাশ্মশান। আজ সেই মহাশ্মশানে নীরবে নিভৃতে এক অপূর্ব্ব শবসাধন চলেছে। নবীন বাংলা মহাকালেশ্বরকে জাগরিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর। আজ শবশিবাও সে সাধনার উপকরণ থেকে বাদ পড়েনি—ভ্রূকুটি আজ সেখানে মূক, মিথ্যাভয় অভী মন্ত্রে অনুপ্রাণিত। নবীন সাধকেরা আজ নাম জাহির করবার জন্যে ব্যস্ত নয়—সে মোহ তা'রা কাটিয়েছে। তারা চায় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে—যুগদেবতার শ্রীমন্দির গড়ে তুলতে।

সে শ্রীমন্দির কেবল বাংলার নয়, ভারতের নয়,—তা' বিশ্বদেবতার [illegible]রবী স্বর্ণচূড় দেউল—ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, সিয়া-সুন্নি, প্রটেষ্টাণ্ট রোমান [illegible]খিলিকের তাতে সমানই প্রবেশাধিকার। কিন্তু যুগ-দেবতার শ্রীমন্দির গড়ে তোলা দু' একজনের কাজ নয়। তাতে চাই প্রত্যেক নরনারীর সমবেত চেষ্টা ও সাধনা। তাই যুগধর্ম্মের সোণার কাঠির স্পর্শে বাংলার কতকগুলি চিরতরুণ প্রাণ আজ অন্তর্ম্মুখী তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আবার কতকগুলি প্রাণ পনর বছরের লাভ লোকসানটা খতিয়ে দেখছেন, ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে। কেউ বা আশা আশঙ্কার দোটানায় পড়ে এখনও কর্ত্তব্য ঠিক করে

* ছাত্রদিগের মধ্যে বর্ত্তমান আন্দোলনে একথা প্রমাণিত হইতেছে কি না তাহা ভাবিবার বিষয়।—সম্পাদক।

উঠতে পারছেন না—আবার কতকগুলি প্রাণ নিষ্পেষণের বিভীষিকায় পিছিয়ে পড়েছেন।

এই রকমভাব উপরসা দেখলে নিশ্চয়ই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বাংলার কর্মশক্তি আজ পঙ্গু—স্বাদেশিকতা প্রাণহীন—জাতীয়তার কল্পনা নিষ্পেষণের নির্দ্দয় চাপে বিদায়োন্মুখ।

নবীন বাংলার খাঁটি স্বরূপটি অনুভব করতে হলে কলকোলাহলের ঘূর্ণিপাক অতিক্রম করে, শান্তসমাহিত তলদেশটির সন্ধান নিতে হবে। বাংলার প্রাণশক্তি অস্থির লোকমত ও উদ্দীপনার গণ্ডী পার হয়ে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আজ লক্ষ্যের সন্ধানে আত্মস্থ। আজ বাংলা বাইরের উদ্দীপনায় তেমন সাড়া দিচ্ছেনা সত্যি, যেমন সে একদিন আপন ভোলা হয়ে আত্মবিসর্জ্জনের মন্ত্রে নিজেকে উৎসৃষ্ট করেছিল। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, বাংলার দৃষ্টি আজ বাইরে আবদ্ধ নয়—অন্তরে, উদ্দীপনায় নয়—আত্মসমাহিত ভাবসাধনায়, অল্পে নয়—ভূমায়!

বাংলার antithesis এর যুগ কেটে গিয়েছে, এটা চলছে synthesis কিংবা সামঞ্জস্যের যুগ। বাংলার সঙ্কট কালের নিশ্চয়ই একটা সার্থকতা ছিল এবং আছে।

ভাবের ধর্ম্মই হচ্ছে যে কোন উপায়ে নিজেকে মুক্ত করে তোলা। ভাব প্রথম অবস্থায় ঠিক সুসীম ও সংহত থাকে না ব'লে, ভাব মূর্ত্তিটাও একপেশে এবং অপূর্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু যুগ দেবতার রাজ্যে 'পূর্ণাৎ পূর্ণতর' স্রোত তরতর বেগে বয়ে যাচ্ছে। অপূর্ণ পূর্ণতরের মাঝখানে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তবেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। যুগধর্ম্মের এই শাশ্বতনিয়মে অপূর্ণভাব যখন [illegible]দৃষ্টিতে ব্যর্থ এবং নিষ্ফল বলে প্রতিভাত হয়, তখনই ভাব-সাধকের বুকফাটা হাহাকার, আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়।

ভাব-সাধকের চোখে আজ এটা মৃত্যু, যুগদেবতার অপার অনুগ্রহে তাই কাল আবার অমৃতের সোপান হয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারের ভিতর তিনি আবার আলোকের সন্ধান পান, অশিবের ভিতর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি আবার শিব ও সুন্দর হয়ে উঠেন—নীলকণ্ঠেরই মত, জগতের কিছুই বাদ না দিয়ে কিংবা পিছনে না ফেলে, সবাইকে নিয়েই তিনি আবার মহত্তর সত্যের ও সার্থকতার পথে অগ্রসর হন।

নবীন বাংলা আজ এই অমৃতের সন্ধানে বেরিয়েছে। লক্ষ্য স্থির করবার

জন্তেই এই বিক্ষোভহীন অচঞ্চল অবস্থা। আজ বাংলার এ লক্ষণ পরাজয়ের কিংবা মৃত্যুর নয়—এ যে জীবন ও জয়েরই পূর্ব্বাভাস। উদয়ারুণরাগের রক্তিম ছটা সাধক অন্তর্দৃষ্টিতে এখনই দেখতে পাচ্ছেন।

এবারকার এ অভিসার শুধু বাংলার যুবক নিয়েই আবদ্ধ নয়। আমার বাংলার মায়েরাও এবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার আয়োজন করছেন,—তাঁরাও নিজেকে বুঝতে, জানতে, চিনতে চেষ্টা করছেন। দু'জনের সম্মিলিত শক্তি এবং পরিপূর্ণ মিলনের মাঝখান দিয়েই বাংলায় এক অভিনব দেবজাতি গঠিত হবে। সেদিন জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের বিচিত্র সামঞ্জস্যে বাংলা ভাবলীলার কেন্দ্র হয়ে বিশাল বিশ্বে আপন আদর্শটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত হবে। বাংলাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ না করে বিশ্বমানবের মুক্তিকামনা করা বাঙালীর পক্ষে যেমন অস্বাভাবিকতা ও কপটতার নিদর্শন, বিশ্বমানবের মুক্তির দিকে লক্ষ্য না রেখে বাংলার মুক্তিকামনা করাও সেই রকম স্বার্থদুষ্ট, আত্মঘাতী ও ব্যর্থ। সকলকে নিয়ে যে আমি সেই হচ্ছে এবারকার পরিপূর্ণ আমি।

বাঙালী আজ জগৎকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছে। জগৎটা যুগদেবতার লীলায়িত প্রেম তরঙ্গের ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত—তাঁরই লীলানাট্যের রঙ্গভূমি। মানুষ সেই আনন্দ-ধারার সীমাবদ্ধ প্রতীক। যুগ-দেবতা প্রত্যেক মানুষের ভিতর দিয়ে তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন। মানুষ তাঁরই সাধনার যন্ত্র। নারায়ণ যুগে যুগে নরের অভিমুখে যাত্রা করেন, এবার নরও নারায়ণের অভিমুখে যাত্রা করবে। এবারকার মন্ত্র নর-নারায়ণ সাধনার মন্ত্র। নর, ভাগবত সত্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে, সংঘের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে, তারই কল্যাণের জন্য নিষ্কামভাবে সংঘে আত্মসমর্পণ করবে এবং এই আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়েই সে আবার আপনাকে বড় করে ফিরে পাবে। এবার আর নৈরাশ্যের মূর্চ্ছা [illegible]হ কিংবা ব্যর্থতার হাহাকার নেই—বাঙালী সুখ দুঃখ, লাভালাভ এবং পরাজয়কে সমজ্ঞান করতে শিখছে।

সংঘ আবার পরিপূর্ণ সত্য হয়ে তখনই দাঁড়াবে যখন ব্যষ্টিকে দলে', পিষে', অকর্ম্মণ্য না ক'রে সে তাকে স্বরাট্ হবার এবং পূর্ণস্বাতন্ত্র্য লাভ করবার অবকাশ দেবে। প্রত্যেক মানব আবার আপনার মণিকোঠায় ভাগবত সত্তা উপভোগ করে, সংঘকেও তদ্ভাবভাবিত করে তুলতে চেষ্টা করবে। ব্যষ্টি এবং সমষ্টির এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য এবং পরিপূর্ণ মিলনের মাঝখান দিয়েই যুগ-দেবতার লীলারহস্য প্রতিষ্ঠালাভ করবে।

এই ভাববিগ্রহটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার ভার বাংলার তরুণপ্রাণের উপর ন্যস্ত হয়েছে। আজ বাংলায় সেই শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সাধনা চলছে। সমস্ত ভারতকেও একদিন হয়ত এই পথেরই পথিক হতে হবে। বাংলা ভারতের সে শুভদিনের জন্য উৎকণ্ঠিত।

যুগপ্রবর্ত্তক, ত্যাগমন্ত্রদীক্ষিত আমার বাংলার তরুণসম্প্রদায়, তোমরাই এ নবীন যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্। প্রেমের প্রীতির আনন্দমন্ত্রের এই আহ্বান প্রথম তোমাদেরই প্রাণের দ্বারে এসে পৌঁছেচে। হৃদয় শতদলের প্রত্যেক পাপড়িটি মেলে, চিরনবীন আলোকটিকে সম্বর্দ্ধনা ও সার্থক করবার শুভমুহূর্ত্ত তোমাদের আসছে, ভাই, আসছে—তোমাদের প্রতিষ্ঠা নিয়েই যে তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা, সে কথাটা ভুলে যেয়ো না।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাধু চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই একটা দুর্ঘটনায় আমাদের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। আমাদের একটী ছেলে অকস্মাৎ মারা পড়ে। যতগুলি আমাদের ছেলে ছিল, তাহাদের মধ্যে সেইটীই বোধ হয় সব চেয়ে বুদ্ধিমান। তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কি ছিল যে, যে তাহাকে দেখিয়াছে সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মাথার মাঝখান হইতে কোমর পর্যান্ত মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া কি যেন একটা সড়াং করিয়া নামিয়া গেল। একটা অন্ধ রাগ আর ক্ষোভে মনটা ভরিয়া গেল। মনটা শুধু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"সব চুলোয় যাক, সব চুলোয় যাক্!"

বৈদ্যনাথে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে মন টিকিল না। অন্ধকার পথ যে দিন দিন আরও অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে তাহা বেশ বুঝিলাম।

কিন্তু উপায় নাই—চলিতেই হইবে। অনশন, অর্দ্ধাশন, আসন্ন বিপদ ও প্রিয়জনের ভীষণ মৃত্যুর মধ্য দিয়া এ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেই হইবে। এ বিবাহের যে এই মন্ত্র!

কিছুদিন পরে বৈদ্যনাথ হইতে সকলেই ফিরিয়া আসিল। সেখানকার বাড়ী চাবী বন্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিল। বোমার আড্ডা কলিকাতায় উঠিয়া আসিল।

কিন্তু পুলিশ যে আমাদের সন্দেহ করিয়াছে একথা মনে করিবার নানা কারণ ঘটিতে লাগিল। দেখিলাম বাগানের আশে পাশে রকম বেরকমের অজানা লোক ঘুরিতেছে। রাস্তা চলিবার সময়ও দুই একজন পিছে পিছে চলিয়াছে। মাণিকতলার সবইন্সপেক্টর বাবুও মাঝে মাঝে বাগানে আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে বৃথাই সন্দেহ করিতাম। তিনি বাগানটীকে শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীর আশ্রম বলিয়াই জানিতেন।

এই রকমে আরও একটা মাস কাটিল। শেষে মোজাফরপুরে বোমা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের পরমায়ু ফুরাইল।

সে দিনের কথা আমার চিরকালই মনে থাকিবে। একে বৈশাখ মাস, দারুণ রৌদ্র। তাহার উপর সমস্ত দিন টো টো করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সন্ধ্যার পর বাগানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন হাত, পা এবং পেট সকলেই সমস্বরে আমাকে বাপান্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং যমরাজ যদি তাঁহার মহিষটীর স্কন্ধে চড়িয়া আমাকে তখন তাড়া করিয়া আসিতেন তাহা হইলে আমি এক পা নড়িয়া বসিতাম কিনা সন্দেহ। সকলেরই প্রায় ঐ এক দশা। কিন্তু পেটের জালা বড় জালা, দুটী রাঁধিয়া না খাইলেই নয়। আমাদের ত আর রাঁধুনী বা চাকর ছিল না যে ঘুরিয়া আসিয়া বাড়া ভাতের থালে বসিয়া যাইব। ভাত রাঁধা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাঁট দেওয়া সবই আমাদের নিজের হাতে করিতে হইত। ছেলেরা তাড়াতাড়ি রাঁধিতে বসিয়া গেল আর আমরা কল্পনার রথে চড়িয়া ভারত উদ্ধার করিতে বাহির হইলাম। কিন্তু সেদিন শনির আমাদের উপর এমন খরদৃষ্টি যে ভাত নামাইবার সময় হাঁড়ি ফাঁসিয়া সব ভাত মাটীতে পড়িয়া গেল। ছেলেরা হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বুঝিলাম সে দিন মা লক্ষী আর অদৃষ্টে অন্ন লেখেন নাই। পেটে তিনটা কিল মারিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু বারীন্দ্র চিরদিনই উদ্যোগী পুরুষ, দমিবার পাত্র নহেন; তিনি সেই রাত দশটার সময় জ্বালানি কাঠের অভাবে খবরের কাগজ জ্বালাইয়া ভাত রাঁধিতে গেলেন। রাত এগারটার সময় ভাত খাইতে বসিতেছি এমন সময় আমাদের এক বন্ধু কলিকাতা হইতে নাচিতে নাচিতে উপস্থিত। কি সংবাদ? তিনি কোথায় শুনিয়া আসিয়াছেন যে বাগানে শীঘ্রই পুলিসের খানাতল্লাসি হইবে, আর আমাদের বাগান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। তথাস্তু, কিন্তু এ রাত্রে ত আর ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া বাহির না করিলে কেহ বাগান ছাড়িতে রাজী হইবে না। সুতরাং স্থির হইল যে কাল সকালেই সকলে আপন আপন পথ দেখিবে: বারীন্দ্র কিন্তু কয়েকজন ছেলেকে লইয়া সেই রাত্রেই কোদাল ঘাড়ে করিয়া যে দুই চারিটা রাইফেল ও রিভলভার বাহিরে পড়িয়াছিল সেগুলাকে মাটীর তলায় পুতিয়া রাখিয়া আসিল। আমাদের শুইতে রাত বারটা বাজিয়া গেল।

রাত্রি যখন প্রায় চারটা তখনও কতকটা গ্রীষ্মের জ্বালায়, কতকটা মশার কামড়ে শুইয়া শুইয়া ছটফট্ করিতেছি। এমন সময় শুনিলাম যে কতকগুলা লোক মস্‌মস্ করিয়া সিঁড়িতে উঠিতেছে, আর তাহার একটু পরেই দরজায় ঘা পড়িল—গুম্, গুম্, গুম্। বারীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই একটা অপরিচিত ইউরোপীয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল:—

"Your name?"

—"Barindra Kumar Ghose"

হুকুম হইল—"বাঁধো ইস্‌কো।"

বুঝিলাম ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্ব্ব এইখানেই সমাপ্ত। তবুও মানুষের যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আস। পুলিস প্রহরীরা ঘরে ঢুকিয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই ধরিতেছে, কিন্তু ঘর তখনও অন্ধকার। ভাবিলাম—now or never। আর এক দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিলাম চারিদিকে আলো জ্বালিয়া পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। রান্নাঘরের একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়া যায়; সেখানে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম নীচে দুইজন পুলিস প্রহরী। হায়রে! অভাগা যেদিকে চায়, সমুদ্র

শুকায়ে যায়। অগত্যা বারান্দার পাশে একটা ছোট ঘর ছিল তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরটী ভাঙ্গাচুরা কাঠ কাঠরায় পরিপূর্ণ, আরসুলা ও ইন্দুর ভিন্ন অপর কেহ সেখানে বাস করিত না। চহিয়া দেখিলাম একটা জানালার সম্মুখে একখানা জরাজীর্ণ চটের পরদা ঝুলিতেছে। তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জানালার ফাঁক দিয়া পুলিস প্রহরীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে রাতটুকু আর যেন কাটে না!

ক্রমে কাক ডাকিল; কোকিলও এক আধটা বোধ হয় ডাকিয়াছিল। পূর্ব্বদিক একটু পরিষ্কার হইলে দেখিলাম বাগান লাল পাগড়ীতে ভরিয়া গিয়াছে। কতকগুলা গোরা সার্জেণ্ট হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাবুক লইয়া ঘুরিতেছে। পাড়ার যে কয়জন কোচম্যান জাতীয় জীবকে খানাতল্লাসির সাক্ষী হইবার জন্ত পুলিসের কর্ত্তারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন তাহারা এক বিপুল-কায় ইন্সপেক্টর সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ "হুজুর, হুজুর" করিতে করিতে ছুটিতেছে। পুকুর ঘাটের একটা প্রকাণ্ড আমগাছের তলায় আমাদের হাত-বাঁধা ছেলেগুলা জোড়া জোড়া বসিয়া আছে, আর উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে বসিয়া ইন্সপেক্টর সাহেবের ওজন তিন মণ কি সাড়ে তিন মণ এই সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

ক্রমে ছয়টা বাজিল, সাতটা বাজিল, আমি তখনও পর্দ্দানসিন বিবিটীর মত পর্দ্দার আড়ালে। ভাবিলাম এ যাত্রা বুঝি বা কর্ত্তারা আমাকে ভুলিয়া যায়! কিন্তু সে বৃথা আশা বড় অধিকক্ষণ পোষণ করিতে হইল না। আমাদের অতিকায় ইন্সপেক্টর সাহেব জুতার শব্দে পাশের ঘর কাঁপাইতে কাঁপাইতে আসিয়া আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। পাছে নিশ্বাসের শব্দ হয় সেই ভয়ে আমি আপনার নাক টিপিয়া ধরিলাম। কিন্তু বলিহারী পুলিসের ঘ্রাণশক্তি! সাহেব সোজা আসিয়া আমার লজ্জানিবারিণী পর্দ্দাখানিকে একটানে সরাইয়া দিলেন। তারপরেই চারিচক্ষের মিলন—কি স্নিগ্ধ! কি মধুর! কি প্রেমময়! সাহেব ত দিগ্বিজয়ী বীরের মত উল্লাসে এক বিরাট "Hurrah" ধ্বনি করিয়া ফেলিলেন। সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চার পাঁচজন সাঙ্গোপাঙ্গ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ ধরিল আমার পা, কেহ ধরিল হাত, কেহ ধরিল মাথা। তাহার পর কাঁধে তুলিয়া হলুধ্বনি করিতে করিতে আমাকে একেবারে হাতবাঁধা ছেলের দলের মাঝখানে বসাইয়া দিল। আমার হাত বাঁধিবার হুকুম হইল। যে পুলিস প্রহরী আমার হাত বাঁধিতে আসিল—হরি! হরি!—সে যে

আমাদের 'বন্দেমাতরম্' অফিসের ভূতপূর্ব্ব বেহারা! কতকাল আমাকে বাবু বলিয়া সেলাম করিয়া চা খাওয়াইয়াছে। আজ আমার হাত বাঁধিতে আসিয়া সে বেচারীও লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

এদিকে খানাতল্লাসী করিতে করিতে গতরাত্রের পোঁতা রাইফেল ও বোমা গুলি বাহির হইয়া পড়িল। আর কোনও জিনিস কোথাও পোঁতা আছে কিনা জানিবার জন্ত পুলিস ছেলেদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিতেছে দেখিয়া বারীন্দ্র ইন্সপেক্টর জেনেরাল প্লাউডেন সাহেবের নিকট নালিস করেন। সাহেব হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দেন। বলেন—"you must not expect too much from us" "আমাদের নিকট হইতে বড় বেশী কিছু আশা করিও না।"

সে দিন ভিন্ন ভিন্ন থানায় লইয়া গিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ রাখা হইল। অদৃষ্টে তিনখানা পুরী ভিন্ন আর কিছু জুটিল না। পরদিনে প্রাতঃকালে সি, আই, ডি পুলিস আফিসে গিয়া শুনিলাম যে বাগান ভিন্ন আরও দুই তিন স্থানে তল্লাসী করা হইয়াছে এবং আমাদের সহিত সংস্রব ছিল না এরূপ অনেক লোকেও ধৃত হইয়াছেন। ডেপুটী সুপারিণ্টেনডেণ্ট রামসদয় বাবু আমাদিগকে দিদিশাশুড়ীর মত আদর যত্ন করিয়া তুলিয়া লইলেন। তাঁহার হাতে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড ঢোলকের মত মাদুলি বাহির করিয়া বলিলেন যে তিনি খ্যাতনামা সাধক কমলাকান্তের বংশধর; আর ঐ মাদুলীর মধ্যে কমলাকান্তের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন পদধূলি বিদ্যমান। আমাদের মাথায় সেই মাদুলীটী ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, কখনও হাসিয়া কখনও বা কাঁদিয়া কমলাকান্তের বংশধরটী আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার মত সুহৃদ আমাদের আর ত্রিভুবনে নাই। তিনি নাকি আমাদের কাজকর্ম্মের সহিত গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন; তবে কি করেন পেটের দায়—ইত্যাদি। বাগবাজারের আর একজন ইন্সপেক্টর বাবু অশ্রুনীরে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া আধ আধ স্বরে আমাদের জানাইয়া দিলেন যে আমাদের ধরিয়া তিনি যে কসাইবৃত্তি করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত। বলাবাহুল্য আমাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি (Confession) বাহির করাই এ সমস্ত অভিনয়ের উদ্দেশ্য। আইন কানুন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা যেরূপ প্রচণ্ড তাহাতে আমাদিগকে বধ করিতে তাঁহাদের বড় অধিক বেগ পাইতে হইল না। উল্লাস বলিল যে, যে সমস্ত বাহিরের লোক বিনা কারণে আমাদের

সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে তাহাদের বাঁচাইবার জন্ত আমাদের সব সত্য কথা বলা দরকার। উল্লাসের বিশ্বাস আমরা সত্য কথা বলিলেই ধর্ম্মাত্মা পুলীস কর্ম্মচারীরা তাহা বিশ্বাস করিয়া বেচারাদের ছাড়িয়া দিবে। বারীন্দ্র বলিলেন—"আমাদের দফা ত এই খানেই রফা হইল, এখন আমরা যে কি করিতেছিলাম তাহা দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার।" এই সমস্ত কথা লইয়া বিচার বিতর্ক চলিতেছে এমন সময় রায় বাহাদুর রামসদয় একখণ্ড হাতে লেখা কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। মহা উৎসাহে বলিলেন—"এই দেখ, বাবা, হেমচন্দ্রের statement, সে সব কথাই স্বীকার করেছে"। বলা বাহুল্য কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। হেমচন্দ্রের বলিয়া যে Statement টা তিনি আমাদের শুনাইলেন তাহা একেবারেই তাঁহার মনগড়া। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে সমস্ত ব্যাপারটা যে আমাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি বাহির করিবার জন্ত অভিনয় মাত্র তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা দুই একটা ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া সে রাত্রের জন্ত নিষ্কৃতি পাইলাম।

পর দিন দুপুর বেলা যখন আমাদের লালবাজার পুলিস কোর্টে হাজির করা হইল তখন ধর-পাকড়ের উত্তেজনা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। একটী ছেলে কাছে আসিয়া বলিল—"দাদা, পেটের জ্বালাতেই মরে গেলুম। কাল সমস্ত দিন পেটে ভাত পড়ে নি। দুপুর বেলা শুধু দুটী মুড়ি খেতে দিয়েছিল।" বারীন্দ্র লাফাইয়া উঠিল। কাছেই ইন্সপেক্টর বিনোদ গুপ্ত দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিল—"বাপু, আমাদের ফাঁসি, মাসি যা কিছু দিতে হয় দাও, ছেলে গুলোকে এমন ক'রে দগ্ধাচ্ছ কেন?" বিনোদ গুপ্ত তাড়াতাড়ি—"এই ইয়া ল্যাও, উয়া ল্যাও" করিয়া একটী সব-ইন্সপেক্টর বাবুর উপর খাবার আনিবার জন্ত হুকুম চালাইলেন, সব-ইন্সপেক্টর বাবুটী হেড কন্সটেবল ও হেড কন্সটেবলটী একজন অভাগা কন্সটেবলের উপর হুকুম জাহির করিয়া সরিয়া পড়িলেন। ফলে পুনঃ পুনঃ তাগাদায় এক গ্লাস জল ভিন্ন আর কিছু আসিয়া পৌঁছিল না। বিনোদ গুপ্তকে সে কথা জানাইলে তিনি একটা কাল্পনিক কন্সটেবলের উপর ভাঁটার মত চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিতে করিতে কোথায় যে অন্তর্হিত হইলেন তাহা আমরা খুঁজিয়াও পাইলাম না।

পুলীস কোর্টের লীলা সাঙ্গ হইবার পর আমাদের গাড়ীতে পুরিয়া

আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হইল। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে রাস্তায় পুলিস-কর্ম্মচারীরা আমাদের দুই খানা করিয়া কচুরী ও একটা করিয়া সিঙ্গাড়া খাইতে দিয়াছিলেন; এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে statement করিবার সময় গলা যাহাতে না শুকাইয়া যায় সেইজন্ত কাহাকে কাহাকেও এক এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। তবে সেটা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ধমক খাইবার পর।

কোর্টে গিয়া দেখিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি (Birley) সাহেব বিকট বদনে উঁচু তক্তের উপর বসিয়া আছেন। মুখ খানি যেন সাদা মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধান। দেখিলে মনে হয় যেন একটা মূর্ত্তিমান শাসন যন্ত্র। তিনি আমাদের statement গুলি লিখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি মনে কর তোমরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে পার?"

কথাটা শুনিয়া এত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসি আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাহেব, দেড় শ বৎসর পূর্ব্বে কি তোমরা ভারত শাসন করিতে? না তোমাদের দেশ হইতে আমরা শাসনকর্ত্তা ধার করিয়া আনিতাম?"

সাহেবের বোধ হয় উত্তরটা তত ভাল লাগিল না। তিনি খবরের কাগজের সংবাদদাতাদের বারণ করিয়া দিলেন যে আমাদের সহিত তাঁহার এ সমস্ত কথাবার্ত্তা গুলা যেন ছাপা না হয়।

কোর্ট হইতে গাড়ীবন্ধ হইয়া যখন আলিপুর জেলের দরজার কাছে হাজির হইলাম তখন সন্ধ্যা। জেল তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; আহারাদিও প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জেলার বাবু কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক এক মুঠা ভাত ও একটু করিয়া ডাল আমাদের খাইতে দিলেন। প্রায় দুই দিন অনাহারের পর সেই এক মুঠা ভাতই যেন অমৃত বলিয়া মনে হইল।

শিশুর ভিক্ষা।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

আজ্‌কে আমায় বকিস্‌ নে আর মা
আকাশ জোড়া এলো মেঘের দল
এই এখ্‌নি আঁধার-করা দিকে
বানের মতো আস্‌বে নেমে জল,
পুঞ্জ-বাঁধা মেঘের-বুকে-ডাকা
দেয়ার হাঁকে উঠ্‌ছে মহী কাঁপি'
আজ্‌কে আমি একটুখানি ওমা
বাইরে গিয়ে কর্‌ব লাফালাফি।

আজ্‌কে আমায় বকিস্‌ নে মা আর
মেঘেতে মা ঘির্‌ল চারি ধার
বুকের মাঝে উঠ্‌ছে কে মা নাচি'
ছুটী পেলে একটুখানি বাঁচি।

আজ্‌ আমারে বকিস্‌ নে আর মা
জাম ডালেরা কর্‌ছে হেলাহেলি
বাতাস পেয়ে পুঞ্জ পাতা যত
আমের শাখে কর্‌ছে ঠেলাঠেলি
গান-থামান' নদীর বুকে বুকে
জাগ্‌ল কালো কিসের কৌতূহল
ঝম্‌ ঝমা ঝম্‌ তীক্ষ্ণ বাণের মতো
এক্ষুণি মা আস্‌বে নেমে জল।

আজকে আমায় বকিস্‌ নে মা আর,
সবুজ-কালো ওই যে বনের ধার
সেথায় থেকে দিচ্ছে আমায় ডাক
নিষেধটা তোর রাখ মা আজি রাখ।

আজ আমারে বকিস্ নে আর মা
তাল সুপুরির কুঞ্জ-বনে-বনে
বাতাস আজি পাগল হ'য়ে ফেরে
কার সাথে বা জীবন-মরণ-রণে,
শুক্‌নো পাতা উড়ছে ঝড়ের বেগে
সত্যি যেন পতঙ্গদের দল
এক্ষুনি যে আস্‌বে নেমে ওমা
কত দিনের আকাশ ছাওয়া জল।

আজকে আমায় বকিস্ নে মা আর
আজ যে আমার ভিতর হ'ল বার,
তাল সুপুরির যেথায় হেলাহেলি
মন যে আমার সেথায় গেল মেলি'।

আজ আমারে বকিস্‌নে আর মা
সারাটা গাঁ উঠল যে আজ মেতে
নাচল মা আজ কার বা চরণ দুটী
স্বপন-দেখা সবুজ ক্ষেতে ক্ষেতে
বিজ্ঞ বটেও ওই যে মাথা নাড়ে
এতদিনের মৌন অচপল
বাতাস যে আজ আন্‌ছে ডেকে ওমা
কত দিনের ভুবন-চাওয়া জল।

আজকে আমায় বকিস্ নে মা আর
সকল মানা আজ যে ঘরের বার
বাহির আজি করছে মাতামাতি
ঐ যে ডাকে কর্‌তে মোরে সাথী।

আজ আমারে বকিস্ নে আর মা
ওমা আজি পড়ছি দুটী পায়
আকাশ বাতাস আজ যে উঠান-কোণে
কত দূরের গানটী রেখে যায়,

ভিতর আমার উঠছে কেঁদে কেঁদে
শুধুই দে মা এক নিমেষের ছুটি
আকাশ বাতাস ঐ যে মোরে ডাকে
আজকে আমার ছুটি—ওমা—ছুটি।

আজ আমারে বকিস্‌ নে মা আর
ভিক্ষে দেমা আজি একটী বার
বাহির হয়ে ক্ষণেক যাব ভুলি'
ঘরের যত বাঁধন-দেওয়া বুলি।

সুখের ঘর গড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এই ভবের পাত্র ও বাধার স্থল তাহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরকালি তর্কসিদ্ধান্ত। জীবনকালি জগতে এই একমাত্র ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ভয় করিত ও প্রাণপণে অপছন্দ করিত। তর্কসিদ্ধান্ত এক আশ্চর্য্য ব্যক্তি। ইহাঁর পিতা ছিলেন জগৎরাম ভট্টাচার্য্য। দোষে গুণে তিনিও একটী অদ্ভুৎ প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর দৈহিক ও মানসিক সমস্ত দোষগুলি দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীগর্ভজাত জীবনকালি ও তারাকালি দুই ভাইয়ে নিঃশেষে পাইয়াছিল। গুণগুলি সমস্ত বর্ত্তিয়াছিল প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত এই তর্কসিদ্ধান্তে। একই ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে এতটা গুণগত তারতম্য সচরাচর দেখা যায় না। টুলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও উদারতায় তেজস্বিতায় ও স্বাধীন চিন্তায় এরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাংলার ভাগ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাড়া আর দেখা যায় নাই। তাঁহার সহাধ্যায়ীরা তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া ম্লেচ্ছপণ্ডিত বলিত। তিনি না রাগিয়া ইহাতে গর্ব্ববোধ করিতেন; একজেও আবার সকলে তাঁহাকে পাগলা-পণ্ডিত বলিত। বিদ্যার চেয়ে বিজ্ঞতা ছিল তাঁর বিশেষত্ব। জীবনকালি ছিল ঘোর সংসারী স্বার্থপর ও তোষামোদজীবী। বিদ্যার দৌড় ছিল "বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ" মন্ত্রপাঠের মধ্যে। মধ্যম তারাকালী

ততটুকু বিস্তারও ধার ধারিত না। বরং অবিস্তা সাধনায় বিশেষ পটুছিল। বাড়ীতে গোচর্য্যায় ও কৃষিকার্য্যে তাহার বাকী সময় ব্যয় হইত। তেলে জলে যেমন স্বভাবধর্ম্মে মিশ খায় না, এই দুই ভাইয়ের সহিত তেমনি স্বভাব বৈলক্ষণ্যে মিল না হওয়াতে তর্কসিদ্ধান্ত রিক্তহস্তে ভিন্ন হইয়া একই ভিটায় বাস করিতে লাগিলেন।

ভিন্ন হইবার সময় তর্কসিদ্ধান্ত পৈতৃক বিষয় ও বাস্তর ভাগবাঁটরার সময় বৈমাত্রেয় ভাই দুটীকে ডাকিয়া বলিলেন—"শোনো দুজনে, বাপের বিষয় সম্পত্তির মধ্যে তো এই মাটীর ঘর, বিঘে পাঁচ ছয় হাজা শুকো জমী, গোটা কতক আফলা নারকেলগাছ আর ওই ভাঙ্গা ফুটো পেতল কাঁসার বাসন, তোমাদের যার যা ইচ্ছে বেচে নাও, পৈতৃক দায়ের মধ্যে বিধবা ভগ্নী আর আইবুড়ো ভাগিনেয়ী কেউ ভার না নাও আমিই নিলুম।" এ বিষয়ে আর দ্বিধা দ্বন্দ্ব না করিয়া জীবনকালী অগ্রজের অবাধ্য হইল না, দাদাকে বাপের দায় অংশ ভাগ করিয়া দিয়া সারাংশ নিজেরা লইল। কেবল চক্ষুলজ্জার খাতিরে পৈতৃক একটা কানা ছটাকে গাইগুরু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। তর্কসিদ্ধান্ত কনিষ্ঠদের আশীর্ব্বাদ করিয়া পৃথকান্ন হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, চরিত্র-গৌরব ও তেজস্বিতার গুণে তিনি চেতলার জমীদারের কাছে কিছু ব্রহ্মোত্তর লাভ করেন, ব্রাহ্মণের কলিতেও অন্নাভাব হয় না বলিয়া তিনি শীঘ্রই গুছাইয়া উঠিলেন। কনিষ্ঠদের কাছে ভক্তি শ্রদ্ধার ন্যায্য অংশ না পাইলেও তাহারা তাঁহার স্নেহ লাভে বঞ্চিত ছিল না।

জীবনের এক ভাবনা ছিল দাদাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইতে কি করিয়া নিষেধ করিবে? তর্কসিদ্ধান্ত তখন বাড়ী ছিলেন না, জীবন তামাক টানিতে টানিতে ভাবিতেছিল তর্কসিদ্ধান্তকে ভাঙ্গাইতে পারিলে তার মংলবটী পুরামাত্রায় হাসিল হয়। কিন্তু কাজটা অনেকটা বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত। বাড়ীতে ফিরিয়া জীবন গৃহিণীর কাছে শুনিল যে যজ্ঞেশ্বরী ব্রহ্ম-ঠাকুরাণীর সহিত আসিয়া তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই জীবন বলিল—"বটে? সাহস তো খুব? কি বল্লে তুমি?"

গৃ। আমি কি বল্‌বো? পেরথম্ তো চুপ করে রইলুম, না বল্লে নয় তাই বল্লুম তোমার বাড়ীতে নিষ্ঠেবান° বামুন পাত পাড়বে কি করে বাছা? তা কর্ত্তারা নেই বাড়ীতে আমিতো কিছু বল্‌তে পারছিনি—আর—পাত পেড়ে কি লোকের কাছে এক ঘরে হবো?'

জী। কি বলে উত্তরে ?

গৃ। বলবে আর কি ? দেমাকে ঠরকে ফিরে যাচ্ছিলো, তোমার ও বাড়ীর পিসি ঠাকরুণ বেরিয়ে এসে তাকে খাতির করে আসন পেতে বসালেন। সে কি খাতির! যেন বাপপিতেমোহোর ঠাকুর মশাই! ওরা নেমন্তন্ন নিলেন!

জীবন। বংশের আর বাড়ীর অপমানটা তো করতে হবে! সাধে দাদাকে সব বলে 'ম্লেচ্ছ পণ্ডিত!'

ঠিক সেই সময়েই তর্কসিদ্ধান্ত বাড়ীর উঠানে উপস্থিত। ভাইএর উক্তি শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—"কি হে ভায়া ম্লেচ্ছপণ্ডিতের কি কুচ্ছো হচ্ছে? বংশের কি মান হানি করে বসিছি ? কি গ্রহ!

প্রথমটা থতমত খাইয়া জীবন সামলাইয়া লইয়া বলিল—"শুনেছ দাদা ?

তর্কসিদ্ধান্ত। শুনেছি বই কি!......মাথায় দুটো কাণ থাকতে এই দশ হাত দূর হতে শুনতে পাব না ?

জীবন। এ কথা নয়; লোকনাথ মুখুয্যের পরিবারের কীর্ত্তি ?

তর্ক। কি রকম ?

জীবন। রকম আর কি ? গ্রামশুদ্ধ 'ঢি' 'ঢি' পড়ে গ্যাছে, আর তুমি শোননি ?

তর্ক। বটে নাকি ? তা হলে আমার শ্রুতি দোষ ঘটেছে বা! সে যাক্ শুনিই না কি কীর্ত্তি এমন যাতে গ্রামে ঢি ঢি পড়ে গ্যাছে, আর নারদ মুনিদের ঢেঁকী টলেছে? কি গ্রহ!

অপ্রিয় বক্তব্য শেষে 'কি গ্রহ!' 'কি পাপ!' উক্তি গুলি তর্কসিদ্ধান্তের ছিল যাকে বলে 'লব্জ।' জীবনকালী দাদার এই শ্লেষবচনে উত্যক্ত ও অধৈর্য্য হইয়া বলিল "কীর্ত্তি নয় কিসে ? বাউনের মেয়ে, তাতে বিধবা! স্নান করে মুসলমানের বদনায় জল তুলে দিলে, মুসলমানকে ছুঁলে, অথচ স্নান করলে না—এ সব অনাচার নয় ? আবার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ানো! তারপর এখন যজ্ঞি করে বাউনদের জাত মারবার ফন্দী করেছে—"

তর্ক। অনাচার নয়? ঘোর অনাচার! এর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত তুষানল কিন্তু ভায়া তার আগে তোমার আমার তুষানল হওয়া উচিৎ আর তোমার জমীদার যজমান বাবুরও চিতানল হওয়া কর্ত্তব্য কেননা এই সে দিন তুমি আমি রহিম জোলার বিক্রি গুড় কিনে খেয়েছি আর তোমার জমীদার

বজমান ইনসপেক্‌টার বাবুকে "মহ্‌নিবিদ্ধা পক্ষী", নিজের বাড়ীতে রেঁধে খাইয়েছেন ; এবং পেসাদও পেয়েছেন—নয় কি ? আর মুখুয্যে গিন্নির অপরাধ তৃষ্ণার্ত্তকে একটু জল তুলে দিয়েছে ! আর কি বল্লে ? বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে ? কি পাপ্‌ ! অনাচার তো বটে ?

জীবন। জোলার গুড় খাওয়াটা এমন দোষ হল ? সকলেই তো খায় ?

তর্ক। আর তৃষ্ণার্ত্তকে জল দেওয়া বা ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান তাতে এতই দোষ ? এমন শাস্ত্রজ্ঞ কবে হলে ভায়া ?

জীবন। আর জমীদার বাবু কি খেয়েছে না খেয়েছে দেখেছো ?

তর্ক। কি গ্রহ ! সবই কি স্বচক্ষে দেখে বলতে হবে ? তুমি কি নিজে দেখেছ মুখুযো গিন্নিকে উক্ত কাজ করতে ?

জীবন। আমি না দেখি, যারা দেখেছে তারা কি মিথ্যা রটাচ্ছে বলতে চাও ? তোমার ভাদ্দরবধূ দেখেছেন সে কি মিথ্যা বলবে ?

এই সময় ভাদ্রবধূ পশ্চাৎ হইতে কানে কানে যজ্ঞেশ্বরীর দ্বিতীয় কীর্ত্তির কথা বলিলেন :—"আর সেই কথাটা বলনা গো ? এটাও আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি ?" জীবন তখন হাঁক দিয়া ডাকিয়া বলিল—"আবো শোনো—"

তর্কসিদ্ধান্তের ইচ্ছা ছিলনা এই তর্কযুদ্ধের দ্বিতীয় কাণ্ডের অভিনয়ে যোগ দেন। তিনি নিজের ঘরের দাওয়ায় উঠিতেই একটী ১২।১৩ বছরের তন্বী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পরমা সুশ্রী কিশোরী মেয়ে আসিয়া একটা পিড়ি পাতিয়া দিয়া বলিল "মামা তামাক সেজে এনে দেবো ?" "হাঁ বুড়ী মা দাও,—তার পর আরো কি শোনবার আছে ?"

জী। সে দিন ইস্‌মাইলের মা, পরিবার আর ছেলেকে বাড়ীতে এনে নিজেদের বাসনে খুব খাওয়ানো হলো—আবার সেই বাসন হেঁসেলে তোলা হ'ল। অনাচার নয়—

তর্ক। আমি বলি বা বেঁধে বেত লাগালে। নিজেদের বাসনে খাওয়ালে এনে যত্ন করে ? কি পাপ।

জী। (ক্রোধ পূর্ব্বক) বোঝ কথাটা তার পর বিদ্রূপ করো—নিজেদের বাসন কোসন দিয়ে তাদের খাওয়ানো হলো আর সেই গুলো আবার নিজের ঘরে তুলে নিয়ে ব্যবহার করছে। আক্কেল দেখ। অনাচার কাকে বলে ?

তর্ক। ঘোর অনাচার বটে। দামী জিনিষ গুলো ফেলে দেবে বলতে চাও ?

জী। হিন্দুর বাড়ী তো? ওগুলো ওদের ছুঁতে দেওয়া কেন?

তর্ক। অতিথিকে নারায়ণ ভেবে পূজা সৎকার করা হিন্দুরই কর্ত্তব্য। ছোঁওয়া ছুঁয়ি বলছো ভায়া, জোলা মুসলমানের সিদ্ধ চাল, গুড় এসব পেটে দিচ্ছ তো? আর ছোঁওয়া-বাসনগুলো এমনি অপকর্ম্ম করলে? এর চেয়ে সত্যকার মহাপাতকী কত আছে সমাজে, তাদের তো সমাজ মেনে নিয়ে চোখ বুজে বেশ চলে যাচ্ছে? দুটো বাসন এমনি অপরাধ করলে? আগুনে ছুঁইয়ে নিলে সবই পবিত্র হয়ে যায় জানতো শাস্ত্রের বিধান? কি বিড়ম্বনা!

জী। তোমার শাস্ত্র আলাদা—

তর্ক। তা জান যদি তবে আর বাক্য ব্যয় করছ কেন?

জী। তা হলে তুমি যাচ্ছ নেমন্তন্নে?

তর্ক। অবশ্য যাব, নিশ্চয় যাব। তুমি ওঁর যা পরিচয় দিলে তাতে আমার মনে হচ্চে ওঁর পায়ের ধুলো আমার ভিটেয় পড়াতে নিজেকে ধন্য মনে করছি!

জী। জমীদার বাবুর ইচ্ছে ও বাড়ীতে এ গ্রামের কেউ পাত না পাতে—

তর্ক। তাঁর ইচ্ছে তুমি মেনো, তোমার অন্নদাতা তিনি। আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি শুনি? কি গ্রহ! তবে বলতে পার গৃহদাহের ভয়—

জী। বলছ কি দাদা? যা তা বলে বিভ্রাট ঘটাবে নাকি?

তর্ক। অতি সত্য কথা যা স্বচক্ষে দেখেছি তাই বলছি। সমুদ্রে যার বাস, ভায়া, শিশিরে তার ভয় করলে চলে কই?

ভাগ্নী উমাতারা তামাক সাজিয়া আনিল। তর্কসিদ্ধান্ত ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। উমা মামার কাঁধ হইতে নামাবলীটা লইয়া আলনায় মেলিয়া দিল।

জীবন বেগতিক দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিল। অন্নদাতার দুর্নাম ও অপমানটা সে তীব্র ভাবে হাড়ে হাড়ে বোধ করিল, এবং এ ক্ষেত্রে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই বুঝিয়া তথায় যাওয়াই স্থির করিল। কি ভাবিয়া বাহিরে গেল।

তর্কসিদ্ধান্ত তামাক খাইতে খাইতে একটু হাসিয়া আপনা আপনিই বলিলেন—"ভায়া আমার নিকর্ম্মা হয়ে অনেক দিন বসেছিল, এই বার হাতে

কাজ জুটলো বুঝি?" তারপর ভাগ্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—'বুড়ীমা কোথা গেলি?' উমাতারা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। তাহার ঘাড়ে একবোঝা লেপ তোষক বালিস।

উমা। কেন মামা?

তর্ক। ও কিরে? ও সব কোথা নিয়ে যাবি?

উমা। দাদার ঘর পরিষ্কার করছি? দাদা কাল আসবে যে?

তর্ক। পঞ্চু? কে বল্লে?

উমা। বাঃ তুমি চিঠি পড়নি?

তর্ক। কই? না? পঞ্চু পত্র দিয়েছে?

উ। মাসি দেয়নি?

মাতৃহীনা উমার মাসি ভবতারিণী তর্কসিদ্ধান্তের ভগ্নী রান্না ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। হলুদ মাখা হাত আঁচলে মুছিয়া চালের বাতা হইতে একটা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া ভাইয়ের হাতে দিয়া বলিল—'হ্যাঁ দাদা, এই একটু আগে হরি পিয়ন পত্র দিয়ে গেল, উমা পড়ে বল্লে পাঁচু কাল দুপুরের গাড়ীতে আসবে?'

তর্ক। পূজোর ছুটী বুঝি আরম্ভ হয়েছে?

উমা তখন বাহিরের আল্‌নাতে বিছানা মেলিতেছিল। সে হঠাৎ বলিল—বড় দিনের ছুটী কবে মামা?

তর্ক। হঠাৎ একথা কেন জিজ্ঞেস করলি? সে তো শীতকালে?

উ। (হাসিয়া) দাদা বলে গিছ্‌লো বড় দিনের ছুটিতে যখন আসবে, তখন আমার জন্তে 'দিদিমার থলে' বই আনবে। তাই মনে আছে—হ্যাঁ মামা ঐদিন যিশু জন্মেছিলেন বলে তো বড়দিন বলে। গুড্ ফ্রাইডে কি?

তর্ক। (কৃত্রিম বিস্ময় ও রহস্তের স্বরে) অ্যাঁ! তা জাননি,—মেয়ের স্কুলে পড়? তোমাদের সদাপ্রভু ঐ দিন কবর হতে উঠে স্বর্গে গিয়েছিলেন।

উ। হ্যাঁ তা বুঝি হয়? আচ্ছা মামা তা কি সত্যি? মানুষ মলে আবার বাঁচে?

তর্ক। সদাপ্রভু কি মানুষ রে বুড়ীমা? তিনি যে দেবতা ছিলেন। তোমার সাবিত্রী যমের বাড়ী গিয়ে স্বামীকে বাঁচিয়ে আনতে পেরেছিল বিশ্বাস হয়?

উ। তা হবে না কেন? মহাভারতে লেখা আছে তা কি মিথ্যে হয়?

তর্ক। তবে? ওঁদেরও বাইবেলে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে তাই বা মিথ্যে হবে কেন?

উ। ওদের বুঝি ধর্ম্মশাস্ত্র আছে! ওরা যে খৃষ্টান!

তর্ক। ওঃ দাঁড়াও তোমার টীচারকে বলে দেবো—আর প্রাইজ দেবে না!

উ। নাই দিক্ আমিতো আর পড়তে যাব না—

তর্ক। কেন?

উ। মাসি মানা করেছে, যেতে দেবে না!

বোনঝির অভিযোগ শুনিয়া ভবতারিণী বাহিরে আসিয়া বলিল—"হ্যাঁ দাদা আর কি ওর যাওয়া উচিত স্কুলে?"

তর্ক। কেন না? যা বুড়ীমা আমার পূজোর ফুল তুলতে যা—(উমা চলিয়া গেল)।

ভব। একতো বারো গিয়ে তেরোয় পড়েছে, অত বড় মেয়ের আর বাইরে বেরোনো ভাল কি? আর তা ছাড়া লোকে দোষ দেয় যে পুরুত পণ্ডিতের বাড়ীর মেয়ে খৃষ্টানী স্কুলে পড়তে দেওয়া—

তর্ক। আমিওতো একটা লোক! আমার বিবেচনা বুদ্ধি নেই? আর দেখ এরি মধ্যে ঐটুকু মেয়ের মনে দিনরাত 'বড় হয়েছে' 'বড় হয়েছে' করে শুনিয়ে শুনিয়ে মনে অন্য ভাব জন্মিয়ে দেওয়াটা কি ভাল? একটু লেখাপড়া শিখছে শিখুক না? দুদিন দু'খানা বই পড়লে হিঁদুর মেয়ের হাজার বছরের সংস্কার নষ্ট হবে না। আর খ্রীষ্টানী স্কুল যা বলছ—তার উপায় কি? নিজেদের মনমত মেয়ে স্কুল থাকলে কি আর ওখানে দি দিদি? নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল নয় কি? আমগাছের গোড়ায় নুণ জল ঢাললে কি আর আম নোন্‌তা হয়রে দিদি? তা হয় না—সে যাগ্। মুখুয্যে গিন্নি নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন?

ভব। হ্যাঁ। (চুপে চুপে) ছিঃ ছিঃ দাদা ভদ্রঘরের মেয়ে বাড়ী বয়ে নেমন্তন্ন করতে এ'ল তা মেজোবৌএর কি ব্যাভার গো! বসতেও বল্লে না! আমি আবার ডেকে এনে হাতে ধরে বসাই, কথা কই। কি খাসা মানুষ, দাদা—বুড়ীকে ডেকে কাছে বসিয়ে কত আদর সোহাগ করলে। নেমন্তন্ন করতে কত যেন স্তুতি-মিনতি! লজ্জায় মরে যাই! কি মুখের মিষ্টি বাক্যি!

তর্ক। যাগ্ তোর কথা শুনে একটু আশ্বাস হল?

ভব। ও কথা কেন বল্লে?

তর্ক। তোদের মুখে তোদের জেতের প্রশংসা কষ্ট তো বড় শুনিনি বোন্?

ভব। আমরা কি আমাদের জেতের নিন্দে কুচ্ছোই করি?

তর্ক। তার ব্যতিক্রম দেখেছিস্ কোথাও?

ভব। না দাদা। সত্যি গুণ দেখলে বলবো না?

তর্ক। সেইটেই করো দিদি। নিজেদের পায়েব আর্দ্ধেক কাঁটা অমনি উঠে যাবে—

ভব। ভাল কথা! আমরা তা হলে যাব তো নেমন্তন্নে?

তর্ক। নেমন্তন্ন নিয়ে যাবিনি কি রকম?

ভব। না তাই জিজ্ঞেস্ করছি, শুনছি মেজদা বাড়ী বাড়ী গিয়ে সব বারণ করে এসেছে,

তর্ক। তোমায় আমায় তো করেনি? আমার ছাত্রদের তো করেনি? ও বিষয়ে ক্রটী হবে না। সে যাগ্, এখন 'যা দেবী ক্ষুধারূপেণ সর্ব্বজীবেষু সংস্থিতা'! দেবীর প্রকোপ হয়েছে।

ভব। যাও না নাইতে, আমার তো হয়ে গেছে রান্না-বান্না।

তর্কসিদ্ধান্ত হুঁকা রাখিয়া উঠিলেন। ভবতারিণী রান্নাঘরে ফিরিলেন। উমাতারা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মুখখানা কান্নার মত করিয়া একসাজি জবা দোপাটী টগর লইয়া উপস্থিত।

তর্ক। কিরে বুড়ীমা কি হয়েছে? অমন করছিস্ কেন?

উ। কাঁটা ফুটে গেছে পায়ে—

তর্ক। খপরদার বুড়ীমা! কারুর ধর্ম্মকে নিন্দে কর না। 'সদা প্রভু' তোমার এই শাস্তিটী করলেন।

কথা শুনিয়া উমা কাঁদন-কাঁদন মুখেও হাসিয়া ফেলিল। উত্তর না দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে ঠাকুর ঘরে ঢুকিল, কিন্তু পরিহাস করিয়া বলিলেও মামার কথাটা তার তরুণমনে ইঙ্গিতে একটা ভয়ের দাগ কাটিয়া দিল। হবেও বা! সে আর কখনো কোনো জাতের শাস্ত্রকে ঠাট্টা করিবে না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল।

দুই প্রণয়ী।

[শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।]

আরসীতে বিকসিত সরসিজ-মুখ,
হরষিত উছসিত রসিকার বুক।
যুবকের প্রাণে জলে পাবকের জালা।
বসি পদমূলে পূজে, করে ফুলমালা।
পাশে জড়সড় জরা জর-জরজর।
বরদেহ জড়াইতে বাড়াইছে কর,
জুড়াইতে আশা তার, পূরাইতে সাধ,
পাইয়াছে সেও এই যৌবন-সংবাদ।

বৈদিক ভাষায় স্বর-প্লুতি

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ।]

মনের ভাব মুখে ফুটিয়া উঠে। শোক তাপ ক্রোধ ভয় লজ্জা অভিমান মনের ভিতর থাকিয়া মুখশ্রী ম্লান করে। সুখ শান্তি আনন্দে মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়। এইজন্ত মুখকে হৃদয়ের দর্পণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। মনটা আমাদের ভিতরের দিক আর শরীরটা বাহিরের দিক। মনটাকে দেখা যায় না, কিন্তু শরীরটা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়। এই শরীর ও মনের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক আছে যে একটীর অসুস্থতায় অন্তটী অসুস্থ হয়। দুশ্চিন্তায় যেমন শরীর খারাপ হয়, শারীরিক ব্যাধি হইলেও সেইরূপ মন খারাপ হয়। শারীরিক যন্ত্রণা অধিক হইলে লোকে মৃত্যু কামনা করে, বালিকাদিগেরও সেইরূপ আজকাল একটা সংক্রামক মনোব্যাধি জুটিয়াছে, যাহার ফলে প্রায়ই আত্মহত্যার বিবরণ কাগজে উঠিতেছে। মনের সহিত শরীরের এই সম্পর্কের ফলেই দুঃখে নয়ন সিক্ত হয়, শোক-প্রভাবে লোকে চীৎকার

করিয়া রোদন করে। প্রহার করিলে পশু চীৎকার করে। এই প্রকারে মনের ভাব বাহিরে অভিব্যক্ত হয়।

ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি। মনের ভাবটী অন্যের গোচর করাই ভাষার কার্য্য। ভাব অন্তরের জিনিস, কিন্তু ভাষা বাহিরের জিনিস। ভাষা ভাবের বাহন। একজনের মন হইতে অন্যের মনে যাইবার জন্য ভাব ভাষা-রূপ বাহন কর্তৃক বাহিত হয়। কিন্তু কেবল মাত্র শব্দই ভাষা নহে। জিহ্বাই প্রধানতঃ বাগিন্দ্রিয় আখ্যায় আখ্যাত হইলেও আমরা চক্ষু ও হস্ত দ্বারা অনেক প্রকার কথা বলিয়া থাকি। তর্জ্জন করিবার শক্তি আছে বলিয়া আমাদের অঙ্গুলি-বিশেষের নাম তর্জ্জনী। আমাদের অপাঙ্গ ভঙ্গীতে সম্মতি, তিরস্কার, অসম্মতি, আহ্বান, বিদায় প্রভৃতি অনেক ভাব প্রকাশ করে। হস্ত দ্বারা আহ্বান ও বিদায় আমরা প্রায়ই প্রকাশ করিয়া থাকি। চোখ-রাঙ্গানো কথাটার মূলে চক্ষের রক্তিমা থাকুক আর নাই থাকুক, মানসিক ক্রোধের অভিব্যক্তি হয়। চোখ-রাঙ্গানো যাঁহাদের অভ্যাস তাঁহারা যে চক্ষু রক্তবর্ণ করেন তাহা নহে। বস্তুতঃ তাঁহাদের মুখমণ্ডলের এমন একটা বিকৃতি ঘটে যাহাতে ভীতি-প্রদর্শন প্রকাশ পায়। সেইজন্যই চোখ-রাঙ্গানোর প্রতিশব্দ মুখখিচুনি। মনের ভাব প্রকাশের জন্য এই সকল প্রক্রিয়া সঙ্কেত বা ইঙ্গিত নামে অভিহিত হয়। বাগিন্দ্রিয়-প্রসূত ভাষাও এই প্রকার মনোভাব প্রকাশের জন্য একটা বড়-রকম ইঙ্গিত—ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। এক একটা ধ্বনির সহিত এক একটা অর্থ এমন ভাবে মিশাইয়া গিয়াছে যে মনোমধ্যে একটীর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যটীর আবির্ভাব হয়। তাই কবি কালিদাস পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের অবিচ্ছিন্ন মিলকে বাগর্থ-সম্পর্কের সহিত উপমিত করিয়াছেন।

বাগিন্দ্রিয় যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করে তাহার সবগুলিই যে অর্থ-সম্পৃক্ত, তাহা নহে। অনেক নিরর্থক শব্দ আছে। পাখীর কলরব, শৃগালের হুক্কা-হুয়া, কোকিলের কাকলি, যুদ্ধাশ্বের হ্রেষারব, মদমত্ত বারণের বৃংহিত, মশকের গুঞ্জন, মক্ষিকার ভন্-ভন্ শব্দ প্রভৃতি নিরর্থক শব্দ। কিন্তু এ সকলেরও এক একটা অর্থ আছে। "পাখী সব করে রব" প্রাতঃকালের প্রকাশক। শৃগাল রাত্রিকালে শব্দ করিয়া রজনীর পরিমাণ বুঝাইয়া দেয় বলিয়া তাহার নাম যামঘোষ। কোকিলের কাকলি মনে পড়াইয়া দেয় যে বসন্তকাল চলিতেছে। যুদ্ধাশ্বের হ্রেষারবে যুদ্ধের আহ্বান পরিস্ফুট। বারণের বৃংহিতধ্বনি আমাদের ভীতির কারণ এবং অন্য হস্তীর পক্ষে যুদ্ধে আহ্বান। আবার বারণীর পক্ষে

মধুর সঙ্গমের দ্যোতক। মশকগুঞ্জন দংশনভীতি ও বিরক্তির হেতু। বর্ষাকালের মাছির ভন্‌-ভনি সংক্রামক ব্যাধির প্রচারক এবং ভীতি ও বিরক্তির কারণ। এই সকল স্থলে পক্ষী বা শৃগালের মনের ভাব হয় ত আমরা বুঝি না, কিন্তু তাহাতে আমাদের মনে একটা ভাব জাগরিত হয়, তাহা বেশ বুঝি। অশ্বের হ্রেষারব হইতে আমরা অশ্বের মনের ভাবও বুঝি। কারণ—এটা যেন একটা ছবি। চিত্রশিল্পী অশ্বের চিত্র আঁকিলে তাহা দেখিয়া যেমন আমরা অসঙ্কোচে চিনিতে পারি, যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বের হ্রেষারব হইতেও সেই প্রকার বুঝিতে পারি যে অশ্ব অন্য অশ্বকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। এইরূপ আমাদেরও অনেক নিরর্থক শব্দ হইতে অর্থ প্রকাশ পায়। বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ গোলমাল করিবার কালে শিক্ষক মহাশয়ের মুখনিঃসৃত নিরর্থক শব্দের অর্থ বুঝে ও গোলমালের অবসান হয়। রাত্রিকালে চৌকিদা'রর নিবর্থক শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে চোর সাবধান হয়। একত্র সমবেত জনমণ্ডলীর নিরর্থক উচ্চ শব্দ শ্রোতার কৌতূহল জাগাইয়া দেয়। নির্জ্জন মাঠের মধ্যে ভাষাবিহীন গোঁ গোঁ শব্দ শ্রোতার শক্তির পরিমাণ অনুসারে সহানুভূতি বা প্রাণভয়ের সঞ্চার করে। অকস্মাৎ তোপ-ধ্বনি বা কোনও প্রকার উচ্চ শব্দ কর্ণগত হইলে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। ব্যাঘ্রগর্জ্জনেও ঐ প্রকার হয়।

আমরা যখন কথোপকথন করি তখন সাধারণতঃ উচ্চশব্দ করি না। সেই জন্য অকস্মাৎ উচ্চ শব্দ শুনিলে আমাদের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং কারণ নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ চাঞ্চল্য ভীতি প্রভৃতির ব্যঞ্জক হয়। এই কারণে প্রাকৃতিক নিয়মে এই সকল উচ্চশব্দ শ্রোতার মনের উপর একটা শক্তি প্রকাশ করে। উচ্চ শব্দ করিবার কালে বক্তার মনে ক্রোধ প্রভৃতি কোনও ভাবের সত্তা থাকিলে শ্রোতা তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভীতি প্রভৃতির বশীভূত হয়। আবার শব্দ যখন কোনও সজীব প্রাণীর নিকট হইতে না আসে তখন তাহাতে বক্তার কোনও মানসিক অবস্থা প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে বৃক্ষপতন শব্দ বা তৈজস-পতনের শব্দ শ্রোতার মনে চাঞ্চল্য উৎপন্ন করে। তাই উচ্চ-শব্দ মাত্রেরই একটা অর্থ আছে, তাহা নিরর্থক নহে। উচ্চারণের ভঙ্গী অনুসারে একমাত্র সম্বোধন-পদ বা একটী অব্যয় পদে অনেক অর্থ প্রকাশ পায়। দূর হইতে কাহাকেও ডাকিবার সময় যে প্রকার স্বরভঙ্গী আবশ্যক হয়, কাহাকেও সম্বোধন পদ মাত্রমূলক ভাষা দ্বারা তিরস্কার, ভীতি প্রদর্শন বা অনুরোধ করিতে হইলে সে-প্রকার স্বরভঙ্গীতে চলে না।

যাহার নাম হরি, তাহাকে এক "হরি" শব্দ দ্বারা আহ্বান, তিরস্কার বা অনুনয় করা যায়। কিন্তু এই তিন প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে হরি শব্দের উচ্চারণ হইবে তিনপ্রকার। সে উচ্চারণ আমরা বাগিন্দ্রিয় সাহায্যে অবাধে করিয়া থাকি, কিন্তু লেখনী দ্বারা প্রকাশ করি না।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ বলেন যে প্রত্যেক ভাষাব শৈশবকালে স্বরভঙ্গী ও অঙ্গ-ভঙ্গীদ্বারা অনেক প্রকার অর্থ প্রকাশ পাইত। বর্ত্তমান কালেও নাট্যাভিনয় বা বক্তৃতার সময়ে এই সকল স্বরভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিবিধ ভাব পরিস্ফুট করা হয়, যাহা কেবল মাত্র শব্দ দ্বারা হইতে পারে না। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক Tucker লিখিয়াছেন :—

It is self-evident that in its most primitive stages language must have been almost helpless without abundant use of two auxiliaries which still play some part—one of them a considerable part—in the spoken language even of the most civilized peoples. These were gesture (including facial expression) and intonation. Gesture would be the readiest means of indicating the relation between two notions. For example, the speaker would point from this to that with a motion of the hand to signify the direction in which an action travelled. If a sign of certain numbers might be that of so many fingers held up, a sign for large and indefinite numbers might be the rapid opening and closing of all the fingers, or a wide sweeping of the hands. Many such gestures are readily conceivable. Intonation, again, would serve for question or command. The notion "if you kill him, I will kill you," might be expressed by the use, first, of the sounds for *you, kill, him*, (not necessarily, nor even probably, in that order) accompanied by pointing and a look of forbidding or disapproval, and then of the sounds for *I, you, kill*, accompanied by pointing and a look of threat. The gestures would indicate subject and object, the look and tone would express—so far as they were expressed—the condition and the futurity.

বৈদিক ভাষার স্বরভঙ্গির দ্বারা কি প্রকার অর্থ প্রকাশ হইল তাহার আলোচনা আমাদের দেশে প্রাচীনকালে হইয়াছে। বেদের উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ

রাখিবার জন্ম প্রাতিশাখ্য ও ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রণয়ন হইয়াছে। প্রাতিশাখ্য ও ব্যাকরণে স্বরপ্লুতির নিয়ম লক্ষিত হইয়াছে। প্লুতি শব্দের অর্থ উল্লম্ফন বা কম্পন। সুতরাং প্লুতস্বর অর্থে কম্পিত বা দীর্ঘস্বর বুঝায়। হ্রস্ব স্বরের একমাত্রা হইলে প্লুতস্বরের তিনমাত্রা। অর্থাৎ হ্রস্ব স্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে প্লুতস্বরের উচ্চারণে তাহার তিনগুণ সময় লাগে। হ্রস্ব দীর্ঘ-প্লুত ভিন্ন আর একপ্রকার উচ্চারণ ভঙ্গীআছে—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় তাহা নহে।

আজকাল বাঙ্গালা লিখিবার সময় ইংরাজী রীতিতে কমা, সেমিকোলন, কোলন ও পূর্ণচ্ছেদ দ্বারা বাক্যাংশ বিভাগ করা হয়। পূর্ব্বকালে এ রীতি ছিল না, ছিল কেবল এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি। কিন্তু একালে যেমন বাক্যাংশ সমূহ উচ্চারণ করিবার সময় বিরাম দ্বারা বিভাগ জ্ঞাপন করি, সেকালেও সেই প্রকার স্বরপ্লুতি দ্বারা বাক্যাংশের বিভেদ উচ্চারিত হইত। এ বিষয়ে পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"বিচাযমাণানাম্ ।৮।২।৯৭॥" অর্থাৎ বিচাৰ্য্যমাণ বিষয় সমূহের বাচক বাক্যাংশ সমূহের অন্ত্যস্বর প্লুত (এবং উদাত্ত) হয়। উদাহরণ —"হোতব্যং দীক্ষিতস্য গৃহা উ৩ ½ ন হোতব্যাম্ উ৩" ॥ "দীক্ষিতের গৃহে হোম করা যাইতে পারে, কি না? "তিষ্ঠেদ্ যূপা উ৩ ½ অনুপ্রহরেদ্ যূপা উ৩ ½।" যূপে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, না প্রহার করিতে হইবে? এখানে বাক্যাংশ দ্বয়ের মধ্যে বিরাম না থাকিলে অর্থবোধ হয় না, কারণ এখানে বাক্যাংশ সমূহ স্বয়ং এক একটী বাক্য, একত্র সংযুক্ত হইয়া দীর্ঘতর বাক্য গঠন করিতেছে। বৈদিক ভাষায় উভয় বাক্যাংশের শেষ স্বর প্লুত বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল যে উভয় বাক্যাংশের সন্ধিস্থলে বিরাম হইলেই বাক্যার্থ বুঝিতে অসুবিধা হয় না। সুতরাং সংস্কৃত ভাষাতে শেষ বাক্যের শেষ স্বরের প্লুতি থাকিল না।" পূর্বং তু ভাষায়াম্ ।৮।২।৯৮।" সংস্কৃত ভাষায় কেবল মাত্র পূর্ব্ব বাক্যাংশের শেষ স্বরের প্লুতি (ও উদাত্ততা) হইবে। উদাহরণ—অহিন্ উ৩, রজ্জুর্। এটা অহি, না এটা রজ্জু? লোষ্টো নু উ৩ কপোতোহ্। এটা লোষ্ট্র না কপোত? আবার বৈদিক যুগে আচারলঙ্ঘন, আশীর্ব্বাদ বা আদেশ অর্থ প্রকাশক বাক্য সাকাঙ্ক্ষ হইলে তাহার অন্তস্থিত ক্রিয়াপদের শেষ স্বর প্লুত (ও স্বরিত) হইত। "ক্ষিয়া—শীঃ-প্রৈষেষু তিঙ আকাঙ্ক্ষম্ ।৮।২।১০৪। ক্ষিয়া=অনাচার, অভদ্রতা। আশীষ=আশীর্ব্বাদ বা প্রার্থনা। প্রৈষঃ=প্রেরণ বা আদেশ। স্বয়ং রথেন যাউতি৩, উপাধ্যায়ং

পদাতিং গময়তি। স্বয়ম্ ওদনং ভুঙক্তে৩, উপাধ্যায়ং শক্তূন্ পায়য়তি। সূত্রাংশ্চ অধীষ্টা৩, ধনং চ তাত। ছন্দো৩ধ্যেষীষ্টা৩, ব্যাকরণং চ ভদ্র। কটং কুরু৩, গ্রামং চ গচ্ছ। যবান্ লুনীহি৩, সক্তূংশ্চ পিব। এই সকল স্থানে সংস্কৃতের অনুরূপ শেষ বাক্যের অন্ত্যস্বর প্লুতির অভাব। আধুনিক বঙ্গভাষায় ইহার অনুরূপ প্রয়োগ—"বলি দোর খুলে দেবে – এ, না আমি চোলে যাব ?"—স্বর্ণলতা।

বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্র।

মা দুর্গা করুন, তাই হোক, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

আমরা উদ্ধৃত বাক্যের আরম্ভে 'যে' ব্যবহার করি, হিন্দীতে 'কী' ইংরাজীতে 'That'। বাঙ্গালার 'যে' বা হিন্দী কীর উচ্চারণ দীর্ঘ, কিন্তু ইংরাজী that, বাক্যবন্তে না হইলে হ্রস্ব। বৈদিক যুগে বেদ হইতে উদ্ধৃত মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে "ওম্" বা প্রণবের প্রয়োগ হইত। ইহার উচ্চারণ প্লুত অর্থাৎ ত্রিমাত্র, এবং ইহার প্রভাবে বাক্যান্তস্থিত অন্ত্যস্বর বা উপধাস্বর ও তৎপরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের লোপ হইত। "প্রণবষ্টেঃ ।৮।২।৮৯।" অপাং রেতাংসি জিন্বতোম উ৩। (= জিন্বতি + ওম্)। দেবাঞ্জিগাতি সুম্নয়োম্ উ৩ (-সুম্নয়ুঃ + ওম্)। যজ্ঞ কর্ম্মে বাক্যাবস্থিত "যে" শব্দ প্লুত (ও উদাত্ত) হইত—'যে যজ্ঞকর্ম্মণি ।৮।২।৮৮" যে উ৩ যজামহে। এখানে সম্ভবতঃ ভাবকেন্দ্রতা (emphasis) বশতঃ "যে" পদের প্লুতোদাত্ত উচ্চারণ। যজ্ঞ কর্ম্মে যে সকল যাজ্যামন্ত্র উদ্ধৃত হয়, সেই সকল যাজ্যামন্ত্রের অন্ত্যস্বর প্লুত (ও উদাত্ত) উচ্চারণ-বিশিষ্ট হয়। "যাজ্যান্তঃ ৮।২।৯০॥" উদাহরণ 'জিহ্বামগ্নে চকৃষে হব্যবাহাউ৩ম্ "(ঋ. বে. ১০।৮।৬), 'স্তোমৈর্বিধেমাগ্নয়েউ৩ (ঋগ্বেদ ৮। ৩৪)।" এ স্থলে উচ্চারণ ভঙ্গী বা স্বরপ্লুতি দ্বারা উদ্ধার-বাক্যের অবসান বিজ্ঞাপিত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় এ স্থলে ইতি শব্দের ব্যবহার হয়।

সম্বোধনবাচী অব্যয় অঙ্গ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে সাকাঙ্ক্ষ বাক্যের অন্তস্থিত ক্রিয়াপদের অন্ত্যস্বর প্লুত হয়। "অঙ্গযুক্তং তিঙ্ আকাঙ্ক্ষম্ ।৮।২।৯৬।" উদাহরণ 'অঙ্গ কূজাউ৩, ইদানীং জ্ঞাস্যসি জাল্ম।' 'অঙ্গ ব্যাহরাউ৩, ইদানীং জ্ঞাস্যসি জাল্ম।' 'অঙ্গ' শব্দ ভদ্র-বাচী, সুতরাং স্বর না টানাইলে ইহা দ্বারা নিন্দা বা ভৎসনা বুঝায় না। এই প্রকার টাকাইয়া উচ্চারণের ফলেই নিন্দা বা ভীতি প্রদর্শন পরিস্ফুট হইতেছে। আধুনিক বঙ্গভাষায় অনুরূপ প্রয়োগ—"দয়ালু! আমাকে যেমন দয়া করলে, ভগবান্ তোমাকেও যেন তেম্নি দয়া করেন।" "তুমি সাধু পুরুষ'! তা না হলে কি এমন হয়!" "লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ

তুমি। কড়ি মুঠো ধর্‌লে ধূলো মুঠো হয়!" গানে বা পদ্যে এরূপ ব্যঙ্গার্থ প্রকাশক স্বরভঙ্গী আধুনিক ভাষায় লক্ষিত হয় না।

"বিপদ বারণ। ওহে নারায়ণ। লোকে বলে তোমায় করুণানিদান।
তবে কেন হায়! লুণ্ঠিত ধরায়, স্বর্ণতনু স্বামীর ভূমিতে শয়ন?
যে জ্বালাতে প্রভু! জ্বালালে আমায়,
সেই জ্বালাতে তুমি জ্বলিবে নিশ্চয়,
জানকী পাইবে পুনঃ হারাইবে কেঁদে কেঁদে হবে দিবা অবসান।"

"ঢের ভাল করেছ শ্যামা, আর ভালতে কাজ নাই।
এখন ভালোয় ভালোয় বিদায় দেমা আলোয় আলোয় চলে' যাই।"

সম্বোধন পদের উচ্চারণে স্বরপ্লুতির সাহায্যে বিবিধ অর্থ প্রকাশ পাইত। দূর হইতে কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিতে ঐ নামের অন্ত্যস্বর প্লুত (ও উদাত্ত) হইত—"দূরাদ্ধূতে চ।৮।২।৮৪"—সক্তূন্ পিব দেবদত্তউ৩। নাম ধরিয়া ডাকিলেও তাহার সহিত হে বা হৈ শব্দের যোগ থাকিলে এই দুই শব্দই প্লুতোদাত্ত হইত—"হৈ-হে প্রয়োগে হৈ-হয়োঃ।৮।২।৮৫।" হে উ৩ রাম, রাম হৈউ৩। দূরাহ্বানে নামের অন্ত্যস্বর ভিন্ন অন্য স্বর গুরু থাকিলে যে কোনও একটী গুরু স্বর প্লুতোদাত্ত হইত। দীর্ঘ ঋকারের স্বরপ্লুতি হইত না—"গুরোর্ অনৃতোঽনন্ত্যস্যাঽপ্য-একৈকস্য প্রাচাম্।৮।২।৮৬।" দেউ৩বদত্ত। দেবদউ৩ত্ত! দেবদত্তাউ৩। তিরস্কার বুঝাইতে সম্বোধন পদের দ্বিরুক্তি ঘটিলে বিকল্পে প্রথম বা দ্বিতীয় পদের অন্ত্যস্বর প্লুতোদাত্ত হইত—"আম্রেড়িতং ভর্ৎসনে।৮।২।৯৫।" দস্যো দস্যোউ৩ বন্ধয়িষ্যামি ত্বা। চৌরউ৩ চৌর, ঘাতয়িষ্যামি ত্বা। প্রাকৃত ভাষায় এবং বঙ্গভাষায় এই প্রকার সম্বোধন পদের উচ্চারণ আছে। শকুন্তলায় ধীবরের ভাষায় এবং মৃচ্ছকটিকের বহু স্থানে সম্বোধন পদের অন্ত্য অকারের আকারে পরিণতি দেখিতে পাই এবং মাগধী প্রাকৃতে সম্বোধন পদের অন্ত্য অকার স্থানে আকারের ব্যবহার বররুচির ব্যাকরণ-সম্মত। পালি ভাষাতেও সম্বোধন পদের অন্ত্যস্বরের দীর্ঘতা বিরল নহে। প্রাচীন বঙ্গভাষায় ইহার বহু উদাহরণ পাওয়া যায় এবং আধুনিক সময়ে বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অবজ্ঞা অর্থে অকারান্ত সম্বোধন পদের অন্ত্য স্বরের দীর্ঘতা হয়। হিন্দীভাষাতেও এ প্রভাব বর্ত্তিয়াছে। আদালতের ভাগ্যবিধাতা পিওন মহাশয় যখন বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিতে থাকেন—

"বিনৃপান্ সত্তো, * হাজিব হে।" তখন তিনি আধুনিক ভাষায় বৈদিক উচ্চারণের প্রভাব ঘোষিত করেন। আবার আমরা যেমন বাচ্যার্থ ভিন্ন অন্য অর্থ প্রকাশ করিতে বাক্যের অংশবিশেষের বাঁকা উচ্চারণ করি বৈদিক যুগে অসূয়া, সম্মতি, কোপ বা কুৎসা অর্থ বুঝাইতে দ্বিরুক্ত সম্বোধন পদের প্রথমটীর অন্ত্যস্বর প্লুত ও স্বরিত হয়—"স্বরিতম্, আম্রেড়িতেঽসূয়া সম্মতি-কোপ-কুৎসনেষু ।৮।২।১০৩।" অভিরূপক৩, অভিরূপক, রিক্তংতে আভিরূপ্যম্ (অসূয়ার্থে)। অভিরূপক৩, অভিরূপক, শোভনোঽসি (সম্মতি অর্থে) অবিনীতক ৩, অবিনীতক, ইদানীং জ্ঞাস্যসি জাল্ম (কোপ অর্থে)। শাক্তীক৩ শাক্তীক, রিক্তা তে শক্তিঃ, যাষ্টীক ৩ যাষ্টীক বৃথা তে যষ্টিঃ (কুৎসা অর্থে)। শূদ্র-ভিন্ন ব্যক্তিকে প্রত্যভিবাদন করিবার সময় বাক্যান্তস্বর প্লুতোদাত্ত হইত। "প্রত্যভিবাদে৩শূদ্রে ।৮।২।৮৩।" অভিবাদয়ে দেবদত্তোঽহম্, ভো আয়ুষ্মান্ এধি দেবদত্ত৩ । প্রত্যভিবাদবাক্যান্তে নাম গোত্র না থাকিলে প্লুতোদাত্ততা হইত না, অথচ সম্বোধন বাচী অব্যয়ের প্লুতোদাত্ততা হইত—আয়ুষ্মান্ এধি ভোঃ৩। সুতরাং এ সূত্র প্রত্যভিবাদনবাক্যের জন্য বিহিত হইলেও বস্তুতঃ নাম উচ্চারণ বা সম্বোধন পদের উচ্চারণ-বিষয়ক বিধান। এস্থলে একটী বিষয় উল্লেখ করিবার আছে—রমণীর নামোচ্চারণে অন্ত্যস্বরের দীর্ঘতা বা প্লুতত্ব হইত না। সম্ভ্রম বশতঃ দূর হইতে স্ত্রীজাতিকে সম্বোধন করাও হইত না। তাই সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ সম্বোধন পদের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয়। প্রত্যভিবাদকালেও এই সম্ভ্রম পরিলক্ষিত হয—'অভিবাদয়ে গার্গ্যহম্—ভো আয়ুষ্মতী ভব গার্গি।' এখানে স্বরপ্লুতি বা উদাত্ততা নাই।

বাক্য মধ্যে কোনও পদের ভাবাধিক্য (emphasis) বুঝাইতে প্লুতস্বরের ব্যবহার হইত। অধ্বর্য্যু আগ্নীধ্রকে যজ্ঞকর্ম্ম বিষয়ে আদেশ করিবার ভাষায় বাক্যের প্রথম দুই অক্ষরের স্বর প্লুতোদাত্ত হইত—"অগ্নীৎ প্রেষণে পরস্য চ। ৮।২।৯২।" 'আ৩ শ্রা৩ বয়।' 'ও৩ শ্রা৩ বয়।' ভাবকেন্দ্রতা বশতঃ (for the sake of emphasis) বাক্য মধ্যস্থিত ব্রূহি, প্রেষ্য, শ্রৌষট্ বৌষট্, আবহ প্রভৃতি পদের আদিস্বর প্লুতোদাত্ত হইত—"ব্রূহি-প্রেষ্য-শ্রৌষট্-বৌষট্ আবহানাম্ আদেঃ ।৮।২। ১।" অগ্নয়েঽনুব্রূ৩হি (মৈত্রেয়ানী স ১।৪।১১) অগ্নয়ে গোময়ানি প্রে৩ষ্য। অস্তু শ্রৌ৩ষট্। সোমস্যাগ্নেবীহী৩ বৌ৩ষট্। অগ্নিমা৩বহ। বৌষট্ শব্দের ন্যায় বষট্, বোষট্, বাষট্, বৌক্ষট্, বাক্ষট্ বক্ষাট্

* বীণাপাণি সামন্ত।

এবং স্বধা শব্দেরও আদ্যস্বর প্লুতোদাত্ত হইত। এই সকল প্রয়োগের অনুরূপ প্রয়োগ সকল ভাষাতেই আছে, বঙ্গভাষাতেও আছে। 'কল্যাউ৩ণ হোক, কল্যাউ৩ণ হোক।' 'ছিউ৩ ছিউ৩, তোমার এমন কাউ৩জ।

তর্কে যাঁহার জয় হইত তিনি পূর্ব্বপক্ষীর বাক্যের অন্ত্যস্বরের প্লুতোদাত্ত উচ্চারণ সহ সেই বাক্যের পুনরুচ্চারণ পূর্ব্বক বিজয়োল্লাস ও বিজিতের প্রতি বিদ্রুপ প্রকাশ করিতেন—"নিগৃহ্যানুযোগে চ ।৮।২।৯৪।" পূর্ব্বপক্ষীয় ভাষা—'অদ্যামাবস্যা।' বিজয়োল্লাসীর তিরস্কারবাক্য—'অদ্যামবস্যেত্যা-খাউ৩?" বাঙ্গালায় অনুরূপ প্রয়োগ—লোকটা সাধু, নাঃ? সেক্সপিয়রের Merchant of Veniceএ "A Daniel is come to judgment, mark Jew, a Daniel!" কেহ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর-বাচক বাক্যে নিশ্চয়ার্থক 'হি' শব্দের বিকল্পে প্লুতোদাত্ততা হইত——"বিভাষা পৃষ্ট প্রতিবচনে হেঃ ।৮।২।৯৩।" অকার্ষীঃ কটং দেবদত্ত? অকার্ষং হী উ৩। অকার্ষং হি। এস্থলে বোধ হয় স্বরভঙ্গি দ্বারা বাক্যটী প্রশ্নবাচক হইয়া অধিক নিশ্চয়তা প্রকাশ করিতেছে। অনুরূপ বাঙ্গালা প্রয়োগ—'করিছি বৈকি?' 'করিছিই ত?' 'করিনি?' 'করিনি ত কি?' যেখানে কোনও বিবিধার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেখানে সেই শব্দের যাহাতে অর্থবোধ হয়, সেই উদ্দেশ্য বাক্যস্থিত পদ বিশেষের অন্ত্যস্বরের প্লুতত্ব হইত। বৈদিক ভাষার চিৎশব্দ বহু-অর্থ-বাচী। উপমা অর্থে ইহার প্রয়োগে হইলে বাক্যস্থিত উপমা বোধক ক্রিয়া পদের অন্ত্যস্বর প্লুত ও অনুদাত্ত হইত। "চিদিতি চোপমার্থে প্রযুজ্যমানে ।৮।২।১০১।" 'অগ্নিচিদ্ ভায়াৎ৩।' (=অগ্নির ন্যায় দীপ্ত হউক)। 'রাজচিদ্ ভায়াৎ৩।' (=রাজার ন্যায় দীপ্ত হউক)। স্বীকারোক্তি, পুনঃ শ্রবণেচ্ছা বা প্রতিশ্রুতিবাচক বাক্যের অন্ত্যস্বর প্লুত ও অনুদাত্ত হয়—"প্রতিশ্রবণে চ ।৮।২।৯৯।" গাংমে দেহি ভোঃ—হন্ত তে দদামি৩। নিত্যঃ শব্দো ভবিতুমর্হতি। দেবদত্ত ভোঃ কিমাত্থ৩? এই উচ্চারণের প্রভাবেই সম্ভবতঃ সংস্কৃত নাটকের 'কাকু' নামক উচ্চারণ ভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে। অনুরূপ বাঙ্গালা প্রয়োগ—'আচ্ছা, হবে৩।' 'দোব' খন্৩!' 'ঠিক্ বলেছ৩।' 'কি বল্লেহে?—ট্রাম বন্ধ৩?' প্রশ্নের উত্তরে পুনঃপ্রশ্নে ও অভিপূজিত অর্থে বাক্যান্ত স্বর প্লুত (ও অনুদাত্ত) হয়—"অনুদাত্তঃ প্রশ্নান্তাভি পূজিতয়োঃ ।৮।২।১০০।" 'অগমঃ৩ পূর্ব্বান্৩ গ্রামান্৩,—অগ্নিভূতা৩ই?' (তুমি পূর্ব্ব গ্রামে গিয়াছিলে, পুড়ে ছাই হয়েছে!) 'শোভনঃ খল্বসি মাণবক৩।' (তুমিই

সুন্দর, বালক!) অনুরূপ বঙ্গভাষার প্রয়োগ—'তুমি দেখে এলে—পুড়ে ছাই?" 'সুখী ত তুমি।' 'নদী ত গঙ্গা' 'তারেই বলি প্রে৩ম্। (যখন থাকে না future এর চিন্তা, থাকে নাক shame)'

অতঃপর আমরা এই স্বরপ্লুতির বিশিষ্টরূপ উপযোগিতার উল্লেখ করিব। জিজ্ঞাসা বা বিস্ময় প্রকাশক বাক্যে আমরা একপ্রকার স্বরভঙ্গী করিয়া থাকি। যেমন, 'তুমি যাবে৩?' 'তু৩মি যাবে।' 'তু৩মি যাবে৩।' ইত্যাদি। এই স্বরভাঙ্গাই জিজ্ঞাসা বা বিস্ময় বাচক বাক্যের প্রাণ স্বরূপ। এই প্রকার স্বরভঙ্গী ভিন্ন জিজ্ঞাসা (interrogation) বা বিস্ময় (admiration) প্রকাশ পায় না। অথচ লিখিবার সময়ে আমরা এ উচ্চারণের পার্থক্য রাখি না। এই উচ্চারণ লক্ষ্য করিবার জন্য ঋক্ প্রাতিশাখ্যোর শৌনক বিধি প্রনয়ণ করিয়াছেন—

"অধঃ স্বিদাসী৩ দুপরিস্বিদাসী৩। অর্থে প্লুতিভাঁরিব বিন্দতী৩, ত্রিঃ॥"

টীকা—"ত্রিমাত্রা মাত্রা প্লুতস্বরো ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় অধুনা উদাহরণেন স্থানের প্লুতান্ দর্শয়িতুমাহ। অধঃ স্বিদাসীৎ দুপরিস্বিদাসীৎ। নত্বাভীরিব বিন্দাতী৩। এতে মুদাহরণেষু অর্থে প্লুতিঃ, অর্থ সমাপ্তে প্লুতিঃ, আখ্যাতস্য অন্তে স্বরে প্লুতিরিত্যর্থঃ। উদাহরণৈরেব ত্রিত্বস্য সিদ্ধত্বাদ্ যৎ ত্রিগ্রহণম্ করোতি তদ্ বিষয়াপেক্ষয়ৈব। স প্রেম সংহিতা চতুঃষষ্ট্যাং ত্রিরেব প্লুতো ভবতীতি, ভীরিব গ্রহণং চ বিশেষণ গ্রহণার্থম্ অথ উপরি শব্দো বিশেষণ ত্বেনোপাদীয়েতে, কিং স্বিদাসীদিত্যত্র মা ভূদিতি, ভয়ং বিন্দতিমামিহ ইত্যেবমাদি নিবৃত্তার্থম।" এখানে 'অর্থে' পদের অর্থ 'অর্থ সমাপ্তিতে' বা 'বাক্যান্তে' বা 'সাকাঙ্ক্ষবাক্যান্তে' (at the end of a clause)। কিন্তু যে তিনটী উদাহরণের উল্লেখ হইয়াছে, সে সবগুলিই জিজ্ঞাসা বাচক। সুতরাং জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যের জন্যই এই বিধি। অর্থ এই যে জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যের অন্ত্যস্বর যেন ভয় পাইয়া কাঁপিতে থাকে। অথচ 'কিং স্বিদাসীৎ' এখানে জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যেও অন্ত্যস্বর-প্লুতি হইবে না। উভয়বিধ উদাহরণের মধ্যে আমরা এই মাত্র প্রভেদ লক্ষ্য করি যে প্রথম বাক্যগুলিতে যেমন প্রশ্নবাচী কিম্ শব্দ নাই, শেষের উদাহরণে কিম্ শব্দ আছে। তাই অর্থ বোধক শব্দ দ্বারা যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহার জন্য স্বরভঙ্গীর আবশ্যকতা হয় নাই। এ বিষয়ে ভট্টোজিদীক্ষিত পাণিনির ৮।২।১০২ সূত্রের বৃত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে এখানে বিপৃচ্ছ্যমান অর্থে (৮।২।৯৭) প্লুতো-দাত্ততা। কিন্তু বিচারের অর্থ কি? কতিপয় প্রশ্নের সমন্বয়ই বিচার। সেইজন্য

আধুনিক কালে জিজ্ঞাসা বাচক বাক্যে একটা পরিচিত স্বরভঙ্গী লক্ষ্য করি। পাণিনের অনুদাত্তং প্রশ্নান্তাভি পূজিতথোঃ ।৮।২।১০০" সূত্রে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জিজ্ঞাসা ও বিস্ময় বা গৌরব বাচক বাক্যে অন্ত্য-স্বরের প্লুতানুদাত্ততা বিহিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া "অনন্ত্যস্যাপি প্রশ্নাখ্যা-নয়োঃ ৮।২।১০৫" সূত্রে প্রশ্ন ও আখ্যান বাচক বাক্যের প্রত্যেক পদের অন্ত্যস্বরের প্লুততা বিহিত হইয়াছে—"অগমঃ৩ পূর্ব্বান্৩ গ্রামান্৩ ?"

সে যাহাই হউক বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিলাম যে অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বরভঙ্গী দ্বারা ভাষায় বিবিধ অর্থ প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে স্বর সমূহের অন্য এক প্রকার বিভিন্নতা হইতে সঙ্গীতের সুর হইয়াছে। বারান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পথের গান।

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

এমন সর্ব্বনাশা পথে সে কোন্
পথ দেখাল সর্ব্বনাশী।
সমাজ-ভোলা শাসন-ভোলা
আপন-ভোলা বাজিয়ে বাঁশী।
সত্য শুধু জ্বল্‌ছে আলো
মন এ পথে মন হারাল
কেমন করে এক নিমিষে
স্বার্থটারে ফেল্‌ল গ্রাসি।
চতুর্দ্দিকে দিগ্বলয়ে
পথিক কোথা যায় না দেখা,
পাগ্‌লী মেয়ের ইঙ্গিতে যে
পথের পরে চল্‌ছি একা।
আপন মনে চলার সুখে
রক্ত শুধু দুল্‌ছে বুকে
কাণের মাঝে বাজ্‌ছে শুধু
মৃত্যু সখার অট্টহাসি।

ইত্যাদি। ছবিখানি ও হাসির বহর দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব ভাবিবার বিষয় হইয়াছিল! কেন না, স্ত্রীজাতিকে উচ্চ শিক্ষা দিলে তাহার ফল যাহা হইবে বলিয়া পুরুষ জাতির ধারণা, চিত্রখানি সেই ধারণারই অভিব্যক্তি মাত্র। অনেক "পরম গুরু"রই এইমত, যে যখন অশিক্ষিতা স্ত্রী হইলে ঘর সংসারের কোন কাজেরই বিশেষ ব্যাঘাত হয় না বরং শিখাইলে মেয়েগুলি আপনটী বোঝে, 'জ্যেঠা' হইয়া যায়, তখন ও বালাই না থাকাই ভাল। স্ত্রীলোককে শিক্ষার আলোকের আভাস একবার দেখাইলে, তাহারা হয়ত বা আর গৃহস্থালী ঘরকন্নার অন্ধকারে দিন রাত ডুবিয়া থাকিতে চাহিবে না। তখন পুরুষকে সেই চিত্রে বর্ণিত অবস্থায় পড়িয়া সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে দরিদ্র পিতার শেষ আশাস্থল পুত্রসন্তান তোমরা দুইদিন টুল টেবিলে বসিয়া ইংরাজী কেতাব উল্টাইয়া দুইপাতা ইংরাজী শিখিযাই যদি "ইংরাজ" বনিয়া যাইতে পার, পিতা মাতাকে মুক্তকণ্ঠে old fool বলিতে দ্বিধা না কর, তবে তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া, এবং তোমাদের সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়া চিরকোমলা নারীর স্বভাব বদ্‌লাইবে, মাথার মণিকে অবহেলায় ধূলায় লুটাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে বল?

তোমদের কাছে আমাদের প্রার্থনাই এই, তোমরা আলোচনা করিয়া বিচার করিয়া দেখ, কি ভাবে শিক্ষা দিলে নারীর শিক্ষা সার্থকতায় পরিণত হইবে, যে বিদ্যার অল্প মাত্রাও "ভয়ঙ্করী" হইবে না, মাত্রাধিক্য হইলেও কনকে জড়িত নির্ম্মল হীরকের মত মনোহারী হইবে। এই জাতীয় জীবনের সমস্যার দিনে যেমন তোমরা নিজেদের জীবন যাত্রা পথের চিন্তা করিতেছ, তেমনি পদপ্রান্তেও তাকাইয়া দেখিও। পা দুটী সুস্থ সবল না হইলে সর্ব্বাঙ্গ ত নিরাময় হইবে না। এই মৃত্যু অন্ধকারের মধ্যে কাহার জোরে দাঁড়াইবে বাঙ্গালী! যাহারা তোমাদের দেহের শান্তিদায়িনী ছায়া, প্রাণের মূর্ত্তিমতী মায়া, গৃহের আনন্দ প্রস্রবন, এক কথায় তোমরা যাহাদের সর্ব্বস্ব, যারা তোমাদের সংসার তরণীর কর্ণধার, তারা এখন যেমন উপেক্ষিত আছে তেমনি পড়িয়া থাকিলে তোমরাও এক পা অগ্রসর হইতে পারিবে না।

নবযুগের আরম্ভে তোমরা যে সত্যসংকল্প লইয়া জাগিয়াছ, তাহার মধ্যে এই নারীর দেহঘটে শক্তিরূপিণী জগন্মাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠাটিকেও স্থান দিও! শুধু মুখের কথায় নয়, প্রাণের সমবেত চেষ্টা দিয়া একবার মায়ের জাতির

অজ্ঞতার শৃঙ্খল কাটিয়া দাও, অবাধ মুক্ত আলোক বাতাসের ব্যবস্থা কর। যাহাতে তাহারা কল্যাণে শ্রীতে মণ্ডিতা হইয়া মূর্ত্তিমতী সিদ্ধির মত ভাবী ত্যাগী কর্ম্মী জ্ঞানী বংশধরের মাতা হইতে পারে, সেই শিক্ষা কেমন করিয়া দিবে, বুদ্ধিমান বাঙ্গালী, এখন সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই আবিষ্কার করিতে হইবে! যে ব্যর্থ শিক্ষার পথে গিয়া তোমাদের "ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ" হইয়াছে, আমাদেরও সেই ভ্রান্তপথে গিয়া স্ত্রীশিক্ষার চরম হইল বলিয়া আস্ফালন করিও না। সম্পূর্ণ নিজস্বধরণে নূতন পথের চিন্তা কর। সেই বিদ্যালয় যেন "ঘরের মত মিঠা, মন্দিরের মত পবিত্র, মাতৃকোলের মত আরামের, গুরুস্পর্শের মত সহজ জ্ঞানদায়ী" হয়। দেখিবে সোণার গাছে মুক্তার ফল ফলিবে, মায়েরা আর দ্বাদশবর্ষ বয়সে নিজেরা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ভবিষ্যৎ চিররুগ্ন কেরাণী সন্তানের মাতা হইবে না। নবযুগের নবীন সাধকবৃন্দ! দেশ মাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক বর্গ! নরকে এবার পতিত পাবনী জ্ঞান-ভাগীরথীর স্রোত বহাও দেখি, নতুবা মনে রাখিও, "নাস্তেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

কোমল মনের বল।

[শ্রীবনলতা দেবী ও বীণাপানি দেবী।]

(১)

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমার বয়স তখন চার কি পাঁচ বছর হইবে। মার মুখে গল্প শুনিয়াছি, সে বছর নাকি পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই বারে রেণুর মা কয়টি ছেলে হারাইয়া এমন কি স্বামীটি পর্য্যন্ত হারাইয়া, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া "খোকসা" গ্রাম হইতে আমাদের গ্রামে, বোনের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হন।

বোনের বয়স ষোল কিম্বা সতের হইবে। তখনও তাহার ছেলে পিলে কিছু হয় নাই। মার সহিত আমি তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম, রেণুর সহিত সেই আমার আলাপ হইল, সেই হইতেই সে আমার খেলার সঙ্গীরূপে গণ্য হইতে লাগিল।

রেণুর মাসীর বাড়ী আমাদের বাড়ীর পিছনে। তাঁর অবস্থা বেশ ভাল।

প্রতিকার প্রার্থনা।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

বাংলায় অনেক দিন ধরিয়াই বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মী অন্তঃপুরিকাদের উন্নতির জন্য একটা চেষ্টা চলিতেছে , যদিও আজ অবধি সেই চেষ্টা কোনও সফলতার মূর্ত্তি ধরিয়া সভ্য জগতে দেখা দিতে পারে নাই তথাপি জাতির উন্নতির মূলীভূত কারণ বুঝিতে পারিয়া এই বহুদিবসের স্বীকৃত "নরকের দ্বার" গুলির উপর যাহাতে জ্ঞানের গঙ্গাজল ধারা পতিত হইয়া উহারা পবিত্র হয় তাহার জন্য নব জাগ্রত শিক্ষিত বাঙ্গালী সভাতে হউক আর অন্তঃপুরে বসিয়াই হউক, আন্তরিক হউক আর মৌখিকই হউক কিছু আলোচনা যে করিতেছেন তাহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। এই যে নারীর শিক্ষার চেষ্টা, অভ্যুদয়ের চিন্তা, ইহা প্রকৃত পক্ষে নারীরই অভ্যুদয় নহে, ইহা যে নব যুগের— নবতন্ত্রের উদ্বোধন, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই বুঝিয়াছেন। বোধন ত আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ওগো নবতন্ত্রের পুরোহিতবর্গ, কল্পারম্ভে মঙ্গল-ঘট স্থাপনা করিয়াছ কই ? আমোদ্রাণাধিবাসের ধূপ গুগ্গুল পুষ্প-চন্দন-গন্ধামোদিত পূত মণ্ডপে, শুদ্ধ শান্ত ব্রাহ্মণের চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হইয়াছে কই ?

যে মহাশক্তির অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অধুনা পদদলিতা, শিশির-মথিতা পদ্মিনীবৎ নষ্ট-শ্রী হৃতগৌরবা বঙ্গ রমণী আজও কদাচিৎ কোন জ্ঞানবৃদ্ধের মুখে শক্তিরূপিনী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন তোমরা ত তাহার "সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে" অধিষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবে না—তোমরা যে তাঁহাদেরই বত্রিশনাড়ী ছেঁড়া ধন, প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান। তোমরা যে ভাবপাগল জগৎ প্রেমিক "গোরার" পদ ধূলির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদের যে আচণ্ডালকে প্রেম বিলানই ধর্ম্ম। আজ কালনেমির অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের ফলে তোমাদের মায়ের জাতি অতলস্পর্শী অন্ধকার গহ্বরে পড়িয়া হাত বাড়াইয়া তোমাদেরই হস্ত-স্পর্শ অনুভব করিতে চাহিতেছেন। মা যখন জ্ঞান শক্তির অভাবে জীবন্মৃতা হইয়া সন্তানের কাছে সাহায্য চাহিতেছেন তখন কি তোমরা বলিতে পারিবে "তোমরা নরকের দ্বার নরকে পড়িয়া থাক, তোমাদের যে জগন্মঙ্গলকর কোনও কার্য্যেই অধিকার নাই।" তাহা হইলে

হে পঙ্গু জাতি। যে সুদৃঢ় পদযুগলের অবিচলিত ধারণ শক্তিতে এখনও তোমরা দাঁড়াইয়া জগতের সমক্ষে জাতির অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছ, পূর্ব্ব গৌরবের জাবর কাটিয়া সেই বিলুপ্ত কর্পূরের সৌরভে সুরভিত হইতে চাহিতেছ, সে পা দু'খানি বুঝি এবার আর তোমাদের ভার বহন করিতে পারিবে না। মায়ের জাতি বুঝি আর দিনে দিনে পলে পলে দুর্জ্জয় তপস্যা করিয়া তোমাদের ভাবী বংশধরদের বাঁচাইতে পারে না।

ওগো "পরমদেবতা," 'পরমগুরু"র জাতি! তোমাদের কাছে বাংলার মেয়েরা আজ দীনাতীদীনা হইয়া শিক্ষার অধিকার চাহিতেছে—শিক্ষার দাবী করিতেছে! আমরা শিক্ষা চাহি সত্য কিন্তু তোমাদের অবস্থা দেখিয়া আমাদের এইটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে আমরা তোমাদের এই অর্থকরী failure শিক্ষাকে ঘৃণার সহিত অবজ্ঞা করিতেছি। পিতার বহু কষ্টের অর্জ্জিত বুকের রুধিরের মত অগণ্য অর্থে অর্জ্জিত যে বিদ্যাতে তোমরা আজ দলকেদল মার্চেণ্ট অফিসের কি রেলওয়ে মাল গুদামের কেরাণী গড়িয়া উঠিয়াছ, সে শিক্ষাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। যে শিক্ষার দোহাই দিয়া বাপকে ভিটামাটি বেচাইয়া তোমরা নিজেরাও আজ জগতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া "একটী চাকরী দাও বাবা"বলিয়া করুণ স্বরে আবেদন করিতেছ, সে শিক্ষা লইয়া কি করিবে বাঙ্গালীর মেয়ে? তোমাদের মত উচ্চ শিক্ষার নামে মেসে বোর্ডিংয়ে থাকিয়া সাবান তোয়ালে ক্রস এসেন্সের সর্ব্বনাশসাধন করিতে দিতে কয়টা মেয়ের বাপই বা সক্ষম? এই বর্ত্তমান অন্নবস্ত্রের সমস্যার যুগে এমন করিয়া মেয়ে পড়াইতে কেই বা পরামর্শ দিবে, আর কেই বা তা পারিবে? যে শিক্ষায় শুধু বিলাসিতা বিবিয়ানাই শেখায়, অভাব অভিযোগই বাড়ায় সে রকম শিক্ষার "মুখ ভেংচানোর" পক্ষপাতী আমরা নই।

সে দিন আমাদের ঘরে বাবু ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরচিত চিত্রে ভাবের স্পষ্ট মূর্ত্তির বিকাশ "ভাবের অভিব্যক্তি" নামক পুস্তকখানি আনা হইয়াছিল। চিত্রগুলি বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সব গুলি চিত্রই অতি সুন্দর। তাহার মধ্যে একটী চিত্র দেখিয়া বাড়ীর পুরুষ মহলে হাসির হিল্লোল অতি মাত্রায় বহিল। ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিয়া দেখি, ছবিটীতে স্বামী মাটীতে বসিয়া হলুদ পিষিতে পিষিতে মুখ সিট্‌কাইয়া বলিতেছেন, "উঃ! হলুদ গুলি কি শক্ত!" আর সাধ্বী পত্নী, সুসজ্জিত তনুখানি চেয়ারে হেলাইয়া এক মনে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, "পতি পরম দেবতা"

আমি বলিলাম ' রেণু আমার কালকের মালা কই ?" সে অধোবদনে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। আমি আবার বলিলাম, "আমার মালা।" মাটী পানে চাহিয়া রেণু আমার কথার জবাব দিল, "সে মালা মণ্টুকে খেলতে দিয়েছিলাম, সে তা ছিঁড়ে ফেলেছে। তুমি রাগ কর না বিনু দা।" আমার বড্ড রাগ হইয়া গেল, ফুল সব ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম। "তোমাকে যত্ন করে রাখতে দিলাম, আর তুমি কিনা ভাইয়ের হাতে দিয়ে ছিঁড়িয়ে ফেল্‌লে বেশ।" সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

(৫)

বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, বোম্বেতে আমার মামার খুব কাতর টেলিগ্রাম আসিয়াছে। মা মাথায় হাত দিয়া অধোবদনে বসিয়া আছেন। কাছে আসিয়া ডাকিলাম, "মা, ওমা।" মা বলিলেন, "বিশু, আজ আর বিরক্ত কর না, আজ কিছুই ভাল বোধ হচ্ছে না।" মার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলাম, "মা, তুমি হুকুম কর, আমি মামাকে দেখতে যাই। মা বলিলেন, এমন বাজে হুকুম আমি করতে যাব কেন, তুমি কি সেখানে যেতে পার ?" বড় হাসি আসিল, মামা সেখানে যেতে পারেন, আর আমরা পারি না! প্রকাশ্যে বলিলাম, "খুব পারবো, কেন পারবো না মা! আমি যাবই।"

অনেক কথার পরে মার সম্মতি লইয়া বোম্বায়ে রওয়ানা হইলাম। যাত্রা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেই মা বলিলেন, "ও বাড়ীতে দেখা ক'রে যা।" "না মা, ও বাড়ীতে আর দেখা করা হবে না। ও বাড়ীর ও মেয়ের সঙ্গে আমি বিয়েও করবো না।" মা বলিলেন, "সে কেমন ক'রে হবে আমি ওর মা'র কাছে যে কথা দিয়েছি। ওর মা বেঁচে নেই, থাক্‌লে এক কথা ছিল। মেয়েটি বড় লক্ষীরে! যেমন রূপে তেমনি—'

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "মা তোমার এই ছেলেটি বেঁচে থাক্‌লে অমন মেয়ে কত লাখে লাখে আস্‌বে, ওর চেয়ে ভাল রূপ গুণই হবে।"

মা রাগিয়া বলিলেন, "কখন না, ওর জুড়ি আর মিলবে না। শান্তস্বরে পরে আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "লক্ষী বাপ, অমন কথা কি বলে, ওর মা নেই!" বলিয়াই মা চোখের জল আঁচল দিয়া মুছিলেন।

মার কান্নাতেও আমার মন ভিজিল না। এই ফাল্গুনেই আমার বিয়ে, এ কোন মতেই হতে পরে না। রেণুর উপর মালা ছেঁড়ার রাগ তখনও আমার পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল।

বোম্বে আসার পর পরই মার এক পত্র পাইলাম, "রেণু খুব কাতর। একবার ফিরে আয় বাবা, সে বুঝি আর বাঁচে না। তোকে দেখবার জন্যই বোধ হয় তার প্রাণটা এতক্ষণও আছে, একবার ফিরে আয় বিনু।"

একি খবর বার বার করিয়া ঐ একটি কথাই পড়িতে লাগিলাম, "সে বুঝি আর বাঁচে না?" আসিবার দিন ত তার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি নাই, বলিয়াও আসি নাই, আমি বোম্বে চলিলাম। তার সেই অধোমুখ, চোখ ছল ছল মনে পড়িল! আরও মনে পড়িতে লাগিল, সেই অন্ধকারে তাকে আমি একা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম।

বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। অন্তরে কে যেন বলিয়া গেল, আর দেখা হয় না বুঝি।

(৬)

দেখা হইল। বাড়ী আসিলাম। রেণু অল্পে অল্পে সারিয়া উঠিতে লাগিল। আবার সেই হাসি তামাসায় দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। মার মনেও কত শান্তি দেখা গেল।

সেদিন 'ভাইফোঁটা'। আমার ত বোন নেই, কে 'ফোঁটা' দিবে? মাকে বলিলাম, 'ভাইফোঁটা' আমাদের বাড়ী নেই মা? মা একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন, না, কে ফোঁটা দেবে?

মনটা সেদিন বড় ভারী ছিল, সকলেই বোনের হাতে ফোঁটা দিতেছে, আর আমি এমনি হতভাগা যে, আমার বোন নাই। বৈকালে ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছি। আর সকল বাড়ীর হুলুধ্বনি কানে আসিয়া মনটা আরও ভারী করিয়া দিতেছিল।

মণ্টুকে সঙ্গে করিয়া রেণু আসিয়া হাজির। তার পরণে একখানা রেশমী ডুরে। বেশ চকমক করিতেছে। আর তার হাতে দুই গাছি বালা। সে চুলের পরিপাটি করিয়া টিপ পরিয়াছে। চালুন বাতি সাজাইয়া লইয়া সে আমার নিকটে আসিয়া বসিল। আমি বলিলাম "ওকি, তোমার ভাইয়ের ফোঁটা এখানে বসিয়া আমাকে দেখাইয়া দিবে নাকি রেণু?" রেণু একটু হাসিয়া বলিল, না তুমি ঘুরে বস, তোমার কপালেই ফোঁটা দেব।" আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়াই বলিলাম, সেকি—তাও কি হয়? "কেন হবে না বিনু দা মার কাছে ত আমরা দুজনেই সমান।" তোমারও বোন নেই, আমারও ভাই নেই, আজ ভাইয়ের কপালে ফোঁটা সকলেই দিতেছে. আর আমার বুঝি

বোনকে মেয়ে সহ রাখিতে তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না, বরং আশ্রয় দিতে পারিবেন বলিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তখন হইতেই বোনের উপরে সংসারের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রেণুর মা রান্না বাড়া সংসারের সব কাজ নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন।

(২)

আমার মার কথা বলিবার জন্য প্রাণ যতই উৎসুক হোক না কেন, শুনিবার জন্য তেমন আগ্রহ ত অন্য কাহারও হয় না। সকলেই হয়ত বলিবেন, "থাক থাক, আমাদেরও ত মা আছেন, অথবা ছিল, অত বাড়াবাড়িই কি ভাল?" সকলের মাই সকলের কাছে সমান। বাপ বেশ্যাসক্ত হইলে, মাতাল হইলে তাহাও বলা চলে, কিন্তু মা দুশ্চারিণী হইলে তাহা কি বলা যায়? লোকে যাই বলুক—আমার মার মত মা আর দেখি না। একাধারে মা আমার লক্ষ্মী সরস্বতী। অতি শৈশবেই আমরা পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হই, সেই হইতেই মা আমাদের লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য, কিন্তু এই কর্ত্তব্যের মধ্যেও একটু বিশেষত্ব ছিল।

পাড়ার মেয়েদের সহিত মার খুবই আলাপ ছিল। বয়স হইলেও দেখিয়াছি মার সহিত কখনও কাহারও কলহ হয় না। মার চোখে সকলেই সমান।

রেণুর মার সঙ্গে মার সম্বন্ধটা কিছু বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রেণুর মা আমার মাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। সময় পাইলেই আমাদের বাড়ী আসিতেন, মাও যখন তখন তাহাদের বাড়ী যাতায়াত করিতেন।

লোকে বলিত, "এ দুটিতে দিব্যি কিন্তু মানায়", মা স্নিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেন। রেণুর মার দুই চোখে জল ঝরিয়া পড়িত। এমনি করিয়াই লোকের মানানোর ভিতর দিয়া, মার বিমল স্নেহের ভিতর দিয়া এই সুকুমার দেহ অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিতে ছিল।

নারিকেল পাতার ফাঁক দিয়া চাঁদ আমাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া উঁকি মারিত, হেনার গন্ধে বাড়ীখানি আমোদিত হইত, আর আমি মার কোলে মাথাটি রাখিয়াই দিব্য আরামে শুইয়া গল্প বলিবার জন্য জিদ ধরিতাম। কোনও দিন বা "দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প, আবার কোনও দিন বা রাজ কন্যার একাকিনী বাস, সেই সোণার কাঠি, রূপার কাঠি, সোণার খাট, সেই

তেপান্তরের মাঠ, সেই চরকা কাটা বুড়ীর কথা শুনিতে শুনিতে কোন সময়ে মার বুকের ভিতরে মাথাটি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।'

(৩)

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণে রেণুর মাসির বাড়ী, পুবে আমাদের পুকুর। পুকুরের পাড়ে সারি দিয়া বকুলের গাছ। জলে পা দিয়া বকুল ফুলের মালা গাঁথার ধুম পড়িয়া যাইত। কত রাজ্যের কত ছেলে মেয়ে আসিত। কিন্তু আমার খেলার সাথী এক রেণু বই আমার খেলা হইত না।

কে ভাল মালা গাঁথিতে পারে, সে না আমি—না আমার মালাই ভাল হইয়াছে; এইরূপে রোজই প্রায় তার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম আবার ভোর না হইতেই দুই জনের মনের এমন নিখুঁৎ মিলটুকু হইয়া যাইত, যে সে দু'টি কোমল প্রাণের কলি কোথায় ফুটিয়াছিল তাহা ধরা যাইত না।

এমনি করিয়াই সুখে দু'জনের বাল্যকাল ফাঁকি দিয়া কোন এক সময়ে সুকুমার কৈশোরে পা দিয়াছিল তাহা কেহই বুঝিতেও পারি নাই।

মধুময় কৈশোরে পদার্পণ করিতেই রেণুর মা সংসারের এত সাধের দুঃখের মায়া কাটাইয়া রেণুকে ফেলিয়া কোন এক অজানা দেশে চলিয়া গেল। গেল তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু যাইবার আগে আমার হাতে রেণুর হাত খানা দিয়া বলিয়া গেল, "তোমরা দুটীতে সুখে থেক, এই আমার শেষের আশীর্ব্বাদ রইলো।" মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি বড় সাধ ছিল, এই ফাল্গুনেই দুটীতে এক ক'রে দেব, ভাগ্যে তা আর ঘটল না, দিদি, আমার রেণু, বিনু রইল, দু'টীকে তুমি দেখ।" মা আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিলেন।'

(৪)

মাসির ছেলে, দেড় বছরের মন্টুকে লইয়া রেণুর দিন একরকমে কাটিয়া যাইতেছিল। মার কথা বলিলে তার চোখের কোণে জল দেখা যাইত। আমার মা তাকে খুবই আদর যত্ন করিতেন।

সেদিন বৈকালে বকুল তলায় বসিয়া রেণু আর আমি বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছিলাম। খুব সুন্দর করিয়া একটা মালা গাঁথিয়া রেণুর গলায় পরাইয়া দিলাম। বলিলাম, রেণু, আজকের মালা খুব ভাল ক'রে গেঁথেছি, এটী তুমি ছিঁড় না। যত্নে রেখ।" "আচ্ছা" বলিয়া রেণু চলিয়া গেল।

পরদিন বৈকালে আবার দুইজনে একত্র হইয়া মালা গাঁথিতে বসিলাম,

ইচ্ছা করে না? তুমি ঘুরে বস বিনুদা, আমি তোমার কপালে ফোঁটা দেই।" আমি ইতস্ততঃ করিতে সে বলিল আমার কথা বলবার বড় বেশী শক্তি নেই। আমার হাঁপ আসছে তুমি ঘুরে বস, তাড়াতাড়ি, আমি ফোঁটা দিয়ে যাই।"

তাহার শরীর তখনও সম্পূর্ণ সারে নাই। আমি আর আপত্তি মাত্র না করিয়া ঘুরিয়ে বসিলাম, সে কপালে ফোঁটা দিতে লাগিল :—

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গো-চোনা, গোময় ইত্যাদির দ্বারা আমার কপাল ভরিয়া দিল। খাবার হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল :—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।"

আমি বলিলাম, ও মন্ত্রের অর্থ কি, রেণু? সে বলিল, 'কি জানি, আমাদের পাড়াগাঁয়ে শুধু বলে, "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম দুয়োরে পড়ল কাঁটা।" আমি হাসিতে লাগিলাম। মা আসিয়া যে আমাদের এই কাণ্ড কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিয়াছেন বলিতে পারি না। মা মুখে হাসি, চোখে জল করিয়া বলিলেন, বিনুর আমার সাধ মিটল। আমি বলিলাম, দেখত মা, রেণু আমার কপালে জোর করে ফোঁটা দিল। মা বলিলেন, বেশ করেছে। আমি বলিলাম, এখন তবে ত ও আমার বোন, ঘর বের জোগাড় করতে হয় না মা? মা বলিলেন "হাঁ।" রেণু মাকে প্রণাম করিল। আমিও বুঝিলাম, কায়দায় ফেলিয়া সে এইবার মালা ছেঁড়া রাগের শোধ তুলিয়াছে। মনটা ভারি খারাপ হইয়া গেল।

প্রভাতে।

[শ্রীবিজনবালা দেবী।]

সোণালী উষার মধুর কিরণ
নিশার তিমির করিয়া হরণ
ধরণীর পর হাসিয়া ফুটিয়া
উঠিল ওই

সে আলোকে মোর মনের আঁধার
টুটিল কই ?

(২)

এ নব প্রভাতে মধুর সুতানে
বনের বিহগ সুধাভরা গানে
আকাশ বাতাস সঘনে কাঁপায়ে
তুলিল ওই ;
আমার সাধের হৃদয়-বাঁশরী
বাজিল কই ?

(৩)

শিশির-বিন্দু গলায় পরিয়া
শোভা-সুষমায় উজল করিয়া
যত ফুল সব হরষে বিকশি'
উঠিল ওই ,
মোর হৃদয়ের আধ-ফোটা ফুল
ফুটিল কই ?

(৪)

সারাটি জগৎ এ নব আলোকে
নবীন হরষে আকুল পুলকে
আশা, হাসি, গানে ধীরে ধীরে জাগি'
উঠিল ওই ,
আমার দেবতা আমার হৃদয়ে
জাগিল কই ?

সিনফিনের পরিণতি।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

সিনফিন যে প্রথমাবস্থায় সমগ্র আইরিস জাতির সহানুভূতি পায় নাই তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শ্রমজীবীদের স্বার্থের দিকে ইহারা তত দৃষ্টি রাখে নাই। কিন্তু সারা ইউরোপে শ্রমজীবীদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আয়র্লণ্ডেও একটা প্রবল শ্রমজীবীদল গড়িয়া উঠিতেছিল, ও' কনলীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া ইহারা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে একটা প্রজাতন্ত্র-মূলক সোসিয়ালিষ্ট দল গঠন করিয়া তুলে। প্রথম অবস্থায় সিনফিন দলের সঙ্গে এই শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত, তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, কেবল মাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিবার আশা করেন তাঁহারা কতদূর ভ্রান্ত। পতিত দেশের উদ্ধার করিতে গেলে, দেশের মধ্যে যাহারা পতিত, তাহাদেরই উদ্ধার আগে করিতে হয়।

আয়র্লণ্ডের পুরাতন বিপ্লবপন্থীদের ভগ্নাবশেষ গুলি ক্রমে ক্রমে এই শ্রমজীবী সংঘের সহিত মিলিত হইয়া একটা নূতন দল গড়িয়া তুলিল। যাঁহারা হোমরুলের আশায় রেডমণ্ডের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হোমরুল বিলের রূপ দেখিয়া তাঁহারাও অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। অধিকন্তু এই ভাঙ্গা-চোরা হোমরুল বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য অলষ্টর-বাসিগণ যখন অস্ত্র ধারণের ভয় দেখাইল, এবং গোপনে তাহারা কামান বন্দুক সংগ্রহ করা সত্ত্বেও যখন ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন না, তখন ন্যাশনালিষ্ট দলের অনেকেই বিপ্লবপন্থী হইয়া দাঁড়াইলেন।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে ইউরোপে তুমুল সংগ্রামের তুরীভেরী বাজিয়া উঠিল। বাণিজ্য ব্যাপার লইয়া ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মানীর যুদ্ধ যে একদিন অনিবার্য্য একথা দুই তিন বৎসর হইতে অনেকেই বুঝিয়াছিল। যুদ্ধ যখন ঘোষিত হইল, তখন যদি রেডমণ্ড জিদ ধরিতেন যে হোমরুল কার্য্যে পরিণত না হইলে আয়র্লণ্ড হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলে হয় ত হোমরুলের এমন অকাল-মৃত্যু ঘটিত না, কিন্তু তিনি নিতান্ত ভদ্রলোকের মত ইংলণ্ডের কথার উপর নির্ভর করিয়া আইরিসদিগকে সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য

সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ফলে ৪০ হইতে ৫০ হাজার আইরিস সৈন্য সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে ছুটিল। সিনফিনদিগের মুখপত্র এ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলে যে ইহার ফল বিষময় হইবে:—'If England wins this war she will be more powerful than she has been at any time since 1864 and she will treat the Ireland which kissed the hand that smote her as such an Ireland ought to be treated."

'ইংলণ্ড যদি এ যুদ্ধে জয়ী হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড এত প্রবল হইয়া উঠিবে যে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের পর তত কখনও হয় নাই, এবং যে আয়র্লণ্ড ঘাতকের হস্ত লেহন করিয়াছে তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত সেইরূপই করিবে।'

আজ আয়র্লণ্ডের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে।

সিনফিন্‌দিগের মুখপত্রে অন্যত্র লিখিত হয়—"যুদ্ধের সময় আইরিস স্বেচ্ছা-সৈনিকগণকে যদি আয়র্লণ্ড রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে তাহারা আইরিস সেনাপতির অধীনে ও আইরিস পতাকার তলে তাহা করিবে। আর তাহা না হইলে তাহারা আপনাদের দেশের দাসত্ব চিরস্থায়ী করিবে মাত্র।"

যুদ্ধ-ঘোষণার তিন মাস পরে সিনফিন, শ্রমজীবী ও প্রজাতন্ত্র দলের সমস্ত সংবাদ পত্র পুলিসে বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু যুদ্ধের জন্য আইরিসদের বিদেশ যাত্রা করা উচিত কি না, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। রেড্‌মণ্ডের ন্যাশনালিষ্ট দল ও অলষ্টরের ইউনিয়নিষ্ট দল ইংলণ্ডের সাহায্য করিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহের পক্ষপাতী আর সিনফিন ও প্রজাতন্ত্রের দল উহার বিরোধী রহিলেন। অবস্থার চাপে পড়িয়া ক্রমশঃ সিনফিন ও প্রজাতন্ত্রবাদীরা এক হইয়া উঠিতেছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে গ্রিফিথ একখানা নূতন সংবাদ-পত্র প্রচার করিয়া ইংরাজ-স্বার্থের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ছয় সপ্তাহের মধ্যেই সেখানির প্রচার বন্ধ করিতে হয়।

এ দিকে ইংলণ্ড বেলজিয়ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উচ্চকণ্ঠে আয়র্লণ্ডবাসীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আয়র্লণ্ডের মনে শুধু এই কথাই উঠিতে লাগিল—"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিদের জন্য যাহাদের এত গভীর সহানুভূতি, তাহারা আয়র্লণ্ডের জন্য কিছু করে না কেন? ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহারা চিরদিনই সন্দিহান, এখন তাহাদের বেশ দৃঢ় প্রতীতি হইল

যে, হোমরুল বিল পুঁথির মধ্যেই থাকিয়া যাইবে; কাজে কখনও লাগিবে না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিবার উপায় নাই; বিরোধী সংবাদপত্রের পরমায়ু নিতান্তই অল্প। শেষে গ্রিফিথ "Scissors and Paste" নাম দিয়া এক সংবাদ-পত্র প্রচার আরম্ভ করেন। সম্পাদকীয় মন্তব্য শুধু একটী মাত্র প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল—বাকি সমস্ত সংবাদাদি অন্যান্য সংবাদ পত্র হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু সেই একটী মাত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আয়র্লণ্ডের মনের কথা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছিল:—

"It is high treason for an Irishman to argue with the sword the right of his small nationality to equal political freedom with Belgium or Servia or Hungury It is destruction to the property of his printer now when he argues it with the pen. Hence while England is fighting the battle of the small nationalities, Ireland is reduced to Scissors and Paste. Up to the present the sale and use of these instruments have not been prohibited in Ireland."

"বেলজিয়ম, সার্বিয়া বা হাঙ্গারীর মত স্বাধীনতা পাইবার জন্য আইরিসরা যদি তরবারি লইয়া দাঁড়ায়,—তাহা হইলে তাহার নাম রাজদ্রোহ। সে স্বাধীনতার কথা লইয়া যদি সংবাদ পত্রে বিচার বিতর্ক করে তাহা হইলে মুদ্রাযন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তাই ইংলণ্ড যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির স্বাধীনতার লাভের জন্য যুদ্ধ-নিরত, আয়র্লণ্ডকে 'কাঁচি ও কাই' সার হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। ওগুলির ক্রয় ও ব্যবহার আয়র্লণ্ডে এখনও নিষিদ্ধ হয় নাই।"

বলা বাহুল্য, এ সংবাদ-পত্রখানিও অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভাবপ্রচার কার্য বন্ধ হইল না। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত হইয়া আইরিসদিগের দ্বারে দ্বারে স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ফলে আয়র্লণ্ডে যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত স্বেচ্ছাসৈন্যের দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যাঁহারা রেড মণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে রহিলেন, যাঁহারা ইংলণ্ডের সাহায্য প্রয়াসী তাঁহাদের নাম হইল ন্যাশনাল ভলণ্টিয়াস, আর যাঁহারা মুখ্যতঃ আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা প্রয়াসী তাঁহাদের নাম হইল "আইরিস ভলনটিয়াস।" আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যে একদিন যুদ্ধ করিতে হইবে, অন্ততঃ অলষ্টরের হাত হইতে হোমরুল বিলকে বাঁচাইতে হইলেও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে

পারে, এই বিশ্বাস বুকে লইয়া আইরিস ভলাণ্টিয়ার দল গাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নেতা জেমস্ ও'কনলীর সহিত প্রজাতন্ত্রদলের তখনও একটা বোঝাপড়া হয় নাই। ও'কনলী শুধু জাতীয় পতাকা, জাতীয় পার্লামেণ্ট বা জাতীয় স্বাধীনতার নাম তুলিতে চাহিতেন না। তিনি বলিতেন, যে যে জাতীয় স্বাধীনতার ফলে আপামর-সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের আপন আপন জীবন স্বাধীনভাবে গড়িয়া তুলিবার শক্তি না আসিবে, সে স্বাধীনতায় শুধু শ্রেণী-বিশেষের আধিপত্য লাভ হইবে মাত্র, তাহার জন্ম মরিয়া লাভ নাই।

এ দিকে পিয়ার্সের (P. H. Pearsc) শিক্ষার ফলে আইরিস ভলণ্টিয়ার্স-গণও ব্যাপকভাবে স্বাধীনতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিল। যে উলফ্ টোন আইরিস স্বাধীনতার ভাব-কেন্দ্রস্বরূপ, তাঁহার শিক্ষা বিশ্লেষণ করিয়া পিয়ার্স দেখাইতে লাগিলেন যে ও'কনলীর শিক্ষার সহিত উহার মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই, উলফ্টোন শুধু শ্রেণীবিশেষের স্বাধীনতার জন্ম জীবন দিয়া যান নাই, সর্ব্বশ্রেণীর স্বাধীনতাই তাঁহার মূলমন্ত্র। "Let no man be mistaken as to who will be lord in Ireland when Ireland is free. The people will be lord and master." "If the men of property will not support us, they must fall : we can support ourselves by the aid of that numeroru, and respectable class of the community the men of no property."

"আয়ার্লণ্ড স্বাধীন হইলে কর্ত্তৃত্ব কাহার হাতে আসিবে এ বিষয়ে যেন আমাদের ভুল ধারণা না থাকে। প্রজা-সাধারণই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবে।" "ধনী সম্প্রদায় যদি আমাদের সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাহাদের পতন অনিবার্য্য। যাহারা অর্থ-সম্পদহীন সেই বহুসংখ্যক ভদ্রশ্রেণীর সাহায্যের উপর আমরা নির্ভর করিব।" বলা বাহুল্য অর্থসম্পদ হীন ভদ্রশ্রেণী অর্থে শ্রমজীবী সম্প্রদায়।

পিয়ার্স এবং ও'কনলীর শিক্ষার ফলে প্রজাতন্ত্রের দলের সহিত শ্রমজীবীদল একীভূত হইয়া গেল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আয়র্লণ্ডে ইহারা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিলেন। বিপ্লববহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সিনফিন দলের সহিত এ বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু বিপ্লব যখন দমন করা হইল তখন সিনফিন দলের নেতারাও দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন।

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বিদ্রোহের সময় আয়র্লণ্ড সম্পূর্ণরূপে সিনফিন বা প্রজাতন্ত্র-মতাবলম্বী হয় নাই। রেডমণ্ডের ন্যাসনালিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল; বিদ্রোহের পর বেশ বুঝা গেল যে হোমরুল বিল কার্য্যে পরিণত হইবার আর বড় আশা ভরসা নাই। প্রজাতন্ত্র-বাদীদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল, বিদ্রোহ থামিবার অল্প দিন পরেই একটা গুপ্ত বিচারের পর পিয়ার্স, ও'কনলি ও অপর তেরজন নেতাকে গুলি করিয়া মারা হইল। দেশময় ধরপাকড় আরম্ভ হইল, ৩০০০ জনকে কারাবদ্ধ করিয়া দেশান্তরিত করা হইল। বিদ্রোহ-দমন কার্য্যটা বেশ জাঁকজমকের সহিতই সম্পন্ন হইল।

আয়র্লণ্ড চুপচাপ করিয়া দেখিল। শেষে ক্রমে ক্রমে সকলের মাথায় এই কথাটা ঢুকিল যে এতগুলা লোককে যে গুলি করা হইল, ইহারা যদি ইংরাজ হইত ত প্রকাশ্য বিচারালয়ে ইহাদের বিচার হইত; জর্ম্মান হইলে ইহারা যুদ্ধের বন্দীর মত ব্যবহার পাইত, কিন্তু পরাধীন আয়র্লণ্ডবাসী বলিয়াই ইহাদের আজ এই বিড়ম্বনা। শেষে ইংলণ্ডের প্রধান সচিব যখন পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিলেন যে আইরিস বিদ্রোহীদিগের প্রতি এইরূপ ব্যবহার সাধারণ ইংলণ্ডবাসীর অভিপ্রায়-সঙ্গত, তখন আয়র্লণ্ড একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। লোকে শুধু দুঃখ বা রাগ প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইল না। যাহারা পূর্ব্বে ও'কনলী বা পিয়ার্সের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই তাহারাও বুঝিতে চাহিল যে অকাতরে এ লোকগুলা এমন করিয়া প্রাণটা দিল কেন? সিনফিন-সাহিত্য পড়িবার জন্য লোকে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। লোকে ক্রমে ক্রমে বুঝিল যে উলফ্ টোন হইতে আরম্ভ করিয়া পিয়ার্স, ও'কনলী পর্য্যন্ত সকলেই আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য মরিয়াছে, হাজার হাজার সৈন্য যে জর্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ করিয়া মরিল—তাহারা বৃথায় মরিয়াছে। কিন্তু অস্ত্রবলে ইংরাজকে তাড়ান ত সম্ভব নয়। সিনফিন যে ইংরাজ শাসন কার্য্যতঃ অস্বীকার করিতে বলিতেছে—সেই পন্থাই অবলম্বনীয়। কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের শাসনপ্রণালীর ধুয়া ধরিলে আর চলিবে না। যাহারা আয়র্লণ্ডের জন্য প্রাণ দিয়াছে—তাহাদের প্রচারিত প্রজাতন্ত্রই আদর্শ বলিয়া মানিতে হইবে।

সারা আয়র্লণ্ডের মনে দেখিতে দেখিতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বড় একটা সংবাদ রাখিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, রাজনৈতিক কয়েদীদের ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে একটা হোমরুলের বন্দোবস্ত করিলেই দেশ শান্ত হইয়া যাইবে। কয়েদীরা ছাড়া পাইল, প্রধান মন্ত্রী

বলিলেন যে অচিরে আয়র্লণ্ডের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু তিনি রাজ্যময় সকল দলের কাছেই তাহাদের মনোমত এক একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার প্রতিজ্ঞার আর কাহারও নিকট মূল্য রহিল না।

১৯১৭ সালে সিনফিনের কর্ত্তৃপক্ষগণ আবার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। "জাতীয়তা" (Nationality) নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক বাহির হইল। এবার দেশশুদ্ধ লোক তাহা পড়িতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডে যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহারা আয়ার্লণ্ডের বিরোধী, সুতরাং সকলেই বুঝিয়াছিল যে পার্লামেণ্টে গিয়া বক্তৃতা দিয়া আর কোনও লাভ নাই। সিনফিন-নির্দ্দিষ্ট পথই একমাত্র পথ বলিয়া সকলে মানিয়া লইল। এদিকে 'আইরিস নেশন লি' নামে সিনফিন ভাবাপন্ন একটা স্বতন্ত্র দল গড়িয়া উঠিল। অন্যান্য দেশের নিকট আয়র্লণ্ডকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করাইয়া লওয়া ও আয়র্লণ্ডের আত্মশক্তির পরিপুষ্টি সাধন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আয়র্লণ্ডে যাহাতে বাধ্যতামূলক সৈন্য-সংগ্রহ (conscription) না চলিতে পারে, ও আয়র্লণ্ড যাহাতে দুই ভাগে বিভক্ত না হয় তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সমগ্র আয়র্লণ্ডই সিনফিন ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ ১০।১২ খানি কাগজে সিনফিন মতবাদ সমর্থিত হইতে লাগিল। পার্লামেণ্টে যখন সভ্য নির্ব্বাচনের সময় আসিল তখন সিনফিনেরই জয় হইল। কর্ত্তৃপক্ষ আবার ভাবিত হইয়া পড়িলেন; শেষে যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল তাঁহাদিগকে পুনরায় নির্ব্বাসিত করাই স্থির করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন তাহাতে খণ্ডিত হইল না। সিনফিন শান্তি সমিতি (Peace Conference) নিকট বিচার ভার দিবার জন্য ডাবলিনে এক সভা আহ্বান করিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী একটা ভাঙ্গাচোরা হোমরুল খাড়া করিয়া বলিলেন—'হয়, ইহা গ্রহণ কর, নয় সমগ্র আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধিগণ মিলিয়া তাহাদের মনোমত একটা প্রস্তাব খাড়া করুক। সিনফিন দলকে এই প্রতিনিধি সভায় পাঁচজন মাত্র সভ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইল, অথচ আয়র্লণ্ডে তখন সিনফিন মতাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক। কাজে কাজেই সিনফিন এই সভায় যোগদান করিল না। এদিকে আবার নূতন করিয়া "আইরিস ভলাণ্টিয়ারের" দল সরকারী পক্ষ হইতে সহস্র বাধা সত্ত্বেও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। 'ন্যাসনালিষ্ট' ভলাণ্টিয়ারদের নিকট হইতেও অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লওয়ায় তাহারাও মনে মনে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধী হইয়া উঠিল।

সরকারী প্রতিনিধি সভার বিচার বিতণ্ডা একদিকে চলিতে লাগিল, অপর দিকে সিনফিনদল আপনাদের এক সভা আহ্বান করিয়া ডি ভ্যালেরাকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচন করিলেন। ডি ভ্যালেরা প্রথমে প্রজাতন্ত্রবাদী বিপ্লবপন্থী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সিনফিনের সভাপতিত্ব গ্রহণে প্রমাণিত হইল যে সিনফিনদল ক্রমশঃ প্রজাতন্ত্রবাদী হইয়া উঠিয়াছেন, এবং বিপ্লবপন্থীরাও বিদ্রোহ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সিনফিন মতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছেন। এই এই সময় হইতেই বর্ত্তমান সিনফিনের আরম্ভ। উহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ডি ভ্যালেরা বলিয়াছেন—"সিনফিন অন্যান্য দেশের নিকট হইতে আয়র্লণ্ডকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে। সে চেষ্টা সফল হইবার পর সমস্ত আইরিস জাতি মিলিয়া যে শাসন প্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া লইবে তাহাই গ্রাহ্য হইবে। ইংলণ্ড বা অন্য কোনও বিদেশী শক্তির আয়র্লণ্ডের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার শক্তি তাহারা স্বীকার করিবে না; ইংলণ্ড সৈন্যবল বা অন্য কোনও শক্তি দ্বারা আয়র্লণ্ডকে পরাধীন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে তাহারা যে কোনও উপায়ে হোক সে শক্তির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে, আয়র্লণ্ডের জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এক প্রতিনিধি সভার উপর সমস্ত বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার অর্পিত হইবে।

পুরাতন সিনফিন হইতে এই নূতন সিনফিন দুই এক বিষয়ে পৃথক। পূর্ব্বে সিনফিন একমাত্র স্বাবলম্বনেরই পক্ষপাতী ছিল, এখন ইহা শান্তি সভা প্রভৃতি বহিঃশক্তিরও আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হইল না, পূর্ব্বে ইহা অস্ত্রধারণের পক্ষপাতী ছিল না, এখন সে কথার উপর আর বড় একটা জোর দিল না।

সিনফিন যখন ক্রমে দুর্ভিক্ষদমনের জন্য খাদ্যদ্রব্য দেশের বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল তখন সাধারণ লোকে উহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ আয়লণ্ডের শাসন প্রণালী স্থির করিবার জন্য যে প্রতিনিধি-সভার (Convention) আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা পরিণামে নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইলেও যখন আইরিসদিগকে বাধ্য করিয়া সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করিবার কথা উঠিল তখন আয়লণ্ডের সর্ব্বসাধারণ তাহাকে বাধা দিবার জন্য সিনফিনের সহিত যোগ দিল। ফলে ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের মানসিক বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। সেইদিন হইতে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছে, আজও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই।

জড়বিজ্ঞান ও জীবাত্মা।

[শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত।]

পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের ক্রম-উন্নতির সহিত যিনি কিছু না কিছু পরিচয় রাখেন তিনিই জানেন যে জড়বিজ্ঞান এক অসম সাহসিক—অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব-তত্ত্ব মীমাংসায় মন দিয়াছে। তত্ত্বটী হইতেছে দেহান্তে আত্মার সজ্ঞান অস্তিত্ব সত্যই থাকে কি না।

কি সভ্য কি অসভ্য সব জাতির মধ্যেই আবহমান কাল হইতেই মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস কোনো না কোনো রকমে চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ রকমেই দেখা যায় জাতি মাত্রেরই ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল স্তম্ভ পরকালে আত্মার অস্তিত্ব। মহাপুরুষরা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শুধু তাই নহে অনেক সাধারণ লোকও কোনো না কোনো সময়ে নিজ জীবনে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়াছে। ফলতঃ মানব জাতির ইহা একটা স্বতঃ-ঘটিত বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

তারপর যখন জড় বিজ্ঞান জন্মলাভ করিয়া মানুষের অলৌকিক বিশ্বাসে ধাক্কা দিল তখন এই বিশ্বাসের ভিত্তি একটু যেন টলিল। সাধারণ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যখন ধরা পড়িল না তখন শিক্ষিত জ্ঞানাভিমানী মানুষ এটাকে কুসংস্কার বলিয়া বর্জ্জন করিল। প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী বৈজ্ঞানিক ইহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিল না। ফলে বিজ্ঞান এ সব তত্ত্বকে কুসংস্কার বা মস্তিষ্ক রোগের লক্ষণ বলিয়া ধার্য্য করিল। কিন্তু প্রকৃতিদেবী মানুষের রুচি অরুচি, বিশ্বাস অবিশ্বাস অনুসারে চলিল না, -অলৌকিক ঘটনা তৎসত্ত্বেও মানবের অভিজ্ঞতায় দেখা দিতে লাগিল। যাহাদের অভিজ্ঞতায় আসিল তাহারা বিজ্ঞানের টিট্‌কারির ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। বৈজ্ঞানিকদের নজরে খবর যদি বা কোনো উপায়ে আসিল—তাঁহাদের অনেকেই উহা অনুভবকারীর মতিবিকৃতি বা মিথ্যাকথা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। তবে সৌভাগ্যক্রমে সব বৈজ্ঞানিক একধাতের নয়। দু চারজন সত্যপিপাসু নির্ভীক পণ্ডিত দেখিয়া শুনিয়া অবিশ্বাস করিতে নারাজ হইলেন। তাঁহাদের উদার বুদ্ধি বলিল—"বিশ্বরহস্য কি সব আমরা

করতলগত আমলকীর মত জানিয়া ফেলিয়াছি? তা কখনোই নয়, আমার ক্ষুদ্র সসীম বুদ্ধিতে বুঝা যায় না বলিয়া এ সব যে অসম্ভব তা কদাপি নয়। নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে অনেক অজ্ঞেয় তত্ত্বই আমরা জানি না। তার অনাবিষ্কৃত রাজ্য হইতে যদি এমনি দু একটা ইঙ্গিত আসে তাতে চোখ বোজা জ্ঞানপিপাসু সত্যসেবকের কাজ নয়। এ তত্ত্ব বুঝিতে হইবেই।" এই বলিয়া তাঁহারা অলৌকিককে বুঝিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

ইয়ুরোপ অমেরিকার আধুনিক পণ্ডিতদের এই ভাব। দর্পিতমস্তক সব-জান্‌তা বিজ্ঞান—অসীমের কাছে সভয় সম্ভ্রমে নতমস্তক। হ্যাকেল জাতীয় দর্পান্ধ বৈজ্ঞানিক আর বড় এখন নাই। আধুনিক জ্ঞানবীরবা এখন স্বীকার করিতেছেন আমরা যা জানি বা জানিয়াছি তাহা অজানার তুলনায় সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ।

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা সভ্যতা আমদানী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেহান্তে আত্মার অস্তিত্ব আমরা একরকম স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া ছিলাম, কেননা আমাদের শাস্ত্র বচন বা বিশ্বাস—মহাপুরুষদের প্রত্যক্ষলব্ধ অনুভূতির ফল। এখন যেমন বিদ্যালয়ের ছেলেরাও মাধ্যাকর্ষণকে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া মানিয়া লইয়াছে আমরাও তেমনি জন্মান্তর বা পরলোকতত্ত্বকে মানিয়া লইয়া ছিলাম। তারপর ইংরাজি বিজ্ঞানের বিপ্লবশক্তির বলে এখন আর সে সব কথায় তত বিশ্বাসবান্ নহি। ইংরাজী বৈজ্ঞানিকের সায়ে সায় দিয়া শিক্ষাভিমানী আমরা এ সব তত্ত্বকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিলাম। দৃষ্টান্ত আমাদের কথায় ও লেখায় ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। সার রমেশ দত্ত তাঁহার ইংরাজী 'ভারত সভ্যতা' গ্রন্থে জর্ম্মন পণ্ডিতের মতে মত দিয়া ভারতীয় যোগশাস্ত্রকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া হেয় করিলেন। আজ আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যোগশাস্ত্রকে ভারতীয় আর্য্যপ্রতিভার এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। আমরাও সেই সুরে সুর মিলাইয়া আমাদের আর্য্য প্রতিভার গুণ গান আরম্ভ করিয়াছি। আমরাই কিছুদিন আগে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দোহাই দিয়া আত্মা ও পরলোক তত্ত্বকে কুসংস্কার বলিয়া গলা ছাড়িয়াছিলাম, আমরাই আজ আবার তাঁদের দেখাদেখি পরলোক তত্ত্বকে বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া বগল বাজাইতেছি। আমাদের দৈহিক অধীনতার চেয়ে মানসিক অধীনতা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে।

সে যাক্। পরকাল তত্ত্ব, বা আত্মার দেহান্তে স্থিতি যে জড়বিজ্ঞান পদ্ধতির কাছে ধরা দিবে এ কথা কেহ কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই। এমন অসম্ভবও সম্ভব হইতে চলিয়াছে। আধ্যাত্ম সূক্ষ্ম চিৎতত্ত্ব যে জড় বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা প্রেক্ষণের আমলে আসিবে এ মহা অসম্ভব ব্যাপারই বটে। তবে এখন এ যুগে চোখ কান খুলিয়া—বিশ্বের হাটে দাঁড়াইয়া কেহ বড় বলিতে সাহসী নন—কোনটী সম্ভব আর কোনটী অসম্ভব। অতি উদ্ভট যে কাল্পিকার কল্পনা খেয়াল আজ তাহা কঠিন বাস্তবের রূপে দেখা দিতেছে। কে ভাবিয়াছিল যে দশবছর আগে লণ্ডনে বসিয়া কথা কহিলে—নিউইয়র্ক বা নিউজিলণ্ডের ঘরে বসিয়া মানুষ সে কথা শুনিবে? কে ভাবিয়াছিল যে মানুষ আকাশে ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে উড়িবে?—সাড়ে চারফুট সাইজের এই যে মানুষ-কীট এ না করিতেছে কি?

সব চেয়ে আবার অসম্ভব অথচ অতি পুরাতন কথা ও তত্ত্ব এই জন্মান্তর রহস্য ভেদ। যে পন্থায় যে পদ্ধতিতে জড়রহস্যকে বৈজ্ঞানিকতার পরীক্ষাগারের মীমাংসার বিষয় করিয়াছে সেই পন্থা ও পদ্ধতিতেই বৈজ্ঞানিক আত্ম-রহস্য ভেদ করিতেছে। কিছু দিন আগে জড়বৈজ্ঞানিক সদর্পে বলিয়াছিল, জীবের চেতনা বা প্রাণ জড়েরই সংযোগ বিয়োগ ঘটিত ফল। দধি যেমন দুধের বিকার ফল চৈতন্য তেমনি gray matter মস্তিষ্কপদার্থের ক্রিয়া ফল। আজ তাঁহারাই সন্দেহ করিতেছেন যে চৈতন্য জড়াতিরিক্ত একটী অজ্ঞেয় বস্তু, এবং তার অস্তিত্ব ও ক্রিয়া সব সময়ে জড়াধীন নয়। বিষয় জ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পরিচিত উপায় ছাড়া অন্য অজ্ঞেয় উপায়েও হইতে পারে। অর্থাৎ চোখ কাণ জিভ, ত্বক নাক ইহারা মস্তিষ্কের কয়টা key মাত্র—মস্তিষ্কও একটা জ্ঞান যন্ত্র, নিজে জ্ঞাতা নয়। আসল জ্ঞাতা সময়ে সময়ে মস্তিষ্ক ব্যতিরেকেও জ্ঞান লাভ করে।

জড়-বৈজ্ঞানিক কেন যে হঠাৎ সুর বদলাইলেন তাহা জানিবার বিষয় বটে। কি এমন ঘটনা ঘটিল যে আজ হঠাৎ আত্মম্ভরি বৈজ্ঞানিক তাঁর জন্মপোষিত প্রিয় মতটীকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন? ঘটনা কিন্তু ঘটিয়াছে। আমরা উপরে একস্থানে বলিয়াছি যে সকল বৈজ্ঞানিকই অন্ধদর্পী নন, কেহ কেহ আছেন যাঁরা বিনয়ী, যাঁরা মনে জ্ঞানে জানেন আমার জ্ঞাত অংশছাড়া বিশ্বরাজ্যে অজ্ঞাত বৃহত্তর একটা সীমাহীন-দেশ আছে। যেথা হইতে অলৌকিক অর্থহীন অদ্ভুত ঘটনা সব ছট্‌কাইয়া আসিয়া আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের

সীমানার মধ্যে পড়িতেছে। একটা আধটা নয় অসংখ্য—আজ কাল নয় চিরকাল হইতে, এখানে এদেশে নয় সব দেশে, মূর্খ অজ্ঞানীর গোচরে নয়—জ্ঞানী পণ্ডিতেরও গোচরে। যখন ঘটিতেছে দেখিতেছি তখন না মানিয়া চোখ বুজিব এ কেমন কথা? চোক বুজিলেই বা অঘটন ঘটনা ছাড়ে কই? কাজেই অনকয়েক নির্ভীক পণ্ডিত লোকলজ্জা ঠাট্টাবিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া ইহার অনুসন্ধানে মন দিলেন। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর আগে ডবলিন রয়্যাল কলেজের পদার্থতত্ত্বের (physics) আচার্য্য W. Barrett তাঁহার এক পরিচিত বন্ধুর বাড়ীতে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করেন। উক্ত বন্ধুর দুই কন্যার আজন্ম এক অদ্ভুত শক্তি ছিল। একজন একটা কিছু মনে করিলে অপরে তা আপনা হইতে বলিয়া দিত। ব্যারেট নিজে তাহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফলে জানিলেন যে পরিচিত ইন্দ্রিয়যোগ ছাড়া অতীন্দ্রিয় উপায়ে একজন আর একজনের মনোভাব বলিতে পারে। আচার্য্য ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইলেন। পরে নিজে অন্য দু একজন উক্তশক্তিশালী লোক লইয়া বহুদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তত্ত্বটীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। পরে তিনি এই কথা তাঁর অন্য বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে বলেন, প্রথম তাঁহারা এসব ব্যাপার বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ব্যারেট ও লজ (Sir Oliver) ছাড়িবার পাত্র নন। আরো কিছু দিন ধরিয়া নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া এবং লব্ধ ফলে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহারা বৈজ্ঞানিক সমাজকে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য অলৌকিক ঘটনা যথা—অতীন্দ্রিয় দর্শন, শ্রবণ,—মোহাবস্থায় অলৌকিক সংবাদ কথন, প্রেত দর্শন প্রভৃতি ঘটনার প্রামাণিক বিবরণ শুনিয়া ও দেখিয়া তাঁহারা মন্তব্য করেন যে বিজ্ঞানের যখন কাজ হইতেছে বিশ্বরহস্য তত্ত্বের মীমাংসা করা, তখন এই সব অলৌকিক ঘটনা কেন তাহার আলোচ্য হইবে না?

ফলে ব্যারেট, সার অলিভার, গর্নি, ও দর্শনাচার্য্য সেজউইক প্রভৃতির উদ্যোগে ও চেষ্টায় একটী বিজ্ঞান সভা Society for Psychical Research (চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সভা) নামে প্রতিষ্ঠিত হইল। সভার পণ্ডিত সভ্যেরা কয়েকটী শাখা সমিতি করিয়া এক একজন এক একটী শ্রেণীর অলৌকিক ঘটনার গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন। এই সভার আলোচনা ও গবেষণা প্রতিবৎসর একটী বিবরণী ও পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

সভার কাজ হইল লোকমুখে শ্রুত অলৌকিক ঘটনার বিবরণ সাক্ষ্য সাবুদ যোগে সত্য বলিয়া প্রমাণ করতঃ লিপিবদ্ধ করা। কেহ যেন মনে না করেন অমুক অমুকের বর্ণিত ঘটনাই লিপিবদ্ধ হয়। তাহা নহে। বর্ণনাকারী বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি কিনা, উক্ত ঘটনা তার নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ কিনা, তিনি তৎকালে সুস্থমনা ছিলেন কিনা, আর কে কে সাক্ষ্য ছিল ইত্যাদি সমস্ত কথার সাবধানতা পূর্ব্বক বিচার বিবেচনা ও পরীক্ষা করিয়া তবে লিপিবদ্ধ হয়। তা ছাড়া সভার পরীক্ষিত ঘটনাগুলিও লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে ভুল ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তাহা বর্জ্জিত হয়। যে রূপ কঠিন মাপ কাঠিতে এ সব ঘটনার সত্যতা যাচাই করা হয় তাহা খুবই গুরুতর। মানুষকে খুন অপরাধে ফাঁসী দিতে গেলে বিচারক যে কড়া প্রমাণের উপর নির্ভর করেন এইসভা কোনো ঘটনাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে তার চেয়ে ৫।৭ গুণ কড়া সাক্ষ্যপ্রমাণ দাবী করেন। প্রমাণের এতাদৃশ অস্বাভাবিক কড়া-কড়িতে বিরক্ত হইয়া অনেক যোগ্য সভ্য এ সভার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। যথা— মহাত্মা ষ্টেড, বিবর্ত্তনবাদী সার এলফ্রেড ওয়ালেস, ষ্টেনটন্ মোজেস প্রভৃতি।

এরূপ ধরণের কড়া প্রমাণ সাক্ষ্য উত্তীর্ণ হইয়াও যে সব ঘটনা বিবরণীতে স্থান পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অনেক। কিরূপ সব ঘটনা সভার পরীক্ষার বিষয় তাহার তালিকা দিতেছি—

(১) অতীন্দ্রিয় উপায়ে মন হ'তে মনান্তরে ভাব চালনা
(২) অতীন্দ্রিয় দৃশ্যদর্শন, শব্দ শ্রবণ
(৩) মৃতের প্রেত দর্শন
(৪) বাড়ীতে ভূতের উৎপাৎ
(৫) সত্য স্বপ্ন
(৬) ভবিষ্য দর্শন, ভবিষ্য জ্ঞান
(৭) মিডিয়ম দেহে প্রেতের আবির্ভাব
(৮) ভৌতিক স্বতঃ কথন, স্বতঃ লিখন
(৯) অশরীরী শক্তি সাহায্যে জড় দ্রব্যের আবির্ভাব, তিরোভাব, চলাচল ইত্যাদি
(১০) প্রেতের মূর্ত্তি ধারণ

আমাদের ইন্দ্রিয় যোগে নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা যেমন কতক আপনা হইতে ঘটে, কতক আমাদের পরীক্ষা বলে ঘটে; এই সব অলৌকিক ঘটনাও তেমনি।

কতকগুলি আপনা হইতে ঘটে, আমাদের তাতে হাত নাই, যখন ঘটে আমরা শুধু দেখিতে পারি, যেমন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহণ, ইচ্ছা করিলে ঘটাইতে পারিনা। আবার কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা আমরা যখন ইচ্ছা পরীক্ষা যোগে ঘটাইতে পারি, সাধারণ ঘটনাও তাই, যেমন দুইটী রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করিলে তৃতীয় একটী নূতন দ্রব্য ঘটে, আমরা যতবার বা যখনি ইচ্ছা তা ঘটাইতে পারি।

চিৎ বা প্রেততত্ত্ব সভাও তেমনি স্বাধীন ঘটনাগুলি ঘটনাকালে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে ও অধীন ঘটনা গুলিকে ইচ্ছা করিলে ঘটাইতে পারে; যেমন আমার অধীনে এক মিডিয়ম আছে, যখনি ইচ্ছা, আমি তাহার দেহে পরিচিত প্রেতকে আবির্ভাব করাইতে পারি।

অলৌকিকের স্ব-তন্ত্র ঘটনার সংখ্যা বড়ই কম, আবার তাহাদের আলোচনার সুযোগ সুবিধা খুব সহজ প্রাপ্য নয়; এইজন্য সভা আত্ম-তন্ত্র পরীক্ষাধীন ঘটনা লইয়া বেশী আলোচনা করিতেছে ও করিয়াছে। পরীক্ষার জন্য ভাল মিডিয়ম দরকার, অর্থাৎ ব্যবসাদার জুয়োচোর প্রবঞ্চক মিডিয়ম না হয়। লাভজনক সমস্ত ব্যাপারের মত অলৌকিক প্রেত ব্যাপারেও জুয়াচুরী প্রবঞ্চনা খুব বেশী। স্বভাবে বিশ্বাসী অলৌকিক প্রত্যাশী মানুষ সহজে ঠকে ও ঠকিতে ভাল বাসে। মানুষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগে অনেক চতুর দক্ষ লোক জাল মিডিয়ম সাজাইয়া মানুষ ঠকাইতে বাকী রাখে নাই। এই একটা কারণ প্রেততত্ত্বে কেন যে বিবেচক শিক্ষিত লোকেরা শ্রদ্ধাহীন ও অবিশ্বাসী হইয়াছেন। চিৎতত্ত্ব সভাকে (S. P. R.) এই অসুবিধা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। সভার ভাগ্যবলে এমন কয়টী মিডিয়ম পাওয়া গিয়াছে যাহাদের বহুবর্ষব্যাপী সাবধান পরীক্ষার ফলে গণ্যমান্য দক্ষ সভ্যরা সৎ ও সাধু বলিয়া মত দিয়াছেন। মিসেস্ পাইপার নাম্নী মার্কীন মহিলা এই ধরণের পরীক্ষিত এক মিডিয়ম। দার্শনিকপ্রবর W James ইহাঁকে সভার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। R. Hodgson মার্কীন প্রেততত্ত্ব সভার দক্ষ বিচক্ষণ সাবধানী সেক্রেটারী, ফাঁকী জুয়াচুরী ধরিতে ইনি অদ্বিতীয়। ইহাঁর বর্ষব্যাপী কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীমতী পাইপার সভার মিডিয়ম কাজে নিযুক্ত হন। সার আলিভার লজও ইহাঁকে বিধিমত পরীক্ষা করিয়া বিশ্বাসী বলিয়া মত দেন। শ্রীমতী এখনো জীবিতা এবং সভার সাধু কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি স্বভাব-মিডিয়ম। অর্থাৎ

আপনা হইতে ইহাঁর ভাব, মোহ বা সমাধি অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় তাহার মুখ অধিকার করিয়া অন্য অশরীরী সজ্ঞান শক্তি বা সত্বা কথা বলে বা হাতে ভর হইয়া সংবাদ লেখে।

বড় বড় বিচক্ষণ ঘোর সন্দেহবাদী জড় বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা সেই সব প্রাপ্ত কথা বা লেখা আজ ৩০ বৎসর ধরিয়া বিধিমতে আলোচনা সমালোচনা করিয়া এই বিশ্বাসে আসিয়াছেন সে যে চৈতন্য সত্তা শ্রীমতী পাইপারের দেহ অধিকার করিয়া বার্ত্তা দিতেছে তা পাইপারের স্বচৈতন্য নহে। শুধু তাই নহে উক্ত চৈতন্য সত্তা যখন যে মৃতব্যক্তির বিদেহ আত্মা বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতেছে— এ যে সত্যই তাহারই আত্মা তাহাতে পনেরো আনা সত্য সম্ভাবনা, এক আনা অসম্ভাবনা।

পরীক্ষাকারী পণ্ডিতরা এই সব অশরীরী সত্তাকে আত্মপরিচয় দিবার জন্য যে যেমন প্রমাণ দিতে বলিয়াছেন, সত্তা তেমনি সন্তোষজনক প্রমাণ দিতেছে, কেবল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দর্শনছাড়া আর যেমন প্রমাণ কৈফিয়ৎ পাইলে অভ্রান্তভাবে বিশ্বাস হইবে 'অমুকের আত্মাই বটে,' তা পাওয়া গিয়াছে। চরম সন্দেহ বাদীও জোর করিয়া 'না' বলিতে পারিতেছেন না। আত্মা তার জীবিতকালীন খুঁটিনাটী গুপ্ত অজানিত নানা ঘটনা বা জ্ঞানের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে, দু চারিটা অবশ্যম্ভাবী অসঙ্গতি বা ভূল ভ্রান্তি যে না ঘটে তা নয়, তা ঘটিবেই। লোকান্তরিত সূক্ষ্মদেহী চিৎসত্তা একটা পরদেহ যন্ত্র অধিকার করিয়া আলাপ করিতেছে, তাহার অসুবিধা অনেক। সে গুলা মনে রাখিলে ভূল ভ্রান্তি সহজ ও সম্ভব বলিয়াই মনে হইবে। গলার স্বর, হাতের লেখা, বচন ভঙ্গী, ক্ষুদ্রদোষ, মত বিশ্বাস রুচি অরুচি সমস্ত বিষয়ে আত্মা জীবিত ব্যক্তির সহিত নিজ ঐক্য সাদৃশ্য প্রমাণ করিতেছে। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে দৃষ্টান্ত দিতে পারিলাম না, পাঠক কৌতূহলী হইলে এ সম্বন্ধে Sir Oliver Lodge রচিত Survival of Man বা Dr H. L. Haldar রচিত Psychical Research and Survival of Man গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। (শেষোক্ত গ্রন্থ প্রবাসী কার্য্যালয়ে প্রাপ্য) Myers রচিত Human Personality আরো ভাল।

যমুনায়।

[শ্রীগিরিশচন্দ্র আচার্য্য কাব্যবিনোদ।]

আজ কেন টলমল দোলে তরণী ?
কেহ নাই সাথে সই, মোরা রমণী,
এ দেখি নূতন নেয়ে বল ত্বরা যাক বেয়ে,
উঠিবে বিষম ঢেউ বিপদ গণি,
ত্বরিতে ও কূলে যেতে বল সজনি।

ভাদরের ভরা গাঙ দুকূল ভাসে,
বুক দুরু দুরু প্রাণ কাঁপে তরাসে।
অই রবি যায় পাটে কেহ নাই পার ঘাটে
সাঁঝের আঁধার অই ঘণায়ে আসে
তরণী না বেয়ে নেয়ে মুচুকি হাসে।

অই দূরে কিবা ঘোর জলদ মালা,
খনে খনে চমকিছে বিজলী জ্বালা
মেঘদল ধীরে ধীরে গগন ফেলিছে ঘিরে,
আঁধারে মিশায়ে গেছে গোধূলি আলা
এখনো যমুনামাঝে আভীর বালা।

ছি ছি সখি একি দেখি মরি যে লাজে
সরলা অবলা পেয়ে যমুনা মাঝে,
কথা কয় আঁখি ঠাবি, ছলে দেয় গায় বারি
হাব ভাব নাবিকের সরমে বাজে,
কুল বধূ সঙ্গে কি রঙ্গ সাজে।

শিক্ষায় নবীন সৃষ্টি।

[শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।]

জাতির জয় অসিতে হয় না, অসি দিয়ে পরের ধন দৌলত ঘর বাড়ী দেশ ভূঁই কেড়ে নেওয়া চলে, দু'দিন জবরদস্তি ভোগ দখল করা চলে। এই যে অসির জয়—এর বল অতি সামান্য, দৈবদুর্ব্বিপাকের এক দমকায় সে দখলি সত্ব উড়ে যায়। সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন বরিসাল জেলা ভরে দুর্ভিক্ষ, কঙ্কালসার মানুষের কাঠামোয় সহরটুকু ভরে গেছে। শ্রদ্ধেয় অশ্বিনী বাবু অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান গড়ে অন্নমেরু উৎসব সারাটি জেলা ভরে করছেন, ক্ষুধা রাক্ষসীর সঙ্গে তেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ এ ঠুঁটো জগন্নাথের দেশে দেখবার জিনিস বলেই দেখতে গেছিলাম। তখন আমরা গোখলের সার্ভেন্ট অব্-ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে বিদ্রূপ করে সার্পেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি বলতাম। ঘটনাচক্রের এমনি ফের, সেই সভার বড় পাণ্ডা দেওধর সেখানে গিয়ে হাজির। তখন আমরা যুগান্তরে মার মার কাট কাট গোছের রক্তগঙ্গা প্রবন্ধ লিখতাম। তারি এক প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, যে, ইংরাজ এ দেশ অসি দিয়ে জয় করে নাই। তাই পড়ে দেওধর বলেছিল, "তাই যদি সত্যি হয় তা' হ'লে আমার ইতিহাস পড়াই বৃথা হয়েছে বলতে হবে।" তখন বড় হাসি পেয়েছিল, আজ দেশ যুড়ে সেই অট্টহাসি বেজে উঠেছে।

আজ বোঝবার দিন এসেছে, যে, ইংরাজ ভাব দিয়ে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েই ভারত জয় করেছে, আর আ'জ ও রোজ তিল তিল করে ও সেই ভাবের ব্রহ্মবাণ হেনে এ জাতের অন্তর জয় করছে বলেই এ রাজ্য এত দৃঢ়। আমরা অসির কাছে হেরে বেশি ছোট হইনি, কারণ বিজয়লক্ষ্মী ত চিরদিনই চঞ্চলা, আজ অবধি কত বীরকেই না কাঁদিয়ে ঠাকরুণ মজা দেখেছেন। কিন্তু হিন্দু কলেজে দোকান ফেঁদে ধারে কর্জ্জে ভাবের উঠনো জুগিয়ে এ জাতটাকে ইংরাজ মুদী সর্ব্বস্বান্ত করল। যে দিন দু' পাতা ইংরাজি পড়ে আমরা বুঝলাম আমরা ছিলাম বুনো, আর আমরা ছিলাম কুসংস্কারের অজ্ঞতার পোকা, সেই দিন থেকে মনটা আমাদের সাহেব মেরে গিয়ে ভারতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসলো।

এই জন্ত জাতীয় শিক্ষার দরকার। জাতের ধারা জাতের প্রাণ হারালে মানুষ যে কি পর্য্যন্ত বিড়ম্বিত কাঙাল সাজে, তার দৃষ্টান্ত দেখতে বেশি দূর যেতে হবে না। আজ ধুয়ো উঠেছে জাতীয় ইস্কুল জাতীয় শিক্ষা চাই। আর সেই বিদ্যের নন্‌কো-অপারেশনের মানে হয়েছে, ঐ চেয়ার ঐ টেবিল ঐ হ্যাট্ ম্যাট্ ক্যাট্ বুলি—ঐ মাথার উপর যমদূত মাষ্টার, বুকে বইএর পাহাড় আর একজামিন পাশের পরিত্রাহি গ্যাঙানি, কেবল সরকারী টাকা সাহায্য নিতে পারবে না। কচু কচুই থাক, তাকে কেবল ধুয়ে নিয়ে বল আলু। আলিগড়ের কর্ত্তা যদি বলেন ইংরেজ বড় পাজি, তা' হ'লে আলিগড়ে আগের মত ইংরেজি শিক্ষার ছুরিতে অক্লেশে কোতল হওয়া যেতে পারে। কৃতদাসের জাতীয়তা মানে খুব খানিকটা রাগ আর ব্যর্থ গালি বাজী।

স্কুল গড়ে তাকে ন্যাশনাল বিদ্যালয় নাম দিলেই যদি শিক্ষাটা জাতীয় হ'তো তা' হ'লে ত সস্তায় কিস্তি মেরে দেওয়া যেত। জাতীয় শিক্ষা বলতে—আমরা কি চাই তা' আমাদের দেশের দশ হাজার করা একজন লোক বোঝে কি না বলা কঠিন। একটা কি যেন কিসের মত মনকাড়া কি চাই এইটুকু বোঝা হয়েছে, সে উল্টোরাজার দেশের সোণার গাছে হীরের ফুলটা যে কি রকম চিজ তা' এখনও বোঝা হয় নি। তাই আমরা আজ "হবু ছেলের অন্ন-প্রাশনে এমন করে সবাই মেতে গেছি। লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করে ত আগে অন্নপ্রাশন একটা হোক, তারপর "হয় ত পুত নয় ত ভূত" যা' হয় একটা জন্মাবেই।

জাতীয় শিক্ষা কি তা' বুঝতে ধারণা করতে গেলে অনেক তলিয়ে ভাবতে হয়, ভারতের অন্তর যুগে যুগে কোন পথে কি ভাব ফুটিয়ে চলেছে তার সন্ধান রাখতে হয় আর শিল্পী যেমন ধ্যানে দেবতার রূপ গড়ে তেমনি মনের মণিকোঠায় নিবিড় সাধনায় বসে দেশের দেশ-আত্মার সহজ রূপ দেখে নিতে হয়। এ সংসারে যে নিজে যা' হতে পেরেছে সেই কেবল তাই গড়তে পারে, তুমি আমি যদি দেহ মন বুদ্ধি জ্ঞানে অন্তরে বাহিরে ভারতের জন হই তবেই না জাতীয় শিক্ষা গড়তে পারবো। প্রায় নয় শ' বছর অবধি পরের মুখ চাওয়া গোলামীর ফলে এ জাত আত্ম নির্ভর ও নিজে ভাববার ও সৃষ্টি করবার অভ্যাস ভুলে গেছে। দেশশাসন সমাজগঠন জ্ঞানবিজ্ঞানসৃষ্টি প্রভৃতি জীবনের যত বড় বড় ভার পরে নিয়ে আমাদের এমনি মন-কুঁড়ে জ্ঞান-কুঁড়ে কর্ম্ম-কুঁড়ে করে দিয়েছে, যে, আমরা আর কিছুই কষ্ট করে করতে চাই না।

যা' সহজে হয়—দু' দণ্ডের পথের অল্প স্বল্প সম্বল গুছিয়ে নিয়ে "জয় মা তারা" বলে গ্রামান্তরের পথে বেরিয়ে পড়া অবধি চলতে পারে; অনেক দূরের পরিণাম ভাবতে হ'লে সেই অনুযায়ী জাতীয় অনুষ্ঠান গড়তে হ'লে মনে হয় "কাজ কি অত ভেবে? একটা কিছু করে ফেলা যাক্।" তাই ভাবের ও কাজের কাঙাল এই জাতের নেতা পরিণাম ভাববার কথায় বলেন, "আমার পক্ষে এক পা এগোনই যথেষ্ট।"

অন্তর মন ও দেহ এমনি ঠুঁটো ও পঙ্গু হয়েছে বলেই—আজও স্থির করা হয়ে উঠলো না, যে, জাতীয় শিক্ষা নামে এই ব্যাপার খানা কি। ইংরেজ কি যে ব্রহ্মবাণ মেরে আমাদের ঘায়েল করে দিয়েছে, শিক্ষার কথা ভাবতে গেলেই ক্রমাগত মনের আয়নায় ভেসে ওঠে শতস্তম্ভ বিরাট এক অট্টালিকা আর তার ভিতর বিদ্যার গোঠে গরু তাড়ানো মাষ্টার আর পিটিয়ে পিটিয়ে তৈয়িরী করা সরস্বতী মার্কা কল। এক দিন কিন্তু আম বট অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে বিনা বেতনে অন্ন বস্ত্রের সঙ্গে গুরুর হাতে বিদ্যা পেয়ে অশোক চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য এ দেশে রাজ্য গড়ে ভেঙে কত সভ্যতার সৃষ্টি করা গেছে। আজ নাকি সব জ্ঞান জগৎসংসার ছেড়ে ইংরাজি বইয়ের পাতায় পাতায় ঢুকে আছে, আমাদের দেশের সাহিত্যের ভাঁড়ে মা ভবানী। তাই সেই ইংরাজি বই দু'দশ গাড়ি স্মৃতির বস্তায় বস্তাবন্দী করে পিঠে নিয়ে কুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ সারি সারি বিদ্যার অগণ্য উঠ সারা ভারতময় আফিস চালকের ইঙ্গিত মাত্রেই ছুট দিচ্ছে। ভারত মাতা কিন্তু সে বিদ্যার বোঝায় একেবারে কংস কারাগারে পাষাণবক্ষ দেবকীর মত কাৎ, নড়ে না, চড়ে না। আর এহেন গো-মাতার (দেশমাতা আর কই?) উপযুক্ত সন্তানরা নব সৃজন ভুলে কেবল কূজনেই ব্যস্ত, বিদ্যার কুহকে তাঁরা নাক কান বোঁচা ঠুঁটো জগন্নাথরূপ দারু-ভূতো মুরারি। ঋষি সৃষ্টি করেছিলেন শাস্ত্র, পিসী সৃষ্টি করেছেন আচার, আর মার চেয়ে যিনি ভালবাসেন সেই রাঙা মাসী সৃষ্টি করেছেন গোয়াল। তাই নির্ভাবনায় আমরা মিল বেন্থামের জাবর কাটি আর দশ যুগ আগেকার গড়া সমাজ ও ধর্ম্মের ক'য়ে দাগা বুলাই। তবে কিনা আগুন ছাই চাপা থাকে না, তাই অন্তরের শিব এত আবর্জ্জনা ঠেলেও মাঝে মাঝে এক একটা রাম-মোহন, ভূদেব, বিবেকানন্দে বেরিয়ে পড়ে, তবু জাতির বিরাট মন—ইতর সাধারণ সেই সরীসৃপ যোনিতে পেটে হেঁটেই চলেছে, সে আর তার মাথাটা আজও তুললো না। দু'দশ জন বড় লোক ভারতের অঙ্গ আলো করে আসা

যাওয়া করছেন, কিন্তু সে যেন ত্যালাকুচা আশশ্যাওড়া 'বনে ছ' চারটে ঝুরি নামা বুড়ো বট, মহীরুহ কাঁটা বনের কেউ নয়, কাঁটাবনও বৃক্ষরাজের গোষ্ঠীর বাহিরে নিতান্তই আগাছা জাতীয়। যে দেশের সাধারণ মানুষের —কৃষাণ মজুরের মন জ্ঞানের মনুষ্যত্বের ধাপে উঠলো না সে দেশ যে এখনও মরা সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে ?

তার উপর বাঙলায় আমরা সহজেই স্বভাবতঃ ভাবুক জাত, নাচন কোঁদন আমাদের জাত ব্যবসা। এত দেশ থাকতে কেন বল দেখি "নিতাই গৌর এল নদীয়ায় ? কারণ বাঙলার সজল শ্যামল এই ধানের সোণায় সোণালী মাঠেই প্রেমের বিগ্রহ প্রেম বিলাতে আসা সহজ। যখন এই জাতীয় গুণটা শিবের জটা বেয়ে গঙ্গাবতরণে ওপর থেকে নামে তখনই তা' পাপী তাপী যত দীন কাঙাল তরায়, আর যখন এই ঘটটুকুতেই জন্মে বইতে থাকে, তখন তা'তে পাঁক থাকে ঢের। এই ওপরটা হ'লো মানুষের সবটা মানুষের বড় আমি বা মনের ঠাকুর—যে নামেই বলো। দেহ মন বুদ্ধি আর এই বাহ্য-আমির জ্ঞান গোচরটাই যে সব নয় তা' বেশ বোঝা যায়, কারণ এই মানুষই ত ঋষি মুণি হয়—বিবেকানন্দ শিবাজী হয়ে নতুন করে খণ্ড-সৃষ্টি খণ্ড-প্রলয় করে, আবার এই মানুষই—হাবা গোবা সাধারণ মুটে হয়ে মোট বয়।

আমাদের জাতীয় জীবনে পনর দিন অন্তর শুক্ল পক্ষ আর কেষ্টপক্ষ আসে, আমাদের পূর্ণিমার, কাক-জ্যোছনার যুগ আছে, আর ঘুটঘুটে আঁধারের ভূত চতুর্দ্দশীও আছে। সৃষ্টিই যে নাগর দোলা, উঠতেও মজা নামতেও মজা, উঠা নইলে নামা হয় না, নামা বিনা ওঠা হয় না। আর যখন জাতটা হদ্দ নামা নেমে আবার উঠেছে তখন সেই আলো আঁধারের হিজিবিজি ছায়াবাজীর কালটাই হ'লো শুভলগ্ন, ঐ গোধূলীতেই জাতির নতুন অপত্যলাভের জন্য— নব-সৃষ্টির জন্য পরিণয়োৎসব। এতদিন ধরে আমাদের আঁধারের যুগ গেল ; তোমরা বলবে ভূত চতুর্দ্দশীটা বড় লম্বা হয়ে—সাত শ' বছর মুসলমানী আর আড়াই শ' বছর গৌরাঙ্গী কীর্ত্তন! তা' বটে, তবে যত বড় জাগরণ তার তত বড় নিদ্রা ত দরকার। নাগোর দোলা যখন খুব খানিকটা দুলে ঢেউ খেলে আকাশ ছোঁয় তার আগে নামেও তেমনি মাটি ছুঁয়ে।

আমাদের জাতীয় জীবনে এখন এসেছে উষার গোধূলী, ধর্ম্ম বা যুগের সত্য এবার বিয়ের কনে হয়ে অবগুণ্ঠনে মুখ শশী ঢেকে উৎসব মণ্ডপের দেবী রূপে দাঁড়িয়েছে। এই সত্য একদিন জগজ্জননী হয়ে যুগ দেবতাকে কোলে

করে মায়ের রূপ ধরে বসবে। বলেছিই ত এটা গোধূলীর যুগ, তাই আলোর সঙ্গে ছায়ার মেশামেশি!—তাই আমাদের অনেক গলদের সঙ্গে সেই নাচন কোঁদন জাত ব্যবসা এখনও ঘোচে নি। ধর্ম্ম সমাজ রাজনীতি যে দিকই আমরা গড়তে যাই তাতে আসর গরম করে খানিকটা হল্লাবাজী করবই, ধেই ধেই করে বার কতক পাক খেয়ে নাচবই। সেই লোক দেখান stagy হাব ভাবের - মন-হরণের পালার সবটাই নিরর্থক নয়, হৈ-চৈ-এ চড়কের সঙে অন্ততঃ লোক জড় ত হয়। কিন্তু ওর বার আনাই যে বাতিল তা'তে আর সন্দেহ কি?

থিয়েটারে দেখবে মিলন-রসের আর বিয়োগ-রসের সুখ দুঃখের নাটকে মাঝে মাঝে প্রহসন থাকে, আমাদের জীবনও তাই। দেশভরা দুঃখ দৈন্ত রোগ ব্যথা হা-হা দে-দে নিয়েও সবাই চড়কের সঙ দিচ্ছি। ঠিক ঠিক সঙ দেওয়া তখনি হয় যখন মানুষ টের পায় না, যে, সে বাঁদর সেজে হাত-তালির ঝড় তুলেছে, আর দিব্য মহা গম্ভীরভাবে আসর মাতিয়ে যায়। সে দিন কলেজ স্কোয়ারে এক বড় বক্তা বলছিলেন, "আমার বক্তৃতা দেওয়া বারণ, কিন্তু আমায় যে বক্তৃতা দিতেই হবে, নইলে দেশের যে ক্ষতি হ'বে, তাই আমি বক্তৃতাও দেব, তাতে ফাঁসী হয় হোক।" আর অমনি ছেলের দল বলে উঠলো, "আহা! না না, আপনি ফাঁসী কেন যাবেন? আপনি বাঁচলে কত কত কাজ হয়।" ব্যাপারটা এমনি প্রহসনাত্মক, যে যারা এটা দেখতে পায় না—sense of the ridiculous যাদের এত কম, তারা একেবারে নীরেট বই আর কি?

জাতীয় শিক্ষা নিয়েও আমাদের অনেকগুলো চড়কের সঙের পালা হয়ে গেল। কিন্তু এই ঝুটো মণির দানাগুলির ভিতর দিয়ে যে সোণালী জরির সূতোটি জল জল করছে—সেই প্রাণের ধারাটি পরম সত্য। আমরা জাতীয় শিক্ষা প্রাণের সঙ্গে চেয়েছি, কেবল পাইনি। এ না পাওয়ার বিড়ম্বনার কারণ আছে, এই হাজার বছরের রাজনীতিক পরকীয়া সাধনের পর আমাদের জাতীয় জীবনটা খিচুড়ী পাকিয়ে গেছে, তাই জাতীয় শিক্ষার নামে যা' গড়েছি তা' হয়েছে গৌরাঙ্গী-খিচুড়ি, জাতির শিক্ষা জাতির প্রাণের সত্যরূপ ধরে নি, তাই তার শিক্ষা-দীক্ষাও যেন ঠিক রূপ পাচ্ছে না।

আজ কাল চারিদিকে বিশ্ববিদ্যালয় বেদ পাঠশালা বিধবাশ্রম অনাথাশ্রম সেবাশ্রম বালিকাশ্রম এমনি সব আশ্রম গড়বার পরিশ্রম যথেষ্ট হচ্ছে। তার

কারণ কি জান? আমরা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে কেউ কেউ পুরাণের আস্থাহীন একদম সাহেব, আর কেউ কেউ নতুনে আস্থাহীন একদম চতুরাশ্রমী। একদল চাইছি ভারতটাকে একেবারে জার্মানী বা আমেরিকায় রূপান্তরিত ক'রে ফেলতে, আর অপর দল চাইছি গঙ্গা যমুনা গোদাবরী তীরে বল্কল পরে সামগান করতে। এত দিন মিল বেন্থানের ক্রিয়ার পর এই প্রতিক্রিয়া এসেছে, স্বদেশী জাতীয় বিদ্যার দল ভাবছেন বুঝি অতীতটাই আমাদের ভবিষ্যৎ বুঝি প্রাণপণে পেছুহটাই হ'লো এগোন। জগতটা যতখুসি এগিয়ে উচ্ছন্নে যাক, ভারত যেন পেছুতে পেছুতে মুণির আশ্রমে গিয়ে পৌছয়, তা' হলেই ভারত আবার ভারত হ'বে।

যাঁরা এই সব আশ্রম গড়ছেন তাঁরা অনেকে জাতীয় কথাটার মানে করেন সনাতন অর্থাৎ কিনা পুরাতন, তাঁরাই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বালক বালিকা বিধবা সাধবা যুবক বৃদ্ধ সবার জন্যই আশ্রম গড়ছেন। তাঁদের মাথায় পুরাতনের পোকা পড়েছে, জাতিটা যে এই অগণ্য হাজার বৎসর জীবনের পথে ভুল ভ্রান্তি করতে করতে চললো, এই চলাটা বৈদিক পোকার কাটায় মিথ্যে হয়ে গেছে। এও এক রকম সঙ দেওয়া কাল পুরুষ তাঁর লোহার হাতুড়ি ধরে নীরবে বসে ভাঙছেন গড়ছেন আর আমাদের সঙ-বাজীতে বিপুল হাস্য হাসছেন। সেই হাসির দমকায় আমাদের যত্নে গড়া তাসের নতুন পুরাতন ঘরগুলি ঝুপ ঝাপ করে ভেঙে পড়ছে।

সেকালের রাম থেকে আরম্ভ করে একালের বক্তৃতাবাজ ইংরাজি পড়া সন্ন্যাসী মহাত্মা বাবু ভায়া অবধি এই যে সমস্ত রঙ বেরঙ চলাটা এর সব টুকু মিলে কিন্তু জাতীয় জীবনের চুড়ান্ত সার্থক পরিণতি, তাই যে আমাদের জাতীয় জীবন। আমরা প্রাণের সত্য ধারাকেও এড়িয়ে যেতেও পারি না, জীবনের ভুল ভ্রান্তি গুলিকেও পাশ কাটাতে পারি নে, এই সব নিয়েই আমরা খাঁটি বাঙালী বা খাঁটি ভারতবাসী। ইংরাজি টুপি মাথায় দিলেও আমরা কালা সাহেব অন্ততঃ পক্ষে হলদে সাহেব ত বটেই। আবার মুণি ঋষি টিকিধারী আর্য্য সাজলেও আমরা মনে প্রাণে জ্ঞানে কতকটা ইঙ্গ-বঙ্গ— যেন ইংরাজি রসে পাক ধরান নিষিদ্ধ পক্ষীর ডিমের রসগোল্লা। আমরা তাই এই সাত রঙা জীবনের টানে মনু পরাশর আউড়ে মিল বেন্থানের থিওরী প্রমাণ করিতে বসি। (ক্রমশঃ)

খেয়াল।

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী।]

আমি আর তুই যদি খুকি,
ছোট্ট ছুটো পাখী হ'য়ে উড়ি,
পুকুর ধারের বকুল গাছে বসি
ফুটছে যেথায় লক্ষ বকুল কুঁড়ি,
মা আমাদের খুঁজ্‌বে হেথা হোথা,
ডেকে ডেকে পাবে নাক কোথা।
রাগ ক'রে মা ফিরবে যখন বাড়ী
পাখীর স্বরে ব'ল্‌বো,—"ওমা আড়ি,"
অথবা তুই কানের কাছে উড়ে
ডাক্‌বি,—"ওমা, মা,"
আমিও তোর পেছু পেছু গিয়ে
ব'ল্‌বো -"যাব না।"

দুধ খাওয়ানোর সময় যখন খুঁকি,
প'ড়বে এসে ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর বেলা,
আমরা তখন বকুল ডালে ডালে,
আপন মনে খেল্‌ছি মত্ত খেলা!
দুধের বাটি হাতে ক'রে ধ'রে
ডাকবে মা,-"ও খোকা, খুকি ওরে,
দুধ খেয়ে যা অনেক বেলা হ'লো';
'না, যাবনা, বাবায় যেতে ব'লো"—
বল্‌বো মোরা দুজনেতে মিলে
মাথার 'পরে উড়ে'
বুঝ্‌বে না-মা মোদের কথা এযে,
কারণ পাখীর স্বরে!

গা মুছাতে বিকেল বেলা যখন
গামছা হাতে ফিরবে মা ও বাড়ী,
আমরা তখন দুজনেতে মিলে
গামছাটারে আন্‌তে যাবো কাড়ি।
মা আমাদের তাড়িয়ে দিতে যাবে,
আমরা যে তা বুঝ্‌তে নাহি পাবে।
ডাক্‌বে যখন খাবার জিনিষ হাতে,
উড়ে নিয়ে উঠ্‌বো মোরা ছাতে।
গাল দেবে মা, পাখীর কথা ব'লে
শুন্‌তে চাবে না,
এ যে তাহার খোকা খুকীই খেলো
বুঝ্‌তে পাবে না।

সন্ধ্যে বেলায় আস্‌বে যখন মায়েব
খোকা খুকীর ঘুম পাড়ানোর পালা,
আমরা তখন খোকা খুকি হ'য়ে
ফুল বাগানে গাঁথছি কত মালা।
কাঁদ্‌বে মা না পেয়ে মোদের খুঁজে,
চুপি চুপি আস্‌বো সময় বুঝে
আহ্লাদে মা ধ'রবে বুকের মাঝে,
ব'লবো,—"মা তোর কান্না সবই বাজে।
আমরা যে তোর সব শুনেছি—মোদের
বুঝিস্‌ নি মা কথা.
এইটে শুধুই রইলো মোদের প্রাণে
বড্ড বড় ব্যথা!"

'নারীর উক্তি'।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

দম্‌কা পশ্চিমে হাওয়ার পরে পরেই দেশের বুকে আচম্‌কা যে একটা পূবে বাতাস বইতে সুরু করল সেই পূবে বাতাসের মাঝে পেট্রিয়টিজমের প্রকাণ্ড ঠুলি দু'চোখে আচ্ছা করে' কসে' বেঁধে আমরা প্রমাণ করতে বসলেম যে আমাদের যা কিছু তার তুল্য জিনিস আর জগতে নেই—তা সে বৈষ্ণব কবিতাই কি, আর ব্রাহ্মণের পৈতাই কি। আমাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ আর ঘুচল না। দম্‌কা পশ্চিমে হাওয়া যেদিন বইল সেদিন চোখ বিস্ফারিত করে' বললেম—ওঃ কি জোর, কি তোড় হাওয়ার—এমন হাওয়ায় উড়ে যেতে পারলেই জীবন। তারপর আচম্‌কা পূবে বাতাস যখন বইতে সুরু করল তখন চোখ আরও বিস্ফারিত ক'রে বললেম—আঃ কি শান্তি কি স্নিগ্ধতা বাতাসের—এমন বাতাসে মরে' থাকতে পারলেই স্বর্গ। আমাদের মনের ঝুলন আর থাম্‌ল না!

এই রকম যখন অবস্থা তখন যদি দেশে এমন কা'রো পরিচয় পাওয়া যায় যাঁর চোখে পশ্চিমের ঝিলিক্ মারা সভ্যতার চমক লেগেও মন উদ্‌ভ্রান্ত হয় নি আবার তাঁর মনে পূবের আত্ম-সর্ব্বস্ব বা আত্মা সর্ব্বস্ব জীবন যাত্রার মোহের প্রলেপ লেগেও চোখ দুটো বুজে যায় নি, তবে যে কেবল আনন্দই হয় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও মনে জাগে যে আমাদের জাতীয় মুক্তির দিন বাস্তবিকই এগিয়ে আসছে। কেন না জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নেই। আর জ্ঞানের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, গোঁড়ামি—কেন না গোঁড়ামির পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে বোকামি—তা সে গোঁড়ামি যে বিষয়েই হোক্ না কেন। "নারীর উক্তির" পিছনে ঠিক এমনি একটা মনের অনুভব আছে যে মন বিলিতি সভ্যতার দ্রব্য-সম্ভারের তলেও চাপা পড়ে নি আবার স্বদেশী সভ্যতার উপবাস আনন্দেও ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে নি।

"নারীর উক্তি"র আর একটা বিশেষ অভিনন্দনের কারণ এই যে এ "নারীর উক্তি" নারীরই উক্তি, উপরন্তু এর বেশীর ভাগ নারী বিষয়কও উক্তি বটে। দেশে যখন চারিদিক থেকে একটা কর্ম্মযোগের সাড়া পড়ে' গেছে

তখন তাতে গলা শোনা যাচ্ছে কেবল পুরুষের। কুর্ম্মযোগের যখন সাড়া পড়ল তখন চারিদিকে পরিবর্ত্তন হ'তে ত বাধ্য। সুতরাং আমরা বাংলার নারীসমাজকেও আর যেমনটী ছিল তেমনিটী রাখতে চাই নে। সুতরাং আমরা অর্থাৎ পুরুষরা আজ কেউ ঈজি চেয়ারে লম্বা হ'য়ে প্রকাণ্ড একটা হাভানা চুরুট দাঁতে ধরে আমাদের নারীসমাজকে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হবার উপদেশ দিচ্ছি কিম্বা আর কেউ ফরাসে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গুড়গুড়ির নল ঠোঁটে গুঁজে গান্ধারী হবার আদেশ কর্‌ছি। আমরা এই যে খোস্ মেজাজে বহাল তবিয়তে সোজা উপদেশ ও লম্বা আদেশ চালাচ্ছি তাতে যে নারী সমাজের উপরে ঐ উপদেশ ও আদেশ চালাচ্ছি সেই নারীসমাজ কি বলেন তা জান্‌বার জন্যে কৌতূহল, যার রক্তে কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে, তারই হওয়া স্বাভাবিক। "নারীর উক্তিতে" বাংলা দেশের অন্ততঃ একটী শিক্ষিতা মহিলার মন আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। এবং এ এমন একটী শিক্ষিত মহিলা যার কাছে পাশ্চাত্যও অপরিচিত নয় আবার প্রাচ্যও অনাদৃত নয়। প্রত্যেকের মুক্তি যেমন তার আপনার সাধনার দ্বারাই হ'তে পারে অপরের বক্তৃতার দ্বারা নয়, তেম্‌নি নারী সমাজের উন্নতি হোক্ মুক্তি হোক্ তা তার আপনার সাধনাতেই হওয়া সম্ভব, কেবল মাত্র পুরুষ সমাজের বক্তৃতাতেই নয়। "কলের পুতুল হয় কি মানুষ তুলে উঁচু করে' ?" এ প্রশ্নের চিরকালের উত্তর একটা নিরেট "না।" সুতরাং পুরুষরা যে দেশ ব্যাপী গোলযোগ কর্‌ছেন তাতে নারীকেও আজ গলা যোগ কর্‌তে হবে। আমাদের জাতীয় সমস্যা যেমন আমরাই ভাল বুঝতে পারি—আফগানিস্থানের আমীরও নয় বা লাসার লামাও নয়, তেম্‌নি নারীর যে সমস্যা তা নারীই ভাল বুঝতে পারেন পুরুষদের চাইতে। আজ দেশে নারী-সমস্যা পুরুষরা নারীকে বুঝাচ্ছেন কিন্তু তার চাইতে সহজ হবে যদি সেই নারী-সমস্যা নারীই পুরুষকে বুঝাতে পারেন। আসলে সমাজের সভ্য যখন পুরুষ ও নারী, তখন সমাজের সত্যও আছে পুরুষ ও নারী দু'জনের কাছেই, সুতরাং সমাজের আসন মঙ্গলও গড়ে' উঠতে পারে পুরুষ ও নারীর দু' হাতে—পুরুষের এক হাতে বা নারীর এক হাতে নয়।

(২)

"নারীর উক্তিতে" লেখিকা প্রথমেই "বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষা-বিচার "করেছেন। এই প্রবন্ধটীর শেষ প্যারা পড়ে' আস্তিক ও নাস্তিকের গল্পটী মনে পড়ে।

একবার এক নৌকাতে করে' এক আস্তিক ও এক নাস্তিক চলেছিলেন। পথে দু'জনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে মহাতর্ক। তিন ঘণ্টাব্যাপী তর্কে নাস্তিক প্রমাণ করে' দিলেন যে ঈশ্বর নেই এমন সময় উঠল মহা ঝড়। শোঁ শোঁ করে' বাতাস ছুটল। সেই বাতাসের নাড়া খেয়ে নদীর তরল বুকে, লক্ষ অজগর কিল কিল করে' জেগে উঠে রোষহুঙ্কারে তাদের লক্ষ ফণা আকাশে তুলে এদিক সেদিক করতে লাগল। আর তারই মাথায় মাথায় নৌকোখানা আছাড় খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগ্‌ল। তখন কোথায় রইল নাস্তিক আস্তিক, কোথায় রইল তর্ক বিতর্ক! তখন যেমন আস্তিক তেম্‌নি নাস্তিক দুজনে মিলে ডাকতে লাগলেন—হে ভগবান্, হে ভগবান্, হে ভগবান্। "বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা বিচারের" শেষ প্যারাটা হচ্ছে এই, "পরিশেষে বক্তব্য এই যে একেলে পুরুষরা একে মেয়েদের যতই দোষ ধরুন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সহ-ধর্ম্মিনীর পরিবর্ত্তে যদি তাঁহাদের স্বর্গগতা ঠাকুর মা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান তাহা হইলে সত্যই কি তাঁহারা সন্তুষ্ট হন?" এ প্রশ্নের উত্তর আর ভেবে চিন্তে দিতে হয় না—আর সে উত্তরটা হচ্ছে একটা পরিষ্কার "না"। তবে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন—তবে যে অনেকে তর্ক তোলেন? তার উত্তর হচ্ছে সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষার্থে। আমরা মনে আর মুখে যে এক নই সেটা ত আমাদের জীবনের সকল বিভাগেই জাজ্বল্যমান। এ বিষয়েও যে আমরা মনে আর মুখে এক নই সেটা শুধু এই প্রমাণ করে যে আর যাই হই না কেন আমরা inconsistent নাই। আমাদের প্রধান ব্যাধিই ত এই যে আমরা বদ্‌লিচি কিন্তু আমাদের ধারণা বদ্‌লায় নি। আমরা, "বদ্‌লাব না" "বদ্‌লাব না" বলতে বলতে বদলাচ্ছি। তাই আমাদের ব্যবহারে ও কথায় এম্‌নি একটা ফাঁক জেগে উঠেছে যে ফাঁকটা কোন রকম সনাতন ধর্ম্ম দিয়েই আর বুঁজোন চলে না, আমাদের পরিবর্ত্তন হওয়াটা আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে সেটা ত সৃষ্টিরই ধর্ম্ম—আবার আমরা সনাতন ধর্ম্মেরও মায়া ছাড়তে পারি নে। ফলে আমরা টিকির উপরে হ্যাট্, ধুতির নীচে ফুলষ্টকিংএ বুট ইত্যাদি কিস্তূত কিমাকার সব দৃশ্য গড়ে তুলি যেটা অপরের কাছে নেহাৎ কমেডি আর নিজেদের কাছে বেজায় ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে।

(৩)

গ্রন্থকর্ত্রী 'বর্ত্তমান-স্ত্রী-শিক্ষা-বিচার" প্রবন্ধটী গ্রন্থের গোড়ায় সজ্ঞানে দিয়েছেন না অজ্ঞানে দিয়েছেন তা আমরা জানি নে কিন্তু এটা জানি যে ঐ

প্রবন্ধটী ঐ প্রথমে দেওয়া অতি যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কেন না নারী সমাজের সম্বন্ধে যিনি যে কথাই বল্‌তে যান না কেন তারই প্রথমে যে প্রশ্নটী উঠবে সেটা হচ্ছে, ঐ নারীর শিক্ষা সম্বন্ধীয়। ঐ প্রশ্নটীর ঐ সমস্যাটীর সমাধান আমরা কেমন করে' করি তারই ওপরে নির্ভর করবে নারী সমাজের আর যা কিছু। সুতরাং এই প্রশ্নটীকে একটু খতিয়ে দেখ্‌লে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই—কেন না ঐ প্রশ্নটী হচ্ছে আসল।

নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা—বেদ সম্বন্ধেই হোক্ আর বাইবেল সম্বন্ধেই হোক—বড় বিশেষ তফাৎ নয়—আর সেটা যে ভয়ঙ্কর উদার তা বলা চলে না। কিন্তু এটা তখন বেদের আমলও নয় বাইবেলের আমল নয় সুতরাং সেই ব্যবস্থাই আমরা চোখ বুঁজে মেনে নিতে পারি নে। বাইবেলের সময়টা কোন যুগ ছিল তা আমরা জানি নে কিন্তু এটা শুন্‌তে পাই যে বেদের সময়টা ছিল সত্য যুগ। এবং শাস্ত্রে এ-কথাও আছে যে কলিযুগে সত্যযুগের সব ধর্ম্ম উল্টে যাবে। সুতরাং আজ আমরা স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বেদের ব্যবস্থা না মেনে যে নতুন বিচার কর্‌ছি তাতে আমাদের শাস্ত্র বাক্যই পালন করা হচ্ছে। সুতরাং সনাতন পন্থীদের এতে করে' শাস্ত্র বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে বলে আনন্দ করা উচিত।

আসল কথাটা প্রথমেই স্পষ্ট করে' বলে' ফেলি—আমরা স্ত্রী-শিক্ষার ঘোরতর পক্ষে। এমন কি "বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষার"ও। "কেন না নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল"। কিন্তু ভুল কর্‌লেম। আমাদের দেশে নারীকে বর্ত্তমানে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার দোষ এ নয় যে সেটা কানা তার আসল আশঙ্কার কথা হচ্ছে যে তা অতিরিক্ত চক্ষুষ্মান। তাতে করে মেয়েদের এমনি তাড়াতাড়ি চোখ ফোটে আর মুখ ছোটে যে মন ফুট্‌বার আর অবসরই পায় না। ফলে মেয়েরা এক অশোভন অবস্থা থেকে আর এক অশোভন অবস্থা গায়ে জড়িয়ে নেয়। তবুও যে এই শিক্ষাকেও শ্রেয় মনে করি তার কারণ ওটা অনেক ভুল চুকের মধ্য দিয়ে এক-দিন না একদিন সত্যে গিয়ে দাঁড়াবেই কিন্তু শিক্ষাহীনতার যে অবস্থা তার আর এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই—সে একেবারে সনাতন।

একটা পরমাশ্চর্য্য বিষয় কিন্তু মনে না লেগে যায় না। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ করবার জন্যে নানা সুরের নানা রকমের তর্ক তুলি ও প্রশ্ন করি কিন্তু ছেলেদের শিক্ষা বন্ধ করবার জন্যে আমাদের কোন

তর্ক বা প্রশ্ন নেই। এর কারণ হয়ত এই যে আজও আমরা মেয়েদের দেখি বৈদিক চোখ দিয়ে আর বিচার করি বাইবেলি মন দিয়ে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে এটা বেদের আমলও চল্‌ছে না বা বাইবেলের আমলও চল্‌ছে না। সুতরাং সে-দেখার ও সে-বিচারের আজ মূল্য নেই। সে সমস্ত আজ অত্যন্তই অসাময়িক অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে anachronism. আসলে মানুষের—তা সে পুরুষই হোক্ বা স্ত্রীই হোক্—শিক্ষাটা যে অমঙ্গলের বস্তু তা আমরা কোনদিনই মান্‌তে পার্‌ব না। পুরুষ স্ত্রীর যতই চোখ ফুটবে ততই যে তারা আপনার জন্যে ধ্বংসের পথই প্রস্তুত করে' চল্‌বে এ-কথা বলাও যা, ভগবান মানুষকে চোখ দিয়ে বেজায় ভুল করেছেন এটা বলাও তাই।

(৪)

মানুষ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এবং স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ স্বার্থপর। সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষায় আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের যদি কেবল লোকসানই হয় তবে সেটা যে পুরুষদের পক্ষে সমর্থন করা কতদূর অস্বাভাবিক সুতরাং অসহজ তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ কোন কিছু চিরকাল প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকতে পারে না যদি সেটা কোন দিকজার লোক্‌সানের উপরে চল্‌তে থাকে। একটা মন যেখানে আর একটা মনকে আঘাত করে' চলেছে সেখানে যে-মন আঘাত পাচ্ছে সে-মন সে-আঘাতকে সহজে বরণ করে' নিতে পারে না - সেটা সৃষ্টিরই নিয়ম নয়। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষায় আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের কি লাভ সেইটের হিসেব নেওয়ায় কথা প্রথমেই মনে জাগে।

আমরা যে বহুৎ বদলিচি অর্থাৎ আমরা যে ঠিক আমাদের পিতামহদের মতো হুবহু নই সেটা নিতান্ত চোখ কান শক্ত করে' বুজে না থাক্‌লে আর অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং আমাদের পিতামহরা আমাদের পিতামহীদের কাছ থেকে যা চাইতেন আমরা আমাদের সহধর্ম্মিণীদের কাছ থেকে আজ আর ঠিক তা চাচ্ছি নে। আমারে তিন পুরুষে পুরুষের দাবীর পরিবর্ত্তন হয়েছে। এই দাবীর নিশানা সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে। আমাদের পিতামহরা আমাদের পিতামহীদের কাছ থেকে চাইতেন খুব চমৎকার কুমড়োর সুক্তো আর সজ্‌নে খাড়ার ডাল্‌না কিন্তু আজ আমরা আমাদের বিবাহিতা স্ত্রীর কাছ থেকে চাচ্ছি তাঁদের মন অর্থাৎ পিতামহেরা চাইতেন রসনার সম্ভোগ, আমরা চাচ্ছি মনের সন্তোষ। এই যে পরিবর্ত্তন,

এই যে আজ আমরা মনের সন্তোষ খুঁজ্‌ছি, আমাদের মন দিয়ে অপরের মন পেতে চাচ্ছি এটাকে যাঁরা আমাদের অধোগতির চিহ্ন বলে বিবেচনা করেন তাঁদের আর যাই হোক্‌ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দীপটী যে খুব উজ্জল নয় তা শাস্ত্রের সাহায্যেই প্রমাণ করা যেতে পারে।

আমাদের পিতামদের আমলে আট নয় দশ বা এগার বচ্ছরে মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে এসে শাশুড়ীর হয় অদৃষ্টের দোষে লাঞ্ছনা গঞ্জনা খেয়ে নয় কপাল গুণে প্রশংসা সুখ্যাতি শুনে নিশাযোগে যেতেন স্বামীর পদসেবার জন্যে। সে-যুগে যুবক ও তার বালিকা বধূর মধ্যেকার দেহের সম্বন্ধটাকে এমন বিশ্রী রকম সুস্পষ্ট ও প্রধান করে তোলা হয়েছিল যে মানুষের আদিম সমাজের পুরুষ নারীর সম্বন্ধের সঙ্গে তার প্রভেদ প্রায় নেই বল্লেই চলে। কিন্তু আজ আমরা সবার প্রথমে যা চাই সেটা হচ্ছে মন দিতে ও মন নিতে। সুতরাং আজ আমরা চাচ্ছি মেয়েদের এমন একটা বয়েস যখন তাদের মন সজাগ হবে ও তাদের এমন একটা শিক্ষা যাতে তাদের মন সজীব হবে। কেননা মন থাক্‌লেই সে মন দেওয়া নেওয়া চল্‌তে পারে। এই যে আমাদের মনের দিক থেকে পরিবর্ত্তন এই পরিবর্ত্তন অনুসারে বন্দোবস্ত করতে হলে চাই মেয়েদের মন গঠন অর্থাৎ চাই তাদের শিক্ষা। এই দিক থেকে মেয়েদের প্রথম লাভ হবে। কেননা এতে করে' আমাদের নতুন যে দাবী তা পূরণ হবার সম্ভাবনা। তবে প্রবীণ ঔদরিক যাঁদের রসনায় সুক্ত ও ডালনার আস্বাদ এবার চাইতে বড় সত্য হয়ে রয়েছে তাঁরা নাকের ডগা আকাশে তুলে বল্‌তে পারেন যে আমাদের এ সব হচ্ছে নভেলিয়ানা, তখন আমাদের চোখের তারা মাটীতে নামিয়ে বল্‌তেই হবে যে তাঁরা মানুষের অন্তরের উচ্চতর রহস্যের কোনই সন্ধান পান নি—তা তাতে তাঁরা শাস্ত্রের বচনই আওড়ান বা সনাতন ধর্ম্মেরই দোহাই দেন।

একথাটা আমরা বার বার করে' বল্‌ব যে শাস্ত্রে লেখা নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে সে শাস্ত্রের চাইতে মানুষের মন বড়। কেন না সে শাস্ত্রের শেষ পৃষ্ঠা লেখা হ'য়ে গেছে কিন্তু মানুষের মনের শেষ কথাটী আজও বলা হ'য় নি—কোন দিন হবে কি না সেটাও সন্দেহ। সুতরাং শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষের মন ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করাও যে কথা, দুটো ফুল বেলের পাত ফেলে মন্ত্র পড়ে' গঙ্গোত্রীতে গঙ্গা প্রবাহকেও ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টাও সে কথা।

সে যা হোক্‌ আসল কথা হচ্ছে এই যে আজ তরুণরা তরুণীদের কাছ

থেকে চাচ্ছে সবার আগে তাদের 'মন—একটা সহজ ও সজীব মন- একটা negative কিছু নয় একটা positive কিছু। এবং এই মন তারা চায় সমৃদ্ধিশালী করে'—যে মনে এমন ভাব এমন চিন্তা সব থাকবে যে ভাব যে চিন্তা তাদের নিজেদের প্রাণে খেলছে, নিজেদের মনে উঠছে। এক দিককার শিক্ষার গুণে ও আর এক দিককার শিক্ষাহীনতার দোষে আজ দেশে এম্‌নি অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে যে পুরুষের অধিকাংশ কথাই নারীর অধিকাংশেই বুঝতে পারেন না। শিক্ষার ও শিক্ষাহীনতার ঐ ব্যবস্থাই যদি চলে, তবে এমন দিন আস্‌তে বাধ্য যখন এই বাঙ্গালীর সমাজে কোন পুরুষের কোন কথাই কোন নারী বুঝতে পার্‌বেন না। সে অবস্থায় দাম্পত্য জীবনটা যে খুব সুখের হবে তা কেবল তাঁরাই বলতে পারেন যাঁদের জীবনে দেহটাই হচ্ছে সবার চাইতে বড়।

এই হচ্ছে আমাদের স্ত্রী-শিক্ষার লাভের হিসেব। লাভ, কেননা মেয়েদের শিক্ষায় আমাদের নূতন দাবীর পূরণ হবে। ঐ নূতন দাবী আজ আমাদের এম্‌নি বড় সত্য হ'য়ে উঠেছে যে তার কাছে আমরা যৌতুক ও ভাল্‌নার লোভকে বলি দিতে বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠিত নই। যৌতুক ও ভাল্‌নার চাইতে একটা বড় আনন্দের সন্ধান আমরা পেয়েছি। এই বড় আনন্দের সন্ধানকে নাকচ ক'রে দেবার ক্ষমতা কোন শাস্ত্রীয় শ্লোকেরও নেই বা কোন অশাস্ত্রীয় সামাজিক আচারেরও নেই।

(৫)

আর একটা মস্ত লাভের কথা ভয়ে ভয়ে বলি। মেয়েরা শিক্ষিত হলে বাধ্য হ'য়ে পুরুষদের "পতি দেবতার" আসন ত্যাগ করতে হবে। পুরুষদের পক্ষে এটা একটা মস্ত লাভের কথা। কথাটা একটু বিশদ করে' বলছি।

পড়ে-পাওয়া টাকাটা চোদ্দ আনাতেই ছাড়ি। যে জিনিষটা মানুষ কোন রকম চেষ্টা বা উত্তম না করে পেয়েছে, কোন রকমের মূল্য না দিয়েই আয়ত্ত ক'রে বসেছে, সে জিনিসের প্রতি মানুষের সাধারণতঃ বড় বিশেষ দরদ জন্মে না। "পতি-দেবতা"র আসনটা মনের প্রাণের হৃদয়ের কোন রকম মূল্য না দিয়ে আমাদের এম্‌নি সহজে দখলে আসে যে ওর দেবত্বটার চর্চ্চা করবার কোন কথাই আর আমাদের মনে ওঠে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের দেবত্ব থাক্ বা না থাক্ সমাজের directoryতে পতিরা দেবতা নামেই লিষ্টভুক্ত। এমন কি যে মানুষটী সমাজের সবার কাছেই অতি সাধারণ হ'য়ে যাটু বছর

কাটিয়ে গেলেন তিনি অনুগ্রহ করে' একটা বিয়ে করলেই অমনি একটা অসহায় ওমূক প্রাণীর কাছে একেবারে দেবতা হয়ে ওঠেন। ষাট বছর পর হঠাৎ একদিন যে তার দেবত্বটা কোথা থেকে আসে তা বলা মুস্কিল। কিন্তু সমাজ সনাতন সনন্দ দিয়ে রেখেছে। I. C S মেম্বরদের একটা পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু আমাদের "পতি-দেবতা'দের কোন পরীক্ষাই নেই—না সমাজের কাছে —না যার কাছে দেবতা হবেন তার কাছে। পরানুগ্রহে প্রতিপালিত হ'তে হ'তে যেমন মানুষের মনুষ্যত্ব পুরুষত্ব লয় পেয়ে যায়, অপর পক্ষে নিজের পরিশ্রমে চেষ্টায় অর্জ্জনে মনুষ্যত্ব পুরুষত্বের স্ফুরণ হয়, তেম্নি এম্নি বিনা আয়াসে "পতি-দেবতা'র আসন ভোগ করে করে" আমরা দেবতা ত হইইনি বরং সে আসন ব্যক্তিগত কষ্ট ও শ্রম করে, যদি আমরা রচনা করতে পারতেম তবে দেবতা না হই অন্ততঃ আমাদের মনুষ্যত্বের যে স্ফুরণ হ'তে পারত তা পর্য্যন্ত হয় নি। এতে করে' আমরা পুরুষরা একটা মস্ত সুযোগ হারিয়েছি। মনুষ্যত্ব দেখাবার ক্ষেত্র ত আমাদের এম্নিই কম। আমাদের প্রত্যেকেরই যদি আমাদের জীবনের বসন্তাগমে অন্ততঃ একটা তরুণীর কাছে আমাদের মনুষ্যত্ব প্রমাণ করবার বন্দোবস্ত থাকত তাহলে তাতে করে' আমাদের মস্ত লাভ হ'ত। কিন্তু সমাজের সনন্দ সে-পথ বন্ধ করে' রেখেছে।

কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হলে এই আরামের ব্যবস্থা শিথিল হ'য়ে হ'য়ে অবশেষে উল্টে যেতে বাধ্য। কেননা মেয়েরা শিক্ষিতা হ'লে তাদের মনের গায়ে আকাশের আলোক ও বাতাসের পুলক লাগতে বাধ্য। সে-অবস্থায় তাদের মন প্রাণ প্রাচীন ও প্রবীণ সব সংস্কার থেকে মুক্ত হবে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটা স্বাধীন মত, একটা ব্যক্তিত্ব ফুটবেই। সে-অবস্থায় তাদের মনে এই সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী ও সমাজ সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন উঠবে। তখন "পতি-দেবতাদের" সমাজের দেওয়া সনন্দ খেলো হ'য়ে পড়তে বাধ্য। অবশ্য অনেকের সূক্ষ্ম বুদ্ধি এই বন্দোবস্ত করতে চান যে আমরা আমাদের মেয়েদের শিক্ষিতও করব আবার ক'নে বউও করে' রাখব, যেমন কোন কোন ইংরেজ রাজপুরুষ হয়ত ভেবেছিলেন যে তাঁরা ভারতবাসীকে Mill, Byron, Shelley ও পড়াবেন আবার Hewers of wood ও drawers of water করে'ও রাখবেন। কিন্তু সৃষ্টির নিয়মটা এমনি অসুবিধাজনক যে তা হয় না। মন যেখানে মুক্ত ও উদার হয়েছে জীবনকে সেখানে সুপ্ত ও সংকীর্ণ করে' রাখা যায় না।

ঘোড়াটার পিঠে ছুটবার জন্তে সপাসপ চাবুক লাগাচ্ছি আবার প্রাণপণে রাস্ টেনে রাখ্ছি তাতে ঘোড়াটাও ক্ষেপে ওঠে—মানুষ ত মানুষ। সে যা হোক মেয়েদের স্বাধীন ভাবে বুঝবার চিন্তা করবার ক্ষমতা হ'লে প্রশ্ন করবার সাহস জন্মালে আমাদের "পতি দেবতাদের" মধ্যেকার প্রমাণিত দেবতাটীকে লজ্জায় লুকিয়ে পড়্তেই হবে। কেন না ফাঁকি জিনিষটা প্রশ্নের সাম্নে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে থাক্তে পারে না। এতে করে' পুরুষরা ত একটা মস্ত অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি পাবে। এবং তাদের আত্মার মঙ্গল হবে। কেন না তাতে তারা সমাজের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া একটা মস্ত মিথ্যা থেকে মুক্ত হবে। আর মিথ্যাই হচ্ছে অমঙ্গল। মেয়েরা শিক্ষিতা হলে আমাদেব অর্থাৎ পুরুষদের এই একটা মস্ত লাভ।

অনেকে প্রশ্ন কর্তে পারেন যে পুরুষদেয় মঙ্গল হোক্ কিন্তু মেয়েদের কি? তাদের এমন একটা ভক্তি-চর্চ্চার সুযোগ হারিয়ে যাবে—এমন্ একটা ভক্তির উপলক্ষ্য চলে' যাবে। কিন্তু ভয় নেই ভক্তির সুযোগ যাবে কিন্তু হৃদয় শূন্য থাক্বে না সেখানে প্রেমের অবদান আস্বে। এবং এই প্রেমের সম্বন্ধই তরুণ তরুণীর মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্য ও সহজ সম্বন্ধ। এবং ভক্তির চাইতে যে প্রেম বড়—মধুর প্রেম বড়, তা বৈষ্ণব শাস্ত্রেই আছে।

(৬)

আমাদের স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর সহধর্ম্মিণী। আসলে সকল স্বামীর স্ত্রীই তার সহধর্ম্মিণী—তা সে সূত্র বেঁধেই বলা হোক্ বা উহ্যই থাকুক। কেননা স্বামী স্ত্রীর মনের মিল না থাক্লে সংসারটা ঝক্মারি হয়ে উঠ্বে। কিন্তু স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হতে পারে না যদি না সে হয় সহমর্ম্মিণী। আমাদের পুরুষ-সমাজের ও নারীসমাজের মর্ম্মের মিল নেই কেননা তাদের মনের চেহারা এক নয়। ও-দুয়ের মাঝে শিক্ষার বৈষম্যে আজ পুরুষের মনের গায়ে বাতাস লেগেছে সাত সমুদ্রের না হলেও অন্ততঃ তের নদীর, কিন্তু নারী-সমাজের মনের গায় যা লাগ্ছে সেটা হচ্ছে চুলোর আঁচ। ফলে আজ পুরুষ-সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার নারী-সমাজের কাছে কোন মূল্য নেই। এমন অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হতে পারে না।

তাই আজ বাঙালীর সংসারে ঘরে ঘরে বাধা। পুরুষ সমাজের বৃহৎ আকাঙ্ক্ষার সম্মুখে নারীসমাজ তার দুর্জ্জন অজ্ঞানতা ও সংকীর্ণতা নিয়ে বসে'। এমনি ত বাইরের বাধাই দুস্তর। তারপর ঘরে ঘরে এই যে বাধা—

যে বাধার জোর কেবল দুর্ব্বলতার জোর—এই বাধা যে পুরুষের পা'কে পিছনে ঠেলে রাখতে পারে তা দেখ্বার জন্তে খুব দিব্য দৃষ্টির দরকার করে না। এই বাধাকে পুরুষদের প্রতিপদে জয় করে' অতিক্রম ক'রে চল্‌তে হচ্ছে। তাতে কত যে শক্তির অপব্যয় হ'চ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এই অপব্যয় কত আপশোষের। কেন না যেখান থেকে পুরুষ-সমাজ শক্তি পেতে পার্‌ত সেখান থেকে তারা শক্তি কেবলই যে পাচ্ছে না তাই নয়, উল্টে আরও সেখান থেকে তাদের শক্তির অপহরণ চল্‌ছে। আজ যদি পুরুষ-সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার পিছনে, তাদের স্বপ্নের পিছনে, নারী-সমাজের উৎসাহবাণী থাক্‌ত, তাদের প্রাণের অনন্ত অনুমতি থাক্‌ত আজ যদি বাঙালী-সমাজে পুরুষের কর্ম্মের পিছনে নারীরও মর্ম্মের রঙিন্ স্বপ্নের অবলেপ থাক্‌ত তবে আজ পুরুষ চতুর্গুণ শক্তিশালী হয়ে উঠ্‌ত। কিন্তু আজ বাঙালী পুরুষের বৃহৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে বাঙালী-নারীর শক্তি ঢাল্‌বার সামর্থ্য নেই। কেননা আজ বাঙলী পুরুষ যে-শিক্ষায় যে-সাধনা আপনার করে' নিয়েছে বাঙালী নারী সে-শিক্ষা পায় নি।—এই যে বৈষম্য এই বৈষম্য অনন্ত কালেও কোন সমাজের পক্ষে মঙ্গলময় হতে পারে না। এখন পুরুষের সঙ্গে নারীর শক্তির সংযোগ ঘটাতে হলে পুরুষ নারীর মন ও মর্ম্ম এক কর্‌তে হবে। আর তা কর্‌তে হলে পুরুষ যে শিক্ষা পাবে নারীকেও সেই শিক্ষাই দিতেই হবে। পুরুষ পড়বে বাইবেল আর নারী পড়বে বেদ, তাতে পুরুষ নারীর মধ্যেকার বৈষম্য ত ঘুচবেই না ববং সে বৈষম্য আরও উৎকট ও সাংঘাতিক হবে। সুতরাং বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাকে নাকচ কর্‌তে হলে আগে বর্ত্তমান পুরুষের শিক্ষাকে নাকচ কর্‌তে হবে। অবশ্য যদি পুরুষ নারীর মধ্যেকার বিষম বৈষম্য ঘুচোবার মতলব থাকে। এবং আমি আগেই বলেছি যে এই বৈষম্য না ঘুচলে পুরুষসমাজ নারীসমাজের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ কর্‌তে কোন দিনই পার্‌বে না।

আমাদের অত্যধিক আধ্যাত্মিকতা চর্চ্চার ফলেই হোক বা আর যে কোন কারণেই হোক পুরুষরা যে বাইরের কর্ম্মানুষ্ঠানে নারীর কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ কর্‌তে পারে সে জ্ঞান আমরা হারিয়েছি। তাই নারী আত্মার প্রকাশের জন্য আমরা সুবৃহৎ রন্ধন শালাটা নির্দ্দিষ্ট করে' দিয়েছি। আমাদের ধারণা নারী অবলা। কিন্তু একথা আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা শক্তির রূপ গড়ে ছিলেন দেবী মূর্ত্তিতে। নারী অবলা সে

কার কাছে? অনাত্মীয়ের কাছে। কিন্তু নারী-আত্মার যে একটা তীব্র একনিষ্ঠতা আছে তা পুরুষের আত্মায় নেই, নারীর প্রাণে যে একটা জলন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা অনুভব করবার ক্ষমতা আছে তা পুরুষের প্রাণে নেই। এই একনিষ্ঠতা এই উৎসাহ উদ্দীপনা নারী আপনার জনের মধ্যে সংক্রামিত করে' দিতে পারেন। নারী এইখানে অবলা নয়। নারীর বল সে বাহুবল নয় সেটা তার আত্মার বল। নারীর এই শক্তি আজ বৃহৎ সমাজের বৃহৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে নির্জ্জীব। কারণ তাদের অজ্ঞতা, কারণ তাদের শিক্ষার অভাব।

এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই যে বর্ত্তমান শিক্ষা—যাকে ইংরেজি শিক্ষাই বল বা বিলিতি শিক্ষাই বল এর পরিণাম ফল শুভ না অশুভ? এর পরিণামে সমাজ ও জাতির পক্ষে এমন একটা দুর্ঘটনা আছে কি না যার ক্ষতি পূরণ আর কোন দিনই কিছু দিয়েই হতে পারে না?

এ প্রশ্নের উপরে কোন তর্ক চল্‌তে পারে না। কেন না আমাদের কারোই ভবিষ্যৎ দেখ্‌বার ক্ষমতা নেই। কাজেই ভবিষ্যতে কি হবে তা নিশ্চয় করে কেউ বল্‌তে পারেন না। তবে জগতে দু'রকমের লোক আছেন—এক রকম হচ্ছে ইংরেজিতে যাঁদের বলা হয় pessimist, অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ে যাঁরা খারাপটাই আগে ভেবে বসে থাকেন। আর অন্য প্রকার হচ্ছে optimist,—যাঁদের চিরকাল বিশ্বাস সে মঙ্গলকে পাওয়া যাবেই যাবে। ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ যে প্রশ্ন, এর পরিণাম ফল শুভ না অশুভ হবে এর উত্তর ঐ দু'দলের লোক তাঁদের প্রকৃতি অনুসারে দু'রকমে দেবেন। এই খানে স্বীকার করি যে আমরা ঐ দ্বিতীয় দলের লোক—অর্থাৎ optimist। ঐ শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কোন শঙ্কাও নেই সন্দেহও নেই।

কিন্তু কেউ যেন ভুল না করেন। আমার এ কথা বলা উদ্দেশ্য মোটেই নয় যে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীটাই সেরা—শিক্ষা দেবার ওর চাইতে উৎকৃষ্টতর আর কোন প্রণালী আমাদের জন্যে হ'তে পারে না। তবে রামের চাইতে শ্যামের কাছ থেকে বেশী ও বড় উপকার পেতে পারতেম বলে রামের কাছ থেকে যে উপকারটুকু পেয়েছি তা যে অস্বীকার করব এমন মন কারোই থাকা উচিত নয়। ইংরেজি শিক্ষার দোষ গুণ আর যাই থাক্ না কেন এর ফলে যে একটা মহৎ জিনিস আমরা লাভ করেছি সেটা এম্‌নি পরিষ্কার যে তা আর কারো ভুল করবারই সম্ভাবনা নাই। এই মহৎ জিনিষটী হচ্ছে মনের

মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। কেউ জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পারেন যে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে ইংরেজি শিক্ষার ফলে তার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি সাহিত্যের বাগানে কি সামাজিক বৈঠকে যেখানেই স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে বা তার জন্যে সাধনা আরম্ভ হয়েছে সেখানেই দেখ্‌ছি তার পিছনে রয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মানুষ নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী পড়া পণ্ডিত নয়। তবে মনের এই মুক্তি এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে যদি কেউ আমাদের জাতীয় জীবনে একটা প্রচণ্ড দুর্ঘটনা বলে মনে করেন তবে আমরা নাচার,—তবে আমরা মাথা নুইয়ে স্বীকার করব যে তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌বার ক্ষমতা আমাদের নেই।

অনেকের আশঙ্কা যে ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমাদের নারী সমাজে কাপড়ের বদলে গাউন পরবে, সিঁদূরের বদলে বনেট্ ধরবে, অর্থাৎ আমাদের মেয়েরা একদম মেম বনে যাবে। অবশ্য কোথাও কেউ মেম বনেছেন কি না তা আমার জানা নেই। তবে শিক্ষার ফলে মেয়েদের যে মন একটু বিভিন্ন রকমের হবে সেটা ত ধরা কথা। এবং সেই জন্যই ত শিক্ষা দেওয়া। নক্ত-নাকে রাঙাদিদির মনের সঙ্গে বি এ পাশ মুক্তিদেবীর মনের যদি কোনই পার্থক্য না থাকে তবে এত কষ্ট করে' মুক্তিদেবীর বি-এ পাশ করবার দরকারই বা কি? এই মনের পার্থক্যের জন্য তাদের চাল চলনেও যে কতকটা পার্থক্য দাঁড়াবে সেও ত জানা কথা। তবে চাল চলনের ঐ পার্থক্যটাকেই যারা মেমত্ব বলে মনে করেন আসলে তারা মেম বলে কোন বস্তু বা ব্যক্তি দেখেন নি, দেখলেও বোঝেন নি। জাতীয় বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে—তবে তা এত সহজে নষ্ট হয় না এবং পরের জাতীয়ত্বও অত সহজে আয়ত্ত করা যায় না। কিন্তু সে যা হোক্ আমাদের মেয়েরা যে মেম 'বনে যাবে না তার প্রমাণ আমাদের চোখের ওপরেই রয়েছে। সে প্রমাণটা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছি এত কাল ইংরেজি শিক্ষার পর আমাদের পুরুষ সমাজ পাজামাও পরে নি আর হ্যাটও ধরে নি। বরং এখন বিলাত থেকে ফিরে এসেও অধিকাংশেই ধুতি চাদর পরছেন। অথচ তাঁরা দেশে এসে কিছুদিন নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন বলে অন্ততঃ আমার ত জানা নেই। সুতরাং একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পুরুষরা যখন সাহেব বনে নি মেয়েরাও তবে মেম বন্‌বে না। কারণ এ কথা সবাই জানেন যে পুরুষদের চাইতে মেয়েরা বেশী রক্ষণশীল। তবে আমাদের মেয়েরা ঠিক

গাস্তারী যে হয়ে উঠবে এমন কোন গ্যারান্টীও নেই। তবে সেটাকে আমরা দুর্ঘটনা বলে মনে করি না।

আবার অনেকের ধারণা আছে যে মেয়েরা শিক্ষিতা হলে স্বাধীন-মনা হলে পুরুষ স্ত্রীর সম্বন্ধ, পরিবারের বনিয়াদ সব একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। অর্থাৎ এদের ধারণা সমাজ সংসার ইত্যাদির পেছনে কোন সত্য নেই, সে সব কোন রকমে ঠেকা ঠুকো দিয়ে রাখা হয়েছে, পারিবারিক জীবনের মূলে কোন সহজ প্রেরণা নেই, মেয়েদের দেহ মন প্রাণ বুদ্ধিকে পঙ্গু করে কোন রকমে সেটাকে খাড়া করে রাখা হয়েছে। মেয়েরা যেই একবার শিক্ষিত ও স্বাধীন হবে অমনি তারা উধাও হয়ে ছুটে যাবে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? আমাদের বিশ্বাস কিন্তু উল্টো। পুরুষ স্ত্রীর সম্বন্ধের পিছনে, সংসার সমাজ পরিবার এ সবের পিছনে এমন একটা সহজ সত্য নিত্য হয়ে আছে যা পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই ভেঙ্গে দিতে পারে না। সুতরাং মেয়েরা শিক্ষিতা হলেই যে পরিবারের বনিয়াদ ধসে যাবে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা চোখের সামনেই ত দেখছি যে যে সব দেশে মেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে সে সব দেশে পরিবার নামক পদার্থটী একেবারে ভেসে যায় নি। তবে মেয়েরা শিক্ষিতা ও স্বাধীনা—হলে আমাদের সমাজের বা পরিবারের চেহারা বদলে যাবে নিশ্চয়। তবে সমাজের যে চেহারা চলে আসছে সেই চেহারাই যে প্রাণপণে রক্ষা কর্‌তে হবে এমন মতলব আমাদের নয়। আমাদের ঝোঁক তার ওপরে নয় আমাদের সমস্ত ঝোক্ মানুষের শিক্ষার ওপরে, মুক্তির ওপরে। পুরুষ নারী শিক্ষিত হোক্ মুক্ত হোক্। শিক্ষিত পুরুষ নারী যে সমাজ যে পরিবার গড়ে তুলবে সেই সমাজকে সেই পরিবারকে শিরোধার্য্য করে' নেবার মতো সাহস ও ক্ষমতা আমাদের আছে ও ভবিষ্যদ্বংশীয়দের হবে।

স্ত্রী শিক্ষাটাকে আমি আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের দিক থেকে ও সমাজের দিক থেকেই উপরে দেখেছি—তাতে পুরুষদের বা সমাজের কি লাভ হবে তারই বিচার করলেম। কিন্তু তা ছাড়া নারীর নিজেদেরও একটা দিক আছে, যে দিকটা সমাজের দিক বা পুরুষের দিকের আগে তার দাবীই সর্ব্ব প্রথম। কিন্তু সে সম্বন্ধে এখানে আর কিছু বলছি না—কেন না তা বলতে হলে আর একটা লম্বা প্রবন্ধ লেখা দরকার হয়ে পড়বে। এবং সে প্রবন্ধটী লিখবার চেষ্টা এখন নয়, পরে করা যাবে।

মুক্তিগাথা

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।]

বুকের আশারে কেন পীড়া দাও
কেন রাখ তা'রে ধরে' ?
ভয়ের বাঁধনে লাজ কম্পনে
কেন সে কাঁদিয়া মরে ?
অন্তরমাঝে কিসের হুতাশ
রুদ্ধ বেদনা ফেলিতেছে শ্বাস
হৃদয় শুষ্ক আকুল তিয়াসি
কেন, সে কাহার তরে ?

জীবন থাকিতে প্রাণভরি' যারা
বাচিল না পৃথিবীতে,
প্রেম পরশন লভিবার সাধ
সাহস হল না চিতে ;
তুলিল না ফুল পাছে কাঁটা ফুটে
খুলিল না আঁখি পাছে ঘুম টুটে
জ্বালিল না দীপ পাছে তমো ছুটে
সত্যেরে প্রকাশিতে ,

আজ দেখি তারা গুরুর আসন
করিয়াছে অধিকার
রক্তনয়নে শাসিছে ভুবন
নিষেধের অবতার !
অশক্ত তাই সংযমী ধীর
অক্ষম তাই বচনে প্রবীর
নির্ধন-তাই ধরিয়াছে চীর
ত্যাগ-কঙ্কাল-সার !

মানবের আশা মানবের প্রেমে
চির-বঞ্চিত যা'রা
হৃদয়ের কথা মরমের ব্যথা
কেমনে বুঝিবে তা'রা ?
জীবন যা'দের মরণ সমান
অলস আঁধারে রহিল শয়ান
আলোকের রথে আনন্দ-গান
কেমনে শুনিবে তা'রা ?

অন্ধ-হৃদয়ে বন্ধ করিয়া
রাখে যা'র চারিধার
শৃঙ্খল সে যে গাঁথে অনুদিন
তুমি যে বন্দী তা'র।
ঘৃণা কর যা'রে সেই তব লাগি
রচিছে মৃত্যু নিশিদিন জাগি
ভালবাস যা'রে সেই অনুরাগী
গাঁথিছে মুক্তিহার।

বিরাট উদার বিশ্বের বুকে
মানবের গুরু যিনি,
প্রেম-শৃঙ্খলে মুক্তির গান
রাখিলেন হৃদে তিনি,
তাঁরই ইঙ্গিতে জীবন ভরিয়া
হৃদয়ের মধু লহ লহ পিয়া
চল অভিসারে চল সহজিয়া
আনন্দ-পথ চিনি"।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ-কর্ত্তৃক বিরচিত কলিকাতা, মূল্য ১৲ মাত্র।

বইখানা পড়িয়া আমরা মোটের উপর বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও উদারপ্রাণ স্বদেশহিতৈষী কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের নিকট কালীপ্রসন্ন মহাভারতের গদ্য-অনুবাদক ও হুতোম প্যাঁচার নক্সা-প্রণেতা রূপে পরিচিত। সাহিত্যক্ষেত্রে এই দুই উদ্যমই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কালীপ্রসন্ন তাঁহার স্বল্পপরিমিত জীবনে দেশ ও দশের হিতকর কত বিখ্যাত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহা ভুলিবার নয়, গ্রন্থকার এই বরেণ্য কর্ম্মীর জীবনসম্বন্ধীয় লুপ্তপ্রায় তথ্যের উদ্ধার করিয়া বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কালীপ্রসন্ন অতি সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কিছুকাল হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি গৃহে ইংরেজ শিক্ষকের কাছে ইংরেজী ভাষা ও পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা করিয়া অল্প বয়সেই পাঠ সমাপ্ত করেন। ষোড়শবর্ষে পদার্পণ না করিতে করিতেই কিশোরবয়স্ক কালীপ্রসন্ন ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালায় সাহিত্য-রসানুভূতির এক অভিনব উৎস উন্মুক্ত করিলেন। আজকাল সর্ব্বত্র সাহিত্য-সভার ছড়াছড়ি দেখিয়া আমরা যেন মনে না করি সেকালেও এই অবস্থা ছিল। কালীপ্রসন্ন উক্ত বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপন করিয়া বাঙ্গালায় যে যুগান্তর আনয়ন করিলেন তাহা সমসাময়িক সংবাদ প্রভাকরের নিম্নলিখিত উক্তিতেই পরিস্ফুট হইয়াছে, "এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল ইহার মধ্যে অনেক কুপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা নগরে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া অধুনা অনেক ভদ্রসন্তানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।" যে সময়ে কালীপ্রসন্ন যৌবনের আবেগে ভাষাজননীর অর্ঘ্য সাজাইতেছিলেন, সেই সময়ে দেশ মাতৃকার সৌভাগ্য গগনে দেবেন্দ্রনাথ,

ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত এবং অক্ষয় দত্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ন্যায় শোভা পাইতে ছিলেন। দেশের এই নেতৃস্থানীয় স্বনামধন্য ব্যক্তিগণের অনুপ্রাণনাই কালীপ্রসন্নের অসীম যৌবনবেগকে সাহিত্যসাধনার জন্য উদ্দীপিত করিয়াছিল।

কালীপ্রসন্নের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব,—তাঁহার অপূর্ব্ব রসানুরাগ। এই রসানুরাগই তাঁহার বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠার মূলে এবং এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত রসপ্রেমেই তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার স্থাপনে উৎসাহিত করিয়াছিল। বালক কালীপ্রসন্ন এই অভিনব রঙ্গমঞ্চের জন্য সংস্কৃত শকুন্তলা, মালতীমাধব, বেণীসংহার, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া জনসাধারণের আনন্দ ও শিক্ষাদানের প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের সেই জীবন প্রভাতে বাণীমন্দিরের পুরোহিতমণ্ডলীকে এক গভীর পুলক ও নিবিড় আনন্দে উচ্ছ্বসিত দেখিতে পাই, বাস্তবিক তাঁহারাই সাহিত্যকে জীবনের অঙ্গীভূত কেমন করিয়া করিতে হয় জানিতেন। সুখের বিষয় তখনও বাঙ্গালার গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হয় নাই, তখনও দেশের লোক নাচিয়া হাসিয়া গাহিয়া আনন্দে মাতিতে ও মাতাইতে জানিত,—দেশে উৎসবের ধারা তখনও অব্যাহত ছিল। কালীপ্রসন্ন এই যুগেরই লোক, তাই সাহিত্যামোদী কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালীর কুটীরে কুটীরে সাহিত্যরসের ফোয়ারা ছুটাইবার জন্য পাগল হইয়াছিলেন। ইনি নিজে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া দর্শক বর্গকে আকৃষ্ট করিতেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা গদ্যসাহিত্যের তখন শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হয় নাই, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য মৌলিক নাটক রচনার সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে ২।১ খানা যে প্রকাশিত হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু সেগুলি জনসমাজে আশানুরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্গসমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দ্বারা লোকশিক্ষার পন্থা উন্মুক্ত করার পূর্ব্বে সংস্কৃতেরই দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচয়িতা যে নিছক রসিক সাহিত্যিক ছিলেন তাহা নহে, সমাজ ও সাহিত্যে সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিমতা ও কপটতার বিরুদ্ধেও তিনি লেখনীধারণ করিয়াছিলেন। "হুতোম প্যাঁচা" সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "আমরা যখন নিতান্ত বালক, তখন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি,

আমাদের মাতৃভাষায় বাজী খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল ফুটান যায়, ফোয়ারা ছোটান যায়। আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।" কালীপ্রসন্ন মহাভারতের গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার যে অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না। সাহিত্যের সেই শৈশবোচিত চাঞ্চল্য ও আবেগের দিনে কেমন করিয়া এই কঠোর প্রয়াস সফল হইল তাহা ভাবিলে স্বতই এই মহাত্মার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে মস্তক নত হইয়া আসে। দীর্ঘ ৮ বর্ষব্যাপী সাধনা, সমবেত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে এই বিরাট কার্য্য সমাপ্ত হয়। মহাভারতের অনুবাদেই আমরা প্রথম বুঝিতে পারিলাম বঙ্গ-ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা সামান্য নয়, একপক্ষে কালী প্রসন্ন কাশীদাসের চেয়ে এই ক্ষেত্রে দেশের কম উপকার করেন নাই। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় কালীপ্রসন্নের স্বদেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া বহু ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমরা একবাক্যে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই যে দেশপ্রেমই তাঁহার সমস্ত উদ্যোগের একমাত্র প্রেরণা স্বরূপ ছিল। ইহাতে তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভাকে খর্ব্ব করা হয়, কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া তিনি যদি লেখনী ধারণ করিতেন তবে "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"র ন্যায় এমন স্বাভাবিকগৌরবোজ্জ্বল গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে দেশপ্রীতি যে তাঁহার অন্তরের অনেকটা অংশ অধিকার করিয়াছিল এবং সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলসাধন যে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার প্রত্যেক উদ্যোগ ও সামাজিক কর্ম্মেই তাহা সুপ্রকট।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ত্তমান জীবন-চরিত রচনা করিয়া বঙ্গের এক মহানুভব ও কৃতী সন্তানের স্মৃতি-তর্পণের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাবের বহু বন্যা ও ঝড়ের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের যে ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল আজ তাহার সামান্য ইতিহাসও ও যিনি দিতে পারিবেন, তিনি স্বদেশের এক মহা উপকার সাধন করিবেন, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থকারের উপাদান সাজাইয়া অল্লায়তনে স্বল্প ভাষায় বিষয় বর্ণনা করিবার বেশ সুন্দর কৌশল জানা আছে, এই জন্য বইখানা একবার ধরিলে শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

এবার দুএকটি ত্রুটির উল্লেখ করিয়া সমালোচনার উপসংহার করিব।

গ্রন্থকার কালীপ্রসন্ন চরিত্রের একটা পূর্ণ চিত্র আমাদিগকে উপহার দিতে পারেন নাই, তাঁহার বইখানাতে কেবল কতকগুলি প্রধান ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে—ইহাতে প্রকৃত মানুষের ছবি ফুটিয়া উঠে না। এইজন্য মন্মথবাবুর পুস্তকখানিকে আমরা শুধু book of reference রূপে ব্যবহার করিতে পারি। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্নের ইহলীলা সাঙ্গ হয়, এইজন্য গ্রন্থারম্ভে মন্মথবাবু অনাবশ্যক আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি জীবনের সব দিক্ আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারেন নাই কালীপ্রসন্নের কোন্ আশামুকুল অকালে ঝরিয়া পড়িল, কালীপ্রসন্ন কোন্ সাধনার শেষ না দেখিয়া সংসার হইতে অপসারিত হইলেন। কালীপ্রসন্নের পারিবারিক জীবনের কোন আভাষই আমরা পাইলাম না।

যাহা হউক আমাদের সাহিত্যে এই প্রকার পুস্তকের প্রচুর দরকার আছে। বইখানা জীবন চরিতের কাঠাম হইলেও নীরস হয় নাই। অনেক ধুরন্ধরের মতে কালীপ্রসন্ন নাকি মধুসূদনের পূর্ব্বে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করেন, গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন এই ধারণা ভুল। পুস্তকখানিতে ১৫ খানা ছবি দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে মহাভারতের অনুবাদ সভার চিত্রখানি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বইখানার ছাপা বাঁধাই ও কাগজ বেশ ভাল, এই দুর্ম্মূল্যতার বাজারে এক টাকায় এইরূপ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ২৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকার সার্থকতা বুঝিলাম না।

ধর্ম্মানুষ্ঠান—শ্রীদুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য তন্ত্ররত্ন, এ, এল্, এন্, এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, মুর্শিদাবাদে লালগোলা, দক্ষিণা এক টাকা।

ইহাতে সঙ্কলয়িতা ও লালগোলাধিপের বংশতালিকা, সঙ্কলয়িতার বংশপরিচয়, ইহার পিতৃদত্ত উপদেশ অর্থাৎ 'কথা' নামক প্রস্তাব, প্রাতঃকৃত্য, পূজাপদ্ধতি, জপনিয়ম এবং চিত্রে 'শ্যামাযন্ত্রং' 'তারাযন্ত্রং' ও 'দুর্গাযন্ত্রং' দেওয়া হইয়াছে। "ধর্ম্মানুষ্ঠান" সঙ্কলয়িতার বংশে বহু মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার পুণ্য ধমনীতে ইহাঁদের শোণিত ধারা প্রবাহিত। বংশগৌরব প্রভাবে লোকে কবি হয়, দার্শনিক হয়, লেখক হয়, ধার্ম্মিক ও অর্থবান্ হয়,—অতএব বর্ত্তমান গ্রন্থকারও বা না হইবেন কেন? কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা আমাদের তন্ত্ররত্ন মহাশয় একাধারেই সবই হইয়াছেন। তিনি বইখানিতে নিজের ও পিতার যে প্রতিকৃতি দিয়াছেন তাহাতে কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে এই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষে ইহাঁদের আদর ও প্রতিপত্তি কিছু কম

হইয়াছে, উপরন্তু আবার বই লিখিয়া টাকা করিবার জন্য এই গরীব দেশের উপর এত অত্যাচার কেন? আমরা তো গ্রন্থকারের বংশ পরিচয় পড়িয়া গৌরব করিবার মতন কিছুই পাইলাম না। সঙ্কলয়িতার কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন্ শুভলগ্নে শালগোলার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কোন কোন্ তারিখে ইহাঁরা ৫॥১, ১০০/, ৫০/ নিষ্কর জমি লাভ করিয়া রাজবংশের অপূর্ব্ব গুরু ভক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন, কোন্ তারিখ হইতে অদ্যাপি রাজপরিবার-সংলগ্ন মন্দিরগুলি হইতে ইহাঁরা প্রতি সন্ধ্যায় ৩২ খানা লুচির ব্যবস্থা পাইয়া আসিতেছেন, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষের কে কবে বিপত্নীক হইয়া নিরাপত্তিতে দারান্তর গ্রহণ করিয়াছেন ইত্যাদি কত বড় বড় মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ঘটনা এই ২৯ পৃষ্ঠাব্যাপী "বংশ পরিচয়ে" স্থান পাইয়াছে, তাহা কি আমাদের মতন সামান্য মানুষ একমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারে? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশগৌরব কীর্ত্তন করিতে করিতে সময়ে সময়ে আবেগে কণ্ঠরোধ হইয়াছে। যথা—'হায়! আজ সে গুরুভক্তি কোথায়? যে গুরুভক্তির দৃষ্টান্তে একলব্য অদ্যাপি হিন্দুর সমাজে আদরণীয় যে গুরুদক্ষিণার জন্য জীবনপাত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতনা। শাস্ত্রে যাঁহার আসন নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া সহস্রদল কমলোপরি স্থাপন করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, যাহার মুখের বাক্য বেদ অপেক্ষাও গুরুতর আজ কালপ্রভাবে সেই গুরুর আসন কোথায়? আমরা ক্রমে আর্য্য শোণিত হীন হইতেছি। আজকাল আর্থিক সুখই আমাদের সুখ। অবিনশ্বর সুখের প্রতি লক্ষ্যই নাই। (পৃষ্ঠা ।/০)' গ্রন্থকারের গুরুগিরির উপর বড়ই লোভ। আর এক স্থলে পৃষ্ঠা ৸/০) গ্রন্থকার বাড়ীর একটি প্রাচীন জুই গাছের কথা বলিতে গিয়া কেমন কবি ও দার্শনিক সাজিয়াছেন দেখুন—"অদ্যাপি সেই জুঁই বৃক্ষ পবিত্র ভাবে তাঁহার বংশাবলির দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। যেন বিশ্বনিয়ন্তা এই পরিবারের পাপপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তাহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। স্থির, অবিচল, নির্ব্বাক অবস্থায় স্বভাবের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া সে যে এই পরিবারের কি দেখিতেছে ভগবানই জানেন। কালের কত কঠোর আঘাত ইত্যাদি ইত্যাদি।" বংশপরিচয়ের শেষে গ্রন্থকার আবার নিজ পরিবারের তালিকা দিয়াছেন। মা ষষ্ঠীর কৃপায় তাহাও বড় কম নয়। নিরীহ পাঠক বৃন্দের উপর কি ভীষণ জুলুম। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উৎসর্গপত্রটি সঙ্কলয়িতার অসীম পিতৃভক্তি ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তৎপর ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী পিতৃদত্ত উপদেশের ছড়াছড়ি। সেই খাস্কাতার আমল হইতে ধর্ম্মোপদেশ দিবার যে মামুলি প্রথা আমাদের পূজারি গুরুগণ সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এখানেও সেই চির প্রচলিত অতএব নমস্য পদ্ধতির শ্রীপাদপদ্মে ফুলচন্দন পড়িয়াছে। সংসারে অনাসক্তভাবে জীবন যাপন করিবে, পাপকাজ করিবে না, স্ত্রীমুখ সন্দর্শন করিবে না ইত্যাদি উপদেশ শুনিয়া শুনিয়া আজ পর্য্যন্তও যাঁহাদের সাধ মিটে নাই তাঁহারা অগৌণে এই অমূল্য গ্রন্থখানি কিনিয়া আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হউন। মোট কথা এই সব পড়িয়া যে কেহ ধার্ম্মিক হইবে, এ আস্থা আমাদের নাই। আজ নবসৃষ্টির যুগ আসিয়াছে, এরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা আর লোকে গ্রহণ করিবে না। আমাদের শাস্ত্রগিরির তুঙ্গ শির নূতন যুগসূর্য্যের আলোক চুম্বন করুক। গ্রন্থখানি বহুকষ্টে ৫০ খানি তন্ত্র আলোচনা করিয়া যে পূজাপদ্ধতি ও জপতপাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন তদনুসারে চলিলে যে শীঘ্র ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিব সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে তবে হয়তো কেন নিশ্চয়ই, গুরুগিরির প্রচলনটা আরও বেশী আবশ্যক হইয়া পড়িবে কেননা তন্ত্ররত্ন মহাশয় বা তাঁহার সমজাতীয় কোন পণ্ডিতের সাহায্য ব্যতীত এই সব তুকতাক, বুঝা একেবারে অসাধ্য।

শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহাশয়ের প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে হইল ইনি নিশ্চয়ই বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। যাঁহার ধমনীতে অসংখ্য মহাপুরুষের পবিত্র শোণিত প্রবাহিত, গরীব পাঠকের নিকট হইতে ১৲ টাকা দক্ষিণা আদায় করিবার লোভ তাঁহার পক্ষে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

স্বাস্থ্য ও শক্তি—শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম্, এ, বি, এল্ প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

আমাদের দেশে ছেলে বুড়ো সকলেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। তাঁহারা শরীর সম্বন্ধে সামান্ত খবর টুকুও রাখেন না। আমরা জগৎটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সবচেয়ে ভাল নীতি বলিয়া বুঝিয়াছি, সুতরাং এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরে মনোযোগী হওয়া অধার্ম্মিকের লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। আশা হয় এতদিনে আমরা বোধ হয় বুঝিয়াছি এই জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই ছার দেহটার বিশেষ দরকার আছে. ইহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিই বল, নৈতিক উন্নতিই বল, কিছুরই কোন মূল্য নাই। শরীর ও মনের ঐক্যতানেই মানবজীবনের বিকাশসঙ্গীত ধ্বনিত হয়, একটি অপটু হইলে অপরটিও পঙ্গু হয়, দুই এর মধ্যে এক অভেদ্য সংযোগ রহিয়াছে।

চারিদিকে শীর্ণ দেহ ও কঙ্কাল দেখিয়া যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় তখন আমাদের জন্য স্বর্গ হইতে আশার বাণী লইয়া আসিয়াছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এমন সুন্দর বই আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত, বিরল। আশা করি বাংলার সকল বালক ও যুবক ইঁহার বইখানা পাঠ করিয়া শারীরিক বল লাভে তৎপর হইবেন। গ্রন্থকার এম্ এ, বি, এল্, সুতরাং কেহ যেন ভয় না পান যে বই খানিতে ডাক্তারি বিদ্যার মারপ্যাঁচ দেখান হইয়াছে। অতি সরল ও চিত্তাকর্ষক গল্পের ভাষায় গ্রন্থকার শরীর সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত করিয়াছেন। প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে কতক গুলি ইংরেজি বইএর নাম দেওয়া আছে, যাহারা ভাল করিয়া গভীর ভাবে বিষয়টির আলোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাহারা ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবেন। পাঠকগণ শরীর সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়া যাহাতে সুস্থ ও সমর্থ দেহ লাভ করিতে পারেন এজন্য গ্রন্থকার আদর্শ ব্যায়াম প্রণালী চিত্র সাহায্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে কতিপয় বলবান্ ব্যক্তির শরীর-সাধনা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া ছেলেদের হৃদয়ে উৎসাহ জাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতিকৃতি দেখিয়া ছেলেরা নিশ্চয়ই এক একজন বীর হইতে চাহিবে। আমাদের দেশের গৌরব রামমূর্ত্তি, ভীম ভবানী, গামা ও গোবরের কথা ও ছবি ইহাতে আছে।

সর্ব্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থের বহুল প্রচলন কামনা করি।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়- শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ এম্, এ, কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য দেড়টাকা।

অদ্য অর্দ্ধশতাব্দীও অতীত হয় নাই—রাজা দক্ষিণারঞ্জন ইহলীলা ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক স্মৃতি এতই ক্ষীণ যে ইঁহার নাম পর্য্যন্তও আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। অথচ রাজা দক্ষিণারঞ্জনের ন্যায় তেজস্বী, উদারচেতা ও বিজ্ঞ জননায়ক নব্য বাংলায় অতি কম সংখ্যকই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এত শীঘ্র দক্ষিণারঞ্জনকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সম্ভবতঃ তাহার কারণ দক্ষিণারঞ্জনের কর্ম্ম ও উৎসাহ প্রধানতঃ বাংলার বাহিরে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এদেশেও তাহার কীর্ত্তির অভাব নাই। দক্ষিণারঞ্জন ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন, এজন্য অল্প বয়স হইতেই তিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার শক্তি ও উপযোগিতা লাভের সুবিধা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ভারত গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণারঞ্জনকে অযোধ্যা প্রদেশে একখানি তালুক প্রদান করেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি উক্ত প্রদেশের দুর্দ্ধর্ষ ভূম্যধিকারীদিগকে শান্তিপ্রিয় করিয়া তুলায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। গ্রন্থকার দক্ষিনারঞ্জনের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে সমসাময়িক বহু ঘটনা ও মহামনা ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বইখানির জন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকারকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহার লিখিবার ভঙ্গী অতি সুন্দর, সহজেই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ভাষা সুমার্জ্জিত, বাহুল্যবর্জ্জিত ও প্রাঞ্জল। ইহার উপাদান সাজাইবার ক্ষমতাও অনুকরনীয়। গ্রন্থে ৪৬ খানা ছবি আছে এবং দক্ষিণারঞ্জনের বাংলা ও ইংরাজি হস্তাক্ষরের নমুনা দেওয়া হইয়াছে। মোট কথা গ্রন্থখানিকে সর্ব্ব-জনমনোহর করিতে মন্মথ বাবু যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পুস্তকের মলাট, আকার, ছাপা ও কাগজ সবই সুন্দর। আশা করি গ্রন্থকার বাঙ্গালী কর্ম্মবীরদিগের প্রত্যেকের একখানি এইরূপ সুন্দর জীবনী প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের এক প্রধান অভাব পুরণ করিবেন। বইখানার ভূমিকা লিখিয়াছেন —স্যার আশুতোষ চৌধুরী।

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

বাঙ্গালী পেট্রিয়টিস্‌ম্‌

বাঙালী পেট্রিয়টিজমের মূলে আছে বাঙালী জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nations এর মতানুসারে বাঙালী পেট্রিয়-টিজমের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমত আমরা একটি বিশেষ জাতি, তার পর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি, সুতরাং আমাদের self-determinationএর বিরোধী হচ্ছে Indian Imperialism আর গতযুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, Imperialism সর্ব্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশী হোক আর বিদেশীই হোক। ইংরাজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে জর্ম্মাণীর ছিল শুধু স্বদেশ। আর জর্ম্মাণীর এই স্বদেশী imperialism, জর্ম্মাণ জাতির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলা-দলিল ত আজকের

দিনে সকলের চোখের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা ভাল, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেন না তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বলো যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে self-determination যদি না খাটে ত ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোন জাতির সঙ্গে অপর কোন জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাঙলার সঙ্গে মান্দ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন কি ফ্রান্সের সঙ্গে জর্ম্মাণীরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের নাম শুনলে এক দলের পলিটিসিয়ানরা আঁতকে ওঠেন তার কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ও-মনোভাব জাতীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে, কোনও মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর যেহেতু তিনি পাড়াপড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন তাহলে সে অভিযোগের কি কোনও প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধরো যদি কোন জননী নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে পাড়াশুদ্ধ ছেলে-মেয়েদের নিজের স্তনের দুধ যোগাতে ব্রতী হন, তাহ'লে কাউকে বঞ্চিত না ক'রে সবাইকে কিঞ্চিত কিঞ্চিত দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান ক'রে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস আমাদের পলিটিসিয়ান্‌রা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজমের উক্তরূপ জলো-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

যদি জিজ্ঞাসা করো যে, এই সহজ সত্যটা লোকের চোখে পড়ে না কেন?—তার উত্তর আমাদের অবস্থার গুণে। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিদেশী রাজার অধীনে, সুতরাং ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই আজ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজ প্রধান বন্ধন হচ্ছে পরাধীনতার বন্ধন এবং এ অধীনতার পাশ হতে কোনও প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় নিজ কর্ম্মগুণে মুক্ত হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের সবারই পলিটিক্যাল-সমস্যা একই সমস্যা। সে সমস্যা হচ্ছে এই যে, অধীনতা কি করে স্বাধীনতায় পরিণত করা যায়। সুতরাং আজকের দিনে ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই উপদেশ কিম্বা আদেশ দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের সকলেরই

তাই একই বাদ, সে হচ্ছে অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর আমাদের সকলেরই গম্যস্থান একই—স্বরাজ্য।

প্রাদেশিক পেটিয়টিজমের মূল্য যে কি, তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পৌঁছিবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে দাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্ম্মের চর্চ্চা ক'রে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কংগ্রেসী-ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশ পাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া, আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া এক বস্তু নয়। এক জেলে পাঁচজন কয়েদির মিলন আর এক সমাজের পাঁচজন স্বাধীন লোকের মিলনের ভিতর যে প্রভেদ আছে, আজকের ভারতের নানা জাতির কংগ্রেসী-মিলনের সঙ্গে কালকের স্বরাজ্যবাসী জাতিদের মিলনের সেই প্রভেদ থাকবে। তখন প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের ভিত্তির উপরেই বাক্যগত নয় বস্তুগত ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজ্‌ম্ গড়ে উঠবে। * * *

আমার বাঙালী nationalism মুখ্যত মানসিক এবং গৌণত রাজনৈতিক। আমাদের মনের স্বরাজ্য লাভ করা ও রক্ষা করা এবং তার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমার প্রধান ভাবনা। রাজনৈতিক স্বরাজ্য মনে স্বরাট হবার একটি উপায়মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন বাঙালীর মনের বিশেষত্ব যে কোথায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক্। এ পরিচয় দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা বাঙালীর national self-consciousness কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই national-self-consciousness কথাটা আমাদের স্বদেশীযুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক এ কথাটা তার পলিটিক্যাল অর্থেই বুঝত। তখন আত্মজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝতুম আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে, সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাঙালার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু এ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেন না তা হলে স্বাধীন জাতের পক্ষে—জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোনও জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ সমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও-পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনও ভাষায় ওটির সঠিক তরজামা করা চলে না।

মানুষমাত্রেরই মুখ্যত এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেননা সেই চেষ্টাতেই তার সুখ সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয় তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্তমান ভারতবর্ষে বাঙলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনও জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে এক লোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি ভারতবর্ষের অপর কোনও জাত তদনুরূপ পারে নি।

ইউরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অল্প বিস্তর বদল করেছে এ কথা আমি মানি, কেননা না-মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিক্যাল-মতামত যে, 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস, এ ত সবাই জানে। দেশসুদ্ধ লোকের পলিটিক্যাল আত্মা যে ইউরোপের হাতে গড়ে উঠেছে, এ কথা এক পেশাদার ন্যাসনালিষ্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইউরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরো কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইউরোপের কাব্য বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। Lafcadio Hern-এর বইয়ে পড়েছি যে, সেক্সপিয়ারের নাটক—জাপানিদের মনের কোনখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে সেক্সপিয়ারের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয় ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে, ইন্দ্রিয়ের দর্শনের স্পর্শনের, মনের ধ্যান ধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে, রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব-নামক মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই না বাঙালী-যুবক Einstein-এর নবাবিষ্কৃত আলোক-তত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্ম্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাঙলায় জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালীর এতটা ঝোঁক।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, বাঙালীর জ্ঞান, জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনও কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালী ততটা করায়ত্ত করতে পারে নি এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস এ অক্ষমতার জন্য যত না দায়ী আমাদের প্রকৃতি, তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কল কারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবত বাঙ্গালীর নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক যা সত্য ও যা সুন্দর তার প্রতি বাঙালী মনের এই সহজ আনুকূল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয় জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের প্রকৃতির উল্টো টান টানতে গেলে তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুগ উঠেছে তাতে যে বাঙালী সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ যে-বাঙালীর চিন্তা একবার অভ্যাস আছে, সেই জানে যে উক্ত শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্বোধিত করবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। কোনও জাতির পক্ষে স্বধর্ম্ম হারিয়ে স্বরাট হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ্য লাভ করবে তখন ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশই তার শিক্ষা দীক্ষার উপর অপর কোনও প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা না একটা বিশেষ জাতীয় আদর্শ থাকে এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজস্ব বলে কোনও জিনিস নেই; অথবা সে নিজস্ব যে

রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায় তার পক্ষে স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোন অর্থও নেই। স্বব্যবস্থা করবার জন্যই ত স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুঁথিপড়া-মনের সঙ্গেও বাকী ভারতবর্ষের পুঁথিপড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতবাং আমাদের পলিটিক্যাল-মনও অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল-মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিক্যাল-মন তার সমগ্র মনের বহির্ভূতও নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য একদলের কংগ্রেস-ওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না, যদি মানতেন তাহলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হ'ত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে' আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদের যুবক শ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাঁচজনের সঙ্গে কথায় বার্তায় নিত্যই পাই। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অধিকাংশ লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মত রাজনৈতিক জগতে স্বরাট হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকব ও হাস্যকর, এ ধারণা এ যুগের বহু বাঙালীর মনে জন্মেছে। তবে মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদ পত্রে ও বক্তৃতাব রঙ্গমঞ্চে গর্জ্জে ওঠে নি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুগ করা চলে না। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য, যে কাজ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই তা নিয়ে প্রকাশ্য ঢাক পেটানো অসম্ভব, আমরা ঢাক পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে কতকটা পরীক্ষার ফলে আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানেরই একাংশ। এবং আত্মজ্ঞান আমাদের মনে জন্মেছে বলে, তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পুষ্ট পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাই নে, আর আমাদের দুর্ব্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে, আমরা লোকের জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরনীয় করে রাখা, পেট্রিয়টিক কাজ ব.ল মনে করি নে। কোন জাতির পক্ষে তার চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে নবজীবন ও নবশক্তি লাভ

করা সহজ সাধ্য নয় এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধন-পদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুগ নয়, কেননা ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে। এবং সে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা—উপধি কিম্বা ওকালতি, শুনতে পাই মহা কঠিন, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা, অর্থাৎ—কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন, কেননা এ লড়াই চিরজীবন ব্যাপী, এক মুহূর্ত্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিক সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, তার উপর আবার ইউরোপের রাজসিক সভ্যতার আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি, সুতরাং আমার কাছথেকে তুমি অন্য কোনও মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পার না। রাজসিক মন সাত্ত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কি না বলতে পারিনে, তবে তা যে, তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজ কাল যে সকল মনোভাব সাত্ত্বিক বলে চলছে, সে সব পুরোমাত্রায় তামসিক। সে সবের মূলে আছে, অজ্ঞতা আর ঔদাসীন্য, এক কথায় মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে আমার মন এ যুগের বাঙলার মন। যদি তাই হয় ত বাঙালীর nationalism এর আদর্শ যে কি তা অনুমান করা কঠিন নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে ডোরকৌপীন পরানো আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আজকের দিনে বাঙালীর যদি কোনও আন্তরিক প্রার্থনা থাকে ত সে এই—

"বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কিন্তু এ প্রার্থনা, কোনও বাইরের শক্তির কাছে নয়। নিজের অন্তরনিহিত শক্তির কাছে। কারণ এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে, বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয় এ সকলই আত্মবলে অর্জ্জন করতে হয়, প্রার্থনা বলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ Ideal-এর মধ্যে ত self-sacrifice-এর কথা নেই, তার উত্তর আমি দেব, self-sacrifice কোনও জাতির আদর্শ হতে পারে না, জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে self-realisation আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বহুলোকের পক্ষে self-realisation-এর ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে-দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, সে বর্ত্তমান বাঙলা নয়, অতীত বাঙলাও নয়, ভবিষ্যৎ বাঙলা. অর্থাৎ—যে-বাঙলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালী-পেট্রিয়টিজম বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজমের বিরোধী নয়। আর এক কথা, যে-ন্যাসনালিজম বিদ্বেষবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সে ন্যাসনালিজমের ফলে শুধু পরের নয়, নিজেরও যে সর্ব্বনাশ হয়,গত ইউরোপীয় যুদ্ধ এই সত্য যার চোখ আছে তারই চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সবুজপত্র -অগ্রহায়ণ।

সঙ্ঘ কি?

নূতন যে সঙ্ঘ হইতেছে বা হইবে, হওয়া দরকার, সকলের আগে মনে রাখিতে হইবে সেটা একটা ধর্ম্মসঙ্ঘ অর্থাৎ (Religious Institution) নয়, সেটা হইতেছে একটা সামাজিক ব্যবস্থা (Socio economic organisation), তবে এই সমাজব্যবস্থার প্রাণ হইতেছে অধ্যাত্ম (Spirituality)। কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রাণ হইতেছে একটা বিশেষ মতবাদ (creed), কোন মহাপুরুষের দেওয়া একটা বিশেষ উপলব্ধি, একটা বিশেষ সত্য, আর এই বিশেষ মতবাদ উপলব্ধি বা সত্য বেশীর ভাগেই দাঁড়াইয়া আছে জগৎকে জীবনকে ছাড়িয়া ওপারের দিকে তাকাইয়া। ধর্ম্মসঙ্ঘ সব আসলে সমাজের ভিতরের জিনিষ নয়, সমাজের বাহিরে সমাজকে পাদপীঠ করিয়া উহারা মাথা তুলিয়া আছে—'অসৌ লোকঃ' বলিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সমাজের সম্মুখে একটা আদর্শ ধরিয়া দিতেছে, সমাজের মানুষকে কোন রকম জীবনকর্ম্ম সমাপন করিয়া ঐ দিকে ছুটিতে বলিতেছে। সমাজ ছাড়িয়া সংসার ছাড়িয়া জীবন ছাড়িয়া জগৎ ছাড়িয়া ঐ 'অমুষ্মিন্ লোকে' যাইবার পথে আশ্রয়স্থান, পান্থনিবাস যাহা তাহারই নাম সঙ্ঘ অর্থাৎ ধর্ম্ম-সঙ্ঘ। এই সরাইখানাতেও দিন গুজরান দরকার, সমাজকেই সে জন্য ট্যাক্স দিতে হইতেছে, সঙ্ঘের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, সমাজকে এই বলিয়া বুঝান হইতেছে যে ইহা সমাজের কর্ত্তব্য, সমাজেরই ইহাতে উপকার, সমাজের সম্মুখে ইহা দিতেছে যে একটা দেদীপ্যমান আদর্শ, ইহসর্ব্বস্ব নয় এই রকম একটা উচ্চতর মহত্তর শিক্ষা ও সাধনা।

নবসঙ্ঘ কিন্তু এইরকম সমাজের বাহিরের জিনিষ নয়, ইহা সমাজেরই ভিতরের ব্যবস্থা, সমাজেরই নূতন একটা রূপ। সমাজ হইতে আস্তে আস্তে লোক ভাঙ্গাইয়া আনিয়া বসিবার একটা আস্তানা, আশ্রম বা মঠ নয়, ইহা যে সমাজ আছে তারই একটা নূতন গড়ন। ধর্ম্মসংঘের লক্ষ্য নিরিবিলি ভাবে এক জায়গায় বসিয়া পারমার্থিক সাধনা বা পারত্রিক চিন্তা করা, কর্ম্মের, জীবন-যাপনের কথা সেখানে খুবই অল্প, নাই বলিলেও চলে। নবসংঘের লক্ষ্য জীবনকে ফলাইয়া ধরা, জীবনের সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া সেখানে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা, সার্থকতা ফুটাইয়া তোলা। খাওয়া পরার প্রশ্ন ধর্ম্মসংঘকে বিচলিত করে না, সে প্রশ্নে বিচলিত হওয়া তার উচিতও নয়, দরকারও নাই—মঠের ভোগ সাধারণ সমাজ জোগাইতেছে। শুধু খাওয়া পরা কেন, সমাজের যে আরও কত সমস্যা রহিয়াছে ধর্ম্মসংঘ সে সকলকে স্রেফ উড়াইয়া দিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন ভাবনা তাহার ভাবিতে হয় না। নবসংঘ সমাজে নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিতেছে বলিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের কথা (যেটা লইয়া আজকাল সমস্ত জগতে আলোড়ন আন্দোলন চলিয়াছে) নর নারীর কথা, প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধের কথা, ছেলে পিলের কথা, শিক্ষার কথা এমন কি রাষ্ট্রের কথা পর্য্যন্ত সব আলোচনা করিয়া চলিয়াছে—এই সমস্তই তাহার কর্ম্মক্ষেত্রের অন্তর্গত। ধর্ম্মসংঘের বিষয় হইতেছে 'অসৌ লোকঃ'—আর নবসংঘের বিষয় হইতেছে 'অয়ং লোকঃ'।

তারপর ধর্ম্মসংঘ আছে এক একটা বিশেষ সত্য লইয়া, পরমার্থ সাধনার বিশেষ বিশেষ পথ লইয়া, এক একখানি শাস্ত্র লইয়া, এক এক মহাপুরুষের ছায়ার তলে। নূতন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির আপন অন্তরাত্মার উপর। নূতন সংঘ ধর্ম্মসংঘ না হইলেও, হইতেছে আধ্যাত্মিকসংঘ, উহাকে দাঁড়াইতে হইবে অধ্যাত্মের উপর, এই অধ্যাত্মকেই কেন্দ্র করিয়া উহা বিকশিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই অধ্যাত্ম আর কিছুই নয়, ইহা হইতেছে প্রত্যেকের মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য ও ঋত, যে ভাগবতসত্তা তাহার ধর্ম্ম, তাহার কর্ম্ম। আধুনিক সমাজের যে সমস্যা সব তাহা পূরণ করিবার জন্য নবসংঘ দিতেছে এই ব্যবস্থা—কারণ, কেবল এই ব্যবস্থাতেই সমাজের শুধু যে সকল আধিব্যাধি দূরীভূত হইবে তা নয়, উপরন্তু ইহাতেই সমাজ সুস্থ সবল হইয়া উঠিবে, পাইবে একটা সতেজ পরিপূর্ণ জীবন, একটা সমুচ্চ সার্থকতা।

আপন আপন ভাগবতসত্তায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি সংগ্রহেরই নাম সঙ্ঘ। আধুনিক সমাজের কেন্দ্র (or unit) হইতেছে পরিবার, স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততি অর্থাৎ রক্তের টানে মিলিত যাহারা তাহাদের লইয়া হইতেছে পরিবার। সঙ্ঘও এই রকম এক একটি পরিবার কিন্তু এ পরিবারের মিলনসূত্র হইতেছে জাগ্রত অন্তরাত্মার সহিত জাগ্রত অন্তরাত্মার মিলন ও মিল। আধুনিক সমাজ পরিবারের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে একটা বাহিরের চাপের ফলে, মানুষের দেহ ও প্রাণের প্রয়োজনের ফলে কিন্তু সঙ্ঘের দানা গড়িয়া উঠিবে অন্তরাত্মার আনন্দের ফলে, অন্তরাত্মার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সার্থকতার জন্যে। পরিবার বহু, সঙ্ঘও সেই রকম বহু হইবে,—অন্তরাত্মার সকলেই এক হইলেও, ধর্ম্মের কর্ম্মের বিভিন্নতা বিভিন্ন কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবে। সঙ্ঘ পরিবারের স্থান লইবে শুধু বহুত্বের নানাত্বের বৈচিত্র্যের হিসাবে নয়, কিন্তু পরিবারের যাহা জীবনসমস্যা সঙ্ঘও সে সমস্তই আলিঙ্গন করিয়া লইবে—গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা, স্বামী স্ত্রীর সমস্যা, সন্তান লালনপালনের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, আরও নূতন নূতন জীবনের ক্ষেত্রে সঙ্ঘ আপন প্রভাব ও প্রতিভা খেলাইয়া তুলিবে। এই রকম সঙ্ঘ সমষ্টি লইয়া যে মহাসঙ্ঘ তাহাই হইবে সমাজ।

পারিবারিক সমাজে একদিকে নাই যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আছে অহঙ্কারের স্বেচ্ছাচার, অন্যদিকে নাই তেমনই সমষ্টিসংহতি, আছে শুধু সমগ্রের অত্যাচার। এ রকম হইতে বাধ্য, কেননা যে মিল দিয়া মানুষ পরিবার গড়িয়াছে, সমাজ গড়িয়াছে সেটা হইতেছে শরীরের মিল—আর শরীরের মিল যেখানে আছে, সেখানে থাকিবেও আবার সংঘর্ষ ও পীড়ন। প্রকৃতপক্ষে এই রকম সমাজেই সত্যকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিতে পারে না। নূতন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সমাজকে গড়িয়া তুলিবে ব্যষ্টির আত্মার উপর। এখানে প্রত্যেকের আসল স্বাতন্ত্র্য ভাগবতস্বভাব ও স্বধর্ম্মই খেলিয়া উঠিবে, সেইজন্য সমাজের সমষ্টিগত সত্তাও পাইবে একটা অটুট আনন্দের সংহতি।

বলা যাইতে পারে, এই রকম আদর্শসমাজে, সঙ্ঘের কোন প্রয়োজন নাই —থাকিবে সমাজ আর ব্যক্তি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপন ধর্ম্ম আপন কর্ম্ম করিয়া যাইবে, সকলের সমবেত সত্তাই হইবে সমাজের সত্তা, সেখানে মাঝখানে সঙ্ঘনামক একটা প্রতিষ্ঠান নিরর্থক। ইউরোপে এনার্কিষ্টদের এই রকম আদর্শ। কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে থাকিয়া আলাদা আলাদা ধরণে চলিলেই মানুষের যে পূর্ণতা হয় তাহা নয়—সে ভাব

সে ধরণ যতই ভাগবত স্বাতন্ত্র্যের লীলা হউক না কেন। দল বাঁধা জোট বাঁধা গোষ্ঠীসৃষ্টি করাও মানুষের ভাগবতসত্তার একটা প্রকাশভঙ্গী। Individual soul যেমন সত্য কথা, Group-soulও সেইরকমই সত্য কথা। ব্যক্তিগত আত্মা, গোষ্ঠীগত আত্মা আর সমষ্টিগত আত্মা—একই আত্মার এই ত্রিধা ভিন্ন প্রকাশ। আত্মার, মানুষের পূর্ণ সার্থকতা এই তিনের যুগপৎ পূর্ণতায়.ও সার্থকতায়। আর এনার্কিষ্টদের আদর্শকেই যদি চরম আদর্শ বলিয়া ধরা যায় তবে সেই আদর্শ পরিপূর্ণ করিবার পথে – ইতিমধ্যে সঙ্ঘবাদ (communism) যে একটা প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী অবস্থা নয়, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

তারপর মহাপুরুষের কথা। এইসঙ্ঘবাদ যদি কোন বিশেষ মহাপুরুষেরই দান হইয়া থাকে তাতে কিছু আসে যায় না। ফলতঃ, জগতে সমাজে যত পরিবর্ত্তন হয় তাহা আকাশ হইতে হঠাৎ পড়ে না, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই তাহা প্রথমে ফুটিয়া উঠে। ভগবান বা প্রকৃতি কাজ করে একটা যন্ত্রের নিমিত্তের ভিতর দিয়া। একজনের ভিতরে যেটা প্রথম প্রকাশ পায়, পরে সেইটাই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, প্রথমে যেটা হয় ব্যভিচার (exception) সেইটাই পরে হয় নিয়ম (Rule)। সমাজে গোপনে যে জিনিষটা তৈয়ারী হইতেছিল, প্রত্যেকেই মনে প্রাণে আধ আধ অনুভব করিতেছিল—মহাপুরুষ সেইটাকেই ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরেন। ফরাসী-বিপ্লব প্রথমে এই রকম দুই একজন দ্রষ্টা, কবি, মহাপুরুষের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল, যেমন রুশো ভলতেয়ার। সোসিয়ালিজম্ আজকাল মানবমনের সাধারণ ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া চলিয়াছে একরকম, কিন্তু প্রথম ইহার উদয় মার্ক্সের মনে। এনার্কিজমের কবি বা দ্রষ্টা বাকুনিন। বোলশেভিজমের মাথায় লেনীন।

আসল ও শেষ কথা, কি রকম মহাপুরুষ ও কি রকম তাঁহার ধর্ম? যে মহাপুরুষ যতখানি ব্যাপক ও গভীরভাবে মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, যে মহাপুরুষ কোন বিশেষ সত্য বিশেষ উপলব্ধির উপর জোর দিতেছেন না, কিন্তু সহজ মানবধর্ম্ম, মানুষের অন্তরাত্মার সহিত যিনি আপনাকে সম্মিলিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি যাহা গড়েন তাহা সর্ব্বসাধারণেরই জিনিষ—তাহাতে একটা বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে, থাকা উচিত ও অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য হইতেছে মানবের অন্তরাত্মারই প্রয়োজন ও দাবী। সে রকম

মহাপুরুষ নিজেকে সার্থক মনে করেন তখনই, তাঁহার পূজাও সার্থক হয় তখনই যখন তাঁহার মুখের কথা শুনিতে বা তাঁহার মতামত প্রচার করিতে ততটা ব্যস্ত নই, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব (personality)কে বড় করিয়া ফাঁপাইয়া তুলিতে ততটা অধীর নই, যতটা আমাদের প্রয়াস ও সাধনা হয় তাঁহারই মতন আমাদেরও প্রত্যেকের জীবনদেবতাকে উপলব্ধি করা ফুটাইয়া তোলা। তাঁহার দেওয়া সত্য তখনই পূর্ণ হইয়া উঠিবে যখন আমরাও আমাদের নিজের নিজের সত্য লইয়া তাহার সহিত যুক্ত করিয়া দিতে পারি।

প্রবর্ত্তক

সহজিয়া।

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল্]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিপ্রলব্ধার কথা

(৪)

স্বামী চলে যাবা মাত্র, হাসি বল্লে "বাঁচলাম।" চাকর দাসীরা বল্লে "বাঁচা গেল।" বাড়ীর অনেকেই মুখে না বলুক ভাবে বোঝালে যে ভালই হ'ল, কিন্তু আমিত কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, যে, তাঁর জন্য কার কি আটকাচ্ছিল। সবাইত' যেমন খাচ্ছিল দাচ্ছিল হাসছিল কাঁদছিল, তেমনি হাসছে কাঁদছে, উঠছে, বসছে। তবে কেন তাঁর যাওয়ার পর এতবড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস সমস্ত বাড়ীখানা হতে উঠে সজোরে আকাশের গায়ে পড়ল? কে জানে কেন?

হয়ত এতবড় একটা বৃহৎ জীবনকে এই এতটুকু সংসারে আঁটছিল না, হয়ত এতখানি প্রখর জ্ঞানের আলো এই অজ্ঞানের সংসারে সহ্য হচ্ছিল না, হয়তো বা এত কাছে এমন মুক্ত প্রাণের খোলা হাওয়া এসে সংসারের গোপনতার পর্দ্দাটুকুকে বারম্বার উড়িয়ে দিয়ে ব্যস্ত করে দিচ্ছিল। কিন্তু আর যার যাই হোক, আমার পক্ষে স্বামী মহারাজের চলে যাওয়াটা যে কি কষ্টের হয়েছিল তা বলতে পারব না। তিনি আসাতে আমি যেন এই বদ্ধগৃহের মধ্যেই বাহিরের মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিলাম, আমি যেন ঘরে বসেই হিমালয়ের পার্ব্বত্যবায়, সমুদ্রের উদার উন্মত্ততা, পূর্ণপ্রাণের সরল স্বাস্থ্য, সমস্তই উপভোগ

করছিলাম। তাই হঠাৎ তাঁর চলে যাওয়ার পরই অনুভব করলাম, আমি বদ্ধজীব। এতদিন একথা ভেবে দেখবার সময় হয়নি, কিন্তু হঠাৎ দুদিনের জন্ম এই মুক্তজীবটী এসে আমার বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে আমি সহস্র পাশে এবং পোড়ামাটীর একটা কারাগারের মধ্যে একেবারে আকণ্ঠবদ্ধ প্রাণী।

তিনি স্বাধীন তাই স্বাধীনভাবে এসে স্বাধীনভাবে চলে গেলেন।

কিন্তু সেই বনের পাখী এসে এই খাঁচার পাখীকে দু'দিনের জন্ম বাইরের বনফল খাইয়ে এমন বড় করিয়ে দিয়ে গেলেন, যে. আমার স্পষ্ট অনুভব হল, এই ছোট খাঁচায় আর আমার আঁটছে না, আমি এই সোণার খাঁচা হতে অনেক বড় হয়ে পড়েছি। আঠার বছর বয়সেও আমায় যত বড করতে পারে নি এই একমাসে আমি তার চতুর্গুণ বড় হয়ে উঠেছি।

হাসি আমার মুখ দেখে বল্লে "ঊর্মিলা দিদি, তোমাব কি হল? পড়া শুনা, যোগ যাগ ছেড়ে দিয়ে কী রাতদিন ছাতে ছাতে ঘুরে বেড়াও?"

আমি বল্লাম, "ছাতে ছাতে বেড়িয়ে কি যোগযাগ পড়াশুনা হয় না?"

"হতে পারে কিনা তুমিই জান, কিন্তু আমিত' দেখি তুমি কেবলি ঘুরছ। পিসীমা বুড়ো হয়েছেন তবু তাঁর খাটুনির অন্ত নেই, আর তুমি এমন জোয়ান মানুষ কেবল গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াবে? এ কোনদেশী ধর্ম্ম?"

"সকলের কি একই ধর্ম্ম? কেউ বা গায়ে হাওয়া লাগাতেই জন্মেছে, কেউ বা বড় তুলতে জন্মেছে। যার যা কাজ সে তাই করছে, তাতে রাগ কর কেন?"

হাসি খুব রেগে উঠে বল্লে, "এ সব কথা কেবল চোখে ধুলো দেবার জন্য, কিন্তু এতে যে কেবল পরের চোখে ধুলো দেওয়া হচ্চে তা নয়, নিজের চোখেও ধুলো পড়ছে। তোমাদের এই সখের ধার্ম্মিকতার খোরাক যোগাবার জন্য সারা সংসার বোকার মত খেটে মরছে, আর তোমরাও এমনি অন্ধ যে নিজেদের এই ধার্ম্মিকতার বাবুগিরীটা স্বাভাবিক আর জন্মগত হক্ মনে করে নিজেদেরও মাটী করছ। দুবেলা খেটে খুটে নিজেদের পেটের ভাত জুটুতে হত ত' দেখতাম তোমাদের যোগযাগ ধর্ম্মকর্ম্ম কোথায় থাকত?"

হাসির হঠাৎ এই অদ্ভুৎ পরিবর্ত্তন দেখে আমার হাসি পেল। আমি হাসতে লাগলাম, কিন্তু সে রেগে গম্ গম্ করে চলে গেল। আমিও কিছুক্ষণ ছাতে ছাতে ঘুরে নীচে নেমে গেলাম। নীচে গিয়ে দেখি, মা বসে গিয়েছেন তাঁর দৈনিক কাশীখণ্ড পাঠ করতে, আর বাড়ীর যত বন্ধুবান্ধব আশ্রিত

অভ্যাগত এমন কি দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই পরম ভক্তিভরে শুনতে বসে গিয়েছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মার পাঠ শুনলাম। তারপর মাকে বল্লাম "মা, এঁদের বৈ থেকে কাশীর মহাত্ম্য শুনিয়ে কি হবে? এই কুম্ভমেলার সময় এঁদের কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে আন না।"

আমার কথায় সকলেই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অনুমোদন করলেন। কিন্তু মা বল্লেন, "যাঁর ইচ্ছা হলে এখনি সব হতে পাবে তাঁকেই বল না গিয়ে, তাঁকে না বলে আমায় বলে ফল কি?"

আমি তখনি বাবার কাছে গিয়ে সে কথা পড়ালাম। বাবাও যেন এই কথার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। আমি বলবামাত্র তিনি বল্লেন, "বেশ তাই হবে মা, আমারও ক'দিন হতে তীর্থ তীর্থ মন করছে। বিশেষতঃ এবার প্রয়াগে কুম্ভমেলা—এক সঙ্গে দুই কাজই হবে।"

আমি বল্লাম, "দু' কাজ কি কি?" বাবা একটু যেন ইতস্ততঃ করে বল্লেন—

"তীর্থ দর্শন, সাধু দর্শন দুই হবে।"

আমার মনে হল বাবা যেন কি একটা কথা গোপন করলেন। যাই হোক আমি আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলাম না।

হাসি এই তীর্থ ভ্রমণের কথা শুনে খুব উৎসুক হয়ে উঠল, এবং তিন চার দিনের মধ্যেই সমস্ত গুছিয়ে ফেল্লে।

কিন্তু আমাদের তীর্থে-যাওয়া ত' বড় সহজ ব্যাপার নয়, এ যেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গযাত্রা। আত্মীয়-স্বজন দাস-দাসী, বরকন্দাজ পাইক, অনাহূত বরাহূত কতই না লোকজনে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটা যাত্রার পূর্ব্বে ভরে উঠল। বাইরের প্রকাণ্ড উঠানে, গরুর গাড়ী পাল্কি ইত্যাদি যান বাহনে একটা ছোটখাটো বাজার হ'য়ে উঠল। কর্ম্মচারীদের ডাক হাঁক, ঘোড়া গরুর চিঁহি হাম্বা, ছেলে মেয়েদের ছুটোছুটী কান্নাকাটী, এবং সকলের ওপরে প্রজাসাধারণের ক্রমাগত আনাগোনা আবেদন নিবেদন শুনতে শুনতে কর্ত্তাকর্ত্রী হতে আরম্ভ করে বাড়ীর চাকর দাসী পর্য্যন্ত সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাবা শেষে বিরক্ত হয়ে বল্লেন. "এত লোকজন নিয়ে গিয়ে কাজ নেই।" কিন্তু মা তা শুনলেন না - বাড়ীর কুকুর বেড়ালের পর্য্যন্ত বিশ্বনাথ দর্শনের ব্যবস্থা করলেন। এবং এই অবকাশে গ্রামের কত দরিদ্র অদরিদ্র ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই চোব্যচোষ্যাদির সঙ্গে এক রকমের

আর্থিক ও পারমার্থিক সুবিধা করে নিলে যে শেষে একদিন দেওয়ানজী এসে বল্লেন 'নগদ টাকা যদি এমনি করে এখনি হতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে এতবড় বাহিনীর তীর্থের খরচের জন্য এষ্টেটের দেনা হয়ে যাবে।' কিন্তু সে কথায় বড় একটা কেউ কর্ণপাত করলে তাত' মনে হলনা। প্রত্যেক চাকর দাসী কর্মচারীর তিন মাসের মত মাহিনা খোরাকীর সঙ্গে কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা হল। তার ওপর তীর্থে খরচের জন্যও কিছু কিছু তারা পেলে। কিন্তু পথে বেরিয়ে তারা যে এক পয়সাও খরচ করেছিল তাত' স্মরণ হয় না।

যাই হোক এই হরিশ্চন্দ্রের কটক নিয়ে আমরা গয়া কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন মথুরা করে যখন আবার কুম্ভস্নানের জন্য প্রয়াগে ফিরলাম তখন অনেকেরই মন বাড়ী বাড়ী করে উঠেছে। হাসি ত আর কিছুতেই থাকতে চায় না— এবং তার সঙ্গে অনেকেই বাড়ী ফিরবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে দেখে বাবা বল্লেন, "তা হলে যারা না থাকতে চায় বাড়ী ফিরে যাক।"

কিন্তু মা বল্লেন, "সে কি কথা। কুম্ভস্নান না করে? তা' কেমন ক'রে হবে?" কিন্তু অনেকেরই প্রাণের কুম্ভ পুণ্যে ভরে উঠেছিল, তাই তারা ত্রিবেণীর মহাযোগের স্নানের লোভ ত্যাগ করে, হাসির সঙ্গে যোগ দিলে। এবং দু'এক দিনের মধ্যেই প্রায় অধিকাংশ লোক গৃহের দিকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। যে দুচারজন থাকলেন তাঁরা নিতান্তই মায়ের অনুগত বিশেষতঃ তাঁরা প্রাচীনা তাই এই ভীষণ জন-সংঙ্ঘের নানাভয়ের মধ্যেও তাঁরা মরণের ভয়ে ভীত হলেন না।

(৫)

দুলছে ফুলছে গর্জ্জন করছে, দিক হতে দিগন্তে মিলিয়ে গেয়েছে তবু একি ঠিক সমুদ্র।

পুরীতে সমুদ্র দেখিছি, কিন্তু সে ত' এমন নয়। এযে কি দেখিছি তা বলতে পারি না। পাগড়ী অপাগড়ী সচুল অচুল, সটীক, অটীক নানাজাতীয় মাথার অন্ত নেই—মাথার পর মাথায় সমস্ত দিগদিগন্ত ছেয়ে গিয়েছে। ঠিক যেন সমুদ্র অথচ এই জনসমুদ্রের গর্জ্জনের সঙ্গে জল সমুদ্রের কল রোলের তুলনাই হয় না। কারণ জল সমুদ্রের গর্জ্জনে কেমন একটা একটানা সুর আছে তাল আছে - কিন্তু এই জনসমুদ্র হতে যে আওয়াজ উঠ্ছিল তাতে না ছিল সুর না ছিল লয়। ছিল কেবল একটা বিরাট গুম্‌গুমানি দূর হ'তে মনে হচ্ছিল যেন কোথায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হচ্ছে।

* * * *

সে যে কি ঠেলাঠেলি তা বর্ণনা করতে পারব না। চারদিকে সিপাই সান্ত্রী নিয়ে নিজেদের প্রাণটুকু বাঁচিয়ে আমরা যতই এই সমুদ্র ঠেলে অগ্রসর হয়েছি ততই দেখেছি যে মানুষের মিলনের মধ্যেও কি বীভৎসতা আছে, কি নিষ্ঠুরতা আছে। আবার কি দয়া আছে কি ভালবাসা আছে। চক্ষের ওপর দেখলাম কত মানুষ পা পিছলে পড়ে গেল, আর কত লোক তার ওপর দিয়ে তাকে পিশে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকাবার জো নেই এমনি এই সমুদ্রের মধ্যে পড়ে মানুষ চৈতন্য হারিয়ে জড়শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পুণ্যের লোভে এসে প্রাণরক্ষার দায়ে সে কি শক্তি-হীন হয়ে স্রোতের মুখে আপনাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

আর দিকে আবার এই বীভৎস দৃশ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে যাঁরা এই অন্ধ জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে চালাবার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের দেখে আর এক ভাবের উদয় হচ্ছিল। কি তাঁদের দয়া! তাঁরা এই ভালবাসার দায়েই কত না কঠিন হয়ে কত না নিৰ্দ্দয় হয়ে মায়ের কোল হতে ছেলে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে দিচ্ছেন। কত তাড়না করতে হচ্ছে কত তাড়না সহ্য করতে হচ্ছে তবু তাঁদের শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই।

কিন্তু সব চাইতে ভয়ঙ্কর অথচ মহান মনে হয়েছিল এই ভাবটা, যে, এত বিপদে প্রতিপদে নিষ্পেষিত হয়ে যাবার এত ভয় তবু ত' এই পুণ্যলোভীরা থামছে না, ছুটে আসছেই আসছেই। "ঐ নাগারা বেরিয়েছে." "ঐ যে দশনামীদের দল আসছে" "ঐ যে সারদা মঠের পতাকা" এই রকম হাঁকাহাঁকিরও অন্ত নাই, অথচ সামাল 'সামালেরও' অন্ত নাই।

কিন্তু কি দেখছিল তারা? কাকে দেখতে, কোন রাজাধিরাজের অভ্যর্থনার জন্য মরণ তুচ্ছ করে এই বিরাট জন সঙ্ঘের মধ্যে নানাদিক হতে নানা জনস্রোত এসে মিলিত হচ্ছে। কে এঁরা, যাঁদের চরণ ধুলায় লুটাবার জন্য লাহোর হতে তাঞ্জোর সোমনাথ হতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত অংশই এ মহামেলায় জনস্রোত প্রেরণ করেছে? কে এঁরা কৌপীনধারী রাজরাজেশ্বরের দল যাঁদের চরণ ধুলায় আজ অনেক মুকুটধারীর মস্তক লুটাচ্ছে। কে এঁরা দেহধারী দেবতার দল যাঁদের রিক্ততার কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমস্ত বাহুল্য লজ্জায় এঁদের গৈরিকের মতই রক্তবর্ণ!

সমস্ত সাধুদর্শন ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করে আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখন বাবা বল্লেন "এইবার ফেরা যাক," কিন্তু ফেরা যাক বল্লেই কি ফেরা যায়? এই বিপুল জনস্রোত ঠেলে যাবার সাধ্য সম্মিলিত হাজার জন সৈন্যেরও ছিল কিনা সন্দেহ। আমরা ফিরতেও পারলাম না—পুণ্য করতে এসে সমস্ত দেহ মন আত্মা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এবং ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়বার মত হয়ে উঠল। বেশ বুঝতে পারা গেল সমস্ত লোকই অনেকক্ষণ হতে মেলার স্থান হতে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে অথচ এমনি বন্ধন যে আপনার চাপে মানুষ আপনিই একেবারে নিশ্চল। আবার সে যখন চঞ্চল হয়ে উঠছে তখন নিজের ইচ্ছায় নয়, এমন একটা বিরাট কিছুর' ঠেলায় যা নিজেরাই তৈরী করছে অথচ এখন স্বেচ্ছায় তার ভিতর হতে' বাইরে আসবার জো নেই।

ঠিক এমনি সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্য আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না অথচ সেই একটী ঘটনাকে অবলম্বন করে আমার সমস্ত অতীত সমস্ত বর্ত্তমান হয়ত সমস্ত ভবিষ্যৎও একটা অখণ্ডসূত্রে বাঁধা হয়ে গেল। যেন আমার অর্থহীন জীবনের সমস্ত প্রলাপকে একটা অপ্রত্যাশিত অর্থ দেবার জন্য তিনি সেই মুহূর্ত্তে দেখা দিলেন।

কে তিনি? তাত' এখনো জানি না, জানবার অবসর পেলাম কোথায়? তিনি এলেন রইলেন চলে গেলেন, বাস্—একটুকু মাত্র বলতে পারি। আর ত' কিছু জানি না!

কিন্তু কে বলে দেবে তিনি কে? তিনি কি? তিনি কেমন? তিনি কোথায়? ঐ ধীর-মন্থরে দোলায়মান জন সমুদ্র হতে যিনি উঠে এলেন তিনি কে? এই বিশাল প্রাণসাগরের কোন সুদূরে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন? কে তাঁর সেই অনন্ত শয্যায় দোলা দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গালে? তার বিষয়ে কিছুই জানি না—শুধু বিস্ময়ে চেয়ে আছি, আশা করে আছি—তিনি সাগর হতে উঠে এসেছিলেন আবার সাগরেই মিলিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আবার আসবেন, আবার দেখা পাব। পাব না? নিশ্চয় পাব, নৈলে কি আমার এই চির আশা এমনি ভাবে পথের দিকে চেয়ে চেয়েই মরে যাবে? না—না কখ্খন না।

তাঁকে প্রথম দেখলাম অদ্ভুত অবস্থায়। একটী পশ্চিম দেশী স্ত্রীলোককে তিনি দুই হাতে উঁচুতে তুলে যেখানে আমরা আছি ঠিক সেই সেপাই-শান্ত্রীর ব্যূহের মধ্যে এনে ফেল্লেন। মেয়েটীর অবস্থা অতি ভয়ানক—সে একেবারে

উলঙ্গা, তার কোলে একটা মরা ছেলে, লোকের চাপে ছেলেটার পেটের নাড়ী বেরিয়ে গিয়েছে, জিভ বেরিয়ে গিয়েছে। মেয়েটার চোখের অবস্থা যে কি ভয়ঙ্কর তা কেউ অনুমানে আনতে পারবে না। আর যিনি নিয়ে এলেন তাঁর মুখের উপর এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল যা মানুষের নয় হয়ত দেবতারও নয় সে যে কি ভয়ঙ্কর ভাব তা যে এই এত বৎসর পরেও ভুলতে পারছি নে। তিনি এলেন যেন দেবতার ক্রোধের মত হয়ে। তিনি এমন মূর্ত্তিতে এসেছিলেন যা দেখে আমাদের ঐ স্বগুলো চোগোঁপ্পা-ওয়ালা ভোজপুরী পাহালবানগুলো পর্য্যন্ত ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

তিনি মেয়েটাকে আমাদের ব্যূহের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে বল্লেন, "এ কে নাও।" তাঁর সেই গম্ভীর স্বরে মনে হল যেন বাবা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলেন। অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে মা ত একেবারে ভয়ে পিছিয়ে এতটুকু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি কেবল সাহস করে সেই ভয়ঙ্করকে সম্ভাষণ করলাম। তাঁকে যে ভয় করিনি কেন, তা বল্‌তে পারব না, সেই ভয়ঙ্করকেই যে কেন এত সুন্দর দেখেছিলাম তাও বলতে পারিনে। কিন্তু ধন্য ভগবান যে আমায় সে সময় সাহসী করে ছিলে, ধন্য আমার অন্তরের দেবতা যিনি আমায় সেই সময় সেই আমার রুদ্রকে শিব বলে আবাহন করে নেবার শক্তি দিয়েছিলেন। ধন্য আমি। ধন্য আমি।

মেয়েটাকে আমি চাদর দিয়ে ঢেকে নিলাম, সে কিছু বল্ল না। তারপর তার কোল হতে তার ছেলের মৃতদেহটা সরিয়ে নিতাম, কিন্তু প্রাণপণ বলে সে সেই মৃতদেহটা টিপে ধরে রইল। কিছুতেই দিলে না। আমায় মা বারণ করতে এগিয়ে এসে বল্লেন, "এমন সময় মড়া ছুঁয়ো না ঊর্ম্মিলা।" অমনি সেই রুদ্র মূর্ত্তি মায়ের দিকে ফিরে বল্লেন "মড়া! কোথায় মড়া?" বাবা বল্লেন, "ছেলেটা মরে গেছে তাই—" অদ্ভুত মানুষটি আরও রক্তবর্ণ হয়ে বল্লেন, "তোমাদের দ্বিধা হয় সরে যাও—যার দ্বিধা নাই তাকে কেন বাধা দিচ্ছ?" তারপর আমার দিকে তার অদ্ভুত বিশাল চক্ষু দুটো ফিরিয়ে বল্লেন, "তুমি যা করছ কর, কারু কথা শুনো না।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতই আবার মেয়েটার কোল হতে মৃতদেহটা একটু সজোরেই সরিয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু সে হঠাৎ এমন ভীষণ একটা চিৎকার করে উঠল যা ঐ দিগন্তব্যাপী জন-সংঘের কোলাহল ভেদ করে কত দূরে কত উর্দ্ধে উঠেছিল যে তা বলতে পারিনে। আমি আবার পিছিয়ে গেলাম, তখন

সেই অদ্ভুত মানুষটী এগিয়ে এসে সেই মেয়েটীর কাঁধে হাত দিয়ে এমন ভাবে তাঁর চক্ষু দুটো মেয়েটীর মুখের উপর রাখলেন যে মেয়েটীর হাত আস্তে আস্তে অবশ হয়ে এল এবং ক্ষণকাল পরেই তার সন্তানের মর্ত্ত্য অবশেষটুকু আপনি মাটিতে খসে:পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেও কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মাটিতে বসে পড়ল।

তিনি তখন আমার দিকে ফিরে সেই মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন। আমি সেই অশুচি মৃতদেহ তুলে নিলাম। কিন্তু তারপর ফিরে চেয়ে দেখি মায়ের মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। সেই মানুষটিও বোধ হয় তা লক্ষ্য করেছিলেন, তাই হঠাৎ আমার কাছে এসে হাত পেতে বল্লেন "কাজ নাই, দাও, আমি এর ব্যবস্থা করছি। 'তোমরা এইটুকু কর' যে এই হতভাগিনীর ভার নিও। যতদিন না এ সুস্থ হয় ততদিন কাছে রেখো। তারপর যেখানে যেতে চায় পৌছে দিও।" তিনি আমার কোল হতে সেই মৃতদেহটা প্রায় একরকম ছিনিয়ে নিয়ে সন্ন্যাসীদের জন্য যে পথ পুলিস দিয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়ে ছিল সেই পথে গঙ্গার দিকে চলে গেলেন। সেই রাজাধিরাজের গতিতেও কেউ বাধা দিতে পারলে না, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবার কথাও কারু মনে উদয় হল না।

উপাসনা—পৌষ।

বর্ত্তমানের সমস্যা।

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।]

এ যুগটী ওলট পালটের যুগ। এ ওলটপালট যে কোন বাহিরের জগতে স্থূল বিষয়ে চলিয়াছে তা নয়। বন্দুক কামান লইয়া গায়ের জোরে যে ঠেলা ঠেলি মারামারি দাঙ্গা করা চলিয়াছে তা ত সকলে স্পষ্টই চোখের সামনে দেখিতেছেন। কিন্তু মানুষের অন্তরে তার স্বভাবে তার সংস্কারে যে ভাঙ্গন উঠিয়াছে সেইটাই আসল জিনিষ, আর সেইটার দিকেই সর্ব্বসাধারণের নজর আমরা ভাল করিয়া ফিরাইতে চাই। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া যে সব জিনিষ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যাদের সম্বন্ধে মনে করিয়াছি

তাহারা সনাতন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ, ঠিক সেই সব জিনিষই কেমন টলমল করিয়া উঠিয়াছে সে খবরটাই আজকালকার দিনের প্রধান খবর। সমাজের মানুষের একেবারে গোড়া ধরিয়াই টানাটানি পড়িয়াছে, বাহিরের দুই চারিটা ভাসা ভাসা জিনিষ যে ধ্বসিয়া ছিটাইয়া পড়িবে তাতে কোন আশ্চর্য্যই নাই। এখনকার দিনে কোন জিনিষকে, তা মানুষ যতই আপনার বলিয়া বোধ করুক না কেন, তাহা ছাড়িতে মানুষের প্রাণে যতই কষ্ট হউক না কেন, কোন জিনিষকেই তেমন অটুট নিত্য-সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। অতি প্রিয়তম জিনিষের উপরেও বিচারের তীক্ষ্ণ আলোক ফেলিতে হইবে, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে হইবে, তাহার শক্তি কতখানি, সত্য কতখানি। নতুবা প্রাণে সাড়া দেয় না, এই জন্য চোখ বুজিয়া পুরাতন পরিচিতকে আঁকড়িয়া যে ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে বিপদের হাত সে এড়াইতে পারিবে না। কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় সীতাদেবীকেও উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এ ছাড়া আর উপায় নাই।

সভ্য সমাজের অতি পুরাতন ও অতি শ্লাঘ্য একটা সংস্কার হইতেছে বিবাহ। ইউরোপে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠিয়াছে বিবাহ কি এতই প্রয়োজনীয় বরণীয় জিনিষ? এটি ছাড়া মানুষের সভ্যতা, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা কি একেবারেই পচিয়া যায়? এ প্রশ্নে শুধু শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, অবিচলিত চিত্তে আলোচনা করিয়া নির্ভয়ে মীমাংসা করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এ সমস্যার তরঙ্গ এখনও আসে নাই। এখানে তরুণদলে দেখা দিয়াছে এই তরঙ্গেরই অব্যবহিতপূর্ব্ব তরঙ্গটি। বিবাহকে বাদ দিলেও চলে কি না, তাহা নয়, প্রশ্ন হইতেছে স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহ, ভালবাসার পরে বিবাহ আত্মীয়স্বজনের দেওয়া বিবাহ অপেক্ষা ভাল কি না। পুরাতনের দিক হইতে বলা হইয়া থাকে যুবক যুবতীর প্রেমের বিবাহ বাস্তবিক পক্ষে হইতেছে কামের বিবাহ, স্বাধীন ইচ্ছার বিবাহ হইতেছে স্বেচ্ছাচারের বিবাহ। অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান গুরুজনেরা চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, স্বভাবচরিত্র রূপগুণ সব যথাযথ ওজন করিয়া,যে পাত্র ও পাত্রীর মিল করাইয়া দেন তাহাই হইতে পারে,—অন্ততঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহারই হইবার সম্ভাবনা আছে—আদর্শ মিল রাজযোটক। ভালবাসার নামে স্বাধীনভাবে যে মিল সেটা ক্ষণিকের মোহ, দুই দিনেই কাটিয়া যায়, পরে আরম্ভ হয় ঘোরতর অমিল। ইউরোপে যেমন দাম্পত্য কলহ, বিবাহলঙ্ঘন (divorce) দেখা যায়

ভারতে কি তেমন আছে? নূতনের দল বলিবেন, স্বাধীনভাবে যাহা করা যায় তাহারই একটা মূল্য আছে; হউক না কাম, হউক না ক্ষণিকের মোহ কিন্তু সেটা আমার স্বাধীনতার সৃষ্টি। পরাধীনভাবে অন্ধভাবে ঠিক পথে চলা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে ভুল পথে চলাও অনেক ভাল, কারণ এখানে আছে অন্তরাত্মার জাগরণ আর ওখানে অন্তরাত্মার মৃত্যু, এখানে জীবনের চাঞ্চল্য আর ওখানে মরণের শান্তি। তারপর নিজের পাওয়া ও দেওয়া ভালবাসাটা কাম আর পরের হাতে পাওয়া ও লওয়া জিনিষটায় কাম নাই তাই বা কে বলিতে পারে? দুইটি অজানা অচেনা জীবকে যে এক সঙ্গে করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে ত প্রথমে দুইটি শরীরকে, শরীরের স্থূলতম পর্দ্দাকে এক সাথে করিয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রাণের মনের মিল ত সেখানে আদর্শ মাত্র ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, পরস্পরে জানাশুনার ফলে যে দুইটি জীব এক সাথে হইতে চায় সেখানে অন্ততঃ আছে জ্ঞানতরঙ্গের মিল, মনেরও একটা মিল। নতুবা এক সাথে হইতে তাহারা চাহিবে কেন? তারপর দাম্পত্যকলহ—সেটা আমাদের পরিবারে কি এতই দুর্লভ জিনিষ? ইউরোপে সেটা না হয় ফাটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু আমাদের সমাজে সেটা বাহির হইবার পথ না পাইয়া ভিতরে ভিতরে খাইয়া চলিয়াছে, তাহা কি কাহারো চক্ষে পড়ে নাই?

আমাদের দেশে বিবাহটা ব্যক্তিগত জিনিস নয়, ওটি সমাজগত জিনিষ। অর্থাৎ আমি বিবাহ করি আমার জন্য নয়, কিন্তু আমার পরিবারের জন্য, আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য, সমাজের জন্য। এই জন্যই হইয়াছে বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা। বয়সের সাথে সাথে মানুষের স্বাতন্ত্র্যটা বাড়িয়া যায়, তাই আমাদের মধ্যে স্বাধীন মত স্বাধীন ইচ্ছা ফুটিবার আগেই পুরুষ ও মেয়েকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, পরিবারের সমাজের ঢালা স্রোতের মধ্যে পড়িয়া যাহাতে তাদের ধার সব মরিয়া যায়, পৃথক অস্তিত্ব আর না থাকে, পরিবারের সমাজের তাহারা একেবারে অঙ্গীভূত হইয়া যায়। পুরুষের পক্ষে স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ যাহাও বা সম্ভব মেয়ের পক্ষে তাহাও সম্ভব নয়। জ্ঞান হইবার আগেই মেয়েকে পাত্রস্থ করিতে হয়, শ্বশুরঘরে তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ার করিয়া লইবার জন্য। বড় হইলে স্বাতন্ত্র্য জন্মে, স্বাতন্ত্র্য জন্মিলে ইচ্ছামত আর গড়া-পেটা চলে না। নিজের নিজের ইচ্ছায় যদি প্রত্যেকে চলে তবে যে যা খুসী তাই করিতে পারে, ইহাতে আসে সমাজে বিশৃঙ্খলতা। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা সুব্যবস্থা রাখিবার জন্য সমাজই আমার হইয়া আমার জীবনের সাথীটিকে পছন্দ করিয়া দেয়

কন্যাপক্ষ বরের দেখেন বিত্তাধন, বরপক্ষ কন্যার দেখেন রূপ গুণ—কিন্তু কুলশীল স্বভাব চরিত্র এ সকলের সাথে হৃদয়ের অন্তরাত্মার মিলের সম্বন্ধ কি ? ব্যক্তির নিজের প্রেরণা সমাজের সুবিধার কাছে, না হয় সমাজের মঙ্গলের কাছেই হইল, তাই বা বলি দিবে এ কোন কথা ? সমাজ বড না ব্যক্তি বড় ? ব্যক্তিকে খর্ব্ব করিয়াই কি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ? উভয়ের সামঞ্জস্য নাই ? ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ, ব্যষ্টির দাবি কি, দায়িত্ব কি, আর সমষ্টিরই বা দাবি কি দায়িত্ব কি—এই গোড়ার তত্ত্ব লইয়া গোলমাল, ইহাও আজ কালকার যুগের একটা মস্ত সমস্যা। আমরা তত্ত্বের মধ্যে যাইব না তবে প্রকারান্তরে এক রকম ইহারই একটা উদাহরণের কথা বলিব। কথাটা সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ।

আজ কালকার সমাজ পুরুষের সমাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজে নারীর স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান নাই, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই পুরুষের সেবায়, পুরুষের সুখ সুবিধা-উপকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়োজিত। সমাজে স্বাধীন সজীব জীব যদি কেউ থাকে তবে সে পুরুষ, নারী যেন পুরুষের জড় ধনসম্পত্তির অন্তর্গত। ব্যবস্থাই আছে, বাল্যকালে মেয়েরা পিতার জিনিষ, যৌবনকালে পতির জিনিষ, আর বৃদ্ধকালে পুত্রের জিনিষ। অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্। পাশ্চাত্যের দার্শনিকপ্রবর দেকার্ত Descartes ইতরজীবদের অন্তরাত্মা (soul) আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না , আমাদের মনে হয় স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ও আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপকদেরও যেন সেই মতই ছিল। মেয়েদের শিক্ষার যে কোনই বন্দোবস্ত ছিল না বা তাহাদিগকে কেবলই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হইত এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। কিন্তু সে সব যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় তা যেন অনেকটা দয়ার দান ; মেয়েদের নিজেদের দাবির জোরে নয়। উত্তরে বলা যাইতে পারে, মেয়েরা যে স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয় তার কারণ তাদের স্বভাব। নারীর স্বভাবই হইতেছে পুরুষের আশ্রয়ে পুরুষকে ধরিয়া চলা, তাহারা হইতেছে অবলা জাতি (weaker sex) কাহাকেও না ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে না, আর তাদের স্বভাবের মধ্যে অনেক খারাপ জিনিষ আছে, পুরুষ যদি তার রাশ টানিয়া না ধরে তবে সহজেই বিগড়াইয়া যায়। দ্বিতীয় কথা, স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য হইলেও নারীকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নয়, সমাজের কল্যাণ কল্পে। কারণ মেয়েরা হইতেছে ঘরের লক্ষ্মী তাদেকে কেন্দ্র করিয়া

পরিবারের সমাজের দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। মূলে, ঘরে কেন্দ্রে যদি স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়, মেয়েরা যদি স্বৈরচারিনী হয় তবে পরিবার বলিয়া কিছু থাকে না, সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। পুরুষের পক্ষে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য, স্বেচ্ছাচার, এমন কি উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক সহ্য করা যায় - তাতে সমাজের বিশেষ কিছু আসে যায় না—পুরুষের কারবার যে বাহিরের জগৎ লইয়া, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিলে যে সমাজের ভিতরে প্রাণের মধ্যে মিলন গ্রন্থীতে একেবার ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করে। এখন প্রশ্ন, মেয়েরা যে স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয়, বা হইতে পারে নাই সেটা বাস্তবিক পক্ষে তার জন্মগত স্বভাবের দোষের ফল না শুধু সংস্কারের অভ্যাসের ফল? একটা বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া, একটা বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার ফলে নারীর স্বভাব স্বধর্ম্ম এই রকম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এইটিই তার সনাতন ধর্ম্ম—এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ—তাই কে বলিতে পারে? অন্য রকম ব্যবস্থা অন্য রকম শিক্ষাদীক্ষার ফলে নারীর ধর্ম্ম কর্ম্ম অন্য রকমও হইতে পারে না? আর তা যদি সম্ভব হয় তবে, নারীর স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্য দিয়াই সমাজ বা পরিবার আর এক রকম ব্যবস্থায় সুব্যবস্থাতেই গড়িয়া উঠিতে পারে না? কিন্তু বাস্তবিক যদি ফলে কোন সুব্যবস্থা নাই হয়, তবুও জিজ্ঞাসা করা যায় সমাজের কি অধিকার আছে যে একটা বিশেষ অঙ্গের উপর সে অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে? পাছে উচ্ছৃঙ্খল হয় বলিয়া স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যটুকু হইতে নারী বর্জ্জিত হইবে কেন? সমাজের মধ্যে আছি বলিয়া, নারী হইয়াছি বলিয়া কি নিজের ইচ্ছা জিনিষটিকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে? সমাজের একটি অঙ্গকে এই রকম নির্বীর্য্য মরণাহত করিয়া রাখিলে সমাজে সুশৃঙ্খলা পাইতে পার, শান্তি পাইতে পার কিন্তু জীবন পাইবে, পুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে?

এখানে কথা উঠিবে, নারীকে তবে দাও সেই রকম শিক্ষা, সেই রকম দীক্ষা—শুধু স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য বলিয়া চীৎকার করিলে হইবে না, আর সেই জন্যই প্রাচীন ব্যবস্থাকারও বলিয়া গিয়াছেন পুত্রের মত কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। নূতন আর আমরা কি বলিলাম? নূতন জিনিস এই প্রাচীন শিক্ষা মেয়েদের দাসত্ব জিনিষটাকেই ভাল করিয়া সুচারুরূপে করিতে শিখাইত, কেবল এই দাসত্বকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করা হইত বড় বড় কথা দিয়া যথা সেবা, আত্মোৎসর্গ, বিনয়, লজ্জা। কিন্তু নূতন শিক্ষার লক্ষ্যই হইবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা, নিজেকে জানা, স্বাধীনভাবে নিজের

ভিতরের ভগবানকে ফুটিয়া উঠিতে দেওয়া। শিক্ষা আগে পরে স্বাধীনতা, একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য হইতেছে, আগে স্বাধীনতা, পরে শিক্ষা। স্বাধীনতার ভিতর দিয়া জীবন্ত শিক্ষা ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু অপর পক্ষ বলিতে পারে, নারীর অবস্থা যে সমাজে এ রকম হইয়াছে, সে যে স্থান পাইয়াছে, যে ধর্ম্মকর্ম্ম অনুসরণ করিতেছে, এটা কি শুধুই বাহির হইতে আরোপ, শুধুই পুরুষের কারসাজি? সমাজ যুক্তি করিয়া কোন্ দিন এ রকম অত্যাচার আরম্ভ করিল? বলা যায় না কি, নারীর এ রকম ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অনুমতি ছিল, কেবল অনুমতি নয়, এইটির মধ্যেই ছিল তার স্বভাবের আনন্দ, নতুবা এ রকম ব্যবস্থা আদৌ উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া, দেশে দেশে যুগে যুগে ঠিক এই একই ব্যবস্থা এ যাবৎ চলিয়া আসিল কেমন করিয়া? একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শুধু মায়া শুধু মিথ্যা শুধু জুয়াচুরির উপরই এত বড় জিনিষটা গড়িয়া উঠিয়াছে? পুরুষ যেমন স্বাধীন স্বতন্ত্র হইতে চায়, আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে ব্যগ্র, নারীও কি ঠিক তেমনি চায়? এ চাওয়াটা যদি নারীর সত্য হইত তবে তাহা কি সমাজে, সমাজের ব্যবস্থায় ফুটিয়া উঠিত না? সমাজটা পুরুষের সমাজ হইল কেন? নারী পুরুষের ছায়া হইয়া থাকিতেই চায়, অধীন হওয়াটাই নারীর স্বাধীন ইচ্ছা, এই জন্যই কি নয়?

আমাদের মনে হয় আসল সত্যটা এই রকমের। প্রাচীন কালে এক সময়ে সমাজের গতি অনুসারে একটা আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল—যুগধর্ম্মের বশে পুরুষ ও নারী উভয়েই এক একটা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন সার্থকতা পাইয়াছিল, সমাজকে একটা বিশেষ বিধি ব্যবস্থা দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। সীতা সাবিত্রীর যুগে নারী আপন ব্যক্তিত্বকে স্বেচ্ছায় পুরুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিল, তাহার অন্তরাত্মা আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, পুরুষের অন্তরাত্মাকেই উপচিত করিয়া চলিত। নারী ছিল দাতা পুরুষ ছিল গ্রহীতা। পুরুষ ছাড়া আপনার ভিন্ন অস্তিত্ব নারী উপলব্ধি করে নাই, করিতে চাহে নাই, তার কোন প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। সেইটাই সেই যুগের ছিল ধর্ম্ম। কেন এই রকম ধর্ম্ম হইল, সমাজের বিবর্ত্তনের কি রকম স্তরে অথবা মানবাত্মার কোন প্রেরণাকে কোন সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য, সে কূট সমস্যা আমরা আলোচনা করিব না। শুধু বলিব, তখনকার দিনে পুরুষের ও নারীর সম্বন্ধ ছিল তাহাদেরই ভিতরের একটা জীবন্ত আদর্শ, একটা

সত্য ধর্ম্মের ফল, সমাজের ব্যবস্থাও দিল সেইটিকেই ফলাইয়া ধরিবার জন্ত সজীব কাঠাম। পরে কিন্তু সে আদর্শ সে ধর্ম্ম লোপ পাইতে লাগিল, সমাজের ব্যবস্থাটা কিন্তু তেমনি অটুট রহিল, শুধু তা'ই নয়, অপ্রমান আদর্শটিকে ধর্ম্মটিকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সে ব্যবস্থাকে আরও বিশদ করিয়া খুঁটি নাটিতে ভরিয়া কঠোর করিয়া তোলা হইতে লাগিল। প্রথমে যে সম্বন্ধটা ছিল সহজ ও আনন্দপূর্ণ, পরে তাহা হইল শুধু অভ্যাসের, কর্ত্তব্যের। প্রথমে নারী যে জিনিষটা দিত স্বেচ্ছায় সানন্দে, পুরুষও লইত পূজার দান রূপে, পরে পুরুষ লইতে আরম্ভ করিল দাবিরূপে, নারীও দিতে আরম্ভ করিল অজ্ঞানের সংস্কারের বশে। কেন এ রকম হইল সে প্রশ্ন তুলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এ জিনিষটি যে স্বাস্থ্যকর নয়, পুরুষ ও নারীর জন্য, সমাজের জন্য যে ইহার পরিবর্ত্তন চাই শুধু তাই নয় আর একটা সত্য আর একটা ধর্ম্ম আর একটা আদর্শ যে এই পুরাতন জীর্ণ কাঠাম ভাঙ্গিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাই আমাদের বুঝিবার দেখিবার জিনিষ।

সেটা হইতেছে পুরুষের ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন, সেই সঙ্গে নারীরও ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন। পুরুষের ছায়া মাত্র হইয়া নারী যে সত্যকে পরিপূর্ণ করিয়াছে, তাহা অতীতের কথা। ভবিষ্যতের কথা, নারী পাইবে আপনার কায়া, ফেলিবে আপনার ছায়া। পুরুষের সম্পর্ক ছাড়াও নারীর যে আছে একটা নিজস্ব সত্য—নাই কি ? –তার পরিস্ফুরণ বর্ত্তমান যুগের একটা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাজকে পূরণ করিতে হইবে, পুরুষকেও সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। প্রাচীন ব্যবস্থা উল্টাইতে গেলে সমাজে একটা বিষম গোলমাল হইবে, ওলট পালট ভাঙ্গাচুরা হইয়া যাইবে, পুরুষ তার সনাতন অনেক সুখের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে—এ সব কারণ দেখাইয়া শান্তি স্বস্তিকে চরম আদর্শ করিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না, সম্ভবপরও হইবে না।

শ্রীচৈতন্য ও হরিদাস

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে
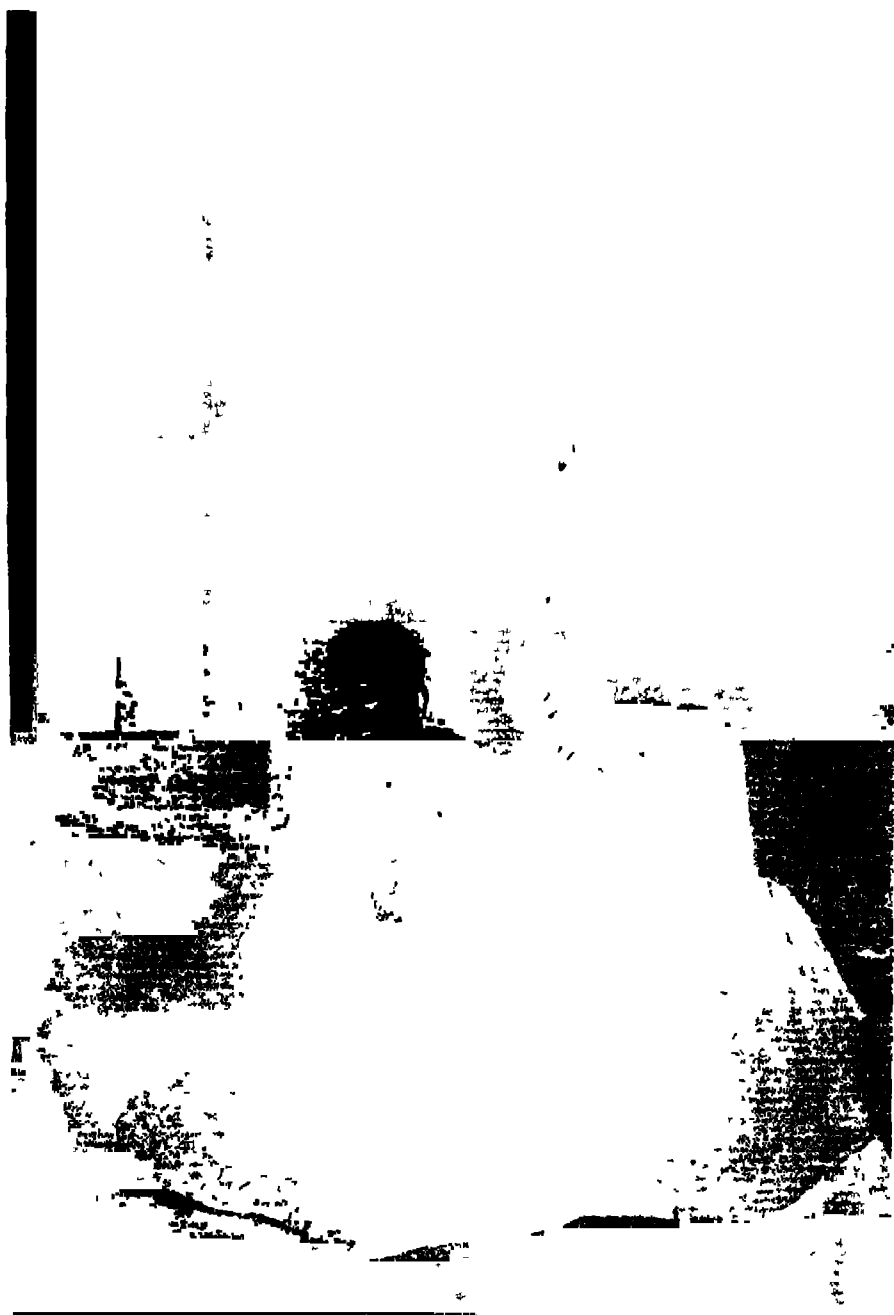
নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]   [চৈত্র, ১৩২৭ সাল।

টেঙ্

(দরবেশ)

ওরে মন, ওরে আমার
আপ্‌না-ভোলা মন,
আর কতকাল কঠিন ভূঁয়ে
কর্‌বে বিচরণ ?
উচু নীচু পথের মাঝে
চল্‌তে গিয়ে ব্যথা বাজে,
কাঁটার ঘায়ে ছিন্ন পায়ে
রক্ত বরিষণ।

এইবারে তুই আস্‌মানেতে
বেঁধে নিয়ে টঙ্,
চুপটি করে' দেখ্‌না বসে'
দুনিয়ার কি ঢঙ্।
আকাশ হতে যাবে দেখা
মিলিয়ে যাওয়া সীমার রেখা,
সকল অধীন্ হয়ে অসীম
কর্‌বে আলিঙ্গন।

দ্বিদল কমল।

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।]

এক রাজা ছিলেন, সেই রাজার দুয়ো সুয়ো কুয়ো প্রভৃতি ক'টা যে রাণী ছিলেন জানি না, কিন্তু একটা যে পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। কারণ এই গল্পটা (গল্প নয়) তারই বিষয়ে লিখিত। এবং যা লিখিত তা নিশ্চয়ই শ্রুত। আবার যা শ্রুতি তা নিশ্চয় ধ্রুব সত্য। অতএব প্রমাণ হল যে এক রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। এ প্রমাণ যে অগ্রাহ্য করবে শ্রুতিকে বিশ্বাস না করার দরুণ এই আর্য্যের দেশ আর্য্যাবর্ত্তে তার স্থান নেই;—সে হয় কিষ্কিন্ধ্যায় যাক, না হয় সাগর ডিঙিয়ে মরুক গে।

এখন, সেই রাজকন্যাটী যখন পরমাসুন্দরী তখন কাজে কাজেই সেই মেয়ের উপযুক্ত বর জোটান দায় হয়ে উঠ্‌ল—বাপের পক্ষে হোক্ না হোক্ গল্প লেখকের পক্ষে ত বটেই। কত দেশের কত রাজপুত্র এসে ঘুরে গেল, কত মন্ত্রি-পুত্র, কোটালের পুত্র, সদাগরের পুত্র, এসে কত ষড়যন্ত্র করে গেল। কত রাক্ষস খোক্কস্ বেঙ্গমা বেঙ্গমী কত পক্ষিরাজ ঘোড়া আর তালপত্র খাঁড়া রাজকন্যার দরজায় এসে ডিগবাজী খেলে, কিন্তু সেখানে প্রবেশ করতেই পারলে না।

কেন? ঐ ত তোমাদের দোষ। 'কেন', জিজ্ঞাসা কর কেন বাপু—যারা 'কেন' জিজ্ঞাসা করে তারা গল্প শুনবার উপযুক্তই নয়। যারা গল্প শুনতে 'কেন', জিজ্ঞাসা করবে তাদের সব কলেজে পাঠিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে ক্রমাগত কেন কেন করুক গে।

যা হোক, রাজকন্যার বর ত আর জোটে না। কেন? আবার 'কেন'? দূর হোক, বাপু, তবে উত্তরই দিই,—কিন্তু খবরদার আর কাউকে বল না। শোনো, কাণে কাণে বলি—মেয়েটী একটা স্বপ্ন দেখেছিল।

হাসছ? ভাবছ এই বুঝি একটা ভারী গোপন কথা! স্বপ্ন ত সবাই দেখে, তা আবার এত কাণে কাণে বলতে হবে নাকি?

ওহে তোমরা ছেলে মানুষ, জান না, এ এমন দেশ যেখানে এ সব কথা কাণে কাণে বল্‌তে হয়, নইলে সব বিফল হয়। মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড় ফুক্ সমস্তই কাণে কাণে বল্‌তে হয়, নইলে কুকুর বেড়াল শুনতে পেলেও যে, সব বেফাঁস হয়ে

যায়। যদি বলবার দরকার হয় 'ফুস্‌টী আর ফাস্‌টী ধানটীর মধ্যে তুষটী' তবু কাণে কাণে বলতে হবে, নইলে সব মাটী। স্বপ্ন যে ফলবে না, বুঝছ না?

শোনো না, মেয়েটী একটী স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু এমন স্বপ্ন, যার জন্ত ঐ অত বড় রাজার অত বড় রাজ্যটার ইয়া ইয়া টীকী থেকে আরম্ভ করে ধান গাছের শীষ, নৌকার হাল, বলদের ল্যাজ সমস্তই নড়ে উঠেছিল। কিন্তু কি স্বপ্ন বল দেখি?

পারলে না? পারবে কেন? একি যে সে স্বপ্ন? একি যার তার দেখা স্বপ্ন? এ যে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যার পরম সুন্দর মগজে হঠাৎ দেখা দিয়েছিল। তোমাদের মগজে তা ধরা দেবে কেন?

তবে বলি শোনো, রাজকন্যা স্বপ্ন দেখলে,—একটী অদ্ভুত পদ্ম অসম্ভব জলে ভাসতে ভাসতে অকারণে তাঁর বুকে এসে ঠেকল। রাজকন্যা পদ্মটী হাতে নিয়ে দেখে তার মোটে দু'টী পাপড়ী। সোণার বরণ পাপড়ী দু'টীর মধ্যিখানে একটী মাত্র অপরূপ কেশর ঊর্দ্ধদিকে উঠেছে। আর পদ্মটীর এমনি গুণ যে পদ্মটী হাতে নেবা মাত্র রাজ কন্যা যেন অজ্ঞান হয়ে গিয়ে সেই পদ্মটীর মধ্যে মিলিয়ে গেল। তার পর সেই কেশরটীর মধ্য দিয়ে কোথায় যে কোন অলোকপথে চলে গেল, সে কথা আর জেগে উঠে সে মনেই করতে পারলে না।

তার পর, জেগে উঠে, এই যে কান্না জুড়ে দিলে তাব আর বিরাম নেই। বালিস ভিজল, বিছানা ভিজল, এমন কি শেষে তার মা বাপের মনও ভিজে পাঁক হয়ে গেল। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন, মেয়ের এই স্বপ্নলব্ধ দুই পাঁপড়ীর পদ্ম যে এনে দেবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন—অবশ্য অর্দ্ধেক রাজত্ব ও যৌতুক আছেই।

এখন বল দেখি তোমরা সেই দুই পাপড়ীর পদ্ম কোথাও দেখেছ? এতক্ষণ যে হাসছিলে, হাস দেখি এইবার? চালাকী!—একি যে সে স্বপ্ন?

যাক আর ভেবে কাজ নেই, কারণ ভেবে কোনো ফল নেই। এতো আর ইস্কুল কলেজ ছাড়া নয় যে এক কথায় ঝুলি ঘাড়ে করে বেরিয়ে নন-কো-অপারেসনের সব মীমাংসা সমাধান করে ফেলবে? বাপু, এ হচ্ছে দ্বিদল পদ্ম, এবং এক রাজকন্যার মগজে গজিয়ে উঠেছে। একে কি সহজে পাওয়া যায়?

একে সহজে পাওয়া যায় না, তাই সেই রাজার রাজ্যের মন্ত্রী হতে যন্ত্রী, সরকার হতে কর্ম্মকার সকলের মাথা গরম হয়ে উঠল, কিন্তু এর সন্ধান কেউ

নির্ণয় করতে পারলেনা। সারা রাজ্য ভরে একটা সন্দেহ একটা তর্ক একটা ভয়ের ঢেউ উঠলো—কিন্তু পদ্মটা কেউ মেলাতে পারলে না।

তখন রাজপুত্রেরা বেরিয়ে গেলেন পক্ষিরাজে চড়ে, মন্ত্রি-পুত্রেরা বসে গেলেন বহু বাক্স-বস্ত পেড়ে, সদাগরের পুত্রেরা ভাসলেন ময়ূরপংক্ষী সাজিয়ে, আর কোটালের পুত্রটা তালঠুকতে লাগলেন তালপত্র খাঁড়া ঘষিয়ে মাজিয়ে। কত হাত চালান, নল চালান, কত উর্দ্ধঃপাতন, তির্য্যক পাতন, কত দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ, কিছুতেই সেই দ্বিদল পদ্মটার আর খবর মেলেনা। কত রত্ন দ্বীপ মণিদ্বীপের খবর মিলল, মণি রত্নে রাজার ভাণ্ডার ভরে উঠল কিন্তু যার জন্যে সব বিফল সেইটাই মিললনা—তাই রাজকন্যার চোখের জল আর থামল না। কত রাজপুত্র কত সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, কত সোণার পাহাড় মুক্তোর ঝরণা রূপোর নদীর খবর নিয়ে এল, কিন্তু স্বপ্নের ফুলটী স্বপ্নতেই থেকে গেল। কত রাক্ষস খোক্কস গন্ধর্ব্ব কিন্নরের খবর নিয়ে রাজকন্যার কাছে তারা এল কিন্তু রাজকন্যার চক্ষুদুটী জলে ভরেই রইল, কারু সঙ্গে চার চক্ষে আর মিলনই হল না। কত সদাগরের পুত্র পদ্ম মহাপদ্ম খর্ব্ব নিখর্ব্বের খবর দিলে, কিন্তু রাজকন্যা মুখই তুলে চাইলে না। কত মন্ত্রি-পুত্রেরা চতুর্দ্দল অষ্টদল সহস্রদলের বড় বড় শ্লোক শুনিয়ে গেল কিন্তু সেই পদ্মপত্রাক্ষীর নয়নপদ্মের দৃষ্টি কোন্ দুটী সোনার দলের আশায় যে মুদিত হয়ে রইল তা কেউ বলতেই পারলেনা। কোটালের পুত্ররা খাঁডা ঢাল ঝাকালে 'ইয়া করেঙ্গা' 'উয়া করেঙ্গা' 'মারেঙ্গা' 'কাটেঙ্গা' 'কুকুর মেরে ফাঁসী যাঙ্গা' করলে কিন্তু স্বপ্নের পদ্ম স্বপ্নের অলোকেই রয়ে গেল। সে বুঝি আর বাইরে ধরা দেয় না! হায় হায় কি হবে? কে রাজকন্যার সেই স্বপ্নের ধন এনে দিয়ে রাজ্যরক্ষা করবে? সেই অরুণ রাঙ্গা দ্বিদল কমলে একটী কেশর কে দেখাবি গো, কে দেখাবি?

রাজ্য ভরে এই শব্দ 'কে দেখাবি গো—কে আছিস।' সমস্ত রাজ্য মাথা নীচু করে বল্লে, কেউ না। লজ্জায় উত্তর হতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সমস্ত দেশের আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত রাঙ্গা হয়ে উঠল। এ দারুণ লজ্জা হতে কেউ কি এদের রক্ষা করতে পারবে না?

হেন কালে এক রাখাল এসে হাজির হল। শুনে হাসছ? হাসগে—রাখাল কিন্তু এল। সে চরাচ্ছিল গরু—তার গায়ে ছিল একটা উড়ুনি, পরনে ছিল ধড়া, হাতে ছিল একটা বাঁশের বাঁশী। সে ছিল মাঠে—তার মুখে পড়ে ছিল

প্রভাত সূর্য্যের আলো, তার বুকে এসে লেগেছিল দূরদূরান্তের হাওয়া। আর কাণে এসে বেজেছিল একটা শব্দ—তার বাঁশীর তাইরে নারের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠেছিল একটা শব্দ—আয়রে আয়। তাই সে এসেছে।

সে রাখাল, তাই সে অমনি ছুটে এসেছে, কোনো দ্বিধা করে নি—কোনো বাধা মানেনি। কোনো শাস্ত্র শস্ত্র যন্ত্র তন্ত্রের পরামর্শ নেয়নি। সে তার মাঠের হাওয়ার মত আলোর মত গানের মত স্বাধীন, তাই সে এসেছে। সে রাখাল তাই রাজার সিংদরজার বাধা সে মানলে না, সিপাই সাস্ত্রীদের দিকে সে চাইলে না, মন্ত্রী যন্ত্রীর শ্লোক সে শুনলে না—একেবারে রাজবাড়ীর সাত মহল সাত দরজা পার হয়ে ধ্রুে রাজকন্যার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বলে 'আমি এনিছি গো এনিছি, পদ্মের খবর এনিছি।

রাজকন্যা মুখ তুলে চাইলে, অমনি চার চক্ষে মিলে গেল— জল মুছে রাজকন্যা হেসে বল্লে, 'ও গো বীর এসেছ॥ এনেছ? কৈ দাও? কৈ আমার দ্বিদল কমল?'

রাখাল বল্লে—'একটী দল তুমি আর একটী দল আমি—তোমার আমাব এই সত্যিকার মিলন হতে যে ইচ্ছা কেশর—একটী মাত্র ইচ্ছা কেশর দেখা দিল সেই ইচ্ছেকে ধবে কোন্ লোকে যে আমরা যাব তাত' কাউকে বলব না।'

আমার কথাটী—এঁ্যা ফুরল না? আরো আছে নাকি? আচ্ছা তবে কি আছে তা তোমরাই বল? নটে গাছ মুড়ুল তবু আমাব কথা ফুরুবে না? তবে নাই ফুরোক, তবে যেন নাই ফুরোয়। তবে যেন এমন কবে সাহস করে বীরের মত বনের রাখাল আমার রাজকন্যার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে "আমি এসেছি গো এসেছি। আমি তোমায় ভাল বেসিছি সত্যি ভাল বেসেছি।" আর সেই সত্যলোকের মানুষটীর কথায় যেন আমার রাজকন্যার দ্বিদল কমল ফুটে ওঠে। যেন সেই মন কমলের ইচ্ছে কেশর হেলে দু'ল বেড়ে উঠে এ লোক হতে আলোক পথে আমার রাজকন্যাকে আলোকপানে নিয়ে যায়। ওগো তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমার রাজকুমারী যেন সেই রাখালকে পায় গো পায় যার প্রেমের বাঁশীর পাচন ছুইয়ে দিতেই লোহার কপাট খুলে যায়, পাথরের দেয়াল পড়ে যায়, বাহির ভেতর এক হয়ে যায়, পাখী গায়, ফুল ফোটে, হাওয়া বয়, হাসি ছোটে, আনন্দে ভর পুর হয়ে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম গেয়ে ওঠে মেতে ওঠে।

বাস্, আমার কথাটীও ফুরুল না, নটে গাছটীও মুড়ুল না, হল ত?

পেটের দায়।

[শ্রীকালিদাস রায়।]

বলেছিলাম 'তোমার ছেলে অকলঙ্ক সোনার চাঁদ',
মিথ্যেকথা। গোবর-গণেশ, আহা কিবা রূপের ছাঁদ।
বলেছিলাম মেয়েগুলি লক্ষ্মী যেন, সত্য নয়,
রক্ষাকালীর বাচ্ছা তারা,—ঠিক তাহাদের পরিচয়।
রূপে তুমি মদন-মোহন বলেছিলাম কতবার,
সত্য তুমি যমের বাহন এমনি তুমি কদাকার,
আয়নাতে মুখ দেখলে পরে থাকবে না সন্দেহ তায়
সে সব কথা বলেছিলাম কেন জান? পেটের দায়।

বলেছিলাম পুণ্যে যেন স্বয়ং তুমি যুধিষ্ঠির
জনক রাজার মতন তুমি মহাপুরুষ ধর্ম্মবীর,
মিথ্যা কথা। তুমি একটি ভীষণ রকম পাষণ্ড
অত্যাচারী দুশ্চরিত্র ভোগগর্দ্দভ বা ষণ্ড।
বলেছিলাম দাতা তুমি বলির মতন গুণধাম
আরে রামঃ। সকাল বেলায় কেউ করে না তোমার নাম।
তোমার বাড়ী হতে দেখি পিঁপড়ে গুলোও কেঁদে যায়
সে সব কথা বলে ছিলাম কেন জান? পেটের দায়।

বলেছিলাম জ্ঞানী তুমি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ
তুমি গেলে পূরণ করতে পারবে না কেউ তোমার পদ।
মিথ্যে সবি। তোমার মতন মূর্খ নাইক দুনিয়ায়
অকাল কুষ্মাণ্ড তুমি গর্ভস্রাবও বলা যায়।
গিন্নী তোমার অন্নপূর্ণা? নেইক এতে সত্য লেশ,
গয়নাতে গা সন্দেশে পেট ভরতে তিনি পারেন বেশ,
লক্ষ্মীর হাতে আঢি কিনা একটী মুঠোও কেউ না পায়,
তবে যে সব বলেছিলাম, সেটা কেবল পেটের দায়!

বলেছিলাম তোমায় আমি আভিজাত্যে পুরন্দর
সমাজপতি মহাকুলীন মহাকুলের ধুরন্ধর।
আরে রামঃ! তোমার বাড়ী পা ধুলে বা পাতলে পাত
নেহাৎ যে জন অনাচারী থাকে নাক তারো জাত।
তবে যে ঐ পোলাও খেতাম করে আমার মাথা হেঁট
সে এই 'দগ্ধোদরস্বার্থে' অর্থাৎ ভরতে পোড়া পেট।
অনেক মিথ্যে বলিয়াছি তৈল ঢালি তোমার পায়
কেন বলেছিলাম জান? শুদ্ধ কেবল পেটের দায়।

জড় বিজ্ঞান ও জীবাত্মা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

মিডিয়ম দেহে ভরপ্রাপ্ত অদৃশ্য চৈতন্যসত্তার এই লিখন ভাষণ কাজ ছাড়া আরো দু এক শ্রেণীর অলৌকিক ঘটনা আছে যা হইতে প্রেত অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। (ক) মৃত্যুকালে বা পরেই মৃতের কোন কোন প্রেতরূপ দূরস্থ আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে দেখা দেয়। এমন কিম্বদন্তী সব দেশে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সভা এমন সব অনেক দৃষ্টান্ত সাক্ষপ্রমাণ যোগে সত্য বলিয়া বুঝিয়া লিপিজাত করিয়াছেন। এই যে মৃতের প্রেত দর্শন ইহা দ্রষ্টার ভ্রমজনিত মায়াদর্শন না সত্যই মৃতের প্রেতমূর্ত্তির বাস্তবদর্শন? ব্যক্তির মৃত্যু ও প্রেতদর্শন এই দুই ঘটনায় কি কোনো কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে? না কাক ওড়া ও তালপড়ার মত দৈবঘটিত সময় মিল? পণ্ডিতরা হাজার হাজার সত্য দৃষ্টান্ত লইয়া probabilityর অঙ্ক কসিয়া দেখিয়াছেন দৈবমিল নয়। তবে কি কার্য্য কারণ মিল?—মৃতের আত্মা দেহমুক্ত হইয়া প্রিয়জনকে দেখা দিয়া গেল। এই সিদ্ধান্তই সমীচীন, সঙ্গত ও বিজ্ঞান অনুমোদিত। এসম্বন্ধে সভার বিচক্ষণদের মত তাই অর্থাৎ মৃতের আত্মাকেই দ্রষ্টা দেখে। তবে এই দর্শন বাস্তবরূপের না মায়াবী রূপের তা লইয়া মতভেদ আছে।

(খ) বাড়ী বিশেষে ভৌতিক উৎপাত। সভা এ শ্রেণীর কতকগুলি ঘটনা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভৌতিক উৎপাত মিথ্যা জনরব বা অজ্ঞানীর কুসংস্কার নহে। **ভৌতিক উৎপাত** গবেষণা করিবার ভার যে শাখা সমিতির উপর পড়ে বিদুষী মিসেস্ সেজউইক (দার্শনিক পত্নী) উহার সভাপতি। তিনি সব সভ্য অপেক্ষা ঘোরতর সন্দেহবাদী—অন্য কোনো ব্যাখ্যার তিলমাত্র পথান্তর থাকিলে তিনি প্রেতবাদ গ্রাহ্য করেন না। তিনিও বলেন—সমস্ত ঘটনা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া আমার মনে হয় আপাততঃ বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য যে ভৌতিক উৎপাত সত্য এবং ভুতুড়ে বাড়ীর অস্তিত্ব প্রামাণিক (S. P. R. proceedings V. I, III page 142).

(গ) প্রেত কর্ত্তৃক জড় দ্রব্যের চলাচল, আবির্ভাব, তিরোভাব। - বিখ্যাত মিডিয়ম হোমস্‌কে লইয়া বিলাতে বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধর W. Cookes, Sir A. R. Wallace প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ও গণ্য মান্য বিশ্বাসী লোক যে সব অদ্ভুত পরীক্ষা করেন তাহাতে চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে এ সব ব্যাপার সত্যই ঘটে ও ঘটিয়াছিল।

কয়েক বৎসর আগে ইংলণ্ডের বিখ্যাত স্বনামধন্য পদার্থ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Lord Rayleigh প্রেততত্ত্ব সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ করেন তাহা পড়িলে পাঠক দেখিবেন এই জাতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক ঘটনা তিনি কিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন এবং কি মত দিয়াছিলেন।

Richet, Lodge, Lombroso, Morsalli, Wallace, Crookes, De' Morgan প্রভৃতি সন্দেহবাদী জড় বৈজ্ঞানিকরা সরল প্রাণে সজোরে বলিতেছেন 'এই সব অতিপ্রাকৃত ঘটনা সত্য—তবে এদের প্রাকৃত কারণ কি কি নিয়মে ঘটিতেছে তাহার কোনো আন্দাজই আমাদের জ্ঞানের ধারণাতীত! তবে ঘটনা অত্যন্ত সত্য —এতে কাহারো দ্বিমত নাই।'

নানাজাতীয় এইরূপ সাক্ষ্য ও প্রমাণ সত্ত্বেও—পণ্ডিতদের মধ্যে দুইটী দল দুই ভিন্ন মতবাদ দিয়া অলৌকিকের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

এক দল বলেন—প্রেতবাদই প্রকৃষ্ট ও সন্তোষকর কারণ ব্যাখ্যা। যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ঘটনা সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত হয় দেহাতিরিক্ত সজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব মানিলে। এবং সমস্ত ঘটনাতেই এমনি দেহমুক্ত আত্মার সজ্ঞান কাজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় দল প্রেতবাদ সঙ্গততর মত মানিলেও বলেন যদি মিডিয়মের সুপ্ত চৈতন্য দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে আর প্রেতবাদে যাওয়া কেন? ইহাদের যুক্তি এই—অতীন্দ্রিয় উপায়ে এক চিত্ত অন্য চিত্তের ভাব জানিতে পারে, অন্য চিত্তে ইচ্ছামত ভাব জাগাইতে পারে। জীবিত মানব-চৈতন্যের এ শক্তি পরীক্ষা-প্রমাণিত সত্যতত্ত্ব, তার পর জীবিত মানব চৈতন্যের আর একটা ধর্ম আছে—উহার সমগ্র-অংশের মাত্র একটু ভগ্নাংশ আমাদের মস্তিষ্ক যোগে প্রকাশমান, বাকীটা সুপ্ত বা অব্যক্ত, এই অব্যক্ত-চৈতন্য (Subliminal Self) অসীম শক্তি ও সম্পদশালী। দেশকাল অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করে, মোহাবস্থায় (Hypnotic) মুগ্ধ মিডিয়ম তার পরিচয় দেয়। সজ্ঞান অবস্থাতেও এই অব্যক্ত চৈতন্য আমাদের অজ্ঞানে কাজ করে, অনেক অজানা খবর জানায়, অশ্রুত বাণী শোনায়, প্রতিভাবান্ শিল্পী ও সাহিত্যিক, যোগী মুনি, ধ্যানী জ্ঞানী সাধু সন্ন্যাসী সবার জীবনে ও কাজে তার পরিচয় পাই। হইতে পারে মিডিয়মের এই জীবন দেবতার মত গুহাশায়ী অব্যক্ত চৈতন্য Telepathy বলে মৃত বা জীবিত, দূর বা নিকটস্থ সকলের গুপ্তকথা, গুপ্তকাজ দেখিতে শুনিতে পায় এবং পাইয়া প্রকাশ করিতেছে? তবে যে অব্যক্ত ব্যক্তিবিশেষের আত্মা বলিয়া পরিচয় দেয়, ও তার ধর্ম-কর্ম আচার ব্যবহার নকল করে, সেটা হয় তো স্বপ্নের ক্রিয়ার মত? আমরা স্বপ্নে যেমন মিথ্যা সৃজন করি, নাট্য অভিনয় করি তেমনি কিছু। যদি তাই হয় তবে ধ্রুব পরিচিত জানিত কারণ ছাড়িয়া অধ্রুব অজ্ঞাতকে টানিয়া আনি কেন? টেলিপ্যাথী ও অব্যক্ত-চৈতন্য আমাদের পরীক্ষা-প্রেক্ষণ লব্ধ তত্ত্ব, প্রেত তাহা নহে।

প্রেতবাদীরা বলেন—"টেলিপ্যাথী দিয়া ব্যাখ্যাত হয় না এমন সব ঘটনার কি হইবে? তা ছাড়া ভুতুড়ে বাড়ী, মৃতের প্রেতরূপ দর্শন, প্রেত কর্তৃক জড়দ্রব্যের চলাচল এ সব তো Telepathy দিয়া ব্যাখ্যা হয় না?"

Telepathy-বাদীরা বলিবেন, এসব ঘটনা এখনো বিশ্বাসের মত প্রমাণিত হয় নাই। উহাদের সংখ্যা এত অল্প যে উহা হইতে একটা সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত নহে।

মোট কথা এই বাদানুবাদের শীঘ্র শেষ হইবে না। কোন্ দল জয়ী হইবেন তাহা বলা দুষ্কর। তবে এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত যত সাক্ষ্য প্রমাণ নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে মনে হয়—প্রেতবাদই সহজতর সঙ্গততর ও সুবিধাজনক

ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ। সভ্যদের মধ্যে বড় বড় নামজাদা বেশীভাগ পণ্ডিতই প্রেতবাদের সমর্থনকারী।

W. Crookes ; A. R. Wallace , Barrett , Myers , Lodge ; Hodgson ; Hyslop , Fimnanon ; Lambroso, Richet, Shiaparelli ; Sidgwick , A. Balfour , H. Bergson ; W. James প্রভৃতি এই যে বিজ্ঞানাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কগণ ইহারা প্রেতবাদই গ্রহণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিৎ Arthur Hill প্রথমে টেলিপ্যাথীবাদী ছিলেন; পরে বহুবৎসরব্যাপী স্বাধীন গবেষণার ফলে প্রেতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

চিৎতত্ত্বসভা মানবজাতির জ্ঞানের প্রসারের জন্য তমসাচ্ছন্ন ভয়াবহ অজ্ঞেয় এই অলৌকিকের রাজ্যে সত্যের বর্ত্তিকা লইয়া চলিয়াছেন—জড়বৈজ্ঞানিক তাঁহার Mechanical কারণ ব্যাখ্যার দ্বারা চিৎ-রাজ্যের কোনো নিরাকরণ করিতে না পারিয়া এই দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছেন, কিন্তু সব কালেই যেমন দুঃসাহসিকের প্রাণপণ সাধনাকে তুচ্ছ করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বা ভয় দেখাইয়া নিরুৎসাহ করিবার লোকের অভাব হয় না; এ যুগে ও এদেশে ওদেশে সর্ব্বত্রই তেমন লোকের অভাব নেই। নব-পথের এই পথিকদের প্রতিবাদী দুই শ্রেণীর। একদল স্বজাতীয় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক তাঁহারা মামুলী পুরাতন পোষা মতকে ছাড়িতে রাজি নহেন। নিজেদের ধারণা ভ্রান্ত বা জ্ঞান অসীম ইহা তাঁহারা না মানিয়া বিজ্ঞানেরই দোহাই দিয়া নূতনের বিরোধপন্থী। ইহাদের মনে কু নাই। কপালে ঘটিলে মত বদলাইতে বাধ্য হইবেন। দ্বিতীয় দল—অজ্ঞানী আনাড়ীর দল যাঁহারা—খোঁজ খপর না জানিয়া উদ্দেশ্য মৎলব না মানিয়া কর্ম্মীর নিঃস্বার্থ কর্ম্মে স্বার্থ বা সুখের গন্ধ দেখেন। ইহারাও নিজ মতের অন্ধ সেবক, অহমের পুজারী। বিলাতের একদলের উদ্দেশ্যই হইতেছে এই সাধু চেষ্টাকে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ ও হেয় করা। সব দেশেই এ শ্রেণীর লোক আছে।

যাঁহারা এ দু' দলের কোনো দলের নন, তাঁহাদেরও অনেকে এ সম্বন্ধে উদাসীন। হঠাৎ খেয়াল বশতঃ কথা উঠিলে ইহারা বলেন—"পরকালের জন্ত মাথা ব্যথা কেন? everything in its time—একালে একালেরই কাজ চলুক'।" যে সব ঐহিক কর্ম্মী সত্যই দেশের ও দশের জন্ত প্রাণপাত করিতেছেন তাঁহাদের একথা বলা সাজে—কিন্তু যাঁহাদের ঐহিক কাজ শুধু হাইতোলা ও

ভুক্তী দেওয়া আর জীবধর্ম্ম পালন করা তাঁহাদের এসব সাধু চেষ্টা বা ব্রত সাধনে কোনো কথা না বলাই ভাল। কেন না এরূপ কাজে লোকের মনে সত্যানুরাগে বাধা পড়ে। আজ যেটা ইহাদের ধারণাতীত বলিয়া উদ্ভট ও অসম্ভব মনে হইতেছে কাল সেটা জগতের পরম জ্ঞান সম্পদে দাঁড়াইতে পারে। "for nothing is that errs from Law"—নিয়মে ব্যতিক্রম বলিয়া কিছু নাই।

বিলাতে আর এক শ্রেণী প্রেত তত্ত্বানুসন্ধানের শত্রুতা করিতেছেন। ইহারা গোঁড়া ধর্ম্ম যাজকের দল। ইহাদের আপত্তি এই যে বাইবেলে প্রেত ব্যাপার লইয়া আলোচনা নিষিদ্ধ সুতরাং এসম্বন্ধে সাধারণের হস্তক্ষেপ অধর্ম্মজনক। ইহাদের যুক্তিতর্ক এতই হাস্যোদ্দীপক যে কাহারো প্রতিবাদ করা কেবল কালি খরচ ও কাল অপব্যয়।

দেহান্তে আত্মার সজ্ঞান অস্তিত্ব, ইহার ভাগ্য, কর্ম্মাকর্ম্ম গতিবিধি যদি বিজ্ঞানবলে প্রমাণিত হয় তাহা হইলে মানব জাতির পক্ষে যে কি অসীম মঙ্গল সাধিত হয় তাহার বর্ণনা অসম্ভব। পরকালে আত্মার ক্রমোন্নতিতে মানুষ যখন শাস্ত্র অনুযায়ী বিশ্বাস করিত তখন মানুষের নৈতিক জীবন অনেক উচ্চাবস্থায় ছিল, পরকালের ভয়ে সে ইহকালকে গঠিত করিত। পুণ্যের একটা প্রবল তাড়না ছিল। এখন মানুষ জড়বিজ্ঞানের নীতিহীন নাস্তিক্য শিক্ষার ফলে ইহজীবনের সুখকে সার করিয়াছে, উর্দ্ধদৃষ্টি, উর্দ্ধগতি এসব আর তার গণনার মধ্যে নাই। পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইবে, এবং পঞ্চভূতবিকৃত চৈতন্য—heat, light, electriicty তে লয় হইবে যখন, তখন আর কে কার? মার কাট খাও, বড় হও—সংসার যখন চামুণ্ডারূপিণী প্রকৃতিরই শ্মশানলীলা, তিনি যখন 'red in tooth and claw,' তখন কিসের ত্যাগ? কার জন্যে ত্যাগ? ভোগই সার বা শয়তান।

আর বিশ্বপ্রকৃতি যদি তাই না হয়? যদি একটা অজ অনাদি সজ্ঞান সর্ব্বভূতস্থ চিৎপুরুষ—যিনি সত্য শিব ও সুন্দর—এমন যদি থাকেন জীবভাগ্য যদি দেবভাগ্যে, সর্ব্বশেষে ঈশ্বরভাগ্যে পরিণত হয়? তখন?

কাজেই এ জ্ঞানের মঙ্গলজনক ফল বহুদূরব্যাপী। একটা নূতন উপগ্রহ বা একটা নূতন ধাতু বা একটা নব শ্রেণীব লতা বা পাখী বা যন্ত্রের আবিষ্কারের যে উপকারিতা, বিদেহ আত্মার অস্তিত্ব আবিষ্কারে তার চেয়ে কোটী গুণের উপকারিতা, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? জড় বিজ্ঞানলব্ধ প্রাকৃতিক বিধিনিয়মগুলার জ্ঞান যেমন আমাদের বিশ্বাসের মজ্জাগত লইয়া আমাদিগকে

জড় জগতে চালাইতেছে তেমনি করিয়া এই চিৎবিজ্ঞান লব্ধ আত্মার অমরত্বের বিশ্বাস আমাদের মজ্জাগত হইয়া নৈতিক জীবনে যদি প্রত্যেক চিত্তে এই ধ্রুবধারণা জাগাইয়া দেয় যে—

No sudden heaven, nor sudden hell, for man.
But thro' the will of One who knows and rules
And utter knowledge is but utter love.
Æonian Evolution, swwift and slow
Thro' all the spheres an ever opening height
An ever lessening Earth.

যে সহসা নগরপতি বা স্বর্গপ্রাপ্তি বলিয়া কিছুই নাই, এক জগদ্রূপের আগে এসব বিবর্ত্ত, সে জ্ঞানপূর্ণ প্রেম, এ জগতই পাইয়া হ্রাস হইতে হইতে চলিয়াছে। তাহা হইলে এর চেয়ে পরম প্রেয় ও চরম শ্রেয় মানব ভাগ্যে আর কি হইতে পারে ?

আহ্বান

(জ্যোতির্ম্ময়ী)

উঠ বীর স্বপ্ন হ'তে
কর্ম্ম তব শিয়রে দাঁড়ায়ে
করিছে আহ্বান।
দুঃখেরে বরণ করি
রত হও কাজে—আপনারে
দিয়া বলিদান।
ত্যাগ-বর্ম্মে সর্ব্ব অঙ্গ
করি আচ্ছাদিত—তূণ-পূর্ণ
কর প্রেম-শরে।
সত্যের মুকুট পরি'
কর্ম্মক্ষেত্রে চল—বিশ্বজয়ী
জ্ঞান অস্ত্র করে।

পল্লী সত্য, কি জনপদ সত্য।

(শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।)

বাঙ্গলায় অধিকাংশ পল্লী মৃত্যুমুখে, পাশ্চাত্যের ভোগমুখী স্পর্শে নাগরিক জীবন গড়িয়া উঠায় অযত্নে পল্লীগুলি মরিতে বসিয়াছে। এ যেন জাতির জীবনপ্রবাহ কৃত্রিম খাল কাটিয়া নগরের আদর্শ কৃষিক্ষেত্র উর্ব্বর করিতে টানিয়া লওয়ায় পল্লী-নদীর বুকে চরা পড়িতেছে। তাই আজ দেশ ভরিয়া ডাক উঠিয়াছে, "ঘরে ফিরিয়া চল, ভরপুর শান্তির শ্যাম শোভায় জীবনের জল নূতন উজানে ফিরাইয়া লও।"

কিন্তু কথা হইতেছে এই, যে, কোন্‌টি সত্য? নগর সত্য কি পল্লী সত্য? কোথায় কোন্‌ জীবনে আমরা অন্তরের চরিতার্থতা চূড়ান্ত সুখে পাই? এত দিন "নগর" "নগর" করিয়া পাগল হইয়া ছুটিলে, আবার আজ "পল্লী" "পল্লী" বলিয়া নগরের বুকে শ্মশান রচিয়া কোথায় যাইবে? নগর ও পল্লী দুই লইয়াই ত দেশ। আগেও ত তাম্রলিপ্তি পাটলীপুত্র অযোধ্যা কাশী ইন্দ্রপ্রস্থ নামে কত বড় বড় নগর জনপদ ছিল। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এক সীমা হইতে সীমান্তরে দুলিয়া দুলিয়াই কি আমরা চির দিন জীবনের সত্য খুঁজিব? দুই অত্যন্তের,—দুপ্রান্তের মাঝের স্বর্ণসূত্র—সয়-মধুর সামঞ্জস্য ধরিয়া কি কখন জীবনকে পূর্ণ সত্য করিয়া পাইব না?

মানুষের জীবনে গ্রামই যদি এক মাত্র সত্য হয় তাহা হইলে মানুষ আসিয়া নগরে সমবেত হয় কেন, কোন্‌ বৃহতের টানে কোন্‌ ভূমার আস্বাদনে লুব্ধ হইয়া জনপদ রচনা করিয়া বসে? যে সত্যের প্রেরণায় মানুষ আপনাকে লইয়া তুষ্ট নয় কিন্তু স্ত্রীপুত্র আত্ম পরিজনে নিজেকে বিলাইয়া আস্বাদন করিয়া আরও গভীর করিয়া পায়, যে অন্তরের সহজ ব্যাপ্তির টানে এহেন আত্মপরিজনের সুখের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া স্বগ্রাম ও আরও দশটি গ্রামান্তরকে লইয়া পল্লীমণ্ডলী রচনা করিয়া বসে, সেই বৃহতের ক্ষুধাই তাহাকে নগর জাতি দেশ এবং অবশেষে বিশ্বমানবেও পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। মানুষ বাহ্যতঃ দেখিতে অতটুকু হইলেও অন্তরেযে অকূল—"the ocean had somehow been poured into the drop"—এই বিন্দুর মাঝে যে অনন্তের সিন্ধু বাস করে।

গ্রাম্য পাঞ্চায়েত বা village commune ভারতের অধিকাংশ জীবন

ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া ভারতে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্ গজায় নাই। গ্রাম্য পঞ্চায়েত গুলি আমাদের জীবন ও তাহার সৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামবাসীরা গ্রামেই আদান প্রদানের বিনিময়ে যে সুখনীড়টি রচনা করিয়া বসিয়া থাকিত, তাহা এমনি শান্তি ও আরাম প্রদ, সকল অভাব অভিযোগের এমনি সহজ শরণ ও আশ্রয়,যে গ্রামবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ চেষ্টা ক্রমশঃই গুটাইয়া অন্তর্মুখী হইয়া পড়িত, জীবনের স্পর্শ দেশকে—বৃহৎ সমাজকে জড়াইয়া ধরিবার কোন প্রেরণাই পাইত না। সহজ শান্ত ক্ষুদ্র পল্লী-জীবনে পরিসর আদৌ ছিল না; সামন্য যেটুকু ব্যাপ্তি ছিল তাহা মাত্র পরমার্থ জীবনে, ভারত-ব্যাপী তীর্থের মধ্যে দিয়াই ছিল। রাজনীর্তিক জীবনে, পণ্যে শিল্পে গ্রামের দান ছিল অতি তুচ্ছ, পাটলীপুত্র তাম্রলিপ্তি ইন্দ্রপ্রস্থের মত নগরই তাহা সামান্য ভাবে জাগাইয়া রাখিত। তাই রাষ্ট্রপীঠ রচনা হইত সমস্ত অখণ্ড ভারত জুড়িয়া নয়, দেশে দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন বাজপাটে। সমস্ত ভারতের অখণ্ড আত্মজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গ পঞ্চনদ দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশেও দেখি রাজশক্তি ও রাষ্ট্রজীবনের সহিত প্রজার নাড়ীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। হয় তো বৈরাজ্য নামক জনতন্ত্রের সময়ে গ্রীক অভিজানের পূর্ব্বে ও পরে কিছু দিন তাহা ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া রাজার উপর অন্ধ ভক্তি ওকরদানে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সে ভক্তি-অর্ঘ্য ও করভারও গ্রাম্য মণ্ডলীর কর্ম্মচারী বহিয়া দিত জনপদে, জনপদ পাঠাইত রাজাকে।

মানুষের নিয়মই এই, তাহার অভাবের প্রেরণায়, আত্মার ক্ষুধায়, মন বুদ্ধি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির বাসনায় সে ফোটে। এই সব ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষা কামনা গুলি জড়াইয়া তাহাদিগকে সার্থক করিয়া যে সৃষ্টি তাহারই সহিত মানুষের জীবনের নাড়ীর যোগ কখনও ঘুচে না। যদি মানুষের সহজ ক্ষুধাগুলি সহজে ঘরের আঙ্গিনায় গ্রামের গোলাঘরে মিটাইয়া দাও, তাহা হইলে সে আর বৃহৎ হইয়া ফুটিবে না, দূরান্তরের মানুষকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে স্পর্শ দিয়া বাঁচাইয়া নিজে বাঁচিয়া উঠিতে চাহিবে না। যেখানে রাষ্ট্র বা জাতীয়তার রূপ বিগ্রহ বা কর্ম্ম যত ছোট, সেখানে তাহার বোধ মানুষের মনে তত অস্পষ্ট, যেখানে রাজ্যের জন্য,—সমাজ সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান পণ্য শিল্পের জন্য বড় ও ছোট—নগর ও গ্রাম পরস্পরের কাছে ঐকান্তিক ও অপরিহার্য্য নয়, সেখানে কল্পিত সম্বন্ধ নাড়ীর যোগকে প্রাণবান্ করিবে কেন?

নগরে ও রাজধানীতে গিয়া যোদ্ধা সামন্ত ও নাগরিকের মাঝে রাজশক্তি

শিল্প সম্ভার কেন্দ্রগত হওয়ায়, এবং গ্রামগুলি পঞ্চায়েত বা মণ্ডলীর অধীনে সামান্য জীবনযাত্রার উপকরণ শস্য ও বিধি ব্যবস্থা গ্রাম্য জীবনের গণ্ডীর মাঝেই পাওয়ায় এ দেশে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্ বিগ্রহ ধরে নাই। তাহার উপর ভারত পরমার্থমুখী অন্তর্মুখ জাত আর তাহার উপর উপর্য্যুপরি বৌদ্ধ ও শাঙ্কর যুগের মায়া-বাদের শিক্ষা। খাইয়া পরিয়া কৃষি গোধন রক্ষা করিয়া যে জীবন ও উৎসাহ উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা লইয়া তীর্থ দর্শন, মন্দিরে পূজা ও ভবপারের পাথেয় সঞ্চয়ই চলিত। যাহাদিগের প্রাণ বড, জ্ঞান অধিক, ক্ষেত্র কতকটা স্বভাবতঃ সংস্কারমুক্ত, তাহারা নাগরিক জীবনে আসিয়া তাহা পরিতৃপ্ত করিত।

সভ্য সভ্যই গ্রাম ও নগর জীবনের দুই দিক দিয়া বিভিন্ন ভাবে একই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা মাত্র। ব্যষ্টির দিকে জীবনকে সর্ব্বার্থসাধক সুসমঞ্জস ও শান্তিপ্রদ করিতে গিয়া গ্রাম্যমণ্ডলী বা কমিউনের সৃষ্টি। কিন্তু তাহাতে বৃহত্তের বা ভূমার ক্ষুধা মিটে না বলিয়া জনপদ ও সুরপুরীকে পরাস্ত করিয়া আপন সৌন্দর্য্যে কলায় স্থাপত্যে ও জীবনের পণ্য ও সুখসম্ভারে গঠিত হইয়া উঠিতে ছিল।

যদি গ্রাম ও জনপদ এই দুয়ের ভাল—দুয়ের সুবিধা একাধারে পাই তবে মানুষ বোধ হয় উর্দ্ধগ অথচ অধগ, বৃহৎ অথচ তরল, ক্ষুদ্রে পূর্ণ অথচ বৃহত্তে অপরিসীম হইয়া ফুটিতে পায়। গ্রামের শান্তি আছে, স্নিগ্ধতা আছে, মুক্ত বায়ু ও আলোকে সহজ জীবন আছে, আর প্রাণে প্রাণে প্রতিবেশী জীবনের নিবিড় সুখদুঃখের তন্ময় বন্ধন আছে। জনপদে দেশ-আত্মার স্পর্শ আছে, বহুর মিলন ও প্রসার আছে, শিল্পকলা সাহিত্য জ্ঞান ও বিপুল কর্ম্ম যন্ত্রের টান আছে। দুইকে মিশাও, পাইবে উদ্যান-জনপদ বা garden-cities, আজ কাল পাশ্চাত্যে এই আদর্শে জনপদ-গুলিকে ভাঙিয়া প্রকৃতির বিজনে শ্যামাঞ্চলের মাঝে গড়িতে চেষ্টা চলিতেছে।

আমাদিগকেও গ্রামের সুখ জনপদে আনিয়া বাটিয়া দিয়া জনপদের জ্ঞান গরিমা বিপুলতা সমৃদ্ধি গ্রামে লইয়া যাইতে হইবে। গ্রামকে নগর ও নগরকে গ্রামে পরিণত করিতে হইবে। সমস্ত দেশকে একটি জীবন্ত নাড়ীর যোগে বিপুল মূর্চ্ছনায় বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। গ্রামকে ক্ষুদ্র রাখিলে তাহাকে শিল্পে কলায় বিদ্যায় সম্পদে বড় করিতে পারিবে না, কারণ ক্ষুদ্রের সে ধনবল জনবল ও প্রেরণা কোথায়? এই পল্লী জীবনের পুনর্গঠনের দিনে আমাদের জাতীয়

ধর্ম্মের নব-সাধকদিগকে এ কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পল্লী ও নগর একই সত্যের দুইটী আংশিক অভিব্যক্তি, তোমারই আমারই কামনার ঊর্দ্ধগ ও অধগ দ্বিধা অভিব্যক্তি, সে গ্রামে পূর্ণকে অংশে দেখাইতে চাহিয়াছে—আর নগরে তাহারই বিপুলতর ছন্দ পাইয়াছে। দুইকে মিলাও, হরিহররূপ পাইবে, ভারতের জীবন নূতনে অভিনব হইয়া ফুটিবে। পুরাতন ও নূতন একের মাঝে সার্থক সামঞ্জস্য লভিবে।

বঁধু-দরশনে।

(শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী)

মরমের মম এক বন্ধন
নয়নের মম চির নন্দন
বঁধু যে
উন্মুখ মম চাতক শ্রবণ
অবিরল ধারে করি সিঞ্চন
বেণু-জলধর বিগলিত-স্বর
মধুতে
পিপাসিত মম চকোর-নয়ন
করি অবিরত হরষ-মগন
চন্দ্র-বদন-রঞ্জিত-কিরণ

হ'তেছে উদয় আমার হৃদয়

মন্দ মন্দ চরণ পাত ,
মরমে মৃদুল মধুরঘাত।
দরশে দরশে নূতন রস
হেলনে দোলনে ভুবন বশ

দিব্য মধুর রঙ্গ ভরে
দিশি দিশি দিশি তরল করে।
পরশের রসে হরষে অতি
মণি-মঞ্জীর বাজিছে তথি।
উঠিছে পড়িছে লাস্য মাঝে
তালে তালে তালে মুরলী বাজে।
অশরণ মম শরণ সার
যুগল চরণ-কমল তার
নাচিয়া নাচিয়া পরাণ লুটে
নয়নে গোপন মরমে ফুটে।

• •

ইচ্ছা করে গগন-থালে
সাজায়ে তারা কুসুম-মালে
শশীর দীপ জ্বালি
বঁধু হে! তব বদন দেশে
সংজ্ঞা-হারা পাগল বেশে
আরতি করি খালি।
আরতি শেষে ধন্য মানি
ছুঁড়িয়া ফেলি সে দীপখানি
ধ্যানের দরিয়ায়,
স্মরিয়া তব করুণা নাথ!
এ মোর দেহ করি গো পাত
তোমার পদ-ছায়।

• •

দরশন দানে বহালে পরাণে
প্রেমের নদী,
বহে প্রেম-লোর, ভাগ্যের মোর
নাহি অবধি!
কি বর মাগিব তুহার চরণে
বঁধু হে!

পড়ুক উছলি বচনে আমার
নিপীড়ি মধুর চক্র তোমার
মধু হে !
হে চিরকিশোর ! কৈশোর তব
লয়ে চপলতা পূর্ণ বিভব
চিত্তে মোর
একমুখী তব চিন্তার ধার
তুলি অবিরত পরাণ আমার
করুক ভোর !

* * *

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম
না করি ভিক্ষা তোমার ঠাঁই,
অস্থি-চর্ম্ম-মর্ম্মারাম
চিত্তে যদি সে ভক্তি পাই।
দিব্য কিশোর মূর্ত্তিখানি
দৈবে নেত্রে ফলিল মোর,
তাইতে মরমে তৃপ্তি মানি,
তাইতে চিত্ত হইল ভোর।
মানস পদ্ম মধ্যে যবে
সঞ্চিত হয় ভক্তি মধু,
অঞ্জলি ধরি মুক্তি তবে
ভৃঙ্গের মত গুঞ্জে বধু !
উন্মুখ যবে রন্ধ্র-মুখ,
অন্তরে পশি ভুঞ্জে সুখ।

* *

মাধুরী-সিন্ধু হে মোর বন্ধু
তোমারে নমস্কার।
তোমার মহিমা না জানে বচন,
তোমার স্বরূপ নাহি জানে মন,

তোমার মাধুরী প্রাণ করে চুরি,
জগতে চমৎকার!
একি রূপ তব ওগো সুন্দর।
রস-পিপাসিত জনের নাগর!
রসিকের হিয়া সে রূপে মজিয়া
গভীর হরষে উঠে পুলকিয়া
চমকি বারম্বার।
লুণ্ঠিত শিরে হে মোর দয়িত।
তোমারে নমস্কার।

* * *

ঈষত অরুণ নয়নি সুধা
পান করি মোর বাড়িল ক্ষুধা।
অধীর অধীর মানস মোব
মধুকব সম মধু-বিভোর
মুখ-পঙ্কজে আবেশে বসি
মধুর অধর-রন্ধ্রে পশি
মুহু মুহু চায় হারায়ে জ্ঞান
চুম্বন মধু করিতে পান।

* * *

মধুর মধুর কান্তি বঁধুর।
মধুর মধুর বদন মধুর!
গন্ধ মধুর! হাসিটি মধুর!
মধুর বঁধুর সকলি মধুর।

* * *

একি এ কান্তি মুখ-ইন্দুর।
একি বেশ তব মধুর মধুর।
হে মোর বন্ধু। পরাণ হে।
একি মাধুর্য্য হিয়াব মাঝারে।
বাক্য আমার ধরিতে না পারে।
আঁখি অপলক, অঙ্গে পুলক,
নীরব মুখর বয়ান হে।

বুদ্ধি হইল জড়ের মতন,
মুগ্ধ চিত্ত, বিমোহিত মন,
না পারি করিতে স্বাদন হে।
এ লীলা মাধুরী তোমার! তোমার!
নিজে তুমি লহ আস্বাদ তার
আত্ম-মগন রমণ হে।
অঞ্জলি এই বাঁধিনু মাথায়,
লুণ্ঠিনু শির ওই রাঙা পায়
বার বার মম জীবন হে।

• • •

নাথ হে!
নিবেদন করি তুয়া পায়ঃ
এ মোর নয়ন দুটি যেখানে পড়িছে লুটি
সেখানে রহগো ফুটি মাধুরী লীলায়,
সেখানে করুণা-ভরা বিশাল লোচন-তারা
মধুর কিরণ ধারা করুক বর্ষণ,
সেখানে বিনোদ বাঁশী ঢালুক অমিয় রাশি,
ভুজঙ্গ দোলায়ে ফণা করুক নর্ত্তন।

চিঠির গুচ্ছ।

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।]

(১)

ভাই নরেশ,—

একই ডাকে দু'খানা চিঠি পেলুম—তোমার আর পিতৃদেবের। বাবা যা লিখেচেন, সেই কথাগুলিই অন্যভাবে সাজিয়ে তুমি পাঠিয়েচ। বোঝা গেল তাঁরই উপদেশ মত তুমি এরূপ করেচ।

সন্ন্যাসী হবার মতলব আমার কোনদিনই ছিল না, সেটা তুমি জান।

কাজেই পিতৃদেব তাঁর বংশ দুলালকে কোন ডানাকাটা পরীর রূপের ফাঁস পরিয়ে সংসারে টেনে রাখবার জন্য—যদি বা ব্যগ্র হয়ে থাকেন—তোমার কিন্তু তেমন কোন আশঙ্কা ছিল না। তুমি যদি তাঁকে আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে, তা'হলে আমায় আজ এই সঙ্কটে পড়তে হোত না।

তুমি লিখেচ, যারা বিবাহ না করার ধুয়া তোলে, তাদের অন্তরে গোপন রয়েচে জীবনের দায়িত্বকে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি। অন্য কারু মনের খবর আমি রাখিনে—তবে আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তুমি অসঙ্কোচে আনতে পার এবং সেটা যে মিথ্যা নয়, তাও স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত হব না।

সত্যিই আমি দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে নারাজ। এর উত্তরে তুমি যা বলবে, তা আমি অনুমানে ঠিক করে নিয়েচি। তুমি বলবে, আমাকে দিয়ে তা'হলে দুনিয়ার কোনই কাজ হবে না। না হবারই সম্ভাবনা বেশি। কারণ, দুনিয়াটা যত বড়, তার কাজও তেমনি বিরাট। সেই কাজে লেগে যাবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। তাতে বুকে যতটা বল থাকা দরকার, তাব শতাংশের এক অংশও আমি কখনো অনুভব করিনি। আমার বিশ্বাস, ইচ্ছে করলেই ও-কাজটা করা চলে না। ওব জন্য ভিন্ন শক্তি থাকা চাই। আমি জানি, এই নিয়ে তুমি দস্তুর মত তর্ক করতে প্রস্তুত। তুমি প্রতিপন্ন করবেই যে, মানুষের মাঝে যে শক্তি লুকিয়ে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তুল্লেই মানুষ সব কিছু করতে পারে। কারণ, তুমি বিশ্বাস কর, আমরা হচ্চি সব "অমৃতস্য পুত্রাঃ।" নেহাৎ যদি আমার মাঝে গোপন রয়েচে যে শক্তি, তাকে কথার জোরে জাগ্রত করতে তুমি অক্ষম হও, তা হলেও হিতোপদেশের তৃণগুচ্ছের সংহতি শক্তি আর ত্রেতা যুগে সমুদ্রবন্ধন ব্যাপারে কাঠ-বিড়ালীদের সাহায্যের নজীর খাড়া করতে তুমি বিরত হবে না। মনে মনে ও-সব আলোচনা করেও আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেচি, তোমরা যাকে 'মহৎ-কাজ' বল আমাকে দিয়ে তার একটুকুও কিছু হবে না।

আমি লোকটি যে অলস তা তোমার অবিদিত নেই। ইজি চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে যখন চুরুটের ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে যেতে দেখি, তখন যেমন দিব্যি আরাম অনুভব করি, তেমনি রাত-দুপুরে, অ-কেজো—বাজে বলে যে পুঁথিগুলি তোমরা হাত দিয়ে ছুঁতেও নারাজ সেগুলি পড়তে পড়তে যখন দুনিয়ার অনেক কথাই ভুলে যাই, তখন এমন একটা আনন্দ অনুভব করি, যা ভাষা দিয়ে বোঝান না গেলেও দস্তুর মত আরাম জনক।

তুমি প্রশ্ন করবে, জীবনটা কি আমার চিরদিনই এমনি করে কেটে যাবে? এই ধরণের প্রশ্নকে আমি সত্যিই বড় ভয় করি। কারণ, ও-সব বিচারে খানিকটা এগিয়ে গেলে শেষটায় এমন যায়গায় গিয়ে পৌছিতে হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। বড়ই বিশ্রী সে।

আমি চাই পাবার মত করে জীবনকে পেতে—একেবারে প্রাণময় হয়ে যেতে। কোনরূপ বন্ধনে কখনো আমার জীবনকে আড়ষ্ট করে ফেলতে আমি দেব না। আমার হৃদয়াকাশে আনন্দ-সবিতা চিরদিনই আলোয় আলোয় উষ্ণ করে রাখবে, পুলকিত করে তুলবে। চারিদিকে আঁধার করে কখনো যদি রাশি রাশি মেঘ জমে ওঠে, তা হলেও তার বুক-ভরা নিরানন্দের মাঝে পড়ে আমি 'হা হতোস্মি' বলে করুণ আর্ত্তনাদ দিগন্তে না ছড়িয়ে মেঘ কেটে যাবার অপেক্ষা করেই বসে থাকব। তখন আমার অন্তরের অন্তর হতে যে স্বর ফুটে বার হবে, তার মাঝেও থাকবে বিশেষ একটা মাধুর্য্য, নূতন ধরণের রাগিণী।

আগে একবার তোমায় লিখেছিলুম যে, তোমাতে আর আমাতে একটা বিরাট ব্যবধান রয়েচে। উত্তরে তুমি জানিয়েচ যে, সে-টা ঠিক নয়; কারণ, তা'হলে আমরা এমন অটুট বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতুম না। বন্ধু তুমি আমার একমাত্র দুনিয়ায়—একথা ভাবতেও আমি আরাম পাই, আরও আরাম পাই এই কথাই ভেবে যে, এই বন্ধুত্ব কখনো আমাদের নিজ নিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দাবী করে বসেনি। তা যদি করত, তুমি যদি আমাকে তোমারই ফটোগ্রাফ করে তুলতে চাইতে, অথবা আমি যদি চাইতুম তোমাকে একেবারে আমার ছাঁচেই ঢেলে নিতে, তা হলে আমাদের অন্তরের প্রীতি অ-প্রীতিতেই পরিণত হোত—সুধা শেষটায় গরল হয়েই উঠত।

যাক্ সে কথা। এখন তোমার প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করি। আমার প্রথম কথা হচ্চে এই যে, বিয়ে করাটা যে এখন খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েচে, তা আমি মোটেও বুঝতে পারচিনে। অভিভাবকদের পক্ষ হতে এত তাড়া হুড়োর মানে হচ্চে এই যে, এ বয়সেও আমার বিয়ে না দেওয়াটা তাঁরা ভালো দেখায় না বলে মনে করেন। বউদি অবশ্য একটি ছোট-খাট টুকটুকে বউ পাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েচেন—আর সে আজ নতুন নয়। সাত বছর আগে যখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ছিলুম তখন হতেই।

সৌভাগ্যক্রমে পিতৃদেব তখন সে কথা কাণেই তুলতেন না, স্পষ্ট বলে দিয়ে ছিলেন যে পড়া শেষ না হলে বিয়ে দেওয়া হবে না। বউদি অগত্যা বছর গুণে গুণে আশায় দিন কাটিয়ে ছিলেন। তারপর কলেজের ছাত্রত্ব ঘুচিয়ে যখন তার অধ্যাপক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হলুম, তখন হতেই বউদি একেবারে ধৈর্য্য হারা হয়ে উঠলেন। বার বছর বয়সে মা'কে হারিয়েচি আর তারপর এই তের বছর সমস্ত দাবী দাওয়া, শতরকম মান-অভিমান অবাধে তাঁর উপর আমি চালিয়ে এসেচি। পেয়েচিও তাঁর বুকভরা স্নেহের সমস্তটাই অংশ। কাজেই তাঁর দাবী আজ অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বউ সম্বন্ধে তাঁর যে আদর্শ, তা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আমার যে স্ত্রী হবে, তার কাছে আমি কি প্রত্যাশা করব? নিজে বিয়ে করেও একথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার, ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি। তাদের কাছে প্রত্যাশা কি কিছু করা যায়? অযাচিত ভাবে যা তারা দিয়ে আসচে, তার বেশী কিছু দেবার শক্তি কি তাদের মাঝে আমরা রেখেচি? তাদের কি কিছু আমরা শিখতে বা বুঝতে দিয়ে থাকি, যার ফলে তারা আমাদের দাসী না হয়ে সহধর্ম্মিণী হতে পারে?

আমরা কথায় কথায় মনুর দোহাই মেনে উঁচু গলায় ঘোষণা করি যে, আমাদের দেশে আবহমান কাল হতে নারীকে দেবীর আসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। "নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" কথা নজীর স্বরূপ যখন তখনই আমরা বলে থাকি।

নারীকে আমরা পূজা না হয় নাই বা করলুম, কিন্তু মানুষের অধিকার যা, তা' হতে তাদের বঞ্চিত রাখবার পরোয়ানা আমাদের হাতে তুলে কে দিয়েচে? 'শক্তি মনের ধর্ম্ম' ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মের এরূপ বিধান হতেই পারে না, আর সে বিধান যদি আমরা মেনে চলি তা হলে আমাদের অনেক দূরে পিছিয়ে যেতে হবে হয় ত একেবারে সেই আদিম যুগে। সেখানে ফিরে যেতে আমি চাই। কাজেই আমার মতে, সামনের পথে যত কিছু আগাছা, সব দূর করে ফেলা দরকার, নইলে চলবার ব্যাঘাত ঘটবে।

তুমি আরও লিখেচ যে, ইচ্ছে করলে যে কোন বাঙালী বধূকে স্বামী নিজের মনের মতটি করে গড়ে তুলতে পারে। তা হয়ত সম্ভব; কারণ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তাদের যে মোটেই নেই। তুমি ওতেই তৃপ্ত—আমি কিন্তু মোটেই নই। যুগ-যুগান্ত তাচ্ছিল্যের ফলে মেয়েরা আপনাদের কথা একেবারেই

ভুলে গিয়েচে। তাই আমরা তাদের পোষ মানাটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করচি। কিন্তু বাস্তব পক্ষে এর চাইতে অনিষ্টকর আর কোন ব্যাধি মানুষের এত ক্ষতিকরতে পারে না।

তোমার আর একটা ধারণা এই যে, আমি একটা বিবি গোছের মেয়েকেই বিয়ে করব। ভয় নেই, বিয়ে করলে আমি কোন বঙ্গ-বালাকেই করব, তবে সে গাউণ পরবে কি বাইক চড়বে, অথবা তার শাড়ীর বহর আরো বাড়িয়ে নেবে, তা' স্থির হবে, তার শারীরিক সৌন্দর্য্য, শক্তি আর মানসিক প্রবৃত্তি বিবেচনা করে। তার বেশভূষা, তার চাল-চলন, শোভন হবে, সুন্দর হবে, আর তারই মনের মতটি হবে। সে সাহিত্যালোচনা করবে, না সেবাব্রত গ্রহণ করবে—কি কিছুই করবে না, কেবল হাসবে, গল্প করবে আর ঘুমুবে ——তা নিশ্চিতই আমি স্থির করে দেব না।

আমি শুধু দেখব সে যেন নিজেকে দাসী মনে করে সর্ব্বদাই খাট হয়ে না থাকে, আর আমিও যেন স্বামিত্বের দাবী করে তার ভিতরের নারীত্বকে গলা টিপে মেরে একটা জীবনকে একেবারে ব্যর্থ না করে ফেলি।

তোমার চিঠির জবাব স্বরূপ আমার যা বলবার ছিল, তা লিখে পাঠালুম। এই লম্বা চিঠি তোমার মূল্যবান সময় নিশ্চিতই খানিকটা নষ্ট করল একেবারে বাজে রকমে। এই সময়টা ব্রিক্ ওন্টালে তোমার মক্কেলও তুষ্ট হোত, কোন কিছুর মিষ্টি আওয়াজও শুনতে পেতে।

ভাল কথা, কনক যে একেবারে চিঠি লেখা ছেড়ে দিয়েচে। ইতি

তোমারই মোহিত।

(২)

স্নেহের ঠাকুর পো!

তোমার বন্ধু নরেশের নিকট তুমি যে চিঠিখানা লিখেচ, কনকের মারফত তা আমার হাতে এসে পৌছেচে। কনক হচ্চে আমার দূর সম্পর্কের মামাত বোন। তারই স্বামীই যে তোমার বন্ধু নরেশ, আর কনক যে তোমার কাছে রীতিমত নিয়মিত চিঠি লেখে, তা তুমি আমায় কোন দিন বলনি। কনক আমায় লিখেচে যে, তুমি নাকি তাকে ছোট্ট বোনটির মতই স্নেহ কর আর সেও নাকি তোমার মত লোককে ভাই বলতে পেয়ে খুসী হয়েচে। তার চিঠিতে তোমার সুখ্যাতি আর ধরে না।

তোমার চিঠিতে দেখলুম যে, তুমি আমার দাবীটা উড়িয়ে দিতে পারচ না বিয়ে করতে কতকটা নিমরাজী গোছের হয়ে পড়েচ। কেবল আমার পছন্দ মত মেয়েকে তুমি সহধর্ম্মিণীর আসনে বসাতে ন'রাজ, অথচ, কেমনটি হলে তোমার পছন্দ হয়, তা না ব'লে, যা তা কিছু লিখে চিঠির কাগজ ভরেচ।

আমার অল্প বুদ্ধি নিয়ে তার কোন অর্থই বার করতে পারলুম না। তাই চিঠিখানা একেবারে তোমার দাদার কাছেই পেশ করলুম। পড়ে তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"বেশ লিখেচে।" আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম—আর তোমার নির্ব্বিকার অগ্রজ মশাই বেশ নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানতে লাগলেন। রাগে আমার সমস্তটা শরীর কাঁপতে লাগল।

আমি মনে মনে স্থির করলুম, যে, তোমার বিয়ের কথা আর কাউকে কোন দিন কিছু বলব না। বিবাগী হয়ে যেখানে ইচ্ছে তুমি চলে যাও। আমার কি? তুমি ত আর আমার ভাই নও? যার ভাই, সেই যদি আগ্রহ না দেখালে, তা হলে আমারই বা এত মাথা ব্যাথা কেন?

শেষের কথাগুলো তোমার দাদাকে শুনিয়ে দিয়ে আমি অন্য ঘরে চলে গেলুম। খাবার সময় বাবা যখন তোমার বিয়ের কথা উত্থাপন করলেন, তখন কাজের ছলে আমি সরে পড়লুম। সত্যই আমি শপথ করেছিলুম, এ সম্বন্ধে আমি একেবারে নীরব থাকব। কিন্তু, তারপর একা একা বসে থেকে আমার মনে হোল চোরের ওপর রাগ করে যে মাটীতে ভাত খায়, সে মস্ত বড় বোকা। আমি যদি তোমার দিকে না চাই, তা হলে কে আর চাইবে? কে আর আছে তোমার? যাঁর ভাবনার অবধি থাকত না তিনি স্বর্গের দেবী স্বর্গেই চলে গেছেন—যাঁরা রয়েচেন, তাঁরা ত সব পাথর দিয়ে গড়া। তোমার সুখ দুঃখে তাদের প্রাণ নাচেও না কাঁদেও না।

বিদেশে কত কষ্টই পাচ্ছ! ঠাকুর চাকরের ওপর নির্ভর। মাইনে করা লোক দিয়ে কি সব কাজ চলে? তোমার দাদাটি কিন্তু মোটেই ভাল লোক নন। দুনিয়ার স্বার্থপর, আর বুদ্ধিতেও যে একটু খাট, এত দিনে তাও আমি আবিষ্কার করে ফেলেচি। আমি বেচারা যখনই তাঁকে তোমার অসুবিধার কথা বলি, তখনই তিনি উত্তর দেন—কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও। শুনে আমার গা যেন জ্বলে ওঠে। টাকা দিয়েই নাকি সব অসুবিধা দূর করা যায়!

বিদেশে বন্ধু-বান্ধব হীন যায়গায় থাকার যে কষ্ট তা তোমার দাদা কি করে বুঝবেন—চিরকাল ত বাড়ী থেকে আরামেই কাটিয়ে দিলেন। রোস, আমি তাঁকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। আগে তোমার বিয়েটা হয়ে যাক—তারপর আমরা দু'বোন ছেলেমেয়েদের আর বাবাকে নিয়ে তোমার ওখানে গিয়ে থাকব। তখন তোমার দাদা বুঝতে পারবেন একা থাকার অসুবিধা কত।

বউ সম্বন্ধে আমার যা আদর্শ তা নাকি তুমি মোটেই বরদাস্ত করতে পার না। আমার মনে হয় কতকটা পার আর কতকটা পার না। লাল-টুকটুকে হলে নিশ্চিতই খুসী হও—ছোট-খাটটিই পছন্দ কর না, কেমন?

তোমার মনের মতটিই আমি খুঁজচি—সন্ধানও একটির পেয়েচি। কর্শিয়াং থেকে ইস্কুলে পড়ে—শুনচি খুব বিদ্যা। মেয়ের বাপ সেখানেই চাকরী করেন। বড়দিনের ছুটিতে সব কলকাতায় আসচেন—তুমিও এসো। দুজনে মিলে মেয়ে দেখা যাবে।

তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমাদের সংসারের ষোল আনা কাজ, তারপর আবার তুমি রয়েচ অত দূর দেশে, তার জন্ম সকল সময়েই ভাবনা চিন্তা। তোমার একটি বউ হলে, তার উপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

ছেলে মেয়েরা তাদের কাকীমাকে দেখাবার জন্ম যত রাজ্যের যা কিছু পাচ্ছে সব জমিয়ে রাখচে। তোমার থাকবার ঘরটা ঘসে মেজে একেবারে নতুন করে ফেলেচে। বাবা রোজ সন্ধ্যায় তাদের নিয়ে বসে কাকীমা এলে কে কি করবে, কে বেশী ভালবাসবে অথবা ভালবাসা পাবে, তারই আলোচনায় মগ্ন থাকেন। তাঁর রামায়ণ মহাভারতের উপর দু-আঙুল পুরু হয়ে ধুলো জমে উঠেচে। আমরা সকলেই যেন সমস্ত নিয়ম কানুন ভুলে গিয়েচি—কেবল তোমার দাদা সেই দশটায় আপিসে বেরিয়ে যাচ্ছেন আর সন্ধ্যা সাতটায় পেঁচার মত মুখটি করে ঘরে ফিরচেন। বেচারা যে করে খাটে!

আজ পার্শেল করে তোমার জন্ম কিছু খাবার পাঠালুম—খেতে কেমন হয়েচে জানিয়ো। তোমার খবর রোজই লিখো। ইতি।

আশীর্ব্বাদীকা

তোমার—বউ দি!

স্নেহের মোহিত!

তুমি যে চিঠি খানা লিখেছিলে সেখানা কনক তোমার বউ-দির কাছে পাঠিয়ে দিয়েচে—এ খবরটা এতদিন তুমি নিশ্চিতই পেয়েচ। এই দুষ্কৃতির জন্য কনকই সম্পূর্ণ দায়ী—আমি কিন্তু জানতুম না যে চিঠি খানা চুরি গিয়েচে। জীবনের আদর্শ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি কোন দিন ঝগড়া করিনি করবও না, তবে দুনিয়ার কাজ বলতে তুমি কি বুঝেচ, তা আমি জানিনে। মানুষ যে এই পৃথিবীর বুকে থেকে কেবল হাওয়ার উপরই ভেসে বেড়াবে, ফুলের মধু পান করবে অথচ কাঁটার খোঁচা খাবে না তা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে।

তুমি চাও পাবার মত করে প্রাণকে পেতে, আমিও তাই চাই। সকল মানুষ, শুধু মানুষ কেন, সকল প্রাণীইত তাই চায়। কিন্তু চাইলেই কি তা পাওয়া যায়? শারীরিক ব্যাধি মানসিক সুখ-দুঃখ, শত রকমের অভাব দৈন্য কি এই প্রাণের স্ফূর্তি লোপ করে দেয় না? যতক্ষণ না তুমি পারচ সে গুলোকে জয় করতে ততক্ষণ হাজার চেষ্টা করে তুমি পূর্ণ করে প্রাণকে পাবে না।

তুমি লিখেচ যে, বাইরের কোন কিছু তোমার ভিতরের আনন্দ নষ্ট করতে পারবে না—নিজের আনন্দে নিজেই তুমি বিভোর হয়ে থাকবে।

পার যদি বিশ্বের গরল-রাশি কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকতে, সেত খুবই ভাল কথা—কিন্তু মনে রেখো তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে ঐ একটি আনন্দময় প্রাণময় মূর্ত্ত সচ্চিদানন্দ যিনি রাজভোগে ও ভিক্ষান্নে সমানই তৃপ্ত, শ্মশানে ও প্রাসাদে সমানই অভ্যস্ত—প্রলয়ের বিষাণ বেজে উঠলেও যিনি আনন্দে নাচতে সক্ষম।

সামান্য রকমের দু'একটা বেদনার আঘাত উপেক্ষা করতেই এ অহঙ্কার কখনো যেন আমাদের মত্ত করে না তোলে যে, আমরা বাইরের আঘাত অগ্রাহ্য করবার শক্তিলাভ করেচি। যেখানে মানুষ তাকে পূর্ণ করে তুলতে চায় পরিবারের ভিতর দিয়ে, সমাজের আশ্রয় থেকে, দেশের ও দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে, সেখানে বাইরের সব কিছু উপেক্ষা করা যায় না।

তুমি অনেক সময় বলে থাক যে, দুনিয়ার কাজে লেগে যাবার মত শক্তি তোমার নেই। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে এর চাইতেও শতগুণে যা কঠিন, দুঃখ দৈন্য দূর করবার জন্য যে প্রবলতর শক্তির আবশ্যক, তা কি তুমি

অর্জ্জন করতে পেরেচ? আমার মনে হয় দুনিয়ার কাজ কারবার চাইতে—দিবানিশি দুনিয়ায় যে কাজ চলচে, তাই অগ্রাহ্য করা অনেক বেশি শক্ত।

তারপর দুনিয়ার কাজ কথাটা আমরা খুব ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিনে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ যে ভাবে দুনিয়ার কাজ করেচেন, সে কাজ মানুষের নয় বলেই ত আমরা তাঁদের ভগবানের অবতার বলি। সেই ধরণের কাজ ছাড়া প্রতি মুহূর্ত্তে কত ছোট বড় কার্য্য সমষ্টির ফলে আমাদের বিপুল এই পৃথিবী পলে পলে গড়ে উঠচে—তাতে যে পায়ে-দলা ধূলিকণা হতে সুরু করে উপরের ওই অনন্ত আকাশ পর্য্যন্ত যতকিছু আছে সবারই কিছু না কিছু দান রয়েচে। কেবল মানুষই কি কিছু দেয় নি? আমার মনে হয় দুনিয়া গঠন ব্যাপারে সবার চাইতে মানুষের দানই বেশি—আর সে মানুষের পৌনে-ষোল আনা ঠিক তোমার আমার মতই মানুষ।

তারপর, মেয়েদের প্রতি আমরা অবিচার করচি বলে তুমি ক্ষোভ প্রকাশ করেচ। তোমার মত হচ্চে, চলবার পথ হতে সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করে দেওয়া। বেশ কথা। কিন্তু সে কাজ কে করবে? কল্পনার জাল বুনে গুটিপোকার মত কেবল নিজেকে ঘিরে ফেলে চুপটি করে বসে থাকলেই কি সামনেই পথ আপনা হতেই পরিষ্কৃত হয়ে যাবে?

হিন্দুরা মেয়েদের পূজা কোন দিন করেচেন কি করেননি সে বিচারে আমি প্রবৃত্ত হব না। তাঁরা যা করে গেছেন তার প্রমাণ ইতিহাসেই পাওয়া যাবে, যা করেন নি তাও করেছিলেন বলে কৃতিত্ব দেবার মত ভণ্ডামি আমার মাঝে নেই।

আমি আমাদের মেয়েদের দুর্দ্দশা যুক্তি তর্ক প্রয়োগে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার লোক নই। মর্ম্মে মর্ম্মে আমি অনুভব করচি আমাদের বিরাট দৈন্য যা দিন দিনই বেড়ে চলেচে তা দেশের নারী শক্তিকে অবহেলা করবার ফলে। যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীর মত আমাদের এই সমাজ যে একেবারে অন্তঃসার শূন্য হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সকল কাজেই তার পরিচয় পেয়ে তীব্র একটা বেদনা অনুভব করচি। সে ব্যথা, তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারচি, তোমার বুকেও বেজেচে। এই ব্যথা বুকে পুরে রেখে, চুপটি করে বসে থেকে পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি গালি বর্ষণ করলেই আমাদের মেয়েদের দুঃখ দৈন্য বিদূরিত হবে না, ভাই।

মেয়েদের ঘরের কোণে আবদ্ধ রাখবার মত এতবড় একটা অনিয়ম

আমাদের সমাজে কেমন করে যে এসে পড়েচে, তা আমি ভেবে স্থির করতে পারিনে। এ সম্বন্ধে দেশে যা কিছু আলোচনা হচ্চে, তাতে দেখচি দুটি দলে বিভিন্ন দুটি কারণ নির্দ্দেশ করচেন। এক দল বলেন, বিজেতা-জাতির অত্যাচার ভয়েই আমরা মেয়েদের নিয়ে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেচি, যেখানে আলো বায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না- অর্থাৎ আমরা ইচ্ছে করে করিনি, জোর করে আমাদের দিয়ে করিয়েছে। অপর দলের উক্তি—অবরোধ প্রথা বিজেতা জাতির ভয়ে নয়, তাদের অনুকরণ করতে গিয়েই সমাজে শিকড় গজিয়ে বসেচে।

এই দুই দলের মতের অ-মিলে বেশি কিছু এসে যায় না, কারণ, উভয়েই স্বীকার করচেন যে, এই প্রথাটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা মোহের বশে আমাদের পেয়ে বসেচে। ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করে, ভাল বলে, এটা আমরা গ্রহণ করিনি। মুস্কিল হচ্চে আর একটি দলকে নিয়ে, যাঁরা বলেন, মেয়েদের সত্যিকার আসনই হচ্চে ওই গৃহের কোণে—অসূর্য্যম্পশ্যা হলেই নারীর গৌরব বৃদ্ধি পায়। এই দলের লোকেরা আবার চাণক্যের "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজ কুলেষু চ" কথাটা যখন তখন বলে থাকেন, তবে রাজকুলকে অবিশ্বাস করা এবং তা ভাষায় প্রকাশ করা বিপজ্জনক জেনে স্ত্রীকুলকেই দুনো জোরে অবিশ্বাস করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। যাঁরা এ উপদেশ মত কাজ করতে নারাজ এ দলের মতে তাঁরা হচ্ছেন সমাজদ্রোহী। আমরা যে পারচিনে অবরোধ প্রথাকে সমূলে উৎপাটন করতে তাতেই প্রমাণিত হচ্চে যে আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই শেষোক্ত দল ভুক্ত।

ব্যক্তি বিশেষ যখন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন সমাজ ত চাইবেই ব্যক্তিবিশেষকে চেপে মারতে—কিন্তু বিশিষ্ট সেই ব্যক্তি যখন সমষ্টির বন্ধন-গ্রন্থি শিথিল করে তার লোকদের স্বপক্ষে টেনে আনবে তখন তাকে নিয়েই সমাজ গড়ে উঠবে, ক্রমে এক ঘরে হয়ে সেই থাকবে যে বিশিষ্ট এই ব্যক্তির আহ্বানে তার গড়া সমাজে এসে যোগ না দেবে। এই জন্যই ত বলা হয়ে থাকে যে মানুষই সমাজ গড়ে,—সমাজ মানুষ গড়ে না।

ব্যথা যদি পেয়ে থাক, বন্ধু, মেয়েদের অমর্য্যাদা বুঝতে পেরে, তবে সে বেদনা বুকে চেপে রেখে নিজেরই সর্ব্বনাশ করো না। হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে চেষ্টা কর নারীশক্তিকে জাগ্রত করতে। তাদের শক্তিশালিনী করে তোল—তা হলেই পুরুষদের মিথ্যা পৌরুষ টিকবে না।

এই সমস্তার আর একটা দিক্ আছে। আমরা সবাই যে মেয়েদের তুচ্ছ করেই তাদের প্রতি অবিচার করি তা নয়। আর্থিক দুরবস্থায় বাধ্য হয়েই অনেক সময় আমাদের তা করতে হয়। দাসীর কাজ মেয়েদের দিয়ে করিয়ে নেবার প্রয়োজন আমাদের কখনই থাকত না, যদি আমরা সকলেই দাস-দাসী রাখতে পারতাম।

বেলা দশটা হতে সুরু করে একপ্রহর রাত পর্য্যন্ত বিশ্রী রকমে খেটে পুরুষেরা যেখানে দুবেলা পেট ভরে খাবার ব্যবস্থা করতে পারে না, সেখানে মেয়েরাই বা কেমন করে মুক্ত আলো বায়ুর সন্ধানে সকালে ও সন্ধ্যায় দু'চার ঘণ্টা বাইরের অবসর ভোগ করবেন।

আজ আর কিছু লিখব না। আমরা ভাল আছি। আগামীতে তোমার কুশল লিখো। ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
নরেশ—

নিরুদ্দেশের যাত্রী।

(বাউল—কাম্বিরী খেম্‌টা)।

[হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম।]

নিরুদ্দেশের পথে যে দিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল সুরু,
নিবিড়্ সে-কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ-বুক কাঁপ্‌লো দুরু দুরু॥
মিট্‌লোনা ভাই চেনার দেনা, অম্‌নি মুহুর্মুহু
ঘর-ছাড়া ডাক কর্‌লে সুরু অথির বিদায়-কুহু—
উহু উহু উহু।
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অম্‌নি বাঁধে ধর্‌লো ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন—
আমি খুঁজি কোন্ আগুনে কাঁকন বাজে গো॥

বেরিয়ে দেখি ছুটছে কেঁদে বাদ্‌লী হাওয়া হু হু
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মতন,
দেয়ার গুরু গুরু ॥
পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, "আর বাঁচিনে। কোথায় প্রিয় কোথায় নিরুদ্দেশ ?"
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপটা মারে নিশীথ-মেঘের আকুল চাচর কেশ।
'তালবনা'তে ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয় ব্রজে বাজে তূরী,
মেখলা ছিঁড়ি পাগ্‌লী মেয়ে বিজ্‌লী-বালা নাচায় হীরের চুড়ি
ঘুরি ঘুরি ঘুরি
ও সে সকল আকাশ জুড়ি।
থাম্‌লো বাদল রাতের কাঁদা,
ভোরে তারা কনক গাঁদা
হাস্‌লো, ও মোর টুট্‌লো ধাঁধা—
হঠাৎ ও কা'র নূপুর শুনি গো ?
থাম্‌লো নূপুর, ভোরের তারা বিদায় নিল ঝুরি !
এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যা-তারার চলার পথে গো।—
আজ অঘ্রাণের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু ঝুরু ॥

বর্ত্তমানের সমস্যা।

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।]

আজকালকার যুগের মস্ত কথা হইতেছে সাম্য, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য। এই কথাটাই নানা ক্ষেত্রে নানা রূপে নানা নামে জগতের সমস্ত আলোড়ন বিলোড়নের কলহ কোলাহলের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। Self-determination শব্দটি আজ যথা তথা মুখরিত হইতেছে। Sein Fein বল, 'স্বদেশী'ই বল, অর্থ ঐ একই। Socialism, syndicalism sovietism এমন কি "Suffrgeattism" পর্য্যন্ত ঐ একই 'স' অথবা 'স্ব' এর মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ব্যষ্টি হউক আর গোষ্ঠী হউক, কেহ আর অপরের কথায় উঠিতে বসিতে চাহিতেছে না, সকলেই চাহিতেছে নিজের ভার নিজে লইতে। মুক্ত

ভাবে নিজের পথ নিজে করিয়া লইতে, নিজের সত্য নিজে খুঁজিয়া জানিয়া লইতে, নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে করিয়া লইতে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, অধিকার ত আছেই তা ছাড়া এইটাই কর্ত্তব্য। মানুষের শক্তি এই পথে, মানবজাতির শান্তিও এই পথে—জীবনের সার্থকতার জন্যে নান্যঃ পন্থা।

একটা যুগ ছিল যখন কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হওয়াটাই সমাজের ছিল নিয়ম ও আদর্শ। তখন কর্ত্তা হইবার অধিকার সকলেরই ছিল না, কারণ সকলেরই সে রকম বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য আছে বা থাকিতে পারে তাহা মানা হইত না। স্বভাবের দোহাই দিয়া হউক অথবা কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া হউক বলা হইত, মানুষের মধ্যে আছে উত্তম ও অধমের শ্রেণী বিভাগ। উত্তমের কথা অনুসারে চলায় অধমের কল্যাণ। অধম নিজের ভাল নিজে বুঝিতে পারে না, সেই অনুসারে নিজে নিজে চলিবার ক্ষমতাও তাহার নাই, তাই উত্তম তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন, পদে পদে ঠেলিয়া লইবেন। আর এই রকম সমাজেরও হয় সুশৃঙ্খলা। সকলেই যদি স্ব স্ব প্রধান হয়, তবে গোলমালের ত অবধি থাকিবে না, নিজের জন্য নিজে নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া মারামারি কাটাকাটি হইবে, সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে, তখন 'নিজ' বলিতে কোন মানুষই থাকিবে না। তাই শ্রেষ্ঠ, গুরুজন ও শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে। সমাজের কর্ত্তাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

সমাজের নানা ক্ষেত্রে এই রকম নানা কর্ত্তা পূর্ব্বকালে উঠিয়াছিলেন। সমষ্টিগত জীবনে আগে আমাদের দেশে ছিলেন ব্রাহ্মণ, ইউরোপে ছিল Church—ব্রাহ্মণে ও শূদ্রে, Church man ও lay manএ কি রকম সম্বন্ধ ছিল, ইতিহাসে সে কথাটা খুব স্পষ্ট করিয়া ফলাইয়াই লেখা আছে। তারপর আর এক কর্ত্তা ছিলেন রাজা—benevolent (আজ কালকার ভাষায় বলিব non-violent) despotism হউক আর violent despotism হউক রাজাই ছিলেন প্রজার মালিক বা অধিকারী, রাজাই প্রজার ভাল মন্দ নির্দ্ধারণ করিতেন, রাজারই ছিল প্রজার দোষগুণের সব দায়িত্ব, প্রজার নিজস্ব সত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। পারিবারিক জীবনে, যিনি ছিলেন কর্ত্তা (Pater familias) তাঁহার প্রভাব, অধিকার, ক্ষমতায় ত এক রকম অবধিই ছিল না। সন্তান ছিল পিতার জিনিষ, পিতার প্রীত্যর্থে সব করা, পিতৃপুরুষ দিগকে সন্তুষ্ট করাই ছিল সন্তান সন্ততিদের একমাত্র ধর্ম্ম। পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান ত দূরের কথা, পিতার মনের কথা আগে হইতেই জানিয়া যে সেই

অনুসারে চলিতে না পারে সে ত কুসন্তান, মহাপাতকী। তারপর স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সে কথা বিশেষ বলাই বাহুল্য। স্ত্রী আপন অস্তিত্বকে ডুবাইয়া জলাঞ্জলী দিয়া কি রকমে স্বামীর কুক্ষীগত হইয়া গিয়াছেন তাহার নিদর্শন বাংলা দেশে ভারতীয় সমাজে বেশী খুঁজিয়া পাইতে হয় না। তারপর আর এক কর্ত্তা হইতেছেন গুরু, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যে রকম এক সময়ে ছিল ও এখনও আছে তাহা দেখিয়া বুঝা কষ্টকর শিষ্য একটি সজীব মানুষ, না জড় পদার্থ মাত্র।

এই ত গেল পুরাতন কালের কথা—নূতন কালেও যে এই সব জিনিষের চিহ্ন লোপ পাইয়াছে তাহা নয়, তবে ইহাদের জোর অনেক কমিয়া গিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পুরাতন কালের কর্ত্তার দল ছাড়া, নূতন কালে নূতন যে কর্ত্তার দল উঠিয়াছে বা উঠিতেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। রাজার কর্তৃত্ব আজকালকার যুগে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে আসিয়াছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। পুরাতন কালেও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যে একেবারেই ছিল না তা নয়—গ্রীসে, স্পার্টায়, রোমের ইতিহাসে ইহার পরিচয় খুবই পাই, কিন্তু তবুও বিশেষ ভাবে এটি হইতেছে আধুনিক যুগের কথা। আজকাল প্রত্যেক দেশবাসীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, শুধু শিক্ষা দেওয়া নয়, কাজে কর্ম্মে লাগাইয়া জোর করিয়া প্রমাণ করা হইতেছে যে রাষ্ট্র-রূপ যন্ত্রের সে একটা অঙ্গ মাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন সাধনা হইতেছে এই যন্ত্রটাকে ভাল করিয়া চালান, ইহার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য তাহার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করা। দেশ অর্থাৎ দেশ-শক্তির কেন্দ্র বা প্রতিনিধি যে রাষ্ট্রশক্তি তাহাই ঠিক করিয়া দিবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ও কর্ম্ম, সেইটুকুই সে করিবে, তাহা না করিলে বা তাহা ছাড়া নিজের ইচ্ছামত কিছু করিলে সে হইবে এনার্কিষ্ট—আইন ভঙ্গকারী, তাহার স্থান ফাঁসী কাঠে, জেলে। রাষ্ট্র যে কেবল নিজের লোকের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে তাহা নয়,পরের রাজ্যের উপরও যথাসাধ্য সে কর্তৃত্ব ফলাইতে চেষ্টা করিতেছে। আগেও অবশ্য এক রাজ্য আর এক রাজ্যকে অধিকার করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিত, এজন্য যুদ্ধ বিগ্রহও হইত যথেষ্ট, সমস্ত ইতিহাসের অর্থই বোধ হয় ত এই ব্যাপার। কিন্তু তখন কথাটা ছিল খুব স্পষ্ট, যে খাইতে চাহিত সে খোলাখুলি বলিত আমি তোমাকে খাইব। কিন্তু আধুনিক যুগে ঠিক সে রকমটি হয় না—আধুনিক যুগে যে খাইতে চায় সে বলে তোমাকে খাইব না, তোমাকে civilise করিব,

আলোকে আনয়ন করিব। ইউরোপের সাদা রাষ্ট্র সব এসিয়ার আফ্রিকার কালো রাষ্ট্র সবকে এই কথা বলিতেছে। Mandatory নেশন সব অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল লোকদিগকে বলিতেছে, তোমরা শিশু তোমাদের ভার আমরা লইলাম, আমাদের স্বার্থ নাই, জগতের মানবজাতির উন্নতি কল্পে তোমাদের শিক্ষা দীক্ষার বন্দোবস্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে, আমাদের কথা অনুসারে চলিতে মূর্খের মত ইতস্ততঃ করিও না।

তারপর আর এক কর্ত্তা হইতেছেন 'বড় লোক' অর্থাৎ টাকাওয়ালা। অর্থ যাঁহার যত তাঁহার যে মান সম্ভ্রম শুধু তত তা নয়, তাঁহার ক্ষমতাও তত। তিনি যে শুধু ভাঙ্গিতে গড়িতে পারেন তা নয়, কি রকমে ভাঙ্গিতে হইবে আর কি রকমে গড়িতে হইবে সে জ্ঞান বুদ্ধিও তাঁহারই আছে। দেশে দেশে যে যুদ্ধ বা সন্ধি হয়, তা অনেকখানি ধনকুবেরদেরই সুবিধা অসুবিধা অনুসারে। মাল আমদানী রপ্তানি সরবরাহ হয় তাঁহাদেরই প্রয়োজন বুঝিয়া, জিনিষ তৈয়ারী হয়, ফ্যাসনের প্রচলন হয় তাঁহাদেরই রুচি পরিতৃপ্তির জন্য। গরীব লোকেরা নিজেদের সুখ সুবিধা মত জীবন যাপন করিতে পারে না, তাহাদের সুখ সুবিধা বড় লোকেরা মাপিয়া জুখিয়া দেন। সমাজের যে একটা high tone থাকা দরকার সেটা বড়লোকেরাই বজায় রাখেন ও রাখিতে পারেন—ছোট লোকের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতেছে 'কাঠ কাটা আর জল টানা' (hewers of wood and drawers of water)।

আধুনিক কর্ত্তাদের লিষ্ট অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, যদি আর এক রকম শ্রেণীর কথা আমরা উল্লেখ না করি। সে শ্রেণী হইতেছে মুনিব বা হুজুরদের। মুনিব আর চাকুরে, হুজুর আর মজুর এ সম্বন্ধটা বিশেষভাবে বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার। আজকালকার নীতিশাস্ত্রে একটা নূতন পাপের জন্ম হইয়াছে দেখা যায় তার নাম insubordination—চাকুরে যদি মুনিবের মন জোগাইয়া না চলে, মজুর যদি সর্ব্বতোভাবে হুজুরের আজ্ঞাকারী না হইয়া থাকে তবে সেটা দোষের (crime) শুধু নয়, সেটা হইতেছে পাপ (sin)। কথাটা অতিশয়োক্তি হইল কি? অন্ততঃ ভারতবর্ষে যে নয়, তার প্রমাণ আমরা অনেকেই নিজের নিজের ভিতরে ভাল করিয়া তল্লাস করিলে নিশ্চয়ই পাইব জোর করিয়া বলিতে পারি। দাস প্রথা (serfdom) আগেও ছিল। কিন্তু একটু আগেই যেমন আমরা আর একটা জিনিষের সম্বন্ধে বলিয়াছি, পুরাকালে জিনিষটা ছিল খোলাখুলি, সেখানে কোন লুকোচুরি কোন ন্যাকামি ছিল না,

সেটা ছিল খুব শরীরগত ব্যাপার, তারপর তখনকার দিনেও মুক্তির অবকাশ ও সম্ভাবনা ছিল—ছিল যেন অন্ততঃ saturnalia, ছিল reason, কিন্তু বর্ত্তমানের দাসত্ব একেবারে জমাট নিরেট একটুও ফাঁক কোথাও নাই। তারপর এ জিনিষটা ততখানি শরীরের নয়, যতখানি মনের, আগের জিনিষটি ছিল সরল সোজা, কিন্তু এখনকার মধ্যে আসিয়াছে কুটিলতা কার্পণ্য—মানি অথচ মানি না, মনের প্রাণের এক অংশ মানিতে চায় আর এক অংশ চায় না। উপর নীচ এখনকার দিনে আবার থাকে থাকে সাজান, প্রত্যেকেরই আছে দুই রকম ভঙ্গী, উপরের দিকে তাকায় আপনাকে যে পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া, নীচের দিকে তাকায় আপনাকে সেই পরিমাণে বিস্ফারিত করিয়া। তবে দুঃখের কথা নীচের দিকের তাকাইবার অবকাশ সকলেরই জোটে না। এ ক্ষেত্রেও দেখি মুনিব বা হুজুর যে সব সময় অত্যাচার করিবার জন্যই চাকুরে বা মজুরের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহেন তাহা নয়, চাকুরের মজুরের উন্নতি বা মঙ্গলের জন্যই মুনিব হুজুর তাহাদের ভার গ্রহণ করেন।

এই ত হইল অবস্থা। কিন্তু সমাজের জগতের পতিতদের শূদ্রদের মধ্যে একটা চেতনা জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, কেহই অপর কাহারও ভার লইবার অধিকারী নয়। যে যত ছোট হীন অশক্ত হউক না কেন, সে বড়র উন্নতের শক্তিমানের হাত ধরিয়া চলিবে না, বড় উন্নত শক্তিমানও তাহাকে কৃপা দয়া পরবশে হাত ধরিয়া চালাইতে চেষ্টা করিবে না। মুক্তির মধ্যেই শক্তির প্রতিষ্ঠা। নিজের প্রেরণায় নিজের সামর্থ্যে নিজের পথে প্রত্যেককে চলিতে দাও—ভুলচুক হউক ক্ষতি নাই, ভুলচুকের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজে যে আমি সত্য পাই তাহাই আমার খাঁটি সত্য, ঠেকিয়া যাহা শিখি তাহাই আমার আসল জ্ঞান। ছাত্রকে গুরুমহাশয় পিটাইয়া মানুষ করিবেন না, ছাত্রকে নিজের রুচি নিজের কৌতূহল অনুসারে চলিতে দিতে হইবে। পিতা পুত্রকে আপনার ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবেন না, পুত্র নিজেই নিজের ছাঁচ খুঁজিয়া গড়িয়া লউক। স্ত্রী স্বামীর প্রতিধ্বনিমাত্র হইবে না, স্ত্রীও আপন সত্তাকে বজায় রাখুক, নিজের নিজত্বকে ফুটাইয়া তুলুক। গরীবেরা সেই ধনীর বিরুদ্ধে, মজুরেরা মনিবের বিরুদ্ধে আপন আপন সত্যকে সত্বকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্ত জোট বাঁধিতেছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের মানুষ দাঁড়াইয়াছে conscientious objectors রূপে, পরাধীন নেশন ক্রমে ক্রমে step by step নয় কিন্তু একেবারেই স্বাধীন হইতে চাহিতেছে।

কালো জাতি সাদা জাতির mandate স্বীকার করিতে নারাজ। এ যুগ শূদ্রেরই যুগ।

জগতের শূদ্রেরা অধিকারী ভেদ বলিয়া কোন জিনিষ মানিতে চাহিতেছে না। অধিকার সকলেরই সমান। অধিকার বা দাবি অনুসারে সামর্থ আছে কি না তাহা প্রত্যেকে নিজে বুঝিয়া দেখিবে—অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কিছু নাই, তাহা লইয়া মাথাব্যাথারও প্রয়োজন নাই। স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে আমি যদি গোল্লায় যাই, তবে সে অধিকারও আমার থাকিবে, গোল্লায় যাওয়াটাই আমার তখন সার্থকতা। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে মানুষ গোল্লায় যাইতে পারে না, ক্ষণকালের জন্য একটু বেচাল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয় করিবার কিছু নাই – প্রকৃতির নিয়মই এই রকম ঋজু কুটিল পথ ধরিয়া ঠিক লক্ষ্যে গিয়া পৌছান। স্বাধীন হইলে আয়র্লণ্ড বা ভারতবর্ষ ধ্বংস পাইবে সে ভয়টা আসল ভয় নয়, আসল ভয় হইতেছে আয়র্লণ্ড বা ভারতবর্ষের কর্ত্তাদের বড় অসুবিধা হইবে। রুসিয়া আপন ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিলে রুসিয়ার যে বিপদ হইবে, সেটাকে খুব ফলাইয়া বলি, আসল বিপদ যে ইউরোপের কর্ত্তাজাতিদের হইবে সেই কথা উহাতে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের মাথার কাছে যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি বাড়াইয়া দেন, তাহা কতখানি শূদ্রদের পারত্রিক পরিত্রাণের জন্য, আর কতখানি নিজেদেরই ঐহিক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

কিন্তু কর্ত্তাদের দিক হইতে যে কৈফিয়ৎটা দেওয়া যায় সেটা অন্তঃসার শূন্য অথবা তাঁহাদের কথাটা যে একবার প্রণিধান করিবার যোগ্য নয়, তাহা না হইলেও হইতে পারে। কর্ত্তাদের পক্ষে আমরা ওকালতনামা লই নাই, কিন্তু আজকালকার যখন গোড়ার তত্ত্ব লইয়া ভাঙ্গাচুরা হইতেছে তখন সব দিকই নির্ব্বিকার ভাবে সমান নজর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। সমাজে বড় ছোট উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ শূদ্র যে একটা বিভাগ হইয়াছে হইতেছে সেটা দেখি সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের জিনিষ—সুতরাং তাহাকে সমাজের একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি না বলিয়া থাকা যায় না। বড় যারা, উচ্চ যারা, ব্রাহ্মণ যারা তাহারা যে এক সময়ে যুক্তি করিয়া জোট বাঁধিয়া এমন দুষ্কার্য্যটি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ রকম বলিলে মানুষসম্বন্ধে সমাজসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। এই যেমন Faminist বা Suffragetteদের মুখে একটা কথা

অহরহ শোনা যায় যে মেয়েরা স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য বিহীন হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষের ছায়ায় পুরুষের পদতলে পতিত রহিয়াছে, সেটা হইতেছে পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কারসাজি—পুরুষেই সমাজ গড়িয়াছে নিজের সুখ সুবিধার জন্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা কি সম্ভব? সমাজ যদি পুরুষেই গড়িয়া থাকে, তবে গড়িবার সময় মেয়েরা কোথায় ছিল? মেয়েরা কেন তখন প্রতিবাদ করিল না বা নিজেদের সুবিধামত সমাজকে গড়িতে পারিল না? যদি বল, পুরুষেরা জোর জবরদস্তি করিয়া বা ক্রুদ্ধ হইয়া ভাগাইয়া এরূপ করিয়াছে —কিন্তু মানবজাতির এক অর্দ্ধেক আর অর্দ্ধেককে এমন ভাবেই ভেড়া বানাইয়া ফেলিল, বিশেষতঃ দুই অর্দ্ধেকের সম্বন্ধ যখন এমনতর যে একজনের সাহচর্য্য সহযোগীতা ছাড়া আর একজন একপদও অগ্রসর হইতে পারে না? আর ইতিহাসে জোর জবরদস্তির—সে ভুলানের ভালানের প্রমাণ কোথায় দেখিতে পাই কি? বলা যাইতে পারে, জিনিষটি আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিয়াছে, এক দিনে হয় নাই, মেয়েরা আজ দেখিতে পাইতেছে তাহারা কি রকমে ধীরে ধীরে জালের মধ্যে পা দিয়া ফেলিয়াছে। কথাটা সত্য হইতে পারে—কিন্তু ইহাতে পুরুষের দোষ নাই, পুরুষেরা সজ্ঞানে দুষ্ট বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে এ কাজ করিয়াছে তাহা নয়। সমাজের একটা প্রেরণায়, স্বভাবেরই টানে পুরুষ এই ভাবে চলিয়াছে, শুধু তাই, নয়, মেয়েরাও তাহা মানিয়া লইয়াছে। এই শেষ কথাটা আমরা সহজেই ভুলিয়া যাই, কিন্তু সেইটাই আসল কথা। মেয়েরা যে পুরুষের উপর এত নির্ভরশীল, পুরুষের ছায়া বা প্রতিধ্বনির মত হইয়া উঠিয়াছে তার গোড়ার কারণ, মেয়েদের স্বভাবে নিশ্চয়ই এই রকম একটা জিনিষ আছে, এই রকম হওয়ায় মেয়েরা একটা আনন্দ একটা তৃপ্তি একটা সার্থকতা পাইয়াছে। হইতে পারে, পুরুষেরা শেষে মেয়েদের এই দৌর্ব্বল্য টের পাইয়া, আরও সুবিধা করিয়া লইয়াছে, বাঁধনটা আরও কসিয়া ধরিয়াছে। মেয়েরা অভ্যাসক্রমে অন্ধভাবে তাহাতে সায় দিয়েছে, কিন্তু এটা গোড়ার সত্য নয়। সেই রকম শূদ্রেরাও যে ব্রাহ্মণের পদতলে, তার কারণ ব্রাহ্মণের আত্ম প্রতিষ্ঠার লোভ হইতে পারে, সমাজের জন্য একটা বিশেষ আদর্শ ও সাধনা স্থাপনের চেষ্টাও হইতে পারে, কিন্তু আর একটা কারণ ব্রাহ্মণের পদতলে থাকিয়া শূদ্রের নিজেরই একটা লোভ ও তৃপ্তি। ভারতবর্ষ যে বিদেশীর অধীন, এসিয়া বা আফ্রিকা যে ইউরোপের ছায়াতলে, কালা লোক যে সাদা লোকের খেলার পুতুল, তার কারণ একের

ছল বল কৌশল হইতে পারে কিন্তু তাহাতে অপরের সম্মতি, তৃপ্তি যে কিছুই নাই তাও বলা চলে না।

বড় যে ছোটর উপর কর্ত্তৃত্ব করে, তাতে বড়র অভিমান আছে অনেকখানি সন্দেহ নাই, কিন্তু কর্ত্তৃত্বের পাত্র হইয়া ছোটরও যে কিছু অভিমান নাই তাহাও নয়। আমি এমন মনিবের চাকর, আমি এমন হাকিমের হুকুমদার এই বলিয়া আমি যে গর্ব্ব অনুভব করি সেটাও ত কম সত্য নয়। গুরুর গুরুত্বকে বাড়াইয়া কমাইয়া, আপনাকে দীনাতিদীন মনে করিয়া শিষ্যই যে চরিতার্থ হয়। আমি নিজে সামান্য অশনভূষণে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, কিন্তু আমার রাজাকে আমি দেখিতে চাই ছত্র চামর, আশা সোটা, লোকলস্করে পরিবৃত করিয়া। ধনীর ঐশ্বর্য্যকে দেখিয়া সব সময়ে যে ঈর্ষান্বিতই হই, তা নয়, বরং সেটা নিজে দেখিয়া অপরকে দেখাইয়া কি একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। বড়র পূজা বলিয়া মানুষের মধ্যে আছে যে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাই বড়র বড়ত্বকে টিকাইয়া রাখিয়াছে। বড় ছোট যদি না থাকে, সকলেই যদি সমান হয়, তবে মানুষের এই বৃত্তিটির গতি কি হইবে? আর এটা যদি এমন স্বাভাবিকই হয় তবে 'স্ব স্ব প্রাধান্য' জিনিষটি সমাজে আসিবে কি করিয়া?

অপর পক্ষের উত্তর, যাহা স্বাভাবিক তাহাই আদর্শ নয়, যাহা অতীতে ছিল বর্ত্তমানে চলিয়াছে তাহাই ভবিষ্যতের চিত্র নয়। আর স্বভাবের গতি বিচিত্র, নানামুখী। অতীতে বর্ত্তমানে এক রকম স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া সমাজে এক রকম শৃঙ্খলা এক রকম আদর্শ উঠিয়াছে। সে শৃঙ্খলার সে আদর্শের ভোগ হইয়া গিয়াছে। Slave menalityর যে সত্য সেটা ভবিষ্যতের কথা নয়। মানুষকে আর এক রকম mentality পাইতে হইবে, আর এক রকম স্বভাব আর এক রকম আদর্শ সমাজে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আধুনিক যুগের সকল বিপ্লব বিলোড়ন দিতেছে সেই মন্ত্র।

গুরু ও শিষ্য।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

১।

শিষ্য আসি' দাঁড়াল নমি' 'গুরুজী মহারাজ।'
কহেন গুরু, "পাগল কেন করিছ হেন কাজ
হাটের মাঝে ছোট কি বড়
হাজার লোক হইল জড়ো
আমারি দেওয়া মন্ত্র তুমি শুনালে নাকি আজ।
বলিল কেরে করিতে তোরে এমন পাপ কাজ?"

২।

"গুরুর কাছে গৃহীত বীজ রাখিতে হয় বুকে
গোপনে তরুবীজের মত, আনিতে নাই মুখে,
সাধন-বারি সেচন ফলে
পরম গুরু করুণাবলে,
ভক্তি-লতা অঙ্কুরিতা দেখিবে পরে সুখে,
বীজের মত গোপনে অতি জপিতে হয় বুকে।"

৩।

আনত শিরে চরণ চাই শিষ্য কহে "স্বামি!
আজিকে শুধু নহে ত, আমি শুনাই দিনযামী।
ত্রিতাপে পাপে আত্মহারা
জ্বলিয়া মরে জগৎ সারা
তোমার কাছে এ সুধা পেয়ে বাঁচিব শুধু আমি,
হেথা, যাতনা ভরা বিপুলা ধরা কাতরে কাঁদে স্বামি।

৪।

"হাটের মাঝে ঘোষে গো তাই, নামের হোক জয়,
আমি, নামাপরাধে নরকে যাব করি না তা'তে ভয়।

এ সুধা দেবো সবার মুখে,
সবার পাপ বহিয়া সুখে
হাজার বার জনম নেব (যদি) মুক্তি নাই হয়,
তবু, 'নামের' জয়, 'নামীর' জয় ঘোষিব জগৎময় ।"

৫ ।

গুরুজী কন, "ধন্য আমি, তোমার নাম দাতা,
"গুরুজী কন, শুনিতে এই অমিয়া মাখা গাথা !
মুক্তি তব চরণ তলে
লুটে যে দাসী হইবে বলে ।
দয়াল "নামী" কেনা যে তোর ধন্য পিতামাতা ।"
শিষ্য কহে জয়রে "নাম" "নামী" ও "নামদাতা ।

সুখের ঘর গড়া ।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত ।]

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

চেতলা মুলুকের জমীদার রতনরায় স্বনাম ধন্য পুরুষ । সে মুলুকের লোকে বলিত,তাহার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। এখনো তাঁর প্রবল প্রতাপের স্মৃতি দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার স্মৃতির মত প্রজাবর্গকে চমকাইয়া তোলে। রতনরায় নিজে ধনেদীবংশের ছেলে ছিলেন। তিনি নিজে ৺রামজয় রায়ের পোষ্যপুত্র। রামজয়ের পত্নী ভুবনেশ্বরী দেবী মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দত্তকপুত্র লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামজয়ের এক ভাগিনেয় ছিল, তাহার প্রতি পুত্রবৎ বাৎসল্য থাকায় ইঁহার ইচ্ছা ছিল ভাগিনেয়কে উত্তরাধীকারী করিয়া যাইবেন, ভুবনেশ্বরীর কিন্তু ননদ পুত্রের উপর আদৌ অনুরাগ ছিল না ; কিন্তু স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিবার ইচ্ছা বা সাহস হইল না। তিনি অত্যন্ত মনমরা ভাবেই দিনপাত করিতেন ; রামজয়

মৃত্যুকালে পত্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যান, ভুবনেশ্বরী নিজ ভগ্নী-পুত্র রতন-রায়কে পোষ্যপুত্র লইলেন, কিন্তু ভাগিনের বিরাজ মোহনকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন না। সে যেমন খাইয়া দাইয়া তাহার আশ্রয়ে মানুষ হইতেছিল, তেমনি হইতে লাগিল। রতনরায়ের ঐশ্বর্য্য লাভের প্রধান সহায়ক তাহার বড় ভাই মোহন রায়। এই মোহন রায়ের একটী মাত্র পুত্র ছিল, তাহার নাম ভবানী প্রসাদ। মোহনের বিষয় বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল, যতদূর সম্ভব ন্যায় পথে থাকিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা তাহার জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ছিল। রতনরায় পোষ্যপুত্র ভাবে গৃহীত হইলে মোহন ভাইএর জমীদারীর দেখা শুনা করিতে লাগিল। বিষয় সম্পত্তি গুছাইয়া দিয়া মোহন মাতৃহীন পুত্রকে রতনের হাতে দিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইল। রতন ভবানী প্রসাদকে আপনার ছেলের সঙ্গে সমান স্নেহে মানুষ করিতে লাগিল।

তারপর রতন রায়ের পুত্র প্রসাদ হঠাৎ তিনদিনের জ্বরবিকারে মারা গেলে বৃদ্ধ রতন রায়ের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা ভবানীর উপর পড়িল। পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া রতন-পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। পুত্রবধূ নয়ন-তারা সংসার অনভিজ্ঞা বালিকা বলিয়া গৃহিণীপণার ভার পড়িয়াছিল রতনের শ্যালক-পত্নী কাদম্বিনীর উপর। ভগ্নীপতি মহেশ চৌধুরী শ্যালকের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবাড়ীতে আস্তানা বসাইয়াছিলেন। কাদম্বিনী ননদের সেবা করিতে আসিয়া এই খানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

মহেশ ও কাদম্বিনী যখন আসিলেন তখন অগত্যা উহাদের গুণধর পুত্র জলধরও পিসে মহাশয়ের স্কন্ধে না থাকিবে কেন? সেও আসিল।

কাণ টানিলে যেমন মাথা আসে তেমনি মহেশ ও কাদম্বিনী যখন আসিল তখন তাহাদের পোষ্য যে যেথা আছে তাহারাও আসিবে। ফলে মহেশের গুণধরপুত্র হারাণ, কন্যা হরিদাসী ও বিধবা বাতিকগ্রস্তা কলহপ্রিয়া এক বৃদ্ধা ভগিনীও রতনরায়ের পোষ্যবর্গের অন্তর্গত হইল। পুত্র হারাণ এর আগেই বিদ্যালাভে প্রবৃত্তির অভাবে নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিয়া কলিকাতার এক মার্চ্চেন্ট আপিসে চাকরীতে ঢোকে। আপিসের কর্ত্তাদের মতে কোনো একটা বে-আইনি কাজ করায় তার চাকরী যায়, কিন্তু দেশে আসিয়া সে প্রচার করে কলিকাতায় স্বাস্থ্যের সঙ্গে তার স্নায়ুযন্ত্রের বিরোধ বাঁধায় সে চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হয়। গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সে মাথার চিকিৎসার

অঙ্গে সিদ্ধি চরস ধরে। তার পর মামার বাড়ীতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার লেখাপড়ার উপর আবার খেয়াল চাপে, সেটা বেশী ভাগ বাপ মায়ের শাসনে তাড়নে ও পরামর্শে। মাস কয়েক পরে হারান নিজেই বুঝিতে পারে তার স্নায়ুযন্ত্রের সঙ্গে ছাপার বই কোনো মতে সামঞ্জস্য রাখিতে চাহিতেছে না, রোগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কাজেই বাপ মা ছেলের অমূল্য স্বাস্থ্যরত্নের দুর্ভাবনায় বাজে খাটুনি বন্ধ করিয়া দিলেন। মহেশ বুঝিল বাজে ইংরাজি বিদ্যার চেয়ে জমীদারী সেরেস্তার কাজেই হারাণের স্নায়ু-যন্ত্র খেলিবে ভাল। কাছেই পীরবাজার নামক একটা ছোট পত্তনী মহলে হারাণকে ছোট নায়েব করিয়া পাঠানো হইল। পীর বাজারে কয়েক মাসের মধ্যেই হারাণ স্থানীয় জেলেপাড়া হইতে একটী মৎস্যগন্ধা হরণ করিয়া তাহার সহিত পারাশরী অভিনয় করার ফলে একটা বিশ্রী এপিসোড্ ঘটে। রতনরায় ভাগিনেয়কে ফিরাইয়া আনিয়া ঘরে বসাইয়া রাখেন। হারাণ তখন পৈতৃক নেশার পেশায় মনোনিবেশ করিল। গোলা বাড়ীতে সাঙ্গ উপাঙ্গ সংগ্রহ করিয়া সে বাপ্‌কা বেটা এবং সেপাইকা ঘোড়া এই প্রবচন দুটীর সার্থকতা দেখাইতে সুরু করিল। হারাণের প্রধান অন্তরঙ্গ সঙ্গী হইল আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাইপো লুটবিহারী।

মহেশ ও মহেশ-জায়ার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটা অপ্রকাশ্য উচ্চ আশা এই একমাত্র বংশধরকে কেন্দ্র করিয়া লোক-লোচনের অদৃশ্য থাকিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহা এ বাড়ীতে ধরিতে পারিয়াছিলেন কেবল মাত্র বুদ্ধিমতী নয়নতারা। পরে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রতনরায় জমীদারী পাইয়া সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত দাদার যুক্তি পরামর্শ অনুসারে চলিত। সাবালক হওয়ার পরও দাদার মৃত্যু ঘটায় তাহার দায়িত্ব বাড়িল কিন্তু বিষয় কাজে মন দিবার প্রবৃত্তি হইল না। এই সময় ভগ্নীপতি মহেশ আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রতনকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিল। রতনের হঠাৎ বৈভব লাভের সঙ্গে সঙ্গে 'জীবন-সম্ভোগের' বাসনা বাড়িল, কেন না ঐশ্বর্য্যই সুখের সোপান। মহেশ সুবিধা বুঝিয়া বাসনানলের মনোমত বিবিধ ইন্ধন যোগাইয়া বুদ্ধিমানের মত ভাগ্যবামের ঘোঁড়ায় চাপিয়া লইতে লাগিল। এমনি করিয়া রতন রায়ের যৌবন মধ্যাহ্ন কাটিয়া অপরাহ্ণের আবির্ভাব হইল।

রতনরায়ের মনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নাম যশের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। রতন

রায় সরকারী-উপাধি ও তকমা লাভের জন্য অস্থির হইল। এবং বুঝিল এ যশোমন্দিরেরও সোপান এই ঐশ্বর্য্য। রতন রায় দুই হাতে অর্থের অপব্যয় আরম্ভ করিল। শেষ দিকে 'রাজা' হইবার নেশায় তাহাকে বিষম রকমেই পাইয়া বসিল। ব্যয়িত অর্থকে পুনঃ সঞ্চিত করিবার যে সব মামুলী জমীদারী উপায় তাহা মন্ত্রী ভগ্নীপতি সাহায্যে অবলম্বিত হইতে লাগিল। নির্জ্জীব রসহীন প্রজাবর্গের হাড়-মাংস নিংড়াইয়া সেই অর্থেব পুনরাগম হইতে লাগিল। প্রজাবর্গ প্রবলপ্রতাপের সবল অভিনয়ে ত্রস্ত, ব্যস্ত ও সশঙ্কিত হইয়া পড়িল।

জমীদারের ইন্দ্রিয়-লালসার ও যশঃপিপাসার বহ্নিতে ইন্ধন জোগাইতে গিয়া জমীদারীর যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহা সহ্য করিতে পারিল না ভবানীপ্রসাদ। ভবানী অন্য ধাতের ছেলে ছিল। চোখেব উপর অসহায় প্রজাবৃন্দের এই অত্যাচার দেখিয়া সে খুড়ামহাশয়ের কার্য্যের পোষকতা তো করিতই না বরং সময় অসময়ে সৎসাহস দেখাইয়া খুড়ার যথেচ্ছাচারে বাধা দিত, ফলে খুড়া ভাইপোতে একটা মনোমালিন্য ঘটিল। এ বাড়ীতে খুড়ার এই যথেচ্ছাচার এবং পিসে পিসীর প্রবল সহযোগ দেখিয়া তার অবস্থা অতিষ্ঠ হইয়াছিল। একমাত্র তার সান্ত্বনার স্থল ছিল মাতৃসমা বৌদিদি নয়নতারা। উভয়েরই এক অবস্থা, একভাব, এক দুঃখ। নয়নতারা এখন আর বালিকা বধূ নন। গৃহিণী হইবার মত বুদ্ধি বিবেচনা ও বয়স হইয়াছে, কিন্তু পিসিশাশুড়ীর প্রবল প্রতাপে তিনি বিরক্তি ও ঘৃণা বোধ করিয়া সংসার হইতে হাত গুটাইয়া ঠাকুর দেবতার চিন্তায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। সংসারে না থাকিলে নয় তাই থাকা। পুত্র তুল্য এই দেবরের প্রতি একমাত্র মায়ায় তিনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই ইহকালে এই একমাত্র স্নেহের খুঁটীতে মনটীর এক প্রান্ত বাঁধিয়া অন্য প্রান্তটী তিনি পরকালের চিন্তার দিকে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া ছিলেন। সংসারের অন্য সব ব্যাপারের 'হাঁ' বা 'না' কিছুতেই বড় গা দিতেন না।

ভবানীপ্রসাদও ইদানীং বড় আর দেশের বাড়ীর ধার মাড়াইত না। পড়া শুনা ও স্বাস্থ্যের অছিলায় কলিকাতাতেই পড়িয়া থাকিত। কেবল বৌদিদির স্নেহের আহ্বান পাইলে সে বাড়ী আসিত। নচেৎ নয়। ভবানী প্রসাদের এরূপ বৈরাগ্যের বিশেষ কারণ হইয়াছিল। যদুপাল নামে জনৈক প্রজা বাকী খাজনা না দিতে পারায় তাহার একমাত্র সম্বল বীজধান বাজেয়াপ্ত হয়। যদু ভবানীর কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়ে। ভবানী তাহাকে মুক্তির আশ্বাস দিয়া

খুড়া মহাশয়ের কাছে যত্নব নিষ্কৃতি ভিক্ষা করে। রতনরায় তখন মহেশের সহিত বসিয়া কমিশনাব সাহেবের জন্ম নজরের ডালি দিবার ফর্দ্দ করিতে ছিলেন। ভাইপোর আবেদন শুনিয়া আল্‌বোলার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া চশমাটা কপালেব উপর তুলিয়া দিয়া বলিলেন—"আজ আবার কাব মাম্‌লা ?"

ভ। যত্নপালের বীজধান বাজেয়াপ্ত হলে ব্যাচারী কি খাবে ?

রতন। (নীরবে চাহিয়া থাকিয়া) হু! গ্রীষ্মেব ছুটী ফুরুতে আর ক'দিন ?

ভ। আর বারো দিন।

রতন। ছুটী ফুরুলে আব কলেজ গিয়ে কাজনি—এই গদিতেই বসে জমিদারী চালিও। সোজা কথা— "

ভ। আমি কি তা চাইছি, কাকা বাবু ?

রতন। চাইতে হবে কেন ? তুমি যখন এমন লায়েক হয়েছ তখন আমি কেন বুড়ো বয়সে আব বিষয়ের পাঁক গায়ে মাখি—সোজা কথা নয় কি ?

ভবানী নীরব। একে গুরু জন, তার উপর অসন্তোষ-জ্ঞাপক শ্লেষ বাক্য। সে চুপ করিয়া থাকিল।

মহেশ উত্তর করিল—"বাবাজীবন ! কিসে কি কর্ত্তব্য বাব মহাশয় ভাল জানেন—তোমরা ছেলে ছোকরা এতে কেন—

রতন। থামো মহেশ। ওরই তো বিষয় সম্পত্তি, দু'দিন পরে ও পাবে, আমাদের কেবল ম্যানেজারী করা, ও যদি বোঝে এ ক্ষেত্রে এই কর্ত্তব্য ও ক্ষেত্রে ওই কর্ত্তব্য অর্থাৎ এ সব ব্যাপারে নায়েক হয়েছে তা হলে ওই সব করুক—(চুপ করিয়া) বাপু জমীদারীও রাখবো, আবার দয়া ধর্ম্ম দেখিয়ে খুড়োকে টেক্কা দেবো লোকের প্রিয়পাত্র হবো এরকম দু'দিক বজায় থাকে না—আমার কর্ত্তব্য আমি করছি—তোমার কর্ত্তব্য তুমি করবে যখন তোমার মাথার ওপর উপরিওলা কেউ না থাকবে—এই সোজা কথা—

ম। যখন তখন প্রজাদের হয়ে বাবাজী এই যে ধরতে কইতে আস এতে ওদের আস্পর্দ্ধা বেড়ে—

র। থামো মহেশ। ওকে বুঝতে দাও, আমাকে বোঝাতে দাও—জমীদারী রাখতে হলে—

ভবানী অধৈর্য্য হইয়া বলিল—আমায় মাপ্‌ করবেন আমি আর কোনো কথায় থাকবো না—

র। অন্ততঃ আমি যদ্দিন বেঁচে আছি আর জমীদারী যদ্দিন আমার অধিকারে আছে। সোজা কথা—

ভবানী প্রসাদ চলিয়া গেল। সে আর তদবধি কোনো কথায় তো থাকিতই না এবং পারত পক্ষে খুড়ার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিত না।

এই ঘটনার পর ভবানী প্রসাদ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে সে আর দেশে আসিবে না। লেখাপড়া শেষ করিয়া শিক্ষা বিভাগে কোনো একটা চাকরী লইয়া জীবন কাটাইয়া দিবে। কিন্তু তাই কি হয়? না পারা যায়? তার ইহজীবনের পরম আশ্রয়, স্নেহের তপ্তনীড় বৌদিদির কোলখানি খালি করিয়া কি দুর্ব্বল ডানা মেলিয়া আকাশের মেঘ ঝড়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে সে পারে?

তার দুঃখ এই যে সে এখন আর ছোট ছেলেটী নয়, শিক্ষিত বুদ্ধিমান বিবেচক যুবা পুরুষ। নিজেকে সে এই জমীদারীর ন্যায্য উত্তরাধিকারী মনে করে। লোকেও তার কাছে অনেক প্রত্যাশা করে, কাজেই ভাবী জমীদার যে ইচ্ছা করিলে দায় বা দৈবে তাহাদের উপকার করিবে এ আশা প্রত্যাশা অন্যায় অসম্ভব নয়। কিন্তু ভবানী যখন দেখিল যে কোনো ক্ষেত্রেই সে অসহায় উৎপীড়িতকে আশা আশ্বাস দিয়া উপকার করিতে পারিতেছে না, তখন তার মন ভাঙিয়া পড়িবারই কথা। এবার সে বাস্তবিকই বড় লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। ছুটীর এখন ১০।১১ দিন বাকী থাকিলেও সে স্থির করিল চলিয়া যাইবেই। পাছে বৌদিদি মনে আঘাত পান এই ভয়ে সে একটা অছিলা করিয়া ছুটী লইতে গেল।

নয়নতারা তখন পূজানিরতা। বেলা এগারোটারও বেশী। ভবানী ধীরে ধীরে পা টিপিয়া আসিয়া ঠাকুর ঘরের এক পাশে জানালার কাছে বসিয়া বৌদির পূজাশেষের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জানালার ভিতর দিয়া সে অন্দরের ফুল বাগানের দিকে চোখ মেলিল। ঝরা শিউলিফুলে কচিঘাসের কার্পেট ভরিয়া গিয়াছে। রং বাহারে দোপাটীর সার কার্পেটের পাড়ের মত দেখাইতেছে। এক কোনে একটা কলকে ফুলের গাছ। তার পাশে একটা পঞ্চমুখী জবা রক্তলোচনের মত লাল, তাহারি ডালপালা জড়াইয়া একটা নীল অপরাজিতা নীলমণির হারের মত জবার ডাল পালা গুলি জড়াইয়া রহিয়াছে। কার্পেটের মাঝখানে একটা গোল জায়গা জুড়িয়া নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়। এই বাগানটী আর এই জানালার

ধারের আসনটী নয়নতারার বড় প্রিয়স্থান। তারই বিপরীত দেওয়ালে নয়নতারার স্বামীর একটা সমগ্র-মূর্ত্তি ফটো। ছবিটী টাট্‌কা শিউলিফুলের মালায় রোজ শোভিত ও পুজিত হয়। তারি নীচে স্বামীরই অঙ্কিত নয়ন-তারার নিজের একটা রংচিত্র; ছবির সঙ্গে আসলের কোন সাদৃশ্য নাই। অন্নদা প্রসাদ ছবি আঁকিতে শিখিয়াই প্রথমেই পত্নীর এক চিত্র আঁকেন। এই ছবি দেখিয়া অন্য কেহ আসলের সঙ্গের নকলের কোনো সদৃশ্য দেখিতে পাইত না। পাইত কেবল অন্নদা নিজে ও নয়নতারা। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিলে অন্নদা বলিতেন,—"আসলটাকে আমার মন যেমন দেখতে চায় বা দেখে, আমি তারি নকল করিছি, আসলে আসলটী লোকের চোখে যেমন, আমার চোখে তেমন নয়, এতো ঠিক? আমি যদি আমার মানসী মূর্ত্তিকে না নকল করি তা হ'লে false art (ঝুটাকলা) হবে, যাকে বলে ফটো তোলা তাই হবে? পোট্রেট্ চেহারা-চিত্রের এইটে হলো highest সব চেয়ে উঁচু কারচুপি। তা না হলে হুবহু নকল করে একটা form বা মূর্ত্তি খাড়া করায় বাহাদুরী কি? যে চেহারা চিত্রে portraitএ ভিতরের আসল মানুষটা না ধরা দিলে সে ছবি ছবিই নয়। ধর, নেপোলিয়ন বা ফ্রানসিসের যে চিত্র আঁকা হবে তাতে চেহারার আকারটা রেখায় ফুটিয়ে তোলাটাই শিল্পির বাহাদুরী নয়, বাহাদুরী হচ্চে ব্যক্তিবিশেষের মূর্ত্তিমান তেজ, বীরত্ব, দম্ভ বা ত্যাগ, বৈরাগ্য ভগবদ্ভক্তিকে ফুটিয়ে তোলা। লোকে দেখলেই বুঝবে এইটে আসল নেপোলিয়ন বা এইটে আসল সেণ্ট ফ্রান্‌সিস্। ভাল শিল্পী মনের রং দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বটাকে ফুটিয়ে তোলে।" যে সময় ও যাহার সহিত তর্কচ্ছলে অন্নদা এই সব কথার ব্যাখ্যা করেন তখন ভবানী উপস্থিত ছিল। তাহার সমস্ত কথা মনে পড়িল। এ ছবিখানি যে সময়ের নয়নতারা তখন ১৪ বছরের। এখন নয়নতারার বয়স ৩০।৩২ হইবে, ভবানী অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকাইয়া তারপর আসলের দিকে তাকাইল। নয়নতারা সেই মাত্র পূজা শেষ করিয়া দেবরের দিকে তাকাইলেন। দুই জনে চোখোচোখি হইল। নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছ ঠাকুরপো?"

ভ। দাদার আঁকার ছবির সঙ্গে তোমাকে মেলাচ্ছিলাম, বৌদি।

ন। মিললো—?

ভ। এতদিনে যেন বুঝছি, ঠিক মিলেছে সত্যি বৌ দি। আমরা তখন ঠাট্টা করতাম দাদা তোমাকে ভুল করে বাড়িয়ে এঁকেছে তুমি তখন কি অত গম্ভীর আর অত সুন্দর ছিলে?

ন। এখন খুব গম্ভীর আর সুন্দর হয়িছি ?

ভ। হ্যাঁ বৌদি। দাদা তোমায় ঠিক দেখেছিলেন আর বুঝেছিলেন — তখন আমরা বলতাম, ঐটুকু পাতলা মিন্ মিনে বউ, আর দাদা এঁকেছেন যেন গিন্নিবান্নি গম্ভীর এক লক্ষ্মী ঠাকরুণ। এতদিনে তুমি আর তোমার ছবি দুজনের মিল হয়েছে। বেশ 'মা' 'মা' চেহারা হয়েছে।

নয়ন। তা যেন হলুম। তুমি হঠাৎ এখন কি জন্যে এলে ?

ভ। একটা পরামর্শ চাই, তোমার পুজোর ব্যাঘাত হলো ?

নয়ন। না না, পুজোর আবার ব্যাঘাত হয়। কি পরামর্শ।

ভবানী। আচ্ছা, বৌদি, আমি যদি আর বাড়ী না আসি ? কলকাতাতেই থাকি ?

নয়ন। হঠাৎ এ কথা কেন ?

ভ। কি লাভ এখানে থেকে ? লোকে জানে আমি জমীদারের ভাইপো ভাবী জমিদার, বিপদে আপদে পড়লে লোকে এসে আমায় ধরে. যদি তাদের কোনো উপকার করতে না পারি তবে মিছে এখানে থেকে চোখে এসব দেখা কেন ?

ভবানী সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। নয়নতারা শুনিয়া বলিলেন—'বলতে পার, কিন্তু তার জন্যে ঘর বাড়ী ছেড়ে উদাসী হতে হবে। আচ্ছা ঠাকুরপো আমি যদি তোমার মা হতাম তা হলে এই অভিমান করতে পারতে ? তুমি ঘর বাড়ী ছেড়ে বিদেশে চলে গেলে আমার কষ্ট হবে না ?

ভ। তুমিও চলো কলিকাতার বাসায় থাক্‌বে - আমার সেখানে একলা বড় অসুবিধে হয়, খাওয়া পরার ভারি কষ্ট

ন। তা জানি, যেতেও পারি, আমার এখানে কিসের মায়া ? কিসেরই বা বন্ধন, ভাই ? তবু যাইনি কেন জান ?

ভ। না, ধর্ম্ম কর্ম্মর বার ব্রতের অসুবিধা হবে, নয়।

ন। পাগল। ধর্ম্ম কর্ম্ম কি জায়গার রূপর ভাই। তা নয়—বাবা তো আর চিরকাল নন, তাঁর অবর্ত্তমানে এ জমিদারী তোমার তা জানো ? নানাকারণে এর উপর আমার একটু নজর রাখতে হয়, তুমি ছেলেমানুষ সব বোঝ না, বিষয় সম্পত্তিতে শনির নজর পড়েছে, যদিচ আমি মেয়ে মানুষ, হাতে কলমে কিছু করতে পারিনি, তবু যা পারি নজর রেখে চলছি।

ভ। যায় যাক্, থাকে থাক্, আমার তাতে লোকসান নেই বৌদি—

জমীদারের ছেলেও নই, বনেদী চালও নয়, যে সম্পত্তি না হলে মারা যাব—

ন। ওই কি কথা হল, ঠাকুরপো? লেখা পড়া শিখেছ:তো? তোমার নয় কিন্তু আইনমতে তোমার হাতে তো একদিন আসবে? ধর না ভগবান তোমাকে অছি নিযুক্ত করছেন, তুমি ইচ্ছে করলে তো লোক জনের দেশের দশের উপকার করতে পার? এ সুযোগ তুমি ছাড়বে কেন? ধর যদি একজন পুষ্যিপুত্তুরের হাতে পড়তো?

ভ। ভাল কথা মনে করে দিয়েছ, বৌদি। আচ্ছা, তুমি কেন পুষিপুত্তুর একটা নাও না?

ন। (হাসিয়া) কি দুঃখে?

ভ। পরকালে জল পাবে, বংশ রক্ষে হবে।

ন। আমার শ্বশুরের বংশ তোমা হতে থাকবে না? তুমি আমার মুখে পরকালে একটু জল দিতে পারবে না?

ভ। তা কেন পারবো না।

ন। তবেই তা হলেই আমার ঢের। পুষ্যি নেওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি যেন আমায় ভগবান না দেন।

ভ। কেন বৌদি? মেয়ে মানুষ—নিঃসন্তান মেয়ে মানুষ হয়ে তুমি ওই কথা বল্লে!

ন। তুমি বুঝবে না, ভাই, তোমায় ঠেলে ফেলে পুষ্যিপুত্তুর দিয়ে আমার পরকাল রক্ষা করা চাইনি। না ও সব দুর্ম্মতি কর না—যেও না—

ভ। থেকে করবো কি? লোকের কাছে বেরুতে পরিচয় দিতে লজ্জা করে—

ন। নিজে পয়সা দিয়ে গতরে যা পার উপকার কর—

ভ। পয়সা?

ন। আচ্ছা তার জন্যে আটকাবে না—

সুস্থ ও প্রফুল্লমনে ভবানী বাহিরে গেল। ছুটী ফুরাইলে সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। মাতৃসমা বৌদিদির কথাগুলি তাহার অবশ মনে এমনি করিয়া টনিকের কাজ করিত।

যাত্রী।

[সাহাদাৎ হোসেন।]

ছায়া-ঘেরা কুঞ্জের মাঝেতে
একেলাটী আনমনে সাঁঝেতে
উদাস নয়ন তুলে কি যেন স্বপন ভুলে
চেয়ে আছি কনকিত সুদূরে ,—
দিনের আলোক-তরী নীলিমার পরপারে
পাল তুলে চলে' যায় কোন্ মহা পারাবারে ,
গম্ভীরে মধুরে—
ধরণীর ছবিখানি শোভিতেছে সুদূরে।
একেলা উদাস মনে বিজনে
বসে আছি সন্ধ্যার কাননে,
সম্মুখে তটিনী বাঁকা উরসে কিরণ মাখা
অস্ফুট কল্লোলে গাহিয়া,
বঙ্কিম বনপথে চলে মধু-নর্ত্তনে
সোণার সলিল বুকে খেলে মৃদু কম্পনে
শেষ গান গাহিয়া।
কিশোর গোপাল ধায় গোষ্ঠেতে নাচিয়া।
ঠুন্ ঠুন্ ঝঙ্কারি কাঁকণে
শেষ ঘট কাঁখে ধীর গমনে
চলে যায় কুলবালা গৃহপথ করি আলা
অঙ্গ-সুরভি খেলে পবনে,—
ঘাটের সোপান-পরে সিক্ত চরণরেখা
বঙ্কিম ঠামে আধ অঙ্কিত যায় দেখা ,
মন্থর গমনে
শেষ ঘট লয়ে গেল তরুণী সে ভবনে।
সহসা দূরের গানে চমকি'
বিস্মিত আঁখি তুলি নিরখি—

সান্ধ্য-নদীর বুকে গান গেয়ে মনোসুখে
পাল তোলা তরীখানি বাহিয়া
সুদূরের নেয়ে কেবা ধেয়ে আসে মোর পানে ,
অজানা সে কোন্ দেশে ঘর তার কেবা জানে।
বসে' আছি চাহিয়া—
দেখিতে দেখিতে তরী তীরে লাগে আসিয়া ।
একি হেরি অপরূপ। তরুণী
বেয়ে এল নদীবুকে তরণী।
মুখে তার হাসিমাখা নয়নে চাহনি বাঁকা,
গোপন মরম-কথা আভাসে
জানায়ে কহিল মোর চলিতে সুদূর দেশে
ভরা পালে তার সনে তরী বেয়ে ভেসে ভেসে
অনুকূল বাতাসে
কল্পনা-লীলাময় কুঞ্জের নিবাসে ।
চেয়ে র'নু ভুলে গিয়ে সকলি
তরুণী নেয়ের মুখে কেবলি,—
করে ধরি তরী-পরে নিল সে উঠায়ে মোরে
বসা'ল সমুখে মোরে আদরে ,
ভাসিল আবার তরী সাঁঝের তটিনী-বুকে
ধরিল সে পুন তান মৃদু হাসি' মনোসুখে।
কম্পিত লহরে
উচ্ছলা রঙ্গিনী ধাইল সে সাগরে।
আজিও চলেছে ভেসে বিজনে
গান গেয়ে তরী বেয়ে দুজনে,
নাহি হেথা কোলাহল, অস্ফুট কলকল

দুপারে ধূসর বারি দূরে নীলবনরেখা
অঙ্কিত ছবি সম দূর পটে যায় দেখা।
তরঙ্গে নাচিছে
ছোট তরী, তরুণী সে তালে তালে গাহিছে।

নাহি জানি কতদিনে শেষ হবে গান গাওয়া,
বুঝি না ত কতদিনে কূল সে যাবে পাওয়া ,—
তবুও চলেছি ভেসে নাবিকের মায়া-ঘোরে
বুঝি না এ নেয়ে মোরে বেঁধেছে কিসের ডোরে।

ফাল্গুনী ও বর্ত্তমান সমস্যা।

[শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ গুহ রায়।]

প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন এক একটা দিন আসে যে দিন হইতে তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। যে ভাবে, যে পথে তাহার জীবন পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতে ছিল, হঠাৎ একটা বিষম ধাক্কা খাইয়া প্রথমটা সমস্তই যেন ওলটপালট হইয়া যায়,—কোন কিছুরই পূর্ব্বাপর্য্য, পুরাতন গতানুগতিকের চির পরিচিত ধারাবাহিক পথ-ধারা আর ঠিক থাকে না ,—পথ যাহা ছিল, তাহার প্রতি মৃত্তিকা কণা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, ভাবধারা—যাহা ধরিয়া জাতীর জীবন অগ্রসর হইত তাহা ওতপ্রোত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। সেই দিন হইতে সেই ইতস্ততঃ অতিবিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খলার স্তূপ হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগৃহীত হইয়া আবার নূতন করিয়া চলিবার পথ ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে—পুরাতন আদর্শের ভগ্নস্তূপ হইতে আবার নূতন আদর্শ গড়িয়া উঠিয়া মুগ্ধ বিমূঢ় জাতিকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলে।

প্রত্যেক জাতির জীবনেতিহাসেই এমন এক একটা যুগ আসে যখন তাহার সম্মুখ-দৃষ্টি অগ্রগমনের পথ হারাইয়া ফেলিয়া দৃষ্টিহীনের মত বিপথে চলে , ভীত, ত্রস্ত চরণে কখনও একটু সম্মুখে হাঁটিয়া আবার ততোধিক বিহ্বল চরণে পিছনে সরিয়া আসে , কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে অতি সতর্কতায় পা বাড়াইয়া আবার সাথে সাথে একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় পুরাতনের গৃহদ্বারেই ফিরিয়া আসিতে চাহে। জাতির অন্তরাত্মা তখন যে পথ হইতে যাত্রা সুরু করিয়াছিল—সেখান হইতে যতদূর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে ততদূর পর্য্যন্ত স্থান কেবল হাতড়াইয়া বেড়ায় —একটু পা রাখিবার স্থান চাহে, স্বস্তির একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার জন্য

তাহার সমস্ত প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। ইহাই যুগান্তরের প্রকাণ্ড লক্ষণ। নূতন পথ গড়িয়া তুলিবার জন্য যে প্রলয়ের আগমন তাহার বোধন এই জীর্ণ ইমারতের প্রতি ভগ্ন ইষ্টকের প্রাণের স্তরে স্তরে অমনি বাজিয়া উঠিতে আরম্ভ হয়।

জাতির জীবনের এই দিনটাই যুগসন্ধি কাল। জাতির ভাবিবার শক্তি তখন পঙ্গু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দৃষ্টি তখন ঝাপসা, প্রাণ অবসাদপূর্ণ। চিরদিন যাহারা অগ্রগমনের নান্দীপাঠ করে তাহাদের পা পর্য্যন্ত তখন কি একটা অনুপলব্ধ ভয়ে আর চলিতে চাহে না,—নানা যুক্তি তর্ক নামাইয়া তখন তাহারা জাতির আত্মাকে আরও দিশাহারা করিয়া তোলে। যে অন্ধ-বাউলের শুধু বাঁশী শুনিয়া শুনিয়া এতটা পথ তাহারা নির্ব্বিকারে, অতি আনন্দে চলিয়া আসিয়াছে সেই বিশ্বাসকে পর্য্যন্ত তাহারা আজ মানিতে চাহে না। যে নব-যৌবনের দল চিরবসন্তের অন্তরাত্মার সন্ধানে সারা পথ কেবল অর্থহীন গানে গানে, পাগল সাগর-নীরের ক্ষ্যাপা তালে তালে নাচিয়া চলিয়াছে তাহারা পর্য্যন্ত এই সন্ধিক্ষণে অতল কালো গুহা-মুখে দাঁড়াইয়া আর অগ্রসর হইতে চাহে না। তরুণ সূর্য্যের প্রভাতী আলো আর পূর্ণিমায় ভরা-চন্দ্রের কুহেলিভরা জ্যোৎস্না যাহাদের পথ ম্লানোজ্জল করিয়া রাখিয়াছিল আজ তাহারা সূর্য্য ও চন্দ্রের তিরোভাবে ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠে।" সমস্তদিন ধূলা আর ছায়ার পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান্ হইয়া "জাতির আত্মা—এই নবজীবনের দল, তখন মনে করে যে বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। চলিবার পথে, যতদিন পর্য্যন্ত অগ্রগমনের পথ পরিষ্কার ছিল ততদিন পর্য্যন্ত কখনও মনে হয় নাই "ভুল হইয়া গিয়াছে বা ঠকিয়াছি, কিন্তু যত বাধা, যত সংশয় এখনই মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। মনে হয় বৃদ্ধ "শ্রুতিভূষণ"ই ঠিক কহিত, "দাদার" কাঠখোট্টা চৌপদী গুলোর উপরই শ্রদ্ধা বাড়িতে আরম্ভ করে।

প্রত্যেক সমাজেই এই "শ্রুতিভূষণ" ও "দাদা" আছে। ইহারা হাস্ত রসকে জীবন হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিলে বাঁচেন, কোন কিছু আশা করাকে ইহারা মহাপাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাদের "উপদেশের এক ফুৎ-কারেই আশা-প্রদীপের জলন্ত শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।" যে স্পর্শে পৃথিবীর ধূলা মাটি পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠে সেই বসন্তের আমেজও ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহারাও চলেন বটে তবে চলিবার টানের সময়ও পেছন দিকে ঝুঁকি রাখেন, যতটা বেগ কমান যায়।

জাতির জীবনে ইহাদেরও প্রয়োজন আছে সত্য কিন্তু যুগসন্ধিক্ষণে ইঁহারা প্রয়োজন অপেক্ষা অপ্রয়োজনের পক্ষপাতিত্বই বেশী করিয়া থাকেন। যে নবযৌবনের দল এতদিন একটা বাধাবন্ধহীন অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহারাই আজ হতাশ হইয়া উঠে। অলক্ষিত অদৃষ্টের বিদ্রূপহাস্ত তখনই দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে যখন তাহারা পেছন ফিরিয়া এতদিন যে দ্রৌপদী-ভক্ত দাদাকে কেবল ঠাট্টাই করিয়া আসিয়াছে তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহে। এই যে অগ্রগমনের দল, এই যে সীমাহারা পথের চিরানন্দ পথিককুল যাহাদের পথচলার আনন্দে সমগ্র বিশ্ব পুলকিত হইয়া উঠে তাহারাই যখন ফিরিতে চাহে, যে পথ দিয়া নির্ভয় আনন্দে তাহারা গান গাহিয়া আসিয়াছে সে পথেই হতাশাখিন্ন-মুখে যখন তাহারা ফিরিতে চাহে, তখনই বুঝিতে হইবে জাতির আসন্ন মৃত্যু সম্মুখীন। যে জাতি সৌভাগ্যবান্ সে বাঁচিয়া যায়, যে নয় সে মরে।

আজ আমরা যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, সে স্থানের সে যুগের সম্বন্ধে কি এই সমস্তই খাটে না? যাঁহারা 'অনাবশ্যককেই জীবনে বরণ করিবার আবশ্যকতা এতদিন বুঝাইয়া আসিতে ছিলেন তাঁহারা কি একটা উল্টা সুরে গান ফিরিয়া গাহিবার চেষ্টা করিতেছেন না, জীবনের প্রতি উৎসমুখই কি দৈহিক ও সাংসারিক নিকট প্রয়োজনের জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে? সত্য সত্যই কি—

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে
যে হেতু সে লাগে বিশ্বকাজে॥

কবিতায় ও ছন্দে অনাবশ্যকের বন্দনা-গীতি যখনই বাজিয়া উঠিয়াছে তখনই দেখিয়াছি কত নবীনের উপাসক ছুটিয়া আসিয়াছে তাহাকে জীবন ও কার্য্যে বরণ করিয়া লইতে, কিন্তু আজ অনাবশ্যক যখন সত্য সত্যই বস্তুগত্যা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন এই চির-তরুণ নূতনকে দেহ মনে বরণ করিয়া লইবার মত হৃদয়ের বিরলতা দেখি কেন? বিধাতার ঝঞ্ঝাকে যাহারা কবিতায় আরাধনা করিয়াছে আজ সে ঝঞ্ঝা যখন তাহার পূর্ণ রুদ্র মধুর বেশে নামিয়া আসিয়াছে তখন তাহারা গৃহকোণে লুকায়িত কেন? ইহাই সমস্যা।

এই সমস্যাই নবযৌবনের দলকে এক অশুভ সন্ধ্যায় ব্যাকুল করিয়া

তুলিয়াছিল। যে অতি বিবেচকের ভীত পরামর্শে চিরদিন অবহেলা দেখাইয়া তাহারা এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, সেই অতি বিবেচক "দাদা"কেই সে সন্ধ্যায় তাহারা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছিল। এতদিন তাহারা আদ্যিকালের বুড়োকে চাহিয়াছিল বটে কিন্তু নিজেদের প্রাণে প্রাণে সেই "বুড়োর প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাই আজ অতি নিকটে আসিয়াও, লক্ষ্য একরূপ হাতের মুঠায় পাইয়াও তাহাদের মন দ্বিধা কম্পিত। এক একবার তাই তাহারা সব ফেলিয়া আবার পুরাতন পথে ফিরিবার মন করিতেছিল।

একই সমস্যা আজ আমাদিগকে বিহ্বল করিতেছে। এতদিন আমরা যাহা চাই বলিয়া লাফালাফি করিতেছিলাম, গান সুরু করিয়া দিয়াছিলাম, আজ তাহারি গৃহ-কোণে আসিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয় আমাদের প্রাণ অভিভূত করিতেছে, আজ মনের গোপন অন্তঃপুরে বলিতেছি "কাজ নাই ভাই ফ্যাসাদে —বেশ ছিলাম কিন্তু দুই বৎসর আগে"—যদিও বাহিরে বলি এ পথ ঠিক নয়, পাশ দিয়া ঠিক রাস্তা গিয়াছে। আজ আমরা তর্কবিতর্ক, বাধাবন্ধের-সূক্ষ্ম আলোচনায় বসিয়া গিয়াছি যদিও এতদিন এই তার্কিককে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করিতে মোটেই কুণ্ঠিত হই নাই। আজ আমরা কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহিতেছি না। কোনরূপ ফল প্রাপ্তির উপর আমরা বিশ্বাসী নই। যাহাদের অতিবিবেচক বলিয়া তিরস্কার করিয়া আসিয়াছি তাহাদেরি তর্কধারা আপন করিয়া লইয়া আজ আমরা মধ্যপন্থী হইতে চাহিতেছি—যাহারা পিছনে আছে আর যাহারা সম্মুখে আছে উভয়কেই তাহা হইলে বিদ্রূপ করিতে পারিব।

আজ ভুলিয়া যাইতেছি জাতির জীবনেতিহাসের কথা। আজ মনে রাখিতে হইবে সকল তর্ক, সকল যুক্তিবাদ সব ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে বিশ্বাসের স্থান। মনে রাখিতে হইবে এই সব যুগ-সন্ধিক্ষণে কোন যুক্তিবাদ কোন তর্ক ছল জাতিকে অগ্রসর করাইতে পারিবে না।—একমাত্র সিদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসই দৃষ্টিহীন বাউলের মত এই নবযৌবনের দল, তথা সমগ্রজাতিকে নূতন পথে নূতন আলোতে লইয়া যাইবে—তাহারই বাঁশীর সুরে সুরে গানের পরতে পরতে যে আদর্শ লুক্কায়িত আছে তাহাই জাতির দৃষ্টির সম্মুখে ভবিষ্যৎ আদর্শ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। এইরূপ সন্ধিক্ষণে সকল যুক্তির উপরে সিদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসের স্থান, তাই নবযৌবনের দলকে যে

ভীষণ সমস্যা হইতে উদ্ধার করিয়া পথ প্রদর্শক হইয়াছিল সে অন্ধ সে বাউল। সে শুধু গাহিয়াছিল—এস, এস, এস আমি পথ দেখাইব। সে কহিয়াছিল—এস, এস, এস, আমি পথ দেখাইব। সে কহিয়াছিল "আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস। গান না গাইলে আমি রাস্তা পাইনে। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়—সে এগিয়ে চলে আমি পিছনে চলি।"

আজ কি আমরা একটা সমস্যায় পড়ি নাই? যে ভাব আমাদের মজ্জায় মজ্জায় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল তাহাকে আজ আমরা ছাড়িবার জন্য অতি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের দৃষ্টি আজ ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের ভাবিবার শক্তি ত পঙ্গু। আজ কেহ আমরা পিছনে যাইতে চাহি, কেহ সম্মুখে, কেহ কোথায়ও না, কেহ পাশে। আজ এমন অবস্থায় আমরা বিধাতার বিদ্যুৎকে, বজ্রকে, দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিলে যে আর চলিতেই পারিব না। আজ রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য আশ্বাস বাণী স্মরণ করিয়া আমরা যেন পথ চলি—

"বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতি-বিবেচকের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্ব্বল করিয়ো না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, বন্যা আসে তখন সংযতবেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভালোমন্দ, লাভক্ষতি দুইই লইয়া আসে। যখন বৃহৎ উদ্যোগে সমস্ত দেশের চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন সে নিতান্ত শান্তভাবে, বিজ্ঞভাবে, বিবেচকভাবে, বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই—তাহার বেগ, তাহার দুঃখ, তাহার ক্ষতি, আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে—সেই সমুদ্র-মন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।"

আজ তাই এই যে ছেলের দল স্কুল কালেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে ইহাতে অনর্থপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও বিচলিত হইবার কোন কারণই নাই। আমাদের গতানুগতিক ভাবধারার সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই ইহাদের বাধা দেওয়া অন্যায়। সমাজের প্রত্যেক অংশই যে ইহাদের পথানুসরণ সাথে সাথেই করিবে ইহা ভাবাও অসঙ্গত। নবযৌবনের দল যখন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল তখনও খেয়াঘাটের মাঝি তাহার চিরন্তনী হাল ফেলিয়া তাহাদের সাথে রওনা হয় নাই বা কোটাল মহাশয়ও তাহার চৌকিদারি ছাড়িয়া ইহাদের দলে ভিড়েন নাই।

"ফাল্গুনী" এই হিসাবে বিশ্বসভ্যতা ইতিহাসের কাব্যমূর্ত্তি। যুগে যুগে মানুষের জীবনে, প্রত্যেক জাতির অন্তরাত্মাতে এই নাট্য গীত হইয়াছে—ইহাই যুগ যুগ ধরিয়া গীত হইবে। সমগ্র নবযৌবনের দল এই যে পুরাতনের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কাণে কাণে, প্রাণে প্রাণে অন্ধ বাউলের সেই প্রাণ সাধনার সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক—

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ীরে আনন্দ গান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্,
আশার অরুণা লোক
হোক্ অভ্যুদয় রে॥

উন্মাদিনী রাই

[শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বাছুরি দেখিলে অমনি ছুটিয়া
কোলে সে লইছে তুলি'
নিজেরে যেন সে বঁধুয়া ভাবিছে
কেবলি আপনা ভুলি'।
গলিত কদম খুঁটিয়া খুঁটিয়া
খোঁপায় গুঁজে সে তাই,
কদমে লাগিয়া সে' চরণ-রেণু—
ভাবিয়া আকুল রাই!

পিয়ালের শাখে পিক যদি ডাকে—
সেথায় তাহার কাণ,
মনে বুঝি হয়— বঁধুর বাঁশরী
এমনি করিছে ভাণ।
যমুনা সলিলে নাহিতে নামিলে
উঠিতে সে নাহি চায়,
বঁধুর দেহের পরশ টুকুন
মাখা আছে যমুনায়।
চাঁপার বরণ আজিকে এমন
হ'য়েছে গো কালো ঝুল।—
সেই রূপে আজ বঁধুরে নেহারি
বাধা হ'ল মশগুল।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে জেলে গিয়া পৌছিলাম, সে রাত্রে আর ভালমন্দ কিছু ভাবিবার অবস্থা আমাদের ছিল না। ধরা পড়িবার পর বারীন্দ্র বলিয়াছিল—My mission is over—আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে!—কিন্তু সে কথার প্রতিধ্বনি ত নিজের মধ্যে একটুও খুঁজিয়া পাইলাম না। দেশের কাজ ত সবই বাকি।—শুধু আমাদের কাজই ফুরাইয়া গেল! প্রাণভরা সহস্র আকাঙ্ক্ষা, কত কি বিচিত্র কল্পনা লইয়া যুগান্তর গড়িতে নামিয়াছিলাম—এক ভূমিকম্পে সবটাই ধুলিসাৎ হইয়া গেল। এ জগতে শুধু পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ীটাই সত্য, আর বাকি সবটাই মায়া? অতীতের কত স্মৃতি তুবড়ী বাজীর মত মাথায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল তিন চার মাস দেশময় টো টো করিয়া ঘুরিয়া যখন শীর্ণ ক্লান্ত দেহভার লইয়া একদিন বাড়ীতে ফিরিয়াছিলাম

তখন মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া অভিমান ভরে বলিয়াছিলেন—"ছেলের আর আমার মায়ের রান্না ভাত ভাল লাগে না। কোথায় দীন দুঃখীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়াস্, বাবা। 'বড় নোকের' ছেলে, শেষে কি কোন দিন পুলিসে ধরে 'অপমানি্য' করবে!"—আজ সত্য সত্যই পুলিসে ধরিয়া 'অপমান্যি' করিল। আবার মনে পড়িল সেই পাহারাওয়ালার কথা যে আসিতে আসিতে বলিয়াছিল—'বাবুজী তোমরা যদি একটা কিছু গোলাগুলি ছুঁড়তে, তাহলে আমরা সবাই পালিয়ে যেতুম।" তাইত! চুপ চাপ একেবারে ভেড়ার দলের মত ধরা পড়িলাম। এ দুঃখ যে মরিলেও ঘুচিবে না। একজন পুলিস সার্জেণ্ট ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—"এরা এমনি সুবোধ ছেলে যে বাগানে ঘুমাইবার সময় রাস্তায় একজন পাহারা পর্য্যন্ত রাখে নাই।" কথাটা সারারাত মাথার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু এখন আর হাত কামড়ান ছাড়া উপায় নাই। একবার উল্লাসের উপর রাগ ধরিল। পুলিসের দল যখন প্রথম বাগানে আসিয়া ঢুকে, তখন সে জাগিয়া উঠিয়াছিল, ইচ্ছা করিলে সে পলাইতেও পারিত। কিন্তু নির্ব্বিকার সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্ম পুরুষের ন্যায় সে ব্যাপারটা চুপ চাপ বসিয়া দেখিয়াছিল মাত্র; পলাইবার কথা তাহার মনে আসে নাই।

সে রাতটা এই রকম দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া কুঠরীর (cell) বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—নরক একেবারে গুলজার। আমাদের সব আড্ডাগুলির ছেলেরাই আসিয়া জুটিয়াছে। অধিকন্তু পাঁচ সাতজন অপরিচিত ছেলেও দেখিলাম। ইহারা আবার কোথাকার আমদানি? একটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাপু হে, তুমি কে বট?"

ছেলেটী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলল—"আজ্ঞে আমার বাড়ী মানিকতলায়। আপনাদের বাগানের কাছে সকালবেলা একটু মর্ণিং ওয়াক করতে গিছলাম, তাই—রা আমায় ধরে এনেছে। মর্ণিং ওয়াক করাটা যে এত বড় মহাপাপ তা'ত জানতুম না।"

দেখিলাম নগেন সেন গুপ্ত আর তার ভাই ধরনীকেও পুলিস জেলে পুরিয়াছে। বেচারারা বোমা 'ব' পর্য্যন্ত জানে না। পুলিসে বোমার আড্ডার সন্ধান পাইয়াছে ভাবিয়া উল্লাসকর বোমাগুলি কোথায় সরাইয়া রাখিবে স্থির করিতে না পারিয়া বাল্যবন্ধু নগেনের বাড়ীতে একটা বোমার প্যাটরা রাখিয়া আসিয়াছিল। প্যাটরার ভিতর

যে সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে, নগেন বা ধরণ' তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না। তাহাদের বাঁচাইবার জন্যই উল্লাস পুলী ণর নিকট সব কথা স্বীকার করিল। উল্লাসের বিশ্বাস ছিল যে সত্য কথ জানিতে পারিলেই পুলীসের কর্ত্তারা নগেন ও ধরণীর উপর আর যো ন্দমা চালাইবে না। পুলীস যে ঠিক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বংশ-সম্ভূত নয় এ ক' টা তখন ত আমাদের মাথায় ভাল করিয়া ঢুকে নাই।

ক্রমে পুলিস নানা জেলা হইতে অনেকগুলি ছলে আনিয়া হাজির করিল। শ্রীহট্ট হইতে সুশীল সেন ও তাহার দুই ভা বীরেন ও হেমচন্দ্র আসিল। সুশীলকে আমরা পূর্ব্বে চিনিতাম কিন্তু তাহাব ট ভাইকে ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মালদহ হইতে কৃষ্ণজীবন যশোহ হইতে বীরেন ঘোষ ও খুলনা হইতে সুধীরও আসিয়া পৌছিল।

আর আসিয়া পৌছিলেন আমার পুরাতন , পণ্ডিত হৃষীকেশ। হৃষীকেশ আমার ডফ কলেজের সহপাঠী। কলেজ হই' মা ইংরাজী সরস্বতীকে বয়কট করিয়া আমি যখন সাধুগিরি করিতে বাহির হ তখন পণ্ডিত হৃষীকেশ ভাবাধিক্য বশতঃ নিমতলার ঘাটের গঙ্গাজল স্পশ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সমস্ত সৎকর্ম্মে সে আমার সহগামী হইবে। ক নিমতলার ঘাট—মহাতীর্থ বলিলেই হয়, তাহার উপর মা গঙ্গা—একে , ব জাগ্রত দেবতা। সেখানকার প্রতিজ্ঞা কি আর বিফল হইবার জো আ ? মা গঙ্গা কি কুক্ষণেই তাহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মনে মনে 'তথাস্তু' বলিয়াছিলে· জানি না, কিন্তু সেইদিন হইতে আজ অবধি পণ্ডিত হৃষীকেশ আমার পিছনেই লাগিয়া আছে। শাস্ত্রে বলে যে উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, ‹ রাবে ও শ্মশানে, যে একসঙ্গে গিয়া দাঁড়ায়, সেই বান্ধব। হৃষীকেশের বিবা ও তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনে আমি লুচি খাইয়া আসিয়াছি, দুর্ভিক্ষের সময় দু ন পীড়িতের সেবা করিয়াছি, এক সঙ্গে উভয়ে সাধুগিরি করিয়া ফিরিয়াছি, ষ্টারীও করিয়াছি আজ রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে গিয়া একসঙ্গে উভয়ে পুলি র হাতে ধরাও পড়িলাম। ভবিষ্যতে যে উভয়কে একসঙ্গে শ্রীধাম আন্দাম বাস করিতে হইবে, তাহা তখন জানিতাম না। বান্ধবত্বের সব লক্ষণই .লিয়াছে, বাকি আছে শুধু শ্মশানটুকু। নিমতলার ব্রতটুকু এখন নিমত" উদ্‌যাপন করিয়া আসিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

যাক, সে ভবিষ্যতের কথা। জেলে গি : দুই দিন বিশ্রাম করিতে না

করিতেই দেখি পণ্ডিত হৃষীকেশ বিশাল দেহভার দোলাইতে দোলাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার সহিত মাণিকতলার বাগানের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, আমাদের কার্য্যকলাপের কিছু কিছু সে জানিত মাত্র। তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণও ছিল না। বাগানের কাগজ পত্রের মধ্যে দু এক জায়গায় তাহার নাম পাইয়া পুলীস সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ছিল। কিন্তু গঙ্গাজল ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা ত আর বিফল হইবার নয়, তাহাকে যে আন্দামানে যাইতেই হইবে। পুলীস যখন তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া গিয়া হাজির করে তখন তাহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটেরও তাহাকে নিরপরাধ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ দেখিয়াই বন্ধুর আমার মেজাজটা একেবারে বিগড়াইয়া গেল। মহামান্য সরকার বাহাদুরের রাজ্য ও শাসন নীতি সম্বন্ধে বন্ধু আমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আর এখানে পুনরুক্ত করিয়া এ বৃদ্ধ বয়সে বিপদে পড়িবার আমার ইচ্ছা নাই। পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেবের টম-ফুলারির (tom-foolery) আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া লাট মর্লীর পিতৃ-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে সবই ছিল। পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জেলের মধ্যে এক স্বতন্ত্র কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সংস্কার করিতে আদেশ দিলেন।

সপ্তাহের মধ্যে আসিয়া হাজির হইলেন শ্রীমান দেবব্রত। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে তিনি যুগান্তরের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নবশক্তির সম্পাদকের কাজ করিতেছিলেন। 'নবশক্তি' উঠিয়া যাওয়ার পর আপনার সাধন ভজন লইয়াই বাড়ীতে বসিয়া থাকিতেন। বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা দেখাশুনা করিতেন না। চলমান পর্ব্বতবৎ তিনিও একদিন সুপ্রভাতে আসিয়া হাজির হইলেন।

পুলীস কোর্টে শুনিয়াছিলাম যে আমরা যে দিন ধরা পড়ি সে দিন অরবিন্দ বাবুকেও ধরা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা জেলের যে অংশে আবদ্ধ ছিলাম সেখানে তাঁহার দেখা পাইলাম না। শুনিলাম তাঁহাকে অন্যত্র আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

হৃষীকেশকে যে দিন পুলিস ধরিয়া আনে তাহার দুই এক দিন আগে শ্রীরামপুর হইতে গোস্বামীদের বাড়ীর নরেন্দ্রকেও ধরিয়া আনিয়া ছিল। সে আমাদের সহিত এক জায়গায় আবদ্ধ ছিল।

আমাদের বাগানে একখানা নোটবুকে একটা নাম লেখা ছিল—চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী। খুলনার ইন্দুভূষণকে আমরা চারু বলিয়া ডাকিতাম। পুলিস তাহা না জানিয়া চারুচন্দ্র রায় চৌধুরীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে স্থির করিল যে চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ই ঐ চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী। চারুবাবুর বোধ হয় অপরাধ যে কানাইলাল দত্ত ও আমি উভয়েই তাঁহার ছাত্র ও উভয়েরই বাড়ী চন্দননগর। যাঁহার ছাত্রেরা এমন রাজদ্রোহী, তিনি 'রায়'ই হোন, আর 'রায় চৌধুরী'ই হোন তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাঁহাকে ত ধরিতেই হইবে।

যাক সে কথা। অল্পদিনের মধ্যেই এক এক করিয়া পুলিস প্রায় ৩০।৩৫ জন লোককে হাজতে টানিয়া আনিল। তিন চারটা কুঠরীতে তিন তিন জন করিয়া রাখিল, বাকি সকলের জন্য পৃথক পৃথক কুঠরীর ব্যবস্থা হইল।

ধরাপড়ার উত্তেজনা সামলাইতেই প্রায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম একটা প্রায় সাত হাত লম্বা ৫ হাত চওড়া কুঠরীর মধ্যে আমরা তিনটী প্রাণী আবদ্ধ আছি। আমি ছাড়া দুইটীই ছেলে মানুষ, একটীর বয়স বছর কুড়ি আর একটীর বয়স পনের। প্রথমটী নলিনী কান্ত গুপ্ত—প্রেসিডেন্সী কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, নিতান্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভাল ছেলে, আর দ্বিতীয়টী শচীন্দ্র নাথ সেন—ন্যাশন্যাল কলেজের পলাতক ছাত্র—একেবারে শিশু বা বাচ্ছা বলিলেই হয়। সেই কুটরীর এক কোণে শৌচ প্রস্রাবের জন্য দুইটী গামলা। তিন জনকেই সেইখানে কাজ সারিতে হয়, সুতরাং একজনকে ঐ অবশ্য কর্ত্তব্য অশ্লীল কর্ম্মটুকু করিতে গেলে আর দুই জনের চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কুঠরীর সামনে একটী ছোট বারান্দা, সেইখানে হাত মুখ ধুইবার ও স্নানাহার করিবার ব্যবস্থা। বারান্দার সামনে সরু লম্বা উঠান আর তাহার পরেই অভ্রভেদী প্রাচীর। প্রাচীরটা ছিল আমাদের চক্ষুশূল। সেটা যেন অহরহঃ চিৎকার করিয়া বলিত,—"তোমরা কয়েদী, তোমরা কয়েদী। আমার হাতে যখন পড়িয়াছ, তখন আর তোমাদের নিস্তার নাই।"

প্রাচীরের উপর দিয়া খানিকটা আকাশ ও একটা অশত্থ গাছের মাথা দেখিতে পাওয়া যাইত। জেলখানার কবিত্ব কেবল ঐটুকু লইয়াই, বাকি সবটাই একেবারে নিরেট গদ্য। আর সব চেয়ে কটমট গদ্য আহারের ব্যবস্থাটা।

প্রথম দিন তাহা দেখিয়া হাসি পাইল, দ্বিতীয় দিন রাগ ধরিল, তৃতীয় দিন কান্না আসিল। সকাল বেলা উঠিতে না উঠিতেই একটা প্রকাণ্ড কালো জোয়ান বাল্‌তি হইতে সাদা সাদা কি খানিকটা আমাদের লোহার থালের উপর ঢালিয়া দিয়া গেল। শুনিলাম উহাই আমাদের বাল্যভোগ এবং আলীপুরী ভাষায় উহার নাম 'লপ্‌সী'। 'লপ্‌সী' কিরে বাবা! শচীন দূর হইতে খানিকটা পরীক্ষা করিয়া বলিল—'ওহো! এ যে ফেন মিশান ভাত।'—পরদিন দেখিলাম দালের সহিত মিশিয়া লপ্‌সী পীতবর্ণ ধরিয়াছে, তৃতীয় দিন দেখিলাম উহা রক্তবর্ণ। শুনিলাম উহাতে গুড় দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই আমাদের প্রাতরাশের রাজকীয় সংস্করণ। সাড়ে দশটার সময় একটা টিনের বাটীর এক বাটী রেঙ্গুন চালের ভাত, খানিকটা অরহর ডাল, কি খানিকটা পাতা ও ডাঁটা সিদ্ধ ও একটু তেঁতুল গোলা। সন্ধ্যার সময় ও তদ্বৎ, কেবল তেঁতুল গোলাটুকু নাই।

ডাক্তার সাহেব ও জেলার বাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিবা মাত্র আমরা একটা প্রকাণ্ড উদর-নৈতিক আন্দোলন সুরু করিয়া দিলাম। ডাক্তার সাহেব জাতিতে আইরিস, নিতান্তই ভদ্রলোক। আমাদের সব কথাগুলি চুপ করিয়া শুনিয়া বলিলেন—"উপায় নাই। জেলের কয়েদীর খোরাক একেবারে দরকারের হিসাব মত বাঁধা। কাহারও অসুখ বিসুখ হইলে তিনি হাঁস-পাতাল হইতে পৃথক বন্দোবস্ত করিতে পারেন; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় অন্য আহার দিবার তাঁহার অধিকার নাই।" জেলার বাবু বলিলেন,—"জেলের বাগানে আলু, বেগুণ, কুমড়া, পেঁয়াজ প্রভৃতি সব তরকারীই ত হয়, জেলের খোরাক ত মন্দ নয়।" শচীন নিতান্ত ঠোটকাটা ছেলে; সে বলিল—"বাগানে ত হয় সবই, কিন্তু পুঁই ডাঁটা আর এঁচোড়ের খোসা ছাড়া বাকি সবগুলা বোধ হয় রাস্তা ভুলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।"

দেখিলাম অসুখ করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। কাজেই আমাদের সকলকার অসুখ করিতে লাগিল। নিত্য নিত্য নূতন অসুখ কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়? পেট কামড়ান, মাথা ধরা বুক দুড় দুড় করা, গা বমি বমি করা সবই যখন একে একে ফুরাইয়া আসিল তখন বাহিরে প্রকাশ পায় না এমন অসুখ আবিষ্কারের জন্য আমাদের মাথা ঘামিয়া উঠিল। রোগ ত একটা কিছু চাই—তা না হইলে প্রাণ যে বাঁচে না। ডাক্তার

সাহেব আসিলে পণ্ডিত হৃষীকেশ গম্ভীর ভাবে জানাইলেন যে তাঁহার বামচক্ষুর উপরের পাতা তিন দিন ধরিয়া নাচিতেছে, সুতরাং তিনি যে কঠিন পীড়াগ্রস্ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মনে হইতেছে যে হাঁসপাতালের অন্ন ভিন্ন তাঁহার বাঁচিবার আর উপায় নাই। ডাক্তার বেচারা হাসিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন।

হঠাৎ আমরা আরও একটা অবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। সেটা এই যে পয়সা থাকিলে জেলখানার মধ্যে বসিয়া সবই পাওয়া যায়। জেলের প্রহরী ও পাচকের হাতে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে পারিলেই ভাতের ভিতর হইতে কৈ মাছ ভাজা ও রুটির গাদার ভিতর হইতে আলু পেঁয়াজের তরকারী বাহির হইয়া আসে, এমনি কি পাহারাওয়ালাব পাগড়ীর ভিতর হইতে পান ও চুরুট বাহির হইতে দেখা গিয়াছে।

একটা মহা অসুবিধা ছিল এই যে এক কুঠরীর লোকের সহিত অপর কুঠরীর লোকের কথা কহিবার হুকুম ছিল না। প্রথমে লুকাইয়া লুকাইয়া এক আধটা কথা কওয়া হইত, তাহাতে পাহারাওয়ালাদের ঘোরতর আপত্তি। তাহারা জেলারের কাছে রিপোর্ট করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল হঠাৎ কিন্তু এক দিন দেখা গেল তাহারা শান্ত শিষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমরা চীৎকার করিয়া কথা কহিলেও আর তাহারা শুনিতে পাইত না। অনুসন্ধানে জানা গেল আমাদের একজন বন্ধু রৌপ্য খণ্ড দিয়া তাহাদের কাণের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। জেলার বা সুপারিন্‌টেনডেণ্ট আসিবার সময় তাহারাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল। রৌপ্য খণ্ডের যে অনন্ত মহিমা তাহা এত দিন কাণেই শুনিয়াছিলাম তাহার এইবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া মানব জন্ম সফল হইল। কিন্তু একটা দুঃখ কতকটা ঘুচিতে না ঘুচিতে আর এক দুঃখ দেখা দিল।

আমরা জেলে আসিবার পর হইতেই জেলের মধ্যে সি, আই ডির কর্ত্তাদিগের শুভাগমন আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিলে মনে হইত যেন আমাদের বীরত্বের গৌরবে তাঁহাদের বুকখানা ফুলিয়া দশ হাত হইয়াছে, আমাদের সহিত সহানুভূতিতে প্রাণ যেন তাঁহাদের ফাট ফাট। কথা-গুলি তাঁহাদের এমনি মোলায়েম হাব ভাব এমনি চিত্তবিমোহন যে দেখিলে শুনিলেই মনে হইত ইহারা আমাদের পূর্ব্ব জন্মের পরমাত্মীয়। তবে ধরা পড়িবার পরদিন তাঁহাদের ঘরে একরাত্রি বাস করিয়া এসব ছলাকলার পরিচয়

অনেক পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম - তাই রক্ষা। ইহারা সপ্তাহ খানেক যাতায়াতের পর নরেন্দ্র গোস্বামী যেন হঠাৎ একটু বেশী অনুসন্ধিৎসু হইয়া দাঁড়াইল। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও বিপ্লবের কেন্দ্র আছে কি না, আর থাকিলে সেখানকার নেতাদের নাম কি—ইত্যাদি অনেক রকম প্রশ্নই সে আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষের এক আধ জনের কথাবার্ত্তায়ও বুঝিলাম—একটা গোলমাল কোথাও লাগিয়াছে।

হৃষীকেশ একদিন আসিয়া আমায় বলিল—"গোটা দুই তিন বেয়াড়া রকমের মাদ্রাজী বা বর্গির টর্গির নাম বানিয়ে দিতে পারিস্?"

"কেন?"

"নরেন বোধ হয় পুলিসকে খপর দিচ্ছে, গোটা কত উদ্ভট রকমের নাম বানিয়ে দিতে পারলে—স্যাঙ্গাতরা দেশময় অশ্বডিম্ব খুঁজে খুঁজে বেড়াবে খ'ন।" তাহাই হইল। মহারাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের সভাপতি হইলেন শ্রীমান পুরুষোত্তম নাটেকার, গুজরাতের সভাপতি হইলেন কিষণজী ভাওজী বা এই রকম একজন কেহ কিন্তু মাদ্রাজের ভার লইবেন কে? মাদ্রাজী নাম যে তৈয়ারী করা শক্ত। খবরের কাগজে তখন মুপিলের নাম দেখা গিয়াছিল। হৃষীকেশ বলিল, যখন চিদম্বরম্ মাদ্রাজী নাম হইতে পারে তখন বিশ্বম্ভরম্ কি দোষ করিল? আর পিলের বদলে থরুৎ বা অমনি একটা কিছু পুরিয়া দিলে চলিবে।

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ।

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এল্]

হে অপরিচিত, হে রহস্যময়, এই যাকে তুমি দিয়ে গিয়েছ এও কি চিরদিন তোমারই মত চিরমৌন থেকে যাবে? তুমি সেই যে দু'দিনের জন্য দেখা দিয়ে কোথায় কোন্ গোপনতার মধ্যে আপনাকে লুকালে আজও সেই গোপনতার অবসান হল না। আর এই যাকে তোমার চির স্মৃতিরূপে রেখে গেলে, এও যে চিরদিনের মত মূক বধির এবং হতবুদ্ধি হয়ে চিরদূর দেবতার

পাষাণ প্রতিমার মত হয়ে রৈল! একে নিয়ে আর কত দিন কাটাব? কত আর পাষাণের এই মূক প্রতিকের সেবা করে এর অধিষ্ঠাতৃদেবতার পুনরাবির্ভাবের আশায় থাকব? কতদিন--ওগো কতদিন? দিনের পর দিন গেছে মাসের পর মাস গেছে বৎসরের পর কত বৎসর চলে গেছে, তবু তুমি দূরে—অতি দূরেই রয়ে গিয়েছো! আর যে কাটে না দিন—আর যে পারি না প্রভু!

যাক, না পারলেও পারতে হবে কারণ তাই তাঁর ইচ্ছা যে।

কত দিন হয়ে গেছে তবু সে দিনকার একটা কথাও ত' ভুলতে পারিনি। কেন পারি নি? আমি আজন্ম সমস্ত জগৎ ভুলতে সমস্ত মায়ার বন্ধন কেটে মুক্ত পাখীর মত ব্রহ্মাকাশে ঘুরতেই ত' শিখেছিলাম। তবু যে মুহূর্ত্তে আমার পিঞ্জর দেখতে পেলাম অমনি আপনা আপনি সেই খাঁচায় ঢুকে পড়লাম কেন? আপনি শিকল পরলাম কেন? এখন দাঁড়ে বসে উর্দ্ধমুখে চেয়ে বসে আছি, যদি খাঁচার দ্বার কেউ খুলে দেয়, যদি শিকল কেউ ছিঁড়ে দেয়! কিন্তু কৈ সেই আমার একটীমাত্র মানুষ যে এই শিকল আপন হাতে খুলে দেবে? কোথায়—

না—না—এসে কাজ নেই, খুলতে এসে কাজ নেই; যদি খুলতে এসে এই শিকলে তুমিও বাঁধা পড় তা যে আমার মর্ম্মান্তিক হবে। না—কাজ নেই—কিন্তু—আবার কিন্তু কেন? কোন কিন্তু নেই। আমার চিরমুক্তি—এই আশাই আমার আকাশ, এই আশাই আমার চিরবিচরণস্থান।

কিন্তু, কেন তুমি এই অদ্ভুৎ ভার আমায় দিয়ে গিয়েছ তা যে বুঝতে পারলাম না প্রভু! আমার এত খানি সচেতন প্রাণ-প্রান্তরের মাঝখানে এই মূক মূঢ় পাষাণের মন্দির বসিয়ে গেলে কেন? যেখানে একদিন তুমি পা রেখেছিলে সেখানে এই বাক্যহীন বোধহীন জড় পিণ্ডের প্রতিষ্ঠা করে গেলে কেন? এ যে আমার সমস্ত দিনের সযত্ন-রচিত পূজা অর্চ্চনা সেবা তোমারই প্রতিনিধি হয়ে নিচ্ছে! একে যে মূহূর্ত্ত ছেড়ে থাকতে পারিনে, ধুয়িয়ে মুছিয়ে খাইয়ে শুইয়ে কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি না। দিনে রাত্রে হাজারবার করে এরই চার পাশে ঘুরে মরতে হয় যে। কি শক্তি এই জড় মেয়েটীর মুখের মধ্যে দেহের মধ্যে সঞ্চারিত করে গিয়েছ। এর সারা দেহে যে তোমারই বিশাল চক্ষুর সেই প্রবল দৃষ্টি ফুটে রয়েছে। আমার সারাদিন যে কেবল তোমার চ'খের সেই দৃষ্টিটা দেখতে পাই। সেই তোমার সেই

চোখ, যা শত সহস্র লক্ষ লোকের চক্ষের সামনে এই মৃতবৎ মুখের উপর রেখেছিলে, যা মাত্র এক নিমেষের জন্ম আমারও চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে আমার অন্তরের মধ্যে রেখেছিলে—সেই তোমার সে দিনকার প্রচণ্ড করুণার দৃষ্টিটা!

তুমি চলে গেলে, কিন্তু এমন করে বেঁধে রেখে গেলে কেন, সন্ন্যাসী ত' মুক্তি দেয়, অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্বে যিনি ব্যাপ্ত তাঁরই পরম পদই ত' দেখিয়ে দেয়। সে তো বাঁধে না। তবে তুমি সেই সে দিন অমন করে বেঁধে, অমন করে বাঁধন স্বীকার করে তবু চলে গেলে কেন? কিন্তু হে আমার সুদূরের দেবতা, এই ভক্তের বাঁধন একদিন তোমায় ক্ষণকালের জন্যও বেঁধেছিল এ কথা ত' সত্য। এ কথা ত' আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। সেই গর্ব্বেই যে আমার সারা অস্তিত্ব ভরে আছে, সে গর্ব্ব কি তুমি কেড়ে নিতে পাববে? না সে শক্তি তোমার নেই। তাই আশা হয় আবার দেখা পাব- এ আশা আমার সফল হবে, হবেই হবে।

আঃ—আবার সেই সফলতার কথা। তিনি যাবাব দিন যে অমূল্য পুরস্কার আমায় দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর প্রাণের শেষ কথায় ভরা এই খাতা খানাই আমার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ লাভ বলে কেন মনে করতে পারছিনে? এই খানেতেই ত' তিনি চিরদিনের জন্ম ধরা দিয়ে গিয়েছেন। আমি ত' তাই তাঁকে না পেয়ে এই খাতাখানাতেই তাঁরই পাশে দিনে দিনে আপনাকে নূতন করে ধরা দিচ্ছি। এই খাতাখানার মধ্যে তাঁরই পাশে আমার স্থান হয়েছে ত' তবে আবার কি চাই তোর? ওরে লোভী, ওরে বিশ্বগ্রাসেচ্ছু, এততেও তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না?

যাক তাঁর কথা লিখি, ওরে মন সেইদিন গুলো আবার স্মরণ কর।...

আমরা সেই মেয়েটিকে নিয়ে প্রায় সন্ধ্যার সময় বাসায় পৌছিলাম। কিন্তু তাকে এনে যে কি বিপদে পড়লাম তা বলতে পারিনে। সে কথা কয় না—উত্তর দেয় না, মড়ার মত পড়েই রইল। কি কষ্টে যে তাকে একটু দুধ খাওয়ালাম তা বলতে পারি না। ছোটছেলে তবু আপত্তি করে, কাঁদে, হাত পা ছোড়ে এবং তার কান্নাকাটীর ফাঁকে ফাঁকে, দুরন্তপনার সাহায্য নিয়েই তাকে খাইয়ে দাইয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে তোলা যায়। কিন্তু এই মেয়েটী একেবারে জড়বৎ হয়ে গিয়েছে। দুঃখের ভয়ঙ্কর ঝড়ে তার আত্মা উড়ে পালিয়েছে, কেবল দেহের কোন্ গভীর কোণে প্রাণের একটা ক্ষীণ অবশেষ রেখে গেছে। সেইটুকু

প্রাণের জোরে তার নিশ্বাস পড়ছে মাত্র, কিন্তু সেই প্রাণের শক্তি পাঁচটা ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আর এসে পৌঁছাচ্ছে না। তাই সে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই আছে, কথাও নেই নড়ন চড়নও নেই।

এমনি করে সেই রাত্রিটা কেটে গেল। তারপর দিনও কাটে কাটে এমন সময় বাবা আবার সেই পরম আশ্চর্য্য মানুষকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি সমস্ত দিন ধরে সাধু দর্শন করে বেড়িয়েছেন। কি যে তাঁর মনে ছিল জানি নে কিন্তু আমি সমস্ত দিন ধরে মনে করেছি যে বাবা একটী লোকেরই খোঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি নিজে বেরুতে পারিনি, কারণ এই যে একটা জীবন্মৃত বস্তুর গুরু ভার তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন একে ছেড়ে এমন কি তাঁর খোঁজেও বেরুবো কি করে? সমস্ত দিন একটু একটু করে একে খাইয়েছি সরিয়েছি নড়িয়েছি, এই সব কাজে যারা আমার সাহায্য করেছে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে, কারণ এই মরণাধিক মরণাচ্ছন্ন প্রাণীটী ত' শিশুর মত লঘুভারও নয় অথচ মৃতের মত একবারে জড় বস্তুও নয়। তাই এর কি যে প্রয়োজন আর কি যে অপ্রয়োজন তাত জানবার জো নেই। বিশেষতঃ সবাই এসেছে পুণ্য সঞ্চয় করতে, এরকম পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর সেবা করতে ত' কেউ আসে নি। তাই একদিন যেতে না যেতেই দাস দাসী আত্মীয় স্বজন সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমিই কেবল একে সেই মহাক্ষণের মহালাভ মনে করে আগলে বসে আছি।

কিন্তু তিনি আপনিই এলেন। এবং এমন সময় এলেন যখন আমি এর মুখে বিন্দু বিন্দু করে দুধ দিচ্ছি এবং যখন আমার চক্ষু দুটী এর মরণাচ্ছন্ন চোখ দুটীর মধ্য দিয়ে অন্য দুটী বিশাল চোখের অপূর্ব্ব দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে!

বাবার সঙ্গে তিনি এসে দাঁড়ালেন। একসঙ্গে জীবনের দুই গুরু। আমি আস্তে আস্তে উঠতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি বারণ করলেন। তার পর আস্তে আস্তে সেই মরণাহত চক্ষু দুটীর উপর ঝুঁকে পড়ে কি যে করুণায় চাইলেন তা বলতে পারিনে সেই সময় সেই কক্ষে এমন একটা স্তব্ধতা অটল হয়ে বসে ছিল যে আমার বক্ষের রক্তের তালও যেন আমার কাণে অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

তিনি ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে হঠাৎ সেই করুণ দৃষ্টি আমার চোখের উপর রাখলেন। আমার যেন মনে হল আমার চোখে মধ্য দিয়ে অতি

শীতল গঙ্গা যমুনার জল তৃষিত অন্তরে প্রবেশ করল, আমি ধন্ত হলাম! আমার জন্মজন্মান্তরের সমস্ত সাধনার সাফল্য যেন এক নিমেষে আমার মধ্যে ধরা দিলে! আমি ধীরে ধীরে যেখানে ছিলাম সেইখানেই বসেই তাঁকে প্রণাম করলাম। অমনি মধুর গম্ভীর শব্দ হলো "ওঁ নমো নারায়ণায়। ওঁ প্রিয়ানাম ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।"

কি মধুর সেই আবাহন! এ আবাহন ত' কেউ করেনি! ইনি এসেই একবার চেয়েই একবার ডাকতেই আমি - এই অন্তর—বেরিয়েছিলাম। এক নিমেষে আমি সমস্ত জগৎ হতে এঁর অন্তরে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়তমা হয়ে ধরা পড়লাম। আবার ধরা দিয়েই তখনি আমি নিজের কাছেও প্রিয় হতেও প্রিয়তমা হয়ে গেলাম। ইনি এক নিমেষে আমায় এ কোন্ স্বর্গে নিয়ে গেলেন? এ কোথায় কোন্ চিরপ্রার্থিত সিংহাসনে তিনি আমায় বসিয়ে দিলেন। যখন আমি তাঁর ঐ আবাহন শুনলাম আমার অন্তরের মানুষটীও তখন না জেনেও নিশ্চয়ই বোধ হয় বলে উঠেছিল—ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে ওঁ প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে ওঁ নিধিনাম্ ত্বা নিধিপতিং হবামহে।

হে আমার লোকের মধ্যে লোকপতি তোমায় আবাহন করি। এস হে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়তম, তোমায় স্বীকার করি। ওগো নিধির মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠনিধি এস তোমায় অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করি!

(৭)

তারপর ক'দিন যে কি রকমে কেটেছিল ভাল স্মরণ নেই। স্বপ্নে জাগরণে মাতালের মতই কেটেছিল বোধ হয়। তিনি যে কি সব কথা বলেছিলেন, কি যে তার উত্তর দিয়েছিলাম জানি না, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই ফাল্গুনের এক অপূর্ব্ব দিনে, বসন্তের এক অপূর্ব্ব প্রথম প্রকাশের মধ্যেই তিনি আমার জীবনকে চির কালের জন্ত তাঁর দক্ষিণ পাণির মধ্যে গ্রহণ করলেন। আমার বাবা ত যেন চিরপ্রার্থিত বস্তু পেয়ে ধন্য হয়ে গেলেন। কি আনন্দে তিনি এই সন্ন্যাসীর হাতের মধ্যে দান করলেন তা তিনি জানেন। কিন্তু মা এবং তাঁর আত্মীয়েরা সকলেই ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন কারণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিবাহ ত' কোন শাস্ত্রেই নেই। লোকে শুনে কি বলবে? সমাজে আমার এই বিবাহ স্বীকার করবে কি? একি হল!

কিন্তু বাবার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না—তিনি যেন হারানিধি খুঁজে পেয়েছেন, তিনি যেন চিরসাধনার সাফল্য পেয়েছেন, এমনি ভাবে সমস্ত কাজ

সম্পন্ন করলেন। সন্ন্যাসী শাস্ত্রীয় সমস্ত নিয়মই পালন করে আমায় গ্রহণ করলেন। সমস্ত রাত্রি ধরে বাবা তাঁকে আর আমাকে একত্র বসিয়ে যজ্ঞ করলেন, তারপর ভোরের সময় আমাদের দুজনকে যেন কি একটা মহান ভাবের অগ্নির মধ্যে স্বাহা মন্ত্রে উৎসর্গ করে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

আমি একবারমাত্র সন্ন্যাসীর দিকে চাইলাম, দেখলাম তিনি একদৃষ্টে যজ্ঞাগ্নির দিকে চেয়ে বসে আছেন। সেই আলোকে তাঁর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে বেষ্টিত অপূর্ব্ব মুখখানা যেন সান্ধ্যসূর্য্যের মত ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর দেখাচ্ছিল। চক্ষে ছিল তাঁর এমন একটা জ্যোতি যা কোমল নয় অথচ কঠিনও নয়—যেন দুয়েরই সংমিশ্রণ। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কেবল অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠতে লাগলাম।

তারপর বাবা যখন শেষ আহুতি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন সন্ন্যাসীও উঠে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে বল্লেন, আমি ধন্য হলাম আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।" বাবা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করতে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আমি তখন তাঁর পায়ে প্রণাম করতেই তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন, "আপনাকে আশীর্ব্বাদ করতে পারব না। আপনি যে আমার দান গ্রহণ করেছেন এই আমার বহুভাগ্য।"

সন্ন্যাসী একবার আমার দিকে চাইলেন তারপর বল্লেন, "কি যে করলাম জানি না, হয়ত এই বালিকার মহৎ অপকার করলাম। আমি সন্ন্যাসী হয়েও একি করলাম! মানুষ মানুষ করে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন মানুষ যে পাব তা কে জানত। আপনি যে আমায় এমন মানুষ দেবেন তা যদি জানতাম, তাহ'লে কি এমনি করে এই প্রকাণ্ড মেলার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি? মানুষের বিরহে যত ছুটে বেড়াচ্ছিলাম ততদিন বুঝিনি যে যতদিন প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়কে না পাওয়া যাবে ততদিন ছুটোছুটী থামবে না। তাই এই বালিকার মধ্যে তাকেই খুঁজব বলে এর কাছে এসেছি। কিন্তু তবু কেন ভয় করছে?"

বাবা চুপ করে ছিলেন না, সন্ন্যাসীর শেষ কথা শুনে বল্লেন, "ভয়! আপনারও ভয় করছে?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন না। পূর্ব্বাকাশে যে উষার আভাষ দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিরে বল্লেন "হ্যাঁ ভয়ই করেছে, এই এতদিনকার সমস্ত সাধনার সংস্কার কি এক মুহূর্ত্তেই শেষ হয়ে যাবে? বোধ হয় যাবে না—বোধ হয় আবার যুদ্ধ করতে হবে।

চিরদিন কামিনীকাঞ্চনকে ঘৃণা করতেই সাধনা করে এসেছি। হঠাৎ যে আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেছি, একি মন সহজে স্বীকার করতে চাইবে? যতদিন মুক্তি সাধনা করেছি, ততদিন বন্ধন আমায় ভয়ঙ্কর জোরেই টেনেছে, আজ আবার যেই বন্ধন সাধনা করতে যাচ্ছি অমনি মুক্তি আমায় টানতে সুরু করেছে। তাই ভাবছি, কি জানি কি হয়।"

বাবা মুখ ফিরিয়ে উষার আলোর দিকে চাইলেন। ঘরের মধ্যে যে ঘৃতের বড় প্রদীপটা জ্বলছিল তার আলো ক্রমশঃ কমে আসছিল। আমি চুপ করে কাঠের মত সেই বিবাহের আসনেই বসে একবার বাবার দিকে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ যখন প্রদীপ নিবে এল তখন ঐ অস্পষ্টতার মধ্যে অদ্ভুত মানুষ দুটি আমার কাছে যেন কোন এক অতীন্দ্রিয় লোকের জীব বলে বোধ হতে লাগল, তাঁদের কথা গুলি আমার কাণের মধ্য দিয়ে তন্দ্রাহীন প্রাণের এমন একটা স্থানে প্রবেশ করছিল যে আমি সে সব কথার একটিও ভুলতে পারিনি। কখনো যে পারবো তাও মনে হয় না।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন "না কোন ভয় নেই- আমার মনে ঐ উষার আলোর মত আশা জেগে উঠছে। আমার বেশ মনে হচ্চে এর পরে এমন একটা সত্য সূর্য্যের মত জেগে উঠবে, যার আজকের এই আলো আঁধারের সমস্ত কর্ম সমস্ত ভয় সমস্ত সন্দেহের অন্ধকার লজ্জায় মুখ লুকাবে। না আমার ভয় নেই—আমার চির প্রত্যাশিত সত্য তোমাদের দুজনার মধ্যে পূর্ণ প্রকাশিত দেখতে পাব। আর ভয় নেই--এস সন্ন্যাসী আজ তোমারও আমি গুরু হব—তোমাকেও আমি আশীর্ব্বাদ করব।"

বাবা এগিয়ে যেতেই সে সিংহের মত কেশর যুক্ত মাথাটি হঠাৎ নুয়ে তাঁর পায়ের কাছে এল —বাবাও তাঁকে কি একটা বৈদিক মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করলেন।

তার পর মা এলেন, দিদিমা এলেন, আরও অনেকে এলেন, আশীর্ব্বাদও করলেন, কিন্তু সেই সিংহের মত মাথাটা আর সেই প্রথম দিনকার মত উঁচু হয়ে উঠল না। মন্ত্রমুগ্ধ সেই পরম দুঃখে আমার চক্ষু জলে ভরে এল।

কিন্তু যে সিংহ গিরিগহনচারী সে তাহার চিরবিচরণ স্থান ছেড়ে কতক্ষণ এই অকিঞ্চিৎকর পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকবে। তাই তিনি দু'দিন পরেই এই যে খাতাখানিতে আমাকে গেঁথে তুলছি এই মহামূল্য বস্তুটী আমাকে দান করে চলে গেলেন। আমি তাঁকে ধরে রাখতে চেষ্টাও করিনি। কারণ এ কথা কঠিন জানতাম যে ইনি নিজে বন্ধন না স্বীকার করলে, কেউ একে বেঁধে

রাখতে পারবে না। তাই আমি একটা কথাও বলিনি, তিনিও কোনো কথা বলেন নি। শুধু যাবার সময় এই খাতাখানি আমার হাতে দিয়ে একবার আমার মুখখানা তুলে ধরেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে সেই যে মুখ ফেরালেন, সে মুখ আর ফিরল না। আমি তাঁর কটা চুলের রাশ মাত্র শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখেছিলাম। কিন্তু সে লালে কালোয় মেশানো ধূমকেতুর পুচ্ছটা আমার মনের আকাশে চিরদিনের মত একি উজ্জল রেখায় আঁকা রয়ে গেল। একি মুছবে না?—এ ধূমকেতুর সামনের তারাটা কি চরদিনের মত অস্তগতই থাকবে? তাকি কোন দিন উজ্জল হয়ে আর দেখা দেবে না—শুধু এই প্রাণের জগতে উপপ্লব জাগিয়েই রেখে দেবে?

বাবা কিন্তু বলেছিলেন "যাক, আবার আসবে। আসতেই হবে। আমার আশা বিফল হবে না। জানকি, মা, ভয় নেই তোর।"

ভয় নেই বটে, কিন্তু অভয় ত নেই। সেই পরম অভয় যে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। তার পরিবর্ত্তে একটা দুর্নিবার কঠিন সন্তোষ যে প্রাণের মধ্যে ধীরে ধীরে আসন নেবার চেষ্টা করছে। যেন মনে হচ্ছে আমি শুকিয়ে উঠছি। কেন এই শুষ্কতা? দাবদাহ? কে আজ বলে দেবে - কেন? যিনি পারেন তিনি দূরে, যিনি পারতেন তিনিও আজ তাঁর এই অধমা কন্যাকে, তাঁর চিরকালের শিষ্যাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এ বিশাল সংসারের মরুভূমে আমায় ফেলে বাবাও আজ কতদিন হল চলে গিয়েছেন। হায় আমার জনক ঋষি তাঁর জানকীকে ফেলে কোথায় গেলেন।

জানিনা তিনি সংসারের পারে গিয়ে তাঁর চির আশার চির সাধনার কোনো সফলতা দেখতে পার্চ্ছেন কিনা কিন্তু আমি যে তা পাচ্ছি না এবং আর যেন পারছিও না। অথচ সেই পরম অপরিচিতকে পাবার আশাও ত' ছাড়তে পারছি না। যতই মনকে বুঝচ্ছি বাবার অন্তঃকালের শেষের কথাগুলি যতই মনকে বলছি যে, যা পাবার নয় তাকে না পাওয়াই পরম প্রাপ্তি, তবু অন্তরের অন্তরে যে আছে সে ত' কৈ বুঝছে না। তাই ত' আজও আমার চির-বাসর-শয্যায় চির-জাগরণে বসে থাকা। তাই ত' চিরদিন ধরে পথ চেয়ে সংসারের সিংহ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। অথচ যিনি আমায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনিও নেই, যাঁর আশায় থাকা তিনিও আসছেন না। অথচ সেই আশাতেই ঐ অত বড় মন্দির তৈরী হয়েছে। সেই পরম সন্ন্যাসীকে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি দেখতে পাই সেই আশাতে মা আমার জন্য ঐ অতবড় ধর্ম্ম-

শালা তৈরী করেছেন। তাঁকেও বুঝতে হয়েছে যে এই আমার অদৃষ্ট! তাই অমন যে হাস্যময়ী হাসি সেও হাসি গোপন করে, প্রতিদিন ঐ ধর্ম্মশালায় তত্ত্বাবধান করছে। অনেক দিন আগে তার বিবাহ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেও প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, যে, তার উর্ম্মিলা দিদির স্বামী না ফিরলে সে বিয়ে করবে না। অন্ততঃ তার বাবা যদি ফিরে এসে বিয়ে না দেন তাহ'লে সে তার দিদির মতই অপেক্ষা করবে। হয় তার বাবাকে চাই নয় তার দিদির স্বামীকে চাই।

তারপর কত সন্ন্যাসীই এলেন আর চলে গেলেন। বাবা বেঁচে থাকতেও অনেকে এসেছিলেন, আমার মায়ের আমলেও কতদিন কত সাধুকে সেই আমার একটী সন্ন্যাসীর আশার আশ্রয় দিয়ে কত উপদেশ কত ধর্ম্ম কথা শুনলাম। কিন্তু যে কথাটী শুনবার জন্য, যার মুখের বাণী গ্রহণ করবার জন্য আমাদের বৃহৎ সংসার সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে উন্মুখ হয়ে আছে, যাঁকে বরণ করবার জন্য আরতি করবার জন্য আমি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জেলে বসে আছি, কোথায় তিনি?

তুমি কি ফিরবে না? কতদিন তোমার প্রিয় হতে প্রিয়তমাকে ছেড়ে থাকবে? কতদিন ওগো—আর কতদিন।

আশাই কি আশার শেষ? বাবা ত' তাই বলে গিয়েছেন কিন্তু তাই যদি হয় তবে এই আশা করার দুঃখের শেষ করে দাও। নিরাশায় কঠিন সন্তোষকে ধরতে শেখাও। না হয় এই যাকে তোমার দেবত্বের কঠিন প্রতীক করে গেছ—এই যে মৌন জড় বস্তুকে আমার বুকের কাছে দিয়ে গেছ, আমায় এরই মত করে দাও। এই বাক্যহীন সর্ব্বচেষ্টাহীন বালিকার অবস্থার ওপরেই যেন ক্রমশঃ আমারও লোভ হচ্চে। এর সঙ্গে থেকে যে ক্রমশঃ আমারও মূকত্ব পেতে ইচ্ছে হচ্চে, জড় হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্চে। এ যেমন ভয়ঙ্কর দুঃখের আঘাতে একেবারে সুখ দুঃখের পরপারে চলে গেছে—আমারও তাতে লোভ হচ্ছে যে।

উপাসনা—মাঘ।

শিক্ষায় 'উটজ' আদর্শ।

(শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।)

"Vox populi vox dei" voice of the people is the voice of God—ভগবান ডাক্ ডেকেছেন—তাঁর বাঁশী বেজেছে। লোকারণ্যের বিশ্ব-মানবের মধ্যে দিয়ে প্রলয়ের বজ্রনির্ঘোষের মধ্যে দিয়ে ঐ তাঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। "তুমি যে আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসো" ঐ সেই আলো বুঝি এসেছে। বিদ্বেষের আগাছা হৃদয়-কানন থেকে উপড়ে পড়ুক, সেখানে প্রেমের ফুল ফুটুক, সে কুঞ্জে বিশ্বের দেবতার বরণ হোক্, তিনি যে ঐ এসে প্রতীক্ষা কর্‌ছেন, পূর্ণ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পঞ্চদীপে তার আরতি হোক।

আমাদের এ বিরাট জাতীয় আত্মা হিমাচলের মত অচঞ্চল ও ধ্যানস্থির থেকে ত্যাগ বৈরাগ্যে ফুটে উঠুক। আর তারই পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন সকল অঙ্গে বিকশিত ও অবাধ হোক।

এ নবযুগের সকলই বিচিত্র, কারণ এবার লীলা হবে চমৎকার—এবার নিতাই প্রেম ব্যক্তির গণ্ডীর বাইরেও জাতীয় ভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জ্ঞানে কর্ম্মে সামঞ্জস্য লাভ করে সার্থক হবে। অধ্যাত্ম গণতন্ত্র বা গণতন্ত্রমূলক আধ্যাত্মিকতার উপর নূতন সভ্যতার ভিত্তি গঠিত হবে, এবার ব্যক্তিত্বের বাঁধ ভেঙে জাতিতে জাতিতে প্রেম,—এবারকার লীলা ব্যাপক। নবসৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রলয়ের সময় এক এক অভিনব ভাব-জাগরণ ঘটবে, সেগুলিকে সৃষ্টিকরী শক্তিতে পরিণত করতে হবে, জীব যখন শিব হয় তখন প্রলয়ের সময় ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত দুর্ব্বিপাকের সংহার মূর্ত্তি প্রশমন ক'রে মানুষ তার প্রেমের শক্তিতে তাকে মঙ্গলমূর্ত্তি কর্‌তে পারে।

ধর্ম্মজীবনের বীজ হতেই হিন্দুর এ সমাজ দেহ। সেই সমাজ ফিরিয়ে আনবার জন্য পরমার্থ জীবনে ভিত্তি করে উটজ শিক্ষালয়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা গ্রামে গ্রামে দরকার।

এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় একরাতে হয় না—যদিও সেকালের রাজারা এক রাতেই পুকুর কেটে ফেলতেন আমেরিকায় এক রাতেই এক একটী পর্ব্বত-প্রমাণ ইমারত উঠতে পারে। অথচ দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে একটা সাময়িক ব্যবস্থাও দরকার—সময় সংক্ষেপ, ছোট ছোট ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অর্থাৎ গাছতলাতে উটজ

স্কুলে দেশ ছেয়ে যাক্। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ দেশ নয়, যেমন বড় বড় কল কারখানার পক্ষেও এ দেশ নয়। শিল্পে যেমন উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠার দরকার, শিক্ষাতেও তেমনই উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠার খুবই প্রয়োজন। অবশ্য সে আদর্শকে প্যাটাভেলের সাবলম্বী শিক্ষার ও জর্জিয়ান রিপাব্লিক স্কুলের ছাত্রতন্ত্রশাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তনে পুষ্ট করে নিতে হবে। নিত্য ব্যবহারের জিনিষপত্র তৈয়ারীমূলক স্বাবলম্বী-শিক্ষা বর্ত্তমানে কতকটা technical education এর অভাব পূরণ করবে, ছাত্রেরা নিজেরাই আবশ্যকীয় জিনিস তৈয়ারী করবে, আর তা পরস্পরের মধ্যে ও বাইরে বেচতে পারবে। এতে তাদের পড়ার খরচও কম পড়বে ও কর্তৃপক্ষদের স্কুল চালানর খরচা অনেক কম হবে। আর ছাত্রতন্ত্রস্কুলের আদর্শে ছেলেরাই স্কুলের কতৃপক্ষদের স্থান কতকটা পূরণ করবে। আমেরিকার জর্জিয়ান রিপাব্লিক স্কুল এই রকম ছাত্রচালিত বিদ্যালয়—তা চেয়ার টেবিলে সাজান দালান কোটার কারাগার নয়। প্রকৃতির একটা সুরম্য স্থানে একটী আদর্শ শিক্ষা-পল্লী বই আর কিছুই নয়, সে সমাজে মানুষের মন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে সঙ্কুচিত ক্ষুণ্ণ হয় না। স্বভাব ও সমাজ দুয়েরই সুবিধা লাভ করে—অসীম বিকাশের সুবিধা পায়, স্বভাবের সম্পর্কে থেকে প্রাণের সুরটা বেজে ওঠে, পল্লীর ন্যায় একটী সমাজের মধ্যে থেকে কার্য্য ও চিন্তার আদান প্রদানে বিচার, পুলিশ, ব্যাঙ্ক, শিল্প, চাষ, আইন সভা প্রভৃতির কাজ নিজেরাই চালিয়ে নিয়ে বাস্তব জীবনের সত্যের ভিতর বাল্য-জীবন সজীবতা লাভ করে।

বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে ধর্ম্মশিক্ষার সে সুযোগ নাই, জোর বক্তৃতাস্থলে নৈতিক উপদেশ পর্য্যন্ত দেওয়াই আছে। কিন্তু একমাত্র আচরণের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত শিক্ষা হয়, তাই চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্ম দেখিয়েছেন নিজের জীবনের দ্বারা—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" শুধু ভাল জিনিষ পড়ান ও ভাল কথাই বলা যথেষ্ট নয়। এমন পারিপার্শ্বিকের ও দৈনন্দিন আচরণের ব্যবস্থা করতে হবে যা নৈতিক জীবন অর্থাৎ যা নিয়ে আমাদের এজগতের কারবার তার গঠন আমাদের অজ্ঞাতে করতে থাকবে। পরমপিতার নাম গানে উপাসনা, শিল্প সাধনা, নাট্য, গান ও চিত্রকলা শিক্ষা, কেতাবী বিদ্যা সেবাধর্ম্ম ও সমবায়-জীবনে দৈনন্দিন কাজগুলি এমনই ব্যবস্থিত করতে হবে যাতে শিক্ষাজীবনের দিন গুলি গানের মত মধুর হয়ে মানসিক বিকাশের সহায়তা করে। একমাত্র রেসিডেন্সিয়াল বা বসতি-বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েই তা সম্ভবে।

গাছতলা ও চালা ঘরই তার পক্ষে যথেষ্ট। ইট পাথরে গড়া দালান কোটা এই সব মনোবৃত্তির কারাগার তার সঙ্কোচ বই বিকাশ করে না।

নূতন শিক্ষায়ই আমাদের জাতীয় সাধনার পথ খুলে যায়। পশ্চিমের মদে মাতাল পনর আনা এক আনা ছাঁটা চুলের টেরি বিলসিত, চুরুট বা নস্তের আমোদাহারী, বিরক্ত আড়ষ্ট মুখশ্রী ইন্দুরভুক্তাবশিষ্ট টুথব্রাস প্যাটার্ণের গোঁফ চড়ান মানবাকারধারীদের জায়গায় আমরা দেখতে পাব ত্যাগ ও সন্ন্যাসের আগুনে শুদ্ধ প্রেমের আলোয় ভরপুর আনন্দ-মূর্ত্তি একদল মানুষ যাদের চেহারায় ও কাজে প্রেমের স্পন্দন অনুভূত হবে, আর তারা মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে জগৎকে জাগাবে, বাঁচাবে ও গড়বে।

নবভাবের আধার সব জন্মেছে, যেন অনুকূল পারিপার্শ্বিকের অভাবে তাদের বিকাশের বাধা না হয়, নবযুগের প্রতিষ্ঠার ভার তাদেরই উপর। প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাস-কর্ম্মীই সে যজ্ঞের একমাত্র ঋত্বিক্, ভোগ বিলাসের সময় এ নয়—ভগবদ্ ইচ্ছা প্রেরিত অদৃশ্য অপ্রতিহত শক্তি-চালিত কাজের এ যুগ। সুতরাং সময়ের সুরটা ধ'রে আমাদের জীবনের সুর সেই মত বেঁধে নিয়ে এবার চলবার পালা।

যুগ-সন্ধি কাল ত উত্তীর্ণ হয়েছে। অপ্রতিহত গতিতে ভগবানের রাজ্য মর্ত্ত্যলোকেও শীঘ্র বুঝি ছেয়ে পড়লো, আধ্যাত্মিকে গণতন্ত্রে বিশ্বদেবতার ন্যায়ের রাজ্য বুঝি বা এসে পড়লো। ঐ যে তার দখিন হাওয়ার নিশ্বাসে বাংলার কুঞ্জে কুঞ্জে আজ লাল হলদে পাতার খেলা লেগে গিয়েছে, নবপল্লব আখির-রাঙা হয়ে তর তর কাঁপছে আর পুরাণ পাতার ঝরার পালা পড়ে গিয়েছে। "আয়রে নবীন আয়রে আমার কাঁচা।" এস এ শুভ মুহূর্ত্তে এ জাতীয়—এ বিশ্ব মানবীয়—জীবন প্রভাতে, হে অমৃতের সন্তানগণ অমর লোকের অযাচিত দান আশীষ নিতে মাথা পেতে দাও, সকল শক্তির উৎস তিনি তো ভাঁড়ারের চাবি খুলে দিয়েছেন—তাঁর আশীষ মাথায় নিয়ে হিংসা, দ্বেষ ভুলে, কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করে, সমাজের সকল অঙ্গকে স্বাধীন করে দিয়ে, সকলে পরস্পর পরস্পরের কাজে সহায় হ'য়ে পূর্ণ সত্যের মহাপ্রকাশের খেলা খেলতে খেলতে এস আমরা এ যুগসন্ধিতে আগুয়ান হয়ে যাই—আমরা এ পুণ্য ভারতে আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের মহাসভা খুলে দিই, মায়ের আনন্দের হাটে মানুষে মানুষ চিনবে ও পৃথিবীর সকল জাতি এসে যোগ দিয়ে সহমিলনের কাজ সমাধা করবে। ধরা ধন্য হবে।

মিলন *

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।]

নীলাম্বরে শুভ্র দেহ করি আবরণ,
দূরে নীল গগন-সীমায়,
চেয়ে আছে গৌরীশৃঙ্গ সতৃষ্ণ নয়ন—
নীল আঁখি মিশে নীলিমায়।
সৃষ্টি হ'তে ধরণীর আছে ধীর, আছে স্থির,
সৃষ্টি হ'তে গতিরুদ্ধ হৃদিবদ্ধ জ্বালা,—
অনন্ত জীবন ঘেরা তবু সে একেলা।

(২)

অনন্ত জীবন জাগে অনন্ত আভাসে,
অনন্ত ভাবের সিন্ধু ছোটে,
বসে' আছে গৌরীশৃঙ্গ সে সবার পাশে
প্রাণে কথা—মুখ নাহি ফোটে।
মহান্ তবু সে দীন, আঁখি-জল রসহীন
অপাঙ্গে ঝরিছে বিন্দু নির্ম্মম কঠিন,
প্রাণপূর্ণ হিমাচল যেন প্রাণহীন।

(৩)

সম্মুখে দেখিছে গিরি দূর নীলিমায়
নীল অঙ্গ নীলে মিশাইয়া,—
বিলাস-বিভোর আশে আলিঙ্গিতে তায়
যেন কোটি বাহু প্রসারিয়া।
আসে আসে যায় ফিরে পড়ে ধরণীর তীরে
আসে কাঁদে রোদনের নাহি অবসান,—
দেখে সিন্ধু গৌরীশৃঙ্গে বিশাল মহান্।

---

* জাহ্নবী।

(৪)

এ পারে কঠিন প্রাণ, ও পারে তরল—
মহান্ মহানে দেখে চেয়ে,
মাঝে মরু বসুন্ধরা শূন্য ফুল-ফল,
কে দিবেরে দুটিরে মিলায়ে ?
পবি চপলার মালা কাদম্বিনী ল'য়ে ডালা
আসে নিত্য অশ্রুকণা দিতে উপহার,
গিরিস্পর্শে প্রাণহীনা তুষারের ভার।

(৫)

সিন্ধুবক্ষে প্রতিদিন সুবর্ণের থালা,
ভেসে উঠে নব প্রলোভন,
কাছে এসে শিরোপরে ঢালে শুধু জ্বালা
দেহে প্রাণে হ'ল না মিলন।
কোথা আছ শক্তিমান্! মিলাতে এ দু'টি প্রাণ,
জীবনের এ সমস্যা করহে পূরণ,
দুটি মহানের আজি কর সম্মিলন।

(৬)

উঠিল করুণ কণ্ঠ ধরণীর কোলে,
কিন্নরে সে বেঁধে নিল গান,
গাহিয়া অনন্ত দিকে ছুটিয়া সকলে—
কই কোথা আছ শক্তিমান্!
ভাঙ্গি তপস্যার গেহ উত্তর না দিল কেহ,
এত শক্তি তবু কিরে শক্তিহীন তারা ?
প্রেম-বারি-বিন্দুপাতে তিতিল না ধরা।

(৭)

কাঁদিয়া কিন্নর-কণ্ঠ হইল নীরব
স্বর্ণ-থালা ডুবে সিন্ধুনীরে,
অন্ধকার আবরিল ধরা-অবয়ব,
আবরিল গৌরীশৃঙ্গ শিরে,

বিষাদে ব্যাকুল হ'য়ে কল্প এল নিদ্রা ল'য়ে
ঢাকে বিশ্বে,—দেব-যক্ষ নিদ্রায় মগন ;
বুঝি, বুঝে এ অসাধ্য হ'লনা সাধন।

(৮)

কোন্ দীর্ঘ কল্প-অন্তে মধুর প্রভাতে
একিরে মধুর গীতি শুনি ,—
জাগে বিশ্ব, দেখে শিশু শুভ্র শঙ্খ হাতে
চলে, পাছে চলে কলধ্বনি।
দেবতা-অসাধ্য কাজ কে শিশু করিলি আজ ?
বিধাতার কমণ্ডলু উথলিয়া ঝরে,
এত শক্তি অস্থিহীন দেহের ভিতরে ?

(৯)

অনুরাগে কাঁদে গিরি ছোটে শুভ্র ধারা,
অনুরাগে উথলে সাগর,
অনুরাগে ফলফুলে সাজে বসুন্ধরা—
সুধা-স্রোতে তিতিলা শঙ্কর।
দগ্ধ দেহে জাগে প্রাণ, কুঞ্জে কুঞ্জে উঠে গান,
সিন্ধু হ'তে কাদম্বিনী ল'য়ে গেল ডালা,
পরে গলে গৌরীশৃঙ্গ মন্দাকিনী-মালা।

(১০)

হে বঙ্গ ! তুমি যে সেই ভাগীরথী-দান,
অমৃতে রচিত তব ঘর ,
এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান,
পুত্র তব অজর অমর।
মূঢ় চক্ষে দীনা তুমি মহীয়সী জন্মভূমি
যে বুঝে সে বুঝে তুমি জীবের উদ্ধারে,
দীনতা মাখ মা মুখে,—মহত্ব অন্তরে।

নিগ্রো সমস্যা।

টোকিয়ো এবং নিউইয়র্কের "আসাহি'র সংবাদ দাতা মিঃ শয়িচী মিতরো (Mr. Shoichi Mitoro) সভ্য জগতে এক নূতন সংবাদ দিতেছেন। যুগ যুগান্ত ধরিয়া নিগ্রোজাতি মার্কিণদের পদানত। আজ তাহাদের প্রাণে মুক্তির বাতাস বহিয়াছে। তাই সারা জগতের ৪০ কোটি নিগ্রোসন্তান মিলিয়া বিরাট্ এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উহার নাম লিবেরিয়া গণতন্ত্র বা Greater Liberia Republic। নিগ্রো-নেতা মিঃ মার্কাস্ গার্ভে (Mr. Marcus Garve) নিগ্রোদের উন্নতি সঙ্ঘ বা Negro Improvement Society নামে এক সমিতি গড়েন। এই সমিতির প্রায় ৩০০ নিগ্রো প্রতিনিধির প্রাণপণ চেষ্টায় উক্ত গণতন্ত্র মহাসমিতির সৃষ্টি হয়। সমগ্র বিশ্ব ভরিয়া আজ মুক্তির বাণ ডাকিয়াছে, ইহাও তাহারই স্ফুরণ।

মার্কাস গার্ভে একজন প্রসিদ্ধ লেখক, স্বজাতির বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে তিনি আমেরিকা ও আফ্রিকায় এক ষ্টীম্ শিপ কোম্পানি খোলেন্। পাশ্চাত্যের এই স্বাধীন জগতে শুধু নিগ্রোদেরই দুর্দ্দশার বিষয় স্মরণ করাইয়া স্বজাতিকে তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলেন, "মুষ্টিমেয় হইয়া মার্কিণগণ যদি আমাদিগকে শাসন-কলে নিষ্পেষণ করিতে পারে তবে আমরা ৪০ কোটি নিগ্রো জীবের জীবন ভগবানের এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরায়" কিসের জন্য আসিল? মানুষ হইয়া কেন আমরা মানুষের অধিকারে বঞ্চিত হইব? কেন নিষ্পেষিত হইব?

মনে রাখিও, নিগ্রোগণ মানুষ। মানুষের বীর্য্য লইয়া তাহারাও স্বাধীনতা লাভ করিবে। ভিক্ষায় নয়—মিনতিতে নয়—আপনার জন্মগত অধিকার হিসাবে তাহারা তাহাদের এই ন্যায্য দাবী আদায় করিবে। * * * শান্তির পথে না লাভ হয় ত কুরুক্ষেত্রকেই বরণ করিবে।"

নিগ্রোদের এই নূতন আন্দোলনে ও তৎসঙ্গে তাহাদের ধনে জনে শিক্ষায় শিল্পে উন্নতি দর্শনে মার্কিণদের এতদিনের ঘৃণা আজ যেন ভয়ে পরিণত হইয়াছে। ১৯১৯ সালের নিউইয়র্ক সমিতি বা New York Conventionএ জাপানী প্রতিনিধির সমাগম দেখিয়া এই ভীতি আরও প্রবল হইয়াছে।

"নিগ্রো ওয়ার্ল্ড" পত্রিকার সুরও ভীষণ, তাহাতে আছে, "নিগ্রোদিগের ন্যায্য দাবী আদায় করিতে গেলে যুদ্ধ বিনা আর গতি নাই, এ সময় জাপানের

সাহায্য পাইলে সিদ্ধিও নিশ্চিত। এশিয়া ও য়ুরোপে যে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে শাদায় কালায় সংগ্রাম একদিন অবশ্যম্ভাবী। সেই শুভযোগে নিগ্রোদিগকে পূর্ণ মিলন ও স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।"

মার্কিণের একদল নিগ্রোদের এই উন্নতির লক্ষণ বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন। আর একদল বলেন, "নিগ্রোদের এমন কোনও গুণ নাই যাহার জন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের কোন আশঙ্কা বা মাথা ঘামাইবার কারণ থাকিতে পারে। বরঞ্চ নিগ্রো ও পীত কৃষ্ণ শ্বেতাঙ্গেতর জাতিদের এই মিলন যাহাতে না ঘটে তাহাই করা হউক ও শাসনের মাত্রা আরও একটু কঠোর করা হউক।

পাঠক! ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফল গণতন্ত্রী আমেরিকার মূর্ত্তিটি একবার দেখ। অহংকার এমনি অন্ধ যে একজনকে সাগর-জলে ডুবাইতে গিয়া নিজেরই যে কখন ডুবিতে হয় তার হিসাবটাও রাখে না। হে অহংকারের জাতি! এই যে ভেদের সমাজ ভেদের রাজতন্ত্র লইয়া বিশ্বচমক সভ্যতা রচিয়াছ তাহা টিকিবে কয় দিন? মার্কিণ জাতি! তোমরা যদি প্রকৃত গণতন্ত্রী হও, তবে নিগ্রোজাতিকে বিশ্বের দরবারে নিজের আসন খুঁজিয়া লইবার অধিকার দাও। স্মরণ রাখিও, এ নিগ্রোসমস্যা নহে—এ মানব জাতির মর্ম্মপ্রাণে বিশ্বদেবতার জোয়ার।

এসিয়ান রিভিউ - জানুয়ারী, ১৯২১।

বিরহে।

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

(১)

পরাণ কাঁদি ফিরে,
সাঁতারি আঁখিনীরে,
বিরহ ব্যথা বাজে বিষম নিরদয়,
আজিকে থেকে থেকে তোমারে মনে হয়।

(২)

গগনে যত তারা,
নিবিয়া মসী পারা,
বিজনে পথ হারা চরণ থামি যায়,
ব্যাকুল বাহু দুটি তোমারে শুধু চায়।

(৩)

বিজলী থেকে থেকে,
চমকি যায় ডেকে,
ধরণী বুকে বাজ বুঝি বা হানি যায়,
তবুও তোমা পানে হৃদয় খানি ধায়।

(৪)

পরশ লাগি তব,
তুলিছে কলরব,
মুখর হৃদিবীণে হাজার খানি তার,
তোমারে নাহি পেলে জীবন কোন্ ছার।

(৫)

এস গো এস ফিরে,
মুছিয়া ধীরে ধীরে,
শতেক ব্যথা মোর মোহন তুলিকায়,
আঁধারে জ্বালো মোর নিবান দীপিকায়।

নারায়ণের নিকষ-মণি

মোসলেম ভারত।

পৌষের "মোসলেম ভারতে" শ্রীআবদুল্লাহ্ আল্ আজাদের লিখিত "নন্-কো-অপারেশন বা অসহযোগিতা" অভিনব সন্দভ। অসহযোগিতা সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে ভাবিবার অনেক কথা আছে। লেখক অধুনিক পাশ্চত্য সভ্যতার ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তাহা যে পরিমাণে ভোগের জীবনে আনন্দ দিয়াছে তাহার সমর্থন করিয়াও সে ভোগের মত্ততা দূষণীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ

করিয়াছেন। তাহার উপর পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ভাবগুলি ও "মানুষের সামাজিক ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে এই যে জাগরণ" তাহার সম্বন্ধে আজাদ সাহেবের আলোচনাগুলি পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত লোকের মত নয়। এ নূতন ভাবুকের প্রাণটি নিতান্তই এসিয়ার মাটিতে তৈয়ারী। প্রকৃত উচ্চ ও কল্যাণকর সভ্যতার ভিত্তি যে আধ্যাত্মিক, তাহার আভাস সমস্ত প্রবন্ধটি ভরিয়া ফুটিতে চায়, তাই বলি আল্ আজাদ এসিয়ার ছেলে। কিন্তু বড় বেদনা লাগে যখন দেখি সে অপূর্ব্ব সত্য—মানুষ যে কেবল দেহ বা মন নয়—দেহ মনের অনেক বড়, তাই তাহার যত উচ্চ সার্থক মহান ভাবগুলি সমগ্রকেই লইয়া—ক্ষুদ্র দেহগত আমিকে লইয়া নহে এই মূল কথা লেখক বলি বলি করিয়া সুস্পষ্ট করিতে পারেন নাই।

তবু আশা আছে, আগামী বারে এসত্য আরও সুস্পষ্ট রূপ ধরিতে পারে, কারণ প্রবন্ধটি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। যেমনি করিয়াই বলুন না কেন লেখকের বক্তব্য নারায়ণেরই বলিবার কথা। কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিলেই পাঠক দেখিবেন এ সাহিত্যিক কতখানি তলাইয়া বুঝিতে জানেন,—"কিন্তু যেইমাত্র গান্ধীর মত নির্লোভ নির্ভূষণ সন্ন্যাসী আসিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে নামিয়াছেন, অমনি সমস্ত ভারত ভূমি যেন উচ্ছ্বাসে আবেগে টলমল করিয়া উঠিয়াছে। ইহার মূল কথা এই যে আশু প্রয়োজনের সাধককে ভারত তেমন বিশ্বাস করিতে শিখে নাই, তা তিনি যত বড়ই ধনী মানী হউন না কেন।" আর এক স্থানে লেখক বলিতেছেন, "গণতন্ত্রের সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা, গণশক্তি বা গণতন্ত্র প্রকৃতই একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, শুধু সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের কথা নহে।"

অসহযোগিতায় শাসকবর্গের বা যে কোন স্বদেশীয় বা বিদেশীয় অত্যাচারীর "শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার ও প্রভুত্বের অভিলাষ" ঘুচে কিনা তাহার আলোচনা তুচ্ছ কথা। যে কোন আন্দোলন বা ভাবপ্রবাহ মানুষকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে অপ্রেম হইতে প্রেমে মৃত্যু হইতে জীবনে যতটুকু লইয়া যায় সে আন্দোলন ততটুকুই সার্থক। প্লাবনের বাণ ডাকিয়া বহিয়া গেলে ধ্বংসের কথা মানুষ ধরে না, মানুষ দেখে এ নূতন পলি মাটিতে ধরিত্রীকে কতখানি উর্ব্বরা করিয়াছে। সমস্ত মানব সভ্যতার লক্ষ্যই মুক্তি—মানুষের ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে—ভূমায় মুক্তি, যে বৃহৎ জাগিয়া এ জগৎ আনন্দের ছন্দে বাঁধিয়া দেয় অণুকেও আপন আলোকে দীপ্ত করে।

সাহিত্যিকা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত ও ৪।এ মোহন লাল ষ্ট্রীটের আর্য্য পাবলিশিং হাউসের দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ১।০ টাকা।

নলিনী শ্রীঅরবিন্দের হাতের গড়া প্রাণ—তাই জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। নলিনীর লেখার মত এমন চিন্তা ও ভাবের ঠাস-বুনানীর লেখা বাঙ্গলা ভাষায় খুব কম এসেছে। প্রকৃত গুরু বা শিক্ষক কি একটা অন্তর্নিহিত জ্ঞানের নাড়ী ছুঁয়ে দেয় আর কবে কোন্ সুলগ্নে আত্মদেবতার শুভ উষায় মনপদ্ম খুলে যায়। যার জীবনে এই দুর্ল্ভ আত্ম-বোধন ঘটেছে তার বলবার কথা—বাজাবার রাগিণী ফুরাতে চায় না, সে হেলায় সৃষ্টির আনন্দে দু'হাতে কেবল দিয়েই যায়—অশ্রান্ত সুখে চিন্তামণির নাচদুয়ারের মণিরত্ন চারিদিকে ছড়িয়ে মাতৃভাষাকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিতা করে যায়। শ্রীঅরবিন্দের দশ বৎসরের প্রবাসবাসে নলিনী সঙ্গে সঙ্গে থেকে যে ভাণ্ডারের চাবি পেয়েছে তার রত্নগুলি আর্য্য পাবলিশিং হাউস বাঙ্গলার দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেবে।

এ বইখানিতে বারটি বিষয়ে বারটি প্রবন্ধ আছে, যথা,—কবিত্বের ত্রিধারা, স্বদেশী সাহিত্য, বিশ্ব-সাহিত্য, মিস্টিক্ কবি, ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও ভারতীয় করুণ রস, আর্টের আধ্যাত্মিকতা, কাব্য ও তত্ত্ব, প্রতিভার কথা, শিল্পকলার কথা, চলিত ভাষা ও সাধুভাষা, চলিতভাষা ও সাধুভাষা (অনুবৃত্তি) এবং সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য।

সাহিত্যিকার পাঠক ভারতে শুধু বাঙ্গালা দেশেই আছে, বঙ্গ স্বাধীন দেশ হলে তাষার রাজপাট এদেশে থাকলে সাহিত্যিকা Classicsএর মধ্যে গণ্য হতো। অন্য বই সম্বন্ধে স্তুতির অতিশয়োক্তি করতে গিয়ে যে কথা বলতে হয় সাহিত্যিকার সম্বন্ধে সে কথা স্বরূপ-বর্ণন মাত্র। এ বইএর সমালোচক খুঁজে সমালোচনা করাবার ইচ্ছা আছে, সে দরের সমালোচক দেশে খুব বেশি নেই। বইখানির যে মাধুর্য্য ও ভাবসম্পদ বলে বোঝাতে পারলাম না নারায়ণের পাঠক তা' পড়ে রসাস্বাদ করে দেখবেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত—শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত, দি নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস ১।৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—প্রকাশিত, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি—বইখানি শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রণীত। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিতা নন। জাতীয় জীবনের সুলক্ষণ বটে যে আমরা দেশের বড়লোকদিগকে কিঞ্চিৎ আদর করিতে শিখিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী হেমলতা দেবী শ্রীশিবনাথের আদর্শ চরিত্র বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া লেখনী সার্থক করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনী এবং ইংরেজী ভাষায় লিখিত সুবৃহৎ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এ পুস্তক প্রণীত, এতদ্ব্যতীত পিতার সম্বন্ধে কন্যার অভিজ্ঞতার মূল্যও কম নয়। পিতার জীবনী লিখিতে গিয়া ইনি যথাসম্ভব সংযম রক্ষা করিয়া প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় সংযমের বাঁধ খসিয়া পড়িয়াছে, হৃদয়বান্ পাঠক তাহা ক্ষমা করিবেন।

হরানন্দ ও গোলোকমণির সংসার চিত্রটি উপন্যাসের মতন চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শিবনাথের জীবনপদ্ম শান্ত স্বচ্ছ কৌমুদীস্নাত তোয়ের সহিত খেলা করিতে করিতে তাহার শুভ্র পাপড়িদল আকাশে সুখে স্বচ্ছন্দে মেলিয়া দেয় নাই, এতো সৌম্য বিকচ পদ্মবিলাস নয়, এ যে জীবনবহ্নির রঙ্গ, চারিদিকের ঘনঘোর অন্ধকারের মাঝে জীবনপ্রদীপের জ্যোতিঃ বিকিরণ। মনে করি অন্ধকারকে ঠেলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আলোর বুঝি শুধু বিজয়গর্ব্বই হয়, তা' নয়—আলোরও যে এতে কত ব্যথা কত বেদনা তা'র কতটুকু ইতিহাস আমরা জানি? শিবনাথ যৌবনে মাতাপিতার বুকে ঘা দিয়া বিবেকের আলোককে চিরজীবন অনুসরণ করিয়াছিলেন,—এক হাতে তিনি চোখের জল মুছিয়াছেন, অন্য হাত বুকে রাখিয়া ভগবানের প্রেম অনুভব করিয়াছেন, বুকের অর্দ্ধেকখানি বিচ্ছেদবেদনায় অহরহ জ্বলিয়াছে, অপরার্দ্ধ কাহার হস্তস্পর্শে শীতল হইয়াছে? জানি না শিবনাথ তাঁহার জীবন দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন কি না, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ অভিসারযাত্রী জগতে দুর্লভ এবং তিনি চিরকাল দীপশিখা জ্বালাইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার অপেক্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছিলেন।

যে যুগে সম্প্রদায়সৃষ্টি দ্বারা জগতের কল্যাণ উদ্ভাবিত হইত, স্বর্গীয় শিবনাথ সেই যুগেরই অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং বোধ হয় তাহার শেষ দেখিয়াই এ

জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। জগতের ইতিহাসে সে যুগেরও প্রয়োজন ছিল, রামমোহন কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ না জন্মিলে আমরা আজ গান্ধি রবীন্দ্র অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনকে পাইতাম না।

রূপম্।

এবার ভারতীয় কলাভবনের মুখপত্র "রূপমের" চতুর্থ সংখ্যা পীতবাসে ও চিত্রসম্পদে সাজিয়া অভিসার সাজে বাহির হইয়াছে। কঞ্জিভেরামের দেব-মন্দিরের অপূর্ব্ব দীপাধার গুলির চিত্রাবলি বড় মনোজ্ঞ—তাহার কোনটি দীপ হস্তে কিন্নরী কোনটি বা গড়ুর, আর কোনটি দীপলক্ষ্মীর প্রতিরূপ। হায়দ্রাবাদের রাজান্তঃপুরবাসীনীর ছবিখানিতে মুখশ্রী ও মাধুরী যথেষ্ট আছে, নাই অন্তররাজ্যের মহাকাব্য। স্বাধীনপতিকা, সম্ভোগ, নবোঢ়া, আগত ভর্ত্রিকা, অভিসারিকা, মুগ্ধা, প্রোষিতভর্ত্রিকা স্বরাঙ্কা ও রূপগর্ব্বিতার ছবি গুলি বড় উচ্চাঙ্গের, হিন্দুর রসশাস্ত্রে প্রেমবৈচিত্রের কি চূড়ান্ত পরিণতিই হইয়াছিল এগুলি তাহারই নিদর্শন। জাতি যতক্ষণ জীবন্ত থাকে ততক্ষণ তাহার সৃষ্টিবৈচিত্র হয় এমনি বহুভঙ্গিম।

তামি কুমে নামক জাপানী চিত্রকরের সূত্রে চিত্রকলার কথা জেমস্ কুজিন যাহা লিখিয়াছেন তাহা বড় উপাদেয় হইয়াছে। যদি জাপানী শিল্প বলিয়া কুমের পরিচয় দেওয়া হইত তাহা হইলে সে বলিত, "আমি জাপানী চিত্রশিল্পী নই আমি শুধু চিত্রকবি। যাঁহার জাতি বর্ণ গোত্রের জ্ঞান আছে সে দেখে চোখের কাছে একটি ক্ষুদ্র দীপ, সেই নেত্রতারা-সংলগ্ন দীপের জ্যোতি টুকুই চক্ষু ছাইয়া বহিঃ ও অন্তর সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে। চিত্র-কবি কোনও বিশেষ দেশের নয়, সে নিবিড়ের—অতলতলের বার্ত্তাবহ। সে কোন পদ্ধতি বা নিয়মের দাস নহে—কারণ সে যে স্বয়ং শিব স্বয়ং ভাব নিধি।

ভাবের মাঝে—এ প্রেরণার স্রোত যে একটি রুদ্ধশ্বাস মহাক্ষণের বিলসন, যখন অসীম ও সসীমের দুটি আত্মার এই আলাপচারী হয় তখন তাহাতে রীতি পদ্ধতির কল কব্জা কোথায়? কুমে বলেন অন্তর্দর্শনের গিরি শৃঙ্গে যখন আমি থাকি, তখনই আমি চিত্র-কবি তখনই আমি মূক। সেখানে গায়কের গান হারাইয়া গিয়াছে। তখন আর চিত্র রঙে আঁকা যায় না, কারণ তখন অন্তরের গোপন কবি নিজে তুলি ধরিয়াছে। কোন বিশেষ দেশের ভঙ্গীর চিত্রকর

সে বৈকুণ্ঠের বাহিরের দৌবারিক মাত্র, যখন কবির মাঝে মানুষ বা জাতি ফুরাইয়া যায় তখনই না স্রষ্টা জাগে।

প্রথমে চোখের দৃষ্টি দিয়া মানুষ চিত্র আঁকে, তাহার পর হৃদয়ের স্নেহ প্রেম মান অভিমান প্রভৃতির রসে ডুবাইয়া তুলি ধরে, সব শেষে আসে ভাবের মহাকাব্য। কুমে তাঁর চিত্রে হৃদয় বৃত্তি ফুটাইয়া তুলেন না, তাঁর আঁকা রঙে অশ্রু-ঢলঢল ব্যক্ত বেদনা নাই, সব চিত্রটি ভরিয়া কবির আনন্দ মুক মহাপ্লাবনে ভরিয়া থাকে। বীণাপাণির অঞ্চল ধরিয়া কুমে ভাবগিরির সেই কুজিয়ামা শৃঙ্গে উপনীত হন যেখানে ব্যক্তের বাস্তবের রূঢ় বর্ণ-গরিমা ও মায়াজাল নাই, সেখানে অনাবরণ আত্মধনের কাছে তাঁহার তুলি পট সবই নতজানু।

কুমে বলেন, যে, যখন এ ভূমার অন্তপুরে এই বৈকুণ্ঠমুখী স্বর্ণ আরোহণীর একটি ধাপ উঠি তখন বুক ভরিয়া যে আনন্দ আকুলি ব্যাকুলি করিয়া নাচে তাহাতে কেবল এই বারতা বহিয়া আনে যে সমুখে এ অভিসারের ঐ যে আর একটি পাদ পীট। ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যক্ত করিয়া বাস্তবকেই দেখায় কিন্তু চিত্রকলার মহাকাব্য অনন্তের ছায়ায় অনন্তের চুপি চুপি গোপন কথায় ভরা। আজ শিল্পকলা নবীন রচনার জন্য নূতন জগত খুঁজিতেছে, কিন্তু সেই অবসরে কোথা হইতে অকূল নিবিড় বুঝি বহিয়া আসিয়া তাহার অগণ্য ভুবনের রহস্যে কলা জগত জয় করিল।"

শিক্ষায় নবীন সৃষ্টি।

(২)

ভগবানের এই বিশ্বের জীবনে বিশেষ করে একটা সৃষ্টির দিন এসেছিল, আর এতদিন স্থিতি ও পালনের যুগ গেল ও এখনও যাচ্ছে, এবং শোনা যায় যে দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হয়ে জলপ্লাবনে আর একদিন নাকি এ পোড়া সৃষ্টি ধ্বংস ও হবে। এই রকম সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনটে বিশেষ দিন থাকলেও মোটামুটি রকমের গড়াভাঙাগুলো কিন্তু একসঙ্গেও চলে। আমাদের জাতিরও জীবনে এমনি বিশেষ করে সৃষ্টির দিন, বিশেষ করে স্থিতির আবার বিশেষ করে ধ্বংসের দিন বার বার এসেছে। এতদিন মহানিদ্রার মরণে মরে ছিলাম, রজের মূর্ত্তি ইংরাজ এ তামস জাতটাকে হটাৎ যুযুৎসু বেঁধে ফেলে আস্তে আস্তে জ্ঞান করিয়ে নিজের ভাবের সুরায় মাতাল করে রাখবার জোগাড়ে ছিল।

পশ্চিমের বড় সাধ ছিল যে ভারতের এ জ্ঞানী জাত যদি কখন জাগে যেন ভূতাবিষ্ট পাশ্চাত্যের ভাবভূতে আবিষ্ট হয়েই জাগে। সে চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি, আমরা জেগেই arise awake O Mother India বলে বার্কের ঢঙে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। মা কিন্তু সন্তানের মুখে বিদেশী বুলি বুঝতে পারলেন না।

কিন্তু বিধি কিনা নিতান্তই ভারতকে অমর করে গড়েছেন, তাই আজ এ ঘোর নেশা ছুটে সাড় এসেছে। আজ অন্তরে বোধ জেগেছে যে আমাদের সত্যকার বাঁচা বাঁচতে হবে, আত্মসাধন মন্ত্র ভূত ছাড়িয়ে আপন তাজা প্রাণ ফিরে পেতে হ'বে। পশ্চিম বুঝতে পারে নি, যে অখণ্ড জ্ঞান যার স্বরূপ জগতের সেই ভাব-গুরু এসিয়া কখন ধ্রুবের মরণ মরতে পারে না, পাশ্চাত্য টের পায় নি, যে, তীব্র পশ্চিমী সুরায় ভারতকে জাগালে সে তপোমগ্ন ঋষি আপন তপস্যার সিদ্ধি নিয়েই জাগবে। তাই বলি বিষম মরণ মরার পর এ আবার নতুন করে সৃষ্টির যুগ এলো, এখন শুধু যে দেশ-আত্মার বোধন চাই তা' নয়, অনেক জিনিষ যুগের নতুন আলোয় নতুন করে গড়া চাই। সনাতন ভারত পুনর্জীবন পাবে, পেয়ে দেশকালোপযোগী নতুন রাজবেশ ছত্র দণ্ড ধরবে।

তাই জাতীয় শিক্ষায় প্রথম কথা দেশ আত্মার বোধন : এমন ধন ফিরে পাও যে ধন নই'লে ভারত শব, যে প্রাণস্পর্শ না ঘটলে ভারত কখনও নড়ে না—সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মশক্তি হয়ে নাচে না। বাংলায় বহুদিন হল সে পরম সত্য এসেছে, তাই যখন আমরা আন্দামানে তখন ইংলণ্ডের একজন শ্রমজীবীদলের নেতা এসে অরবিন্দ শিশির কুমার প্রভৃতিকে দেখে লিখেছিলেন, "But Bengal is doing better than making political parties It is translating nationalism into religion, into music and poetry, into painting and literature."—"বাঙলা রাজনীতিক দল সৃষ্টি করার চেয়েও ঢের বড় কাজ করছে, কারণ বাঙলা জাতীয়তাকে ধর্ম্মে, কবিতায় গানে চিত্রে শিল্পে সাহিত্যে রূপান্তর করে নিচ্ছে।" যখন দেশ আত্মা —The soal of a nation জাগে তখন এমনই হয়, জীবনহিল্লোল ভাগবত শক্তিতে জাতির সব অঙ্গ নধর নবীন লাবণ্য-ঢল-ঢল করে তোলে।

বাঙলা যে বেঁচেছে—পাশ্চাত্যের সুরা পান করে ঘুম ভেঙে নিজের আত্ম শক্তিই ফিরে পেয়েছে, তার প্রমান রামমোহন ভূদেব বঙ্কিম বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ। তাই দেখনা পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্প শিখে আমাদের অবনীন্দ্র মাটিতে বসে অজন্তার ছবি আঁকতে লেগে গেল! কৈ, যীশুর কোলে মেরী ত আঁকলো না? কৈ, বর্ণে রূপে মাধুর্য্যে দেহের কবিতা সেই গ্রীক শিল্পীর ভোগের স্বপ্ন তুলির মুখে ত ফলাল না? বাঙলার জগদীশ দেখ জড় বিজ্ঞানের সত্য যা' খুলে দিল তা ঋষির সাধন-ধন—উপনিষদের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। সে দিন একজন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু শ্লেষ করে বলছিলেন, "জগদীশ বিজ্ঞান শিখে কি করলেন, না জড়ে গাছ পালায় জীবন আছে তাই দেখালেন!" বন্ধুটির বড় আক্ষেপ যে কতগুলো কল কব্জা ধোয়াঁগাড়ী গড়ে আচার্য্যদেব ভারতের মানুষকে সহজলভ্য টাকার ছালা দেখিয়ে দিলেন না কেন।

আর একটি নবীন তরুণ বন্ধু অনেকবার আমাদের কাছে যাতায়াত করেছেন। তাঁর ধারণা জগতের ইতিহাসে নাকি কোথায়ও দেখা যায় না যে অধ্যাত্ম ধর্ম্মে জাতিকে বড় করে বা তার সভ্যতা গড়ে দেয়। পাঠক! একবার বুঝে দেখুন ইংরাজি স্কুলে ইতিহাস পড়ে ভারতের আত্মা কি রকম শিঙেই ফুঁকেছে, কি বিষম মারাত্মক মরণই মরেছে! ফরাসী জাতি যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব ধন নিয়ে জেগেছিল যে জাগরণের শক্তিমন্ত্র স্বার্থমুখী য়ুরোপকে আজও যদুবংশ ধ্বংশ থেকে রক্ষা করে আসছে, সে তত্ত্ব —সে ভাবধন কি আধ্যাত্মিক নয়? আমেরিকায় মার্কিন গণতন্ত্র মানবের যে পরম মুক্তির আশায় ভিত গেড়ে সৌধ রচনা করেছে—সে জীবনবেদ কি আধ্যাত্মিক নয়? এসিয়ায় বুদ্ধ শঙ্কর কন্‌ফিউসিয়াস যে তত্ত্ববীজ নিয়ে কত কত মহাদেশব্যাপী সভ্যতা ও রাষ্ট্রপীঠ রচনা করিয়ে গেছেন সে শক্তিবীজ কি আধ্যাত্মিক নয়? শক্তির ঘর চিরদিনই সূক্ষ্মে বা কারণে, তাই তা' লোক চক্ষুর অগোচরে, তার বাহিরের প্রকাশ দেখেই মানুষ ভুলে যায়, ভাবে বুঝি শক্তির চেয়ে এ শক্তি-সিন্দুর ঢেউ বড়। মন প্রাণ দেহই শুধু মানুষ নয়, ওগুলি প্রকৃত মানুষের প্রতিমা—তার আনন্দ আস্বাদনের পাত্র তার প্রকাশের যন্ত্র। প্রকৃত মানুষের ইতি নাই, কি শক্তির দিক দিয়ে কি আনন্দের পরিমাণে মানুষ সব দিক দিয়েই অসীম অকূল অফুরন্ত। মানুষের একদিকটা জীব আর একদিকটা শিব, শিব থেকে জ্ঞানশক্তি আনন্দ বয়ে আসে আর জীব থেকে সৃষ্টি হয়। এই অখণ্ড দৃষ্টিই ভারতের ধারা—এই ধন এই দিব্য জিনেত্র লাভ করে জাতীয় শিক্ষার ভিত রচনা করতে হবে।

আগে গুরু শিষ্যকে জ্ঞান দিত, আশ্রমে বসে গাছের তলায় তপস্যানিরত

গুরু শিষ্যকে ক'খানা বই পড়াত? কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের জ্ঞানী শিক্ষক বুঝতো মানুষ বইপড়া জ্ঞান ভরে দেবার একটা নির্জীব চোঙ নয়—শিক্ষার যন্ত্র নয়, মানুষ একটা জীবন্ত কিছু—বড় সূক্ষ্ম জটিল, নিজেই জ্ঞানের উৎস। তাকে পাঁশ গাদা বা আঁস্তাকুড় (dust bin) করে বাহির থেকে তার মধ্যে জ্ঞান ফেলে দেওয়া যায় না, তার অন্তর্নিহিত রুদ্ধ জ্ঞান অমোঘ স্পর্শে ফুটিয়ে তুলতে হয়। গুরু তাই করতেন, এমন এক জ্ঞানের নাড়া ছুঁয়ে দিতেন, যার চেতনায় কোন্ শুভ লগ্নে তার মন-পদ্ম খুলে যেত, আর তারপর এক মঙ্গল উষায় অপূর্ব্ব তপোবল জ্ঞানবল ও আনন্দধন নিয়ে আশ্রম থেকে এক বাঁধনহারা মহাকর্ম্মী বেরিয়ে সংসারে আসতো। এর নাম শিক্ষা — এর নাম আত্মবোধন, অন্তরের জ্ঞান-উৎসের মুখ না খুলে দিতে পারলে—মানুষকে শক্তি ও সৃষ্টির ডাইনামো না করে নিতে পারলে, বাহির থেকে পরের চর্ব্বিত জ্ঞান ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জ্ঞানবাহী গর্দ্দভই করবে, জ্ঞানী করতে পারবে না।

জাগা মানুষই কেবল জ্ঞান ধন দিতে পারে। জ্ঞানের আধার মানুষের এই বিরাট আমির যেমন দুই দিক—এক এই ছোট প্রকাশ আমি দেহ প্রাণ মন, আর সেই তার মূল সর্ব্বব্যাপী কারণ আমি। এক জীব আর শিব, তেমনি এই অনন্ত মানুষের শিক্ষার দিকও দুই—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। এই দুই নিয়ে জ্ঞান পূর্ণ। অন্তর্জগতের পরা বিদ্যা এশিয়ার জীবন সাধনা আর বহির্জগতের অপরা বিদ্যা পাশ্চাত্যের জীবন সাধনা। এত দিনের এই দুই সাধনা মিলিয়ে তবে জীবন-বেদ। জাতীয় বিদ্যালয়ে এই তত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞ গুরু বসে সম্পূর্ণ জীবন-বেদ বিদ্যার্থীকে দেবে। সেই জীবন্ত বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিখে মানুষ হয়ে নিত্য আনন্দে পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে যারা বাহির হবে, তারা দেশকে আবার ভারত করে গড়বে, আবার মরা এসিয়াকে প্রাণদান দিয়ে জগতে মানুষের চির মুক্তির (Spiritual democracy) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

রচনা—হাবিলদার কাজী নজরুল্ ইস্লাম্ ।

সুর ও স্বরলিপি ।

[শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা

আস্থায়ী ।

২´ ৩ ० ১
II { সা র্সর্সা । না -র্রা র্সা । ধধা না । ধা পা -রা I
প থিক্ ও ० গো চল্ তে প থে ०

২´ ৩ ० ১
রা গগা । মা —পধা পপা । মা গমরা । ন্া র্া সা I
তো মায় আ ०० মায় প থে০র দে ० খা

অন্তরা

I সা ন্া । ধ্া প্া —া । সরা গা । মা পা —া I
ঐ দে খা তে ই ছুই টি হি য়া র্

২´ ৩ ० ১
I ধধা না । র্সধা পা —া । মা গমরা । ন্া র্া সা } II
জাগ্ লো প্রে০ মে র্ গ ভী০র্ রে ० খা

অন্তরা ।

২ ৩ ० ১
II { পপা ধা । র্সা —ধা না । র্সা র্সর্সা । না —র্রা র্সা
এই যে দে ० খা শ রৎ শে ० ষে

I র্রা র্গর্গা । র্মা —া পা । র্মা র্গর্মর্রা । না র্রা র্সা } I
প থের্ মা ० ঝে অ চি০ন্ দে ० শে

২´ ৩ ० ১
র্সা র্সা । না র্সা —া । ধা ননা । ধা —া পা I
কে জা নে ভা ই ক খন্ কে ० সে

২´ ৩ ০ ১
রগা গা । মধা পা —া । মগমা রা । ন্‌া —র্‌া সা II
চল্‌ বো আ০ বা র্‌ প০থ্‌ টি এ ০ কা

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১
II { পপা মা । গা রা —গা । মমা পা । পমধা পা —া I
এই যে মো দে র্‌ এক্‌ টু চে০০ না র্‌

২´ ৩ ০ ১
I ধধা না । র্সনা ধা —পা । মা গরা । ন্‌া —র্‌া সা I
আব্‌ ছা য়া০ তে ই রে্‌ দন্‌ জা ০ গে

২´ ৩ ০ ১
I সা ন্‌ন্‌া । ধ্‌ধ্‌া প্‌া —া । সা রগা । মা মা পা I
কা গুন হাও য়া র্‌ ম দির্‌ ছোঁ ও য়া

২´ ৩ ০ ১
I ধা ননা । ধা না ধপা । মা গমা । রা —া সা }
পূ রের্‌ হা ও যার্‌ কাঁ পন্‌ লা ০ গে

আভোগ।

I { পপা র্সধা । নর্সা র্রা —া । নর্সা র্সা । নর্রা র্সা —া I
হয় ত০ মো০ দে র্‌ শেষ্‌ দে খা০ এ ই

২´ ৩ ০ ১
I ধধা না । র্সা —না র্রা । র্সা ধনা । ধা পা —া I
এম্‌ নি ক ০ রে প থের্‌ বাঁ কে ই

২´ ৩ ০ ১
I র্সর্সা র্রা । না —া র্সনর্রা । ধধা না । ধা পা —পরা I
রই ল শু ০ ধু০০ চার্‌ টি আঁ খে ০ই

২´ ৩ ০ ১
I রা গগা । মধা প্‌া —া । মা গমরা । ন্‌া - র্‌া সা } IIII
চে নার্‌ বে০ দ ন্‌ নি বি০ড়্‌ লে ০ খা

চাকুরের ছুটি।

[শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায বি, এ।]

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রি দশটার সময় অবসর পাইয়া সতীশ কাঁধে একখানা ভিজে গামছা আর হাতে হুঁকো কলকে লইয়া ছাদের খোলা বাতাসে আসিয়া যখন একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তখন লোকে যাকে বলে পুনর্জীবনলাভ করা, সতীশ বোধ করি সেই রকমেরই একটা কিছু লাভ করিল। তার-পর বসিয়া, হাতের আড়ালে দেশলাই জ্বালাইয়া একখানি টিকে ধরাইয়া, বাঁ-হাতটা উঁচু করিয়া টিকেখানি বাতাসে ধরিয়া রহিল, আর ডানহাতের হুঁকাটার মুখে ফুঁ দিয়া অতিরিক্ত জলটুকু ফেলিয়া দিতে লাগিল। ঠিক এমনি সময়ে রাজেন আসিয়া সতীশের নিকটে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বাঁচা গেল ভাই—ছুটী ত পেলাম।" সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "বেশ, বেশ, বাবু কি বল্লেন?"

রাজেন—"কি আর বলেন বল, ছ'মাস হ'ল বাড়ী থেকে এসেছি,—ছুটী না দিলে কি ছাড়তাম।"

সতীশ "তা হ'লে কবে যাচ্ছ? কালই নাকি?"

রাজেন "কাল আর কি করে যাই, ভাই, কিনতে কাটতে হবে। পরশু যাব মনে করছি।"

রাজেনের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় কুসুমপুর নামক একটী গ্রামে। কলিকাতায় চাকরী করে বড়বাজারের চিনেপটীতে মহেন্দ্র গোঁএর গদীতে বার টাকা বেতনের একজন 'গোমস্তা' প্রায় ছয়মাস হইল সে বাড়ী হইতে আসিয়াছে, তাই বাড়ী যাইবার জন্য আজ সে বাবুর নিকট ছুটী চাহিতে গিয়াছিল। রাত্রি সাড়ে নয়টার পর, তহবিল মিলাইয়া, আহারান্তে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া, গুড়গুড়ীর নল মুখে বাবু যখন 'বিশ্রাম' করেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময়টীতেই বাবুর মেজাজটী কিঞ্চিৎ নরম থাকে। রাজেন ঠিক সেই সময়েই গিয়া তাহার আবেদন জানাইল। সর্ব্বদাই খিট্‌খিটে এই বাবুটী গদীর প্রায় সকলেরই উপর কোন না কোন কারণে চটা; কিন্তু এই রাজেনের উপর কোনদিনই চটেন নাই, কারণ তিনি কোনদিন তাহার কাজে বা ব্যবহারে বড় একটা 'ভুলচুক' বা 'খুঁত' ধরিতে পারেন নাই।

অধিকন্তু রাজেন ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া বাবু তাহাকে একটু ভয় ও ভক্তি করিতেন, কারণ এই দোকানেরই কোন্ এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের একটা দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়াছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা। কাজেই রাজেন ছুটী চাহিলে বাবু বলিলেন "তাইত হে,—এ সময় গদীতে লোক জন কম—" পরে গুড়গুড়ীর নলে আর একটা টান দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যাও, কিন্তু ৭ দিনের মধ্যে আসা চাই।" রাজেন ছুটী পাইয়াই আগে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সতীশকে খবর দিতে গেল। সতীশও ঐ এক দোকানেরই কর্ম্মচারী, তার কাজ তাগাদা করা।

শুধু বাবু কেন গদীর প্রায় সকলেই রাজেনকে ভক্তি করিত, এত দারিদ্র্যে-জীর্ণ শীর্ণ মানুষ অথচ এত বিশ্বাসী ও সৎস্বভাব খুব কম পাওয়া যায়। রাজেন অনাহারে থাকিত কিন্তু মনিবের টাকা গোরক্ত জ্ঞান করিত। বয়স তাহার আন্দাজ ত্রিশের দুই এক বছর বেশী হইবে। সংসারে মা, দুইটী পুত্র ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী যেদিন দুইটী পুত্র রাখিয়া মারা যায়, সে আজ চারি বৎসরের কথা। তারপর কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ঘটক আসিয়া রাজেনের মাকে ধরিয়া বসিল। তিনিও বলিলেন, "বিয়ে দিতে হবে বৈকি, ছেলের আমার বয়স কোথা? তবে কি জানেন—মেয়েটী একটু বড় সড হয়, এসেই ঘরকন্না করতে পারে, এমনি ধারাটী হ'লেই যেন আমার ভাল হয়, দেখ্‌ছেন ত আমি বুড়ো হাবড়া—"। ঘটকমহাশয়ও অমনি "তা বৈকি, তা বৈকি, সেই রকম মেয়েই আমার হাতে আছে—" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং নিজের কাজ গুছাইয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। কিছুদিন পরেই একটী চৌদ্দ বছরের মেয়ের সঙ্গে রাজেনের বিবাহ হইয়া গেল। এত দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট রাজেনের আপত্তি করিবারও বুঝি শক্তি ছিল না, সে সকল বিষয়েই নির্ব্বিকার। শাশুড়ী 'ধূলো পায়ে' দিন করাইয়া বৌকে ঘরে আনিলেন। নূতন বৌ আসিয়া ছেলেদুটীকে আদর যত্ন করিতে লাগিল, এবং শাশুড়ীকেও বেশ ভক্তি করিতে লাগিল। শাশুড়ীটীকে আর সংসারের প্রায় কোন কাজই করিতে হয় না, বৌমাই সব করে। তা ছাড়া, এমনি নীরবে সে কাজ করিয়া যাইত, যে পাশের বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত এই বৌটীর কোনদিন মুখের রা'টী শুনিতে পায় নাই।

* * * * *

পরশু দিন বাড়ী যাইবে, সুতরাং কাহার জন্য কি লইয়া যাইতে হইবে, সে

রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া রাজেন তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার শীর্ণ মুখে এখন হাসি ধরে না। স্থির করিল, মায়ের জন্য ত এক জোড়া কাপড় লইতেই হইবে, আর আসিবার সময় তাঁহার হরি নামের ঝোলাটী ছেঁড়া দেখিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তাঁহার জন্য একটী হরিনামের 'ঝোলা'ও লইতে হইবে। তার পর ভাবিতে লাগিল,—ছেলেদের জন্য কি রকম কাপড়ই বা লইয়া যায়! দুইটিরই রং ফর্সা, কালা পেড়ে কাপড় বেশ মানাইবে, সুতরাং তাদের জন্য এক জোড়া কালা পেড়ে কাপড় লইতে হইবে। কিন্তু স্ত্রী নারায়ণীর জন্য কি রকম কাপড় লওয়া যায়? পাছা পেড়ে লইব, না বেপাছা সাড়ী লইব? খুব চওড়া হাতীপাড় লইব, না ইঞ্চিপাড় লইব? বিলাতী ভাল হইবে কি, দেশী শান্তিপুরে কি ফরাসডাঙ্গার ভাল হইবে? এইরূপ অনেক কথাই সে ভাবিতে লাগিল। তারপর টাকার কথা মনে হইল. ভাবিয়া দেখিল, টাকার অভাব হইবে না, কারণ তাহার দুই মাসের বেতন পাওনা আছে। ২৪৲ টাকা। সে কি কম, রাজার রাজত্বি!।

পরদিন সকালে রাজেনের কেবলই মনে হইতে লাগিল, "আজকের দিনটা গেলে বাঁচি।" বৈকালে বাবুর নিকট টাকা চাহিয়া লইয়া বাজার সারিল। তারপর, গ্রামের একটী লোকের সঙ্গে দেখা করিয়া মুর্গিহাটা দিয়া যখন ফিরিতেছিল, তখন দেখিল, কয়েকখানা সুগন্ধি তেলের দোকানের গন্ধে জায়গাটা ভরপুর। রাজেনের মনে হইল, নারায়ণীর জন্য একশিশি নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার ভাবনা আসিল, যদি টাকায় না কুলায়! যাহা হউক, কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজেন অল্পদামী একশিশি সুগন্ধি তেল স্ত্রীর জন্য কিনিল।

রাত্রিতে রাজেন পুটুলি বাঁধিতেছে, এমন সময় সতীশ আসিয়া পড়িল, বলিল, "বাঃ—রাজেন দা,—তীর্থযাত্রী মেয়েদের মত তোমার পুটুলি ত দেখিছি নিতান্ত ছোট হল না। কি এত কিনলে?"

রাজেন বলিল, "ভাই একটা দুটো করতে করতে এতগুলোই হয়ে উঠলো, এখন হাতে পথ খরচা বই আর কিছু নেই। এই ধর না—একখানা লোহার কড়াই কিনলাম, মা পোস্ত ভালবাসেন, সেই জন্যে পাঁচপোয়া পোস্ত কিনলাম, তারপর, ফৌজদারী বালাখানার তামাকও খানিকটা নিতে হল,—বাড়ী গেলেই পাড়ার সবাই এসে বলবেন, "কি হে কলকাতা থেকে এলে, ভাল তামাক টামাক কিছু এনেছ"—

এইবারে সতীশ বাধা দিয়া বলিল,- "তা বেশ, বেশ—কিন্তু কাপড় চোপড় কিনবে বলছিলে, কি কিনলে দেখি। এই বলিয়া সে পুটুলিটী খুলিয়া ফেলিল। তারপর মোটটী গুছাইয়া বাঁধিতে গিয়া একটা শিশি নজরে পড়ায় সতীশ বলিয়া উঠিল, "ও কি, রাজেন দা, একটা বাসতেলও বুঝি নিয়েছ? তাই বলি, এত বাস বেরুচ্চে কোথা থেকে। কি তেল দেখি—"

রাজেন তাহার হাত হইতে পুটুলিটী কাড়িয়া লইয়া বলিল, "ওরে চুপ কর্ হতভাগা, ওঘরে বাবু এখনও জেগে আছেন, শুনতে পাবেন যে।" সতীশ চুপ করিল। তারপর কতকগুলো কাগজ চোখে পড়ায় আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, অত কাগজ কিনলে কেন রাজেন দা?"

রাজেন বলিল, "ভাই, বড় ছেলে কানাই পাততাড়ী ছেড়ে কাগজে লিখতে আরম্ভ করেছে, তাই তার জন্যে দু'দিস্তা কাগজ নিলাম।"

পরদিন প্রাতে সাড়ে ছ'টার সময় ট্রেণ কিন্তু রাত্রি তিনটা হইতে চার-পাঁচবার উঠিয়া রাজেন দেশলাই জ্বালিয়াছে আর দেওয়ালের ক্লকটা দেখিয়াছে। পাঁচটার সময় আর থাকিতে না পারিয়া সতীশকে উঠাইয়া বলিল, "ওরে ওঠ্ না ভাই, এইবারে ষ্টেশনে যাওয়া যাক্।" "এত তাড়াতাড়ি কেন, যাব ত ভারী এইটুকু"—এই বলিয়া সতীশ আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। রাজেন বলিল, "ওরে বুঝিস না, রেলের কাজ—একটু আগে যাওয়াই ভাল।"

যথা সময়ে রাজেনকে ট্রেণে চড়াইয়া দিয়া সতীশ বাসায় ফিরিল।

• • • • • •

রাজেন যখন রসুলপুরে নামিল, তখন বেলা প্রায় দশটা। ষ্টেশন হইতে তাহার বাড়ী প্রায় সাত আট ক্রোশ। সে প্রথমে একটা মুটের চেষ্টা করিল, কিন্তু মুটে যখন কিছুতেই এক টাকার কমে নামিল না তখন সে ভাবিল, "আমার মাইনে হ'ল মাসে বার টাকা, আমি একটা টাকা মুটেকে দিই কি করে?" এই ভাবিয়া সে নিজেই মোটটী মাথায় করিয়া, সেই কাঠ-ফাটা রৌদ্রে চলিতে আরম্ভ করিল। কথায় বলে, বাড়ীমুখো বাঙ্গালী আর রণমুখো সেপাই—তা'ছাড়া রাজেন আজ ছয়মাস পরে বাড়ী ফিরিতেছে, তাহার কি আর রোদ বৃষ্টি জ্ঞান থাকে!

ক্রোশ দুই আসার পর রাজেন বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সে মাঠের একটা পুকুরের পাড়ে বটতলায় বসিল। পুকুরে তখন দুই চারিজন বাগ্দীর মেয়ে জাল লইয়া মাছ ধরিতেছিল। বেলা বোধ হয় দ্বিপ্রহর। তাহার মনে

হইল, "এতক্ষণ হয়ত তাহার স্ত্রীর রান্না শেষ হ'য়ে গেছে, ছেলেরা পাঠশালে গেছে, আর 'সে' হয়ত মাকে খাওয়াচ্ছে, অথবা, হয়ত, দু'জনেরই খাওয়া হ'য়ে গেছে, মা শুয়ে আছেন, আর 'সে' মায়ের মাথার পাকা চুল তুলে দিচ্ছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজেন অপেক্ষা করিতে লাগিল, যদি কোন রাখাল কৃষাণ সেদিক দিয়া যায়, তাহা হইলে সে একবার 'কড়া তামাক খাইতে পায়। কিন্তু কেহই যখন আসিল না, তখন সে তাহার পুঁটুলি খুলিয়া তামাক সাজিল এবং তাহার জলশূন্য হুঁকায় টান দিয়া তামাক খাওয়ার সাধ মিটাইল। পরে আবার চলিতে লাগিল।

আরও তিন ক্রোশ আসার পর সে একেবারে আসন্ন হইয়া পড়িল। একটা পুকুরে স্নান করিয়া লইয়া একটী আমগাছের তলায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিল। আবার চলিল। ক্রমে সূর্য্যদেব লাল্ হইয়া নীচে নামিতে লাগিলেন আর পিছনের দিকে তাকাইয়া যেন বলিতে লাগিলেন, "পথিক সন্ধ্যা হয় হয়, একটু দ্রুত গমন কর।" রাজেন দেখিল, আর তিন পোয়া আন্দাজ রাস্তা বাকী, গ্রামের বাবুদের চিলে কোঠা দেখা যাইতেছে, তাড়াতাড়ি করিয়া আর লাভ কি? ক্রমে যখন গা-ঢাকা-ঢাকা অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন রাজেন গ্রামের বাহিরে 'রায়দীঘির' পাড়ে পৌঁছিল। এই দীঘির জলই তাহাদের পাড়ার সকলে খায়। রাজেন একটী তেঁতুল তলায় বসিল, ভাবিল, এই সময়েই ত তাহার স্ত্রী এই দীঘিতে জল লইতে আসে, আজও আসিবে, সে এইখান হইতে দেখিবে। ক্রমে যখন পাড়ার বৌ ঝি সকলেই জল লইয়া গেল, অথচ তাহার স্ত্রী আসিল না, তখন তাহার ভয় হইল, অসুখ বিসুখ করে নাই ত। পরে ভাবিল, বোধ হয় আজ বেলা থাকিতেই জল লইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া দীঘির ঘাটে পা ধুইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। গ্রামে ঢুকিয়া দেখিল, দূরে দয়াল কাকা তাহাকে দেখিয়াই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পরিচিত অনেককেই সে দূর হইতে দেখিতে পাইল, কিন্তু সকলেই পাশ কাটাইতে লাগিল। কেবল যখন রাঙা পিসির সামনে পড়িয়া গেল, তখন তিনি আর পাশ কাটাইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, রাজু যে!" "হাঁ পিসিমা, ভাল আছত!" বলিয়া রাজেন চলিতে লাগিল, তাহার আর কিছু বলিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইতেছিল না। কেহই ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না দেখিয়া, এক অপ্রত্যাশিত বিপদের আশঙ্কায় রাজেনের বুক কাঁপিতে লাগিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়া সে কিছুক্ষণ বহির্ব্বাটীর দরজায়

কাণ পাতিয়া রহিল, যদি কাহারও কোন কথা শুনিতে পায়। কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না। কোন্ এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া উঠানে পা দিয়াই সে ডাকিল "মা।"

কে বাবা, রাজু এলি।" বলিয়াই মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "বাবা, বৌমা আমার নেই রে, আজ তিনদিন হ'ল মাকে আমার হারিয়েছি বাবারে—।" রাজেন সেই খানেই বসিয়া পড়িল, মা কাঁদিতে লাগিল, ছেলেদুটীও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার শব্দে প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িল। তাহারা রাজেনের মাকে থামাইল। রাজেন 'থম খাইয়া' বসিয়াছিল, তাহার বুকটা চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাহার বোধহয়, চেঁচাইয়া কাঁদিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু চোখের জলে তাহার বুকটা ভাসিয়া যাইতেছিল। অবশেষে কে একজন বুঝাইয়া বলিলেন, "যা বাবা, চান্ করে আয়—সারা দিনটা খাওয়া হয়নি?" "এই যাই" বলিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজেন স্নান করিতে গেল।

সে রাত্রিতে মা রাজেনকে একলা শুইতে দিলেন না। তিনিও ছেলেদের লইয়া এক ঘরেই শুইলেন। বলিতে লাগিলেন, "হঠাৎ যদি হ'লে দু'তিনদিনে যে এত বাড়াবাড়ি হবে, বাবা তা ডাক্তারও বুঝতে পারে নি।" তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "এমনি হবে জানলে কি তোকে না জানাতাম বাবা।" এইরূপে অনেকরাত্রি পর্যন্ত মা তাহাকে অসুখের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। রাজেন বুঝিল, 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' হইতে নিউমোনিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতেই নারায়ণী মারা গিয়াছে। স্ত্রীর কথা যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার বাদিকে বুকে সে একটা নির্মম খোঁচার আঘাত অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, ছয় মাস পূর্ব্বে যেদিন সে বাড়ী হইতে যায়, সেদিনও তাহার স্ত্রী জ্বরে পড়িয়াছিল, মনিবের কাজের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া বার বার তাগাদা পত্র আসায় বাধ্য হইয়া তাহাকে রোগকাতর স্ত্রীকে ফেলিয়াই কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল।

পরদিন মা যখন স্নান করিতে গেলেন এবং ছেলেরা কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল, সেই সময় রাজেন তাহার পুঁটুলিটি খুলিল এবং স্ত্রীর জন্য আনীত সাড়ীখানি ও তেলটী বাহির করিল। পরে একটা কাঠের সিন্দুকে—যাহাতে পুরাণো ছেঁড়া কাপড় চোপড় থাকে—তাহারই সব নীচে চোখের জলে ভিজাইয়া সেই সাড়ীখানি রাখিয়া দিল, তার উপর কতকগুলি পুরাণো কাপড়

চোপড় চাপা দিল, যেন সহসা কাহারও তাহাতে চোখ না পড়ে। আর সেই তেলের শিশিটা খুব একটা উঁচু কুলুঙ্গীতে--যেখানে তাহার মা কোনদিন হাত দেন না, আর ছেলেরাও নাগাল পায় না, সেই খানে তুলিয়া রাখিল। চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। ঘরের একপাশের একটা কুলুঙ্গীতে রাজেন দেখিল মাথা বাঁধা ফিতে, চুলের দড়ি, আর মাথার কাঁটা রহিয়াছে, আর একটা কাঁচের বাটীতে খানিকটা নারিকেল তেল, তাহাতে সিঁদুর পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরের 'আড়ায়' একখানা হলুদের দাগ-টানা কাঁথা ঝুলিতেছে, বোধ হয় পাড়ার কেহ তাহার ছেলের জন্য বুনিতে দিয়াছিল, নারায়ণী শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই। আর দেখিল, দেওয়ালের গায়ে গজালে একখানা আয়না ঝুলিতেছে, তাহার ফ্রেমটীও সিঁদূর মাখান। পিছনের একটা ছোট কুলুঙ্গীতে দেখিল, একটা চাবির রিং, আর কতকগুলো ভাঙ্গাচূড়ী রহিয়াছে। চোখের জলে তাহার চোখ ভরিয়া গেল। সে আর চাহিতে পারিল না বুকের ভিতরটায় অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল, মনে করিল একবার খুব চীৎকার করিয়া কাঁদে। ঠিক এমনি সময় তাহার বাল্যবন্ধু যুগল আসিয়া ডাকিল, "রাজেন"। রাজেন বাহির হইয়া আসিল। তারপর যুগল বলিল, "আমি ভাই দু'দিন বাড়ীতে ছিলাম না,—এই মাত্র আসছি, এসেই শুনি তুই এসেছিস—উঃ চোখ দুটো তোর যে লাল জবাফুলের মত হ'য়ে উঠেছেরে, আয় আমাদের বাড়ী" বলিয়া যুগল তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

• • • • •

কয়েকদিন পরে একদিন স্নানান্তে ঘরের দিকে বসিয়া রাজেন তাহার মায়ের হরিনামের মালা গাছটা নূতন করিয়া গাঁথিতেছে, এমন সময়, তাহার মা আসিয়া বলিলেন, "বাবা, ও ঘরটায় কি ইন্দুরের দৌরাত্মই হয়েছে। ঘরের কপাটটা খুলেই একটা কিসের বাস পেলাম—ঢুকে দেখি, একটা বাস তেলের শিশি ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে, ঘরময় তেল ছড়াছড়ি। আহা—মা আমার কোন কুলুঙ্গীতে কখন তুলে রেখেছিল, বোধ হয় একদিনও মাখে নি। —ছেলে দু'টো আবার তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে মাখছে—বললাম—কাচে হাত কেটে যাবে—তাই কি শোনে—। যাই দেখি গে।" বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। রাজেন বুঝিল, এ কোন্ তেলের শিশি। কয়েকদিন পূর্ব্বে কত সাধ করিয়াই না সে মুর্গিহাটায় এই তেলের শিশিটা কিনিয়াছিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় রাজেনের নামে একখানি চিঠি 'পিওন' দিয়া গেল। তাহার মনিব দিয়াছেন, লিখিয়াছেন—'সাতদিনের ছুটী লইয়া গিয়াছেন, আজ প্রায় দুই সপ্তাহের উপর হইয়া গেল, যত শীঘ্র পারেন, চলিয়া আসুন, কাজের বিষম ক্ষতি হইতেছে।'

রূপ কথা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সেদিন সাঁঝে খবর এল
কল্প লোকে শেষ নিশায়
বসবে সভা নাচবে হাজার অপ্সরী
তারার দলে জালবে বাতি
দীপ্ত করি' দিক বিভায়
গাইবে গীতি কণ্ঠে মধুর কিন্নরী।

বাহির হ'লেম কুটীর ত্যজি'
সেদিনের সে শেষ নিশায়
রাখতে সেই অপ্সরীদের আমন্ত্রণ
দেখতে হবে কেমন তারা
কিন্নরীরা কেমন গায়
হৃদয় মাঝে জাগল এমন আকিঞ্চন।

হাজির হ'লেম কল্প লোকে
সেদিনে তাই শেষ নিশায়
মনটা আমার উধাও করি' আকাশে,
অপ্সরীদের নূপুর রিণি,
কিন্নরীদের কণ্ঠ গায়,
রঙ্গিণীদের রঙ্গ বাজে বাতাসে।

শুধুই হাসি শুধুই গানে
রিক্ত কিছু নাই কোথায়
চৌদিকে হায় আপন-ভোলা সঙ্গীতে,
অশ্রু এল আঁখির পাতে
বাজল ব্যথা মোর হিয়ায়
অপ্সরীদের সেই গো একই ভঙ্গীতে।

হাসি মুখে ফিরনু ঘরে
সেদিনে তাই প্রভাত বায় :—
ভাল ভাল আমার ভাল ধরিত্রী
আমার চোখের অশ্রু জলে
ঐ যে স্বপন দেখা যায়
ভাল আমার দুঃখ-সুখ দায়িনী।

ভাল ভাল আমার ভাল
এই যে প্রাণের আকুলতা
তুলনা তার কোথাও গো নাই নন্দনে
চোখের জলে সুখের রেখা
সুখের মাঝে লুকিয়ে ব্যথা
সেই স-পাওয়াই জাগছে আমার ক্রন্দনে।

সিন্ধু-সকাশে।

দিবস রাত্তি তোমার বুকে
যে-সব উঠে তরঙ্গ
কি চায় তারা? কি গায় তারা গান?
দিবস রাত্তি পরাণ মেলি
নভের গায়ে অনন্ত
কি পায় তারা? কি চায় তারা দান?

কাহার তরে ব্যাকুল ওরা
আকুল কিসের জল্পনা
ফুটছে ওদের গভীর হিয়ার তলে?

কাহায় নিয়ে ওদের খেলা
কিসের বিপুল কল্পনা
ওদের জীবন-পথটী চেয়ে চলে ?

গভীর ওদের বুকের তলে
যেথায় শীতল শান্ত গো
সেথায় কিসের স্বপ্ন দেখে ওরা ?
অতল তোমার কোনের কাছে
পৃথ্বী যেথা ক্লান্ত গো
কার পরশে ঘুমিয়ে জাগে ওরা ?

আমার কানে ওদের বাণী
ওদের চির মূর্চ্ছনা
প্রাণের কবাট আল্‌গা করে' যায়।
দিবস রাতি সে এক মোহ
সে এক আকুল প্রার্থনা
মনের বনে চির নূতন গায়।

আমার প্রতি শিরায় শিরায়
ঢেউয়ের মতোই নৃত্য রে
ওম্‌নি কে যে হাজার ফণা তুলি'
অনন্ত ঐ নভের গায়ে
বিপুল কাহার বিত্তে রে
জীবন নিয়ে উঠ্‌তে চাহে ফুলি।

জীবন-পথে আমার বুকে
ওম্‌নি হাজার ঢেউ খেলে
ওম্‌নি হাজার ভাব্‌-লহরী নাচি'
যাত্রাপথে মুখর করি'
জল-তরঙ্গের রাগ ঢেলে
কে কয় ডাকি,—"আছি অবোধ আছি,"

সেই ডাকেতে পাগল আমি
তরঙ্গদের মতোই ধাই
এদিক সেদিক দিবস-রাতি মাঝে
দুঃখ সুখের মাঝে আমার
তাইত সদা শুনতে পাই
পাগল-করা আনন্দ-গান বাজে।

সে-গান শুধুই শুন্‌ছি আমি
আর তোমার ঐ তরঙ্গ
আর পৃথিবীর কেউ ত জানে না।
আর বাগানেব কোমল কলি
আর কাননের বিহঙ্গ
আব ভবে কেউ সে-সুখ মানে না।

হায় রে কবে আমাব মতো
সবাই হবে পাগল রে
পাগল যেমন তোমার বুকে তরঙ্গ
দিবস রাতি সবার বুকে
বাজবে না আর আগল রে
আগল বিহীন কেমন বনের বিহঙ্গ।

সেদিন তোমার ঐ লহরী
ওম্‌নি সবার বক্ষে রে
উঠবে নাচি' বিলিয়ে মোহ অনন্ত
দুঃখ সুখের সুরে সুরে
লাগবে নেশা চক্ষে রে
বিপুল ধরায় বইবে শুধুই আনন্দ।

বুদ্বুদ

[শ্রীসত্যবালা দেবী।

(১)

জাগো শক্তি স্বরূপিনী,—বাংলার আত্মা তোমাদের বোধন করিতেছে। তোমাদেরই রসে প্রাণ পাইবে তাহার অন্তর্গূঢ় নিবিড় ইচ্ছাশক্তি। তোমরাইত' রূপ দিবে এই উদীয়মান জাতিকে।

*　　　*　　　*　　　*

(২)

আজ ভাগবৎ প্রবাহ আধারের সকল বন্ধ্র পরিপূর্ণ করিয়া অতল অগাধ জলরাশির মত থিতাইয়া দাড়াইয়াছে। তাহারই মধ্যে প্রতিবিম্ব দেখিলাম তোমার,—নারী। দেখিলাম অনন্ত সম্ভাবনা। দেখিলাম ঘূর্ণ্যমান কালচক্রে কোথার কি কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

*　　　*　　　*　　　*

(৩)

তোমার যতখানি মানুষ জানিয়াছে,—সে সামান্য মাত্র। যতখানি তুমি আপনি জানিয়াছ সেও অতি সামান্য। তোমার পরিপূর্ণতা কেহই জানে না, জানিতে পারে না। নির্ণয় নিরূপণের মধ্যে তোমার অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ হইবার নয়। বুদ্ধি কি করিবে, সে যতই সূচাগ্র হউক তাহার গণ্ডী ত স্থূল এ জড়ের মধ্যেই। তোমার সমস্ত সম্ভাবনা যদি কোথাও নিহিত থাকে ত সে আনন্দের মধ্যে। আত্মাই তাহার বোদ্ধা।

*　　　*　　　*　　　*

(৪)

ওগো লক্ষ্মী, তোমার যে ঘর সেখায় কোনও সীমা কোনও গণ্ডী নাই,—সে বৈকুণ্ঠ, সকল কুণ্ঠা লয় পাইবার স্থান। সেথাকার দান লইয়াই না এই জগতের স্থিতি?—যদি এই মরণোন্মুখ জাতিকে রাখিতে চাও, বুঝিয়া দেখ এই সকল সত্য,—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের তর্ক মিটিয়া যাইবে।

(৫)

আত্মা অমর তাহার মধ্যে ভয়ের স্থান নাই বলিয়া। যেখানে ভয় সেখানেই সঙ্কোচ, – তাহাই মৃত্যু। এই মৃত্যুই জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

আত্মানং বিদ্ধি। নতুবা তুমি সংসারকে অতিক্রম করিবার শক্তি পাইবে না।

* * * *

(৬)

নূতন আসিতেছে তুরীয় লোক হইতে জীবনবাণী আহরণ করিয়া। সে এই সংসারেরই মৃত্যুহীন রূপান্তর। তাহাকে আবাহন কর নারী তোমারাও, —সংসারের পারে গিয়া। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, আমি জানি সে শক্তি তোমাতে আছে।

* * * *

(৭)

নারীর বিশ্বস্ততাই পুরাতনের বনীয়াদ অথচ পুরাতনের চক্ষে সে নরকের দ্বার। ইহারই নাম প্রকৃতির পরিহাস।

* * * *

(৮)

পুরুষ যতটা দিতে পারে এখনও দিয়া উঠিতে পারে নাই,—তোমায় পায় নাই বলিয়া, নারী। গতানুগতিক বিধানে তাহাদের চরণে তোমার অনন্ত বাধ্যতা অবিনশ্বর দাস্যে, তাহারা এতদিন, কেবল, তোমার মধ্য দিয়া আপনাপন কামনাকেই পাইয়াছে।—তোমাকে নয় তোমাদের সত্যটা তাহারা যতক্ষণ না পাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাদের সত্যটাও তাহারা পাইবে না।

তাহাদের সত্যকে তোমরা আকর্ষণ করিয়া আনিবে আপনাপন সত্য প্রকাশিত করিয়া,—ইহাই অমোঘ ভাগবত বিধান।

সত্যের উপরেই নূতনের প্রতিষ্ঠা হইবে। মিথ্যার সহিত আপোষে নহে।

* * * *

(৯)

তুমি ভগবানের, আপনার নহ। এই মন্ত্র তোমার অজপা হউক।

* * * *

(১০)

আজ মাতৃত্ব ভগিনীত্ব সতীত্ব সমস্তেরও উপর স্থান পাক—ধর্ম। নারীত্ব মুছিয়া যায় যাক, যদি সে সত্যের প্রকাশের অন্তরায় হয়।

* * * *

(১১)

নারীর সত্য স্বরূপে তাহার স্থান জগতে সর্ব্বোচ্চে। যুগে যুগে সে যে নিম্নে তাহার কারণ তাহার মধ্যে প্রকৃতি প্রবলা। আত্মা তন্দ্রামগ্ন।

আপনাকে স্বচ্ছ করিলেই সকল নির্দ্দেশ আপনার মধ্যে পাইবে। কাহারও শরণ লইতে হইবে না।

* * * *

(১২)

নারীর জন্য যে প্রেরণা সে নামিয়া আসে জ্ঞান হইতে হৃদয়ে। পুরুষের জন্য যাহা তাহার পথ জ্ঞান হইতে মস্তিষ্ক; তাই শাস্ত্রকার পুরুষের আদর্শ।

নারী শাস্ত্র মানিতেছে বাহিরের শাসনে। পুরুষ কাব্যের আস্বাদ লইতেছে ভিতরের কষাঘাতে। কিন্তু একদিন উভয়েই মুক্ত হইবে।

(১৩)

যার ভয় আছে তারই বুদ্ধি আছে। ভয় নাই যার তার বুদ্ধিও নাই। যাহা আছে তাহা অব্যক্ত পদার্থ,-সে বস্তু সর্ব্বজয়ী। তাহাই অমৃত জানিও। অমর হইতে বাসনা থাকে,—অন্বেষণ কর। অন্বেষণ কর।

* * * *

(১৪)

নারীর মধ্যে এমন একটা গতিবেগ আছে যেটা সমগ্র জাতিকে পৃথিবীময় করিয়া দিতে পারে। আকুঞ্চনের দিনে মৃত্যুর জড়তা তাহাকে অনুশীলনের শিকলে বাঁধিয়া রাখে। সম্প্রসারণের যুগ সে নিগড় ভাঙ্গিয়া দেয়। নারীর অন্তরে যদি কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে সে এই নিয়মের বশেই। নারী হইয়া উঠিতে বুঝিব দুর্দ্দশার যুগের অবসানে আকুঞ্চনের লৌহগ্রন্থি শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরাই যদি এ যুগের প্রবর্ত্তন করিতে পারি তবে এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর সর্ব্বাগ্রে আস্বাদ করিব, যে মধু ভরিয়া উঠিলে জগতের জীবনকোষ সম্পূর্ণ পরিণতি পাইবে।

জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা। *

[শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।]

আচণ্ডালে বিশ্বে দান এটা আজকালকার শিক্ষিতের কাছে একটা ধুয়া বা গোঁড়ামীতে দাঁড়িয়েছে। যে একটু উদার প্রাণ—যার মনই জাতের কল্যাণে জেগেছে সেই এ বস্তু চায়। প্রাণ শক্তির গড়া মানসিক উন্নতির এই পুরাণ সভ্যতায় বিদ্যা যে কতক অভাব ঘোচায় তা' এক রকম ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আসলে শিক্ষা যে কি - শিক্ষার সব চেয়ে বড় আদর্শ কোন্‌টা —সে বিষয়ে একটা চূড়ান্ত জ্ঞান কারুর মনে নেই। শিক্ষার সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ ত হয়ই নি, তার ওপর বিধির বিড়ম্বনায় দেশে ফৈরঙ্গী আর দেশী মনের ও ধারার এই জবরদস্ত মাথা-ঠোকাঠুকি চলছে, এসিয়া আর ইউরোপের একেবারে বিপরীত জ্ঞান ও সভ্যতার মরমুখো রণ লেগেই আছে। শুধু কি তাই? রাজদণ্ড বা শাসনের শ্রীকৌশল বিদেশীর হাতে থাকায় শিক্ষা-তরীর দাঁড় আর হাল রাঙা হাতেই ধরে রয়েছে। এই সব বিপদের ওপর আবার স্বাধীনতার হাওয়ায় হঠাৎ আমাদের জাগরণ আর জাতীয় শিক্ষার কোলাহল। কাজেই সবাই বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থায় মহা গণ্ডগোলে পড়ে গেছে।

শুধু শিক্ষা যে কি বস্তু বা কি রকম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধেই একটা স্পষ্ট বোধ নেই, তার ওপর জাতীয় শিক্ষা বস্তুটা যে কি বুঝি সে জ্ঞান তো আরও বিরল। কেবল এইটুকু সবাই মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছে যে, আজ-কালকার স্কুলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা' খারাপ, তা'তে জাতির চরিত্র জাতীয় মন ও আত্মা জাত মেরে অধোগতি পায়ে আত্মঘাতী হয়, কারণ রাঙা হাতের দেওয়া বিদ্যের আছে বিদেশী গন্ধ, বিদেশী ছন্দ, বিদেশী মাল মসলা, বিদেশী গতি, বিদেশী প্রাণ। এ বিদ্যের চলবে না—আমাদের আন্দোলনের এই "না" এর দিকটায় একরায় হ'লেও আমাদের উপায় হবে না। কথা হচ্ছে, যে, আমরা মন্দ বিদ্যের জায়গায় আদর্শতঃ আর কার্য্যতঃ কোন ভাল শিক্ষার প্রবর্ত্তন করবো? একটা নামে মন্ত্রের বল থাকতে পারে, কিন্তু একটা স্কুলে বা কলেজে বা শিক্ষা কৌন্সিলের গায়ে "ন্যাশনাল" নামটা জুড়ে দিলেই চলবে

* A Preface on National Education—Arya. অনুবাদ।

না ; যে বিদ্যের আমরা নিন্দা করছি, সেই বিদ্যের মানুষ হয়েছে এমনতর স্বদেশী এজেন্সীর হাতে ভার দিলেও চিঁড়ে ভিজবে না ; সেই পুরোণো পদ্ধতি টাকে ছেঁটে কেটে আর তাতে কিছু জুড়ে তেড়ে বইগুলো বদলে আর তার ল্যাজে একটা টেক্‌নিকাল ক্লাস জুতে দিয়ে এ সমিস্তের নির্ব্বংশও হবে না আর তা'তে শিক্ষার পরিবর্ত্তনও হবে না। এ রকম একটা হাত সাফাই দেখিয়ে কিস্তিমাৎ করতে যাওয়া আর গড্ডালিকাভাবে উল্টো ডিগবাজী খেয়ে আগে যেখানে ছিলাম, সেইখানেই পড়ে ভাবা যে আর একটা নতুন মুলুকে গিয়ে পড়েছি, একই কথা। এ বুজরুকী অচল। এই সব ... তুন পাঠশালে শিক্ষা ভাল হচ্ছে কি না হচ্ছে, সে কথা আ... ; কিন্তু এ শিক্ষার কোন্‌খানটা জাতীয়, সেই হ'লো গিয়ে প্রশ্ন।

জাতীয় শিক্ষার সমস্যা বড় জটিল, বড় দুরূহ। ঠিক কোন্ চিন্তা ধরে হাতে কলমে কাওটির কোন্‌খানে আরম্ভ করতে হবে, শিক্ষায় নবীন সৃষ্টি কি আদর্শের ভিতে উঠবে, এ ইমারৎ কোন নক্সায় গড়বে ভাল, এই ত হ'লো সমস্যা। যা' গড়তে যাচ্ছি তা' একেবারে আনকোরা নতুন জিনিস, যেখানে গড়বো সেখানে এক অরণ্য সাফ্ করে নগর বসা'ত হবে আমাদের মান্ধাতার আমলের একটা কিছু পুরাতন অস্থি মজ্জা টেনে এনে দিলেই তা' জাতীয় হবে না ; এককালে যা' চলেছিল এবং যাতে এ জাতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাকে এ যুগে বাঁচান আর বাজারে চালান দুষ্কর। এই বর্ত্তমানের নতুন জীবনের অভাব অভিযোগ আর আমাদের প্রকাণ্ড গৌরবমাখা ভবিষ্যতের সব ক্ষুধা সে একমুটি পুরাণ ক্ষুদে পুরবে না। এটা যেমন একদিকের কথা তেমনি অপরদিকে কোন ইংরাজী জার্ম্মাণ বা মার্কিন বিদ্যা-পদ্ধতি নিয়ে তার ওপর দেশী রং দেশী বার্ণিশ চড়িয়ে ও চালিয়ে দিলে অনেক চিন্তা ও চেষ্টা চরিত্রের দায় থেকে আমরা বাঁচতে পারি—একটা প্রাণকাড়া গোছের নতুন পঞ্চকাণ্ড ব্যাপার খাড়া করতে পারি বটে, কিন্তু তা'তেও কূল পাবে না। তা' হলেই যদি হতো তবে "ন্যাশনাল ন্যাশনাল" করে এ টুগোলের একটা কোন অর্থই থাকে না, দেশী পরিচালনে দেশীভাষায় নতুন ধর নর বই বেছে নিয়ে জাতীয় শিক্ষা দিলেই হয়। আমার বিশ্বাস আমরা যা খুঁজছি তা এর চেয়ে বড় জিনিস চের গভীর করে তলিয়ে বোঝবার বস্তু ; তাকে রূপ দেওয়া কঠিন হ'তে পারে, কিন্তু তাই আমরা খুঁজছি যাতে ভারতের জাতি-আত্মা—ভারতের প্রতিভা—ভারতের মন ও ধারা গড়ে উঠবে, তা যে শুধু অতীতের রঙের ছবিই হলে চলবে তা' নয়, তা, এমন কিছু পরম শরণ

হওয়া চাই যা' ভারতের ভবিষ্যতের যত সাধ আশা—ভারতের দিনে দিনে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর জীবনের এই ভবী আত্ম স্ফুরনের অনুকূল হয় আর ভারতের চিরন্তন প্রাণের সত্য হয়। একটা আমাদের মনে জ্ঞানে বেশ স্পষ্ট করে নিতে হবে. এই শিক্ষার মূলের খুব সুদৃঢ় ভিত্তি রচলে তবে ত তার উপর আমরা বিশাল ও মহান করে সৃষ্টি আরম্ভ করতে পারবো। তা' না করে যে কোন একদিকে একটা ভ্রান্তির পেছনে ছুটে পড়া অতি সহজ, শুনতে ও বলতে বেশ; মুখভরা একটা যা' হোক বা তুলে এরকম মেঠো কাঁটা পথে বেরিয়ে পড়লে চলতে চলতে আমরা গিয়ে পড়বো খানায় ডোবায় কি নালায় তার ঠিক থাকবে না।

জাতীয় শিক্ষা বলতে গোড়ায়ই একটা প্রকাণ্ড কথাকাটাকাটির কারণ হয় এই নিয়ে যে, শিক্ষা হ'লো একটা সঙ্কীর্ণ ব্যাপার, তা' বড় জোর দেশের সীকে দেশের কর্ত্তব্যই না হয় শেখায়, শিক্ষার মাঝে আবার এ দেশ প্রীতির অনধিকার চর্চা কেন? গোড়ায় এই প্রতিবাদের হয় নিরসন করা দরকার, নয় এর কোথায় কতটুকু সত্য আছে তা দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। এই দল বলেন যে, দেশ প্রীতির কর্ত্তব্য কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কি ইংলণ্ড কি জার্ম্মানী কি জাপান কি ভারত সব জায়গায়ই এক, তা' শেখাবার জন্যে আলাদা আলাদা শিক্ষার দরকার নেই। মানুষ যখন মনুষ্যত্ব' এক এবং সত্য ও জ্ঞানের কোন জাতি বা দেশ নাই সে হিসাবে শিক্ষাও সুতরাং বর্ণ গোত্র ও ভৌগলিক সীমাহীন এক সার্ব্বভৌম জিনিস হওয়া দরকার। এই যব জড়বিজ্ঞানে আবার জাতীয় শিক্ষা কি হতে পারে। জড় বিজ্ঞানের জাতি কোথায়? আমরা কি সেই আদি কালের বদ্দিবুড়ী ভাস্কর আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহির ধরে বসে থাকবো আর তারপরে যাঁরা হয়েছেন সেই গ্যালিলিও ও নিউটন থেকে আজ অবধিকার এই অভিনব জড়বিজ্ঞান ছেড়ে দেব? কিম্বা ল্যাটিন গ্রীক অথবা অন্য য়ুরোপের ভাষা ও সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতিতেই বা জাতীয় হিসাবে কি তফাৎ হতে পারে। তা' হ'লে কি নদীয়ার সেই সনাতন টোলের ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হ'বে কিম্বা নালন্দা বা তক্ষশীলার কেমন শিক্ষা বিধান ছিল তা' যদি আবিষ্কার করা যায় তা' তাই ধরে বসে থাকতে হবে। না হয় বড় জোর দেশের ভাষায় শিক্ষাই দেওয়া যেতে পারে ইংরাজি ভাষাকে একটা গৌণ ব্যাপার second language করে রাখা যেতে পারে আর খুব করে অতীত ভারতের ব্যাপারের যত ইতিহাস শিক্ষাই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা'তেও কথা আছে, যে বিংশ শতাব্দীর যুগে

আমরা আছি সে যুগে আবার চন্দ্রগুপ্ত বা আকবরের ভারতকে বাঁচিয়ে তোলা কঠিন হবে, জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্ত্তমান জ্ঞান সভ্যতা ও ধারার সঙ্গে নাড়ীর যোগ না ছিঁড়ে হালফ্যাসানি হয়েই যে আমাদের বাঁচতে হবে।

এ সব যুক্তি-বাণ তখনই সন্ধান করা চলে যখন জাতীয় শিক্ষা কেবল অতীতের ধুয়া ধরে পেছু হটেই চলেছে কেবল সেই রূপ সেই বিগ্রহ নেবার চেষ্টাই করছে যা' একদিন ভারতের জীবন ধন থাকলেও এখন কাল প্রভাবে মরে আসছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বলতে তা' তো আমরা বুঝছি নে দেশের জীবন-ধারা এখন যেমন রেল বা মটর ছেড়ে পুরাণ রথ বা গরুর গাড়ী নিয়ে চলতে পারে না, তেমনি আমাদের নতুন জীবনের জাতীয় জাতীয় শিক্ষাও ভাস্কর পণ্ডিতের অঙ্ক বা জ্যোতিষ শাস্ত্রে কি আনন্দে ফিরতে পারে না। এত বড় আন্দোলনের কোথায়ও পুরাণ ভারতকে ফেরাবার এরকম উদ্ভট চেষ্টা বা পাগলামী থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত প্রেরণাটির সুর তা'ত নয়; বর্ত্তমানের জীবন্ত জাগ্রত শক্তির ঘর যে জাতি-স্বার্থ, আমাদের তার কথা ভাবতে হবে। সে হিসাবে এ প্রশ্ন তো অতীত বা বর্ত্তমানের দ্বন্দ নিয়ে নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিদেশী আমদানী করা সভ্যতা ও ভাবধারা ও প্রকৃতি আজও যে সভ্যতা রচনার শক্তি ধরে সেই দুই সভ্যতা নিয়ে। আমাদের রচনা হবে অতীত ও বর্ত্তমানের মাঝ পথে নয় কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝ পথে। পঞ্চম শতাব্দীকে ফিরে আনার আবশ্যক নেই, আবশ্যক হচ্ছে বহু অনাগত শতাব্দির জন্ম দেওয়া, পেছুহটা আদৌ নয় এগিয়ে পড়া সেই পথে যে পথে বর্ত্তমানের এই কৃত্রিম মিথ্যা নকলের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ভারতের শক্তিতে ভারতের প্রাণ তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য প্রেরণা ও সিদ্ধিকে জাগিয়ে তুলবে।

জাতীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে এই সব যুক্তি তর্ক নিয়ে আসার নামে যখন এই রকম একটা ধারণা মানুষকে পেয়ে বসে যে শুধু কি কি বিষয় শেখান যেতে পারে তারই একটা তালিকার নাম জাতীয় শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষনীয় বিষয় হলো শিক্ষার বহু প্রকার উপায়ের একটা উপায় মাত্র, জাতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য মানব মন ও আত্মার শক্তি গড়ে তোলা—তার জ্ঞানের ঘুম ভাঙ্গান—ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির বোধন ঘটান, যাতে সে নূতন জ্ঞান নূতন তত্ত্ব বা নূতন ধারার সৃষ্টিও করতে পারে এবং তা গ্রহণও করতে পারে। যদি কতকগুলো জড়বিজ্ঞানের কথা হজম করাই উদ্দেশ্য হ'তো, তা' হ'লে যা হোক করে সেইগুলো গেললেই চলতো। কিন্তু তা' তো নয়; এ জড়বিজ্ঞান নিয়ে আমরা কি করবো, কি

উপায়ে বিজ্ঞানার মন ও নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবনের শক্তি পাওয়া যাবে তাই হ'লো আসল কথা। ভারতের মন ভারতের নিজের পথে মুক্তির আনন্দে নূতন উদ্ভাবনের পন্থা সৃষ্টি করবে—জড় বিজ্ঞানকে নূতন রূপ দেবে সে কথা না হয় আপাততঃ ছেড়েই দিলাম। যখন মানব মনের অন্য উচ্চাঙ্গের শক্তির কথা বলবো যখন আমাদের মেধা ও প্রকৃতির আরও ভাস্বর ও আরও শক্তিশালী প্রেরণার কথা বলবো তখন না হয় সে নবীন সৃষ্টির কথা বলা যাবে, সেই খানেই কিন্তু ভারতের মনের প্রকৃত ছাঁচ তার চিরন্তন গতি তার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত শক্তি জ্ঞান ও প্রতিভা—তার গূঢ় অন্তর ধারার (culture) সবটুকু পরিচয় রয়েছে। সংস্কৃত বা যে কোন ভাষা শিখতে গেলে অতীত শিক্ষা প্রণালী ধরে শিখলেই চলবে না, যে উপায়ে সহজে স্বাভাবিক পথে মনের অনুশীলন সার্থক করে ভাষা শেখা যায় সেই প্রণালীই নিতে হ'বে। সংস্কৃত ও আর আর মাতৃভাষা কি ভাবে শিখলে তাদের সাহায্যে জাতীয় ধারার (culture) প্রাণ ও নিজস্ব মর্ম্ম খুঁজে বার করা যায়, আজও এ জাতির বুকে অতীতের যা' কিছু জীবন্ত আছে আর ভবিষ্যতের সৃষ্টির জন্য যত শক্তি জাগবার অপেক্ষায় ঘুমিয়ে আছে সেই দুই বিরাটতাকে কি যোগে কি বাঁধনে যুক্ত করা যায় এবং ইংরাজি ও অন্যান্য বিজাতীয় ভাষাই বা কোন্ পথে শিখে কি ভাবে ব্যবহার করলে অপরাপর দেশের জীবন ভাব ও ধারার আলোয় আপন জীবন গুছিয়ে নিয়ে চারিদিকের জগতের সঙ্গে মিলনসূত্র গড়ে তোলা যায় সেইগুলি হ'লো জাতীয় শিক্ষার মূল কথা। জাতীয় শিক্ষা মানে বর্ত্তমানকে মুছে ফেলা নয় কিন্তু আমাদের নিজের মনে নিজের আত্মায় নিজের অন্তর দেবতার ভিত্তি করে জীবনবেদ রচনা করাই জাতীয় শিক্ষা।

জাতীয় শিক্ষার প্রতিপক্ষ দল আর একটা যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেন, যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের শিখতে হ'বে আমাদের বাঁচবার কোন পথ নাই আর তাই শেখবার উপায়ই প্রকৃত শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষার আদর্শ এই ধারণার স্বতঃসিদ্ধত্বকেই অপ্রমাণ করতে চায়। প্রতীচ্য থেকে—মিশর, চ্যাল্ডিয়া, ফিনিশিয়া ও ভারত থেকে ভাব নিয়ে ভিত রচনা করে তার উপর য়ুরোপ নিজের সভ্যতা গড়েছে, প্রতীচ্যের সেই ভাব-ধন গ্রীস ও রোমের প্রতিভায়—তাদের প্রকৃতিগত গুণে সামাজিক মন ও প্রেরণায় আর তাদের জীবন ভঙ্গীতে আর এক রূপ ধরেছিল, সে যুগে য়ুরোপ কিছুকাল প্রতীচ্যের ভিত্তটি হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু আবার আরব জাতির স্পর্শে তুর্ক ইরাণ আদি দেশ ও ভারত

থেকে নতুন প্রেরণা পেয়ে, বিশেষতঃ Renaissanceএর যুগে প্রাচীন ভাব-সম্পদটি আবার ফিরে নিয়ে টিউটন ল্যাটিন কেল্টিক ও শ্লাভ জাতিরা নিজ নিজ প্রতিভায় মন প্রাণ ও সমাজ গড়ে বলে সে সম্পদকে নতুন করে জীবনের অনুকূল রূপ দিয়ে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করে নিয়েছে। এই রকমে গড়া সভ্যতাই যেন মানবজাতির উন্নতির শেষ কথা এই বলে সেটাকে এতদিন য়ুরোপ জগতের সামনে তুলে ধরেছিল। কিন্তু এসিয়ার জাতিরা তা' কেন ও-ভাবে অন্ধ অনুকরণে গ্রহণ করবে? তার চেয়ে ভাল করে সার্থক করে নেবার পথ যে রয়েছে, য়ুরোপ যা' কিছু নূতন ও সত্য জ্ঞান দিতে পারে তা' নিয়ে নিজের ধারায়-cultureএ ও জ্ঞানে মিশিয়ে এসিয়ার প্রকৃতি প্রতিভা ও সমাজ প্রেরণায় নূতন করে অভিনব জীবনবেদ সৃষ্টি করে মানবের ভবিষ্যৎ সভ্যতা এসিয়াই গড়ে দেবে না কেন? য়ুরোপে এই জড়বিজ্ঞানের বস্তুতান্ত্রিক বৈশ্য-প্রাণ অর্দ্ধ-গণতান্ত্রিক সভ্যতা যে য়ুরোপেই ভেঙে পড়ছে, সে জীর্ণ বাঁধন সব ফোঁপরা ভিতের উপর মন্দির যা আমাদের জ্ঞানহীন বলে গড়ে তোলা সে বদ্ধ পাগলামী। য়ুরোপের এই মহা-সংগ্রামে যখন য়ুরোপেরই বড় বড় প্রাণশক্তি নূতন আধ্যাত্মিক সভ্যতার জন্য এসিয়ার প্রতিভার দিকে মুখ ফেরাতে আরম্ভ করেছে, তখন আমরা নিজেদের অন্তর-নিহিত এত শক্তি ফেলে দিয়ে য়ুরোপের এসব মরা অতীতকে শবের মত জড়িয়ে থেকে আত্মঘাত করবো কেন?

আর সব শেষে এই প্রতিবাদী দলের লোকের অব্যর্থ যুক্তি এই হয়ে দাঁড়ায়, যে, দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ আছে সবার মন মূলতঃ একই আর এক কাঁচ কলে ফেলে অর্ডার মাফিক তাদের একই মাপে কেটে ছেঁটে নেওয়া যায়। আমাদের মনের যুক্তির এই পুরাণ কুসংস্কারটা এবার ছাড়বার দিন এসেছে। কারণ মানবজাতির অখণ্ড আত্মার সেই একত্বের মাঝে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত আত্মাগুলো জনে জনে তাদের স্বধর্ম্ম নিয়ে আবার তা [illegible] ও অনির্ব্বচনীয়তা নিয়েও বিরাজ করেছে আবার অখণ্ড মানবজাতি আর ব্যক্তি মাঝে কত শত জাতি আত্মা (nation-souls) তাদেরও জাতিগত অভিনবত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা এই তিনটি আত্মারই জীবনের অনুশীলন বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে; তবেই তা কৃত্রিম একটা কিছুতে পরিণত হবে না, তবেই তা' মানুষের আত্মার ও মনের প্রকৃত শক্তি গড়তে পারবে আর যা সুপ্ত আছে তাকে জাগিয়ে দেবে।" জাতীয় শিক্ষা এই হিসাবেই মানুষের জীবনবেদ।

নিকুঞ্জে।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম্-এ।)

সখি আজিকে প্রভাতে ভাণুর কিরণ কিলাগি উজল কত ?
হের আজ কেন ওই মালতি-মুকুল ফুটিয়া উঠিছে যত ?

২

সখি কিলাগি-আজিকে বিহগের গান উঠিছে নূতন রাগে ?
আর পাপিয়ার তান সুহাস ললিত ওই যে কাননে জাগে।

৩

দেখ শত বরষের জীর্ণ তরু শাখায় সহসা শ্যামল কেন।
হের শুষ্ক ভূপতিত ওই মাধবিকা শিহরে সজীব যেন।

৪

আজ ডালে ডালে বসি কোকিল-কোকিলা প্রণয়ের গাথা গায়
আর সুমন্দ অনিল গোপন বারতা কি যেন শুনায়ে যায়।

৫

তাই ছুটিছে রাধার রুদ্ধ অনুরাগ শ্যাম বঁধুয়ার লাগি।
তাই শত বিরহের সুপ্ত অভিলাষ সহসা উঠিছে জাগি।

৬

সখি সেই কতদিন কানু চলি গেছে পাশে ঠেলি অভাগীরে,
আর সেই কতদিন দিবস যামিনী ভাসে বাধা আঁখিনীরে।

৭

তবে আজ কি সজনি দুখ অবসান ?—আজ কি লো এলো ?
ন'লে হেন সে মাধুরী নিরানন্দ গেহে কি হেতু উদয় ভেল।

৮

—শোন ওইলো সজনি বাঁশরীর তান। ওই যে এসেছে কালা,
দেখ মাতায় নিকুঞ্জে ত্রিভঙ্গ মূরতি,—গলে দিয়ে বনমালা।

৯

সখি এসেছে রতন। কাজ নাই মানে, ডাকে মোর শ্যামচাঁদ।
আমি পড়ি গিয়ে পায়।—রাধার পীরিতি না-মানে সরম বাঁধ।

অবুঝ

চিত্র-শিল্পী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের সৌজন্যে

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] [বৈশাখ, ১৩২৮ সাল

প্রভাস মিলনে গোপবালা।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

সেই ত সখি, মাধবী নিশি, মলয়া বহে মধুরে
জ্যোছনা সেই রজত উজলা,
সে সুধা ধারা মাখিয়া কায়ে হাসিছে হের অদূরে
তমাল তালে কানন শ্যামলা।
চুমিয়া তট তটিনী বহে যমুনা অনুকরণে,
কি কল গীতি উঠিছে দু'কূলে,
নটীর মত নাচিয়া চলে মাধব মনোহরণে,
আশার মত কাঁপিয়া মৃদুলে।
বরষ শত বিরহ সহি' মিলন মধু তিয়াসে
সেই ত আমি অধীরা চাতকিনী,
রাজার সাজে রুচিরবপু আমারি সখি, পিয়া—সে,
তড়িতে ঘেরা নিরদ নব জিনি।
ললাট পটে মুকুট খানি সাজান কত রতনে
কম্বু জিনি কণ্ঠে আ মরি।

মুক্তা মালা দেবকী রাণী দোলায়ে দেছে যতনে
বক্ষে যেন যমুনা লহরী—।
(তবু) এ পোড়া হিয়া কাঁদিয়া ফিরে দূর বৃন্দা বিপিনে,
মুরলী রব শ্রবণ লালসে,
(যথা) গাগরী ভরি' গোপের বালা চাহিয়া বাতি কি দিনে,
ফেরেনি ঘরে আজো কি আলসে।
সজনী সাথে যামিনী জাগা, বঁধুর লাগি' মধু সে—
কুঞ্জ মাঝে বাসর সাজায়ে,—
নিমেষে কত নিরাশা আশা জাগায়ে দিত বঁধু সে,
ছলনা ছলে মুরলী বাজায়ে।
পথের পানে নিদ্রাহীন চাহিয়া দীন নয়ানে,
বিজন বীথি কানন ভবনে,
অশ্রু আর হাসিটী আসি করিবে খেলা বয়ানে
সে যে কি সুখ কব তা কেমনে।
দাঁড়াত এসে রাখাল বেশে হাঁসিটি রাঙ্গা অধরে
বকুল মালা চুমিয়া চরণে,
মূর্ত্তি ধরি মনোজ নিজে উদয় যেন হ'তরে।
ভুলিত রাধা জীবন মরণে
তেমনি আজো সকলি আছে। বিরহ ক্ষত জুড়ায়ে
দিয়াছে সখা সদয় দরশনে
পরাণ ফিরে কাঁদিয়া তবু স্মৃতির মোতি কুড়ায়ে
ছড়ায়ে পিয়া চরণ পরশনে।
বিজন সেই কুঞ্জে যায়, রন্ধ্র সব ভরিয়া
মুরলী রব ফিরিছে কাঁদিয়া
স্তব্ধ সেই যমুনা কূলে পরাণ মন হরিয়া
ফিরিগো তবু বঁধুরে সাধিয়া।

—

ধর্ম্ম ও জীবন

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই দেশটা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, এ কথা অনেক কর্ম্মী পুরুষের মুখে আজকাল শোনা যায়। ধর্ম্মের বিড়ম্বনাটা না থাকিলে না কি দেশটার এতদিন একটা গতি হইয়া যাইত। ধর্ম্ম জিনিষটাকে পরলোকের জন্য মুলতুবি রাখিয়া আপাততঃ গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা দেখিলে সংসারের দুঃখও কমে আর ফ্যাসাদও বাড়ে না—ইহাই হইল এক দলের কথা। ইউরোপীয়দের মত সাত দিন অন্তর ঘণ্টা খানেকের জন্য গির্জ্জায় গিয়া যদি ধর্ম্মের ঋণ শোধ করা চলিত, তাহা হইলেও ব · ইঁহারা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু ধর্ম্মটা যদি সর্ব্বদিনব্যাপী মহোৎসব হইয়া দাড়ায়, তাহা হইলে কর্ত্তব্যের খাতিরে ইঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে সমস্ত তর্ক উপস্থিত করা হয়, তাহা হইতে গালাগালির অংশ বাদ দিলে যুক্তিগুলা কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়—"সমাজের মঙ্গল বলিলে সোজাসুজি এই কথাই ত বুঝায় যে লোকের খাওয়া পরার কষ্ট থাকিবে না, ব্যক্তি, জাতি সম্প্রদায় বিশেষের অযথা প্রভূত্ব থাকিবে না, দেশের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞান ও প্রীতি চর্চ্চার অবসর থাকিবে?—এই না?—তা' যদি হয় ত আমাদের সমাজের যা কিছু অভাব তা' ত চোখের সামনেই পড়িয়া আছে। দেশে অন্ন বস্ত্র নাই—অন্ন বস্ত্রের সংস্থান কর, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি কর। উচ্চবর্ণ যদি নিম্নবর্ণকে ঘৃণা করে, ত নিম্নবর্ণকে শিক্ষায় দীক্ষায়, আচারে ব্যবহারে উচ্চবর্ণের সমান করিয়া তোল, তার পর উচ্চবর্ণ যদি সমান অধিকার না দেয়, ত প্রহারের চোটে তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দাও। রাজনৈতিক শক্তি তোমাদের হাতে নাই?—বেশ কথা, দেশকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা কর। দেশ হইতে অজ্ঞান দূর করিতে চাও?—যথেষ্ট পরিমাণে স্কুল কলেজের ব্যবস্থা কর। আর পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব প্রচার করিতে চাও—ত মাঝে মাঝে না হয় প্রীতিভোজের আয়োজন করিও। এক কথায় জতীয় উন্নতির সোজা অর্থ, জাতির অর্থ-নৈতিক, রাজ-নৈতিক, সামাজিক শিক্ষা বিষয়ক সংস্কার। এ সমস্ত সোজা কথা বুঝাইবার জন্য ধর্ম্ম নাম দিয়া একটা আধ্যাত্মিক কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? না হয় ধরিয়াই লইলাম যে এই সৃষ্টির পশ্চাতে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, কিন্তু

তিনি গোলোকে থাকেন কি ব্রহ্মলোকে থাকেন, ক্ষীর সমুদ্রে চিৎ হইয়া আছেন কি দধি-সমুদ্রে উপুড় হইয়া আছেন—এই গভীর প্রশ্নের মীমাংসাটা আপাততঃ না হয় স্থগিতই রহিল। মৃত্যুর পর মানুষ প্রেত হইয়া শ্যাওড়া গাছেই বাস করুক বা দেবতা হইয়া স্বর্গে বসিয়া সুধাপানই করুক—সে কথা না জানিলে কি সংসার-চক্র একেবারে অচল হইয়া পড়ে?"

এই ত গেল নবীন দলের কথা। কিন্তু যাঁহারা এ-পারের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া ও-পারের ঘাটের দিকে লক্ষ্য করিয়া ভেলা ভাসাইয়াছেন, যাঁহারা মায়ার খোসা ছাড়াইয়া ব্রহ্ম-ফলটুকু খাইবার জন্য ছুরি সানাইতেছেন, তাঁহারা এ সমস্ত তর্কের উত্তরে বলিবেন—"বাপু হে, তোমরা যে ঐ অতগুলা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক সমস্যার তালিকা দিলে, ঐগুলার মীমাংসা না হইলেই বা কি আসিয়া যায়? এত বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে মানুষ যেন সমুদ্রের এক ফোঁটা জল। আর সেই মানুষ যখন মরিবেই, তখন কে খাইয়া মরিল, কে না খাইয়া মরিল, কে রোগে ভুগিয়া খাবি খাইতে খাইতে মরিল, আর কে নীরোগ শরীরে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিল—ইহাতেই বা কি আসিয়া যায়? দু'দিন আগে, না হয় দু'দিন পরে যখন সকলকেই এ সংসার ছাড়িতে হইবে, কেহ যখন জগতের মৌরসী পাট্টা করিয়া লয় নাই তখন কে ছোট কে বড়, কে রাজা হইয়া সিংহাসনে চড়িয়া মজা লুটিল, আর কে দুর্ভিক্ষের জ্বালায় দন্তবিচ্ছেদ করিয়া খানায় পড়িয়া মরিল—ইহার একটা প্রকাণ্ড তালিকা না হয় নাই প্রস্তুত করিলে? আর জাতীয় উন্নতির কথা যদি বল—এ জগতে কত জাতি উঠিল, কত জাতি পড়িল, কত জাতির বিন্দু পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া গেল—কে তাহার সংবাদ রাখে? মানুষের জীবনই যখন এত ক্ষণভঙ্গুর তখন কে ক'দিনের জন্য কাহার রাজ্য কাড়িয়া লইল তাহার হিসাব রাখিয়াই বা কি লাভ? সংসারটাই যখন দু'দিনের তখন এ সব বাজে কাজ ছাড়িয়া দিয়া যাহা চির দিনের তাহাই সম্বল কর। নশ্বর জিনিষ লইয়া বৃথা টানাটানি করিয়া কি হইবে?"

কথাটা ত ঠিক! মৃত্যুর মত অত বড় সত্য জীবনের মাঝখানে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না—শ্মশানের দুই মুঠা ছাই-ই যদি ইহ-লীলার পরিণাম হয় তাহা হইলে এ কর্মভোগ ত না করাই ভাল। যথাসাধ্য পরকালের সম্বল করিয়া এ কুস্থান ত্যাগ করিতে পারিলেই ত সুবিধা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও মনে আসিয়া উপস্থিত হয়—জীবন ছাড়িয়া পলায়নই যদি জীবনের

পারসত্য, তবে ইহা আসিল কোথা হইতে? যাহা চিরন্তন সত্য, তাহার মধ্যে মনুষ্যজীবনের কি কোনও স্থান নাই? পলায়নের রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করাই কি মনুষ্য-বুদ্ধির চরম কাজ? মানুষের যে প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা—এগুলা সমস্তই কি বাজে? সবটাই শুধু 'মিছে কথা, ছলনা?' মানুষ মরে—বেশ কথা। কিন্তু সংসার ত মরে না। তুমি আমি মরিয়া ভূতই হই বা ভগবানই হই, তাহাতে কি আসিয়া যায়? আমাদের মরণের বা মুক্তির পরদিনও আবার সহস্র কোটী নরনারী স্নেহমমতাভরা প্রাণ লইয়া, নিরাশার অশ্রু মুছিয়া আনন্দের সংসার পাতিবার চেষ্টা করিবে। তুমি বলিবে সে বৃথা চেষ্টা—সংসার শুধু দুঃখময়। কিন্তু সে পণ্ডিতি কথায় যোগ আনা সায় দেওয়া ত চলে না। সুখ দুঃখের জমাখরচের হিসাব দেওয়া সহজ নহে, কিন্তু মোটের উপর যদি দুঃখের অপেক্ষা সুখের মাত্রা বেশী না হইত তাহা হইলে কে-ই বা এ সংসারের বোঝা পিঠে করিয়া ফিরিত, কেই বা সংসারের চাকায় তেল লাগাইতে যাইত? মানুষ সংসারের মধ্যেই আপনার সমস্ত অভাব পূরণ করিতে চায়, ইহাই তাহার স্বাভাবিক প্রেরণা। মানুষের জ্ঞানের অভাব তাই সে আরও জ্ঞান চায়, শক্তির অভাব তাই সে শক্তিমান হইতে চায়, জীবনে অনেক দুঃখ, তাই সে দুঃখ দূর করিয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। জীবনের মধ্যে থাকিয়া সে জ্ঞান ও আনন্দ ও শক্তির অধিকারী হইতে চায়, জীবন ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে নাই। মৃত্যু দুঃখময়—বেশ কথা, মৃত্যুকে জয় কর, জীবন সহস্র অভাবে ভরা—সে অভাব দূর করিবার জন্য শক্তি অর্জ্জন কর। কিন্তু মৃত্যু ও অভাবের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সারা জীবনটাকে ত্যাগ করিবার সার্থকতা কি?

প্রাচীনের দল এখানে হাসিয়া বলিবেন—'আরে বাতুল। তা'ও কি হয়? পূর্ণ আনন্দ জ্ঞান ও শক্তির অভিব্যক্তি এ সংসার মধ্যে হইবার উপায় নাই, এ সংসারটা এমনি মাটিতে গড়া, যে তাহাতে শিব গড়িতে গেলেই তাহা বানর হইয়া দাঁড়াইবে। বিশ্বাস না হয়, ত বরং দু চারখানা সংস্কৃত পুঁথি খুলিয়া দেখ। তাহার উপর ত আর কথা কহিবার জো নাই!"

কিন্তু মানুষের কেমন কু-অভ্যাস, শারীরক ভাষ্যের বাঁধনেও বাঁধা পড়িতে চায় না। সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়াও তাহার উপর তর্ক চালাইতে চায়। তাহার অন্তরের মধ্যে যে অশরীরী ভাষ্য ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে না মিলিলে শারীরক ভাষ্যকেও নাকচ করিয়া দেয়।

আজ আমি অপূর্ণ, আজ আমি দুর্ব্বল, আজ আমার জীবন নিরানন্দময়, সব কথাই স্বীকার করিয়া লইলাম—কি করিয়া যে এ সমস্ত অভাব দূর করিব, সে পথও হয়ত আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু পথ যে নাই, তাহা স্বীকার করিব কেন? সমস্ত প্রকৃতিকে জয় করিবার যে অদম্য স্পৃহা আমার মধ্যে নিহিত করিয়াছে, সহস্র পরাজয়েও যে জয়ের আকাঙ্ক্ষা মরিতে চাহে না—কোন্ শাস্ত্র আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিবে যে তাহা মিথ্যা? ইহা ত বুদ্ধির বিচারের কথা নহে, এ অনুভূতি যে আমাদের অন্তরের গূঢ়তম সত্তার সহিত একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দুইটা শ্লোকের খাতিরে আমি ইহা পরিত্যাগ করিব কেমন করিয়া?

প্রাচীন এ কথার উত্তরে বিমর্ষ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলেন—"ইহারই নাম ত মায়া, কর্ম্মভোগ না কাটিলে আর ইহার হাত হইতে রক্ষা নাই। এই একান্ত প্রত্যাশা যদি কখনও ত্যাগ কর ত দেখিবে যে যিনি আনন্দময় ব্রহ্মপুরুষ তিনি একেবারে এ মায়া-সম্বন্ধ-রহিত। সেই ব্রহ্ম-স্বারূপ্য লাভ করিলে এই সংসার একেবারে নির্ব্বীজরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সংসারের দুঃখ জ্বালাও জুড়াইয়া যায়। আর তোমাদের রাজনৈতিক সমাজনৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গবেষণাও চিরদিনের মত শান্ত হইয়া যায়।"

ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ করিলে যে দুঃখ যায় তাহা না হয় বুঝিলাম; কিন্তু কর্ম্মভোগও যদি সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া যাইত, তাহা হইলে এ শুভসংবাদ সংসারে প্রচার করিবার জন্য কেহ ফিরিয়া আসিত কি? সংসারের বীজ পর্য্যন্ত যে একেবারে ধ্বংস হয় না তাহার প্রমাণ যাঁহারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহারা নিজেই। বীজ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া গেলে সংসারে ব্রহ্মের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার কেহই থাকিত না। আরও এক কথা এই যে ব্রহ্ম যদি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হইত তাহা হইলে কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিত? জীবকে যে শক্তি আপনার ব্রহ্মস্বারূপ্য দেখাইয়া দেয় তাহা প্রাকৃতিক শক্তি। সে শক্তি অর্জ্জিত হইবার পর জীবনের মধ্যে কার্য্যকরী না হইবে কেন? প্রকৃতির শান্ত অবস্থার মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃতির চঞ্চল অবস্থার মধ্যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না, পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তি লইয়া মনুষ্যজীবনকে রূপান্তরিত করা চলে কি না, মায়াবাদী বৈদান্তিক

সমাজে সে পরীক্ষা আদৌ হয় নাই, বাংলাদেশের তান্ত্রিক সমাজে সে চেষ্টা কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিল। মনের অতীত সত্বায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া মন ও শরীরকে পূর্ণজ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি প্রকাশের যন্ত্ররূপে যে রূপান্তরিত করা যায়—এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বস্তুতঃ তাহা করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, আর তাহা না হইলে ব্রহ্মের জীবরূপ ধারণ নিতান্ত খামখেয়ালি ব্যাপার হইয়া পড়ে।

এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ব্রহ্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইয়া দাড়ায়, তখনই সে প্রকৃত স্বরাট। আধি, ব্যাধি, অভাব, মৃত্যু, শোক, দুর্ব্বলতা জয় করিবার ঐ একমাত্র পন্থা। জীবন ছাড়িয়া পলাইয়া যাওয়া একটা গোঁজামিল মাত্র।

অনেক দেশ উঠিয়াছে, অনেক দেশ পড়িয়াছে। সাগর বক্ষে বুদ্বুদের মত প্রকৃতির কোলে অসংখ্য জীব জন্মিয়াছে ও লয় পাইয়াছে। মনুষ্য বুদ্ধি তাহার হিসাব করিতে গেলে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতির এই লীলা একটা উদ্দেশ্যহীন বাতুলতা নহে, ইহার মধ্যে ক্রমবিকাশের একটা ধারা রহিয়া গিয়াছে। পঞ্চভূত রূপান্তরিত হইয়া বৃক্ষলতার মধ্যে প্রাণের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, প্রাণ জীবশরীরে রূপান্তরিত হইয়া মনের আসনে পরিণত হইয়াছে, মনুষ্য শরীরে মন ও বুদ্ধির মধ্যে অহংসত্বা স্ফূর্ত্ত। অহংসত্বা হইতেই ভেদের উৎপত্তি বলিয়া মানুষ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া নিরানন্দময় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির ক্রমবিকাশ লীলা শেষ হইয়া যায় নাই। ভেদ-বুদ্ধি-জর্জ্জরিত জীব আজ আপনার ক্ষুদ্রতায় পীড়িত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। প্রকৃতির ইহা প্রসব বেদনা। অহং যে মনাতীত সত্বার খণ্ডিত বহিঃরূপ মাত্র, মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে সেই সত্বার আত্মপ্রকাশের সময় আসিয়াছে। নর এবার আপনার খণ্ডরূপ অতিক্রম করিয়া নারায়ণকে আপনার মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে। সেইখানেই মানুষের একতা, সেইখানেই মানুষের স্বাধীনতা। সেই অবস্থা লাভ করার চেষ্টার নামই ধর্ম্মসাধনা। মানুষের উন্নতির ইহাই ভিত্তি।

নবীন দলের যাঁহারা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন তাঁহারা হয়ত এই সময় বলিয়া উঠিবেন—"তুমি না হয় শরীরের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আনন্দময় হইয়া বসিয়া রহিলে, কিন্তু সমাজের দুঃখ, জ্বালা ত ঘুচিল না।" এ কথার উত্তরে প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে জীবনের মধ্যে জীবের পূর্ণ রূপের প্রতিষ্ঠাই যখন ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্য এবং জীবনের পূর্ণ বিকাশের

জন্ত যখন সমাজ একান্তই আবশুক, তখন সমষ্টিগত জীবন বা সমাজের সৃষ্টি ও রক্ষার উপযোগী সমস্ত কাজ কর্ম্মই এই ধর্ম্মসাধনার অন্তর্ভুক্ত। রাজনীতিই বল, অর্থনীতিই আর গার্হস্থনীতিই বল সমস্তই এই ধর্ম্মসাধনার অঙ্গীভূত। ভারতবর্ষীয় সমাজের মনে এই সাধনের ছাপ অনেক দিন হইতে পড়িয়া গিয়াছে, ইহা আমাদের অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত। আর প্রকৃত পক্ষে ইহাই মানুষের জীবনের গোড়ার কথা। খণ্ড মানুষকে লইয়া কখনও মুক্ত সমাজ গড়িয়া উঠিবে না। মানুষকে আপনার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও, স্বাধীন ও আনন্দময় সমাজ আপনিই গড়িয়া উঠিবে। যাহারা অহঙ্কারের দাস, তাহারা মোহান্ধ হইয়া তোমার পথে বাধা দিতে আসিলে আপনিই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ॥৹

ব্যথিতা

[শ্রীগোবিন্দ লাল মৈত্রেয়।]

গোকুল জুড়িয়া সখি এত কেন কানাকাণি?
কি গোপন কথা যেন হ'য়ে গেছে জানাজানি
বাঁশরীর গান সখি সকলে ত ভালবাসে
মোরে চেয়ে কেন সবে নয়নের কোণে হাসে?

(২)

ধোঁয়ার ছলনা করি, কালারে স্মরিয়া কাঁদি,
বেলা নাহি কাটে বলে বাঁধা চুল খুলে বাঁধি।
কারো কাছে এর বেশী করিনি ত কোন দোষ
কেন তারা মোরে চেয়ে প্রাণে পোষে বৃথা রোষ?

(৩)

কালিন্দীর কালো জলে কালারূপ হেরি সই
কদম্বের মূলে শুধু অনিমিখে চেয়ে রই
নিরজনে গৃহ কোণে ভাবি হৃদে কালাচাঁদ
কেন সবে তবু সখি সাধে হেন মনোবাদ

(৪)

সকালে বিকালে সখি সবাই ত ঘাটে যায়,
তমালের তলে তার পদরেখা পানে চায়,
সতী শিরোমণী শুধু মোরে দেয় পরিবাদ,
সুন্দরে ভালবাসি এই কিগো অপরাধ ?

নন্-কো-অপারেশন।

(গল্প)

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

কর্ম্ম ত্রস্ত, সদাব্যস্ত কলিকাতা সহরে বেলা প্রায় ১১টা বাজে। রাস্তায় টাইমের ভাত খাইয়া, কেহ বা অভুক্ত অবস্থায় যে যার কাজে যাতায়াত করিতেছে।

পুত্রের দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠের পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়া বর্ষীয়সী মাতা মৃদুস্বরে পুত্রবধূকে ডাকিতেছিলেন "সুধা, অ-সুধা !"

ভিতর হইতে বধূ সুধা কণ্ঠস্বরে অনেক খানি বিষ ঢালিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেলা দুপুরে গিল্‌তে বসেও স্বস্তি আছে ? দিনরাত "সুধা" আর "সুধা"। মিনি মাইনের বাঁদী আর কি।

বিধবা সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন। সাহসে ভর করিয়া আবার বলিলেন, "খোকা ঘরে আছে কি !"

"কি আক্কেল মার আমার ! বল না অমল, ওঁর বুড়ো খোকা কি এখনও ঘরে বসে আছে ! কাছারী নেই নাকি আজ !"

১৪ বছরের পৌত্র অমল বাহিরে আসিয়া দেখিল মার সুধামাখা সম্ভাষণে ঠাকুরমা ম্লান মুখে নীচে ফিরিয়া যাইতেছেন। মাঝে মাঝে প্রায়ই সে এ দৃশ্য দেখিয়া থাকে। তথাপি আজ নূতন করিয়া ঠাকুরমার এই অপমানিত ব্যথিত মুখভাব দেখিয়া বড় বেদনা বোধ করিল। চাপিয়া ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা ত বাড়ীতে নেই। কেন ডাকছিলে ঠাকু'মা।"

ঠাকু'মা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "পোড়া পেটের জালায়, দাদু! ঘুঁটে নেই, ঝি বল্‌ল 'পয়সা চেয়ে আন, তবে তোমার উননে আগুন পড়্‌বে।' থাক্ আজ আর খেয়ে কাজ নেই।"

অমল আবার ঘরে ফিরিয়া গেল। স্কুলের বই গুলি লইয়া বাহিরে আসিয়া ঝিকে ডাকিয়া পয়সা দিয়া গেল। ঠাকুরমাকে বলিয়া গেল, "রাঁধ ঠাকু'মা, আমি এসে তোমার পাতে খা'ব।"

(২)

বিকালে অমল মা'কে লুকাইয়া ঠাকুরমার পাতের প্রসাদ খাইত। মা'র কঠোর শাসনে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঠাকুরমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিত না। অমল বড় হইয়াছে, সে মা'কে অত ভয় করিত না। আজ পাতের ভাত খাইতে বসিয়া দেখিল, শুধু ভাত।

সে সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি আজ কি দিয়ে খেয়েছ ঠাকুমা।"

ঠাকু'মা বলিলেন, "বিধবার খাওয়া, একটু সন্ধব আর এক পো' আলো-চালেই হয় রে, অমু! তুই যদি মার কাছ থেকে একটু দুধ মিষ্টি আন্‌তি, ভাত কটি খেয়ে নিতি।"

বুদ্ধিমান পৌত্র বুঝিল, হতভাগিনী ঠাকু'মা ঘুঁটের পয়সা চাহিতেই সাহস পান নাই, তা'র ডাল তরকারীর পয়সা চাহিবেন কি! আজ তিনি নুন তেঁতুল দিয়াই পেটের জালা নিবাইয়াছেন। অমল বলিল, "কেন ঠাকু'মা ভাঁড়ারে কত তরকারী থাকে, তোমাকে কেন দেয় না মা!"

ঠাকু'মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে সব যে তোমাদের মাছ মাংস মাখা থাকে, অমু, আমাকে দে'বেনা কেন, আমিই তা খাই না।"

"তুমি কেন ভাঁড়ার দেখ না ঠাকু'মা।

"ভাঁড়ারের চাবি যে আমি তোমার জন্ম থেকেই তোমার মা'কে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি তোমাদের শুধু ঠাকু'মা হ'য়ে থাকব, গঙ্গাস্নান কর্‌ব, আর শিব পূজো কর্‌ব, দাদা, আমার গিন্নিপনার আর দরকার কি! সুধা এখন বুঝতে শিখেছে!"

ঠাকু'মা নীচেই থাকিতেন। উপরের ২ খানা ঘরের একখানাতে পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র বৈঠকখানা করিয়াছিলেন, অপর খানি শয়ন কক্ষ। বিলাসিনী বধূর পরামর্শে মাতার উপরে স্থান হইত না। নির্ম্মলচন্দ্র কাছারী হইতে ফিরিয়া-ছিলেন। একবার ভাবিলেন "অমু মার কাছে বসে কথা কইছে, আমিও যাই"

অমনি দেখিলেন বেথুন স্কুলের সুশিক্ষিতা পত্নী সুধা হাকিম গৃহিণীর উপযুক্ত "পজিশন" বজায় রাখিয়া, খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতেই নীচে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছে। আর মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎরূপ দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল না, তিনি উপরে ধাবিত হইলেন।

অমু বলিল, "আজ ভাত খেয়েই আমার পেট ভরেছে, ঠাকু'মা আমার জল খাবারের পয়সা দিয়ে তোমার খাবার আন্‌ব। কি আন্‌ব আমায় বলে দাও না, ঠাকু'মা।"

ঠাকু'মা আজ অনেক সহিয়াছিলেন, কিন্তু এই মাত্র পুত্র অগ্রসর হইতে হইতে যে ফিরিয়া গেল, সেই ক্ষতের উপর পৌত্রের স্নেহের প্রলেপটি আর সহিতে পারিলেন না, অঝোরে চোখের জল ঝরিতে লাগিল, তিনি আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন, "দাদু, দাদু, আজ খোকা আমার পর হ'য়েছে, আজ সে নির্ম্মল বাবু হ'য়েছে, একদিন সেও তোর মত আমার আঁচলধরা ছিল। পাঁচ মাসের ছেলে কোলে নিয়ে একাদশীর উপোস করেছিলাম। আধ পেটা খেয়েও তাকে তা'র বাপের ভিটেয় নিয়ে ছিলেম! শেষে তার কাকার চক্রান্তে তাকে নিয়ে বাপের বাড়ী আসি। কত করে' ভাই ভাজের মন জুগিয়ে তাকে "ডবল এমে" পাশ করিয়েছিলুম, তা আমি জানি আর উপরওয়ালা জানে রে! বিধবার সম্বল খোকা যখন এণ্ট্রান্স পাশের জলপানির পয়সা দিয়ে আমার খাবার ছানা চিনি আন্‌তো, সে যেন অমৃত খেতাম! আর আজ বড় লোকের শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করে হাকিম হ'য়ে নির্ম্মল আমার দিকে ফিরে চায় না! একটা পয়সার আলু ভাতে দিয়ে খেতে চাইলে সুধা আমায় বলে, 'বিধবার অত নোলা কেন', তা'তে আমার খেদ নেই, ভাই! তোমরা ভাল খাচ্ছ, ভাল পরছ ত! অভাগীকে যে আমার খোকা মা বলে ডেকে খোঁজ নেয় না, সেই খেদেই আমি মরে আছি!"

অমল ভাবিল "এই কি উচ্চ শিক্ষার পরিণাম!"

(৩)

দুই দিন পরে নির্ম্মল বাবু আহারান্তে ধড়া চূড়া পরিতে উপরে যাইতে-ছিলেন। পথে পাইয়া মাতা একটা কথা কহিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারি-লেন না। বলিলেন, "নির্ম্মল, রামদীনকে বলে যে'ও আমার আলোচা'ল ফুরিয়েছে, আধমণ চা'ল এনে দিতে।"

নির্ম্মল চন্দ্র মাতার প্রতি বধূর ব্যবহার অনেকটা জানিতেন; তথাপি সুধা

কি ভাবিবে, বলিয়া চাউল আনাইবার লুপ্ত কর্তৃত্বটুকু হাতে লইতে সাহস পাইলেন না। বলিলেন, "আজ আমার বড্ড তাড়াতাড়ি; সুধাকে বলগে, সেই ত চা'ল ডা'লের খবর জানে।"

নির্মল একটু ইতস্ততঃ করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন, দেখিলেন সেখানে সুধা তাঁহার বেথুন স্কুলের "ক্লাস ফ্রেণ্ড" মিসেস্ অমিয়া মিত্রের সহিত মিঃ গান্ধির বক্তৃতার অন্যায্যতা প্রমাণ করিতে মহা তর্ক বাধাইয়া দিয়াছেন। নির্মল স্মিত মুখে অমিয়া মিত্রকে নমস্কার করিয়া পাশের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় বদ্লাইতেছিলেন। সহসা নীচে যেন কিছু পড়িয়া গেল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় ছুটিয়া আসিতে দেখিলেন, চেতনহীনা মাতা ধুলায় লুটাইতেছেন, অমল তাঁহার মাথাটী কোলে লইয়া অস্থির ভাবে ডাকিতেছে "ঠাকু'মা গো, ঠাকু'মা!"

নির্মল বলিলেন, "একি, মার কি হ'ল, অমু!"

অমল বলিল, "সইতে পারেনি, বাবা, ঠাকু'মা অতটা সইতে পারে নি! আমি নিজের চোখে দেখেছি, পরশু শুধু নুণ ভাত খেয়েছে, কাল একাদশী করেছে, আজ চা'ল নেই বলে মাকে সকালে বলতে গিয়েছিলেন, মা' এত-গিগ্‌গির চা'ল ফুরোল কেন বলে রাগ করতে লাগলেন। তোমাকে চালের কথা বলতে তুমি আবার মা'কে বলতে বল্লে! অত হেলা ফেলা বুড়ী আর সইতে পারেনি, মনের খেদে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেছে!"

ঠাকুরমা চোখ মেলিয়া অমলকে দেখিয়া বলিলেন, "অমল, আমার খোকা কাছারি চলে গেছে।"

নির্মল হাঁটু পাতিয়া মার কাছে বসিয়া বলিলেন "মা, ওমা, এই যে আমি, আমায় মাপ ক'র মা।"

মা বলিলেন, "ডাক খোকা, আবার ডাক, আমি এখনো, তোকে খোকা ডাকা ভুলতে পারিনি, তুই কি অপরাধে মা ডাক ভুলবি, খোকা! তুইত আমার সোহাগের স্মৃতি নোস্, তুই যে দুঃখিনীর ধন বাবা।" উপরে নির্মল চন্দ্রের মেয়ে সুর করিয়া পড়িতেছিল।

"মা আমার কত ভালবাসেন আমায়
আছে কি তুলনা মোর মায়ের মায়ায়।"

* * *

উপরে গিয়া অমল ভগ্নী "বেবি"র চুলের ফিতা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, বলিল, "আর তোমাকে বিবি সেজে স্কুলে যেতে হ'বে না।"

"আঃ ! ছেড়ে দাও দাদা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে,...না গেলে fine হবে যে" !

"না বেবি, তুই আর আমি Non-co-operation করব।"

নির্ম্মল বিস্ময়ে বলিলেন, "সেকিরে অমু, তোর আবার হ'ল কি, Non-co-operation আমার বাড়ী চলবে না।"

অমল গম্ভীরভাবে বেবির বইগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "তোমার বাড়ীতেই আগে আরম্ভ হ'বে, বাবা, নইলে এই শিক্ষা দীক্ষা শেষ হ'লে ১৫ বছর পরে আমিও যে তোমাদের খেতে দেব না, ঠাকুমার মত মা'কেও যে আমার বউএর খোসামোদ করে খেতে হ'বে। বেবিটাকেও বাড়ীতে আমরা পড়াব, নইলে পর শ্বশুর ঘরে গিয়ে এই রকম বিবিয়ানাই করবে, গেরস্তের সর্ব্বনাশ করবে। কাঙ্গাল জাতের জন্যে তো এ শিক্ষা নয়, বাবা। আমি মুটে মুজুরি করে খা'ব সেও ভাল, তবু অমনতর সভ্য হয়ে বাপ মা হাবাতে চাই না। যদি সুশিক্ষা দেশে আরম্ভ হয় ত আবার পড়ব, নইলে আমিও আজ থেকে মহাত্মা গান্ধীর দলে যোগ দেব, হাকিমের ছেলে, "Non-co-operation" করব।" নির্ম্মল নির্ব্বাক। অপর কক্ষে সুধা অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা॥

বাঁশরী

[শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

থামাস্ নে রে থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে তোর বাঁশীখান
তার সুরে যে ব'য়ে আসে কোন্ বা অচিন্‌পুরের গান
আঁখির যত অশ্রুরাশি তরল হ'য়ে ভেসে যায়
মর্ম্মতলের বেদনা শত দীর্ঘশ্বাসে মিশে যায়
আশার ব্যথার দুঃখ ও সুখ তার সুরে সব পায় যে প্রাণ,—
থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে তোর বাঁশীখান।

থামাস্ নে রে থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে তোর বাঁশীখান,
অপ্সরীরা কোথায় নাচে কিন্নরীরা গায়রে গান,
তোর বাঁশরীর তানে তানে তারা যে সব মূর্ত্তি পায়
চোখের আগে কল্পলোকের স্বপ্নরাশি ফুটে যায়।

কোন্ কাননে লতা দোলে শুনে বিহঙ্গদের তান ;—
থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে ভাই থামাস্‌নে তোর বাঁশীখান।

দিনের শেষে কোন্ গোধূলির অবসরে ছল্ ছল্
কোন্ তরুণীর আঁখির পাতে অশ্রু করে টল টল্
নীরব স্বরে সন্ধ্যা নামে কোন্ সাগরের কিনারায়
তোর বাঁশরীর রন্ধ্র-পথে তারা যে সব আসে যায়,
কোন্ বাজনে ব্যথায় বাজে হায় কিশোরীর একলা প্রাণ ;—
থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে তোর বাঁশীখান।

বকুল-বীথির তলে তলে কোন্ দুপুরের ঘন ছায়
একলা বালা মালা গাঁথে গুন্‌গুনিয়া কণ্ঠ গায়
কোন্ পুলিনে সুন্দরীদের সান্ধ্য স্নানের কলরোল
সন্তরণে আন্দোলনে নদীর হিয়া উতরোল,
কোন্ দুপুরে তালীর বনে উদাস করে ঘুঘুর গান ,—
থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে তোর বাঁশীখান।

তোর বাঁশরীর সুরে সুরে বাঁধা যে মোর হৃদয়খান
থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে ভাই থামাস্ নে তোর বাঁশীখান
তোর বাঁশরীর তানে তানে হয় যে ব্যথা মধুময়
তোর বাঁশরীর গানে গানে পাই যে মোরে জগতময়
কোন্ বাদলের কোন্ জোছনার কোন্ উষা কোন্ সাঁঝের গান ,—
থামাস্ নে রে থামাস্‌নে ভাই থামাস্ নে তোর বাঁশীখান।

সুখের ঘর গড়া।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।)

নবম পরিচ্ছেদ।

জীবনকালি অগ্রজ তর্কসিদ্ধান্তের কথার ভাব ভঙ্গী হইতে বুঝিল জমীদার বাবুর শরণ লওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নাই। তার রোক চাপিয়া গিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরীর যজ্ঞনাশ না করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। সেইদিন বিকালেই সে জমীদার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। মহেশ চৌধুরী একাধারে বাবুর সম্বন্ধী স্কুলের সেক্রেটারী ও জমীদারীর ম্যানেজার। মহেশ মাত্র দিন কয়েক হইল প্রায় মাসাধিক কাল পরে মাহাল পরিদর্শন করিয়া সদরে ফিরিয়াছেন, সেই শুভ ঘটনা উপলক্ষ্যে বৈঠকখানায় একটা বড় রকমের মজলিস চলিতেছিল, প্রায় সকাল হইতেই অষ্টপ্রহর লাগিয়া ছিল। মহেশের কয়টী অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, ইহাদের সহিত মহেশের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহার-বন্ধন-সূত্র ছিল গঞ্জিকা ও চরস নামমাহাত্ম্যেই হউক বা যে কারণেই হউক মহেশ গাঁজা খাইতেন। জীবনকালি এই অন্তরঙ্গ দলের একজন তবে গাঁজা এখনো ধরে নাই। সে চরসেই চৌরস ছিল, ঈশান হালদার ও ভূষণ আড্ডি ও গোবর্দ্ধন গুঁই বাকী কয় রত্ন। ঈশান ও গোবর্দ্ধন গুঁই ইহাদিগকে গ্রামের লোক মহেশের নন্দী ভৃঙ্গী বলিত। ইহারা আবার ইস্কুলের মাষ্টার পণ্ডিতও ছিল। নবু নাপিত আর এক অবতার। নবু খুব ভাল তবলা বাজাইতে পারিত। ভূষণ আর নবু চরসে অদ্বিতীয় ছিল।

ঠাকুরবাড়ীর উপর তালায় মজলিস্ বসিয়াছে। বুড়া বয়সে রতনরায় খুব রাসভারী লোক হইয়া পড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা বয়সের যত নেশা ছাড়িয়া দিয়া এখন মাত্র খেতাব খিলাতের নেশায় তিনি ভরপুর। মহেশ ইংরাজী সরস্বতীর কিঞ্চিৎ কৃপায় সাহেব সুবার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে একটু মজবুৎ থাকায় এবং খাজনা আদায়ে বেয়াড়া প্রজাবর্গকে শমদমাদি উপায়ে দোরস্ত করিতে অদ্বিতীয় থাকায় শ্যালকের প্রিয়পাত্র ছিল, কাজেই তাহার অনাচার অত্যাচার আবদার রতনরায়কে দায়ে পড়িয়া গায়ে পাতিয়া লইতে হইত। কেবল ভবানীপ্রসাদের ভবিষ্যৎ ভয় থাকিতে মহেশ কারো মাথা হাতে কাটিতে ভরসা করিত না। ইদানীং সে ভয়ও বড় ছিল না।

ভবানী না থাকায় পুরাদমেই মজলিস চলিতেছিল। গাঁজা ও চরসের] ধোঁয়ায় মজলিস নিবিড় কোয়াসাচ্ছন্ন। কলাবিৎ বক্কেশর শুঁড়ী (জগুভক্তীর ভাই) তানপুরার তারে চড়িয়া স্বরের কুস্তি আরম্ভ করিয়াছে নবগুই চাঁটার চোটে তবলার চর্ম্ম-ধর্ম্ম পরীক্ষা করিতেছে স্বরের হুহুকার, বাজনার দাপট ও সমজদারের বেতালা কেয়াবাৎ, বহুৎ আচ্ছা শব্দে সেই ঘরটার অচেতন দেওয়াল কপাট জানালা, কড়ি বরগা পর্য্যন্ত যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। এই শব্দের ভিড় ঠেলিয়া জীবনকালি একেবারে "পিসে বাবু" যেখানে ভিজা গামছার ভাঁজ মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রে চাপাইয়া নন্দী ওরফে গোবর্দ্ধনের হাত হইতে কল্‌কে টানিতে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইল। মহেশ তখন আনন্দময় কোষে বিরাজ করতঃ খুব গ্র্যাণ্ড্ বোধ করিতেছিলেন, ধোঁয়ার হ্লাদিনী শক্তি আর ওস্তাদের স্বর কসরৎ জনিত নাদ ব্রহ্ম একত্র মিশিয়া মহেশের সুপ্তকুণ্ডলিনীকে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। জীবনকালি ঈশানের কাছে গিয়া চরসে একটান দিয়া আসিয়া পিসে বাবুর কাছে বসিল। পিসে বাবুর দেব-দ্বিজে খুব ভক্তি ছিল, পুরোহিতের পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন :—

ম। আরে! ঠাকুর মশাই যে—এস এসো! আমাদের circle কম্‌প্লিট্! পঞ্চ পাণ্ডব আমরা, গাঁজা আমাদের দ্রৌপদী। কি বল ভট্‌চাজ?

ই। পঞ্চ পাণ্ডব কে কে বুঝেছ ভশ্‌চাজ?

ভট্ট। যে বাবা তোমাদের গানের ধমক! বক্কেশ্বরের দেখছি পরদা দিন্ দিন্ বেজায় চড়্‌ছে!

ম। ওরে থাম্ থাম্! গান থামা!

নন্দীভৃঙ্গী অমনি চেচাইয়া উঠিল—"ওরে থামা! থামা! চুপ চুপ!" নিষেধ শুনিয়াই অর্দ্ধপথে স্বর ও সঙ্গৎ থামিয়া গেল। বক্কেশ্বরের মুখ হাঁ হইয়াই রহিল; নবুর চাঁটী উঠিল মাত্র নামিল না। 'নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ' শুনিয়া পলাশীর ক্ষেত্রে নবাব সৈন্যের ঠিক যা হইয়াছিল।

ই। পঞ্চ পাণ্ডব কে বুঝেছ ভশ্‌চাজ?

ভট। এই আমরাই!

মহেশ। বুঝলেনা ভট্‌চাজ পঞ্চ পাণ্ডব কে কে? শোনো— :

ভূষণ। শৃণু! শৃণু! দেব নবপঞ্জি ফলাফলং বলছেন—

গানের দল উঠিয়া আসিয়া মহেশকে ঘেরাও করিল। মহেশ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া ব্যাখ্যা করিলেন—

ম। আমি হচ্ছি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ ; ঈশেন ভীম, গোবরা নকুল

গো। (ক্ষুন্নমনে) আমি অর্জ্জুন নই কেন ?

ম। একটুওতো মেলা চাই ?

গো। মেলেনা কিচ্ছু ?

ভূষণ। আরসিতে চেহারা খানা দেখলেই উত্তর পাবি।

হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ হেঃ হেঃ প্রভৃতি নানারকম স্বরে সুরে ও লয়ে একটা হাসির গর্‌রা উঠিল। অনেক কষ্টে হাসির জের মরিলে গোবর্দ্ধন বলিল "একটু মেলে।'

মহেশ। কোথায় ?

ভূষণ। সব্যসাচী বটে গোবরা! দুহাতেই সমান গাঁজা টিপতে পারে।

পুনরপি হাস্যের কলরোল। সঙ্গে সঙ্গে কাশির কোলাহল।

ম। যাগ্‌! আপাততঃ তুই নকুলই থাক্‌, ভূষণ আড্ডি অর্জ্জুন হোক, পরে ওর অবর্ত্তমানে তোকে ও পদে তোলা যাবে।

ভূ। যদি নাকটা গজায় আর রং ফর্সা হয় আর থাক্‌—

গো। শালা আমার কি রাজপুত্তুর রে ?

ভূ। রাজপুত্তুর না হই রাজবোনাই-পুত্র বটে। না কি না পিসে বাবুকে জিজ্ঞেস্‌ কর ?

ম। তারপর—ভশচাজ্জ সহদেব। কেন ? কারণ কারণটা—কি হে আড্ডি ?

ভূষণ। কারণ সহজ সরল ও সাদা। বয়সে নয় নেশায়। বালক বলে ?

মহেশ। কিরূপ ব্যাখ্যা কর ?

ভূষণ। উনি এখনো চরস চোষেন, দ্রৌপদীর কাছে ঘেসতে পারেন না বলে! দ্রৌপদী অর্থাৎ গাঁজা। ইতি টীকা—

আবার সমবেৎ হাস্যধ্বনি। ভট্‌চাজ্জ কেবল গম্ভীর।

ম। ভশচাজ্জ চটলে নাকি ? বিষণ্ন কেন ?

ভট্ট। কারণ ঘটেছে সেইটেই বলতে আসা—

ভূ। আচ্ছা ভটচাজ্‌ এত বয়স হল, গাঁজাটা তবু কায়দা করতে পারলে না হে ?

ভট্ট। না ভাই ওটা ধাতে সয় না—বড় বদ্‌ নেশা

ভূ। কি বল্লে ? গাঁজা বদ্‌ নেশা ? শুন্‌লে পিসেবাবু এর নেমকহারামি ?

মহেশ। ভূষণ শুনিয়ে দাওতো ভশ্চাজকে তোমার গাঁজার মহিম স্তোত্রটা।

ভূষণ। (সুর করিয়া)

বাবা সাধে কি গাঁজা টানি

গাজার যে মজা কত বুঝলে না কো ব্রহ্মা বিষ্ণু

বুঝেছেন শুধু শূলপানি-ই-ই—

(সঙ্গে সঙ্গে সকলে অঙ্গুলী যোগে মহেশকে 'শূলপানি' বলিয়া দেখাইতে লাগিল।)

দমটী টেনে চক্ষু বুঁজে

বস্‌লে পরে মাথা গুঁজে

মণ্ডার মত ব্রহ্মাণ্ডটী হস্ত গত তখ্‌খুনি—

(হাতের চেটোর মধ্যভাগ দেখাইয়া) বুঝেছ ভশচাজ্‌, 'তখ্‌খুনি'। সকলের মহা কলরবে হাস্য। কেবল ভট্টাচার্য্য নীরব—

মহেশ। আর সেইটে ? 'আমি খেলুম, বাবা খেলেন' ?—

ভূষণ। একি তোমার চরস, ভশচাজ্‌ ? একছিলিম সাজ্‌লাম—

আর (সুর করিয়া—)

আমি খেলুম, মামা খেলেন

খেলেন বুড়ো তালুই

ভাইপো ব্যাটা নেহাৎ ছোঁড়া

বাদ্‌ দিলেই কি সেই ?

প্রতিবেশী সপ্ত শিষ্য

পাড়ার আরো পাঁচটী পোষ্য

ছুটো ছাটার নাইকো ভাষ্য

বাবা এক্‌ এক্‌ টান্‌ সবাই ?

হাসির গর্‌রায় দরজা জানলা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। তবু ভশচাজ গম্ভীর মুখভার।

মহেশ। ভশচাজ, ব্যাপারটা কি ? আজ তোমার টেম্পারেচার এত 'লো' কেন ?

ভট্ট। বলিছিতো কারণ ঘটেছে, তাই বলতেই আসা—

ম। কি শুনি ?—তোমরা চুপ্‌ করতো·হে—

ভট্ট। আপনি আর কর্ত্তা মুলুকের মালিক হয়ে যদি দেবতা বামুনের মান না রাখেন তা হলে তো দেশে টেঁকা দায় ?

ম। (গম্ভীর হইয়া) কে জাত মারলে কার?

ভট্ট। ভোলা মুখুজ্যের ভাগ্নে দেশে এসে বাস করছে শুনেছেন তো?

ম। তা শোনা গেছে বৈ কি?

ভট্ট। তিনি সম্প্রতি এক কীর্ত্তি করেছেন--

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল এবং 'কি' 'কি' প্রশ্নে মজলিস্ মুখরিত করিয়া তুলিল।

ভট্ট। স্নান করে উঠে এক মুসলমানের মেয়েকে ছুঁলেন, তারপর বাউনের বিধবা তো? ফের স্নান করা হল না। সে যাগ্—

ম। যাগ্ কেন থাক্—তার পর?

ভট্ট। তারপর সেদিন নাকি তাদের বাড়ীতে এনে—

ম। কাদের?

ভট্ট। সেই ব্যাটা পুরোনো দাগী এসমাইল—তার মা, পরিবার আর ছেলেকে বাটীতে এনে খাওয়ানো হল। নিজেদের ঘটিবাটী দিয়ে অতিথ ভোজন করিয়ে—সে গুলো আবার ব্যাভার করা হচ্চে,—এ তে জাত যায় কি না?

সকলে। খুব যায়, অবশ্য যায়, একশো বার যায়—যায় বলে যায়।—

ভট্ট। এখন তিনি ভোলার মেয়েব ভাতে বাউন ভোজনের নেমন্তন্ন করেছেন পাড়ায়—

ইশান। মেয়ের ভাত?

ভূষণ। কেন দাদা? মেয়েরা ভাত খায় না? তবে কি মেয়ের খিচুড়ী বলবে?

গো। না, মেয়ের অন্নপ্রাশন হয় কি?

ভূষণ। কল্লেই হয়—! এই যে আমরা পিসেবাবুর ছেলে হতে পিসির হেলথ্ স্মোক (Smoke) করলাম, গাঁজা টেনে? হয় না?—একটু মরাল্ কারেজ থাকলেই হয়—

ম। তার পর?

ভট্ট। আমি তা শুনে খুব ব্যস্ত হলাম—

ভূষণ। হবারই কথা! ধর্ম্মরক্ষা তোমাদেরই তো কর্ত্তব্য; বিশেষ তুমি হলে ভশচায্ এ গাঁয়ের ধর্ম্মের পুলিস দারগা ও কোষাধ্যক্ষ—

ভট্ট। আপনার নাম করে সকলকে মানা কল্লাম, নেমন্তন্ন না যায়।

ম। তাতে সব কি বল্লে ?

ভট্ট। দোনোমোনো করছে—ভয়ও আছে আবার লোভও আছে—

ম। (গম্ভীর হইয়া) হুঁ—ভোলাও তো বড এ দিকে আসে না—কেন হে ?

ভূ। ঈশেনের কিস্তির ভয়ে নিশ্চয় নয়।

ই। কেন নয় ?

ভূ। কেন না ঈশেনদা মাতের চেয়ে চালমাৎ করতে খুব ওস্তাদ—

ই। বটে ? একবার করে দেখ না একবাজী ?

ভূ। না দাদা। ভবের ছকে চালমাৎ হয়ে বসে থাক্‌তে বড় রাজী নই, বিশেষ বড়ের চালে ।

ম। তারপর, ভোলা আসে না কেন ?

ভট্ট। ভোলা good boy হয়েছে— তা ছাড়া—

ম। তা ছাড়া কি ?

ভট্ট। (চাপা স্বরে) সে এখন নতুন খেলায় ঝুঁকেছে।

সকলে। (উচ্চৈস্বরে) কি রূপ ? কি রূপ ? কি খেলা ?

ভট্ট। আপনাদের রাঁধুনী তারামণির বাড়ী আজ কাল—

ম। কি করে ?

সকলে উৎসুক হইয়া ভট্টাচার্য্যের মুখের দিকে কান ফিরাইল।

ভট্ট। ঘন ঘন যাতায়াত। ওষুধ পত্র চাল ডাল, খোরাক পথ্য, এই সব নিয়ে সরবরাহ করে।

ম। কেন ?

ভট্ট। কেন আর। নরচরিত্তির সব বোঝা যায়, বলুন ?

ভূ। কতক যায় ; কিন্তু নারী চরিত্তির কদাপি না—

ম। তার ছেলেটাকে কই দেখছিনি তো।

ভট্ট। দেখবেন কি করে ? সে যে এখন ভোলার ভাইঝির ধর্ম্মপুত্তুর না ভিক্ষেপুত্তুর হয়ে স্কুলে যাচ্ছে—

মহেশ। বটে ! ভোলা তা হলে স্বপ্রধান হয়ে পড়েছে ! ছেলেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল কার হুকুমে ?

ভট্ট। তার ভাজের হুকুমে।

ম। হুঁ ! নেমন্তন্ন কবে ?

ভট্ট। পরশু।

ম। যাচ্ছে সব খেতে ?

ভট্ট। না যেতেও পারে—তবে—দাদা আমার—

ম। কে ? তর্ক সিদ্ধান্ত ? তিনি কি বলেন ?

ভট্ট। ঘরের ঢেঁকী বিভীষণ যা' করে ? তিনি যাবেন, আপনারও নিষেধ শুনবেন না।

ম। বটে না কি। শালাবাবু রায়মশাই শুনেছেন ?

ভট্ট। আপনি না বল্লে আমরা কি তাঁকে বলতে পারি ?

ঈশান। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে পারি আমরা ?

ভট্ট। বল্‌বো কতো ? তারামণি নাকি সেই যজ্ঞে রাঁধবে, আমি তার পিসিকে বারণ করতে গেলাম, যে ওই অনাচারের বাড়ী হাঁড়ি ছুলে এ বাড়ীতে কাজ থাকবে না, নিষ্ঠেবান হিঁদুর বাড়ী বুঝে শুঝে কাজ করে যেন।

ম। তা বুড়ী কি বল্লে ?

ভট্ট। বাবা, কি তার কুলোপানা চক্র, তবু যদি এক ছিটে বিষ থাক্‌তো ? সে বল্লে "হ্যাঁ যাবে বৈকি। চাকরি না থাকে না থাক্‌বে ?—

ম। বটে।

ভট্ট। সে যেন হলো, আপনাদের মুলুক আপনারা বুঝবেন, আমি আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে থাকি কেন ? একটা নালিশ আছে।

ম। কি ?

ভট্ট। গরীব বামুন পেটে খাবার পয়সা জোটেনে, ছেলের জরিমানা দি কোথা হতে ?

ম। কে জরিমানা করেছে ? কেন ?

ভট্ট। আমার ছেলের জরিমানা করেছে ভোলা বাবু মাষ্টার।

গোবরা। অপরাধ ?

ভট্ট। কেলাসের ছেলেরা কি নিয়ে মারামারি করেছে—তারামণির ছেলে আমার ছেলের নামে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করলে, অমনি ভোলাবাবু তার জরিমানা করলেন চার আনা। একে তারামণির ছেলে— তারপর ভাইঝির ধর্ম্মপুত্তুর।. তার সাক্ষী কি মিথ্যে হয় ?

ঈশান। জটিল সমস্যা।

ভূষণ। অতীব। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দাও হে গোবরধন।

ম। না, আর না, রায় মশায়ের কাছে যেতে হচ্চে—

ভট্ট। এস্‌মাইলকে আপনি মালিক হয়ে গাঁ ছাড়া করতে চান; ভোলার তাজ তাকে তার বাগানে ভিটে করে দিতে চেয়েছে—বসবাস করতে। দেখুন আস্‌পরধা।

ঈশান। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা।

ম। বাউনির ছেলেটা এখন কোথা?

ভট্ট। ভোলাদের বাড়ীতেই থাকে—দিব্বি দুধ ঘিয়ে আদরে কদরে আছে, স্কুল যাচ্ছে—

ভূষণ। ছোড়ার চেহারাটা বেড়ে।

বঙ্কে। গলাটাও ততোধিক বেড়ে—থিয়েটারের ভারি একটা লোকসান্ বলতে হবে—বেশ তৈরি করে তোলা যাচ্ছিল।

ভূ। তালিম বন। কথার অপ্রয়োগ হয় কেন, বাবা?

ম। তা হলে—আচ্ছা ভশচাজ্ একবার আমার সঙ্গে চলতো রায় মশাইএর কাছে—

ভট্ট। চলুন না, বেশ তো। এর একটা মীমাংসা দরকার হয়েছে—গাঁয়ে চোখের উপর অনাচারকাণ্ড ঘটবে এওতো বড় লজ্জার কথা!—

উভয়ে উঠিল। অকালে সভা ভঙ্গ দেখিয়া পাত্রমিত্র অনিচ্ছায় যে যার আস্তানায় চলিয়া গেল। নির্জ্জনে মহেশ ও জীবনকালি উভয়ে কি একটা পরামর্শ আঁটিল; দু একটা অল্প উচ্চারিত কথার ইঙ্গিতে আন্দাজ বুঝা গেল —যেন মহেশ বলিল—"ভোলা কি চেষ্টায় আছে, না বাগিয়েছে? দেবতার প্রসাদেতে "কুকুরের নজর?" জীবন উত্তর করিল "ঠাওর করছি—চাক্ষুষ দেখিনি যদ্যপি—।" মহেশ—"বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা;—তা হলে আর ওকে আস্ত রাখবো না।"

দুঃখ-সাধনা।

[শ্রীমতী রাণি নিরুপমা দেবী]

তুমি কত ব্যথা আর সওয়াবে গো মোর
এ প্রাণে
পাতা ঘর মোর ভেঙ্গে দেবে কত
তুফানে ?

আর কত দিন সুখের খেয়ালে হাসাবে
আর কত দিন অশ্রু-সাগরে ভাসাবে ?
আরো কত দিন দুঃখের ভয়ে শাসাবে আমায়
কে জানে ?
কত ব্যথা আর সওয়াবে গো মোর
এ প্রাণে ?

সময় কি আজো হয় নি নীরব
রহিতে ?
দুঃখ সুখের তরঙ্গাঘাত
সহিতে ?

ভক্তি কি আজো শেখেনি কঠোর সাধনা
হৃদয় কি আজো বহিতে শেখেনি বেদনা ?
তবে ফাটাও ফাটাও ফাটাও এ বুক চেতনা
কঠিন-পাষাণে।
কত ব্যথা আর সওয়াবে গো মোর
এ প্রাণে ?

সুর ও স্বরলিপি—

[শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

জয়জয়ন্তি—ঢিমে তেতালা।

আস্থায়ী।

II { ০ সা সা ন্‌া সা। ১ ররা সা রাঃ —া I
তু মি ক ত ব্যা০ থা আ র্‌

২´ জ্ঞ জ্ঞজ্ঞা রা—গমা। ৩ রজ্ঞা সাঃ —ঃ া।
স ওয়া বে ০০ গো০ মো র্‌ ০

০ ন্‌া —সা —রা —জ্ঞা। ১ —রা —সা ন্‌া —সা I
এ ০ ০ ০ ০ ০ প্রা ০

I —রা—ন্‌া— সা —সা —প্‌া। —ধ্‌া প্‌া ধা প্‌া }।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ণে ০ ০

০ প্‌া রা রাঃ — সঃ। ১ রাঃ —মঃ মা পা I
পা ভা ঘ র্‌ মো র্‌ ভে জে

২´ না র্সা —া া। ৩ না —া র্সা —া।
দে খে ০ ০ ক ০ ত ০

০ মা —পা —ধা —ণা। ১ —ধা —পা —ম পা I
ভু ০ ০ ০ ০ ০ ০ বা

২´ —মা —পা —মা —া। ৩ —রা —জ্ঞা —রা সা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নে

সঞ্চারী।

	০				১			
II {	মা	মা	মা	গমা ।	মা	পপা	ধা	—ধা I
	স	ম	য়	কি॰	আ	জো॰	হ	য়
	২				৩			
	পা	ঋা	মা	জ্ঞা ।	ঋা	সা	—ঋা	সা ।
	নি	নী	র	ব	র	হি	॰	তে
	০				১			
	র্সর্সা	র্সা	ণা	ণা ।	ধা	পা	পা	—মপা I
	দুঃ	খ	সু	খে	ব	হে	ব	ড গা
	২				৩			
	ঋা	—মা	গমা	। ।	জ্ঞা	ঋা	—জ্ঞা	সা } ।
	ধা	॰	ত॰	॰	স	হি	॰	তে

আভোগ।

। {	মা —মমা	পা	না ।		না	মা	পা	না I
	ভ	কৃতি	কি	আ	জো	শে	খে	নি
	২				৩			
	র্সা	র্সা	না	। ।	র্সা	না	—র্সা	র্সা } ।
	ক	ঠো	র	॰	সা	ধ	॰	না
	০				১			
	না	র্সা	র্ঋা	র্জ্ঞা ।	মা	র্ধা	র্ঋা	না ।
	হৃ	দ	য়	কি	আ	জো	র	হি
	২				৩			
I	র্সা	র্ঋা	র্জ্ঞা	র্ঋা ।	র্সা	র্ধা	র্সা	র্সর্ঋা ।
	তে	শে	খে	নি	বে	দ	না	তবে
	০				১			
{	র্সা	ণা	ণা	ণা । ।	ধা	ধা	ধা	পা I
	ফা	টাও	ফ	।	টা	ও	ফা	টা

২ ৩
পা মা -পা মপধনর্সা। র্সা না —র্সা র্সা }
ও এ বু ক॰॰॰॰ চে ত ॰ না } ।

র্সর্রা —র্সা নর্সা —পা। ধপা —ধা পধা— —পা
ক॰ ॰ ঠি॰ ॰ ন॰ ॰ পা॰ ॰

২´ ৩
I মপা —মা গসা —জ্ঞা। ।—রজ্ঞা —রা —সরা —সা।
বা॰ ॰ গে॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰॰ ॰

॰ -১
{ সা রা মমা পা। ধপা সা পপা ধা
ক ত বা॰ ॰। আপ স ধুয়া র

মা: —গম:। রজ্ঞা মপমা রজ্ঞ —রসা
গো মা ॰র ॰ ॰॰॰ প্রা॰ ॰ণে II II

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নানা প্রকারের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে এমন সময় হঠাৎ একদিন আমাদের অদৃষ্ট খুলিয়া গেল। জেলের কর্তৃপক্ষগণ হুকুম দিলেন যে ৩৪ ডিগ্রী হইতে অন্তস্থানে লইয়া গিয়া আমাদের একত্র রাখা হইবে। ভাগ্য-বিধাতা সহসা এরূপ প্রসন্ন হইয়া কেন উঠিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু আমরা ত হাসিয়াই খুন। আলিঙ্গন, গলা জড়াজড়ি, লাফালাফি আর চীৎকার থামিতেই এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম যে তিনটী পাশা-পাশি কুঠরীতে আমাদের রাখা হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাশের দুইটা ছোট,

আর মাঝেরটা অপেক্ষাকৃত বড়। অরবিন্দ বাবু ও দেবব্রতর মত যাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর-প্রকৃতি, তাঁহারা পাশের দুইটী কুঠরীতে আশ্রয় লইলেন; আর আমাদের মত "চ্যাংড়া" যাহারা তাহারা মাঝের বড় কুঠরীটী দখল করিয়া সর্ব্বদিনব্যাপী মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিল। মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসও (তখন তিনি দাসত্বত্যাগ করিয়া কাননগুহত্ব আশ্রয় করিয়াছেন) আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত পূর্ব্বে কখনও বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার অবসর পাই নাই, এবার কাছে আসিয়া দেখিলাম, যে, যাঁহাদের মাথার চুল পাকে, বুদ্ধিও পাকে, কিন্তু বয়স বাড়ে না, হেমচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। অসাধারণ শক্তিমত্তার সহিত বালসুলভ তরলতা মিশিলে যে অদ্ভুৎ চরিত্রের সৃষ্টি হয়, হেমচন্দ্রের তাহাই ছিল। দুই একদিনের মধ্যেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি সাধারণের "হেমদা" হইয়া দাঁড়াইলেন। আমাদের পাশের দুইটি ঘরে লেখাপড়া ও ধর্ম্মালোচনা চলিতে লাগিল, আর আমাদের ঘরটী হইয়া উঠিল নাচ, গান, হাসি, ঠাট্টা, তামাসা ও চিমটি কাটা-কাটির কেন্দ্র। বলাবাহুল্য উল্লাসকর আমাদের সহিত একত্রেই ছিল। সে না থাকিলে আসর জমিত না। আমরা বাড়ীঘর ছাড়িয়া যে জেলে আসিয়াছি হট্টগোলের মধ্যে সে কথা মনেই হইত না।

দিন কয়েক পরে সুখের মাত্রা আরও এক পর্দ্দা চড়িয়া গেল। বাহির হইতে পুলীস আরও কয়েক জনকে ধরিয়া আনিল। মোট আমরা প্রায় ৪০।৪৫ জন হইলাম। এত লোককে তিনটী কুঠরীর মধ্যে পুরিতে গেলে অন্ধকূপহত্যার পুনরভিনয় করিতে হয়। ডাক্তার সাহেব বলিলেন যে, একটা ওয়ার্ড খালি করিয়া দিয়া আমাদের সকলকে সেখানে রাখা হোক। কাজে-কাজেই সকলে আসিয়া একসঙ্গে মিশিলাম। নরক একেবারে গুলজার হইয়া উঠিল।

জেলের খাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ করায় ডাক্তার সাহেব আমাদের জন্য বাহির হইতে ফল মূল বা মিষ্টান্ন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সুশীল সেনের পিতা প্রায়ই আম, কাঁঠাল ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিতেন। কলি-কাতার অনুশীলন সমিতির ছেলেরাও মাঝে মাঝে ঘি, চাল, মসলা ও মাংস পাঠাইয়া দিত। সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ "হেমদা" সেগুলি হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া পোলাও বানাইয়া আমাদের ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। আম কাঁঠাল এত অধিক পরিমাণে আসিত যে খাইয়া শেষ করা দায় হইত; সুতরাং

সেগুলি পরস্পরের মুখে ও মাথায় মাখাইয়া সদ্ব্যবহার করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

সন্ধ্যার সময় গানের আড্ডা বসিত। হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, দেবব্রত ক' জনেই বেশ গাহিতে পারিত, কিন্তু দেবব্রত গম্ভীর পুরুষ বড় একটা গাহিত না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন তাহার স্বরচিত একটা গান আমাদের শুনাইয়াছিল। ভারত-ব্যাপী একটা বিপ্লবকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা রচিত। তাহার সুরের এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে গান শুনিতে শুনিতে বিপ্লবের রক্ত-চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে যেন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিত। গান বা পদ্য কস্মিন কালেও আমার বড় একটা মনে থাকে না, কিন্তু দেবব্রতের সেই গানটার দুই এক ছত্র আজও মনে গাঁথিয়া আছে

"উঠিয়া দাঁড়াল জননী।
কোটী কোটী সুত হুঙ্কারী দাঁড়াল।
* * *
রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
রক্তিম চন্দ্রমা তারা,"
রক্তবর্ণ ভালে রক্তিম অঞ্জলি
* * রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল।

গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জ্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে, মায়ের রক্ত-চরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগণ-স্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে, দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণ-বাদ্য কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ব্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখন স্পর্শ করিতেও পারিবে না।

ছেলেরা অনেকেই সেকালের স্বদেশী গান গাহিত। তাহাদের অদম্য উৎসাহ আর স্ফূর্ত্তি চাপিয়া রাখাই দায়। শচীন সেন ছিল তাহাদের অগ্রণী। পনের বৎসর যখন তাহার বয়স তখন সে মা বাপের কথা ঠেলিয়া একরূপ জোর করিয়াই কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হয়। কিন্তু তাহার প্রাণের গভীরতর আকাঙ্ক্ষা কলেজের বিদ্যায় মিটিল না, শেষে বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়া সে বাগানে যোগ দিল। জেলে আসিবার পর চীৎকার করিয়া লাফালাফি করিয়া, গান গাহিয়া, কাঁধে চড়িয়া, আম কাঁঠাল চুরি করিয়া সে যে

শুধু আমাদেরই অস্থির করিয়া তুলিল তাহা নহে, জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাহার বক্তৃতার ও গানের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। রাত বারটা একটা বাজিয়া চলিয়াছে—শচীনের গানের আর বিরাম নাই! জেলার বাবুটী নিতান্ত ভদ্রলোক। এতগুলা ভদ্রলোকের ছেলেকে তাঁহার জেলের মধ্যে পুরিয়া দেওয়ায় তিনি নিতান্তই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিকে সরকারী চাকরী, পেন্সন পাইবার আর বৎসর খানেক মাত্র বিলম্ব—আর অপর দিকে চক্ষুলজ্জা - এই দোটানায় পড়িয়া বেচারার একেবারে প্রাণান্ত। একে ভদ্রলোক প্রৌঢ় বয়সে চতুর্থ না পঞ্চম পক্ষের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উপর রাত্রি-কালে ছেলেদের গানের জ্বালায় অস্থির। একদিন প্রাতঃকালে তিনি নিতান্ত ভালমানুষের মত আসিয়া নিবেদন করিলেন, যে, ছেলেদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া যেন আমরা একটু শান্ত করিয়া রাখি। কেন না রাত্রিকালে গৃহিণীর ও মশকের উপদ্রবের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের গানের উপদ্রব আসিয়া জুটিলে তাঁহার আর এক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া পেন্সন ভোগ করিবার সুবিধা মিলিবে না। এ হেন সদ্যুক্তির পর আর কি বলা যায়? কথামালা ও শিশুশিক্ষা হইতে উদ্ধৃত করিয়া অনেকগুলি ভাল ভাল উপদেশ ছেলেদের শুনাইয়া দিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করিলাম, কিন্তু সদুপদেশ মত কার্য্য করিবার বুদ্ধিশুদ্ধিই যদি তাহাদের থাকিবে, তাহা হইলে আর ভারত-উদ্ধার করিবার কুপ্রবৃত্তি তাহাদের স্কন্ধে চাপিবে কেন?

অরবিন্দ বাবু, দেবব্রত ও বারীন্দ্র ভিন্ন আর সকলেই এই হট্টগোলে যোগ দিত, তবে মধ্যে মধ্যে উঁহারাও যে বাদ পড়িতেন—তাহা নহে। ধরা পড়িবার পর বারীন্দ্রের মনে কোথায় একটা বিষম ধাক্কা লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, সে প্রায় সমস্ত দিন একখানা চাদর মুড়ি দিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। দেবব্রত সকালে উঠিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া সেই যে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিত, বেলা দশটা পর্য্যন্ত তাহাকে আর নাড়িবার উপায় ছিল না। আহারাদির পর আবার বেলা চার পাঁচটা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কখনও বা গীতা ও ভাগবত পড়িত। তাহার সময় কেবল পড়ে কাটিয়া যাইত। অরবিন্দ বাবুর জন্য একটা কোণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সমস্ত সায়ংকাল তিনি সেই-খানে আপনার সাধন ভজনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও কোন কথাই কহিতেন না। অপরাহ্নে দুই তিন ঘণ্টা পায়চারী করিতে করিতে উপনিষদ বা অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ

করিতেন। তবে সন্ধ্যাবেলায় এক আধ ঘণ্টার জন্য ছেলেখেলায় যোগ না দিলে তাঁহারও নিষ্কৃতি ছিল না।

কানাই লাল প্রভৃতি চার পাঁচজন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত। রাত ১০টা ১১টার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, আম বা বিস্কুট লুকান আছে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যে দিন সে সব কিছু মিলিত না সে দিন এক এক গাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা বা কাহারও কাণের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া হৃষ্টমনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় ১টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি কানাই একজনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দ বাবু পার্শ্বেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দ বাবু চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন। নিদ্রাভঙ্গের আর কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। চুরিও ধরা পড়িল না।

রবিবারে আমাদের স্ফূর্ত্তির মাত্রা একটু বাড়িয়া যাইত। আত্মীয় স্বজন ও বাহিরের অনেক লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, সুতরাং অনেক প্রকার সংবাদাদি পাওয়া যাইত। মিষ্টান্নও যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত। বিপুল হাস্যরসের মাঝে মাঝে একটু আধটু করুণ রসও দেখা দিত। শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কি রকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞাসা করায় শচীন লপ্সীর নাম করিল। পাছে লপ্সীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া তাহার পিতার মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে শচীন লপ্সীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল—"লপ্সী খুব পুষ্টিকর জিনিস।" পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"বাড়ীতে ছেলে আমার পোলাওএর বাটী টান মেরে ফেলে দিত, আর আজ লপ্সী তার কাছে খুব পুষ্টিকর জিনিস।" ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা তখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাষ যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র, কথা কহিতে পারে না। হয়ত এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে

কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলা আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্ত্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল। যাক্ সে কথা। এইরূপে ত সুখে দুঃখে জেল-খানায় আমাদের দিন কাটিতে লাগিল, ওদিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারও আরম্ভ হইয়া গেল। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, আদালতে উকিল ব্যারিষ্টারের ছড়াছড়ি, কিন্তু আমাদের সে দিকে লক্ষ্য নাই। সবটাই যেন আমাদের চোখে একটা প্রকাণ্ড তামাসা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কত রকম বেকরমের সাক্ষী আসিয়া সত্য মিথ্যার খিচুড়ি পাকাইয়া যাইত; আমরা শুধু শুনিতাম আর হাসিতাম। তাহাদের সাক্ষ্যের সহিত যে আমাদের মরণ বাঁচনের সম্বন্ধ এ কথাটা মনেই আসিত না। স্কুলের ছুটীর পর ছেলেরা যেমন মহাস্ফূর্ত্তিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, আমরাও সেইরূপ আদালত ভাঙ্গিবার পর গান গাহিতে গাহিতে, চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতাম। তাহার পর সন্ধ্যার সময় যখন সভা বসিত তখন বার্লি সাহেব কি রকম ফিরিঙ্গি-বাংলায় সাক্ষীদের জেরা করে, নর্টন সাহেবের পেণ্টলানটা কোথায় ছেঁড়া আর কোথায় তালি লাগান, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টরের গোঁফের ডগা ইঁদুরে খাইয়াছে কি আরশুলায় খাইয়াছে—এই সমস্ত বিষয়ে উল্লাসকর গভীর গবেষণা করিত আর আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতাম। কিন্তু এই হাসি-পর্ব্বের পর যে একটা প্রকাণ্ড কান্না-পর্ব্ব আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝি নাই।

নরেন্দ্র গোস্বামীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা যাহা ভয় করিয়াছিলাম ফলে তাহাই হইল। বিচার আরম্ভ হইবার দুই চারি দিন পরেই সে সরকারী সাক্ষী হইয়া কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সাক্ষ্যের ফলে চারিদিকে নূতন নূতন খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল, আর পণ্ডিত হৃষীকেশের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত মারাঠী ও মাদ্রাজী নেতৃবৃন্দকে আবিষ্কার করিবার জন্য পুলীস চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

নরেন সরকারী সাক্ষী হইবার পরই তাহাকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া হাঁসপাতালে ইউরোপীয় প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল। পাছে কেহ তাহাকে আক্রমণ করে সেই ভয়ে জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া থাকিতেন। জেলার বেচারী একদিন বলিলেন—"দেখুন, আমার হয়েছে তালগাছের আড়াই হাত। তালগাছ সবটা চড়া যায়, কিন্তু

শেষ আড়াই হাত উঠবার সময় প্রাণটা বেরিয়ে যায়। এতদিন চাকরী করে এলুম, বেশ নির্ব্বিবাদে গেল। আর এই পেন্সন নেবার সময় আপনাদের হাতে গিয়ে পড়েছি। এখন মানে মানে আপনাদের বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।" কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস! তালগাছের শেষ আড়াই হাত আর তাঁহাকে চড়িতে হইল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের মোকদ্দমা সেসনে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আমরাও লম্বা ছুটি পাইলাম নিষ্কর্মার দল সকলেই, কাজেই সকলেই হাসে, খেলে, লাফালাফি করে, মোকদ্দমার ফলাফল লইয়া মাঝে মাঝে বিচার বিতর্কও হয়। ছেলেরা কাহাকেও বা ফাঁসিকাঠে চড়ায়, কাহাকেও বা খালাস দেয়। কানাইলাল একদিন বলিল —"খালাসের কথা ভুলে যাও, সব বিশ বৎসর করে কালাপানি।" শচীনের তাহাতে ঘোরতর আপত্তি। সে প্রমাণ করিতে বসিল যে বিশ বৎসরের মধ্যে দেশ মুক্ত হইবেই হইবে। কানাইলাল খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল "দেশ মুক্ত হোক আর না হোক, আমি হব। বিশ বৎসর জেলখাটা আমার পোষাবে না।" এই কথার দুই একদিন পরেই একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ পেটে হাত দিয়া শুইয়া পড়িয়া সে বলিল যে তাহার পেটে ভারি যন্ত্রণা হইতেছে। ডাক্তার বাবু আসিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি সে হাঁস-পাতালেই রহিয়া গেল। মেদিনীপুরের সত্যেনকে কিছু দিন পূর্ব্বে পুলিশ ধরিয়া আনিয়াছিল। কঠিন কাশরোগগ্রস্ত বলিয়া সেও হাঁসপাতালেই থাকিত।

কানাই হাঁসপাতালে যাইবার তিন চার দিন পরেই, একদিন সকালবেলা বিছানা হইতে উঠিয়া আমরা মুখ হাত ধুইতেছি, এমন সময় হাঁসপাতালের দিক হইতে দুই একটা বন্দুকের মত আওয়াজ শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম চারিদিক হইতে কয়েদী পাহারাওয়ালারা হাসপাতালের দিকে ছুটিতেছে। ব্যাপার কি? কেহ বলিল বাহির হইতে হাসপাতালের উপর গোলা পড়িতেছে, কেহ বলিল সিপাহিরা গুলি চালাইতেছে। হাসপাতালের একজন কম্পাউণ্ডার ঘুরপাক খাইতে খাইতে ছুটিয়া আসিয়া জেলের অফিসের কাছে শুইয়া পড়িল। ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে সংবাদ দিবার জন্য সে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহা তাহার পেটের মধ্যেই রহিয়া গেল। প্রায় দশ পনের মিনিট এইরূপ উৎকণ্ঠায় কাটিল, শেষে একটা পুরাণো চোর ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল :—

"নরেন গোঁসাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

"ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কি রে ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু, কানাই বাবু তাকে পিস্তল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ঐ দেখুন গে না—কারখানার সুমুখে সে একদম্ লম্বা হয়ে পড়েছে। আর জেলার বাবুর ত আর একটু হলে হয়ে যেত। তিনি কারখানায় ঢুকে পড়ে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে খুব প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।"

প্রায় পনের মিনিট পরে জেলের পাগলা ঘণ্টা (alarm bell) বাজিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে জেলের প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া হাঁসপাতালের দিকে চলিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম তাহারা কানাই ও সত্যেনকে ধরিয়া ৪৪ ডিগ্রীর দিকে লইয়া চলিয়াছে।

ডাক।

[শ্রীসরসীকান্ত দত্ত বি এ।]

আজ সত্য যদি ডাক দিয়েছ মোরে,
প্রভু কেমন করে রইব বল ঘরে ?
তোমার পাগল-করা বাঁশীর তানে
কি-যে মন্ত্র কেই-বা জানে ?
তপন তারা শশী পবন
সেই রাগিণী ধরছে ধ্যানে,
সেই পুলকে আছে ভরে।

ভুবন আমার পূর্ণ কর
ওহে ভুবন-ঈশ্বর
তোমার গানের রঙে রঙে
তুমি দয়াল শঙ্কর।
আমার ভাঙা গলার সব সাধনা,
ভাঙা ঘরের ভয় ভাবনা,
তোমার বাঁশীর আলো হাসি
দিক্ ভ'রে তায় রূপ চেতনা,
দিক্ জাগায়ে চরাচরে।

জাতীয়তা ও দেশ।

(অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়)

জগতের সমস্ত বিশ্বধর্ম্ম বা World-religionএর উদ্ভব এই এসিয়া মহাদেশ থেকে। খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম শাক্ত, শৈব, কনফুসীয়, পার্শী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক যাবতীয় ধর্ম্মের বিকাশ এই মহাদেশ থেকে। যখনই জীব-যুদ্ধে জাতি পিছিয়ে পড়েছে, তখনই মহাপুরুষের আবির্ভাব। মনে হয় যেন, এ দেশের আকাশে বাতাসে একটা অজ্ঞাত দুর্লভ মহাশক্তি জাগ্রত হয়ে আছে। দেশের ঐক্য এই ধর্ম্মবন্ধনের বজ্রশক্তির উপর নিহিত। পঞ্চম চার্লসের সময় যে Holy Roman Empireএর প্রভাব সমগ্র পাশ্চাত্য-জগতের উপর সামুদ্রিক বন্যার মত ব'য়ে গিছ্‌ল, তা যে ক্ষণিক ও চঞ্চল, সে কথা ঐতিহাসিকই ব'লে গেছেন। It was neither holy, nor Roman, nor Empire,—যে শক্তি থাকলে জাতির মধ্যে ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘভাবের স্ফুরণ হয়, তা এতে ছিল না।

জাতি জেগে উঠে কিসে? এই ধর্ম্মশক্তির বলে। সম্রাট্‌-হন্তা ম্যাক্‌বেথের বর্ম্ম-পরা সুপ্রশস্ত বুকের উপর সেই যে গোটাকতক ধাক্কা (Knocking) পড়েছিল, তাইতেই তার সুপ্তচৈতন্য জেগে উঠেছিল। আমাদের সুপ্তচৈতন্য জাগাতে হ'লে গভীর দামামা-ধ্বনির দরকার নেই, বক্তার গম্ভীর চীৎকার চাই না, নেতার পরিচালন প্রয়োজন নেই, কিংবা বাহ্য আন্দোলনেরও কোন মূল্য নেই; অন্তরের জিনিষকে জাগাতে হলে ভিতরে গিয়ে ডুব দিতে হবে। সেখানটা কেবলই তলহীন অনন্ত। এই ক্ষুদ্র মানুষটার ভিতর বিশ্বের পুঞ্জীভূত শক্তি সংহত হয়ে আছে। মন যখন আকুল হয়ে উঠে একটা অজ্ঞাত কিছু পাবার জন্য, তখন জগতের এই পরিদৃশ্যমান বস্তুগুলা প্রথমটা আমাদের চোখে খুবই বড় হয়ে উঠে। যে প্রেমিক প্রথম ভালবাসতে পেরেছে, সে বলে—'ঐ জ্যোতির্ম্ময় তারা, ঐ গন্ধাঢ্য কুসুম, ঐ বনান্তরগামী নদী, ঐ মূর্চ্ছনাভরা বাতাস, ঐ কুহকপূর্ণ সঙ্গীত—সবই আমার প্রিয়তমের প্রতিচ্ছবি।' প্রেমের এই আত্মবিস্মৃত অবস্থায় সে সেক্সপীয়রের ডিউকের মত 'Books in running brooks, Sermons in stones and good in everything' দেখতে পায়। ভিক্টর হিউগো'র গিলিয়াটের মত তুষারাবৃত দুরবিসর্পী পথে

প্রিয়তমা ডেরুশেটের (Deruchette) মোহন-নামটী নানাছলে, নানা ভঙ্গিমায় সে তখন লিখ্‌তে চায়। কিন্তু 'তাবৎ অলি গুঞ্জরে, যাই ফুল ধুতুরারে, যাবৎ ফুল মালতী নাহি জুটে।'—ভ্রমর ধুস্তুর কুসুমের কাছে গিয়ে কতক্ষণ গুন্‌গুন্ করে? না, যতক্ষণ মধুর মালতী ফুলের সে দেখা না পায়। ধর্ম্মের বিকাশেও এই একই কথা। ক্রমে ক্রমে দেহজগতের উপর আস্থা স্পৃহা ভাবটা মুছে আসে, চোখের পর্দ্দা সরে যায় আকাশের সব তারাগুলো চঞ্চলরশ্মির অঙ্গুলি চালনা কোরে' বলে—'ওকে, ওকে একে গো।' 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্?' যার দ্বারা অমৃত হতে পারবো না, তাকে নিয়ে করবো কি? সাধক তখন দারুণ অন্তর্জ্বালায় বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সে তখন আপনার ভিতরে আপনি ডুব দেয়। বাহিরে কি আছে? যে শক্তির বলে মানুষ বাহিরে এই সৌন্দর্য্যের ভরা হাট গড়ে তুলেছে তার পাপিয়াসনের ঠিকানা পাওয়া যাবে,—এই অস্থি-চর্ম্ম-মেদ-বসার অন্তঃস্থলে, বুকের ভিতর। তাই সাধক অতৃপ্ত উচ্ছ্বাসে গেয়ে উঠেন

'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ-রতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥'

মানুষ যখন তৃষ্ণায় বুক-ফাটা, ক্ষুধায় জর্জ্জর, বেদনায় মুমূর্ষু, হতাশে শক্তিহীন, তখন সে এমনি করে নিজের সঙ্গে মরণান্ত সংগ্রাম বাঁধিয়ে দেয়। দেশের লোকে বলে—'যেতে দাও, যেতে দাও, ও পাগল।' কিন্তু আমরা জানি, আসল পাগলামি দু'রকমের আছে। এক, fanaticism, যা Queen Mary বা ঔরঙ্গজেবের ছিল; দ্বিতীয়, যা সব সাধকের ভিতরই ছিল বা আছে। দুরন্ত আত্মসংগ্রামে মানুষ আপনাকে কেমন ক্ষত-বিক্ষত করে' তোলে, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আছে Carlyleর Sartor Resartusএর Everlasting yea ও Everlasting Nay নামক দুইটী সুবিখ্যাত পরিচ্ছেদে। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ নানা পরীক্ষা করে' পুঁথি ঘেটে স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছেছেন, যে, সেবার কাজে, সাধনায়, ধর্ম্মে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, যাঁরা মনীষা-সম্পন্ন, তাঁদের চরিত্রে স্বভাবের (normal nature) একটু ব্যত্যয় আছে। আত্মসর্ব্বস্বের পশুভাব তাঁদের মনে আসতেই পারে না। আত্মাকে জয় করেই তাঁদের যুদ্ধ শেষ হয়নি, পরকেও তাঁরা সেই জয়ের অভয়-মন্ত্র প্রদান করেছেন। তাই

যখন একটা সমগ্র জাতি ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ বারিধির মত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন কেউ তাকে আটকাতে পারে না, কেউই তার চাঞ্চল্যের কারণ বুঝতে পারে না, কেউই তার রোগের প্রতিকার করতে পারে না। দেহের ক্ষুধার শান্তির জন্ম বাইরে অনেক খাবার রয়েছে, কিন্তু অন্তরের স্বাস্থ্যকর ক্ষুধা মেটাবার মত ভোজ্যবস্তু বাইরে কোথায় মিলবে? অন্তরের ক্ষুধা মেটাতে হলে, অন্তরে গিয়েই ডুব দিতে হবে।

তাই জাতীয়তার মূলমন্ত্র ধর্মশক্তির উন্মেষ, ও দেশোদ্ধারের প্রকৃষ্ট পন্থা সেবা। এই সেবাধর্মের বিকাশ শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনে ভাল করেই আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। বিশ্বসুদ্ধ সকলেই আমার আপন, সমাজের মধ্যে যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ আমার উন্নতিই চরম উন্নতি নয়, নিজের ও সংসারের ভরণপোষণের অতিরিক্ত যা কিছু থাকে, তা আমার নয়—পরের,—এই ভাবই সেবাধর্ম। সমগ্র ভারত এখন গভীর যোগ-সাধনায় নিবিড় নিশীথে মহাশ্মশানে বসে আছে, শ্মশানবিহারী, মৃত্যুঞ্জয় শিবের প্রজ্ঞালাভ করবার জন্ম সকলেই 'নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' জেগে আছে, আকাশের সব তারা নিবে গেছে, জীবনের সব আশা চলে গেছে, আশার সব বাণী মিথ্যা হয়েছে,—তাই আমরা যোগস্থ হয়ে বসে আছি।

কিন্তু শুধু যোগস্থ হয়ে বসে থাকলে চলবে না,—আমাদের কাজ করতে হবে। আগে এই ভিতরের মানুষটীকে জাগিয়ে তুলতে হবে। শাস্ত্রমতে এই মানুষটী—

'সহস্রশীর্ষপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমি বিশ্বতো ব্যাপ্য অত্যোতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥'

তাঁর সহস্র মূর্দ্ধা, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ,—দশাঙ্গুল মাত্র পরিমাণে তিনি সমস্ত ভূমি, সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করে আছেন। সুখে যাঁকে দেখা যায় না, দুঃখে তাঁকে দেখতে হবে, সান্ত্বনায় যিনি অদৃশ্য—শোকে তাঁকে পেতে হবে, জীবনে যিনি অজ্ঞেয়—মরণে তাঁর অমৃত-বিষাণ 'মাভৈঃ' স্বরে বেজে উঠবে। সমস্ত কাজেই আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা আপনাকে ভাল করে চিনতে পারিনি। পরকেও আপনার করে' নিতে পারিনি। তাই কথায় ও কাজে এই সদর-মফস্বল বরাবরই থেকে গেছে। রাস্তা দিয়ে গলিতবাসে, দীননয়নে, শীতজর্জর দেহে ও কে যায়!—ও যে আমারই জন্ম-জন্মান্তরে বন্ধু। আমার টাকার সিন্দুকে আমারও যেমন অধিকার ওরও তেমনি অধিকার আছে।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এই ভাবটাই আগে উঠেছিল। তাই সমস্ত ইয়োরোপেও সেই ভাব সংক্রামিত হয়ে পড়েছিল। আসল কথা এই যে, নিজের ষোল আনা বুঝে পেলেই সব পাওয়া হলোনা, পরের পাওনা কতখানি আছে, তাও দেখতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা বলা বা লেখা যত সোজা, কাজে তত নয়। তাই আমাদের দেশের যাঁরা তথাকথিত প্রবুদ্ধ তীর্থোপম নেতা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেউ কেউ আত্মসর্ব্বস্ব হয়ে পড়ছেন।

বেদনার ভিতর দিয়ে যেটা শিখি, তা যে সহজে ভোলা যায় না। ভুলতে গেলেই যে ক্ষতের দিকে নজর পড়ে যায়। সহস্র সহস্র বছর ধরে এই দেশ, এই জাত নিদারুণ বেদনার মধ্য দিয়েই এগিয়ে এসেছে এতদূর। জীব-যুদ্ধে আমরা পিছিয়ে পড়েছি, নিজের জিনিষকে এত অবজ্ঞা অবহেলা করেছি যে পরে এসে তা সাদরে বরণ করে' না নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত তার কদর বুঝতে পারিনি, নিজের ভাষা, নিজের সাহিত্য, নিজের ইতিহাস-দর্শন,—তাও পরের হাতে ধোলাই বা চোলাই হয়ে না এলে তা আমাদের দেহে বা মুখে রোচে না। তাই এর ঔষধ কোন বাহ্য আড়ম্বরে নেই, এর ঔষধ নিজের ভিতর। আপনার ভিতরকার ঐ দশাঙ্গুলপ্রমাণ প্রাজ্ঞ মহাপুরুষটীকে সাধনবলে জাগিয়ে তুলতে হবে, সমস্ত বিশ্বের শক্তিকে নিজের মধ্যে সংহত করে নিতে হবে, আর শুদ্ধ সংযত, শান্ত, নির্ভীক, উদারকঠোর মুদ্রায় আসন পেতে, ঋজুদর্শিঃ সমক্ষে মহাযোগসাধনায় নিযুক্ত হয়ে ব্রহ্মণ্য-দেবতার কাছে ভগবান বুদ্ধদেবের মত অঙ্গীকার করতে হবে—

'ইহাসনে মে শুষ্যতু শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

মায়ের পরিচয়।

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী]

(১)

খোকা ডেকে শুধায় বাবাকে,
"মা ছিল সে কেমন ধারা বলো ;
দু'হাত দিয়ে বুকের মাঝে যে
ধরত আমায়, সে পাঁচ বছর হলো,
—সেই কি আমার -সেই কি বাবা মা ?
খুলে আমায় বুঝিয়ে বলো না।"
হাত বাড়িয়ে খোকায় ধ'রে ঝুঁকে
ব'ল্লো বাবা চাপা বেদন বুকে,—

(২)

মা তোর ছিল শরৎ কালের ঊষা
আকাশভূমে রাঙা আঁচল জোড়া
তুই ছিলি তার ছোট্ট রবিখানা
আলোয় ঘেরা সারা বুকটী পোরা
তোদের শিশির-আলোর মাখামাখি,
তোদের হাসি, তোদের ছল আঁখি
জড়িয়ে যেত আমার প্রাণের তলে ,—
নীরব পাওয়া সেই সে চোখের জলে।

(৩)

মা তোর ছিল ফাগুন হাওয়া খোকা,
শীতল তনু, গন্ধেতে আকুল ,
তুই ছিলি তার সকল-চাওয়া ওরে
মধু বনের ছোট্ট শাদা ফুল।

যখন তোরে চুমো দিত ঝুঁকে
তোর হাসি তার লাগত অধর মুখে .
তোদের বুকের গন্ধ মাখা বায়
বন্ধ যে মোর বেদন-ভাঙ্গা কায়।

(৪)

সে আমার যে ছিল খোকা ওরে,
চাঁদিম রাতের ময়লা-ধোয়া ধারা
লুকিয়ে যেতিস্ তুই যে তাহার কোলে
ফুটিয়ে তোলা একটুখানি তারা।
মা ছিল তোর বাদল-ঘন-ঝরা,
ঝরঝরাণি—তোরেই সবুজ করা।
তোদের খেলার ছিলাম দরশক,
তোদের রঙের নীরব উপাসক।

(৫)

মা তোমার যে ছিল খোকা শোন,
কলকলানি গাওয়া নদী খানি।
তুই যে ছিলি পাড-খানি তার খোকা,
সদাই চাওয়া তারই চুমের দানি।
বাণ যে হঠাৎ তাহার বুকে উঠে
ভিজিয়ে তোমায় কোথায় গেল ছুটে।
হেথায় শুধু রইলে প'ড়ে তুমি—
সুয্যিপোড়া মাওড়া বেলা ভূমি।

অতীত ও বর্ত্তমান নারী

[শ্রীসত্যবালা দেবী।]

যাঁহারা সমাজ সংস্কারক রূপে নারী-সমুন্নতীর প্রয়াসী তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিৎ যে গত এক শত বৎসর এই চেষ্টা সমানে চলিয়া আসিতেছে,এখনও প্রত্যক্ষ ফল কিছুই মিলে নাই। তাঁহাদের ভাবা উচিৎ যে অতীতের যে সমস্ত স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের তাঁহারা ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করিতেছেন, নারীজাতী এখনও সেই পণ্ডিতদেরই বিশ্বাস করে। অন্তঃসারশূন্য মূর্খ ব্রাহ্মণ তাঁহাদেরই ভেক ধরিয়া আসিয়া এখনও প্রতি অন্তঃপুরে সমানে আপন প্রাপ্য প্রণামী আদায় করিতেছে। তাঁহাদের চোখ মেলিয়ে দেখা উচিৎ, যে অগাধ জ্ঞান পাণ্ডিত্য যুক্তির সাহায্যে তাঁহারা কার্য্য করিতে চাহেন সেখানে তাহা একেবারেই প্রভাব বিস্তার করিতে অক্ষম।

আবার এদিকে যদি এই নিষ্ঠুর সত্যের আঘাত তাঁহাদের ক্ষীণপ্রাণ সঙ্কল্পটুকু টলাইয়া দিবার মত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া দিয়া বসে—সেও একটা সঙ্কট কিন্তু সে ভয়ে ভীত হইতে আমি সঙ্কুচিত। একটা পতিত জাতির উত্থান, একটা পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিকে জাগাইয়া অগ্রগামী করিয়া দেওয়া-এতো দুনীয়ার আদালতের মোকদ্দমা নহে যে তদ্বির তুষ্টি ভিন্ন গতি নাই। সমস্ত চেষ্টা সমস্ত কামনা ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে থাকাটাও আমি ক্ষতিকর বিবেচনা করি না। আমি জানি ভগবানের আসন টলিলে তবে এটা ঘটিয়া থাকে। আমি স্পষ্ট বলিতে পারি এখানে divine justice will work out, ভগবদ্ বিধান এখানে অমোঘ ভাবে ফলপ্রসূ, নারীকে পুরুষ চেষ্টা পূর্ব্বক অধীনতার শিকল পরাইয়া তাহার সমস্ত মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়াছে এ যদি সত্য হয়, তবে, প্রতিহিংসার পীড়নে পুরুষকে দিনে দিনে উন্মাদ হইয়া উঠিতে হইবে। আবার নারী যদি আপন স্বভাব দোষে এতটা অধঃপতিত হইয়াছে, ইহার জন্য কেহ দায়ী নহে,—এইটাই সত্য হয়, তবে, অবসাদে মৃতকল্প এই জাতিকে দিনে দিনে পিষ্ট হইতে হইতে অবশেষ পরিত্রাহি চীৎকার করিতে হইবে।

অবশ্য এখন সত্যকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে,—এখন আর বর্ত্তমান অবস্থা কাহার দোষে তাহা লইয়া কলহ করিবার সময় নাই। নারী-সমুন্নতির জন্য আমি প্রাণপণ করিয়াছি তজ্জন্য নাম কিনিবারও ইহা সময় নহে। এখন চাই

আন্তরিক চেষ্টা, চাই কেবল শক্তির প্রয়োগ, কিসে কাজ হয়,—কতটা কাজ হয়। তাহাই হইতেছে। কর্মী যাঁহারা তাঁহারা প্রিয় অপ্রিয় খুঁজিতেছেন না, খুঁজিতেছেন—সত্য। তাঁহাদের অন্তরটা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ভাগবত প্রেরণার উৎসাহাগ্নিতে। ভগবানেরই যে আসন টলিয়াছে।

কেন?—সে কথা বুঝা ত কঠিন নহে। এই যে কোটী কোটী দেব ঋষির বংশধর আজ পশুবৎ আবদ্ধ হইয়া পশুজীবন যাপন করিতেছেন—পরশুরাম ভীমার্জ্জুনের সেই বজ্রদৃঢ় স্নায়ুতন্ত্রী কালবশে বিকৃতি লভিয়া আজ বিলাস আলসে আবেশার্দ্র। সীতা দময়ন্তীর পাতিব্রত্য আজ আর্থিক মুখোপেক্ষার অধীনতা আর লোক নিন্দার সঙ্কোচ মাত্রে পর্য্যবসিত। আরো কি চান, এই যে যথেষ্ট। তাই ভগবানের আসন টলিয়াছে।

ঘরগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মানুষের আয়ু স্বাস্থ্য প্রভৃতির কথা চিন্তা করিলে আর যে চাহিয়া দেখা যায় না, চোখ ফাটিয়া জল আসে। তার উপর আর্থিক ও মানসিক অবস্থা আছে, চরিত্রগত আর একটা দিক আছে। যাহা হইয়াছে ইহারই ত নাম চরমে আসা, আরো অধিক কিসের প্রয়োজন?

সামাজিক ও সাংসারিক অবস্থার কথা কাহারও ত অবিদিত নাই। মেয়েদের ত্রুটীতে পুরুষের কত বৃত্তি পচিয়া উঠিতেছে, পুরুষদের ত্রুটীতে মেয়েদের কত বৃত্তি শুকাইয়া যাইতেছে সমস্ত ভাবিতে বসিলে কে না বুঝিতে পারিবে যে পরস্পর কর্ত্তব্য শৈথিল্যের পাপে আমরা আর জীবনকে জীবন রাখি নাই। আমরা আজ যন্ত্র, আমরা আজ বাহির ও অন্তরেন্দ্রিয়গুলি জীয়াইয়া রাখিবার যন্ত্রমাত্র। কোনও রূপে বিশ্বের বুকে প্রবাহটা বজায় রাখিয়া যাইতেছি, ঠিক অর্থমত বলিতে গেলে আমরা আর বাঁচিয়া নাই।

সকলেই বুঝে—সকলেরই বক্ষ-পঞ্জর ধসিয়া নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস বাহির হয়, কেমন নাকি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—একটানা জড় বেগে ছুটিয়া চলা, তাই আর কেহ দাঁড়াইয়া মোড় ফিরিতে পারিতেছে না।

এ সময়ে আজ আর উৎসাহ আবেগ সঙ্কল্প বড় কথা নয়—কোনও শ্রেণীর কোনও স্তরের মানুষেই তাহার অভাব নাই। আজ বড় কথা—চেয়ে দেখিবার কথা—সিদ্ধির পরিমাণ। কে কার্য্যতঃ কিছু করিয়াছে,—সত্য সত্যই কিছু পাইয়াছে। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে মনস্তত্ব হিসাব করিতে যদি বাঙ্গালীর হৃদয়ের গুপ্তগৃহের কপাটটা আজ খুলিয়া দেওয়া যায়, জগৎ বিস্মিত হইয়া দেখিবে সেখানে যাহা আছে বলিয়া সকলেই জানিত তাহার চিহ্ন মাত্র আর নাই। আজ সেখানে

সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ বিরাজিত। প্রাচীন প্রথার সে চাওয়া আজ পুরুষেরও আর নাই নারীরও নাই। সকলেই আজ নূতন জিনিষ চাহিতেছে। পরস্পরের কাছে নূতন দাবী আরম্ভ করিয়াছে। সে সমাজের সর্ব্বস্তরেই।

তাই সংস্কারকদের বলি, নারী-হিতৈষী কর্ম্মিগণকে বলি, দেশের অবস্থা অনেক বুঝলে বুঝাইলে, এবার একবার আপনাপন অবস্থা বুঝিয়া লহ বুঝাইয়া লহ।

আজ মেয়েদের দেখাও তোমরা কি? যে পুরুষের অবহেলায় তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি অকালে শুকাইয়া যায়—অথবা ফুটিতেই পায় না, যে আপন প্রয়োজনের বাহিরে আসিয়া তাহাদের কোনও সংস্রবের মধ্যেই থাকে না,—তোমরা সে পুরুষ নহ, তোমরা স্বতন্ত্র কিছু। পুরুষের স্পর্দ্ধা শৌর্য্য স্বাধীনতায় নারীর আশা আকাঙ্ক্ষা মিশাইয়া নূতন জীবন রচিয়া তাহাদের সম্মুখে ধর। শুধু উদারতা ও মহাপ্রাণতার পুঁটুলি হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।—তৎপর হও, সাহস দেখাও। জান না কি none but the brave deserve the Fair? এই সুপ্তিত আত্মার নৈতিক হিংসা ও মূর্চ্ছাগত জাতিকে জাগাইয়া পৃথিবীতে একটা সৌন্দর্য্য ও নূতন সমারোহ বসাইয়া দিবে—জীবনে একটা নূতন ভোগ ফিরাইয়া আনিবে, তাহার কি সাধনা নাই? তোমাদের যে একসঙ্গে কবি ও যোদ্ধা দুই-ই হইতে হইবে।

দোষ দেখাইতেছি না, একটা স্পষ্ট কথা বলিতে চাই। তোমরা বুকভরা হিতৈষণা না লইয়া মেয়েদের ত কখনও জোর দিয়া একটা কথাও বলিতে পার না। সব উড়ো উড়ো কথা। অথচ তোমরা চাও আমাদের মুক্তি উন্নতি দুর্দ্দশামোচন। যাহারা আমাদের বাঁধিয়াছিল, নষ্ট করিয়াছিল, পঙ্গু করিয়াছিল সেই দুরভিসন্ধি বুকে লইয়া তাহাদের বুকের পাটা কত। কি সপ্রতিভ জোর কথা!! সেই অত্যাচারীদের হাতের মুঠার ভিতর এমন করিয়া স্বর্গ নরক আসিতে পারিয়াছিল,—আর তোমরা ধর্ম্মপথে চলিয়া তোমাদের আসে না কেন?

তোমরা অবশ্য হাসিবে। বলিবে—বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা নারীর মুখে একি কথা? কি জান? Women are silly এ মজ্জাগত স্বভাব বা ধর্ম্ম যাইবার নয়। তার উপর আলোকপ্রাপ্তা কয়জনের দুঃখমোচনেই ত জাতিটাকে টানিয়া তোলা শেষ হয় না। যাহাদের তুলিলে জাত উঠিবে তাহারা ত এখনও গোময় মাদুলি তাবিজের স্তরেই পড়িয়া আছে। ওগো! যুগধর্ম্মের আহ্বান সেখানেও

একটা অপরিচিত অস্বস্তি জাগাইয়াছে। সেটার মর্ম্মগত ভাবটা ইংরাজি বা সাধু বাঙ্গলায় তর্জ্জমা করা হয় নাই। আর তারাও emancipatory ideaর ধারে ঘেঁসে নাই।

যদিও তারা অতীতের নারী, তুলসী তলায় পথের ধারের নুড়িটীতে মাথা কুটিয়া, গঙ্গাস্নান তীর্থস্নান পার্ব্বণস্নান সমস্তই করে, জেনো, অতীতের নিয়মে তারা জগদ্দল পাথর হইয়া বসিয়া নাই। যখন জীবনের পক্ষে জীবনোপায় অকিঞ্চিকর হইয়া পড়ে, চুপি চুপি তাহারাও প্রথার অদল বদল করিতে দ্বিরুক্তি করে না, মৃত-শাস্ত্র বিধির অপেক্ষা প্রাণের উপরই তাহাদের মমতা বেশী। তোমাদের স্বর যদি প্রাণের বীণায় বাঁধিয়া চড়াইয়া থাক স্বর সেখান পর্য্যন্ত পৌঁছবেই। মরণ রোধ যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, জীবনটাকে বেগবান করিয়া প্রকাশ করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তোমরা সেথায় বাধা পাইবে না। দেখিবে বটে তাহাদের হাতে সেই পুঁথি, যে পুঁথি বলে—মেয়েরা পিছাইয়া থাকুক, যে পুঁথি বলে, মেয়ে পুরুষে আকাশ পাতাল তফাৎ, কিন্তু সেটা সহ্য করিতে হইবে। সেই একই পুঁথিতেই যে আবার আছে মেয়েদের পীড়ন করিও না, কষ্ট দিয়ো না, সুখে রাখিও, তোমরা উঁচুতে থাকিয়া তাহাদের সকল অভাব মিটাইয়া যাও, সকল ভবনা ভাব। সেই পুঁথিতে তাহাদের শাসনও আছে আবার ক্ষমা করাও আছে।

এই কৃচ্ছ্রতা-পীড়িত বর্ত্তমানের চাপ তাহারাও তাহা বোঝে। তবুও অতীতকে আঁকড়িয়া আছে অতীতের মানুষকে তাহারা যে এতখানি বিশ্বাস করিতে প্যারিয়াছিল। তোমাদের উপর তাহাদের বিশ্বাস জন্মাও, তোমাদের পুঁথিই তখন সর্ব্বময় হইবে। তাহারা অতীতের পুঁথি তখন মুড়িয়া রাখিবে।

তোমরা অবশ্য অতীত আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে যে নারীরা সেই শ্রেণীর নারীদের কথা ছাটিয়া দিয়া নিরঙ্কুশ পথে চলিয়াছ, তোমরা গড়িয়া লইতে চাও বর্ত্তমানের নবনারী। তোমরা তৈয়ারী করিতেছ তোমাদের সাহিত্যের মতই সম্পূর্ণ তোমাদের নিজস্ব তোমাদের কল্পনায় নিখুঁত শিল্পবিশেষ, যারা প্রকৃতির অনুযায়ী গঠিত নয়। তোমাদের আদরের সীমার বাহিরে জগতে আর তাহাদের কোথাও স্থান নাই। কিন্তু এমন জীবন লইয়া জাতের কি উদ্যোগ সম্পন্ন হবে? মৃত্তিকার সংস্রবহীন আলোকলতায় উদ্যান ত সাজে না। এ কথা একবার ভাবিয়া দেখ

তাহার পর তোমাদের হাতে গড়া এই বর্তমান নারীরাই বা তোমাদের

মনের উপর রাজত্ব কতখানি? তাহাদের সম্বন্ধে মনোভাব প্রকাশের সময় নিঃসঙ্কোচে সেটা ত স্বীকার করিতে পার না যে তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনার পথে তাহাদের তোমরা ছাড়িয়া দিতে পার। তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছ কি, যে, জাতির একটা অন্ততঃ সামান্য ভারও তাহারা আপন ক্ষমতায় বহন করিতে পারে?' অতীতের যে সব বৃদ্ধ গৌরিক লইত তাহারা বলিত নারী নরকের দ্বার। তোমরা কখনও তা'বল নাই, বলিবেও না। তোমরা বল—নারীর মন দুর্ব্বল। নারীর ক্ষমতা অতি ক্ষীণ। জগতে বিপদের মুখে অন্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দাঁড়াইবার সামর্থ নারীর নাই।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় মেয়েদের জীবন যে ভাবে কাটিয়াছে—সে ভাবের দিন ফুরাইয়াছে, নূতন ভাবে তাহারা দিন কাটাইবে—নূতন জীবনের আস্বাদ করিবে। আমি অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিয়া একেবারে কারণের সন্ধান লইয়াই এ কথা জোর দিয়া বলিতেছি। মেয়েরা এবার নূতন হইবেই। ইহার ফল ভালও হইবে, কতক মন্দও হবে। তাহাদের অতীতের জীবনে যেমন ভালও ছিল—মন্দও ছিল। এখন তোমরা পুরুষ বলিয়া শক্তিমান বলিয়া এ জুলুমবাজি কেহই করিতে পার না, যে, আমি কেবল ভালটাই চাই অথবা মন্দ-টুকুর ভয়ে এ নূতনকে একেবারেই চাই না। অতীতের ভালটুকুর সঙ্গে মন্দ-টুকুকেও ত হজম করিতে হইয়াছে, বর্ত্তমানেও তাহাই হইবে। আর যাহারা মেয়েদের সাহায্য করিতে চাও—আগাইয়া দিতে চাও, তোমরাও পরিবর্ত্তনটা ঠিক্ যেমন ভাবে হইতেছে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে চল। পরিবর্ত্তনের দেশকাল প্রস্তুত—প্রকৃতির দুঃখের আঘাতের কটাহ টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে—পাত্র প্রস্তুতের জন্য। তোমরা, যাহারা আমাদের জন্য অন্তরে দৈবী করুণা অনুভব করিয়া থাক, অতীতের প্রথায় জীবনের অসম্পূর্ণতা বুঝিতে পারিয়াছ, তারাই এই অগ্নির জ্বালে চড়িয়াছ,—তোমাদেরই ভগবান পাত্র রূপে প্রস্তুত করিতেছেন।

সেই তোমাদেরই বিশেষ ভাবে বলিতেছি জ্বাল যত খর হইবে—তোমাদের বুদ্ধি মতলবের জলটুকুই তত মরিয়া আসিতে থাকিবে। তলায় পড়িবে—জ্ঞান, প্রেম। তখন তোমরাও বুঝিবে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যরা মানুষ হিসাবে মন্দ লোক ছিলেন না। তাঁহাদের সম্মুখে যেমন দেশকাল ছিল, তাঁহারা তাহারই উপযুক্ত পাত্র; অধিকন্তু তাঁহাদের বিশাল হৃদয় ছিল যাহার রসে তাঁহারা মেয়ে-দের অভিভূত করিতে পারিয়াছিলেন। তোমাদের মধ্যেও আজ সেইটাই চাই।

তাহার পর শরীরের বলে কাহাকেও যেমন্ পোষ মানান যায় না তেমনি শুধু মনের বলেও চলে না। মনও জড়। সূক্ষ্ম জড়। সুতরাং মেয়েদের জন্ম নবযুগের পাঁতি দেওয়া কেবল মাথা খাটানর কাজ নয়। তাহাদের নূতনের পথে ছুটাইয়া লইয়া যাওয়া কেবল মানসিক তীক্ষ্ণতার কাজ নয়। আরো বেশী কিছু চাই। কি চাই জান? আত্ম সমর্পণ। আত্মাকে মুক্তির পরপার হইতে ফিরিয়া আসিয়া নূতনের নববন্ধন জীবন বন্ধন পরাইতে ইহাদেরই মধ্যে বাঁধা পড়িতে হইবে।

বদন-ভঙ্গি।

(দরবেশ।)

বাদল দিনের মাদল যখন উঠ্‌লো বেজে গগনে,
আমি তখন ঘরের মাঝে বেজায় চিন্তা মগনে।
আকাশ-সভার বৈঠকেতে ছুট্‌লো বে সুর সঙ্গীতে,
অপ্সরারা তালে তালে নাচ্‌ছে কতই ভঙ্গিতে,
কণ্ঠহারের পান্নাখানি ঝিলিক্ মারে হামেশা,
ওস্তাদিতে মস্ত চতুর,—ওযে ওদের নিজ্ পেশা।
উতাল বাতাস মাতাল হয়ে ঢলাঢলির চূড়ান্ত,
ফুলেরা সব পড়্‌লো ঝরে, সকল মধু বাড়ন্ত।
স্বর্গে যখন হানাহানি বাদল দিনের যাজনে,
আমি তখন মত্ত আছি সূক্ষ্ম তত্ত্ব গাজনে।
চট্ করে' ভাই, বুঝে নিলাম, সৃষ্টিকর্ত্তা নয় চতুর,
আমাদের এই মুখের সাম্‌নে কারই কেন নাই মুকুর।
থাকতো যদি এক-একখানা আয়না বাঁধা সম্মুখে,
নিত্য যত ভঙ্গি করি, কর্‌তেম রে তা' কোন্ মুখে?
অনেক বাঁচন বেঁচে যেতাম প্রাত্যহিকের ব্যাপারে,
অনাবশ্বক ঘটছে যত, ঘটতে কি আর তা' পারে?
থাকতো যদি চোখের সাম্‌নে বদন-দেখা আর্শিখান,
ঘুচে যেতো ঔদ্ধত্য করে' ওস্তাদিতে সুর শিখান।

বদন-ভঙ্গি।

মুখটি বেঁকে মুণ্ডু নেড়ে, নিজের হাতে ধরে' কান,
পারতেম কি রে তোয়াজ করে' ফু'লিয়ে গলা দিতে টান?
আপন চোখে দেখে তখন আপনারই এই বদন-চাঁদ,
আপনা হতে ছিঁড়ে যেতো তানপুরার ঐ সুরের বাঁধ।
ফুরিয়ে যেতো গাহেন-গাওয়া আসর করে সর-গরম,
মজলিসের ঐ এজলাসেতে চাকরী হতো শেষ খতম।
এম্‌নি ধারা মেঘলা রাতে আগল-দেওয়া কুটীরে,
কোমল বাহুর আড়ে যখন সোহাগ ওঠে ফুটি রে,
আধো আধো গদ গদ কতই ভাবের মহড়া,
গাল-ফুলান ঠোঁটের কোণে প্রেমের খাড়া পাহারা,
অকারণের কাজে যত বহ্বারম্ভের অভিমান,
সকল যেতো বিফল হয়ে থাক্‌তো যদি আর্শিখান।
নাকি-কাঁদন-ধোয়া বদন ঝিলিক্ দিতো নয়নে,
বেজায় বাধা পড়ে' যেতো প্রণয় সোহাগ চয়নে।
ধর, যখন তুমি-আমি বসে' আছি অ-কাজে,
এম্‌নি ধারা বাদ্‌লা দিনে আকাশ-জোড়া ঝাঁঝ বাজে,
আত্মতত্ত্বের গভীর সত্য ভাব্‌ছি দিয়ে গোঁপে তা,
স্বয়ং আমার কি মহত্ত্ব!—হচ্ছে সে সব বারতা,
রাজা-বাদ্‌সা মেরে দিয়ে উজীর সুরু করেছি,
রাজ-কন্যার বর-মাল্য স্বয়ং গলায় পরেছি,
ফুরিয়ে যেতো ফষ্টি তখন—বিকট রসের রঙ্গিমা,
দর্পনেতে দেখ্‌তে পেলে আপন ভুরু-ভঙ্গিমা।
আকাশের ঐ গুরু-গম্ভীর ডম্বুরাটির ধরণে,
আমি যখন ছাড়ছি নিনাদ কর্ত্তা-গিরির করণে,
দাঁত-খামাটী, চোখ্-রাঙানী, দন্তে দন্তে ঘর্ষণে,
গিন্নী যখন আছেন শুধু তপ্ত বারি বর্ষণে,
চাকর-বাকর ত্রস্ত-ব্যস্ত দেখে আমার ভিরকুটি,
চক্ষু যখন মাতাল হয়ে ললাট পরে যায় উঠি,
মেঘের মতন বেজায় আওয়াজ, ঝড়ের মতন হয় কোঁদন,
রগড় হতো তখন যদি দেখতে পেতাম নিজ্ বদন।

এম্‌নি তর সকল কাজে সকাল সাঁঝের ব্যাপারে,
অনেক রাস্তা কমে' যেতো জীবন পথের সফরে।
অনেক বাবত অনেক কার্য্য জবাব দিতো চাকরী,
চিত্ত তখন বাহির ছেড়ে থাক্‌তো ভিতর আঁকড়ি।
ফুরিয়ে যেতো হানাহানি কানাকানি গোপনে,
চিন্তা হতো গররাজি ভাই, অলীক স্বপন বপনে।
তাইতো বলি, বিধির এবার হয়ে গেছে মস্ত চুক্,
আর্শি বিনা আমরা সবে দেখতে পাই না আপন মুখ।

এক ঢেবুয়া।

[শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

গরীবের ঘরে জন্মেছিল ছেলেটী—বেচারী ছিল জন্মদুঃখী। পড়শী তাদের জমাদারের বউ টাটুকা টাটুকা ভাতের মাড় আর কচিৎ বা কাঁচ্চাটাক ছাগলের দুধ সলতে করে চুষিয়ে মা-বাপ-হারা, একরত্তি একলা সে দুমাসেরটুকুকে বাঁচিয়েছিল। তারো আর কেউ ছিল না—আলাই বালাই আপন কি দোস্‌রা। গতর খাটিয়ে, ঘুঁটে কুড়িয়ে, গম পিষে দিনান্তের দু ঢেবুয়া যা জমাদারণীর রোজগার হতো তাই নিঃশেষে খরচ করে আন-আগুনের বাবুয়া —এইটিকে আপন বুকের আনন্দের মত মমতায় মমতায় বাড়িয়ে তুল্‌লো। পালা ছেলে তার এখন ভোর বিহানে আপনি উঠে ছাগলটাকে বার করে মাঠে নিয়ে খোটা পুঁতে দিয়ে আসে, রোদ্দুরে ছড়িয়ে দেওয়া ঘুঁটে কুচি ঝাড়া করে ঝুড়িতে কুড়িয়ে তুলে মাইয়ার হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—বাজার থেকে গমের দুটো টুক্‌রীর ছোটটী মাথায় ব'য়ে বাড়ী নিয়ে আসে, জমাদারণী, সন্ধ্যেটাতে রোজ ভুজা ভাত ছাতু রোটী যা জোটে খাইয়ে খেয়ে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমোয়।

কাঙালের ছেলের এমন করে দিন কাটবে—তা কি দেবতার সয়! চট করে তিনি মৃত্যুর পরোয়ানা জারি দিতে যমের দূতকে পাঠিয়ে দিলেন—তিন দিনের জরেই বুড়ীয়ার দুনিয়ার দিক্‌দারী মিটে গেল।

অনাথ ছেলেকে আশ্রয় দিতে আজ আর কেউ ঘরে ডেকে নিলে না। এক মুঠো মকই কি চানাও তো হতভাগার কপালে জুটলো না আজ। সারাদিন উঠোনটীতে প'ড়ে প'ড়ে আছাড়ি পিছাড়ি ক'রে সে কাঁদলো। সন্ধ্যেটীতে আজ কুঁড়ের কোণে টিনের ডিবিয়াটী আর কে জেলে দেবে, অন্ধকারের ভেতরে চালার মেজেয় লুটিয়ে প'ড়ে 'মাইয়া গে, এ মাইয়া' বলে সে কি তার কলিজা-কাটা ছাতিফাটা কান্নাকাটী। অনেকক্ষণ এমনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শেষকালে ঘুমিয়ে পড়লো।

পেটের "ক্ষিদে" মনের ব্যথায় ভুলে থাক্‌তে পারে আর কদিন? তাও এই শিশু। তিন দিনের দিন সকালে সে উঠোনের বাইরে এসে দাঁড়ালো, পা টল্‌ছিল—পারলে না খাড়া থাক্‌তে, ভুঁইএর ওপর লুটিয়ে প'লো। জগ্‌মোহন তার টোকনী পুরে মকইএর খই নিয়ে খেতে খেতে চলেছিল—গঁহু-ক্ষেতে। ডেকে তাকে একগাল ভুজা যে চেয়ে নেবে তাও বেচারী পারলে না—ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছলো—ভাষা কি কথা ফুটছিল না মুখে। অনেকক্ষণ ঐ টোক্‌নীর পানে বসে-যাওয়া দুটো চোখের মৌন মিনতি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে শীর্ণ দু'খানা হাতে সেই কালি কিষ্টি নেংটী খানার আধ-ঝোলা আঁচল-টাকে বাড়িয়ে ধর্‌লে। জগমোহনা ব'ল্‌লে, "ভাগ্‌-বুড়্‌বগ্‌।"

ক্ষুধার্তের অভিমান আঘাত লেগে টাটিয়ে উঠে চোখফাটা জলের ধারা শুকিয়ে সিঁটুকে লাগা গালের দুধারি ধরে নহর ব'য়ে গড়িয়ে এলো—কিন্তু চেঁচিয়ে কাঁদতেও পার্‌লে না বেচারী—কণ্ঠে বল নেই।

আপন মনে ব'য়ে ব'য়ে বেলা তার দিন-হাজিরার পাকা খাতার পাতায় পাতায় সকল নিকাশ ঠিকঠিক নাবিয়ে দিয়ে এগিয়ে চ'ল্‌লো—ক্ষুধাহতের পেটের শুরু তাগিদও সঙ্গে সঙ্গে বিষম হ'য়ে নেহাৎ হ'য়ে বেড়ে উঠ্‌লো—কোথায় কি পায় আশাহীন, নিরুপায় পেটের তার এই দাউ দাউ ক'রে জ'লে-ওঠা তীব্র জ্বালা মেটাতে প্রয়োজনে অগত্যা উপায় আবিষ্কার হ'লো—চিনিয়ার চাচীর কাছে মেঙে—দুমুঠো ভাত তার সেদিন মিল্‌লো। তারপর থেকে রোজই "ফজিরে" বেরিয়ে "সাম" যখন ঝাকড়া গাছ পা।র তলায় তলায় কালো হ'য়ে আস্‌তো—ছেলেটী তখন বাড়ী ফির্‌তো—ঐ কুঁড়েখানার দোরে। বারো বাড়ীর সাত মিশালী চাল, বুড়িয়ার ছেড়ে যাওয়া দুশো তালির ধারিটাকা মোটা সূঁচের তাগর সেলাইয়ে সেলাইয়ে কাঁথার মত সে লুগাখানার কোনায় বেঁধে। কিন্তু আগুন জেলে হাঁড়িতে চাপিয়ে

ভাত ফুটিয়ে নিতে তো সে জান্‌তো না—কাঁচা চালই চিবিয়ে খেয়ে ঢকর ঢকর ক'রে এক লোটা জল গিলে একলাটী প'ড়ে থাক্‌তো জমিনে ছেঁড়া চেটাইএর ওপর ভাঙা চালাখানার নীচে। একদিন কি হ'ল—কাল বৈশাখী করাল হ'য়ে এসে দমকা ধাক্কায় ঐ চালা খানিও ফেলে দিয়ে গেল—শিশিরে স্যাৎসেতেই শ্যাওলা ধ'রে ধ'রে ঝুরি হ'য়ে সে চালার শেষ যা ছিল খড় খুঁটি মাটী হ'য়ে গেল। একেই বলে বুঝি একান্ত নিরাশ্রয়। পাতা-ঝাঁকড়া আম গাছটার নীচে প'ড়ে থেকেই এবার নিরাশ্রয়ের রাত্তির কাটুতে লাগ্‌লো। ঝড় যেদিন দিগন্ত ঝাপ্‌সা ক'রে বিদ্রোহীর মত অসংযত আস্ফালনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আস্‌তো—ছেলেটা প্রাণপণে তার সরু গলায়—"মাইয়া গে, এ মাইয়া" ব'লে একবার চীৎকার ক'রে উঠে গাছের গুঁড়িটার আড়ালে স'রে গিয়ে বস্‌তো—তারপর বাদল যখন নেহাৎই পাগল হ'য়ে ঢলে ধারে নেবে আস্‌তো নিরুপায় তখন দৌড়ে গিয়ে মীনা মসজিদের ছাদের নীচে মাথা গুঁজে দাঁড়াতো। জল ছাড়্‌লে আবার ফিরে আস্‌তো-গাছতলায়—নয়ত ঐখানেই রাত্তির কাটাতো কোনো মতে কাত হয়ে ভয়ে ভয়ে—কি জানি যদি মসজিদের মুল্লী জান্‌তে পেরে ঘাড় ধ'রে তাড়িয়ে দে'য়।

এমনি ক'রে শীত এসে তুহিন হেনে তার ত্বকে ত্বকে শিউরে উঠ্‌লো। বুড়ীয়ার ফেলে যাওয়া যা ছিল লুগা কুর্ত্তা সে সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে শেষ হ'য়ে গেছে। কি ক'রে আর পারে হতভাগা এই হিমে পড়ে মেঙে খেয়ে? কিন্তু উপায় ও তো আর কিছু নেই—কেউই যে নেই তার দিন দুনিয়ায়। আহা! যদি কিছু উপায় থাক্‌তো মাইয়ার কাছে যাবার, তবে ছুটে যেতো সে এক দমে মুখ বুঁজে—মাইয়ার কোলখানার ভেতর গিয়ে প'ড়্‌তো মাথা গুঁজে। কিন্তু কি করে কোথায় যে সে চ'লে গেল—শিশু যে আজ ভাল করে তাও বোঝে না।

হাওয়া বুঝি সেদিন বরফের টুক্‌রো ভেঙে ভেঙে নিশ্বাসে নিশ্বাসে তার হিমানী বৃষ্টি ক'র্‌ছিল। রাস্তার পাশে গাছ তলায় গরুর গাড়ীর চাকায় লোহা আঁটা মিস্ত্রীরা আগুন জেলে সেঁকে সেঁকে চাকার তাদের বহর বাড়িয়ে নিয়েছিল—জায়গাটা তখনো ছিল আঁচে আঁচে গরম। ছেলেটা আর পারছিল না—কন ক'নে শীতের ভেতর ঠির ঠির ক'রে কাঁপছিল—ছুটে এসে গাছটার তলায় দাঁড়ালো—পায়ে-গায়ে যদি বা একটু তাপ লাগে। নোংরা তার নেংটীখানা কোনো মতে গুঁজে রেখেছে—উদ্‌লো গা পিঠ এ

ভিখিরীকে কে আর এক টুক্‌রো নেক্‌ড়া দেবে—এই শীতে পিঠখানা তার ঢেকে বাঁচাতে? ঐ আগুনের গরমে কি আর অমন সে শীত কমে—হাতের ওপর হাত আড়া আড়ি ক'রে বুকের উপর যোড়া হাতের শক্ত চাপ চেপে চেপে বুকের হিমটা কমিয়ে নিতে চাইছিল—কিন্তু সে হিম কি কম্‌বার!—পাগলের মত সে মরিয়া হ'য়ে রাস্তার পাশ দিয়েই তিন চারবার ছুটাছুটি ক'রে এসে আবার গাছতলায় দাঁড়ালো। এবার গাটা একটু গরম লাগলো বটে কিন্তু পা দুখানা তার মনে হ'ল বুঝি খ'সে গেল। এদিকে পেটে ক্ষিধে—মাথা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে, কানের ভেতব বুঝি লাখো হাজার ঝিঁ ঝিঁ পোকা এক সঙ্গে ডাকতে আরম্ভ ক'রেছে। খানিকটা অসাড়ের মতন নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল—গাছ তলায়,—"ক্ষিধের" কষ্টটা এইবার বড় ভারী হ'য়ে—বিষম হ'য়ে লাগলো—সঙ্গে সঙ্গে শীত—কাঁপুনির ওপর কাঁপুনি কাঁপিয়ে ছেলেটার দেহের উপর দিয়ে কম্পনেরই বুঝি একটা তড়িৎ তরঙ্গ তরতরিয়ে তুললো।

রাস্তা দিয়ে একটী বাবু যাচ্ছিলেন—ষ্টেসনে গাড়ী ধ'র্‌তে বুঝি। পশমিনা পায়জামার উপর কোঁচা কোঁচানো মিহি ধুতি তিনি প'রেছেন। গায় ছাটা তিনটে খাটো খোটো জামার ওপর ফ্লানেলের কামিজটার ঝুল ঝুলিয়ে দিয়ে প্রায় দেড় ইঞ্চি পুরু টুইলের শিকার-কোট টাইট করে লাগিয়েছেন—ঘাড়ের ওপর শালখানা ভাঁজ ক'রে ফেলা আছে, বাঁহাতের ওপর দিয়ে আন্ধেকটা জামা ঝুলিয়ে নামিয়ে দিয়ে বিলিতী কারিকরের কাটা চেকনাই-চমকানো চেষ্টারফিল্ড ব'য়ে চলেছেন—গায় দিতে হবে রাত্তিরে বড্ড শীত। বাঁহাতে কোঁচা আর ছড়িখানা। দেখে ছেলেটার ভরসা হ'ল, তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে—না খেয়ে না খেয়ে সেই কান্নার মত ক্যানকেনে মিহি তার স্বরে ব'ললে,—"বাবু একটা পয়সা—একটা পয়সা দিন্ না বাবু"। একবার বাঁচোখের বাঁকা ভুরুটীকে কুঁচিয়ে কুঁচকিয়ে এনে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে—বাবু ব'ললেন,—"যা যা, পয়সা পথে প'ড়ে থাকে আর কি।" হতাশ হ'য়ে বেচারী ফিরে এল গাছ তলাটীতে—রাস্তার চেয়ে গাছের নীচেটা বুঝি তবু একটু গরম।

পেছনেই একটী ঠাকরুণ যাচ্ছিলেন পুরু রূপোর পরতে ক'রে খাবার সাজিয়ে দাসীর মাথায় দিয়ে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে দেবীর ভোগ দিতে। তাঁর দোরে ধন্না দিয়ে ছেলের পাশের জন্ত মায়ের প্রসাদ মেগে পূজোর

নির্ম্মাল্য মাথায় ক'রে নিয়ে আসবেন—হতভাগাটা দেখেই ব'লে উঠ্‌লো—"এক মুঠো খাবার দে-মা,—সারাদিন কিছু খাইনি—"

"কোথাকার হতচ্ছাড়া গো মা—স'রে আসুন সরে আসুন গা গিন্নি ঠাকরুণ"—ব'লে দাসী তার মনিবাণীকে সাবধান ক'র্‌লে—খবরদারিতে হুঁস হ'লে—গিন্নি লম্বা পাখানা লাফানোর মতন ক'রে হেঁচকা হেঁচড়ে টেনে ফেলে সরিয়ে এনে ব'ল্লেন,—"ওমা,—ছুঁ'বি—ছুঁ'বি—সর্‌ সর্‌"—।

কঙ্কালসার হাতখানা তুলে ক্ষুধার্ত্ত হতভাগা তার চোখের কোনাটা মুছে নিয়ে সরে দাঁড়ালো। বুকের স্পন্দনটা ভাল ক'রে না ক'র্‌তেই সোঁ ক'রে একখানা মোটর এসে ঐখানটাতেই ঠিক থাম্‌লো·· ঐখান থেকে গাড়ী খানা ঘুরিয়ে ·বাঁদিকের রাস্তায় যেতে হবে। ভিখিরীর কি লজ্জা অভিমান আছে,—সে অম্‌নি দৌড়ে গিয়ে মোটরের পাদানি ঘেঁসে দাঁড়িয়ে হাত পাত্‌লে—"এক ঢেবুয়া—বড়া সাহেব, ভরদিন কুছ খায়া নেহি"—

সাহেব হীরা বসানো আংটী-আঁটা আঙ্‌লটা তুলে রাস্তার পাশটা দেখিয়ে দিতে দিতে গন্ধমাখা রুমালখানা বার ক'রে তাড়াতাড়ি নাক ঢাক্‌লেন—সোফার চাকাটা ঘুরিয়ে দিতেই ঝাঁ ক'রে একটা "স্পার্ক" দিয়ে মোটার সাঁৎ করে বাঁদিকের রাস্তায় ছুটে চ'ললো—। একজন ইস্কুল মাষ্টার আস্‌ছিলেন—তাঁর বাঁ বগলে একরাশ খাতা তার সঙ্গে লম্বালম্বি ক'রে চেপে ধরা আধ-ছেঁড়া ছাতিটী—ডান হাতে একখান৷ নেকড়ায় বাধা আলু, বেগুন মাছ তরকারী লাউএর ছুটো ডগা নেকড়ার কোণা দিয়ে লম্বালম্বি বেরিয়ে ঝুলে নেবেছিল—ইস্কুল থেকে ফের্‌বার বেলা বাজার ক'রেই আস্‌ছিলেন—তিনি দূর থেকেই প'ড়তে প'ড়তে আস্‌ছিলেন—ঐ মোটারখানার পিছনে মস্ত প্ল্যাকার্ডের ওপর বড় বড় হরফে স্পষ্ট ক'রে লেখা ছিল—"মিষ্টার চাউড়ুরীকে ভোট দিন। দীনের দুঃখ বারণ করিবার জন্ত, নিরন্নের অন্ন সংস্থানের জন্ত স্বদেশের সকল শ্রীবৃদ্ধির জন্ত জননী জন্মভূমির কৃতী-সন্তান প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি মিঃ চাউড়ুরীর শাসন সংস্কার কৌন্সিলে প্রথম আলোচনার বিষয় হইবে—গ্রাডুয়েট শিক্ষকগণ মিঃ চাউড়ুরীকে ভোট দিন"—! মাষ্টার মশায় মনে মনে ঠিক ক'রে গেলেন—যে তাঁর ভোট রিজার্ভড রাখবেন না, মিঃ চাউড়ুরীকেই দেবেন।—

একটা পাকা সিগারেট-খোর বকাটে ছেলে যাচ্ছিল মাষ্টার মশাইএর সঙ্গে সঙ্গেই—সে নাকটা একটু টেনে টুনে একটা কিসের গন্ধ বেশ অনুভব

ক'রে নিয়ে মনে মনে বললে, "কোথায় থেকে আস্‌ছেরে গন্ধটা? খাঁটী ওয়েষ্ট মিনিষ্টার টুবাকোর মস্‌গুল গন্ধ যে—ওঃ—ওখানা মিঃ চাউডুরীর মোটর না? —হ্যাঁ মোটর থেকেই গন্ধটা এসেছে—তাইত বলি—আর কে এখানে ও সিগারেট খাবে,—"

এমন সময় আবার একখানা ঘোড়ার গাড়ী—ছুটে এলো তারও গায় লম্বা কাগজ আঁটা—লেখা আছে "মি চাউডুরী দেশের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন—মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ চাউডুরীকে ভোট দিন।"

হতভাগাটা উঁকী মেরে দেখতে যাচ্ছিল গাড়ীর ভেতর কে আছে— কোচম্যান সপাং ক'রে একটা চাবুক ক'সে দিয়ে ব'ললে—"হঠ যাও, উল্লুক" আর গাড়ীর ভেতর থেকে বড় বাবু থু ক'রে খানিকটা থু থু ফেললেন বাতাসে উড়ে এসে তা প'ড়লো ঐ বেচারীর মুখে চোখে।

দুটী সহুরে তরুণ যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে কূটতর্ক বিরাট রকম জমাট ক'রে দস্তুর মত হল্লা ক'র্তে ক'র্তে। তারা দেশের নতুন ডাকে জেগেছে—শুধু তর্ক করতে, বুদ্ধির ছকা নক্‌শায় তাদের অগাধ বিশ্বাস। একজন বল্‌ছিল :—

"বড় গলায় যে চেঁচাচ্ছো Non Co-operation, কিন্তু ভেবে দেখেছ একবার যে সেটা ফাঁকা কি নিরেট? কতকগুলো বয়াটে ছেলের হৈ চৈ— হুজুগে মাতোয়ারা হ'য়ে খুব নাচানাচিটাই আরম্ভ ক'রেছ।"

অন্য ছেলেটী বল্লে—"সে সব ভেবে দেখবার এখন সময়ও নেই, দরকারো কিছু আছে ব'লে মনে হয় না—দেশ মাতৃকার অন্তরের এ ডাক—সাড়া পেয়েছি—নাচানাচিই বল আর ছেলেখেলাই হ'ক প্রত্যেক সন্তানকে মায়ের ডাকে যোগ দিতেই হবে।"

"তা' দিলে ত বাঁচি, কিন্তু গান্ধী বা দাশের মত সবাই দিই কই? তুমি আমি ত দিই নি। যারা কাজে নেমেছে তারা ত তবু একটা কিছু করছে। কিন্তু যারা গান্ধীর আদর্শ মুখে বলছে কিন্তু কাজে করতে পারে নি তারা?'

ছোকরার সঙ্গীটী এবার হো হো ক'রে হেসে উঠে ব'ল্‌লো—"ওঃ—এ তোমাদের Logicএর দোহা লকড়-বন্দী যুক্তি-তর্ক Deliberation? দেশের ডাকে Lagicএর জায়গা নেই হে"—

ভিক্ষুক হতভাগাটা এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে গাছতলাটীতে ঠির ঠিরিয়ে কাঁপ্‌ছিল, সন্ধ্যেও তো প্রায় এল—তার কাজল আঁচল দুনিয়ার বুকের ওপরে টেনে টেনে বিছিয়ে বাড়িয়ে নিয়ে আঁধার ঘন হ'য়ে গাছের নীচে জমাট

বেঁধে গুমোট লেগে উঠ্‌বে যখন কি হবে আর তখনো ঐ পথিকহীন বিজন বাটের ধারে দাঁড়িয়ে ভিখিরীর হতাশায়; তাই হতভাগা ফেরার পথে পা বাড়াতেই অন্তমনস্কে পড়া একটা মরম-টোটা, কলিজা-কাটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে শুক্‌নো কাঠের মত ঠোঁট দুখানার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল—"মাইয়া গে—এ মাইয়া।" নিজের মনে যারা তর্কের ঝোঁকে চেঁচিয়েই চ'লেছিল তাদের দ্বিতীয় ছেলেটী বন্ধুর কথায় এবার বিলক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে উত্তর দিলে—"দেখ্‌বে তোমরা—আমাদের এই ধ্বংসের ওপরেই আকার পাবে একটা বিরাট—গ'ড়ে উঠ্‌বে একটা স্বর্গ ·ওপর থেকে নেবে আস্‌বে—এই নিপীড়িত দেশের জন্ত চিরন্তন কল্যাণ। দেশ আজ এই ধ্বংসই চাইছেন···সেই মাতৃ পূজায় নৈবেদ্যের মত এই তরুণ প্রাণগুলো—তাদের যত কিছু সুখ দুঃখ, যা কিছু বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সব উৎসর্গ ক'র্‌তে হবে"—

এমন সময় শীতার্ত্ত সে হতভাগার ক্ষুধা-শীর্ণ, কঙ্কালসার কণ্ঠে তার এই দীর্ঘ দিনটা-ভরা "দাও দাও" চাওয়ার ব্যাকুল কাকুতি ব্যর্থ হ'য়ে বেড়ে ওঠা একটা ব্যথা আর্ত্তনাদে আড়ষ্ট হয়ে জড়িয়ে গিয়ে—অস্পষ্ট, শীর্ণ একটা স্বরে শুধু বেরিয়ে এল বাষ্পজড়িত হ'য়ে—"মে-এ-এ-ই-য়া-য়া"—এই কথাটায়।

ছেলে দুজন এবার কাছাকাছি হ'য়ে পড়েছিল—চকিতে চ'মকে উঠে ব'ললো :—"কিরে ?"

এবার ফিরে যাচ্ছিল হতভাগা তার-আবরণ-আচ্ছাদন-হীন, নীল-আকাশের নীচে নগ্ন আশ্রয়—ঐ বুড়ীমার বাড়ীর হিমে ভেজা ভুঁইটুকুর পানে হতাশায়। ভাবছিল—স্যাৎসেঁতে সেই গাছতলায় মাটীটুকু আঁকড়ে প'ড়ে শীতের সমস্ত রাতটা ক্ষুধায় কোঁতে, শিউরে শুকিয়েই কাটাতে হবে আজ; ঐ "কিরে" তার কানে গিয়ে সে ফিরে দাঁড়ালো। আশা!—তবু আশা—হারে বেচারী!!

ছেলেদুটীর সাড়া পেয়ে ভিখিরী কষ্টে চেষ্টায় আরো দু-পা এগিয়ে গিয়ে বললে—"একঠো ঢেবুয়া, বাবু,—হুকুম হোক, হুজুরের এক ঢেবুয়া।" পকেট থেকে একটা পয়সা তুলে তাদের মধ্যে একজন ছোঁড়াটার দিকে ছুঁড়ে দিলে। রাস্তার বনের ভেতর সেটা গড়িয়ে গিয়ে প'ড়লো—বুকভরা আশায় সবটুকু তার বলে হতভাগা ছুটে গিয়ে পড়লো সেইখানে—কিন্তু সুরকি ধুলোয় তামাটে সে পথের পাশে কোথায় সেটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে—আগ্রহে-ব্যগ্রতায় হাতড়িয়ে হাতড়িয়েও পেলে না তো হতভাগা সেটা। অনেকক্ষণ খুঁজলো

আশায় আশায়—না, মিললো না পয়সাটা ; এবার হতাশায় ব'সে প'ড়ে সেথান থেকে আর উঠ্‌তে পারলে না বেচারী—"ক্ষিদেয়"—তেষ্টায়" হিমে হাওয়ায় অসাড় হয়ে আস্‌ছিল তার সকল অঙ্গ, স্থির হ'য়ে আসছিল বুঝি তার বুকের স্পন্দন, কাত হয়ে লুটিয়ে প'লো সে সেইখানে ,—তার্কিক দুজন কখনই তো চ'লে গেছে তাদের মত—আর এখানে এ দেশের ছবি নেতিয়ে নিথর হ'য়ে পড়লো ভুঁইএর ওপর—মরণ এতক্ষণ কোন্ কোণায় তার কঙ্কালের পায়ে রুদ্র তাল বাজিয়ে নাচছিল এই ফাঁকে সে ছুটে এসে দাঁড়ালো—ঐ হতভাগা ভিক্ষুকের শক্ত শ্রীহীন অসাড় মুখখানার পানে অপলক তার দৃঢ় দৃষ্টিটা নিবদ্ধ ক'রে।

একাকী।

[শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

স্তব্ধ নভে ঘিরি' আছে মৌন তারাদল
ফুলবন হিল্লোলিত সুখের পবনে
কিসের স্বপনে মগ্ন বিশ্ব ধরাতল ?
সুবাসিত বায়ু ফেরে ভবনে ভবনে ,—
আঁধারের গায়ে জ্বলে খদ্যোতের মালা
কোন্ রত্ন সেথা তারা খুজি খুজি ঘুরে ?
আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি দূরে দূরে।
ফেরে নিয়ে সাথী তার প্রতিধ্বনি বালা ,—
এ হেন নিশীথে আমি একাকী পথিক
বাহিরিনু রাজপথে মুছি আঁখিজল—
একা বন্ধুহীন—শুধু অন্ধ দশ দিক
সান্ত্বনিতে রহিল রে ক্ষুব্ধ হিয়া তল,
দুখী পান্থ সুখী তবু বান্ধব-বিহীন
নাহি আশা ভালবাসা নাই ভিক্ষা ঋণ।

সমাজের কথা।

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।]

মারামারি কাটাকাটির ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিলে মানুষের শক্তি প্রতিভা ব্যক্তিত্ব বাড়িয়া উঠে এ কথা স্বীকার করিলেও, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ যে সমাজের এই এক রকম বিধিব্যবস্থার সহায়েই হয়, এমনও জোর করিয়া বলা যায় না। মূর্খের লাঠ্যৌষধি—কিন্তু লাঠিতে মূর্খের পিঠের দাঁড়া শক্ত হইতে পারে, তাহার জ্ঞানের চক্ষু ফোটে কি না সন্দেহ, গাধাকে পিটিয়া ভার বহনের শিক্ষা তাহার আয়ত্তে আনিয়া দিতে পার, কিন্তু মানুষ করিতে পার না, কামড়া কামড়িতে দন্ত নখরের সামর্থ্য বাড়াইতে পার, কিন্তু তাহাতে যত সামর্থ্য ঐ দন্তনখরেই জমা হয়, ভাবের আর সব সামর্থ্য চাপাই পড়িয়া যায়। সে যাহা হউক, সমাজে রেষারেষি তাড়াহুড়া জোরজবরদস্তির ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে যদি আনা যায় আর এক ধরণের ব্যবস্থা যেখানে মানুষ পায় একটা বিস্তীর্ণ অবকাশ, ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে পারে খুব সহজে স্বচ্ছন্দ গতিতে, কেহ কাহারও সাথে টক্কর না খাইয়া তবে ফলে দাড়ায় কি? আপাততঃ মনে হয়, মানুষ শক্তি ও উদ্যম হারাইয়া ক্রমে হইয়া পড়িবে অলস, সৌখীন, মেরুদণ্ডহীন, অবলা-স্বভাব। ওয়েলস্ সাহেব দূর ভবিষ্যৎ মানবজাতির এই রকম একটা পরিণাম কল্পনায় চিত্রিত করিয়াছেন—মানুষ সব ছোট ছোট, দাড়িগোঁফ-শূন্য, পুরুষ কি মেয়ে চেনা দায়, শরীরে বল নাই, বুদ্ধির প্রাখর্য্য নাই, ইন্দ্রিয়ের তেজ নাই, সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, আছে শুধু বালকের কৌতূহল, সহজ সরল অনুভূতি, প্রকৃতির কোলে হাওয়ায় হাওয়ায় যেন সকলে উড়িয়া বেড়াইতেছে। * কিন্তু এইরূপ হইতে কি বাধ্য? এ রকমও ত হইতে পারে যে মানুষ অটুট শান্তিপূর্ণ অবকাশ পাইয়া, করিতেছে বিশুদ্ধ আনন্দের সৃষ্টি, সব বাহিরের চাপ হইতে মুক্তি, তাহাদিগকে লইয়া চলিয়াছে আপন আপন অন্তরাত্মার সন্ধানে, আপন আপন নিগূঢ় প্রতিভার পরিস্ফুরণে। চাপ ছাড়া শক্তি ফোটে না, ঘর্ষণ ছাড়া আলো ও উত্তাপ বাহির হয় না, এ কথা যখন বলা হয় তখন ধরিয়া লওয়া হয় যে জিনিষের এমন কোন অবস্থা নাই যা হইতে পারে না যখন সে

---

* H. G. Wells—The Time Machine.

সহজ অবস্থায় থাকিয়া আপনা হইতেই শক্তি আলো উত্তাপ বিকীরণ করে। কিন্তু আজকালকার Radio activityর ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া এ কথা ত কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। মানুষ যে কর্ম্ম করে তাহা কেবল প্রয়োজনের বশে, অভাবের তাড়নায়—এটা স্থূল দৃষ্টির কথা। আসল ভিতরকার সত্য হইতেছে মানুষ কর্ম্ম করে আনন্দের প্রেরণায়, একটা ভাবেরই খেলার জন্য। ব্যবহারিক হিসাবে দেখা যায় বটে যে সব কর্ম্ম একটা প্রয়োজনের রসদ জোগাইতেছে, একটা অভাব মিটাইতেছে, কিন্তু আসলে কর্ম্ম কর্ম্মেরই জন্য, কর্ম্মের আনন্দের জন্য। চাষী চাষ করিতেছে, বাণিয়া ব্যবসা করিতেছে লাভের জন্য বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ নয় কি, চাষে ব্যবসায়ে যে আনন্দ তার জন্য? কবি কবিতা রচনা করিতেছেন লোকের উপকারের জন্য বা যশের জন্য, এটা গৌণ কারণ, আসল কারণ, কবিতা রচনা করা তাঁহার স্বধর্ম্ম, না করিয়া তিনি পারেন না, বাহিরের কোন উদ্দেশ্য কোন লক্ষ্য কোন অভাব বোধ না থাকিলেও, তিনি উহাই করিয়া যাইতেন।

মানুষের যে রজোগুণ সেটা তাহার সত্ত্ব বা সত্তার সহিত ওতঃ প্রোতঃ মিশ্রিত। দ্বন্দ্ব (struggle) এই রজোগুণের একটা প্রকরণ মাত্র—শুধু প্রাণময় ক্ষেত্রে (vital plane) রজোগুণের যে খেলা আবদ্ধ সেখানেই সম্ভব দ্বন্দ্ব, কিন্তু বিশুদ্ধ সত্তা, আত্মা, অন্তরাত্মায় আছে যে রজোগুণের খেলা তাহা দ্বন্দ্ব নয়, তাহা হইতেছে প্রকাশ, প্রকাশের গতি। এই বিশুদ্ধ রজোগুণ প্রাণেও নামিয়া আসিতে পারে, প্রাণকে তদনুরূপ ধর্ম্মে লীলায়িত করিয়া তুলিতে পারে। প্রাণশক্তি যখন একটা অভাব বা শূন্যতা বোধ দিয়াই পরিচালিত হয় না, সে যখন চলে আপনার পূর্ণতার জন্যই উছলিয়া দুই কূল ছাপাইয়া, তখন প্রাণে প্রাণে আর দ্বন্দ্ব প্রতিযোগীতা ধ্বস্তাধ্বস্তি কামড়াকামড়ি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যেন প্রত্যেকে চলে আপন আপন স্বভাবের স্বধর্ম্মের পথে আপন আপন বিশেষত্বকে ফলাইয়া ধরিবার জন্য, প্রত্যেকের কর্ম্ম প্রত্যেকের কর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য নয়, কাহারও সত্তা কাহারও সত্তাকে খর্ব্ব করিয়া চলিবার জন্য নয়, কিন্তু সকলেই আছে আপন আপন সিদ্ধি ও ঋদ্ধিকে প্রকট করিবার জন্য আর সেই উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সফল হয় অপর সকলের সিদ্ধিও ঋদ্ধিকে উপচিত করিয়া চলিয়া।

ফলতঃ, এই কথাটি স্মরণে রাখিতে হইবে যে জীবনের মূল বাসনা নয়, জীবনের মূল হইতেছে আনন্দ। বাসনা যদি প্রত্যাহৃত হয় তবে জীবন খোঁজ

পাইবে না, বাসনার নীচে আছে যে আনন্দের ঈষণা, সৎপুরুষের তপঃশক্তি তাহাই জীবনকে সঞ্জীবিত প্রস্ফুটিত করিয়া ধরিবে। বাসনা হইতে কর্ম্ম উদ্ভূত নয়, কর্ম্ম উদ্ভূত সত্তার আদি প্রকৃতি হইতে, বাসনা এই আদি প্রকৃতির একটা পরিণতি বা বিকৃতি মাত্র। সংঘর্ষ হইতেছে বাসনার জগতের কথা। কর্ম্মকে বাসনার সহিত মিশাইয়া ফেলা হইতেছে, তাই ত আমরা মনে করি সংঘর্ষ ছাড়া কর্ম্ম নাই। গীতার মূল কথাটিই ত এইখানে।

কর্ম্ম হইবে অথচ সংঘর্ষ হইবে না, এই ভাবটি ধারণা করিতে আমাদের খুবই কষ্ট হয়, আমাদের বুদ্ধির কাছে এটা একটা অসম্ভব জিনিষ বলিয়াই বোধ হয়। কর্ম্ম মানেই শক্তি বিকীরণ অর্থাৎ নানাশক্তির ছুটাছুটি অর্থাৎ ধাক্কাধাক্কি অর্থাৎ সংঘর্ষ। অবশ্য এমন কল্পনা করা হইতে পারে যে শক্তি কণাগুলি ছুটিতেছে প্রবাহধারায় টানা স্রোতে, কোন রকম ধাক্কাধাক্কি না করিয়া—এবং ধারাগুলি সব চলিয়াছে সমতল রেখায় সোজাসুজি, এক দিকেই হউক আর বিপরীত দিকেই হউক, এরূপ কল্পনা করিলে সংঘর্ষকে বাতিল করা যাইলেও যাইতে পারে, কিন্তু এটা কল্পনামাত্র —অণু পরমাণুর সংঘর্ষ ছাড়া জগৎ নাই, Radio active বস্তুতে বাহিরের সংঘর্ষ দিয়া আলো উত্তাপ জাগাইতে হয় না বটে কিন্তু তাহার ভিতরে অণু পরমাণুর মধ্যে যে কি ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব বিপুল সংঘর্ষ চলিতেছে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সংঘর্ষ যে কেবল প্রাণ জগতের সত্য (biological truth) তাহা নয়, ইহা সত্তামাত্রেরই সত্য (truth of existence)

কথাটা মানিয়া লইলাম, কারণ না মানিয়া উপায় নাই। তবুও আরও কথা আছে। জড়ের ক্ষেত্রে, প্রাণের ক্ষেত্রে যেটা সত্য মানুষের মধ্যে সেই সত্যটাই পায় একটা নূতন বাসনা, একটা রূপান্তর। কারণ মানুষের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে আরও একটা ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের সত্য। মানুষ শুধু জড় সমষ্টি নয়, অথবা প্রাণশক্তির ঘূর্ণিপাক নয়, মানুষ হইতেছে চিন্ময় সত্তা, মানুষের মধ্যে আছে ভাব বলিয়া একটি জিনিষ। এখন কথা হইতেছে মানুষের এই যে ভাব, চিন্ময় সত্তা, অন্তরাত্মা বা আত্মা, এখানে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ বস্তুটি নাও থাকিতে পারে। সংঘর্ষ হইতেছে প্রকৃতির কথা, পুরুষে পুরুষে সংঘর্ষ নাই। মানুষে মানুষে সংঘর্ষ হয় তখন যখন মানুষ প্রকৃতির দাস, পুরুষ যখন নামিয়া আসিয়া প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া যায় অর্থাৎ হয় যখন অহঙ্কারের খেলা। কিন্তু মানুষ যদি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়, জীব যদি আপন পুরুষ-

সত্তা প্রকৃতির ঊর্দ্ধে স্থাপন করে তবে মানুষ কাজ করে অহঙ্কার বিবর্জ্জিত হইয়া, পরস্পরের প্রকৃতির মধ্যেও ফুটিয়া উঠে একটা সামঞ্জস্য ও সম্মিলন। যেমন বহুল বিভিন্ন ধ্বনি মিলিয়া সৃষ্টি করে ঐক্যতানের মূর্চ্ছনা, সেই রকম বহুল বা বিভিন্ন ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়াও মানুষ গঠন করিতে পারে একটা সমন্বয়ের সমাজ।

সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা লইয়া যে সমাজ সে সমাজ সকলের জন্য নহে, সে সমাজে বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া উন্নতি করিয়া থাকিতে পারে এক বিশেষ প্রকৃতির মানুষ। কি প্রকৃতির মানুষ, তাহা বুঝিতে পারি সমাজ এই "উন্নতি করা" কথাটা কি অর্থে ব্যবহার করে সেই দিকে একটু নজর দিলে অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে প্রাণময় স্তরের গুণাবলীই প্রধান, অন্য কথায় যাহাদের আছে ছল বল কৌশল। এইরূপ সমাজে কার্য্যকরী গুণ ছাড়া আর কোন গুণ ফলপ্রসূ হইতে পারে না, কাজ ছাড়া বাহিরের সফলতা ছাড়া ব্যক্তির স্বাধীন সত্য —মূল সত্তার উদ্বোধন এখানে হয় না। এমনও যদি স্বীকার করি এ সমাজে বাস্তবিকই হয় যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, তবে বলিব যোগ্যতমের মধ্যেও এখানে বাছাই হয়, স্থান পান সফলতা সার্থকতা পায় যোগ্যতমের মধ্যে আবার যাহারা যোগ্যতম, যাহাদের আছে প্রতিভা, যাহারা সকল বাধা বিপত্তি সকল নিম্নাভিমুখী টান কাটিয়া ছাঁটিয়া জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখাইয়াছে অন্তরতম সত্তার মহিমা, সেই দুই চারিজন লোকেরই জীবন এই সমাজে সার্থক। এ রকম ব্যবস্থায় ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকলে সমান সুবিধা সুযোগ বা অধিকার পায় না, প্রত্যেক মানুষেরই আছে যে একটা প্রতিভা, ব্যক্তিমাত্রেরই আছে যে একটা নিজস্ব মর্য্যাদা (Greenএর Worth of Persons) সে সত্যটি মানিয়া ত লওয়াই হয় না, সেটা সত্য কি মিথ্যা তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার কোন সুযোগই দেওয়া হয় না।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার একটা প্রয়োজন ও সার্থকতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেটাকে চিরকালের ব্যবস্থা করিয়া গ্রহণ করিলেই ভুল হইবে, সে ব্যবস্থা বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ স্তরের কথা, বিবর্ত্তনের সব কথা বা মূল ধারা তাহাতে ধরা দেয় নাই। ব্যক্তির পক্ষে উচ্চতর সাধনা ও সিদ্ধিকে ধারণ করিবার জন্য প্রথমে স্থূল আধারকে খানিকটা উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হয়, অন্ততঃ স্থূল আধারের কিছু ধারণ-সামর্থ্য না থাকিলে উচ্চতর সাধনা ও সিদ্ধি ফুটিয়া উঠিতে পারে না— শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং, সেই রকম সমাজের মধ্যেও একটা উচ্চতর জীবন-

স্রোত বহাইয়া দিতে হইলে সমাজের নিম্নতর স্তরকে একটু দৃঢ় করিয়া লইতে হয় নতুবা সে স্রোত আসে না, অথবা অসময়ে আসিলে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লইয়া যায়। মানুষ ও মানুষের সমাজ এখন প্রাণময় স্তরে দাঁড়াইয়া মনোময় স্তরের পরিচয় লইতেছে। বিবর্ত্তনেব পরবর্ত্তী সোপানে মানুষকে মানুষের সমাজকে মনোময় স্তরেব উপর দাঁড়াইয়া অধ্যাত্ম স্তবের পরিচয় লইতে হইবে। কিন্তু এই অধ্যাত্ম স্তবের পরিচয় সম্ভব হইবে না, হইলেও খাঁটি হইবে না, যদি নীচের মনোময় ও প্রাণময় স্তবে একটা সামর্থ্য পূর্ব্ব হইতেই আহরিত না হইয়া থাকে। আমরা বলিতে চাই সমাজেব বর্ত্তমান সংঘর্ষের ব্যবস্থা সমাজে দিয়াছে এই মনোময় ও প্রাণময় স্তরের সামর্থ্য। কিন্তু আবার ব্যক্তির পক্ষে যেমন আসন প্রাণায়ামই যদি মুখ্য হইয়া উঠে, তবে তাহার সাধনা হয় ব্যর্থ, সে হইয়া পড়ে আধ্যাত্মিক কুস্তিগীর অথবা ভেল্কিবাজ—সেই রকম সমাজে দ্বন্দের সংঘর্ষে জের যদি অতিমাত্র টানা যায় তবে সে সমাজ আর সমাজ নামের উপযুক্ত থাকে না, তাহা হইয়া পড়ে সমরাঙ্গন—তাহার ধ্বংসও বোধ হয় বেশী দূরে নাই।

সমাজকে যদি আবও টিকিয়া থাকিতে হয়, সমাজের মধ্যে মানুষ যদি চায় মহত্তর সার্থকতা তবে তাহার রূপকে বদলাইয়া ফেলিতেই হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির আছে একটা মর্য্যাদা, একটা বিশেষত্ব, একটা প্রতিভা—সেইটুকু ফুটাইয়া ফলাইয়া বুঝিবার সুযোগ স্বাধীনতা পূর্ণ অবকাশ দিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি কি দিতে পারে, তাহাব উপর সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমাজ ব্যক্তির নিকট হইতে কি আদায় করিতে পারে অথবা বাধ্য হইয়া ব্যক্তি কি দেয়, তাহার উপর নহে। এইটুকু বুঝিতে হইবে, প্রত্যেকেরই আছে দিবার মত কিছু সম্পদ, থাকিবার সুতরাং সৃষ্টি করিবার আনন্দ; সেই জিনিষটাকে বাহির করিতে হইলে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের প্রয়োজন নাই, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ তাহাকে চাপিয়া আটকাইয়া রাখে, তাহার জন্য চাই হাঁপ ফেলিয়া চলিবার অনেকখানি ফাঁকা যায়গা। এই রকম ফাঁক পাইলে দুই এক জনের নয় অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় নিজের অন্তরাত্মার দিকে দৃষ্টি দিতে, নিজের আনন্দ যাহাতে সেই ধর্ম্ম সেই কর্ম্ম অনুসরণ করিতে। এই ব্যবস্থায় সমাজে প্রথম প্রথম কিছু শিথিল নিস্তেজভাব আসিলেও আসিতে পারে, এত দিনের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া গেলে মানুষ কিছুকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু সে ভাবটা কাটিয়া গেলে আসিবে একটা পূর্ণতর ঋদ্ধতর জীবনের স্রোত

রজোভাবের খেলার পর আসে তমোভাব, কিন্তু সে তমোভাব চালাইতে জানিলে উঠাইয়া ধরে সত্বের মধ্যে। An idle mind is the Devil's workshop·· কথাটা সব সময় সত্য নয়, idle mindএর মধ্যেই আবার কখন কখন ভাগবত শক্তির বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়। আর এমনও যদি হয়, বাহিরের তাড়না না পাইয়া কেহ কেহ একেবারে তমোগ্রস্ত হইয়া প্রকৃতিলীন হইয়া যায়, তাহাতেও সমাজের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যাহারা যাইবার তাহারা যুদ্ধে অর্থাৎ অপঘাতে না মরিয়া, আস্তে আস্তে প্রাণশক্তির হ্রাসের ফলে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু থাকে যাহারা তাহারা সমাজকে দেয় একটা বিভিন্ন গতি ও প্রকৃতি, একটা উচ্চতর প্রতিষ্ঠান।

শিব-স্তুতি

(অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।)

(১)

শ্মশানে পেতেছ ধ্যানের আসন
মরণে করেছ জয়,
আকাশে করেছ অঙ্গ-বসন,
নাহি জরা, নাহি ভয়।
ধুস্তর-বাসে আমোদিত হিয়া
ভস্ম অলঙ্কার,
মাভৈঃ বিষাণে উঠিছে বাজিয়া
বিশ্বের ওঙ্কার।
ভাগিরথী ধারা বদ্ধ জটায়
মহাজ্ঞানী ত্রিলোচন,
জগতের জ্বালা দূরে চলে যায়—
মধুর শান্ত মন।

(২)

জাগিল একদা মাধবী বাসরে
মদন-পুষ্প-বাণ,—

স্মরহর দেব, আঁখির সায়কে
ঘুচালে তাহার প্রাণ,—
হিমগিরি বুকে ফুটেছিল ফুল
কাননে ব্যাকুল পাখী,
অলকানন্দা পুলকে ব্যাকুল,
মধুবায়ে দুলে শাখী।
হৈমবতীর হিম-জর্জ্জর
উঠেছিল হিয়া কাঁপি,
স্তব্ধ সুদূর বন-মর্ম্মর
বিশ্বের ব্যথা চাপি'।

(৩)

সাগর-মন্থে সুধার অংশ
পাওনি হে মহাবল,
দুঃখ-দেবতা, হে নীলকণ্ঠ,
পেলে শুধু হলাহল।
দক্ষ-যজ্ঞে অনাহুত শিব—
তবুও নির্ব্বিকার,
সতী—অপমানে টলিল আসন
ধ্যানে থাকা হলো ভার।
প্রেমের সাধক, হে চিররুদ্র,
জ্ঞানের দেবতা তুমি,
চন্দ্রশেখর, হে মহেশ্বর।
তোমার চরণ চুমি।

(৪)

মায়া-মোহে যবে বিশ্ব ঘুমায়
জাগ্রত আছ চাহি',
সত্যের ধ্যানে, হে চিরন্তন,
আছ তুমি অবগাহি',—
গোমুখীর ধারা গভীর আরাবে
শিখরে জাগায় গান,

স্তব্ধ শান্ত, ওগো হিমাচল,
কর আনন্দ-পান।
গরলে করিলে স্নিগ্ধ অমৃত,
গৌরব অপমান।
মরণে করিলে অজেয় জীবন,
দাও, দেব, মহা জ্ঞান।

পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(১)

চোরবাগানের কোনও ধনীর বাড়ী শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ-বিদায় আনিতে গিয়া দরোয়ানের গলাধাক্কা খাইয়া যখন রাখু ঘরে ফিরিতেছিল, তখন শুধু যে সন্ধ্যা হইয়াছিল, এমন নয়,—আকাশটাও হঠাৎ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইতেছিল। গলদেশটা দরোয়ানের কঠোর পীড়ন হইতে কোনও রকমে অভগ্ন অবস্থায় ফিরিয়াছে। এখন আবার রাখুর মাথাটা বাঁচাইবার প্রয়োজন হইল। যেহেতু তাহার ছাতি ছিল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘ—কিঞ্চিৎ ঝড়ের সঙ্গে গোটাকতক করকা আর খানিকটা মুষলধারের বৃষ্টিপাতের বিশেষ সম্ভাবনা। রাখু আর গলার চিন্তা করিবার অবসর না লইয়া, ব্রাহ্মণ-বিদায় নামের নীচ ভিক্ষা জন্মের মত ত্যাগ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল এবং যথাসম্ভব সত্বর তাহার কুমারটুলির বাসায় ফিরিতেছিল। সোজা পথ ধরিয়া আসিতেও পথের এমন স্থানে ঝড়ের সূচনা হইল, যে স্থানটা পার হইতে পারিলে রাখু যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইত। কিন্তু বিশেষ চেষ্টাতেও সে তাহা করিতে পারিল না। অগত্যা তাহাকে পথের ধারের একটা ছোট বারান্দায় আশ্রয় লইতে হইল।

সে স্থানটা সহরের যত পতিতার আশ্রয়। রাখু যে বারান্দায় দাঁড়াইল, তাহার পার্শ্বেই গৃহ-প্রবেশের দ্বার। আসিতে আসিতে সে অনেক বাড়ীর দরজায় বেশ ভূষা করিয়া অনেক হতভাগিনীকে যেমন দাঁড়াইয়া থাকিতে

দেখিয়াছিল, এ বাড়ীটা সেরূপ নয়। সেখানে তখন একটীও প্রাণী ছিল না, বাড়ীর দ্বারটাও রুদ্ধ ছিল। তথাপি সঙ্কোচের সহিত রাখু সেখানে দাঁড়াইল। সে বাড়ীর সম্মুখের একটি বাড়ীর দোতালায় তখন গান-বাজনা চলিতেছিল। নিরুপায়ে দাঁড়াইয়া রাখু গান শুনিতে লাগিল।

রাখুর একটু তালবোধ—একটু স্বরবোধও ছিল। বিষ্ণুপুরের নিকটে একটি গ্রামে তাহার জন্ম। বিষ্ণুপুরকে গান বাজনার একরূপ জন্মস্থান বলিলে বেশী বলা হয় না। সাধারণ লোকেরও সেখানে স্বর-তালে অল্পবিস্তর দখল আছে। রাখুরও সেইরূপ ছিল। সে বিষ্ণুপুরে দুই চারি জন ভালো কালোয়াতের গান ও বাজনা শুনিয়াছে। নিজেও গানের - বিশেতঃ বাজনার একটু আধটু চেষ্টা করিয়াছে। রাখু নিজেকে না বলুক, সেখানকার অনেকেই তাহাকে একজন ভাল "বাজিয়ে" বলিত। বাজাইতে বাজাইতে অনেক মুগ্ধ শ্রোতার মুখ হইতে যে অনেক প্রকারের প্রশংসা ধ্বনি শুনিয়াছে। নিরুপায়ে অর্থাৎ চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না বলিয়া রাখু গান শুনিতেছিল। কেন না গায়িকার না ছিল স্বর-বোধ,—বাদকের না ছিল তাল-বোধ। মাঝে হইতে কতকগুলা অপ্রকৃতিস্থের অনর্থক উচ্চ বাহবা শব্দ সঙ্গতটাকে আরও যেন বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল।

দাঁড়াইয়া ক্রমে সে বিরক্ত হইতে লাগিল, কিন্তু ছাতির অভাবে তাহার স্থানত্যাগ ঘটিতেছিল না। রাখু মনে করিল—একবার ঝড় নিবৃত্তি হইলেই এ কুৎসিত স্থানটা ছাড়িয়া যাই।

ঝড় তো কমিল না বরং খানিকটা বৃষ্টি মাথায় করিয়া সে একটু গর্জ্জনের সঙ্গেই ছুটিয়া আসিল। রাখুর যাওয়াটা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত হইল বটে, কিন্তু ঝড়বৃষ্টির শব্দের ভিতরে গান-বাজনা যে ডুবিয়া গেল, তাহাতে সে আপনাকে অনেকটা সুখী বোধ করিল। তাহার গলা ধাক্কার অপমানের চেয়ে স্বর-লয়ের অপমানটা বেশী যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছিল।

সহসা সেই শব্দরাশি ভেদ করিয়া একটি সূক্ষ্ম স্বর তাহার কানে আসিয়া লাগিল। শুনিবা মাত্র সে যেন চমকিয়া উঠিল। তাই ত। বিষ্ণুপুরের বড় বড় মজলিসে বড় বড় গায়কের কণ্ঠ হইতেও ত এত মিষ্ট স্বর বাহির হইতে সে কখন শুনে নাই। সত্য সত্যই আসল স্বরটা কি এত মিষ্ট, না ঝড় জলের শব্দ নিজের ভিতরে গানটাকে মিশাইয়া স্বরটাকে এত মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে?· রাখু উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

যে বাড়ীর বারান্দায় সে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই উপরের একটি ঘর হইতে স্বর উঠিয়াছিল। উঠিয়া কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ রহিল না। কি একটা গানের একটা কলিমাত্র গাহিয়া গায়িকা চুপ করিল। গান শুনিবামাত্র সেটা যে নারী কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে, এটা রাখুর বুঝিতে বাকী ছিল না। গানের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি তালে তালে সঞ্চালিত পরস্পরে আহৃত তার অঙ্গুলী দু'টি গায়িকাকে দেখিবার জন্য যেন প্ররোচিত করিতেছিল। শুধু সরম আর অবস্থার বিপর্য্যয় তাহাকে সেইখানেই দাঁড় করাইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া রাখু গানটার পুনরাবৃত্তির প্রত্যাশা করিল। সেই একটা কলি গান শুনিয়াই সে বুঝিয়াছিল—গায়িকার কণ্ঠস্বর শুধু মধুর নয়, তাহার তাল-বোধও যথেষ্ট আছে। হায়, এ গানটা যদি এ কুৎসিৎ স্থানে না হইয়া বিষ্ণুপুরের কোন আসরে হইত, আর স্ত্রীলোকের না হইয়া কোন পুরুষের কণ্ঠ হইতে বাহির হইত, রাখু তাহা হইলে মনের সাধে সঙ্গত করিয়া তাহার বাজনার শক্তিটা সার্থক করিয়া লইত।

গান রাখু আর শুনিতে পাইল না, তার পরিবর্ত্তে কথা শুনিল,—ঝি দরজাটা বন্ধ করে আয়।

একটা কর্কশ কণ্ঠে উত্তর উঠিল, "কেন, বাবু যদি এসে পড়েন ?"

"তোর যেমন বুদ্ধি। এ দুর্য্যোগে শিয়াল কুকুর ঘর থেকে বেরুতে পারে না—"

"কিন্তু দিদিমণি, বাবু বেরুতে পারে।"

"আরে মর্, কথা কাটাস কেন, দরজা দে। এসে পড়ে দরজায় সে ধাক্কা দেবে এখন।"

ঝি নীচে ছিল, আর তার কর্ত্রী উপরে ছিল। কথাগুলা উচ্চ রবে হইল বলিয়া রাখু তাহা শুনিতে পাইল। গায়িকার কথাও কি মিষ্ট। শুনিতে শুনিতে রাখুর কানে যেন কোন পূর্ব্ব যুগের এক শোনা কথা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাসিকা হইতে সশব্দে একটা শ্বাস বাহির হইয়া সেই ঝঙ্কারের সহিত মিশিতে গিয়া নিষ্ফল প্রয়াসে তার বুকের ভিতর ফিরিয়া লুকাইল।

(২)

দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া ঝি অন্ধকারেই মুখটা একবার দোরের বাহির করিয়া এদিক ওদিক দেখিল। দেখিবার উদ্দেশ্য কি আমরা ত জানিই না,

ঝি নিজেই জানিত কি না সন্দেহ। পতিতার ঘরের প্রহরিণী—হয়ত স্বভাব বশেই সে ঐরূপ করিল। ঐরূপ করিতে গিয়া সে রাখুকে দেখিতে পাইল। বিস্মিত হইবার তার কোনও কারণ ছিল না। একে রাত্রি অধিক নয়, তাহার উপর সদর পথ, সম্মুখে আলো। সবার উপর ওরূপ স্থানে অনেকেরই রাখুর মত সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া থাকা দেখা তাহার অভ্যাস আছে। সে পা টিপি টিপি ভিতরে ঢুকিল—দরজা বন্ধ করিল না।

উপরে গিয়াই দিদিমণিকে দেখা দিয়াই ঝি খলখল হাসিল। হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল—"বাবু।"

"কই ?"

"দেখবে এস,—চোরটির মত পথের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।"

ইতিমধ্যে বারান্দার সম্মুখে গ্যাসের আলোটা একটা বাতাসের ধাক্কায় নিবিয়া গিয়াছে। দূরের আলো মলিন রশ্মির সম্পাতে স্থানটাকে যেন বেশী অন্ধকারে ঢাকিয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গলিটায় হাঁটু প্রমাণ জল। রাখু দেখিল—তাহার দেশের একটা যেন মুখর "দাঁড়া" অকস্মাৎ তাহার সম্মুখে একটা বিশাল ডাঙ্গার জল আনিয়া তাহার চলিবার পথ রোধ করিয়াছে।

তাহার শীঘ্র শীঘ্র বাসায় ফিরিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরের আশ্রয়ে থাকা—ফিরিতে রাত্রি হইলে সারারাত্রির মত তাহার উপবাসের সম্ভাবনা। উপবাসের কথা মনে উঠিতেই সঙ্গে সঙ্গে দ্বারোয়ানের ধাক্কার কথাটা তাহার মনে পুনরুদিত হইল। আজ কি কুক্ষণে সে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল।

তখন হইতেই তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছিল। বৃষ্টি থামিবার অপেক্ষা আর তাহার চলিল না। দুই দিন পূর্ব্বে তাহার সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিলে অসুখ ফিরিয়া আসিতে পারে,—আসুক। এ বৃষ্টি যে রাত্রির মধ্যে থামিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? বৃষ্টি একটু থামিবার মত হইয়াছিল, আবার বাড়িল। মেঘ নীরব হইবার মুখে আবার দ্বিগুণ গর্জ্জনে ছুটিয়া আসিল। আসুক। যেমন করিয়া হোক, যত শীঘ্র পারে,-তাহাকে বাসায় ফিরিতেই হইবে। ব্যাকুলতায় বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তায় যেমন সে পা দিবার উপক্রম করিয়াছে, অমনি তাহার পশ্চাতে জানুদেশে কোন একখানি সুকোমল চরণের স্পর্শানুভূতি হইল। একটু সভয় চমকে মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে তাহার দক্ষিণ কর্ণ দুটি কমাঙ্গুলিতে সংলগ্ন হইল। চরণ বেশী

কোমল, কি কর বেশী কোমল—এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই রাখু বুঝিল—উপরের ঘরের যে কথার মিষ্টতায় সে ক্ষণপূর্ব্বে মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই স্বর মৃদু হাসিতে মিশ্রিত হইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্রে খাম্বাজের মধুরতার তরঙ্গ ঢালিতেছে।

"মৎলবটা কি?"

"বাছা, তুমি লোক ভুল করেছ।"

রমণী রাখুর কাণ হইতে হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার ভুল করাটা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। ওরূপ জল-ঝড়ে তাহার ঘরে আসিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মাথায় ছাতি না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পোষাকটা কোন মতে রাখুর মত হওয়া উচিত ছিল না। রাখুর পরিধানে একখানি অপরিসর অর্দ্ধমলিন বস্ত্র, গায়ে একখানি অর্দ্ধমলিন চাদর, তাহাতে দুর্গন্ধ না থাকুক, কিন্তু যে গন্ধ অমন ঝড় বৃষ্টিতেও আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না,—তাহার কণামাত্রও সে চাদরের কোন অংশে কোন কালে ভুলেও সংলগ্ন হয় নাই।

একটু তীব্র বাক্যে রমণীর এই অন্যায় ভুলের প্রতিবাদ করা রাখুর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। কেননা রমণী হাত ছাড়িবামাত্র সে একটা তীব্র মধুর গন্ধ অনুভব করিল। কর্ণ হইতে রমণীর হাত সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখু কাণটায় একবার হাত দিল। হাতটা অন্যমনস্কে নাকের কাছ দিয়া যাইবার সময় সে বুঝিল—তাহার অঙ্গুলিতেই সেই মধুর গন্ধ লাগিয়া গিয়াছে। অন্ধকারটা সে জায়গায় প্রগাঢ়। এখনও পর্য্যন্ত কেহ কারও মুখে দেখিতে পায় নাই,—যে যার কথামাত্র শুনিতেছে।

"তাইত মশায়, বড়ই অন্যায় করলুম—আমি আপনাকে আমার একজন বন্ধু মনে করেছিলুম।"

"তাতে কি হয়েছে, তুমি তো আর জেনে করনি, বাছা।"

"আপনি কি?"

"ব্রাহ্মণ।"

ঠিক এমনি সময় একখানা মেঘ আর একখানা মেঘের উপর পড়িয়া দুইখানা প্রকাণ্ড জাহাজের সংঘর্ষণের মত মুহূর্ত্তের জন্য বিরাট অগ্নিশিখা ও প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে অন্ধকার-সাগরে ডুবিয়া গেল। বিদ্যুতে রাখুর চক্ষু যদি ঝলসিয়া না যাইত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত যে, সেই মুহূর্ত্তের

আলোকে তাহার মুখ দেখিয়া বজ্রাহতার মত মেয়েটা খানিকটা পিছাইয়া দেয়ালের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

রাখু তাহার মুখটা দেখিতে দেখিতে যেন দেখিতে পাইল না। তাহার কপোল ও গণ্ডে কেয়ারী-করা চুলের এমন একটা ঘন-বিন্যস্ত আবরণ। সে শুধু দেখিল—ছবিতে আঁকার মত ছোট একখানি মুখ। তথাপি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকেও লুকাইয়া একটা বদ্ধ শ্বাস ঝড়ের বাতাসের সঙ্গে শব্দ মিলাইয়া দ্রুতবেগে রাখুর নাসিকা-রন্ধ্র-পথ দিয়া চলিয়া গেল।

এ ভাবটা রাখুর কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। বাসায় ফিরিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা বিশেষ ভাবেই ফিরিয়া আসিল। মেয়েটাও কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক। সে চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া রাখু আবার কাতর-নেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। নিষ্ঠুর আকাশ আজ রাখুকে বাসায় কিছুতেই যাইতে দিবে না বলিয়াই যেন আপনার শূন্য উদর সাগর-প্রমাণ জলে পূর্ণ করিয়া ধারায় ধারায় উদ্গার তুলিতে লাগিল. আর একবার চলিবার উদ্যোগ করিতে গিয়া প্রাণের আবেগে সে আপনাকে শুনাইতে বলিয়া উঠিল—

"আরে ম'ল—বৃষ্টি যে বেড়ে গেল। নাঃ। দেবতা আজ আমাকে যেতে দিলে না দেখছি।"

স্ত্রীলোকটার এইবারে নির্ব্বাকত্ব ঘুচিল। কিসের জন্য যেন রাখুর সঙ্গে আলাপ করিতে সাহসী হইল। জিজ্ঞাসা করিল—

"এই দুর্য্যোগে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন ?"

"তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ ?"

এর উত্তরের পরিবর্ত্তে রাখু তাহার নগ্ন পদতলে করস্পর্শ অনুভব করিল। অনুভূতি কি মধুর! রাখু বলিল—

"বাছা, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি কিছু মনে করি নি।"

"কোথায় যাচ্ছিলেন ?"

"যাচ্ছিলুম না,—এক জায়গায় গিয়েছিলুম। সেখান থেকে বাসায় ফিরছিলুম। যখন বেরিয়েছিলুম তখন ঝড় ছিল না। পথে ঝড়ে পড়েছি—এখানে একটু আশ্রয় পেয়ে দাঁড়িয়েছি।"

"এখন কোথায় যাচ্ছিলেন ?"

"বৃষ্টি আসবার লক্ষণ দেখছি না, সেই জন্য বাসায় যাচ্ছি।"

"ভিজতে ভিজতে ?"

"কি করব, ছাতি নেই।"

"কোথায় বাসা ?"

"কুমোরটুলী।"

"ওমা, সে যে অনেক দূর!"

এই সময় বাতাসটা ঘুরিয়া খানিকটা জলের ছিটা লইয়া যে স্থানে উভয়ে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল, সেস্থান আক্রমণ করিল। মেয়েটি বলিল—

"দোরের ভিতর আসুন, নইলে এখুনি আপনার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যাবে।"

"নাইতে চলেছি—ভেজার ভয় করলে চলবে কেন ?"

"তাকি হয় ?"

এই বলিয়াই রমণী ডাকিল—

"বিশু।"

হিন্দুস্থানী ভৃত্য বিশু বাহিরে আসিয়াই বলিল—

"কি, মা ?"

"একখানা গাড়ী নিয়ে আয়, কুমোরটুলী যাবে।"

রাখু বলিল—

"কি, আমার জন্য ?"

"ভাড়া আমি দেব।"

"তা বুঝেছি, কিন্তু দিয়ে লাভ নেই। আমাকে ভিজতেই হবে। যেখানে আমার বাসা সেখানে গাড়ী যায় না।"

চাকর জিজ্ঞাসা করিল—

"কি করব, মা ?"

"গাড়ী আনবি।"

"যে বৃষ্টি পড়ছে, বহুত ভাড়া হাঁকবে।"

"যা চায় তাইতেই আনবি।"

ভৃত্য একটা ছাতি আনিতে আবার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। আবার এক ঝাপটা। রমণী রাখুকে আবার ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিল।

"বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্য জেদ করছি নে। এই দোরের পাশেই বসবার স্থান আছে। আপনাকে যাতে ভিজতে না হয়, তারও ব্যবস্থা করব—ছাতি দেব। আসুন।"

বলিয়াই আবার বাড়ীর দিকে সে মুখ করিয়া ডাকিল—

"ঝি!"

চাকর দোরের ভিতর দিক হইতে ডাকিল—

"ঝি, মা ডাকছে।":

বলিয়াই সে বাহিরে আসিয়া ছাতা খুলিয়া পথের জল-স্রোতে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রমণী দেখিল, রাখুও দেখিল—তাহার জানু পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়াছে। দূরের সেই ক্ষীণ আলোকে রাস্তার জলটা একরূপ দেখা যাইতেছিল। এখন আবার আর একটা ঝটকা বাতাসে সেটাও নিবিয়া গেল।

(৩)

এখন আবার এ উহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, ভাল করিয়া দেখা কাহারও ভাগ্যে ঘটিতেছিল না। রাখু শুধু বিদ্যুৎ-ঝলকে স্ত্রীলোকটার নাকে বোধ হয় যেন তড়িৎ-বিন্দুর মত একটা কি জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল। আর হাতনাড়ার সময় একটা মধুর শব্দও তাহার কানে বাজিয়াছিল। রমণী রাখুর পোষাক-পরিচ্ছদটা বিদ্যুতের ক্ষুদ্র চমকে কতকটা দেখিয়া লইয়াছে। কিন্তু যেটা না দেখিবার জন্য সে এমন একটা বিষম অপরাধ করিল এবং তড়িতের সাহায্যে একবার মাত্র দেখিয়াই দেয়ালে টলিয়া পড়িল, রাখুর সেই মুখ বিদ্যুৎ অসংখ্য চিকমিকিতেও আর তাহাকে দেখিতে দিল না। এখন আবার দুজনেই ঘনান্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

কেহ কাহাকে আর দেখিবার চেষ্টা না করিয়াই এইবার তাহারা কথা কহিতেছে। বুঝি পরস্পরের কথার আকর্ষণে যে যার স্থানে নিবদ্ধবৎ দাঁড়াইয়া আছে।

"তাইত ঠাকুর। এ দুর্য্যোগে আপনি কেমন করে' যাবেন?"

"দুর্য্যোগ তো খুবই দেখছি; তবু আমাকে যেতে হবে।"

"যেতেই হবে?"

"যেতেই হবে।—নইলে সারা রাত উপবাসী থাকতে হবে।"

"উপবাসী থাকতে হবে কেন?"

"আমাকে নিজ হাতে পাক করতে হয়।"

"রেঁধে দেবার লোক নেই?"

"এখানে নেই, দেশে আছে।"

"স্ত্রী ?"

"না।"

"আপনি কি বিবাহ করেন নাই ?"

রাখু চুপ করিয়া রহিল। মেয়েটা তাহার আবছায়ার পার্শ্বে আসিয়া বলিল—

"বুঝেছি,—আপনার স্ত্রী মারা গেছে।"

রাখু এ কথারও কোন উত্তর দিল না।

"জিজ্ঞাসা করে' আপনার মনে দেখছি বড় কষ্ট দিলুম।"

এ কথাতেও রাখু হাঁ কি না কোন কথা কহিল না।

(৪)

ঠিক এমনি সময়ে একদিক থেকে একটা বড রকমের ঝাপটা আসিল—অপর দিক থেকে আসিল ঝি। ঝিও অন্ধকারে অন্ধকারে আসিয়াছিল। আসিতে বোধ হয় দেহের কোন স্থানে সামান্য কিছু আঘাত পাইয়াছিল, সেইটাকে একটু বড করিয়া সে গোটা দুই আর্ত্ত কথার সঙ্গে "পোড়া" দেবতাকেও গোটা দুই মিষ্ট কথা শুনাইয়া দিল।

তাহাকে আর কোন কথা কহিতে না দিয়া মেয়েটা কহিল—

"শীগ্‌গির ভেলভেটের আসনখানা নিয়ে আয়। উপরে অরগ্যানের উপরে বোধ হয় আছে। না থাকে, খুঁজে আন।"

ঝি একবার মুখ বাহির করিয়া উভয়কে দেখিল অথবা দেখিবার চেষ্টা করিল। কিছু দেখিতে পাক আর নাই পাক, এটা সে নিশ্চয় বুঝিল—তাহার দিদিমণি যাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, সে বাবু নয়। একটু চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—

"আলো আনব না ?"

"দরকার নেই, তুই আসন আন।"

"পোড়া দেবতার উৎপাতে আলো আনবার কি ছাই যো আছে ?"

বলিয়াই ঝি চলিয়া গেল। রাখু বলিল—

"আসন কেন ?"

"আপনার জন্য।"

"কিছু প্রয়োজন ছিল না। আমি এখানে বেশ আছি।"

"আপনি থাকতে পারেন, আমি ত নই। আমার সমস্ত কাপড় জলের ছাটে ভিজে গেল।"

"কেন বাছা, তুমি দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছ, ঘরে যাও না কেন?"

"যেতে পাচ্ছি কই?"

"আমার জন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না, বাছা।" তুমি যাও। এরকম ভেজা আমার অভ্যাস আছে।"

"আপনি ছেলেমানুষ - বুড়োর মত আমাকে অমন 'বাছা বাছা' করছেন কেন?"

রাখু এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। আর একটা প্রবল ঝটকা একটু বেশী রকমের জলের উচ্ছ্বাস লইয়া স্থানটাকে আক্রমণ করিল। জলে ভিজা অভ্যাসের গর্ব্ব করিয়াও রাখুকে একটু পিছাইতে হইল। পিছাইতে গিয়া রমণীর গায়ে তাহার গা ঠেকিল। সঙ্কোচের সহিত সরিতে গিয়া রাখু দেখিল—রমণীর হাতে তাহার হাতটা বাঁধিয়া গিয়াছে। আলোক থাকিলে রাখু দেখিতে পাইত—সে হাতখানা এমন জোরে কাঁপিতেছে যে, তাহার হাতও সে কম্পনের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া তাহার হৃদয়ে শিহরণ আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

"আসুন।"—

বলিয়াই মেয়েটা রাখুকে একটু আকর্ষণ করিল। রাখু দেখিল, মেয়েটা ক্রমে অনিষ্টতার বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু বলপ্রয়োগে তাহার হাত হইতে হাতটা টানিয়া লইতে তাহার সাহস হইল না। পাছে স্ত্রীলোকটা দুঃখিত হয়,—রাখু বলিল

"বেশ চল। একটু না বসলে তুমি যখন তুষ্ট হবে না, তখন একটু বসি।"

রাখুর সম্মতিতে যেন কত আশ্বস্ত হইয়া করের বাঁধনটা একটু দৃঢ় করিয়া সে বলিল—

"চল।—আ আমার মরণ, কি বল্লুম—চলুন। আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। ওটা অভ্যাস-দোষে বলেছি।"

"বলেছ তাতে কি আর হ'য়েছে।—চল।"

(৫)

যে জ্যৈষ্ঠ মাসের যে দিনের ঝড়ে সাত শত পুরী-যাত্রীকে লইয়া সেন্ট লরেন্স জাহাজ সাগর-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল, এ সেই ১২৯৪ সালের জ্যৈষ্ঠ

মাসের সেই দিন—১২ই জ্যৈষ্ঠ। সমস্ত দিনটা আকাশ মেঘলা করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা ঝড় যে আসিতেছে, ইহা সহরের কেহই বুঝিতে পারে নাই। জাহাজের অভিজ্ঞ কাপ্তেনও বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং পাড়াগেঁয়ে মূর্খ রাখুর না বুঝায় কাহারও বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঝড়ের ভাব কেহই বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বাড়িতেছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই কালবৈশাখীর মত দেখিতে দেখিতে বায়ুর বেগ প্রবল হইয়া উঠিল যে সময় মেয়েটা রাখুর হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন ঝড় মূর্ত্তি ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই রমণী ঝিকে ডাকিল, উত্তর পাইল না। যথাসম্ভব উচ্চ কণ্ঠে আর একবার ডাকিল, উত্তর পাইল না। তখন চলিবার পথের পার্শ্বে সিমেণ্ট করা উঁচু ধাপের উপর নিজের অঞ্চলটা পাতিয়া বলিল—

"আপাততঃ এইটার উপরে ব'স।"

অন্ধকারে মেঝের উপর হাত দিয়া রাখু দেখিল, একখানা কাপড়। জিজ্ঞাসা করিল—

"এটা কি?"

"ব'স, তার পর বলছি।"

অন্ধকারেই মেয়েটা বুঝিতে পারিল, রাখু বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। সে শপথ করিয়া রাখুকে অভয় দিল। "তুমি" বলা ছাড়িয়া আবার "আপনি" বলিতে আরম্ভ করিল।

বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখু বুঝিল, তাহার দুই হাত একেবারে গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে।

"একি তুমি আঁচল পেতে দিয়েছ!"

মেয়েটা কোন উত্তর দিল না। এই সময় ঝি নীচে আসিয়া বলিল—

"দিদিমণি, আসন তো পেলুম না।"

"থাক্ দরকার নেই। তুই মাসীর ঘরে গিয়ে একবার দেখে আয়, জানলাগুলো ঠিক বন্ধ আছে কি না।"—আর রাখুর উদ্দেশ্যে সে বলিল—

"আপনার কি তামাক খাওয়া হয়?"

তামাক খাই না, একথা রাখু বলিতে পারিল না। বাল্যকাল হইতেই তামাক খাওয়ায় সে বিশেষ ভাবেই অভ্যস্ত ছিল। বহুক্ষণ ধূমপান করিতে না পাইয়া তাহার পেট ফুলিতেছিল। কিন্তু হুঁকা সম্বন্ধে তাহার দেশের যে বিষম

আচার নিষ্ঠা সে কলিকাতায় করিয়া আনিয়াছে, আজও পর্য্যন্ত তাহার তাহা পরিত্যাগের প্রয়োজন হয় নাই। বাসায় তাহার নিজের একটি খেলো হুঁকা ছিল, সে সেইটিতেই তামাক খাইত। সেটি কাহাকেও সে দিত না, অথবা কাহারও হুঁকাতে সে তামাক খাইত না! অল্পদিন মাত্র সে কলিকাতায় আসিয়াছে, আর আসিয়াছে সে ঠাকুর পূজার কাজ করিতে। ব্যবসায়ের খাতিরেও তাহার আচার রক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল। পতিতার গৃহে তামাক খাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। সে বলিল—

"থাক আর কাজ নেই।"

"নূতন হুঁকো আছে, আজও পর্য্যন্ত কেউ তা'তে মুখ দেয় নি। যা ঝি, সোফার পাশের বৈঠকে যে গড়গড়াটা আছে, গঙ্গাজলে ফিরিয়ে বিষ্ণুপুরে তামাক সেজে নিয়ে আয়।"

আসল কথা—ঝিকে স্থানান্তরিত করাই তাহার উদ্দেশ্য, পাছে অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাদের নির্জ্জনালাপ সে শুনিতে পায়।

ঝি গেল না। সত্য সত্যই সে একটু আড়ালে দাঁড়াইল। ব্যাপারটা তাহার কাছে কিছু নূতন মত ঠেকিতেছে। রাখু বলিল—

"কেন ওকে মিছামিছি কষ্ট দেবে, তামাক আমি খাব না।"

"আমার কথা আপনি কি মিছে মনে করলেন? বল্‌লে হয়ত আপনার বিশ্বাস না হতে পারে, সবে মাত্র আজ আমি এ বাড়ীতে বাস করতে এসেছি। আমার ঘরটি ছাড়া আর সব ঘর এখনও খালি পড়ে আছে।"

"অবিশ্বাস করিনি,—এখনি আমাকে উঠ্‌তে হবে।"

অন্তরাল হইতে ঝি বলিয়া উঠিল—

"কেন বাবু, দিদিমণি যখন থাকতে বলছে তখন থাক না। আমাদের বাবু বোধ হয় আজ আর আসতে পারবেন না।"

"আ মর্, এখনও তুই দাঁড়িয়ে আছিস?"

বলিয়াই মেয়েটা ঝিকে আরও দুটা রাগের কথা শুনাইয়া তৎক্ষণাৎ স্থান-ত্যাগে আদেশ করিল।

ঝি বলিল—

"হাত ধরে' বাবুকে ঘরেই নিয়ে এস না দিদিমণি, ভূত-পেত্নীর মত অন্ধকারে বসে ফিসফিস করছ কেন? বাবু আজ আর আসছে না। এলে তিনি এতক্ষণ আসতেন।"

"তুই কি আমার কথা শুনবিনি ?"

"আর যদিই আসেন, তোমার মাসীর ঘরে তো কেউ নেই, আমি ওকে সেই ঘরে লুকিয়ে রাখবো এখন।"

"আ মঁল, তুই ত অতি নচ্ছার।"

"নচ্ছার ত বটি, নইলে তোমার ঘরে চাকরী করতে আসব কেন ?"

রাগের ভরে এইবারে ঝি সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

"বাবু" কথা শুনিবামাত্র রাখু বিশেষ ভীত হইয়া পড়িল। সে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

"আর না, আমি চললুম।"

তাহার ওঠা বুঝিতে পারিয়া মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল এবং রাখু দ্বারের দিকে দুই পা যাইতে না যাইতে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

"ব্যস্ত হচ্চেন কেন, থাক্‌তে না চান, দুর্য্যোগটা একটু কম্‌লে যাবেন।"

"এ দুর্য্যোগ আজ আর ছাড়বে না।"

"বেশ, গাড়ী আসবার অপেক্ষা করুন।"

"গাড়ী যদি না পাওয়া যায় ?"

রাখুর কথা শেষ হইতে না হইতে বিশু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সে গাড়ী পায় নাই। গাড়ীর আড্ডায় একখানিও গাড়ী ছিল না—আস্তাবল হইতেও কেহ গাড়ী লইয়া আসিতে চাহিল না। সে এমন একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের সংবাদ দিল, সেটা তাহারা দুইজনে ঘরের ভিতর হইতে বুঝিতে পারে নাই। এর উপর আবার বিশুর কথায় বুঝা গেল, গাড়ী পাইলেও সে গলির ভিতর গাড়ী আসিবার উপায় নাই। রাস্তায় স্থানে স্থানে এক কোমর জল হইয়াছে, পথের সমস্ত আলোই প্রায় নিবিয়া গিয়াছে। এমন অন্ধকার যে বিশুরই সে বাড়ীতে ফিরিতে তিন বার আছাড় খাইতে হইয়াছে ও বাড়ীর দরজা ঠিক করিতে দু'তিন বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে হইয়াছে।

"আর কেন, হাত ছাড়।"

মেয়েটা হাত ছাড়িল না, কোন উত্তরও দিল না। রাখু আবার হাত ছাড়িবার অনুরোধ করিল। অনুরোধের ফলে রাখু দেখিল—দুই হাতে তাহার মণিবন্ধ বাঁধা পড়িয়াছে. রাখু এবারে নিজের হাত মৃদু আকর্ষণ করিল।

"হাত টানছ কেন? আমি তোমাকে ছাড়ব না।—ছাড়তে পারি না। এরূপ দুর্দ্দিনে কেউ শত্রুকেও ঘর থেকে যেতে দেয় না। কুকুর বেড়ালকেও বাড়ীর বার করে না।"

"দোহাই, আমি গরীব ব্রাহ্মণ—।"

"সে তোমাকে বলতে হবে কেন—আমি দেখামাত্র বুঝেছি।"

"আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি?"

"কিছু না, অপরাধ করেছি আমি"

আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, পারিল না। বলিতে বলিতে কথা জড়াইয়া মধ্যপথে রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন সে রাখুর হাত ছাড়িয়া দুই হাতে তাহার পা ধরিল। রাখু এবারে আপনাকে যথার্থই বিপন্ন বোধ করিল। ঘটনাটা যেন ক্রমে তাহার বোধের অতীত হইয়া যাইতেছে। তবে চরণ আকর্ষণ করিয়াই সে বলিল—

"বেশ, আসনখানা নিয়ে এস, আমি এইখানেই বসি।"

"আমি যাই আসন আনতে, আর আপনি যান পালিয়ে।"

যথার্থই রাখুর মনে পলাইবার ইচ্ছাটা জাগিয়াছিল। মনটা যেন এই নারীর অন্ধকার-ভেদী দৃষ্টির কাছে ধরা পড়িয়াছে। তাহার কথায় উত্তর না দিতে পারিয়া রাখু তাহাকে পা ছাড়িয়া উঠিতে অনুরোধ করিল।

"বলুন—'থাকবো'।"

"পা ছেড়ে দাও।"

"বলুন—'থাকবো'।"

"না বললে ছাড়বে না?"

"না।"

"এই এমনি ভাবে বসে থাকবে?"

"কাজেই। আপনাকে যা' বলবার তাতো আগেই বলেছি।" আপনি একবার বলুন—'থাকবো', তাহ'লে এ হাত দিয়ে আপনার পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করব না।"

পবিত্রতার অভিমান লইয়াই রাখু এতক্ষণ প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল। পতিতার মুখ হইতে সে কথা শুনিয়াই রাখুর মন আর্দ্র হইল। দুর্ব্বলতা কখন কোন রন্ধ্র দিয়া মানুষের চিত্তে প্রবেশ করে, তাহা মানুষ কদাচ বুঝিতে সমর্থ। বুঝিতে পারিলে মানুষকে দেবতা হইবার জন্য বেশী

পরিশ্রম করিতে হইত না। কত সময় কত মানুষ আপনাকে দেবতা নিশ্চয় করিয়া কার্য্যতঃ দানবতার সহিত সখ্য করিয়াছে।

রাখুর কথার স্বর নরম হইল, কিন্তু ভয়টা ত তাহার এখনও দূর হয় নাই,—যদি রাত্রে মেয়েটার 'বাবু' আসিয়া পড়ে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে তাহার পায়ের উপর উষ্ণ অশ্রুর স্পর্শানুভব করিল। মেয়েটার হাতখানা নিজ হাতে ধরিয়া সে তাহাকে উঠাইতে উঠাইতে বলিল—

"উঠ, অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। ঝড় বৃষ্টি না থামলে আমি যাব না, কিন্তু—।"

"কিন্তু কি বল ?"

"যদি তোমার বাবু আসেন, তিনি এখানে আমাকে দেখে যদি কিছু মনে করেন ?"

"আজ এখানে আর কেউ আসবে না, তা আপনি থাকুন আর নাই থাকুন।"

"তুমি কেমন করে' জানলে ?

"আমি আসতে দেব না।"

বলিয়াই মেয়েটা বিশুকে দরজা বন্ধ করতে আদেশ দিল। আর বলিল—"যদি ইনি যেতে চান ত দরজা খুলে দিবি, নইলে বাইরে থেকে যে কেউ আসুক—খবরদার কাউকেও দরজা খুলে দিবিনি।"

এমনি সময়ে পথের অপর পার্শ্বের একখানি বাড়ীর বারান্দা হইতে কে একটা স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল—

"ও ফুল, ফুল। ও চারুবিবি।"

ঝড়ের শব্দকেও ভেদ করিয়া সে শব্দ তাহাদের কানে বাজিল। চাকরটা বলিয়া উঠিল—

"মা, তোমাকে ডাকছে।"

"শুনতে পেয়েছি। তুই দরজা বন্ধ করে দে। সাড়া দেবার দরকার নেই।"

ভৃত্য দ্বার বন্ধ করিল। রাখু জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার নাম—চারু ?"

"না।"

"বিশুতো হ'লে ওকথা বললে কেন ?"
"বিশু বুঝতে পারেনি।"
"না, তোমারই নাম—চারু।"
"তবে - চারু।"

(ক্রমশঃ)

বিফল নিশীথে।

(শ্রীকালিদাসী দেবী।)

সখি রজনী যে নাহি আর।
পাণ্ডু বদনে মিলায় আকাশে,—
লক্ষ তারকা হার।
ঘৃত দীপগুলি বৃথা নিভে যায়,
চন্দন-চুয়া মিলাইল কায়,—
খসিয়া পড়িছে মালার পুষ্প,
সাজান কুঞ্জদ্বার,—
ম্লান হয়ে এলো-হৃদয়ের আলে,—
মুক্ত,—কবরী ভার।
সখি—এমনি অপেখি চাহি,
কত নিশি বল বিফল প্রয়াসে
আশার তরণী বাহি ?
বনপথ চাহি শ্রান্ত নয়ন,
কণ্টক সম কুসুমে শয়ন,
শতবার ছুটে আসি দেখিবারে,
তরু মর্ম্মর শুনি,—
আপনার মনে মাধুরী মিলায়ে
স্বপনের জাল বুনি।
নির্জ্জন বন হায়,—
কতবার ভুলে ভাবি বসে মনে,

লুকাইছে শ্যামকায়,
কেকা রব শুনে—চারিভিতে চাই,
মুরলী বদনে—কই কেহ নাই,
জমাট আঁধার—চাহি ধরিবারে
সাধনার ধন বলি।
কোথায় কান্তঃ! হৃদয় প্রান্ত
নিরাশায় যায় দলি।
দিবস কি সুখে কাটে?
গৃহ আর সেই কদমের তল
গিরি—গোচারণ মাঠে।
ভয়ে নাহি চাই আকাশের পানে,
তমাল কুঞ্জে মাধবী বিজনে,—
শিখীর পুচ্ছ ভয়ে নাহি হেরি,
যদি তারে পড়ে মনে,—
তবু তার ছবি শয়নে স্বপনে,
ফিরে যেন মোর মনে।
আসে কি সাধের রাতি?
কত আশে চাহি সন্ধ্যার পানে
কি সুখে জ্বালাই বাতি।
ভুলায়ে স্বজনে ভ্রমি বনমাঝে,
সাজাই অঙ্গ তারই চাওয়া সাজে—
সাজাই কুঞ্জ—গাঁথি মালা গাছি,
নিত্য নূতন ফুলে!
সে যদি গো আসে আমারি ভবনে,
বারেক পথটী ভুলে!
বৃথাই এ অভিসার,
কঠিন তাহার অন্তর কালো,
যেমন রূপটী তার।
ভঙ্গিটী বাঁকা...বাঁকা ঠাম বাঁশী,...
কেন তার তরে এ গহনে আসি?

বাঁকার প্রয়াসী আর না হইব,....।
হাসিছ তোমরা সবে ?
দেখ সত্যই রাধা-ভুলিবে কৃষ্ণে,
যতদিন ব্রজে রবে।

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ।

স্বরাজ ও স্বারাজ্য

দেশে আগে কথাটা ছিল 'স্বারাজ্য', আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় প্রয়োজন-চক্রে তাহা দাঁড়াইয়াছে 'স্বরাজ'। স্বারাজ্য ছিল অন্তরের একটা রূপান্তর, মানুষের স্বভাবের একটা শুদ্ধি ও ঋদ্ধি; স্বরাজ হইতেছে বাহিরের একটা রূপ-গঠন, মানুষের একটা কর্ম্মক্ষেত্রের পরিশোধন সম্প্রসারণ শৃঙ্খলাবিন্যাস। তারপর স্বারাজ্য ছিল ব্যষ্টিগত একটা সিদ্ধি, স্বরাজ কিন্তু হইতেছে সমষ্টিগত একটা সিদ্ধি।

আধুনিক যুগের বিশেষত্ব, তাহার দান হইতেছে ঠিক এই দুইটি জিনিষ—প্রথম, বাহিরের জগতের জীবনের উপর টান, মাটির পৃথিবীর রসে শক্তিতে জ্ঞানে ভরপুর হইয়া উঠা, আর দ্বিতীয়, এই জ্ঞান এই শক্তি এই আনন্দ হওয়া চাই সকলের সমবেত জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ, এ জিনিষটি কেবল পৃথক পৃথক ভাবে এখানে ওখানে দুই চারিজনের সম্পত্তি হইলে চলিবে না। সমষ্টি আর বাহির, এই দুইএর মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সমষ্টি যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে তাহার অর্থ ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধ—দান প্রতিদান, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া—তাহার অর্থ কর্ম্মক্ষেত্র। ফলতঃ সমষ্টির স্বাভাবিক সাধনা হইতেছে কর্ম্মের সাধনা, কর্ম্মই সমষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই সমষ্টির জীবন ও জীবনের সার্থকতা। পক্ষান্তরে কর্ম্মী যাহারা, জীবন-সাধক যাহারা, বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে অপরের সাথে লেনা-দেনা করিতে হয়, গ্রহণ করিতে হয় একটা সমষ্টিগত ব্রত ও আদর্শ।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এই সমষ্টিগত ব্রত ও আদর্শ হইতেছে রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও শক্তি, কারণ, ভারতবর্ষের সমষ্টিগত জীবনে এই জিনিষটাই এখন দেখা দিয়াছে প্রথম ও প্রাথমিক প্রয়োজনরূপে। আমাদের অবস্থার বিপাকে

ঘটনার তাড়নায় এইটাই হইয়া উঠিয়াছে আমাদের স্বরাজ। কিন্তু স্বরাজের এটা একটা রূপ মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে (এমন কি আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও) অন্য রকম স্বরাজ-সাধনার চেষ্টা চলিয়াছে - রাজ্যশাসনের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ বা যোগ থাকিলেও, এ জিনিষটি সেখানে মুখ্য কথা নয়। আমাদের স্বরাজ-চেতনা ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া জাগিয়াছে, এরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—কিন্তু এই ইউরোপেই স্বরাজের সাধনা কেমন ভেল বদলাইয়া বদলাইয়া চলিয়াছে তাহা দেখিবার বিষয়। আমরা আজ যেমন বলিতেছি চাই স্বরাজ অর্থাৎ 'পলিটিকাল' মুক্তি, এইটিই আসল জিনিষ, এটি হইলে আর সব জিনিস আপনা হইতেই ফুটিয়া ফাটিয়া বাহির হইবে, ঠিক তেমনি ইউরোপও একদিন মনে করিয়াছিল যে রাষ্ট্রীয় মুক্তি সাম্য ও শক্তি হইলেই সমষ্টির মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ফরাসী বিপ্লব এই ভাবটিকেই মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল - আমেরিকা বা ইতালীতে স্বরাজের বীজ নিক্ষেপ করিয়া যায় এই ফরাসী বিপ্লব, জর্ম্মনীর রাষ্ট্রীয় প্রতিভা ফুটিয়া উঠে এই বিপ্লবেরই ধাক্কায়। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল পলিটিকাল স্বরাজ অভীষ্টকে আনিয়া দেয় নাই, যে অভাব-বোধে লোকে স্বরাজ চাহিয়াছিল, স্বরাজ পাইয়াও সে অভাব তেমনি অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তখন উঠিলেন সেণ্ট সিমন (Saint Simon), কার্ল মার্ক্স (Karl Marx), তাঁহারা বলিলেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা মানুষকে স্বাধীন করিতে পারে না, চাই সামাজিক স্বাধীনতা। সমাজে স্বাধীন কে? যাহার অর্থ আছে। সুতরাং আগে চাই অর্থ বিষয়ে সাম্য ও স্বাধীনতা। এইরূপেই হইল সোসিয়ালিজ্‌মের ভিত্তি-স্থাপন। রাষ্ট্রের আইন-কানুন লোককে ভোট দিবার, প্রতিনিধি পাঠাইবার, আইন গড়িবার বা অন্য রকম যত অধিকারই দিক না কেন, সমাজের অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে সে সব অধিকার কোন উপকারে আসিবে না। সমাজের যে আছে দুইটি শ্রেণী বা স্তর—এক ধনী আর দরিদ্র, এক মহাজন ও মুনিব আর মজুর ও চাকর—ইহার দরুণ নিম্নের যে শ্রেণী নীচের যে স্তর তাহাকে বাধ্য হইয়া উচ্চ শ্রেণীর উপরের স্তরের পদানত হইতে হয়, বড় লোকের সর্ব্ববিষয়ে অনুগত হইয়া চলা ছাড়া ছোটলোকের আর উপায় কি?

পদমর্য্যাদা ক্ষমতা শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নতি, যাহাই বল না কেন সে সব বড়লোকেরই ভাগ্যে হয়। গরীবদের দিন আনিয়া দিন খাইতেই পরিশ্রান্ত

হইতে হয়, আর এজন্যও বড়লোকদেরই কাছে যাইতে হয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যার অর্থ অর্থের সমস্যা। লোককে অর্থের স্বরাজ পাইতে হইবে, তবে রাষ্ট্রের স্বরাজের একটা অর্থ হইবে। এই অর্থের স্বরাজ লইয়াই ইউরোপের মারামারি এখন চলিতেছে। রুশিয়ায় বলশেভিকেরা খুব জোরে একটা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া এই রকম একটা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অন্ততঃ করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

কিন্তু একটু চিন্তাশীল যাঁহারা, জিনিষকে যাঁহারা তলাইয়া দেখেন, যাঁহারা দূরে নজর দেন তাঁহারা ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিতেছেন এখানে আসিয়াও মানুষের মুক্তি নাই। কুলি মজুর চাষাভুষা—সমাজের পতিত দীন দরিদ্র যাহারা তাহারা ধনীর ধন কাড়িয়া লইল, ভাল করিয়া খাইতে পরিতে পারিল, তাহারাই হইল রাজ্যের কর্ত্তা, কিন্তু ইহাতে কি সমাজের পিছাইয়া পড়িবার আশঙ্কা নাই? বলশেভিকদের দেখিয়া কি মনে হয় না দেশটা অতিরিক্ত মাত্রায় বৈশ্য বা বাণিয়া বনিয়া যাইতেছে? শিক্ষার জ্ঞানের চর্চ্চা কি এমন আবহাওয়ায় থাকিতে পারে? সমাজের নিম্নতম স্তর যেখানে মাথায় উঠিয়াছে সেখানে শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান এ সব জিনিষ জন্মিতে পারে, না টিকিতে পারে? সেখানে যে শিক্ষা সম্ভব, যে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় তাহা হইতেছে অর্থকরী শিক্ষা, খাওয়া পরার মালমসলা যোগানের শিক্ষা। পলিটিকাল প্রয়াসের যখন প্রাধান্য ছিল তখন ইকনমিকস্ (economics) আমল পায় নাই, সেই রকম ইকনমিক্যাল প্রয়াস যখন প্রধান তখন যে এডুকেশন মানুষের আমল পাইবে না তাহাও কিছু আশ্চর্য্যের নয়।* তাই ভয় হয়, মানুষের জীবনকে সচ্ছল করিতে গিয়া, তাহার মনকে উপবাসী না করিয়া রাখি, সমাজে শুধু যাহারা গতর খাটাইয়া চলে তাহাদের সুখ সুবিধা করিতে গিয়া সমস্ত সমাজটাকে একটা গতরখাটান যন্ত্র না বানাইয়া ফেলি।

পাছে সমাজ এই রকমে ক্রমে বর্ব্বরতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সেইজন্য ইতিমধ্যেই প্রত্যেক দেশে আর একদল লোক দেখা দিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, দণ্ডশাসনের সমস্যা, অর্থের সমস্যা তারও আগে হইতেছে শিক্ষার সমস্যা—লোকের প্রথম চক্ষু ফুটাইতে হইবে, মনটাকে তৈয়ারী করিতে হইবে,

---

* শুনুন আমাদের দেশের আজকালকার মন্ত্র—Education can wait, but Swaraj cannot.

নতুবা আর সব জিনিষ পণ্ডশ্রম মাত্র। আর স্পষ্টই ত দেখা যাইতেছে পলিটিকাল আন্দোলন কর আর economical আন্দোলন কর, তার গোড়ার কথা হইতেছে মনের সাড়া, মনের পরিবর্ত্তন, মূলতঃ আন্দোলন অর্থই হইতেছে একটা শিক্ষা। তবে সে শিক্ষা শুধু একটা দিক হইয়া একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষা। শিক্ষাই যদি গোড়ার কথা হইল, তবে শিক্ষাটাকে ওরকম সঙ্কীর্ণ না করিয়া রাখিয়া ব্যাপক করিয়া তোলা, শিক্ষাকে শিক্ষা করিয়া ধরা। সুতরাং দাঁড়াইল এই, আগে পলিটিকাল স্বরাজ নয়, আগে ইকনমিক্যাল স্বরাজও নয়, আগে হইতেছে এডুকেশনাল স্বরাজ। মানুষের মনকে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত পরিপুষ্ট করিয়া তোল, সব সমস্যার পূরণ আপনা হইতেই হইবে। এখন যে কোন মীমাংসাই হইতেছে না, শত চেষ্টার ফল হইতেছে শুধু গণ্ডগোল, তার কারণ আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি।

এই শিক্ষা কিরূপে হয়, মানুষের মনকে কি রকমে তৈয়ার করিতে হয়, চিন্তাশক্তিকে কি রকমে বাড়াইতে হয়, জ্ঞানকে কি রকমে জাগাইতে হয় তাহা লইয়া অনেক গবেষণা চলিয়াছে অনেক পরীক্ষাও চলিয়াছে। শিক্ষার অর্থ কি, ইহার উদ্দেশ্য কি, উপায় কি? ব্যষ্টিকে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, গোষ্ঠীকেই বা কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে? একটা নেশনের শিক্ষার ধারা কি, সমগ্র মানবজাতির শিক্ষার ধারাই বা কি? পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ, মনীষিবৃন্দ—Intelligentsia—আগে সেই কথা ভাবিতেছেন, সেই প্রয়াসে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা কিন্তু আরও একটু আগাইয়া যাইতে চাই। শিক্ষাসমস্যারও মধ্যে আর একটি সমস্যা অনুস্যূত আছে, আমরা সর্ব্বাগ্রে সেইটার উপর জোর দিতে চাই। মানুষের দেখিতে পাই আছে তিনটি ক্ষেত্র, তিনটি স্তর—দেহ, প্রাণ ও মন। সেই অনুসারে বাহিরের জগতে সমষ্টিকে লইয়া রচিত হইয়াছে তিনটি আয়তন। প্রথমতঃ সমষ্টির দৈহিক আয়তন। মানুষ যাহাতে শান্তিতে থাকিতে পারে, নিরুপদ্রবে চলিতে ফিরিতে পারে, মুক্তভাবে পরস্পর লেনাদেনা করিতে পারে—ইহাই দৈহিক আয়তনের কথা, ইহারই অন্য নাম পলিটিক্স। পলিটিক্স বা রাষ্ট্রনীতি বা দণ্ডনীতি সমাজের প্রতিষ্ঠা; উহাই মিটাইতেছে সমাজের প্রথম ও প্রাথমিক প্রয়োজন—থাকিবার দাঁড়াইবার জায়গা, চলিবার বাড়িবার সুবিধা ও অবকাশ। সমাজরূপ জগতের ইহাই পৃথিবী। তারপর দেহের উপরে প্রাণ। প্রাণ কি চায়, প্রাণের ধর্ম্ম কি?

প্রাণ চায় বাঁচিয়া থাকিতে, প্রাণের ধর্ম্ম গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা। সমাজের প্রাণ-ধর্ম্ম—জীবন-ধারণ, খাওয়া-পরার কথা লইয়া যে আয়তন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই নাম ইকনমিক্স বা অর্থনীতি। ইহাকে আমরা বলিতে পারি সমাজ-জগতের অন্তরীক্ষ। প্রাণের পরে হইতেছে মন। মানুষ চায় আপনার বলিতে থাকিবার একটা জায়গা, সে চায় বাঁচিবার জন্য খাওয়া-পরা, কিন্তু এখানেই তাহার সব দাবি বা প্রয়োজন শেষ হইল না, সে চায় আবার জানিতে শুনিতে। বরং এই জানাশুনা তাহার যত ভালরকম হইবে, তাহার থাকা ও বাঁচার প্রশ্নটারও তত সুন্দর মীমাংসা হইবে, ইহা ছাড়া জানাশুনারও নিজস্ব একটা আনন্দ, একটা মূল্য আছে। সমাজেরও তাই আছে একটা জানাশুনা অর্থাৎ শিক্ষার সমস্যা—এই শিক্ষা লইয়াই সমাজের মনের আয়তন। দণ্ডনীতি, অর্থনীতি—তাহারও উপরে হইতেছে শিক্ষানীতি, এডুকেশন—ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সমাজ-জগতের দ্যৌ বা স্বর্গ।

কিন্তু দেহ প্রাণ মন হইতেছে মানুষের স্থূলতর আধার। দেহ প্রাণ মন ছাড়াইয়া আছে একটা বস্তু, সেখানেই মানুষের আসল নিবিড় সত্তা—তাহার নাম আত্মা। পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ—ভূর্ভুবঃস্বঃ—হইতেছে বিষ্ণুর (বা অনন্ত ব্রহ্মের) তিনটি পাদপীঠ। দেহ প্রাণ মন হইতেছে আত্মার ত্রিধা ভিন্ন প্রকাশ। মানুষ দেহকে চায় দেহের জন্য নয়, আত্মার জন্য, মানুষ প্রাণকে চায় প্রাণের জন্য নয়, আত্মার জন্য, মানুষ মনকে চায় মনের জন্য নয়, আত্মার জন্য। এই আত্মাকে জানিতে পারিলে, মানুষ সত্যভাবে পূর্ণভাবে পায় তাহার মনকে, প্রাণকে ও দেহকে। ঠিক সেই রকম, সমাজের যে দণ্ডনীতিক, অর্থনীতিক, শিক্ষানীতিক আয়তন তাহাদের মূল হইতেছে একটা আত্মিক আয়তন—সেইটাই প্রধান ও গোড়ার কথা। এই নিগূঢ় আয়তনটিই আর সকল আয়তনকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যদিয়া আপনাকে সৃষ্টি করিতেছে।

মানুষের সামাজিক প্রচেষ্টা সব যে আশানুরূপ ফল দিতেছে না, তাহার কারণও আমরা ঠিক এখন বুঝিতে পারিব। আমরা প্রথমে চাহিয়াছি শুধু দেহের মুক্তি, তারপর চাহিয়াছি প্রাণের মুক্তি, তারপর চাহিতেছি মনের মুক্তি, কিন্তু সব মুক্তি সম্ভব ও সার্থক হইবে তখনই যখন চাহিব আত্মার মুক্তি—অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের, বিশেষ বিশেষ আয়তনের স্বরাজ নহে, কিন্তু আত্মার স্বারাজ্য। ব্যষ্টিগত হিসাবে যাহা সত্য, সমষ্টিগত হিসাবেও তাহাই সত্য। সমাজের, দেশের, জাতির আত্মা কোথায়, সেই দিকে সকলের

আগে দৃষ্টি দিতে হইবে, সেই সমষ্টিগত আত্মার উদ্বোধন আগে করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় স্বরাজ পাইলে দেশ জাতি সমাজ মুক্তি পাইবে না, অর্থনীতিক স্বরাজ অর্থাৎ খাওয়া-পরার সুশৃঙ্খলা সুবন্দোবস্ত হইলেও সে মুক্তি পাইবে না, এমন কি শিক্ষানীতিক স্বরাজ অর্থাৎ লেখাপড়া, বিদ্যা পাণ্ডিত্য জ্ঞানগুণে ভরপুর হইলেও, নহে। আগে চাই সমাজ-আত্মার স্বারাজ্য। আমরা এমন কথাও বলিতে পারি, এই স্বারাজ্য না হইলে অন্য সব স্বরাজ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। একের পর একে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, তার অর্থই হইতেছে ভিতরে সেই আত্মার স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার ঈষণা—স ঐচ্ছৎ।

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের কথার এমন অর্থ নয়, যে দেশের এই সমষ্টিগত স্বারাজ্য-সিদ্ধি যতদিন না হইতেছে ততদিন ইতরতর স্বরাজের সাধনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, বা সে সব দিকে কোনই মনোযোগ দিতে হইবে না। ব্যষ্টিকে আমরা যেমন বলি না যে কর্ম্মজগৎ হইতে অপসৃত হইয়া দেহ প্রাণ মনকে নাকচ করিয়া সে ধ্যানস্থ সমাধিস্থ হউক, আগে লাভ করুক অন্তরাত্মার স্বারাজ্য, পরে কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া অন্তরাত্মার স্বারাজ্য সিদ্ধি প্রয়োগ করুক দেহ প্রাণে মনে। ব্যষ্টিকে আমরা বলি দেহের প্রাণের মনের সহজ অবস্থা স্বাভাবিক ক্রিয়াকে অব্যাহত রাখিয়া, তাহারই মধ্যে অধ্যাত্মকে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতে, জাগ্রতের মধ্যে চলিতে চলিতেই সমাধির চিৎশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে, সমাধির চিৎশক্তি দিয়া জাগ্রতভাবেই সেই জাগ্রতকে রূপান্তরিত করিতে। ঠিক সেই রকম সমাজের যে সহজ যে প্রয়োজনীয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজীবন—তাহার পলিটিক্স তাহার ইকনমিক্স, তাহার এডুকেশন—সে সমস্তই চালাইতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে ধরিতে হইবে সমাজের অন্তরাত্মা, দেখিতে হইবে উহাদের মধ্যে কতখানি ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিয়াছি এই সমাজের অন্তরাত্মা। সব স্বরাজ-সাধনা যুগপৎ ও অবিরাম চলিবে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে সামাজিক স্বারাজ্যের প্রতীক বা বিগ্রহ হইয়া উঠা, যে স্বরাজ যতখানি স্বারাজ্যের মূর্ত্তি লইয়া উঠিয়াছে, যে স্বরাজের পিছনে আছে যতখানি জাগ্রত স্বারাজ্যের চেতনা, সেই সেই স্বরাজই ততখানি সত্য ও সার্থক।

আমাদের দোষ বা অভাব এইখানে যে সমাজের এক একটি অঙ্গকে আমরা ভিন্ন করিয়া লই এবং তাহারই মুক্তি ও শুদ্ধির চেষ্টা করি বাকী সকলকে স্রেফ

বাদ দিয়া রাখি, অথবা একটিকেই প্রধান করিয়া লইয়া তাহারই স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর আর সকল অঙ্গকে নিযুক্ত করিয়া দেই। কেহ বলেন চাই রাষ্ট্রীয় সাম্য ও স্বাধীনতা, এইটি হইলে আর সব আপনা হইতেই হইবে, ইহার জন্য, ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া অর্থনীতিকে সাজাও ও প্রয়োগ কর—'স্বদেশী' ও 'বয়কট' কর, শিক্ষার বন্দোবস্তও এমনভাবে কর, যে তাহা যেন রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগাইয়া তুলে, রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত ও উদ্যোগী করিয়া তোলে। কেহ বা বলেন, চাই জীবনের স্বচ্ছলতা অর্থের যথেষ্ট উৎপাদন ও ন্যায্য ভাগবাটরা—সেই জন্যই যথাযোগ্য গবর্ণমেণ্ট তৈয়ারী কর, কর ডেমক্রাটিক বা সোসিয়ালিষ্টিক রাষ্ট্র, আর দাও এমন শিক্ষা যাহাতে লোকে খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে পারে, সমাজের ধন বৃদ্ধি করিতে পারে। আবার কেহ বলিতেছেন, না, ওসব আসল উদ্দেশ্য নয়—আসল উদ্দেশ্য শিক্ষা জ্ঞানার্জ্জন, সমাজকে বিদ্যায় বুদ্ধিতে মার্জ্জিত সমলংকৃত করিয়া, cultured করিয়া তোলা। রাষ্ট্রকে এই উদ্দেশ্যে গড়িতে হইবে, অর্থের যথাযথ বন্দোবস্ত এই জন্যই করিতে হইবে।

কিন্তু আসলে সমাজের প্রত্যেক অঙ্গকে আলাদা আলাদা দেখা উচিত নয়, দেখা উচিত গোটা সমাজকে। সমাজের প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট, ওতঃপ্রোত বিজড়িত, তাই বলিয়া আবাব কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়া আর কয়েকটিকে তাহার ছায়ায় আওতায় ফেলিয়া রাখাও উচিত নয়। প্রত্যেক অঙ্গের আছে নিজস্ব সত্য নিজস্ব প্রয়োজন, নিজস্ব সার্থকতা; তাই চাই প্রত্যেকের যুগপৎ মুক্তি ও শুদ্ধি—স্বরাজ সিদ্ধি এবং সকলের সম্মেলন ও সামঞ্জস্য। সকলের এই একৈক পূর্ণতা ও সমবেত সামঞ্জস্য পাইতে হইলে, কেবল ঐ গুলিকে লইয়া সাধন করিলে, উহাদের সহিত সমান স্তরে থাকিলে চলিবে না, আমাদের দৃষ্টি আরও একটু উপরে ও গভীরে চালাইতে হইবে, সমষ্টিগত চেতনাকে, সমাজের সর্ব্বসাধারণ ইচ্ছাশক্তিকে আরও একটা উর্দ্ধতর নিবিড়তর স্তরে উঠাইয়া ধরিতে হইবে, খেলাইয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ সমাজের সমবেত সত্তাকে স্বারাজ্য-সিদ্ধি পাইবাব জন্য সাধনা করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন সমাজের স্বারাজ্য জিনিষটা কি? ব্যক্তির স্বারাজ্য কতকটা বুঝিলেও বুঝিতে পারি, কিন্তু গোষ্ঠীর বা সমষ্টির স্বারাজ্য বস্তুটা তেমন সুস্পষ্ট নয়। তারপর ব্যক্তিগত স্বারাজ্য সিদ্ধির উপায়ও ধরা সহজ, কিন্তু একটা দেশের একটা জাতির, একটা মানব-সঙ্ঘের, অধ্যাত্ম সাধনা চলে কি ভাবে, কোন পথে?

প্রথমতঃ, সমষ্টিগত স্বারাজ্য হইতেছে সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টির স্বারাজ্য অর্থাৎ ব্যষ্টির সেই স্বারাজ্য যাহা শুধু ভিতরের অন্তরাত্মার বস্তু নয়, কিন্তু যাহা আবার জীবনে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। যে মানুষ নিজের আত্মাকে নিজের ভাগবত সত্তাকে পাইয়াছে, যে মানুষ কেবল দেহের প্রাণের মনের বৃত্তি বা প্রেরণা অনুসারে চলিতেছে না কিন্তু চলিতেছে আত্মার সত্যে জ্ঞানে ও আনন্দে ও তাহাকেই মনে প্রাণে দেহে ফুটাইয়া ধরিয়াছে, যে মানুষ সহজ জীবনের স্বাভাবিক আয়তন সমূহ ঢালাই করিয়া লইতেছে অতীন্দ্রিয় জীবনের ছাঁচে ; যে মানুষ অপর মানুষের সহিত সম্বন্ধ যোগাযোগ স্থাপন করিতেছে, জীবিকানির্ব্বাহের উপায় স্থির করিতেছে, শিক্ষাদীক্ষায় আপনাকে ভরিয়া তুলিতেছে অন্তরাত্মার জ্ঞান ভোগ আনন্দের টানে টানে, এই রকম মানুষের সমষ্টি লইয়া যে সিদ্ধি তাহাই হইতেছে সমষ্টিগত স্বারাজ্য সিদ্ধি। আর এই সমষ্টিগত স্বারাজ্য সিদ্ধির উপায়ও হইতেছে, প্রত্যেক ব্যক্তির আপন আপন স্বারাজ্য সিদ্ধির পথে চলা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে স্বারাজ্য পাইলেই চলিবে না, ফলতঃ আমরা যে ব্যষ্টিগত স্বারাজ্যের কথা বলিয়াছি তাহা পৃথক পৃথক ভাবে পাওয়াও সম্ভব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভিতরে একটা সমষ্টির সত্তা উপলব্ধি করিতে হইবে, এক অপরের সহিত অভিন্নাত্মক বুদ্ধি লইয়া চলিবে। প্রত্যেকে যে প্রত্যেকের সহিত একত্ব বা অভিন্নতা অনুভব করিবে তাহা প্রয়োজনের সুবিধার জন্য নয়, ইহার অন্য নাম সহযোগীতা নয়, 'আমি আছি' যেমন একটা সহজ অখণ্ড সত্য, সেই রকম 'আমরা আছি' ইহাও একটি সহজ অখণ্ড সত্য, 'আমি'র পূর্ণতা সার্থকতার সাথে সাথে চলিবে 'আমরা'র পূর্ণতা সার্থকতা। আর এই 'আমরা' শুধু কতকগুলি 'আমি'র যোগফল নয়, এই 'আমরা'র আছে একটা নিজস্ব সত্য, নিজস্ব ধর্ম। 'আমি' হইতেছি এই 'আমরা'র একটা অঙ্গ, একটা যন্ত্র, একটা কেন্দ্র। এই আমরাকে যতখানি শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি 'আমি'ও ততখানি শুদ্ধ ও সিদ্ধ। অন্য কথায়, বহু ব্যষ্টিকে একত্র করিলেই সমষ্টি হয় না—যেমন সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জোড়া দিয়া এক সঙ্গে করিলেই সজীব মানব-আধার হয় না। প্রত্যেক ব্যষ্টির পিছনে আছে একটা সমগ্র, এই সমষ্টিই সেই ব্যষ্টিকে ধারণ করিয়া আছে, প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যষ্টিকে আপন আপন সত্তায় চেতনায় আপনার সমষ্টিগত সত্তাকে চেতনাকে

সম্যক্ জাগরিত করিতে হইবে। তারপর ব্যষ্টির যে রকম জীবনের ধারা ও লক্ষ্য আছে সমষ্টিরও সেই রকম জীবনের ধারা ও লক্ষ্য আছে—ব্যষ্টির জীবনের ধারার ও লক্ষ্যের মধ্যে নিহিত সেই সমষ্টিরই জীবনের ধারা ও লক্ষ্য। প্রত্যেক ব্যষ্টিকে দেখিতে হইবে সমষ্টির সেই নিবিড় জীবনধারা সে কতখানি ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতেছে।

এইভাবে দেখিলে সমষ্টিগত স্বারাজ্য সিদ্ধি হইতেছে সেই বস্তু যখন সমষ্টির আছে যে একটা বিরাট আত্মচেতনা, একটা জীবনপ্রবাহ তাহারই জ্যোতিতে তাহারই শক্তিতে প্রত্যেক ব্যষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই সার্থকতার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক আয়তন প্রয়োজনমত ছাঁচরূপ পাইয়াছে ধর্ম্মকর্ম্ম পাইয়াছে। ইহার পথ হইতেছে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে মিলিয়া, আত্মার সহিত আত্মার বিনিময় করিয়া গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ-চক্র গড়িয়া, একটা পূর্ণ অখণ্ড সমাজ জীবনের স্রোত তাহার মধ্যে বহাইয়া দেওয়া।

আধুনিক সমাজের প্রতিষ্ঠান সব গড়িয়া উঠিয়াছে, সামাজিক জীবন একটা রূপ পাইয়াছে, মানুষের প্রাকৃত স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া, মানুষের দেহের ও প্রাণের ও কথঞ্চিৎ মাত্র মনের দাবি মিটাইবার জন্য। সমাজে স্বারাজ্য অথবা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে তখনই যখন সমাজ গড়িয়া উঠিবে মানুষে অন্তরাত্মার লেনাদেনার ফলে, বাহিরের চাপে বা অভাবের প্রয়োজনে যখন মানুষে মানুষে আদান প্রদান চলিবে না কিন্তু মানুষ যখন ফুটাইয়া তুলিবে একাত্মতার ঐশ্বর্য্য। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের পাওয়া চাই নিজের আসল খাঁটি সত্তা, নিজের অন্তরাত্মা, নিজের ভাগবত পুরুষ, আর ইহারই প্রেরণায় নিজ নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ ও ঋদ্ধ করিয়া চারিদিকে তদনুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা। এই সাথে আবার ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে ধরা চাই সমষ্টির যে একটা নিবিড় সত্তা ও চেতনা, একটা তপঃশক্তি তাহার জীবনশৃঙ্খলার মধ্যে, তাহার আন্দোলন বিলোড়নের মধ্যে, তাহার ক্রমপরিণতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে; সমষ্টির এই গুহাস্থিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত মিলাইয়া, জাগ্রতে সংযোগ রাখিয়া সমষ্টির কর্ম্মপ্রয়াস যখন বিকশিত হইতে থাকিবে, ব্যষ্টিরও জীবন যখন তাহাকে উপচিত করিয়া চলিবে তখন সকল স্বরাজ চেষ্টা স্বারাজ্যেরই এক একটি অব্যর্থ বিভূতি হইয়া উঠিতে থাকিবে।

প্রবর্ত্তক—মাঘ ৩য় সংখ্যা।

সহক্রিয়া।

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

(১)

যতদিন বাবা ছিলেন ততদিন একটা যেন জোর ছিল। কিন্তু তাঁর প্রবল অস্তিত্বের ছায়া যখন সরে গেল, তখন যেন আমাদের সকলের শক্তিই ক্রমশঃ কমে এল। তিনি যে এই অদ্ভুত সংসারের পক্ষে কি ছিলেন, তা সেই দিনই সকলে বুঝতে পারলে, যেদিন সমস্ত গ্রামখানির হাহাকারের সঙ্গে তাঁর মরদেহ শ্মশানে ছাই হয়ে গেল। তাঁকে যারা ভয় করত তারা সেদিন হ'তে ভক্তি করতে আরম্ভ করলে, যারা ভক্তি করত তারা ভাল বাসতে লাগল, আর যারা হিংসা করত তারা সহস্রবার করে এসে মাকে জানিয়ে গেল, যে, 'তাঁর কোন ভয় নেই।"

সংসার তার পরে আবার ঠিকই চলছে, সবই আবার মায়ের চতুর্দ্দিকে সহজেই স্বস্থান অধিকার করেছে। কিন্তু আমার ঋষি আমার জগৎগুরু চলে যাওয়াতে আমার যেস্থান শূন্য হয়েছিল তা ত কেউ পূর্ণ করতে পারেনি। সেই শূন্য স্থানটীর মধ্যে আমি কেন্দ্রহীন তারার মত ঘুরে মরছি। কবে যে এ ঘোরার শেষ হবে কে জানে?

বাবার মৃত্যুতে আমাদের সংসারে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, তার মধ্যে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটেছিল হাসির। যে বোবা পাগল মানুষটা আমাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল তাকে ধরে হাসির সেই হাস্যময় মুখখানি যেন অতি সহজেই বর্ষার দিনে সজল উজ্জ্বল আকাশের মত থম থম করছিল। সেই বোবা মেয়েটী তার কোন পরিচয় দিতে পারে নি, তবু হাসি কি এক অদ্ভুত উপায়ে তার পরিচয় আবিষ্কার করেছিল। মেয়েটী যখন ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে আপনা হ'তে একটু আদটু নড়তে চড়তে আরম্ভ করলে, তখন হাসি, হঠাৎ একদিন বলে উঠলে, "মেয়েটির নাম ব্যথা।" মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করে জানলি?" হাসি সে কথার উত্তর না দিয়ে চ'খে জল ভরে কেবলি হাসতে লাগল। আমি বল্লাম, "ব্যথাই বটে,—শরীরের মধ্যে কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটাটাই মূর্ত্তিমান ব্যথা হয়ে দাঁড়ায়। এও তেমনি হয়ে আমাদের মধ্যে আছে।"

মা বল্লেন, "ছি ছি তা কেন, অমন কথা ব'ল না তোমরা, তা হলে যে—দু'জনার কাছ থেকে আমরা ওকে পেয়েছি তাঁদের অপমান করা হবে।"

হাসি বল্লে, "কখ্খন না - দাঁতে কাঁটা ফুটলে জিব যেমন সেইখানেই লেগে থাকে, ওই পরম দুঃখী মানুষটী আমায় তেমনি করে পিসেমশায়কে মনে করিয়ে দেয়। ওর নাম ব্যথাই বটে।"

মার চক্ষে জল দেখা দিল। তিনি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে চলে গেলেন। হাসিও তার ঘরে ঢুকে ছবি আঁকতে বসে গেল। আমি হাসির পাশে দাঁড়িয়ে সেই ছবিটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বললাম—"এ ছবিখানা ব্যথার ছবি।" হাসি মুখ না তুলেই বল্লে, "ব্যথার নয়, আশার—দেখছ না মেয়েটীকে আকাশের মাঝখানে দাঁড করিয়েও ওর হাত দুটো, চোখ দুটো ওপরের দিকে তুলে দিয়েছি? আকাশের ভয়ানক একাকীত্বের গৌরবের শিখরে উঠেও তার আশার শেষ হয়নি।"

আমি বল্লাম, "সেই জন্যই এ ছবি আশার নয় ব্যথার, যখন সে ভয়ানক একাকী তখনই সে ভয়ানক ব্যথিত।"

হাসি তার ছবি হ'তে মুখ তুলে আমার পানে চাইলে, তারপর কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে বল্লে, "ওঃ! তাই এই ছবিখানার মুখে তোমার ছায়া পড়েছে। আমি না ইচ্ছে করেও তোমার মুখই এঁকে ফেলেছি।"

তার কথা যেন আমায় মারলে। আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে পালিয়ে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ হাসি এসে বল্লে, "একজন কে সন্ন্যাসী এসেছেন, ধর্ম্মশালায় বসে আছেন। তাঁর সারা শরীর হ'তে জ্যোতিঃ যেন ফুটে পড়ছে—চল না দিদি দেখবে।"

আমি চমকে উঠলাম—সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি আবার বালিশে মুখ গুঁজে বল্লাম—"আজ নয়, হাসি, আজ নয়—কাল দেখতে যাব।"

পরের দিন স্নান করে পুষ্পচন্দনে সাজি ভরে পট্টবাসে দেহটাকে সাজিয়ে সাধু দর্শনে ধর্ম্মশালায় গেলাম। গিয়ে দেখলাম, কি দেখলাম? কি জানি কি দেখলাম। সেই উন্নত বরবপু, সেই আপৃষ্ঠ লম্বিত শুষ্ক চুলের রাশি, যেন কপিশ-কেশর-বেষ্টিত-মুখ মহাসিংহ অজিনাসনে বসে আছেন। চক্ষে তাঁর অপলক দৃষ্টি, কিন্তু সে দৃষ্টি কাউকে যে দেখেছিল তা বলবার জো নেই।

কিন্তু একি সেই? এই এত বৎসর পরে কি সেই আমার পরম যোগী

আমারই কাছে ঠিক তেমনি বেশে তেমনি রূপ নিয়ে ধরা দিতে এলেন? একি সেই? আমার মনের মধ্যে যে ছবিখানি এতদিন ধরে চুপ করে বসেছিল, আজকের এই প্রভাতের আলোকে সেই ছবিই কি এমনি ভাবে বাইরে এসেছে? হাঁ, এ সেই বটে—

কিন্তু তবু কেন ভয় হ'ল? এ ভয় এতদিন কোথায় ছিল? এই যে এতদিন ধরে মনে করে এসেছি, যে, যে মুহূর্ত্তে তিনি আসবেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলব, "এই যে তোমায় পেলাম, এই যে তোমায় ধরা দিলাম।" কিন্তু কৈ, চিনতে পেরেও ত ধরা দিতে পারছিনে, ধরতেও ত' পারছিনে?

ইনি তিনিই—কিন্তু—

হাসি আমার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "একি সেই।" আমি তার দিকে চেয়ে চক্ষু নত করলাম। সে কি বুঝলে জানি না, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর নিকটে গিয়ে প্রণাম করে পুষ্পোপহারগুলি রেখে দিলে। তিনি একবার তার দিকে চাইলেন, তার পর ফিরে সেই দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতেই আমার মুখের পানেও চাইলেন। আমিও প্রণাম করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি মধুর গম্ভীর স্বরে বল্লেন, "তুমি কি উর্ম্মিলা দেবী?" আমি নত বদনে বল্লাম, "সেবিকার পিতৃদত্ত নাম জানকী, তবে মা আমায় আগে ঐ নামেই ডাকতেন।"

সন্ন্যাসী হাসির দিকে চেয়ে বল্লেন, "তোমার দিদিতে তোমাতে এত প্রভেদ। তুমি হাসি আর—বস'না তোমরা।"

দাসীর হাত হ'তে কম্বল নিয়ে আমরা দুজনেই বসলাম। তিনি অমনি সাজি হ'তে একটা পদ্মফুল তুলে নিয়ে ঘুরুতে ঘুরুতে বল্লেন, "তোমার পিতা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু যাবার পুর্ব্বে এখানেও স্বর্গ রচনা করে গিয়েছেন দেখছি। ইচ্ছে হচ্ছে দুদিন এখানে থেকে তোমাদের কষ্ট দিই, কি বল?"

কষ্ট। হায় সন্ন্যাসী, তুমি আজন্ম বৈরাগী, নইলে এমন নিষ্ঠুরের মত কথা কি বলতে পারতে?

হাসি তাঁর কথা শুনে হেসে বল্লে, "কত দিন কষ্ট দেবেন"?

"কত দিন? তা কেমন করে বলব? যত দিন ইচ্ছাময়ী মায়াময়ী আমায় এখানে ভুলিয়ে রাখবে ততদিন।"

"কত দিন ভুলিয়ে রাখবে?"

"তা কেমন করে বলব ?"

"কেন ? এর আর শক্তটা কি ? দু' মাস কি ছ' মাস"।

সন্ন্যাসী এতক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তার দিকে ফিরে চাইলেন। এইবার ভাল করে তাঁর চোখ দুটী দেখতে পেলাম—কি উজ্জল গভীর চক্ষু দুটী। কিন্তু সেই চক্ষু দুটীর মধ্যে, যা খুঁজছিলাম তা যেন কিছুতেই পেলাম না। এ সেই— তবু যেন সে নয়।

হাসি হঠাৎ তাঁর দৃষ্টির আঘাতে যেন কেমন জড় সড় হয়ে গেল। লজ্জায় তার সুন্দর মুখখানি লাল হয়ে উঠল, এবং সেই লজ্জার মধ্যে কেমন একটা ভয়চকিত ভাব ফুটে উঠে তাকে চুরি-করতে-গিয়ে-ধরা-পড়া-চোরের মত দেখাতে লাগল।

তিনি তার দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন, "দু'দিনও থাকতে পারি, দু'বছরও থাকতে পারি—কিন্তু এসে পর্য্যন্ত যে রকম বেশী সেবা লাগিয়েছ তাতে বেশী দিন টিকতে পারব না বোধ হয়।"

হাসি ব্যস্ত হ'য়ে আমার দিকে চাইলে, তারপর মৃদুস্বরে বল্লে, "আপনি যে রকম বললেন ঠিক তেমনি সেবাই যদি হয় তা হ'লে কি থাকতে পারবেন না ?"

সন্ন্যাসী এইবার উঠে দাঁড়াইলেন, তার পর ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর সুন্দর সুঠাম প্রভাতালোক-স্নাত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে কত কি যে ভাবতে লাগলাম তার ঠিক নেই। কিন্তু হাসির প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আমার মন যেন একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। মনে হল, ইনি যদি তিনিই. ত কিছুতেই ধরা না দিয়ে, পরিচয় না দিয়ে যেতে পারবেন না। কিছুতেই নয়। আমার এত দিনকার সিদ্ধি এত কাছে এসে অসিদ্ধ হয়ে ফিরে যাবে না।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ বাইরের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই যেখানে ১০ বৎসর আগে সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতি প্রভাতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সেখানে দাঁড়িয়ে উষার প্রথম আলোটুকু দুই চক্ষু দিয়ে পান করে উষারই মত উজ্জল হয়ে উঠতেন, ইনিও সেইখানে প্রায় তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্মুখেই আমাদের বিস্তৃত পুষ্করিণীটী প্রভাতের আলোকে টল্ টল্ জল জল্ করছিল। ওপারের ঘাটে গ্রামের মেয়েরা কলসিতে জল ভরে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠছিল। পশ্চিম তীরের শিব মন্দিরের স্বর্ণ-কলস উজ্জল হয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করছিল।

আমি সবই দেখলাম—এবং ঐ সমস্তের মধ্যেই ঐ প্রভাতের আলোকের জমাট দেহখানির দিকে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখছিলাম।

হাসি আবার সেই প্রশ্ন করল। তিনি চট্ করে ফিরে বল্লেন, "তোমরা যদি চাও তা হলে—" তিনি কি বলতে গিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন। বোধ হয় আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, হয়তো আমার বুকের রক্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল—হয়তো আমার সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। তিনি কি দেখেছিলেন জানি না কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, "সন্ন্যাসীকে নিয়ে তোমরা কি করবে? তাকে ত' কেউ সহজে চায় না—চাইলেও কেউ পায় না, কারণ সে যে নিজেরই নয়।"

হাসি এইবার জোরে হেসে বল্লে, "অর্থাৎ সে কারুরই নয়, কেবল একমাত্র নিজেরই। যাক, আমরা তাড়িয়ে না দিলে ত' যাবেন না।"

সন্ন্যাসী ফিরিলেন না, কিন্তু তাঁর মধুর স্বর শুনতে পেলাম। তিনি বল্লেন, "সন্ন্যাসীকে কেউ চায়! আশ্চর্য্য!" তিনি আস্তে আস্তে ধর্ম্মশালার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। আমি হাসিকে বল্লাম, "ছিঃ কি বেহায়ার মত কথা বলছিস্? উনি কি মনে করবেন?"

"কি আবার মনে করবেন? আর, কিছু মনে করলেই বা। উপায় কি? যেমন করেই হোক ধরে ত' রাখতেই হবে?"

"কেন? যদি ইনি—"

আমার কথা শেষ হল না—কারণ যা বলতে যাচ্ছিলাম তা সাহস করে বলতে পারলাম না। হাসি হেসে বল্লে, "ইনিই তিনি। তোমার মুখ বলছে, চোখ বলছে, তবু তুমি সন্দেহ করবে? আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"তুমি ত' কখনো দেখনি।"

"নাই বা দেখলাম, তবু একেই যে তুমি এতদিন ধরে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ তাতে কি আর ভুল আছে। মা কাল দেখে গিয়েছেন—তিনিও চিনতে পেরেছেন। দিদিমাও চিনেছেন। এতগুলো লোক ভুল করবে?"

"দশ বৎসর পরে দেখা, ভুল হতেও ত' পারে?"

"তোমার হ'তে পারে কিন্তু আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

আমি আর কোন কথা বল্লাম না, কিন্তু মন আমার এমন হয়ে গেল কেন? সে যে পাওয়া না পাওয়ার মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগল, দুলতে লাগল।

এর উপায় কি? কত দিন ভুলতে হবে—এমনি করে না মরে না বেঁচে থাকতে হবে। কে জানে কতদিন।

উপাসনা—ফাল্গুন।

কর্ম্মের আনন্দ।

তোমার কর্ম্মের মধ্যে তিনটি জিনিস আছে, প্রভু কর্ত্তা, ও যন্ত্র। নিজের মধ্যে এই তিনটির যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান হওয়া—এই তিনটিকে পাওয়াই কর্ম্মের গূঢ় রহস্য—তাহাতেই কর্ম্মের আনন্দ।

প্রথমে ভগবানের যন্ত্র হইতে শিখ আর তাঁহাকে স্বীকার করিতে শিখ। এই যে বাহিরের রূপ যাহাকে "আমি" বলিয়া পরিচয় দাও ইহাই যন্ত্র, এ যন্ত্র মনেরই একটি ছাঁচ, শক্তির একটি গতিকেন্দ্র, অসংখ্য স্প্রিং স্ক্রু কলকব্জায় গড়া একটি কল। ইহাকে—প্রভু বা কর্ত্তা বলিয়া ভ্রম করিও না, ইহা প্রভুও নয় কর্ত্তাও নয়। নত হইয়া অথচ গর্ব্বের আনন্দে নির্ভরের সুখে আপনাকে ভাগবত যন্ত্ররূপে গ্রহণ কর।

প্রিয়তমের হস্তে একটি নিখুঁৎ যন্ত্র হইবার গর্ব্ব ও মহিমার বড় আর কি বস্তু আছে?

প্রথমে নির্ব্বিচারে আদেশ-পালন করিতে শিখ। কোথায় গিয়া আততায়ীকে আঘাত করিতে হইবে হাতের তরবারী তাহা বিচার করে না, ধনু-চ্যুত তীর জিজ্ঞাসা করে না সে কোন্ পথে যাইবে? কলের স্প্রিং কব্জা কখনও বলে না "আমাকে দিয়া এইরূপ জিনিস তৈয়ার করিও।" স্বভাবের লক্ষ্য ও প্রেরণায় এ সব আপনি হয়, এবং যন্ত্রটি যতই স্বভবের অন্তর্নিহিত নিয়মের অনুগামী হইয়া জানতঃ সেই ছন্দে চলে, সে যন্ত্রের কর্ম্ম ততই নিখুঁৎ সৌন্দর্য্যে সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। দেহচারী প্রাণ-শক্তির যথেচ্ছ গতি এবং শারীর ও মানস যন্ত্রের বিদ্রোহে যন্ত্রের কর্ম্মই নষ্ট হয় মাত্র।

ঝড়ের মুখে পাতা হও—ভগবানের ইঙ্গিতে চল, তাঁর হস্তে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া তেমনি ভাগবত ইচ্ছায় চালিত হও যেমন ঘাতকের ইঙ্গিতে অসি আঘাত করে, যেমন তীর লক্ষ্য অভিমুখে উধাও হয়। তোমার মনটি যন্ত্রের স্প্রিংএর মত হউক, তোমার শক্তি সেই যন্ত্রের চক্র দণ্ডের গতির মত হউক, তোমার কর্ম্ম যন্ত্রের চাপ ও তাহার গঠন কৌশলের মত হউক। তোমার বাক্য হউক কামারের নাইয়ে হাতুড়ির আঘাত শব্দ, যন্ত্রের চলিবার

ঘর্ঘর রব, ভগবানের শক্তি দিগ্বিদিকে প্রচার করিবার শঙ্খনিনাদ। যেমন করিয়াই পার যন্ত্র হইয়া স্বভাব-নিয়ত কর্ম্ম করিয়া যাও।

রণক্রীড়ায় অসির এক আনন্দ আছে, নিজের গতি বেগে ও সন্‌সনিতে তীরও হর্ষে আকুল হয়, আকাশে তাহার মত্ত ঘূর্ণনে পৃথিবীও আনন্দঅধিরা, সূর্য্য আপন অগ্নিমুখ শোভায় তাহার অনন্ত গতির মাঝে সুখনিমগ্ন। ওগো চেতন যন্ত্র! তুমিও তোমার বিধিনিয়োজিত কর্ম্মের আনন্দ আধার ভরিয়া সম্ভোগ কর।

অসি ত কখন অসিরূপে গঠিত হইতে চাহে নাই, রণক্রীড়ায় নর্ত্তিত হইবার নিবৃত্তিও সে চাহে না, ভাঙিয়া দ্বিখণ্ডিত হইলেও শোক করে না। নির্ম্মাতার হস্তে রূপ ধরিতে, যোদ্ধার হস্তে ব্যবহৃত হইতে, কর্ম্ম হইতে বিরাম লভিতে এমন কি ভঙিয়া যাইতেও তাহার পরমানন্দ। সেই সম আনন্দকে খুঁজিয়া বাহির কর।

যন্ত্রকে প্রভু ও কর্ত্তা জ্ঞানে ভূল করিয়াছ বলিয়া—আপন অবস্থা আপন লাভালাভ আপন ব্যবহার কি হইবে তাহা অন্ধ বাসনায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়াছ বলিয়াই তোমার এত বেদনা, এত দুঃখ, সেই জন্যই যতদিন না মানব জীবনের সমর্পণের শিক্ষা শেখো ততদিন বার বার তোমাকে রক্তমুখ চুল্লীর মাঝে গিয়া হাতুড়ির আঘাতে নূতন হইয়া গঠিত হইতে হইবে।

এই সব অসামঞ্জস্যের বেদনা ও যতিভঙ্গ তোমার অসম্পূর্ণতার মধ্যেই আছে। স্বভব এই যন্ত্রের নির্ম্মাতা হইয়া কি নির্ম্মান করিতেছে?

সে আপন স্থূল জীবন মন ও জড় উপাদান হইতে একটি চেতন সত্ত্বা গড়িয়া তুলিতেছে।

• • • আর্য্য।

পল্লি ও জনপদ সম্বন্ধ।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

"পল্লী সত্য কি জনপদ সত্য" প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় বারীন্দ্র বাবু যে বিচার করেছেন সে সম্বন্ধে আমার আরও দু'একটী কথা বলবার আছে। আমরা আজ যে নবজীবন গড়তে চলেছি, তার সঙ্গে পল্লীজীবন ও নাগরিক জীবনের প্রকৃত সম্বন্ধ কি হবে তা নির্দ্ধরাণ করতে হবে।

দুটী আংশিক সত্যের এক একটীকে অর্থাৎ কেবল "পল্লী সত্য' কি 'জনপদ সত্য' বলে যতই আমরা কোলাহল করি না কেন, আমাদের যে আসল সত্যটিই উপলব্ধি হয়নি একথা স্বীকার করতেই হবে। আসল সত্যের স্বরূপ কি না জানলে পল্লী কি পরিমাণে আংশিক সত্য ও জনপদই বা কি পরিমাণে আংশিক সত্য এ নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। হরি-হরএক আত্মা না বুঝলে, আবার 'হরি বড়' না 'হর বড' তর্কই আসবে। আমাদের নবজীবন কোন পথে চলবে, এ জাতির নব-জাগরণের দিনে পথের দিশারীকে পল্লী ও জনপদের সত্য সম্বন্ধ নির্ণয় করে দিতে হবে, শুধু আংশিক সত্য বললেই তার প্রকৃত পরিচয় মিলবে না।

পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যে যে সম্বন্ধ, পল্লীর সঙ্গে নগরের সেই সম্বন্ধ—এর তাৎপর্য্য এই যে, গ্রহাদির সহিত সূর্য্যের আয়তন ও দূরত্বের হিসাব করে এ সম্বন্ধ নিরূপণ করা নয়, এ সম্বন্ধ নিরূপণ করতে প্রাণের স্পন্দন ও আকর্ষণের নিবিড়তা অনুভব করা চাই। পল্লী ও জনপদের প্রাণসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা জানতে হবে। যদি যথার্থ তা হয়ে থাকে তবে আংশিক সত্য বুঝেও যা হবে, না বুঝেও তাই হবে অর্থাৎ সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হবে। আর যথার্থই যদি সে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকে তবে পল্লীর জীবনের সহিত সহরের জীবনের সে স্পন্দন নিবিড়তম ভাবে মেশাবার উপায় করতে হবে। তবেই এ নবজীবন সার্থক হবে, এ নবজাগরণ প্রভাতের শিশির পাতের মত পরীক্ষার গৌর করস্পর্শে মিলিয়ে যাবে না।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে আমাদের পল্লীমুখী করছে, এ কথা আমরা সকলেই জানি, তা প্রবন্ধের প্রথম ক'টী ছত্র হতে বেশ অনুমাণ করা যায়, দুটী ছত্র উদ্ধৃত করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সমর্থন করতে চাই—"বাঙ্গলার অধিকাংশ পল্লী মৃত্যুমুখে, পাশ্চাত্যের ভোগমুখী স্পর্শে নাগরিক জীবন গড়িয়া উঠার অযত্নে পল্লীগুলি মরিতে বসিয়াছে।" আজ পল্লী শ্মশান-পথের যাত্রী, আর নগরী তার বিলাস সৌন্দর্য্য নিয়ে আমাদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছে, এই কি পল্লী ও নগরীর যথার্থ সম্বন্ধ? একদিকে উপেক্ষা আর একদিকে লালসা এই যদি সত্যের দুই দিক হয় তবে এ নির্ম্মম উপহাস নির্ম্মম আঘাতে চূর্ণ করতে হবে। নূতন উপকরণে নবজীবনের এমন এক নীহারীকা চক্রের সৃষ্টি করতে হবে, যার সমষ্টি জড় উল্কা পিণ্ডের স্রোত নয়, যার প্রতি বিন্দুটী নব-সৃষ্টির সচেতন বিকাশ।

"সমস্ত দেশকে একটী জীবন্ত নাড়ীর যোগে বিপুল মূর্চ্ছনায় বাঁধিয়া দেওয়া

আবশ্যক।" জীবন্ত নাড়ী আছে, এখনও হিমানী প্রবাহে দেশের সে জীবন্ত নাড়ী অসাড় বুঝি হয়নি, এখনও সুতরাং তার যোগ করতে যত না ভাবনা তাতে বেগ সঞ্চার করতে বেশী ভাবনা। আমরা চাই স্বাধীনতা, জীবনের স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব। নূতন পল্লী, নূতন জনপদ, পুরাতন পল্লী, পুরাতন জনপদ সর্ব্বত্র অবাধ মুক্ত আনা যাওয়ার পথ (an open road); আমরা সেই কর্ম্মক্ষেত্র চাই, সর্ব্বত্র এই নূতন প্রাণের স্রোত চাই। পিঞ্জর ও শৃঙ্খল দুইএরই বন্ধন থেকে মুক্তি আসবে এমনই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত চাই এই নবজীবন। চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ আমরা যেমন দেখি না, আমরা জনপদবাসী,— পল্লীর সহিত তেমনই আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ। সেই অন্ধকার প্রদেশে এই নবজীবনের আলোর প্রদীপ জেলে দীপালী উৎসব সমারোহে আনতে হ'বে।

এত আলো এ যে বাঁধনহারা মুক্তির সাড়া! এ ত ক্ষুদ্র হয়ে আবদ্ধ থাকবার নয়। এ আলোর তরঙ্গ যে উৎস হ'তে উৎসারিত হ'য়েছে সে যে প্লাবন আনবে। সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ নয়, সব সঙ্কীর্ণতা বিপ্লবে ডুব দেবে, যে সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্রের জ্যোতিঃ ম্লান নিষ্প্রভ হ'বে, এ তারই আভাস মাত্র! দ্বাদশ সূর্য্যের জ্যোতিঃতে ভারতের যে সভ্যতা পুনঃ স্বপ্রতিষ্ঠ হবে, সে তো নূতন ও পুরাতন 'রূপ' নয়, সে যে শাশ্বত অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য— বিদ্যুৎঝলকের মত তা' বাংলা কি পঞ্চনদের আকাশে চপল ও ক্ষণপ্রভ নয়।

দধীচি। *

[শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

পার হ'য়ে গেল সূর্য্য পশ্চিম আকাশ
জাহ্নবী কাঁদিল মৃদু স্বরে,
ভাঙ্গে ব্রত,—বৃদ্ধ ঋষি হইল নিরাশ
অতিথি এল না বুঝি ঘরে।

একটি মেঘের শিশু সুদূর অম্বরে
মাথা তুলি স্থিরনেত্রে চায়,—
"এ দরিদ্রে; ঋষিরাজ রাখ' দয়া করে'
ক্ষুধানলে পেট জলে' যায়।"

* জাহ্নবী।

"আয় ভাই, কি চাহিবি, তোরে দিব দান,"
ডাকে ঋষি বাহু প্রসারিয়া—
বেদমন্ত্রে করে তার আবাহন গান,
ধ্যানে বসে নয়ন মুদিয়া ।

পলকে প্রলয় এল, যুগ এল পলে
কে কাঁদেরে সকরুণ স্বরে ?
"স্থান দাও, ঋষিরাজ, চরণ-কমলে
অতিথি দাঁড়ায়ে তব দ্বারে ।"

চেয়ে দেখে ঋষিরাজ অস্থিচর্ম্মসার,
উপবাসী, মূর্ত্তি তপস্তার,—
কে অতিথি নতজানু দেবতা আকার
সহস্র লোচনে বহে ধার ।

"অসুরের পদভরে কাঁপে জন্মভূমি
পলায়িত দেবতা-বাহিনী,
ভিক্ষা আশে তব দ্বারে আসিয়াছি আমি,
ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও মুনি !"

"হে পুণ্য অতিথি, এস, পাতহ অঞ্জলি,
ব্রত আজ করি উ'দ্যাপন,
বুক ছিঁড়ি, হে ভিখারী, লহ অস্থি তুলি,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা কর নিবারণ ।"

মুহূর্ত্তে জলদ-শিশু হইল বিপুল,
উল্লাসে বহিয়া গেল ঝড়,
নিমেষে দানবকুল হইল নির্ম্মূল,
আকাশ করিল কড় কড় ।

ক্ষীর-নীর মাতৃ-বক্ষে ঢালে জলধর
জননীর তৃষ্ণা গেল দূরে,
দধীচির জয়-গান গাহিছে অমর,
একি ভিক্ষা দিলে জননীরে !

নারায়ণের নিকষ-মণি।

"মনুষ্যত্ব"

শ্রীনলিনী কিশোর গুহ প্রণীত, মূল্য দুই আনা, প্রাপ্তিস্থান শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২নং রামকান্ত মিস্ত্রির লেন, কলিকাতা।

নলিনী বাবুর পুস্তিকাখানিতে অনেক মর্ম্মের কথা অনেক অমোঘ সত্য আছে। অসহযোগ আন্দোলনের শক্তির দিক্ এবং দৈন্যের দিকও দেখান হইয়াছে, অথচ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সম্মান কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অসহযোগে আমরা যে সত্য পাইয়াছি তাহা জাতীয় দৈন্য নহে, তাহা আত্মবোধ; জাতীয় দৈন্যের জ্ঞান এই দেশজোড়া সাড়া বা আত্মবোধেরই ফল—অবশ্যম্ভাবী ফল। নিজেদের ঘরে ফেরাই ইহার আসল কথা, জাতি তাহার সমস্ত চেতনা ও সম্বিৎ অন্তরে ফিরাইয়া আত্মস্থ এবং স্থিতধী হইয়া জীবনের দৈন্য ত দেখিবেই, অধিকন্তু অখণ্ড শক্তির ঘর চিনিয়া শক্তিমান হইবে। নলিনী বাবুর লেখায় রাজশিক শক্তির দিক দিয়া অসহযোগের শান্ত বিরোধিতার প্রতি কটাক্ষ আছে; কিন্তু এ জাতির জীবন-বিগ্রহ তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে নির্ব্বিরোধ প্রথমে হইতে হইবে, যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে সেই তাহার ব্যবহার—প্রতিপ্রহারে বা ক্ষমায় দুই রকমেই ব্যবহার করিতে পারে। তাহার উপর আর একটা কথা আছে; ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতায় জগত শ্মশান হইয়াছে, এখন নূতন সভ্যতার ভিত—নবজীবনের সামঞ্জস্য ও লয় রচনার দিন আসিয়াছে। কালীর এক করে অসি ও এক করে বরাভয়—উহাই শক্তির মূর্ত্ত ও পূর্ণ রূপ।

অকাজের কাজ।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেটের প্রচারিত "কর্ম্মপথে" সিরিজের ছোট ছোট ✓০ আনা সিরিজের বই আজ অবধি পাঁচ ছয় খানি বেরিয়েছে। এখানি সেই সিরিজের চতুর্থ পুস্তিকা, লেখক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

বিভূতি দাদা আমার সাহিত্যের পরশমণি, ও মানুষটি লোহা ছুঁলে তা সোণায় দাঁড়ায়। এমন মসগুল অকাজের কাজে আদরকারের নেয়ে আর জুড়ি নেই। একটু খানি উদ্ধৃত করে পাঠককে বইখানির রসগ্রহণ করাই, "আজ

হ'তে এই চরকা হ'তে আমাদের এই ক'জনের কাপড়ের সুতো, ঐ তাঁত হতে কাপড়, আর আমাদের চড়াব দশবিঘে জমী হ'তে ধান আর তুলো— আমার ঐ সামনের বাগানটুকু হ'তে তরিতরকারী সবই হবে। তেল নুনের জন্ম আমাদের কাঠের কাজের লাভটুকু ব্যয় করবো, বৈ কেনবার পয়সার জন্ম সুতো বেচবো, কাপড় বেচবো। * * চরকার পাকের মধ্যে যে গান সুতো হয়ে বেরুবে, সেই গানই কোদালের তালে তালে লাঙলের ফালের মধ্য দিয়ে মাঠের আলে আলে বয়ে যাবে। কঠিন কাঠের বাটালী যখন নানারূপকে অরূপ হতে বের করে আনবে তখন সেই রূপের আনন্দকেই আমরা ধুতি সাড়ী চাদরে গড়ে ওঠার মধ্যে ধরতে পারবো। * * সংসার হয়তো বলবে, আমরা চুপ করে আছি, কিছু করছি না, কিন্তু আমরা জানবো এই অকাজই কাজ। সংসার যে কাজের নেশার মাতাল তাই অকাজ। তা'তে জীবন আনে না, আনে মৃত্যুকে। আমাদের এই অকাজের কাজই আমাদের অমৃতের অধিকারী করবে।" আমাদের বিভূতিদা' তার কলমটি যদি এ পথে কিছুকাল এই রকম ব্যবহার করেন তা' হ'লে সে কলমের জোর হাউইটজার ডেডনটকে হারিয়ে দেবে।

পল্লী-স্বরাজ।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেটের কর্ম্মপথে নির্দ্দেশ এর পুস্তিকা, দাম দুই আনা, লেখক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়। ইহার অধ্যায়গুলির নাম বলিলেই বই খানির সহিত পরিচয় হয়, যথা—গ্রাম ও সমাজ-জীবন, কৃষকের অধিকার, প্রজাতন্ত্রের নূতন দিক, আমাদের নীরব প্রজাতন্ত্র, কলকারখানা, সমূহ-তন্ত্র, ধর্ম্মগোলা, পল্লীভাণ্ডার, গাঁতি, গৃহ-শিল্প ও ছোট কারখানা, সাধারণ ইলেক্ট্রিক ঘর, গ্রাম্য পাটের কল, গ্রাম্য স্বায়ত্ত কণস্থাপন ইত্যাদি।

রাধাকমল বাবুর সমূহতন্ত্র বা communalism পাশ্চাত্যের ছাঁচে গড়া— তাই এ পল্লী-স্বরাজ বাহিরের সুখসুবিধার লেনদেনের স্বরাজ, কিন্তু লেনা দেনার পাটোয়ারী বুদ্ধি দিয়ে মানুষের প্রেমের স্বর্গ তো য়ুরোপ আজও গড়তে পারলো না। ওরা যে কমিউন বা সংঘের নামে নররক্তে দেশ ভাসিয়ে দেয়, অসির ঘায়ে মানুষকে মরণের ভয় দেখিয়ে ভাল করতে যায়। "পল্লী সমাজে নারায়ণ মন্দিরে মন্দিরে গভীর মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন", সেত সত্যি কথা; কিন্তু দেবতা বিনা এ নারায়ণ-বোধন ব্রত উদ্‌যাপন করবে কে? ব্যক্তি যেমন

মানুষের জীবন-বেদের একদিক, সঙ্ঘ বা সমাজ তেমনি তার আর এক দিক। বিশ্বচরাচর দ্যুলোক ভূলোক জুড়ে ত্রিপাদ ভূমিকামী বামনরূপী যে মানুষ তাকে জাগাও—সঙ্ঘ ও ব্যক্তি দুই ভরপুর হয়ে থাকবে। এই হ'লো এসিয়ার তথা ভাবী-ভারতের বাণী। রাধাকমল বাবু যে সব কথা বলেছেন তাতে গ্রাম্য জীবনের দৈন্য ঘুচবে, স্বাস্থ্য আসবে, বল বাড়বে সত্য। কিন্তু এত কাজ করবে কে? সাগরে শিলা ভাসাবে কে? পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাবে কোন্ দেবতা?

চরকা শিল্পশিক্ষা প্রণালী।

শ্রীমান বীরেন্দ্র চন্দ্র সেনের ভগ্নি কুমুদিনীর লেখা। মূল্য ৵০ আনা, প্রাপ্তিস্থান ১০৯ অপার সার্কুলার রোড, ও আমাদের বিজলী আফিসে।

কুমুদিনী নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্নের চরকা স্কুলের প্রথম ছাত্রী। মেয়েদের চরকায় সুতো কাটা কাজে বইখানি শিক্ষকের কাজ করবে।

ত্রয়ী।

শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা ও শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য আট আনা, প্রাপ্তি-স্থান দি মডার্ণ পাবলিশিং হাউস' কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা।

ত্রয়ী তিন জনের জীবন কথা—গান্ধী, দাস ও মহম্মদ আলি। দেশ বন্ধুর জীবনী বিমলার লেখা, বাকী দুইটি প্রকাশ চন্দ্রের লেখা। বইখানির মলাটে একটি সুন্দর প্রচ্ছদ—আছে, ভাষা মনোরঞ্জক, উভয় লেখকেরই লিখনভঙ্গি চরিত্রচিত্রণ অভিনব। বইখানি সুপাঠ্য। বিমলার প্রাণ কবির প্রাণ, লেখনী তাই ভাবপ্রস্থ ও মাধুর্য্য ভরা,—কবির চক্ষে জগতের মর্ম্ম ও এই সাড়ে তিন হাত মানব বিগ্রহের অনন্ত-রূপ সহজে ধরা পড়ে। মানুষকে আঁকিতে গিয়া সে সম্বাদ যদি না দেওয়া যায় তাহা হইলে সে জীবনী প্রাণহীন ও অসার হইয়া পড়ে। বনের একটি শ্যামল রস সরস শীতলশ্রী প্রাণ আছে, তাহার হিসাব না দিয়া কাঠের হিসাব দেওয়াও যা', মানুষের মাঝে দেবতার লীলা না দেখাইয়া তাহার কাজের হিসাবও তেমনি অঙ্গহীন।

দহন-মালা

(কাজী নজরুল ইস্‌লাম)

হায় অভাগী। আমায় দেবে তোমার মোহন-মালা?
বদল দিয়ে মালা, নেবে আমার দহন-জ্বালা?
কোন্ ঘরে আজ প্রদীপ জেলে
ঘর-ছাড়াকে সাধ্‌তে এলে
গগন-ঘন শান্তি মেলে হায়?
দুহাত পুরে' আন্‌লে ওকি
সোহাগ-ক্ষীরের থালা, আহা দুখের বরণ-ডালা?
পথ্‌-হারা এই লক্ষীছাড়ার
পথের ব্যথা পার্‌বে নিতে? কর্‌বে বহন বালা?
লক্ষীমণি! তোমার দিকে চাইতে আমি নারি—
দু-চোক আমার নয়ন-জলে পুরে,
বুক ফেটে যায় তবু এ-হার ছিঁড়্‌তে নাহি পারি,
ব্যথাও দিতে নারি,—নারী। তাই যেতে চাই দূরে।
ডাক্‌তে তোমায়, প্রিয়তমা,
দু হাত জুড়ে' চাইছি ক্ষমা—
চাইছি ক্ষমা-চাইছি ক্ষমা গো!
নয়ন-বাঁশীর চাওয়ার সুরে
বনের হরিণ বাঁধ্‌বে বৃথা লক্ষী গহন-বালা।
কল্যাণী! হায় কেম্‌নে তোমায়
দেবো যে-বিষ পান করেছি নীলের নয়ন-গালা।

শিক্ষায় নবীন সৃষ্টি।

(৩)

প্রথমেই বলেছি শিক্ষায় নবীন সৃষ্টির গোড়ার কথা হচ্ছে দেশ-আত্মার বোধন। মরা জাতিকে জীবন দাও, ছোট ছোট কোমল আধারগুলিকে ছুঁয়ে স্পর্শ করে এই কায়া আসিন্ধুবেলা ধরণীর বেদনায় ও আনন্দে কাঁদিয়ে হাসিয়ে

তার অন্তরের ভারতকে—জাগিয়ে দাও। ধ্যানের আনন্দে নিথর বুদ্ধরূপ দেখে যেন বিদ্যার্থীর মন-বীণার সব তার গুলি সুরসপ্তকে মধু রাগে বেজে ওঠে, মন্দিরের চূড়া গঙ্গা যমুনার জলোচ্ছ্বাস দেখলে তার তপ্ত শ্রান্ত দেহ যেন কার স্নেহ'কর স্পর্শে আপনি স্নিগ্ধ হয়ে যায়—চক্ষু দু'টি যেন ফিরেও না ফিরতে চায়; শ্যামল মাঠের মাঝে উলঙ্গ কৌপিনসম্বল লাঙ্গল হাতে চাষার সঙ্গে কথা বলতে যেন তার সজন-সুখেব গর্ব্বে মাটিতে পা না পড়ে। সেই ভারতের soul আত্মা—যা' গোধূলীর গো-ঘণ্টার ও মন্দিরের পূজারতির শঙ্খনাদে—যা' মাঠের কাদামাখা কালো কালো উলঙ্গ শিশুর সর্ব্ব অঙ্গে দেবাশীর্ব্বাদের মত জ্বল জ্বল করে, দীর্ঘ প্রবাস থেকে ফিরলে যা' দেখে বাঙালীর চোখের পাতা ভরে জল আনে, সেই গোপন দেশ-আত্মা ঘটে ঘটে জাগিয়ে দাও।

ভারতের এই রূপ, বঙ্গের এই আনন্দ শ্যাম আবির্ভাব অতি প্রত্যক্ষ, সে চিন্ময় বিগ্রহ গোপন থাকে শুধু বিদেশী জ্ঞানে শিক্ষায় ও প্রভাবে অন্ধ আমাদেরই চক্ষে।

"আলোক সাগরে অন্ধ স্নান করে
আলো কেমন বুঝতে নারে
(কত অনুমান করেও তবু)
আলো কেমন বুঝতে নারে"—

এ যেন সেই রকম। দেশ-সন্তানের সেই দিব্যদর্শন খুলে দাও,-যে করে পার মেয়ে ও ছেলে—দুই জনেরই স্নেহপ্রীতিতপ্ত প্রাণ গুলি ভবে এমন মাতৃ-বোধ জাগিয়ে দাও যাতে এ বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্যের পদধূলি-স্নিগ্ধ মাটিতে পা ফেলে চলতে, মাঠের আম-বনের জলভরা বাতাস ঠেলতে যেন তাদের দেহ ভরে পুলক দেয়। যেন তারা সত্যই আপনা ভুলে এই মাটিকে ভালবাসতে জানে বোঝে ও শেখে। ফরাসী জাতি যখন জর্ম্মানের হাতে আলশেস লোরেন হারিয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা পেয়েছিল, তখন থেকে এই গত মহাযুদ্ধ অবধি ফ্রান্সের প্রতি স্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হোত তা'তে কোমল মতি শিশুকে আলশেস লোরেনের ব্যথায় কাঁদিয়েছে, তাদের বুকে সেই আশার সুধাতরঙ্গ জাগিয়েছে, যে, এক দিন আলশেষ লোরেন আবার তাদেরই হ'বে। আইরিশ জাতি যে দিন থেকে নিজেদের গেলিক ভাষা নিজেদের আইরিশ কাল্‌চার নিয়ে নিগূঢ় তপস্যায়—জীবন-রচনার গোপন সাধনে বস্‌লো সেই দিন থেকে ঘরে ঘরে স্কুলে স্কুলে তারা শিশুর মনে আইরিশ জাতি-বোধ ও আইরিশ-

আত্মস্মৃতি জাগাতে পণ করলো। যে কোন দেশে জাতির নিজস্ব ধারায় যদি সে জাতির মতি গতি ও অন্তঃ প্রেরণা রঙিয়ে দেয় তা' হ'লে সে মন্ত্র স্পর্শে নবজীবিত জাতিকে কেউ আর মারতে পারে না, সে তিল তিল করে নিজেরই অন্তর্নিহিত মৃতসঞ্জিবনী ধারায় অমর হয়ে ওঠে। অন্তর-ফল্গুর ধারা তো বাহিরের বাঁধে বা আলে রোধ করা যায় না। যেখানে যেখানে কালো মায়ের কোলে কালো শিশু নতুন শ্যামল বরণে চোখ মেলবে সেই সেই খানে দেহ মন প্রাণ জ্ঞান বুদ্ধি সংবেদনা ভরে ঐ অমর বোধই জাগবে। কারণ সে দেশের মাও যে সেই ভাবের সেই শিক্ষা দীক্ষার মূর্ত্ত প্রতিমা।

তোমরা যারা এ জীবন্মৃত দেশে নতুন শিক্ষা দেবে তারা আগে নিজেদেরই অন্তরের অসাড়তা ঘুচিয়ে বেঁচে ওঠো, তারাই আগে বোঝ যে তোমাদের দেশের আত্মা আছে—বিশেষ ধারা ও ভঙ্গী আছে—যা' আর কারও নাই। এই দেশেই এমন মানুষ এমন অমোঘ মৃতসঞ্জীবন জাগরণে জাগতে পারে যার সদগুণে হাজার হাজার অপর মানুষের ঘটে ঘটে কুণ্ডলিতা অন্তর্লীন চিন্ময়ী জ্ঞানশক্তিও সাড়া পেয়ে জেগে যায়, মানুষ তখন আর বাহির থেকে জ্ঞান নেয় না অন্তর থেকে শত উৎসমুখে তা' ঢেলে দেয়, কারণ সে তখন শুধু বিদ্বান নয়, সে বীণাধরা শ্বেতপদ্মে বসা স্বয়ং মূর্ত্ত বিগ্রহধরা বিদ্যা। তাই এদেশে জাগা মানুষ আম গাছের তলায় বনের ছায়ায় শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গনে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে বসে ছেলে মেয়েদের জীবন-বেদ শেখাতে পারে। কিন্তু মাঠে ঘাটে মন্দিরে চত্তরে কেন? প্রকাণ্ড প্রাসাদে নয় কেন? তাই যে ভারতের ধারা। স্কুল কলেজ টেবিল চেয়ার ত তোমাদের নয়, ওসব বিভব তোমাদের জীবনের উপকরণ নয় বলেই তো তোমরা এ মাটির কোল ভরে আসন পীড়ি হয়ে সুখাসনে সহজপ্রেমে বসতে জান।

তার ওপর আজ এ দেশ দরিদ্রের দেশ। দেশাত্মবোধঃ হারিয়ে তিল তিল করে স্বার্থরোগে মরে মরে তোমরা ধন সম্পদ হারিয়েছ। এখন নতুন জীবন রচনার দিনে আর বিলাস কেন? ত্রিশ কোটী সন্তানের বিলাস সামগ্রীর অর্থ কই, তাদের সকলকে অশনে বসনে পরিধেয়ে উৎসববেশে সাজাবার উপযোগী বিপুল সম্পদ কই? আজ নাই বটে কিন্তু একদিন সে সম্পদও আসবে, যত দিন তা' না আসে ততদিন অর্থের অপব্যয় কোরো না, যে হাজার হাজার টাকায় বড় বাড়ী আসবাব জাঁক জমক করবে সে টাকায় কত শত জীবন্মৃত অজ্ঞানপঙ্গুকে—তোমার তাজা প্রাণের স্পর্শ দিয়ে বাঁচাতে পারবে। আগে

যারা শব হয়ে আছে তারা জীবন পাক, তার পর ওরাই লক্ষ্য অযুত হস্তে ধনরত্ন বিলাস বিভব সৃষ্টি করবে। ওদের দীনা আভরণহীনা জগন্মাতাকে ওরাই আনন্দে জগন্মোহিনী করে সাজাবে। অট্টালিকায় বসে টেবিল চেয়ার ইলেট্রিক পাখা আলোয় ঘিরে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু যে টাকার অপব্যয় হয় তা' নয়, আমরা সুজলা সুফলা সূর্য্যকরস্নাতা মায়ের স্পর্শ হারিয়ে ফেলি। এ সঙ্কটকালে সেই বিদ্যাই তো পরাবিদ্যা যাতে সন্তানের প্রাণে মাতৃবোধ জাগে। পুণ্যসলিলা গঙ্গার সে দ্রব তরল প্রাণময়ী রূপ—মায়ের সে মগ্ন মধুর ছবি নক্সায় দেখিয়ে কি বোঝাবে, ভাই? ভারতের মূর্ত্ত তপস্যা—তার আকাশচুম্বী শিববিগ্রহ হিমাচলের মহিমা কি কালির আঁচড়ে বোঝান যায়? ভারতের যে 'অতীত গৌরব কথা দশ বৎসরেও বকে বকে বোঝাতে পারবে না, বিদ্যার্থীকে একবার শিল্পীর জীবন্ত স্বপ্ন ওই তাজের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেই যে প্রাণে তার সে ভাব আপনি উদয় হবে। কেরাণী হয়ে, চাকুরে ও ব্যাপারী হয়ে এই ক্ষীরদায়িনী মাটির সঙ্গে নাড়ির সম্বন্ধ হারিয়ে মানুষ মাটিকে ভাল বাসতে ভুলে গেছে। সে মাটির জন্ম টান বুক ভরে জাগাতে হলে যে বিদ্যার্থীকে লাঙ্গল হাতে হলধর রূপে নারায়ণ-বিগ্রহ ধরতে হবে। মাটির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর টান আবার অনুভবের মধ্যে এনে দিতে হ'লে তা'কে মাটির কোলে ধূলা কাদায় মানুষ করতে হবে।

তার পর ভারতকে সে চিনে শেষে ধরিত্রীকে চিনবে, দেশের ছেলেকে ভাই বলে বুকে পেয়ে মানুষকে বুকে পাবে। যার দেশ আছে তারই বিশ্বমানব আছে; যার এটা নাই তার ওটাও কবিকল্পনা। মানুষকে মুক্তির মন্ত্র শেখাতে হবে, অন্তরে, বাহিরে মুক্তিধন না গড়ে তুললে জগদ্দাহী বন্ধনের দুঃখ মানুষের ঘুচবে না। যে মুক্তি কামনা করে মানুষ রাজ-পাট সমাজ বিধি বা শাসন যন্ত্র গড়ে, বাসনার সেনাদলের পদোত্থিত ধূলিজালে কর্ম্মের হট্টগোলে সে মুক্তি হারিয়ে যায়; নিজের বুদ্ধির গড়া সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা গুরুভার যন্ত্র হয়ে ঘাড়ে চাপে—শিকল হয়ে পায়ে পায়ে ঝন ঝন করে বাজে। স্বার্থ লোভ কামনা অহংকারের বেদনায় গণতন্ত্র অসির মুখে রক্তস্রাবে ডুবে যায়; অন্তরের দেবতা—মুক্তির শিব পশুর স্পর্শে লোপ পায়। সেই কথা ভারতের তরুণ হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত করে প্রকৃত জগত্তারণ বিশ্বপাবন মুক্তিবীজ রোপন করতে হবে। আমাদের জাতীয় শিক্ষায় যে জীবনের গীতের হারাণ রাগ ও মাধুরী ফিরে দেবে, আনন্দ শক্তি ও জ্ঞানে মানুষের সর্ব্ববিধ মুক্ত জীবন যে কি বস্তু তাই

বুঝিয়ে দেবে। তা না হলে এই বিশ্বউদ্ধারণ ভারত-বোধন যে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যায়।

গান

(শ্রীলীলা দেবী)

ভানুর রক্তিম তনু দিক্ চক্রবালে
ইন্দীবর মুদে আঁখি নয়নের জলে
কোথায় সরসী কোথা গগন মহান্
এর মাঝে চিরদিন কি বিচিত্র গান!
দেবতার চিরারাধ্য পদ-কোকনদে
ভক্ত শত নিত্য নব অভিনব মদে,
সেই শ্রীচরণ আর ভকতের প্রাণ
এর মাঝে চিরদিন কি বিচিত্র গান।
গান শুধু নহে সুর মূর্চ্ছনা ঝঙ্কার
রাগিনীর রূপে রূপে বেজে ওঠা তার
সে যে আছে চিরদিন মিশে প্রাণে প্রাণে
অনির্ব্বচনীয় এক সুরে লয়ে তানে।

চিঠির গুচ্ছ।

[শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।]

(৪)

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

দাদা, আপনার চিঠিখানা চুরি করে পাঠিয়ে দিয়েছি বলে আপনি হয়ত আমার উপর রাগ করেছেন—আপনার বন্ধুত আমাকে শাসিয়ে অস্থির করে তুলেছে। আমার কিন্তু মনে হয় যে পাঠিয়ে আমি ভালই করেছি।

আপনার যিনি বৌদি তিনি যে আমার দিদি হন, হটাৎ তা আমি আবিষ্কার করে ফেলেচি এবং যেমন আপনার কাছে, তেমনি তার নিকটও আমি

স্নেহের দাবী করে বসেছি। সংসারে আপনার জন কেউ নেই বলেইত আমি এত স্নেহের কাঙাল।

মামার বাড়ী থেকে বড় হয়েছিলুম—যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, ততদিন খুব আদরেই দিন কাটিয়েছি, কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে চারিদিক হতে শুধু তাচ্ছিল্য আর অবমাননাই পেয়েছি। সেখানে থাকবার শেষ কটা দিন কি কষ্টেই কাটিয়েছি তা কাউকে বলা যায় না। তখন কেবল মৃত্যু কামনাই করতুম।

ঠিক সেই সময় কোথা হতে যেন গিয়ে আপনার নেহাৎ ভাল মানুষ এই বন্ধুটি আমায় দাবী করে বসলেন। তারপর ক্রমে আপনার সঙ্গেও পরিচয় হয়ে গেল। আপনারা দুজনা মিলে আমার দুঃখ বেদনা দগ্ধ চিত্তের সকল জ্বালা ঘুচিয়ে দিলেন অবিশ্রান্ত স্নেহবারি বর্ষণ করে। আপনার বন্ধুকে আপনি লিখেছেন, যে, আমাদের পুরুষেরা মেয়েদের বড় নির্ম্মম অবিচারে পীড়ন করছে। আমার কিন্তু তা মোটেও মনে হয় না। কারণ, আমি জীবনের সবই পেয়েছি আপনাদের কাছে এবং আপনারাই হচ্ছেন দেশের পুরুষ।

মামার বাড়ীর পুরুষেরা যে আমায় নির্য্যাতন করতেন সে আমি মেয়ে বলেই নয়, বোধ হয়। আমি ছিলুম তাদের আশ্রিতা, তাদের অচলপ্রায় সংসারের অতিরিক্ত একটা ভারি বোঝা। এমন অবস্থায় পরভাগ্যোপজীবী পুরুষও নির্য্যাতিত হয়, তারও লাঞ্ছনার সীমা থাকে না।

আপনার একটা কথা আমি খুবই সমর্থন করি। সে হচ্ছে, আপনাদের আমরা কিছু দিতে পারি না। সত্যিই ত, আপনাদের কাছে যা পেয়েছি, তার প্রতিদান স্বরূপ দেবার মত আমাদের কি আছে? করতেই বা পারি কি? এতটুকু যত্ন, তাও সব সময় করতে পারিনে। সামান্য একটু ভালবাসা—তারই বা মূল্য কি?

আপনার বন্ধুকে যখন এসব কথা বলি, তখন তিনি চটেই ওঠেন—কেবল এই একটা সময়েই তাঁকে রাগতে দেখি। তিনি বলেন, যে, দীর্ঘ দিবসের অত্যাচার আমাদের এতই অপদার্থ করে ফেলেছে যে বেদনা বোধের ক্ষমতা-টাও আমাদের লোপ পেয়েছে। আমরা যে কিছু করতে পারিনে, এটা স্বীকার করাই নাকি আমাদের ভয়ানক অবনতির পরিচায়ক। তিনি বলেন আমাদের সব শক্তিই আছে—আমি কিন্তু সত্যি কথা বলতে সে শক্তি যে কি তা একটুও অনুভব করিনে।

এখানে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। সে বিবাহিতা। তার বাপ এখানে চাকরী করেন—আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকেন। সেও

দেখলুম অনেকটা আপনাদের মতেরই লোক। পুরুষদের ওপর তার ভারি রাগ। সে বলে, যে, আমাদের জীবনগুলো সব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে পুরুষদেরই ষড়যন্ত্রে। তার যদি শক্তি থাকত, তা হলে সে নাকি মেয়েদের নিয়ে এমন একটা দল গড়ত, যারা পুরুষদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখত না। শুনে আমি হেসেই ফেল্লুম;

কিন্তু তার চোখের দিকে চাইতেই আমার হাসি শুকিয়ে গেল। তার দু' চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। সে আমায় বল্লে—"তুমি ভাই ভাগ্যবতী, স্বামীর তাচ্ছিল্যের ব্যাথা কখনো পাওনি, তাই হাসছ কিন্তু অতবড় ব্যাথা আর কিছুতে পাওয়া যায় না। যদি বুঝতুম যে আমারই দোষে আমি এ শাস্তি পাচ্ছি তা হলে নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করতুম—কিন্তু যেখানে নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়ে অন্য একজনের সুখ শান্তির জন্য সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেব, সেখানেও যদি পাই কেবল লাঞ্ছনা আর তিরস্কার, তা হলে ভক্তিই বল আর শ্রদ্ধাই বল, আপনা হতেই সব শুকিয়ে যায়।"

তার পর সে তার স্বামীর দুর্ব্যবহারের কথা আমায় জানালে, শুনে আমারও চোখ ফেটে জল বেরুল। সত্যিই সে নির্যাতন অসহ্য। আমি তাকে কিছু বলতে পারলুম না। মনে মনে ভাবলুম তার স্বামীর মত স্বভাব যাদের তারা আবার পুরুষ কিসের? তারা ত মানুষই নয়। আর সমাজে এই অমানুষের সংখ্যা নিশ্চিতই বেশি নয়।

দিদির (আপনার বৌদির) পছন্দ মত মেয়েকে আপনার বিয়ে করতে অমত হলে আপনি নিজেই মেয়ে দেখবেন। কর্শীয়াং-এর মেয়েটির বর্ণনা শুনেই দিদি লিখেছেন যে আপনার পছন্দ হবেই। আপনার বন্ধু বলেন, মেয়েটি বেশ শিক্ষিতা—সিনিয়ার কেম্ব্রিজ না কি একটা পরীক্ষা দেবে। তবে তিনি আশঙ্কা করেন যে একটু বিলাতী ধরণের হতে পারে, কারণ সে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রী সবাই নাকি বিদেশিনী—দু চারটি মাত্র দেশী ছাত্রী আছে। আমি কিন্তু ভরসা রাখি সে শত শিক্ষিতাই হোক, আচারে ব্যবহারে ঠিক আমাদেরই মত হবে।

বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় যাবার সময় এখানে নেমে বিশ্রাম করে যাবেন। আমরা ভালই আছি—আপনার শারীরিক অবস্থা কেমন?

প্রণত কনক।

শুভ-পরিণয়

চিত্র শিল্পী শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে

ত্রয়ী।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ সাল

গান

(শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায়)

আমার মন হারাল কোন্ স্বপনের
গোপন অভিসারে।
কোন্ রতনের জ্যোতির পাছে
ডুবল অন্ধকারে।
কোন্ অজানার দেশে
সকল চাওয়ার শেষে
উদয়-রবির আগে গেল
তিমির সাগর পারে।
আমার তন্দ্রাহারা আঁখি
আমি অবাক্ চেয়ে থাকি
সেই নামহীনেরে ইচ্ছামত
কতই নামে ডাকি
কখন আসবে যে মন ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
বন্দী করে' সেই জনারে
হার-মানা প্রেম-হারে।

সঙ-সার।

[শ্রীমতী বনলতা দেবী ও শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী।]

(১)

তাঁতির ছেলে তারিণীচরণ, স্ত্রীর সহিত যেমন মধুর ব্যবহার করিত, বুড়া বাপ মায়ের সহিত কিন্তু তেমন ব্যবহার করিত না। একমাত্র ছেলে তারিণী যখন স্কুলে পড়িত, পিতা তখন আদর করিয়া মনের মত একটি টুক টুকে বউ ঘরে আনিয়াছিলেন। এখন সেই বউ বড় হইয়াছে, ছেলেও স্কুল ছাড়িয়া দিয়া কাপড়ের দোকান করিতেছে। জাত ব্যবসায়ে তারিণীর বড় লজ্জা। বৃদ্ধ পিতা কিন্তু জাত ব্যবসার উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়া আসিতেছেন। আশা ছিল তারিণীচরণ লেখা পড়া শিখিয়া দু পয়সা আনিবে, বুড়া বুড়ীর এ কষ্টের লাঘব হইবে। বুড়া তখন তাঁতের কাজ ছাড়িয়া পায়ের উপর পা দিয়া তামাক টানিতে টানিতে সুখে কাল কাটাইবে।

বুড়ার মনের কথা জানিয়া অলক্ষ্যে বিধাতা পুরুষ হাসিলেন, তাই তার সে সাধের আশায় ছাই পড়িল। দোকান করিয়া তারিণীচরণ বেশ দু পয়সা উপায় করিতেছিল, তাহাতে বুড়া বুড়ীর কিন্তু কিছুই সাশ্রয় হইল না। তারিণীর শ্বশুরবাড়ী তারিণীর গ্রামের নিকটেই। তারিণীর বউ প্রায় বাপের বাড়ীতেই থাকে, কাজেই তারিণীও থাকে সেইখানেই। মাঝে মাঝে বউ তারিণীর বাড়ী আসে। তার বাপের অবস্থা ভাল, কাজেই এখানে আসিলে কাজ কর্ম্ম করিতে কষ্ট হয়। তারিণীর মার সঙ্গে বউয়ের বনে না। বউকে এক কথা বলিলে বউয়ের হইয়া তারিণী মাকে দশ কথা শুনাইয়া দেয়, মা নীরবে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া চোখের জল মুছেন। এমনি করিয়াই সুখের সংসারে দিনের পর দিন কাটিতে ছিল।

(২)

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। রৌদ্রে যেন মাটী ফাটিয়া যাইতেছে। বাহিরে পাখীরাও কলরব থামাইয়া যে যাহার ছায়া খুঁজিয়া লইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দুরন্ত কাকের সকাল দুপুর নাই—তার অনর্থক কাকা চীৎকার রব যেন প্রখর রৌদ্রতাপকে খরতর করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত জগৎ যেন নিস্তব্ধ।

ঘরের দাওয়ায় খাঁচায় টাঙ্গান টিয়া পাখীটা হাঁ করিয়া, গা হেলাইয়া, চোখ বুঁজিয়া পড়িয়াছিল। আর তারিণীর বাপ অন্য ঘরের ভিতর বসিয়া আপন মনে সুতা কাটিতেছিল। তারিণী তখন দোকানে। পাশের ঘর হইতে শ্বশুর ডাকিয়া বলিল, "বৌমা, টীয়াটাকে একটু জল দিয়ে এস মা।" তারিণীর বৌ নিত্যকালীর সেদিকে গ্রাহ্যই নাই। সঙ্গিনীদের সহিত হাসির ধুমে তখন ঘর ফাটিতেছিল। শ্বশুর বার বার ডাকিয়া বলায় বউ হাতের খেলা রাখিয়া বলিল, "কি আপদ, বুড়ো নিজে উঠে জল দিতে পারে না, তবে ও আপদ পোষে কেন? আমি ও সব পারি নে, বাপু। এমন সুন্দর বাজী এবার হাতে পড়েছিল। ঠাকুর ঝি, এবারে কিন্তু তোমাদের হারতে হত। এবারে ছক্কা—ছক্কা" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া টিয়ার জল দিতে যাইয়া বৌ চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওলো-ঠাকুর ঝি, দেখে যা, টিয়াটা কেমন দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছে।" হা হা করিয়া নিত্যকালী হাসিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল।

তারিণীর মা জগৎময়ী পাশের বাড়ী ধান ভানিতে গিয়াছিল। ধান ভানিয়া বাড়ী আসিতে পথ হইতেই বধুর কথা শুনিতে পাইয়া কহিল, "বউ মা কি হ'ল—ওমা কি হ'ল?" বধূ হি-হি করিয়া হাসিতেই লাগিল। তারিণীর মা ধানের ধামা ফেলিয়া রাখিয়া খাঁচার নিকটে গেল, খোঁচা দিয়া দেখিয়া, পরে খাঁচা খুলিয়া টীয়াটা হাত দিয়া নাড়িয়া তারিণীর মা কাঁদিয়া উঠিল, "ওমা একি হল?" ঘর হইতে তারিণীর বাপ বাহির হইয়া বলিল, "আবে হল কি,—কাঁদ কেন?" তারিণীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এমন সব অলক্ষণে লোকও বাড়ী থাকে, মা। জল না খেয়ে গলা শুকিয়ে মারা গেছে, মা, তা কেউ একটু জলও দেয় নি।" বলিয়া উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিল। তারিণীর বাপ হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া টীয়াটার দিকে চাহিয়া বলিল, "বউমা, একটু জল আন ত, দেখি বেচে আছে কিনা।" বউ রাগিয়া গর গর করিতে করিতে ঘরে উঠিয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল, "তা বালাই গেছে, বাঁচা গেছে, আমাব উপর এত কথা কেন বাপু? সব দোষ যেন আমারই।" তারিণীর মা কাঁদিতেই লাগিল। তারিণীর ছোট একটী ভাই ছিল। বার তের বছরের ছেলে বছর তিনেক হইল মারা গিয়াছে। তারই পোষা এই টিয়া পাখীটা। তারিণীর মার টিয়ার শোক ও ছেলের শোক এক হইয়া নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল।

(৩)

সন্ধ্যায় তারিণীচরণ বাড়ী ফিরিয়া আসিলে নিত্যকালী নানা ছাদে ঢালিয়া, নানাবিধ, করিয়া শাশুড়ী কত কথা বলিয়াছেন, বড কষ্ট পাই ইত্যাদি কথায় কাঁদিয়া তারিণীর গোচর করিল, এ্কেই ত তারিণীচরণ পিতামাতার উপর প্রসন্ন নয়, তাহার উপর মার এই অন্যায় ব্যবহারে সে একেবারে রাগিয়া অজ্ঞান হইল। জল যখন নিজে দিয়া যাইতে পারে নাই, তখন বৌকে গালি দিবার সে কে ?

তারিণী দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা শুনে যাও।" মা তখন রান্না করিয়া স্বামী পুত্রের জন্য ভাত বাড়িতেছিল, বলিল, "তারিণী, ভাত খেতে আয় বাবা ?"

উদ্ধত ভাবে ছেলে উত্তর করিল, "না, তুমি শুনে যাও।"

তারিণীর বাপ পিঁড়ির উপর বসিয়া পুত্রের অপেক্ষা করিতেছিল, বলিল, "যাও না, শুনেই এস, কি বলে।" তারিণীর মা বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি রে।" তারিণী গম্ভীর স্বরে বলিল, "আজ থেকে আমি পৃথক হলেম। তোমার ওখানে আর খাব না।" তারিণীর মার চোখের জল তখনও শুকায় নাই, বুক ফাটা চোখের জল লইয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল, "কেন, বাবা" ?

তারিণী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কেন না'কি আবার বলে দিতে হবে ? যাও, আমার বিয়ের যা জিনিষ পত্র আছে, সে সব এখনি বের ক'রে দাও। আজ থেকে আমি পৃথক।" আর কারও কথার অপেক্ষামাত্র না করিয়া তারিণী ঘরে ঢুকিল। তারিণীর মা কাঁদিয়া বলিল, "ওরে, তারিণী অবিচার করিস্ নে বাপ, বউয়ের কথাই কি সব শুনবি, মার কথা কি কিছুই শুনবিনে ? আজকের মত খেয়ে যা, কাল থেকে না হয় আর খাস্‌নে। "তারিণী ভিতর হইতে বলিল, "যাও, ঘ্যান ঘ্যান, করো না ?"

অভুক্ত অবস্থায় বুড়া বুড়ী কাঁদিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। অনেক রাত্রে জাগিয়া তারিণীর বাপ শুনিতে পাইল, পুত্র ও পুত্রবধূর কলহাস্য, বাসনের ঝন ঝনানি। বুড়া মনে করিল গিন্নি জাগিয়া নাই ত ? আমার প্রাণে সব সয়। সে যে স্ত্রীলোক।" তারিণীর মা তখন টিয়া পাখীর স্বপ্ন দেখিতেছে, আর সেই কোলের ছেলে আসিয়া যেন বলিতেছে, 'মা' এই নাও আর একটি টিয়াপাখী, আর তুমি কেঁদ না।" টিয়াপাখী মনে করিয়া তারিণীর বাপের হাতখানা তারিণীর মা বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল।

(৪)

এমনি দুঃখেই দুই বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, তারিণী স্ত্রী লইয়া বেশ সুখেই কাল হরণ করিতেছিল। ইতি মধ্যে তারিণীর একটি পুত্রও হইয়াছে। সে একপা আধপা হাটিতে পারে, দুটী একটী আধ আধ কথাও বলে।

তারিণীর পিতার অবস্থা একান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধ এখন আর কাপড় বুনিতে পারে না, বৃদ্ধাও আর ধান ভানিয়া দুপয়সা সাশ্রয় করিতে অক্ষম। বৃদ্ধ চলৎশক্তিহীন হইয়াছে। ঘরে বসিয়া নিষ্কর্ম্মা জীবন বহন করিতে যখন একান্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল, বিধাতা তখন অলক্ষ্যে থাকিয়া আর একবার হাসিলেন, আর তারিণীর ছেলে হইল। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্বরূপ বৃদ্ধ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

বৃদ্ধের সংসার আর চলে না। তাহারা দুই জনে যে দিন অভুক্ত থাকে, তারিণীর ঘরে সে দিন মহা ধুম। এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। গত দুই বৎসর পূর্ব্বে যেদিন সেই টিয়াপাখীটি জল না পাইয়া মারা গিয়াছিল, গত বৎসরও তারিণীর মা সেই দিন সেই খাঁচার বাটীতে জল দিয়া শূন্য খাঁচা দর্শনে চোখের জল মুছিয়াছিল। আজ সেই দিন। তারিণীর মা ভাবিল, "না আর কাঁদিব না, তারিণীর ছেলের অকল্যাণ হইবে। তারিণীর পৃথক হওয়ার কথাও ধীরে ধীরে অন্তরে জাগিয়া উঠিল। তারিণীর মা আসিয়া ছেলে কোলে লইল।

ছেলে তারিণীর মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, "দাদু—দি-দি। তারিণীর মা সে সুন্দর মুখে চুমো খাইল।

কোথা হইতে ঝড়ের ন্যায় নিত্যকালী ছুটিয়া আসিয়া তারিণীর মার কোল হইতে ছেলে ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "ডাইনি বুড়ি, শুকনো মুখে আমার ছেলে নিলে, ছেলের আমার হাড় মাস খেয়ে ফেলবে," বলিয়া ছেলে লইয়া ঘরে উঠিয়া গেল। তারিণীর মা দাঁড়াইয়া নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিল। ঘরে সেদিন একমুঠা চালও ছিল না।

(৫)

বৈকালে তারিণী বাড়ী আসিয়া দেখিল ছেলে ঘুমাইতেছে। তাহার মাথায় হাতদিয়া তারিণী আঁৎকাইয়া উঠিল। বউ নানা ছাঁদে শুকনো মুখে ডাইনি বুড়ী ছেলে কোলে লইয়াছিল, তাই ছেলের গা গরম হইয়াছে,

এই মত সব কত কথা বলিল। ক্রমেই ছেলের গা বেশী গরম হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর তারিণী ডাক্তার লইয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া ভরসা দিয়া গেল বটে, কিন্তু রাত্রি গোটা বারর মধ্যেই মার কোলে শিশু চির কালের তরে শয়ন করিল। তারিণী চীৎকার করিয়া উঠিল। তারিণীর চীৎকারে বুড়া বুড়ী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারিণী দৌড়িয়া আসিয়া একহাত বাপের পায়ের উপর রাখিয়া আর একহাত মায়ের পায়ে রাখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ব'লল, "বল—একবার বল কি পাপে আজ আমার এই শাস্তি হ'ল?"

বৃদ্ধ অট্ট হাস্য করিয়া বলিল, "আমাকে কষ্ট দেওয়াই তোর এ শাস্তির মূল, তোর উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। কিন্তু এ শাস্তি তোর ভগবানের হাত দিয়েই এসেছে তারিণী, আমার হাত দিয়ে আসেনি।

তারিণীর মা ছেলেব শোকে আছাড় খাইয়া পড়িল।

শমন-দূত

[দরবেশ।]

শমন-দূতের ভয় দেখায়ে
যে সব মহাশয়,
অন্তিমে সান্ত্বনা লাগি
তোমায় ভজতে কয়;
তাদের ভয়াল সঙ্গ হতে
চালাও মোরে ভিন্ন পথে,
তোমার সনে লাভের হিসাব
যেন আমার নয়।
নরক ভয়ে পাতক হতে
দূরে সরে' যাওয়া,—
তার চেয়ে যে অনেক ভাল
পাপের ভরা বওয়া।

ঘুচাও আমার সকল গরজ,
চিত্ত কর সরল সহজ,
পাপে পুণ্যে ভিতর বাহির
সমান যেন রয়।

বেদনার দান

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।]

জীব, এই জগতে তাহার স্থান করিয়া লইবার জন্য যে ভয়ঙ্কর মূল্য দিয়াছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, 'এই কি প্রেমময় ভগবানের প্রেমের রাজ্য? যেখানে বড় ছোটকে, ছোট বড়কে, সবল দুর্ব্বলকে, দুর্ব্বল সবলকে, সর্ব্বদাই তাড়া করিয়া আত্মসাৎ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে, সেখানে প্রেমের স্থান কোথায়? জীবের ক্রমবিকাশের সমস্ত পথটাই যে একটা অফুরন্ত শ্মশানের উপর দিয়া।'

জীব আপনাকে আপনি হত্যা করিয়া এই জগতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। এই খাওয়াখায়ি, এই মারামারি এই মৃত্যুলীলা এমনি ভয়ঙ্কর সত্য, যে, কি ভক্ত কি অভক্ত কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান কাহারও চক্ষু হইতে ইহা এড়ায় না। যে কিছুই জানে না, সেও জানে যে তাহাকে মরিতে হইবে, এবং যতদিন সে পরের ভক্ষ্য না হয়, ততদিন তাহাকে অপর জীবদেহ —তা সে শাকই হউক আর শকুনই হউক—আত্মসাৎ করিয়া বাঁচিতে হইবে।

সংসার যেন ছিন্নমস্তা! সে আপন রুধির পান করিয়া আপনি নৃত্য করিতেছে এবং এইটাই আশ্চর্য্য যে, এই শ্মশানের মধ্যেও সে সুখে আছে—আপন সৃষ্টি-তত্ত্বের উপর বা স্বয়ংই আপন মৃত্যুতত্ত্বরূপে দাঁড়াইয়া নিজেই যেন আনন্দিত! তাহার জন্ম লওয়ার এবং বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টার অন্ত নেই, অথচ এই বিশ্বজীবনরূপ প্রকাণ্ড পিরামিডটা যে তাহারই অসংখ্য দেহের স্তূপ, এ কথাও তার যেন মনেই থাকে না। পরকে মারিয়াই হউক আর যেমন করিয়াই হউক মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া কোন গতিকে জগতে টিঁকিয়া থাকার চেষ্টা প্রত্যেক জীবেই বর্ত্তমান এবং ইহাই যেন তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য—অথচ মৃত্যুও অনিবার্য্য, সে আসিবেই। সমস্ত জীব-জগৎই যেন হু হু করিয়া

মরণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—ফুল ফলের দিকে, ফল মাটির রসের দিকে, রসপূর্ণ ফল বৃক্ষের দিকে, বৃক্ষ আবার ফুল হইতে ফলের দিকে ছুটিয়াছে—সবই মরণ-পথের যাত্রী। জীবের নিজের দেহের বিষয়ই যদি সে ভাবিয়া দেখে তাহা হইলেও সে দেখিবে, যে, সে কত জীবকোষকে আত্মসাৎ করিয়া এমন কি তাহাদিগকে তাল পাকাইয়া লইয়া আপনার অস্তিত্বের ইমারৎ খাড়া করিয়াছে। তাহার সারাদেহময় কি বিরাট মরণ-লীলা চলিয়াছে। তাহার দেহই একটা জীবন্ত শ্মশান অথবা মৃত্যুময় জীবনলীলার ক্ষেত্র।

মানুষের সভ্যতা রাষ্ট্র সমাজ তাহার সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান সমস্তই যে কেবলি এক একটা সৃষ্টির ধারা তাহা নহে।

ইহাদের সমস্ত ইতিহাসটাই এক একটা ধ্বংসের লীলা। এক একটা রাষ্ট্র বা সভ্যতা বা সাম্রাজ্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাষ্ট্র বা সভ্যতাকে গ্রাস করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এক যুগের সাহিত্য অপর যুগের সাহিত্যকে আত্মসাৎ করিয়া জন্মিয়াছে। এক যুগের বা দেশের ললিতকলা শিল্পবাণিজ্য সমস্তই অপর যুগের বা দেশের কলা শিল্পাদিকে কখনো বা ধ্বংস করিয়া কখনো বা আত্মসাৎ করিয়া আপনার গোড়াপত্তন করিয়াছে। এক যুগের দর্শন বিজ্ঞান অপর যুগের বা দেশের দর্শন বিজ্ঞানের ধ্বংসের ফল। এইভাবে দেখিলে মানবের সমস্ত ইতিহাসই একটা ধ্বংসাত্মক সৃষ্টির খেলা মাত্র। গ্রীসের সর্ব্ববিধ ধ্বংসের উপর রোমান জগতের রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা, আবার এই গ্রিকো-রোমান জগতের শেষ আশ্রয় কন্‌ষ্টান্টিনোপল যখন পঞ্চদশ শতাব্দিতে তুর্কের কামানের গোলায় ধূলিসাৎ হইয়া গেল, তখন সেই অটোম্যান আক্রমণের ঝড়ের মুখে ইউরোপের দিকে দিকে পলায়মান গ্রিকো-রোমান বিবুধগণের কোলাহলকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার বীজ ছড়াইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয়ের ডিমোক্রাটিক রাষ্ট্র, সমাজ এবং সাহিত্যও ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসতাণ্ডবের মধ্যে এবং ঐ ফরাসী সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মূল Stoic দের State of Nature এর ধারণার মধ্য দিয়া Platoর Republic পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এইরূপে দেখিলে মানুষের যাহা কিছু ক্রিয়া কর্ম্ম ধ্যান ধারণার ফল এতাবৎ পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে সমস্তই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীকে আত্মসাৎ করিয়া বা ধ্বংস করিয়া। কালের ধ্বংসশীলতার মধ্যেই তাহার সৃষ্টিশীলতা লুকাইয়া রহিয়াছে। ধ্বংসই তাহার প্রাক্‌ভাব—সৃষ্টি তাহার উত্তর ভাব মাত্র।

এইরূপে দেখিতে পাইতেছি, খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধের উপরই যেন জীব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ফল শষ্য যে জীবের খাদ্য সেই জীব আবার মাংসভোজী জীবের ভক্ষ্য। আবার সমস্ত জীব-দেহই জীবাণুর—রোগজীবাণুর ভক্ষ্য। যে জীবাণুতে দেহ গঠিত সেই জীবাণুতেই দেহের পরিসমাপ্তি। এখানে প্রেমের, স্নেহ মমতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা যেন মৃতদেহের উপর স্রক্‌চন্দন দানের মত বিসদৃশ।

আমার মনে হয় যে বিশ্বের এই আপনাকে আপনি আত্মসাৎ করিয়া আপনার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে যাহারা স্বপুচ্ছ-ভক্ষণ শীল সর্পের মূর্ত্তির দ্বারা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঠিকই করিয়াছিলেন। জানি না, হয়ত তন্ত্রের ছিন্নমস্তার পরিকল্পনাও এই কারণ হইতে এবং এইরূপে দশ মহাবিদ্যার প্রত্যেক বিদ্যাই হয়ত এই বিশ্বকে এক এক মূর্ত্তিতে দেখিয়া পরিকল্পিত।

ও কথা যাউক। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এই, যে, 'মানুষের মধ্যে তাহার জীবত্ব এই সার্ব্বজৈবিক আত্মঘাতের মধ্যে দিয়া কি ভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কি ভাবে আত্মবিকাশ করিয়াছে, কতখানি জীবধর্ম্ম হইতে শিব ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।'

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যদি প্রশ্ন উঠে, যে, মানুষ যে সত্যই সভ্যতার পথে শিবত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহারই বা স্থির নিশ্চয়তা কৈ? তাহা হইলে গোল বাধিবে। কারণ মাথা না থাকিলে মাথা ব্যথা হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি মানুষের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান শিবত্ব, বা তাহার আত্মার ক্রম-বিকাশশীলতাকেই যদি প্রারম্ভেই সন্দেহ করিয়া বসে তাহা হইলে এই প্রবন্ধের অন্যান্য কথা তুলিবার আর অবসরই থাকে না। সেই জন্য আমি এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি, যে, জীবের জীবত্বের একটা স্বাভাবিক গতি আছে। তাহার অস্তিত্ব কেবল একটা স্থিতিশীল অস্তিত্ব নয়—গতিশীল অস্তিত্ব এবং এই গতি শিবত্বেরই দিকে অথবা শিবত্বকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে।

এই গতি চক্রবৎ কিম্বা সরল রৈখিক কিম্বা একসঙ্গে দুই প্রকারেই, ইহা লইয়া অধিক বাকজাল বিস্তারের প্রয়োজন নাই। সামান্য দুচার কথা বলিয়া মূল কথার অবতারণা করিব। জীবত্বের যে একটা গতি আছে ইহা এক প্রকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। হয়ত সংসারচক্র এক এক সময়ে এক একটা কেন্দ্রের

চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে অথচ পৃথিবীর ন্যায় আপন কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়াও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিবার জন্য বৃহত্তর রেখা অঙ্কিত করিয়া বৃহত্তর বৃত্তে ঘুরিতেছে। অথবা হয়ত ইস্ক্রুপের পেচের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমাগতই উপরের দিকে উঠিতেছে। সেই বৃত্তগতি আপাততঃ সম্মুখগতি মাত্র বলিয়া ধরিয়া লইলেই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

জীবের এবং সেই সঙ্গে মানুষের জীবনের গতিশীলতা বিশেষতঃ উন্নতিশীলতা সম্বন্ধে তখনই সন্দেহ উপস্থিত হয় যখন আমাদের দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ রাখি। চলন্ত যানে চড়িয়া যদি আমাদের দৃষ্টি ক্রমাগত কোন বহুদূরস্থিত বস্তুর উপর নিবদ্ধ রাখি তাহা হইলে আমরা যে চলিতেছি সে বিষয়ে উপলব্ধি আমাদের প্রায় হয় না বলিলেই চলে। আমাদের গতির বিষয়ে সচেতন হইতে হইলে নিকটস্থ স্থির বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন এবং বিশেষতঃ আমরা যে পথ অতিক্রম করিয়াছি সেই পথটার কথা স্মরণ করার প্রয়োজন।

জীবের ক্রমবিকাশতত্ত্ব আলোচনা করিলে এক-কোটী জীব হইতে বহু-কোটী জীবের বিকাশ যেমন একটা জীবনের গতিশীলতার প্রমাণ বলিয়া ধরিতে পারা যায় তেমনি অধঃস্তন অদণ্ডী-জীব (molusca) হইতে মেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী জীব হইতে পূর্ণমস্তিষ্কবান মানবের ক্রমবিকাশও এই জীবনগতিরই একটী অপূর্ব্ব নিদর্শন বলিয়া ধরিতে পারি। তাহার পর প্রাগৈতিহাসিক মানব হইতে ঐতিহাসিক মানবের দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের মধ্যে যে মহা-ব্যবধান ঘটিয়াছে তাহাও কি এই গতিশীল প্রাণের অদ্ভুত বিকাশ নয়?

অপিচ এই জীবদেহের সমত্ব ও সাধর্ম্ম্য homogeniety হইতে বিষম ও বহুজাতীয় heterogenous হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার একমাত্র স্থূল স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে সূক্ষ্মানুভূতিময় পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশ ইহাও সেই বহুত্বাভিমুখী প্রাণ-শক্তির সদাগতিত্বেরই পরিচয় নহে কি?

জীবের প্রাণশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে একটা অপূর্ব্ব বস্তুর বিকাশ দেখা যায় সেটাই বা কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার। simple (সহজ) প্রাণ যতই complexitya (জটিলতা) দিকে যাইতেছে ততই দেখিতে পাই মন নামক একটী অপূর্ব্ব পদার্থ সেই প্রাণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছে।

প্রাণের সঙ্গে মনের বিকাশও গতিশীল। সেও simple হইতে

complexityর দিকে ছুটিয়াছে। আত্মরক্ষার সহজ চেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া সুখোন্বেষণের বহুমুখী চেষ্টার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ আপনাকে ছাড়াইয়া পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টার অভিব্যক্তির আলোচনা করিলে প্রাণের সঙ্গে মনের গতিশীলতা সুস্পষ্টভাবে ধরিতে পারা যায়।

কিন্তু এই গতিশীলতার পরিমাণ কোনো প্রকার গণিতশাস্ত্রের নিয়মের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ধরা দেয় নাই এবং ধরা দিবার কোনো লক্ষণও এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। কারণ এই গতি একসঙ্গে সৃষ্টিশীল ও স্থিতিশীল। এই সৃষ্টির শক্তি ও বৃদ্ধির শক্তি যে কোথা হইতে আসিতেছে তাহা বলিবার জো নাই, অথচ দেখিতে পাইতেছি, প্রাণশক্তি ক্রমাগত নানা আকারে ও বর্দ্ধিত বেগে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এই জন্য ফরাসী দার্শনিক Burgson এই প্রাণের ক্রমবিকাশকে creative evolution বা সৃষ্টিশীল ক্রমবিকাশ বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন; যাহা ছিল না তাহাই হইতেছে অথচ তাহারই মধ্যে সেই পুরাতনও রহিয়া যাইতেছে, -ইহাই এই প্রাণশক্তির গতিশীলতার প্রকৃতি।

বিশ্বচিত্তের ক্রমবিকাশের মধ্যেও এই সৃষ্টিশীলতার সহিত স্থিতিশীলতার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবেই আছে। আদিম মানব মনের মধ্যে যে সমস্ত দোষগুণ ছিল, সেই সমস্তই সভ্য মানব মনের মধ্যে নূতন আকারে—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতাকারে রহিয়া গিয়াছে।

তার পর মানবের মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাজ ও ইতিহাসের ক্রমবিকাশও এই সৃষ্টিশীল গতির অপূর্ব্ব নিদর্শন। আদিম মানব সমাজ যে ভাবে গঠিত চালিত ও শাসিত হইত তাহার সহিত বর্ত্তমান মানবের সমাজের আকৃতি প্রকৃতির তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় মানব-মনের সহিত বাহ্যপ্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাতে তাহার সমাজ যুগে যুগে কত না অপূর্ব্ব আকারে দেখা দিয়াছে। অথচ প্রত্যেক পরবর্ত্তী অবস্থার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা আপনাকে সম্পূর্ণ লোপ না করিয়াও লুপ্ত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন হিন্দু আধুনিক হিন্দুর মধ্যে যেমন সূক্ষ্মভাবে অথচ সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করিয়াও পূর্ণভাবে রহিয়াছে। তেমনি প্রাচীন গ্রীক ও রোমানের সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব আধুনিক ইউরোপের সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের মধ্যে আত্মলোপ করিতে পারে নাই, পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান।

বাহ্য জগতের অস্তিত্ব দেশে এবং কালে, সেই জন্য সমস্ত বস্তুই এক সঙ্গে স্থিতিশীল ও গতিশীল। প্রাণের অস্তিত্বও এইরূপ দ্বন্দ্বাত্মক—সেও একসঙ্গে

স্থিতিশীল ও গতিশীল। দেশের দিক হইতে সে স্থিতিশীল ও কালের দিক হইতে সে গতিশীল।

প্রাণের এই গতিশীল দিকটার মধ্যেই তাহার সৃষ্টিশীলতা ও মরণ-শীলতা এক সঙ্গেই বর্ত্তমান। কিন্তু আমরা যখনই প্রাণের কথা ভাবিতে বসি তখনি তাহার মাত্র একটা দিকই আমাদের চক্ষে ঠেকে, এবং সে দিকটা হইতেছে বিশেষ ভাবে তাহার মরণশীলতা। অথচ প্রাণ ত' কেবল মাত্র মরণশীল নয়—সে যে এক সঙ্গে সৃষ্টিশীল স্থিতিশীল ও মরণশীল। বলিতে গেলে এই তিনটাই তাহার প্রকৃতি, নহিলে সে প্রাণই নয়। ইহার একটাকে বাদ দিলে প্রাণের প্রাণত্বই থাকে কি না সন্দেহ।

ত্রিভুজের একটা ভুজ বাদ দিলে যেমন তাহা আর ত্রিভুজের কোনো গুণই দেখাইতে পারে না, তেমনি এই তিনগুণের সমবায়েই জীবন, নহিলে সে অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু জীবন নাম আর তার দেওয়া চলে না।

আমি এই প্রবন্ধে ভগবানের বিশ্বতত্ত্বের মঙ্গলময়ত্বের ওকালতি করিতে বসি নাই। জীবের অনন্ত জীবন হইলে ভাল হইত কি মন্দ হইত, তাহা লইয়া আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বিশ্বতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করিতে হইলে নির্ভয়ে সমস্ত সত্যটাকে মুখামুখি করিয়া দেখিয়া লওয়ার প্রয়োজন। সত্য যে সব সময় সুন্দর হইবে বা মনোরম হইবে এরূপ সত্যবদ্ধ হইয়া সে আপনাকে প্রকাশিত করিতে আসে না। এবং বিশ্বের সমস্ত সত্যানুসন্ধীই জানেন, যে, সত্যকে নির্ভয়ে মুখামুখী দেখা এবং স্বীকার করাই আত্মার পক্ষে মঙ্গলের।

প্রাণ বস্তুটা একান্তই ত্রিগুণাত্মক, সে হয়, সে থাকে এবং সে যায়। যখন সৃষ্টির দিক হইতে দেখি তখন দেখি, সে ক্রমাগতই হইতে হইতেই চলিয়াছে।

চির জীবন হ'তে হ'তেই চলা
আমার মাঝে শুধুই 'হওয়ার' মেলা।
এ মেলা যে কেবল বেড়ে চলে,
নূতন এসে জোটে দলে দলে।

পল-অনুপল-বাঁধন-বাধা-হারা,
আমার 'সময়' কেবল হওয়ার ধারা

নাইক' অতীত, নাইরে অনাগত,
হওয়া শুধু বর্ত্তমানের স্রোত।
(চিরন্তনী। ১ অঙ্ক—২ গর্ভাঙ্ক।)

আবার যখন 'লয়ের' দিক হইতে দেখি, তখন অনুভব হয়, সমস্ত জগৎই একটা অফুরন্ত 'ঝড়ে-পড়ার' কাহিনিতে ভরা। যেখানে মনে হইতেছে সৃষ্টি হইতেছে, সেইখানেই দেখিতে পাই যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যাহা ছিল তাহা মরিয়াছে। সেই মৃতদেহের উপর, শবের উপর, যে দাঁড়াইয়া আছে সেও মরণধর্ম্মী। তাহার ক্ষণিক নৃত্য ক্ষণিকে স্থিতি তাহার পদতলস্থ শবকে ভুলাইতে পারে না। এই ভাবে ক্রমাগত অতীতগামী কালের দিক হইতে জগৎকে একটা মহাশ্মশান ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তখন সমস্ত বর্ত্তমান, সমস্ত ভবিষ্যৎ অতীতের ছায়ালোকে মিলাইয়া যায়, তখন জগতের সমস্ত শোভা গন্ধ আনন্দ লুপ্ত হইয়া একটা বিরাট কুয়াশার ছায়া আসিয়া পড়ে এবং তাহার উপর জাগিয়া উঠে হিমের গান।—

ছায়ালোক মেঘে ঢাকা—
আলোকও আঁধারে মাখা,
'কোথা প্রাণ ?'—'কোথা প্রাণ ?'
হাহাকার জাগে একা।
(চিরন্তনী। ৬ষ্ঠ অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

কিন্তু এইরূপে দুই দিক হইতে দেখিলে এই বিশ্ব প্রধানতঃ দ্বিরূপীর মতই মনে হইবে। কিন্তু মানবের ত' কেবল দুইটী মাত্র চক্ষু নয়—তাহার আরও একটী চক্ষু আছে। সেই তৃতীয় চক্ষুর সম্মুখে যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে তাহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। সেই তৃতীয় চক্ষুর সম্মুখে যে মূর্ত্তি দেখা দেয় তাহাই তাহার পরমরূপ। কারণ সেই চক্ষুতে জগতের বহুরূপ, সরলরূপটীও পড়ে, অথচ সেই সঙ্গে ইহার অচলরূপটী প্রতিভাত হয়। যে অচপল জ্যোতিতে এই সমস্ত সচলত্ব, এই চিরন্তনী লীলা নাটক প্রকাশিত হয়, সেই অচপল জ্যোতির দিক হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রাতিভাসিক বিশ্বমূর্ত্তির যাহা তৃতীয় পাদ, তাহাই ইহার পরম অস্তিত্ব এবং সেই তৃতীয় পাদই—সেই অচল পরম পদই ইহার প্রাতিভাসিক ক্ষণিক অস্তিত্বরূপে

জগতে প্রতীয়মান। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, মনে করুন, প্রদীপটী জলিতেছে। এখন আমরা বলিতে পারি, (১) ঐ আলোক একটী ধারাবাহিক সৃষ্টির মালা। (২) আবার ইহাও বলিতে পারি, যে, উহা একটি ধারাবাহিক মৃত্যুর মালা কারণ প্রতিমুহূর্ত্তে তৈলটুকু পুড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে। (৩) আবার যদি ইচ্ছা করি ত বলিতে পারি, এই দুই দৃষ্টিতে লয়কে ধরিয়া শিখাটুকু একটী অখণ্ড অস্তিত্ব লইয়া আছে। শিখার অস্তিত্বের বা স্থিতির মধ্যে ঐ তৈলের লয় এবং আলোকের সৃষ্টি। আলোক আপনাকে এবং সেই সঙ্গে জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে ঐ ধারাবাহিক লয় ও সৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া।

এই বিশ্বের স্থিতি এবং প্রকাশও এই উপমায় বলিতে পারি ত্রিগুণাত্মক। সে এক সঙ্গে সৃষ্টি লয় ও স্থিতি। অথবা, তাহার স্থিতি এবং প্রকাশ,—সৃষ্টিলয়াত্মক। আপনাকে এবং সেই সঙ্গে অপরকে প্রকাশ করিতে হইলেই আপনাকে ধ্বংসের মধ্য দিয়া সৃষ্টি করিতেই হইবে, ইহাই যেন প্রকাশের একমাত্র নিয়ম।

এ নিয়ম কেন হইল, কে করিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু ইহাই ইহার স্বরূপ। অথচ এই পরম সত্যই সব চাইতে গুপ্ত—'গুহাহিতং'। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 'ত্রিপাদস্য দিবি'। ইহার অর্থাৎ জগতের অস্তিত্বের ত্রিপাদই গুপ্ত,—একপাদ মাত্র প্রকাশিত। অথচ এই প্রকাশমান একপাদের মধ্যেও সেই বিষ্ণোঃ পরমং সেই অচ্যুতের তৃতীয় পদ অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই অচলং প্রতিষ্ঠং যে পদ তাহাই বিশ্বে ক্ষণিক স্থিতিরূপে প্রকাশিত।

কিন্তু এমনি আমাদের মনের গঠন, যে, ঐ লয়টার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। কেন যে পড়ে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু পড়ে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই মৃত্যুর আঘাত হইতে যে সব উপরি লাভ হইয়া থাকে তাহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধি। প্রথম লাভটা এই, যে, এই মৃত্যু হইতেই নবীন জন্ম। দ্বিতীয় লাভটা আরও সূক্ষ্ম ধরণের অথচ মহান। এই মৃত্যুর ভয় ও আঘাত হইতে যে ধারাবাহিক বেদনা জাগে তাহাই জীবের চৈতন্যের একটা কারণ। ক্রমাগত সুখের মধ্যে শান্তির মধ্যে থাকিলে দেখা যায় আত্মা যেন ঘুমাইয়া পড়েন। সেই কারণেই তাহার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনকে জাগাইয়া এবং সদা চঞ্চল করিয়া রাখিবার জন্যই যে, এই মৃত্যুরূপ ধ্বংসরূপ প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন। তাই বোধ হয় প্রাণ আপনাকে জাগাইয়া রাখিবার

জন্য আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ক্রমাগতই বেদনার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে যেন প্রতি মুহূর্তের লয়ের ব্যথাকে সৃষ্টির সুখে পরিণত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার প্রচণ্ডগতির কারণই হইতেছে ঐ মৃত্যুর বেদনার তাড়না। প্রতি মুহূর্তের শবের উপর দিয়া এই প্রকাশময়ী শিবাদেবী নাচিয়া চলিয়াছেন। এবং তাঁহার এই প্রচণ্ড চাঞ্চল্যই তাঁহার প্রকাশের কারণ,--চিন্ময়ীত্বের নিদর্শন।

ঋগ্বেদের সৃষ্টি সূক্তে (অঘমর্ষণ সূক্তে) ঋষি বলিতেছেন, "ঋতং চ সত্যং চাভিদ্ধাত্তপসোধ্যজায়ত:" প্রজ্বলিত তপঃ হইতে ঋত এবং সত্য জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ জগতের বিধিও শৃঙ্খলার আবির্ভাবের কারণই হইতেছে প্রজ্বলিত তপঃ। সেই আদিম তপঃ বা তাপই পরবর্ত্তী সমস্ত খণ্ড বা অখণ্ড প্রকাশের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। এই তাপ বা heatই জগতের সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং লয়-তত্ত্বের মধ্যে অদ্বৈতপ্রকাশ তত্ত্বরূপে রহিয়া গিয়াছে।

মনুও বলিয়াছেন, যে আদিতে সমস্তই তমোভূত হইয়া সমস্তই অপ্রতর্ক্য এবং অতীন্দ্রিয় অবস্থায় ছিল। তারপর সেই আদিম তাপের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দিবা ও রাত্রি আলোক ও রাত্রির বিভাগ দেখা দেয়। মনু স্বয়ংও সুদুশ্চর তপস্যার দ্বারা দশজন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির পত্তন করিয়াছিলেন। অতএব সৃষ্টির আদি তত্ত্বই হইতেছে তপঃ বা তাপ। সেই আদিম তাপরূপ বেদনা হইতেই জগতের প্রকাশ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখিতে পাই, ব্রহ্মা আপনাকে অশ্বরূপে পরিকল্পনা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে বলি দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই মৃত্যুর বেদনাই ব্রহ্মের জগৎরূপ প্রকাশের উপায় হইয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই একটা বিকীরণশীলতায় radio activityর দ্বারাই অর্থাৎ তপের দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। আত্মা যেন স্বপ্রকাশক সূর্য্যস্বরূপ. তাঁহার প্রকাশ যতই স্ফুটতর হয় ততই তাঁহার প্রকাশিত জগৎও আপনাকে প্রকাশ করে। বিশ্বের আত্ম-প্রকাশের অন্য উপায় বিশ্বাত্মা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই।

কিন্তু এই চাঞ্চল্যাত্মক প্রকাশ কি বাস্তবিকই মৃত্যুরই লীলা, অনস্তিত্বেরই পূর্ব্বাভাষ মাত্র? মোটেই নয়। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টা। ইহাই তাহার দীপ-শিখার ন্যায় অস্তিত্ব, ইহাই জগতের প্রকাশাত্মক সদাচঞ্চল অস্তিত্ব। এই

চঞ্চলত্ব, এই তপাত্মক প্রকাশই তাহার চির অস্তিত্বের দ্যোতক, নহিলে তমোময় অপ্রকাশের মধ্যে যদি জগৎকে পড়িয়া থাকিতে হইত তাহা হইলে তাহার বিষয় অস্তি নাস্তি কিছুই বলা যাইতে পারিত না।

কিন্তু চাঞ্চল্যাত্মক প্রকাশকে লাভ করিবার জন্য জগৎকে বিশেষতঃ জীব জগৎকে যে দাম দিতে হইয়াছে তাহার বিষয় চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে—"এত বেদনা সহ্য করিয়া, এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া জীবের কতটুকু লাভ হইয়াছে? তুমি দার্শনিক, তুমি হয়ত বলিবে এমনি করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া আগুনে পুড়াইয়া আত্মা এই জগৎকে তাঁহার বাসের ও প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া লইতেছেন।' কিন্তু আমার মন যে তাহাতে শান্ত হয় না। আমার যাহা কোটী কোটী যুগে কোটী কোটী জন্মে হারাইতে হইয়াছে তাহার সমস্তই যে আজ স্মৃতিতে জমা হইয়া বসিয়া আছে—আমি যে সেই সব-হারাণ ধনদের কিছুতেই পূর্ণ ভাবে হারাইয়া ভোলানাথ হইয়া বসিতে পারিতেছি না। তুমি নিষ্ঠুর জ্ঞানী, তোমার পক্ষে সুখও একটা ক্ষণিকের অনুভূতি মাত্র দুঃখও তাই, কিন্তু আমার পক্ষে যে তাহা নয়, মোটেই নয়। আমার যে অশ্রু থামে না। আমি যে আমার ভ্রূণ জন্ম হইতে, এককোষী অবস্থা হইতে এই সভ্য নরজন্ম পর্য্যন্ত যাহা কিছু হারাইয়াছি যাহা কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি, সেই সমস্ত হারাণ বস্তুর চাপে আমার প্রাণ যে ফাট ফাট হইয়া উঠিয়াছে। এই যে সেদিন জ্ঞানী এবং সভ্য মানুষ তাহার আদিম পশুত্বের পূর্ণলীলা দেখাইয়া ও বৎসর ধরিয়া পরস্পর পরস্পরের গলা কাটাকাটী করিল, ইহা হইতে তাহার কতটুকু লাভ হইল? যে লাভ, যেটুকু জ্ঞান সে ইহা হইতে লাভ করিল তাহা তাহার লোকসানের হিসাবে কত অকিঞ্চিৎকর। আর শুধু জ্ঞান লইয়া কি ধুইয়া খাইব যদি সে আমার প্রাণের কান্না না একটুও থামাইতে পারে? কি হইবে দর্শন লইয়া, কি হইবে বিজ্ঞান লইয়া কি হইবে ধর্ম্ম লইয়া যদি না সে মানুষের সেই আদিম ক্ষুধা সেই ভালবাসার ক্ষুধা মিটাইতে পারে?"

জ্ঞানী একথার কি উত্তর দিবেন জানি না, কিন্তু সকলকেই ইহার একটা না একটা উত্তর দিতেই হইবে। জীবনের মধ্যে এই অনাদি প্রশ্নের উত্তর না দিলে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের বোঝা পড়া করা হয় না। তাই এ প্রশ্নের যাহা উত্তর আমি আমার মনকে দিয়াছি তাহাই এখানে দিতেছি।

জ্ঞানী হয়ত বলিবেন, যে, এই দুঃখ একটা মায়া একটা অনাদি মিথ্যা

জগতের সুখও মিথ্যা দুঃখও মিথ্যা, এই দুঃখের হাত হইতে যদি মুক্তি চাও ত' জগতের ক্ষণিকের সুখকেও বিসর্জ্জন দাও। তাহা হইলেই এই অনাদি ক্রন্দন থামিবে, কারণ দুঃখ হইতেছে সুখের অপর পীঠ। মিলনের সুখকে লইতে হইলেই বিরহের দুঃখকে লইতে হইবে, আলো লইতে হইলে অন্ধকারকে লইতে হইবে, নহিলে আলোর অনুভূতি বা সুখের অনুভূতি হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু এ উত্তরে প্রাণের কান্না থামে কি? এ যেন কতকটা আব্দারে ছেলের মত উত্তর। শিশু বলিল "আমার এই চাই, কেবল এইটাই চাই, আর কিছু চাই না,—ইহা যদি না দাও ত' আমি কাঁদিব।" মা তাহাকে বলিলেন, "ইহা যদি লও ত', এই আর একটিকেও লইতে হইবে, পুতুল যদি লও, ত' সেটা হারাইবার বা ভাঙ্গিয়া যাইবার দুঃখকেও লইতে হইবে।" শিশু যদি অমনি মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া উত্তর দিতে পারে, "যাও তবে আমি কিছুই চাই না, তোমার সুখও চাই না দুঃখও চাই না, তাহা হইলে সে পাকা ছেলে হইবে, জ্ঞানী আখ্যা পাইবে।

এ রকম পাকা শিশু জগতে অনেকই দেখা দিয়াছেন। সেই সব বৃদ্ধ শিশুদের পায়ে প্রণাম করিয়া আমি আমার বক্তব্যটাও বলিতেছি।

আমি বলিতে চাই, ওগো আমার চিরক্রন্দনশীল প্রাণ, তোমার এই ক্রন্দনই অক্ষয় হোক। কারণ এই ক্রন্দনই, এই ব্যথা সহিবার ক্ষমতাই তোমার ভালবাসার কারণ, তোমার স্নেহশীলতার লক্ষণ, তোমার অনুভূতিময় আত্মার প্রকাশ। ফুল যে সুন্দর, তাহার একমাত্র কারণ এই, যে, সে ফুটিয়া দুদিনের তরে সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া তারপর ঝরিয়া যায়। চিরদিনের তরে রহিবার জন্য আসিলে কোনো বস্তুরই মূল্য থাকে না ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আবার এই ক্ষণিকের অস্তিত্বের ফলেই আমাদের হারাণধনগুলি অন্তরের মধ্যে স্থান পায়, প্রেমের মধ্যে ভালবাসার স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা হয়। সেগুলিকে ক্ষণিক চৈতন্যের জগৎ হইতে চিরচৈতন্যের জগতে, আত্মার জগতে, স্থান দিবার জন্য এই মৃত্যুর আঘাত, লয়ের ব্যথার প্রয়োজন।

এই এমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি—এমন দেশে এমন রূপ রস শব্দ গন্ধের দেশে জন্মিয়া আমরা প্রকৃতির আদুরে ছেলের মত দেশ মাতৃকাকে যে ভুলিয়া বসিয়া আছি, এই ব্যাপার হইতেই কি প্রমাণ হয় না, যে, অতি আদরে আত্মা ঘুমাইয়া পড়েন? আর যে সব দেশে প্রকৃতির উপর জোর জারী করিয়া মারপিট করিয়া ছেলেদের বাঁচিতে হয়, তাহাদের দেশপ্রীতির

বষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে কি বুঝিতে পারি না, যে, যাহারা চিরজীবন ক্ষণিকের গান গাহিয়া—

"যা ফুরায় দেরে ফুরাতে
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস্‌নেক' কুড়াতে"

(রবীন্দ্র—ক্ষণিকের গান)

এই রকম কথা বলিয়া গায়ে হাওয়া দিয়া বেড়াইতে চায় তাহারা সত্য সত্যই মরণের দিকে ছুটে। মরণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাহারা মৃত্যুং তীর্ত্বা অমৃতং অশ্নুতে—মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া অমৃত পান করে তাহারাই অমৃতকে পায়, অন্যে নহে। এই যে মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের জন্য যুদ্ধ, ইহাই ত' আত্মার গৌরব, ইহাই ত চিরজাগ্রত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের জন্য প্রাণের যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধই নানা আকারে পাপের সহিত পুণ্যের, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, দানবের সহিত দেবতার যুদ্ধের আকারে দেখা দিয়া আত্মাকে জাগ্রত করিতেছে। এমন কি ইহাও বলিতে পারি, যে, এই যুদ্ধই আত্মাকে জানাইয়া দিতেছে, যে, সে আছে। নহিলে যদি তিনি চিরদিন সাগর মাঝে ঘুমাইয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্বের কি গৌরব থাকিত? যদি থাকিতেই হয় তাহা হইলে সদাজাগ্রত সদাঅস্তিত্বের মহানন্দে থাকাই প্রয়োজন এবং এই আনন্দেই জগৎ আছে, ক্ষণিকের সুখ দুঃখের মধ্যে, লাভ লোকসানের মধ্যে, সমস্তকে অতিক্রম করিয়াই সে আছে এবং সেই থাকাই তাহার গৌরবময় মহান অস্তিত্ব। এইখানেই তাহার জয়, এইখানে দাঁড়াইয়া সে চিৎকার করিয়া বলিতে পারে।—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

এই যে আমি তাঁহাকেই জানিয়াছি যাঁহাকে জানিলে যাঁহাকে অন্তরের মধ্যে আপনার আত্মার মধ্যে স্বীকার করিলে, অমৃতত্বকে পাওয়া যায়। যিনি ছাড়া চলিবার আর পথই নাই, সেই পথেই ত' চিরদিন চলিতেছি, অতএব আমিও অমৃতের পুত্র, আমি ও অভয়-পথের পথিক।'

জীব না জানিয়াও এই পথেই চলিয়াছে কিন্তু তবু সে কাঁদে। কেন কাঁদে জানি না, কিন্তু এটুকু জানি, যে, এই ক্রন্দন তাহার অনন্ত চৈতন্যের ক্ষণিকের বিকাশ। সে কাঁদে অথচ সেই ক্রন্দনকেই চিরতরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। তাই তাহার Sweetest songs are those that tell of sadest thought কারণ তাহার চিরক্রন্দনই চিদানন্দময় তাই চিরানন্দময়।

যদি তাহাকে বলা যায়, যে, "ওগো আর তুমি ভালবাসিও না, আর কিছুকে, আর কাহাকেও বুকের মধ্যে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিও না, তাহা হইলেই তুমি শান্তিতে থাকিবে,"—সে কথা সে কিছুতেই শুনিবে না। কারণ সে কি আপনাকে হারাইতে চাহিবে? কিছুতেই নয়।

প্রকৃতির সহিত লড়াই করিতে করিতে জীবের বিশেষতঃ মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় সচেতন, তাহার প্রাণ সদা চঞ্চল, তাহার দেহ রোগপ্রবণ তাহার চিত্ত দুঃখপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখন যদি তাহাকে বলা যায়, 'ওহে আবার গণ্ডারের মত তোমার সমস্ত দেহ মনকে মোটা চামড়ায় ঢাকিয়া দিতেছি, তোমার আর রোগ ভোগ শোক দুঃখ থাকিবে না," তবে সে কি সেই আদিম এবং সহজ সুস্থ পশুত্বকে ফিরাইয়া লইতে চাহিবে? কিছুতেই নয়। সে তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিয়া বলিবে, "না—না—না, কিছুতেই নয়। তার চাইতে আমায় যত পার আঘাত কর, আমি সহ্য করিতে রাজী আছি।" সে তখন কবি রবির ভাষায় বলিবে--

"তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি,
দু'খ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি।

এই ভক্তি, এই স্নেহ, এই প্রেমেই জীবের জীবনের দুঃখের পরম লাভ। এই অস্তিত্বসাগর মন্থন করিয়া অমৃতের সঙ্গে বিষও যদি উঠে তবু সাগরমন্থন চাই—নীলকণ্ঠও যদি হইতে হয় তবু অমৃতকে চাই।

মানবের আত্মা যে দুঃখকেই ভালবাসে, দুঃখকেই ভক্তি করে ইহার প্রমাণ,—তাহার ধর্ম তাহার সাহিত্য তাহার বিজ্ঞান, তাহার সমাজ তাহার রাষ্ট্র তাহার সমস্তই। জগতে যে যত man of sorrows সেই তত ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র। ধর্মের জন্য যিনি যত বেদনা সহিয়াছেন

তিনি ততটাই ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য। জ্ঞানের জন্য যিনি যতটা সহিয়াছেন তিনিই ততখানি জ্ঞানী এবং ততখানি ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র। ললিত-কলার জন্য যিনি যতখানি দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন তিনি ততখানি ভালবাসার বস্তু। রাষ্ট্র বল, সমাজ বল, সবতাতেই দেখিতে পাই মানুষ দুঃখীরই সম্মান করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাকেই ভালবাসিয়া আসিয়াছে। সত্য মিথ্যাতে পরিণত হইতেছে, এ শতাব্দির জ্ঞান অপর শতাব্দির কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইতেছে, তবু মানুষ দুঃখের সম্মান করিতে ভুলিতেছে না— মানুষের এই বেদনাময় প্রেমের গতি ঠিক সমান ভাবেই রহিয়া যাইতেছে। এই যে আত্মার জয় ইহাই মানুষের সাহিত্য, ললিত কলা, ধর্ম্ম, জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে ভেরী বাজাইয়া চলিয়াছে।

পিরামীড প্রস্তুত করিতে, অজন্তার গুহা খুঁড়িতে, তাজমহলের পাথর কাটিয়া বহিয়া আনিতে কত লোক প্রাণ দিয়াছে, আগুণে পুড়িয়া রোগে ভুগিয়া মরিয়াছে তাহার সংবাদটাই কি কেবল বড় হইবে?—আর এই — মানবের চিরন্তন আনন্দের আত্মবিকাশ তাহাই ভুলিয়া বসিব? ব্যাধি জরা মৃত্যু না থাকিলে যদি রাজার ছেলে বনে না যায় তাহা হইলে আসুক শত সহস্রবার ব্যাধি জরা মৃত্যু, আসুক জন্ম হইতে জন্মান্তরের দুঃখময় অস্তিত্ব, আমি ঐ একটী মাত্র সর্ব্বত্যাগী প্রেমময় মানুষকে পাইবার জন্য লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিব। আমি একটীমাত্র ক্রুশবিদ্ধ মহাদুঃখিকে দেখিবার জন্য লক্ষ ফারিসীর ইট পাটকেল ঝাঁটা লাথি ইন্‌কুইজিসান সেন্ট্ বার্থলোমিউ ওয়াটার্লু ভার্ডুন সহ্য করিব। আমি একটীবার গীতা শুনিবার জন্য সহস্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন দুঃশাসনের হাতে প্রাণ দিব, তবু ইট পাটকেলের জড় অচেতনত্ব, সুখদুঃখহীন অস্তিত্বকে ফিরিয়া চাহিতে পারিব না। আমি বৃক্ষত্ব হইতে পশুত্ব লাভ করিতে গিয়া যাহা হারাইয়াছি, পশু মানব হইবার জন্য যে দুঃখকে বরণ করিয়াছে পশু-মানব হইতে মহামানব হইতে চলিয়া যে দুঃখ সহ্য করিতেছি তাহার বিনিময়ে যে অবস্থায় আসিদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ সেই অচেতনাবস্থা, অন্ধকার অবস্থা, অস্তিনাস্তিহীন অবস্থা পাইতে চাহি না।

একখানা মেঘদূতের জন্য শত কালিদাসের অশ্রু জলে জগতের রামগিরী গায়ে ঝরণার মত নামুক, একখানা ডিভাইনা কমেডিয়ার জন্য শত ডাণ্টে সহস্রবার ফ্লোরেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হউক, লক্ষবার প্রিটরীর অনন্ত দুঃখের মধ্য

দিয়া কাঁদিয়া ছুটুক, একটীমাত্র রাখালের জন্ম সহস্র গোপিকা কোটী বৎসর বৃন্দাবনের ধুলায় গড়াগড়ি যাক, তবু এই সব কাঁদুনির বিনিময়ে অশ্রুহীন দেবত্ব চাহি না,—মানুষ তাহা চাহিবে না, চাহিতে পারে না।

যদি কোন কালেও কোনো যুগেও বিশ্বরাজ্যে স্বর্গরাজ্য না আসে তবু "তোমার রাজ্য আসুক" বলিয়া মানুষ কাঁদিবে, কিন্তু যদি কখনো স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিয়া অশ্রুহীন সুখরাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলে ত' অমনি মানুষ তাহা হইতে দুঃখের ফল খাইয়া সেই দুঃখহীন অশ্রুহীন সুখস্বর্গভূমি হইতে বিদায় লইবে—তাহার প্রিয়ার সহিত এক ভ্রমে এক পাপে ডুবিবে", তাহার প্রিয়তমার জন্মই সে চিরদুঃখ চির মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে। ইহাই তাহার প্রেমের গৌরব, ইহাই তাহার চিরচঞ্চল অস্তিত্ব।

মানুষ তাহার এই অনুভূতিময় দেহ পাইয়াছে বেদনা হইতে,—প্রতিনিয়ত সেই দেহ সহস্র প্রকার রোগবীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে, ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—তবু সে ইহার বিনিময়ে কুম্ভীরের 'কাঁটামারা অঙ্গ' চাহেনা, গণ্ডারের মত শুষ্ক সবল সর্ব্বংসহ দেহ চায় না। চিরদিন নব নব বেদনা সহিয়া সহিয়া তাহার মন কত না সুখের কল্পনা করিতে শিখিয়াছে, কত না সাহিত্য স্থাপত্য সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়া কত না নব নব অনুভূতিসম্পন্ন হইয়াছে, সেই সংবেদনশীল মনের বিনিময়ে সে গাছের মত "দিবি বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ" হইয়া থাকিতে পারিবে না। সে চির দিন ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া তাহার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়া আপনারই ভাঙ্গা গড়াকে অনুভব করিতে করিতে চলিতে চায়। ইহাই তাহার দেহের প্রাণের মনের তাহার সমস্ত অস্তিত্বেরই একমাত্র কামনা।

জীবের সমস্ত অস্তিত্বই ভাঙ্গা গড়া। প্রত্যেক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের মধ্যে যে আনবিক ক্রিয়া ঘটে তাহাতে দেহের কোষ সমষ্টির মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফলে কিছু না কিছু ক্ষতি প্রতিনিয়তই ঘটিয়াছে। আবার প্রতিনিয়তই সেই ক্ষতি সে পূরণ করিয়া লইতেছে। এই ভাঙ্গাগড়া লইয়া তাহার দৈহিক অস্তিত্ব। এই ভাঙ্গাগড়া এত দ্রুত যে সাত বৎসরের মধ্যে ত তাহার সমস্ত দেহটাই বদলাইয়া নবকলেবরে পরিণত হয়।

তাহার মনের মধ্যেও সেই প্রকার ভাঙ্গা গড়া প্রতিনিয়তই চলিতেছে। সেই জন্য শৈশবের সঙ্গে যৌবনের মনের অনেক পার্থক্য আবার যৌবনের মনের সঙ্গে বার্দ্ধক্যের মনেরও অনেক পার্থক্য। কৈশোরের

মনের যে সমস্ত গুণ ছিল সেই সমস্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া তবে সে যৌবনের মনের গুণগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে এবং সেইরূপে সে যৌবনের মানসিক গুণগুলিকে অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বার্দ্ধক্যের বহুদর্শী মনকে লাভ করিতে পায়।

ঠিক এই ভাবে মানুষের নিজহাতে গড়া সমাজ এবং রাষ্ট্র ও শৈশব কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই চারিটী অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। যে সময় জাতীয় ইতিহাসে কাব্য ও ললিতকলার আবির্ভাব হয় তখন জাতীয় দেহ মনের যে অবস্থা, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুগে তাহা থাকে না। যখন দেহ আর মন প্রকৃতি ও আবেষ্টনীর সঙ্গে সহজে যুদ্ধ করিতে অক্ষম হয় তখনি বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া সুখে ও সহজে জগতে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। আবার ঠিক সেই সময়েই জগতের আপনার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া লইবার জন্য দর্শনাদি জ্ঞানশাস্ত্রের ও আবির্ভাব ঘটে। গ্রীকদের আমল হইতে এপর্য্যন্ত চিরদিনই তাহাই ঘটিয়া আসিতেছে। ব্যক্তি গত হিসাবেও এই নিয়ম খাটে, জাতিগত হিসাবেও তাই, এবং বিশ্বমানব হিসাবেও এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। গ্রীকেরা প্রথমে কবি এবং কলাবিৎ, এবং তার পর বীর। হোমর হইতে আরম্ভ করিয়া পিণ্ডার পর্য্যন্ত কবির যুগ, ফিডিয়াস প্রভৃতি কলাবিতের যুগ। তারপর সক্রেটিস প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকের যুগ, তারপর আরিষ্টটল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের যুগ।

রোমকেরা প্রথমে বীর, তারপর কবি, তারপর দার্শনিক এবং তারপর সাম্রাজ্যের বিলাসিতা রক্ষার্থ পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক।

ইংরেজ ফরাসী জর্ম্মান প্রভৃতি বর্ত্তমান সমস্ত সভ্য জাতিরই জাতীয় ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির মধ্যেও এই রকম একটা ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই।

আবার সমগ্র জগতের বিকাশের মধ্যেও এই নিয়মের কার্য্য দেখিতে পাই। আদিম paganic পেগানিক যুগকে জগতের কৈশোর বলিতে পারি, তারপর গ্রীক রোমক ও খৃষ্টীয় মধ্যযুগকে যৌবন ও কাব্যকলার যুগ বলিতে পারি। তারপর আসিয়াছে দর্শনের ও বিজ্ঞানের যুগ। ইহাকে জগতের বার্দ্ধক্যের যুগ বলা এক হিসাবে অসমীচীন নয়। এই যুগে মানবের দেহ যেমন প্রকৃতি ও আবেষ্টনীর দ্বারা আঘাতের পর আঘাত পাইয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে এই জগৎটাকে বাসোপযোগী করিয়া লইতেছে—তেমনি সামাজিক

রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিয়া আপনার সহিত অন্তর ও বাহ্য জগতের সঙ্গে নিত্য নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে, স্থাপিত করিতেছে।

এই মানবের অন্তর্বাহ্যজগতের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে কত সমাজ, কত রাষ্ট্র, কত সাম্রাজ্য, কত দর্শন বিজ্ঞান তরঙ্গের মত উঠিয়া লয় পাইয়াছে তাহার ঠিক নাই। তথাপি এই ভাঙ্গাগড়ার আর শেষই হইল না। হইবে কিনা তাহার ঠিকানা নাই এবং আমার মনে হয়, না হওয়াই এই বিশ্বতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

বিশ্বের আত্মার স্বরূপই বোধ হয় রথিত্ব। সে তাহার রথকে ক্রমাগতই চালাইবে। সে যেন—

"ঘর কইনু বাহির' বাহির কইনু ঘর"

এই বলিয়া এই বিশ্বপথে বাহির হইয়াছে। তাহার রথচক্র তলে ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র সমস্তই পথরূপে পড়িয়া থাকিবে এবং সে তাহারই উপর দিয়া তাহার বিরাট রথ চালাইবে। কোন্ সময় কাহারা আসিয়া তাহার রথের দড়ি ধরিয়া টানিতেছে, কত ব্যক্তিগত দুঃখ মরণ কত সমাজ ও রাষ্ট্রগত উত্থান পতন তাহাকে ঠেলিতেছে সে দিকে তাহার দৃষ্টি নাই—তাহার দৃষ্টি কেবল চলার দিকে, গতির দিকে। কত মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ, কত বামন, কত রাম কত বুদ্ধ তাহাকে ঠেলিতেছেন তাহার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, সে কেবল বলিতেছে—

আগে চল আগে চল ভাই
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।

অথচ এই চলা এমন অদ্ভুৎ, যাহারা এক যুগে ঠেলিয়া আছে পরবর্ত্তী যুগে দেখি তাহারাও রথের উপর আশ্রয় পাইয়াছে। যাহারা পরে আসিতেছে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের সমেত বিশ্বরথকে ঠেলিয়া দিয়া পরবর্ত্তীদের জন্য ঐ রথেই চড়িয়া বসিতেছে। অদ্ভুৎ এই রথ এবং অদ্ভুৎ এই পথ এবং অদ্ভুৎ এই চির-পথিক আত্মা। এই অদ্ভুৎ রথ-যাত্রা দেখিয়াই কবির সহিত বলিতে ইচ্ছা করে

সে [illegible], না ফুটিতে, পড়িল ধরনীতে
যে [illegible] মরু পথে হারাল ধারা,
জানি[illegible]হে জানি তাও হয় নি হারা। (রবীন্দ্র)

এই কথা যদিও কবির কতকটা অন্তর্বেদনার সান্ত্বনার অভিব্যক্তি তথাপি ইহাই সত্য কারণ বেদনাময় অস্তিত্বই জীব-চৈতন্যের স্বরূপ-লক্ষণ।

তবে কি পথই পথের শেষ? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে অক্ষম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্যক্তি-মানবই বল আর বিশ্ব-মানবই বল কেহই এ জগতে পথিকতত্ত্ব ছাড়া আর কোনো ভাবে প্রকাশ করিয়া যান নাই। হয়ত এক একটী ব্যক্তি-মানবের জীবন দেখিয়া মনে হয় পথের বুঝি শেষ হইল। কিন্তু তারপরই দেখা যায় তিনিই শেষ নন, আরও আছে। তিনি আসিয়া পথের শেষ করিয়া যান নাই নূতন পথের দরজা খুলিয়া দিয়াছেন মাত্র। নূতন নূতন ভাব জাগিয়া মানবাত্মার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। সেই পথ খুলার সময় একটা মারামারি লাগে বটে, কিন্তু সেইটাই সেই মারামারিটাই হইতেছে পুনর্গঠনের কাল। সেই মৃত্যুলীলার মধ্য দিয়া মানবাত্মা নবকলেবর ধারণ করিয়া নূতন শৈশব লইয়া ছুটেন। ইহাই তাঁহার চিরন্তনী লীলা। যুগে যুগে এমনি ভাবে তিনি মরণের মধ্য দিয়া জীবনকে নূতন ভাবে পাইতেছেন অথচ সমস্ত অতীতকে লইয়া চির পুরাতন হইয়াও নিত্য-নূতন হইতেছেন। কাল ইহার পরিমাপক নহে, দেশ এই গতির প্রতিবন্ধক নহে—ইহা দেশ কালাতীত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ গতিমাত্র।

এই গতিকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রতিনিয়ত জানিতেছেন, প্রতি-নিয়ত জাগিয়া আছেন। ইহাই আত্মার আত্মবোধের সঙ্গে বিশ্বাতত্ত্বেরও পরতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব বোধ। এই আত্মতত্ত্ববোধের জন্য বিশ্বের প্রয়োজন এবং সেই বিশ্ববোধের জন্য আঘাতের, তা সে আঘাত সুখেরই হউক আর দুঃখের হউক, প্রয়োজন। অন্য প্রয়োজন অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্য আনয়ন করা বা অন্য কোনোরূপ মহান উদ্দেশ্য মানবজীবনের আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বিশ্ব জগতে টিঁকিয়া থাকিয়া আপনাকে নিত্যনব উপায়ে অনুভব করার যে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে ইহা তাহার প্রতি কার্য্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক নবভাবের অভিব্যক্তিতে, নব ধর্ম্মের প্রচারে, নব জ্ঞানলাভের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্য নিকটে আসিতেছে কি না এখনো বলিতে পারি না, কিন্তু এই সকলের মধ্যে যে আত্মার আত্মবোধ প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এইটুকুই মাত্র জোর করিয়া বলিতে পারি

জানি কিম্বা নাই বা জানি
তবু তোমার মাঝেই আছি

মানি কিম্বা নাই বা মানি,
মরাও মরি, বাঁচাও বাঁচি।
এই আলো, এই যে আঁধার,
এই যে খোলা, এই যে গাঁধার
লক্ষ পাকে, বিশ্ব ধাধার
মধ্যে অনায়াসে নাচি,—
অনায়াসের হাতটি ধরি
তাইতে অনায়াসে আছি।
পেলাম কিম্বা নেই বা পেলাম
সে সব হিসাব নাইবা নিলাম।
আছি বলেই থেকে গেলাম,
তাহার অধিক নাইকো যাচি।
যেটুক্ দেছো আঁজল পূরে,
তাতেই পরাণ ভরিয়াছি।
(চিরন্তনী। ১ম অঙ্ক)

বিশ্বসন্ন্যাসী।

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

কোন মদে আজ পাগল করে মাতাল বাতাসে,
হুঙ্কারে তার কাঁপছে ধরা আকুল তরাসে,
ফুৎকারে ওই পথের ধূলা উড়িয়ে কে চলে,
কোন্ কথা কে শুক্‌নো পাতার মরমরে বলে ?
দুপুর রোদে ফুল্‌কি কি আগুন পড়ছে ঠিকরি',
বকুল-ডালে কোকিল কালো রইবে কি করি ?
কাঁচা পাতার আঁচল খোঁজে আজ কে বনেতে,
একই ছায়ার হরিণ ঘুমায় বাঘের সনেতে ;

দেবদারু আর ঝাউয়ের বনে বাতাস মেতেছে।
প্রান্তরে আজ কম্প দিয়ে পাগল জেগেছে।
কচি পাতা ঝাঁউরে গেল আগুন্ পরশে
মুকুল কলি থাকবে কি আর তেমন সরসে ?
একি হল তাণ্ডবে আজ এ কোন্ নাচনা,
বুকের মাঝে তুফান তোলে চৈত্রের বাজনা,
যোগী ভোলার ভাঙল কি যোগ আজকে দাহনে,
ডম্বরু যে বজ্রডাকে জাগায় বাহনে,
ধুতরা ফুলের মঞ্জরী কে কর্ণে পরাল,
ছাই নিয়ে কে ভোলানাথের অঙ্গে বুলাল ?
আজ প্রমথ হাড়ের মালা কণ্ঠে ধরেছে,
কটির শোভা কেউটে সাপের হার যে পরেছে !
বদ্ধজটা এলিয়ে প'ল ব্যাকুল বাতাসে
ললাট হ'তে আগুন খসে সকল আকাশে !
বাঘাম্বর রয় কি না রয় এমনি কাঁপনি
অম্বরে আজ সম্বরে লাজ কে ওই আপনি ?
পাহাড় কাঁপে পায়ের দাপে তুফান সাগরে,
রুদ্রলীলায় মাত্‌ল কে আজ বালির সায়রে ?
নয়ন ঝরায় আগুন কণা 'শয়াল' নাচনে
নৃত্যপরা জাগ্‌ল ধরা আজকে গাজনে।
কণ্ঠে ও কার নীলের রেখা, সিন্ধু মথিয়া
ধরার অমঙ্গলে ভরা গরল ভখিয়া।
নীলের দিনে সাধুর মুখে কি গান শুনালে
গাজন গাছের ঘূর্ণীপাকে বিশ্ব ঘুরালে।
কাঁপিয়ে ধরা ত্রিশূল তোলে ও ক কি ত্রিশূলী,
অভয় দিতে দাঁড়ায় যোগী সংসারের তুলি ?
রুদ্র তেজে বিরাট হয়ে ভূর্জ্জ বেশে,
নিখিল-বিশ্ব-সন্ন্যাসী আজ পাগ্‌ল কি শেষে ?

ধর্ম্মের বনীয়াদ।

[শ্রীসত্যবালা দেবী।]

ধর্ম্মভাব ভারতীয় উপাদানে শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট বস্তু এ কথা বিস্মৃত হয়ে আমাদের কোনও দিকেই অগ্রসর হবার উপায় নেই। মেয়েদের তোলবার বেলায়ও এই একই কথা। ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে কাজ না করলে কোনও কাজই হবে না। কোনও রূপেই,—আঘাত দিয়েই বল—আকর্ষণ করেই বল—কোনরূপেই সমাজের ভিতর থেকে আমরা সাড়া পাব না। আন্দোলনের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করা চাই-ই।

অথচ এ কথাটা আবার মিথ্যাও বটে। এই ধর্ম্মেরই নামে হিন্দুজাতি বারবার রকম বেরকমের এত ভুল করেচে যে তার গুণোগার সমাজ এখনও চুকিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। ঐ যে সমাজের আনাচে কানাচে এখনও কত আবর্জ্জনা! কত কিম্ভুতকিমাকার সম্প্রদায় আচার ব্যবহার যার ভিতর হতে সত্যই বীভৎস রস যেন টুপিয়ে পড়চে। সমাজ এখনও তাদের সভ্য করে বরদাস্ত করে নিতে পারে নি। সে যদি শোনে আমাদের এই নূতনের ঢেউ ধর্ম্মের আর একটা ঢেউ ছাড়া বিশেষ কিছু নয়, তখন তার পাশ কাটিয়ে দাঁড়ানটাই মনঃপূত হবে, সোজা হবে। হয়ত সে তাই-ই করে বসবে। তবুও কিন্তু আমাদের মনে রাখা চাই বিনা ধর্ম্ম আন্দোলনে আমরা কাজ করতে পার্ব্ব না। বিনা ধর্ম্ম ভাব সাহায্যে আমরা জাতির চিত্ত আকর্ষণ করতে পারব না। ধর্ম্মাচরণ হাতে হাতে সাথে সাথে না দেখাতে পারলে সমাজেরও পাষাণ মন গলবে না। এই ত হয়েচে মুস্কিল। ধর্ম্ম না নিলেও চলবে না আবার ধর্ম্ম নিলে তাল সামলানও দায় হবে।

ব্যাপারটা কি? উপায়টাই বা কি?—ব্যাপারটা হচ্চে গোড়ায় গলদ, তার উপায়টা একেবারে সত্যকে স্পষ্ট করে বোঝা। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা আর স্বভাবের অপূর্ণতা-প্রবৃত্তি (the law of persistences) এই দুটোর মূলোচ্ছেদের পূর্ব্বেই আমরা যদি কাজে নেমে পড়তে ধেয়ে আসি ত সে আমাদের গোড়ায় গলদ করা হবে। ততক্ষণ যে আমাদের কাজের হাতিয়ার ঝোঁক, শক্তি নয়। আত্মশক্তি স্ফুরণ অনিবার্য্যবেগে যাকে নামিয়ে না

এনেচে সে উত্তেজনার ষ্টিমে দীর্ণমান বয়লারের মত হয় ফেটে পড়ব নয় ছুটে পড়বো গোছ কি করি কি করি করতে থাকে।

কিন্তু হায় কর্ম্মযোগের এ জীবনটা ঠিক জাহাজ নয়। কম্পাস যন্ত্রটা এরই ঠিক্ একটা কামরায় নেই। তাকে দেখে পথ ঠিক করে নিতে হলে দেখবার মতটা হয়ে উঠতে হয়, সে দেখা দেবার মত হয়ে বসে নেই। এই জন্যই বলচি উপায়—সত্যকে স্পষ্ট করে বোঝা—এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

বুঝতে পাচ্ছি এমন লোক আছেন যাঁরা এতক্ষণে আমায় বেশ্ একটা ধমক্ দেবার জন্য মুখ কণ্ডুয়নে অস্থির হয়ে উঠেছেন—ভাঁজচেন এর পাল্টা জবাব।

তাঁরা যা বলবেন তা জানি। তাঁরা বলবেন—পূর্ণতা অপূর্ণতা persistence resistance এ সবের ধূয়া ধরে তোমার মত দারুব্রহ্ম গোছ হলেই হয়েচে আর কি? যুগান্ত ধরে বসে বসে ওই কর, আর কাজ পড়ে থাক। ও সব চলবে না। কাজ চাই—নেমে পড়। এমন ধমকের উত্তরে হাঁসি ছাড়া আর জবাব নেই। কেন না কাজের জন্য সাধনায় যে নেমেচে—মন প্রস্তুত করবার অন্তর্যুদ্ধ যার আরম্ভ হয়ে গেছে, সেও ত বসে নেই। কাজের চেষ্টায় বার বার নেমে বার বার প্রতিহত ব্যক্তির চেয়ে বস্তুতঃ সেইই ত এগিয়ে যাচ্চে। তারপর দেশের ভাবের, জীবন ধারার মোড় ফেরবার বেলায় দু'দশ বছর মাত্র লাগবে, দৃঢ় স্থির, এতবড় বুকের পাটায় প্রোগ্রাম ভেঁজে ফেলতে পার—এমন কি নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বারাজ্য তাও অসম্ভব হয় না, আর আপনার মনের—স্বভাবের মোড় ফেরাবার বেলায় সময়ের অঙ্কটা অনন্তকালের দিকেই বা পড়ে কেন? সমস্ত দেশকে নেড়ে দেবার যার উৎসাহ আপনাকে একটু ভাঁজ করে নেড়ে নিতে ভেঙে গড়ে নিতে তার আর কদিন?

তাই বলচি কর্ম্মীদের সত্যটাকে আগে স্পষ্ট করে বুঝে নিতেই হবে—সময় নষ্ট হচ্চে এ ধমকে অস্থির হলে চলবে না। অতীতে বারে বারে যত ভুল হয়েচে সে এইখানে। সে শকুনীয়াদের উপর/ া গাঁথার ভুল - ইমারত ঠিকই গাঁথা হয়েছিল।

আমাদের লক্ষ্মীর মন্দিরের নক্সা (Plan) ঠিকই আছে। নির্ম্মাণ কৌশলও আমাদের যথেষ্ট শেখা আছে। কেবল এই জলোদেশের আবহাওয়ার উপযুক্ত করে ভিত্‌টা আমরা ঠিক্ গাড়তে পারি না। মাটীর তলাতেই জল

চুঁয়ে চক্ষের আড়ালে যে সব ভূমিস্যাৎ হবার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত হয়ে যায়,—উপায় সেইখানেই করতে হবে।

তারি নাম, যা বলতে চাচ্চি—সত্যকে একেবারে স্পষ্ট করে বোঝা।

তবে, এইখানে একটা কথা আছে। যে সত্য ভারতের সাধনা তার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাধনাগত সত্যের মিল নেই। আমরা তবে কাকে বুঝব? জগৎকে ছেঁটে দিয়ে ভারতকে না ভারতকে উপহাস করে জগৎকে? অর্থাৎ পথে বাহির হওয়া অভ্যাস নাই, অথচ যখনি ঐ সম্মুখে বিস্তৃত পথের পানে চাই মনে কেমন একটা কোন অজ্ঞাত পরিণামী লক্ষ্যের আভাষ জেগে মনটাকে এত উদাস করে দেয়, যে, কিছু ভাল লাগে না। দুয়ার জানালা রুদ্ধ করে ঐ পথটাকে দৃষ্টিপথ থেকে মুছে ফেলতে হবে না। এই অভ্যাসের বশ অবাধ্য আমিটাকে অন্ধ বধির করে দিয়ে তার মস্তিষ্ক যন্ত্রটাকে অবধি আঘাতে বিপর্য্যস্ত করে যেমন অভ্যাসের বশ ছিলাম তেমনি শোচনীয় ভাবে পথের বশ হতে হবে। যেন হয় অভ্যাস নয় পথ, মাঝে আর কেউ নেই।

কিন্তু সত্যই কি তাই? তাতো নয়। পথ আর অভ্যাসের মাঝখানে একটা যে আমি আছে,—যে অভ্যাসের মধ্য হতে আপনার খোরাক সংগ্রহ করে এতদিন গোঙাচ্ছিল। আজ পথের পানে চেয়ে সে কি একটা অদূরবর্ত্তী প্রাচুর্য্যের সন্ধান পেয়েছে। কেবল তার এইটুকু বোঝা কুলিয়ে উঠচে না, যে, পথে বাহির হলে ঘরে বসার অভ্যাস মরে যায় না, একটা বাহির হওয়া রূপ নূতন অভ্যাস আরম্ভ হয় মাত্র।

ঠিক একই কথা নয় কি? সত্যকে বুঝতে গেলে বিশ্বের সত্য ভারতের সত্য কি? যেমন একই বল নিয়ে সিংহ হতে শশক পর্য্যন্ত চলাফেরা করে তেমনি একই সত্যের উপরই ত বিশ্বের সকলের জীবন প্রতিষ্ঠান! হতে পারে ঐ বলের প্রকাশের মত সত্যের প্রকাশের তারতম্য আছে। হয় ভারত নয় বিশ্ব দু'য়ের মধ্যে একের সত্য অধিক পরিস্ফুট অথবা উন্নত ধরনের।

আবার এদিকেও আমাদের উপায় সত্যকে স্পষ্ট করে বোঝা। বুঝলেই গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং আমরা কলহের এলাকার মধ্যে নেই। আমরা নিরাপদ। গ্রহণ করতে ত চাইচি না।

এখন ভারতের সত্যই বা কোন স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছেচে—বিশ্বেরই বা কোন অবধি পৌঁছেচে। পরমার্থ বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারত। তার সত্য অতীন্দ্রিয় লোককে স্পর্শ করেছে। জড় বাদ ও ব্যবহারিক তত্ত্ব এদের প্রাধান্যকে ছাপিয়ে

হয়ে গেছে তার মনের প্রাধান্ত। সে আধ্যাত্মিক। স্থূল চর্ম্মচক্ষে যতটা দেখা যায় ও আহার বিহারাদিচ্ছলে যতটা আমরা নিজেদের প্রকাশিত করি হিন্দুর সীমা তার চেয়ে অনেক বেশী দূর। ভারতের বিশিষ্টা সভ্যতা মানুষকে এমন কিছু সত্তায় পরিণত করে যে মানুষ চক্ষু মনেরও অগোচর—সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় এক রহস্যলোক মধ্যে আপনাকে অনুভব করতঃ এক অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদনে আপনাকে ধন্ত করছে। আহার বিহার তার যথেষ্ট নয়, তার চাই সংযম। পুষ্টিই যে তাহার শেষ লক্ষ্য নয়—সে যে চায় ব্যাপ্তি। জীবন ও জগতটা ভোগ করেই সে ক্ষান্ত হতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জগতের কারণকেও ভোগ করব, এতদূর হচ্ছে তার আশা। ভারতের আধ্যাত্মিকতা এই-ই।

বস্তুতঃ জিনিষটা কি ? জিনিষটা মানুষের একটা বিরাট রূপান্তর। হঠাৎ কল্পনা বলে মনে হয় কিন্তু তা নয়—ঠিক কল্পনা নয়। এ রূপান্তর অতীন্দ্রিয় রূপান্তর, তাই বুঝতে একটু দেরী লাগে। অনেক দিন পর্য্যন্ত আলোআঁধারেই থাকতে হয়। বিশ্ব কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবে নি যে ইন্দ্রিয় এবং তার সাধ্য উভয়ের উপাসনা ছেড়ে আরো এগোতে হবে। হঠাৎ ভারতের মনের কথা তার কাণে ঢুকলে কথাটা তার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হওয়াই চাই। আমাদের অনুপযোগী নয় এই জন্ত, যে, আমরা যে পুরুষানুক্রমে এই সত্য নিয়ে মেতে আছি। আমাদের জীবনের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানটাই এমন একটু কায়দা করে পাতা হয় যে তার মধ্যে কত কি ভঙ্গী থাকে, সব ভঙ্গীই কারণকে স্মরণ করিয়ে দেবার সহায়ক।

বিশ্বের সত্য হচ্ছে যে শক্তির অন্ধ জড়বেগে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলেচে সেই পর্য্যন্ত সচেতন হওয়া। ভারতের সত্য সেই জড়বেগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এমন একজন কেউ নিশ্চয়ই আছে,—কারণ এ বেগ শুধু ত বেগ নয় এই বিপুল বেগ বিস্ময়-কর সমারোহ ত উন্মত্তবৎ হয়ে উঠচে না, এর মূলে ত রয়েচে অটুট শৃঙ্খলা। অনন্তকাল অসীম ব্যাপ্তি অথচ কি স্থির অচপল প্রকাশ!—ক্রমে মিলিয়ে যাচ্চে না—সব একই ভাবে দীপ্যমান। যিনি এই সমস্তের অতীত, যিনি এই সমস্তের নিয়ন্তা, তাঁর মধ্যে সচেতন হওয়া ভারতের সত্য। অন্ধজড়বেগে প্রকৃতির শক্তির হাতে আমরাও চলেছি— বিশ্ব চলেচে, আমরাও বাদ যাইনি। যেতেও পারি না! আমাদের বিশিষ্ট উপলব্ধি এই, যে ওই যে অন্ধজড় বেগ ওর নিয়ন্তা যিনি তাঁরও ত নিয়ন্ত্রিত আমাদের মধ্যে আছে। শক্তির যেটা চালনা তাতেও সচেতন হব, আবার শক্তিকে যিনি নিয়মিত করেছেন তাঁর ... শৃঙ্খলা তাতেও সচেতন হব

সুতরাং ধর্মের বনীয়াদে গাঁথা মানে ঐ বিরাট রূপান্তরের বনীয়াদে গাঁথা। আমাদের অতীন্দ্রিয়াভিমুখিনী চেতনা যা জানাচ্ছে, যা জাগাচ্ছে আগে সেটা পরিপূর্ণ হোক। আমরা সচেতন হয়ে উঠি বিশ্বের ও আমাদের সমস্তটার মধ্যে। তারপর ঐ নিয়ন্তা আমাদের মধ্যে এসে বসবেন। তখনই আমরা বলতে পারব—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

বিনিময়

[শ্রীহেমলতা দেবী।]

এই যে জগৎ
আপনি এসে
পরায় গলে
আনন্দ ডোর,
এই বাঁধনে
সাধন আমার
করবে চির—
আনন্দ ভোর।
চিরদিনের
মায়ার ফাঁসি
সুধায় মেখে
উঠবে ভাসি
ভুবন ভরি
মোহন বাঁশী
বাজবে হিয়ার
আনন্দে মোর।

জগত বধুর
পরিণয়ে
এই রাগিণী
নিত্য বাজে
অমর সুধার
বিনিময়ে
নিত্য শোভায়
চিত্ত সাজে
প্রণয় নিবিড়
আলিঙ্গনে
বাঁধন হিয়ায়
সঙ্গোপনে
জীবন বঁধুর
এই মিলনে
বিশ্বে ঘনায়
আনন্দ ঘোর।

চিঠির গুচ্ছ।

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।]

(৫)

কল্যাণবরেষু,

ছিঃ ঠাকুর পো, তুমি এত বে-রসিক তা'ত জানতুম না। এ সময়টা ছুনিয়ায় আর বেড়াবার যায়গা তুমি খুঁজে পেলেনা—রাজপুতনার মরুভূমি ছাড়া? উজ্জয়নীতে গেলেও এক রকম চলত। কিন্তু বাংলায় জল-বায়ুই এ সময় তোমার দেহের ও মনের উপর আশ্চর্য্য কাজ করত বলেই আমার বিশ্বাস। চণ্ডীদাসের দেশই হচ্চে এখন তোমার বেড়াবার উপযুক্ত স্থান।

লাহোরের শুকনো হাওয়ায় সত্যিই তোমার অবনতি ঘটেচে, নইলে, যার কথা শুনতে তুমি এতটা ব্যাকুল তাকে পাহাড়ী মেয়ে বলে অভিহিত করতে না। কর্শিয়ং পাহাড়ের দেশ সেত সকলেই জানে—কিন্তু সে যে মেঘমালার দেশ সেই কথাটাই তোমার আগে মনে পড়া উচিত ছিল।

এখন একটা সুখবর আছে, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মেঘমালার দেশের সেই মেয়েটি বাপ মায়ের সঙ্গে ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে হাজির হয়েচে। মেয়ের বাপ এসে অবধি রোজই দু'বেলা হাঁটাহাঁটি করচেন মেয়ে দেখাবার দরবার নিয়ে।

আমি বর্দ্ধমান হতে কনককে নিয়ে এলুম এবং কাল বিকেলে খোকার সঙ্গে আমরা দু বোন তাঁদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। সদর দরজার সামনে আমাদের গাড়ী দাঁড়াতেই মেয়ের মা এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে গেলেন। বেশ ভাল লোকটি। তোমার সম্বন্ধে আমাদের সংসার সম্বন্ধে অনেক কথাই হল।

কনকের কিন্তু এ সব মোটেই ভাল লাগছিল না। তার দৃষ্টি ছিল কেবল এদিকে ওদিকে মেয়েটির সন্ধানে।

একটি সাত আট বছরের মেয়ে এসে তার মার কাছে চুপি চুপি কি যেন বল্লে। তোমার হবু শাশুড়ীটি আমাদের একটিবার অন্য ঘরে যেতে অনুরোধ

"নারায়ণ" সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। অগ্রহায়ণ হইতে নারায়ণের বর্ষারম্ভ। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা, ভিঃ পিতে লইলে আরও ৴৹ আনা অধিক লাগিবে। মণি অর্ডারে টাকা পাঠাইলে চারি টাকাতেই হইবে। ১৩২৭ সালের বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক অবধি, এই সাত সংখ্যা আমরা তিন টাকায় দিব। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ছয় আনা, ভিঃ পিতে ৷৵৹ আনা।

২। "নারায়ণ" প্রতি বাঙ্গলা মাসের ১লা বাহির হয়।

৩। যথাসময়ে "নারায়ণ" না পৌঁছিলে, স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান ও পোষ্ট অফিসের লিখিত উত্তরসহ সেই মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে না জানাইলে, আমরা পুনরায় দিতে পারিব না বা দায়ী হইব না।

৪। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময়ে গ্রাহক নম্বর না লিখিলে কোন প্রতিকার করা অসম্ভব।

৫। দুই এক মাসের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে গ্রাহকগণ দয়া করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাইয়া লইবেন। অধিক দিনের জন্য হইলে গ্রাহক নম্বর সহ ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৬। চিঠি পত্রাদিতে এবং মণি অর্ডার কুপনে নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে ভুলিবেন না।

৭। কোন চিঠির জবাব বা অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরৎ দেওয়া হয় না; সুতরাং উহার কাপি রাখিয়া পাঠান আবশ্যক। নারায়ণের ছয় পৃষ্ঠার অধিক হইলে সে প্রবন্ধ লওয়া হয় না: দুই পিঠে লেখা প্রবন্ধ আদৌ গৃহীত হয় না।

৮। ভিঃ পি যোগে পত্রিকা পাঠাইতে অনেক সময় টাকা পাইতে দুই মাসেরও অধিক বিলম্ব হয় সুতরাং মণি অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইলে কাগজ পাইতে দেরী হয় না।

টাকাকড়ি চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন।

নারায়ণ কার্য্যালয়—
৫৪, মোহনলাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

নারায়ণের বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি :—

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিজ্ঞাপন দাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃষ্টি রাখিবেন, যেন তাঁহাদের প্রেরিত বিজ্ঞাপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইলে সেই বর্দ্ধিত অংশটুকুরও মূল্য তাঁহাদিগকে বহন করিতে হইবে। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বা নূতন বিজ্ঞাপন দিলে ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের পাওয়া চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ ১ পৃঃ—	প্রতি মাসে—	১২৲ টাকা
,, ½ পৃঃ	,,	৭৲
,, ¼ পৃঃ	,,	৪৲
,, ⅛ পৃঃ	,,	২।০
সূচীর নিম্নে অর্দ্ধ পৃঃ	,,	৮৲
ঐ সিকি ,,	,,	৪।০
কভারের প্রতি ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা	,,	১৮৲
,, ঐ ½ ঐ ½	,,	১০৲
ঐ ৪র্থ পৃঃ	,,	২২৲

Sri Aurobindo's ARYA **Monthly Magazine.**

The Arya is a review of pure philosophy.

The objects which it has been unfolding for the last **seven years** are—

(1) A synthetic study of the highest problems of existence.

(2) The formation of a vast synthesis of knowledge harmonising the diverse traditions of humanity accidental as well as oriental. Its method is that of a realism at once rational and transcendental a realism consisting in the unification of intellectual and scientific disciplines with those of intuitive experiences.

Annual subscription, India—6/-, Foreign—125.

The November-December issue contains among other things :— A Preface on National Educatian, The Lines of Karma and, Synthesis

অরবিন্দ প্রবাহের নতুন বই।

বারীন্দ্রের আর্য্য পাবলিশিং হাউস

৪।এ, মোহনলাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার পোঃ, কলিকাতা।

WORKS of SreebrouAindo Ghosh.

	Rs.	As.
Ideal and Progress	1	0
Evolution	0	8
Thoughts & Glimpses	0	6
Superman	0	8
Isha Upanishad	1	0
Renaissance in India	1	12
Ideal of the Karmayogin (in the Press)		
Uttarpara Speech	0	4
Ideal of Humanunity	2	8
War and self-determination	2	0
অরবিন্দের পত্র		।৶০
গীতার ভূমিকা		১।০
ধর্ম্ম ও জাতীয়তা		১॥০
পণ্ডিচারীর পত্র		৵০

বারীন্দ্রের

দ্বীপান্তরের কথা	১৲
(নারায়ণে যতখানি প্রকাশিত হয়েছিল তার দ্বিগুণ)	
,, ,, বাণী	৯৲
,, মিলনের পথে (উপন্যাস)	১॥০

নলিনী গুপ্তের

সাহিত্যিকা	১॥০

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

ইরাণী উপকথা	১।০
নূতন রূপকথা	১৲
দেবজন্ম	১৲
পূর্ণযোগ	॥০
লীলা	॥০
যৌগিকসাধন	৸০
সাধনা	॥৵০
উদ্বোধন	১।০
নবযুগের কথা	৸০
যুগবার্ত্তা	৸০

মুক্তি পথে সিরিজ :—

উপেন্দ্রের—জাতের বিড়ম্বনা	৵০
অনন্তানন্দের পত্র	৵০
পার্থসারথীর—বাঙালীর ব্যবসাদারী	৵০
বারীন্দ্রের—মায়ের কথা	৵০
অরবিন্দের—পণ্ডীচারির পত্র	৵০
অতুলচন্দ্রের—উভয় সঙ্কট	৵০
উপেন্দ্রের—সিন্‌ফিন্	।৵০

অরবিন্দের **বিজলী** প্রেরণায়

নূতন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা, নগদ মূল্য—১০ পয়সা

যুগান্তরের ভাষায় "কালবৈশাখী" ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যার ভাষায় "উনপঞ্চাশী", তা' ছাড়া "কাজের কথা", "পাঁচমিশালা", "খড়-কুটো" প্রভৃতি মনকাড়া লেখায় এমন কাগজ আর নাই সত্বর গ্রাহক হউন।

বিজলী কার্য্যালয়—৪।এ, মোহনলাল ষ্ট্রীট,

করলেন। সেখানে গিয়ে দেখলুম আসন পাতা খাবার যায়গা তৈরি। গৃহকর্ত্রী আমাদের বল্লেন, একটু মিষ্টি মুখ করতে হবে। দু'চার বার আপত্তি জানিয়ে শেষটায় আমরা বসে পড়তে বাধ্য হলুম।

এমনই সময় তাকে ঘরে ঢুকতে দেখ্‌লুম একখানা খাবারের রেকাবী হাতে নিয়ে। সত্যিই সে মেঘমালার দেশের মেয়ে। মেঘের কোল হতে নেমে এসেচে একেবারে বিদ্যুৎ বরণ নিয়ে, অথচ স্থির ধীর, মোটেও চঞ্চল নয়। নামটি তার নীহার।

কনক তাকে টেনে নিয়ে তার সঙ্গে খেতে বসালে আমি তাই তাকে ভালকরে দেখবার সুযোগ পেলুম। মুখচোখ তার একেবারে নিখুঁত। পরণে ছিল একখানা আসমানি রংএর শাড়ী, সাদা সিধে গোছের একটা ব্লাউস গায়ে আর তার পিঠের ওপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে পড়েছিল একরাশ ঘনকালো লম্বা চুল। চোখের দৃষ্টি বেশ শান্ত আর হাসিটুকু বড়ই মধুর।

তোমায় আগের চিঠিতে ইস্কিস্‌ লিখে পাঠিয়েছিলুম বলে মনে করবোনা যে, পান্টা তোমায় নকল লিখে পাঠাচ্ছি। যতটুকু লিখেছি, তাও সত্যিই—লিখে বুঝাবার মত ভাষা যদি আমার অধিকারে থাকত, তাহলে তার চেহারাটা তোমায় বুঝাবার এই ব্যর্থ প্রয়াসের পরিচয় পেতে না। কলমের দাগই তুলি দিয়ে আকার মত একখানা সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলত।

আমাদের জলযোগ শেষ হলে নীহার মায়ের আদেশে কনককে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। আমি কিনা তোমাদের সংসারের গিন্নী। তাই মেয়ের মার সঙ্গে সাংসারিক কথাই কইতে লাগলুম। প্রসঙ্গ ক্রমে তোমার কথাও উঠল। মেয়ের মা তোমার চেহারা কেমন, রোগা নাকি তুমি, এই সব প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি ঠিক ঠিক সব উত্তর দিতে লাগলুম এমন কি তুমি যে পেটে ক্ষিধে নিয়ে, রসনায় লোভ রেখেও চেয়ে খেতে জান না, সে-টাও তাকে জানিয়ে দিলুম।

পাঁচটার পর আমরা বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। কনকের মুখে আর নীহারের প্রশংসা ধরে না—সমস্তটা রাস্তা সে বকতে লাগল। তার মতে এই মেয়ে ছাড়া, তোমার বউ হবার উপযুক্ত মেয়ে কোথাও পাওয়া যাবে না।

এত গেল মেয়ে দেখবার পালা। এর পরই কিন্তু তাদের তরফ হতে ছেলে দেখবার তাগিদ পড়বে। আমি সেই জন্যই বার বার করে তোমাকে এখানে আসতে লিখছি।

তারা তোমায় দেখতে চান, একথা শুনে নিশ্চিতই তুমি বিদ্রোহী হবে না, কারণ, আমাদের মত তাদেরও ও আকাঙ্ক্ষাটা স্বাভাবিক।

এ ছাড়াও ছুটিতে তোমার এখানে আসা খুবই দরকার। বিশেষ কাজ আছে—চিঠিতে লিখে তা বোঝান যাবে না। তোমার এখানে থাকা চাই এবং আমার ফরমাস নিয়ে এদিকে সেদিকে ছুটোছুটি করা চাই। বাড়ীতে ত আর দ্বিতীয় লোকটি নেই কাজেই নিজের বিয়ের অনেক কাজ তোমাকেই করে নিতে হবে; নইলে একা আমি পারব কেন?

এতদিন ভাই তুমি সম্পূর্ণ আমার হাতের মুঠোর ভিতরই ছিলে। যখন যা বলেচি, না করে থাকতে পরিনি—এমন কি তুমি নিজে যা করতে চেয়েছে, তাও একবার আমার মুখ দিয়ে বার করিয়ে নিয়ে তবে করেচ। তুমি কি শুধু আমার দেবর স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর মাত্র? কেবল তা হলেই কি তোমায় এমন করে ভাল বাসতে পারতুম।

তুমি ত আমায় কেবল ভ্রাতৃবধূরূপেই দেখনি। মায়ের স্নেহ ভগ্নীর ভালবাসা, বন্ধুর প্রীতি সব দাবী করে নিয়ে তুমি যে আমায় একেবারে নিঃস্ব প্রায় করে ফেলেচ। আজও বিকেলে ইস্কুল হতে ফিরে এসে খোকা যখন খাবার চাইলে, খেতে ভাল লাগচে বলে যখন আরও দিতে বল্লে—তখনও অন্যমনে বলে ফেলেছিলুম—"সব তোকে দোব, কাকাবাবু খাবেনা?" পেছন হতে মিনি বলে উঠল—"কাকাবাবু লাহোরে হাঁ করে বসে আছেন মা তুমি এখান হতেই তাঁর মুখে তুলে দাও।" খোকা আর মিনি দুজনাই হেসে উঠল—আমিও তাতে যোগ দিলুম।

এত সব আজ তোমায় কেন লিখচি, বলতে পারিনে—যা এসে পড়ল তাই-ই লিখে ফেল্লুম। ছুটিতে এখানেই এসো।

আসবার সময় বর্দ্ধমান হতে নরেশকে নিয়ে এসো—কনককে আমি ততদিন ছেড়ে দিচ্ছিনে। তোমার দাদার কাছে যে চিঠি লিখেচ, তা দেখলুম জবাব হয়ত এই ডাকেই পাবে। আমরা ভাল আছি। কেমন লাগচে? লাহোরের নতুন কিছু সঙ্গে এনো। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা
বৌদি

(৬)

ভাই নরেশ।

তোমরা সবাই মিলে আমার চারটে দিকই ঋণজাল দিয়ে ঘিরে ফেলেচ।

এখন কলকাতায় বসে বউদি জাল গুটাবেন আর আমি সটান তার কাছে গিয়ে হাজির হব। আত্মসমর্পণে আমার কোন দিনই অমত ছিলনা—বিশেষ তোমাদের মত লোকের কাছে—যাদের আইনে একমাত্র শাস্তিই হচ্চে স্নেহ বর্ষণ।

একদিন তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, মেয়েরা আমাদের কি দিতে পারে? জবাব স্বরূপ তুমি যা লিখেছিলে মামুলী বলে আমি মোটেও তা সমর্থন করতে পারিনি। কিন্তু মানুষ যে সময় সময় অতি পুরাতন, একেবারে জানা—যা, তার জনই ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তাই পেলেই পরম তৃপ্তি লাভ করে—সে-টা আমার জানা ছিল না। নতুনের মাঝে যে একটা মাদকতা আছে, তাতেই মত্ত হয়ে এমন বহু পুরাতন অথচ, চিরনবীন যা, চিরদিনই মানুষ যা পেয়ে আনন্দ লাভ করে তাও তুচ্ছ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলুম। তাইত অশিক্ষিতা বলে অবজ্ঞা ভরে মেয়েদের স্নেহ প্রীতি ভালবাসার কোন মূল্যই একদিন দিতে চেয়েছিলুম না। কিন্তু কাল বউদির চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলুম আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বিরাট একটা দৈন্য যা এতদিন কেবল হা-হা করছিল, তা হচ্চে এই সব উপেক্ষা করবারই ফলে। মেয়েদের কাছেই ওই জিনিষগুলি পাওয়া যায়—এবং তা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে।

তুমি আমার চিঠিতে এ কথাগুলো পড়ে নিশ্চতই খুব বিস্মিত হয়েচ এত শিগ্গীর আমার মত বদলাতে দেখে। আমার এ মানসিক পরিবর্ত্তন এনে দিয়েচে বৌদি আর কনক তাদের অফুরন্ত স্নেহের সন্ধান জানিয়ে।

কিন্তু মনে করো না যে এতেই তৃপ্ত হয়ে তোমার সমাজের নিয়ম মেনে নিয়ে তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবো বরং দ্বিগুণ বিক্রমে আমি তাকে আঘাত করব—কারণ, আমার বিশ্বাস যে, সমাজ যদি পীড়ন না করত, তা' হলে আমাদের দেশের নারীকুল তাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে সমস্ত সঙ্কোচ দূরে ফেলে, তাদের অন্তরের অমৃতরাশি বিলিয়ে দিতে পারত, যাতে করে অভিশপ্ত মৃতপ্রায় এই জাতি বুকভরা প্রাণ পেয়ে জেগে উঠত।

তুমি একবার লিখেছিলে, সমাজকে গালি দেওয়া বৃথা, কারণ, সমাজ গড়ে উঠেচে আমাদেরই নিয়ে। তোমার মত হচ্চে, সমাজের অধিক সংখ্যক লোক যখন পরিবর্ত্তন আবশ্যকীয় মনে করবে, সমাজের আচার নিয়ম তখন আপনা হতেই বদলে যাবে। যতদিন তা না হচ্চে, ততদিন আমাদের চুপটি করে বসেই থাকতে হবে—জাতির অনিবার্য্য শক্তিক্ষয় নির্ব্বিকার ভাবে দেখতে হবে।

কখন কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে এই বিরাট জন-সঙ্ঘ শিক্ষিত হবে, কুসংস্কার

দূর করে, মিথ্যা অবিশ্বাস ঘুচিয়ে কবে সে আপনাকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে, তারই অপেক্ষায় বুকের ব্যাথা আমরা বুকেই পুষে রাখব। অত ধৈর্য্য আমার নেই—সেই জন্যই ত আমি তোমাকে বলতুম, তোমরা যাকে মহৎ কাজ বল, আমাকে দিয়ে তা হবে না। তাইত আমি দূরে সরেছিলুম তোমাদের কর্ম্মকোলাহলের সম্পূর্ণ বাইরে। তুমিই ইচ্ছে করে না করালেও —টেনে নিয়ে এসেচ আমায় কর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্তের একেবারে কাছে। সে যখন আমায় আকর্ষণ করচে তার অদম্য শক্তির জোরে তখন তুমি বলচ আমায় সামলিয়ে নিতে, নিজেকে সংযত করতে। একি তোমার পরিহাস বন্ধু? বাইরের সব কিছু উপেক্ষা করব বলে যে দম্ভ করেছিলুম তা যে কত মিথ্যা, তাই প্রমাণ করবার এ প্রচেষ্টা।

এক রকম লোক আছে, যাদের মায়ের অঞ্চলের নিধি বলা হয়ে থাকে। আমরা বেশির ভাগ লোকই এই দলভুক্ত হয়ে পড়েচি। দুঃখ দৈন্য যত প্রবলতর হয়ে উঠচে, ততই জোরে আমরা অতীতের কঙ্কাল জড়িয়ে ধরচি। দেখবার প্রবৃত্তি নেই, বুঝবারও শক্তি নেই যে সে কঙ্কালে ঘুণ ধরেচে—তার আর শক্তি নেই যে সে আমাদের রক্ষা করে। ওই কঙ্কালে মেদ-মজ্জার সঞ্চারে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে নতুন উদ্যম চাই, তা আমাদের নেই —নতুন কিছুই আমরা সইতে পারিনে। পারিনে বলেই ত এই সেদিনও কেশবচন্দ্র, রামমোহনকে পৃথক করে দিলুম—বিবেকানন্দের মুক্তির বাণী গ্রহণ করতে পারলুম না।

মেয়েদের বন্ধন-রজ্জু শিথিল করে দিতে বল্লেই আমরা বাসন মাজবার লোক পাব না আশঙ্কা করে চেঁচিয়ে উঠি। সংসারে সব চাইতে বড় কাজই হচ্ছে ওই ঐ বাসন মলা। শিক্ষিতা হয়ে মেয়েরা যদি সংসারের আয় বাড়াতে অক্ষম হয়, তা হলে বাসন তাদেরও বাধ্য হয়েই মলতে হবে—বি-এ পাশ করে ছেলেরা যেমন কুড়িটাকা মাইনের চাকরী করে।

যাঁরা একটু বেশি বিজ্ঞতার ভাণ করেন, ভবিষ্যৎকে যাঁরা স্পষ্ট করে নাকি দেখে ফেলেচেন—তাঁরা আগে সফ্রেজিষ্ট শেষে বলশেভিষ্টদের নজীর দেখিয়ে বলবেন, স্বাধীনতা পেলে আর্য্যনারীরাও শেষটায় ওই দলের ধ্বংসবাদী হয়ে দাঁড়াবে।

ইউরোপের সামাজিক সমস্যা জটিল হয়ে উঠচে সন্দেহ নেই—কিন্তু সেটাকে ভয়ের চোখে তারাই দেখচে, যারা সমাজকে মানুষের চাইতেও বড় বলে মনে

করে। মানুষকে যারা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে চায় তাদের চিত্ত কিন্তু আশায় আনন্দে নেচে উঠ্‌চে স্বাধিকার স্থাপনের এই প্রচেষ্টা দেখে। হাঁটতে গেলে শিশু বার বার আছাড় খাবে এই আশঙ্কা মনে পোষণ করে তাকে পঙ্গু করে রাখব, না চলবার শক্তি লাভ করলে সে পাহাড়ও অতিক্রম করতে পারবে তাই উপলব্ধি করে তাকে চলতে শেখাব ?

নূতন করে গড়তে হলে পুরাতনকে প্রয়োজন মত ভাঙতেই হবে। বৈদিক যুগ হতে সুরু করে ভাঙা গড়ার ভিতর দিয়েই আমাদের এই জাতি গড়ে উঠেচে। আমাদের মাঝে যা কিছু অসত্য, যত রকম ভুল ভ্রান্তি সব এমনি করে বিদূরিত হয়েচে। সনাতন বলে যা কিছু আমরা পেয়েচি, তা হচ্চে এই ভাঙা গড়ারই ফল স্বরূপ। এ জাতি ভাঙা গড়ায় যদি চিরদিনই ভয় পেয়ে আসত, তা হলে কি দুনিয়ায় কিছুতেই টিকে থাকতে পারত ?

যে দিন হতে আমরা শক্তি হারিয়েচি, সে দিন হতেই আমরা নিজেদের বার বার করে বুঝিয়েচি আমাদের আর কিছুই করবার নেই—পূর্ব্ব পুরুষেরাই ত সব করে গিয়েছিল। তাদের পুণ্যের জোরে আমরা যে কেবল বেঁচে থাকব তা নয়, সেই সঞ্চিত পুণ্যের অংশ পেতে বিশ্বের সকলেই কাঙালের মত আমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে আমরা কাঙালের চাইতেও অসহায় হয়ে পড়েচি। দুনিয়াকে দেবার মত আমাদের অনেক কিছু থাকতে পারে, এ কথা আমি অস্বীকার করতে চাইনে, হয়ত অনেক কিছুই আছে। সব জাতিরই কিছু কিছু থাকে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সেই দাতার পদে অধিষ্ঠিত হবার আগে আমাদের নিতেও হবে অনেক। আর সে সব প্রত্যাখ্যান করলে আমাদের পূর্ণরূপটি কখনো ফুটে উঠবে না, সমগ্র বিশ্ব যা দেখে আমাদের কাছে এসে ভিড় জমাবে।

বাইরের কথা অনেক কিছুই বল্লুম—জানিনা তুমি এতে সায় দেবে কি না। বউদি আর কনক মিলে কর্শিয়ং এর সেই মেয়েটি দেখে এসেচেন। তার যে বর্ণনা আমায় পাঠিয়েচে তাতে বোঝা গেল তারা এই সম্বন্ধটাই স্থির করে ফেলবেন। আমারও যে অমত আছে, তা নয়।

এখনো কিন্তু বুঝতে পারচিনে, বিয়েটা উচিত হচ্চে কি না। এত তাড়াতাড়ি না করলেও চলত বোধ হয়। ইতি

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
মোহিত

(৭)

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। রাজপুতনা ভ্রমণ এবার স্থগিত রাখিলেই ভাল হয়। বড়দিনের ছুটিতে এখানেই আসিবে। তোমার ভ্রাতৃবধূ তোমাকে এখানে আসিবার জন্য লিখিতে আমায় বার বার অনুরোধ করিতেছেন। তুমি না আসিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন।

অতি অল্প বয়সেই তুমি মাতৃহারা হইয়াছ। তদবধি মাতার ন্যায় স্নেহে তিনি তোমাকে পালন করিয়াছেন। এমতাবস্থায় তাহাকে ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত হইবে না। অপর সংসারের কার্য্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে একাকিনী বধূমাতার পক্ষে সকলদিকে দৃষ্টি রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আমি অগৌণে তোমার বিবাহ দিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় তুমি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়া উপার্জ্জন-সক্ষম হইয়াছ। অতএব বিবাহ না করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ তোমার থাকিতে পারে না। তথাপি এ বিষয়ে তোমার মতামত লওয়া আমি আবশ্যক মনে করিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃবধূর নিকট তোমাব সম্মতি আছে জানিয়া আমিও পাত্রীও প্রায় স্থির করিয়াছি। মেয়েটি সুশ্রী, বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা। মেয়ের পিতা কর্ম্মিয়ংএ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি অতি সজ্জন এবং অমায়িক ব্যাক্তি। সম্প্রতি দুইমাসের বিদায় লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। শুভকার্য্য সম্পন্ন হলেই কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, আগামী মাঘ মাসেই শুভকার্য্য সম্পাদন করি। ঐ সময় তোমাকে কলেজ হইতে কিছুদিনের বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। বড় দিনের ছুটিতে বাড়ী আসিলে এ সম্বন্ধে এবং সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে।

তোমাদের সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া কিছুকাল আমি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হই মনে করিয়াছি। এতদিন যাবত সংসারের বোঝা বহন করিয়াই আসিয়াছি, এক্ষণে তোমরা আমাকে অব্যাহতি দাও যাহাতে আমি পরলোকের চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমরা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া সুখে কাল অতিবাহিত কর এবং পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধানে সক্ষম হও। অত্র মঙ্গল। পত্রোত্তরে তোমার কুশল সংবাদ লিখিবা। ইতি আশীর্ব্বাদক—

শ্রীভবনাথ রায়।

পুঃ -খোকা ও মিনির দুইখানি পত্র এইসঙ্গে পাঠাইলাম।

শ্রীশ্রীচরণেষু -

কাকাবাবু, আপনি কবে আসবেন। আমাদের ড্রিব্‌নাষ্টিক মাষ্টার মশাই গল্প করেছেন, পাঞ্জাবের কোথায় নাকি খুব ভাল হকি-ষ্টিক পাওয়া যায়। আপনি আসবার সময় আমার জন্তে খুব ভাল দেখে তিন খানা নিয়ে আসবেন। আমাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে—শিগ্‌গীরই প্রমোসন হবে। ইতি

প্রণত—

খোকা

কাকাবাবু,

আমি এবার ইস্কুলে অনেক বই প্রাইজ পেয়েছি। আমাদের বাড়ীতে একজন নতুন লোক এয়েছেন—তিনি হচ্ছেন মাসীমা। আরও অনেকে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন, মা বলেচেন, আমাদের কাকীমা হবেন। এমন তিনি সুন্দর। আপনি যে দিন আসবেন, সে দিন আমরা ষ্টেশনে যাব—দাদা বাবু নিয়ে যাবেন বলেচেন।

মিনি

অন্যমনে

(শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

সাঁঝের আঁধার নাম্‌ল নদীর পারে
তোমার চোখের পাতার ধারে ধারে
বিষাদ কেন বিরল এসে বাঁধা ?

শঙ্খ কাঁশর বাজ্‌ল দেবালয়ে
বাদুড় পাখা নাড়ায় তরু চয়ে
গাঁথা তোমার হয় নি কি গো মালা ?

সোণার রেণু কখন গেছে উড়ে
পশ্চিম নভে বিদায় বেণুর সুরে
দিন যে তাহার গেয়েছে শেষ গান

জোনাক তাদের ক্ষুদ্র পাখা মেলে
ঝোপে ঝাড়ে বেড়ায় আলো জেলে
নদীর বুকে উঠ্ছে নিশার তান।

গোষ্ঠ হ'তে বৎস ধেনুর দলে
আপন ঘরে কখন গেছে চলে'
তুলসী বাতি কখন হ'ল জ্বালা
লক্ষ তারা উঠ্‌ল একে একে
হাটের লোকে কতই ডেকে হেঁকে
ফিরল ঘরে নিয়ে বেসা্তি-ডালা

ঝিঁঝিঁর দলে কখন গেছে মেতে
শিবার দলে কখন গলা গেঁথে
দিয়েছে যে এক পহরের ডাক
ঝোপ ছাড়ায়ে বেড়ায় ধারে ধারে
এদিক সেদিক পুকুর পারে পারে
ছড়িয়ে গেছে জোনাকিদের ঝাঁক।

শিশুর দলে চোখের পাতা ভারী
রাজ কন্যার সকল দুঃখ ছাড়ি'
ঘুমিয়ে গেছে দৈত্যপুরীর মাঝে,
মৃদঙ্গ আর হরিধ্বনি দূরে
মিশিয়ে গেছে নীরবতার সুরে
গভীর নিশি সাজন গহন সাজে।

সারাটা দিন কমনে গেছে বালা
কিসের ছলে হয়নি গাঁথা মালা
এম্‌নি কি গো ছিলে অন্যমনে
ছিলে বুঝি এখন একা একা
আঁখির তটে নিয়ে বিষাদে-লেখা
সারা নিশা কাটাও শূন্য সনে।

দেশের কথা।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

দেশের দুর্দ্দশার একটী মূল কারণ টাকার দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু টাকার শক্তি হ্রাস বা দ্রুত অবনতি। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট ঝক্‌মকে বন্দুকের সঙ্গীনে নয়, চক্‌চকে টাকায়। সুতরাং ইংরেজের টাকা অচল হ'লেই তার বন্দুকের সঙ্গীনে মরচে পড়িবে। কি কি কারণে টাকার দ্রুত অবনতি সম্ভব, তাহা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে বাঙলার ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় একটী অধ্যায় স্মরণ করিতে বলি

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাস আমাদের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব যখন দিল্লীর চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, তখন বাঙলায় হিন্দু মুসলমানের গৌরব, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদের অখণ্ড প্রতাপ। গঙ্গাবক্ষে দেশ বিদেশের বাণিজ্যসম্ভার বহন করিয়া সহস্র সহস্র তরণী ভাসমান ছিল। নবাবের শক্তির মূলে ছিল জগৎ শেঠদের ঐশ্বর্য্য। দিল্লীর বাদশা, নবাব ও জগৎশেঠদের তুল্য সম্মান করিতেন। শেঠদের ঐশ্বর্য্য জগৎবিখ্যাত ছিল। মুর্শিদাবাদে বাৎসরিক রাজস্ব সংগৃহীত হইবার পর একক্রোটী বিশ লক্ষ মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করা হইত এবং সমুদয় অর্থ শেঠেরা 'হুণ্ডি' পাঠাইয়া দিল্লীর কুঠি হইতে পরিশোধ করিতেন। শেঠদের কুঠী বাঙলার ও ভারতের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিল। মুর্শিদাবাদে নবাব বহু অর্থ শেঠদের নিকট ঋণ করিতেন ও শেঠদের পরামর্শ ব্যতীত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন না। ইংরেজ ফরাসী ও আর্ম্মেনীয় বণিকগণ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা শেঠদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিতেন। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা সেই পলাশী ও গিরিয়ার রণক্ষেত্রে সিরাজ ও মীর কাশেমের শক্তি ইংরেজ কর্ত্তৃক নির্ম্মূলিত হয় নাই, বরং সে ষড়যন্ত্র ও ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে জগৎশেঠদের যে শক্তি ছিল সেই শক্তিকে কৌশলে ইংরাজ করতলগত করে ও অবশেষে বিধ্বস্ত করে। বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন কালে শেঠদের দুই কোটী মুদ্রা লুঠিয়া লইলেও শেঠেরা পূর্ব্বের মত এক কোটি টাকার 'হুণ্ডি' পাঠান বন্ধ করেন নাই। মুতাক্ষরীণকার বলেন, যে, শেঠদের

যেন দুই আঁটী খড় চুরি গিয়াছিল। এ হেন শক্তি পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের পদানত হয়, ইহা অসম্ভব। মীরকাশেম শেঠদের ইংরেজের জাল হইতে মুক্ত করিতে শেষ চেষ্টা করেন। মীরকাশেম মহারাজ নন্দকুমারের বুদ্ধিবলের সহিত শেঠদের অর্থবল "মণিকাঞ্চন" যোগ করিতে সমর্থ হইলে বাঙলায় ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা আকাশ কুসুমবৎ বিলুপ্ত হইত। যাঁহারা কলিকাতায় টাঁকশাল বা mint স্থাপন ও মুর্শিদাবাদ হইতে রাজস্ব বিভাগ কলিকাতায় আনয়ন করা এবং তাহার ফলে শেঠদের শক্তি নির্ম্মলিত হওয়ার ইতিহাস জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাৎকালিক কলিকাতার গবর্ণর ভ্যানসিটার্টের (Vansitart) চিঠি পত্রাদি ও অন্যান্য State Papers পাঠ করিতে পারেন। জগৎ শেঠদের ইতিহাস শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে" কীর্ত্তিত আছে।

স্বভাবতঃ টাকার মূল্য বা শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি দেশের উৎপন্ন শস্যের ও শিল্পের অল্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে এবং বিদেশজাত দ্রব্যাদির বিনিময়ে ধার্য্য হয়। রাজার কর্ত্তব্য প্রজার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ টাকার শক্তিকে স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে ও কমিতে দেওয়া। যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা রাজধর্ম্ম, তেমনই করভার হইতে প্রজারক্ষণও রাজার ধর্ম্ম। যে দেশে রাজা ও প্রজার স্বার্থ এক, সেই দেশে প্রজা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে রাজাও দুর্ব্বল, প্রজা সবল হইলে রাজাও সবল হয়। আমাদের দেশে রাজা ও প্রজার স্বার্থ ঠিক এক নয়, তাই যত অর্থের দুর্ভিক্ষ তত অন্নের দুর্ভিক্ষ, অর্থের স্বচ্ছলতার অভাব ও তারই ফলে যে অন্ন বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা, ইহা অনেক পরিমাণে সত্য। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়, যে, ভারতবর্ষ বৃটীশ সাম্রাজ্যের একটী প্রদেশ (Province) মাত্র—ইহার রাজধানী কলিকাতাও নয়, দিল্লীও নয়, লণ্ডন। রাজার দৃষ্টি কোন পথে—দিল্লীর পথে কি লণ্ডনের পথে তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভারতে নাই বলিয়া আমাদের আত্মনির্ভরতার একান্ত অভাব।

তাই ইংরেজের দেশ হইতে বস্ত্র আসে আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতে, আমাদের বিলাসীতা সৌখীনতার সকল আসবাব-সামগ্রী সাত সমুদ্র পার হইয়া আসে, আর আসে ইউরোপীয় Services, অর্থাৎ আমাদের দেশ-রক্ষা করিতে বড় লাট হইতে আরম্ভ করিয়া গোরা সিপাহী পর্য্যন্ত,—যাঁহারা

প্রজা রক্ষার দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া আইনের জাল বিস্তার করেন এবং সীমান্তে আতসবাজী দেখাইয়া রুষ আফগান সিংহ ব্যাঘ্র হইতে পাহাড়িয়া মানুষ মূষিক পর্য্যন্ত শত্রুদলকে সন্ত্রস্ত ভয়চকিত করিয়া দেশরক্ষাকল্পে দেশের রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করেন।

দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা যতই Statistics দেখান না কেন, সচ্ছলতা দেশে আছে কিনা, তাহা দেশের জনসাধারণের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট যদি না বুঝি, ঐ সব মোটা মোটা হিসাবের খাতা পত্র দেখিয়া কি বুঝিতে পারিব? বাঙলার কৃষক যখন তাহার কৃষিক্ষেত্রে সোণা ফলাইয়া তাহা রক্ষা করিতেছে, দেশের উন্নত অবস্থা তখনই দেখিব,—না যখন ব্যাধি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া সহরের কলকারখানায় কয়লার ময়লা মাখিয়া, সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানের দুইটা টাকার জন্য স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য লালায়িত হইয়া ধর্ম্মঘট করিতেছে? দেশের উন্নত অবস্থার এই কি ছবি?

এযে সভ্যতার-সংঘর্ষ, ভারত কি এই সভ্যতা গ্রহণ করিবে? বাস্তবিক, সভ্যতা, শিক্ষা, শাসন সবেরই আজ জাতিবিচার করিবার, আচরণীয় কি অনাচরণীয়, এ বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। টাকা 'বয়কট' করিবার প্রয়োজন হয় না। টাকার শক্তি না থাকিলে টাকা আপনা আপনি অচল হয়। টাকার শক্তি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, দেশের জনসাধারণের টাকা গড়বার শক্তি আছে। আমরা বৃটীশ-শাসন, হিন্দু-শাসন বুঝি না; বৃটীশ-শাসন থাক বা যাক, হিন্দু-শাসন হউক বা না হউক, আমরা বুঝি সুশাসন গ্রহণ করা ও কুশাসন বর্জ্জন করা, আমরা যে 'স্বরাজ' চাই, সে 'স্বরাজ' বাঙলার বা ভারতের স্বরাজ নয়, সে স্বরাজ সর্ব্বদেশে সকল মানুষের 'স্বরাজ' (Freedom of man), পৃথিবীর সকল জাতিকে সেই 'স্বরাজ' পাইতে হইবে সে স্বরাজ কেহ বাহির হইতে দিবে না—প্রত্যেকের অন্তরের সাধনার বলেই সেই 'স্বরাজ' ফুটিবে। অন্তরে মুক্ত মানুষের সমাজ রাষ্ট্র দেশ সবই মুক্ত।

দীপলক্ষ্মীর আবাহন।

(শ্রীমতীবাণী নিরুপমা দেবী।)

হে দেবী রহস্যময়ী তব গূঢ় মায়াজাল একবার ছিঁড়ে দাও ক্ষণেক তরে
তোমার তপন হতে একটি কণক শিখা আমার এ নয়নে ছোঁয়াও,
মাটির মানুষ তোর অবোধ এ ছেলেমেয়ে পীড়িত তাপিত কাঁদে বেদনা ভরে
তোমার এ মহিমার ধূলার এ মলিনতা আলোর জ্যোতিতে রেঙ্গে দাও!

জ্যোতির মুকুল অয়ি লক্ষ তপন জ্বালা লক্ষ বিজলী খেলা মুকুট শিরে
চিরধ্রুবা চিরশুভা মাগো তুই অপরূপা ওগো নভোলীলাময়ী দেবী
অজ্ঞানের জড়িমায় কামনা কলুষ কালো ঘনঘোর তমসায় রেখেছে ঘিরে
তোর দেওয়া জ্ঞানালোকে ওগো মহাজ্ঞানময়ী একবার তুষা জ্ঞানে সেবি।

একি তোর মায়াজাল কেন এ জীবন লীলা একি শুধু পরিহাস হে নটরাণী?
এই গড়া এই রাখা এই ভাঙ্গা পুনঃ পুনঃ অর্থ কিছুই এর নাই।
আমরা অবোধ শিশু আমরণ নত শিরে আমোঘ বিধান তোর বহিতে জানি
কেঁদে হেসে ভালবেসে দুর্ব্বলের অধিকারে জানি শুধু কবিতে বড়াই!

তোমার তপের জ্যোতি ভাগ্যখেলানর তা জ্বলিতেছে দুলিতেছে গগন কোলে
সুখদুখ হাসি ব্যথা ইহকাল পরকাল নিমেষে নিমেষে গড়ি নব
আমরা বিমূঢ় শিশু খেলার ঘুঁটির মত আলো আঁধারের ঘরে পড়ি যে ঢলে
কুহেলি কুয়াসা মাখা অন্ধ তিমির ঢাকা ভাগ্যখেলার ঘরে তব।

এই কি জীবন দেবী? বুদ্বুদের মত শুধু দিন দুই ভয়ে ভয়ে শিহরি কায়া
ফুলে উঠে ফেঁপে উঠে তখনি ফাটিয়া যাওয়া এরি নাম মানব জীবন
ধ্যান ধারণায় গড়া মনের স্বরগে রচা ভাব স্বপনের একি মোহন ছায়া
এত হীন, এত ম্লান, এত ছোট এত দীন নহে দেবী নহে তা কখন।

কি যে তোর ছায়ারূপ ধ্যানে তা দেখা না আজ একবার কায়া দিতে প্রয়াস করি
এ নারী জীবন যেন কাঁদিয়া কাঁদায়ে শুধু একেবারে বিফল না হয়
জীবন থাকিতে দেবী ও তোর মানসরূপে এ হৃদয়ে একবার স্বরগ ধরি
মানব জীবনে ওমা কত যে ধরিতে পারে দিই তারি গূঢ় পরিচয়!

ওগো প্রেমশতদলনিবাসিনী চিরশোভা ওগো জগতের জ্যোতিঃ কমলাসনা
মোদের নয়ন হ'তে মোহের এ আবরণ ক্ষণেকের তরে খুলে নাও
সৃষ্টিপ্রেমের ঐ অতল বারিধি হ'তে দাও মা তাপিত প্রাণে করুণা কণা
তোমার ও রূপজ্যোতি তোমার শ্রীমুখভাতি এ আঁধারে বারেক দেখাও।

পথহারা ভারতের চিরজাগা ধ্রুবজ্যোতি জ্বলিতেছে ঐ তোর মুকুটমণি
মোদের জীবনঢাকা ঘন তমসার পথে চাই মাগো চাই ওরি আলো
দীপ্তি লভিয়া যেন দীপ্ত করি এ প্রাণে অপরূপ বরণের অরুণ কণি
মানব জীবন ঘন গহন বনের মাঝে জ্বালো দেবী সে প্রদীপ জ্বালো।

মোহন আঙ্গুল দিয়ে মোহিনী পরশ তোর একবার ছুঁয়ে দেখ প্রাণের কোণে
জড়তা অবশ প্রাণে বিজলী শিখার মত ঝরে কি না ঝরে আলোরাশি
পরশ পাথরে তোর কত কি যে সোনা হ'ল তবে সেকি জাগাবে না আমার মনে
অরুণচরণশায়ী স্বর্ণপরাগঢাকা কণক-কমল-প্রেম-হাসি?

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নানারূপ গুজবের মধ্য হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বুঝিলাম তাহা এই:—হাঁসপাতালে থাকিবার সময় সত্যেনের মনে হয় যে যখন কাশরোগে ভুগিতেছি তখন ত অল্পদিনের মধ্যে মরিতেই হইবে, বৃথা না মরিয়া নরেনকে মারিয়া মরিলেই ত বেশ হয়। কানাইলাল সে কথা শুনিয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত পিস্তল লইয়া হাঁসপাতালে আসে। পেটের যন্ত্রণা শুধু ডাক্তারকে ঠকাইবার জন্ত ভাণ মাত্র। তাহার পর সত্যেন্দ্র নরেনকে বলিয়া পাঠায় যে জেলের কষ্ট আর তাহার সহ্য হইতেছে না, সেও নরেনের মত সরকারী সাক্ষী হইতে চায়, সুতরাং পুলীসের কাছে কি কি বলিতে হইবে তাহা যদি দুজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঠিক করে তাহা হইলে আদালতে জেরার সময় কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। সত্যেনের ছলনায় ভুলিয়া নরেন

তাহাই বিশ্বাস করিল এবং একজন ইউরোপীয় প্রহরী সঙ্গে লইয়া সত্যেনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কথা কহিতে কহিতে যখন সত্যেন পিস্তল বাহির করিয়া উক্ত লক্ষ্য করিয়া গুলি করে তখন নরেন ঘর হইতে পলাইয়া যায়। পলাইবার সময় তাহার পায়ে একটা গুলি লাগিয়াছিল, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। গুলির শব্দ শুনিবামাত্র কানাইলাল হাঁসপাতালের নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসে। ইউরোপীয় প্রহরী তাঁহাকে ধরিতে যায়, কিন্তু হাতে একটা গুলি খাইয়া সে সেইখানেই পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাঁসপাতালের বাহির হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাশায়ী করিয়া কানাই যখন নরেনকে খুঁজিতে থাকে তখন সে হাঁসপাতালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং হাঁসপাতালের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। কানাই তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখায় যে নরেন কোথায় পলাইয়াছে তাহা যদি সে বলিয়া না দেয় ত তাহাকে গুলি খাইয়া মরিতে হইবে। বেচারা দরজা খুলিয়া দিয়া বলে যে নরেন অফিসের দিকে গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে নরেনকে দেখিতে পায় ও গুলি চালাইতে থাকে। গুলির শব্দ শুনিয়া জেলার ডেপুটী জেলার, আসিষ্টাণ্ট জেলার, বড জমাদার, ছোট জমাদার সবাই সদলবলে হাঁসপাতালের দিকে আসিতেছিলেন। পথের মাঝখানে কানাই এর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয় বোধ করিলেন। কে যে কোথায় পলাইলেন তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে জেলার বাবু যে তাঁহার বিপুল কলেবরের অর্দ্ধেকটা কারখানার একটা বেঞ্চের নীচে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন এ কথা সর্ব্ববাদি সম্মত। এদিকে কানাইএর হাত হইতে গুলি খাইতে খাইতে নরেন কারখানার দরজার কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কানাইয়ের গুলি যখন ফুরাইয়া গেল তখন বন্দুক কীরিচ, লাঠি সোটা লইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং কানাইকে ঘিরিয়া ফেলিল।

এখন প্রশ্ন এই পিস্তল আসিল কোথা হইতে? কয়েদীরা গুজব রটাইল যে বাহির হইতে আমাদের জন্য যে সমস্ত ঘিয়ের টিন বা কাঁঠাল আসিত, তাহার মধ্যে ভরিয়া কেহ পিস্তল পাঠাইয়া দিয়া থাকিবে। কানাইলাল বলিল ক্ষুদিরামের ভূত আসিয়া তাহাকে পিস্তল দিয়া গিয়াছে। প্রেততত্ত্ব-

বিদ্দের এক আধখানা বই পড়িয়াছি, কিন্তু ভূতকে পিস্তল দিয়া যাইতে কোথাও দেখি নাই, আর আমাদের স্বদেশী ভূতেরা গৃহস্থের বাড়ীতে ইঁট পাটখেল ফেলে, খুব জোর কচুপাতায় মুড়িয়া এক আধটা খারাপ জিনিষ ছুঁড়িয়া মারে, সুতরাং পিস্তলের ব্যাপারে ভূতের থিওরিটা একেবারে অবিশ্বাস যোগ্য বলিয়াই মনে হয়। কাঁটাল বা ঘিয়ের টিনও ডাক্তার সাহেব নিজে পরীক্ষা করিয়া দিতেন, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া দুই দুইটা রিভলভার আসা তত সুবিধার কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে কর্তৃপক্ষের চক্ষুর অগোচরে জেলের মধ্যে গাঁজা, গুলি, অফিম, সিগারেট সবই যখন যাইতে পারে, তখন সে রাস্তা দিয়া পিস্তল যাওয়াও ত বিচিত্র নহে।

যাক্ সে কথা। তাহা লইয়া এখন মাথা ঘামাইয়া আর কোন ফল নাই। কিন্তু নরেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অদৃষ্ট পুড়িল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই জেলের সুপারিন্টেনডেণ্ট সশস্ত্র সিপাহি শান্ত্রী লইয়া ব্যারাকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন আর একে একে আমাদের সকলের তল্লাসী লইয়া বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পর ব্যারাকের তল্লাসী আরম্ভ হইল। বিছানার মধ্যে বা এদিক ওদিকে দশ বিশটা টাকা লুকান ছিল। তল্লাসীর সময় প্রহরীরা তাহা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া লইল। আমাদের কাছে ত কিছুই পাওয়া গেল না কিন্তু ইন্সপেক্টর জেনেরাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় পুলিসের কর্ম্মচারীতে জেল ভরিয়া গেল। আরও রিভলভার জেলের মধ্যে লুকান আছে কি না, পুকুরের মধ্যে দুই একটা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না ইত্যাদি বহুবিধ গবেষণা চলিতে লাগিল। আমাদের বড় আশা হইয়াছিল যে রিভলভার অনুসন্ধান করিবার জন্য যদি জেলখানার পুকুরের জল ছেঁচিয়া ফেলে, তাহা হইলে, এক আধদিন যথেষ্ট পরিমাণে মাছ খাইতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু অদৃষ্ট তাহা ঘটিল না। অধিকন্তু ইন্সপেক্টর জেনেরাল আসিয়া আবার আমাদের পৃথক পৃথক কুঠরীর (cell) মধ্যে বন্ধ করিবার হুকুম দিয়া গেলেন। ডিগ্রী খালি করিয়া আমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় জেলার বাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ভদ্র-লোকের মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন—"মশায়, এতই যদি আপনাদের মনে ছিল, ত জেলের বাইরে কাজটা করলেই ত হতো। দেখছি ত আপনারা একেবারে মরিয়া, তবে ধরা পড়তে গেলেন কেন?"

আমরা সমস্বরে প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে এ কার্য্যের সহিত আমাদের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই। তিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, তা বুঝতেই পারচি। যাই হোক, আপনাদের যা হবার তা ত হবে, এখন আমার দফা রফা হয়ে গেল।"

এক সপ্তাহের মধ্যেই ৪৪ ডিগ্রী হইতে সমস্ত কয়েদী অন্যান্য জেলে চালান করিয়া আমাদের সেখানে স্থানান্তরিত করা হইল। জেল যে কাহাকে বলে এতদিনে তাহা বুঝিলাম।

পুরাতন সুপারিনটেনডেণ্টের উপর নরেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের ভার পড়িল, তাঁহার জায়গায় নূতন সুপারিনটেনডেণ্ট আসিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। পুরাতন জেলার ও ডাক্তার বদলী হইয়া গেলেন। আমাদের হাসপাতাল যাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। অসুখ হইলে কুঠরীর মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে হইত। কাহারও সহিত আর কাহারও কথা কহিবার উপায় রহিল না। সমস্ত দিন কুঠরীর মধ্যে খাও, দাও, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাক। জেলের অন্যান্য অংশ হইতেও কোন লোক ৪৪ ডিগ্রীতে ঢুকিতে চাইত না।

ক্রমে দেশী প্রহরীর পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় প্রহরী আসিল, আর দিনের বেলা ও রাত্রি কালে দুইদল গোরা সৈন্য আসিয়া জেলের ভিতরেও বাহিরে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হইয়াছিল যে আমরা বোধ হয় জেল হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিব।

প্রথম দুইটী কুঠরীতে কানাই ও সত্যেন আবদ্ধ থাকিত। আমরা পাঁচ সাত দিন অন্তর এক কুঠরী হইতে অন্য কুঠরীতে বদলী হইতাম। যখন কানাই বা সত্যেনের কাছাকাছি কোন কুঠরীতে আসিতাম তখন রাত্রিকালে চুপি চুপি তাহাদের সহিত কথা কহিতে পারিতাম। দিনের বেলা কাহারও সহিত কথা কহিবার কোন উপায়ই ছিল না। প্রাতঃকালে ও বৈকালে আধঘণ্টা করিয়া উঠানের মধ্যে ঘুরিতে পাইতাম, কিন্তু সকলকেই পরস্পরের কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিতে হইত। প্রহরীদের চক্ষু এড়াইয়া কথা কহিবার সুবিধা হইত না।

সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকার যে কি যন্ত্রণা তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। একদিন সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে পড়িবার জন্য বই চাহিলাম। তিনি দুঃখের সহিত

জানাইলেন যে গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতীত আমাদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। নরেনের মৃত্যুর পর তাঁহার হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

আমরা যখন বাহিরে ঘুরিতাম তখন কানাই ও সত্যেনের কুঠরীর দরজা বন্ধ থাকিত। একদিন দেখিলাম কানাইলালের দরজা খোলা রহিয়াছে। আমরা সেদিকে যাইবার সময় প্রহরীও বাধা দিল না। পরে শুনিলাম যে কানাই লালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য প্রহরীরা দয়া করিয়া কানাইকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবার মত জিনিষই বটে। আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে, জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি, অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে মুখে চিন্তাব রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে —আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসিকাঠ, সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন। প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে চিত্ত বৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত।

তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজ শাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা। কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?" যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাই-লালের চিতার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।

কিছুদিন কুঠরীতে বন্ধ থাকিবার পরে আলিপুরের জজের আদালতে আমাদের মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। দিনের মধ্যে ঘণ্টা কয়েকের জন্য একটু খোলা হাওয়া খাইয়া ও লোকজনের মুখ দেখিয়া আমাদের প্রাণগুলা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুই একজন ভিন্ন মোকর্দ্দমার খরচ জোগাইবার পয়সা কাহারও নাই, সুতরাং অরবিন্দ বাবুর সাহায্যের জন্য যে চাঁদা উঠিয়াছিল তাহা হইতেই উকিল ব্যারিষ্টারদের অল্পস্বল্প খরচ দেওয়া হইতে লাগিল। যাঁহাদের অল্প দক্ষিণায় পোষাইল না তাঁহারা দুই চারিদিন পরেই সরিয়া পড়িলেন, শেষে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া আমাদের মোকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন।

হাইকোর্ট ছাড়িয়া আলিপুরে মোকর্দ্দমা চালাইতে আসায় ব্যারিষ্টারদের অনেক অসুবিধা, সুতরাং মোকর্দ্দমা যাহাতে হাইকোর্টে যায় সে জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ হাইকোর্টে গেলে বিচারের ভার জুরির উপর পড়িত। বারীন্দ্রের বিলাতে জন্ম, সে একজন পুরাদস্তুর European British-born subjeet, সুতরাং সে ইচ্ছা করিলে মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে বিলাতী সাহেবের অধিকার চায় কি না তখন সে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিল—না। কাজে কাজেই আলিপুরের জজের কাছেই আমাদের বিচার আরম্ভ হইল।

কিন্তু বিচারের কে খবর রাখে, আমরা হট্টগোল লইয়াই ব্যস্ত। আদালত খোলার আরও একটা মহা সুবিধা এই যে দুপুর বেলা জল খাবার পাওয়া যায়। জেলের ডাল ভাত খাইয়া খাইয়া প্রাণ পুরুষ যেরূপ মুমুর্ষু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে অনন্তকাল যদি এই মোকর্দ্দমা চলিত, তবুও জল খাবারটুকুর খাতিরে তিনি ঐ ব্যবস্থায় রাজী হইয়া পড়িতেন!

কোর্টে আসিবার ও যাইবার সময় আমাদের হাতকড়ার ভিতর দিয়া শিকল বাঁধা থাকিত। দুপুর বেলা শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে গেলে সেই হাতকড়া পরান অবস্থায় পুলীস আমাদের রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জন্য ততটা ভাবনা ছিল না; কেননা "ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।" যাহার মান নাই তাহার আবার মানহানি কি? কিন্তু অরবিন্দ বাবুকে হাতকড়া পরাইয়া টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিলে মনটার ভিতর একটা

বিদ্রোহ জমাট হইয়া উঠিত। তিনি কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বিরোধ ভদ্রলোকের মত সমস্তই নীরব হইয়া সহ্য করিতেন।

সাক্ষীরা একে একে আসিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া যাইত, আমাদের মনে হইত যেন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছি। উকিল, ব্যারিষ্টারের জেরা, পুলীস কর্ম্মচারীদের ছুটাছুটি সবই যেন একটা বিরাট তামাসা। আমাদের হাস্য কোলাহলে মাঝে মাঝে আদালতের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। জজ সাহেব আমাদের হাতকড়া লাগাইবার ভয় দেখাইতেন, ব্যারিষ্টারেরা ছুটিয়া আসিয়া অরবিন্দ বাবুকে অনুরোধ করিতেন "ছেলেদের একটু থামতে বলুন।" অরবিন্দ বাবু নির্ব্বিকার প্রস্তর মূর্ত্তির মত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, ব্যারিষ্টারদের অনুরোধের উত্তরে জানাইতেন যে, ছেলেদের উপর তাঁহার কোনও হাত নাই।

বিচার সংক্রান্ত সব স্মৃতিটাই প্রায় ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—শুধু মনে আছে ইন্সপেক্টর শ্যামশূল আলমের কথা। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুদ জোগাড় করিবার ভার তাঁহার উপরই ছিল। মিষ্ট কথায় কিরূপে কাজ গোছাইতে হয় তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, তাই ছেলেরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গান গাহিত—"ওগো সরকারের শ্যাম তুমি, আমাদের শূল। তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু, তুমি দেখবে চোখে সরসে ফুল।" আমাদের মোকদ্দমা শেষ হইবার পর সরকার বাহাদুর তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি করিয়া দেন, কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহাকে সে পদ গৌরব অধিকদিন ভোগ করিতে হয় নাই।

কোর্ট ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত আবদর রহমন সাহেবের কথাও মনে পড়ে, কেননা আমাদের জল খাবার জোগাইবার ভার তাঁহার উপর ছিল। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত তিনিই ছিলেন পুলীশ কর্ম্মচারীদের মধ্যে একমাত্র ভদ্রলোক। আমাদের সম্ভবতঃ দ্বীপান্তরে যাইতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া তাঁহার মুখে যে করুণার ছবি ফুটিয়া উঠিত তাহা আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে।

কিন্তু এ সমস্ত বাহিরের কথা আমাদের খুব বেশী আন্দোলিত করিত না। আমাদের মধ্যে তখন অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহাই তখন আমাদের কাছে মোকর্দ্দমার দৈনন্দিন ঘটনা অপেক্ষা ঢের বেশী সত্য।

আমরা না দামড়া

(গান)

[শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলনবীশ]

নূতন সাজে সেজেছি আজ
নূতন সভ্য আমরা।
ইঙ্গ-বঙ্গ হাম্বা রবে
যেন শৃঙ্গবিহীন দামড়া।

সস্ত্রীক চতুষ্পদে হাঁটি,
অসভ্যতার জাবর কাটি,
সার করেছি নূতন গোয়াল
শ্বশুর বাড়ীর কামরা।

Independence—দূর্ব্বা খেতে
মনে বড় ইচ্ছা হয়,
কিন্তু ছুটে যেতে গোঠে
মাঠে বড় লাঠির ভয়,

অধীনতার দড়ী ছিঁড়ে,
পালিয়ে একদিন ঠেকেছি রে,
পৃষ্ঠে পাঁচন-বাড়ী, গলায়
বেধেছিল আমড়া।

Rolled goldএর দড়ী ফুঁড়ে
নাক হইতে কাণ অবধি,
কি আরামে বচ্ছি ঘানি,
তৈরী কচ্ছি তেলের নদী;

কবি বলে "শুধুই কি তাই?
—অধিক বলা বাহুল্য ভাই।—
তোদের ত্বক্ যে Compulsory
জুতো তৈরীর চামড়া।"

সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব

(নক্সা)

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।]

নিখিল বাবু বসন্তপুরের জমিদার। জমিদারী খুব বেশী না থাকিলেও সম্মানটা তাহার অনুপাতে খুব বেশীই ছিল। কারণ, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের রেশম কুঠীর সাহেবেরা এবং রেলের গার্ড সাহেব প্রভৃতি গণ্যমান্য শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণ প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিত। তিনি এইরূপে কুঠিয়াল সাহেব ও রেলের গার্ড সাহেবের সিঁড়ি বাহিয়া অনেকটা উঁচুতেও উঠিয়াছিলেন। সাহেবদের কাছে তাঁহার একটা খুব বড় রকমের প্রত্যাশা ছিল যে, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া দিল্লীর দোকান হইতে একটা ভাল রকমের লাড্ডু আনিয়া দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ নিখিল বাবুর রসনা আজি পর্য্যন্ত "সে রসে বঞ্চিত।" নিখিল বাবু আজি পর্য্যন্ত নিরুপাধি।

নিখিল বাবু খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। পাছে দারিদ্র্যকে সম্মান করা হয় এই জন্য তিনি গরীব-দুঃখীকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। বহু গরীব ছাত্র, কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতা, অন্ধ খঞ্জ ভিখারী কখনও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করাইতে পারে নাই। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, তাঁহার কোন সদ্ব্যয় ছিল না।

তাঁহার বাড়ীতে কুকুর-প্রতিপালনে যাহা খরচ হইত, আমাদের দেশের বড় বড় জমিদারের সংসারে তাহার সিকি ভাগও খরচ হয় না। এই কুকুর ছিল দুই রকম। কতকগুলির লেজ ছিল, কতকগুলির ছিল না। যাহাদের লেজ ছিল, তাহাদিগকে সকলে কুকুর বলিয়াই ভাবিত, আর যাহাদের লেজ ছিল না, তাহাদিগকে সকলে বলিত সারমেয়। কুকুরগুলিকে তিনি লোহার শিকলে বাঁধিয়া রাখিতেন, আর সারমেয়গুলি সোণার ফ্রেমে আটকানো ঠুলি চোখে পরিয়া, সোণার শিকলে বাঁধা থাকিত।

নিখিল বাবু কথায় কথায় আইনের দোহাই দিতেন। এক একটি আইনের এরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতেন যে, বড় বড় উকিল-ব্যারিষ্টারকে তাক্ লাগাইয়া দিতেন। তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন

—এ যুগ, আইনের যুগ। এ যুগে যিনি আইন বাঁচাইয়া চলিতে পারিবেন, তিনিই জীবনে উন্নতি করিতে পারিবেন। তাই তিনি আইনের সম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে উপদেশ দিতে আদৌ আলস্য বোধ করিতেন না।

২

বসন্তপুরের জমিদার-বাটীতে প্রতি বৎসরেই মহাসমারোহের সহিত দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। গত অগ্রহায়ণ মাসে নিখিল বাবুর পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে এবারের পূজার ভার নিখিল বাবুর উপর। পূজা এবারে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে নিখিল বাবু একাগ্রমনে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। নিকটে কতকগুলি সারমেয় বসিয়া তাঁহার পদলেহন ও চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় তাঁহার পুত্র শচীন্দ্র তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"হাঁ বাবা, এবার পূজোয় কি রকম কি হবে?"

'তাই ত ভাবছি। যে রকম দিন কাল, তা'তে পূজোটা বাদ দেওয়াই ভাল। বরং পৌষ মাসের কোন একটা ব্যাপারে সে খরচটা করা যুক্তি সঙ্গত।"

বিষন্ন চিত্তে শচীন্দ্র বলিল—

"তা কি হয় বাবা? বছরের এই দিনটাই ত আমাদের দিন। দুর্গাপূজো কি উঠিয়ে দেওয়া চলে?"

নিখিল বাবু পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন,—

"ওরে বাবা, দেশ-কাল-পাত্র বুঝে সকল কাজ করতে হবে। দেশটা বাঙ্গলা, কাল ত বুঝতেই পাচ্চিস, আর 'পাত্র—আমরা জমিদার। দুর্গাপূজো আমাদের এখন না করাই ভাল।"

"তা'তে দোষ কি?"

নিখিল বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন,

"পূজোটা রাজসিক—বুঝলি—পূজোটা রাজসিক।"

"দুর্গাপূজো ত চিরকালই রাজসিক। তা'তে হ'ল কি? না বাবা, পূজো বাদ দেওয়া হবে না।"

"ছেলেমানুষী করিস্‌নে শচীন, একটু ভেবে দেখ,—বুঝতে পারবি। ও সব মারামারি কাটাকাটি পূজোর মধ্যে না যাওয়াই ভাল।"

পিতার সহিত তর্কে পাছে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়, এই ভাবিয়া শচীন্দ্র ক্ষুন্ন

মনে তথা হইতে চলিয়া গেল। নিখিল বাবু পুত্রের মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়া পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিলেন। প্রায় সকলেই তাঁহার কথাতে সায় দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি, মহামহোপাধ্যায় মশায়, কি করা যায়?"

মহামহোপাধ্যায় মহাশয় একটি কৌটা হইতে নস্য লইয়া নাসিকার উদর-পূর্ত্তি করিতেছিলেন। বদ্ধ-নাস অবস্থায় উত্তর দিলেন—

"জগদম্বার অর্চ্চনাটা যখন সম্বচ্ছরই হ'য়ে থাকে, তখন এবারে বন্ধ দেওয়াটা সগ্‌গত হয় না। পুজোটা রাজসিক আকারে না করে' সাত্ত্বিক ত হ'তে পারে। বা আবার ব্রহ্মময়ী।"

"মা আমার ব্রহ্মময়ী" নিখিল বাবু বলিলেন—"বাঃ বেড়ে বলেছেন পণ্ডিত মশায়, মা আমার ব্রহ্মময়ী। তবে ত মাকে নিরাকারেও পুজো করতে পারা যায়? কিন্তু তাঁর চাইতে সাত্ত্বিক ভাবটাই যেন আমাদের পক্ষে বেশী খাপ খায়। আচ্ছা সাত্ত্বিক পুজোয় কি রকম কি হবে?"

পণ্ডিত মহাশয় নস্যভরা নাসিকা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন—

"পুজোর উপকরণের কোনো অগ্‌গই বাদ যাবে না। কেবল রক্ত চন্দন বাদ দিয়ে শ্বেত চন্দন আনতে হবে।"

নিখিল বাবু সম্মতি সূচক মস্তক-সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—

"তা ঠিকই। রক্ত-চন্দনটাতে বেশ একটু উত্তেজনার ভাব আসে বটে। আচ্ছা, আর আর?"

"আর সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমিও আপানাব সগেগ সগেগই আছি।"

৩

নিখিল বাবু সাত্ত্বিক দুর্গোৎসবে সম্মত। প্রতিমা গড়িবার জন্য গোয়াড়ী হইতে কারিগর আসিয়াছে। নিখিল বাবুর চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে। নিখিল বাবু চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ওহে ও কারিগর!—শুনছ? ওহে ও। কথা শুনতে পাচ্ছনা?—কালা নাকি? ওহে! তুমি ত ভারী ইয়ে দেখচি। ওহে ও কারিগর!"

অনতি বিলম্বেই কারিগর তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে উত্তর করিল—

"আজ্ঞে, বাবু!"

"কোথায় গেছ্‌লে ?—হাঁ দেখ কারিগর, তোমাকে দুটো কথা বলতে আমি এসেছি। তোমরা অবিশ্যি বড় জায়গার বড় কারিগর। কিন্তু শোন। দেখ—এই দুটো পুতুলকে খুলে ফেলে দাও।"

কারিগর বিনীত ভাবে বলিল—

"কেন হুজুর, কোন-কিছু খুঁৎ হ'য়েছে নাকি ?"

"না, বিশেষ কিছু খুঁৎ নয়। রাজসিক পূজোতে ওসব লাগে কিন্তু আমার এটা সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব কি না ? বুঝলে ?

"তা'ত বুঝলাম বাবু, কিন্তু এ রকমটা আর কখনো তৈরী করিনি।"

"করনি শিখ। আর দেখ—এই পাখীটাকেও খুলে ফেল। ফেলে, আমি যা, যা, বলি,—কর।"

"আজ্ঞা করুন।"

নিখিল বাবু প্রতিমার সম্মুখস্থ একখানি কেদারায় উপবেশন করিয়া কারিগরকে বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, দুখানা বাকারী নাও। নিয়ে এক একখানা বাকারীর দুই মুখ জুড়ে বেশ গোল গোল চাকার মত কর। তারপর একটা বাঁশের ডগার খানিকটা কেটে ঐ দুটোর সঙ্গে যোগ করে দাও। আর, বুঝলে—এই—

"আজ্ঞে হুজুর, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

"তবে এই দেখ" বলিয়া নিখিল বাবু পকেট হইতে পেন্সিল ও কাগজ বাহির করিয়া জিনিষটা কি এবং কিরূপ হইবে, তাহার একটি নক্সা আঁকিয়া দিলেন এবং বলিলেন—

এটা বেশ রং করে' ঐ পাখীটার যায়গায় বসিয়ে দিও।"

"যে এজ্ঞে।"

"আর দেখ কারিগর, তোমাদের একটা বড় ভুল হ'য়ে যায়, ঐ গণেশটা তৈরী করতে। গণেশটা বড়ই unnatural—বুঝলে ?—বড়ই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে তা'তে না হয় পশু, না হয় মানুষ, না হয় দেবতা। ওটাকে একটু স্বাভাবিক কোরো। আর দেখ, আমি ওবেলা আবার এসে যা যা করতে হয়, সব বুঝিয়ে দিব। তুমি এখন এবেলা এইগুলো সেরে ফেল।"

কারিগর নম্রভাবে বলিল—

"আজ্ঞে ওবেলা আমাকে বারোয়ারীর প্রতিমা খানা 'দোমেটে' করতে হবে।"

"বারোয়ারী !"

"আজ্ঞে হাঁ।"

,'কোথায় ?"

"আজ্ঞে, গ্রামেই।"

অপরাহ্ন। নিখিল বাবুর বৈঠকখানায় তাঁহার পার্ষদগণ এক একটি চায়ের পেয়ালায় "সুবোধ বালকের" মত "মনোনিবেশ" করিয়াছেন এবং "যাহা পাইতেছেন, তাহাই খাইতেছেন।" আর, গ্রামের বারো জন ইয়ার মিলিয়া যে বারো-ইয়ারীর ষড়যন্ত্র করিয়াছে, নানা ভঙ্গীতে তাল ফেরতা গানের মত তাহারই আলোচনা হইতেছে। নিখিলেশ্বর বাবু জনৈক পার্ষদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই বারো জন ইয়ার কে কে বলতে পার, মনোরঞ্জন বাবু ?"

কেহই ইহার যথার্থ উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। দেখা গেল—পার্ষদেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি একটু আড়নয়নে চাহিলেন মাত্র। অবশ্য এই নয়ন ভঙ্গিমা নিখিল বাবুর অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মনোরঞ্জন বাবু একটু তাল সামলাইয়া বলিলেন -

"ঐ সব ওপাড়ার চাষাদের ছেলেরা হবে বোধ হয়।"

"চাষাদের ছেলে বলছেন কেন, মনোরঞ্জন বাবু।" বলিতে বলিতে শচীন্দ্র তথায় উপস্থিত হইল। মনোরঞ্জন বাবু শচীন্দ্রকে দেখিয়া আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। শচীন্দ্র বলিতে লাগিল—

"হাঁ মনোরঞ্জন বাবু, অবিনাশ আপনার ছেলে না ? নিজেকে চাষা বলে বেমালুম পরিচয় দিয়ে দিলেন ?"

অবিনাশ শচীন্দ্রের বাল্যবন্ধু। সে বারোয়ারীর প্রতিমার কাছে সকল সময়েই উপস্থিত থাকিত।

বারোয়ারী পূজার প্রতি পুত্র শচীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নিখিল বাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে শচীন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন—

"দেখ শচীন, তুমি বুদ্ধিমান। কালেজে পড়ছ। ভেবে দেখ—বারো জন লোক একত্র হওয়াটা ভয়ঙ্কর বে আইনী। unlawful assemblyর সেই

ধারাটা দেখাব কি ?—যাক্,তুমি যেন ও সব বারোয়ারী টারোয়ারীর মধ্যে যেও না। বারো জন লোক এক মত হ'লে, তাদের উপর Conspiracyর charge আনা যেতে পারে, তা জান ?"

শচীন্দ্র বিনীতভাবে বলিল—

"অত আইন-কাহ্নন জানিনে বাবা। তবে যারা বারোয়ারী পূজো করে, তাদের ত কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকে না। তাদের উদ্দেশ্য—মায়ের পূজো আর তার সঙ্গে একটু আনন্দ করা।"

নিখিল বাবু নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—

শোন, তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। দুটো উদ্দেশ্যই যে খারাপ, তা' আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমতঃ, দেখ, দুর্গাপূজোটাই মারামারি কাটাকাটির পূজো, শান্তিভঙ্গ ও রক্তপাত কথায় কথায়। আর আনন্দ করা ?—শুনছি নাকি কার যাত্রা আসছে। তা'তে 'পালা' হবে—রাবণ বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, আর দধিচীর অস্থিদান। যাত্রা হ'লে হাজার হাজার লোক এক জায়গায় জড় হবে। আর ঐ 'পালা'গুলো কি শান্তিপূর্ণ ? যাত্রার দলের সৈন্যেরা ত যুদ্ধ করেই, অধিকন্তু বক্তৃতায় এতই উত্তেজনা এনে দেয় যে, ছুড়িরা পর্য্যন্ত আপনা-আপনির ভিতর যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। যদি জীবনে উন্নতি করতে চাও—ও সবের মধ্যে যেয়ো না। এবার বি, এ পাস করতে পারলেই তোমাকে আমি ডেপুটী করে দিব। যাও, আমাদের প্রতিমাখানা একবার দেখগে। সাত্বিক ভাবে দুর্গোৎসব করা যায় কি না, একবার দেখে এস। এতে শক্তিপূজোও হবে, অথচ কোন রকম উত্তেজনা আসবে না।"

শচীন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ্যাদিকল্প। নিখিল বাবুর অন্তঃপুরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। শচীন্দ্রের মাতা নিখিল বাবুকে বলিতেছেন—

"তোমার এ রকম মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল, বল দেখি ? বাড়ীতে দুর্গোৎসব। মা আমাদের দুর্গতি দেখে বছর বছর দয়া করে' এসে থাকেন। তাঁকে অপমান করে' বসলে ?"

নিখিল বাবু সসঙ্কোচে বলিলেন—

অপমানটা আবার কোথায় হ'ল ?"

কুপিতা ফণিনীর মত শচীন্দ্রের মাতা শির উত্তোলন করিয়া উত্তর দিলেন—

"হ'ল না? দুর্গোৎসব করতে বসেছ। অথচ, প্রতিমা দেখে সকলের উত্তেজনা আসবে বলে' সিংহ-অসুরকে তুলে ফেলে দিয়েছ। আবার শুনলুম—ময়ূরটিকে তুলে দিয়ে কার্ত্তিককে বাইসাইকেলের উপরে বসিয়েছ, কার্ত্তিকের হাতের ধনু-শর ফেলে দিয়েছ।

"বুঝলে,—ও সব অস্ত্র শস্ত্র না থাকাই ভাল।"

"তবে তার ডান হাতে একটা চুরুট দিয়ে দাওগে না কেন? বাঁ হাতখানা ত সাইকেল ধরেই আছে। ছিঃ!"

নিখিল বাবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন। শচীন্দ্রের মাতা বলিতে লাগিলেন—

"মায়ের দশ হাতের অস্ত্রগুলোও ফেলে দিয়েছ,—তাও শুনেছি, একটা কাজ করলে না কেন? তাঁর এক এক হাতে এক এক রঙের উল, কুর্শী, কাঁটা, কার্পেট দিলে না কেন? কেমন?"

এইবারে নিখিল বাবু ভীতি-কম্পিত স্বরে বলিলেন—

"দেখ, আমি সাত্ত্বিক ভাবে পূজোটা করতে গিয়েছিলাম কি না, তাইতে—"

"ও সব ভিরকুটী আমি শুনতে চাই না। পূজোর যাতে কোন রকম অঙ্গহানি না হয়, তাই কর। তুমি যেমন কতকগুলো কুকুর আর বাঁদর নিয়ে দিনরাত কাটাও, আর তাদের পরামর্শ মত চল, আমি ত আর তা পারিনে। আমার ঘর সংসার ছেলে মেয়ে আছে। মায়ের ইচ্ছার উপরে তাদের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। দেখো, পূজোর যেন কোন রকমে ত্রুটি ক'রে আমার শচীনের অমঙ্গল ডেকে এনো না।"

বলিতে বলিতে শচীন্দ্রের মাতার নয়ন-কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু উভয় গণ্ড দিয়া বহিয়া গেল। মাত্র দুই বিন্দু অশ্রু, প্রবল বন্যার শক্তিতে নিখিল বাবুর আইন-কানুন সমুদায়ই ভাসাইয়া দিল। নিখিল বাবু সহধর্ম্মিনীকে বলিলেন—

"কিন্তু আজ ষষ্ঠী। হঠাৎ প্রতিমা পাই কোথায়?"

শচীন্দ্র এতক্ষণ এক কোণে নীরবে বসিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

"বারোয়ারীর সেই প্রতিমাখানা?"

নিখিল বাবু বলিলেন—

"তারা দেবে কেন?"

শচীন্দ্রের মাতা হাসিয়া শান্তভাবে উত্তর দিলেন—

"বারোয়ারী নয় গো। তোমাদের পরামর্শ শুনে, আর তোমার প্রতিমা-তৈরীর রকম বুঝে আমিই সেই প্রতিমাখানি তৈরী করিয়েছি। অনেকেই জানে বারোয়ারী। কিন্তু তা নয়।"

জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।]

জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ দলের এই সব যুক্তি, প্রতিবাদ ও তার আনুসঙ্গিক ভুল ভ্রান্তি খণ্ডন করাই যথেষ্ট নয়, জাতীয় শিক্ষা অর্থে আমরা কি বুঝি, ভারতে জাতীয় শিক্ষা কোন্ মূল তত্ত্ব (principle) ধরে কি রূপ নেবে, কাজেই বা তা কেমনটি হয়ে গড়ে উঠবে বা কোন্ উপায় অবলম্বনে জীবনের কোন্ মোড়টুকু ফেরালে তা সার্থক হবে তাই আমাদের বুঝে স্থির করতে হবে। এইখানেই প্রকৃত বাধা বিপত্তির আরম্ভ—একাজ এইখানেই কঠিন, কারণ শুধু শিক্ষায়ই নয়, আমাদের সমস্ত জীবন-ধারায় (cultural life) বহুকাল থেকে আমরা জাতীয় ভাব ও প্রেরণা হারিয়ে বসে আছি। এ পর্য্যন্ত শুধু শিক্ষায়ই নয়, সকল বিষয়েই আমাদের তেমন স্পষ্টভাবে গভীর ও যথাযথ ভাবে তলিয়ে দেখা বা ভাবা হয় নাই, যাতে আমরা সে হারাণ জাতীয় প্রেরণা ফিরে পেতে পারি এবং সেই কারণেই এ সবের অপরিহার্য্য মূল ভিত্তিই হোক অথবা শাখা প্রশাখাই হোক, কোন দিকেই মতের একটা স্পষ্ট ঐক্য বা অনৈক্য কিছুই ফুটে ওঠে নি। আমরা এ বিষয়ে খুব খানিকটা ভাবের ঢেউ, একটা অস্পষ্ট অপরিণত ধারণা আর সেই ভাবের অনুযায়ী উত্তেজনা নিয়েই তুষ্ট, আর তাকে রূপ দিতে গিয়ে বুদ্ধি-জীবী আমাদের চিরকেলে বুদ্ধির পুরাণ ছাঁচ, আমাদের অভ্যাস ও খেয়ালের বশে হাতের কাছে যা' পেয়েছি তাই দিয়েই গড়তে গেছি। তাই তার কোন স্থায়ী ও

প্রত্যক্ষ সফলতা তো হয়ই নি, বরঞ্চ হয়েছে যথা সম্ভব গণ্ডগোল ও ব্যর্থতা। প্রথমতঃ আমাদের বোঝা দরকার জাতি-আত্মা, জাতি-প্রকৃতি, জাতির স্বভাব শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে কিসের সার্থকতা চায়, সেইটি বুঝে এই শিক্ষা-সমস্যার সকল দিকের সহিত সামঞ্জস্য রেখে তার প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই অনুসন্ধানে সফল-কাম হ'লে আমরা বর্ত্তমান মিথ্যা অন্তঃসার-শূন্য কৃত্রিম শিক্ষার স্থানে একটা কিছু ব্যর্থ অসার এলোমেলো জিনিস বা একটা নতুন মিথ্যা কৃত্রিমতা না গড়ে ভবিষ্যৎ ভারতের প্রকৃত জাব ও সৃজনাধার ভাবী মনুষ্যত্ব গড়ে তুলতে পারি।

শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি বহুকালের সযত্নপুষ্ট ভ্রান্তি ও কদর্থ আছে, প্রথমে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ, মূল লক্ষ্য ও স্বরূপটি তা থেকে পৃথক করে নিতে হবে। কারণ তা' হ'লেই আমাদের শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপনা পাকা হয় এবং আমরা কথাটির প্রকৃত অর্থের ধারণা করে কার্য্যতঃ ফুটিয়ে তুলতে পারি। প্রকৃত শিক্ষা কি, প্রকৃত শিক্ষা কি হওয়া উচিত, তা যদি একবার স্থির হয়, তা হলে জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ নির্দ্ধারণ অতিশয় সহজ হয়ে আসে। আমাদের গোড়ার কথা থেকে আরম্ভ করতে গেলে সত্য ও জীবন্ত শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ তিনটি জিনিসের উল্লেখ করতে হয়,—প্রথম মানুষ, অর্থাৎ তার অসাধারণত্ব ও সাধারণত্ব নিয়ে ব্যক্তিত্বের ভূমিতে মানুষ, দ্বিতীয়তঃ জাতি এবং সর্ব্বশেষ বিশ্বমানব। এক মাত্র তাই সত্য ও জীবন্ত শিক্ষা যা মানুষের মধ্যে তার সকল অন্তর্নিহিত বৃত্তি ফুটিয়ে তুলে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পূর্ণ সার্থকতায় পৌঁছে দেয়—যে শিক্ষা তার সঙ্গে তার জাতির জীবন মন ও আত্মার সম্বন্ধকে নিবিড় করে তোলে এবং শুধু তাই নয়, যে বিশ্বমানবের জীবন মন ও আত্মার সে একটি অঙ্গমাত্র—তার জাতিও যার অভিন্ন অঙ্গ হয়েও ভিন্ন, তারই সমগ্র স্বরূপের সঙ্গে সেই ব্যষ্টির নিবিড় নাড়ীর যোগ জাগিয়ে তোলে। আমাদের শিক্ষা ঠিক কি রকম হবে এবং জাতীয় শিক্ষার দ্বারা আমরা কিই বা সাধন করবো তা এই ভাবে মূল তত্ত্বের বৃহৎ ও সমগ্র দর্শনের ফলেই গড়ে উঠবে। জাতির দৃষ্টির এই সমগ্রতা—জাতির ভিত্তির এই বিশালতা আজ কাল অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতেই বেশী দরকার। কারণ এই জীবনের সন্ধিক্ষণে নতুন ভাগ্য গঠনের দিনে এ জাতিকে তার সমস্ত জীবন প্রেরণা ও শক্তিধারাকে—তার ব্যক্তিগত ও জাতিগত আত্মাকে খুঁজে বের করে গড়ে তুলতে সার্থকতার পথে নিয়োগ করতে হবে এবং এই পথে ভারতের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত

হয়ে ভারত তার হারাণ ধন ফিরে পেয়ে মানব-জাতি পরিবারের মধ্যে নিজের অধিকার ও পদ গ্রহণ করবে।

মানুষ ও তার জীবন, জাতি ও তার জীবন, বিশ্বমানব এবং সেই মহামানবের জীবন সম্বন্ধে বহু ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আদর্শ সম্ভব, সেই পার্থক্যগুলি অবলম্বন করে শিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদেব আদর্শ ও চেষ্টা একান্তই ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে। ভারতেরও নিজস্ব একটি আদর্শ একটা জীবন-স্বপ্ন আছে, শিক্ষার মূলে সেই জাতিগত সত্য সেই চির জীবনের সুখস্বপ্ন রয়েছে কি না, আমাদের সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ তাহাই আমাদের শিক্ষাকে প্রকৃত জাতীয় করে তুলবে। ভারত মানুষকে কখনও এ ভাবে দেখে না যেন মানুষ একটি চেতন দেহ—সে জড় প্রকৃতির গড়া যন্ত্রে কতকগুলি প্রাণ-তরঙ্গের বাসনাই যেন খেলছে, যেন সে একটি অহং চেতনা, একটি মন ও বিবেক বুদ্ধি, অথবা মানব নামধেয় পশু—যেন পশু জাতির অন্তর্গত মানব, আবার সেই পশু মানবের মাঝে ভারতবাসী বলে এক জীব সুশিক্ষিত মন ও বিবেক বুদ্ধির নিয়ন্ত্রিত যেন তার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা ও জীবন তাবই ব্যক্তিগত ও জাতিগত অহংকারের পরিপুষ্টি ও বাসনা ক্ষুধা প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্যই ব্যয় করতে হবে। ভারত কখনও মানুষকে বিচাব-শক্তিতে শক্তিমান পশু বলে গ্রহণ করে নাই; মানুষকে জড় প্রকৃতির মনোময় সন্তান বলে—চিন্তা ভাব ও ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত জড় সত্ত্বা বলে দেখে নাই, সেইজন্য ভারত মানুষের শিক্ষাকেও কখনও কেবলমাত্র মনো বৃত্তির অনুশীলন বলে গ্রহণ করতে পারে নাই, ভারতের ধারা তা নয় যাতে মানবকে একটি রাজনীতিক সামাজিক ও অর্থনীতিক জীব বলে ধরে নিতে পারে; এইরূপ ভাবে বা ধারায় মানুষকে দেখলেই তার শিক্ষাকে সেই শিক্ষা বলে মনে হয়, যে শিক্ষা মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিপুণ সুশিক্ষিত ও অর্থকরী পুরজন-রূপে গঠন করে। এ সকলই বহুমুখী মানব-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন দিক (aspects), ভারত এগুলিকেও তার বিশাল আদর্শের অন্তর্গত করে উচ্চ আসনই দিয়েছে, কিন্তু এগুলি বাহিরের জিনিস,—মন, জীবন ও কর্ম যন্ত্রের অঙ্গ বা অভিব্যক্তি মাত্র, মানবের প্রকৃত স্বরূপও তো নয়ই, সমগ্র স্বরূপও নয়।

ভারত চিরদিনই দেখেছে—প্রতি মানবের মাঝে তার ব্যক্তিত্বের আধারে একটি প্রস্ফুট আত্মাকে মন ও দেহ কোষে আবৃত সেই ভাগবত সত্ত্বারই অংশ রূপে, প্রকৃতির জড় মাঝে অনন্ত বিশ্বময় আত্মসত্ত্বার একটি জ্ঞানময় স্ফুরণ

রূপে, ভারত মানবের আধারে পৃথক পৃথক রূপে অনুশীলন করেছে মন, বুদ্ধি, নীতির মানুষকে, শক্তি কর্ম ও সৌন্দর্য্যরসের মানুষকে, এমন কি প্রাণ ও জড় দেহ-তরঙ্গের সুখ পতঙ্গ মানুষকেও সে অবহেলা করে নাই, কিন্তু ভারতের চক্ষে এ সকলি আত্মারই শক্তি, এদেরই মধ্যে সে দেখে আত্মারই স্ফূরণ, ইহাদেরই পরিপোষণে তারই পুষ্টি, কিন্তু সে সমগ্র অখণ্ড আত্মধন কেবল এইগুলিতেই নিঃশেষ হয়ে যায় নাই, কারণ অনুশীলনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে গিয়ে মানুষকে যে এ সকলের অনেক বড় এক আত্মময় সত্তা বলে পাওয়া যায়, এই আত্মস্বরূপে অধিরোহনেরই বলে ভারত যে মানবের পূর্ণ অভিব্যক্তি—তার চরম ভাগবত্তা—তার পরমার্থ—তার সর্ব্বোচ্চ পুরুষার্থ পেয়েছে। ব্যক্তিকে যেমন, তেমনি ভারত কোন বিশেষ জাতিকেও সে চক্ষে দেখে নাই, যাতে শুধু জাতীয় অহংকারের সেবায় উৎসর্গিত জীবন সংগ্রামে সশস্ত্র ব্যূহবদ্ধ রাষ্ট্রচক্র বলে প্রতিভাত হয়। অহংকারের সে লৌহ বর্ম্মে সে মুখসে সে ছদ্মবেশে জাতি পুরুষকে বন্ধনে ক্ষুণ্ণ করে মাত্র, ভারত জাতির মধ্যে দেখেছে —দেশবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্ঘ-আত্মা রূপে, সেই সঙ্ঘ-আত্মাই আপন প্রকৃতি, স্বভাব ও স্বধর্ম্ম বিকাশ করে তার বুদ্ধি নীতি শিল্পকলার রসজ্ঞানে, তার শক্তি সমাজ ও রাজনৈতিক ধারায় ও জীবনে তাকে রূপ দিয়েছে। তেমনি আমাদের মহামানবত্বের আদর্শও ভারতের ধারার অনুযায়ী হওয়া উচিত—অর্থাৎ ভারতের সেই সনাতন সত্যদর্শনেরই অনুযায়ী যাতে সে মানব জাতির মধ্যে তার জীবনে ও মনে চিরদিন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিণামে অনন্তকেই অভিব্যক্ত হতে দেখেছিল। মূল ভাবটি হবে আধ্যাত্মময়।—সংযম ও সমবেদনা এ দুইয়ের ভিতর দিয়েই ভারতের দেশ-আত্মার সেই অখণ্ড একত্বের অভিমুখী গতি পাওয়া যায়। সে গতির মধ্যে ভারতের অন্তর্গত বহু জাতির বাঞ্ছিত বহু ভঙ্গিম বিচিত্রতাও হারায় না অথচ অভিজ্ঞতা ক্রমশঃই বেড়ে চলে; সে গতির মাঝে ব্যষ্টির শক্তির অনুশীলন ও ক্রম-পরিণতি এবং দেবত্বের অভিমুখী ব্যষ্টির চলা—এই সবটুকুতে জাতি-আত্মার পূর্ণত্বের অনুসন্ধানই ফুটে ওঠে, তবে ব্যষ্টির গতি জাতি-পরিণতিকে ছাড়িয়ে পিছনে ফেলে চলে না, সমষ্টি-জীবনের সুরে সুর বেঁধেই ব্যষ্টির গান বাজে। অবশ্য তর্ক উঠতে পারে, যে, এই কি ব্যষ্টি বা জাতিপুরুষের প্রকৃত পরিচয়? কিন্তু এই দর্শন এই বিবরণ একবার সত্য বলে ধরে নিলে একথা স্পষ্টই বোঝা যায়, যে তাই প্রকৃত শিক্ষা, যাতে দেহ মন ও আত্মার অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে ব্যষ্টি ও জাতি গড়ে

তোলে। এই মূল ভিত্তি এই মুখ্য ও নিয়ামক আদর্শের উপরই জাতীয় শিক্ষার সৌধ রচনা। এ সেই শিক্ষা, যার মূল লক্ষ্য হবে—ব্যষ্টিতে তার আত্মার সহস্রমুখী শক্তি ও সম্ভাবনার প্রকাশ, জাতিতে তার আত্মার ও ধর্ম্মের রক্ষা বলবিধান ও পুষ্টি এবং ব্যষ্টি ও জাতি এই দুইয়েরই মহামানবের শক্তিতে জীবনে আত্মার অধিরোহণ। এ সেই শিক্ষা—যা মানুষের আত্মাব—অন্তঃপুরুষের বোধন ও পরিণতির এই যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, তা' কখন হারায় না!

আর্য্য।

প্রলয় রূপ

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ।)

তব জটাজুট
আজিকার মেঘবক্ষে হেরি পরিস্ফুট।
একি তব কণ্ঠ শোভী নাগনেত্র শিখা
মুহুমুহু আঁকিদেয় বিদ্যুতের রেখা
সকল আকাশে? ত্রাসে কাঁপে ত্রিভুবন।
সংক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস সম উন্মাদ পবন
দিগ্বিদিকে ছুটে যায় তুলি হাহাকার,
উদ্দাম তাণ্ডবে একি গঙ্গাবারিধার
জটাটুটি' লুটি' পড়ে সারা বিশ্বময়।
জলদে ডম্বরু ধ্বনি ঘোষিছে প্রলয়।
অনন্ত অরূপ
সসীমে অসীম একি মিলায়েছ রূপ।
দূর অতিদূর হ'তে পরাণের পাশে
তোমার প্রলয় রূপ আপনা প্রকাশে

পতিতার সিদ্ধি।

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩

এখন তাহাকে চারুই বলিব। তা সে 'বালা'ই হোক কি 'লীলা'ই হোক। অন্ধকারে অন্ধকারেই চারু রাখুকে লইয়া চলিল, অন্ধকারে অন্ধকারেই তাহাকে উপরে তুলিল,—সে যেন আজি আলোক দেখিতে ভয় পাইতেছে অথবা অন্ধকারে আলোকে দেখিতেছে। রাখু কিন্তু আর অন্ধকার পছন্দ করিতেছে না। বহুক্ষণ কোন কিছু দেখিতে না পাইয়া সে যেন দৃষ্টিহীন হইবার মত হইয়াছে। সে মনে করিতেছিল—তামাক আনিতে না বলিয়া ঝিটাকে এখন চারুর একটা আলো আনিতে বলা উচিত ছিল।

যাই হোক প্রথমে চারুর হাত, পরে চারুর কাঁধ ধরিয়া সে উপরে উঠিল। বারান্দায় পা দিতেই সে দেখিতে পাইল, একটা ঘরের ভিতরের দীপ্ত আলোকে বাড়ীর উপরের অনেকটা স্থান যথেষ্ট আলোকিত হইয়াছে। দেখিয়া তাহার বোধ হইল, বাড়ীখানি ছোট হইলেও দেখিতে ঠিক নূতনের মত। আর একটু দেখিতেই সে বুঝিল, বাড়ী শুধু নূতন নয়, সুন্দরও বটে। বাঁকুড়ার পল্লীবাসী,—শুধু ঐটুকু অনুভূতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

এইবার সে পূর্ব্বোক্ত ঘরেই স্থান পাইবে মনে করিল। সেইটে মনে করাই তখন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যেহেতু একমাত্র সেই ঘরটাতেই আলো ছিল। ঘরটা ছিল তাহার উঠিবার পথের ডান দিকে। চারু কিন্তু তাহাকে সেদিকে লইয়া গেল না। বাম দিকের বারান্দায় চলিতে অনুরোধ করিল। ইচ্ছাটা সেরূপ না থাকিলেও রাখু তাহার অনুসরণ করিল। একটা অন্ধকারময় ঘরের দ্বারের কাছে তাহাকে লইয়া চারু বলিল—

"এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।"

বলিয়াই দু' একপদ চলিতেই সে একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়া গেল; অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করিয়া রাখুর চক্ষু তাহার অনুসরণ করিল। একটু পরেই

সে দেখিল, সম্মুখের সেই আলোকিত ঘরের দ্বার-মুখে কালো জল ভেদ করা পদ্মের মত কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের জন্য চারুর মুখখানি ভাসিয়া উঠিয়াছে। সে মুখের শুধু সে একপ্রান্ত মাত্র দেখিতে পাইল। একখানি ছোট মুখে যেন পল্লবে ঢাকা একাংশ—তথাপি রাখুর হঠাৎ চিত্তটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা ভয়,—রাখু মনে মনে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিল। তাহার মনে হইল, একটু সাহসের সহিত বাহিরের ঝড়ে ঝাঁপ দেওয়াই তাহার উচিত্ ছিল। তাহা হইলে এতক্ষণ সে বাসায় পৌছিতে পারিত।

কিন্তু এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। সে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, ঝড়ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। রাখুর বস্ত্র অনেকটা সিক্ত হইয়াছিল, তাহার গাও শীত শীত করিতেছিল, তথাপি চারুর ফিরিবার অপেক্ষায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটা তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

অতি শীঘ্র চারুর ফিরিবারই সে প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু মেয়েটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আর যে বাহির হইতে চাহেনা। রাখু তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল বৃষ্টির উচ্ছ্বাস খাইতেছিল। তাহার কাপড় চাদর এবারে ভালরূপই ভিজিল, বস্ত্রপ্রান্ত হইতে জল পড়িতে লাগিল এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্থির ছিল, এইবারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতে কাঁপিয়া উঠিল। অগত্যা তাহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

সেখানে তাহার দেহের কম্পনটা নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু চিত্তটা তাহার সহসা বিষম আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সে নারায়ণ স্মরণ করিতে গিয়া বুঝিল, সে সায়ং সন্ধ্যা করিতে ভুলিয়াছে। কিন্তু যেরূপ স্থানে অদৃষ্ট দোষে আজ সে পড়িয়াছে, সেখানে আহ্নিকের সরঞ্জাম—মনে করাও বে-আদবী, আঙুলে পৈতা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে গায়ত্রী জপিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা অনামিকার গোটা দুই পর্ব্ব অতিক্রম করিল মাত্র। সেইখানে সে তাহাকে লুকাইয়া নিশ্চিন্তের মত বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার মন চারুর সেই এখনো না দেখা ঘরখানি হইতে আরম্ভ করিয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিতে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়ার একটি ক্ষুদ্র পল্লী, একখানি একটি ছোট 'মেটে' বাড়ীর সম্মুখে রাখুকে দাঁড় করাইয়া যখন তাহার মন তাহার চোখের কোণে এক বিন্দু অশ্রুর প্রতিষ্ঠা করিতেছিল, তখন ঘরের বাহির হইতে ঝিয়ের কথা এক অনুপলে চারুর বাড়ীর সেই আঁধার-ভরা ঘরে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিল।

"কই গো ঠাকুর মশায় কোথায় আপনি ?"

"এই যে ঘরের মধ্যে আছি।"

বলিয়াই রাখু আবার জপ কার্য্য আরম্ভ করিল। একহাতে একটা পিলসুজ, অন্যহাতে একটা ধুচুনীর ভিতরে দীপ লইয়া ঝি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আর কোন কথা না বলিয়া একটা কোণে, বাতাসে না নিবিয়া যায়, পিলসুজটি বসাইয়া তাহার উপরে প্রদীপটা বসাইল। সেটা মিটিমিটি জ্বলিতেছিল, তথাপি তাহারই আলোকে রাখু দেখিল—ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু তাহাতে আসবাব পত্র কিছুই নাই, এমন কি বলিতে হইলে মেঝে ভিন্ন সেখানে একখানা ক্ষুদ্র আসন পর্য্যন্ত ছিল না। ঘরের সেরূপ অবস্থা দেখিয়া রাখু একটু বিরক্তি বোধ করিল। সেই বিকাল হইতে দাঁড়াইয়া সে এতই ক্লান্ত হইয়াছিল যে, আর তাহার না বসিলে চলে না। ঈষৎ বিরক্তির সহিতই সে বলিল—

"মেঝেতেই বসব না কি ?"

ঝি বলিয়া উঠিল—

"না না, তা কি হয় ? দিদিমণি আপনার বিশ্রামের সব আয়োজন করে আনছেন।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই চারু একটা গালিচা লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ঝিকে বলিল—

"ঘরটায় ঝাঁটা দিয়েছিস কি ?"

"দেবো কখন, এইতো সবে ঘরে ঢুকলুম।"

বলিয়াই ঝি ঝাঁটা আনিতে ঘরে ঢুকিল। কিন্তু বারবার যাতায়াত এখন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। জলের ছাটে বারান্দা সব ভাসিয়া যাইতেছিল। দ্বার হইতে বাহির হইয়াই দেবতাকে আর এক প্রস্থ গালি দিয়া ঝি আবার ভিতরে আসিল। অগত্যা চারু হাত দিয়া কতকটা স্থান যথাসম্ভব পরিষ্কার করিল, এবং গালিচা পাতিয়া রাখুকে একখানা গরদের কাপড় দেখাইয়া বলিল—

"এইখানা পরে' ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল। এ কাপড়ের আজও কোন ব্যবহার হয়নি।"

ঝি বলিল—

"একটা বালিশ আনলে না ?"

"কোথায় বালিশ ? থাকলে আর আনতুম না ?"

"কোথায় বালিশ কি গো।"

তাহার কথায় কোনও উত্তর না দিয়া চারু রাখুকে বস্ত্র পরিবর্ত্তনে আবার অনুরোধ করিল। তথাপি তাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল—

"আমি মিছে বলি নাই। কাপড় আমি আমার মাসীর জন্ত আনিয়েছিলুম।"

"তবে আমাকে দিচ্ছ কেন?"

"তাহার ভাগ্যে থাকে—আবার আনিয়ে দিব।"

অসমৃত-কথা—ঘৃণার জন্ত রাখু কাপড় লইতে ইতস্ততঃ করিতে ছিল না। চারুকে দেখিয়া বিস্ময়মগ্নতাই তাহার দাঁড়াইয়া থাকার কারণ। আলোটা ভাল জ্বলিতেছিল না, তাহার উপর পোড়া ঝি মাঝে পড়িয়া আলোর পথটা একেবারেই রোধ করিয়াছে। তথাপি সে দেখিল, মেয়েটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যেন আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়াছে। কেমন করিয়া তাহার মূর্ত্তির এ পবিবর্ত্তন হইল, প্রদীপেব সেই ক্ষীণ আলোকে সে বুঝিতে পারিতেছিল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাখু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া সেইটা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। দ্বিতীয়বারের অনুরোধে চমক ভাঙ্গিতেই সে অর্দ্ধ শায়িত ভাবে গালিচার উপর বসিয়া পড়িল।

"আঃ! বাঁচলুম। তিন ঘণ্টার ভিতরে একটী বারের জন্যও বসতে পাই নি। চারু, তোমার কল্যাণ হোক।"

"কল্যাণ হবে?"

এত ভক্তি যার, ভগবান নিশ্চয়ই তার কল্যাণ করেন—এইটুকু মাত্র বুঝিয়াই রাখু আশীর্ব্বাদের কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছিল। চারুর প্রশ্নে কিন্তু সে কেমন থতমত খাইয়া গেল। প্রশ্নের যে কি উত্তর দিবে, সেটা সে স্থির করিতে পারিল না। তাহার এমন বাড়ীতে বাস, এমন পোষাক-পরিচ্ছদ, এমন নরম গালিচা—যাহা সে এর পূর্ব্বে কখনও চক্ষে দেখে নাই—তাহার পরিধানের জন্ত যে এমন একখানা ভাল গরদের ধুতী একদণ্ড বাহির করিয়া আনিল, উপরে ঝি, নীচে চাকর, ঐ তো নাকে একটা অতি আশ্চর্য্য কি সূর্য্যালোকে ভরা কচুপাতের মাথার জলবিন্দুটার মত জল জল করিতেছে,— এ সমস্তের মালিক যে, তার আবার নূতন কল্যাণ কি হইবে? সত্য সত্যই রাখু উত্তর দিতে নিজেকে অশক্ত বোধ করিল। সে ক্লান্তিবশে আকাশ-বালিশে যেন ঠেস দিয়া হেলিয়া পড়িল।

চারু আর তাহাকে উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি না করিয়া বলিল—

"ব্যবহারের বালিশ আনতে ভরসা করছি না।"

"তোমার ব্যবহার ?"

চারুর কথার অর্থ না বুঝিয়া বোকা বামুন তাহাকে এমন একটা প্রশ্ন করিল যে, তৎক্ষণৎ একটা জবাব দেওয়া তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে যেন কথাটা শুনিতে পাইল না। বারবিলাসিনীর ঘরের উপাধান, নিশ্চিত সে কেমন করিয়া বলিবে যে, একমাত্র সেই তাহা ব্যবহার করিয়াছে। অন্য একটা কাজের অছিলায় দ্বারের কাছে গেল। দেখিল—ঝি চৌকাটে দাঁড়াইয়া হাতটা বারান্দায় বাহির করিয়া ঝাপ্‌টার তীব্রতার পরীক্ষা করিতেছে। দেখিয়া চারু তাহাকে বলিল—

"মরবার তোর যদি এতই ভয়, তা হ'লে তুই যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। ওর সেবা আমিই করব এখন।"

ঝি বাস্তবিক ঝড়ের ভয়ে দাঁড়াইয়া ছিল না। সে পূর্ব্বে দিদিমণির অনেক লীলা দেখিয়াছে, আর সে জানে—এইরূপ দিদিমণি-জাতীয়া নারীর লোকভেদে লীলাভেদ। ইহারা বাবুর সম্মুখে বাবুয়ানী দেখায়, পণ্ডিত প্রভুর কাছে পণ্ডিতার পরিচয় দেয়, এদিকে আবার বৈষ্ণব প্রভু পাইলে নাকে তিলক ও হাতে মালা দিয়া বৈষ্ণবী হয়,—মদ মাংসের নামেই তখন তাহাদের বমনেচ্ছা আসে। সুতরাং দিদিমণির এও একটা লীলা বলিয়া সে কৌতূহলী হইয়া দেখিতেছিল। দেখিতেছিল কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিল না। একটা ভিখারীর মত বামুনকে সে এমন যত্ন দেখাইতেছে কেন? সে অনুমান করিতেছিল—এই ছোট ময়লা কাপড় পরা ভিখারীবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় অনেক টাকার মালিক, নইলে দিদিমণির তাহার সেবায় এত আগ্রহ কেন? এটাও সে জানে—কলিকাতায় ঐ বামুনের মত বেশ করা এমন অনেক মহাজন আছে, যাহারা দিদিমণির পোষাক-পরা গাড়ী চড়া বাবুর মত দশ বিশ জনকে বাজারে কিনিতে বেচিতে পারে। ঝি বুঝিল, এ বামুনটাও সেইরূপ এক আধটা মহাজনেরই মত ধনী হইবে। তবে ব্রাহ্মণ বোধ হয়, এই প্রথম বারাঙ্গনার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, এখনও নিষ্ঠা ছাড়িতে পারে নাই, তাই দিদিমণিও নিষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বালিশ না থাকার রহস্যটাও সে বুঝিয়া লইল। পাঁচজনের ব্যবহারের বালিস দিদিমণি ব্রাহ্মণকে ব্যবহার করিতে দিবে না। একটা বালিশের সন্ধান তাহার জানা ছিল। সেটা

চারু একদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া তাহাকে দিয়াছিল। সে কিন্তু সেটাকে আজও পর্য্যন্ত ব্যবহার করে নাই। সুতরাং চারুর কথায় কোন উত্তর না দিয়া সে চৌকাটে পা দিতেই ঝি তাহাকে চুপি চুপি বালিশের কথাটা শুনাইয়া দিল। চারু বলিল—

"সেটা নিয়ে আয় দিকি?"

উত্তরেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

একটু পরেই চারু ফিরিল। এক হাতে তার একটা পিতলের 'মেছ্‌লী' অন্যহাতে ঘটী, সে দুটা আনিবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া রাখু উঠিয়া বসিল এবং বলিল—

"ঘটী তুমি আমার হাতে দাও, আমি বারন্দা থেকে পা ধু'য়ে আসি।"

"বাইরে যাবার উপায় নেই" বলিয়া চারু তাহার পাদুটো মেছলী'র উপর তুলিয়া অতি সন্তর্পণে ধুইতে বসিয়া গেল।

চারুর মুখে কথা নাই। রাখুরও মুখে কথা নাই। একজন মাথা হেঁট করিয়া, আর একজন তাহার মুখখানা দেখিবার জন্য তীব্র অভিলাষে মাথা তুলিয়া। প্রদীপটা যেন ঝড়ের ভয়ে ঘরের কোণে মুখে লুকাইয়া সন্তর্পণে অন্ধকারের পানে চাহিয়া আছে। সে আলো-আঁধারে রাখুর দৃষ্টির কোনও মূল্য রহিল না। সে বুঝিতে পারে নাই—চতুরা বারাঙ্গনা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে মুখ দেখিতে দিতেছে না। প্রদীপটাকে পিছন করিয়া এমন ভাবে সে বসিয়াছে যে, তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা আপাততঃ রাখুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অগত্যা মুখ দেখার চেষ্টা ছাড়িয়া সে আপনার পায়ের দিকেই চাহিল। দেখিল—চারু এইবার একটি ধপ ধপে কাপড়ের মত কি দিয়া তাহার পা মুছাইতেছে। বস্তুটা তোয়ালে। রাখু ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তোয়ালে দেখে নাই। সে এতক্ষণ কথা কহিবার সুযোগ পাইতেছিল না। তোয়ালেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া কথা আরম্ভ করিতে গিয়া সে দেখিল—চারুর হাতে কোন অলঙ্কার নাই। তৎপরিবর্ত্তে দুই হাতে দুটি গোল শাঁখা। আর বাম হস্তে শাঁখার পার্শে স্ত্রীলোকের আয়তী-চিহ্ন 'নোয়া'।

দেখিয়া রাখু বিস্মিত হইল। কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর সীমন্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ক্ষীণ দীপশিখা তাহার দৃষ্টি হইতে সিন্দুর-বিন্দু

লুকাইতে পারিল না। দৃষ্টিটাকে নামাইয়া আবার তাহার হাতের উপর আনিতে রাখু দেখিল, চারু একখানি ডলডলে কস্তাপেড়ে সাড়ী পরিয়াছে।

"চারু!"

মুখ না তুলিয়াই চারু উত্তর দিল—

"উঁ।"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

"বল।"

"তোমাতে সধবার চিহ্ন দেখছি,—তোমার কি স্বামী আছে?"...

"এসে বলছি।"

বলিয়া ঘটী, মেছলী, তোয়ালে তুলিয়া চারু যেন সমস্ত দেহটা এক পাকে ঘুরাইয়া উঠিয়া গেল। দীপটা কি-জানি-কেন এই সময় হঠাৎ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাখু দেখিল—পিঠের স্থানভ্রষ্ট কাপড়ের পার্শ্ব দিয়া একরাশ মুক্ত কেশ শ্রাবণ ঘন মেঘের মত যেন তড়িদ্দণ্ড বাঁধিয়া উড়িতেছে। চারু চলিয়া গেল, দীপটা নিবিয়া গেল।

অন্ধকারে পা গুটাইয়া হাতের পাতায় ভর দিয়া গালিচার উপর হেলান দিতে রাখু বলিয়া উঠিল—

"দুমুঠো আতপ চাল আর কাঁঠালী কলা মাত্র যার দিনের উপার্জ্জন, হা ভগবান, তাকে তুমি এ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখালে কেন?"

এইবারে অন্ধকারটা রাখুর ভাল লাগিল। সে মনে মনে বলিল- "থাক্ প্রদীপ তুই নিবে'। তোর জ্বলবার প্রয়োজন চলে' গেছে। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। স্বপ্ন ঘুমের জিনিস, তাকে খোলা চোখে দেখে পাগল হ'তে যাই কেন?"

কেশের আবরণের ফাঁকে ফাঁকে রাখু সত্য সত্যই চারুর পৃষ্ঠদেশটা কতকগুলো বিদ্যুৎ-রেখার মত দেখিয়াছিল। বাস্তবিক চারুর যদি ঐরূপই বর্ণ হয়, আর সেই বর্ণের যোগ্যতার ছাঁচে তাহার মুখখানি গড়া হয়, তাহা হইলে চারুর মত সুন্দরীর ঘরে সেই দুর্দ্দান্ত ঝড়ে আশ্রয় লইয়া সে নিশ্চয় আজ আত্মহত্যা করিতে আসিয়াছে।

রাখু চক্ষু মুদিল, কিন্তু তারা দু'টা তার চক্ষুপলককে ভিতর হইতে বিঁধিতে লাগিল। তাহারা অন্ধকারের উপর অন্ধকারের চাপে পড়িয়া স্তব্ধ হইতে চাহিল না। বিপন্নের মত আবার সে চোখ মেলিল। চাহিতেই দেখিল—

সম্মুখের ঘর হইতে একটা আলোর ছায়া-মাখানো রশ্মি তাহার কাপড় চাদরের উপর পড়িয়া যেন কাঁদিতেছে। সেটা দেখা তাহার সহ্য হইল না। সে তাড়াতাড়ি সে দুটাকে তুলিয়া বাড়ীর বারান্দায় নিক্ষেপ করিতে গেল। সেই দুটার অপরাধেই তো রাখু আজ চারুর অমন আলোকিত ঘরে স্থান পাইল না! তাহার ঘরে যদিও একটা প্রদীপ আসিল, তা সেটাও তাহাকে দরিদ্র বুঝিয়া পলকের জন্য একটা রহস্যের হাসি ছড়াইয়া নিবিয়া গিয়াছে।

দুর্দ্দশার অভিমান অন্ধকারকে তাহার আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে। নিজের দেহটাকেই যখন সে দেখিতে পাইতেছে না, মনটা পর্য্যন্ত যখন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে, জাতটা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন তার দারিদ্র্যের প্রবল সাক্ষী কাপড় চাদর দু'টাই কেবল তাহার মুখের পানে চাহিয়া কপট কান্নার রহস্য করিবে কেন?

ফেলিবার পূর্ব্বে কাপড়খানা নাকের কাছে আনিতে সে দেখিল চারুর পাতা আঁচলে বসিবার ফলে তাহার বস্ত্রে গন্ধমাখা হইয়া গিয়াছে। বাসার সমস্ত লোকের টিট্‌কারী খাইবার জন্য এ কাপড় পরিয়া সে কিরূপে বাসায় ফিরিবে? আসুক অন্ধকার, ঘনতম অন্ধকার। সে তাহার পল্লীজীবন হইতে চারুর দ্বারস্থ হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একবার নিমেষের চিন্তায় ভ্রমণ করিয়া আসিল। দেখিল—কতকাল হইতে অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া করিয়া আজ যেন হঠাৎ সে ঝুপ করিয়া সাত হাত অন্ধকারের নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

তাহার চোখে এইবার জল আসিল। দোর হইতে মুখ বাড়াইয়া কাপড় চাদর বারান্দার এক ধারে যেমন সে রক্ষা করিতে গেল, অমনি প্রবল বাতাসে গোটাকয়েক তীক্ষ্ণ জলবিন্দু তাহার ভিজা চোখের উপর আঘাত করিল। অন্ধের মত তখন সে সেদুটাকে যে কোন এক দিকে নিক্ষেপ করিয়া গালিচার উপরে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ তাহার আগেই অবসন্ন হইয়াছিল, এখন তাহার চিন্তাগুলা পর্য্যন্ত অবসাদ-গ্রস্ত হইল। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া তালে-তালে-আগত ঝড়ের ঘুম পাড়ানো গান অবিলম্বেই তাহার বহিঃসংজ্ঞা বিলুপ্ত করিল।

পায়ের উপর এক সুকোমল স্পর্শ কতকগুলা জালা-ভরা অনুভূতির ভিতর দিয়া রাখুকে আবার জাগ্রতের দেশে টানিয়া আনিল। সে চোখ মেলিয়া দেখিল—ঘরে বেশ আলো জ্বলিতেছে কিন্তু প্রদীপকে আড়াল করিয়া পায়ের কাছে কে বসিয়া।

"কে, চারু ?"

"বড় ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছ বলে' ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস করি নি।"

জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝিতে পারিল, তাহার গালিচার উপরে রাখা মাথা ঘুমের ঘোরে কেমন করিয়া একটি ছোট বালিশের উপর উঠিয়াছে। চারু তাহ'লে তো দুটি হাত দিয়া তাহার মাথা বালিশের উপর তুলিয়া দিয়াছে, তার পর তাহার সেই ঘুমকে আশ্রয় করিয়াই চারু আবার চুরি করিয়া তাহার পদসেবা করিয়াছে। করিয়াছে নিশ্চয়, নইলে ঘরের ভিতর এত স্থান-থাকিতে চারু তাহার পা দুটির পার্শ্বেই বসিয়া থাকিবে কেন ?

ঘুমটার উপর বিরক্ত হইয়াই যেন রাখু উঠিয়া বসিল। চারুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। উঠিতেই রাখু এই সর্ব্বপ্রথম তাহার মুখখানা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝিল এ মুখ দেখার আগ্রহ তাহার না রাখাই ভাল ছিল। কেন না দেখা মাত্র বাহিরের সেই প্রচণ্ড ঝড়ে কতকগুলো রক্তের আর্ত্তনাদ তাহার চক্ষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। চারুর মুখশ্রী তাহার সৌন্দর্য্যের গান কোন সুরে গাহিয়াছিল, জানি না। রাখুর দৃষ্টি কিন্তু তাহা দেখা মাত্র তাল মান হারাইয়া স্থির হইয়া গেল।

চারু সেটা বুঝিতে পারিল,—বুঝিয়া প্রথমটা যেন একটু শঙ্কিত হইল। কিন্তু বারবিলাসিনীর অভ্যাসসিদ্ধ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় যখন সে বুঝিল, রাখুর সে মুখের চাহনিতে কোন ভয় নাই, তখন সে নিজের চিরাভ্যস্ত মদালস চাহনির ভারে রাখুর দৃষ্টিকে মেঝের দিকে নামাইয়া অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হইল। এইবার সে কোণ হইতে প্রদীপের আধারটাকে গালিচার কাছে লইয়া আসিল। তারপর আর একবার মেছ্‌লী ও জলপূর্ণ ঘটিটা রাখুর নিকটে আনিয়া বলিল—

"নাও, এইবার হাত মুখ ধু'য়ে ফেল।

নীরবে হেঁট মাথায় রাখু তাহার আদেশ পালন করিল। তাহার দেওয়া আর একটা নূতন তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিল।

চারু সেগুলা খানিকটা দূরে রাখিয়া একটা গড়গড়া লইয়া আবার রাখুর কাছে আসিল।

"তামাক সাজা আছে, টিকে ধরিয়ে দিই ?"

রাখু গড়গড়াটার দিকে একবার সন্দেহ-দৃষ্টিতে চাহিল মাত্র। চারু তাহার কথার আর অপেক্ষা না করিয়া দীপটাকে বিশেষরূপে প্রজ্বলিত করিল এবং টিকে ধরাইতে ধরাইতে বলিল—

"গড়গড়া নতুন, নল কল্কে নতুন, গঙ্গাজলে গড়গড়া ভরে' এখনো পর্য্যন্ত কারো ব্যবহার না করা তামাক সেজে এনেছি। এতেও কি তোমার আপত্তি আছে ?"

"কোন আপত্তি নেই, চারু !"

"কেবল বালিশটে একদিন মাত্র ব্যবহার করেছি। মনে করেছিলুম, তাও দোব না কিন্তু তোমার শোবার কষ্ট দেখতে পারলুম না।"

"তুমি ভালই করেছ। আমি কিন্তু এমনি অবাধে ঘুমিয়েছি, কখন যে তুমি বালিশ এনে আমার মাথায় দিয়েছ—বুঝতে পারি নি।"

"দেখি তোমার মাথাটা গাল্‌চের উপর গড়াগড়ি খাচ্চে। হাত দিয়ে তাই বালিশের উপর তুলে' দিয়েচি।"

বলিয়াই চারু কলিকাটাকে গড়গড়ার উপরে বসাইয়া নলটা রাখুর হাতের কাছে রাখিল।

রাখু নলটা হাতে করিতে একবার গড়গড়ার পানে চাহিল। তার পর গালিচা, বালিশ, পরিধেয় গরদ সমস্তগুলা এক নিমিষে দেখিয়া লইল। সর্ব্বশেষে বালিশটায় হেলান দিয়া নলটা মুখে দিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর মুখের পানে চাহিল। চারু অমনি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

"তারপর ?"

কতকাল যেন সে তামাক খায় নাই, এমনি আগ্রহে সে গড়গড়া টানিতে বসিয়া গেল। চারুর প্রশ্নে প্রথমে সে কোনই উত্তর দিল না। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই তামাক টানিতে লাগিল। চারু আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"আমার কথা শুনতে পেলে কি ?"

"পেয়েচি, কি বলতে চাও, বুঝেচি।"

"কি করব ?"

"কি বলব ?"

"আমি তো সাহস করে' এখানে আপনার খাবার কথা মুখে আনতে পারি না।"

'তুমি' ছাড়িয়া আবার চারু 'আপনি' ধরিল। বার কয়েক অন্যমনস্কের মত টান দিয়া রাখু সেটাকে গালিচার উপরে রাখিল। চারু দেখিয়াই বলিল—

"তামাক খান। ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে পীড়ি করব না।"

চারু তাহাকে পীড়াপীড়ি না করুক, ঘুম হইতে উঠিবা মাত্র ভীষণ প্রজ্বলিত ক্ষুধা রাখুকে পীড়াপীড়ি করিতেছিল। চারুর কথা তাহাকে দ্বিগুণ বেগে জ্বালাইয়া তুলিল। তাহার আবাল্যের সংস্কার কিছুতেই চারুর আতিথ্য গ্রহণে সম্মতি দিতেছিল না। আপদ্ধর্ম্মের অনুগত হইয়া পতিতার ঘরে সে যে আশ্রয় লইতে সাহস করিয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। সে কথাও সে কাহারও কাছে কস্মিন্ কালেও প্রকাশ করিতে পারিবে না। তাহার যে ব্যবসা, কলিকাতার কতকগুলি সম্ভ্রান্তের বাড়ীতে ঠাকুর পূজা—লোকে ঘূণাক্ষরে চারুর ঘরে তাহার রাত্রিবাস জানিতে পারিলে আর কেহ তাহাকে করিতে দিবে না। সেই সকল পরিবারের মেয়েরা নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার সঙ্গে আলাপাদি করে, এমন কি একমাত্র তাহার সঙ্গে ঠাকুর-ঘরে কত সময় একা একা কাটাইয়া দেয়। তাহার এ দুর্দ্দশার কথা শুনিলে, কোন বাড়ীর গৃহিণী তো আর কন্যা-পুত্রবধূদের তাহার নিকটে রাখিতে সাহসী হইবে না।

এতক্ষণ রাখু মুগ্ধ ভাবেই তাহার ঘরে অবস্থান করিতেছিল। এই খাবার কথাটা তুলিতেই তাহার যেন চৈতন্য ফিরিল। এইবারে সর্ব্বপ্রথম তাহার বোধ হইল, ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া বাসায় চলিয়া যাওয়াই তাহার কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া চারুর মোহাকর্ষণে তাহার ঘরে আশ্রয় লইয়া সে বড় দুঃসাহসিকের কাজ করিয়াছে।

তথাপি সে চারুর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। সে ভাবিয়াছিল—চারু তাহাকে কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিবে। এখন বুঝিল—এ পতিতা তাহাকে নিষ্ঠাবান বুঝিয়া, সামান্য দু'একটা অনাচমনীয় মিষ্টান্নও দিতে সাহসী হইতেছে না।

রাখু এক একবার নলটা মুখে দিয়া টানে, আবার গালিচার উপরে রাখে। আবার টানে—আবার রাখে। কি যে সে উত্তর দিবে, বুঝিতে পারিতেছে না। চারু নীরবে মাথাটা নীচু করিয়া তাহার সুমুখে বসিয়া। এবারে রাখু সে অবনত মুখের পানেও চাহিতে সাহসী হইতেছে না। এইভাবে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল, রাখু তামাকের শেষ ধূমাটি পর্য্যন্ত টানিয়া নিশ্চিন্ত হইল। আর তাহার কথা না কহিলে চলে না। সে এইবারে প্রসঙ্গের ছলে জিজ্ঞাসা করিল—

"রাত কত?"

"দশটা অনেক্ষণ বেজে গেছে।"

"ঝড় কি থামবে না ?"

"এখনও তো থামেনি বরং বেড়েছে।"

ঘরের চারিদিক বন্ধ বলিয়া রাখু ঝড়ের প্রকোপটা এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে মাঝে মাঝে জানালার ফাঁক দিয়া যে শব্দ আসিতেছিল, তাহাতেই সে বুঝিয়াছে—ঝড় নিতান্ত সামান্ত নয়। সে শুধু কথায় চারুকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার ঘরে কে আছে ?"

"ঝি।"

"বাবু আসতে পারেন নি ?"

"আসতে পারবে না, চাকর দিয়ে বলে' পাঠিয়েছে। হঠাৎ জ্বর হয়েছে।"

"কখন সে এসেছিল ?"

"আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন।"

"আমাকে কি সে দেখে গেছে ?"

"আমি তাকে ডেকে দেখিয়েছি। আমি একা আছি মনে করে' বাবু আমাকে আগলাবার জন্ত তাকে পাঠিয়েছিল।"

একটু শঙ্কিতভাবে রাখু বলিল—

"সে তো তাহ'লে বাবুকে গিয়ে বলবে।"

"তা' বলবে বৈ কি। তাকে তো ফিরে যাবার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?"

"তা হলে ?"

"তা হ'লে কি বলুন ?"

"এখন কি যাওয়া যায় না ?"

"ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চান কি ?"

রাখু চুপ করিয়া রহিল। সত্য সত্যই তাহার ভয় হইল। তাহার থাকার কথা শুনিয়া যদি চারুর বাবু সেখানে আসিয়া তাহার অপমান করে কিম্বা তাহাকে বাড়ী হইতে সে দুর্য্যোগে বাহির করিয়া দেয়, তাহা হইলে তো সেই ঝড় জলেই তাহাকে নিজের পথ দেখিতে হইবে। কিন্তু পুরুষ মানুষ হইয়া একটা স্ত্রীলোকের কাছে সে ভয় পাইবার কথা কেমন করিয়া বলিবে ? খানিকটা চুপ রহিয়া সে বলিল—

"না ভয় পাব কেন ?"

"তাই বলুন, আপনি আছেন এই সাহসে তাকে চলে' যেতে বলেছি। নইলে একমাত্র ঝিকে আশ্রয় করে' এই দুর্য্যোগের রাতে এত বড় বাড়ীতে থাকতে পারব কেন ?"

"কেন, তোমার মাসী ?"

"সে আমার ওপর রাগ করে' শ্রীক্ষেত্রে গেছে।"

বলিয়াই পাছে রাখু তাহার মাসীর সম্বন্ধে আরও দু' পাঁচটা প্রশ্ন করে সে কথা ফিরাইয়া বলিল—

"তা' যা হোক, আপনাকে ঘরে ধরে এনে দেখছি—আমি বড়ই গর্হিত কায করেছি।"

"আমার যাবার কথা শুনে তুমি কি আক্ষেপ করছ ?"

"আক্ষেপ করবার আমার কিছু নেই। আপনার যদি যাবার কোন উপায় থাকতো, তা হ'লে আমি সুখী হতুম।"

কথাটা রাখুর মনে আঘাত করিল। বুঝিল, সে যে তাহার ঘরে জলগ্রহণ করিতে এত সঙ্কোচ দেখাইবে, এটা সে পতিতা বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিলে বোধ হয় এত আগ্রহ করিয়া তাহাকে সে ঘরে আনিত না। বামুনের ছেলে এবার বিষম সমস্যায় পড়িল। তাহার সেবা রাখুকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে বেশ করিয়া দেখিল—এ বয়স পর্য্যন্ত এক মা ছাড়া আর কারো কাছে সে এ রকম যত্ন পায় নাই। যত্ন ?—তাহার মায়ের মৃত্যুর পর একমাত্র অনাদরই তার নিত্য প্রাপ্য বস্তু ছিল। সংসারের কত দিক হইতে কত ভাবে যে সে লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিয়া সে যদি সেগুলাকে এক পার্শ্বে রাখে, আর এই হঠাৎ-চোখে-পড়া হীন বেশ্যার দু'দণ্ডের স্নেহ ও যত্ন অপর পার্শ্বে রাখিয়া দুইটা ব্যবহারের তুলনা করে, তাহা হইলে তাহার প্রসাদ মুখে দিলেও বুঝি রাখুর ব্রাহ্মণত্ব তাহার গলার ত্রিদণ্ড সূতার বাঁধন ছিঁড়িয়া তাহাকে পতিত করিয়া পলাইতে পারে না। তাহার উপর ব্রাহ্মণের যে একমাত্র উপজীবিকা যাজন কার্য্য আগে হিন্দু সমাজে এক অতি সম্মানের বস্তু ছিল, কলিকাতায় আসিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে বুঝিয়াছে, এখানে সে কাজের সামান্য মাত্রও সম্মান নাই। বড় লোকের ঘরের একটা খানসামার মর্য্যাদাতেও তার অধিকার নাই। আর ব্রাহ্মণত্বের সম্মান ? আজই তো বড় লোকের বাড়ীর দ্বারদেশ হইতে সে তাহা ঘাড়ের বোঝাস্বরূপ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সামান্য একটু জল মুখে দিয়া চাকর ক্ষোভ দূর করিলে কি এমন

মূল্যবান সম্পত্তি চিরজীবনের মত তাহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে, রাখু সেটা বুঝিতে পারিল না। কিছু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া একটু জল খাইবে,—রাখু মনে স্থির করিল। কিন্তু—তথাপি সঙ্কোচ—খাবার কথা বলিতে রাখুর মুখ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এক বলিতে সে আর বলিল—

"যদি সত্য বলতে হয়, তা হ'লে বলি তোমার এখানে আমি পরম সুখে আছি। তবে কি না, এখনও পর্য্যন্ত আমার সন্ধ্যাহ্নিক কিছুই করা হয় নাই। সেই জন্যই যাবার ইচ্ছা করছিলুম।"

"আমি তা' জানি। সেই জন্য আমি আহ্নিকের আয়োজন করে রেখেছি। ঐ দেখ।"

বাস্তবিকই রাখু দেখিল—ঘরের এক পার্শ্বে পাতা একখানা আসন, আর তাহার সম্মুখে একটা কোশা! পতিতার বুদ্ধি-বিবেচনা দেখিয়া সে অবাক্ হইল। সে আবার চারুর মুখের পানে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না।

চারু কিন্তু অন্য রকম বুঝিল। সে মনে করিল—বুঝি তাহার উপর ঘৃণায় রাখু তাহার আনীত পূজা-পাত্র ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। তাহার মনে এবার ক্রোধের উদয় হইল। তখন পতিতার অভ্যাস সিদ্ধ বক্রোক্তিতে কথায় বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল --

"কি হে অধ্যাপক ঠাকুর, আমার ছোঁয়া গঙ্গাজলও ছুঁলে জাত যায় নাকি? অত নিষ্ঠে যখন তোমার তখন বেশ্যার দোরে এসে ধর্ণা দিয়েছিলে কেন?"

তাহার ক্রোধ হইয়াছে বুঝিয়া রাখু বড়ই দুঃখিত হইল। সত্যই তো, পতিতা তাহাকে গৃহে আশ্রয় দিয়া কোনও অপরাধ করে নাই। অপরাধ যদি হইয়া থাকে তো সে রাখুর নিজের। সে তাহার ঘরে না আসিলেই তো পারিত। দীনভাবে তখন সে বলিল—

"না চারু, আমি সেজন্য তোমার মুখের পানে চাই নি। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে অবাক্ হ'য়ে তোমার পানে চেয়েছিলুম।"

"আহ্নিক করুন।"

রাখু পূজার আসনে বসিল। মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া সে চক্ষু মুদিয়া বহু চেষ্টায় বারদশেক গায়ত্রী জপিয়া লইল। আসল কথা চারুর মুখের তীব্র কথা শুনিবার পর হইতেই তাহার প্রাণটা কেমন হু হু করিয়া উঠিয়াছে। জপ করিতে বসিয়া সে চারুকে দেখিতে দু' একবার মুখ ফিরাইবার ইচ্ছা করিল।

সাহস হইল না। তাহার বাড়ীর দ্বারের প্রথম দর্শন হইতে ক্ষণেক পূর্ব্বের তাহার ভ্রুকুটি-রঞ্জিত মুখ দেখা পর্য্যন্ত রাখু তিনবার চারুকে তিন রকম দেখিয়াছে। এবার দেখিলে আবার যদি সে মুখ আর এক রকম নূতন হইয়া যায়। আর সে মধুর মায়াবিনীর নূতন রূপ দেখিতে রাখুর সাহস হইল না। সে গায়ত্রী জপের পর গঙ্গাজলে হাত দিয়া চক্ষু মুদিয়া চারুর রাগ-রাঙ্গা মুখখানি ধ্যান করিতে লাগিল। ধ্যান শেষে সে দেখিল, তাহার সম্মুখের কোশার গঙ্গাজল হাত বাহিয়া তাহার চোখে উঠিয়া আঁখি-প্রান্ত দিয়া অশ্রু মূর্ত্তিতে ঝরিতেছে।

পাছে চারু দেখিতে পায়, শশব্যস্তে রাখু দুই হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। ফিরিয়া দেখে—চারু নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল—গালিচার অপর প্রান্তে আর একটি সুন্দর চিত্রিত আসন, তাহার সম্মুখে নানাজাতীয়—সে জীবনে কখন দেখেও নাই—ফলমূল মিষ্টান্ন ভরা অতি সুন্দর শ্বেতপাথরের থালা, আসন পার্শ্বে সেইরূপই শ্বেত বরণের ঢাকনী দেওয়া শ্বেতবরণের গেলাস, আর গেলাসের পার্শ্বে একটি রূপার ডিবে।

দেখিবামাত্র রাখু সমস্তই বুঝিল। এইবারে বর্ষার উচ্ছ্বাসে তাহার চোখে জল আসিল, হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। আজীবন অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণ যুবক আজ সর্ব্বপ্রথম মমতার স্নিগ্ধতলে আশ্রয় পাইয়াছে। চিরদরিদ্র রাখুর বোধ হইল—চারুর ক্রোধ সংক্ষুব্ধ বাণীর মধুরতা উপভোগের জন্য দেবতারা তার মুখের কাছে সে সময় অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চারুর অতিথি হইবার জন্য রাখু তড়িৎ-প্রেরিতের মত আসন ছাড়িয়া উঠিল। এই বেশ্যা-রূপিণী দেবকন্যার দয়ায় মাখাইয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব উজ্জ্বলতর করিবার সে সংকল্প করিল। রাখু আপনাকে আরও দৃঢ় সংকল্প করিবার জন্য নিজেকেই শুনাইতে বলিয়া উঠিল—

"আজ আমার নিরর্থক দম্ভভরা বামনাইকে এই নারীর করুণাজলে মুছিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিব।"

কিন্তু হায়, তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় বিধান করিয়া চারু বুঝি দারুণ অভিমানে উঠিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

হাজিরা *

[প্রসাদ]

সম্মুখে আঁধার ঘন, সবে সন্ধ্যা, পড়ে' সারা রাতি,
সম্মুখে ভীষণ বন, দুর্গম—দুর্গম পথ অতি।
এ পথে চলিতে হবে, হে যাত্রী, হাজির,
দূর হ'তে বলে যাত্রী—"হাজির, হাজির।"

এক, দুই, তিন, চার, দশ, বিশ, এক শ,' হাজার,
অযুত, নিযুত, কোটি,—বাকী কে রহিল তবে আর ?
"সকলেই বাকী গুরু, একমাত্র আমি,
এখনও পথে তারা ঘুরিতেছে স্বামি।"

এক তুমি, দুই তুমি, দশ, বিশ, এক শ,' হাজার,
লক্ষ তুমি, কোটি তুমি—বাকী কে রহিল তবে আর ?
এবারে চলিতে হবে, হে যাত্রী, হাজির।
"পদতলে নতশির, হাজির হাজির।"

একা তোমা যেতে হবে এ অরণ্যে সোজা পথ দিয়ে,
যেতে হবে অন্ধকারে আলোকের সুর বেঁধে নিয়ে ;
সম্মুখে রাখিবে দৃষ্টি ফিরিবে না আর,
পশ্চাৎ পশ্চাতে রবে—পথ ক্ষুরধার।

বুদ্ধি তুমি, শক্তি তুমি, স্থিতি তুমি, রতি তুমি, প্রাণ,
এ অরণ্যে এক তুমি—দাতা তুমি, দেয় তুমি, দান,
নদী তুমি, স্রোত তুমি, পার তুমি, তীর,
পান্থ তুমি, পথ তুমি।—কোথা তুমি ধীর।

* * *

এস প্রিয়, এস সখা, রম্য কুঞ্জে বিপুল আলোকে,
হে আনন্দঘন মূর্ত্তি, বক্ষে আজ বাঁধিব তোমাকে
দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ মোর, গণ্ডে বহে ধারা,
দেখিতে না পাই—হেথা আসিতেছে কারা ?

"কই কা'রা ? কোথা কা'রা ? পদপ্রান্তে দেখ তুমি স্বামি,
আঁধারের বন ভেঙ্গে একমাত্র আসিয়াছি আমি।"
এক নও, পশ্চাতে চাহিয়া দেখ বীর,
কোটি কণ্ঠে কারা বলে "হাজির হাজির।"

সুখের ঘর গড়া ।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত ।)

দশম পরিচ্ছেদ

প্রবল-প্রতাপ মহামহিম রতন রায় তখন তাঁহার খাস্ কামরায় বা দেওয়ানি খাস মহালের আরাম কক্ষে বিশাল ফরাশের উপর একটা প্রকাণ্ড তাকিয়ায় একপাশ হইয়া বিপুল ভুঁড়িটাকে বামদিকে ঢালিয়া দিয়া মুদিত নয়নে আল-বোলার নল মুখে দিয়া তাম্রকূট ধূমে "রাজা হওয়ার খেয়াল রচনা করিতে-ছিলেন। খাস্ মোসাহেব গেঁড়া সরকার অদূরে একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া পরম উৎসাহে পুরাণো একটা বাঙ্গালা খপরের কাগজ হইতে সংবাদ সহযোগে কর্ত্তার সেই ফেনার গোলকটী ফুঁ দিয়া ফাঁপাইয়া তুলিতেছিল খপরের কাগজটীতে ইংরাজি নববর্ষের উপাধি তালিকা ছিল। গেঁড়া তাহা হইতে বাছিয়া দুইটী ভাগ্যবান সরকারী প্রসাদভোগীর নাম করিল। একজন হইতেছেন চিংড়ঘাটার পত্তনীদার গজেন্দ্র গঞ্জন টহলদার, দ্বিতীয়টী হইতেছেন, বক্শীডাঙ্গার ইচ্ছারঞ্জন পাকড়াশী। গজেন্দ্রগঞ্জন রাজা-বাহাদুর হইয়াছে, আর ইচ্ছারঞ্জন রাওবাহাদুর তো পূর্ব্ব বছরে হইয়াই ছিলেন, এ বছর নাকি "এ-ছি-ও-ছি-" উপাধি পাইলেন।

রতন। এ ছিঃ ও ছিঃ কি হে? এমন টাইটেল্ তো শুনিনি?

গেঁড়া। আজ্ঞে কর্ত্তা এটা নাকি নতুন তৈরি হয়েছে যারা 'ছিয়াই' বা 'কে ছিঃ এ ছাই' পাবার মত বড়দরের নয়, মাঝারি রকমের জমীদার তাদের জন্যে এটা তৈরি হয়েছে—ছোটলাট নাকি ভারত ছেক্রেটারীকে লিখে পাঠান এমন সব জমীদার আছেন যাঁদের আয়ের চেয়ে দেনা বেশী, আর দেনার চেয়ে দান বেশী তাদের মর্য্যাদা মাসিক উপাধি দেওয়া উচিৎ—তাই এইটে নতুন হয়েছে—

রতন। ওর মানে কি?

গেঁড়া। তা কর্ত্তা ইংরিজি তো তত জানিনি বল্‌তে পারিনি, তর্ক-সিদ্ধান্তর ভাগ্নে পঞ্চুকে মানে জিজ্ঞেস করলাম তা সে ভেবে বল্লে মানে হচ্ছে সব গুণবান সমান, এও ছিঃ ও-ও-ছিঃ

রতন। ছোকরা তো খুব ফাজিল বটে—

গেঁড়া। খ্যাপা কর্তা খ্যাপা—যেমনি মামা তেমনি ভাগ্নে; খনার বচন তো মিথ্যে নয় নরানং মাতুল ক্রমঃ—তর্কসিদ্ধান্তটী ভিজে বেরাল—খ্যাপা বল্‌লে ভুল হয়—কর্তার তো অবিদিত নেই—

এমন সময় মহেশ ও জীবন ভট্টাচার্য্য ঘরে ঢুকিয়া করাশের এক পাশে বসিল। কথা পাড়িবার সুযোগ আপনা হ'তে আসিয়াছে দেখিয়া মহেশ গেঁড়াকে জিজ্ঞাসা করিল—

ম। তর্ক সিদ্ধান্ত তো? যত না পাগল তার দশগুণ—না থাক্ ভট্‌চাজ আবার দাদার নিন্দে শুনে চট্‌বে—

জীবন। চটবো কেন? হক্ কথা বলবেন তার কি? দাদা আছেন দাদাই আছেন, অন্নদাতা তিনি নয় তো?—আমি তো কর্তার কাছে ভাইরএ কীর্ত্তি শুনাতে এসেছি—

রতন। কে ভট্‌চাজ যে, কি খপর? কি কীর্ত্তি দাদার?

জীবন। আজ্ঞে কর্তার শরীর কেমন?

রতন। আর কেমন। ভাঁটা পড়েছে, চড়া দেখা দিচ্ছে আর কি।

গেঁ। তবে সমুদ্দুরের জোয়ার ভাঁটা এই যা—কি বল পিসেবাবু?

রতন। দাদার কি কীর্ত্তি ভট্‌চাজ?

জীবন। বলুন না চৌধুরী মশাই—

ম। তুমিই বল না—

রতন। কি মুস্কিল। যে হয় বল না—সোজা কথা যা বুঝি—

ম। জমীদারী চালানো এক গুখোরী ব্যাপার—মান খাতির চক্ষু লজ্জা—

রতন। কি বিপদ। চৌধুরী কি দম্ বেশী দিয়েছ নাকি? সোজা কথাটা—

ম। কথাটা এই—

রতন। দু কথায় সেরে ফ্যালো—

ম। ভোলা মুখুয্যের ভাজ দেশে এসেছেন তা তো জানেন—

রতন। হুঁ—

ম। তাঁর কীর্ত্তির কথা শুনেন নি কি?

র। সেই মোছলমানি অনাচার কাণ্ড তো?

ম। আজ্ঞে—

। পুরোণো কাসুন্দী ঘাঁট্‌তে বস্‌লে নাকি ?

ম। এখন তিনি ভোলার মেয়ের ভাত উপলক্ষে গ্রামের বাউনদের নেমন্তন্ন করেছেন। ভট্‌চাজ্‌ বলে অনাচারের বাড়ী ম্লেচ্ছ কাণ্ড সেখেনে খেয়ে কি নিষ্ঠেবান বাউনরা জাত খোয়াবে ? সে কর্ত্তার নামে সকলকে নিষেধ করে—নেমন্তন্ন না নিতে—তাতে ভোলার ভাজ বল্লে কি,—'জমীদারবাবু সাহেব দারগাকে বাড়ীতে এনে গরু শুয়োর খাওয়ালেন সে বাড়ীতে বাউনদের খেতে জাত যায় না তো ? আর আমাদের বাড়ীতে খেলেই জাত-ধর্ম্ম যাবে ?

গোঁ। আস্‌পর্দ্ধাটা দেখুন। মন্দিরে শুয়ে দেবতার দিকে পা করা ?

রতন। হুঁ—

ম। সে যেন গেল—মেয়েমানুষের মুখের সাট নেই কিন্তু এসমাইল ব্যাটার গুষ্টীকে ডেকে এনে নিজের বাগান বাড়ীতে ঘর তুল্‌তে জমি দেওয়া হয়েছে, ঝাড়ের বাঁশ সুদ্ধু পাবে—এখন কথা হচ্ছে একজন প্রজা যদি আর একজন বদমাইস্‌কে আশ্রয় ভরসা দেয় তা হলে তো গাঁয়ে টেঁকা দুষ্কর হবে। জমিদারী চালানো, তাইতো বলি নিজের উপর কাজ— ধরার হল নিজের হাতে পায়ে নিজেকেই ছুরী বসাতে হয় আত্মীয়তা বন্ধুতা থাকে না।

জীবন। বিশেষ মেয়ে মানুষের আস্পর্দ্ধা। ওটা শুনলে বিশ্বেস করবেন না—গিন্নিকে সে দিন ঘাটে শুনিয়ে বল্‌লে 'জমীদার না কুমীর ?'

রতন। হুঁ—তারপর তর্কসিদ্ধান্ত কি করেছ ?

ম। বলনা ভট্‌চাজ।

জীবন। তিনি বলেছেন ঐ কথা আর কি ? আপনার জনের নামে বলা, পিসেবাবু যা বল্লে, নিজের পায়ে ছুরী মারা না বল্লেও নয়—অন্নদাতা সব চেয়ে নিকট বন্ধু, তাঁর হিত নাম আগে তো ? দাদা বলেন, জমীদার বাবু ম্লেচ্ছ কাণ্ড করলেন, কই তার পাত পাত্‌তে তো তোমাদের জাত যায় না ? কেউ না যায় আমি তো যাবই। ওঁর মত বাউনপণ্ডিতের কাছে যদি অনাচার করে লোক ভরসা আস্কারা পায় তাহলে লোক আমাদের মানবে কেন ? দেব-দ্বিজ আর দেশে থাকবে না দেখছি।

ম। আবার দেখুন। ঢোঁড়ারও বিষ দেখা দিয়েছে।

রতন। সোজা কথা বল চৌধুরী, সোজা কথা —

ম। তারামণি আমাদের রাঁধুনী সে যাবে যজ্ঞিবাড়ী রাঁধতে ; ভট্‌চাজ

তার পিসিকে মানা করতে গেল, যেন যেতে না দেয়—বুড়ী কি বল্লে হে ভট্‌চাজ ?—

জীবন। ওঃ বাবা তার আবার কি গর্জ্জন ? 'যাবে না ? খুব যাবে—ফলনা চক্রবর্ত্তীর মেয়ে কারুর তোয়াক্কা রাখে না।' বল্লাম চাকরী তা হলে ইঁদুর ঘরে থাকবে না—তাতে উত্তর হল—"নাই থাকলো, চাকরী ঢের জুটবে।"

ম। পেছুনে জোর না থাকলে ঐ অসহায় বুড়ীর মুখের এত জোর হয় ? সরকার কি বল ?

গেঁড়া। তাতো বটেই, পায়ের তলার বালি উপর হতে তাত না পেলে কি অত তাতে ?

রতন। (ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) আচ্ছা তোমরা এখন যাও—ওবেলা কথা হবে—চৌধুরী নবেকে কল্‌কে বদলাতে বলে যাও তো—

বাক্যব্যয় না করিয়া মহেশ ও জীবন উঠিয়া গেল। নবীন একটা প্রকাণ্ড তাওয়া দেওয়া কল্কে আনিয়া গুড়গুড়ীর উপরে চাপাইয়া দিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া জীবন ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিল, "কই পিসেবাবু কর্ত্তা তো তেমন খেয়াল করলেন না ?—মেজাজ্‌টা ঠিক নেই না কি ?"

ম। ওইতেই হবে হে ভশচাজ্। বারুদের বস্তায় কি জ্বালানি কাঠের খোঁচা দিতে হয়। টীকের ফুল্‌কিতেই কাজ হবে, তা ছাড়া জানইতো মাথাওলা উকীলরা আর্জ্জির তিন লাইন পড়েই কেস্ চট্ করে বুঝে ফ্যালে—না কি ?

জী। হ্যাঁ তার আর ভুল কি। রাজ্যি চালানো কি হরে নরে'র মাথার কাজ ?

ম। তাছাড়া মেজাজ অনুসারে কথা পাড়তে হয় হে। আমাদের কথাটা পাড়া হয়েছে বেটাইমে। লগ্ন মাফিক হয় নি—বাবুর মেজাজটা এখন ঝোঁকের ওপর আছে—এখন ঠিক খাপ খাবে না—

জী। তা হলে কখন আসবো ?

ম। বারুদ যদি শুকনো থেকে থাকে তবে কাজ হয়ে গিয়েছে না হলে ডাক্ পড়বে ব্যস্ত কি ? সে যাক্ ভোলার একটু গতিবিধি নজর কর তো ? ভাল কথা নয়—বাবা সব জিনিষে ভাগাভাগি চলে—ওতে—

জী। নজর? খুব রাখছি—সে ভয় নেই। দেবতার নৈবিদ্দিতে কি ভেড়ায় মুখ দিতে ভরসা করে?

ম। অভরসাই কি ভশচাজ্। কথাই আছে আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকোয়—

জী। ঐ পর্য্যন্ত। চুলকোনিই সার—

ম। আচ্ছা তা হলে ওবেলা এস, আজ রাত্রিতে বিন্ধ্যেশ্বরী দেবীর প্রসাদ ভোজন—

কাছারী বাড়ির বাহিরে আসিয়া জীবন চলিয়া গেল। মহেশ অন্দরাভিমুখে ফিরিল।

বাধা দূর হইলে গেঁড়া সরকার স্বস্তি বোধ করিল। সে আবার পুরাণো কথার জের টানিয়া আরম্ভ করিল—

"হ্যাঁ বলছিলাম কি এই যে গাজনতলার গজেন্দ্র টহলদার, আর মকুন্দ-গঞ্জের ইচ্ছারঞ্জন পাকড়াশী এরা যদি রাজা হতে পারলে তা হলে আপনি হবেন না কেন? আসল কথা সরকার বাহাদুরকে একটু জানাতে হবে যে আপনি খুব একজন প্রজারঞ্জন জমীদার, নিজের নামের ঢেঁট্রা না পিটলে কালতে মোক্ষ নেই রায় মশাই—প্রজারা জানলে কি হবে? সরকার হ'ল রাজার রাজা, তাঁকে জানাতে হবে—আজকাল কর্ত্তা বিজ্ঞাপনে পয়সাও বটে মান-খাতিরও বটে—

রতন। সেইটেরই তো পন্থা—করতে হবে—

গেঁ। সোজা পন্থা ওতো পড়ে আছেই একেবারে সরাসর বাঁধানো রাস্তা এ কি মোগলপাঠানি আমল রায় মোশাই? সরকারের চোখ কাণ জিভ সব হল মাজিষ্টর, দারগা, কমিশনর, নন্দীকে খুসী না কল্লে যেমন কৈলেসে যাওয়া যায় না—তেমনি জেলার মাজিষ্টরকে খুসি না কল্লে—

রতন। তার তো খুবই চেষ্টা করছি। আচ্ছা গাজনতলার গজপতি ব্যাটা কি এমন করেছে যে—আমি তো তবু ইস্কুল হাঁসপাতাল -

গেঁ। তিনি? তা খুব চাল্ চেলেছিল, মাজিষ্টর রাশভেল সাহেবের মেম্ বিলেত গেল যখন, তখন তার রাহাখরচ ফাষ্ট কেলাসের রাহাখরচ দিলে আবার আসবারও দিলে, তা ছাড়া ফি সিজনে দারজিলিং এর বাড়ীটা তো রাশভেল সাহেব ভোগ করছে—ইস্কুল হাঁসপাতালে আর কিচ্ছু হয় না রায় মশাই—তা না হলে গজপতি টহলদার তো বোকা আর বদমাইসের এক

শেষ! এমন দিন যায় না যে প্রজাদের চখের জলে সে তর্পন্ না করে—গাঁয়ের লোকে ধরলে হুজুর একটা ইস্কুল করে দিন, ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখুক, তা যেমনি রাজা তস্ত মন্ত্রী তেমনি, ওর ম্যানেজার পরামর্শ দিলে ছোট লোকেরা লেখা পড়া শিখলে বড় বাড় বেড়ে ওঠে। দেশের রাজা জমীদারদের মানে না, সরকারকে পর্য্যন্ত চোখ রাঙ্গায়? ও-সব পথে সুবিধে নেই—"

গজেন্দ্রও বুঝলেন—

স্বতন। কুতকটা তাইতো বটে, দেখনা চখের ওপর এস্‌মাইল ব্যাটার চোদ্দ পুরুষ ঘরামি করে আর বাবুর্চ্চিগিরি করে কাটালে আজ ব্যাটা দুপাতা বই পড়ে আর কলকাতায় হোটেল খুলে একেবারে ডোন্-কেয়ারী মেজাজ ধরে বসেছে।

গং। দেখছিনি কর্ত্তা? খুব দেখছি আর ভাবছি হলো কি? আসল কথা কি কর্ত্তা দুধ খেতে ধবলেই যে সাপের বিষ নষ্ট হবে, তা হয়না,—ইস্কুল ফিস্‌কুল করতে যাওয়া ভুল কর্ত্তা—ও পথে সুবিধে নেই, স্কুল তুলে দেওয়াই ভাল—

র। আমিও তাই ভাবি। ইটখোলার সেই জমিটা নিয়ে মনে পড়ে, হালদারদের সঙ্গে মামলা? বৃন্দাবন মড়লকে সাক্ষি দিতে বল্লাম ব্যাটা রাজি হলো। তার ছেলে সে নাকি কালেজে পড়া ছেলে—বাপকে বল্লে মিথ্যেসাক্ষী দেবেন কি বাবা? মড়ল বল্লে কি করি বাবা, জমীদার রাজা!—ছেলে বল্লে, "তাতে কি? হলেই বা জমীদার তার জন্যে অধর্ম্ম করতে হবে?"

গং। বলেন কি কর্ত্তা?

র। এ দেখেও ভবানী বাবাজীর ঝোঁক আরো স্কুল খোলা হক। যেটা আছে সেটাকে ভাল করা হক—ড্যান্ ড্যান্—

গং। অর্থাৎ চাষা ভুষোদের ল্যাখাপড়া শিখিয়ে মাথায় তুলতে হবে!

র! বোঝ সরকার। আমার অবর্ত্তমানে জমিদারীর যা অবস্থা হবে তা দিব্য চোখে দেখছি—

গং। মধুসূদন রক্ষা করুন। কর্ত্তা আছেন যাই তাই আমাদের মত পক্ষী পতঙ্গ বেহৎ বটবিক্ষের ডালে আশ্রয় পেয়েছি। এই সব গরমমেজাজের নতুন ঢং এর মনিবের পাল্লায় পড়লে—তবে তদ্দিন টিক্‌লেতো এ দেহ! হরি যা কর।

দেওয়াল—ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল।

রতন। কটা হে?

গেঁ। আজ্ঞে কর্ত্তা দ্বিপ্রহর বাজ্‌লো—উঠি তা হলে—

র। হ্যাঁ। ভীমেকে ডেকে দিয়ে যাও—

ভ্রমর নিন্দিত কৃষ্ণকায় ভীমমূর্ত্তি ভীমে তাহার কাঁধে তোয়ালে ও দুহাতে দুটা দুরকম সুগন্ধি তৈলপূর্ণ বাটী লইয়া বাবুর তৈলমর্দ্দন পর্ব্ব আরম্ভ করিল। বাবু নলটা ফেলিয়া দিয়া একটা বিরাট হাই তুলিয়া চিৎ হইয়া পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। বিপুল দোদুল্যমান লোমশ ভূড়ীটা আবেগভরে কিয়ৎক্ষণ কাঁপিয়া সাম্যলাভ করিল। ভীমচন্দ্র বাবুর গৌরবর্ণ মাংসল স্থূল পা দুখানা নিজ আবলুস্ নিন্দিত উরু উপাধানে তুলিয়া লইয়া নানাপ্রকার সশব্দ কসরৎ যোগে তৈল মর্দ্দন আরম্ভ করিল।

গেঁড়া সরকার চোখের সুতাবাঁধা চসমাটা খুলিয়া ছেড়া খাপে পুরিতে ব্যস্ত ছিল। রতন রায় তাহাকে বলিলেন—"ওহে সরকার, তর্কসিদ্ধান্তকে একবার আমার কাছে ওবেলা আস্‌তে বলতো—

গেঁ। যে আজ্ঞা সঙ্গে করেই না হয় আন্‌বো এখন এলে হয়। যে বদ্‌মেজাজী বাউন, ঠাকুর দেবতাকেই বড় পোঁছে। কর্ত্তামুখে উত্তরে কোনো মন্তব্য না শুনিতে পাইয়া সরকার গৃহত্যাগ করিল।

(ক্রমশঃ)

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রিয়ব্রতের কথা

হিতোপদেশে সেই মূষিক-সিংহের গল্পটা আজ মনে পড়ছে। ঋষি তাঁর পোষা ইঁদুরটিকে বেড়াল করলেন, বাঘ করলেন, সিংহ করলেন, কিন্তু তার তা সইল না। শেষে যে ইঁদুর সেই ইঁদুরই তাকে হ'তে হল। কেন? কেউ বলবেন নিয়তি, কেউ বলবেন বোকামী, কেউ বলবেন দুর্ভাগ্য, কেউ বলবেন দুষ্কর্ম্ম। কিন্তু আমি বলব, ওসবের কিছুই নয়, ইঁদুরের পরম সৌভাগ্য যে সে

আবার ইঁদুর হতে পেয়েছিল। যা মিথ্যে, যা সে নয়, সে যে তা থাকতে পারেনি এ তার পক্ষে শাপ নয়, বর। মুনিবর তাকে পুনর্মূষিক করে পরম নিস্ফলতা হ'তে বাঁচিয়েছিলেন। সত্যিকার সিংহের পক্ষে মূষিক হওয়াটা যেমন দুর্ঘটনা, সত্যিকার মূষিকের পক্ষে সিংহ হওয়াও তেমনি দুর্ঘটনা। যা সহজগতি তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে যে দিকেই চালাও না—তা' সে স্বর্গের দিকই হ'ক আর নরকের দিকেই হ'ক, সে গতিতে মঙ্গল নেই, স্বস্তি নেই, আনন্দ নেই।

এ কথা কেউ মানবে না, তা জানি। এই অসহজের গুরুভার ধার্ম্মিকের জগতে মানাতে যাওয়া যা, আর আমার মত বীরের পক্ষে, গন্ধমাদন তুলতে যাওয়াও তাই। বোঝাতে পারব না তা জানি, তবু বলতে হবে, কারণ সেটাও আমার স্বভাব। এতদিন ধরে বনে বাদাড়ে, অনাহারে অনিদ্রায় যে সত্যকে জীবনের মধ্যে ধরতে পেরেছি, তাকে না প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজ নয়। আমি সহজের উপাসক, সহজের মন্ত্রদ্রষ্টা, সহজের ঋষি এবং সহজের কবি।

এই যে কথাটা রোদে পুড়ে, আগুনে ভাজা হয়ে, জলে গলে, শীতে জমাট হয়ে প্রাণের মধ্যে সত্য বলে ধরা দিয়েছে এ কথা আমায় বলতেই হবে, নইলে আমার অস্তিত্বের কোন অর্থ থাকবে না। কেউ নিরর্থক হ'তে চায় না, পারেও না—আমিও চাই না, পারবও না।

আমার বলবার কথা কি? আমি এই বলতে চাই যে, যে ফুল গাঁদাই হবে তাকে গাঁদা না হতে দিয়ে গোলাপ করে তুলতে চেষ্টা করলে, সে ফুল গোলাপ ত' হ'তে পারেই না, কিন্তু ভাল গাঁদা হবার যে আশাটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। মঙ্গলেচ্ছু মানুষকে তাই আপনার অন্তরে প্রবেশ করে দেখতে হবে যে কি কারণে এবং কি হবার জন্য সে জন্মেছে। আত্মানং বিদ্ধি, এইটাই হচ্ছে চরম উপদেশ। আগে আপনাকে জান যে তুমি কি হতে জন্মেছ, এবং কোন্ দিকে তোমার সহজ গতি। তার পর সেই গতিকে ঠিক করে জেনে সেই গতি যাতে বাড়ে, যাতে সুন্দর এবং সুস্পষ্ট হয় তাই কর, তাহলেই তোমার পরমার্থ লাভ হবে, কারণ তখনি তুমি সার্থকতার দিকে চলতে পারবে। এই স্বরূপাভিমুখী গতিতেই আনন্দ,—এবং এই গতিকে বাধা দেওয়াই দুঃখ। অন্য যত দুঃখ আছে সেগুলা এর তুলনায় দুঃখই নয়। সেগুলা সুখের অপর পিঠ। সত্যি দুঃখ হচ্ছে অজ্ঞান।

আত্মার এই অবাধগতিকে বাধা দেওয়াই মানুষের পরম অজ্ঞান। সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, লোভ, অহঙ্কার এই সমস্ত বড় বড় বাধা এই অবাধগতিকে ফেনিলোচ্ছল করে তুলছে। তাই মনে হচ্ছে যে মানুষ দুঃখ পাচ্ছে—নইলে অস্তিত্বই যে আনন্দের, তাতে সুখ-দুঃখ আসবে কোথা হ'তে? সুখও যেমন একটা তৈরী বস্তু, দুঃখও একটা তেমনি তৈরী জিনিষ। সে হয়ত পরমার্থতঃ কোথাও নেই, কোথাও সে কখনও ছিল না। কিন্তু হয়ত দিক্‌ভ্রমের মত কি এক অজ্ঞাত কারণে তাকে জগতের মধ্যে মানুষই জন্ম দিয়েছে। সে নৈলে তার চলে না, কারণ সুখ পেতে হলেই দুঃখ চাই।

বহু পূর্ব্বে একবার একজনের কাছে লিখে দিয়েছিলাম যে আমি দুঃখের লোভেই সংসার হতে বেরিয়ে পড়েছিলাম, সুখের লোভে নয়। কিন্তু সংসারের বাইরে বেরিয়ে কেবল আনন্দকেই দেখতে পেয়েছি, দুঃখ কোথাও নেই। দুঃখ কেবল আছে মানুষের মনে। সে বাইরে কোথাও নেই এবং কেউ তাকে খুঁজে পায় না। যদি তাকে পেতে হয় ত' সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির বাইরে গিয়ে সৃষ্টি করা যায় না—তাই যা সৃষ্টির জায়গা, যাকে মানুষ সংসার বলে বা জগৎ বলে, তারই মধ্যে না ঢুকলে দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়া যায় না বলে সংসারেই ফিরতে হ'ল। এই দুঃখকে না চিনলে না পেলে সুখকেও পাবার জো নেই এবং সুখ-দুঃখ না থাকলে এমন কি চৈতন্যই থাকে কিনা সন্দেহ—তাই আবার সেই দুঃখের লোভেই সংসারে ফিরে এলাম।

কিন্তু একথা লোককে বিশ্বাস করান কঠিন যে, যে-লোক ১৫-১৬ বৎসর গহন গিরিগুহার স্বচ্ছন্দ অটনের পরম সুখ অনুভব করেছে, সে কি লোভে আবার সংসারে ফিরে এল? সংসারে লোভের বস্তু কি আছে, অন্ততঃ আমার মত স্বাধীনতার সুখ যে অনুভব করেছে তার সংসারে ফিরে আসা নিশ্চয়ই বোকামী, নিশ্চয়ই অধঃপতন। অধঃপতন? তা হবে।—কিন্তু না এসেও যে আমি পারলাম না, আমার চুলের মুঠী ধরে যে নিয়ে এল। যাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দই যে বল্লে, "এই যা একলা হয়ে দেখলি তাই শেষ নয়, এর পরেও আছে।"

এর পর কি আছে? আপনাকে কুড়িয়ে গুটিয়ে আনার আনন্দের পর আপনাকে ছড়ানর আনন্দ আছে—আপনাকে পরের মধ্যে অনুভব করার আনন্দ আছে। এবং তার পরে যা আছে সে হচ্ছে পরকে আপনার মধ্যে অনুভব। এই তিনটাই হচ্ছে এই মানুষের দেহ ধারণের ত্রিবিধ আনন্দ। এর

পরে কি আছে জানিনে—কিন্তু মানুষের জীবনকে স্বীকার করে আত্মা এই ত্রিবিধ আনন্দ অনুভব না করলে বুঝতে হবে পূর্ণ আনন্দ এ জীবনে পেল না, অন্ততঃ আমি এইটুকু সত্য ধরতে পেরেছি। আমি ধরতে পেরেছি যে আনন্দই আমাকে চুপ করে থাকতে দেবে না। আমাকে ঠেলে নিয়ে সে একবার গুহাহিত করবে, আবার যখন তার দরকার হবে তখনি আমায় সেই গুহা হ'তে বার করে হাটের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেবে।

জানি যে, পরের মধ্যে আপনাকে, এবং আপনার মধ্যে পরকে অনুভবের সঙ্গে জগতে যাকে দুঃখ বলে, ত্রিবিধ তাপ বলে, তাই আছে। কিন্তু আনন্দকে যখন পেতেই হবে, আনন্দই যখন আমার স্বরূপ তখন সেই আনন্দের জন্ত যা আসবে তাকেই নিতে হবে। না নিয়ে যে উপায় নেই, কারণ এই সুখ আর দুঃখের, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের, পাপ এবং পুণ্যের, জ্ঞান এবং অজ্ঞানের দোলায় সব রকম দ্বন্দ্বের দোলাতেই আনন্দ দুলছেন এবং সেই দুলে দুলেই আপনাকে অনুভব করছেন। মানুষের দৈনিক জীবনেও এই সত্য চির পরিস্ফুট,—সে দিনের বেলায় নানা কাজে নানা সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে ছড়াচ্ছে, তার পর রাত্রি হলেই আপনাকে গুটিয়ে নিদ্রার মধ্যে গুহাহিত হচ্চে। এই দোলাই তার স্বরূপ। এই দোলাই সেই পরম দোলের ছায়া—যে দোলে পরমাত্মা একবার অহরাগমে বহু হয়ে বিকাশ লাভ করছেন, এবং রাত্র্যাগমে সমস্ত বহুত্ব নিজের মধ্যে লয় করে গুহাহিত গহ্বরেষ্ট হচ্ছেন। আনন্দস্বরূপ আত্মার ইহাই দোললীলা। সুখ দুঃখ একা একা সত্য নয়—কেবল আনন্দের দুই পীঠ বলে দুই দিক তারই সত্যের মধ্যে সত্য।

আমিও ত আত্মাই, আমি কি করে নিজের স্বরূপকে উল্টে দেব? আমার সব রকম সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতেই হবে। কেউ যদি বলে যে জগতে সুখ একটা মিথ্যা সৃষ্টি, আমি তা'হলে বলবো যে দুঃখও তা'হলে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা সৃষ্টি। যদি বল সুখ মানুষকে টানে; আমি বলব দুঃখও তা হ'লে মানুষকে টানে, কারণ দুঃখ ছাড়া সুখ নেই, সুখ ছাড়া দুঃখ নেই।

হয়তো কেউ এ কথা মানবে না, কিন্তু আমার কথা যে সত্য তার প্রকাণ্ড প্রমাণ এবং উদাহরণ আমি নিজে। নইলে সেই কত বৎসর আগে যখন নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে এনে হিমালয়ের গুহার মধ্যে সমাধিস্থ করে এনেছিলাম, যখন মনে হয়েছিল যে আর আমার কোনো বাসনা নেই, কোনো সুখ নেই, কোনো দুঃখ নেই, আমি কেবল আমারি আর কারু নই, ঠিক সেই সময়ই

মানুষ মানুষ করে ছুটে বেরিয়ে ছিলাম কেন? ঠিক সেই সময় মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করবার জন্য কুম্ভ মেলার হাটের মধ্যে—সেই. ত্রিবেণীর মোহনায় উপস্থিত হয়েছিলাম কেন? আবার আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য, একটি নির্দ্দোষ নির্ব্বোধ মানুষকে বিবাহ করলামই বা কেন?

আমার ত' কিছুরই প্রয়োজন ছিল না, তবে কেন সেদিনকার সেই পরম অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছিলাম? কে বাধ্য করলে? কে আমার চিরদিনের মুক্তিলোভী প্রাণকে বন্ধনলোভী করে দিয়েছিল? কে আমার প্রাণে ঐ অত বড় একটা ভয়ঙ্কর জনসংঘের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার লোভ জন্মিয়ে দিলে? সে যদি আমার নিজেরই আনন্দ না হবে ত' কে? আপনাকে ভুলে পরকে অনুভব করার মধ্যে যে প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে তা যে আমার নিজেরই আকর্ষণ নইলে কেন সেই ভুল আমার হল? সেই ভুল করা, সেই মায়াকে স্বীকার কবাও আত্মার সহজ ভাব, নইলে এ ভুল হ'ত না। ভুল? আচ্ছা বেশ ভুলই, কিন্তু এ ভুল করতেই হবে, নইলে আনন্দই নেই।

আর এই ভুল করতে হবে বলেই দুঃখকে স্বীকার করতে হবে, তাই মানুষ আবায় টেনেছে, মানুষের সংসার আমায় ডেকেছে, মানুষের দুঃখ নূতন মূর্ত্তিতে আবার আমায় আকর্ষণ করেছে। দুঃখকে অনুভব কর্ত্তে আবার আমি ফিরলাম, কারণ সে যদি বা আমায় ছাড়তে চায় আমি যে তাকে ছাড়তে পারি না। ছাডলে বুঝি আমার অস্তিত্বই থাকবে না।

তাই সব রকম দুঃখকে স্বীকার করে পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সব রকম দ্বন্দ্বকে স্বীকার করে আমি আবার এলাম কারণ আনন্দ দ্বন্দ্বকে বাদ দিয়ে অন্ততঃ আমার কাছে নিজেকে জানাতে পারলেন না। আমি মানুষকে চাই, তা' সে যতই ছোট হোক, যতই অজ্ঞানে দুঃখে মোহে ডুবে থাক, তাকে চাই। নইলে আমার এই একাকীত্বের হাহাকার থামছে না। আমি এক তাই আমার মধ্যে অপরকে চাই বহুকে চাই সর্ব্বকে চাই। কে আমার এই পথের গুরু হবে তাকেই খুঁজতে আবার বেরুলাম। এ পথের গুরু এ দিকে নেই, কারণ এ দিক একের দিক। যে পথে আমি বহু হয়ে বিশ্ব হয়ে ক্রমাগত বিকাশ পাচ্ছি, সেই পথে সেই জগৎপথে চঞ্চলের পথে গতির পথে চলবার জন্য ফিরে এলাম। দেখি গুরু মেলে কি না, সঙ্গী মেলে কি না।

২

কেন ফিরেছি তা যতটা পারি বল্লাম, কিন্তু কি করে ফিরলাম তাও কি বলতে হবে? সে তো অতি সামান্য একটা কথা, কিন্তু সেটাও কি বলার দরকার? বেশ ভাই তাও বলছি। ঘটনা সামান্য বটে, কিন্তু আমার পক্ষে ত' সামান্য নয়, তাই সে কথা বলাই উচিত।

ঘটনাটা এই,—দশ বৎসর ধরে আপনার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি, অর্থাৎ যে কাজটা ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছিলাম তারই স্মৃতি আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। কিন্তু এই ভয়ের হাত হতে কিছুতেই নিস্তার পাই নি, কৃচ্ছে নয়, ব্রতে ধ্যানে নয়, সমাধিতেও নয় কারণ এ যে আমার একেবারে অন্তরের অন্তরে স্থান নিয়েছিল, আমার অস্তিত্বের পীঠে পীঠ ঠেকিয়ে বসেছিল। এর হাত হতে ত্রাণ পাব কি করে? কিন্তু এই ভয়ের হাত হতে তখনি নিস্তার পেলাম যখন একে সত্য বলে স্বীকার করলাম, যখন সেই ভয়কে অভয়ের মধ্যে টেনে এনে ফেল্লাম তখনি বাঁচলাম। যখন বুঝলাম যে আমি কেবল আমার নই, যাকে পর বলে তারও বটে, তখনি আমার এই ভয় হ'তে মুক্তিলাভ হল। তখন ওঁ পরতত্ত্বায় স্বাহা বলে বেরিয়ে পড়লাম। অন্তর হ'তে আবার বাইরের দিকে হারাণো পথ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘটনাটা অতি ছোট,—একদিন সমস্ত দিন না খেয়ে দেয়ে সমাহিত হয়ে এক গাছতলায় বসে আছি, সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ তাল পাকিয়ে একটা জমাট বর্ত্তমান হয়ে বসে আছি। বহুদিনের অনাহার অনিদ্রা যখন আমার প্রাণকে প্রায় শুকিয়ে ধুনির আঙ্রার মত করছে, যখন সমস্ত দেহটা চিমটের মত কেবল ঝন্ ঝন্ ঠন্ ঠন্ কর্‌ছিল, সমস্ত জগৎটা একটা সাহারার মত চক চকে একত্বে পরিণত হয়ে ধু ধু করছিল, ঠিক সেই সময়ে একটী ছোট্ট রোগা শিশু আমার অজ্ঞাতে ধুনির কাছে এসে বসেছিল। কতক্ষণ বসেছিল জানি না, কিন্তু যখন তাকে দেখতে পেলাম তখন অবজ্ঞায় তার দিকে চেয়েও চাইলাম না।—সে কিছুক্ষণ ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চাইলে, শেষে হঠাৎ কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে "মহারাজ, মর ভূখাহু!" মহারাজ! আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আওয়াজটা যে আমার কোথায় গিয়ে পৌছল তা জানি নে, কিন্তু হঠাৎ মনে হল যেন আমার মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে। এক নিমেষে সাহারায় সিরকো উঠল, বালি উড়ল, আঁধার হয়ে এল, সমস্ত অস্তিত্বটা হঠাৎ এমন ঝাকানি খেয়ে

উল্টে পাল্টে গেল যে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ক্ষিদে? আমার ক্ষিদে পেয়েছে? তাইত, এযে বিশ্বগ্রাসী ক্ষিদে। আমি যে অগস্তের মত সারা সমুদ্রটাই এক-টানে পান করে ফেলতে পারি, আমার এমনি তেষ্টা পেয়েছে। গরুড়ের মত গ্রাম নগর গিলে ফেলতে পারি এমনি ক্ষিদে পেয়েছে।

কিন্তু ওযে আমায় ডাকলে মহারাজ বলে!—মহারাজ!—আমি মহারাজ? আর একটা ছোট শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির মত একটুকরো রুটীও আমার ঝুলিতে নেই? তবে আমি কিসের মহারাজ?

আমি চট্‌ করে উঠে ছেলেটাকে দুহাতে ঝাপটে তুলে ছুটলাম। ছুটে ছুটে একদল সন্ন্যাসীর আশ্রমে পৌছে ছেলেটাকে নামিয়ে বল্লাম—"ময় ভুখা হু।" তারা আমায় খেতে দিলে, কিন্তু সে আহার্য্য আমি ছেলেটাকে দিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলাম। সন্ন্যাসীরা কিন্তু হাসতে লাগল, বলে "মায়া—মায়া, তুম্‌ মায়ামে গির গিয়ে হো।" মায়ায় পড়িছি? হবে—কিন্তু ওরে—এ মায়ায় এত আনন্দ! এ ভ্রমে এত সুখ! শিশু খাচ্ছে আর তার প্রতি গ্রাসের সঙ্গে আমার অনুভব হচ্ছিল "আমি তৃপ্ত হলাম—আমি আনন্দ পেলাম—আমি বাঁচলাম।" এই কি ভ্রম? একেই আমার এত ভয়।

যাক, শিশু কতদিন বুভুক্ষিত ছিল তা জানিনে, কিন্তু সে এত খেয়ে ফেল্লে যে তার পর দিনই তার অসুখ করলে। তার সেবা করতে করতে কত দিন কেটে গেল, কিন্তু সে যত কষ্ট যত দুঃখ ভোগ করতে লাগল ততই যেন আমার মনে হল যে ঐ শিশু দেহে আমিই সব দুঃখ ভোগ করছি। তার সমস্ত দুঃখের মধ্যে আমি আমাকে অনুভব করে ভয়ঙ্কর সুখের সঙ্গে মধুর ভীষণ দুঃখকে ভোগ করতে লাগলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল, আমি এই মরণোন্মুখ শিশুর মধ্যেই বেঁচে গেলাম, এর কষ্টের মধ্যেই আমি বেঁচে গেলাম, এর কাতর ক্রন্দনের মধ্যেই আমি বেঁচে গেলাম।

শিশু বাঁচলে না—কিন্তু তার প্রাণ দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে গেল। আমিও ছুটে পালিয়ে এলাম—আমায় বাঁচতেই হবে। দুঃখকে প্রাণের মধ্যে স্থান দিলে আমায় বাঁচতেই হবে। ওগো ভ্রম, ওরে অজ্ঞান, ওরে আমার চিরন্তন ভুল তোকে কোন এক অকাল বসন্তের দিনে আমার তৃতীয় চক্ষের আগুনে ভস্ম করেছিলাম মনে নেই। কিন্তু কে জানত যে সেই ভস্ম আমার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে গায়েই ছিল। তারপর কোন সকাল কল্কোদয়ে সেই

ছাই হতে আবার তুই মরুর পাখী ফিংসের মত জেগে উঠেছিস্। শিশুর নবপ্রাণ আমার শুষ্ক আত্মাকে রসে রসিয়ে, ফুলে ফুটিয়ে, অশ্রুতে ভিজিয়ে বাঁচিয়ে দিলে। আমি পালিয়ে এলাম। মরণাধিক মরণ-সাগর হ'তে জন্ম-মৃত্যুর কোমল দোলায়মান রসসাগরের তীরে আবার এলাম। তোমরা ভাই গালই দাও আর জটা মুকুট মুড়িয়েই দাও—আমি তবু বলব, আমি তোমাদেরই ভাই, তোমাদেরই।

৩

'বৈরাগ্য যোগ কঠিন উধ অব না করব হো।' সমস্ত সংসার গেয়ে উঠছে। আমি গাইব না।—আমিও প্রাণপণে গাইতে গাইতে কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে পালিয়ে এলাম, কিন্তু কোথায়? সেই যেখান থেকে বেরিয়ে ছিলাম, সেই আমার আদি—জন্মস্থানে। সেই যেখান হতে কোন এক বসন্ত প্রভাতে বসন্তের গৈরিক বসন ধারণ করে বেরিয়ে পড়ে মনে করেছিলাম জীবনে ফাল্গুন চৈত্রের শেষ হল, এইবার বৈশাখের প্রচণ্ড আলো ফুটে উঠবে, সেই আমার গ্রামে সেই আমার জীবনের আরম্ভ স্থানেই পৌছিলাম। যেখানে পরম মায়াবিনীর কাছে বিদ্রোহ করি সেই থানেই প্রায়শ্চিত্ত করতে ছুটে এলাম। আমি ত' জানতাম না যে সেইদিনকার সেই বৈরাগ্যের বসনের লাল রংটার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত আমার পাছু নিয়েছিল, পলাশ শিমুল কিংশুক আমার গায়ে লেগে গিয়েছিল, অশোক গোপনে গোপনে আমার প্রাণের তলাটা রাঙিয়ে রেখেছিল। পদ্ম আমার হৃদয়দহরে একেবারে শত পাপড়িতে ফুটে চুপচাপ বসেছিল। তাদের দেখেও দেখিনি, অবজ্ঞা করে অবহেলা করে কেবলি পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি; কিন্তু আজ তারা সময় পেয়ে একেবারে অন্তর হতে বেরিয়ে আমার সারা পথটা টিটকারী দিতে দিতে দুয়ো দুয়ো করতে করতে এসেছে। আমি গ্রামে ঢুকলাম, সেই রকম এক বসন্ত প্রভাতে, তেমনি এক উষার মধুর আলোকে, তেমনি এক "পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা" পথ দিয়ে।

গ্রামে ঢুকলাম, কিন্তু হায় সবই চেনা তবু এমনি অচেনা হয়ে গেছে যে, সবাই সত্যানন্দ সন্ন্যাসীকেই প্রণাম করলে, আসন দিলে তবু তাদের প্রিয়-ব্রতকে ডেকে নিলে না। সন্ন্যাসী আদর পেলে পূজা পেলে, কিন্তু তাদের বাল্যের প্রিয়ব্রত বুভুক্ষিতই থেকে গেল। গ্রামে বন্ধুদের কাছ থেকে মায়ের কাছে গেলাম। গিয়ে কি দেখলাম? দেখলাম মাও আমার অচেনা হয়ে

গিয়েছেন, নতুন সংসার পেতে নতুন মানুষদের নিয়ে নতুন হয়ে বসে আছেন। যে তাঁর দেহ হতে দেহ, প্রাণ হতে প্রাণ নিয়ে তাঁরই কোলে বড় হয়েছিল সে আজ তাঁর কেউ নয়। আর যাঁরা কেউ নয় তাঁরাই আজ তাঁর সব। তিনি তাদের নিয়ে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছেন। আমি পরিচয় দিলাম, কিন্তু সে পরিচয় তাঁর চোখ দেখে বুঝলাম বিশ্বাস হল না। মনে করলেন, কে বুঝি তাঁকে ঠকাতে এসেছে।

কিন্তু আমি ত' ঠকাতে আসিনি, তাই দু'দিন তাঁর কাছে রইলাম। তিনিও কি জানি কেন আমায় ধরে রাখলেন, কিন্তু তাতে যাঁরা আমার সেই পরিত্যক্ত বিষয় ভোগ করছিলেন, তাঁদের ভয় হল। তাঁরা শত্রুতা আরম্ভ করলেন। এবং সেই সঙ্গে সংসারের চিরন্তন সুখ আরম্ভ হল।

এতে কার দোষ দেব? কারু নয়, তাঁদেরও নয়, আমারও নয়। তবে কার? কার জানিনে, তবু এই সংসার। এবং একেই ভক্তির সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে—কারণ এই এর স্বরূপের এক দিক। কিন্তু আর দিকও আছে। কি? তাও বলছি।

আমার আত্মীয়েরা যখন দেখলেন যে বেটা ভক্ত বিটলে সন্ন্যাসী কিছুতেই যায় না, দুবেলা বসে ভাতের কাঁড়ী লুটছে এবং মাও যেন একটু তার দিকে ঢলে পড়বার মত হয়েছেন, তখন গালিগালাজ হ'তে লাঠি সোটা পর্য্যন্ত বেরুল। মা তখন ব্যস্ত হয়ে আমায় পাখা দিয়ে আগলাতে লাগলেন।

কিন্তু আমিও নাছোড়বন্দা—স্থানুর ন্যায় অচল হয়ে বসে, বল্লাম, "আমি কিছু চাই নে, শুধু এই বারান্দাটায় পড়ে থাকতে চাই তাও কি তোমরা দেবে না?" কিন্তু আত্মীয় স্বজন থেকে আরম্ভ করে পাড়াপড়সীরা পর্য্যন্ত এমন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করলে যে, মা শেষে ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "বাছা, তুমি যাও। তোমায় দেখে বড্ড মায়া হচ্চে, কিন্তু মায়া হচ্চে বলে ত' তোমায় মরতে দিতে পারব না, তুমি যাও।"

আমি বল্লাম, "আমি তোমার প্রিয়ব্রত!!" মা কেঁদে বল্লেন, "আমার তা বিশ্বাস হচ্চে বাবা, কিন্তু এরা যে তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।"

আমি কেঁদে বল্লাম, "আমি ত' কিছু চাইনে, শুধু তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকতে চাই।"

মা বল্লেন, "এরা যে তা বিশ্বাস করছে না বাবা।" আমি বল্লাম, "তুমি ত' বিশ্বাস করেছ মা—তোমায় এত দিনকার এত কথা বল্লাম, যে সব কথা

কেউ জানতে পারে না জানেও না তাও বল্লাম, তবু কি তুমি আমায় ছেলে বলে মানবে না—বিশ্বাস করে কোলে স্থান দেবে না?" মা বল্লেন, "ওরা যে বলে তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মনের কথা জানতে পার। তুমি আমায় ভুলিয়ে এই বিষয় আশয় ভোগ করবার জন্য এই সব বলছ।"

হায় রে! আমার সন্ন্যাসীত্বই আমার চির বিরোধী। যে স্থান আমার সহজই ছিল, সেই স্থানই আমার পক্ষে এত অসহজ এত দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ওগো লীলাময়ী, এ তোর কি লীলা গো!

যাক আমি তবুও উঠলাম না, কেবল কাতর ভাবে জানিয়ে দিলাম আমি প্রিয়ব্রত। কিন্তু কি জানি কেন কেউ সে কথা কিছুতেই মানলে না। শেষে একদিন তারা পরামর্শ করে আমার জটা মুড়িয়ে দিলে, গেরুয়া কেড়ে নিলে, চিমটে ভেঙ্গে দিয়ে একটা ছেঁড়া কাঁথা ঘাড়ে দিয়ে মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে বল্লে, "চেয়ে দেখুন দেখি এ কি আপনার সেই প্রিয়ব্রত।"

মা চেয়ে চেয়ে বল্লেন—"সে ত' এত ফর্সা ছিল না—তার মুখ ত' এত চকচকে ছিল না! তার কালো কালো কোঁকড়া চুল ছিল। কিন্তু কপালের ঐ দাগটা ওটা যেন—"

মাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমার আত্মীয়গণ আমার গলা টিপে বাড়ীর বার করে দিলেন।

আমি বাইরে এসে শুনলাম, মা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে বলছেন, "ওরে তোরা ওকে কিছু বলিসনে, ও যে আমার প্রিয়র নাম নিয়ে এসেছে। ওরে তোরা মারিসনে—"

আমার প্রাণ ফেটে শব্দ উঠল "মা—মা—মা"। মাও আমার ছুটে বেরিয়ে এসে সেই আত্মীয়দের হাত ছাড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে, সেই আত্মীয়দের বল্লাম, "তোমরা সব নাও—কিন্তু মাকে দাও। আমি আর কিছু চাইনে।"

আমার এই কথার উত্তরে যা শুনলাম, তা আর বলে কি করব? এই ত সংসার! এই ত সুখে-দুঃখে, ন্যায় অন্যায়ে ভরা সংসার। এই দুঃখে না পড়লে কি মাকে পেতাম, মাকে বুঝতাম। মা তাঁর ছেলের নামটুকুকেও এত ভাল-বাসেন যে সেই নামটুকুর জন্যে আমার সঙ্গে চলে আসতে চাইলেন। তিনি বল্লেন, "চল বাবা তোমার সঙ্গে কাশী গয়া বৃন্দাবন করিগে। তুমি যেই হও, আমি তোমায় আমার প্রিয়ব্রতই বলে জানলাম।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বল্লাম, "মা, বুঝলাম তুমি এখনও আমায় বিশ্বাস করনি—জটা গেরুয়াতে যেমন আমায় চিনতে দেয়নি, তেমনি এই নেড়া মাথা আর ছেঁড়া কাঁথাতেও চিনতে দিলে না। যাই হোক আবার আমি আসব, তার পর দেখব কেমন আমার মা আমায় না নেয়।"

৪

হয় ত তোমরা জিজ্ঞাসা করবে যে যখন আমার আপনার জনেরা আমায় অমনি করে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিলে তখন আমার দুঃখ হয়েছিল, কি না? এবং তোমরা আশা করবে, যে আমি বলব—

"মেরেছ কলসির কাণা
তা বলে কি প্রেম দিব না।"

না গো, না, আমি কি আর সন্ন্যাসী আছি, যে অমনি করে বলব, "হে পিতঃ এই পাপীদের ক্ষমা কর, এরা জানে না যে এরা কি করছে।"

যাঁরা সে কথা বলেছিলেন তাঁরা জগদ্গুরু। তাঁরা আমার মাথায় থাকুন। আমি সহজ মানুষ—তাই মার খেয়ে কাঁদলাম। তাই এই পরম দুঃখকে দুঃখ বলেই স্বীকার করলাম। কিন্তু তবু তাদের আশীর্ব্বাদ করতে ভুললাম না—কারণ তাদের মার-ধরের মধ্যে আমি আমার মাকে পেলাম, তাঁদেরও পেলাম এবং এই দু'য়ের মধ্যে আমাকেও পেলাম। তাতে যে আমারই পরম লাভ হল। আমায় কাঁদিয়ে তাঁরা আমায় জাগালেন—আমি যে কাঁদতে ভুলে গিয়ে বৈশাখের আকাশের মত ফাঁকা শুকনো প্রকাণ্ড একটা কি হয়ে গিয়েছিলাম। সেই আকাশে যে আষাঢ়ের জলদোদয়ের প্রয়োজন ছিল। তাই এই অশ্রু মেঘের সঞ্চারকে পেয়ে আমার আত্মা অন্যথা বৃত্তিচেতঃ হয়ে বেঁচে উঠল। বসন্তকে ত্যাগ করে গ্রীষ্মে এতদিন কেটেছে, এইবার বর্ষার উদয় হয়েছে। আমিও কেঁদে বেঁচেছি। আমি যে সবাইকে শুদ্ধ আপনাকে পেয়ে বেঁচেছি। তাঁদের আশীর্ব্বাদ করব না?

তার পর কি হল? যা হবার তাই হল। সংসারের এক দরজায়—স্বার্থের দরজায় প্রবেশ পেলাম না বলেই কি, অন্য দরজাতেও প্রবেশ নিষেধ হবে? আর যে সংসারকে আমি অপমান করে ত্যাগ করে গিয়েছিলাম, সে যে আমায় সহজে প্রবেশ করতে দিলে না সেটা কি খুবই অন্যায় করেছে? কখনই না। আঘাতের প্রতিঘাত না পেলে যে আমার আদর পাওয়াই হত—দুঃখ পাওয়া যে

হ'ত না। তাই সেই পুনঃ প্রবেশের প্রথম ক'দিন, যে সংসারের সিংহদ্বারে আমার মাথা ঠুকে গিয়েছিল, সে তো ঠিকই হয়েছে।

কিন্তু তার পরে আর এক দরজা দিয়ে সেই মা, সেই পরম মায়াবিনী জননী সংসার আমায় ডেকে নিলেন। কলকাতায় এক উকিল বন্ধু অবিনাশের কাছে, কিছু দিন পরে, গিয়ে উপস্থিত হতেই সে আদর করে ডেকে নিয়ে বল্লে, "আরে এ কে! প্রিয়! তুমি এই বেশে! তোমার লোটা কম্বল গেরুয়া জটা কৈ হে?"

আমি বল্লাম, "সব কেড়ে নিয়েছে ভাই, এমন কি জায়গাটুকু পর্য্যন্ত। এখন একটু জায়গা দেবে? নইলে যে আমি ডুবে যাই।"

সে তো হেসেই আকুল, বল্লে, "বেঙ্ থেকে কেঁচে আবার ব্যাঙাচী হলে ভাই! সেই হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটের কথাগুলো মনে আছে? তখন যে সব লম্বা লম্বা বাত্ ঝেড়েছিলে, সে সব কি হল?"

আমি বল্লাম, "সব ঝেড়ে ফেলেছি ভাই, এখন তুমি আমায় ঝেড়ে ফেল না, এইটুকু প্রার্থনা।"

বন্ধু আমার সব কথা শুনে বল্লে, "এঁ, মাও তোমায় চিনলেন না? আশ্চর্য্য!"

আমি জীব কেটে বল্লাম, "ছি ছি, ও কথা বল না, মা ঠিকই চিনেছেন। তবে সবাই মিলে তাকে চিনতে দিলে না যে! যাক, ও কথা আর নয়, যখন দিন পাব তখন দেখো আমার মা মাই আছেন। এখন আমার একটা ব্যবস্থা কর।"

বন্ধু অবিনাশের কাছে কিছু দিন থাকার পর, ব্যবস্থা আপনিই হল; বন্ধু তাঁর গ্রামের এক মক্কেলের এষ্টেটের ম্যানেজার করে আমায় চাপকান চোগা পরিয়ে পাঠিয়ে দিলে। বলে দিলে যে, সম্পত্তির মালিকরা মেয়েমানুষ, এবং তাঁদের না কি সন্নিসী ফকিরে ভারি ভক্তি। আমি যখন জীবনের এতটা কাল সন্ন্যিসীগিরী করিছি, তখন তাদের সঙ্গে খুব পোষাবে। কিন্তু গ্রামের আর এষ্টেটের মৃত মালিকদের নাম শুনেই আমার যেন কেমন একটা চমক লাগল। এ যেন চেনা নাম! এ যেন কবে কোথায় শুনিছি, তা যেন কিছুতেই ভাল করে সাহস করে স্মরণে আনতে পারলাম না। কেমন ভয় মিশ্রিত আশায় আমার প্রাণটা চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি একদিনও দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম। পথে আসতে আসতে কেবলি ভাবছিলাম এ নাম কোথায় শুনিছি? আমার

সমস্ত স্মৃতিটা তালপাকিয়ে জটপাকিয়ে মনের মাথার ওপর বসেছিল—কিছু-তেই জটা ছিঁড়ে সেই স্মৃতির ধারাকে বহিয়ে আনতে পারলাম না। কিন্তু সমস্ত অস্তিত্ব হ'তে ধ্বনি উঠতে লাগল—কোথায়—ওরে কোথায়?

উপাসনা (চৈত্র)

কর্ম্মের আনন্দ।

তার পর নিজেকে কর্ত্তা বলে জান: ধারণা করে নাও যে তোমার (খণ্ড) প্রকৃতিই তোমার মধ্যে কর্ত্তারূপে কাজ করছে, আর তোমার এই নিজস্ব (অন্তরতম) শক্তি বা প্রকৃতি ও (অখণ্ড) বিশ্ব-প্রকৃতিই স্বয়ং তুমি।

এই প্রকৃতি-সত্বা কেবল তোমারই নয়, তোমার অহংকারের গণ্ডীর মাঝে সীমাবদ্ধও নয়। তোমরাই প্রকৃতি সূর্য্য ও বিশ্ব চরাচর গড়েছে, পৃথিবী ও তার জীবকুলকে গড়েছে, যা' কিছু তুমি হয়েছ যা' কিছু তোমার বসে আছে যা' কিছু তোমার অন্তর সত্বা সবই সেই গড়েছে। এই প্রকৃতিই তোমার শত্রু ও মিত্র, তোমার জননী ও তোমার খাদক, তোমার প্রণয়ী ও তোমার উৎ-পীড়ক, তোমার আত্মার সহোদরা অথচ তোমার নিতান্তই পর, তোমার আনন্দ অথচ দুঃখ, তোমার পাপ অথচ পুণ্য, তোমার শক্তি অথচ দুর্ব্বলতা, সেই তোমার জ্ঞান অথচ অজ্ঞানও সেই। আবার বলতে গেলে এ সকলের কিছুই সে নয়, সে এমন এক অপূর্ব্ব বস্তু এগুলি সবই যার ছায়া ও অসম্পূর্ণ প্রতিমা। কারণ এই সকলের অতীত হয়ে সে তো আত্ম জ্ঞানেরই বিলাস, অনন্ত—শক্তি সিন্ধু অগণ্য গুণ সমষ্টি।

কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের মাঝে আছে একটি বিশেষ গতি, একটি বিশেষ প্রকৃতি ও ব্যক্তিগত শক্তিতরঙ্গ। তারই অনুসরণ কর, ক্ষীণ স্রোতা নদী যেমন ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে বিপুল হয়ে সাগরে মেশে তেমনি এই ধারা তার অনন্ত মূল ও আশ্রয়ে তোমার পৌঁছে দেবে।

অতএব এইটুকু বুঝে রেখো যে এই স্থূল জড় পিণ্ডে তোমার দেহ একটি গিঁট, বিশ্ব মন সলিলে তোমার মন ও জীবন একটি ঘূর্ণীপাক মাত্র। এই জেনো যে তোমার শক্তি সকলেরই দেহচারী একই শক্তি, যে জ্ঞান কাহারও একার সম্পত্তি নয় তোমার জ্ঞান সেই জ্ঞানেরই স্ফুরণ, তোমার কর্ম্ম তোমার হাতের কাছে গড়ে গড়ে কে এগিয়ে দিচ্ছে, এই জ্ঞানে অহংকারের ভুলের বাঁধন কেটে বেরোও।

এই বাঁধন কাটা সাঙ্গ হ'লে তখন তোমার স্বরূপের সত্যে তোমার শক্তিতে মহত্বে মাধুর্য্যে ও জ্ঞানে অপার মুক্ত আনন্দ লাভ করবে, অধিকন্তু এ সব সম্ভোগের মত এ সব ত্যাগেও সম আনন্দ পাবে। কারণ এ সব তো সেই পুরুষের মুখের মুখস, জগত শিল্পীর নিজরূপ গড়ার শিল্পচাতুরী।

নিজেকে সীমায় বেঁধে ছোট করবে কেন? যে অসি তোমায় আঘাত

করছে আর যে বাহু আলিঙ্গনে বাধছে দুইয়েতেই নিজেকে অনুভব কর, সূর্য্যের দীপ্তিতে ও ধরণীর গতি নৃত্য, বাজের ওড়ায় ও কোকিলের গানে, যা কিছু ছিল 'যা' আছে আর যা' কিছু প্রকাশের জন্য ব্যাকুল সব তাতেই আত্ম অনুভূতি লাভ কর। কারণ (স্বরূপতঃ) তুমি অনন্ত ও এ সকল আনন্দই তোমাতে সম্ভব।

কর্ম্মী (প্রকৃতি) কর্ম্মের আনন্দ সম্ভোগ করে আর সে যে প্রণয়ীর জন্য কাজ করে সে প্রণয়ীর আনন্দও তার উপভোগ্য। প্রকৃতি নিজেকে তার জ্ঞান তারই শক্তিরূপে জানে, তার জ্ঞান ও জ্ঞানের সঙ্কোচ (অজ্ঞান), তার আত্মার অখণ্ডত্ব ও ভেদ, তার অসীমতা ও স্বরূপের সীমা বলে নিজেকে বোঝে। (কিন্তু শুধু তাই নয়) নিজেকে স্বরূপতঃ এ সকলি বলে জেনো আর তোমাব চির প্রিয়তমের আনন্দ অন্তরে ধর।

যারা নিজেকে কর্ম্মশালা বা যন্ত্র বা তার হাতের শিল্প বলে জানে কিন্তু কর্ত্তা বা প্রকৃতিকে ঈশ বা কর্ত্তা বলে মনে করে, এও এক বিষম ভ্রান্তি। যারা এ ভুলের মাঝে পড়ে আত্মহারা হয় তারা আপন উচ্চ শুদ্ধ ও পূর্ণ কর্ম্ম পায় না।

ব্যক্তির প্রতিমায় বা রূপের বাঁধনে সসীম প্রকাশই তো যন্ত্র। ব্যক্তিত্বের ভঙ্গিমায় অনন্তের অভিব্যক্তিই কর্ত্তা, কিন্তু এ দুয়ের কোনটিই যে ঈশ, কারণ এ দুয়ের কোনটিই প্রকৃত পুরুষ—সেই পরম মানুষ নয়।

চিত্র-পরিচয়।

"সনাতনী ম্যাচ বা কন্যাঘাতী বিয়ে" চিত্রশিল্পী শ্রীগগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আঁকা। শিল্পী স্নেহলতার মরণের কথা ব্যঙ্গের রসে এঁকেছেন, সামাজিক বাঙালী কন্যাঘাতের কি নরকে এসে দাঁড়িয়েছে, এই ছবিখানির হাসির মাঝে বেদনার ছুরি দিয়ে সেইটি এঁকে দেওয়া হয়েছে। এখানে বর হলো কেরাসিন তেলের টিন, বরের টোপর টিনের ক্যানেলটি; পুরুত ঠাকুর স্বয়ং যম; আগুনের হলদে লহরের সঙ্গে মেয়ের গাঁট ছড়া বেঁধেছে, সেইখানে সনাতনী ম্যাচ বাক্স পড়ে আছে। ওদিকে কন্যাকর্ত্তার ও মেয়ের মায়ের গলায় বরকর্ত্তা পণের দড়া দিয়ে চক্ষু কপালে তুলেছেন। আজ কাল দেশে অনেক শান্তিসেনা সেচ্ছাসেবক হয়েছেন, আমাদের অনুরোধ এই যে একটা ফণ্ড খুলে এই ছবি হাজার হাজার ছাপিয়ে নেওয়া হোক। আর যারা ছেলের বিয়ের পণ নেবে তাদের সবাইকে এক একখানি করে যেন পাঠন হয়।

নাঃ সহ সঃ

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩২৮ সাল।

দাম্পত্য-বন্ধনের কথা।

(শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)

দম্পতী হইতেছে সমাজের মূল-অংশ (unit), অথবা সমাজকে যদি একটি শৃঙ্খল বলিয়া মনে করা যায় তবে দম্পতী তাব হইতেছে এক একটি গ্রন্থী বা সন্ধি। এই দম্পতীও আবার দুইটি ভগ্নাংশ লইয়া এক,—পতি ও পত্নী বা পুরুষ ও নারী। এই পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ যত দৃঢ় হইবে সমাজশৃঙ্খলা, সমাজবন্ধনও তত দৃঢ় হইবে, স্বতঃসিদ্ধ রূপে দেখা যাইতেছে। পুরুষ ও নারীর বন্ধন যাহাতে দৃঢ় হয়, সমাজ তাহার দুইটি বন্দোবস্ত করিয়াছে—প্রথম, নারীর সংযোগের সুবিধা দেওয়া, দ্বিতীয়, এক কর্ম্মে ব্রতে আদর্শে বা ধর্ম্মে উভয়কে গাঁথিয়া দেওয়া—এই দুইটি লইয়া যাহা হয় তাহারই নাম বিবাহ। প্রাণের মিল অর্থাৎ স্বাধীন ভালবাসা ও মনের মিল—এই দুইটি উপায়ও ছিল, কিন্তু সমাজ সাহস করিয়া ইহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই—কারণ এ দুটি বস্তু বড় খামখেয়ালী, কখন কাহার সহিত হয় কখন আবার ছুটিয়া যায় তাহার ঠিক ঠিকানা নাই, সমাজ অনিশ্চিতের উপর ভরসা করিয়া চলিতে পারে না। ব্যক্তি হইতেছে সজীব সুতরাং অনিশ্চিত, সমাজ ব্যক্তিকে আমল দেয় নাই, খাড়া করিয়াছে একটা ধর্ম্ম (principle) এবং তাহার মধ্যে দুটি ব্যক্তিকে—পুরুষ ও নারীকে বাঁধিয়া দিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম ত আর আকাশ বা শূন্য হইতে নামিয়া আসে না, কোথায় তাহাকে পাওয়া যায়? সমাজ পুরুষের মধ্যেই ধর্ম্মকে পাইয়াছে, আর নারীকে করিয়া দিয়াছে তাহার সহধর্ম্মিণী। এরূপ করিবার কারণও ছিল। দম্পতীর দুই অংশ সমান হইতে পারে না—অংশ দুটি যদি জড় হইত তবে বোধ হয় কোন কথা ছিল না, কিন্তু তাহারা যে

সজীব, আর সজীব হইলেই উভয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী (পুরুষ ও নারীর মধ্যে আছে যে একটা চিরবৈরী, এই sex war এর কথা ত পাশ্চাত্য বিধান হাতে হাতে প্রমাণ করিতেছে।) তাই একজনকে উপরে আর একজনকে নীচে, একজনকে প্রভু আর একজনকে তার অনুগত করিয়া রাখিতে হইবে। শারীরিক বলে নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির বলেও নারী পুরুষের সমকক্ষ নয়—তাই পুরুষেরই স্থান উপরে, পুরুষই প্রভু। নারীকে ছোট পুরুষকে বড় করিয়া একজনকে আর একজনের মধ্যে মিশাইয়া লইয়া দম্পতী বস্তুটিকে দৃঢ় ও নিরেট করিয়া তোলা হইয়াছে—উভয়ে সমান বড় হইলে দম্পতী বলিয়া জিনিষ থাকে না (আমেরিকায় আজ কাল যেমন হইতেছে,) আর সমাজের শৃঙ্খলও তাহাতে শিথিল হইয়া আসে। এই বন্দোবস্তে নারীর যে কিছু ক্ষতি হয় তাহা নয়, নারীর অন্তরাত্মার কোন অপচয়ই ইহাতে ঘটে না। ইহাতে নারীর প্রাণও শুকাইয়া যায় না, মনও পঙ্গু হইয়া থাকে না। স্বাধীন স্বতন্ত্র যথেচ্ছভাবে চলিলে নারীর প্রাণ ও মন যে রস পায়, যে রকম ভাবে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়—সেটা হইতেছে পশুজগতের কথা, কিন্তু দাম্পত্য বন্ধনের মধ্যে নারীর প্রাণ ও মন যে আনন্দ পায় তাহা হইতেছে সংযমের আনন্দ অর্থাৎ তাহা হইতেছে সহজ প্রাকৃত প্রবৃত্তিকে সংহত ও সুসংযত করিয়া একটা উদারতর স্তরে উচ্চতর কেন্দ্রে উঠাইয়া ধরা। সীতার প্রেমের আনন্দ কে পাইয়াছে—ক্লিওপেত্রা না কাথেরীন? গার্গী যে জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল—সে জ্ঞান স্বাধীনভর্তৃকা কোন নারী পাইয়াছে?

তবে দোষ কি, ত্রুটী কোথায়? দোষ দেখি এই, পুরুষের মধ্যে কি জ্ঞানে কি কর্ম্মে কি প্রেমে যত সংখ্যক যত রকম মহা-পুরুষ পাই, নারীর মধ্যে "মহা-নারী" তেমনি পাই না। কেন? পুরুষকে উচাইয়া ধরিয়াই কি নারীর বিশেষ সার্থকতা, নারীর নিজের মহিমা কিছু নাই? নারীর প্রতিভা কেবল দানে, সৃজনে নয়! আচ্ছা, সমাজের ব্যবস্থা যদি এমন হইত যেখানে নারীই পাইত প্রাধান্য, অন্ততঃ নিজত্বের পূর্ণ প্রবাহ, সেখানে সমাজের চেহারা কি রকম হইত? Sex war এর কথা ভুলিয়া যাও ধর, দম্পতী যদি হইত সমান পূর্ণ দুইটি বস্তুর সম্মীলন একীকরণ, তবে দাম্পত্যবন্ধন কি আরও শক্ত নিরেট হইয়া সমাজকে শক্ত ও নিরেট করিয়া তুলিত না? অবশ্য তার আগে চাই নারীর ও পুরুষের প্রত্যেকের স্বভাবের শুদ্ধি, চাই অন্তরাত্মার মিল, দুইটি পরিশুদ্ধ আত্মজ সত্তার স্বেচ্ছা সম্মিলন -নতুবা শুধু প্রাণের বা মনের

মিল পাকা খাঁটি জিনিষ নয়। কিন্তু তাহা হইলে দাঁড়ায় এই, দম্পতী আর সমাজের কেন্দ্র থাকে না,—কারণ তখন আর দাম্পত্য সম্বন্ধ দিয়া সমাজের বন্ধন আরম্ভ করা যায় না, ও জিনিষটি হইয়া পড়ে শেষের কথা। গোড়ার আসনে কেন্দ্র হয় ব্যক্তি, পুরুষই হউক আর নারীই হউক। প্রত্যেক পুরুষ চলে আপন অভিব্যক্তি, সার্থকতার দিকে, প্রত্যেক নারীও তাই চলে—পরে অভিব্যক্তির একটা স্তরে সার্থকতার একটা টানে এক পুরুষ এক নারীর সহিত সঙ্গত হয়, তাহারাই হয় আদর্শ দম্পতী। কিন্তু ইতিমধ্যে, যতদিন আদর্শ দম্পতী সৃষ্ট হইতেছে না অর্থাৎ পুরুষ নারী আপন আপন পূর্ণতা সাধন করিয়া অটুট মিলনে মিলিত হইতেছে না ততদিন কি হইবে? ফলতঃ সেটাকে আর ইতিমধ্যে বলা চলে না সেইটাই হয় সমাজের সাধারণ ব্যবস্থা। কি রকম ব্যবস্থা সহজে দাঁড়ায় তাহার একটা কল্পনা আমরা করিতে পারি। গোড়ায় দাম্পত্য বন্ধন না থাকিলে, পুরুষ ও নারী যথেচ্ছ ভাবে আপন আপন পথে চলিলে, সমাজে হয় উচ্ছৃঙ্খলতা, বিচ্ছৃঙ্খলতা—কারণ আদর্শ সাথী পাইবার জন্য কেহ বসিয়া থাকিতে পারে না, সকলেই সাধু হইয়া গিয়া একলা একলা শিব ও গৌরীর মত—সাধনা করিতে থাকিতে পারে না।

কিন্তু কথা হইতেছে সমাজ বন্ধনের জন্য দাম্পত্য-বন্ধন গোড়ায় দরকার কেন? দুই বা জোড়ার উপর দাঁড় না করাইয়া একের উপর কি সমাজকে দাঁড় করান যায় না? তাহাতে শুধুই কি হয় উচ্ছৃঙ্খলতা, বিচ্ছৃঙ্খলতা? দম্পতীর উৎপত্তি আদৌ হইল কি ভাবে, কি রকম অবস্থায়? দম্পতীর উৎপত্তি সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের জন্য। সমাজের আদিম অবস্থায় যখন শান্তির সুশৃঙ্খলার অভাব ছিল, প্রত্যেক মানুষকে নিজের রক্ষার ভার নিজেকে লইতে হইত তখনই গৃহের ঘরের বাস্তুর সৃষ্টি—স্ত্রী সন্তানকে বুকে ধরিয়া বসিত আর পুরুষ আপন বাহু দিয়া স্ত্রীকে ঘিরিয়া রাখিত। এই রকমে দাম্পত্য জীবনের সৃষ্টি, এই রকমেই দম্পতী শ্রেণী বা গৃহসমষ্টিতে সমাজ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। পরে অভ্যাস সংস্কার এই জিনিষটীর উপরই রঙ চড়াইয়াছে, কল্পনা ইহাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা-টিকেই যে চিরকাল বাহাল রাখিতে হইবে এমন কি কথা আছে? এখন কি অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই? সমাজ এখন এমন সুসংহত সুশাসিত সমষ্টি হইয়া উঠিয়াছে এমন পৃথক সত্তা ও জীবন পাইয়াছে যে সন্তান সন্ততির ভার একান্ত পিতামতার উপর না থাকিলেও চলে। তাই ইউরোপে state children

এর কথা উঠিয়াছে। অর্থাৎ শুধু সন্তান কেন, সন্তান পিতা-মাতা সকলেই হইতেছে সমাজের অথবা প্রত্যেকেই নিজের নিজের—রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ শিক্ষাদীক্ষা কাজকর্ম্ম বিষয়ে প্রত্যেকেরই দাবি সমাজেব কাছে, সমাজের ব্যক্তি-বিশেষের কাছে নয়।

বলশেভিকদের সম্পর্কে Nationalisation of women বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল। কথাটা শুনিলেই চমকাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু কথাটা যদি মোলায়েম করিয়া লই তবে উহার সদর্থ যে কিছু বাহির হয় না, তাহা নয়। . Nationalisation of women অর্থ, কোন নারী কোন পুরুষের সম্পত্তি নয়—প্রত্যেক নারীই স্বাধীন স্বতন্ত্র, ইচ্ছা করিয়া যদি কোন বিশেষ পুরুষের সহবাসে থাকে তবে আলাদা কথা (অবশ্য দুই জনেরই ইহাতে সম্মতি প্রয়োজন), কিন্তু নাবী যদি কাহারও হয় তবে গোটা সমাজের। এই অর্থে শুধু নারী কেন পুরুষ এবং শিশুসন্তানকে ত nationalised বলা চলে। ইহা হইতেছে প্রত্যেক সত্তাব Self-determination এর কথা। এই রকম nationalisation যে খুব নূতন জিনিষ, বোলসেভিকদেরই আবিষ্কার, তাহা বলা চলে না। আমাদের দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কতকটা এই ধরণেরই জিনিষ দেখিতে পাই না কি? সেখানে নিজস্ব ব্যক্তিগত ধন (private property) বলিয়া কিছু নাই, ভিক্ষার ঝুলিটি পর্য্যন্ত মঠের সম্পত্তি, নারীও কোন বিশেষ পুরুষের নয়, সেও সম্প্রদায়েরই—সন্তান সন্ততি যে হয় তাহারাও মাতার বা পিতাব নয়, সম্প্রদায়েরই—পুরুষ সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

দাম্পত্য-বন্ধন গোত্র কুল গোষ্ঠীর আঁটঘাট একটা বিশেষ ফল উৎপাদন করিয়াছে। সমাজে এই রকম এক একটি কোট একটি বিশেষ ধারার সৃষ্টি করিয়াছে—এক একটা বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা স্বভাব রচিত হইয়াছে। এক একটি বংশ এক এক বিশেষ ছাঁচ দিয়াছে—সেই বংশে যে সন্তান সন্ততি সকলেই সেই একই ছাঁচে তৈয়ারী হইয়া যাইতেছে। তাই বংশের অন্য নাম "অন্বয়" অর্থাৎ পূর্ব্বের অনুবৃত্তি বা অনুসরণ। এই ব্যবস্থায় কতকগুলি বিশেষ গুণ যেমন ক্রমে জোর পাইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠে, কতকগুলি দোষও তেমনি বাড়িয়া কায়েমী হইয়া পড়ে। সমাজের স্থিতির পক্ষে এ রকম বন্দোবস্ত ভাল হইতে পারে, কিন্তু সমাজের গতি, সমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধরণের প্রতিভার আবির্ভাবের পক্ষে তাহা সহায় নয়। দাম্পত্য-বন্ধন ভাঙ্গিয়া গেলে অর্থাৎ

সেটা মুখ্য কথা না হইলে, কুলধর্ম্ম গতানুগতিক স্বভাব (tradition) চিরাভ্যস্ত সংস্কারের হাত হইতে সন্তান সন্ততিরা মুক্তি পাইলে—সমাজে বৈচিত্র নূতন সৃষ্টির পরিসর বাড়িয়া যাইতে পারে।

আর এক কথা দাম্পত্যের নীড় ভাঙ্গিয়া গেলে, সন্তান সন্ততির গ্রাসাচ্ছাদন শিক্ষা-দীক্ষার অভাব নাও হইতে পারে, কিন্তু গৃহ ত কেবল হোটেলখানা নয় বা ইস্কুলও নয়, গৃহ যে স্নেহের নীড়—শিশুর হৃদয় সরস সজীব হইবে কি রকমে, কোথায়? কিন্তু নারী দাম্পত্য-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও, সন্তানকে যে ছাড়িয়া থাকিবে এমন কোন কথা নাই। আর কিছু না হয় এখনকার পরিবারে কর্ত্তা হইতেছে যেমন পুরুষ, তেমনি পুরুষ যদি তাহার এই স্থান হইতে বিচ্যুত হয়, তবে নারীই না হয় সে স্থান অধিকার করিবে। গৃহ গৃহই থাকিবে। দাম্পত্যবন্ধন না থাকিলে গৃহ যে থাকিবে না তাহা নয়, কিন্তু তাহা হইবে অন্য রকমের গৃহ—এক নারীরই গৃহ হউক কিম্বা একাধিক নারী ও পুরুষের বৃহত্তর গৃহ (communal) হউক।

আরও একটি কথা, দাম্পত্য-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া কি মানুষের চিরন্তন স্বভাব নয়, মানুষ একলা স্বতন্ত্র কি থাকিতে পারে, চলিতে পারে? কিন্তু আমরা তাহা বলিতেছি না—আমরা শুধু বলিতেছিলাম এই কথা যে দাম্পত্য-বন্ধনটা শেষের জন্য রাখিয়া দিলেও, দেওয়া যাইতে পারে। আগে ব্যক্তি, ব্যক্তির উপর ব্যষ্টি হিসাবে পুরুষ ও নারীর উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা হউক, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি পূর্ণ গোটা বস্তু ধরিয়া প্রথমে সমাজ বাঁধা হউক। পরে ইহার মধ্যে জোড় বাঁধে, সে পরের কথা, সমাজ শৃঙ্খলায় তাহাতে কিছু আসিবে যাইবে না।

বোলশেভিকেরা ইহাই করিতে চাহিতেছে। আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহাই হইয়া উঠিয়াছিল। তবে বলশেভিকরা করিতে চাহিতেছে কলের মত জোর করিয়া (mechanically), মানুষকে জড়বস্তু বোধে পিষিয়া মাড়াইয়া। আর বৈষ্ণবদের মধ্যে তাহা হইয়া উঠিয়াছিল একটা প্রাণের আবেগে ভাবের উত্তেজনায়। কোনটারই পিছনে একটা সজীব সজাগ বুদ্ধি, একটা সুদৃঢ় সত্য উপলব্ধি বা উদার পরিকল্পনা ছিল না।

সমাজের এ রকম ব্যবস্থার জন্য, পূর্ণ অনন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আগে চাই খুব গভীর একটা দীক্ষা, নীরেট একটা শিক্ষা, পরিপূর্ণ একটা শুদ্ধি ও সাধনা। তৎব্যতিরেকে হইবে কেবল

বোলশেভিকী ওলট পালট, ভাঙ্গা চুরা, প্রলয় (chaos) যার না হয় "নেড়া নেড়ীর কেচ্ছা"।

নারীকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিলে চরম কি হইতে পারে জের টানিয়া আমরা তাহারই একটা চিত্র পরিকল্পনা করিতেছিলাম। খুব খারাপ ভাবে দেখিলেও পরিণাম যে কেবলই বিষময় তাহা নয়, আমাদের অত্যন্ত সংস্কার তাহাকে যতই কালো করিয়া দেখুক না কেন, তবুও সেখানে থাকিতে পারে যে আলোর রেখা এইটুকু বুঝাইতে যদি পারিয়া থাকি তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

আমি।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

সীমাবিহীন কালের মাঝে
যোজন যোজন পথে
আমি ছুটে বেড়াই
হাজার বাঁধন মোহের কাঁদন
তার মাঝারে যেগো
আমি আমায় হারাই,—
হারিয়ে মোরে আবার খুঁজি
অবুঝ হ'য়ে আবার বুঝি
এম্নি করেই আনন্দটা
সদা লুটে বেড়াই
অসীম আমার জীবন পথে
আমি ছুটে বেড়াই।

পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসে
শীতল স্রোতস্বিনী
শুধুই নীচু পানে

নৃত্য করি সিন্ধু পানে
যায় রে শুধু ছুটে
একটী সুরের পানে
নাইরে আমার উঁচু নীচু
নাইরে আগু নাইরে পিছু
হাজার সুরের গাঁথা জালে
আমি আমায় হারাই
হাজার বাঁধন আলিঙ্গনি
আবার তারে তাড়াই।

•

কোথায় কবে স্বপ্ন দেখে
এসেছিলাম নামি'
এই ধরার পরে
ঊর্ণনাভের জালে আমায়
জড়িয়েছিনু আমি
মধুর মোহভরে,—
জড়িয়ে আবার খুলতে চাহি
মনের আমার ঠিক্‌না নাহি
হারিয়ে ফেলে আবার চাহি
পেয়ে আবার হারাই
শিশুর মতো মন-ভোলা তাই
এম্‌নি করেই বেড়াই।
হেথায় হ'তে আবার আমি
স্বপ্ন দেখেছি এক
ওই উর্দ্ধ লোকে
সেই পানেতে জীবন তরীর
হাল ধরেছি তাই
ও ভাই কি পুলকে,—
যেথায় থেকে হেথায় আসি
হেথায় হ'তে ভালবাসি

ঊর্দ্ধ লোকের অসীম গানে
চিত্ত আমার ভরাই
আমি গোপন ক'রে' আমার আমি
এম্‌নি ছুটে বেড়াই।

নারী-মঙ্গল

(শ্রীউষানাথ সেনগুপ্ত)

কুমারীত্ব, নারীত্ব এবং মাতৃত্ব—এই ত শক্তির অভিব্যক্তির তিনটী ধারা—শক্তি সঞ্চয়, শক্তিবিকাশ এবং শক্তিপ্রকাশের যুগ।

প্রথম অবস্থাটিকে শক্তিসঞ্চয়ের যুগ (Potential accumulation) বলা যেতে পারে। কুমারী-শক্তিকে আমরা হৃদয়ে অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করি, কেনন! শক্তি-প্রস্রবণের অনন্ত গোমুখীধারা কুমারীত্বের ভিতর লুক্কায়িত—সে যে বর্ত্তমানের ভিতর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল-মোহন-ছবি। এই সময় সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে সামান্য ক'জনকে নিয়েই তাঁর কারবার। তবে এই সময় থেকেই শক্তি সঞ্চিত ও সংহত হ'তে থাকে। আমাদের দেশে গৌরীদানের ফল এই দাঁড়াত যে ভিত্তি ঠিক না করেই আমরা তার উপর প্রাসাদ গড়বার কল্পনা করতুম! সুখের বিষয়, সে দিন চলে যাচ্ছে। আশা করি, এখন থেকে শক্তি সঞ্চিত ও সংহত হ'লে তবেই কুমারী নারীত্বের তথা দেবীত্বের পথে যাত্রা ক'রবেন—নতুবা নয়। এই হচ্ছে Training period, এই সময় আদর্শ-টিকে বেশ সুস্পষ্ট করে কুমারীর প্রাণে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে, আমরা হয়ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প'ড়ব।'

দ্বিতীয় স্তরটিকে শক্তিবিকাশের যুগ (Development) বলা যায়। এই স্তরে কুমারী নারীত্বের ভিতর দিয়ে মাতৃত্বের তথা বিশ্বের পথে যাত্রা করেন। বিশাল বিশ্বের একখানি সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহে, ততোধিক অপরিচিত পরিজনের ভিতর, কুমারী সামান্য একটুখানি স্থান দখল ক'রবার জন্যে উপস্থিত হন। অপরিচিতাটিকে সকলেই "দেবী" হিসাবে বরণ করে ঘরে তোলেন। এই সময় থেকেই শক্তি-লীলার পরিস্ফুরণ। পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তিবলেই তিনি

পরকে আপন করেন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করতে সমর্থ হন, অপরিচিতকে যুগযুগান্তের হারানিধিরূপে ফিরে পান। শক্তির এই আশ্চর্য্য বিকাশ তখনই সম্ভবপর হয়ে ওঠে, যখন শক্তিময়ী দেবী একটি শক্তিময় কেন্দ্র খুঁজে পান—যখন তিনি সেই স্থির কেন্দ্রের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর লীলা-পরিধিকে ক্রমাগত বিস্তৃত করবার অবকাশ পান। এই কেন্দ্রই হচ্ছে, লীলার দোসর, "পতি"—কেননা তিনি পত্নীকে পতন থেকে রক্ষা করেন; এবং দেবী নিজে পত্নী কেননা তিনিও পতিকে পতন থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু "দোসরের" ভিতর যে দ্বিত্বভাব শক্তির পক্ষে তা অসহ্য, শক্তি চায় মিলন—একত্ব। মিলনের নিবিড় ব্যাকুলতায় উভয় কেন্দ্রের প্রাণমন আদর্শ, প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে, এক হয়ে যায়। আর দ্বিত্বভাব নেই—তখন "পতি" হয়ে যায় "স্ব—আমি"—তখন স্থিরকেন্দ্রের উপর তাঁরা স্বপ্রতিষ্ঠ। এই অবস্থা "যদস্তি হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম··"এই সরল সুন্দর মন্ত্রটির পূর্ণপরিণতি ও সার্থকতা। কুমারী-শক্তির এই প্রথম দেবীত্ব সিদ্ধি, কেননা একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতকে তিনি "আপন হইতেও আপনার" করতে সমর্থ হয়েছেন। এই সময় থেকেই "আমি" পরিধির বিস্তৃতি আরম্ভ, কেননা আর কেন্দ্রভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই।

শক্তি আবার সীমাবদ্ধ থাকতে রাজি নয়। অসীমের বাঁশী তার প্রাণমন আলোড়িত করে, তাকে বিশাল বিশ্বে আহ্বান করে। তখনই "বহু" হবার বাসনাটি প্রাণে জাগে। এই বাসনা থেকেই সৃষ্টি। শক্তির এই যে একত্ব এবং বহুত্বের ভিতর আনাগোনা এই ত সৃষ্টিলীলারহস্য। এই তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে শক্তিপ্রকাশের যুগ (Realisation)। নারীত্বের চরম প্রকাশই হচ্ছে মাতৃত্ব। আজ তিনি সন্তানের ভিতর নিজেরই আত্মা প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পান। আজ তাঁর চোখে সমস্ত বিশ্বই মধুময়—আজ আর শত্রুতে মিত্রতে প্রভেদ নেই—তিনি বিশ্বজননী—তোমার,আমার সকলের মা। আর সেই জন্যেই যে মুহূর্ত্তে হিন্দু সন্তানকে নিজের আত্মারই মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে লাভ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই পত্নী-আর পত্নী নন—তিনি তাঁরও মা। এই জন্যেই তন্ত্রের উপদেশ—রমণীকে জননীত্বে পরিণত কর, তোমার ভোগ পিপাসা মিটে যাবে।

এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা অধিকাংশই, মুখে এবং লেখায় যাই বলি না

কেন, কাজে এবং ব্যবহারে নারীর নারীত্বকে পদদলিত করে, শুধু দৈহিক সম্বন্ধটাকেই বড করে তুলেছি। শিক্ষার ও যুগধর্ম্মের মারফতে যে সব নারীর জীবন সুন্দর ও বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে, তাঁদের অন্তর যে ক্রমে বিষিয়ে উঠছে সে খবরও আমরা রাখি। অন্ধ "পতি দেবতা" মোহ এ দুর্ব্বার জলতরঙ্গ বেশী দিন রোধ করতে পারবেনা। আজ নারী, হাডে হাডে ভুগে, দেবতা ও পশুর পার্থক্য বেশ করে যাচাই করে নিতে শিখছেন। যেদিন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি সহসা সন্ধুক্ষিত হয়ে উঠবে, সেদিন হয়ত বাংলা শুম্ভিত হবে। সময় থাকতে আমাদের মনে রাখতেই হবে যে নারী শুধু রমণী নন—তিনি নারী এবং ভবিষ্যৎ বাংলার জননী। ভাই বাঙ্গালী, সাবধান!!

কিন্তু যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। সমস্ত বিশ্বকে আপনার করেও প্রেম তৃপ্তি পায় না। অসীমের আহ্বান তাকে দূরে—আরো দূরে টেনে নিয়ে যায়। শক্তি মহাশক্তির মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তবেই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। তখন স্বামী জগৎস্বামী-তে পরিণত হয়।

* * * *

যা অসুন্দরকে সুন্দর করে, অপূর্ণকে পূর্ণ করে বিচ্ছেদকে মিলনের রাগিণীতে ভরপূর করে দেয়, এবং অসামঞ্জস্যতার ভিতর যা সুসামঞ্জস্যের ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারে, তাকেই আমরা শ্রীনামে অভিহিত করি। নারী সেই শ্রীরূপিণী মহাশক্তি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অন্যায় চাপে, নারী আজ শ্রীভ্রষ্ট এবং আমরাও আজ শ্রীহীন—লক্ষ্মীছাডা।

সেই সুপ্তশ্রীটিকে জাগিয়ে তুলবার জন্যে অন্ততঃ বাংলায় একটা অভিনব সাড়া পড়ে গেছে। সে শ্রী ফুটে উঠুক আমাদের পল্লীমায়ের বুকে, নবনাগরিক সভ্যতার অন্তরে, পঙ্গুসমাজ এবং নির্ম্মম শাস্ত্রের "অচলায়তন" চুরমার করে। আমার বাংলার প্রত্যেক নরনারী শ্রীসম্পন্ন হয়ে এক অভিনব 'দেবজাতি' গড়ে তুলুক। সেজন্যে প্রত্যেক নরনারীকে স্বরাট এবং স্বাধীন হয়ে দাঁডাতে হবে—পরমুখাপেক্ষী হলে চলবে না। প্রবীণের দল হয়ত স্ত্রী-স্বাধীনতা শুনেই আঁৎকে উঠবেন। কিন্তু আমাদের মতে স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা কিম্বা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়,—স্বাধীনতা হচ্ছে নিজের অন্তর দেবতার অধীনতা।

আমাদের দেশে তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতার যে ব্যভিচার হয়নি, এমন কথা বলি না। আমরা জোর করে বাইরে থেকে স্বাধীনতা চাপিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তখনও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। কাজেই দু'এক জায়গায় যে কুফল ফলবে সে ত

জানা কথাই। স্ত্রী-স্বাধীনতা দেবে বলে পুরুষ যে স্পর্দ্ধা করে, সেটা নিতান্তই মিথ্যা কথা—ফাঁকা চাল। স্বাধীনতা দানের বস্তু নয়—অন্তরের ভাবলব্ধ ধন। অন্ধকারের জীব অতখানি আলোর সমারোহ সহ্য করবে কি করে। প্রথমে জ্ঞানালোকে এই অন্ধকার অপসারিত করতে হয়। তখন স্বাধীনতাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে হবেনা, সে আপনি এসে তার স্বর্ণসিংহাসন বিছিয়ে নেবে।

নারী, মনে রেখো— তুমি সেই জগতের চিদাধার শক্তিরই একটি বিশিষ্ট অংশ। তুমি আত্মবিস্মৃতা এবং একটু বেশীমাত্রায় বৈষ্ণবী হয়েছিলে বলেই তোমার এই দুরবস্থা। শক্তিহীনা না হলে কি তোমার পায়ে শিকল পরিয়ে দিতে পারতুম? তোমার পায়ে শিকল পরিয়েই আমরাও আজ আষ্টেপৃষ্ঠে শিকলে বাঁধা—পদদলিত। শক্তির অভাবে আমরাও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছি। আজ আমাদের মত তোমাদেরও মনের শিকল কেটে ফেলতে হবে। আত্মানাং বিদ্ধি, 'আত্মস্থ হয়ে নিজেকে জান,' বুঝবার চেষ্টা কর, অন্তর্মুখ হয়ে আপনাকে মহাশক্তির অংশ বলে জান,—তারপর এস, দু'জনে মিলে একটা মহাসৃষ্টির সূচনা করি।

তবে এস সহধর্ম্মিণি, তোমার মাহেশ্বরী শক্তি নিয়ে যেখানে যত অপূর্ণতা, অক্ষমতা এবং অনুদারতা আছে, তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড করে দাও, যেখানে তোমার শক্তির অবমাননা দেখবে, সেখানে তোমার তীব্র জ্যোতিতে অপমানকে পরাস্ত এবং লজ্জিত করে তোমার সহধর্ম্মীর অন্তরে কর্ম্মশক্তির প্রেরণা দিয়ে বিশ্বের সমস্ত শুভকাজে তার পাশে এসে দাঁড়াও এবং তোমার বৈষ্ণবী শক্তি প্রেমে, গানে, আনন্দে বিশ্বে চিরবসন্ত আনয়ন করুক।

জগদ্ধাত্রীরূপিণী মা আমার, তোমার ভিতর ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তিত্রয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সংসাধিত হয়ে বিশ্বে এক নবযুগের সূচনা করুক। তোমার অপূর্ণ আশাকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার সন্তানদের প্রাণে সেই মহান্ আদর্শের অঙ্কুরটি সযতনে রোপণ করে দাও,—তুমি হয়ত দেখতে পাবে না—কিন্তু কালে সেই অঙ্কুরটি এমন এক মহামহীরুহে পরিণত হবে, যার শীতল ছায়ায় বসে বিশ্বমানবের তাপিত প্রাণ শীতল হবে, ধন্য হবে, পবিত্র হবে।

নারী নারী—নারী বিশ্বজননী—নারী জ্ঞানপ্রেমকর্ম্মের ত্রিবেণী—নারী-শ্রী—নারী শক্তি ও স্বাধীনতার উৎস। আমরা সেই বিশ্বাত্মিকা মায়ের জাতকে

"নরকস্ত দ্বারং" বলে ঘৃণা করে এসেছি। তাই আমাদের সাধনার ক্ষেত্র হয়েছিল রুদ্ধঘর, চোরাগলি এবং পর্ব্বতের গহ্বর। সে আত্মদর্শন ছিল স্বার্থ-দুষ্ট, কাজেই ব্যর্থ, সেখান থেকে ফিরে এসে যদি এই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে সেই "আমি"কে মহত্তর ও বৃহত্তর ভাবে পেতে তাঁরা চেষ্টা করতেন, তা হলে সে ছিল স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু গহ্বর থেকে ফিরবার পথ তাঁরা খুঁজে পাননি, হয়ত সে চেষ্টাও তাঁদের ছিল না। এটা হচ্ছে সামঞ্জস্যের যুগ। বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে এবার নয়, এবার

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে, মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।......
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

এবারকার অভিযান কাউকে বাদ দিয়ে নয়—কাউকে পিছনে ফেলে নয়,—এবার চোরাগলিতে নয়,—একেবারে বিশ্বের সদর রাজপথে—আনন্দবাজারে।

গান।

(ভৈরবী—একতালা)

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি, এল।)

ফুল মালা লয়ে বসে আছি প্রাতে
কার তরে ওগো কার তরে—
মৃদু বয়ে যায় দক্ষিণ বায়
তারি কথা মোর মনে পড়ে।
ডেকে ডেকে ওঠে পাপিয়া
কি সুখ যামিনী যাপিয়া
থেকে থেকে পিক চায় অনিমিক্
থেকে থেকে কুহু কুহুরে।
সহসা কেন গো আঁখিতলে মোর
জল উঠে যেন ছাপিয়া

আমি হৃদয়-আবেগ রাখিতে গো নারি
বুকের তলে চাপিয়া!
ছলি' ছলি' হাসে মৃদুফুলগুলি
আমারি নয়ানে চাহিয়া
সে কি আসিবে না পরিবে না মালা
দিবে নাকি মালা মোর গলে।
দিন চলে যায়—নিশি কাটে হায়
আকুল নয়নজলে
সাধের এ মালা প্রীতি-ফুল-ডালা
সবি বুঝি যায় বিফলে।

যোগ বিয়োগ।

[শ্রীরাজকিশোর রায়]

শিশু পাঠশালায় অঙ্ক শিক্ষাকালে প্রথমতঃ যোগ-বিয়োগ শিক্ষা করে তৎপরে গুণ ভাগ প্রভৃতি যোগ-বিয়োগের রূপান্তরিত গণনা শেখে। একে এক দিলেই দুই হয় আর এক হতে এক নিলেই হাতে কিছু থাকে না, হাত শূন্য হয় ইহা শেখে। অঙ্ক শাস্ত্রে এক থাকা চাই কারণ এক না থাকলে অঙ্কপাতই হবে না। কিন্তু শিশু বোঝে না এই এক কি এবং কোথা হ'তে এলো। এককে যদি স্বতঃসিদ্ধ না ধর তোমার অঙ্কপাত বা কোন গণনা হবেনা সুতরাং অঙ্কশাস্ত্রে এক্‌কে ছাড়বার জোটি নাই—এক্‌কে ধরে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে এক আছে। আধ্যাত্মিক জগতে বা ধর্ম্মশাস্ত্রেও "এক" একমেবাদ্বিতীয়ং, এই এক হতেই আরম্ভ, এক অনাদি স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ম্ভূ!

২। বালক যখন অঙ্ক কোসতে বসে তখন ঠিক বোঝেনা একে আর একটা একদিলেই দুই হয় কেন বা এক হতে এক নিলে হাতে কিছু থাকে না কেন। প্রথম একটি বা কি আর দ্বিতীয় একটিই বা কি স্বরূপতঃ উভয় এক কি এক নয়? বাস্তবিক দুই একই এক, তবে মনে হয় যেন দুইটি বিভিন্ন পদার্থ। গুরু মশাই শিশুর হাতে একটা পাকা আম দিয়া বলেন "বাপুহে!

বলতো কটা আম পেলে" ? শিশু অনায়াসেই বলে "একটা", একটাকে জানতে শিক্ষা কত্তে হয় না ইহা মানবের সহজ জ্ঞান। শিশু যদি আর একটা আম পায় হাস্‌তে হাস্‌তে বলে "আমার দুটো আম হয়েছে" একটার ওপর আর একটা হলেই মানুষের আমোদ আহ্লাদ ধরে না। আম পেয়ে বালকদের আমোদের কারণ যে উহা খাবে দেখাবে বা নিয়ে খেলা কর্ব্বে। কিন্তু গুরু মশাই আমটা দিয়ে যদি উহা কেড়ে নেন্ ত শিশুর হাসি তৎক্ষণাৎ কান্নায় দাঁড়ায় কারণ তার হাতে কিছুই নাই, হাত খালি। যেটি তার ছিল তা অপরের হয়েছে। গুরুমশাই যদি জিজ্ঞেস করেন বাপু হে,হাসলেই বা কেন আবার কাঁদচো কেন ? বালক কিছু সঠিক জবাব দিতে পার্ব্বে না। আঁক কসাতে ব'সে গুরুমশাই তখন যদি বলেন বাপুহে, যখন তোমার হাতে একটা আম দিলাম তখন তোমার বড আমোদ হোল তার ওপর যখন আর একটা দিলাম তখন তোমার আমোদ ধরে না। এই একটার সঙ্গে যে একটার মিলন ঐ মিলনকে অঙ্ক শাস্ত্রে যোগ বলে আর যখন ঐ আমটি কেড়ে নেওয়া হয় তখন যে কাজ করা হয় ঐ প্রথার নাম বিয়োগ।" শিশু কিন্তু ইহার গুঢার্থ বুঝ্‌তে পারুক আর না পারুক তাকে যে যুগপৎ হাসি কান্নায় পডতে হয়েছে তা সে বেশ বুঝতে পেরেছে। কিছু পেলেই আনন্দ আর কিছু গেলেই দুঃখ এটা সে কতকটা বুঝেছে।

৩। সংসারে এই যোগ বিয়োগ নিয়ে ভগবানের লীলা বা খেলা। পূর্ব্বেই বলেছি এক স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ম্ভূ অনাদি কাল ধরে আছেন। একের দুই হবার ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টির সূত্রপাত। এক হতে দুইএর সৃষ্টিতে ইচ্ছাশক্তির আবশ্যকতা হয়েছিল তাই একে চিৎশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল আর শিশু যেমন একটা আম পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল কেন না সে উহা খাবে দেখ্‌বে বা উহা নিয়ে খেলা করবে তদ্রূপ আদি এক বা পরমাত্মার চিৎশক্তির বা ইচ্ছাশক্তির উদয়ে নিজেকে নিজে দেখবার উপভোগ করবার বা খেলবার জিনিষ পেলুম এই জ্ঞানে অপার আনন্দের উদয় হয়েছিল। কাজেই তাঁতে চিদানন্দের সমাবেশ। তিনি সৎ অর্থাৎ বরাবর আছেন তাতেই এই দুই গুণের সমাবেশে তিনি সচ্চিদানন্দময় হয়ে আছেন। কেমন নয় ? ছাত্র একটার ওপর আর একটা আম পেয়ে যেমন আনন্দে নাচে ভগবান একমেবাদ্বিতীয়ং অবস্থায় থাকবার পর যখন প্রজা সৃসৃক্ষু হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেন সেই থেকেই তিনি সচ্চিদানন্দ নিত্যানন্দ ঠাকুর হয়ে আছেন।

৪। বালক যখন আমটি পেয়েছিল তখন তাহার আমোদ ধরে না কারণ তাহার আমের সহিত একটা আমিত্ব সম্বন্ধ হয়েছিল। আমি আম খাব, এটা আমার আম, আমার আম নিয়ে খেলা হবে, আমি আমটাকে অপরকে দেখাব, আমার আম সবার চেয়ে ভাল ইত্যাদি—কাজেই তার আনন্দ, কিন্তু আম পেয়ে ভাবেনি আমটি খেলে ওর হাতে কিছু থাকবেনা কিম্বা কেউ কেড়ে নিলেও তার হাত শূন্য হবে, না সে খেলতে পার্ব্বে না সে দেখাতে পার্ব্বে। এই আমার আমিত্ব জ্ঞানে মানুষ কোন জিনিষ পেলে আনন্দ হয়, আমার একটা ছিল না একটা হয়েছে এই জ্ঞানে। আবার যদি আমটি কেড়ে নেওয়া যায় তখনই সে কাঁদবে, না হয় ঝগড়া কর্ব্বে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "কেন তুমি কাঁদছো" সে অমনি জবাব দেবে, আমার যে আম অপরে নিয়েছে, কেন অপরে আমার আম নেবে, কেন অপরে খেলবে কেন অপরে উহা উপভোগ কর্ব্বে। আঁক্ কসতে বসে যদি কেড়ে নেওয়াকে বিয়োগ করা বোঝান যায় সে বোঝা দূরে থাকুক কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদবে আর বোলবে আমার জিনিষ অপরের হোল কেন?

৫। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যোগ বিয়োগে ভগবানের সংসার খেলা। আর আমরা এই ধাবার মধ্যে খেলছি। সে খেলা হাসি কান্নায় জড়িত। পেলেই আনন্দ হারালেই কান্না অর্থাৎ যোগে আনন্দ বিয়োগে নিরানন্দ। পাবার জন্য সদা লালায়িত। কিছু পরেই তাকে রাখতে চেষ্টা করি যেন প্রাপ্ত জিনিষটা না হারাই। প্রাপ্ত জিনিষের সহিত সংযুক্ত থাকবার বাসনা আমাদের প্রকৃতিগত কিন্তু যেখানেই সংযোগ সেইখানেই বিয়োগ যেখানে আলো সেখানেই ছায়া। ইহাদের সম্বন্ধ নিত্য। একটি অপরটির কাছে পাশাপাশি প্রচ্ছন্নভাবে থাকবেই থাকবে। যখন শিশু ভূমিষ্ট হয়, মায়ের কোলে উঠে তখন তার আনন্দ ধরে না সে মাকে কামড়ে ধরে রাখতে চায় পাছে মা তাকে ছেড়ে চলে যায়, তার সঙ্গে মার বিচ্ছেদ বা বিয়োগ ঘটে। মা ছাড়লেই কান্না সুরু করে, মাও নবজাত শিশুকে তাঁর শূন্য কোলে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হন, কেননা তিনি একটি দেখাবার খেলবার মাই দেবার জিনিষ পেয়েছেন। ছেলেকে মাই দিতে মার বড় আনন্দ এমন আনন্দ আর কিছুতে হয় না। মায়ে পোয়ে উভয়েই আনন্দে মেতে উঠে। কেন না উভয়ের পরস্পরের মিলন বা স্বর্গীয় যোগ সাধন ঘটেছে। আকর্ষণে ভালবাসার উৎপত্তি কারণ উহাতে যোগ সাধন হয় তাই ভগবানের নাম কৃষ্ণ তাই নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মে এত উৎসব এত আনন্দ

হয়েছিল। এই দেহরূপ নন্দালয়ে যখন বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের বা ভক্তির উদয় হয় তখন মানুষের আনন্দের সীমা থাকে না। তাই কৃষ্ণসেবক বা ব্রহ্মপরায়ণ বিশ্ব প্রেমিক হয়। প্রকৃত কৃষ্ণসেবক সকলকে আঁকড়ে ধর্ত্তে চায় কেন না তাতে আকর্ষণ বা যোগশক্তি নিত্য বিরাজিত। যেখানে আকর্ষণ সেই খানেই আবার বিকর্ষণ বা বিচ্ছেদ হয় ইহা জাগতিক নিয়ম কাজেই শ্রীকৃষ্ণ বা প্রেমের বিচ্ছেদে কান্না আসে, তাই ভক্তিমতী শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহে এত শোক এত কান্না। যাক এসব তত্ত্ব বারান্তরে বুঝাবার চেষ্টা করবার বাসনা রইলো।

৬। বালক যখন বড় হয় তখন তার সাংসারিক নিয়মে স্ত্রীপুত্রাদি লাভ হয় অর্থাৎ সংযোগের ধারা পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হয়। যুবা বা যুবতী যখন স্ত্রী বা স্বামী লাভ করে তখন তার আনন্দ হয় কারণ তাহাদের পরস্পরের জীবনের আদান প্রদানের যোগ সম্যক্ সাধিত হয়। যৌবনে আকর্ষণী শক্তির উদ্গম হয়ে ক্রমশঃ উহার পূর্ণ বিকাশ হয় তাই যৌবনে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। বাল্য বিবাহে তাহার কোন বিকাশ হয় না তাই উহা বর্জ্জনীয় ও দোষের। শ্রীরাধা তাই গৌরী ষোড়শী। মানুষ যখন সেই আনন্দ-দায়িনী স্ত্রী বা স্ত্রী যখন আনন্দদায়ক স্বামী হারায় তখন কেঁদে আকুল হয়। কেন কাঁদে তার উত্তর সোজা, কেন না তার বিয়োগ ঘটেছে বিয়োগে দুঃখ পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে। তার হাতে জগৎগুরুমশায় যে পাকা আমটি দিলেন তাহা কেউ কেড়ে নিয়েছে তার হাত শূন্য হয়েছে হৃদয় শূন্য হয়েছে তার দেখবার আস্বাদন কর্ব্বার বা খেলবার জিনিষটা নাই সব শূন্য হয়েছে। তাই দক্ষালয়ে গৌরীশোকে মহাদেব দিশাহারা হয়েছিলেন। নবজাত পুত্রলাভে নর-নারীর অপার আনন্দ তাই পুত্রকন্যার নাম নন্দন নন্দিনী। পুত্রকন্যা লাভের ন্যায় আনন্দ জগতে আর নাই কারণ পুত্র কন্যা আত্ম স্বরূপ "আত্মাবৈপুত্র নামাসি" "আত্মনঃ জায়তে পুত্র"। আপনার স্বরূপ নিয়ে খেলবার দেখবার উপভোগ করবার জিনিষ আর কি থাকতে বা হতে পারে? ইহা আত্মা-রামের আনন্দের প্রতীক আনন্দ মাত্র। স্ত্রী বা স্বামী সেই যোগ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় বা সহায়ক তাই স্ত্রী বা স্বামী নারী বা নরের এত ভালবাসার জিনিষ।

৭। যোগে সুখ, বিয়োগে দুঃখ ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। সাধারণ মানুষ ইহা বেশ বোঝে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগ বলা হয়েছে আর যোগে সুখ তাও বলেছি। চিত্তবৃত্তি নিরোধকে কেন যোগ বা সুখ বলে তাহা বোঝবার আগে সুখ জিনিষটা কি তা বুঝবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে

বলে সর্ব্বমাত্মবশং সুখং সর্ব্ব পরবশং দুঃখং" যাহা আপনারই বশে থাকে অর্থাৎ যাহা আপনার বলবার হয় যার উপর আমার সর্ব্বকর্তৃত্ব থাকে তাহাতেই সুখ হয়। আর যখন তা হয় না, যা আমার অধীন নয় তাতেই দুঃখ আসে। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি সকল যখন আমার অধীনে থাকে (এসব বৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক, কাজেই ত্যাগ করবার নয় তখনই আমার সুখ হয় আর উহাদের বিক্ষিপ্ততাতে বা বিচ্ছেদে বা বিয়োগে দুঃখ হয়। যদি কোন প্রথা অবলম্বন কর্লে মানুষ আপনার উক্ত বৃত্তিগুলিকে আপনার মধ্যে ধরে রাখ্‌তে পারে সেই প্রথাকে যোগ বলে। এই যোগ সাধনেই আত্মানন্দ বা সুখ, কেননা উহাদের উপর আমার সর্ব্বকর্তৃত্ব থাকে। আর বৃত্তিগুলি যখন পরাধীন হয় অর্থাৎ বিষয়পঞ্চকে বশীভূত হয় তখনই আমার দুঃখ হয়। আর বিষয়পঞ্চকের বিকর্ষণীশক্তি বড় বেশী, উহাদের আপনার কর্ব্বার শক্তি নাই। উহাদিগকে যারা আপনার করবার জন্য যে পরিমাণে আঁকড়ে ধর্ত্তে চায় তারা ততদূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কাজেই তাদের এ বিচ্ছেদে বা বিয়োগে বড় কষ্ট হয়। এই জন্যেই গাঁজাখোরের গাঁজা ছাড়তে, মাতালের মদ ছাড়তে, প্রথমে বড়ই কষ্ট পেতে হয়, খেতে না পেলে কেঁদেই আকুল হয়। তাই মানুষ বারবানতার লাথি ঝাঁটা খেয়েও সর্ব্বস্বান্ত হয়েও ছাড়তে পারে না।

৮। গীতা শাস্ত্রে "সমত্বং যোগমুচ্যতে" বলা হয়েছে অর্থাৎ যোগবিয়োগের অতীত হওয়াকে সুখ দুঃখের সাম্যাবস্থাকে যোগ বলা হয়েছে, কেননা তাহাতে অপার নিত্যানন্দ লাভ হয়। সে অবস্থায় যোগের আশা নাই, বিয়োগের ভয়ও নাই। যে এক বচনাতীত অবস্থা উহা জীবাত্মার কূটস্থ অবস্থা। সেই অবস্থায় যে উপনীত হতে পেরেছে তার ন্যায় আর কে সুখী হতে পারে? কারণ তার চিত্তবৃত্তিগুলি তার নিত্যবশে আছে, তাতে নিত্যযুক্ত হয়েছে তাহাতে বিচ্ছিন্ন হবার কোন কালে ভয় নাই, কাজেই সে আত্মারাম বা নিত্যানন্দময়। ইহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা। জানিনা এ অবস্থায় জীবাত্মা চিরকাল থাকতে পারে কিনা, বোধ হয় পারেনা, কারণ সংকর্ষণী শক্তির নিত্য সহচর বিকর্ষণশক্তি, এই উভয়শক্তির সাহায্যে ভগবানের জগৎ-খেলা! এখন দেখা গেল সাংখ্যশাস্ত্রের যোগশব্দের সহিত গীতোক্ত যোগশব্দের কোন বিরোধ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানেই যোগ সেই খানেই বিয়োগ যেখানে আকর্ষণ সেই খানেই বিকর্ষণ যেখানে আলোক সেই খানেই

ছায়া। তবে ইহার হাত হতে এড়াবার কি উপায় নাই? বাস্তবিক কোনও কালে নাই—তবে কতকটা নিষ্কৃতি পাবার উপায় আছে।

৯। শিশুর আম পেয়ে আনন্দ, সে চায় না তার আম অপরে কেউ নেয়। মানুষও চায় সে যা পেয়েছে, সেই জগৎগুরুদত্ত জিনিষগুলি যেন সে না হারায়। স্ত্রীপুত্রাদি পেয়ে মানুষ তা হতে বিযুক্ত হলে কেঁদে আকুল হয় কারণ তার প্রাণ খালি হয়, তার উপভোগ-করবার জিনিষ কমে যায়, বিয়োগ বা অভাবে মানুষ দুঃখে পড়ে। পূর্ব্বেই বলেছি দুঃখ অর্থ পরাধীনতা। স্ত্রীর মৃত্যুতে পুত্রকন্যার মৃত্যুতে বা কাহার কোথায় গমনে উহারা স্থান বা কালের অধীন হয়, নিজের বল কিছুই থাকেনা, তাই তার দুঃখ। চোখের আড়াল হলেই মানুষ তার প্রিয় পদার্থের জন্য কাঁদে।

১০। অঙ্কশাস্ত্রে এক হতে এক নিলেই হাতে শূন্য থাকে অর্থাৎ কিছুই থাকেনা। শূন্য অনাদি, যখন হাত শূন্য হয় তখন বলতে পারা যায় না যে একবারে কিছুই নাই, আছে বটে—তবে আছে অনাদিতে, চক্ষু অন্তরালে গেছে, কোথাও না কোথাও আছে, একেবারে ধ্বংস হয় না বা হবার যোটি নাই। অর্থাৎ অনন্তকাল বা অনাদি হতে অন্যত্র যাবার স্থান কোথায়? বালক যখন আমটি খেয়ে ফেলে তখন তার আস্বাদন করার কিছুই থাকে না তাই সে কাঁদে যাতে সেটার মত বা আর একটা পায়। বাস্তবিক কি তার আমটি ধ্বংস হয়ে গেছে, তার অস্তিত্ব নাই? না, তা জাগতিক নিয়মে হতে পারে না। আম বোলতে যা কিছু তা ঠিকই আছে, নাই তার কেবল খোসাটা। আমার হাতে একটা টাকা ছিল তাহা লইয়া অপরকে দিয়াছি আমা হতে টাকাটা বিযুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু বিযুক্ত টাকা টাকাই আছে তবে আমার কাছে নেই অপরের কাছে গিয়েছে, অপরের আনন্দ হয়েছে কারণ অপরের নিকট যোগ সাধন হয়েছে। আমটি বালক খেয়েছে, তার খোসা গেছে বটে কিন্তু তার সেই আমের আমত্ব বা বীজ বজায় আছে, সে বীজ থাকায় নববৃক্ষের উৎপত্তি হবে তাতে আবার অসংখ্য আমের উৎপত্তি হবে কত লোকে কত আমোদ পাবে। জিনিষের আসা যাওয়া নিত্য। সংসারে জীবের আসা যাওয়াও নিত্য। এই আনাগোনার অপর নাম জন্ম মৃত্যু।

১১। জগতে যখন যোগ বিয়োগ আসা যাওয়া বা জন্ম মৃত্যু নিত্য ব্যাপার তবে উহা নিয়ে হাসি কান্না ঘটে কেন? এই কান্নার কারণ অবিদ্যা বা মায়া এখন আসুন দেখা যাক গীতা শাস্ত্রের "সমত্বং যোগমুচ্যতে" বাক্যের সত্য

উপলব্ধি হতে পারে কিনা? যদি এমন কোন জ্ঞানের উদয় হয় যাতে নিত্য যোগ জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে নিত্যবৃদ্ধ হয় তবে মানুষের নিত্যসুখ হয়। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যোগের উৎপত্তি প্রথম। রসশাস্ত্রে ও যোগে আনন্দ ও সুখ, তাই আমরা বিবাহে, সমারোহে, উৎসবে, ক্রিয়াকর্ম্মে, সকলের সহিত একত্রিত হয়ে অপার আনন্দ পাই। হুলাহুলি কুলাকুলি করি। সম অবস্থায় আসিতে হলে বিয়োগ হবার আশঙ্কা নাশ কর্ত্তে হবে। বিয়োগকে যোগে পর্য্যবসিত কর্ব্বার জ্ঞান হৃদয়ে আনয়ন কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তে হবে। সেই জ্ঞানকে বলে অবিদ্যার নাশ সাধন বা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়। ব্রহ্মজ্ঞানোদয় সুখ দুঃখ যোগ বিয়োগের কাটাকাটি—সমত্বের সমুদয়। স্ত্রীপুত্রাদি নাশে আমার ঘর শূন্য বা অন্ধকারময় হয়েছে বটে কিন্তু অন্যত্র আলোক বা আনন্দের উদয় ইহা ধ্রুব সত্য। জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে সেই এক অনাদি অব্যয় পুরুষ বহু হয়ে আছেন। কেবল খোসা আলাহিদা। সেই খোসাই বিভিন্নতার কারণ। আধারের বর্ণানুসারে যেমন আধেয় জলের বর্ণের বিভিন্নতা দেখায় ইহাও তদ্রূপ। স্বরূপতঃ একই জল জলই আর কিছুই নহে। মহাসমুদ্রের যেমন স্থানভেদে কোথাও নাম হয়েছে বঙ্গসাগর চীনসাগর প্রশান্তমহাসাগর ভারতমহাসাগর কিন্তু স্বরূপতঃ একই জল মাত্র, সেই অনাদি পরমেশ্বর পাত্রভেদে নানা নামের বিষয়ীরত। তুমি আমি সবই এক। যদি তাই হয় তবে একের স্ত্রীপুত্রনাশে শোকাতুর হবার কি আছে? আমার স্ত্রী আমার স্বামী, আমার পুত্র কন্যা মরেছে বটে কিন্তু ঠিক মরে না কেবল মাত্র আমার নয়নের অগোচরে গিয়াছে মাত্র। আমার ক্রোড় হ'তে অপরের ক্রোড়ে গিয়েছে। আমার আনন্দ অপরে ভোগ কচ্ছে মাত্র। এ জ্ঞান কথায় বলা সোজা কিন্তু ইহার অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া সাধনা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। আমা হতে বিযুক্ত পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন অপরে যুক্ত হওয়ায় আমাতেই অর্থাৎ বড় আমিতেই সংযুক্ত হয়েছে। এই বৈদান্তিক জ্ঞান কি মহান্! কি সুখকর! তাহা ধারণা কর্ত্তে পারলে মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। তখন তার সাক্ষাতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শক জ্ঞানের পূর্ণ মাত্রার উদয় হয়। তখন তার মৃত পুত্রকন্যাদির জন্য শূন্য দেখতে হয়না, শোকে অভিভূত হতে হয় না। এই জ্ঞানোদয়ে তখন অপার অক্ষয় আনন্দ হয়। শোকে আর মুহ্যমান হতে হয় না। আত্মরূপী আমার তোমার কোলে স্ত্রীপুত্রাদি নিত্য বিরাজমান দেখা যায়। তখন সেই যোগ বিয়োগে কাটাকাটি

হয়, নিত্যানন্দের উপভোগ হয়। সে আনন্দধারায় তার গণ্ড ও বক্ষস্থলে গজমুক্তাহার শোভিত হয়। এই জ্ঞানোদয়ে যোগে ও বিয়োগে এই উভয় অবস্থাতেও সুখানুভূতি। এ সাধনা জগতে কোন ভগবৎ ভক্তের হয়েছে কিনা জানি না, তবে ভক্তিগ্রন্থে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিধুরা শ্রীরাধার এই অবস্থা ছিল। তাই এই আত্মজ্ঞানে শ্রীরাধাব শ্রীকৃষ্ণ সহযোগে বা শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে সদা আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। তাই শ্রীমতী নয়ন মুদিলেই শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ জ্বালার হাত হতে নিস্তার পেতেন, স্বজ্ঞানে অজ্ঞানে তার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন সদাই ঘটত। দয়াময় কবে এ দীন জীবনে এ যোগ বিয়োগের কাটাকাটির অবস্থায় আনবেন তা তিনিই জানেন। তাঁর চরণে এই ভিক্ষা যেন জন্মজন্মান্তরেও তাঁর এই যোগবিয়োগের হাত হতে উদ্ধার করেন।

উৎস।

[শ্রীমতী আশালতা সেন।]

পাষাণের বাঁধ টুটিয়া উৎস
বাহিরিল ছুটি আবেগ'ভরে
গুহার আঁধার আবরণ ভেদি
লুটিয়া পড়িল ধরণী পরে।
দূর হ'তে কার আকুল আহ্বান
নিভৃত নিলয়ে পশিয়া তার
পলকে ব্যাকুল করে দিল প্রাণ
কোন বাধা সে যে মানে না আর
তাই সে চলেছে, তাই সে ছুটেছে
তাই সে বহিছে আবেগ ভরে।
অতি দূর, বহু দূর সে যে পথ,
কভু কি পূরিবে মোর মনোরথ ?
শিলায় প্রহত চরণ, কভুবা
ধুলায় মলিন সলিল তার

"যেতে হবে" শুধু এইটুকু জানা
তার বেশী সে যে জানে না আর।
কখনো দীপ্ত অরুণ আলোকে
বক্ষ তাহার ঝলসি ওঠে
কভু বা মেঘের কালো ছায়া বুকে
গভীর দুখে সে গর্জি ছুটে
কোথায় বিরাম, কোথা পরিণতি
কোথা সে বারিধি-বাঞ্ছিত তার?
কতদূর ওগো কতদূর আর,
সন্ধান তাহার কেহ কি জানে?
অজানা পথের পথিক চলেছে
তারি অজানার অসীম টানে।

সুখের ঘর গড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

দশম পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নের কিছু পূর্ব্বেই গেঁড়া সরকার তর্কসিদ্ধান্তের বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল। তর্কসিদ্ধান্ত তখন অন্দরের বেলতলার বাঁধানো বেদীতে বসিয়া বাড়ীর এক আচার বিভ্রাটের মীমাংসা করিতেছিলেন। বাড়ীর একটা আপন হাতে পোষমানা অযত্নপালিত কুকুর তাহার ভগ্নি উমাকে ছুঁইয়া ফেলায় অবেলায় আবার স্নান করিতে উদ্যতা মেয়েটাকে তিনি শুদ্ধি ব্যবস্থা দিতেছিলেন, কিন্তু ব্যবস্থার অহিন্দুত্ব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ভগিনী বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন। ভগিনী বলিতেছেন "তা দাদা কলসির জলটা তো গেল?"

ত। (হুকা টানিতে টানিতে) কেন যাবে দিদি? জল তো নারায়ণ? তা ছাড়া ওর কাঁকের কলসিতে জল। কুকুর ছুঁয়েছে তার পা

ভ। ছোঁয়া তো গেল ?

ত। তা হলে তো পুকুরটাই গোটা অশুদ্ধ—ভেলো তো পুকুরে জল খেয়েছে ?

ভ। বেশ কথা তোমার।

ত। কথা অসঙ্গত কি ?

ভ। নাইতে তো হবে ?

ত। ক্ষেপেছিস্ ? এই সন্ধ্যেবেলা রোগা মেয়েটাকে আর মারিসনি বোন্ ?

ভ। ওমা বল কি দাদা ? অশুদ্ধ নোংরা জন্তু।

ত। —বলিসনি দিদি ও কথা।. ভগবানের অংশ সব জীবে আছে। অশুদ্ধ নোংরা হয় জীব মনের পাপে—ওদের মন নেই পাপও নেই। অশুদ্ধ নোংরা জন্তু শুধু মানুষ—আর সব শুধু নোংরা। যে জন্তু ঝাটা লাথি, খেয়ে. অনাদর পেয়েও সমস্ত রাত্রি জেগে মনিবের ঘর বাড়ী রক্ষা করে সে হল অশুদ্ধ। নাইতেও হবে না, জলও ফেলা যাবেনা—

ভ। দাদার সব অদ্ভুৎ যুক্তি।

ত। (হাসিয়া) তাইতো লোকে তোর দাদাকে ম্লেচ্ছ পণ্ডিত বলে—(ভাগ্নিকে) যা বুড়ী মা গঙ্গাজল ছুঁয়ে কাপড় ছাড়গে যা—উমা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তার মা হাঁ না কিছু বলিবার আগেই গেঁড়ে আসিয়া বাহির বাড়ী হইতে ডাক দিল সিদ্ধান্ত মশাই বাড়ী আছেন ? সিদ্ধান্ত পরিচিত স্বর শুনিয়া সাড়া দিলেন, ও বাড়ীর বাহিরে গেলেন। "কি খবর সরকার" ?

গেঁ। খবর এমন কিছুই না, বাবু একবার দেখা করতে চান্—

সি। তা হলে তো ভালই খবর, ব্যাপরটা কি সরকার ?

গেঁ। কেমন করে জানছি বলুন ?

সি। তুমি জাননা তাও কি হয় ? বাবুর প্রধান পারিষদ তুমি ?

গেঁ। আজ্ঞে কি করি বলুন, অন্নদাতা প্রতিপালক, যেতে, বসতে হয় বৈ কি ? পারিষদ সভাসদ আর কি বলুন।

সি। তা বটে। কখন হাজির হতে হবে ?

গেঁ। যখন আপনার সুবিধে—এখনই তো বলেছেন—

সি। আচ্ছা তুমি এগোও—

গেঁড়া সরকার চলিয়া গেল। সিদ্ধান্ত সাত পাঁচ ভাবিয়া যাওয়াই স্থির

করিলেন। কাঁধে চাদর ফেলিয়া লাঠি হাতে তিনি জমীদার ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

বাবুর বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখিলেন রতন রায় অর্দ্ধমুদিত নেত্রে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া আছেন। পায়ের দিকে গেঁড়া সরকার চোখে চষমা আঁটিয়া খবরের কাগজ হইতে দেশ বিদেশের বার্ত্তা পড়িয়া শুনাইতেছে। তর্কসিদ্ধান্তকে দেখিয়া গেঁড়া বলিল—"এই যে সিদ্ধান্ত মশাই আসুন—"

তর্কসিদ্ধান্তের আগমন সংবাদ শুনিয়া রতন রায় পাশ ফিরিয়া পা গুটাইয়া বসিলেন এবং নিমীলিত নেত্রদ্বয়কে ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া 'এই যে তর্কসিদ্ধান্ত মশাই আসুন'—বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এবং স্থূল বাহুদ্বয়কে অনিচ্ছাসত্ত্বে একত্র করিয়া একটা প্রণামের ভ্যাঙচানি সারিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষ সুতরাং প্রণম্য, কিন্তু প্রণম্য দরিদ্র হইলে এবং প্রণামকারী ধনগর্ব্বিত হইলে সামাজিক এটিকেট্ বাঁচাইয়া চলিতে চাইলে—মর্য্যাদা জ্ঞানের অভিনয়টা ওই রকমই হয়।

তর্কসিদ্ধান্তও অভিনয়ের দ্বারা হাত বাড়াইয়া জয়স্তু বলিয়া ফরাশের এক পাশে বসিলেন।

কথোপকথন চলিল। সমানে সমানে আলাপ। উভয়েই পরস্পরকে চেনেন। মহেশ খবর পাইয়া কাজের অছিলায় ঘরে ঢুকিয়া একপাশে বসিল।

রতন রায়। তার পর তর্কসিদ্ধান্ত মশাইএর তো পায়ের ধুলো এ বাড়ীতে আর পড়ে না—একরকম—

তর্ক। লক্ষ্মীর বাড়ীতে গরীব বাউনের এক পাত-পাড়া ছাড়া তো ধুলো পড়বার সুযোগ ঘটে না

রতন। তাই বা কই ঘটে? আপনার মত ব্রাহ্মণ তো বলাবে বাউনের দলছাড়া হয়ে বসেছে—কি অছিলায় সাক্ষাৎ পাব বলুন?

তর্ক। সাক্ষাতের প্রয়োজনই বা কি? আমরা মৃণ্ময় পাত্র ধাতুপাত্র হতে যত দূরে থাকে ততই ভাল, তবে আশ্রয়ে আছি এই যথেষ্ট। সে থাক্ কিসের জন্যে ডেকেছেন শুনতে এলাম।

রতন। গাঁয়ের লোক সব কি বলে যে তর্কসিদ্ধান্ত মশাই—কোথা গরীব বাউনের জাত ধর্ম্ম রাখবেন না যাতে তাও ঘোচে তার চেষ্টা করছেন? ব্যাপারটা কি?

তর্ক। বটে না কি? কার আবার জাত ধর্ম্ম মারলাম? ফরিয়াদী কে?

ম। আপনার ভাই জীবন ভটচাজ্জিই বলে বেড়াচ্ছে—

রতন। থামো মহেশ কথাটা আমাদের দুজনের মধ্যে বোঝা পড়া হোক্ ওঁর মুখেই সব কথা শোনা যাক্—

তর্ক। খোলসা করেই বলুন না। জমীদারীর বাঁকা চোরা কসরতি ভাষা বুঝিনে চৌধুরী মশাই—বুদ্ধিশুদ্ধি ন্যায়ের কচকচি আর কূট কচালেই সারা হয়ে বসে আছে—

রতন। ভোলা মুখুয্যের মেয়ের ভাতে নাকি সশিষ্য খেতে যাবেন—?

তর্ক। গেলামই বা। নেমন্তন্ন করলে যাব না? বাউনের ছেলে ফলারে ব্যাজার—সেতো কুলক্ষণ। ধ্বংসমতি। (হাস্য) তা ছাড়া তার অপরাধ কি হল?

রতন। শোনেন নি সেই মুসলমানি কাণ্ড?

তর্ক। ওঃ ভাল কথা। ভদ্রলোকের মেয়েটীকে বিড়ম্বিত করতে আপনিও সশস্ত্রে সেজে নেমেছেন দেখছি?

র। (চোখ মেলিয়া বিস্ময়ের ভাণ করিয়া) কি বলছেন ভটচাজ্জি মশাই?

গোঁ। কাকে কি বলছেন সিদ্ধান্ত মশাই?

তর্ক। (নিতান্ত বিরক্তি ভরে) সে জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে আপনি সে জন্য ব্যস্ত হবেন না। কি গ্রহ!

রতন। দেশে অনাচার হলে ধর্ম্ম কর্ম্মহানি হলে আমাকে দেখতে হয় বৈকি!

তর্ক। ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিলে ধর্ম্মহানি হয় সে শাস্ত্র জানা ছিল না।

ম। আসল কথাটা চাপ্‌ছেন কেন? তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিলে ধর্ম্ম যায় না তা আমরা জানি কিন্তু তাত নয়—মুখুয্যে গিন্নি মুসলমানের ছোঁয়া এঁটো বাসন নিজে ধুয়ে ঘরে তুলে নিলেন এটা কি অনাচার নয়? হিন্দুয়ানী—

তর্ক। আচার তত্ত্ব এ বাড়ীতে এসে আমাকে শিখে কাজ কর্ত্তব্য করতে হবে নাকি? মন্দ না। জমীদারী সেরেস্তায় শাস্ত্রের বিধান ব্যবস্থা হয় তা জানতাম না—কি আপদ!

রতন। সিদ্ধান্ত মশাই রেগে যাচ্ছেন কেন? ব্যবস্থা আপনাদেরই দেওয়া; আমরা তার মানামানিটা তদন্ত তদারক করি এই যা—এটা যে অনাচার তাতে ভুল আছে?

তর্ক। কিছুই অনাচার নয়, সম্পূর্ণ ধর্মাচার। ও নিয়ে কেন মিছি মিছি কথা কাটাকাটি। ব্যক্তি মাত্রেরই তো নিজ নিজ প্রবৃত্তি আছে? আপনি এক রকম কাজ করে ধর্মাচারসঙ্গত ভাবেন, আমিও এক কাজ করে ধর্মাচার সঙ্গত মনে করি—এতো রুচির কথা চৌধুরী মশাই? এই তো? না আর কিছু কথা আছে? যাদের প্রবৃত্তি হবে যাবে, যাদের হবে না তারা যাবে না? সোজা কথা।

রতন। তা বটেই তো। তা হলে জমীদার কাকে বাড়ীতে খানা খাইয়েছে, সঙ্গে বসে খেয়েছে তার জাত কেন যায়নি—এসব সমালোচনা না করলেই পারতেন? এও তো প্রবৃত্তির কথা?

তর্ক। নিশ্চয়ই। কথা তুমি দায়ে পড়ে। যে অনাচার স্বার্থের গন্ধে সবাই করে সেই অনাচার পরের উপকারে কেউ করলে তার নির্যাতন কেন হয়? প্রজার যিনি ধন প্রাণ মান রাখবার কর্তা তাঁর মুখে একথা শোভা পায় না—

ম। জমীদার বাড়ীতে সাহেব সুবোকে খানা দিতে হয়, সবাই দেয় কিন্তু জমীদার তার সঙ্গে সেই সব অখাদ্য খেয়েছেন এ কথা কোথা শুনলেন?

তর্ক। ও কথা অতিরঞ্জন হয়ে আমার জবানি এসেছে। জীবন ভটচাজ্জির এ রকম অতিরঞ্জনে বা মিথ্যাভাষণে লাভ আছে—হরকালি ভট্টাচাজ্জির তাতে কোনো লাভ নেই—

রতন। বিশ্বাস কি?

তর্ক। ইচ্ছে হয় করবেন, কিছু এসে যায় না।

তর্কসিদ্ধান্তের দুঃসাহসিক কথার ভঙ্গী ও স্বরে মহেশ ও গেঁড়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। রতন রায় ভিতরে বেতর রকমের ক্ষুব্ধ হইলেও বাহিরে সে ভাব ঘুণাক্ষরে জানাইলেন না।

ম। সিদ্ধান্ত মশাইএর কি মাথার ঠিক নেই—মুখের তো নেই দেখছি।

রতন। থামো মহেশ। বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, উনি কি রামা-শ্যামার মত মোসাহেবি করবেন? ও সব ভাল বাসিনে, আমিও স্পষ্ট কথা বলি—স্পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসি। সে যাক সিদ্ধান্ত মশাই, বলছি কি পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করছে যখন ভাল হক্, মন্দ হক্ তাতে যোগ না দিলে ভাল দেখায়?

তর্ক। তর্কসিদ্ধান্ত ওইটে পারে নি, পারবেওনা। পাঁচ জনে মিলে

একজনের সর্ব্বনাশ করছে বলে আমাকে তাতে যোগ দিতে হবে, এ দুর্ম্মতি যেন কখনো না হয়, যখন জমীদারী চালাবো তখন না হয় হবে—তা হলে এখন উঠি।

রতন। তা হলে যাচ্ছেন্ নেমন্তন্নে—

তর্ক। নিশ্চয়! তা আর বল্‌তে। একটা যদি পুণ্যি করবার স্থযোগ ঘটেছে ছেড়ে দেবো?

রতন। পুন্যি? কি পুন্যি? ফলার খাওয়া?

তর্ক। হ্যাঁ এই রকম একটী আসল বাউনের মেয়ের হাতে রান্না প্রসাদ খাওয়া। পুন্যি নয়? বলেন কি?

রতন। তা হলে আপনার ভাগ্নির বিয়েতে কেউ যে খেতে যাবে না?

তর্ক। না যায় কি করছি বলুন, বাজে খরচ বেঁচে যাবে? কেমন না সরকার মশাই?

রতন। আপনারা তা হলে আমারি বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছেন?

তর্ক। ওই বিদ্যেটা হুজুর বাপের কালে শিখিনি, তবে ভায়া ওতে খুব পক্ক বটেন আমার ওইটা হল না হবেও না। আসি তবে, কল্যাণ হোক।

বাক্যব্যয় আর না করিয়া তর্ক সিদ্ধান্ত চলিয়া গেলেন। জমীদার বাবু ও তাঁর সভাবদ দুটী একেবারে নির্ব্বাক! দিনান্তে পুরা অন্ন জোটে না, ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ হয় এমনি এক দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সাহসে যে এত বড় একটা প্রতাপশালী জমীদারকে এমন ভাবে অগ্রাহ্য করিল এ তাহারা ভাবিয়া উঠিতেই পারিল না। আর রতন রায় নগণ্যের কাছে এমন ভাবে ইতিপূর্ব্বে কখনো ব্যবহৃত হয় নাই। তিনি তরঙ্গহীন বারিধির মত স্থির ও অনুদ্বেলিত থাকিলেও ভিতরে ভিতরে রাগে ফুলিয়া উঠিতেছিলেন।

মহেশ। দেখ্‌লে সরকার একবার আস্পর্দ্ধাটা!

গো। পিপীলিকার পাখা ওঠে মরণের তরে! অতিবাড় বেড়না, ঝড়ে যেন ভেঙ্গনা। পরমাশ্চর্য্য বটে।

ম। ফলে, যেচে অপমান নেওয়া হলো—আমার ইচ্ছে ছিল না ওকে ডাকা হয়—যাগ্ এর একটা বিহিত হওয়া দরকার, রায় মশাই কি বলেন?

র। হুঁ। ভেবে ছিলুম কাদা ঘাঁটবো না কিন্তু—ঘাঁটতে হবে—তর্ক-সিদ্ধান্তের ভাগ্নির বে নাকি? (ক্রমশঃ)

আদেশ

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

(১)

কেমন ক'রে কাটবে আমার মস্ত [illegible]?
বলবে তুমি হেসে হেসে বাজাও ব[illegible]।
আকুল করা সুরে ভরা
মনের ধাঁধাঁ লুপ্ত করা
পাইনা খুঁজে কোন পথে যাই এ বড় দুর্দ্দিন।
ব'লবে তুমি হেসে হেসে বাজাও বসে বীণ॥

(২)

ঐ পথেরই ছায়ায় বসে কাটবে কি মোর বেলা?
মুক্তি পথের আলোয় গিয়ে ক'বব ধূলো খেলা॥
কতক বেলা হ'লে শেষে
তোমার কোলে যাব হেসে
তখন আমি হবো কিগো চিৎ সাগরে লীন?
বলবে তুমি হেসে হেসে বাজাও বসে বীণ॥

(৩)

অনেক কথাই যায় না জানা সে সব কেন আর?
প্রাণের কথা মনের ব্যথা দিলাম তোমায় ভার॥
আপন ঘরে মুক্তরূপে
এস তুমি চুপে চুপে
তোমার মনের গুপ্ত আদেশ শুনাও নিশিদিন।
ব'লবে তুমি হেসে হেসে বাজাও বসে বীণ॥

(৪)

সরু মোটা দুটী আমার হৃদয় বীণার তার।
এক কালেতে বেজে গেছে দুটীতে ঝঙ্কার॥

মুক্তি আশে একটী ছুটে
একটী রাঙ্গা পায়ে লুটে
এমন ক'রে কেমন করে কাটাই বল দিন।
বলবে তুমি হেসে হেসে বাজাও বসে বীণ!

(৫)

মুক্তি, মুক্তি? মুক্তি কিহে ধ্যান ধারণায় মিলে
সাগর কূলে ঢেউ উঠেছে সেই যে নেবে তুলে
মুক্তি কেবল বলে মুখে
রক্ত দেখে মায়ের বুকে
ঢেউয়ের মত হেসে খেলে কাটবে কি দিন দিন
তবুও তুমি ব লবে নাকি বাজাও বসে বীণ?

(৬)

তোমার বীণার সপ্তসুরে বাজিয়ে মোদের প্রাণ?
মুক্ত কর দৃঢ় কর শুনিয়ে তোমার গান
বাজাও বসে মিষ্টি সুরে
ব্যাপ্ত হউক বহু দূরে
মায়ের বুকের রক্ত গায়ে লাগ্‌ছে যে দিন দিন।
এখন নাকি বল্‌লে তুমি বাজাও বসে বীণ?

(৭)

আদেশ তোমার ধরব মাথে যতই কঠোর হোক,
মাথা পেতে নেবো ত্বরা ভুল্‌ব সকল শোক।
তোমার বাঁধা নেবো হাতে
পায়ের ধুলা নেবো মাথে
কেবল তুমি কর মোরে একটী প্রদক্ষিণ্?
দেখ আমি কেমন ক'রে বাজাই বসে বীণ্॥

"ঋগ্‌বেদের সময়ে ভারত।"

১।

আমবের (আর্য্যদের) আদিগেহ।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ]

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ঋগ্‌বেদের সময়ে ভারত" নামক একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ। ঋগ্‌বেদে কথিত 'সপ্তসিন্ধু' জনপদই (ভারতের এক দেশ) যে আমাদেব আদিগেহ তাহা লেখক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অধুনা আবিষ্কৃত তথ্য ও ঋগ্‌বেদের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা তিনি কিরূপে প্রমাণ করিয়াছেন আমরা প্রথমে তাহাই একে একে দেখিব, ও পরে ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইব। আবার অবিনাশ বাবু তাঁহার পুস্তকের উপসংহারে আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, যেহেতু ভূমণ্ডলের জন্মাবধি ইহার রূপের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেইজন্য আমাদের আদি জন্মস্থান যে কোথায় তাহা বলা কঠিন; কিন্তু 'as the region (Sapta-Sindhu) was peopled by the Aryans from time immemorial they came to regard it as their original cradle— ইহা যে কতদূর সত্য তাহাও আমরা দেখিব। পরে ইহাও আমরা দেখাইব যে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কৃত তথ্য সকল বেদের দিক হইতেও সম্পূর্ণ সত্য। চতুর্থতঃ ঋগ্‌বেদে আমাদের আদিগেহের যাহা কিছু স্মৃতি আছে, তাহা 'দেবতার' আদিগেহ, সুতরাং তাহা উপকথা ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া অবিনাশ বাবু উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি উহা উড়াইয়া দিবার যথাযথ কারণ দর্শাইতে পারেন নাই।

এখন আমরা দেখিব 'সপ্তসিন্ধু' যে আমাদের আদিনিবাস ভূমি তাহা অবিনাশ বাবু কেমন করিয়া প্রমাণ করিলেন।

(১) ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান বলে যে পূর্ব্ব-তুর্কিস্থান, বঙ্গপ্রদেশে, সপ্তসিন্ধু ও গান্ধারপ্রদেশের পার্শ্বে এক মহাসাগর ছিল। তখন বর্ত্তমান চীনদেশ ও

রাজপুতনা এবং আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশের অনেকটাও সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত ছিল। ইহা প্রায় এক লক্ষ বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা। আর ঋগ্‌বেদেও আর্য্যদের বাসস্থানের চারিদিকে চারিটী মহাসাগরের কথা বর্ণিত আছে—পূর্ব্বমহাসাগর, উত্তর মহাসাগর, পশ্চিম মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর। ঋগ্‌বেদে ইহাও আছে যে সরস্বতী নদী বরাবর সাগরে গিয়া পড়িতেছে। তাহা হইলে এই সাগর রাজপুতানা-সাগর ছাড়া অন্য কোনও সাগর হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাজপুতানা-সাগরের অবস্থান কালে আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধুতে বাস করিতেন,—আর সে অন্ততঃ এক লক্ষ বৎসর হইল। তাহা হইলে আর্য্যরা এক লক্ষ বৎসর হইতে সপ্তসিন্ধুতে বসতি করিতেছেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ আর্য্যরা কোথাও আভাষ দেন নাই যে তাঁহারা অন্য স্থান হইতে এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছেন।

(৩) তৃতীয়তঃ যেখানে দক্ষপ্রজাপতি ও মনু বাস করিতেন সেই 'ইলা' হিমালয়ের উপর কাশ্মীর প্রদেশে অবস্থিত ছিল।

(৪) চতুর্থতঃ ইন্দ্র সকল দেবতার মধ্যে প্রাচীনতম এবং তিনি সপ্তসিন্ধুতেই বৃত্রসংহার করিয়া দিলেন।

(৫) আর সরস্বতী ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী জনপদকে আর্য্যরা 'দেবনির্ম্মিত দেশ' বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

এই পাঁচটী প্রধান কারণ দেখাইয়া লেখক 'সপ্তসিন্ধুকে' মানবের (আর্য্যদের) আদি জন্ম ভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা এক একটী করিয়া প্রত্যেক যুক্তিটাই বিচার করিয়া দেখিব।

ভূ-তত্ত্ব-বিদ্যার সাহায্যে বেদ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার এক নূতন পথ লেখক আমাদের দেখাইয়াছেন। তাহার জন্য লেখকের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমরা লেখকের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার প্রথম যুক্তিটীর বিচারে প্রবৃত্ত হইবে। বর্ত্তমান ভূ-তত্ত্ব-বিদ্যার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে সপ্তসিন্ধু, গান্ধার, বল্ক (Balkh) পূর্ব্বতুর্কিস্থান ও আলটাই পর্ব্বত বেষ্টিত মঙ্গোলিয়া প্রাচীনত্বে সমান। আমাদের লেখক মহাশয়ও একবার স্বীকার করিয়াছেন যে পূর্ব্বতুর্কিস্থান, বল্ক, গান্ধার ও সপ্তসিন্ধু, এই সকল স্থান আর্য্যগণের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। পরে কিন্তু ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই; এবং সপ্তসিন্ধুকেই কেবল আর্য্যগণের বাসভূমি বলিয়াছেন। তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিতেছেন,—

From an examination and discussion of the above geological evidences is clearly proved the existence of the four seas, mentioned in the Rig-Veda, round about the region inhabited by the ancient Aryans, which included sapta-sindhu on the South Bactriana and Eastern Turkistan on the North, Gandhara on the West, and the upper valley of the Ganges and the Yamuna on the East. The age of the Rig-Veda, therefore, must be as old as the existence of these four seas in ancient times. এখানে আমরা লেখকের সহিত সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু তিনি এখানে আলটাই বেষ্টিত মঙ্গোলিয়াকে আর্য্যগণ অধ্যুষিত স্থানের অন্তর্ভুক্ত করিলেন না কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মঙ্গোলিয়া এই সকল স্থানের মতই প্রাচীন, আর ইহা পূর্ব্বতুর্কিস্থানের সহিত যুক্ত। যাহা হউক, আমাদের এই বিষয়টী হইতে প্রমাণ হইল ঋগ্বেদের ও এই স্থানগুলির প্রাচীনত্ব, কিন্তু আর্য্যদের আদি জন্মভূমি কোন স্থান তাহা এখনও প্রমাণ হইল না।

অতঃপর আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে আর্য্যদের অন্য দেশ হইতে সপ্তসিন্ধুতে আসার বিষয়ে বেদে কোনও ইঙ্গিত ও আভাষ আছে কিনা। অবিনাশ বাবু বলিয়াছেন বেদে এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। আর নিজ মত সমর্থনের জন্য দুই একটী সাহেবের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবিনাশ বাবু সমস্ত বেদ পাঠ করিয়া কেন যে এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাইলেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় ইহা তাঁহার পাশ্চাত্য মোহ। কুসংস্কারাপন্ন না হইয়া শুদ্ধ ও স্বাধীন চিত্তে পাঠ করিলে তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন যে বেদে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদ যে তাঁহাদের নিজ মনোমত অনুবাদ করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের যাঁহারাই বেদের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই বলিয়া থাকেন। এমন কি মধ্যযুগের দেশীয় ভাষ্যকারেরাও না বুঝিয়া অনেক সময়ে যাহা তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের অরবিন্দ তাঁহার 'আর্য্য'পত্রিকায় কি বলিতেছেন, পাঠক একবার দেখুন,—It is not surprising, therefore, that the most inadequate interpretation should be made which reduce this great creation of the young and splendid mind of humanity to a botched and defaced scrawl, an incoherent

hotch-potch of the absurdities of a primitive imagination perplexing what would be otherwise the quite plain, flat and common record of a naturalistic religion. The Veda became to the later scholastic and ritualistic idea of Indian priests and pundits nothing better than a book of mythology and sacrificial ceremonies while European scholars seeking in it for what was alone to them of any rational interest, the history, myths and popular religious notions of a primitive people, have done worse wrong to the Veda and by insisting on a wholly external rendering still farther stripped it of its spiritual interest and its poetic greatness and beauty. (p. 6/8, No. 10 of vol VI, Arya). আবার Western scholars put a false and non-existent meaning in the old verses (P. 620). আর এক স্থানে দেখুন, If we read them as they are without any false translation into what we think early barbarians ought to have said and thought we shall find instead a sacred poetry sublime and powerful in its words and images (P. 621)

আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, অবিনাশ বাবু যদি মান্যবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'মানবের আদিজন্মভূমি' পুস্তক খানি পড়িতেন, বোধ হয় তাহা হইলে তিনি এমন ভ্রমে পতিত হইতেন না। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লেখার সাহায্যে আমরা অবিনাশ বাবুর ভুল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিব। আর তাঁহাকে অনুরোধ করি তিনি যেন উপরি উক্ত পুস্তকখানি আর 'মন্দার-মালা'র প্রকাশিত এই বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখেন, দরিদ্র বঙ্গভাষায় বলিয়া যেন অবহেলা না করেন। সত্য সব ভাষাতেই আপনাকে প্রকাশিত করিতে পারে, সে ভাষাগত ভেদ জানে না।

ভারতীয় আর্য্যগণ সত্যই বাহির হইতে আসিয়াছিলেন। আর তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস স্থানের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞও ছিলেন না। কারণ বেদ সমূহে এই বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা ঋগ্‌বেদে—

প্র আতৃষং সুদানবো অধ দ্বিতা সমাত্রা।

মাতুগর্ভে ভরামহে। ৮।৭২।৮ম

অর্থাৎ হে শোভনদানশীল ইন্দ্রাদি দেবগণ। তোমরা আমরা পর পর পরস্পরের ভ্রাতৃব্য। আমরা সকলেই একই মাতৃভূমি প্রভব। এখন তোমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তথাহি—

অস্তি হি বঃ সজাত্যং বিশাদেসো দেবাসো অস্ত্যাপ্যম্॥ ২০।২৭।৮ম অর্থাৎ দুর্গাচার্য্য—হে হিংসক বিনাশক দেবগণ তোমাদিগের সহিত মনুষ্যদিগের সমান জাতিতা (তোমরাও দেবতা, তাহারাও দেবতা) ও বন্ধুত্ব আছে। তথাহি—

ইয়ং মে নাভিঃ, ইয়ং মে সধস্থং, ইমে মে দেবা অহমস্মি সর্ব্বঃ॥ ১৯।৬।১১ম ঐ (দ্যো) আমার উৎপত্তিস্থান, ঐ আমার গোষ্ঠী স্থান, ঐখানকার দেবগণ আমারই জাতি বন্ধু, সুতরাং আমি দেবতাও বটে আবার মনুষ্যও বটে।

আবার একজন ঋষি বলিতেছেন,

দ্যৌর্ণঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্নঃ মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তনয়োশ্চম্বোর্য্যোনিরন্তঃ যত্র পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ॥ ৩৩।১৬৪।১ম

অর্থাৎ—দ্যো আমার পিতা (পিতৃভূমি) ও জনিতা (জন্মস্থান), আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই দ্যোতে নাভি (উৎপত্তি) হইয়াছিল। এখনও সেইখানে আমাদের জ্ঞাতিবন্ধুবান্ধব বিদ্যমান আছেন। তবে এই মহতী পৃথিবী (ভারতবর্ষ) আমাদের মাতা (মাতৃভূমি)। পিতা দ্যো ও মাতা পৃথিবী এই উভয়স্থানই জ্ঞান বিজ্ঞানে অত্যুন্নত। ইহারা যেন দুইটী প্রধান সেনাপতি। তবে ইহাদের মধ্যে আমাদের পিতা দ্যোহি যোনি (আদি উৎপত্তিস্থান)। উক্ত পিতার দেবলোক সকল তাহার কন্যার গর্ভে (অর্থাৎ কন্যাস্থানীয় ভূবর্লোক ও দ্যুলোকে) যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদে কোনও এক ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—কাস্বীৎ আসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ?

কোন্ স্থানে আমাদের পূর্ব্বচিত্তি (পূর্ব্বক্ষিতি) বা পূর্ব্বনিকেতন ছিল।

ইহার উত্তরে অন্য এক ঋষি বলিতেছেন,—

দ্যৌরাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ। অর্থাৎ—দ্যো আমাদের পূর্ব্বনিকেতন ছিল।

ইহাতেও কি কেহ বলিবেন যে আমাদের ঋষিরা তাঁহাদের আদি জন্মস্থানের বিষয় কিছু বলিয়া যান নাই। অবিনাশ বাবু কি এই সব মন্ত্রগুলি দেখিতে পান নাই? না, 'বুজরুকি' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। ৩৫২ পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়াছেন, The ancient abode mentioned in the Rig Veda

does not mean the original cradle of the Aryans, but only Heaven or the abode of the gods, the immigration of the Vedic Aryans under the leadership of Vishnu from that ancient home is a pure myth which has no basis to stand upon. তাহা হইলে আমি যে সকল মন্ত্র অধ্যাহৃত করিলাম তাহা সবই myth (উপকথা)! তবে সমস্ত বেদটাই myth বলিলেই চলিত; আর ঋগ্‌বেদের সময়ের ভারতের ইতিহাস না লিখিয়া—একখানা সে যুগের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' লিখিলেই ঠিক কাজ হইত। কিন্তু একথা 'বাবা আদমের' সময় হইতেই সত্য যে বুঝিতে না পারিলেই সত্যবস্তু myth (উপকথা) হইয়া পড়ে। আমাদের অবিনাশ বাবুও সেই প্রকার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন মন্ত্রটাকে সত্য আর কোনও মন্ত্রটাকে myth বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি ও দেখাইব যে ইহা myth নহে, খাঁটি সত্য। তবে অবশ্য ক্রমে ক্রমে দ্যো ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ হইয়া আসিলে ও আমরা আমাদের জ্ঞাতি পূর্ব্বপুরুষগণকে উপাস্য পদার্থে পরিণত করিলে, ইহার অনেকটা myth হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা আবার বলি যে ইহা খাঁটি সত্য। অবিনাশ বাবু সংস্কার শূন্য হইয়া দেখিলে এই উপকথার মধ্যেই সত্যের দর্শন পাইতেন।

দেবতারা পারলৌকিক কিছু নন। তাঁহারা আমাদেরই মত স্থূল শরীরধারী মানুষ ও আমাদেরই মত জন্মমৃত্যুর অধীন। তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ও জ্ঞাতিবন্ধু। আর তাঁহারা এই জগতেই বাস করিতেন। তাঁহাদের বাসস্থানের নাম দ্যো বা স্বর্গ বা ইলাবৃতবর্ষ যাহার মধ্যে মেরুপর্ব্বত অবস্থিত। দ্যোর আর এক নাম 'যজ্ঞ'; কারণ এখানেই অথর্ব্ব সর্ব্বপ্রথমেই যজ্ঞের প্রবর্তন করেন। স্বয়ং ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন,—যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যৎ, দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্। অর্থাৎ যে অনন্ত জলরাশি সকল প্লাবিত করিয়াছিল, সে আপন মহিমায় উৎপাদন শক্তিলাভ করিল, যজ্ঞ জনপদকে জন্মদান করিয়াছিল।

আবার,

আপো হ যদ্ বৃহতী বিশ্বমায়ন, গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

৭।১২৩।২০ম

সর্ব্বপ্রথম ভূমণ্ডলে কোনও এক জনপদ ছিল না, কেবল এক অপার অনন্ত

জলরাশি সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া ছিল। 'সেই অনন্ত জলরাশি যক্ষ নামক জনপদকে গর্ভে ধারণ করিলে, উহাতে অগ্নি (বা আদিমানব বিরাট) জন্মগ্রহণ করেন। বিরাটের নাম হিরণ্যগর্ভ লোকপিতা ব্রহ্মা ও অগ্নি ("মানবের আদি জন্ম) ভূমি")। এই যক্ষ জনপদই পৃথিবীর চারিদিকে ক্রমে ক্রমে শত শত বংশ বিস্তার করিয়াছিল। (ঋগবেদ, ১।১৩০।১০ম্)। সেই জন্যই মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই অমৃতের পুত্র দেবগণকে বন্দনা করিয়াছিলেন, যাঁহারা যক্ষ জনপদ হইতে পৃথিবীর চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন (১৫।৮৫।১০ম)। দেবতারা যে মর আর তাঁহারা যে আমাদেরই মত মানুষ তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট দিয়াছি। যদি দেবতারা মানুষ না হইয়া পারলৌকিক কিছু হইতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবীর লোক নচিকেতা স্বর্গ নরক ও পিতৃলোকের রাজা যমের নিকট গিয়া কিরূপে প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহা আমার ন্যায় স্থূল বুদ্ধির লোকে বুঝিতে পারে না। আর যমের বাড়ী যদি মৃত্যুর পরলোকে যায়, তাহা হইলে নচিকেতা যমকেই বা জিজ্ঞাসা করিবেন কেন—"হে যম! মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, কি হয়, এবিষয়ে গভীর সংশয়। কেহ কেহ বলেন যে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ কেহ বলেন যে মৃত্যুর পর কিছুই থাকে না। আমি তোমার নিকট উপদিষ্ট হইয়া প্রকৃত তথ্য জানিতে চাই।" আবার যমই বা তাহার উত্তরে একথা বলিবেন কেন,—'বৎস। আমি তো ইহার কিছুই জানি না। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বড় বড় দেবতারাও এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষয়ের অনুমাত্র তথ্যও জানিতে পারেন নাই। আমি কোন্ ছার ?' এ আবার কি! মরিলে লোকে যমের বাড়ী যায় তবে কেন যম বলেন যে মানুষ মরিলে কোথায় যায় তাহা আমি জানি না। এ এক বিষম সমস্যা! বস্তুতঃ যমও আমাদের মত জনম মরণশীল মানুষই ছিলেন। এক সময়ে তিনি পিতৃলোকে (স্রোতে) রাজত্ব করিতেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও এক সময়ে স্বর্গের রাজা ছিলেন। আর দেবতারা যদি সত্য সত্যই অমর হইবেন তাহা হইলে 'ছান্দোগ্যে' কেন থাকিবে যে, 'দেবতারা মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদের পঠন পাঠনে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে কেন থাকিবে যে, 'হে মহারাজ! সেই শাকদ্বীপ (স্তো) বাসী দেবগন্ধর্ব্বাদি সকলে অকালে জরা বা অকালে মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেন না, পরন্তু তাঁহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন। আরও দেখুন একজন ভারতীয় ঋষি দেবতা ও সমস্ত মানব জাতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "শোন

বিশ্বজন শোন, অমৃতের পুত্র যত দেবগণ দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ম্ময়, তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্যপথ নাহি।" (রবীন্দ্র নাথের অনুবাদ) সত্যই দেবতারা অমর হইলে, ঋষি তাহাদের আহ্বান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় করিবার পথ বলিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না।

যত উপকথার আবিষ্কার তাহা মহর্ষি বেদব্যাসের তিরোধানের বহু পরে বৌদ্ধ যুগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বেদের কতকগুলি মন্ত্রও যে দুষ্ট হয় নাই তাহা নহে।

আমরা আরও অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে বেদের উক্ত কয়েকটি শব্দের বিষয় আলোচনা করিব। সমগ্র বেদে "পিতা" ও "মাতা", আর 'দ্যো' ও "পৃথিবী" এই কয়েকটী শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাই। মধ্যযুগের ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেবল প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্যকার শিষ্য শঙ্কর 'পিতা' শব্দের প্রকৃতার্থ জানিতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বম্—অর্থাৎ 'সকলের জন্মভূমি বলিয়া উহার নাম পিতা'। প্রশ্নোপনিষদে আছে, "পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ। পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্" (১২।১৬৪।১২)—অর্থাৎ, "যদি 'পিতা' (পিতৃভূমি) ও 'দিবের' (ত্রিদিবের) ভূমি পরিমাণ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে 'পিতা' পঞ্চপদে (বা পাঁচপোয়া) হইলে, দিং বা দ্যুলোক বার পোয়া হইবে, (অর্থাৎ 'পিতা' অপেক্ষা 'দিব' আড়াইগুণ বড়)। দিবের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পুরীষি বা জলময়"। 'পিতা' যে কোন জনপদের নাম তাহা বেশ বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে 'পিতা' কে?

একজন আর্য্যঋষি ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা। অর্থাৎ দ্যো আমাদিগের পিতা বা পিতৃভূমি, এবং পৃথিবী মাতৃভূমি। পৃথিবী মানে এখানে ভারতবর্ষ বুঝাইতেছে। বেণতনয় মহারাজ পৃথুর নাম হইতে ভারতের নাম পৃথিবী হইয়াছে। পরে ইহা জগৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ অতি প্রাচীনকালে মহী, ভূ, গো, পৃথিবী প্রভৃতি শব্দ ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। এমনকি আমরা কালিদাস, রসমঞ্জরিতে ও চরণব্যূহটীকাব্যে 'পৃথিবী' ও 'পৃথ্বী' শব্দ ভারতবর্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। আর "দ্যাবাপৃথিবী" 'দ্যো' ও 'পৃথিবী' মিলিয়া হইয়াছে ('মানবের আদি জন্মভূমির, চতুর্দ্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।')

কোন্ শব্দ কি অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা না বুঝাতে অনেক প্রকার

ভ্রমে পতিত হইতে হয় বলিয়া আমরা এতগুলি অবান্তর কথার অবতারণা করিলাম।

অতএব দেখা যাইতেছে যে 'পৃথিবী' (ভারত কিম্বা ভারতের একদেশ,) গান্ধার, পূর্ব্ব-তুর্কিস্থান ও মঙ্গোলিয়া প্রাচীনত্বে সমান। (ঋগ্‌বেদের প্রথম রচনার সময়ে,) আর 'সপ্তসিন্ধুর' আর্য্যগণ বাহির 'দ্যো' হইতে আসিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে 'দ্যো' কোথায়? 'দ্যো' অবশ্যই উপরিউক্ত স্থান সমূহের মধ্যে কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, যে হেতু ভূ-তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে অন্য কোনও স্থান হইতে আর্য্যদের এদেশে আসা সম্ভব ছিল না। আরও পূর্ব্বে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে 'দ্যো' 'যক্ষ', ও 'ইলা' বা ইলাবৃত একই জনপদের বিভিন্ন নাম মাত্র। এখন দেখা যাউক এই 'ইলা' বা 'ইলাবৃত বর্ষ' কোন্ স্থানে অবস্থিত।

হিন্দুরা তাঁহাদের সকল শাস্ত্রেই মেরু পর্ব্বতের (মেরুপ্রদেশ নহে) সানুদেশ ও ইলাকেই তাঁহাদের আদি নিবাস ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণিতে দেখিতে পাই যে, সেই মেরুপর্ব্বতের উর্দ্ধ-শৃঙ্গে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের বাসভবন ত্রয় বিরাজমান। এই মেরুপর্ব্বতে নানা রত্ন ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি পাওয়া যাইত এই জন্য ঋষিরা উহাকে 'কনকরত্নময়' বলিয়াছেন। আর এই মেরুপর্ব্বতের কথা আমরা গ্রীকসাহিত্যে (Meros বা মেরস্), মিসরসাহিত্যে (Meroe, or Mer, 'মেরো' অথবা 'মার'), এশি-রিয়াদের প্রাচীন পুস্তকে (Merukh or Merukha, 'মেরুখ') ও ইরাণদের 'জেন্দ-আভেষ্টায়' পাওয়া যায়। আর সকলেরই বিশ্বাস যে উহার সানুদেশে দেবতার বাস ও উহা নানাজাতীয় মণিমাণিক্যের আকরভূমি। এই বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। এখন এই যে মেরুপর্ব্বত, ইহা কোথায় অবস্থিত?

বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে 'মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্'। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে মেরুপর্ব্বত। অতএব আমরা দেখিতেছি যে মেরুপর্ব্বত 'ইলাস্থায়ী'। আর এই 'ইলাস্থায়ীর' অপভ্রংশ হইতেছে বর্ত্তমান 'আলটাই'। সুতরাং 'আলটাই' ও মেরুপর্ব্বত অভিন্ন। আর মেরুপর্ব্বতকে ঘিরিয়া আছে যে দেশ তাহাই 'ইলাবৃত' বা বর্ত্তমান 'মঙ্গোলিয়া'। আমরা মঙ্গোলিয়াকে ইলাবৃতবর্ষ বলিতেছি কেন তাহার আরও কারণ আছে। কিন্তু 'ইলা' যে হিমালয়ে কিম্বা কাশ্মিরের কোন এক স্থানে অবস্থিত তাহা অবিনাশ বাবু কোথায় পাইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অবিনাশ বাবু যদি সে কথা আমাদের

বলিয়া দেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বেদে কিন্তু এমন কোনও নিদর্শন পাই না যে 'ইলা' কাশ্মিরে। বেদে কেন—হিন্দুর কোনও শাস্ত্রে এ কথা নাই। মোট কথা, 'it is very probable if our Surmise be correct', কিম্বা 'I think' দ্বারা সত্যানুসন্ধান হয় না। সত্যকে পাইতে গেলে সাধনার আবশ্যক।

আর এক কথা—ইলাবৃত হইতেছে দেবতাদের আদি জন্ম ভূমি। ইহা বেদে বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে। অবিনাশ বাবু 'দেবতাদের আদি-গেহের' কথা উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তবে কেন যে তিনি আবার তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, 'দেবতাদের আদিগেহ' ও 'আর্য্যদের আদিজন্মভূমি' সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভিতর বেশ একটু 'খটকা' লাগিয়াছিল। কিন্তু অবিনাশ বাবু ভাল মানুষের মত তাহা স্বীকার না করিয়া মনের 'খটকা' মনেই চাপিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে কিন্তু তাঁহার সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। যাহাতে কাহারও সন্দেহ না থাকে, সেইজন্য আমরা কয়েকটী মন্ত্রের অধ্যাহার করিলাম। যথা, ইলঃ পতির্মঘবা। ৪।৫৮।৬ম, অর্থাৎ, মঘবান্ (অর্থাৎ ইন্দ্র) ইলার পতি। (৪৫।৪০।১ম ও ৮।২।৭ম মন্ত্র দুইটীও দ্রষ্টব্য)।

মঙ্গোলিয়াই যে ইলাবৃতবর্ষ তাহার আরও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আপনারা এশিয়ার মানচিত্র মনে করুন। বিষ্ণুপুরাণ ২০।৮।২ শ্লোকে বলিতে-ছেন—"সেই দেব পর্ব্বত—মেরুর উত্তরদিকে মেরুপ্রদেশে (North Pole) অবস্থিত। ঐ মেরুপ্রদেশ সমগ্র দ্বীপ ও নববর্ষের উত্তরদিকে সংস্থিত, একারণ তথায় সর্ব্বদাই দিন ও সর্ব্বদাই রাত্রি হইয়া থাকে।" এখন নববর্ষ—কি কি?

১। উত্তর কুরু বর্ষ—
২। হিরণ্ময় বর্ষ—
৩। রম্যক বর্ষ—
} ত্রিদিব বা দিব

৪। ইলাবৃত বর্ষ (বেদী, যজ্ঞ বা দ্যো)
৫। হরি বর্ষ—
৬। কিম্পুরুষ বর্ষ—
৭। ভারত বর্ষ—

৮। ভদ্রাশ্ব বর্ষ—

৯। কেতুমাল বর্ষ—

এই নয়টি বর্ষ। এই নববর্ষের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ কোন্ স্থানে? বায়ুপুরাণ ৩৪ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে বলিতেছেন,—

" 'বেদী' শেষ সীম 'ইলা', উহার দক্ষিণে তিনটী বর্ষ ও উত্তরে তিনটী বর্ষ, ঐ ছয়টী বর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে বেদী ইলাবৃত। উহার মধ্যে মেরু পর্ব্বত।" তবে দেখা যাইতেছে যে এসিয়ার উত্তর সীমায় মেরু প্রদেশ (North Pole), তাহার দক্ষিণে উত্তর মহাসাগর। আর এই উত্তর মহাসাগরের ঠিক দক্ষিণ ভাগে নয়টী বর্ষ এই ভাবে সংস্থিত—

মেরুপ্রদেশ—(North Pole)

উত্তর মহাসাগর (Arctic Ocean)

১। উত্তর কুরু বর্ষ
২। হিরণ্ময় বর্ষ
৩। রম্যক বর্ষ
} ত্রিদিব বা Siberia

৪। ইলাবৃত বর্ষ বা Mongolia
(যাহার মধ্যে 'আলটাই' বা মেরু পর্ব্বত)

৫। হরিবর্ষ বা Chinese Turkistan

৬। কিম্পুরুষ বর্ষ বা Tibet

৭। ভারতবর্ষ।

৮। কেতুমাল বর্ষ বা Afghanistan, Persia and Turky

৯। ভদ্রাশ্ববর্ষ or China.

এখন বোধ হয় আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে জম্বুদ্বীপ (Asia) মহাজনপদের কোন্ স্থানে ইলাবৃত বর্ষ বা আর্য্যদের আদিগেহ সংস্থিত।

(আগামী বারে সমাপ্য)

আনন্দের শিশু।

(শ্রীঅবণীমোহন চক্রবর্ত্তী।)

অসীম আকাশ ভরিয়া
নিতেছ ভুবন লুটিয়া
পাগল অনিল ওরে,
ছুটিয়া টুটিয়া পড়েছ লোটিয়া
নিবিড় বাহুর ডোরে,
পাগল অনিল ওরে।

পাখীরা গাহে যা' গগনে
ফুলে যে সুরভি গোপনে
সকলি নিতেছ হরি'।
করুণ করেছ বুকটী তোমার
গন্ধ ও গান ভরি'
সকলি নিতেছ হরি'।

রঙিনে শ্যামলে কোমলে
বুলালে পরশ বুলালে
কি মধুর মাখামাখি।
ডুবিছ জোছনা-রূপের সাগরে
লাবণী লইছ মাখি,'
কি মধুর মাখামাখি!

ভ্রমর চকোর সহজে
লুটিতে নিপুণ এত যে
তেমন পারেনি তা'রা,
যেমন লুটিয়া ভরেছিস্ বুক্
ওরে ও পাগল পারা,
তেমন পারেনি তা'রা।

লীলায় লীলায় হেলিয়া
ফিরিস্ উধাও বহিয়া
শুধু বাঁশী শুধু খেলা,
কেবলি বাঁধন কেবলি হরণ
মধুর মিলন-মেলা,
শুধু বাঁশী শুধু খেলা।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শুধু কাজ লইয়া যাহাদের একতার বাঁধন, কাজ ফুরাইলেই তাহাদের একতাও ফুরাইয়া আসে। ধরা পড়িবার পর আমাদের কতকটা সেই দশা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা বিপ্লবপন্থী তাঁহারা সকলেই এক ভাবের ভাবুক নহেন। দেশের পরাধীনতা দূর হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু স্বাধীন হইবার পর দেশকে কিরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তাহার পর আমরা যে ধরা পড়িলাম, তাহা কতটা আমাদের নিজেদের দোষে, কতটা ঘটনাচক্রের দোষে—তাহা লইয়াও আমাদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলিত। বাহিরে কাজকর্ম্মের তাড়ায় যে সমস্ত ভেদ চাপা পড়িয়া থাকিত, ধরা পড়িবার পর তাহা ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

একদল শুধু ধর্ম্মচর্চ্চা লইয়াই থাকিত, আর যাহারা বিশুদ্ধ অর্থাৎ ইউরোপীয় রাজনীতির উপাসক তাহারা ঐ দলকে ঠাট্টা করিয়া দিন কাটাইত। ঐ সময় আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র "ভক্তিতত্ত্ব কুজ্ঝটিকা" কথাটার সৃষ্টি করেন। ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিলে নাকি মানুষের বুদ্ধি ঘোলাটে হইয়া যায় আর সে কাজের বাহির হইয়া পড়ে! ডকের মধ্যে বসিয়া উভয় দলেরই প্রচার কার্য্য চলিত। দেবব্রত ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, হেমচন্দ্র ধার্ম্মিকদিগের নামে ছড়া ও গান বাঁধিতেন। বারীন্দ্র এককোণে দুএকটী অনুচর লইয়া কখনও বা ধর্ম্মালোচনা করিত কখনও বা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। আমি উভয় দলেরই রসাস্বাদন করিয়া ফিরিতাম।

এই হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতেন—অরবিন্দ বাবু। কোন কথাতেই হাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুদ্ অদ্ভুদ্ গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন; ভাত খাইবার সময় আরস্থলা, টিকটীকি ও পিঁপড়েদের ভাত খাইতে দেন; স্নান করেন না, মুখ ধোন না, কাপড় ছাড়েন না—ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কুলাইত না। মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না, কিন্তু দেখিতাম যে অরবিন্দ বাবুর চুল যেন তেলে চক্চক্ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল দেন?" অরবিন্দ বাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—"আমি ত স্নান করি না।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার চুল অত চক্চক্ করে কি করিয়া?" অরবিন্দ বাবু বলিলেন—"সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কতকগুলা পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমার শরীর হইতে চুল বসা (fat) টানিয়া লয়।"

দুই একজন সন্ন্যাসীর ওরূপ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝি নাই। তাহার পর ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে অরবিন্দ বাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে, তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে চিত্তের বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই একজনকে তাহা দেখাইলাম, কিন্তু কেহই অরবিন্দ বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি সাধন করে কি পেলেন?" অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"যা খুঁজছিলাম, তা পেয়েছি।"

তখন আমাদের সাহস হইল, আমরা তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জগতের যে অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিলাম তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা নহে; তবে এই ধারণাটী হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে এই অদ্ভুদ্ মানুষটীর জীবনে একটা সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া তিনি যে সমস্ত তান্ত্রিক সাধনা

করিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। সে সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দ বাবু বলিলেন যে একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্মশরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান। মোকর্দ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আমি ছাড়া পাব।"

ফলে তাহাই হইল। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরে যখন রায় বাহির হইল তখন দেখা গেল সত্যসত্যই অরবিন্দ বাবু মুক্তি পাইয়াছেন। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁশির আর দশজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। বাকি অনেকের পাঁচ সাত দশ বৎসর করিয়া জেল বা দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইল। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া উল্লাসকর হাসিতে হাসিতে জেলে ফিরিয়া আসিল, বলিল—"দায় থেকে বাঁচা গেল।" একজন ইউরোপীয় প্রহরী তাহা দেখিয়া তাহার একজন বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন—"Look, look, the man is going to be hanged and he laughs (দেখ, দেখ, লোকটার ফাঁসি হইবে, তবু সে হাসিতেছে)। তাহার বন্ধুটী আইরিস, সে বলিল—"Yes, I know, they all laugh at death" (হাঁ, আমি জানি, মৃত্যু তাহাদের কাছে পরিহাসের জিনিষ!)

১৯০৯এর মে মাসে রায় বাহির হইল। আমরা পনের যোল জন মাত্র বাকি রহিলাম; বাকি সবাই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমরাও হাসিতে হাসিতে তাহাদের বিদায় দিলাম; কিন্তু সে হাসির তলায় তলায় একটা যেন বুকফাটা কান্না জমাট হইয়া উঠিতেছিল। জীবনটা যেন হঠাৎ অবলম্বন শূন্য হইয়া পড়িল। পণ্ডিত হৃষিকেশ মুর্ত্তিমান বেদান্তের মত বলিয়া উঠিলেন—"আরে কিছু নয় এ একটা দুঃস্বপ্ন।" হেমচন্দ্র বুকে সাহস বাঁধিয়া বলিলেন—"কুচ্ পরোয়া নেহি; এ ভি গুজর যায়েগা" (কোন ভয় নেই; এ দিনও কেটে যাবে); বারীন্দ্র ফাঁসির হুকুম শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"সেজ দা (অরবিন্দ) বলে দিয়েছে ফাঁসি আমার হবে না।" আমিও সকলকার দেখাদেখি হাসিলাম; কিন্তু বীরের মন যে ধাতু দিয়া গঠিত হয়, আমার মন যে সে ধাতু দিয়া গঠিত নয় তাহা এইবার বেশ ভাল করিয়াই দেখিতে পাইলাম। মনটা যেন নিতান্ত অসহায় বালকের মত দিশেহারা হইয়া উঠিল। বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাইয়া দিতে হইবে।

উঃ! এর চেয়ে যে ফাঁসি ছিল ভাল! এ কি সাজা, ভগবান, এ কি সাজা!

ভগবান্ বলিয়া যে একজন কেহ আছেন এ বিশ্বাসটা কয়েকবৎসর ধরিয়া আমার বড় একটা ছিল না। ছেলেবেলা একবার বৈরাগ্যের ঝুলি কাঁধে লইয়া সাধু সাজিতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন ভগবানের উপরে ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব বেশ একটা ছিল। মায়াবতীর মঠে স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট নিগুণ ব্রহ্মবাদে দীক্ষিত হইবার পর ধীরে ধীরে সে ভক্তি ও বিশ্বাস কোথায় শুকাইয়া গেল। স্বামীজী বিদ্রূপ ও যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিয়া যখন আমার ভগবানটাকে নিহত করেন সে দিনের কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। এই বিশাল মায়ার সমুদ্রের মাঝখানে একাকী ডুব সাঁতার কাটিতে কাটিতে একেবারে হিমাঙ্গ হইয়া ও পারে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উঠিতে হইবে ভাবিয়া আমার রক্ত একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছিল। নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে ডুব দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকার নামই মুক্তি—এ তত্ত্ব আমার মাথার মধ্যে বেশী দিন রহিল না। চরম তত্ত্ব বলিয়া একটা কিছু মানুষ আপনার জ্ঞানের মধ্যে পাইয়াছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে আরম্ভ করিয়া জাগ্রত অবস্থা পর্য্যন্ত সব অবস্থাগুলাই অনন্তের এক একটা দিক মাত্র, এ দুই অবস্থার উপরে ও নীচে এরূপ অনন্ত অবস্থা পড়িয়া আছে। সেই অনন্তের মধ্যে একটা কিছু সত্য আছে যাহা মানুষের জীবনে কর্ম্মরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং জীবনকে ছাড়িয়া পলাইতে যাইব কেন?

কর্ম্মকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত লেলে আসিয়া যখন আমাদের মধ্যে ভক্তি-মূলক সাধনা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন তখন মহাবিজ্ঞের ন্যায় তাঁহার ভক্তিবাদকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। সবটাই যখন সেই অনন্তের মূর্ত্তি তখন ভগবানের একরূপ ছাড়িয়া অন্যরূপ ধ্যান করিবার সার্থকতা কি? লেলে তখন শুধু এই কথাটী বলিয়াছিলেন—"যাহা বলিতেছ তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর আমার বুঝাইবার কিছু নাই, কিন্তু অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতেরও স্থান আছে, এ কথা ভুলিও না।"

আজ যখন বিধাতা জোর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন, তখন নিজের মধ্যে কোন অবলম্বনই খুঁজিয়া পাইলাম না। একটা

অজ্ঞাতপূর্ব্ব আশ্রয় পাইবার জন্ম চঞ্চল হইয়া উঠিলাম; প্রাণটা কাতর হইয়া বলিতে লাগিল—"রক্ষা কর, রক্ষা কর"।

বিপদে পড়িলে আর কিছু লাভ না হোক, মানুষ নিজেকে চিনিবার অবসর পায়। কঠোর নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাহাই আরম্ভ হইল। সেসন্স কোর্টের রায় বাহির হইবার পর হইতেই আমাদের পায়ে বেড়ী লাগাইয়া কুঠরীর মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইল। সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় এক একবার মনে হইত যেন পাগল হইয়া গেলাম। মাথার ভিতর উন্মত্ত চিন্তার·তরঙ্গ যেন মাথা ফাটাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দিন কাহারও সহিত কথা কহিবার জো নাই।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া আছি এমন সময় পাশের কুঠরীতে একটী ছেলে চীৎকার করিয়া গান গাহিয়া উঠিল। তাল মান লয়ের সহিত সে গানের বড় একটা সম্বন্ধ নাই, কিন্তু সে গান শুনিয়া খুব এক চোট হো হো করিয়া হাসিয়া আর মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া যে আমার প্রচণ্ড মাথাধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহা বেশ মনে পড়ে। গান শুনিয়া চারিদিক হইতে ইউরোপীয় প্রহরীরা ছুটিয়া আসিল, এবং পরদিন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের বিচারে বেচারার চারদিন চালগুঁড়া সিদ্ধ (Penal diet) খাইবার ব্যবস্থা হইল।

আর একটী ছেলে একদিন দেওয়াল হইতে চুণ খসাইয়া দরজার গায়ে লিখিয়া রাখিল—Long live Kanailal!"—তাহারও চারদিন সাজা হইল।

প্রহরীদের মধ্যে সকলেই আমাদের জব্দ করিবার চেষ্টায় ফিরিত; কিন্তু দু একজন বেশ ভালমানুষও ছিল। আমাদের মধ্যে যাহারা সাজা খাইত তাহাদের জন্ম একজন ইউরোপীয় প্রহরীকে পকেটে করিয়া কলা লুকাইয়া আনিতে দেখিয়াছি। চুপি চুপি কলা খাওয়াইয়া বেচারা পকেটে পুরিয়া খোসাগুলি বাহিরে লইয়া যাইত।

একজন লম্বা চৌড়া হাইলাণ্ডর প্রহরী মাঝে মাঝে আমাদের জ্বালাতন করিয়া আপনার প্রহরী জন্ম সার্থক করিত। আমরা তাহার নাম দিয়াছিলাম "Ruffian warder"। মাঝে মাঝে সে আমাদের বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিত যে সে ও তাহার স্বজাতিরা ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার জন্ম এখানে আসিয়াছে। কিন্তু সকলের চেয়ে মিষ্টমুখ শয়তান ছিল চিফ্ ওয়ার্ডার স্বয়ং।

সে আবার মাঝে মাঝে ধর্ম্মের তত্ত্বকথাও আমাদের শুনাইত; এবং আশা দিত যে জীবনের বাকি কয়টা দিন সৎ হইয়া চলিলে স্বর্গে গিয়া আমরা ইংরাজের মত ব্যবহারও পাইতে পারি। হায়রে ইংরাজের স্বর্গ! জেলখানার মধ্যে গালাগালি, মারামারি সবই সহ্য হয়; কিন্তু ধর্ম্মের বক্তৃতা সহ্য করা দায়।

আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র চিত্র-বিদ্যায় বেশ নিপুণ। তিনি দেওয়ালের শ্যাওলা, চুণ, ইটের গুড়া ঘসিয়া নানারূপ রং প্রস্তুত করিয়া সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়ালের গায়ে আঁকিয়া রাখিতেন। প্রহরীদের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য মাঝে ২ কাগজের উপর নখ দিয়া নানারূপ ছবিও তাহাদিগকে আঁকিয়া দিতেন।

যাঁহারা চিত্রবিদ্যায় নিপুণ নন, তাঁহারা মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে কবিতা লিখিয়া মনের খেদ মিটাইতেন। একদিন এক কুঠরীর মধ্যে গিয়া দেখিলাম একজন অজ্ঞাতনামা কবি দেওয়ালের গায়ে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—

ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোণার বরণ হৈল কালি।
প্রহরী যতেক বেটা বুদ্ধিতে ত বোকা পাঁটা
দিন রাত দেয় গালাগালি॥

আমাদের সে সময় কাজ ছিল পাট ছেঁড়া।

মাঝে মাঝে এক আধটী বেশ ভাল কবিতাও নজরে পড়িত। আমার মনের ফাঁদে কবিতা প্রায় ধরা পড়ে না, কিন্তু এই দুই ছত্র কিরূপে আটকাইয়া গিয়াছিল—

"রাধার দুটী রাঙ্গা পায়—
অনন্ত পড়েছে ধরা—
উঠে ভাসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা"

হায়রে মানুষের প্রাণ। জেলের কুঠরীর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াও রাধার দুটী রাঙ্গা পায় আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

সেসন্স কোর্টে রায় বাহির হইবার পর হইতেই—হাইকোর্টে আমাদের আপিলের শুনানি চলিতেছিল। নভেম্বর মাসে রায় বাহির হইল। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম বদ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইল।

অনেকের কারাদণ্ড কমিয়া গেল, কেবল হেমচন্দ্রের ও আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

পাছে দড়ি পাকাইয়া ফাঁসি খাই সেই ভয়ে আমাদের পাট ছিঁড়িতে দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই যাহারা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত, তাহারা ভিন্ন অপর সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আমরা আণ্ডামানের জাহাজের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম।

অসময়ে

[শ্রীমতী নলিনীবালা ঘোষ।]

আজিকে আমার সনে কি খেলা খেলিবে প্রিয়।
কাজ নাই, তুমি গুণ্ঠিত কর প্রেমের উত্তরীয়।
দীর্ণ এ হিয়া আছে শত কাজ,
কেমনে তোমায় বরিব গো আজ ?
ধূলিময় গৃহে তুলিব তোমায় কেমন করে ?
এত দিন পরে এলে যদি এত অসময় ক'রে।

সে দিন কি তুমি চাহ নাই মোরে জীবন-প্রিয়।
লাগে নাই ভাল মোর আরাধনা হে মোর বন্দনীয়।
হৃদয়ের সেই প্রেম প্রীতি ঢালা
গেঁথে রেখেছিনু শুভ্র সে মালা
অনাদরে হায় দলগুলি তার পড়েছে ঝরে,
সৌরভ তার একটুকু নাই যাও সখা যাও ফিরে।

এখন কি করে নূতন হয়ে বাসর সাজাতে পারি
কাননে আমার কোনো ফুল নাই নিঃশেষে গেছে ঝরি'
হৃদয় হয়েছে শুষ্ক কঠিন
ভুলে কি গিয়েছ হে চির নবীন!
দাও নি মোরে তব প্রেম বারি—কতদিন বল হবে।
শুষ্ক ভূমিতে কি করিয়া সখা কুসুম ফুটিবে তবে ?

জানিতাম যদি বন্ধু আমার আবার আসিবে ফিরে
রাখিতাম তবে জীবন মোর সরস মধুর করে,
ডাকিবার আগে বন্ধু আমায়
অর্ঘ্য আনিয়া ঢালিতাম পায়
ক্লান্তি তোমার মুছিয়া নিতাম আমার সে প্রেম দিয়া
এখন তোমায় কি দিয়া পূজিব শূন্য এ মোর হিয়া।

যদিও হে সখা! চিরদিন তুমি আমার বন্দনীয়
তবুও তোমায় শুষ্ক এ বুকে ধরিতে পারি না প্রিয়!
তোমার প্রেম-সলিলে যেদিন
সিক্ত করিবে উষর কঠিন
জীবন আমার, সেদিন আবার আসিও আমার দ্বারে
অসময়ে আজ চাহি না তোমায় যাও সখা যাও ফিরে

পতিতার সিদ্ধি।

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৮)

অনেকক্ষণ চারুর প্রত্যাশায় বসিয়াও যখন রাখু দেখিল, সে ফিরিল না, তখন সে গালিচা হইতে উঠিল। দোরের কাছে আসিয়া দেখিল, চারু সন্তর্পণে সে কবাট বন্ধ করিয়া গিয়াছে। খুলিয়া বাহিরে আসিতেই ঝড়ের ভাব সে অনেকটা বুঝিতে পারিল। বাহিরে বিষম অন্ধকার। চারুর ঘর হইতে যে আলোটা তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, রাখু সেটাকে আর দেখিতে পাইতেছে না। তবে কি সে তাহার ব্যবহারে সংক্ষুব্ধ হইয়া ঘরে গিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়াছে? কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সে সেই নিবিড় অন্ধকারের পানে চাহিয়া বাতাসের গর্জ্জন আর বৃষ্টির পতন শব্দ

শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াই বুঝিল, তাহাকে যাইতে না দিয়া চারু তাহার প্রতি পরম হিতৈষিণীর ব্যবহার দেখাইয়াছে। বাতাস যেন তাহার অকৃতজ্ঞতার উপর কুপিত হইয়া তাহার শীত-কম্পিত দেহে চারুর দয়ার আবরণ স্বরূপ সেই সুন্দর গবদখানা বার দুই তিন কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। রাখু এতক্ষণ পরে বুঝিল, এ জাতিহারা কুলহারা দেহ-ব্যবসায়িনী নারী অন্ততঃ তাহার পক্ষে আজ জাতির অতীতা, দু[illegible]নী, আকাশ-কুসুমে রচা দেবী।

রাখু মনে মনে স্থির করিল, পাহারা ত করিবেই,—তাহার অন্তরালে করিবে না। চারু পাত্র-পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে, আর সে তাহার নির্দ্দেশমত দ্রব্য মুখে তুলিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করিবে। প্রথমে সেই দুয়ারে দাঁড়াইয়াই বার তিন চার সে চারুর নাম ধরিয়া ডাকিল—উত্তর পাইল না। এক উগ্রপ্রকৃতির উৎপা[illegible] অস্তিত্ব ছাড়া এ-বাড়ীর কোনও স্থানে সে অন্য জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করিল না। চারু যদি একটু আগে তাহাকে দেখা না দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার ঠিক মনে হইত—এক প্রাণশূন্য বাড়ীর ভিতর, এক বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টির সম্মুখে সে একাকী অবস্থান করিতেছে।

যথাসম্ভব উচ্চ চীৎকারে রাখু আর একবার চারুকে ডাকিল। ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা হুঙ্কারে তাহার কথা ডুবাইয়া দিল। সে এবারে স্থির করিল, চারুর ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিবে। কিন্তু সে অপরিচিত বাড়ীর অপরিচিত অন্ধকার তাহাকে ত পথ বলিয়া দিবে না। তথাপি সাহসে ভর করিয়া সে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া সেই পথের কিছুদূর অগ্রসর হইল।—বুঝিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই সে সিঁড়ির মুখে উপস্থিত হইবে। কিন্তু সেখানে তাহার পদস্খলনের বিশেষ সম্ভাবনা। সে দেখিয়াছিল, সিঁড়ির মাথা সরু বারান্দাটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। আলোকের একটু সামান্য মাত্র আভাষ না পাইলে এবারে তাহার অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে আকাশের কাছ হইতে একটু বিদ্যুৎ-রেখা ভিক্ষা করিল। আকাশ সদয় হইল না, কিন্তু বাতাস কি-জানি-কেন করুণার্দ্র হইয়া চারুর ঘরের একটি বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিল। সে আলোকে বেশী কিছু বুঝিবার না থাকিলেও সে এইটিমাত্র বুঝিল যে, চারুর ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে। হয় সে এখনও জাগিয়া আছে, নয় জানালা বায়ুবশে মুক্ত হওয়ায় সে এখনি জাগিয়া উঠিবে।

সেইখানে সে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। যদি চারু না ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মুক্ত জানালা বন্ধ করিতে উঠিবে। জানালার কাছে আসিলেই সে তাহাকে ডাকিবে। এর অতিরিক্ত সাহস তাহার হইল না। তবে তাহার অনুমানটা ঠিক হইল। সত্য সত্যই রাখু সেই জানালার ফাঁকের ভিতর দিয়া একখানি হাতের যেন ছায়া দেখিল। সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া ডাকিল—

"চারু!"

উত্তর আসিল না, কিন্তু জানালাটা ধীরে ধীরে একটু বেশী করিয়া খুলিয়া গেল। রাখু দেখিল, হাতখানা পার্শ্বের দিক হইতে জানালাটাকে খুলিয়া আবার অন্তর্হিত হইল। সে আর একবার একটু জোর গলায় ডাকিল—

"চারু!"

তথাপি চারুর কোনও উত্তর আসিল না। তবে সেই খোলা জানালার মধ্য দিয়া এমন একটু আলোকের আভাষ আসিল, যাহাতে সে দেখিল—সিঁড়ির মাথা দিয়া সম্মুখের বারান্দায় যাইতে একজনের যাইবার যোগ্য একটি পথ রহিয়াছে। সেটা ধরিয়া চলিলে তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকিবে না বুঝিয়া রাখু চারুর ঘর দেখিতে অগ্রসর হইল।

(৯)

সমস্ত বাড়ীটার ভিতরে একমাত্র রাখুই যেন জাগিয়া আছে। জাগিয়া আছে চোরের মত গৃহস্থের ঘর হইতে, পারে যদি, যেন তাহার সর্ব্বস্ব লুটিবার জন্য। কিছুদূর যাইতেই রাখুর মনে ওই ভাবটা জাগিয়া উঠিল। রাখু মনে মনে বলিল, তাই ত আমি এ কি করিতেছি। চারু জানে না, বাড়ীর আর কেহ কিছু জানে না। যদি কেহ হঠাৎ জাগিয়া তাহার এই চোরের গতি লক্ষ্য করে? তাহার চলিবার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, তাহার দুরভিসন্ধিটাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া এই অন্ধকারে কোন লুকিয়ে থাকা প্রহরী হঠাৎ একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে? তখন রাখুর কৈফিয়ৎ দিবার উপায় থাকিবে না। দিলেই বা কে সে কথা বিশ্বাস করিবে? চারুই কি করিবে? সে তাহার পরিচর্য্যার যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে, তাহার উপরে রাখুর এমন কিছু প্রাপ্তব্য নাই, যে জন্য তাহাকে একটা ঘুমন্ত স্ত্রীলোকের দরজায় গিয়া ঘা দিতে হয়।

কথাটা মনে হইতেই রাখু আর বেশী যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিল না। সে কিন্তু ফিরিবার সঙ্গেই তাহার প্রাণ হঠাৎ কি এক রকম ব্যাকুলতায় সে-রাত্রির

ঝড়ের আর্ত্তনাদ তাহার ফিরিবার গতিকে জড়াইয়া ধরিল। সেইখানেই দাঁড়াইয়া তখন তীব্রদৃষ্টিতে সে সেই মুক্ত জানালার দিকে চাহিল। চাহিতেই দেখিল, চারু যেন জানালার পার্শ্বে মুখটি আনিয়া, কার যেন সন্ধানে, দৃষ্টি দিয়া অন্ধকার ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আর একবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে না ডাকিতে চারু ধীরে জানালার একটা কপাট বন্ধ করিল। রাখু আর স্থির থাকিতে পারিল না;— দ্বিতীয় জানালা বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই সে অন্ধকারের সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

কিন্তু যাইয়া, কই সে চারুকে ত দেখিতে পাইল না। তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল, বাতাসের ভরেই জানালাটা খুলিতেছে, আবার বন্ধ হইতেছে।

প্রথমে সে জানালার ভিতর দিয়া ঘরটার যতটুকু অংশ পাইল, দেখিয়া লইল। এমন সুসজ্জিত সুন্দর ঘর সে জীবনে আর কখনও দেখে নাই। দেব-পূজার কাজ করিতে সে দুই একজন বড় মানুষের ঘরে যাতায়াত করে, কিন্তু ঠাকুর ঘরটি ছাড়া তাহাদের আর কোনও ঘর দেখা আজিও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

সে ঘরের ভিতরে অরগ্যান দেখিল, সোফা দেখিল সর্ব্ব-শেষে ঘরের এক প্রান্তে সিঁড়ি-দিয়া-ওঠা একটি অতি সুন্দর পালঙ্ক দেখিল। পূর্ব্বের দু'টা সে কখনও দেখে নাই, সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও সে ভাল রকম বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পালঙ্ক সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। তবে এমন সুন্দর পালঙ্ক সে কোনও কালে দেখে নাই; সিঁড়ি দিয়া যে তাহার উপর উঠিতে হয়, কোন কালে স্বপ্নেও সে ধারণা করিতে পারে নাই।

দেখিয়া রাখু কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। এত ঐশ্বর্য্য তার! আর এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও তার কিনা এত বিনয়! দাসীর মত সে কি না হীন পূজারী রাখুর সেবা করিতেছে! আপনাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে রাখু এ সেবার অধিকার দাবী করিতে পারিল না। কলিকাতায় আসিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে সে রাঁধুনী পূজারী বামুনগুলার গৃহস্থের মেয়েছেলেদের কাছে আদর-সম্মান দেখিয়াছে। হ'ক পতিতা, সভ্য গৃহস্থের কাছে পাওয়া সম্মানের সঙ্গে এই পতিতা নারীর নিকট প্রাপ্ত সম্মানের তুলনা করিয়া রাখু তাহার কাছে বামুনাই দেখানো অতি মূর্খের কার্য্য মনে করিল। সে স্থির করিল, আর একবার দেখা হইলে এই পতিতাকে সম্মুখে বসাইয়া, তাহার নৈবেদ্য

ভক্ষণ করিতে করিতে, জীবনের সমস্ত দুঃখ-কাহিনী তাহাকে শুনাইয়া দিবে! রাখুর যেন মনে হইল, এতদিন পরে তাহার অন্তরের কথা শুনিবার লোক মিলিয়াছে।

কিন্তু কোথায় সে? অমন সুন্দর পালঙ্কের উপর একমাত্র সেই সুন্দর দেহখানিই আশ্রয় লইবার অধিকারী, এইটিই রাখুর মনে লইয়াছিল; কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহুক্ষণের চেষ্টাতেও কথায় তাহাকে সে দেখিতে পাইল না। তখন সেখান হইতে ঘরের যেখানটার যতদূর দেখা যায়, ক্ষুধিত তারা দু'টা দিয়া সে চারুকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিতে পাইল না। তৎপরিবর্তে সে দেখিল, ঘরের অন্যপ্রান্তে বহু স্থান ব্যাপিয়া এক সুন্দর শতরঞ্চ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার উপরে এক শুভ্র চাদর। তাহার উভয় পার্শ্বে সারি দেওয়া তাকিয়া। মধ্যের একস্থানে একটি হারমোনিয়ম, বাঁয়া ও তব্‌লা। হারমোনিয়মের অন্তরালে—জানালার কবাট যতটা মুক্ত করিবার করিয়া, চক্ষু দু'টাকে গরাদের ফাঁকে যতটা পুরিবার পুরিয়া—রাখু দেখিল, চারু যেন—'যেন' কেন, তাহার নিশ্চিত বোধ হইল—চারুই মাটীর দিকে মুখ করিয়া মুক্তকেশগুচ্ছে পিঠটা ঢাকিয়া শুইয়া আছে। ক্রমে নিশ্চয়তাটা তার অধিক দূর চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সে বেশ বুঝিল, চারু ফরাসের উপরে নাই,—মেঝের উপরই মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে।

তাহার আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া তবে কি চারু কাঁদিতেছে? মনে হইতেই তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া এক সঙ্গে কতকগুলা ভাব কিছু এলোমেলো রকমে ঝড়ের প্রবাহে ছুটিয়া গেল। আর কোনও ভাব সেখানে নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলেও একটা বিষাদ-মাখা স্মৃতি অতিদূর দেশ কাল অতিক্রম করিয়া তাহার হৃদয়ের খানিকটা স্থান এরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে দখল করিয়া বসিল যে, রাখু তাহাকে মন হইতে মুছিতে গিয়া, না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বহুদিন পূর্ব্বে নিজের পর্ণকুটীরের একটা কোণে মাটীর মেঝের উপর সে একবার এইরূপ ছবি দেখিয়াছিল। ছবিখানা আজিকার মত এক নির্দ্দয় ঝঞ্ঝায় এক যুগ পূর্ব্বে কলিকাতায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তার কোন্ ভাগ্যবশে করুণায় ভরা যুগের বাহুতে ভর দিয়া আজই যেন সে ঝড়ের বুক ভাঙ্গিয়া এই কোঠাবাড়ীর দোতালায় উঠিয়াছে। ছবি দুইটার তুলনা করিতে তাহার সম্পূর্ণ সাহস হইল না। না হইলেও তাহার চক্ষু সাহস করিয়া দু' ফোঁটা জলে এই উভয় চিত্রের সামঞ্জস্যকে অভিবাদন করিল।

কতকটা কারণ বুঝিবার ইচ্ছায়, কতকটা যেন নব-সঞ্জাত মমতায়, চারুকে সে তুলিবার মন করিল। কিন্তু এখন আর চারুর নাম ধরিতে তাহার সাহস হইতেছে না। উভয়ের অবস্থানে যে অনেক প্রভেদ। কিন্তু তাঁহাকে 'বাছা' বলাও আর সে যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছে না। বলিলে চারু যদি রাগ করিয়া উত্তর না দেয়? সে ডাকিল—

"ওগো!"

প্রথমে ঈষদুচ্চস্বরে। চারু নড়িল না। ঝড়ে শব্দ আবদ্ধ হইল মনে করিয়া বেশ একটু চীৎকারের মত করিয়া আবার ডাকিল—

"ওগো, ওগো—শুনছ?"

বারান্দার ঝিলিমিলির মধ্য দিয়া ঝঞ্ঝার টিট্‌কারী ছাড়া আর কিছু সে শুনিতে পাইল না। এবারে আর নাম না ধরিয়া সে পারিল না—

"ওগো চারু···চারু!"

জাগরণের চিহ্নস্বরূপ চারুর দেহ একটু নড়িল মাত্র, কিন্তু উত্তর সে দিল না। কেবল মুখটি রাখুর দিকে ফিরাইয়াই আবার সে নিশ্চল হইল। রাখুর বুকটা কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনেই বিপুল আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সে আবার ডাকিল,—কম্পনে স্বরের ভগ্ন-জড়তায় নামটা তার ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না। কিন্তু তাহাতেই সে দেখিল, পলায়নোন্মুখ ঘুমটাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য মুক্ত কেশরাশি দিয়া চারু তার চোক মুখ ঢাকিয়া দিতেছে।

রূপজ মোহ রাখুকে এক মুহূর্ত্তে সাহসী করিয়া তুলিল। হৃদয়ের প্রতি-স্পন্দন তাহাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। সে বুঝিল চারু জাগিয়া আছে, তাহার কথা শুনিতেছে, শুধু অভিমানভরে উত্তর দিতেছে না।

দেয়াল ধরিয়া রাখু অগ্রসর হইল। একটু যাইতেই তাহার হাত দোরের কবাটে ঠেকিল। বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা করিতে যেমন সে কবাটে হাতের একটু চাপ দিয়াছে, অমনি প্রবল বাত্যা তাহার করাঙ্গুলির প্রান্ত বাহিয়া দোরের উপর যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কবাট দু'টা একেবারে পূর্ণ উন্মুক্ত। একটা যেন পরীর বাসা অন্ধকারের পেটিকার মধ্যে লুকাইয়াছিল। আশ্রয়-লুব্ধ বাতাস রাখুর করাঙ্গুলিতে আবেগ জড়াইয়া তাহার ডালা খুলিয়া দিয়াছে। ঘরখানা এখন নবোঢ়া বধূর মত লজ্জাভরা উজ্জ্বল দৃষ্টি একবার মাত্র মুক্ত করিয়া ঘন নীলাবগুণ্ঠনে মুহূর্ত্তের ভিতরে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আসল কথা—সন্ধ্যা হইতে বিতাড়িত অন্ধকার ঝড়ের ফুৎকার অবলম্বনে ঘরের

ভিতরের আলোটাকে গ্রাস করিল। সঙ্গে সঙ্গে সভয় চমকের একটা আকস্মিক 'মোচড়ে' রাখুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। যেমন তাহার মনে হইল, আত্মহারা হইয়া এ আমি কি করিতেছিলাম, অমনি তাহার বুকের স্পন্দন সর্ব্বদেহে প্রসৃত হইয়া তাহাকে কাঁপাইয়া দিল। তাহার দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় সে যদি সিঁড়ির দিকে নরদেহধারী একটা চলিষ্ণু অন্ধকারকে না দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় সেই দোরের কাছেই বসিয়া পড়িত। তাহার বোধ হইল, কে যেন সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। আর সে দাঁড়াইল না। বারান্দার রেলিং ধরিয়া যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

(১০)

ঘুম রাখুর চোখ হইতে পলাইয়া গিয়াছে। এখন সে তাহাকে আবাহন করিতেও সাহস করিতেছে না। সে যেন বাত্যা-শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কাহার কথা শুনিতেছে। কে যেন মঞ্জীব-চরণা ঝড়ের পৃষ্ঠে অধীর মুখর পরশ চাপাইয়া তাহার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করাইতে শয্যার পাশে আসিতেছে! তাহার চক্ষু-পলকের কপটতা পরীক্ষা করিবার জন্য হাতে যেন তার একটা আলো। বাতাস সেটাকে নিবাইবার জন্য যত তরঙ্গের আঘাত করিতেছে, সেটা যেন আপনার স্নেহ আঁকড়িয়া ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

চোখ মুদিয়াই রাখু গরদ কাপড়ের খুঁটটা ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিতে ইচ্ছা করিল, পাছে ভুলে সে চোখ মেলিয়া ফেলে। কিন্তু ঢাকিতে গিয়া সে বুঝিল, সে কাপড়খানাও তার দুর্জ্জয় অন্যমনস্কতার জন্য কোন এক সময়ে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন সে পাশ ফিরিয়া দুই বাহুর ভিতরে মুখ লুকাইয়া কুকুর-কুণ্ডলীর মত পড়িয়া রহিল।

সহসা একটা চমক—জাগরণের সঙ্গে তন্দ্রার মিলন-মুখে বিরাট করুণ উপাখ্যানের শেষ নিঃশ্বাসের মত এক অব্যক্ত আক্ষেপ। সহসা একটা আলোক—স্তিমিত লোচনের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া তারার সঙ্গে আলাপ-প্রয়াসী যেন এক অতি কোমল অপাঙ্গ-লেখা। সহসা একটা স্পর্শ—সমীর বিক্ষিপ্ত পুষ্প-রাগের মত চারিদিক হইতে ঘিরিয়া-ধরা এক ব্যাকুল বেদনা ভরা স্নেহ।

রাখু চোখ মেলিল—

"একি! চারু?"

"ছি ছি, এমন কাজও করে! কাপড়খানা জলে যেন ভাসছে। আর একবার ওঠো, কাপড় ছেড়ে ফেল।"

"দেখ—।"

রাখু কাপড় ভিজার কৈফিয়ৎ দিতে যাইতেছিল। চারু বাঁধা দিয়া বলিল—

"দেখবো এর পরে—আগে ওঠো দেখি।"

অগত্যা রাখু উঠিয়া বসিল। উঠিতে গিয়া সে দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ আগে হইতেই একখানি সুন্দর শাল দিয়া আচ্ছাদিত হইয়াছে। বিস্ময়-মুগ্ধ, অবাক, সে চারুর মুখের পানে চাহিল দেখিল, চারু হাস্যময়ী, চেলীর মত রং করা, নানারকমের ফুল-কাটা পাড়ের আর একখানা কাপড় হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

এবারে আর সেখানে ক্ষুদ্র পিলসুজের উপর আগেকার সেই কৃপণ দীপ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে উচ্ছ্বাসের রাশি লইয়া একটি অপূর্ব্ব-সুন্দর আলোক-পুষ্প শতদীপের বদান্যতায় ঘরটাকে ভরিয়া দিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে চারু আবার বলিল

"আর ভেবে কি করবে? ও কাপড়ে তোমাকে আমি থাকতে দেব না। তাতে তোমার জাত থাক আর যাক। কি করব, তোমার বরাত। এই আমার কাপড় প'রেই তোমাকে রাত্রিবাস করতে হবে।"

কোনও কথা না বলিয়া, গাত্র-বস্ত্রটা বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া রাখু দাঁড়াইল। চারুও কোন কথা না বলিয়া কাপড়খানা তাহার হাতে দিল এবং রাখু যখন দৃষ্টি দিয়া কাপড়ের সৌন্দর্য্য আর দেহ দিয়া তাহার কোমলতা উপভোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখন হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—

"দেখো, যেন এ কাপড়খানাও ভিজিয়ো না। এবারে ভিজলে তোমাকে পাছাপেড়ে শাড়ী পরতে হবে।"

"আর ভিজবে না। আমি তোমার ঘরের দোরে গিয়েছিলুম কেন, জান?"

"আমাকে কৃতার্থ করতে।"

বলিয়াই চারু হাসিয়া উঠিল। হাসিটা রহস্যের এত ঘন স্পন্দনে মাখানো যে, তাহার প্রশ্নের অর্থ একটু গোলমেলেভাবে চারু গ্রহণ করিয়াছে, মনে করিয়া রাখু একটু অপ্রতিভ হইল। একেবারেই তখন সে বলিয়া উঠিল—

"না চারু!"

তার পর কাপড় পরিয়া ও শালখানা গায়ে আবার বেশ করিয়া জড়াইয়া গালিচায় পুনরুপবিষ্ট হইল।

চারুও ভিজা গরদখানা ঘরের একপাশে রাখিয়া গালিচার পার্শ্বে মেঝেতে বসিতে বসিতে বলিল—

"বেশ, তবে নয়।"

"তোমার দেওয়া খাবার খাব—তোমাকে বলতে গিয়েছিলুম।"

চারু আর উত্তর দিল না। শুধু দিল না নয়, রাখুর চোখের উপর শুধু মুখ-সৌন্দর্য্যটি ধরিয়া উর্দ্ধ-সন্নিবিষ্ট স্থির-দৃষ্টিতে যেন পাষাণের মত বসিয়া রহিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া রাখুও কিছুক্ষণ কোনও কথা কহিতে পারিল না। যখন একটা অতি সূক্ষ্ম বেদনার সুর-ভরা দীর্ঘশ্বাসে সে তাহাকে জীবন-রাজ্যে পুনরাগত মনে করিল, তখন বলিল—

"চারু আমায় কিছু খেতে দাও।"

চারু কেবল তারা দু'টা পলকে ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

কেন যে সে ওরূপভাবে বসিয়াছে, সেটা রাখুর বুঝিতে বাকী রহিল না। খাবার কথা সে নারী যে মুখ হইতে বাহির করিতে পারিতেছে না, এটা তাহার মনে হইল না। তাহার পূর্ব্বাচরণে নারীহৃদয়সুলভ যে অভিমান জাগিয়াছিল, চারু মিষ্ট ব্যবহারের আবরণে এতক্ষণ তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। অভিমান তার এখনও যায় নাই। আর সেই দুরন্ত অভিমানটাই জোর করিয়া তাহার ঠোঁটদুটি চাপিয়া আছে, চোক দু'টিকে পাতা দিয়া ঢাকিয়াছে।

আর কোনও কথা না কহিয়া অতি সন্তর্পণে রাখু গালিচা ছাড়িয়া উঠিল, এবং সেইরূপ সন্তর্পণেই জল-যোগের জন্য আসনে উপবিষ্ট হইল। খাদ্য-পাত্র সেইরূপই রক্ষিত ছিল। তাহার চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকার সময় চারু একটি জিনিষও স্থানান্তরিত করে নাই।

আসনে বসিয়াই হাত ধুইয়া গণ্ডুষ করিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর পানে ফিরিল। চারু সেই ভাবেই বসিয়া আছে, অধিকন্তু তাহার চোখের প্রান্ত দিয়া গণ্ড বাহিয়া জল ঝরিতেছে। এ ত শুধু অভিমান নয়! রাখু সেই অশ্রুগুলার সঙ্গে জড়ানো চারুর হৃদয়-থেকে-ফুটিয়া-ওঠা একরাশ বেদনা দেখিতে পাইল। সে বেদনা লঘু নয়, তার এতক্ষণের নিশ্চলতায় এটা সে বেশ বুঝিল, তার বেদনা মর্ম্মান্তিক।

চারুকে না ডাকিয়া আগে সে পাত্র হইতে গোটা দুই আখের টিকলী উঠাইয়া মুখে দিল। নিঃশব্দে সেগুলাকে চর্ব্বণ করিয়া ছিব্‌ড়া দু'টা মেঝের রাখিল। চারু যখন দেখিবে, সে দু'টা তাহার আতিথ্যগ্রহণের সাক্ষ্য হইবে।

চিত্তের অসম্ভব চঞ্চলতায় রাখুর ক্ষুধা দূর হইয়া গিয়াছিল। আবাল্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কারও তাহাকে পতিতার ঘরে খাদ্য গ্রহণে নিষেধ করিতেছিল। আসনে বসিয়াও গণ্ডূষ করিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। চারুর অভিমান দেখিবা মাত্র আবার তাহার বামুনাই ও মনুষ্যত্বে দ্বন্দ্ব বাধিল। সে দ্বন্দ্বে কোনটা যে জিতিত, আসনে বসিয়াও রাখু তাহা বুঝিতে পারে নাই। এইবারে সে নারীর মনের কিম্বা মর্ম্মের –কি প্রকারে উৎপন্ন অজানা বেদনাটার সাহায্য পাইয়া রাখুর মনুষ্যত্ব তাহার বামুনাইকে হারাইয়া দিল।

একটা মিষ্টান্ন মুখে ভরিয়া অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে রাখু ডাকিল—

চমক-ভাঙ্গার মত চারু চোখ মেলিল, মুখ ফিরাইল, রাখুর কার্য্য দেখিল। দেখিয়াই তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু অশ্রু তাহার যেন ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চোখের কোণ হইতে বাহিরে ছুটিল।

পরক্ষণেই তাহার অশ্রু-সিক্ত মুখের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া সে বুঝিল, তাহার এতটা আত্মহারা হওয়া ভাল হয় নাই। সে অমনি যথাসম্ভব সত্বর রাখুর অলক্ষ্যে চোখ মুখ মুছিয়া দাঁড়াইল।

"আমার সুমুখে এসে ব'স।"

চারু নড়িল না, তার কথায় একটা কথাও কহিল না।

"আমার কথা কি শুনতে পেলে না?"

"পেয়েছি।"

"তবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"বসে' কি করবো?"

"আমার খাওয়া দেখবে।"

তবু চারু দাঁড়াইয়া রহিল। রাখু বুঝিল, আবার সে চিন্তা-সাগরে ডুবিতেছে। সে আবার ডাকিল—

"চারু!"

"চারু চারু করছ কেন? আমার নাম চারু—তোমাকে কে বললে?"

"তবে তোমার কি নাম, আমাকে বল। সেই নামে তোমাকে ডাকি।"

"কেন, যেমন 'ওগো' বলে' ডাকছিলে।"

বিস্মিতনেত্রে চারুর মুখের পানে চাহিয়া রাখু বলিল—

"তুমি জেগেছিলে?"

"ছিলুম বৈ কি।"

"তবে উত্তর দিলে না কেন?"

"দিলুম না।"

আরও কিছু যেন সে বলিতে যাইতেছিল, রাখু বাধা দিয়া বলিল—

"অমন সোনার পালঙ্ক ছেড়ে মেঝের উপর মুখ গুঁজে শুয়েছিলে কেন?"

"ওই রকম শোবার সখ্ হ'য়েছিল।"

"না—"

বলিয়াই রাখু 'চারু' বলিতে যাইতেছিল। বলিতে না পারায় তাহার কথা জড়াইয়া গেল।

"বেশ ত, চারুই বল।"

"নামটা বলবে না?"

"তোমার কি 'ওগো' বলতে বাধা ঠেকছে? আমি যদি তোমার বউ হতুম ঠাকুর, তাহ'লে কি বলে' ডাকতে?"

রাখু উত্তর দিতে পারিল না, মাথা নামাইয়া আর একটা মিষ্টান্ন সে হাতে তুলিল। চারু দেখিল—ব্রাহ্মণ, যে খাদ্যটা আগে খাইবার সেটা না লইয়া অন্য একটায় হাত দিয়াছে। সেটা খাইতে নিষেধ করিবার জন্য সে বলিল—

"ওটা পরে খেয়ো।"

"কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে খেতে হয় আমি কি জানি? খাওয়া পরের কথা, আমি এর পূর্ব্বে এ সকল জিনিষ চোখেও দেখিনি। তুমি কাছে বসে' আমাকে দেখিয়ে দাও।

"আমার কি কাছে বসা উচিত?

"উচিত অনুচিত আমি বুঝতে পারছি না, তুমি বস।"

অগত্যা চারুকে রাখুর সম্মুখে বসিতে হইল।

(১১)

চারুর নির্দ্দেশ মত দ্রব্য মুখে তুলিতে তুলিতে হঠাৎ একবার চোখ উঠাইয়া রাখু দেখিল, চারু অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে।

"হ্যাগা, আবার তুমি কাঁদছ?"

উত্তর দিতে গিয়া নিরুদ্ধ ক্রন্দনের উৎপীড়নে চারু এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, রাখু আত্মহারা হইবার মত কি করিবে—না বুঝিয়া বাঁ হাতে তার ডান হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

"করলে কি আমাকে ছুঁয়ে ফেললে।"

"তাতে কি, তুমি এবারে কোন্ মিষ্টিটা খেতে হবে বল, আমি আবার খাচ্ছি।"

"আমি তোমাকে আর খেতে দেবো কেন?"

বলিয়াই সরাইবার জন্য চারু অন্য হাতে থালা ধরিল।

"নাও হাত ছেড়ে উঠে পড়।"

"তুমি কাঁদছ কেন, আগে বল।"

"দেখ দেখি, এই সামান্য জিনিষ, তাও আবার রাখতে হ'ল।"

তাহার হাত ছাড়িয়া রাখু বলিল—

"তা যদি বল, তাহলে বলি, আমার খিদের লেশমাত্র ছিল না। চারু, পাছে মনে কষ্ট পাও, তাই আমি এই খাবার মুখে তুলেছি।"

"উঠে পড়। এতটা যে দয়া করলে এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"দয়া আমার না তোমার চারু?"

বলিতে বলিতে রাখু দাঁড়াইল। চারু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাহার হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিতে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল।

রাখু কিন্তু তাহার চক্ষু জলের কারণ নির্ণয় না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন কাঁদছিলে, বল্লে না?"

"আর বলে' কি হবে? হাত-মুখ ধুয়ে, ডিপেয় পান আছে খেয়ে, কল্কেয় তামাক সেজে রেখেছি—ধরিয়ে দিই, টেনে শু'য়ে পড়। রাত দুপুর হ'য়েছে। একে ত অনেকবার ধরে' ভিজেছ, তার উপর রাত জেগে অসুখ করে' হিতে বিপরীত করে' বসবে। বাসায় কে আছে?"

"দেশের দু'চার জন লোক আছে।"

"আপনার জন?"

"কেউ নেই।"

"তবে অসুখ হ'লে সেবা করবে কে?"

"তা' যদি বললে তবে বলি। সেবা করবার লোক এখানেও নেই, দেশেও নেই।"

"আপনি কি বিবাহ করেন নি?"

"করেছিলুম।"

"স্ত্রী কি জীবিত নেই?"

রাখু চারুর মুখের দিকে ভিখারীর দৃষ্টিতে চাহিল। চারু ক্ষণেকের জন্ম মাথাটা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। তারপর মেঝে হইতে জলপূর্ণ ঘটি তুলিতে তুলিতে বলিল—

"বুঝেছি, ঠাকরুণ তোমাকে ফেলে পালিয়েছে।"

"না চারু, সে মারা গেছে।"

"নাও, হাত ধোবে এস।"

"পাঁচ বৎসর বয়সে মা হারিয়েছি, সাত বৎসর বয়সে মরেছে বাপ্।

"বিছানায় বসে' তামাক খেতে খেতে বললে চলবে না?"

অগত্যা রাখু চুপ করিল ও চারুর ইচ্ছানুযায়ী মুখ-প্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ করিয়া গালিচায় বসিল।

চারুও হাত ধুইয়া যথাসম্ভব সত্বর তাহার আগে হইতে সাজিয়া-রাখা একটা কলিকায় আগুন ধরাইয়া গড়গড়ার উপর বসাইয়া এইবারে সে বিছানার পার্শ্বে আসিয়া নিশ্চেষ্টের মত বসিল।

ক্ষণেক নীরব রহিয়া রাখু তামাক টানিতে লাগিল। চারু বলিল—

"তবে তুমি তামাক খাও,—আমি আসি।"

"আমার মনে হচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত তুমি কিছু খাওনি।"

"আমার মনে হচ্ছে, আজ আমি এত খেয়েছি যে, কিছুকাল আমাকে আর খেতে হবে না।"

বলিয়াই এমন মধুর হাসিতে চারু ঘরটা ভরাইয়া দিল যে, রাখুকে সে মধুরতায় ডুবিয়া ক্ষণেকের জন্ম নল ছাড়িয়া চক্ষু মুদিয়া বসিতে হইল। বসিল বটে, কিন্তু চারুর কথার অর্থ প্রণিধান করিতে তাহার একান্ত স্থূলবুদ্ধি তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না।

অথচ এ কথার একটা জবাব না দিলে চারুর কাছে তাহাকে মূর্খ সাজিতে হয়। মনে মনে উত্তর ঠিক করিয়া যখন সে চোক মেলিয়া বলিল—"তাহ'লে পাকা হরতকী খেয়েছ বল।" তখন চারু খাবার স্থানটা পরিষ্কার করিতে উঠিয়া গিয়াছে।

"এইবারে যাচ্ছ নাকি?"

"খিদের কথা তুলে' তুমি যে হর্তকীকে কাঁচিয়ে দিলে। ভাগ্যে জগবন্ধুর মহাপ্রসাদ জুটে গেল—গ্রহণ করতে কি নিষেধ কর?"

এই সব জটিল কথার উত্তর দেওয়া সুবিধা হবে না বুঝিয়া রাখু বলিল—

"আমার অবস্থার কথা তোমাকে বলতুম, তবে কি না—" "নাই বা কইলে।"

"তবে একটা কথা তোমাকে বলতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।"

চারু থালায় হাত রাখিয়া রাখুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। রাখু ঈষৎ হাসিয়া বলিল—

"বল্‌বো?"

"আপনার ইচ্ছা।"

"বললে পাছে তুমি কিছু মনে কর, এইজন্য সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"তাহ'লে যে সময়ে সঙ্কোচ হবে না, সেই সময়ে বলবেন।"

"এর পরে কি আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তা বলবো?"

চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইল। রাখু বলিতে লাগিল—

"সত্য কথা যদি বলতে হয় যে স্নেহ আদর তুমি আজ আমাকে দেখালে, আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজও পর্য্যন্ত কারও কাছে তা' পাই নি।"

"এই কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল?

"না, সে আলাদা কথা।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন—বুঝেছি।"

"কি বল দেখি?"

"স্নেহের প্রতিদান দিতে আমাকে পায়ে রাখতে আপনার ইচ্ছা হয়েছে।'

রাখু জিভ্ কাটিয়া বলিল—

"না—না—না। চারু, আমি দীন বটি, হীন নই। তা যদি তুমি মনে কর, তাহ'লে বল, এখনি আমি -"

"নাগো ঠাকুর, তোমায় উঠতে হবে না। হীন ত তুমি নওই, তুমি দীনও নও। একটু তামাসা করবার ইচ্ছা হল, তাই করলুম। ঝড়ের রাতটা কি একেবারে নিঝুমেই কেটে যাবে গা।"

"আজকের এ আশ্রয়ের কথা—একি জীবনে ভুলতে পারব?"

"তামাকটা যে অমনি অমনি পুড়ে' গেল।"

রাখু নলটা ছু'টান টানিয়াই বলিল—

"আগেই গেছে।"

চারু এইবারে রাখুর ভুক্তাবশেষ গেলাস· বাটী প্রভৃতি থালার উপর সাজাইয়া, হাত ধুইয়া আবার তামাক সাজিতে আসিল।

'মাঝখান থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই—আপনাদের দেশ কোথা ?'

"বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নাম শুনেছ ?"

"শুনেছি—আর শুনেছি, সেখানে গান বাজনার খুব চর্চ্চা।"

"আগে ছিল। রাজাও ছিল, সঙ্গীতেরও আদর ছিল। এখন রাজার সঙ্গে সঙ্গে সবই এক রকম যেতে বসেছে। এখনও তবু যা আছে, দু' পাঁচ বছর পরে তারও কিছু থাকবে না।"

চারু মুখের হাসি অতি কষ্টে কল্‌কের আগুনের আলোকে ঢাকিয়া রাখুর কথা শুনিতে লাগিল। সঙ্গীতের কথায় আত্মহারা রাখু বলিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। তার হাসি আসিবার কারণ—রাখুর কথার গতি ফিরানোই তার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হইয়াছে। সে এইবার কল্‌কেটা দিতে গিয়া বলিল—

"তাহ'লে ঠাকুরেরও কিছু গান বাজনার সখ আছে ?"

রাখু স্মিতবিকশিত মুখে চারুর মুখের পানে চাহিল।

"বেশ, আমাকে তোমার একটু গান শুনিয়ে দাও।"

"গাইতে ভাল জানি না।"

"বাজনাটা ভাল শিখেছ ?"

"ভাল শিখেছি বললে অহঙ্কার হয়, তবে ভাল ওস্তাদের কাছে শিখেছি।"

"বেশ, তাই আমাকে শোনাবে ?"

"কবে ?"

"আজ বল আজ, কাল বল কাল, অথবা যেদিন তোমার ইচ্ছা।"

রাখু কোনও উত্তর দিল না।

"কিগো, চুপ করে' রইলে কেন ?"

"তাইত চারু, কাল আমি কেমন করে' থাকবো ?"

"থাকতে পারবে না ?"

"এই যে বললুম। আমি কতকগুলি যুজমানের বাড়ীতে ঠাকুর-পূজো করি। আমাকে যেমন করেই হোক, ভোরে বাসায় পৌছিতেই হবে।"

"বেশ, খেয়ে দেয়ে বৈকালে ?"

"বৈকালেও আসতে পারবেন না—আর আসতে পারবেন না ?"

এরূপ কথায় রাখুর উত্তর দেওয়া সর্ব্বতোভাবেই উচিত ছিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে উত্তরের একটি অক্ষরও বাহির হইল না।

"বেশ, শু'য়ে পড়ুন। তবে—যাবার সময় একবার দেখা করে' যেতেও কি আপত্তি আছে?"

তবু যুবক উত্তর দিতে পারিল না। তবে এবারে সে মুখ তুলিল। চারুর স্থূল চক্ষু এইবারে বুঝিতে পারিল, উত্তর না দিতে পারায় রাখুর কোনও অপরাধ নাই। তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা ছুটিতেছে। দেখিয়া চারু যেন কতকটা আশ্বস্ত বোধ করিল। তাহার মুখটাও প্রফুল্ল হইল। হাসিতে হাসিতেই সে বলিয়া উঠিল—

"মাথা খাও, যাবার সময় আমার সঙ্গে যেন দেখা না করে' যেয়ো না।"

বলিয়া রাখুকে কোনও কথার অবকাশ না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

মনোহর।

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী)

পুঁথিপত্র দিয়েছি ফেলিয়া,
আপনার অন্তর মেলিয়া,
শুধু চেয়ে, আছি তারি পানে,
কতগান পশিয়াছে কাণে,
মানবের কণ্ঠ স্বরে, পাতার মর্ম্মরে,
মধুপ গুঞ্জন আর পিক কলস্বরে,
মনঃ শিলাতল বাহী অন্তর ধারায়
সুগভীর যে রাগিনী প্রবাহিয়া যায়,
আর কোথা তারে এক ঠাঁই
শুনিতে সুযোগ নাহি পাই।

সুখে দুঃখে আলো ছায়া মাঝে,
একসাথে নিয়ত বিরাজে,
বিরহ মিলন, মুগ্ধ প্রণয় নিবিড়
দুরাশা নিরাশা আশা করে থাকে ভিড়
শ্রাবণ মেঘের মত থাকে বুকে করে,
বৃষ্টি বজ্র সৌদামিনী ক্ষুব্ধ ধাক্কা ঝড়ে।
ভিন্ন হয়ে বসন্ত শরৎ
পূর্ণ করে বিশ্বের জগৎ,
এক আসে আর চলে যায়,
অন্তরের এই অমরায়
সকল সুষমা এসে করিয়াছে বাস,
নিদাঘ বরষা শীত আর মধুমাস।
অশোক চম্পক সাথে কুন্দের মিলন,
উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মীলন আর নীমিলন!
বিশ্ব এসে করে বসবাস,
এ অন্তর তাইতে আবাস
মানবের আর দেবতার,
জগতের সব বারতার,
জনম আলয় আর সমাধি মন্দির,
ক্ষুব্ধ মত্ত পারাবার, নীলাম্বর স্থির,
তন্বী শ্যামা সুন্দরী ধরণী যুগে যুগে
ছিল যাহা, হয়ে যাহা, আছে এই বুকে।
শিলালিপি আছে যুগান্তের,
কোন দূর স্তব্ধ নিশান্তের
আলোকের প্রথম সূচনা,
তৃণপুষ্প পল্লব রচনা
আদিম বসন্ত প্রান্তে, নবজীবনের
দুঃখ সুখ দ্বন্দ্ব কোলাহল, যৌবনের
প্রথম আবেগ, পশুপক্ষী পতঙ্গম
বাসা বেঁধে আছে হেথা স্থাবর জঙ্গম!

যে মহামানব যুগধর্ম্মে
উঠিবে গড়িয়া, এই মর্ম্মে
আছে ভ্রূণ তার, পশু-তেই
মরে নাই আজো, নিমেষেই
সহসা চকিত কবি দেখা দিয়ে যায়,
নীহারিকা বাষ্প জালে রহস্য ছায়ায়
যে সৃজন, যে প্রলয় অবিরাম গতি,
অন্তরের অন্তঃস্থলে তাহারি বসতি।
বিচিত্র একত্র হয়ে আসে,
ভগ্ন ছিন্ন যাহা চারি পাশে,
খণ্ড বলে' আছে তুচ্ছ হয়ে,
অখণ্ড সে মনের নিলয়ে
অপরূপ রূপ ধরি অনন্ত সুন্দর
আপনি হয়েছে মন, তাই মনোহর।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

ওপারের আলো।

এখানি প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লেখা একখানি উপন্যাস। উপন্যাসখানির নাম হয়েছে "ওপারের আলো"। নামটি আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে খুব সুন্দর খাপ খেয়েছে। কেন না উপন্যাসখানির ভিতর দিয়ে যে জিনিষটিকে খুব বেশি কোরে ফোটান হয়েছে তা এপারের হয়েও ওপারের।

এপার অর্থে গ্রন্থকার মহাশয় সম্ভবতঃ যুগযুগান্তরের সংস্কার এবং তাই দিয়ে গড়া মানব সমাজকেই লক্ষ্য করেছেন। এই যে আমাদের সমাজ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনধারণ ব্যাপার, সংস্কারই ত একে আপনার মতন করে গড়ে তুলছে এবং তুলবেও। আর সংস্কার জিনিষটা কি? সেটা মানুষের গড়া গোটাকতক নিয়মের বেড়া ছাড়া ত আর কিছুই নয়। আর এই যে মানুষ নিজে হাতে নিজেদের চারিদিকে গণ্ডীর পর গণ্ডী খাড়া করে তুলছে এ কিসের

জন্যে? এ কেবল মানুষের জীবন-যাত্রাকে নিরাপদ এবং নির্ঝঞ্ঝাট করে তোলবার জন্যে। এর মধ্যে শাশ্বত এবং নিরপেক্ষ সত্য শিব সুন্দরের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঁচতে হবে, কাজেই সেই বেঁচে থাকার দিন কটাকে যতটা পারা যায় সহজ এবং নির্ঝঞ্ঝাট করে তুলতে হবে ত।—এই হোলো সমাজ এবং সংস্কারের ভিতরকার কথা।

এই ত গেল একদিকের কথা। আর এক দিকে কিন্তু মানুষের বুকের ঠিক মাঝখানটাতে একটা নির্জ্জন কোণে বসে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে একটি অখণ্ড শক্তি ক্রমাগতই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে—সমস্ত বন্ধন ভেঙে, সমাজ এবং সংস্কারের সমস্ত গণ্ডী ভেদ করে। সে বলতে চায়, সমাজ না হয় তার সুবিধা অসুবিধার জমা খরচের অঙ্ক কসে ঠিক করে নিলে এইটে ন্যায় আর ঐটে অন্যায়, কিন্তু ন্যায় অন্যায়ের মূল্য কি লাভালাভের কষ্টিপাথরে যাচিয়ে নিতে হবে? তা ছাড়া লাভ লোকসান খতিয়ে দেখতে গেলে শুধু দোকান-ঘরটার বাডবাড়ন্তর দিকে তাকালেই ত আর হবে না—দেখতে হবে সেই লাভের অংশ বাড়ীতে গিয়ে পৌছুচ্ছে কিনা।

এই যে ভিতরকার ডাক, এই যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে মাঝে মাঝে কোন্ এক নিভৃততম অপ্রশস্ত রন্ধ্রপথ দিয়ে একটা নূতন আলোক মাঝে মাঝে এই বাহিরের জগতটার উপর এসে পড়ছে—যুগ যুগ ধরে, সমস্ত বাঁধাবাঁধির রুদ্ধ দ্বারের ফাটলের ফাঁক বেয়ে—গ্রন্থকার একেই বলতে চেয়েছেন ওপারের আলো।

আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে যতগুলি চরিত্র পেয়েছি তার অনেকগুলির মধ্যেই এই আলোকের আভাস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে।

কিশোর রায় জমিদারেব ছেলে—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কিন্তু তাঁর মনে আদবেই সুখ নেই, আর থাকবেই বা কি করে?—স্ত্রী তাঁর কুচরিত্রা। তাও আবার কি রকম স্ত্রী, না যাকে তিনি প্রাণ ঢেলে ভালবাসেন। সংস্কার গলাবাজি করে উঠলো, "এ কিন্তু ভয়ানক অন্যায়,—ওকে যখন তুমি বিবাহ করেছ তখন ওত তোমারই সম্পত্তি—তবে কোন্ হিসাবে ও পরকে মনে স্থান দিতে যায়!—ত্যাগ কর এখুনি ওকে—দূর করে দাও বাড়ি থেকে।" কিন্তু অন্তরবাসী সেই নির্ব্বিকার পুরুষটি যা বল্লে, তা এই যে, "বিবাহ ত বাইরের বন্ধন। তুমি তাকে বাইরে থেকে বেঁধেছ ভিতর থেকে ত আর বাঁধনি। তাই আমি নিজে হাতে তাকে প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার কাছ

থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—তুমি পারবে না তাকে নিজের করে নিতে। ঐ একই জিনিষকে আর একটু সরল করে নিয়ে কানাই বাবাজী বৈষ্ণব ধর্ম্মের তরফ থেকে বল্লেন, "তুমি যখন তাকে ভালবাস তখন চেষ্টা কর যাতে সত্যি সত্যি তাকে ভালবাসতে পার। বিবাহের গাঁটছড়ার বাঁধন দিয়ে সে ভালবাসাকে বেঁধে রেখে দিতে চেষ্টা কোরো না, ছড়িয়ে দাও তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে। তুমি তাকে ভালবাস—বাস্। ঐ খানেই তোমার দেনা পাওনা সবই চুকে গেছে, তবে আবার বদলা পাবার জন্যে হাঁপিয়ে মরছ কেন? ভালবাসা কি বেচাকেনার জিনিষ যে লাভ না বিকুলে তাকে গুদম্-ছাড়া করবে না।

সংস্কারের সঙ্গে ভিতরকার মানুষটির এই যে ঠোকাঠুকি,—এটা খুব সুন্দর করে দেখান হয়েছে একটি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার ভিতর দিয়ে। এই চরিত্রের ভিতর দিয়ে যে সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, সত্য যখন আসে তখন অনেক সময় সে তার রুদ্র মূর্ত্তি নিয়েই আসে, আর আমরা তাকেই বিপদ মনে করে পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করি। সত্যের এই যে রুদ্রমূর্ত্তি এ যে ধ্বংসের প্রলয়মূর্ত্তি নয়—নব গঠনের শান্ত মূর্ত্তি, সে কথা আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না। এই যে বিধবাটি,—ইনি সারা জীবন ধরে পূজা করে এসেছেন কেবল বাইরের গোটাকতক শুকনো আচার বিচারকে। ওদিকে কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে মনুষ্যত্ব যেখানে আপনার অচল আসনখানির উপর পূজা পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে রয়েছে, সেখানে একটা ঝরা পুষ্পদলও গিয়ে পৌঁছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন হোলো কি না,—চাবাগানের লোকেদের পাল্লায় পড়ে বেচারা যে জিনিষটিকে সব চেয়ে বড় বলে মনে করত সেটি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল। এমনি করে সত্য একদিন তার রুদ্রমূর্ত্তি নিয়ে এসে সুমুখে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "যাকে আঁকড়ে ধরে পৃথিবীর আর সব ভাল জিনিষকে ভুলতে বসিছিলি—আজ তাকে ভেঙ্গে চুরে একবারে তচ্ নচ্ করে দিয়েছি, কিন্তু তার জন্যে একটুও আক্ষেপ করিস নে। বাইরের এই যে শুচিতা একে নষ্ট করে দিয়েছি কেবল ভিতরের শুচিতাকে জাগিয়ে তোলবার জন্য। আমার এ রুদ্রমূর্ত্তি দেখে ভয় পাস্‌নে। এ রুদ্রমূর্ত্তির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে যে জিনিষটি—তা ধ্বংস নয়—বরাভয়।

তার পর কানাইবাবার চরিত্র। এ চরিত্রটি আমার কাছে একটা জীবন্ত

allegory র মত ঠেকে। এই মানুষটি যেন মানুষের ভিতরকার সেই অন্তরতম শাশ্বত সুরটি যা সংস্কারের খাপছাড়া এবং বেসুরা কোলাহলের মধ্যেও কোন দিন বেসুরা হয়ে বেজে উঠেনা। এঁর জীবনটা যেন সংস্কার এবং সঙ্কীর্ণতার এই এপারের জগতটার মধ্যে থেকেও কুমুদিনীর মত ওপারের ঐ উদার এবং স্বচ্ছ আলোর জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে—নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। এক্স-রে দিয়ে ডাক্তারেরা যেমন মানুষের শরীরের ভিতরকার বীজাণুটাকে পর্য্যন্ত দেখে নেন, ওপারের ঐ তেজালো আলোটা দিয়ে বাবাজী তেমনি মানুষের মনের ভিতরকার অতিবড় সূক্ষ্ম পাপের বীজটি পর্য্যন্ত খুটিয়ে দেখতে পান। বড় ভাই ছোট ভায়ের কাছ থেকে জোর করে তার "নববৃন্দাবন" ব'লে সখের বাগান এবং দেবমন্দিরটি কেড়ে নিতে চান। আমরা ভাবলুম, কি ভয়ানক অত্যাচার!—এ কখনই হতে পারে না. বেচারা এ অত্যাচার সহ্য করতে যাবে কেন?—সে না দিয়ে ভালই করেছে।—এ হোলো এ পারের আলো দিয়ে দেখা। কিন্তু ওপারের ঐ এক্স-রে দিয়ে খুঁচিয়ে দেখে বাবাজী বল্লেন, "না আমার মনে হয় দিয়ে দেওয়াই ভালো, একটা জিনিষ যদি অপরের মনে হিংসার উদ্রেক ক'রে তোলে, তাহলে সে জিনিষটার দিকে না চেয়ে যাতে সেই জিনিষটার জন্যে অপরের মধ্যে হিংসা প্রবৃত্তি না জেগে উঠতে পারে তারি দিকে চাওয়া ভাল নয় কি?—ওটা তোমার দাদাকে দিয়েই দাও—তা হলে আর কোন গণ্ডগোলই থাকবে না।"

মোট কথা বই খানি ঠিক সাধারণ উপন্যাসের মতন হয় নি। অনেক নভেল আছে যাদের উদ্দেশ্য কেবল রসসৃষ্টি! আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে যা রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানান সমস্যা (Problem) খাড়া করে তোলে। এই উপন্যাসটি সমস্যা প্রধান এবং সেদিক থেকে আমার মনে হয় এর মূল্য খুব বেশি।

পর্ণপুট, বল্লরী, ঋতুমঙ্গল

কবি কালিদাস রায়ের কবিতার বই কয়খানি পেয়েছি, তাদের নাম পর্ণপুট, বল্লরী ও ঋতুমঙ্গল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রামপ্রসাদ কমলাকান্তের ভাবমাধুরীতে বাঙলার আকাশ মধুমান হয়ে আছে, এ দেশের মাঠ ঘাট ফল শস্য জল বাতাস কবিচেতনার চিদ্ঘন রূপ। বাঙলায় তাই এত কবির ছড়াছড়ি। তাদের মধ্যে "কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ কেউ বা দিব্যি কালো", সবারই

মাঝে কিছু না কিছু সুর আছে, সবারই প্রাণ এই হরিত শ্যামা মাটির ডাকে পাগল করা। কালিদাসের কবিতার প্রথম ও প্রধান গুণ স্বচ্ছতা—যেন ঝরণার টলটলে স্বচ্ছ বিমল কাকচক্ষু জল ঝির ঝির ঝির ঝির করে ব'য়ে চলেছে। এ গুণ পূর্ণ শোভায় মৌলিক মাধুর্য্যে ছিল বড়াল কবির বাঁশীর তানে, এ যেন—

কানুর বাঁশের বাঁশী কি গুণ জানে?
কি গুণ জানেরে বাঁশী কি গুণ জানে।

এ কবি নিবিড়ের কবি নয়, দিব্য ঘরের সেই সবরসের রস -মিষ্টিক কবির সেই ঋষি দৃষ্টি কালিদাসে নাই। ভাবের কারুময় মর্ম্মর মাধুরীও তেমন জমকালো শোভায় পর্ণপুটে নাই, মধুসূদনের "মধু হতে মধুতর" ঝঙ্কার, রবীন্দ্রের সে "অনন্ত ভুলের মদিরা পিয়া" বীণার মীড় কিছুই নাই। কিন্তু এত নাই নাই, এত দীনতা নিঃস্বতার মাঝে আছে অনির্ব্বচনীয় তাহাই যাতে সামান্য সিউলী বসরা গোলাপ কি শতদল শোভাকে হারিয়ে দেয়। এক কথায় এ কবি বড় নয়, ছোটর মাঝে এর একটুখানি নিজস্ব স্বভাব শোভা একরত্তি সুবাস, নগন্যেও একটু স্নিগ্ধ সরস রূপ আছে যা জগতে আছে বলে সান্তের বুকে অনন্ত দোলে, যাতে প্রতি অণুর মাঝে অসীম বাজে বলে মায়ার টানে এ গণ্ডগোল বাধে।

"ছোট হয়ে তুমি বাধালে গোল"

• • • •

ঝরে পড়ে বলি তাই অনুপম
মরমী বুঝে রে ফুলের মরম
বিন্দু বলে কি সুখ ধরে কম
রমণীর আহা নয়ন জল।

জাগৃহি।

(শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ)

(১)

জেগে উঠে মোর মন,
এ নব আলোক-উৎসব মাঝে
জাগো অন্তর ধন।
একি আনন্দ ভুবনে-ভবনে,
তরু বীথিকায় আকুল পবনে,
সাগরের বুকে—ফুলের নয়নে,
একি মধু-জাগরণ!
নবরূপে আজ সবার মাঝারে
প্রকাশিলে নারায়ণ।

(২)

এ নব আলোকে আজি,
অন্তরবাসী বন্ধু আমার—
উঠ গো নয়ন মাজি।
মুছে ফেল লোর—ঘুচুক বেদন,
টুটুক শঙ্কা—শোক-আবরণ,—
জয়মের শাঁখ ওই শোন মন,
উঠিছে সঘনে বাজি;
কর্ম্মশালার এ মহাযজ্ঞে
জেগে উঠ মন আজি।

(৩)

ওরে মোর বীণা খান।
নবীন-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
সঙ্গীত কর দান

"সবই সুন্দর—সবই মধুময়,
মহাজননীর সকল তনয়
একই রাখী-ডোরে বাঁধা যেন রয়,"
ধরার এ মহাগানে—
ঝঙ্কৃত হোক্ সব তারে তোর
ওরে মোর বীণা খান !

(৪)

ওগো সুন্দরতম !
লহ হৃদয়ের প্রীতি-বন্ধন—
পূজা আয়োজন মম।
সত্য রথের হে মহা-সারথি,
মানব সঙ্ঘ জানায় প্রণতি,
যাচিছে করুণা—চাহিছে শকতি
তৃষিত চাতক সম ,—
সত্যের পথে জাগাও সবারে
ওগো সুন্দরতম !

চিঠির গুচ্ছ

২ দফা

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

(১)

নরেশ,

এই ত জীবনের নতুন পর্য্যায় সুরু হয়ে গেল। যে দায়িত্বকে চিরদিন ভয় করে এড়াতে চেয়েছি—সবাই মিলে তোমরা আমার ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিলে তবে ছাড়লে। বিয়ে করলুমই। এজন্য অবশ্য আমি এখন এতটুকু দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই।

ছেলেবেলায় পড়েছিলুম, যে সকলকে তুষ্ট করতে চায়, সে কাউকেও তুষ্ট করতে পারে না। আমার বেলায় এ কথা খাটল না দেখচি। পিতা এত-

দিনে তাঁর কর্ত্তব্য-সমাপ্তি হয়েচে মনে করে সুখী হয়েচেন—দাদা, বৌদি, তুমি ও কনক, ছেলে-মেয়েরা সবাই খুসি--আর আমি নিজেও কিছু মন্দ আরাম পাচ্ছিনে।

এ ক'দিন একটা বেদনাই কেবল আমার বুকের মাঝে গুমরিয়ে মরেচে। সে হচ্চে বিয়ের সময় তোমার অনুপস্থিতি। ছেলেবেলা হতে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত জীবনে যতরকম পরিবর্ত্তন হয়েচে, সব সময়েই তোমাকে আমার পাশে দেখেচি—তাই এবারও বরের আসনে দাঁড়িয়ে সতীর্থদের মাঝে যখন তোমার মুখখানি দেখতে পেলুম না, তখনই বুকটা যেন কেমন করে উঠ্ল। তোমার সেই দিনই ফেরবার কথা ছিল। আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই তোমার আগমন প্রতীক্ষা করছিলুম' শুভদৃষ্টির আগেও আমার দৃষ্টি চারদিকে তোমারই সন্ধান করছিল বাসর ঘরে যাবার বেলায়ও একবার তোমার খোঁজ নিতে ভুলিনি।

পরদিন সকালে তোমার টেলিগ্রাম পেলুম যে, তোমার মাতামহীর মৃত্যু-শয্যা ছেড়ে তুমি আসতে পারবে না। আমার এখনো সময় সময় বুড়ীর ওপর ভারি রাগ হয়। পুরো আশী বছর সুস্থ শরীরে বেঁচে থেকে ঠিক ওই সময়টায় তার ব্যামো হোল কেন? আর ব্যামোই যদি হোল, তা' হলে দুটোদিন আগে মরলেও ত তার কোন ক্ষতি হোত না। তা হলেও ত তুমি আসতে পারতে।

বিয়েতে কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে কলকাতায় যারা থাকে, তারা প্রায় সকলেই এসেছিল এবং নানা রকমে আমায় বিব্রত করে তুলেছিল। তারপর দিন ছিল এদের উপহার দেবার পালা। উপহারের জিনিষগুলো আমি একটু বেশ নজর করেই দেখেচি। কারণ, ওই দিয়ে উপহার দাতৃগণের মনের ভাব অনেকটা বোঝা যায়।

ফ্যান্সি জিনিষ যারা দিয়েচে, তাদের রুচি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই—যারা বই দিয়েচেন, তাদের মাঝে বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। মেয়েদের যারা সীতা সাবিত্রীর মত হতে দেখতে চান, তাঁরা রামায়ণ মহাভারত এবং পতিব্রতা গ্রন্থমালা উপহার দিয়েচেন। যাঁরা কাব্যরসিক, তাঁরা দেশীয় বিদেশীয় কবিদের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ দান করেচেন, আধুনিক ভাবের ভাবুক যাঁরা, তাঁরা য়ুরোপের ও এদেশের নবীন সাহিত্যিকদের নাটক নভেল দিয়েচেন, শুশ্রূষা, ধাত্রীবিদ্যা, পাকপ্রণালীও পাওয়া গেছে। একজনা আবার দিয়েচেন

ছেলে-মেয়েদের দুধ খাবার একটা ফিডিং বটল আর একখানা হাসিখুসী। কাগজের লেবেলে তার ওপর লেখা আছে—"প্রত্যাখ্যান করবেন না, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।" ম্যাডোনার ছবিও একখানা পাওয়া গেছে।

নারীকে বাংলার তরুণেরা কে কি মূর্ত্তিতে দেখতে চান, এই উপহার নির্ব্বাচন দেখে তা অনেকটা বোঝা যায়।

আমি বুঝতে পারচি এ সব কথা শুনতে তোমার ইচ্ছে ততটা হচ্ছে না, যতটা কৌতূহল হচ্ছে নব বধূকে জানবার জন্য। এ বিষয় আমি আজও কিছু তোমায় বলতে পারলুম না—হতাশ হয়োনা, সবই জানবে।

বিয়ের পর দশদিন একসঙ্গে ছিলুম। কনক আর বউদি ফন্দী খাটিয়ে আমাদের এক ঘরে বন্দী করে রাখত দিন ও রাত্রির বেশির ভাগ সময়টাই তখন যে আমরা চুপটি করে বসে একে অন্যের দিকেই চেয়ে থাকতুম, তা নয়; কথাই বলতুম। এত কথা কি যে বলেচি, তা কিন্তু আমার মোটেই মনে নেই।

একদিন রাতদুপুরে দরজায় বার বার আঘাত শুনে, দোর খুলে দেখলুম—বৌদি আর কনক দাঁড়িয়ে। হেসে বৌদি বল্লেন—"এমন রাতগুলো নারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিচ্ছ।"

তারপর চারজন মিলে কত রকম গল্প করলুম—ফিরে যখন শোবার উদ্যোগ করলুম, তখন চারটে বেজে গেছে। এ-কদিনে এইটুকুই শুধু জানতে পেরেচি যে, নীহার লোকটি মন্দ নয়। এর বেশি কিছু জানতে চাইলে কনককে জিজ্ঞাসা করো—তার সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেছে।

এখন, নীহারের কাছে আমি কি কতখানি প্রত্যাশা করি, সেটা তুমি বোঝা পড়া করে নিতে চাও। দাবী আমি তার কাছে কিছুই করব না—কারণ, ও জিনিষটা দুনিয়ায় যত কম করা যায়, ততই সুখে থাকা যায়।

প্রত্যেক মানুষেরই যে একটা স্বাতন্ত্র্য বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আছে, তা বর্জ্জন করতে বলা আমার অভ্যাস নয়।

নীহারের কাছে আমি ততটুকুই চাইব এবং ততটুকু পেয়েই তৃপ্ত থাকব, যতটুকু সে বেচ্ছায় আমায় দেবে। যদি এমনও হয় যে তার দান আমার পাবার আকাঙ্ক্ষা মিটাতে পারে না—আর তাতে যদি আমি ব্যথাও পাই, তা'হলেও জোর করে কখনো তাকে এমন কথা বলব না যে, এটা তোমাকে করতেই হবে।

কনককে বউদি হয়ত এতদিন ছেড়ে দিয়েচেন। সে কেমন আছে? তাকে চিঠি লিখতে বলো।

তোমাদের

মোহিত।

(২)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

প্রিয়তমে এডি,

সহপাঠীদের মধ্যে তুমিই একমাত্র বিদেশিনী যে ঘৃণা করে আমাদের কখনো দূরে রাখবার চেষ্টা করনি। রংএর তফাৎ ও জাতি বিচার না করে একা তুমিই ভালবাসার ডোরে আমাদের বেঁধে নিয়েছিলে। তাই বিয়ের সময় তোমার অভিনন্দন পত্র পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আমার নতুন জীবন যেমন শান্তিময় হোক বলে তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেচ, তোমার জীবনও তেমনি শান্তিময় হোক, তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা।

আমার স্বামী সে একজন এম-এ এবং কলেজের অধ্যাপক, একথা জানতে পেরে, তুমি লিখেচ, খুবই খুসী হয়েচ। কেবল তোমার না-কি আশঙ্কা হচ্চে যে, কূট গবেষণায় যার ললাট সর্ব্বদাই কুঞ্চিত থাকে, মাথার চুলগুলো যার যত্নের অভাবে অকালে শুক্ল হয়ে যায়, যার পরিচ্ছদে পারিপাট্য নেই, সুখাদ্যে রুচি নেই—জীর্ণ পুঁথির পাতা ওল্টাতেই যে পরম আনন্দ লাভ করে, সে রকম লোক আমার মত ফুটনোন্মুখ পুষ্প-কোরকের মর্ম্ম গ্রহণ করতে অক্ষম হবে।

অধ্যাপক সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা খুবই মজাদার সন্দেহ নেই কিন্তু আমার স্বামী এখনও তেমন পাকা অধ্যাপক হয়ে উঠতে পারেন নি। সবে কলেজ হতে বেরিয়েচেন, কাঁচা বয়স, আমার চাইতে মোটে দু'বছরের বড়—চুল ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বেশ, দাড়ী গোঁফের উৎপাত নেই, আহারেও একটু অতিরিক্ত রুচির পরিচয় পেয়েচি, গায়ের রং আমার চাইতে কিছু কালো—কিন্তু কালো রংটা তোমরা যত বিশ্রী মনে কর, আমরা তা করিনে। বেশ সুন্দর চেহারা। কাজেই তুমি আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ যে আশঙ্কা করেচ, তা অমূলক জেনে নিশ্চিন্ত হয়ো।

তারপর, তুমি যে প্রশ্ন করেচ তাঁর জবাব চাও, কেমন? তুমি জিজ্ঞাসা

করেচ, স্বামীকে ভালবাসতে পেরেছি কি-না। হাঁ পেরেছি—বৈ কি? নইলে তিনি যখন চলে গেলেন, তখন বুকে অত ব্যথা পেলুম কেন? আর এখনই কেন বা যখন তখন প্রাণটা এমন হা-হা করে কেঁদে উঠে?

শুনে তুমি বিস্মিত হচ্চ ভাবচ আমি একটি জানোয়ার। আগে হতে জানা-শুনা নেই—হঠাৎ একদিন এসে অগ্নি স্পর্শ করে তিনি বল্লেন আমি তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করলুম, আর আমিও অমনি আমার দেহের ও মনের সকল সত্ত্ব তাঁকে সমর্পণ করে বলে উঠলুম—তুমিই আমার স্বামী, আমার ইহকালের ও পরকালের সর্ব্বস্ব, আমার জাগ্রত দেবতা। 'আমি যেন আমার যা কিছু সব মুঠোর ভিতর নিয়ে বসেছিলুম, যে কেউ চাইতে এলেই সব দিয়ে ফেলব মনে করে।

হয়ত তেমন করেই বসেছিলুম। ভালবাসা জিনিষটা যখন আমাদের বুকে জমে ওঠে, তখন সে-টাকে দিয়ে ফেলতে পারলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়। সকল দেশের তরুণ তরুণীর হৃদয় এক সময় এতে করে টলটল করে নেচে ওঠে।

যারা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাখতে অভ্যস্থ, তারা ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করেই আত্মীয় স্বজনের মাঝে আপনাকে অন্তরের এই ভালবাসা বিলিয়ে দিয়েই নিঃস্ব হয়ে পড়ে আর তার চাইতে উদার যারা তাদের এই ভালবাসা সমগ্র বিশ্বের বুকের উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে চলে যায়।

আমরা হচ্চি প্রথম শ্রেণীর লোক। আমাদের ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যায় নিতান্ত আপন দু'চার জনকেই দান করে। দিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি এবং দান করেই তৃপ্ত হই। কৈশোর উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দান করবার আকাঙ্ক্ষাটা আমাদের অন্তরে প্রবল হয়ে ওঠে—তখন হতেই আমরা আগ্রহ সহকারে তারই প্রতীক্ষা করি, যে আমাদের এই দান গ্রহণ করবে।

তোমাদের সমাজে মেয়েদের নিজেদেরই এই দানের পাত্রটিকে খুঁজে পেতে বার করে নিতে হয়, আর আমাদের আজন্ম সংস্কার যে, পিতা বা অভিভাবক যাকে নির্ব্বাচণ করবে, সেই-ই উপযুক্ত আমাদের এই দান গ্রহণ করতে। তাই, পূর্ব্ব হঁতে পরিচয় না থাকলেও, বিবাহের পরই আমরা স্বামীকে ভালবাসতে পারি। শেষটায় যে বুঝতে পারে যে, স্বামী তার ভাল লোক নন, অথবা ভালবাসার প্রতিদানে যে পায় শুধু লাঞ্ছনা আর নির্য্যাতন, তার চিত্তের ভাল-

বাসার উৎস একেবারেই শুকিয়ে যায়। এমন অবস্থায় তোমরা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে পৃথক হয়ে যাও—আর আমরা পদদলিত কর্দ্দমেরই মত পায়ের তলায় লেগে থাকি।

শুনে হয়ত বিস্মিত হবে যে, আমার স্বামী বিয়ের দশদিন পরেই লাহোর চলে গেছেন, আমায় এখানে রেখে। মাস খানেক পর কিছুদিনের জন্ম কর্শিয়াং যাব, তারপর হয়ত লাহোর যেতে হবে। তোমাদের কিন্তু বিয়ের পরই স্ত্রীকে ছেড়ে স্বামী অন্যত্র গেলে স্ত্রী নিজেকে অপমানিতা বলে মনে করে কিন্তু আমরা স্বামী-বিরহে ব্যাথা পেলেও, সে-টা সয়ে নিতে পারি। কারণ, স্বামীকে অবলম্বন করে আমাদের এই যে নতুন সংসার গড়ে ওঠে, তার প্রতি আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে বলেই আমরা মনে করি।

তুমি ভাবচ, আমার কন্‌ভেন্টে পড়া ব্যর্থ হয়েচে। আমি লেখাপড়া শিখে, সাত আট বছর তোমাদের সঙ্গে থেকেও যে পুরাতন নিয়মের বন্ধন ছিঁড়তে পারিনি এটা তোমায় খুবই বিস্মিত করে তুলেচে। আমি কিন্তু মনে করি তোমাদের ওখানে পড়া আমার সার্থকই হয়েচে। ওখানে না পড়লে, তোমাদের সঙ্গে না থাকলে, তোমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার আমি জানতে, বুঝতে পারতুম না।

আমি উৎকট রক্ষণশীল নই—পরিবর্ত্তন প্রয়াসী, কিন্তু তোমাদের ভালটুকু নেব বলে মন্দখানি না নিয়ে বসি, সেই দিকেই আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করি।

আমাদের দেশের নারীর দুঃখ ও দৈন্য যে, কেবল বেড়েই চলেছে, তা আমি সকল সময়ই অনুভব করি—বিশেষতঃ তোমাদের সঙ্গে যখন নিজেদের তুলনা করে দেখি।

তোমরা মুক্ত—আমরা পিঞ্জরে আবদ্ধ। তোমরা শক্তি স্বরূপিণী আমরা অবলা, তোমরা সুস্থদেহে প্রফুল্ল মনে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কর—আমরা রোগে ভুগে বিষণ্ণ প্রাণে সংসারের দেনা আর দৈন্য বাড়িয়ে তুলি।

তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার, এ সব জেনে বুঝেও কেন আমি পিঞ্জরের ভিতর স্বেচ্ছায় প্রবেশ করলুম। এ প্রশ্ন নিজেকে নিজেই আমি বার কত জিজ্ঞাসা করেচি। সত্যিই ত, বিয়ে কেন করলুম!

না করেই বা করতুম কি? আমার প্রাণ যে চেয়েছিল ভিন্ন একটা আশ্রয়। তা'ত উপেক্ষা করে থাকতে পারতুম না। তুমি বলবে আমি

পারতুম একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে যাতে মেতে উঠে দেশের মেয়েরা তাদের পায়ের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলত। না-না, আমি তা পারতুম না। তার জন্য যে দুর্নিবার শক্তির আবশ্যক, তা আমি কোনদিন অনুভব করিনি। আর আমার বিশ্বাস বাহির হতে মেয়েদের বন্ধন ঘুচাবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে, যদি না আমাদের ভিতরেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

স্বামীর সঙ্গে অল্প কদিনের পরিচয়েই বুঝতে পেরেচি যে অমঙ্গলকে নাশ করতে তিনি নির্মম বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী। আমি কিন্তু তা পারিনে।

আমার সত্যিই বড় মায়া হয়। পরিবর্ত্তন যারা সইতে পারবে না, তারা যে বড় ব্যথা পাবে।

আশা করি তোমরা বেশ ভালোই আছ। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে।

তোমারই স্নেহের
নীহার।

(৩)

স্নেহময়ী বউদি,

তোমাকে বউদি বলে ডেকে আমার তৃপ্তি হয় না—সে যেন নেহাৎ পর পর বলে মনে হয়। যদি কিছু মনে না কর, আমি তোমায় নীহারই বলব আর তুমিও আমার নাম ধরেই ডেকো। কেমন, রাজী আছ ত?

বর্ত্তমানের কোন ব্যক্তি বিশেষের কষ্ট হচ্চে বলেই, আমি তোমায় ছেড়ে চলে এলুম, নইলে আরো কটা দিন থাকবার ইচ্ছে ছিল। দূরে চলে এসেছি বলেই তোমাদের কনককে ভুলে যেয়োনা ভাই, নিয়মিত চিঠি পত্র লিখো। আমার আপনার জন কেউ যে নেই তা'ত তোমায় বলেচি।

আসবার আগের দিন প্রসঙ্গক্রমে তুমি আমাদের দেশের মেয়েদের দুর্দ্দশার কথা বলছিলে। আমি কিন্তু আগে স্বীকারই করতুম না যে, সত্যিই আমাদের প্রতি কোন অবিচার হয়ে থাকে। এখানে এসে একটি মেয়ের বিবাহিত জীবনের করুণ কাহিনী শুনে আমি মনে করি কোথাও কোথাও সত্যিই হয়ত পুরুষের পীড়ন ও নির্য্যাতন মেয়েদের জীবন ব্যর্থ করে দেয়। আমি তেমন শিক্ষিতাও নই—দেশ বিদেশের মেয়েদের অবস্থাও কিছু জানিনে,

কাজেই তাদের তুলনায় আমরা সুখে কি দুঃখে আছি, তা বলতে পারিনে।

আমি কল্পনাও করতে পারিনে যে, মেয়েদের অবস্থাটা ঠিক কেমনটি হলে আর অভিযোগ করার কিছুই থাকে না। মানুষ যতদিন না দেবতা হবে, ততদিন তাঁদের অবিচার অত্যাচারও ঘুচবে না। কেবল পুরুষই যদি মেয়েদের প্রতি অবিচার করত, তা হলে হয়ত বলা চলত যে, মেয়েদের স্বাধীনতা হলেই সে সব ঘুচে যাবে—কিন্তু মেয়েরাই যদি মেয়েদের মর্য্যাদা না বুঝে অমানুষিক অত্যাচারে তাদের পীড়ন করে, তা'হলে প্রতিকারের আশা কোথায়?

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সব সংসারে পুরুষের চাইতে বধূদের সঙ্গে মেয়েরাই বেশি দুর্ব্যবহার করে থাকে। তারপর আমরা যা করচি, তার চাইতে বেশি কিছু কি সত্যিই আমরা করতে পারি?

তুমি এ-সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেচ, আমায় যদি একটা পথ দেখিয়ে দিতে পার ভাই, তা হলে সে পথ ধরে চলতে আমার অমত হবে না।

তাই বলে এখানকার এই গরীব বেচারাকে ছেড়ে আমি কিন্তু কোথাও যেতে পারব না। লোকে ডুবু ডুবু হবার সময় যেমন স্রোতে ভাসা তৃণগাছি পর্য্যন্ত জড়িয়ে ধরে, তেমনি কি যেন একটা ভাবের বন্যায় পড়ে তিনি আমার মত অপদার্থ এই নারীকেই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েচেন—কূল পাবেন কিনা জানিনে—আমার কিন্তু তাই বড় মমতা দাঁড়িয়ে গেছে।

দেশের পুরুষদের কথা ভাবতে গেলেই আমার এই স্বামী বেচারার কথা মনে পড়ে। তাই আমি পুরুষকে সত্যি সত্যিই নির্ম্মম অথবা স্বার্থপর বলে ভাবতে পারিনে। ও জাতটা যে আকাশের মতই উদার, তার দৃষ্টান্ত আমার এই কাছে থাকতে আমি তা অগ্রাহ্য করতে পারিনে। হয়ত তুমিও পারবে না।

দাদার মনের ভাব স্পষ্ট করে বুঝতে না পারলেও আভাস কিছু পেয়েচ। তাতে করে কি সত্যিই তুমি বলতে পার যে, পুরুষেরা স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচেতা আমাদের চেপে রেখে নিজেরাই প্রভুত্ব করতে চায়।

দাদা তাঁর বন্ধুকে যে চিঠি লিখেচেন, তাতে জানলুম যে, তুমি নাকি তাঁর চিন্তটা তোলপাড় করে দিয়েচ। আজ এই পর্য্যন্ত—

তোমাদের কনক।

শাস্ত্র বিচার।

[দরবেশ।]

শাস্ত্র আছে ব্যস্ত সদা
অস্তি-নাস্তি লয়ে,
তোমার পূজন বিধান তাহার
অমঙ্গলের ভয়ে।
লয়ে খানিক বিধি-নিষেধ,
কতই তাহার নিষ্ফল ভেদ,
আমার কেন মিটেনা খেদ
শাস্ত্র-বচন কয়ে।
চিত্ত-বেদের গোপন পত্রে
সহজ ভাবের তুলি,
লিখেছে যে সরল সত্য
শিখাও গো সেই বুলি।
শাস্ত্র মেনে তোমার সাধন,
সে যে কঠিন নিগড় বাঁধন,
সুখে দুঃখে তোমার দাদন
উঠুক সমান হয়ে।

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ।

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রিয়ব্রতের কথা।

৩

কাজটা নিয়েই আবার দু'রকমের ভয় হয়েছিল। একটা হচ্ছে, একাজ পারব কি না। আর একটা ভয় হয়েছিল যে কিসের, তা প্রথমটা খুব খোলসা

করে ধরতে পারিনি। কিন্তু যখন ধরতে পারলাম, কিসের ভয়, তখন ভয়ের কারণও পালিয়েছে। ব্যাপার দুটোর প্রথমটা এই :—

কাজটা ঘাড়ে নিয়ে, ভয়ে ভয়ে সারদাপুরের রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌছিতেই দেখি, আমার জন্তে জমিদারের গাড়ী এসে উপস্থিত এবং এমনি আদর করে কর্মচারীরা আমায় ডেকে নিলে, যে জমিদার মহাশয়ের বৈঠকখানা পৌছাতেই আমার অর্দ্ধেক ভয় কেটে গেল। মন বল্লে "নাঃ এদের ভয় করবার কিছু নেই।"

তার পর দু চার দিন সুস্থ হয়ে বাসায় বসতে না বসতেই মালিকেরা আমায় ডেকে পাঠালেন, এবং এমন অদ্ভুত ভাবে পর্দ্দার আড়াল হতে আমার ওপর হুকুম জারির সঙ্গে উপদেশ এমন কি মৃদু তিরস্কার পর্য্যন্ত বেরিয়ে এল যে আমার প্রথম ভয়টা এক নিমেষেই লজ্জায় পালিয়ে গেল। আর এটাও ত' সত্য যে জলের মাছ জলে পড়লেই স'াতার দিতে আরম্ভ করে অবশ্য যদি সে একেবারে না মরে গিয়ে থাকে। আমি মরিনি তাই এই অনভ্যস্ত কাজেও প্রথম দিন হতেই হারিনি।

যাক, আমি যখন সদর কাচারির পেছনকার ঘরের পর্দ্দার সুমুখে এসে দাঁড়ালাম, অমনি ভেতর হতে মধুর স্বরে হুকুম এল, "ঐ চেয়ার খানায় বসুন।"

আওয়াজ শুনেই কাণ জুড়িয়ে গেল, ইচ্ছে হল পর্দ্দাটার নীচে একটা প্রণাম ঠুকি, কিন্তু পারলাম না। বোধহয় অনভ্যাসে, কিম্বা হয়ত সঙ্কোচে, অথবা হয়তো তখনো এই চাপকান চোগার অন্তরালে সন্ন্যাসীটা লুকিয়ে বসে ছিল।

যে কারণেই হ'ক নমস্কার করা হল না। কিন্তু ভেতর হতে শব্দ হল, "আপনি ব্রাহ্মণ, শুনিছি আমাদেরই স্বজাতি, আপনাকে নমস্কার করছি। আশীর্ব্বাদ করুন।"

আমি চটকরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, "আশীর্ব্বাদ করব, কি বলে আশীর্ব্বাদ করব ?"

ভিতর হতে একটা মৃদু হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর শব্দ শুনলাম, "আশীর্ব্বাদ করতেও জানেন না ? তা হলে এতবড় এষ্টেট চালাবেন কি করে ?"

আমি মাথা চুলকিয়ে বল্লাম, "দেওয়ানজী বলেছেন চালিয়ে নেবেন, তাই সাহস হয়েছে, পারব। ভুল হয় আপনারা দয়া করে শুধরে দেবেন।"

"তা হলে, প্রথম থেকেই ভুল শুধরে দিতে হবে দেখছি—আপনি একলা এসেছেন কেন? ঐ অত বড় বাড়িটা কি আপনাকে একলা থাকবার জন্ম দেওয়া হয়েছে? কেবল চাকর বামুনের হাতে আপনাকে আমরা ফেলে রাখব কি করে? উর্ম্মিলা দিদি পিসীমা দুজনেই বলে দিয়েছেন যে আপনি যদি আপনার ছেলে মেয়েদের না নিয়ে আসেন তা হলে এ বিদেশে আপনার মন টিকবে কি করে? মন দিয়ে কাজ কর্ম্ম করবেন কি করে? চুপ করে রৈলেন যে? একলা এই বিদেশে আসা কি আপনার ভুল হয়নি?"

একলা! বিদেশে! ওগো অপরিচিতা, ওগো অন্তরালবাসিনী! তুমি যদি জানতে যে, তোমাদের এই আশ্রয়প্রার্থীটী কতখানি একলা! আর তার স্বদেশকে পাবার জন্ম তার মধ্যে যে কত হাহাকার তা কি অনুভব করতে পারবে?

থাক, আমি অবাক হয়ে এই অপরিচিতার পরিচয়ের সঙ্গে এই অদ্ভুত সম্ভাষণের ভঙ্গীর মধ্যেই ডুবে গিয়েছিলাম। তাই তিনি যখন বল্লেন, "চুপ করে আছেন কেন?" তখন আমি চমকে উঠে বল্লাম, "ছেলে মেয়ে আমার কেউ নেই, এক আছেন মা,—"

"কেউ নেই! ছি ছি শীগ্‌গির মাকে আনতে পাঠান! আজই চিঠি লিখে দেন, না হয় নিজে যান। না—এমন করে আপনার থাকা হবে না।"

আহা! কে গো করুণাময়ী, এই অপরিচিতকে অন্তরালে থেকে এমনি করে সহজেই আপনার করে নিলে! কেগো এমনি করে আমায় আমার স্বকৃত মরুভূমি হতে এক নিমেষে অনায়াসলব্ধ ওয়েশিসে পৌছে দিলে! ওগো তোমায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করব? তুমি যেখানে আছ সে স্থান বুঝি একেবারে কমলালয়, একেবারে পূর্ণের দেশ। ওগো অন্তরালবাসিনী, তুমি অন্তরালেই থাক, আর যেখানেই থাক, তবু তোমায় না জেনেই জানলাম, না চিনেই চিনলাম, না দেখেই দেখলাম।

আমি কোনো উত্তর করলাম না বলেই বোধ হয় পর্দ্দাখানি নড়ে উঠল, এবং দুখানি চরণকমল পর্দ্দার নীচে দেখা গেল। বোধ হয় যেন পর্দ্দা ভেদ করে সেই অপরিচিতা আমার পরিচয় নেবার চেষ্টা করছেন। তারপর আবার মধুর স্বরে হুকুম এল, "আপনি মাকে চিঠি লিখবেন ত? দেরী করবেন না ত'!"

না দেরী না, দেরী করা আর হবে না। কি করে দেরী করব? এমন

স্থানে এমন আদরের মধ্যে যাকে যে আমার আর না হলেই নয়। যাঁকে আর দূরে রাখব কি করে?

আমি বল্লাম, "আমি আজই পত্র লিখে দিচ্ছি, কিন্তু তিনি—"

"তিনি আসবেন না? ছেলে ফেলে দূরে থাকবেন? তা কি কখন হয়?"

"গঙ্গাহীন দেশে—"

"গঙ্গাহীন দেশ—হ'লই বা গঙ্গাহীন দেশ কিন্তু ছেলেকে ফেলে কি করে তিনি থাকবেন? ছেলের চেয়ে গঙ্গা বড়! না—না সে হবে না, আপনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসুন, নইলে যা শুনিছি তাতে বুঝছি যে আপনি এ রকম করে থাকলে বাঁচবেন না—অন্ততঃ বেশীদিন এখানে টিকতে পারবেন না।"

আশ্চর্য্য! এই অদ্ভুত মানুষটী অন্তরাল হতে আমার কতখানি লক্ষ্য করেছে। না জানি এর দৃষ্টি কতদূর যায়!

আমি অবাক হয়ে সেই কাঠের চেয়ার খানার ওপর কাঠের মত বসে রৈলাম। তারপর দেখলাম পা দু'খানি হঠাৎ সরে গেল অনুভব হ'ল যেন কে আর একজন ঐ ঘরে এলেন। তিনি এসেই বল্লেন, "বাবা, তোমায় আমাদের বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে ডাকিনি, কারণ সে বিষয়ে দেওয়ানজীই তোমায় সব বুঝিয়ে দেবেন। আর তুমি শুনিছি খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান, জ্ঞানী মানুষ—অবিনাশ বাবু উকিল তোমার বিষয় অনেক কথাই লিখেছেন। তাই বিষয় সম্বন্ধে আর কি বলব? কিন্তু, বাবা, আমরা মেয়ে মানুষ আমাদের আগে চোখে পড়ে যারা আমাদের কাছে এসে পড়েছে তারা কষ্ট পাচ্ছে কিনা সেই দিকে। আমি শুনলাম, তুমি নিজে হাতে সব কর, চাকর বামুনদের কিছু করতে দাও না। তারা মুস্কিলে পড়ে আমার কাছে এসে জানিয়েছে। এ রকম করলে ত' চলবে না বাবা। কেন ওদের কাজ করতে দাও না?"

আমি হেসে ফেল্লাম, কিছু বল্লাম না—অমনি সেই আর একটী মধুর স্বরের মানুষটীর রাগের স্বরে শব্দ হল, "না পিসীমা ও রকম মানুষ নিয়ে চলবে না, ওঁর মা আছেন, হয় তাঁকে উনি নিয়ে আসুন—না হয় আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে এসে রোজ প্রসাদ পেয়ে যান। অমন করে উপবাসী হয়ে থাকবার কারো অধিকার নেই, তাতে গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে।"

মা বল্লেন,—মা! হা তাইত—মা বল্লেন "কেন বাবা, তোমার চাকর বামুনদের খাটতে দাওনা? বিছানায় শোও না—খাওনা দাওনা, কেবল চুপ করে কি ভাব?"

এ কথার কি উত্তর দেব? আমি এসিছি সন্ন্যাসী-মহারাজগিরি ছেড়ে চাকর হতে, আমার আবার চাকরি! কিন্তু এ কথা কি এরা বুঝবে? আর সে কথা বলেই বা কি হবে? তাই মৃদুস্বরে বল্লাম, "আমি সামান্য মানুষ—আমার কিই বা কাজ আছে যে ওরা করবে?"

কিন্তু একথা হতে নানা কথা, নানা অনুরোধ উপরোধ দেখা দিল। এবং তার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আমার মা স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। কি করে? অতি সহজে। বন্ধু অবিনাশ এবং আরও কে কে গিয়ে মাকে যখন বুঝিয়ে দিলে তখন আর কি তিনি থাকতে পারেন? তিনি সব ফেলে চলে এলেন। আমিও মাকে জড়িয়ে ধরে বল্লাম—

"বেশ করেছ মা—ছেলের চাইতে কি বিষয় বড়? ওরা চাচ্ছে তাই দেখ গিয়ে, তুমি ছেলে চাচ্ছ তাই না?"

মা ত কেঁদে কেটে আদর আকারে আমায় ডুবিয়ে এই এত বছরের বিরহের দুঃখ এক মুহূর্তে মুছে ফেললেন। আমিও তাঁর কোলে মাথা রেখে কত কাল পরে ঘুমলুম। আঃ সে কি ঘুম! হাজার বছরের জমাট নিদ্রা আমার প্রাণের ওপর যেন চেপে বসল—আমি কাজ কর্ম কর্ত্তব্য সব ভুলে মায়ের কোল আঁকড়ে পড়ে রৈলাম। যে ঘুমকে ঘুম পাড়িয়ে ছিলাম সে আজ প্রতিশোধ নিলে—আমিও ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম যেন আমি এতটুকু হয়ে মার কোল জুড়ে অতি সহজেই পড়ে আছি।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন অনুভব হল, মা আমার মাথাটা কোলে নিয়েই বসে আছেন এবং মৃদু স্বরে কার সঙ্গে কথা বলছেন। আমার উঠতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু তবু উঠতে হল; কারণ এমন ভাবে পড়ে থাকা ত সহজ অবস্থায় যায় না বিশেষতঃ অপরের সামনে। তাই উঠে বসতেই হল। কিন্তু উঠে দেখি, এ কি মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি বুঝি এমনি করে ঘুম থেকে উঠেই দেখবার। এ মূর্ত্তি দেখাই বুঝি ঘুম ভাঙ্গার সার্থকতা। মায়ের অভাবে যে মূর্ত্তি পরদার আড়ালে ছিল, মায়ের মাঝে সেই মূর্ত্তি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

মূর্ত্তি অপরূপ হাসি হেসে বল্লেন, "আমি, মা এসেছেন শুনেই, দেখতে আসছিলাম, পিসীমা বারণ করলেন। কিন্তু আপনি যে এখনো এত শিশু তা জানলে হর্ষিত অন্ততঃ মাস খানেক দেরী করে আসতাম।

মা আমার হাসতে হাসতে বল্লেন, "ও আমার চিরদিনের শিশু—ওযে কি শিশু তা তোমাদের একদিন বলব মা। ওরে প্রিয়, তুই কাছারী যাবি নে?

তোর পেয়াদা যে এসে বসে আছে, কাছারীতে না কি কে সাহেব এসেছে, তোকে ডেকে পাঠিয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, ' মা তোমায় যে কথা বলেছি তা যেন ভুলে যেওনা—কথার ঝোঁকে যা' তা' বলে এঁদের ব্যস্ত ক'র না। আমি আসার পর হতেই এঁরা আমায় নিয়ে যে রকম ব্যস্ত হয়েছিলেন তাতেই বলছি যে ছেলের আদর বাড়াবার জন্যে যা' তা' কতকগুলি কথার ঝুড়ি এদের শুনিয়ে কাজ নাই।"

আমার কথার ভঙ্গীতেই বোধ হয় হাসি দেবীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে তিনি একবার আমার দিকে চেয়ে তারপর মার দিকে ফিরে বল্লেন "এঁর বিষয় গোপন করবার কি কিছু আছে?" মা বল্লেন, "কি জানি মা, ও আমায় ওর বিষয় কোনো কথা বলতে মানা করে দিয়েছে। যাক, ভয় নেই মা, ও যা বলতে বারণ করেছে তাতে এমন কিছু নেই যা তোমাদের ভয় পাবার কারণ হবে।"

হাসি দেবী তবু হাসলেন না। আমিও বেরিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু এই হাস্যময়ী হাসিদেবীর ভীত মুখ যেন আমাকেও একটু অস্বস্তি এনে দিলে। মন কেবলি বলতে লাগল—ওগো হাস্যময়ি তুমি হাস। যে হাসি হতে কেউ বঞ্চিত হয় না, সে হাসি হতে আমি যেন বঞ্চিত না হই।

(৬)

এইবার আমার দ্বিতীয় ভয়টা কি এবং কি করে সেটা গেল সেই কথাটা বলব। কিন্তু একথাগুলো বলতে কেমন যেন লজ্জা করছে! লজ্জা! হাঁ। লজ্জাই ত--আমি যে একেবারে সহজ মানুষ হয়ে গিয়েছি, আমার লজ্জা করবে না?

কিন্তু কিসের লজ্জা। লজ্জা এই, যে আমি যাঁর দাসত্ব করতে ফিরে এসেছি, এখানে দুদিন থেকেই বুঝলাম তিনিই আমার এই মালিক—একদিন এক অপূর্ব্ব দিনে অপূর্ব্ব অবস্থায় এঁকেই আজকের এই অন্তরালবর্ত্তিনীকেই চিরান্তরালের বাইরে রাণীরূপেই পেয়েছিলাম। বিশ্বমায়াময়ীর অপূর্ব্ব মায়ায় আজ আমি না জেনে না ইচ্ছে করে সেই ইচ্ছাময়ীর (আমারই 'প্রতিষ্ঠিত) প্রতীকের সেবা করতে এসে পড়িছি। জগতের চিরন্তনী ইচ্ছাময়ী যে কি অঘটনঘটন-পটীয়সী তাই দেখতে পেয়ে ভয়ে লজ্জায় আনন্দে আমি একেবারে

এতটুকু হয়ে, এই আমার মন্দিরের দ্বারে এসে পৌঁচেছি। কিন্তু ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-প্রতীক এখন গোপনতার অন্তরালে লুকিয়েছেন, আমি এখন ঐ মন্দিরের গোপুরমে দাঁড়িয়ে আঁধার মন্দিরের গোপনতার দিকে চেয়ে আছি। মনে আশা—মন্দিরের দরজা কি খুলবে না—দেখতে কি আর পাব না? তিরস্করিণীর আবরণ কি সরবে না?

নাই বা সরলো, তবু জানছি যে তুমি আছ সেই যে যথেষ্ট। গোপন হয়ে আমার মধ্যে আশা জাগিয়ে, ব্যথা জাগিয়ে, আমার সব জাগিয়ে আছ—আছ, এই যে আমার পরম লাভ। একেবারে সমস্ত অন্তরাল লোপ করে তোমায় পেলে যে সব দুঃখ লোপ পেত, জড় হয়ে যেতাম, না না—তা চাই না। ওগো দয়াময়ি, তোমার এই দুঃখ দেওয়াই যে পরম সুখ দেওয়া। এই ধরা না দিয়ে ধরা দেওয়াই যে পরম আনন্দ দেওয়া। একেবারে মুখোমুখি দেখায় ভয়ঙ্কর সুখ আর চাই না—আমি চাই না। এখন ভুল করতেই শেখাও। সত্যিকে একভাবে খুব দেখে নিয়েছি ভয়ঙ্কর নিয়েছি—সে যে সুখ দুঃখের বাইরে। ওগো, সে সত্যকে, নিয়ে আনন্দ নেই। যে আনন্দের অভাবে আনন্দের তাড়নে একদিন জগৎসৃষ্টি হয়েছিল সেই আদি ভুল ভুলে থাকতে চাই যে। ভুল? আচ্ছা ভুলই সই,, তবু তাকেই চাই।

কি বলতে গিয়ে কি সব বাজে কথা লিখে ফেল্লাম। এ সব সহজ মানুষের কথা নয় যে। ওকথা আর বলব না—এই কাণ মলছি। ওগো ক্ষমা কর—আর কখন বলব না।

আমি বলছিলাম, যে, আমার ভয় হয়েছিল' যে কোন দিন বুঝি ধরা পড়ে যাব, আমার এই লুকোচুরী বুঝি কোন দিন এঁদের কাছে একেবারে খোলসা হয়ে যাবে, আর আমার এই অপরূপ দাসত্বের খেলা ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু দুদিন "যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, যে না—সে ভয় নেই—কারণ যাকে গর্ভধারিণীই চিনতে পারে নি তাকে কি করে এঁরা চিনবেন?—বিশেষতঃ এই অত্যন্ত সহজ বেশে। প্রথম যখন এঁদের কাছে এসেছিলাম, তখন একেবারে সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানাশ্রয়ী সন্ন্যাসী মানুষ। তাঁরা সেই অসহজ মানুষকে এই সহজ মানুষের মধ্যে ধরতে পারবেন কি করে? তখন ছিল গেরুয়া এখন হয়েছে প্লেণ্ট্‌লান, না হয় ধুতি চাদর, তখন মাথায় ছিল জটা এখন মাথায় আছে টেরী, তখন শরীরে ছিল দীপ্তি আর শক্তি, এখন সেইখানে এসে জুটেছে কান্তি আর পুষ্টি! এ দেহের মধ্যে তাকে কোথায় পাবে, যাকে পাবার জন্য শুনিছি এই

এত বড় সংসারটা সমস্ত ভারতবর্ষের বৈরাগ্যলোকের ধ্রুবলোকের দিকে চেয়ে বসে আছে। যাকে পাবার জন্য ঐ অত বড় একটা ধর্ম্মশালা হয়েছে—অন্ততঃ যাতে একটী সন্ন্যাসীও যেন দিনান্তে একবার এঁদের চোখে পড়েন। এবং আরও শুনেছি নাকি কে একজন স্বামীজী আজ কত দিন হতে এঁদের ঐ পুকুরটার দক্ষিণ বাগানের মধ্যে ষোড়শোপচারে পূজা পাচ্ছেন। তিনি যে কে এখন পর্য্যন্ত তা কেউ জানে না, কেবল একটা সন্দেহ, কেবল একটা 'হলেও হতে পারে' এই আশঙ্কার জোরে তিনি ঠাকুরের মত পূজা পাচ্ছেন। কে তিনি তা জানিনে, জানতে চেষ্টাও করিনি কারণ সহজ মানুষ অসহজ মানুষের কাছে যেতে ভয় পাবে না কি? আমি চাকরী করতে এসেছি, দাসের কি স্বামীর কাছে, অতি কাছে যাওয়া ভাল দেখায়?

আমি স্বামীজীকে দেখতে যাই নি, তার নানা কারণের মধ্যে বড় কারণটা যে কি তা বলব কি? আচ্ছা বলছি, ভাই, কিছু গোপন করব না।

এই যে অদ্ভুৎ অবস্থার মধ্যে এসে পড়িছি এটার মধ্যে ভারি একটা লোভের জিনিষ পেয়েছিলাম। এই যে লুকোচুরী এই যে গোপনতা, এইটাই যেন ভারি একটা লাভ বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই যে প্রভু হবার জায়গায় জেনে শুনে দাস হতে পেয়েছি এইটেই যে মায়েব আমার পরমদয়া, পরম স্নেহ দেখান। এ অবস্থা কি সহজে ছাড়া যায়—এই সহজ হবার মধ্যে এসে একটু অসহজ হওয়া এও যে আনন্দের জিনিষ, এও লোভের জিনিষ। আমি যে এখন বড্ড লোভী হয়ে উঠেছি। আমি চিরদিন অসহজকে অভ্যাস করে করে এসেছি কিনা, তাই এখানে এসেও সে আমার অজ্ঞাতে আমায় পেয়ে বসেছে, আমার এই দোষটুকু ক্ষমা কর ভাই। যেটা 'আপসে আতা হায়' তাকে আসতে দিলে কি খুবই দোষ হবে?

আর দোষই বা কি? এখন যদি চট করে বলে বসি, যে তোমরা আমাকেই খুঁজছ—যাকে খুঁজছ সে আর কেউ নয় এই চাপকান চোগা টেরী ছড়ী ধারী আমি, ঐ গেরুয়া জটা চিমটে ধারীর মধ্যে তোমাদের সেই খোঁজার বস্তু নেই, যার মধ্যে আছে তাকে তোমরা ধরেও ধরতে পারনি, পেয়েও পাবে না, একথা এখন বল্লে এরা কি তা বিশ্বাস করবেন? না করাই ত' সহজ, বিশ্বাস করাই ত' অসহজ। আমি সহজের সেবক হয়ে কি করে সে কাজ করতে দেব এঁদের? আর করতে বল্লেই বা তা এঁরা করবেন কেন? হয় ত বলতে গেলে ফলে আমার এই যে মুফতে পাওয়া মস্ত আনন্দটুকু ভোগ করবার উপায় হয়েছে

তাও যে চলে যাবার সম্ভাবনা। না না, আমি বড্ড লোভী ভাই, আমি এ আনন্দের লোভ ছাড়তে পারব না। এই সুখ দুঃখের এই আশা নিরাশার দোলে দোলাব আনন্দ হতে তোমরা বঞ্চিত হতে বলোনা। আমি পারব না, কিছুতেই না। যো আপ সে আগ্ উসকো আনে দিয়া -আনে দেও ভেইয়া আনে দেও। আওর ইসমে জো কসুর হ্যায় উসকো ভি জানে দেও।

বাধা দেওয়া হবে না, জোর করা হবে না। বাপ্‌রে। আবার জোরা জোরী এই জোরা জোরীর পড়ে এই ১৫.১৬ বছরটা কোন দিক দিয়ে চলে গেল তার হিসেবই নাই। এত ক'বছরের যে লোকসান হয়েছে তারই ঠেলা কি করে সামলাব। আবার বাধা দেওয়া? গতির বিরুদ্ধে উজান টানা? না ভাই আর নয়। এখন গা ভাসান দিয়েছি, ভাসতে শিখেছি, আর ভয় কি—এখন ভেসে চলব। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় ভাসছি এ বোধ হতে ত' এ আনন্দ হতে ত' কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারবে না। বাস্ তা হলেই হল; থাকা নিয়েই কথা, যখন আছি, তখন আছি বলেই থেকে গেলাম—বাস আউর কেয়া?

যাক, যে কথা বলছিলাম ভাই বলি, এরা আমায় কেউ চিনলে না, আমিও বেঁচে গেলাম, মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের দুঃখ আকণ্ঠ পান করতে আরম্ভ করলাম। যাঁর দাসত্ব করতে এসেছি মুক্তভাবে তাঁর দাসত্ব করতে আরম্ভ করলাম। তিনি দেখলেন না তিনি জানলেন না, তবু তাঁর কাছে তাঁর না চাওয়া পূজা পৌঁছে দিয়ে আমি বড় আনন্দে আছি ভাই। এই যে প্রতিপদে ব্যথা পাচ্ছি, প্রতিপদে মনে হচ্ছে বলি, একবার, ওগো অন্তরালবাসিনী কৃপা করে এই দীনের পুজোপহারের দিকে চেয়ে আমার চোখের মধ্যে দিয়ে সেই পরম মায়াবিনীর চোখের সুমুখে আমার নৈবেদ্যগুলো পৌঁছে দাও—কিন্তু প্রতিবারে বাধা পেয়ে ফিরে আসছি, এতে কি আনন্দ কি মুক্তি। কি বেদনা কি বন্ধন। ওগো এই বেদনার বন্ধন আমার অক্ষয় হোক, তোমরা এই পরম লোভীকে, পরম কামুককে এই আশীর্ব্বাদ কর। (উপাসনা—বৈশাখ)

চাই স্বারাজ্য

স্বরাজ ভাল কথা, কিন্তু স্বারাজ্য আরও ভাল কথা। স্বরাজের জন্য চেষ্টা চলুক, তাহাতে কিছুমাত্র ঢিলা দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু সেই সঙ্গেই স্বারাজ্যের বন্দোবস্তটাও ঠিক করিয়া লইতে হইবে। স্বরাজের উদ্দেশ্য বাহিরটা পরিষ্কার করা, সুযোগ ও সুবিধা আনিয়া দেওয়া, কিন্তু সেই

সাথে চাই ভিতরটা পরিষ্কার করা, অন্তঃকরণে নূতন প্রেরণা ও অভিনব শক্তি ফুটাইয়া তোলা। ভিতরটা ঠিকমত গড়ন না পাইলে, বাহিরটার শত পরিবর্ত্তনে ওলট-পালটে বিশেষ কিছু ফল হইবে না। এ কথাটি আজকালকার জগৎ-জোড়া বিপ্লবের মধ্যে আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, জোর করিয়া বলিতে হইবে যে বাহিরের বিধিব্যবস্থার নিয়মকানুনের যতই ভাঙ্গাচুরা গড়াপেটা হউক না কেন, মানুষের স্বভাব যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে সব পণ্ডশ্রম। মানুষের স্বভাবে যদি গলদ থাকিয়া যায়, তবে সে গলদ তাহার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহে ফুটিয়া উঠিবেই। 'পরাধীন অবস্থায় যদি আমাদের প্রকৃতিতে থাকিয়া যায় অশুদ্ধ জিনিষ সব, তবে স্বাধীন অবস্থায় আসিলে সে সকল যে ভৌতিক বাজির মত দূর হইয়া যাইবে তাহা কেহ মনে করিবেন না। ইউরোপের দেশ সব দেখুন—সব দেশই ত স্বাধীন। কিন্তু ভিতরের অবস্থা তাদের খুবই কি লোভনীয় বলিয়া বোধ হয়? ভারতবর্ষের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া আমরা অশ্রু ফেলি, সব দোষ দেই পরাধীনতার উপর। কিন্তু স্বাধীন ইংলণ্ডেরই কি অবস্থা আজ তাহার পরিচয় দিতেছে শ্রমজীবীদের বিদ্রোহ। পরাধীন দেশে দেখি রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ (স্বাধীন দেশে এ সংঘর্ষও আছে), স্বাধীন প্রজাতন্ত্রদেশে দেখি প্রজায় প্রজায় সংঘর্ষ। স্বাধীনতা ও পরাধীনতায় যে তাই বলিয়া কোন পার্থক্য নাই, তাহা নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ দেশের সব লোকের কাছে না হউক অন্ততঃ একটা শ্রেণীর কাছে সুযোগ সুবিধা আনিয়া দেয়, পরাধীন দেশে দেশের কোন লোকই প্রায় সে সুযোগ সুবিধা পায় না। কিন্তু কথা হইতেছে এই স্বাধীন অবস্থায় স্বরাজে এই সুযোগ ও সুবিধার সম্পূর্ণ ফল পাইব তখনই যখন মনের জগতে একটা স্বাধীনতা স্বারাজ্য আমরা স্থাপন করিতে পারিয়াছি। স্বাধীন হইয়াও ইংলণ্ড জর্ম্মণী রুশিয়া ফরাসী আমেরিকা এমন কি জাপান পর্য্যন্ত যে-সব ব্যাধিতে জরজর হইয়া পড়িয়াছে, সে-সকলের হাত এড়াইতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তুত হইতে হইবে। বিধান বা শাস্ত্র উল্টাইয়া দিলে যে মনটাও উল্টিয়া অন্য রকম হয়, তা নয়। আর মন যদি অন্য রকম না হয়, তবে ব্যবস্থা বদলাইয়া গেলেও কিছু হয় না। ইংরাজীতে ইংলণ্ডের ইতিহাস না পড়িয়া, বাংলায় বাংলার ইতিহাস পড়িলেই তাহাকে জাতীয়শিক্ষা নাম দেওয়া চলে না; সেই রকম সাদা-রাজের পরিবর্ত্তে কালো-রাজ প্রতিষ্ঠা করিলেই যে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা হইবে তাহাও একটা একান্ত ভুল বিশ্বাস।

মহাত্মা গান্ধীর কাছে তাই একটা জিনিষের জন্য আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ। দেশবাসীর কাছে তিনি চাহিতেছেন যে অহিংসা, তাহার অর্থ তিনি চাহিতেছেন স্বভাবের একটা সংযম ও শুদ্ধি। অন্তরাত্মার বল তিনি যে অর্থে গ্রহণ করেন তাহা আমরা হুবহু গ্রহণ না করিতে পারি, - তাঁহার অন্তরাত্মার বল হয়ত শুধু নৈতিক বল, ঠিক আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাকে হয়ত বলা চলে না— কিন্তু তিনি যে এই গোড়ার কথাটা এমন জোর দিয়া বলিয়াছেন যে আমরা বাহিরের ব্যবস্থা উল্টাইব, বাহিরের শক্তি দিয়া নয়, রাজনীতিকের ছল বল কৌশল দিয়া নয় কিন্তু অন্তরাত্মার বলে, তীব্র বৈরাগ্যের জোরে, তপস্যার চাপে, ইহাই ভারতবাসীর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। আর ঠিক এইজন্যই আমাদের রাজশক্তি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, চেষ্টা করিতেছেন যেন আমরা বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সমান স্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যে-শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই শক্তি লইয়া তাঁহাদের সাথে লড়ি ও পরাভূত হই। ভারতবন্ধু ইউরোপীয়েরা পর্য্যন্ত এই জন্য বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। কর্ণেল ওয়েজউড গান্ধীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন ভারতের গোলমাল মিটিবার নয়, কারণ ভারতবর্ষ যে কেবল ইংলণ্ডের হাত হইতে মুক্তি চায় তা নয়, সে ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে চায়। কর্ণেল ওয়েজউড সত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন—ভারতের স্বরাজচেষ্টা শুধু একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, বাহিরের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা নয়, ইহা হইতেছে অন্তরের পরিবর্ত্তনের কথা। প্রাণের তোড়ে দেহের জোরে তর্কবুদ্ধির দাপটে ইউরোপীয় প্রতিভা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে ভারতের অধ্যাত্মপ্রতিভা স্বারাজ্য-শক্তি—মানুষের মধ্যে ভগবানের শান্ত সমাহিত অথচ বিপুল অটুট ইষণা। ভারতের স্বরাজ সাধনার ইহাই মূল কথা।

দুইটি জিনিষের উপর আমাদের বিশেষ দৃষ্টি এখন দিতে হইবে। প্রথম, স্বভাবের পরিবর্ত্তন অর্থে কি বুঝি, অধ্যাত্ম-শক্তি কাহাকে বলি। স্বভাবের পরিবর্ত্তন অর্থ স্বভাবের আমূল রূপান্তর, অধ্যাত্মশক্তি অর্থ মানুষের নিবিড়তম উদারতম সত্তার ঐশ্বর্য্য। মানুষের আছে দুই রকম স্বভাব, একটা হইতেছে প্রাকৃত স্বভাব আর একটা হইতেছে আত্মিক বা ভাগবত স্বভাব—গীতা যাহাদের নাম দিয়াছেন আসুরী প্রকৃতি আর দৈবী প্রকৃতি। আসুরী প্রকৃতি বা প্রাকৃত স্বভাবটিকেই মানুষের সহজ, নিত্যনৈমিত্তিক, খুব আপনার বলিয়া বোধ হয় আর বস্তুতঃ আমরা দেখি মানুষ সচরাচর ইহারই দ্বারা পরিচালিত;

কিন্তু দৈবী প্রকৃতি বা ভাগবত স্বভাবও মানুষের পক্ষে কম আপনার নয় বরং এইটিই মানুষের গভীরতম সত্তার মধ্যে আছে, মানুষ ইহাকেও সহজ নিত্য-নৈমিত্তিক করিয়া লইতে পারে। তারপর দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, এই দৈবী প্রকৃতি, ভাগবত স্বভাবকে চিনিয়া বুঝিয়া সম্যক উপলব্ধি করিয়া জীবনে ফলাইয়া ধরিতে হইবে - মানুষের প্রত্যেক চিন্তা ভাব ও কর্ম্মের লক্ষ্যই হইবে এই নিবিড়তর ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা। আসুরী প্রকৃতি দিয়া স্বরাজলাভ করা যে যাইতে পারে না তাহা নয় কিন্তু সে স্বরাজ হইবে আসুরিক-স্বরাজ —তাহাতে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অন্যায় অত্যাচার অভাব দৈন্য থাকিবেই, সেখানে যথার্থ স্বাধীনতা যথার্থ সাম্য যথার্থ ঋদ্ধি স্থান পাইবে না। সেইজন্য আমরা যদি সত্য সত্যই স্বরাজপ্রয়াসী হই কায়েন মনসা বাচা, কেবল উত্তেজনার বশে বা বাহিরের একটা খোঁচাব ফলে নয় - তবে আমাদিগকে স্বারাজ্য পাইতে হইবে অর্থাৎ দৈবী প্রকৃতি ভাগবত স্বভাব পাইতে হইবে। সমস্তার এই একমাত্র খাঁটি সমাধান, আর সব গোঁজামিল—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এ পথটি যদি মানুষের অগম্য বলিয়া বিবেচনা কর, যদি বল মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্য সাধন, তবে বুঝিতে হইবে মানুষের কোনই আশা নাই, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সব মায়া মরীচিকা। তবে বলিতে হইবে মানুষের শিক্ষার সাধনার কোন অর্থ নাই, মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য নাই।

মানুষ যে দৈবী প্রকৃতি পাইতে পারে না এ রকম বিশ্বাসের অবশ্য যথেষ্ট হেতু আছে। কারণ ব্যক্তিগত হিসাবে যাহাই হউক, সমষ্টি হিসাবে যখনই মানুষ এ সাধনা করিয়াছে তখনই দেখিতে পাই প্রথম প্রথম একটু আধটু সুফল পাওয়া গেলেও অচিরে যথাপূর্ব্বং তথাপরং হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের ইতিহাস একটু দেখিলেই এ কথা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এই যে বিফলতা ইহার কারণ কি আদর্শের মধ্যেই, না সাধনার মধ্যে, না উপায়ের মধ্যে? আমরা বলিতে চাই দোষ আদর্শে নাই, দোষ হইতেছে যে পথে চলা হইয়াছে সেই খানে। প্রথমতঃ দৈবীপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া অর্থাৎ আসুরীপ্রকৃতিকে নিগ্রহ করিয়া, কোন রকমে চাপাচুপি দিয়া যে প্রকৃতিটা পাইয়াছি তাহারই নাম দিয়াছি দৈবীপ্রকৃতি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দৈবী প্রকৃতি তাহা নয়, আর শুধু এই টুকু দিয়াই দৈবীপ্রকৃতি পাওয়া যায় না। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? চাপা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়া উপরে উপরে একটা সাত্ত্বিকতা বা সাধুভাব—দৈবীপ্রকৃতির আভাস পাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সেটা প্রকৃতি নয়,

স্বভাব নয়, সেটা নিয়ম দিয়া, আইন কানুন দিয়া প্রকৃতিকে স্বভাবকে বাঁধান মাত্র। দুই রকমে আমরা আসুরী প্রকৃতিকে ঢাকিয়া চাপিয়া রাখিতে পারি, স্বভাবের উপর দৈবী প্রকৃতির একটা ছায়া বা জলুস লাগাইতে পারি। প্রথম, কঠোর ইচ্ছা শক্তির জোরে, তপস্যার তাপে, তীব্র ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা, শিক্ষার সভ্যতার বলের দ্বারা। দ্বিতীয়, একটা চিত্তাবেগ, ভাবোন্মত্ততার দ্বারা। কিন্তু উভয় পন্থাই অনিশ্চিত। কারণ কোনখানেই আসুরী প্রকৃতির গোপন বীজ নষ্ট হয় নাই, সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহা ফুটিয়া ফুলিয়া উঠিবে। চাই আসুরী প্রকৃতির রূপান্তর, সমস্ত আধারের একটা নির্ম্মল টলটল শুদ্ধির উপরতম স্তর হইতে নিম্নতর স্তর পর্য্যন্ত একটা প্রসাদগুণাত্মক স্থির সমতা। এ জিনিষ জোর করিয়া হয় না, সহজ ভাবাবেগেও হয় না। এ জন্য চাই নিবিড় জ্ঞানের, অন্তরাত্মার জাগরণের ক্রমবিকাশ, আধারের মধ্যে ক্রম বিকাশ, আধারের মধ্যে ক্রমবিস্তার। ইচ্ছা শক্তি ও ভাবাবেগ সহায় হইতে পারে, কিন্তু ও দুটি ছাড়া চাই ভিতরে একটা পূর্ণব্রহ্মের অনুভূতি, এবং তাহারই এষণায় অঙ্গের একটা ধীর রূপান্তর।

যম নিয়ম অহিংসা অস্তেয় স্বাধ্যায় দ্বারা নৈতিক মানুষ পাওয়া যাইতে পারে, প্রেম ভক্তি দ্বারা সাধু মানুষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন দিব্য মানুষ, দিব্য মানুষের সম্ভাবনা হইবে তখনই যখন মানুষ দাঁড়াইবে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর, পাইবে গীতার "ব্রাহ্মীস্থিতি"; সুস্থ অখণ্ড সহজ স্বাভাবিক মানুষ— এইরূপ লক্ষ্য হইলে যে সাধনা যে ক্রিয়া যে পথ মানুষকে একবগ্গা, একদিক ভারী, অস্বাভাবিক করিয়া ফেলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। মনের বা চিত্তের কসরৎ ছাড়িয়া দিতে হইবে, সমস্ত আধারকে সহজ ছন্দে দুলাইয়া দিতে হইবে, ও সেই ভাবেই তুলিয়া ধরিতে হইবে একটা উচ্চতর গ্রামে অর্থাৎ মনের চিত্তের কোন বিশেষ ধারার মধ্যে ঢালিয়া নয় অন্তরাত্মার পূর্ণ বিভূতির মধ্যে মানুষকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে।

অন্তরাত্মার সিদ্ধি বল, ব্রহ্মসিদ্ধি বল আর স্বারাজ্যসিদ্ধি বল—আমরা গোড়ার সেই একই জিনিষকে লক্ষ্য করিতেছি। ইহার পথ কি? ইহার কোন বিশেষ পথ নাই, কারণ ইহা আছে সমস্ত জীবনকে ঘিরিয়া, ইহা উপার্জ্জন বা লাভ করিবার বস্তু নয়, ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। বিশেষ পথ ধরিয়া, একটা কাটাছাঁটা সাধনার ক্রম ধরিয়া এখানে পৌঁছান যায় না, সমস্ত আধারটিকে পুঁটুলি পাকাইয়া, নিজের সমস্তখানিকে গুটাইয়া ইহার মধ্যে যে

ঝাপাইয়া পড়িতে পারিবে, সেই ইহাকে পাইবে। এই রকমেই সকলকে এ জিনিষ পাইতে হইবে।

(প্রবর্ত্তক)

প্রিয়।

[শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু, বি-এ]

কে আজ আমার অঙ্গে অঙ্গে
পরশ বুলালো,
আনন্দ-সঙ্গীতের মালা
কণ্ঠে দুলালো ?

হৃদয়খানি গলে' গলে'
ঝরে রে তা'র আঁখির জলে,
তার মাঝে তা'র হাসির কিরণ
ভুবন ভুলালো।

তরুণ-রবির আলোক-রথে
এই পথে তা'র আনাগোনা,
সন্ধ্যা-শেষের গানটিও তা'র
এখান হতেই যায় রে শোনা।

দুঃখ সুখের লহর বেয়ে
চলে সে গান গেয়ে গেয়ে,
জানি না হায় কোন্ ভিখারী
রাজার দুলাল ও।

পণ্ডিচারীর পত্র।

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

একদিন অরবিন্দের কাছে পণ্ডিত হৃষীকেশ ভারতীয় চিত্রকলার মহত্ব ও সৌন্দর্য্য বুঝতে চাইলো। তারপর যে কথা আরম্ভ হ'লো তা' আমার ভাষায় বলা কঠিন। এবারকার "শ্যামা"য় "হার্মিসে"র পাথরে খোদা রূপ আছে, তা' দেখিয়ে অরবিন্দ বললেন, "দেখো, এতে শরীর ও প্রাণের মূর্ত্ত কবিতা আছে, তার বেশি নেই। দেহের সৌষ্ঠব, সুঠামতা ও নিখুঁৎ গঠন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আর আছে action কর্ম্মের সহজ লীলা, দুই হাতের ভঙ্গি ও দাঁড়াবার হাব ভাবে স্বর্গের বারতা জগতে বলবার ভঙ্গিটি বেশ ফুটেছে, এ ছবি তাই শুধু প্রাণ ও দেহের কলা, আত্মার অনন্তত্ব ও মহত্ব এখানে আদৌ নাই।

আর নন্দলালের এই "নৌকাবিহার" দেখো। এতে রাধা ও কৃষ্ণের মাঝে আগে রাধাকে লক্ষ্য কর। এ চিত্রে বাস্তবের details বা বহুবৈচিত্র্য পাবে না, রূপ আঁকা হয়েছে শুধু simple essentials নিয়ে অর্থাৎ শুধু সেই কয়টি সরল ললিত আসল রেখায় যা না হ'লে অরূপ রূপ পায় না। তারপর রাধার মাঝে দেখো দু'টি জিনিষ পাবে,- প্রেম ও আত্মদান। মুখের ভাবে, দুই হাতের ভাবে, এমন কি দেহের ললিত রেখার ছন্দে (rythm) পা দু'খানির রাখার রকমে এমন কি সমস্ত শরীরের হেলনে আনমনে ঐ আত্মদান —শ্রীকৃষ্ণার্পণ ও প্রেম ফুটে উঠেছে। অথচ এ জমাট প্রেমে উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য নাই বিরাট শান্তির মাঝে যেন কি মধুর পূর্ণতায় বিধৃত এ চাওয়া—এ দেওয়া। এই রাধাই হ'লো এ চিত্রের key বা রহস্যের দ্বার। একে বুঝলে তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও সখি দু'জনকে বোঝা যায়।

তারপর শ্রীকৃষ্ণে পাবে দেবতার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, মগ্ন ভরাট মহিমা, আর সেই আপন ঐশ্বর্য্যে দৃঢ় আসীন হয়ে প্রেমে এই আত্মোৎসর্গকে গ্রহণ। কৃষ্ণের হাতের বাঁশীটি যা'-দিয়ে রাধাকে টেনে এনেছে—জয় করেছে তা' কেমন হেলায় আলগোছে ধরা! ভগবানের পক্ষে এটা যে কত স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজ লীলা তাই যেন দেখাচ্ছে। সখী দু'জনের মাঝে চাঞ্চল্য আছে, কৌতুক আছে, কিন্তু শান্তির নিবিড়তাও আছে।"

তারপর পারস্য ও মিশরের কলা, চীন জাপানের কলা, অজন্তা, মোগল কলা এমনি কত কলা ও শিল্পের কথাই না হ'লো। পারস্যের কলা পরীর

জগতের ছবির মত হালকা তুলির স্বপ্ন, এ যেন আরব্য উপন্যাসের জগত। মোগল কলা সূক্ষ্ম বা psychic জগতের, জীবনের মহাকাব্যের মহত্ব তা'তে না থাকলেও লালিত্য ও মাধুর্য্যে সেও অনুপম। জাপানে জাপানী চিত্রকর মানুষ আঁকলে যেন ব্যঙ্গ চিত্র হয়ে যায়, ওরা প্রকৃতির ছবি natural scenery বড় রমণীয় করে ফোটায়। অরবিন্দ চীনের খুব বড় শিল্পীর আঁকা বৌদ্ধরূপ দেখেছেন, তা'তে সমস্ত জগতের দুঃখ যেন প্রাণতরঙ্গে মূর্ত্ত হয়ে বুদ্ধের মুখের বেদনায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু ভারতের আঁকা আর একটি বুদ্ধ রূপেও ঠিক ঐ রকম দেখেছেন, সেই অনন্ত জগদ্দাহী দুঃখ সে মুখেও ফোটান বটে কিন্তু শান্তির অটল মহত্বে সমস্তটি ধরা।

অর্দ্ধেন্দু প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা "গঙ্গা" দেখে বললেন, "ছবিটি খুব সুন্দর হয়ে উৎরোয় নি, কিন্তু গঙ্গার চোখ দেখ! দৃষ্টি যেন এ জগতে নেই, পিছনে অনন্ত কি এক জগতে ডুবে আছে—সেইখান থেকে কলনাদিনী বয়ে আসছে কিনা। নন্দলালের "গিরীশ" দেখে বললেন, "মহত্বে মণ্ডিত। নন্দলালের ঐটিই বিশিষ্টতা, দেবতার অন্তরের দেবত্ব এমন করে ফোটাতে সহজে কেউ পারে না। তবে এ স্কুলের একটা বিপদ আছে, তা' অল্প অল্প দেখা দিচ্ছে। কলাভবনের ছোট ছোট চিত্রশিল্পীরা বড় বড় আঁকিয়ের বাহিরের ভঙ্গি ও ধারাটা (mannerisms) ধরে এঁকে যায়, ভিতরের সত্যটি হারিয়ে ফেলে বা ধরতে পারে না।"

তারপর কথা হ'লো এক দিকে সাধক ও অন্যদিকে প্রতিভাশালী কবি বা চিত্রকরের মধ্যে পার্থক্যটি কি তা' নিয়ে। প্রতিভায় মানুষ মনের অলক্ষ্যে কোন্ গোপন দুয়ারের একটুখানি ফাঁক দিয়ে ঝলক ঝলক-আলো মনের মাঝেই পায় আর তাই কথায় বা রঙে ধরতে থাকে। এ পাওয়া তার সাক্ষাৎ পাওয়া নয়, অবগুণ্ঠন তুলে সমস্ত মুখখানি দেখা নয়; আবার সেই ক্ষণিক পাওয়াও তার সহজে হাতধরা জিনিষও নয়,—সে কখন পায় কখন পায় না, কখন অল্প পেয়ে তাই ফেনিয়ে তোলে, কখন বেশি পেয়ে দু'একটি টানে দু-পাঁচটি আখরে তা' অমর করে রেখে যায়। কিন্তু তবু চিত্রে কবিতায় বা ভাস্কর্য্যে যেন রূপের বা ভাষার আবরণ ভেদ করে পিছনের ভূমাকে দেখিয়ে দেয়, সাক্ষাৎ-দেখাতে পারে না—you look at the infinite though the form, not at it direct."

"জামা"য় এবার বারাণসী বিদ্যাপীঠের আবেদন বেরিয়েছে। তার সম্বন্ধে

কথা হ'লো। তা'তে লিখছে, "১৯১০ সালে Tagore Collection নামে ঠাকুর বাড়ীর রাশি রাশি ছবি ভারতীয় চিত্রভবন দেশকে বিনামূল্যে দান করতে রাজী ছিলেন। তার একমাত্র সর্ত্ত ছিল যে দু'চার লক্ষ টাকায় ভাল চিত্রভবন গড়ে যেন সে গুলি যত্নে রাখা হয়। ভারতে কিন্তু কেউ তার মর্য্যাদা বুঝলো না, আমেরিকা সে চিত্ররাশ নিয়ে গেল। এখন ভারতীয় চিত্রকলার সব চেয়ে বড় স্থায়ী প্রদর্শনী বা চিত্রভবন দেখতে হ'লে তাই বোষ্টনে যেতে হয়। এবার চার লাখ টাকায় আবার Tagore Collection বিক্রী হচ্ছে। এবার দেশ জাগুক, কোন ধনী এই চিত্ররাশি কিনে কালী বিদ্যাপীঠে দিয়ে নিজের নাম ও যশ অক্ষয় করুন। নইলে এ অমূল্য সম্পদ আবার দেশের বাইরে চলে যাবে।" অরবিন্দ বললেন, "আজ যার দাম চার লাখ, ভবিষ্যতে একদিন চল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়েও তা' দেশে ফেরাতে পারবে না, তখন ভারতের গৌরবের যুগে আমেরিকা জয় করে এ সম্পদ লুটে আনা ছাড়া আর গতি থাকবে না। কিন্তু দেশ যবে অর্থ (art sense) কলাজ্ঞান নিঃশেষে হারিয়েছে। কেবা এ সবের মূল্য বোঝে।"

আমার রাখালরাজ।

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত এম, এ

হে মোর রাখাল রাজ,
জানিনা কি প্রভু কি চাহি জীবনে ?
তোমার রাতুল চরণ বিহনে
কি চাহিব অধিরাজ ?
তুমি যে আমার শত সাধনার
ধ্যান জপ তপ সীমা সবাকার
প্রেমিক হৃদয় রাজ।
কোন্ আলোঘেরা গোষ্ঠের মাঝে
কোলাহল হ'তে লয়ে গিয়ে সাঁঝে
বসায়েছ নিজপাশ,
জ্যোছনা বিছান বট তরু তলে
সোহাগের ভরে বসায়ে বিরলে
পুরায়েছ মোর আশ।

তব বেণুধ্বনি উঠিত গুমরি
সারা প্রান্তর পুলকেতে ভরি
চড়ায়ে পড়িত তান ;
যমুনার বারি উঠিত ফাঁপিয়া
কলকল রবে চলিত বাহিয়া
আবেগ পূরিত প্রাণ।
কুসুম বিতান উঠিত দুলিয়া
ভাবহিল্লোলে পড়িত হেলিয়া
ফেলিত সুরভি শ্বাস,
মাথার উপর অমল ধবল
চারু ইন্দুর কিরণ তরল
লুটাত মধুর হাস।
এখনো সে সব পড়িছে স্মরণে,
যে অমৃত স্বাদ পেয়েছি জীবনে,
পুলকে ভরিত প্রাণ,
মুগ্ধ পরাণ হারাত চেতনা
তোমার চরণে সঁপিত কামনা
জপ তপ কুল মান।
তুমি যে আমার পিপাসার বারি
জীবন জুড়ান প্রেম তৃষাহারী
অফুরাণ প্রেমাধার,
সকল অভাব মিটায়েছ মোর
প্রেমের স্বপনে রেখেছ বিভোর
বিলায়েছ প্রীতিভার।
তোমার আদরে যবে মোর হিয়া
অসহ পুলকে উঠিত কাঁপিয়া
অবশ এ দেহলতা,
ধীরে ধরে তুমি কোলেতে টানিয়া
বাহুবেষ্টনে রেখেছ বাঁধিয়া
জাগায়েছ নবীনতা।
এস পুন আজ হে পরাণ স্বামী !
পুরায়ে বাসনা অন্তরযামী
ধরিয়ে মোহন সাজ—
এস এস মোর পরাণ ভুলান
এস এস মোর জীবন জুড়ান
এস হে হৃদয় রাজ।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩২৮ সাল

শ্রাবণে

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

আজ, শ্রাবণ ঘন নিবিড় মেঘে
আকাশ ছেয়ে আসে,
সন্ত্রাসিতা বসুধা ক'ার
উন্মাদনার ত্রাসে।
এধার ওধার চম্‌কে চিরে'
আলোর করাত বেড়ায় ফিরে'
নিঝুম বাতাস না জানি কার
কোন্ ইসারার আশে,
ব্যথার মত নিবিড় ঘন
মেঘের সারি ভাসে।

ওই আসে, ওই আসে বুঝি
ঝড়ের হানা হানি।
অভিসারের সাজটী আমার
দাও গো এবার আনি'।
পিয়ার মিলন লগন এযে
রাধা এখন রইবে সেজে'
বাঁশী কখন্ উঠ্‌বে বেজে
কিছুই যে না জানি,
বাইরে যে ওই মেঘের ঘটা
ঝড়ের হানা হানি !

ঝঞ্ঝা নয় রে বাদল নয় রে,
ওই যে মহোৎসব !
নূপুর রুনু ডুবাবে মোর
দেয়ার গুরুরব।

আকাশ ভরা ওই যে কাহার
নীলাম্বরীর জরীর বাহার,
সাড়ীর সাথে মিশ্‌বে রে মোর
নিশির অন্ধকার ;
অলঙ্কারের শিঞ্জিনী কেউ
শুন্‌বে না আজ আর !

শ্রাবণ নিশার-আঁধার রে আজ
গভীর হ'য়ে আসে,
এই লগনে আজকে তোরা
একলা রবি বাসে ?
বাতাস ডাকে 'আয় চলে আয়',
মাতাল সে আজ কিসের নেশায়,
হিন্দোল দোলায় দোলাতে তায়
আকুল কেশ পাশে,
শ্রাবণ নিশার আঁধার যে ওই
জমাট হ'য়ে আসে।

বাঙলা কাব্যে একটী নূতন সুর

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ।]

যে নূতন কবির নূতন সুরের কথা আজ বলিব তিনি অনেকের অপরিচিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি শীঘ্রই পুস্তকাকারে "মরীচিকা" নাম দিয়া প্রকাশিত হইবে—আশা করি তখন তাহার বিশেষ সুরটি সাধারণের নজরে পড়িবে। আমি শুধু তাঁহার 'ঘুমের ঘোরে" নামক কবিতাগুলি হইতেই নূতন সুরটী কি তাহা দেখাইব। এই কবিতাগুলি পূর্ব্বে "যমুনা"য় প্রকাশিত হওয়া সত্বেও সাধারণের দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করা উচিত তাহা করে নাই। যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায় প্রভৃতি কবিগণ কবিতাগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আমিও এগুলির ভিতর একটি নূতন সুরধ্বনি পাইয়াছি; কবিতার ভিতর দিয়া এমন একটা বিদ্রোহ ভাব বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় কাব্য কালান্তক রস আবিষ্কার করিয়া "যমুনা"য় কিছু কাল আগে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ইহাতে নূতন কবিতা, পুরাতন কবিতা, ঘুষঘুষে কবিতা, প্রবল কম্প কবিতা, পালা কবিতা, বিষম কবিতা, ধোঁয়া ধোঁয়া কবিতা, ছোঁয়াচে কবিতা, একমাস অন্তর কবিতা, চাপরী চাপা কবিতা প্রভৃতি যেরূপ কবিতা রোগই হউক না কেন নিশ্চয় ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। বুকজ্বালা, মন হুহু করা চোখে ঝাপসা দেখা, প্রাণ কেমন করা, রাত্রে নিদ্রা না আসা, পেট ফাঁপা, মাঝে মাঝে হাত শুড় শুড় করা, ইত্যাদি উপসর্গ এক বটিকা সেবনেই উপশমিত হইবে। বিশেষ চেষ্টায় বেতস, বিছুটি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি দেশীয় গাছগাছড়ায় এই মহৌষধ প্রস্তুত। পথ্যের কোন ধরাকাটা নাই। কেবল ঔষধ ব্যবহারের সময় ও পরেও একমাস জ্যোৎস্না লাগান, ফুল শোঁকা এবং মাসিকের সম্পাদকের সহিত পত্র বিনিময় নিষিদ্ধ।"

এ হেন কাব্য কালান্তক রসের আবিষ্কর্ত্তা যতীন্দ্রনাথের হাত হইতে কি করিয়া কবিতা বাহির হইল, ইহাতে অনেকের বিশেষ সন্দেহ হওয়ার কথা।

ওমর খৈয়ামের কবিতার সঙ্গে আমাদের কবির লেখার জায়গায় জায়-

গায় বেশ মিল আছে। "ওমরের কবিতায় কেহ কেহ কেবল মদিরার গন্ধ আর রূপসীর পাতলা ঠোঁটের ক্লিয়ান রসের স্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম যেমন 'ব্রহ্ম মিথ্যা' কখনও বলেন নাই, তেমন শুধু নাচ, গান, পান করার তথ্য প্রচার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার কবিতা ব্যর্থ ও নিকৃষ্টতর হইত। প্রকৃত পক্ষে এ কবিতাগুলি অভিমানের ও বিদ্রোহের কবিতা। কবি বলিতেছেন "হে শাস্ত্রকার, তুমি আমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারিবে না অথচ আমাকে শত সহস্র 'না'র মধ্যে জড়াইয়া আমার জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে—তাহা হইবে না। আমি তোমার কথা মানিব না। হে আমার চিত্ত, তুমি কেন বৃথা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়া কষ্ট পাইতেছ? এস বিশ্রাম কর। অর্থহীন তর্ক ছাড়িয়া দিয়া চল আমরা নিভৃতে গিয়া কোনও তরুণীর অধর সুধা পান করিয়া শ্রান্তি দূর করি।

"কিন্তু ওমরের চিত্ত কি এই আহ্বান শুনিয়াছিল? ওমর কি আপন ইন্দ্রিয়ের সেবায় মগ্ন হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বিস্মরণ হইয়াছিলেন? না তাহা নহে। এ ক্ষণিকের বিদ্রোহের পরেই আবার মন সেই পুরাতন চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইত। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত তখন এক একবার হৃদয়ে বিরক্তির উদয় হইত এবং তখনই এই শ্রেণীর কবিতার জন্ম হইত।"

যতীন্দ্রনাথ ঘুমের ঘোরে অবসন্ন হইলেও ভগবান এবং সংসারটাকে একবারে সাদা চোখে দেখিয়া ফেলিয়াছেন এবং উপরের রংচঙে না ভুলিয়া ভিতরকার খড় বাঁশ টানিয়া বাহির করিয়াছেন। এই বাস্তবতার প্রতি ভক্তি এবং অবাস্তবতার উপর নিদারুণ বিদ্রোহ বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ধ্বনিত করিয়াছেন।

'আজকাল একটা ফ্যাসান হইয়াছে যে কবিতার ভিতর কথায় কথায় ভগবানকে লইয়া টানা হ্যাঁচড়া করা। অসীম লইয়া সীমার ভিতর নাড়াচাড়া করা, দুঃখকে সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা, যন্ত্রণাকে দেবতার মঙ্গল দান বলিয়া লইতে বলা—ইহাই কবিদের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনে যিনি সত্যই ইহা অনুভব করেন, তিনি এরূপ কথা বলুন আপত্তি নাই, কিন্তু যার তার মুখে এসব কেবল কথার গাঁথুনি মাত্র বলিয়া বোধ হইবে—ভাবহীনের অসারতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তাই যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া বাস্তবকে বাস্তবের আকারে দেখিবার জন্ত বলিলেন—

অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে,
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে।
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল—ভাবি দেবতার দান,
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান।
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা।
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নিবাণী।
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্ত্তিখানি?
কালোকে দেখাবে কালো ক'রে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো,
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের মত বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো।
খেলোয়ারি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা,
বর্ম্ম ভেদিয়া মর্ম্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম্মব্যথা।
এ কথা বুঝিবে কবে?
ধান ভানা ছাড়া কোন উচুঁ মানে থাকে না ঢেঁকির ববে।

ইংরেজ কবি সুইনবার্ণের ভাবের সহিত দু এক জায়গায় আমাদের কবির ভাবের মিল আছে। ইবসেন, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকগণ সত্যের এই নগ্নমূর্ত্তি উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রিয়তম মৃত্যুশয্যায় কাতর—বহুদিন শুশ্রূষা করিতে করিতে নারীর দেহ মন প্রাণ অবসন্ন—এমন সময় প্রিয়তমের মৃত্যু হইলে শুশ্রূষাকারিণীর মনে প্রিয়তমের দুঃখ শান্তি হইল বলিয়া হয় ত যে একটু আনন্দ হয়, তাহার পিছনে নিজের ক্লেশের অবসাদ জনিত আনন্দ লুক্কায়িত থাকে কি না ইউরোপীয় কবি বুকে হাত দিয়া দেখিতে বলিতেছেন। বাস্তবিক কথাটার স্পষ্ট সত্য জবাব দেওয়ায় সাহসের দরকার বটে। আমাদের কবিও বলিতেছেন।—

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম্মে জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।
প্রেম ও ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন বলিলে আমি এ কথা,
মিথ্যা মাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।

আমাদের রোগ এই যে কবিতা পাইলে তাহার এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

খাড়া করিয়া থাকি। জীবনের ছোট বড় সকল ঘটনাতেই যেখানে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি কারণ না পাইয়া পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে আমরা সেখানে সত্য মিথ্যা একটা উদ্দেশ্য দর্শাইয়া নিজের মনটাকে প্রবোধ দিই। ইহাতে মানসিক বলহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই বলিয়াছেন যে একজন স্পষ্টবাদী সরল নাস্তিককে তিনি একজন অবিশ্বাস সম্পন্ন আস্তিকের অপেক্ষা বেশী ধার্ম্মিক মনে করেন। গুঁতোর চোটে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে—সংসারের ভাষায় যাহাকে দুঃখ কষ্ট বলে তাহা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতেছি, অথচ মুখে বলিতেছি—ওটা সুখেরই একটা রূপান্তর মাত্র, এবং ভগবানকে ইহার মঙ্গলময় দাতা বলিয়া অভিনন্দন করিতেছি।

তাই কবি বলিতেছেন—

আমরা যখন সুখে সুখী হই—সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধান নহে যে আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ,—
কেন যে এ সব আছে,
সে কৈফিয়ৎ তুমি কোনদিন দেবে না কাহারও কাছে।
সাগরের কূলে পুরী তব দারু মূরতি জগন্নাথ ;—
রথের চাকায় লোক পিষে যায় তোমার নাহিক হাত।
তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান তারে নিয়ে রাস লীলা।

কবির বিদ্রোহ এইবার পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন ভগবান যদি থাকেন তো তিনি সৃষ্টি করিয়াই খালাস—সৃষ্টির উপর আর তাঁহার কোনো হাত নাই। তাঁহার চন্দ্র তপন তারকা সকলই ঘড়ির মত চলিতেছে। "থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টা—নিখিল বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মরে তুমি তার চির দ্রষ্টা। আর জগৎটা—

চারি পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো আঁধারের গরাদে বসান অপার বিশ্ব কারা।
এরি মাঝে ঘুরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা।
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়ি চাঁচা, কাঠঠোকরা।
পথ নাই পালাবার ;
উঠে, প'ড়ে, ছুটে, ঘুরে ঘুরে লুটে, কেবল শ্রান্তি সার।

যুগ যুগান্ত ভ্রমণ ক্লান্ত নিশ্চল কত গতি,
ঝাঁকি খুঁজে কত মহাতপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি।
তবু নাই কারো ছুটি,
অভ্যাস ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি।
অসীমের কারাগার—
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ায় মিলে না পার।
এত বড় খাঁচা মুক্তির খাঁচা বিদ্রূপ করো না ক'।
সীমা নাই যার, নাহিক দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি?
কয়েদে যখন ব্যবস্থা কর কয়েদীর মত রহি।

বিদ্রোহী মন উপায় নাই দেখিয়া বলিতেছে—

নচেৎ মুক্তি দাও
চারিদিকে এই অসীমের সীমা একবারে খুলে নাও।
জীবন মরণে কর্ম্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন।
নাহি যবে প্রয়োজন,
আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবে না গরজন।
বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন, প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি
আপনারে ঘিরে প্রতি মুহূর্ত্তে গড়িব আপন সৃষ্টি।
যবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণ ভ'রে কেঁদে ধুয়ে মুছে দেব নিজে গড়া অপরাধ।
যদি ভাল লাগে ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু ব'লে
সমানে সমানে ছলনা বিহীন দিন যাবে কুতুহলে।

মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নাই—যদি চান ভগবান কোনোদিন Mr. Montagur মত কাহাকেও পাঠাইয়া আমাদিগকে reforms দিতে চান তাহা হইলে কবি বর্ণিত এই democratic equality এবং free will আমরা চাহিব। আর এখন কি আছে—

বন্ধু গো আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হ'য়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা।

আমি বলি, কিনে ফুলো
পিঠে বেঁধে দাও গভীর নিদ্রা, দু'কানে গুঁজিয়া তুলো।

লাট্টুর সহিত একটি উপমা দিয়া কবি বুঝাইতেছেন যে আমাদের জীবনে কি খেলা চলিতেছে তাহা আমরা জানি না—সেই খেয়ালী খেলোয়াড়ই জানেন। তাঁহার আনন্দ কিসে তাহা তিনি নিজেই বুঝেন আমরা কেবল মিথ্যা একটা লক্ষ্য জীবনে আরোপ করিয়া নিজেরা ঘুরিয়া মরি।

ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেত্তিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও ক'রে ছুড়ে ফেলে
বন্ বন্ বন্ ঘুর ঘুর পাক চিত্তেন কেত্তেন সোজা,
লাট্টু বলিছে "হায় হায় হায় ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা।
জীবন যে আসে ফুরায়ে।"
বলিতে বলিতে ফুরাল ঘুরণ—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেত্তিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্তে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,—
ফাটা লাট্টুটা ছুড়ে ফেলে দিল দূরে কণ্টক বনে।

এ স্থলে ওমরের নিম্নলিখিত লাইনগুলি তুলনা করা যাইতে পারে—

"নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন যেই নিয়েছে খেলায় তার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু, জয় পরাজয় তাঁরই হাত।"

তাই জীবনের সুখ দুঃখের জন্য সে নিষ্ঠুরের কাছে হাত পাতিয়া কি হইবে—

আমি বেশ জানি সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শেষ
জোর করি দুটি কর,
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়।
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহ না সে জানি আমি;
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি।

জগতের এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে কবি এই মত নিয়ম আবিষ্কার করিলেন—

একটি নিয়ম মান তুমি সেটি কোন নিয়ম না রাখা
আঁখি মুদে দেখি পাগলের মত ঘুরিছে কালের চাকা।

বলিলেন ইহকাল পরকাল লইয়াও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—

পূর্ব্বকালে যা ছিনু আজ তার হ'ল না তা প্রণিধান
পরকালেতেও যা হবে তা হবে কেন বৃথা আয়োজন।

যে ভগবান ক্ষুধা দিয়া অন্ন দিয়াছেন আবার জন্ম দিয়া মৃত্যু দিয়াছেন—তাঁহার দান আদান সবই সমান। এ যেন গোরু মেরে জুতা দান।

গোরু পোষাপির প্রায়—

জননীর কোলে ছেলে বড় হ'লে কে পুনঃ কাড়িছে তায়।
ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দৈত্যে হেসে বলে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক,

অন্য অর্থাৎ—

যাহার পাটা সে যেদিকে কাটুক তার অপরের কি?

জগতে কত অবতার আসিলেন কত নূতন নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, কিন্তু জগৎ যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিল—জীবের দুঃখের ভার আর কমিল না—

ঈশা, মূশা আর বুদ্ধ
কণফুসিয়স মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুক
সবাই বলেছে পাঠালেন মোরে দয়াময় ভগবান,
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর তোমাদেরি তিনি চান।
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
রবে না নরের জরাব্যাধি শোক পাপতাপ আদি দুঃখ,
যেমন জগৎ তেমনি রহিল নড়িল না একচুল
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল।
কি হবে কথার ছলে?
ভগবান চান—তবু হয় না'ক, একথা পাগলে বলে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া কবি শিখিলেন—

চারি দিক দেখে চারি দিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।

যদি বল তুমি সুখ দুঃখ নাই দু'টাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম।
জারি কর তবে খ্যাতি,
এ ভব রোগের নব চিকিৎসা আমার "ঘুমিও প্যাথি।"

হানিমানের হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পর বিংশশতাব্দীতে কবিবর "ঘুমিওপ্যাথি" আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সংসারের অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার লাভের জন্য উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বড় দুঃখেই পরামর্শ দিলেন। দেখিলেন "এজগৎ মাঝে সেই তত সুখী যার গায়ে যত ঘাঁটা," এ সুখ দুঃখের কার্য্য কারণ জন্মান্তরের রহস্যের ভিতর তিনি পাইলেন না। জগৎটা একটা হেঁয়ালি বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইল—"যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি।" বিশ্বস্রষ্টাকে স্তব স্তুতি করা ভুল—যা হবার তা হবেই। "মোরা ভুল ক'রে প্রণমি তোমায় ভুল ক'রে করি রোষ। তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ নাহিক অসন্তোষ। আমরা তোমায় ডাকি,—যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই—আপনারে দিই ফাঁকি।"

দার্শনিকের ন্যায় কবি Personal God অস্বীকার করিলেন। তাঁহার ঈশ্বর যেন বেদান্তের নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম। জগৎরহস্য বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, অনিয়মটা সকলের চেয়ে জগতেরই বড় নিয়ম—

জগতের শৃঙ্খলা
স্বপ্নেরি মত উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা।
বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।

এতটা শ্লেষ করিয়াও কবি ক্ষান্ত নহেন—মানবের প্রেম নশ্বর এবং তাহা যে বারোটার বেশী রাত জাগিলেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাও বলিলেন—অবশেষে "কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ"—এতখানি প্রশ্নও করিয়া বসিলেন। মানুষের দর্শন সত্যই ইহার সন্তোষ জনক উত্তর আজও দিতে পারে নাই। কবির এই বিদ্রোহ ভাবের পরিচয় পাঠক পাইলেন। ইহার মূল বেদান্তের ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু তিনি ঢেঁকির শব্দে ধান ভানা ছাড়া আর কোনও মানে যে নাই—তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন। এখন আমরা সংসারটাকে সেই ভাবে দেখিতে পারিব কি?

সুখের ঘর গড়া।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

সেই দিনই বিকাল বেলা গেঁড়া সরকার ভোলানাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরকার ভোলাকে জানাইল যে চৌধুরী মশাই তাহার সহিত একবার দেখা করিতে চান। ভোলানাথ ইতিপূর্ব্বে জমীদার-তর্কসিদ্ধান্ত-সাক্ষাৎ সম্বাদ অবগত হইয়াছিল, সম্বাদের ফলাফলও যে না জানিয়াছিল তা নয়, ব্যাপার যে রকম দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সে ভয় পাইয়া গেল। চৌধুরী মহাশয় উপযাচক হইয়া দেখা করিতে চাহিয়াছেন শুনিয়া সে উদ্বিগ্ন হইল, এবং কারণ কতকটা মনে মনে আন্দাজ করিয়াও সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল —"কেন বল্‌তে পারেন সরকার মশাই?

গেঁড়া। কেমন করে বল্‌বো ভায়া—বড়লোকের মনের ভাব আমরা কি করে জান্‌বো। সরকারের যে তা জানা নাই এ কথা ভোলা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তবে কি জানি কি অপ্রিয় কথা শুনাইয়া বসিবে সেই ভয়ে সে আর জিদ্ করিল না। কাঁধে চাদরটা ফেলিয়া মহেশের বৈঠকখানার অভিমুখে চলিল। গেঁড়া সরকার অন্যত্র কাজের অছিলা করিয়া আর একদিক দিয়া চলিয়া গেল।

ভোলানাথ সভয়ে মহেশের বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মহেশ ও জীবন ভট্টাচার্য্য ও দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বসিয়া ফিস ফিস করিয়া কি আলোচনা করিতেছে। ভোলানাথ ঘরে ঢুকিবামাত্র মহেশ বিদ্রূপের স্বরে আহ্বান করিয়া বলিল—"আরে মাষ্টার যে। এস, এস আর যে বড় এ দিক মাড়াওনি হে, ব্যাপারটা কি?"

ভূষণ আড্ডি স্বর করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—'এ যে দাড়ালে বঁধু কোন ভুলে ভুলিয়া?'

ভোলানাথ একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল "হ্যাঃ কদিন আসিনি বটে—ভারি ঝঞ্ঝাটে পড়িছি—

ম। কি ঝন্‌ঝাট্ হে শুনিই না—কি নাক ধরে ফেঁদে বসেছ—

ভো। জিই বটে তা—

ম। কি রকম যজ্ঞি—কিসের কিরূপ?

জীবন। শিবরহিত যজ্ঞ—এইরূপ—

ম। (চাপা হাসি হাসিয়া) শিবরহিত যজ্ঞ। সে কিরূপ ভট্টচাজ? শিবটা কে?

জী। আবার কে—আপনি?

ভোলা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তথাপি কিছু উত্তরে বলা তো উচিৎ। বলিল ভট্টচাজ আমাকে আর জড়াচ্ছ কেন? আমার সাধ্যি কি কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকাই? বৌদির খেয়াল হয়েছে মেয়েটার মুখে ভাত দেয় তাই জনকতক বাউন খাইয়ে একটু উৎসব করা—

ম। উৎসব না মহোৎসব হে? সারা গাঁয়ের বাউন নেমন্তন্ন—আর আমরা অব্রাহ্মণ বলেই বাদ দিলে বুঝি? না হয় তোমার ঢেঁকিশালে পাত পেতে তোমার ভাজের রান্নাটা খেয়ে যেতুম?

ভোলা। এ রকম দুঃসাহস করতে আমাদের ভরসা হবে কেন?

ম। দুঃসাহস যা করেছ তার চেয়ে এটা আর মাত্রায় বেশী কি?

ভোলানাথ অনির্দিষ্ট ভয়ে চমকিয়া বলিল "কি দুঃসাহস করিছি বলছেন?"

ম। বাকি কি? ব্যাচারী বাউনদের নেমন্তন্ন করে তাদের জাতটা মারা কম দুঃসাহসটা কি?

ভো। চৌধুরী মশাই আমাদের সাধ্য কি এ কাজ করি? বিশেষ আপনার রাজ্যে বাস করে, আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে—

ম। সাধ্য হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি যে—তোমার বাদির কাণ্ড তুমি জাননা? মুসলমান নিয়ে তোমার ভাজ কি কীর্ত্তিটা করেছে জাননা—না জেনেও জাননা হে?

ভো। আজ্ঞে সত্যি কথা বলছি যতটা রটেছে ততটা কিছু নয়—

ম। কতকটা তো বটে হে? তা হলেই হলো, বিষ্ঠে কড়ে আঙুল দিয়ে ছুলেও অশুদ্ধ আর গায়ে মাখ্‌লেও অশুদ্ধ, তোমার ভাজ ভাইপো না হয় সহরে কেতার লোক, হিঁদুয়াণীর ধার ধারে না, গাঁয়ের বাউন কায়েৎরা তো আর তত আলো পায়নি। একটা জাতার লোক্ আচার বলে জিনিষ আছে পাঁচজনে যখন মেনে চলে তখন পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হলে মানতেই হবে—কি বল হে ভটচাজ্‌?

ভট্ট। (গম্ভীর ভাবে) তার আর ভুল কি পিসেমশাই! শাস্ত্রেই আছে—

"আচারে রক্ষতি ধর্ম্মং অনাচারে ধর্ম্মহানিঃ
অনাচারী দেবদ্বিজং নরকং যান্তি সবংশং"

ম। শুনলে মাষ্টার? ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের ভাই ভাগ্যিস্ বেশী বিদ্যে হয় নি—সে যাগ্, কাজটা ভাল হচ্চে না মাষ্টার, এতই যদি সাধ হয়েছিল উচ্ছব করতে, জ্ঞাতিভোজন করালেই পারতে। বাউন ব্যাচারীদের এতে টানা কেন? একে তো কপারের লোভ বাউনের পক্ষে সম্বরণ করা কঠিন—

ভো। আপনি বলেন যদি তা হলে কি বলবো—অনাচার কি হয়েছে জাতো বুঝ্ছিনি—

ম। কি মুস্কিল! এত বোধশক্তি কি কবে কমে গেল হে? স্নান করে উঠে মুসলমান ছোঁয়া হয়ে ছিল তো? তারপর সেই কাপড়েই বাড়ী ফেরা, ঘর দোরে ওঠা আবার মুসলমানীদের খাইয়ে সেই বাসন নিজে ধোয়া আর ঘরে তোলা এ কি খুব শাস্ত্রসিদ্ধ সদাচার বল্তে চাও? ভায়ের হাতে বুঝি কিছু পয়সা আছে তার লোভে বুদ্ধি শুদ্ধি বিগড়ে গেল?

ভো। তিনি তারপর বাড়ীর পুকুরে চান করেছিলেন, আর বাসন যা বলছেন্ তা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়—

ম। প্রমাণ?

ভো। আমরা মিছে কেন বলবো? তারও তো একটা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে?

ম। আছে যে তার প্রমাণ?

ভো। বিশ্বাস যদি না করেন তা হলে—

ম। আমি করতে পারি তুমি আমার ইয়ার বকসীর একজন—কিন্তু সমাজ? সমাজ তা বিশ্বাস করবে কেন?

ভো। আপনারা কল্লেই সমাজ মান্বে—

ম। উহুঁ তা কি হয় সমাজ আমার মাথার ঠাকুর—আমার খাতিরে ন্যায় অন্যায় না বিচার করে মান্বে?

ভো। তা হলে কি করতে বলেন?

ম। রীতিমত শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করে জেতে উঠ্তে হবে তা না করা পর্য্যন্ত কেউ তোমার বাড়ী পাত পাত্তে পারবে না—কেন মিছে একটা দলাদলি ঘটিয়ে নিজেও বিপদে পড়বে আর পাঁচজনকে বিপন্ন করবে?

ভো। দেখুন দেখি এই যে এতকাল দেশে বাস করছি কারুর সঙ্গে জোরে কথাটা কইছি শুনেছেন ?

ম। আরে তাইতো বলাবলি করি না হে আজ্ঞি ? বলাবলি করি যে ভোলামাষ্টার হঠাৎ এত ভারিক্কের হলো কি করে, এতই বা হঠাৎ কি বলে সম্পন্ন হয়ে উঠ্‌লো কি করে—যে মেয়ের ভাতে ষষ্ঠি লাগিয়েছে।

জী। শুধু ষষ্ঠি নয় শিবরহিত ষষ্ঠি তা বলবেন্—

ভোলা ভট্টাচার্য্যের দিকে একটা নীরব আক্রোশের বক্র দৃষ্টি করিয়া দেখিল জীবন মাথা বা চোখ না তুলিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছে—মহেশের কথা শুনিয়া বিনীত ভাবে বলিল—

আমার কি ক্ষমতা না সাধ, জানেনই তো বৌদির হঠাৎ সখ্ হল বল্লেন কি মেয়ে ছেলে কি ছেলে নয়—ব্যাটাছেলের মূল্য আছে মেয়ের থাকবে না কেন ? আমি আর কি বলি বলুন ?—

ম। তাতো দেখছিই হে মেয়ে মানুষ যে মেয়েমানুষ নয়, পুরুষের বাবা তা তোমার ভাগ্ন এসে দেখাতে আরম্ভ করেছেন। স্বামী ছিল পয়সাওয়ালা, স্বামী নেই কিন্তু চাল্‌টা আছে তো।

জী। অর্থাৎ বিষ নেই—চক্র আছে।

ভোলা জীবনের এই মৃদু দংশনগুলা সহ্য করিতে পারিতেছিল না, বিশেষ বাড়ীর মেয়েদের লক্ষ্য করে এই যে সব মন্তব্য—সে কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া প্রত্যুত্তর করিল "হাঁ ভটচায্ বিষ যা সব পুরুৎ বাউনের বাড়ীর মেয়েদের একচেটে হয়ে গিয়েছে কিনা—

ম। বা মাষ্টার বা। তোফা—সব যে বলে মাষ্টার উল্টো কামড় দিতে পারে না! কি বলছে ভট্‌চায্—

ভট্ট। তাইতো দেখ্‌ছি ঢোঁড়াতেও ছোবল দেয়—

ভো। তা চতুষ্পদ বিশেষে দেয় বৈ কি, তবে কি জান ভট্‌চায ঢোঁড়া হলেও সাপ, কিন্তু শিবের মাথায় উঠে হেলেও কেউটে হয় এই আশ্চর্য্য!

ভট্‌চায যে কথাগুলার জ্বালা অনুভব করিল না তাহা নহে। কিন্তু চট্‌ করিয়া উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া জোরে জোরে হুঁকায় টান দিতে লাগিল। যেমন ধূম দর্শনে পর্ব্বত বহ্নিমান অনুমান করা যায়, ভটচার্য্যের উদ্গিরীত ধূম পরিমাণ হইতে বুঝা গেল, মাথায় রাগের টেম্পারেচার কত হইয়াছে।

লাগ মাফিক কথা বলিতে পারিলে রসিক লোকেও অতি অপ্রিয় কথার

আমোদ বোধ করেন ও ভিতরে ক্ষুণ্ণ হইলেও বাহিরে তারিপ্ করিতে ছাড়ে না; মহেশ ও ভূষণ ভোলানাথের কথায় খুব মজা পাইল, ভট্টাচার্য্য চটিবে বলিয়া মজাটা বাহ্য চিহ্নে প্রকাশ করিতে পারিল না।

ভোলা মহেশের কথা গুলার ভঙ্গীভাব মনে মনে পছন্দ করিতে ছিলনা, অথচ নিজের দুর্ব্বলতা বশতঃ যে বাড়ীর কুললক্ষ্মীর প্রতি তীব্র মন্তব্যগুলার প্রতিবাদ করিতে পারিল না ইহাতে সে বড় লজ্জিত ও মর্ম্মাহত বোধ করিল, পাছে আর বেশী কিছু শুনিতে হয় এই ভয়ে সে উঠিয়া পড়িল—মহেশ বলিয়া উঠিল কি মাষ্টার উঠ্‌লে যে?

ভো। দেখি যাই বৌদিদিকে বলে যদি যজ্ঞি বন্ধ করতে পারি, মিছিমিছি কেন ফুস্‌কুড়ী চুল্‌কে বরণ তোলা—

ম। তাইতো বলি, বাউনদের ব্যাপার, একটা কাণ্ড যদি হয় তাহলে আমাকে ন্যায় বিচার করতে হলে তোমার দিকতো নিতে পারবো না—মাঝ-খান হতে তুমি ব্যাচারী মারা যাবে কেন? তা ছাড়া বন্ধু বলেই ডেকে সামলে দিলাম, তা না হলে আমার আর এত গরজ কেন? মোদ্দা কথা বন্ধু নারী বুদ্ধিতে আর ঘর মজিওনা আর নিজে মজোনা—

ভোলানাথ আর বিলম্ব করিল না। দেখিতো কি হয় বলিয়া সে মহেশের নৈকট্য ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল।

ভোলানাথ চলিয়া গেলে জীবন ভট্টাচার্য্য হুঁকা রাখিয়া বলিল, "আসল কথা ভোলামাষ্টারকে কেমন মনে হয় আপনার?"

মহেশ। ব্যাচারী গো বেচারা, তবে লক্ষ্মণের মত দেওর বলে বোধ হয় প্রবলা ভ্রাতৃজায়ার কবলে পড়ে গিয়েছে তাল সামলাতে পাচ্ছে না।

ভূষণ আড্ডি একটা বিকট বহরের হাই তুলিয়া জড়িতকণ্ঠে মুদিত চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মাষ্টারের ভাজ হঠাৎ এত প্রবলা কি করে হলেন, মাষ্টারের দাদা তো ইতি হয়েছেন—আর মতলবটাই বা কি এই যজ্ঞি করে বাউনদের জাত নষ্ট করার? খোলসা হচ্চেনা উদ্দেশ্যটা।

জীবন। বুঝলে না আড্ডি? পিসেবাবুকে তো বলেছি—লোকনাথ মুখুজ্যে প্রথম ছেলের—সেটী গত—ভাত দেশে এসে দেয় তাতে সহরে কটী খৃষ্টান্ বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে পংক্তিতে খাওয়াতে চায়, তাইতে খুব হুলস্থূল পড়ে; বাউনরা বেঁকে বসলো খাবেনা, তখন বাছাধন নাকখৎ দিয়ে মান বাঁচান্। সেই অপমানের পর লোকনাথ দেশ ছাড়ে কিন্তু তার পরিবার সে

দুঃখী উজোড় হয়ে যেতো, ওপরে একজন আছেন, তিনি অন্ধ পঙ্গু নন। আমি সে বিশ্বাস রাখি—দেখই না—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়—

সদু। কিন্তু যদি কেউ খেতে না আসে জিনিষ পত্তর সব তো নষ্ট হবে—

য। তা কেন হবে বোন্? কাঙ্গাল গরীবের অভাব দেশে? তারা এসে খাবে—আমার লক্ষ বাউন ভোজনের পুণ্যি হবে—

ভো। সে না হয় আর একদিন কর না—এটা বন্ধ থাক্।

য। পাগল হয়েছো? তাই হয়? এত কষ্টের আয়োজন, সব পণ্ড হবে?

ভো। তা হয় তো কি হবে! তা বলে প্রবলের আক্রোশে পড়ে মারা যাব—

য। মারাই যায় সবাই। মিছে কেন ভয় পাচ্ছ ঠাকুরপো?—

ভো মিছে নয়—গাঁয়ে বাস করনি, জাননি এখানকার হাল্ চাল্।

য। বেশতো ঠেকে শেখা যাগ্ না—এক কথা—সবাই তো আসবে না জানি; যে দু চার জন আসবে তাদের জন্যে কি করবে? মান রক্ষে করা চাই তো?

ভো। মান রক্ষে করতে গিয়ে যদি অপমান হ'তে হয় তবে এসব কাজে হাত আগে হতে নাই বা দিলুম—

য। বলছি তো দেখাই যাগ্ না। অপমান কিসে? খেতে ডাক্‌লাম, এলনা—এলনা, বাস্, অপমান কিসের? আমিও বুঝলুম, এর পর আর লোকের সঙ্গে কার কারবার না করলেই হবে?

ভোলানাথ কি বলিতে যাইতেছিল, যজ্ঞেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন—দেখ ঠাকুর পো, যজ্ঞি বন্ধ করতে বল্‌ছো, তাও ওদের মন্ত্রণায় তো? কিন্তু ওরা যদি তোমাকে আমাকে জব্দ করবার মতলবই করে থাকে তা হলে এই পরামর্শ অনুসারে কাজ করলেই জব্দ হবে—

ভো। কিসে?

য। তুমি সব বন্ধ করে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে আছ—ওদিকে নেমন্তন্ন হয়ে আছে কাল যখন সব খেতে আসবে?

ভো। কেউ আসবে না; সব জমীদারের কথায় সায় দিয়েছে—

য। তবে তাদের এত মাথা ব্যথা কেন, আমি যজ্ঞি বন্ধ করি আর না করি।

ভো। বোধ হয় তর্কসিদ্ধান্ত যদি আসেন তা হলে তাদের জিদ্ বজায় থাক্‌বে না, এই ভয়ে—

য। আসল কথা তা নয়—ঠাকুরপো তুমি বুঝলে না, আমি মেয়ে মানুষ হয়েও বুঝেছি। তোমাকে নয় আমাকে, ওরা জব্দ করবে পণ করেছে; আমি যজ্ঞি বন্ধ করলে ওরা সব আসবে—আর না বন্ধ করলে অধিকাংশ আসবে না —মোট কথা, একটা গোলমাল ওরা ঘটাবে এঁচে আছে—তুমি চুপ করে থাক দেখাই যাগ্ না কি দাঁড়ায়?

ভো। দাঁড়াবে আর কি একটা দলাদলি—

য। তাতে কি?

ভো। তাতে সব—আমার মত ক্ষুদ্র লোকের গ্রামে টেকা কঠিন হবে—

য। তখন তা বোঝা যাবে—এখন যে দায় তাহতে উদ্ধার হও—লোক জন এসে না অপ্রস্তুত করে তার জন্যে প্রস্তুত হও—

ভোলানাথ ব্যাজার মনে ও বিরক্ত মুখে "যা খুসি করগে"—বলিয়া চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী সে কথায় কান না দিয়া আপন কাজে গেলেন। সদু ভোলার পিছন পিছন গেল। যজ্ঞেশ্বরী হঠাৎ কি ভাবিয়া উভয়ের পদানুসরণ করিলেন। আড়ালে কান পাতিয়া শুনিতে পাইলেন দেবর বলিতেছে—"তেমন তেমন কিছু ঘটে যদি, তুমি ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাও আমি অন্য কোথাও একটা কাজ নিয়ে থাকিগে পরে যা হয় করা যাবে—মেয়ে বুদ্ধিতে মজে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করা পোষাবে না"—কথা শুনিয়া যজ্ঞেশ্বরীর চৈতন্য হইল। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ও জিদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার শক্তি না থাকায় দেবর যে অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ কল্পনা করিতেছে ইহা ভাবিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু এত দূর অগ্রসর হইয়া সবদিক মাটি হইবে ইহা তিনি কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারিতেছেন না। তিনি মুহূর্ত্তেক হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন; হঠাৎ ভোলানাথ আসিয়া পড়িল, ভাজকে তথায় তদবস্থায় দেখিয়া তার ভয় ও লজ্জা হইল বোধ হয় তিনি তার গৃহত্যাগের মন্তব্য শুনিয়াছেন—এই সভয় অনুমানটা সুনিশ্চিত সত্য কি না জানিবার জন্য ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল বৌদি এখানে দাঁড়িয়ে? চলে ছলে না?

য। হ্যাঁ এই মাত্র ফিরে এলাম, তোমার কাছে একটা কথা জানতে?

ভো। কি?

য। তর্কসিদ্ধান্ত মশায়ের বাড়ী আমি যেতে পারি?

ভো। কেন যাবে না?

য। কথা কইতে পারি? আপত্তি নেই তোমার?

ভো। না আপত্তি কি? তুমি বাড়ীর গিন্নি—অপরে যেটা নিষেধ তোমাতে তা হতে পারে না—

য। দেখ ভাই যে তোমাদের গ্রাম আর পাড়া—

ভো। না।

য। তার সঙ্গে একটা যুক্তি করতে চাই। দেখছি তো তিনিই গ্রামে একমাত্র দুর্ব্বলের বন্ধু, অসহায়ের সহায়—

ভোলানাথের গোপন ভয় ঘুচিয়া গেল। সে নিশ্চিন্ত হইল যে তাহার অসাবধানে উচ্চারিত কথা গুলা যজ্ঞেশ্বরী শুনিতে পান নাই। যজ্ঞেশ্বরীও কৌশলে ধরা না দিয়া দেবরের গোপন ভয়কে ঘুচাইয়া দিলেন। কিন্তু দেবরের কথায় তাঁহার মনে যে অনির্দ্দেশ্য ভয় হইয়াছিল তাহার নিরাস্ হইল না।

সে দিন সকালে তিনি স্নান করিতে গিয়া ঘাটে একটা আ'লাচনার ভগ্নাংশ শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহার উপস্থিতি মাত্রেই তাহা থামিয়া যায়, কিন্তু বাড়ী ফিরিবার পথে দক্ষঠাকুরাণীর মুখ হইতে সমস্তটা শুনিতে পান। মীবন-ভট্টচাজ্জির পরিবার নাকি বলিতেছিল—"মেয়ে ছেলের ভাত তো কোথাও শুনিনি, তা আবার ভোলার মেয়ের! এ ওর ভায়ের খেল্, ঐ অছিলে করে বাউনদের জব্দ করা? কে একজন শ্রোতা বলিল—"জব্দ করা কেন? উত্তরে ভট্টাচার্য্যগৃহিণী বলেন" ওমা :তা জানিনি? কর্ত্তার মুখে শুন্লাম লোকনাথ মুখুয্যে নাকি প্রথম ছেলের ভাত দেশে এসে দেয়--তাতে তার এক বেহ্ম বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে বাড়ীতে এনে খাওয়ায় এই নিয়ে বাউনদের মধ্যে কথা ওঠে তাতে বাবু খুব জব্দ হন, মাথা হেট করে সমাজকে তো মান্যি করতে হয়! এখন সেতো মরে গেছে সেই আক্রোশ আছে পরিবার তার সেই আক্রোশ মেটাচ্ছে। বাউনদের জাত মেরে জব্দ করা মাগী কম জাঁহাবাজ গা! তা নৈলে কাঙ্গাল গরীবের আবার মেয়ের ভাত দেবার সখ হয় গা?" শ্রোত্রী-মণ্ডলী ভট্টাচার্য্যগৃহিণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার তারিপ করিতেছে এমন সময় দক্ষ-ঠাকরুন সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরী তথায় উপস্থিত হইলেন, দক্ষদেবীকে দেখিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলী যে যার স্নান প্রসাধনে ব্যাপৃতা হইল। যজ্ঞেশ্বরীর সেই কথা এখন স্মরণ হইল। তাঁহার ভয় হইল ভোলানাথ যদি সে কথা শুনিয়া থাকে তাহা

হইলে তাহারও তো বিশ্বাস হইতে পারে? যজ্ঞেশ্বরী সাতপাঁচ ভাবিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন, কিন্তু বাজে চিন্তায় উন্মনা হলে চলিবে না—বুঝিয়া তিনি কাজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হইলেন। তবু এক একবার এই কথাটা মনে উঁকি মারিতে লাগিল "সাধ করে এক করতে গিয়ে শেষে ঘর ভাঙাভাঙি হয়ে যাবে নাকি?"

অকূলের আহ্বান।

(জ্যোতির্ম্ময়ী)

যাই যাই কোথা তুমি কোন্ দূর হ'তে
আহ্বান করিছ মোরে মধুর সঙ্গীতে,
যাই প্রিয় এই যাই
আর তো বিলম্ব নাই
ক্ষুদ্র গৃহে ক্ষুদ্র কাজে তৃপ্ত নহে মন
অসীমে ধরিতে প্রাণ ব্যাকুল এখন।

অনন্তের পথে মোর আজি অভিসার
তোমার সঙ্গীত-মুগ্ধ আকুল হিয়ার।
আজি চিত্ত ছুটে চলে
প্রেম-যমুনার কূলে,
পাসরিয়া লাজ-মান-কলঙ্ক-কালিমা,
বিশ্বকুঞ্জে ধায় আজ পরাণ উন্মনা।

সীমার বাঁধনে প্রাণ বাঁধা নাহি রয়,
শাশুড়ি ননদী গৃহে কত কথা কয়,
কে জানে প্রাণের জ্বালা
হানে বাক্য বিষে ঢালা,
তোমার মিলন পথ রুধিয়া দাঁড়ায়।
রাধারে বাঁধিতে চাহে ক্ষুদ্র সীমানায়।

যাই আমি এই যাই সন্ধ্যাদীপ জালি'
রাধার দিবস-প্রান্তে নেমেছে গোধূলি
প্রিয়তম ক্ষম মোরে
দাসীর বিলম্ব হেরে
ডেকে ডেকে অভিমানে যেয়োনা ফিরিয়া
এই যে এসেছি ছুটে পথে বাহিরিয়া।

ধর্ম্মের বনিয়াদ

(২)

(শ্রীসত্যবালা দেবী)

পূর্ব্বে দেখিয়েছি ভারতের সত্য হচ্চে সর্ব্বত্রকে সমস্তকে অভিভূত করে ব্যাপ্ত যিনি তাঁরি সঙ্গে যোগ। (Consciousness) এই যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারত একদিন দেখেছিল এক স্থির অচঞ্চল অনুদ্বেল সমুদ্রের মত পরম সত্ত্বা রয়েচেন,—আমরা যা কিছু দেখচি সমস্তই হয়েচে হচ্চে এবং হবে,—হয় ত বা একদিন অব্যক্তেই বিলীন হয়ে এই প্রবাহ সুপ্তবৎ অবস্থান কর্ব্বে, আবার জাগবে আবার বিলীন হবে—যেন ওই সমুদ্রের বুদ্বুদ কিন্তু ওই যে পরম সত্ত্বা তিনি স্থির একম্ অদ্বৈতম্—নিষ্ক্রয়ম্। তাঁরেই অনুভব করে ভারত আপাতঃবিধ্বংসী এই লীলাবিলাসের ওপর অবিনশ্বর একটা কিছু গড়তে পেরেছেন সেইটেই হচ্চে—অমৃতম্। উর্দ্ধের অমৃত লোকে অধিষ্ঠিত হয়ে সে এই নিম্নের দিকে চেয়ে আবিষ্কার করেছিল সমস্ত বিশ্বে চারিটী ভাব—ধর্ম্ম অর্থ কাম,—আর এই তিনের লক্ষ্য স্বরূপ মোক্ষ। সে দেখেছিল মূলে ঐ পরম সত্ত্বা, ঐ অমৃতম্, নিম্নের স্তরে এসে এই চারিটী ভাব নিয়ে চারি খণ্ডে আপাতঃবিক্ষিপ্তবৎ, বিক্ষিপ্ত প্রকৃত নয়। সকলেরই মধ্যে, আনন্দের আভাষরূপে ঐ অমৃতমই আত্মগোপন করে রয়েচেন। তারপর আরও নিম্নস্ত'র ঐ চারি ভাবের বিবিধ বর্ণশঙ্কর আর তারই সমাবেশে গ্রথিত এই বিচিত্র জগৎ ব্যাপার।

গীতায় এই জগদ্ব্যাপারকে উর্দ্ধমূল অধঃশাখা অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা

করচে। অশ্বত্থ যেমন অন্ধকার হতে নীরবে আপন জীবন রস আহরণ করে এ জগদ্ব্যাপার তেমনি ঐ দূর অপূর্ব্ব রহস্যাচ্ছন্ন লোক থেকে আপন জীবন রস আহরণ করে। এক কাণ্ডযোগে সঞ্চারিত শত শত শাখা পল্লব পত্রে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের বিকশিত করে তোলে। যেন নীচের থেকে কোনও কিছুই গড়ে ওঠেনি, সব উপরেই গড়া, ঝুলিয়ে ধরা।

সত্যকে স্পষ্ট করে বুঝতে হলে একেবারে ওই উপরকার সত্যকেই (Consciousness) বুঝা আমরা ধরে নিই। ওইখান থেকেই সকল শক্তি এ দিকে আসচে এসে প্রকাশিত হচ্চে মাত্র। সেই প্রকাশিত হওয়াটাই জড়ের বুদ্‌বুদ বিকাশ। এক্ষণে যেমন যেমন প্রকাশিত হচ্চে আমাদের মন যদি তার আইনগুলো কেবল নাড়াচাড়া করে, সে এই উপকরণ পুঞ্জকেই তাদের অভ্যন্তরে নিহিত প্রবাহের মুখে ফেলে কাজে লাগাতে পার্ব্বে সত্য—প্রকৃতির অন্ধবেগকে নিয়ন্ত্রিত কর্ত্তে পার্ব্বে সত্য—কিন্তু প্রকৃতির হাত থেকে তার ছুটী কই, সেও ত ওই অন্ধবেগেরই অধীন। আর যদিই বা অমন ভেল্কি একটু আধটু আমরা দেখাতে পালুম, ওত প্রকৃতিরই হাতে পড়ে তারই খেলান খেলা খেললুম মাত্র। উইপোকা যে গড়েচে বুঝে দেখতে গেলে উইঢিপি তারই গড়া। ক্ষুদ্র পোকাগুলা মুখে করে মাটী বয়ে এনে সাজিয়েচে বলেই তার মধ্যে সত্যই তার এমন বাহাদুরী কিছু নেই। যে তারে গড়েচে সে অমনি করেই গড়েচে যে বেচারি মাটী বইবেই। মর্ত্তে মর্ত্তেও বইবেই।

আমাদের ভারতের সত্য এমন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মনকে সচেতন করে সত্যকার প্রাধান্য এনে দেয় যে, আমরা এইটে বুঝি বুঝে জেগে জেগেই জগৎ প্রপঞ্চের স্বপ্ন দেখি। ঠিক প্রকৃতির হাতে খেলব না, প্রকৃতিকে যিনি খেলাচ্চেন তাঁরই হাতে খেলব এইটে হল আমাদের জীবন প্রকাশে পার্থক্য। তাই আমরাও এই বিশ্বে অপর সকল জাতির মতই জীবনের খেলাই খেলে এসেছি,—তারা সমাজ স্থাপনা করেচে সভ্যতা স্থাপনা করেচে শিল্প বাণিজ্য নিয়ে আড়ম্বর করেচে, আমরাও করেচি। তারাও যুদ্ধ করেচে শান্তি এনেচে ধর্ম্মপ্রচার করেচে, আমরাও করেচি। তাদের ব্যষ্টি জীবন পারিবারিক জীবন সুখ সম্পদ সাহিত্য সঙ্গীত বিলাস—আমাদেরও বাদ যায় নি। সবই আমাদের মত হয়েচে কিন্তু তাদের যেমন করে হয় আমাদের তেমন করে হয় নি। আমাদের পার্থক্য আছে। আমাদের মত তারা প্রকৃতিকে যিনি চালাচ্চেন তারই হাতে

চলবার চেষ্টা করে নি। প্রকৃতি যেমন চালিয়েচে সহজ ভাবে তেমনই একরোখা চলে আসচে।

সাদাসিদে দেখলে ওদেরই যেন কত উন্নত স্বচ্ছন্দ ভাব যেন ওইটেতেই শক্তির বেশী স্ফুরণ, যেন আমাদের পথটা কুটীল, জাড্য আর অকর্ম্মণ্যতায় ভরা।

কিন্তু ভাল করে দেখতে গেলে তাতো নয়। আমরা স্রোতের বিপরীত মুখে চলেছি ওরা চলেচে অনুকূলে। ওরা যাচ্চে ভেসে আমরা যাচ্চি ঠেলে। আমরা একদিকে নদীর উৎপত্তি স্থানের সন্ধান নিচ্চি ওরা ওই নদীরই জোয়ার ভাটায় একবার নামচে একবার উঠচে। সাদা চোখে দেখাচ্চে বটে ওরা হুহু করে ভেসে চলেচে—আমরা যাচ্চি ঢিমে তালে। কিন্তু ওরা যাচ্চে যাচ্চেই, কোথাও ত যাচ্চে না, আমাদের ত তা নয়। আমরা যে টুকু যাচ্চি—সে যত টুকুই হোক্ পথ কমিয়ে যে ফেলচি।

প্রত্যেক জাতির মূলে এক একটা ভাব আছে বলেচি সেইটে তার সত্য। হিন্দুর মূলে যেটা ভাব বলে ধরে নেওয়া গেছে অন্যজাতির ভাব থাকার তুলনায় সে এক নয়। সকল জাতির ভাব এক একটা স্বতন্ত্র ভাব, আর হিন্দুর ভাব হচ্ছে সকল ভাব সমন্বয়ের ভাব। ইংরাজের ভাব স্বার্থ ফরাসীর ভাব স্বাধীনতা মার্কিণের ভাব সাম্য জার্ম্মানের ভাব প্রাধান্য। জাতিগুলা দানা বাঁধবার দিন থেকে এই এক একটা ভাব নিয়েই আছে, থাকবে, যে দিন পর্য্যন্ত না ধ্বংস শতচূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়চে তারা আপন আপন ভাবেই অটুট কিন্তু দেখ ওই দোয়ারে ওঠা আর নামা—উন্নতি আর অবনতি—দিনকতক বড় মানুষী আবার তারপর গরিবীয়ানা, এই নিয়েই ওই মূল ভাব ধরে তারা পড়ে আছে। ও ভাবটার কোনও লক্ষ্য নেই কোনও গতি নেই। ভাবটার এতটুকুও ওদের পরিণতি নেই চোখের ওপর যে হাউই বাজি দেখব সে ওই উন্নতিরই, বড় মানুষের রঙ বেরঙের আগুনের ফিনকি. কাটতে কাটতে সর্ সর্ শূন্যে ঠেলে ওঠা আর থুপ্ করে পড়া। ইতিহাস খুলে পড় এ ছাড়া আর কিছু দেখবে না।

তার উপর ওই যে স্বার্থ স্বাধীনতা সাম্য প্রাধান্য বড় বড় কথা গুলো দেখচ —ওর মূলগত যে ভাব সে ওদের একার নয় জেনো, ভারতের সমন্বয় ভাবের ভিতর সকলকেই খুঁজে পাবে। ভারত ও সবগুলোকেই তার তপস্যার গণ্ডী মধ্যে টেনে এনে—মহা সমন্বয়ের চেষ্টা করচে। সে ভবিষ্যৎ জগতের জন্য একমনে একটা কিছু গড়চে, উন্নতির খেয়ালই রাখে নি। অমন কত উন্নতির

হাউই তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে ফিরে তাকায়নি। সমস্তের ভাবকে এক করে একটা মহাসমন্বয় গড়াই যে তার লক্ষ্য। পৃথিবী তাকে আপনার উন্নতি দেখিয়ে বার বার উপহাস করে গেছে,—কখনও কুণ্ঠিত কর্ত্তে পারে নি।

ওই যে চারটে মূল ভাব—ধর্ম্ম অর্থ কাম আর তাদের লক্ষ্য স্বরূপ মোক্ষ, জগতের সকল দেশের সকল ভাবই এর মধ্যে পাবে। প্রথম ওই তিনটে ভাব ছাড়া মানুষের জীবন রচনা হতেই পারে না আর চতুর্থ ভাবটী আদর্শ স্বরূপ না থাকলে কোনও ভাবই স্বভাবে কোনও দিন থাকে না ঘুলিয়ে উঠে। ভারত শূদ্রের মধ্যে কাম, বৈশ্যের মধ্যে অর্থের ভাব ঢুকিয়েছিল। আর ক্ষত্রিয় গড়েছিল, তার কাজ ছিল প্রকৃতির জড় শক্তির প্রবাহে যেন ওই দুই জড়ের মধ্যে সমাপ্ত বর্ণ ভেসে না যায়। ক্ষত্রিয়ের তাই ভাব ছিল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের কাজ হচ্ছে অমৃতের অমর সত্তায় উদ্বোধিত অন্তর্ম্মুখী শক্তির অনিবার্য্য স্ফুরণে বাহু বলের বিপুল প্রকাশ। তার উপর ছিল ব্রাহ্মণ, যে ঐ জীবনাতীতকে জীবনের সকল দ্বারে বিঘোষিত করে মোক্ষের আদর্শ দিয়ে ধর্ম্ম অর্থ কামকে সংযত রাখত—ভারতের বৈশিষ্টের অভিমুখী করতো।

এই ত constitution, এখন হিন্দুজাতি ধর্ম্মের বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলতে কি বুঝব? বুঝব কি ওই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, না বৈশ্যের অর্থ, না শূদ্রের কাম, না বুঝব ব্রাহ্মণের মোক্ষ?—কোন বনিয়াদের উপর হিন্দুজাতি প্রতিষ্ঠিত বুঝব?

বোঝার কথা বলতে গেলে বলতে হয় এখনও চরম বোঝা ভারতের শেষ হয়নি। এখনও সে বুঝচে। যে জিনিষ তার মধ্যে রচিত হয়ে উঠলে সে আর আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকতে পার্ব্বে না, পাকা ফল যেমন করে বৃন্তচ্যুত হয় তেমনি করে তার অন্তরাত্মা আপনার জন্মভূমি ছেড়ে বিশ্বের অভিমুখে যাবেই, সে বোঝা এখনও হয়ে ওঠেনি। সে বোঝা যেদিন পঞ্চনদে যজ্ঞকুণ্ডের চতুর্দ্দিক ঘিরে ঋষিগণ আপনাপন স্ত্রীপুত্র পরিবার সঙ্গে করে আহুতি দিতেন সে দিন যেমন করে চলছিল,—যে দিন তথাগত গৌতম জন্ম ব্যাধি জরা মৃত্যু পীড়িত সংসারের উপর আপনার বোধিসত্ত্ব লব্ধ জীবনের বাণী ছড়িয়ে দিলেন সে দিন যেমন করে চলছিল,—যেদিন চূর্ণীকৃত বৌদ্ধমঠের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুর তরবারি ও নব প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসের হর হর ব্যোম ব্যোম নাদ দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ করেছিল সে দিন যেমন করে চলছিল,—যেদিন ইসলামের দীন্ দীন্ রবত্রস্ত পরাজিত ব্রাহ্মণত্ব গ্রাম্য সমাজে বিবাহাদি অনুষ্ঠান মাত্র সম্বল করে আত্মগোপন

যারা আপনার প্রাণ রক্ষা করেছিল সেদিন যেমন করে চলছিল,—আজও এই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভগ্ননৈতিক-মেরুদণ্ড জাতির সম্মুখে ধ্বংসের বিকট ব্যাদান দেখে হিন্দু মুসলমান শিখ-জৈন সব একত্রিত হয়ে এই আর্ত্তনাদ এই কম্পনের মধ্যে তেমনি করেই চলচে। বোঝা তেমনি করেই চলচে। সেটা অতীত বলে কোনও মহামহিমার্ণব ভগবানের রাজত্ব ছিল না। এটা বর্ত্তমান বলে আর একটা জরাজীর্ণ শীর্ণ কুব্জ অভিশাপগ্রস্ত ভগবান এ যুগের অধীশ্বর হয়ে বসেন নি। সেই একই ভগবান, এ মানুষও এক। প্রভেদ যা সে ক্রমঃপরিবর্ত্তিত অবস্থার।

বিশ্বের চতুর্দ্দিকে অপরাপর দেশগুলায় মানুষ কেউ ধর্ম্ম কেউ অর্থ কেউ কাম এই ভাবেরই একটাকে প্রবল করে তারি ওপর আপনাপন জাতির বিশিষ্ট সুর চড়িয়ে একটা একটা আদর্শ রচনা করে। ঐ পর্য্যন্তই তাদের চেতনা। বাকিটা সমস্তই প্রকৃতির ঝঞ্ঝায় অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তি থাকে উপরে, চেতনা তার প্লাবনের নীচে কোথায় তলিয়ে যায়, তাই কেউ স্বার্থ অমন প্রবল সপ্রগলভতার বজায় কর্ত্তে পারে, কেউ নররক্তে পৃথিবী ধৌত করেও আপন প্রাধান্য বজায় করে চলে যায়। কেউ বা আপনার ধর্ম্ম কেউ বা আপনার রাষ্ট্রনীতি কেউবা আপনার সভ্যতা বিকট বক্ত্র বিস্তার করে অপর জাতিগুলিকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পৃথিবীর ভূধর গণে, কান্তার চষে সমভূমি করে বেড়ায়। প্রকৃতির যতখানি জোর ঝঞ্ঝায় বজ্রে সাগরোচ্ছ্বাসে বিস্ফারিত এদের এক এক জনের এক একটা দাপট তার চেয়ে কম জোরে ত পাখশাট মারে না।

. এখানে ভারতে ওমনি একটা ভাবকে প্রকৃতির জড়বেগের কুণ্ডলীকৃত স্তম্ভের মাঝখানে ফেলে ভগবান কখনও শক্তির আবর্ত্ত রচনা করেন নি। এখানে যা হচ্ছে, সে বরাবরই বলে আসছি একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার।

মোক্ষের ভিত্তির ওপর, ধর্ম্ম অর্থ কাম, আপন আপন সামঞ্জস্য রেখে একটা ভাবসমন্বয়মূলক চেতনা রচনা করচে এখানে। সেই চেতনা প্রকৃতির প্লাবনের নীচে তলিয়ে যাবে না, তার ওপরে উঠেই আমরা যেমন আমাদের কলকব্জার মধ্যে প্রকৃতির একটু আধটু বাষ্পশক্তি বা বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগাই তেমনি করে সমগ্র প্রকৃতির অফুরন্ত শক্তি ভাণ্ডারকে কাজে লাগাবে। মানবত্বের একটা মহৎ পরিণামই ভারত ধীরে ধীরে আপনার উত্থানে পতনে সুখে দুঃখে এই পুণ্যভূমিতে রচনা করে যাচ্ছে।

অতএব বলতে অবশ্যই পারি যে কোন বনিয়াদের ওপর হিন্দুর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত সে ত এখনও আমি বুঝে উঠিনি। হিন্দুর সমস্তটা এখনও গড়ে ওঠে নি যে। আমি কেবল বললুম মাত্র যে হিন্দুর একটিই বনিয়াদ। ভারতের মেরুদণ্ড ধর্ম্ম কিন্তু সে মেরুদণ্ড শরীরতত্ত্বের বাইরের জিনিস। ভারতবর্ষের দেহটাকে কেটে খান খান করেও তাকে তুমি চক্ষের উপর তুলে ধরতে পারবে না।

ভারতের ধর্ম্ম হচ্ছে মোক্ষ ধর্ম্ম অর্থ কামের সামঞ্জস্য, তা যদি না হবে তাহলে ত বৈদিক যুগেই জাতির সমাপ্তি ঘটে যেত। একটা মুষ্টি নিয়ে যেমন ইসলাম ধধূপের জ্বালাময় উদগারসম ছুটে বেরিয়ে আপনার সমস্ত আলোটা জ্বালিয়ে আপনাকে পুড়িয়ে ফেলেছিল, স্পেন বোরিয়েছিল, দীনেমার বেরিয়েছিল, ইংরাজ বেরিয়েছে, জার্ম্মাণ রুষ বেরুচ্চে, তেমনি করে সে যুগে ভারতও বেরুত। তার সেই গগনস্পর্শী যজ্ঞধূম কত কত বিভিন্ন জাতির ছিন্ন শির আহুতি স্পর্শে বিকট গন্ধসহ গগনমার্গে কুণ্ডলাকৃত হত কে তা বলতে পারে? তার সামগানের ছন্দে কত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধের গাথা কীর্ত্তিত হয়ে যেত। তা ত হল না। বরং উল্টে ভারত একদিন কোন এক নব স্বপ্ন দেখে আপন মনে আপনিই শিহরিয়া উঠল। সে আপনার মধ্যেই ভেঙ্গে গড়া সুরু করে দিলে। ধর্ম্মের যে আদর্শ একটু একটু করে তৈরী হয়ে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিল, তাকে সে বদলে দিলে। সে নব অনুষ্ঠানে নূতন করে ফিরে বসল। ভারতে বৌদ্ধ সাধনার ভিতর দিয়ে মোক্ষের আদর্শটাকে সম্মুখে রেখে মোক্ষকে প্রাধান্য দিয়ে নবীন জীবন রচনা আরম্ভ হল। সমাজ বদলে গেল, সভ্যতা বদলে গেল, আচার বিচার বসন ভূষণ জীবন ধারণ সবই ভারত নূতন করে নিয়ে আপনাকে আবার ঢেলে সাজলে। এ যুগে যে জিনিস তৈরী হয়ে উঠেচে সেও ত সামান্য নয়। তারে দেখে বিশাল চীন সম্ভ্রমে মাথা নীচু করেচে, পারস্য অভিভূত হয়ে গিয়েচে, জগতের শত শত জাতি সংস্পর্শ লাভ করে আপনাকে ধন্য কত্তে ছুটে এসেচে কিন্তু ভারতের গতী সেখানেও থামেনি,—তাকে যে তখনো এগোতে হবে। হ'ক না পথ সঙ্কটময়, সে অত্যুজ্জ্বল রবিকরোদ্ভাসিত শৃঙ্গ থেকে উপত্যকা তার পর আরো নীচু একেবারে গভীর খাতের মধ্য দিয়ে না হয় তার পথ গিয়েছে; তাই বলে কি তাকে থেমে যেতে হবে? তাই ভারত সেখানেও চুপ কর্ত্তে পারে নি। ধর্ম্মবিরোধ আত্মসঙ্কোচ পরাজয় অপমান সমস্তের মধ্য দিয়ে ভারত একেবারে মৃত্যুমুখেও এসে দাঁড়াতে দ্বিধা করে নি।

ভারতের নিজস্ব জীবন ধারা অন্তঃসলিলা হয়েও ঠিকই বয়ে আসচে। মুসলমান আমলে ঐ গোঁড়ামীর ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিতে দেখেই তারে উৎসন্নে গেছে ভেবো না, ইংরাজ আমলে এই যে গোলামীর গাধার টুপি পরে সেই ভারত—সেই যাজ্ঞিক ভারত—সেই মুমুক্ষু বৃদ্ধ ভারত—এমন সঙের মত ধেই ধেই করে নাচচে,—এ দেখে নিরাশ হয়ো না।

যে ভগবান এরে ধর্ম্মের আদর্শ মোক্ষের আদর্শ যুগের মধ্যে দাঁড় করিয়ে ছিলেন, এখনও তিনিই আছেন—তাঁরই হাতে এর ভাগ্যরজ্জু। ইচ্ছার অনিরুদ্ধ বেগ নিয়ন্ত্রিত বলধর্ম্মী মুসলমান আর স্বার্থ সর্ব্বস্ব পরম নাস্তিক ইংরাজ আজ তাঁরই বিধানে ভারতের প্রবাহের মধ্যে পড়েচে। ঐ চতুর্ব্বর্গের সামঞ্জস্যে এরাও আপন আপন দান দিতে এসেচে,—এরা কেউ ছোট নয়। আপন কাজ সমাপ্ত হলে সকলেই ভারতের আপন হয়ে যাবে।

এই শেষ লক্ষ্যের মধ্যে পৌঁছান পর্য্যন্ত ভারতের জাতির গঠনই চলবে। তারপরই ভারতবর্ষ দাঁড়াবে, যে দাঁড়ানকে প্রকৃত নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ান বলে।

বিশ্ববিদ্যালয় বিদায়-গীতি

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।]

আমার স্কন্ধে মন্দমতি
চাপ্‌ল তুষ্ট সরস্বতী
বিদায় নিলাম বিদ্যাসতী
তোমার আলয় থেকে
এতদিনের ভালবাসা
মিটলনাক প্রাণের তৃষা
মরীচিকায় ভোলায় দিশা
স্বপন-মায়া ডেকে।

চাইলে চোখে লাগে ধাঁধা
মুদ্‌লে আঁখি সবই আঁধা
ভাবতে গিয়ে দেখি—গাধা
কথায় আছি ডাক।
নামিয়ে দিয়ে ভূতের বোঝা
এবার আমি হ'লাম সোজা
রইল আমার 'ডিগ্রী' খোঁজা
'নোটের' ঘানিপাক।
তোমার কৃপা-দৃষ্টি পেলে
লক্ষ্মী সে তো পায়ে ঠেলে
সরস্বতী দূরে ফেলে
ত্যাজ্যপুত্র করে।
শরীর—সে তো নাকের আগায়
দৃষ্টি—সে তো চশ্‌মা লাগায়
জীবন—সে তো শ্মশান জাগায়
জ্যান্ত শবের পরে।
তোমার কোলে যে সব ছেলে
নন্দদুলাল শরীর মেলে
জীবনটা তো অবহেলে
কাটিয়ে দিল খাস।
ভুঁড়ি, দাড়ি, চেন ঝুলিয়ে
প্রথম জুটোয় হাত বুলিয়ে
জ্ঞান-সাগরের জল ঘুলিয়ে
তুল্‌ছে বালির থাস।
তাদের মতন্ কয় বা কজন্?
লাখের মধ্যে দু এক ডজন—
মেখে পায়ে কৃপার রজন্
ভাগ্য-দোলায় নাচে
পিটিয়ে গাধা বানান্ ঘোড়া—
পূজ্‌তে তাঁদের চরণ-জোড়া

নিয়ে মোটা টাকার তোড়া
অনেক ছেলেই আছে।
বাক্‌সে তাদের আছে যে দম্‌,
শরীরেই তা' বিশেষ কি কম।
তাইতে তারা হয়না বেদম্‌
বিদ্যা-রেসে ছুটে,
চক্ষু মুদে ঊর্দ্ধশ্বাসে
ছুটছে তারা জয়ের আশে
দেখেই বিদ্যা পলান ত্রাসে
ভাবেন ধরল ভূতে।
কিন্তু যাঁদের বাক্‌স শূন্য
নাইক খোসামোদের পুণ্য
কিম্বা কর্ম্ম দোষের জন্য
ধনের ঘড়া খালি।
তা'রাও কেন মোহের ভরে
ঋণের বোঝা মাথায় করে'
বিদ্যা বলে' অবিদ্যারে
দিচ্ছে পূজার ডালি।
দরিদ্রতার তাইতো জ্বালা
তাইতো গলে দুখের মালা,
তাইতো যখন হাসির পালা
অশ্রু চোখে ঝরে।
ফুলের মত জীবন-শত
আধেক-ফোটা ফুলেরমত
মধ্য-দিবস না হয় গত
অকালে যায় ঝরে'!
বুঝে শুঝে বোঝার দায়
এড়িয়ে এবার—স্বস্থ-কায়ে
ভাসিয়ে দিলাম জীবন নায়ে
অথই সাগর-বুকে।

নিজের হাতে ধরেছি হাল
নিজের হাতে তুলেছি পাল
চক্ষু চেয়ে সকাল বিকাল
বাইব তা'রে সুখে।
যেমন সহজ সূর্য্য উঠে
যেমন সহজ কুসুম ফুটে
যেমন সহজ গন্ধ ছুটে
হাওয়ার বুকে ভেসে,
তেম্নি-করে' বাঁধন টুটে
পরাণ আমার উঠবে ফুটে
হাওয়ার সনে ছুটে ছুটে
চলব দেশে দেশে।
প্রাণের কথা আপন ভুলে
গাইব নিত্তি পরাণ খুলে
বিশ্ব চিত্ত উঠ্‌বে দুলে
আপন ভোলা সুরে।
অন্ধ আঁধার খুলবে নয়ন
করবে আলোর কুসুম-চয়ন
মরণ হ'বে কুসুম-শয়ন
জীবন-মোহন পুরে।

চিঠির গুচ্ছ

দুই দফা

(৪)

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।]

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে নীহার,

সত্যিই ভাই অধ্যাপক সম্বন্ধে আমার বড়ই বিদ্‌ঘুটে একটা ধারণা আছে। শুনে নিশ্চিন্ত হলুম যে তোমার স্বামী সুপুরুষ এবং রসিক লোক।

আমি ভাই, খুবই লজ্জিত যে আমাদের মাঝে এমন সব মেয়ে আছে, যারা তোমাদের ঘৃণা করে শুধু তোমাদের রং কালো আর তোমাদের আচর ব্যবহার ভিন্ন ধরণের দেখে। নতুনকে যারা সইতে পারে না, আমার মতে, দুনিয়ার আনন্দ তারা উপভোগ করতে অক্ষম। অতি ছোট বয়সেই আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে এসেচি এবং তারপর আর সেখানে ফিরে যাবার সৌভাগ্য কখনো আমার হয়নি, কাজেই সেখানকার মেয়েরা কেমন, তা আমি ঠিক বলতে পারিনে। তবে পুঁথি পত্রে তাদের পরিচয় যা পেয়েছি, তাতে মনে হয়, ভারতে পালিতা ইংরাজ-দুহিতার মত তারা সঙ্কীর্ণ চেতা নয়—দুনিয়াকে তারা দেখতে চায় পূর্ণরূপে, আর, নূতনকে বরণ করে নিতে সর্ব্বদাই তারা প্রস্তুত।

তুমি বিয়ে করেছ বলে আমি মোটেও আশ্চর্য্যান্বিত হইনি—আর স্বামীকে ইতিমধ্যে ভালবেসে ফেলেছ বলে তোমায় জানোয়ার ঠাউরে বসিনি।

আমি শুধু ভাবি, তোমরা এমন কি এক আশ্চর্য্য উপাদানে গঠিত, যার জন্ম, এত অল্প বয়সে তোমরা জীবনের চাঞ্চল্য বর্জ্জন করতে পার। তোমাদের জীবনে কর্ত্তব্যের দাবীটা আমাদের কাছে বড়ই বিচিত্র বলে মনে হয়। জীবনের কত কিছু হতে নিজেদের বঞ্চিত রেখে বেশ প্রফুল্ল চিত্তে পার তোমরা নিজেদের বিলিয়ে দিতে।

এর মাঝে নিশ্চতই তোমরা একটা আনন্দ পাও, নইলে এ নিয়ম কিছুতেই চলত না। তোমার সমাজের বন্ধন নিশ্চয়ই খসে যেত, যদি তোমরা এতে ব্যথা পেতে। এই রকম কোটি কোটি নারী নিয়েইত তোমাদের জাতি গড়া—অভিযোগ কেউত করে না।

তোমরা যারা, নতুন ভাবকে গ্রহণ করতে পেরেচ, কেবল তারাই বেদনা অনুভব করচ এবং সেই ব্যথা বুকে চেপে না রেখে প্রতিকার প্রার্থনা করচ। তোমাদের সমাজে রক্ষণশীল যাঁরা, তাঁরা এতেই চঞ্চল হয়ে উঠেচেন এবং আমাদের দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার নিন্দা করে, তোমাদের সতর্ক করে দিচ্চেন, তোমরা যেন ওই ভুয়ো সভ্যতার বাইরের আবরণ দেখে মুগ্ধ না হও। এ সব কথা আমি তোমার কাছেই শুনেচি—কাজেই এত সভ্যতা সম্বন্ধে আমার চাইতে তুমিই ভালো জান।

এ সব যদি সত্য না হয়, তা হলে তোমাদের দেশের নারী জীবন ইচ্ছামত তোমরা গঠন করতে পারবে—কিন্তু যদি সত্য হয় তা হলে তোমাদের খুবই বেগ পেতে হবে।

জীবনের আদর্শটাকে যদি তোমরা খুব ছোট করে নেও, আর ছোট্ট সেই আদর্শ লাভ করেই তোমরা যদি তৃপ্ত থাক, তা হলে তোমাদের নিজেদের ভিতরই যে পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবেনা। তোমরা ত স্বভাবতই মনে করবে যে অবস্থায় তোমরা আছ, তার চাইতে ভাল ব্যবস্থা কিছু হতেই পারে না।

পরিবর্ত্তন যাঁরা পছন্দ করেন না, তারা তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে চরম সুখের ও শান্তির অবস্থা বলে মনে করে নিয়েছেন এবং পরিবর্ত্তনের জন্য যারা আন্দোলন করচেন, তাদের বলচেন দেশের মেয়েদের চিত্তে মিথ্যে অভাব তুলে তাদের জীবনে অশান্তি এনে দিয়ো না।

শান্তির মূল্যস্বরূপ তোমরা অনেক কিছুই দিতে পার, দেখচি। এমন কি এই শান্তির জন্য তোমরা মরতেও পিছুপাও নও। আমার মনে হয়, জীবনের পক্ষে তোমাদের প্রার্থিত এই ধরণের শান্তির চাইতে সংগ্রামেরই বেশি প্রয়োজন।

শান্তির জড়তায় যদি জীবন আড়ষ্ট হয়ে যায়, অথবা প্রাণের স্পন্দনকেই যদি শান্তির বিঘ্নস্বরূপ বলে মনে কর, তা হলে, কাণাকড়ি মূল্যেও আমি সে শান্তি ক্রয় করতে রাজী নই।

মানুষ শান্তি চায় কেন? জীবনকে উপভোগ করবার জন্যই ত। তোমাদের ওই ঘরের কোণের বদ্ধ-জীবন কি উপভোগ্য হতে পারে? অবশ্য যা করতে হবেই, না করে উপায় নেই, সে কাজটাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলে, তা দুঃখের বোঝা হয়ে ওঠে না—সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যই মেয়েদের

ঘরের কাজ প্রভৃতি কর্ত্তব্যগুলিকে আনন্দপূর্ণ বলে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই গৃহ-কর্ম্ম প্রভৃতির পরেই সহসা তোমরা একটা বড় দাড়ি টেনে দিয়েচ—আর, সেইটেই হচ্চে তোমাদের জীবনের পক্ষে মারাত্মক।

আমাদের সমাজের মেয়েদের কি ঘরের কাজ করতে হয় না? ব্রিটিশ-সন্তানেরা কি মাতৃস্নেহের মধুর স্বাদ পায় না? দম্পতী পায় না একে অন্যের ভালবাসা? এ-সব যদি না পেত, তাহলে শুধু কামানের আর বন্দুকের জোরেই এত বড় জাতি গড়ে উঠতে পারত না—এ জাতির মানুষ শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যেত, অথবা মৃতপ্রায় হয়ে আটল্যান্টিকের ওই ক্ষুদ্র দ্বীপটির ধূলোর ওপরই লুটিয়ে পড়ে থাকত।

জীবনকে উপভোগ্য করতে হলে, তার পরিসরও বৃহত্তর করতে হবে। যাতে করে এক জায়গায় বেদনা পেয়ে, অন্যত্র লব্ধ আনন্দের উল্লাসে সেই বুকের ব্যথা ঘুচান যায়।

সাংসারিক অপরিহার্য্য দুঃখ-দৈন্য যখন কেবলই পীড়ন করে, মানুষ যদি তখন এমন একটা যায়গা না পায়, যেখানে দাঁড়িয়ে সে এতটুকু আনন্দ লাভ করতে পারে, তা হ'লে বেদনার আঘাতে সে ত ভেঙে পড়বেই—তার জীবন একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

নারীকে কেবলমাত্র গৃহের ঘরণী করে রেখে তোমাদের সমাজ নারীজীবন একেবারে বিফল করে দিয়েচে। এই বিরাট বিশ্বে প্রাচীরবেষ্টিত ওই ক্ষুদ্র আঙিনাটুকু ব্যতীত কোথাও তাদের দাঁড়াবার স্থানটিও নেই। তোমার সমাজের পুরুষ যখন অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে, তখন ঐ আবদ্ধ স্থানটুকুর মাঝে পড়েই তাকে যাতনায় ছটফট করতে হয়।

তবুও যে তারা অভিযোগ করে না, তার কারণ হচ্চে এই যে, তারা বোঝে না প্রচলিত প্রথার চাইতে ভাল কিছু থাকা সম্ভব, যা তাদের জীবনকে বেশি কিছু আনন্দ দিতে পারে।

তোমাদের জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের সমাজ, সম্মোহনমন্ত্র আউড়ে তোমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, তোমরা ছোট, শক্তিহীন, পুরুষের দাসী। তাই ভিক্ষাস্বরূপ যতটুকু পাও, তাতেই তৃপ্ত হয়ে থাক, আর সেই অবস্থাটাকেই স্বাভাবিক বোলে মনে কর।

তুমি ঠিক বলেচ যে, বাইরের আন্দোলনে কিছু হবে না—নারীর অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে মুক্ত হবার, পূর্ণ হবারই একটা আকাঙ্ক্ষা। কোন বিষয়েরই

অধিকার ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না—নিজের চেষ্টায়, নিজেরই শক্তির জোরে সব আদায় করে নিতে হয়। তোমাদের পুরুষেরা তোমাদের কোন অধিকার দেবে কি দেবে না, তা আমি জানিনে। যদি দিতে চায় ত কাজ সহজ হয়েই যাবে। আর দিতে না চাইলেই কি তোমরা চুপটি করে বসে থাকবে? দুনিয়ার ওপর দাবীটা কি শুধু তাদেরই—তোমাদের কিছুই নাই? আমি একথা কখনো ভাবতে পারিনে যে কেবল পুরুষদের নিয়েই একটা জাতি গড়ে উঠতে পারে। জাতিগঠন ব্যাপারে নারীর দান কি অগ্রাহ্য করা চলে?

তুমি লিখেচ যে, ভাঙ্গতে তোমার বড় ব্যথা লাগে। কিন্তু, সেই ব্যথার ভয়ে চুপ করে থাকলে ত চলবে না। দেহে ফোঁড়া হলে, সে ফোঁড়া কাটতে হবে, চিরতে হবে।—ব্যথা পাবার ভয়ে তাকে বাড়তে দিলে তোমার জীবন নিয়েই শেষটায় টানাটানি পড়ে যাবে। ফোঁড়া কাটবার বেলায় ডাক্তার নির্ম্মম ব্যবস্থাই করে থাকে—তখন দয়ে মায়া করে কাজ করলে তার চলে না। রোগী যখন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে, ডাক্তার তখনই মায়ের মত স্নেহ ও যত্ন নিয়ে তার সেবা করে।

যুগান্ত-সঞ্চিত যে অনিয়ম সমাজদেহে সহস্র-বন্ধনে বেঁধে রেখেচে, তার অবিচার হতে মানুষকে মুক্ত করতে হলে নির্ম্মমই হওয়া চাই। ভাঙবার চেষ্টা তখনই নিন্দনীয়, গড়বার প্রবৃত্তির যখন অভাব হয়—কিন্তু গড়বারই জন্য যে ভাঙা, সে ত অনাবশ্যক নয়—সে অপরিহার্য্য।

জেনে খুসী হয়েচি যে, তোমার স্বামী উদারচেতা ও সংস্কার প্রয়াসী। তোমাদের দুজনের চেষ্টায় তোমাদের দেশের মেয়েদের মনের দাসত্ব অন্তত কিছু বিদূরিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তোমার চিঠি পেলে আমার বড়ই আনন্দ হয়—তোমার কাছে চিঠি লিখেও খুব আরাম পাই। তোমাতে আমাতে পত্রব্যবহার কোন দিনই যেন বন্ধ না হয়। জীবনের গতি তোমার আর আমার মাঝে যদি সুমেরু আর কুমেরুর ব্যবধানও ঘটিয়ে তোলে, তবুও যে বন্ধুত্ব-সূত্রে আমরা একবার বাঁধা পড়েচি, তা যেন শিথিল হয়ে না যায়। অটুট বন্ধুত্ব চিরদিনই যেন আমাদের দুটি প্রাণ এক করে রাখে। কেমন রাজী ত?

তোমারই
এভি।

(৫)

ভাই মোহিত,

তোমার দুখানি চিঠিই পেয়েচি—দিচ্চি দিচ্চি করে জবাব দিতে দেরী হয়ে গেল। তুমি লিখেচ, পরিবারের লোকের দাবী-দাওয়া আমাদের দেশে বড়ই বেশি—যতদিন না ওর পরিমাণটা আমরা সবাই কমিয়ে ফেলতে পারচি, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের ঘরের বিবাদ নিবারিত হচ্চে না। সংসারে কারু কাছে কিছু চেয়ে নিতে হবে না সকলেই প্রাপ্য যা তা স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেবে—কিছু না পেলেও কেউ রুষ্ট হবে না, এ রকম অবস্থাটা সত্যি মন্দ নয়। সে রকমটি হলে অনেক অ-প্রীতির বোঝা কমে যাবে তাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু তুমি কি পারকি তা? যেখানে আমাদের নিজেদের এতটুকু অসুবিধা হবে মনে করি, সেখানেই ত আমরা যেতে নারাজ। সকলের প্রাপ্য যা, তা তখনই দিতে কার্পণ্য করি, যখনই আমরা বুঝতে পারি যে, দান করতে গেলে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা। এই লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশে প্রবৃত্ত হয়েই ত আমরা যত গোলযোগের সৃষ্টি করি—আমরা পেতে চাই অনেক কিছু, কিন্তু দেবার বেলায় কেবল শূন্য।

এটা যে আমাদের বাঙালীদেরই কেবল দোষ তা নয়। মানুষের অন্তরে সর্ব্বত্রই এই আকাঙ্ক্ষাটা প্রচ্ছন্ন রয়েচে। মানুষ যখন দেখলে যে নিজ নিজ সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে উজিয়ে উঠতে পারচেনা, তখনই সমাজগঠন সুরু হোল এবং সবাই কিছু কিছু দাবীর অংশ ছেড়ে দিল, আর একে অন্যকে কিছু দিতেও প্রতিশ্রুত হল। দেনা-পাওনা এমনি করেই দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের সাহায্যে জীবন চালিয়ে নেওয়া সহজ হবে মনে করে। মানুষকে সাধারণোপযোগী একটা কিছু নিয়ম সব সময়েই গড়ে নিতে হবে।

তুমি যদি বল যে, সময় এসেচে, যখন আমাদের এই দেনা-পাওনার দাবীটা কমিয়ে বা বাড়িয়ে অন্যরকম করে নিতে হবে, তাতে আমি অসম্মত হব না। জীবনের আদর্শ যে বদলে গেছে সেটা আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কাজেই নবীন আদর্শ লাভের জন্য এই নূতন জীবনে অনেক কিছু বাদ দিতেও হবে আবার গ্রহণও করতে হবে। অর্থাৎ মানুষ অন্ধের মত গতানুগতিক না হয়ে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগে আপনি জীবনের কর্ম্মপদ্ধতি আপনিই স্থির করে নেবে।

দাবী যখন তুমিও কর, আমিও করি,—তখন ও জিনিষটাকে ত সুখের

কথায় উড়িয়ে দিতে পারচি নে। গোল এই নিয়েই হচ্চে যে, আমরা যেটাকে দাবীর যোগ্য বিবেচনা করিনে, অন্যে সেইটেই চায়—আর তা আমরা সইতে পারি নে।

তুমি লিখেচ, যে দাবীর জোরে তোমার বউদি প্রভৃতি নীহারকে তোমার কাছে না পাঠিয়ে তাদের কাছে রেখে দিয়েচেন, সে অতি অন্যায় দাবী আমি অস্বীকার করিনে। তোমার মতে এখন পত্নীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাটা খুবই স্বাভাবিক এবং এই মিলনের মস্ত বড় একটা সার্থকতাও আছে।

গৌরীদান করে যারা অভ্যস্ত তারা কিন্তু নব-বিবাহিত দম্পতীর মিলনটাকে আবশ্যকীয় বলে মনে করে না, প্রকৃতপক্ষে দেহের অথবা মনের আকর্ষণ তখন সহজেই উপেক্ষা করা যেত। আজ পরিপূর্ণ দেহ-মন নিয়েই যে বিবাহ বাসরে স্বামী স্ত্রীর পরিচয় হচ্চে—জানবার ও জানাবার অনেক কর্ম্মই যে এখন তাদের বুক ভরে জমে ওঠে। এখন স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে রাখলে, তারা ত স্বভাবতই খুব ব্যথা পাবে।

কিন্তু তুমি ব্যথা পাচ্ছ বলেই কি অন্যকে আঘাত করবে। আজ যদি তুমি নীহারকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বল, তোমার অভিভাবকেরা পাঠিয়েই দেবেন—কিন্তু অসন্তুষ্ট হবেন, বৌদি হয়ত ব্যথাই পাবেন। সব সময় সঙ্গীন খাড়া করে সংসার চলা যায় না—ব্যক্তিত্বকে কখনো কখনো চেপে রাখতে হয় এক সঙ্গে অনেক থাকতে হলে। এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ করোনা।

তুমি অবশ্য বলবে, এই রকম সামান্য সামান্য ঘটনার বহুল সমাবেশই একসঙ্গে মিলে দারুণ অবিচারে মানুষকে পীড়ন করে, সুতরাং চোখের সামনে, মনের গোচরে, যখনই তার পরিচয় পাবে, তখনই তাকে নষ্ট করতে হবে। তোমার এ কথার কি জবাব দেব, তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারচিনে। ও রকম যাদের মনের ভাব তাদের আমি সাধারণ মানুষের বাইরে —তাই বলে কিন্তু নীচে নয়—স্থান দিতে চাই, আর অসাধারণ যারা হবে, তাদের জন্য কোন বিধি নিয়মই খাটবেনা। আপনাদের শক্তির জোরেই নিজ নিজ লক্ষ্যাভিমুখে ছুটে যাবে, কিছুই তাদের গতির ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

সমাজে যদি এই ধরণের অসাধারণ লোক ক্রমে বেড়েই চলে, তা হলে

শেষটায় তারাই সাধারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং এখন যাকে অবিচার অত্যাচার বলচি সে গুলি বিদূরিত হয়ে আবার নতুন রকমের অবিচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হবে। এই রকম ততদিন হতে থাকবে যতদিন না মানুষ দেবত্ব লাভ করবে। অবশ্য, দেব সমাজে যে কেউ কারু ওপর অত্যাচার করে না, তা আমি হলফ করে বলতে পারিনে। ঠিক কোথায় গেলে সে মানুষকে এতটুকু উৎপীড়ন অত্যাচার সইতে হবে না তা' আমি কল্পনায়ও জানতে পারিনে।

সেই জন্যইত আমি চারিদিকের সব কিছু ভেঙে চুরে এগিয়ে যেতে চাইনে। অমঙ্গল মাত্রকেই পায়ে দলবার প্রবৃত্তি আমি রাখিনে কারণ, আমি জানি, সেখানেই যাব, ওসব ঘাড়ে চেপে বসবেই—যদি ধীর স্থির ভাবে অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিবর্ত্তিত করতে না পারি। আমি যে পরিবর্ত্তন আনতে চাই তাতে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হবেনা, তাতে সমস্ত বিষয়েরই একটা আগা-গোড়া সামঞ্জস্য থাকবে। সেই জন্যই কেবল আস্তিন গুটিয়ে চলবার ভাবটা আমার ভাল লাগে না—সবই বয়ে সয়ে করাই আমার অভিপ্রেত।

কিছুদিন হতে একটা কথা কেবলই আমার মনে হচ্চে এবং সে-টা তোমায় না জানিয়ে থাকতে পারচিনে। সে হচ্চে আমাদের নবজাগরণের কথা। আমাদের চিত্তে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েচে, যার ফলে আমরা নিজেদের ভিতর একটা দুর্দ্দমনীয় শক্তির বেগ অনুভব করচি এবং যা আমাদের কেবল সামনের দিকেই ছুটিয়ে নিতে চাইচে—তাতেই উত্তেজিত হয়ে হাতের মাথায় যখন যা কিছু পাচ্ছি, তাই নিয়েই আমরা টানাটানি সুরু করে দিয়েচি। কোথাও কিছু সামঞ্জস্য নেই—আগাগোড়া কেবলই অমিল।

শক্তি সু-নিয়োজিত না হলে, তার অপচয় অবশ্যম্ভাবি। অকাজে ব্যয়িত হ'লে অফুরন্ত যা নয়, তার অভাব ঘটবারই বেশি সম্ভাবনা আমার ভয় হয়, যে শক্তি আমাদের অন্তরে সঞ্চিত হয়েচে, তা তেমন ভাবে খরচ করে আমরা শেষটায় দেউলে হয়ে না যাই।

তুমি চাও সমাজের সংস্কার সাধন করতে নির্ম্মম শক্তি প্রয়োগে। তোমার এই বল প্রয়োগ নারীকে স্বাধিকার লাভে কতটা সহায়তা করে তাই একবার দেখা যাক। তুমি আঘাত করে যাদের বুকে ব্যথা দেবে, কেমন করে প্রত্যাশা করতে পার যে তারা তোমার কাজের সহায়তা করতে অগ্রসর হবে? রক্ষণশীল বলে যাদের তুমি নিন্দা পরিহাস করবে তারা স্বভাবতই ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণই করবে। এরূপ অবস্থায়

যে পরিবর্ত্তন আনবার চেষ্টা তুমি করচ, সমাজের বহুসংখ্যক লোকের প্রতিকূল আচরণে তা অসম্ভব হয়ে উঠবে। ক্ষেপে উঠে তারা অমনিই যতটুকু দিতে চাইত, তাও দেবে না—বাংলার নারীরা যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে, অকারণে তোমার খানিকটা শক্তি ক্ষয় হবে।

অথচ, ধীরে ধীরে তুমি যদি স্থিরভাবে কাজ করতে থাক, তা'হলে হয়ত তোমার ঈপ্সিত সহজেই মিলবে, তোমার চেষ্টা সফল হবে।

আজ এই পর্য্যন্তই রইল। ভাল আছি। তোমাদের কুশল সংবাদ লিখো। কনক নীহারের চিঠি রীতিমতই পাচ্ছি ইতি—

তোমারই—নরেশ।

নিশ্চিন্ত।

(শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত)

তুমি গো আমায় করেছ পাগল,
হৃদয় দুয়ারে ভেঙেছ আগল,
বিনাশি সরমে
পশেছ মরমে
মোর,
তাই লাভ ও ক্ষতির হিসাব নিকাশ
হয়েছে ভোর।
আমার মাঝারে তোমার বিকাশ
আজ
করেছে সফল,
আমার সকল
কাজ,
জানি মোর কোন কাজ নাই
এবে আর,
উদাসীর মত আছি আমি তাই
নিশিদিন অনিবার।

ততো জয়মুদীরয়েৎ

(ভাণ্ডারকর স্মৃতিগ্রন্থ হইতে ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির অনুবাদ)

(অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম, এ)

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ"

মহাভারতে প্রত্যেক পর্ব্বের আরম্ভে এবং গ্রন্থশেষে (১৮শ পর্ব্ব, ২৩২) পাঠমাহাত্ম্য বর্ণনাকালে এই শ্লোকটি দেখিতে পাই। এই নমস্ক্রিয়াবাক্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সাধারণে ইহা শুধু পড়িয়াই যায় এবং কিছুমাত্র না ভাবিয়া কথাটা সাদাসিধাভাবে অনুবাদ করিয়া লয়। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদে প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয় এই প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,— "নারায়ণকে, নরশ্রেষ্ঠ নরকে, এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করিবে।" চতুর্থ পাদের যে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ দেখাইয়াছেন—ততো ব্যাপ্তস্তয়ৈব সরস্বত্যা পরম-কারুণিকয়া জনবোধায়াবিষ্টো জয়ং 'জয়ো নামেতিহাসোঽয়ম্' ইতি বক্ষ্যমাণত্বাজ জয়সংজ্ঞম্ ভারতাখ্যম্ ইতিহাসম্ বা—

অষ্টাদশ পুরাণাণি রামস্য চরিতম্ তথা
কার্ষ্ণ্যম্ বেদম্ পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ
তথৈব বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শিবধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ
ইতি ভবিষ্যবচনাৎ পুরাণাদিকম্ বা—

'চতুর্ণাং পুরুষার্থানামপি হেতৌ জয়োঽস্ত্রিয়াম্' ইতি কোষাদন্যং বা পুরুষার্থ-প্রতিপাদকং গ্রন্থং শারীরকসূত্রভাষ্যাদিরূপম্ উদীরয়েৎ উচ্চারয়েৎ।

প্রকৃত টীকাকার নীলকণ্ঠ 'ততঃ' এই শব্দটির নিজস্ব একটা অর্থ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রতাপচন্দ্র ইহা ছাড়িয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহার প্রতিশব্দ, 'পরে', তাহার পর' অর্থাৎ এখানে ঐ ত্রিবিধ নমস্কারের পর নীলকণ্ঠ পূর্ব্ববর্ত্তী 'সরস্বতী' শব্দের সঙ্গে ইহা ঘনিষ্টভাবে যুক্ত করিয়া

দিতে চাহেন। তাঁহার ব্যাখ্যা—'সেই পরমকারুণিক সরস্বতীদেবীর প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া, আর 'জয়' শব্দের 'জয়লাভ' এই সাধারণ অর্থ না ধরিয়া তিনি বলেন, এখানে উহা স্বয়ং মহাভারতকেই বুঝাইতেছে। ইহার পক্ষে তিনি মহাভারতের শ্লোক স্পষ্ট উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে দুইবার আছে—ইহার জয় নাম দেওয়া হইল। (১।২৩০২, ১৮।১৯৪) এই সংজ্ঞা মহাকাব্যে 'বিদুলপুত্রানুশাসন' (৫।৪৬০১) উপাখ্যানে প্রযুক্ত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ প্রমাণস্বরূপ ভবিষ্যপুরাণকে নির্দেশ করিয়াছেন,—ভবিষ্যপুরাণে শুধু মহাভারতকেই জয় নাম দেওয়া হয় নাই,—অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, বিষ্ণুধর্ম্ম ও শিবধর্ম্মকেও এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক অভিধানে, জয়শব্দের অর্থ, "যাহা চারি পুরুষার্থের কারণ", এই অভিধানের বলে তিনি ব্যাসের দার্শনিক গ্রন্থ, শারীরক সূত্র, ও সেই সঙ্গে শঙ্করাদি প্রণীত তাহার টীকা,—সমস্তই 'জয়' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে চাহেন।

নীলকণ্ঠ যেন এখানে পাণ্ডিত্যের বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তিনি এখানে জয় শব্দের যে অর্থ দিয়াছেন তাহা শুধু অভিধানেই আবদ্ধ, কিম্বা, কাল্পনিক, সাহিত্যে ও ভাষায় তাহার প্রয়োগ নাই। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিলে আধুনিক যুগের প্রতাপচন্দ্র রায় এবং পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা সঙ্গত। আমার বিশ্বাস, সংস্কৃতে এমন কোনও নির্ভরযোগ্য উদাহরণ নাই যে, 'উদীরয়তি' ক্রিয়া যাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ। পাঠকদিগকে অবশ্য একথা মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে 'উদীরয়তির' প্রকৃত অর্থ চালাইয়া দেওয়া, বায়ুতে ত্যাগ করা, নিক্ষেপ করা, এবং ইহা হইতে রূপক অর্থ, শব্দ উচ্চারণ করা। কিন্তু সেরূপস্থলে ক্রিয়ার সহিত এমন একটি পদ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা শব্দের ঠিক বোধটি আনিয়া দেয়,—ন তাং (বাচম্) উদীরয়েৎ, মনু, ২।১১৬, বাচম্ উদীরয়ন্, রামায়ণ ২।৫৭।৩, উদীরয়ামাসুঃ ··· আলোকশব্দম্, রঘু ২।৯, মন্ত্রমুদীরয়ন্, যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৩৬।

নীলকণ্ঠের প্রস্তাবিত এই কষ্ট-কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া পরে দেখা যাউক, আর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা যাহা অধিক সহজ ও অধিক সঙ্গত হইতে পারে। লোকে অনায়াসে এরূপ অনুবাদ করিতে পারে,—নারায়ণ, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নর, এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া (মানুষ) তবে জয়লাভ করিতে যায়। নর-নারায়ণ আর কৃষ্ণার্জ্জুন একই, একথা আমাদের

জানা আছে, কারণ ইহা মহাভারতে বহুবার বলা হইয়াছে—১।২১৮।৭৮৮৯, ১।২২৪।৪১৬১, ১।২২৮।৮৩০২, ৩।৪৭।১৮৮৮, ৫।৯৬।৩৪৯৬, ৫।১১১।৩৮২৪, ৭।১১।৪২২; ৭।৭৭।২৭০৭, ইত্যাদি। এই একত্ব স্বীকার করিলে আর একটি বাক্য মনে পড়ে, তাহা এই প্রাথমিক আশীর্ব্বাণীর মত সমগ্র গ্রন্থে ওতপ্রোতভাবে আছে, তাহা মহাভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষারূপে ভারতের অন্তরে আজিও বিরাজমান:—যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ১।২০৫।৭৫১৩, ৪।৬৮।২৫৩১; ৬।২১।৭৭১, ৬।২৩।৮২১ ইত্যাদি। 'যেখানে কৃষ্ণ সেখানে জয়। অনেক স্থানে এই বাক্য ইহার অনুরূপ আর একটি বাক্যে পূর্ণতালাভ করিয়াছে, "যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণঃ"...৬।২৩।৮২১, এই দুই বাক্য একত্র হইয়া হইল—যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ১৩।১৬৮।৭৭৪৬, যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়। অবশেষে 'যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' এই বাক্যের উৎপত্তি হইল। এই আকারে বাক্যটি যেন বিশুদ্ধ নীতি শিক্ষা দিতেছে—ধর্ম্মের জয় হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় মহাভারতের প্রধান অর্থ ই বাদ যায়। মহাভারত যে নীতিমূলক শিক্ষাগ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কাব্যে ও নীতিতে ভারতের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানের চিহ্ন স্পষ্ট আছে, হিন্দুজাতির অন্যান্য কৃতির ন্যায় এই মহাকাব্যও সমগ্র জাতির সমগ্র সম্প্রদায়ের। ইহার নাম পঞ্চমবেদ, লোকে ইহাকে পঞ্চমবেদ বলে, ব্রাহ্মণদের চতুর্ব্বেদের প্রাতিপাদ্য বিষয়, আর্য্য জীবন, পবিত্র জীবন, আর মহাভারত এই চারিবেদের সমান আসন অধিকার করিয়া ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ জীবন শিক্ষা দেয়। ইহার অন্য নাম কার্ষ্ণ্যবেদ, কৃষ্ণের বেদ, কারণ ইহা ক্ষত্রিয়দের নিকট সিদ্ধি ও মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়রূপে কৃষ্ণধর্ম্ম প্রচার করে। "জয়"—যুদ্ধে জয়লাভ—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সিদ্ধি, ক্ষত্রিয়ের শরণ, ক্ষত্রিয়ের প্রণম্য—ক্ষত্রদেবতা কৃষ্ণ। "যেখানে কৃষ্ণ সেখানে জয়," কারণ "কৃষ্ণকে পাইলে সবই পাওয়া যায়।" "যতঃ কৃষ্ণস্ততঃ সর্ব্বে।" যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই ধর্ম্ম; ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম্ম তাহাকে বলে,—"মরিলে স্বর্গে যাইবে, জয়ী হইলে মহীভোগ করিবে, সুতরাং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, আমরা যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না জয়লাভ কর।" দুষ্টের দমন ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের হস্তে শাসনদণ্ড অর্পণ করে। এই সকল নীতির বা মতের উদাহরণ ও পরিণতি—মহাভারত, এই সকল মত ভগবদ্গীতায় একত্র হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ভগবদ্গীতা অনুপম নাট্য, লোকে প্রায়ই বলে, মহাভারতে ইহা অসংলগ্নভাবে অনর্থক জুড়িয়া

দেওয়া হইয়াছে, মূলে আখ্যানবস্তুর সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে, সমস্ত গ্রন্থটির কেন্দ্রই হইতেছে এই ভগবদ্গীতা। নরনারায়ণ-রূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবতীর্ণ কৃষ্ণার্জ্জুন, প্রধান সঙ্কটের সময় ধ্যানমগ্ন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, বীরধর্ম্মের শ্রেষ্ঠগুরু আনন্দময় ভগবানের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর ভগবান্ তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন, বিশ্ববিধান মতে তাঁহার স্বধর্ম্ম, নিজের ধর্ম্ম নিঃসঙ্কোচে পালন করিতে, শুভ যাহা, সাধু যাহা, তাহার জন্য আবশ্যক হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া আত্মীয়দের রক্তপাত করিতেও তিনি প্রস্তুত। ব্রাহ্মণদের অধ্যাত্মতত্ত্ব এতদিন কর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিল, আজ তাহা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মপ্রাণতার সহিত বেশ মিলিয়া গেল। অর্জ্জুন শুধু বীরশ্রেষ্ঠ নহেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়াও তাঁহাকে মানিতে হইবে। একদিকে বহুসংখ্যক দুর্দ্ধর্ষ নারায়ণীসেনা, অন্যদিকে সারথীরূপী শ্রীকৃষ্ণ একা, এই উভয়ের মধ্যে তিনি সিদ্ধির অভ্রান্ত নিদর্শন কৃষ্ণকেই সহায়রূপে গ্রহণ করিলেন। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা মহাভারতকে বিশুদ্ধ নীতিগ্রন্থ বলিয়া দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে লইয়া বড় গোলে পড়েন,--বীরধর্ম্মের আদর্শের সহিত পাণ্ডবদের কয়েকটি কৌশলের মোটেই সামঞ্জস্য নাই, দ্রোণকে নিরস্ত্র করিতে গিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এক হীন কৌশলের আশ্রয় লইলেন, ভীমসেন অন্যায়রূপে দুর্য্যোধনকে আহত করিলেন। এই সকল কর্ম্মের দায়িত্ব স্বয়ং কৃষ্ণের স্কন্ধে চাপাইতে কবি কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহেন, তাঁহার অতীন্দ্রিয়জ্ঞানে তিনি কর্ম্মজীবনে আবশ্যক বলিয়া ইহাদিগকে পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া কাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবানের জয় যদি উদ্দেশ্য হয়, ত যে উপায়ই অবলম্বন করনা, সকলই সাধু।

তাহা হইলে মনে হয়, ঐ প্রাথমিক আশীর্ব্বাণীর এরূপ ব্যাখ্যা করিলে কেহ আপত্তি করিবেন না—"নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ নর এবং দেবী সরস্বতীকে পূজা করিয়া তবে লোকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে জয় আশা করিতে পারে।"

উপরের ব্যাখ্যা ঠিক হইলে অনেক পরিশ্রম করিয়া মহাভারত সম্বন্ধে যে সব মত খাড়া করা গিয়াছে সে সব মত আর টিঁকিবে না। এমন কি, এ পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, এক প্রাচীন কাব্য বাড়াইয়া মহাভারত রচিত হইয়াছে, সেই মূল কাব্যের নায়ক ছিল দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতৃগণ। কিরূপ ভাবে কাব্য বাড়িয়া উঠিল, কাব্যের ক্রমবিকাশ লইয়া, আলোচনা না করিয়া

তাহার রসভোগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সাধু। ভারতবর্ষে যে এমন এক-দল কবি ছিলেন যাঁহারা কাব্য আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই; এই ভারত সূর্য্যের তলে একদিন মধ্যযুগের জীবন ফুটিয়াছিল। আধুনিক রাজপুতদের ন্যায় প্রাসাদদুর্গে সুখাসীন সেকালের রাজগণ এই সব পৌরাণিক উপাখ্যানের আবৃত্তি শুনিয়া যুদ্ধযাত্রার অবসরে চিত্তবিনোদন করিয়া লইতেন, অতীত বীরকীর্ত্তি প্রখ্যাপনকারী অনিয়তবাস কবিদের জন্য ইঁহারা অধীর উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিতেন। কিন্তু এই মহাকাব্য ত এক একটি করিয়া গ্রথিত বীরগণের উপাখ্যানের সংগ্রহ মাত্র নহে, ইহা একভাবে ভাবিত, আর সে ভাব ইহাকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছে, প্লাবিত করিয়া দিয়াছে; পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ইহা, ইহার আখ্যান ভাগ এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চারিদিকে কলাকৌশল সহযোগে সংস্থাপিত। পাশ্চাত্যে ঐক্য জাতীয়ভাবে প্রকাশিত, সেখানে কবির প্রেরণা আসে স্বজাতিপ্রীতি হইতে। ইলিয়ড্ ইনিয়ড্ গ্রীস রোমের কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছে। চ্যাপলিনের লা পুসেল ও ভল্টেয়ারের হাঁরিয়াড্ ফ্রান্সকে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যে সকল শ্রেষ্ঠ উপায়ে বহুকে ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিতে পারা যায়, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস একটি, এই ধর্ম্মবিশ্বাস হইতেও কাব্যের প্রেরণা আইসে, 'স্বর্গচ্যুতি,' 'মেসিয়া,' খ্রীষ্টধর্ম্মের গৌরব বাড়াইবার জন্য রচিত। এইরূপ জাতীয় ভাব ভারতে কখনও উদ্বুদ্ধ হয় নাই, ধর্ম্ম এবং সমাজ ছাড়া আর কোথাও ভারত তাহার ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পায় নাই। মহাভারতের প্রেরণা আসিয়াছে এই সমাজ ও ধর্ম্ম হইতে। হিন্দু সমাজ গঠনে ক্ষত্রিয়কে যে আদর্শ সাধন করিতে দেওয়া হইয়াছে, মহাভারত সেই আদর্শ প্রচার করে; ভগবানের যে মহিমা ক্ষত্রিয়ের সিদ্ধিপ্রদ, মুক্তিপ্রদ, মহাভারত ক্ষত্রিয়কে সেই ঈশমহিমা শিখাইতেছে। যে কৃষ্ণপূজা যুগে যুগে ভারত সাহিত্যে অবদান পরম্পরা সাধন করিয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ সমাজে কাব্যে তাহার প্রতিচ্ছবি রাখিয়া গিয়াছে। শোভা সৌন্দর্য্য কোমলতা মনুষ্যত্ব, যাহা কিছু ভারতে লুকান ছিল, ব্রাহ্মণদের ভারত সে সব একত্র করিয়া রাখিয়াছে। শুধু সাহসবীর্য্য-ব্যঞ্জক সেই মহাপুরুষের অসামান্য কান্তিই বুদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। একজন জগতের বিষাদের অবতার জীবনের দুঃখকষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নির্ব্বাণ ছাড়া আর কোথাও শান্তি নাই। আর যাঁহারা বীরত্বে, মহৎকর্ম্মে অনুরক্ত তাঁহারা অচ্যুতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—আকৃষ্ট

হইলেন। দুইয়ের ভক্ত ভারত ও বিদেশ হইতে আসিয়া মিলিত। দার্শনিক রাজ মিনাণ্ডার বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারই সমসাময়িক হিলীওডর নামে তক্ষশিলাবাসী (রাজা অ্যাণ্টাক্লিডাস কর্ত্তৃক ভারতের কোনও রাজ সভায় প্রেরিত দূত) আর একজন গ্রীক, ক্ষাত্রদেবের শরণ লইয়া দেব-দেব বাসুদেবের গৌরবচিহ্ন স্বরূপ গরুড় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুষণেরা যখন হিন্দুস্থানে এক প্রকাণ্ড সিথিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল, তখন কনিষ্কের এক বংশধর 'বাসুদেব' আখ্যাও গ্রহণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক উপাদানের একান্ত অভাবে, এই সব লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করিতে পারি, বৌদ্ধদের মত ভাগবতদেরও ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা ছিল।

রচনারীতি দেখিয়াও মনে হয়,—মহাভারত প্রণয়নের মূলে আছে—বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মহাভারত এই বলিয়া স্পর্দ্ধা করে যে, সে শত-সাহস্রী, অর্থাৎ, এমন প্রকাণ্ড গ্রন্থ যে, সাধারণ মানবরচিত গ্রন্থের পরিমাণ অনেক মাত্রায় অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। "ইতি শ্রীমহাভারতশাতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ পর্ব্বাণি····অধ্যায়ঃ।" এই অভিধান পঞ্চমযুগের রীতির অনুমোদিত ছিল। খোয়াতে প্রাপ্ত ২১৪ খৃঃ এর শর্ব্বনাথের শিলা-লিপিতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়,—মহাভারত শতসহস্র শ্লোকের সংগ্রহ। "উক্তঞ্চ মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াম্" কিন্তু এই নাম বৌদ্ধ সাহিত্যের এক মূল গ্রন্থের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই গ্রন্থের নাম 'শতসহস্রিকা' বা 'শতসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।' জন সমাজে প্রচারের জন্য এই গ্রন্থ ক্রমে ক্রমে আয়তনে কমিয়া ২৫০০০, ৮০০০ (প্রাচীন প্রথায়, অষ্টসহস্রিকাই গ্রন্থের আয়তন হওয়া উচিত), ৭০০ বা ৫০০ ছত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর, একই কথার বার বার প্রতিশব্দ, ইহাতে যথেষ্ট পরি-মাণে আছে, তাহাতে গ্রন্থের কলেবর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার যেরূপেই হউক ইহাকে নির্দ্দিষ্ট আকার দিতে কৃতসঙ্কল্প, সুন্দর যাহা তাহাকে পাওয়ার পথে ভারত আর অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে সুন্দরের সন্ধানে বৃহতের কাছে, বহুর কাছে চলিয়াছে। কথা সাহিত্যের "বৃহৎকথা"য় ও এইরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, গুণাঢ্য, কথাসাহিত্যের ব্যাস, তিনি "বৃহৎকথা" লিখিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসের শতসাহস্রী ও বৌদ্ধ শতসাহস্রিকায় লেখকদের যে ধর্ম্মানুরাগ প্রকাণ্ডগ্রন্থ রচনায় ধৈর্য্যের অনুকূল. তাঁহার গ্রন্থরচনায় সে ধর্ম্মানুরাগ ছিল না, তাই তাহার নানারূপ সংক্ষিপ্ত

সংস্করণ আছে। ক্ষেমেন্দ্র "মঞ্জরী" বাঁধিয়াছেন, 'সংগ্রহ' করিয়া বুদ্ধস্বামী তাহা কাব্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন, সোমদেব গ্রন্থখানি আকারে আরও সংক্ষিপ্ত কলেবর করিয়াছেন—বলিয়াছেন, "সংগ্রহং রচয়ামি অহম্।"

মহাভারতের উপমা খুঁজিতে গেলে আবার এই 'বৌদ্ধধর্ম্মেই আসিতে হইবে। মূল. সর্ব্বাস্তিবাদিগণ সংস্কৃতকে শাস্ত্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষলাভের প্রমাণ স্বরূপ এক প্রকাণ্ড "বিনয়" গ্রন্থ জগৎকে দিয়াছেন, এই গ্রন্থ সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের বিনয়ের প্রায় দ্বিগুণ, সর্ব্বাস্তিবাদীগণের "বিনয়" আবার স্থবির, ধর্ম্মগুপ্ত, মহীশাসক, মহাসংঘিক, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিনয়কে আকারে অতিক্রম কবিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিনয় শতসহস্রিকা হইতেও বৃহৎ; এক গ্রন্থমালায়, শতসহস্রিকা যদি দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়, বিনয় গ্রন্থ তবে ত্রয়োদশ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। বিহারের শিক্ষাদীক্ষাবিষয়ক বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীব চাবিদিকে অনুবাদক নানারূপ গল্প, জাতক, উপাখ্যান সন্নিবেশিত কবিয়াছেন, প্রকৃত বুদ্ধেব জীবনী হইল কি না, তাহা দেখেন নাই। ইহা একপ্রকার 'বুদ্ধবংশ,' মহাভাবতের হরিবংশেব মত। এই সকল উপাখ্যান ও বিচিত্র কথামালা লইয়া মহাভারত এইরূপ এক বিনয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাব উদ্দেশ্য—ভাগবত প্রথামত ক্ষত্রিয়দিগকে শিক্ষাপ্রদান।

মিছে।

(শ্রীকালীপদ ঘোষ)

মিছে কেন বাঁধা কুন্তলভার, মিছে কেন আঁটা কাঁচলি,
মিছে কেন আর কাজলের টিপ, মিছে শোভা সাজ সকলি,
মিছে কেন আর বকুলের মালা,
মিছে কেন আর চন্দন ঢালা,
মিছে কেন পরা নীলবাস খানি, শ্যাম বিনা সব বিফলই;
মিছে কেন বাঁধা কুন্তলভার, মিছে মেছে কেন আঁটা কাঁচলি

মিছে কেন আর তাম্বুলরাগ, মিছে নীপমূলে যাওয়া,
মিছে কেন আর নুপুরের ধ্বনি, মিছে কেন পথ চাওয়া,
মিছে কেন আর চকিত নয়ন,
মিছে কেন আর রচিত শয়ন,
মিছে কেন বল কুসুম চয়ন, মিছে অভিসারে ধাওয়া,
মিছে কেন আর তাম্বুলরাগ, মিছে নীপমূলে যাওয়া।

মিছে কেন সারা তাড়াতাড়ি কাজ, মিছে আসা ঘাটে বিকালে,
মিছে কেন সওয়া গঞ্জনা ভার, চলে গেছে বঁধু যেকালে,
মিছে কেন চ'খে অঞ্জন আঁকা,
মিছে কেন পায়ে রঞ্জন মাখা,
মিছে কেন বল অধরের হাসি যৌবন সুধা ফুরালে,
মিছে কেন সারা তাড়াতাড়ি কাজ, মিছে আসা ঘাটে বিকালে।

মিছে কেন সখি বিকচ কুঞ্জ, মিছে শ্যাম শোভা আকাশে,
মিছে কেন ফুটে অশোক পুঞ্জ মিছে কেন চলে বাতাসে,
মিছে কেন শুধু করা হা হুতাশ,
মিছে কেন ফেলা বেদনার শ্বাস,
মিছে কেন মরা মরম দহনে, মিছে কেন আর ভাবা সে,
মিছে কেন সখি বিকচ কুঞ্জ, মিছে শ্যাম শোভা আকাশে।

মিছে কেন ঐ পিয়ালের ফুল পাতাগুলি গেছে ছাড়ায়ে.
মিছে কেন বল আঁখি না মেলিতে বকুল বালার ঝরা এ,
মিছে কেন অলি আসে উড়ে উড়ে,
মিছে মধুটুকু গেছে যদি ঝরে,
মিছে কেন বল যমুনার পাড়ে গাছ গুলি শাখা বাড়ায়ে,
মিছে কেন ঐ পিয়ালের ফুল পাতাগুলি গেছে ছাড়ায়ে।

মিছে কেন আর তমালের শাখে শুকসারি গাহে বন্দনা,
মিছে কেন আর শিরীষের শিরে শিস্ দিয়ে ডাকে চন্দনা,
মিছে কেন আর মাধবী বিতানে,
পবন সঘন শিহরণ হানে,

মিছে কেন আর কদম্ব বনে পিকরাণী করে মন্ত্রণা,
মিছে কেন আর তমালের শাখে শুক্‌সারি গাহে বন্দনা।

মিছে কেন আর ব্রজের কাননে হেসে নেমে আসে গোধুলি,
মিছে কেন ওই পথে চলে যেতে ফিরে ফিরে চায় ধবলী,
মিছে কেন মাঠে শ্যাম ঘাসগুলি,
পায় নাই যদি পূত পদধুলি,
মিছে কেন কর পরশন যাবি দাঁড়ায়ে র'য়েছে শ্যামলী,
মিছে কেন আর ব্রজের কাননে হেসে নেমে আসে গোধুলি।

মিছে কেন আশা 'রাধা' ব'লে বনে বাজিবে আবার বাঁশরী,
মিছে কেন ভাবি শ্যাম যে আমার, আমি সে শ্যামের কিশোরী,
মিছে কেন সখি আমি গরবিণী,
তারে ভাল বাসি তার প্রণয়িণী,
মিছে কেন সখি করি তারে দোষী যদিই সে যায় পাসরি,
মিছে কেন আশা 'রাধা' বলে বনে বাজিবে আবার বাঁশরী।

মিছে কেন সখি সংসার আর, মিছে কেন সহা যাতনা,
মিছে কেন আর বিফল প্রয়াস, মিছে কেন বল কামনা,
মিছে কেন বল আর না মরিব,
সে মরণে যদি কালারে পাইব,
মিছে নয় এই যমুনায় রব, পুনঃ ঘরে ফিরে যাব না,
মিছে কেন আর সংসার সখি, মিছে কেন সহা যাতনা।

পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাখু এইবারে বুঝিল, রাত্রির মত আর চারুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত তার বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার আলাপ-কুশলতার অভাবে তাহার কথায় চারু বিশেষরূপেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নহিলে বোধ হয় অত শীঘ্র সে ওরূপভাবে চলিয়া যাইত না। বোধ হয়, আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া তাহার সঙ্গে চারুর গল্প করিবার ইচ্ছা ছিল। তাহারও তো চারুকে শুনাইবার অনেক কথা বাকি রহিয়া গেল। অন্ততঃ যে একটা কথা না বলিতে পারিলে, শুধু সে রাত্রি কেন, ইহার পরেও কত রাত্রি তার অনিদ্রায় কাটিয়া যাইবে, সে কথা ত চারুকে শুনাইবার উপায় রহিল না! বলিবার অনেক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি রাখু তাহা বলিতে পারে নাই। বলিতে পারে নাই—চারুকে দেখিলেই তার স্ত্রী রাখীর মুখ তার মনে পড়ে। মনে পড়ে কেন, দুই মুখের এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য যে, এক একবার চারুকে দেখিলে তাকে রাখী বলিয়াই ভ্রম হয়। অবশ্য চারু রাখী নয়। চারুর ভাষায় যে লালিত্য তাহা রাখীর ভাষায় ছিল না, চারুর বর্ণটাও বুঝি রাখীর বর্ণ হইতে অনেক উজ্জ্বল। তার হাসির ঝঙ্কারের মিষ্টতা—রাখীর বাপের সমস্ত ক্ষেতের আখ নিংড়াইলেও বুঝি পাওয়া যাইবে না। আর সম্পদ? ক্ষুদ্র ভূস্বামীর কন্যা হইলেও রাখু তার যে অহঙ্কার দেখিয়াছে, চারুর সম্পদের অধিকারী হইলে রাখীর কি আর মাটীতে পা পড়িত? না রাখুই তার দশ হাত দূরেও দাঁড়াইতে পারিত? বিনয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ এই চারুর সঙ্গে সেই রূঢ়ভাষিণী পল্লীবাসিনীর কত প্রভেদ।

তথাপি—তথাপি চারুকে দেখিয়াই রাখুর মনে হইয়াছিল, যেন বহু বৎসর না দেখা এক কমল-কোরক হঠাৎ তার চোখের উপর শতদল সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চারু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই তাহাকে আবার দেখার সাধ অতি তীব্রভাবে যুবকের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু আর ত সে তাকে

থাকিতে পারে না। চারু আঁধারে ডুবিল, তার সঙ্গে রাখুর পুনঃ সাক্ষাতের আশাও বুঝি চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল।

ঘরের ভিতরে এক একবার ঝটিকা তরঙ্গ প্রবেশ করিতেছিল। ঘরের একটি কোণে থাকিয়াও আলোটা মাঝে মাঝে মৃত্যু-শিহরণে রাখুকে দ্বার বন্ধ করিতে মিনতি করিতেছিল। তথাপি সে বাতাসে বুক দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; গৃহ প্রবেশের সময় অন্ততঃ সে একবার চারুকে দেখিবে। দেখিবে, ঘরে ঢুকিবার মুখে সে একবার তাহার পানে চাহে কি না। ফিরিয়া চাওয়ার কোন মূল্য আছে কি না, সেটা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না। তাহার দাঁড়াইয়া থাকাতে তাহার মর্য্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এটাও সে ভাবিবার অবসর লইল না।

অন্ধকারে অন্ধকারে চলিয়া চারু তার ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিল। এতক্ষণ রাখু তাহাকে দেখিতে পায় পাই—এইবারে দেখিল। দেখিল—সে মুখ না ফিরাইয়াই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণের অপেক্ষায় যখন রাখু দেখিল, চারু দোরটা বন্ধ করিতেও আসিল না, এবং ঘরের নৃত্যশীল আলোক একটি বারের জন্যও তার ছায়ার একটু প্রান্ত পর্য্যন্তও নাচাইল না, তখন সে ফিরিয়া গালিচার উপরে বসিয়া আবার তামাক সেবনে নিযুক্ত হইল।

তামাক পুড়িয়া, আগুন নিবিয়া যখন নলটা গড়গড়ার ভিতর হইতে কেবল-মাত্র জলের বাষ্প বহিয়া তার কণ্ঠ শীতল করিতে আসিল, তখন আলোটা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল, সে কবাট বন্ধ করিতে ভুলিয়াছে।

অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল, কিন্তু কবাট বন্ধ করিতে যেমন সে আবার দোরটির কাছে আসিয়াছে, অমনি সে শুনিতে পাইল—সেই সন্ধ্যাকালের মত অদ্ভুত অপ্সরার গান ঝড়ের পৃষ্ঠে তালে তালে নৃত্য করিতেছে।

আর রাখুর কবাট বন্ধ করা হইল না। শুনিবার অত্যন্ত আগ্রহে চারুর ঘরের পানে চাহিয়া সেই অপূর্ব্ব সুরের রূপটাই যেন সে পান করিতে লাগিল। ঝড় সুরটাকে ভাঙ্গিয়া মোচড়াইয়া স্তবকে স্তবকে তাহার কানে উপহার দিতে-ছিল। অবকাশে অবকাশে সেই ভাঙ্গা সঙ্গীতের পুঞ্জীকৃত উচ্ছ্বাসে তাহার শ্রবণ লালসা তৃপ্ত না হইয়া এমন উছলিত হইল যে, রাখুর সেখানে স্থির-থাকা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু মর্য্যাদা বোধের সামান্য মাত্রও অভিমান যদি তার থাকে, তাহা হইলে, চারু বিদায় গ্রহণকালে যেরূপ সংযত ব্যবহার

তাঁহার প্রতি দেখাইয়াছে, তাহা দেখিবার পর এরূপ গভীর রাত্রিতে তার ঘরে প্রবেশ রাখুর কোনও মতে কর্ত্তব্য হয় না।

সে তখন মুগ্ধ চিত্তের প্রেরণায় দুই চারিবার ঘরের ভিতরেই চলাফেরা করিল। দুই একবার বসিল, আবার উঠিল, কিন্তু একটিবারও চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে ভরসা করিল না।

অবশেষে গানটা যখন তার নির্ম্মম মুখরতা একটা বিচিত্র গিটকিরী ভরা কলরবে মিশাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, রাখুও অমনি বন্ধ নিশ্বাস মুক্ত করিয়া অবশাঙ্গের মত গালিচার উপরে শুইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

১৩

আসল কথা—চারুর ঘরে আজ তার স্বামী অতিথি হইয়াছে। বারো বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই। দেখিবার প্রত্যাশা ত করেই নাই—রাখেও নাই। পথহারা দেবতার মত ঝড়ের পৃষ্ঠে চাপিয়া সে যে আজ তার অপবিত্র বিলাস মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, স্বপ্নের সাহায্যেও এ নারী যদি সে কথা ভাবিতে যায়, তাহা হইলে তাহার স্বপ্নটাও বুঝি পাগল হইয়া উঠে। অথচ জ্বলন্ত সত্যের আবির্ভাবের মত সেই ঘটনাই আজ ঘটিয়াছে।

নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সত্য সত্যই সে তার তখনকার বাবুর আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কোনও কারণে গৃহ-প্রবেশের উৎসব সেদিনকার মত স্থগিত থাকিলেও রাত্রিকালে তাহার বাবুর সঙ্গে তার দু'একজন বন্ধুর আগমনও সে যে প্রত্যাশা না করিয়াছিল এমন নয়। সে জন্য সে তাহাদের জলযোগের ব্যবস্থা ও সঙ্গীতাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেই সে দেখিল, হঠাৎ ঝড়টা প্রবল হইয়া তার আয়োজন পণ্ড করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি তার বিশ্বাস ছিল, আর কেহ না আসুক, সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া অন্ততঃ বাবু আসিবে। যেহেতু তার জানা ছিল, সে দিন সে বাড়ীতে এমন একটি ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোকও ছিল না যে, সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে চারুর সঙ্গী হইতে পারে।

ঝির মুখে তাঁর বাবুর অবস্থানের কথা শুনিয়া লীলাবিলাসের এ একটা নূতন ভাব বুঝিয়া চারু তাহাকে ধরিতে আসিল। আসিয়া দেখিল, ঝি অন্ধকারে লোক ভুল করিয়াছে। অন্ধকারে যে দাঁড়াইয়া আছে, সে বাবু নয়—বাবুর একজন ইয়ার। বাবু আসে নাই জানিয়া, পথের পানে চাহিয়া সে তার

আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। রসিকতার অজস্বরূপ 'বাবু'র বিলাস-গৃহের সহচরেরা কখন কখন তার প্রণয়িনীর পদ-প্রহারে চরিতার্থ হইয়া থাকে। চারুও সেইভাবে তাহাকে কৃতার্থ করিতে গিয়াছিল। তাহার পায়ে সুকোমল মখমলের জুতা ছিল। সে 'ইয়ার'কে প্রহার করিবার ছলে মখমল দিয়া রাখুর জানুর পিছনে ধীরে আঘাত করিল। করিয়াই বুঝিল, সেও ঝিয়ের মতই ভুল করিয়াছে। ভুলের পরিমাণটা বুঝিতে গিয়া সে বিস্ময়-বিমোহে চাহিয়া দেখিল, তাহার জীবন-সৌধের সমস্ত প্রাচীর কোন এক ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাথা স্থির রাখা তখন তার অসম্ভব হইয়া পড়িল, সে দেয়ালের সাহায্যে ভগ্ন স্তূপের ভিতর হইতে আপনাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিল। এখন তার প্রাণটা অস্তিত্বের লোভে ঝড়ের বাতাসকে পর্য্যন্ত আঁকড়িয়া ধরিয়াছে।

বারো বৎসর পূর্ব্বে সে কুলত্যাগ করিয়াছিল। সে ত্যাগের ইতিহাস আমাদের এ আখ্যায়িকার পক্ষে একান্ত অবান্তর না হইলেও সে কথার উল্লেখ করিতে আমরা নিরস্ত হইব। তবে এ কথা আমরা বলিতে পারি, চারুর গৃহত্যাগে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণের অল্পবিস্তর দোষ থাকিলেও রাখু সে সম্বন্ধে একেবারেই নিরপরাধ ছিল।

চারুর পিত্রালয় ছিল বর্দ্ধমান জেলায় দামোদরের তীরস্থ একটি গ্রামে, রাখুদের বাড়ী হইতে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে।

যখন তাহাদের বিবাহ হয়, তখন রাখুর বয়স ছিল এগারো, চারুর দশ। রাখু কুলীন, এইজন্য চারুর বাপ এই অল্প বয়স্ক বালককে একরূপ কিনিয়া আনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল।

তাহার পূর্ব্ব নাম ছিল রাখহরি। মায়ের তিন চারিটি সন্তান নষ্ট হইবার পরে সে জন্মিয়াছিল বলিয়া ঐ নাম সে মায়ের কাছে পাইয়াছিল। মা-বাপের মৃত্যুর পর যখন সে তার মামার অভিভাবকত্বের আশ্রয় পাইল, তখন তার বয়স সাত। মামা অভিভাবক হইলেও নির্ম্মম মামীর কাছে পড়িয়া এই হতভাগ্য বালক অতি অনাদরেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তার প্রতি তার মামীর ব্যবহার প্রতিবেশীদের চক্ষে সময়ে সময়ে এমনি কঠোর বোধ হইত যে অনেকেরই মনে হইয়াছিল, সেই অল্প বয়সে রাখু শ্বশুরের আশ্রয় না পাইলে তাহাকে সত্বর কোনও নিরুদ্দেশের পথে পলায়ন করিতে হইত।

শ্বশুরের ঘরে আসিয়া রাখু দিন কয়েক বেশ সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিল।

কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে, বছর দুই শ্বশুরের গৃহে বাস করিতেই তার শ্বশুর মরিল এবং সেও বিষম ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইল। রোগ রহিল তিন বৎসর। এই তিন বৎসর ক্রমাগত জ্বরের উপর জ্বর রাখুর শরীর একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিল।

এই কয় বৎসরের ভিতর কিন্তু বালিকার দেহ যৌবনের সমস্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, আর বালক রাখু প্লীহা ও যকৃতের আত্যন্তিক বৃদ্ধিতে রক্তশূন্য দেহে হ্রস্ব হইতে হ্রস্বতর হইয়া ক্রমে একটি পুঁটুলির আকার ধারণ করিয়াছে।

চারুর পূর্ব্ব নাম ছিল রাখী, তাহার স্বামীর নামেরই অনুরূপ। নামটা বোধ হয় রক্ষাময়ী কিম্বা ঐরূপ কোন একটা নামের অপভ্রংশ। সেও বোধ হয় তার মায়ের অনেকগুলা মরা সন্তানের পর জন্মিয়াছিল। তার একমাত্র ভাই, তা হইতে বয়সে অনেক বড় ছিল। সেইজন্য বাপ মা তাহাকে শিশুকাল হইতে এতই আদরিণী করিয়া তুলিয়াছিল যে, বাল্যকাল হইতেই, তার ব্যবহারের অসংযম দেখিলেও, কেহ তাহাকে শাসন করিতে মনোযোগী হয় নাই। এই অন্যায় রকমের প্রশ্রয় পাওয়াই শেষে মেয়েটার সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন এই হতভাগা বালক শ্বশুর বাড়ীর সকলেরই একরূপ বিরক্তিভাজন হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ হইল রাখীর— যৌবনের নবোচ্ছ্বাসে অদম্য লালসার প্রেরণায় স্বামী নামের অযোগ্য এই বালকটাকে আর সে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না।

যখন ডাক্তার কবিরাজের মতে রাখুর বাঁচিবার আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না, তখন তার ভাই বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে তাহাকে তার মামার গৃহে রাখিয়া আসাই স্থির করিল।

শ্বশুরের দেশে আসিবার পর রাখু দুইবার মাত্র নিজের বাড়ীতে ফিরিয়াছিল। তাহার মধ্যে একবার মামার গৃহে একটা কার্য্যোপলক্ষে সে রাখীকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। আসিয়া কিন্তু একমাসের মধ্যে মামী-শাশুড়ীর আচরণ বালিকার এমনই তীব্র বোধ হইয়াছিল যে, সে এক মাসের অধিক শ্বশুর-গৃহে তিষ্ঠিতে পারে নাই। রাখুর সঙ্গে কন্যাকে পাঠানো সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইলেও কন্যার প্রতি একান্ত মমতায় তার মা সে অভিভাবকহীনের সংসারে তাহাকে আর পাঠাইতে সাহসী হইল না।

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস—রাখু এখন মরে ত তখন মরে করিয়াও মরিল না। মরিল—রাখীর মা ও বাপ।

ইহারই কিছুকালের পরে রাখুর মাতুলের কাছে সংবাদ আসিল, 'রাখুর কল্যাণের জন্ত কালীঘাটে 'মানত' করিতে গিয়া তাহার পত্নী আদিগঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে।

তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিল, তাহার এক দূর সম্পর্কিয়া মাসী। মাসী কলিকাতায় কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে রাঁধুনী বৃত্তি করিত। তাহার চরিত্র ভাল ছিল না। সংসারে নানাবিধ পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অসংযত চিত্তের প্রেরণায় যখন বালিকা বাপের বাড়ীতে অবস্থানে জ্বালা বোধ করিতেছিল সেই সময় মাসী তাহাকে প্ররোচনায় ও প্রলোভনে কুলের বাহির করিল। কলিকাতায় মাসীর আয়ত্তে আসিয়া অভাগিনী এই আত্মনাশের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। চরিত্রের সঙ্গে সে পূর্ব্ব নাম বিসর্জ্জন দিল।

এখন সে সহরে গায়িকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গানের ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট অর্থাগম। বিলাসী সম্প্রদায়ে তার এমন প্রতিষ্ঠা যে, বহু ধনী যুবক তার কৃপালাভ করিতে পারিলে আপনাদের কৃতকৃতার্থ মনে করে। দু'চার জনের সর্ব্বস্ব ইতিমধ্যে তার পাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কলিকাতায় দু' চারখানা ভাল ভাল বাড়ীর সে 'বাড়ীওয়ালী'। এ বাড়ীখানি সে নিজের ব্যবহারের জন্ত করিয়াছে। আজ গৃহ-প্রবেশের দিনে এ বাড়ীতে খুবই ধুমধাম হইত। কেবল মাসী নাই বলিয়া সে শুধু নামমাত্র পূজা সারিয়া গৃহ-প্রবেশ করিয়াছে। মাসীর ইচ্ছা, বাড়ীখানি চারু তাহার নামে করিয়া দেয়। চারু সেটি করে নাই বলিয়া রাগ করিয়া সে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের রথ দেখিতে গিয়াছে। চারুকে এই হীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিয়া মাসীর কম লাভ হয় নাই। আর তাহাকে রাঁধুনীর কাজ করিতে হয় না। চারু যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার অনেকাংশই সে আত্মসাৎ করিত। তথাপি তার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। কেন মিটিবে? তা হ'তেইতো চারুর এমনভাবে অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। রাখুর কাছে থাকিলে তার এতদিনে দু'বেলা দু'মুঠা অন্ন জোটাই ভার হইত। একমাত্র সেই ত চারুকে এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই সমস্ত কথা কহিয়া যখন-তখন সে চারুর নিকট টাকাকড়ির দাবী করিত। মাসীর ভাই-পো'ও মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া চারুর নিকট হইতে টাকাকড়ি জিনিষপত্র লইয়া যাইত।

অল্পদিন হইল চারুর ভাই আবার গোপনে গোপনে তাহার নিকট যাতায়াত করিতেছে। এই গোপন-যাতায়াতের ফলে, তাহার দশ পোনেরো বিঘা

নূতন নূতন জমি হইয়াছে, স্ত্রীর গায়ে এমন ভাল ভাল ছ' চারখানা অলঙ্কার হইয়াছে যে, সেদেশের লোক সেরূপ অলঙ্কার দেখা দূরে থাক, সেগুলার নাম পর্য্যন্ত কাণে শুনে নাই। এই সবে সেদিন চারু ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়নের প্রায় সমস্ত খরচটাই দিয়াছে। এ সবগুলা দেখা এখন আর মাসীর একেবারেই সহ্য হইতেছিল না। তাহার উপর চারু পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতির পর বাড়ীখানা তার নামে না করা তার ভাইয়েরই পরামর্শে হইয়াছে বুঝিয়া রাগ করিয়া সে গৃহপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তীর্থ-দর্শনের ছলে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু এই দীর্ঘকালের ভিতরে একদিনের জন্যও চারু কাহারও কাছে তাহার পরিত্যক্ত স্বামীর সন্ধান পায় নাই। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার পাপ-ব্যবসায়ের ফললোভী আত্মীয়গুলিকে তাহার কথা দুই একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কেহই কিছু বলিতে পারে নাই অথবা জানিয়াও তাহাকে বলে নাই। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে চারুর কোনও সংশয় ছিল না। বিশেষতঃ তাহার মাতুল-পত্নীর কৃপায় জীবনের দিন ক'টা আরও যে সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এটাও তার বুঝিতে বাকী ছিল না। তথাপি তার অন্তর হইতে একটা সংক্ষুব্ধ সংশয় মাঝে মাঝে সে-যুগের সেই রোগ-জীর্ণ বালকটার কথা জানিবার জন্য তাহাকে উত্তেজিত করিত।

এত ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মাঝেও একএকবার তার কথা চারুর মনে পড়িত। এক একদিন এমন পড়িত যে, সে মরিয়াছে স্থির বুঝিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। প্রণয়প্রার্থী যুবকগুলার কারুণ্যপূর্ণ মুখচোখের পার্শ্ব দিয়া এক একদিন তার ছায়া-মূর্ত্তি উঁকি দিয়া চলিয়া যাইত। মনের খেয়াল জানিয়াও সে শরীর-শিহরণ রোধ করিতে পারিত না। বড় বড় মজলিসে তার গানে আবদ্ধ শ্রোতৃবর্গের অজস্র উচ্চ প্রশংসাধ্বনী ভেদ করিয়া রাখুর ব্যাধি-নিপীড়িত কঠোর ক্ষীণ ধ্বনি কতবার তার কর্ণে আঘাত করিয়াছে।

তবু সে স্থির বুঝিত, সে মরিয়াছে। অথবা যদিও অসম্ভব হয়, যদি রাখু কোনও দৈব ঘটনায় মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে এতদিনে সে আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। যদিও সে না ভুলে—তাহার তখন অপ্রীতিকর হইলেও তৎপ্রতি সেই রুগ্ন বালকের একটা ব্যাকুল মমতা স্মরণে সে বুঝিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে মন থেকে একেবারে মুছিয়া ফেলা রাখুর পক্ষে অসম্ভব। সত্যই যদি সে তাহাকে ভুলিতে না পারে তাহা হইলেও এ জীবনে চারুর সঙ্গে তার পুনঃ সাক্ষাতের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

সেই স্বামী সত্য সত্যই বাছিয়া বাছিয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিনেই তার ঘরে অতিথি হইয়াছে। আর আতিথ্যের দক্ষিণাস্বরূপ আগেই তাহাকে দিয়া তার সেবাব্রত সম্পূর্ণ করিয়াছে।

(১৪)

স্বাখুকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া খাবার পাত্র হাতে ধরিয়া চারু তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। প্রথম বার মনের যে ভাব লইয়া সে ঘরে ঢুকিয়াছিল, এখন তার আর সে ভাব নাই।

প্রথমে বিস্ময়ে, লজ্জায়, সহসা প্রজ্বলিত অনুতাপে আপনাকে সে স্থির রাখিতে পারে নাই। স্বামীর সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিকে এমনই উগ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তার জন্য সে যেন সারা পৃথিবীর কোনও স্থানে একটু সুস্থিরভাবে দাঁড়াইবার স্থান দেখিতে পাইতেছিল না। সর্ব্বদেহের রক্তবিন্দু-গুলাও যেন সেই আক্রমণে ভীত হইয়া রুদ্ধ ধমনী-পথে পলাইবার স্থান না পাইয়া এক একবার সমবেত প্রবাহে তার বুকের দিকে ছুটিতেছিল।

স্বামীকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরের দণ্ডস্পর্শে যেন এক পলকে তার ঘৃণিত আচরণগুলা অগণ্য তিরস্কারকারী কথা লইয়া সহস্র পাপ-চিত্রের যবনিকা তার চোখের উপর মুক্ত করিয়াছে। সে যাতনা চারু সহিতে না পারিয়া ঘরে আসিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কাঁদিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। অশ্রুবিন্দুগুলা চোখের কোণে সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই এক একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নিরবয়ব হইয়া অগ্নিভরা ঘরের বায়ুতে মিশিয়া যাইতেছিল।

তার পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া সে এমন স্থানে আপনাকে বসাইতে পারিতেছে না, যেখান হইতে সে কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি নামাইয়া তার স্বামীরদিকে নিরীক্ষণ করে। সে দেখিল, স্বামীর দারিদ্র্যতার সম্পদ ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। ধর্ম্মপথে যার সঙ্গিনী হইবার একমাত্র তারই অধিকার ছিল, আজ সে কি না তার দত্ত গঙ্গাজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। সত্য সত্যই তখন চারু আপনাকে প্রবোধ দিবার একটাও কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। স্বামীর রূপটাকে উপলক্ষ করিয়াও যে আপনাকে একটা সান্ত্বনা দিবে, হা ভগবান, তারও উপায় তুমি কিছুই রাখ নাই! চারু দেখিল, তার কৃপা-ভিক্ষার্থী, চোখে কাতরতা মাখানো, কথায়

নারীর ভাষা জড়ানো, পুরুষনামধারী মেয়েগুলার মাঝখানে যদি একবার তার স্বামীকে সে বসাইতে পারিত, তাহা হইলে রাখুর সে পুরুষোচিত মূর্তি জলাশয়ে একমাত্র প্রস্ফুটিত পদ্মের শ্রীতে দীপ্যমান হইত। আপনাকে হারাইয়া তাই চারু মেঝেয় মুখ ঢাকিয়া, অন্ধকারের ভিতর হইতে নিজেকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এবারে কিন্তু ভাব তার অন্যরূপ। স্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়া এবারে সে উল্লাস বিষাদে, আশা নিরাশার বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। উল্লাস—স্বামী তার স্নেহের উপহার অতি আদরে গ্রহণ করিয়াছে। বিষাদ—হতভাগী রাখীর এ সৌভাগ্য একদিনের জন্যও ঘটে নাই। আশা—স্বামীর সহিত আলাপে তার মন বলিতেছে, সে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। নিরাশা—যদিই সে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও সমাজের মধ্যে স্বামীর পাশে বসিয়া পরিণীতা ভার্যার পবিত্র অধিকার এ জন্মে আর সে লাভ করিতে পারিবে না, রক্ষিতা বারাঙ্গনার মত, শুধু তার ভোগের সামগ্রী হইয়া থাকিবে মাত্র। এই আশা নিরাশার মধ্যে পড়িয়াও রাখুকে সে ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই চারু সঙ্কল্প করিল, নিজের দোষে হারাইয়াও, শুধু দেবতার আশীর্বাদে অভাবনীয় রূপে যাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, তাহাকে যে কোন উপায়ে আবার আপনার করিয়া লইব। ঘরে আসিয়াই প্রথমে সে স্বামী প্রাপ্তির কামনা করিয়া ভক্তিভরে তার প্রসাদ গ্রহণ করিল। তারপর স্বামীকে ধরিবার উপায় স্থির করিতে বসিয়া গেল।

সে একবার আপনার বিভবের দিকে চাহিল। ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, এই সমস্ত দিয়াই সে রাখুকে প্রলুব্ধ করিবার কামনা করিল। কিন্তু চারু দেখিতে পাইল, তার সমস্ত সম্পদ তার স্বামীর পায়ে অঞ্জলি হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছে, আর সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যদি এই ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইয়াও তার পাপ-উপার্জ্জন লইতে সম্মত না হয়? দুই একবার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য স্বামীকে তাহার ঘরে আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আনিবার কল্পনাতেই এই ঐশ্বর্য্যলাভের উপায়গুলা এমন মলিন মূর্তি ধরিয়া তাহার চোখের উপর নৃত্য করিতে লাগিল যে, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরজ জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহাকেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইল।

তবে—চারুর মন এবারে তাহাকে বেশ আশ্বাস দিতেছে—স্বামী ধরিবার নাগপাশ তাহার কণ্ঠদেশে বিধাতা জড়াইয়া রাখিয়াছে। রাখুর কথায় চারু বেশ বুঝিয়াছে, সে গান বাজনায় বিলক্ষণ পটু। তবে গানের চেয়ে বাজনাতেই তার দক্ষতা অধিক। সে যতই বিনয় দেখাইয়া বলুক না কেন, বুঝি তার মত 'বাজিয়ে' এই কলিকাতা সহরেই অতি অল্প আছে।

চারু উপায়টার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিল। খাবার পাত্রগুলা প্রথমে সে বারান্দায় রাখিতে গেল। গিয়া দেখিল, স্বামী এখনও দোর খুলিয়া রাখিয়াছে। উঁকি দিয়া দেখিল, সে গালিচায় বসিয়া হেঁট মাথায় এখনও তামাক টানিতেছে।

সে ফিরিল, পাছে ঝড়ের বাধায় তার কার্য্য সিদ্ধ না হয়,—দোরটা খুলিয়া রাখিল। এইবারে বিনা সুর যোগে দোরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই সে একটা গান ধরিল। দেখিল—স্বামী গালিচা ছাড়িয়া দোরের কাছে দাঁড়াইয়াছে।

দেখামাত্র তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বারাঙ্গনা কত যে হতভাগ্যের বক্ষ সামান্য অপাঙ্গভঙ্গে ভাঙ্গিবার মত করিয়াছে, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু নিজে এই এতকালের মধ্যে কাহাকেও দেখিয়া এরূপভাবে বক্ষের স্পন্দন অনুভব করে নাই। সে তাহাদের লইয়া যাদুকরীর ইঙ্গিত সাহায্যে খেলা করিত মাত্র। আজ নিজে সে খেলার পুতলী হইয়াছে। এ স্পন্দন সে সহ্য করিতে অসমর্থ হইল—তাহার দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। গান সুর-লয়-হারা হইবার উপক্রম করিল। কোনও প্রকারে বুকটা চাপিয়া গানটাকে কোনও রকমে সে শেষ করিল। শেষ করিতেই সে দেখিল, রাখু দোর ছাড়িয়া আবার গালিচায় শয়ন করিয়াছে।

এবারে সে ঘরের অপর পার্শ্বে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। আয়নাটি যেমন বড়, তেমনি উজ্জ্বল, তাহাতে সমস্ত দেহটা সমান দৈর্ঘ্যে পরিস্ফুটরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। সেইখানে দাঁড়াইয়া আপনাকে সে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। এতক্ষণ আপনার নূতন বেশে নূতন মূর্ত্তি দেখিবার অবসর পায় নাই। বেশের পরিবর্ত্তনে তার শ্রীর কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া সে হাসি রাখিতে পারিল না। সে তখন প্রতিবিম্বটাকে তিরস্কার ছলে বলিতে লাগিল—"বা! বেশ তো কুলের বউটি সেজেছিস পোড়ামুখী! কিন্তু সেজেই বা তুই করলি কি! সে তো কই তোকে চিনতে পারলে না! সে পুরুষ মানুষ—এই বারো বৎসরে তার শ্রী বদ্‌লে' সে যেন এক নতুন মানুষে

গড়ে' উঠেছে, তবু তুই তাকে দেখামাত্র চিন্‌লি, কিন্তু সেত তোকে চিন্‌তে পারলে না।"

হৃদয়ের যে বিশেষত্বটুকু লইয়া নারীর নারীত্ব, শত অকার্য্যের প্রলেপেও সেটিকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। স্বামীর উপর অসংখ্য অত্যাচারে তার মনে যে তীব্র অনুশোচনা জাগিয়াছে, তাহার ভিতরেও, স্বামী সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, সে জন্য চারুর মনে তীব্র অভিমান জ্বলিয়া উঠিল। যদিও সে বুঝিয়াছে, রাখুর তাহাকে না চেনা ভালই হইয়াছে, তথাপি সে অভিমান ত্যাগ করিতে পারিল না। সে স্বামীকে চিনিল, স্বামী তাহাকে চিনিল না কেন? ভালবাসার চক্ষে সে যদি রাখীকে একদিনের তরেও দেখিত, তাহা হইলে কখনই সে এমন ভুল করিতে পারিত না। প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি রাখীকে চারু গোটাকতক টিট্‌কারী দিল। তথাপি তাহাকে বাঁধিতে হইবে। এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও এই বিষম ঝড়ে সে আপনাকে সর্ব্বপ্রথম নিরাশ্রয় মনে করিল। যার আশ্রয়ে আজকাল সে ছিল, সে কাপুরুষ ঝড়ের ভয়ে জ্বরের অছিলা করিল তার কাছে আসিতে পারিল না। লোকের ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে চোরগুলার পক্ষে আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভদিন। তারা যদি আজ তার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইত? অভাগিনীদের চোরের হাতে এরূপ মৃত্যুর কথা সে যে না জানিত এমন নহে। সে দেখিল, শাস্ত্রের আদেশে ধর্ম্মতঃ যে তাকে রক্ষা করিবার অধিকারী, তাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে দেবতার নির্দ্দেশে সে যেন তাকে আজ রক্ষা করিতে আসিয়াছে। আর চারু কোনও মতে তাহাকে ছাড়িতে পারে না। যদি ধরিতে না পারে, এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে বসাইয়া সে গঙ্গায় ডুব দিয়া মরিবে।

রাখুকে বাঁধিতে চারু কোমর বাঁধিল। প্রতিবিম্বকে সম্বোধন করিয়া সে বলিয়া উঠিল—"রাখী, ও রকম হাতছাড়া স্বামীকে বশে আনা, তোর মত লজ্জাশীলা কুলবধূর কর্ম্ম নয়। যদি পারে, ও সে এই লোক-মজানো চারী। সে তখন যথা সম্ভব সত্বর সেই অবস্থাতেই এক রূপ বেশ-বিন্যাস করিয়া লইল। মাথার চুলগুলা সে এলোমেলো করিয়াছিল, সেগুলাকে সে বুকে পিঠে ফেলিয়া এক রকম মনোহর করিয়া তুলিল। ইঙ্গিত, কটাক্ষ, মুখের হাসি সে কার্য্যোপ-যোগী করিয়া,—যে সমস্ত হাবভাবে সে লোক ভুলায়,—তার একটা অব-লম্বনে অরণ্যানের সুর সংযোগে এবারে গাহিতে চলিল।

অরগ্যানের পার্শ্বেই সেই দাঁড়া-আয়না। গাহিবার সময়ে হাবভাবগুলা ঠিক রাখিবার জন্ত সেটাকে সে ইচ্ছাপূর্ব্বকই সেইখানে রাখিয়াছিল। চারু গাহিতেছে—এক একবার আয়নার দিকে মুখ ফিরাইতেছে, এক একবার যেন অন্তমনস্কের মত দোরের দিকে চাহিতেছে। দু'চার বার দেখিয়া যখন বুঝিল, রাখু সেখানে আসে নাই, তখন গানটা কোনও রকমে শেষ করিয়া যখন আর একবার সে আয়নার পানে চাহিল, তখন দেখিল—রাখুর প্রতিমূর্ত্তি তাহার মূর্ত্তির বহু পশ্চাতে নিশ্চল প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই বুঝিল, রাখু দোরের পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের সাহায্য লইয়া লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছে। সে এইবারে জয়ের সন্নিকটে আসিয়াছে বুঝিয়া সেই প্রতিবিম্বের চোখে একটা মিষ্ট তীব্র কটাক্ষ হানিয়া মাথাটা ঈষৎ ঘুরাইয়া চুলগুলা তার একরূপ নূতনভাবে পিঠে বুকে সাজাইয়া লইল। কিন্তু সে রাখুকে দেখিতে মুখ ফিরাইল না। যেন সেখানে আর কেহ নাই, এরূপ-ভাবে প্রতিবিম্বকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"দূর ছাই, ঘুম তো হবেই না, তখন এস না গা, দু'জনে মুখোমুখী বসে গান গেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই।"

সত্য সত্যই রাখু চারুর ঘরের বারান্দায় আসিয়া সসঙ্কোচে লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছিল। প্রথম গানের সময় সে কোনও রূপে জোর করিয়া আপনাকে ঘরের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় বারে যখন চারু সুরের সঙ্গে গান ধরিয়াছে, তখন আর সেই আকর্ষণে তার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা রহিল না।

এবারে সে গায়িকার সুর-লয়-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইল। সঙ্গতের সঙ্গে হইলে এ গান আরও না জানি কত মধুর হইতে পারে। সঙ্গতহীন গান—সে তো রাগ-রাগিণীর অঙ্গচ্ছেদ। চারু গাহিতেছে শুধু তাহাকে শুনাইবার জন্ত। কিন্তু এরূপ কার্য্য করিতে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতজ্ঞা নারী মর্ম্মে কতই না বেদনা অনুভব করিতেছে। তাহার এমন গানে বাজাইবার লোক নাই! অথচ একটু আগে সে চারুর কাছে বাজনা জানার পরিচয় দিয়াছে। এই সমস্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল, এবারে চারু গান ধরিলে সে বিনা সঙ্গতে তাকে আর গাহিতে দিবে না। বিশেষতঃ প্রথমবার যে বস্তুটাকে দেখিয়া সে একটা বড় রকমের বিচিত্র সিন্দুক মনে করিয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ব্ব তেজে সুর বাহির হইতে দেখিয়া সে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছে যে, সেইটার সঙ্গে নিজের গলাটা মিলাইবার লোভও সে যেন কিছুতেই সম্বরণ করিতে

পারিতেছে না। যা থাকে ভাগ্যে চারুর অনুমতি লইয়া সে তার ঘরে প্রবেশ করিবে।

সে কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় চারুর প্রতিবিম্ব অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে তাহার চোখ দুটাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। লজ্জায় সে দৃষ্টি তার চোখের উপর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মুখ ফিরাইতে গিয়াই সে চারুর আবাহন কথা শুনিতে পাইল। চারু যথাসম্ভব উচ্চ কণ্ঠেই কথাগুলা বলিয়াছিল, তথাপি বাতাসের শব্দ তার অর্দ্ধেকটা গ্রাস করিয়া ফেলিল। শেষাংশটুকু শুনিবামাত্র এমন সে শিহরিয়া উঠিল যে, কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে দোর ধরিয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু সেই সঙ্গেই সে বুঝিতে পারিল, চারুকে সে দেখে নাই, তার প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিয়াছে। দোর ধরিতে গিয়া আয়নার ভিতরে চারুর প্রতিমূর্ত্তি হইতে দূরে অবস্থিত নিজের প্রতিবিম্বটাকেও সে দেখিতে পাইল।

এইবারে লজ্জা, বিষম লজ্জা—লুকাইয়া চারুর গান শুনিতে আসিয়া সে তো তবে তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। 'এসো' বলিতে সাহস করিয়াছে। প্রীতিময়ীর এই বড় আদরের আহ্বান শুনিয়াও সে যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয় চারুর কাছে চোর হইতে হইবে। দূর ছাই, আমারও যখন ঘুম হইবে না, তখন চারুর কাছে বসিয়াই রাতটা কোনও রকমে কাটাইয়া দিই। সেই অপূর্ব্বসুন্দরীর পরমাত্মীয়তার আকর্ষণের কাছে ব্রাহ্মণ যুবকের নৈষ্ঠিকতা পরাভূত হইল।

(১৩)

ঘরে প্রবেশ করিতেই রাখু দেখিল, চারু শ্রান্তি দূর করিতে তাকিয়ায় বাহু-মূল রাখিয়া, করপত্রে মাথা দিয়া, মদালস-দৃষ্টি উপরে তুলিয়া, ঈষদুন্মুক্ত ঊর্দ্ধদেহে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যেন পটে আঁকা একখানি ছবির মত পড়িয়া রহিয়াছে।

শশব্যস্ততার ভাণ দেখাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্য নগ্নতাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া অঞ্চলে দেহ আচ্ছাদিত করিতে করিতে চারু উঠিয়া বসিল।

রাখু চক্ষু মুদিল। দোরের দিক হইতে ঝড়ের একটা বহস্য হুহু করিয়া তার বুকের ভিতর ঢুকিয়া চোখ কান দিয়া অগ্নিরূপে বাহির হইতে বলিয়া উঠিল—"রাখু, তুই মরিতে আসিয়াছিস।" রাখু অন্তর হইতে উত্তর দিল—"নারায়ণ, নারায়ণ।"

চোখ মেলিয়া রাখু দেখিল, চোখ ছুটাকে আরও যেন বিলোল করিয়া সেই ঘরের কোথায় লুকানো কাহাকে দেখিতে নিশ্চল প্রতিমা বসিয়া আছে। সুতরাং রাখুকেই আগে কথা কহিতে হইল—

"ওগো, তোমার গান শুনতে এসেছি।"

"আসুন, আসুন—আমার কি এমন ভাগ্য হবে।"—বলিয়াই চারু রাখুকে আবাহন করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ও ঘরে দাঁড়িয়ে তোমার গান শোনবার চেষ্টা করেছিলুম। শুনতে পেলুম না বলে' তোমার দোরে এসেছিলুম, কিন্তু আসতে আসতেই গান শেষ হ'য়ে গেল। শুনে সাধ মিটলো না, তাই ঘরে এসেছি।"

"বেশ করেছেন।"

—বলিয়াই সে অরগ্যানের অন্তরাল হইতে একখানা আসন ক্ষিপ্রতার সহিত লইয়া আসিল এবং সেখানাকে সোফার উপর পাতিয়া রাখুকে বসিতে অনুরোধ করিল। রাখু না বসিয়া বলিল—

"এসে কি অন্যায় করলুম চারু?"

"না না এত আপনারই ঘর।"

"তোমার গানে আমার একটু সঙ্গত করতে ইচ্ছা হ'য়েছে।"

"বল কি গো, তা হ'লে যে আমি স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পাই।"

"তবু তোমার কাছে আসতে আমার ভয় হচ্ছিল—চারু, আমি বড় গরীব।"

"আমি তোমার চেয়েও গরীব।"

—বলিয়া, অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া রাখুকে হাত ধরিয়া আসনের উপর বসাইল।

এইবারে চারু যেন নিশ্চিন্ত হইয়া আল্‌গা চুলগুলাকে একটা কুণ্ডলিত ফণীর আকারের খুপি করিল এবং মুকুটের ভাবে সেটাকে মাথার উপর বসাইল। সম্মুখে অবস্থিত রাখুর দিকে এখন তার দৃষ্টি নাই, রাখুর পশ্চাতে আয়নার দিকে চাহিয়া সে কেশের এক অভিনব বিন্যাসে আপনাকে একটু উগ্র সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে লাগিল। সাজিতে সাজিতে সে দেখিল, রাখুর প্রতিবিম্ব এক একবার মাথা তুলিতেছে, আবার নামাইতেছে। ছায়ার পশ্চাৎ দিকটা মাত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, কিন্তু তাহাতেই স্বামীর দৃষ্টিকে সে যে তার মুখ-সৌন্দর্য্যের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইয়াছে, এটা সে বিলাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না।

এইবারে সে দোরের কাছে গিয়া, মুখ বাহির করিয়া সন্তর্পণে কত কি যেন দেখিয়া লইল। তারপর—অন্ধকারের ঈর্ষা-কৃশা অপ্সরাগুলা এই বিলাস-গৃহে দৃষ্টি দিয়া, পাছে রাখুর সহিত তাহার চিরপরিচিত পল্লীর এই অপূর্ব্ব বাসরসজ্জা উত্তপ্ত করিয়া দেয়, তাই যেন সে নিঃশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া, নিঃশব্দে তাহাতে খিল দিল।

রাখুর বক্ষে এক একটা মধুর আন্দোলন ক্রীড়া করিতেছিল, মস্তিষ্কটাও অবসন্নের মত হইতেছিল। চারুর মুগ্ধ লাস্য তার চক্ষুকে দৃষ্টিহারা করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি সে যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহার গতিবিধি দেখিতেছিল। এইবারে একটু গোল বাধিল চারু এখন সন্তর্পণে যেন কাহাকে লুকাইয়া দোর কেন বন্ধ করিতেছে, সে বুঝি বুঝি করিয়াও যেন বুঝিতে পারিল না, সলজ্জ ওষ্ঠাধরে বিলীনবৎ কথা বিপুল প্রয়াসে বাহির করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—

"দোর দিলে কেন চারু?"

"কেন বল দেখি?"

"আমি কেমন করে' বলব?"

"আমিই বা কেমন করে' বলব?"

—বলিয়াই চারু হাসিয়া উঠিল। রাখু আর কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া সে আবার বলিল—

"তোমার কি ভয় হচ্ছে?"

"ভয় হবে কেন চারু, আমার মনে হচ্ছে, আমি নিজের ঘরেই এসেছি।"

"আমার মন-ভুলানো কথা বলছ, না সত্যি বলছ?"

—বলিয়াই উত্তরটা দূর হইতে শোনা তৃপ্তিকর হইবে না বুঝিয়া, সে সোফার নীচে রাখুর পাদমূলে আসিয়া বসিল।

রাখু কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। বাস্তবিক কথাটার জ্ঞান না করিয়াই সে চারুর পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল।—গিয়াছিল তাহাকে একটু আত্মীয়তা দেখাইবার জন্ম। চারু নিজেই যে একটু পূর্ব্বে সে ঘরটা তার বলিয়া তাহাকে আত্মীয়তা দেখাইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ কথাটার অর্থ তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। একটি নব-পরিচিতা নারী, তাহাকে দেখিবা মাত্র, এমন আশ্চর্য্য করা আত্মীয়তায়, গল্পে-পড়া প্রণয়-কথার মত তাহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছে যে, তার প্রভাবে সে আপনার অবস্থার কথা পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্ম বিস্মৃত হইয়াছে।

চারুর দ্বিতীয় প্রশ্নে তার চমক ভাঙ্গিল। অতি সন্তর্পণে কপাট বন্ধ করার পর তার প্রশ্নটার সরল অর্থ রাখু গ্রহণ করিতে পারিল না। কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া সে কেবল চারুর মুখের পানে চাহিল।

যুবতী ঊর্দ্ধমুখী- উত্তরের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় নয়ন ভরিয়া তাহাকে দেখি-তেছে। মাথার কেশ-শীর্ষ রাখুর উদাস দৃষ্টির তলে মন্ত্র-মুগ্ধ ফণীর মত যেন ফণা তুলিয়াই নিশ্চল হইয়াছে।

দেখিবা মাত্র রাখুর মন আবার দেশ-দেশান্তরে ছুটিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া, এ সৌন্দর্য্যের উপমা খুঁজিতে অতীতের এক মাধুর্য্য-মণ্ডিত বিস্মৃতির কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দৃষ্টি তার মাতালের মত, বোধশক্তি হারাইয়া চারুর মুখখানির উপর যেন অবশভাবে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

দেখিয়াই চারু শিহরিল। রাখুর এরূপ অর্থশূন্য দৃষ্টির কারণ বুঝিতে তার বাকি রহিল না। ধীরে চরণ স্পর্শে তাহার চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সে বলিল—

"বাঁয়া তবলা আনি?"

রাখু বলিল—

"আন।"

বাঁয়া-তবলা ও একটা হাতুড়ি সোফার উপর রাখিয়া, একটা ছোট হার-মোনিয়ম লইয়া যখন চারু আবার রাখুর পাদমূলে বসিল, তখন ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। শুনিয়াই রাখু বিস্মিতের মত বলিয়া উঠিল—

"তাই ত চারু, রাত যে শেষ হ'তে চল্‌লো।"

"থাকতে বলব নাকি?"

—বলিয়াই এবার সে গিট্‌কিরি দেওয়া হাসিতে ঘরটাকে এমন পূর্ণ করিয়া দিল যে, কিছুক্ষণ ধরিয়া চারুর হারমোনিয়মে সুর দিবার পরও সে হাসির ঝঙ্কার রাখুর কান হইতে অপসৃত হইল না। তবলাটা যে বাঁধিতে হইবে, সেটা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। আবাঁধা তবলায় বার দুই চাঁটি দিতেই চারু বলিয়া উঠিল—

"ও কি করছ। বাজাবার ইচ্ছা থাকে ত বাজাও, নইলে আমি শুয়ে পড়ি। মিছে বসে' রাত কাটাই কেন?"

রাখু নিজের ভুল বুঝিয়া তাহা ঢাকিতে বলিয়া উঠিল—

"বাজাতেই ত এসেছি, কিন্তু তুমি বাজাতে বলছ, না তামাসা করছ?"

"কি রকম?"

"বাজিয়ে রইল স্বর্গে আর গাইয়ে রইল পাতালে, এতে কি বাজনায় হাত আসে ?"

"তা কেন, তুমিই স্বর্গে ওঠ। এখানে তো যথেষ্ট স্থান আছে।"

"ওখানে কি আমার স্থান আছে ?"

"আমার যদি থাকে, তাহ'লে তোমারও আছে।"

রহস্য করিতে গিয়া মূর্খ ব্রাহ্মণ চারুকে কাঁদাইয়া দিল। বুঝিল সে নিজের হীন ব্যবসায়কে স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে তুষ্ট করিতে হাত ধরিয়া চারুকে সে সোফার অপর প্রান্তে বসিতে অনুরোধ করিল। চারু বাধা দিল না—হারমোনিয়মটা লইয়া সোফার উপর উঠিয়া সে স্বামীর দিকে মুখ করিয়া বসিল।

চারু গান ধরিল—

"ভাল আমি বাসিতে না জানি, তুমি ত ভাল তা জান হে।"

গাহিয়া কলির পুনরাবৃত্তি করিতেই রাখু তবলার অঙ্গুলি-প্রহারে গানের অভিবাদন করিল।

১৬

ভাল আমি বাসিতে না জানি, তুমি ত ভাল তা জান হে।
আমি যদি ভুলে ভুলেছি তোমারে, তুমি ভুলে রবে কেন হে।
বাসনাবরণে নয়ন অন্ধ দিবস করেছি রাতি,
তুমি কেন নাথ, ধরে' এই হাত, ফিরালে না মোর গতি ?
আজি এ মর্ম্মব্যথার কথা শুনেও যদি না শুন হে।
এখন নিশীথে কেন দেখা দিলে বঁধু হে, সখা হে, প্রাণ হে।

গান শেষ হইতে আধঘণ্টারও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। চারু তাহার সঙ্গীতে অভিজ্ঞতার, যত রকম করিতে পারিল, পরিচয় দিল। রাখুও বাজনায় এমন হাত দেখাইল যে, চারু গাহিতে গাহিতে ইঙ্গিত আভাষে তার মুগ্ধতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। গীত শেষে চারুই প্রথমে কথা কহিল—

"আমার গান শেখা আজ সার্থক হ'ল।"

"না চারু, ও কথা বল' না, অনেক ভাল ওস্তাদ তোমার গানে সঙ্গত করেছে; আমারই বাজনা শেখা সার্থক। আমি যে এ রকম গানের সঙ্গে বাজাবো, এ কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"কিন্তু আমি যদি বলি, এ রকম মিষ্টি ওস্তাদী হাত আমি আর কখন শুনিনি ?"

রাখু উত্তর দিল না।

"আমার কথা অবিশ্বাস করলে ?"

রাখুর চোখে জল দেখা দিল। তাহার মুখে শুধু প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া চারু সন্তুষ্ট হয় নাই। এ পর্য্যন্ত শ্রোতাদের মুখে এত সে প্রশংসা-বাক্য শুনিয়াছে যে, ইদানীং সে কথাগুলাতে আর তৃপ্ত হইবার কিছু ত ছিলই না, বরং সময়ে সময়ে সেগুলা তার বিরক্তির কারণ হইত। গাহিবার সময়ে তাহাকে এক একবার অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রত্যাশা করিয়াছিল—স্বামীর চোখে অশ্রুবিন্দু দেখিতে। নীরস স্বামী একটিবারের জন্যও তা' দেখায় নাই, অথবা মূর্খ বামুন তার গানের মর্ম্ম বুঝে নাই, শুধু সুর শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এইবারে তার চোখে জল দেখিয়া, কারণটা স্থির বুঝিতে না পারিলেও সে প্রফুল্ল হইল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল—

"লোকে কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়, তুমি যে কেঁদে উড়িয়ে দিলে গো।"

"না চারু, তোমার কথায় আমার ওস্তাদকে মনে পড়লো। তুমি যা বললে, আমার বাজনা শুনে তিনিও একদিন খুসী হ'য়ে ঐ কথা বলেছিলেন।"

"তিনি বেঁচে আছেন ?"

"বেঁচে থাকলে কাঁদবো কেন ? অল্পদিন হ'ল তিনি দেহ রেখেছেন।"

চারু বুঝিল, তার এতটা পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে। মূর্খ ব্রাহ্মণ শুধু সুর শুনিয়াছে, গানের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে নাই। রাখুর অশ্রুরেখা অবলম্বনে সে যে'আজ তার হৃদয় অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, পরিশ্রম ব্যর্থ হইলেও তাহার ত পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার উপায় নাই।

নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন আবার সে হারমোনিয়মে সুর দিল। সুর কীর্ত্তনের—রাখু শুনিবামাত্র বলিল—

"এ যে কীর্ত্তন ধরলে গো।"

"কীর্ত্তনের সঙ্গত জান না ?"

"মদনমোহনের দেশে বাস, কীর্ত্তনে সঙ্গত করতে জানি না, এ কথা কেমন করে' বলব ? তবে এ বাঁয়া-তবলায় ত কীর্ত্তনের অপমান করব না।"

ঘরের এক কোণে খোল ছিল, চারু মৃদু হাসিয়া ইঙ্গিতে সেইটা রাখুকে দেখাইয়া গান ধরিল—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষা রাখিল না।

চণ্ডীদাসের সেই চিরবিশ্রুতপদ—"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।" প্রথম প্রথম চারু শুধু সুরটাই আবৃত্তি করিতে লাগিল,—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষায় একবার, দুইবার, তিনবার—রাখু উঠিল না।

"খোল এনে দি ?"

"থাক্, তুমি গাও, আমি বসে' বসে' শুনি।"

চারু বুঝিল, পতিতার মুখ-নিঃসৃত মহাজন পদে সে সঙ্গত করিবে না। তখন চক্ষু মুদিয়া সে গাহিতে লাগিল—

কি মোহিনী জান, বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।

চক্ষু মুদিয়াই সে আঁখর দিল—মুদ্রিত পলকের ভিতরেই বুঝি সে সমস্ত সঙ্গত বন্দী করিয়াছে—

(কি মোহিনী জান, ওহে মদনমোহন)
(তুমি পলকে মজালে মোরে
মোহনিয়া কি মোহিনী জান)
(পলক আমার ঘুমিয়ে গেল,
প্রাণ সখা কি মোহিনী জান)
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু বঁধু, তোমার পিরীতি।
(বোঝা গেল না, সে কি চায়, চায় কি না চায়
পিরীতি রীতি বোঝা গেল না)

চারুর কানে সহসা মৃদুমধুর খোলের শব্দ প্রবেশ করিল। অভিমানিনী তাহা সহ্য করিতে পারিল না—চোখ মেলিয়াই সে বামহস্তে রাখুর দক্ষিণ হস্ত আবদ্ধ করিয়া আবার আঁখর দিল—

(কার চোখে সে চোখ রেখেছে
চোখ মেলে তা বোঝা গেল না)

রাখু এবার দু'টি কর পত্র পরস্পরে বাঁধিয়া কোলের উপরে জানু স্থাপিত করিয়া অপ্রতিভের মত বসিয়াছে।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
(আমার সব বিপরীত)

(ঘরের বাইরে এসেও ঘর পেতেছি
এ যে আমার সব বিপরীত)
(এখন তুমিই আছ, আমার সব গিয়েছে,
(এখন শুধু তুমিই আছ, আমাব সব গিয়েছে,
এখন শুধু তুমি আছ)
(আমার যেথায় যা ছিল পব কবেছি
পবাৎপব তুমি আছ)
(বঁধু তুমি যদি মোবে নিদারুণ হও,
(যেন নিদয় হ'য়ো না)
(ওহে প্রাণবল্লভ, নিদয় হ'য়ো না)
মরিব তোমাব আগে দাঁডাইয়া রও
(যদি নিদয় হও)
(কি জানি যদি নিদয় হও)
(পদে অপবাধ বহু কবেছি নাথ,
তাই যদি নিদয় হও)
(তবে দাঁড়াও হে, একবাব দাডাও হে)
(আমি তোমাবই প্রাণ তোমাবে দিই,
একবাব বঁধু দাঁডাও হে)

মন্ত্রাদিষ্টের মত সত্য সত্যই বাপ্ দাঁডাইয়াছে, তাব গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিতেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে সত্যই সে অনুভব করিল, চারুর মাথা তার পায়ে লুণ্ঠিত হইতেছে।

"চারু।"

চারু মাথা তুলিল—উত্তর দিল না।

"তোমার ঘরে এসে আমি আজ ধন্য হ'য়েছি।"

হাঁটুতে ভর দিয়া যুক্তকরে সে স্বামীর মুখের পানে চাহিল মাত্র। বুঝি কথা কহিতে সে সামর্থ্য হারাইয়াছিল।

"আমার কথায় বিশ্বাস করলে না?"

"না।"

"এমন সৌভাগ্য আমার জীবনে কখন হয় নি।"

"বেশ ত মন-ভোলানো কথা কইতে জান? তা হ'লে তুমি মোহনিয়াই বটে।"

"সে তুমি যা বল, কিন্তু চারু, আমি মিছে কই নি।"

"যাও ঠাকুর, আর চারু চারু ক'র না।"

—বলিয়াই সে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই আবার বলিল—

"তুমি হেরে গেলে, বলতে পারলে না—এটা তোমার ঘর।"

রাখু উত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না। সে শূন্য দৃষ্টিতে মাথা ঘুরাইয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল মাত্র। বুঝি দৃষ্টি দিয়া সে চারুর ঐশ্বর্য্য মাপিবার চেষ্টা করিল। ব্যর্থ চেষ্টায় আবার সে চারুর মুখে তাহা ফিরাইয়া আনিল। চারু বলিল—

"বস, তামাক আনি।"

রাখু একটু ব্যস্ততার ভাবেই বলিল—

"না না—প্রয়োজন নেই।"

"আমি দেখছি আছে।"

—বলিয়াই সে দোরের দিকে অগ্রসর হইল। রাখু প্রথমে সাগ্রহ কথায় তাকে নিষেধ করিল, যখন সে শুনিল না, তখন পিছন হইতে বাহুমূল ধরিয়া নিরস্ত করিল।

"ছিঃ! কর কি,—ছেড়ে দাও।"

"তা তুমি যত পার, তিরস্কার কর—আমি তোমাকে আর ভিজতে দেবো না।"

"তাতে কি হবে—আমি কি মরে যাব?"

"আমার জন্য ঠাণ্ডা লেগে যদি এ গলার সামান্যমাত্র ক্ষতি হয়, তাহলে আমার মহা অপরাধ হবে।"

"আর আমি কি গাইব মনে করেছ?"

"আর গাইবে না?"

"মুখ্‌খু বামুন, বুঝতে পারলে না?—আমি যে গানের ব্রত উদ্‌যাপন করলুম।"

"আমি যদি শুনতে চাই?"

"সে তোমার গান তুমি শুনবে।"

"তামাক আনো।"

চারু ধীরে কবাটে হাত দিল, আরও ধীরে খিল খুলিল। দোর খুলিতে যাইতেছে, এমন সময় রাখু আবার বলিল—

"তুমি কি—"

মুখ না ফিরাইয়াই চারু তার কথা শেষের অপেক্ষা করিল। শেষটা শুনিবার প্রতীক্ষাতেই তার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাখুর মুখ হইতে আর কথা বাহির হইতেছে না।

"কি জিজ্ঞাসা করছিলে, বল।"

রাখু বলিতে পারিল না।

"আমি 'কি' কি?"

জিজ্ঞাসা করিয়াই চারু মুখ ফিরাইল। গান গাহিবার পর হইতেই তার চিত্তবৃত্তি এরূপ শান্ত হইয়াছিল, তার মনে এমন একটু সাহস আশ্রয় করিয়াছিল যে, স্বামীকে পরিচয় জাগাইতে আব তার শঙ্কা নাই। স্বামী সাহস করিয়া তাহাকে চিনে চিনুক, সে আর তাহার কাছে পরিচয় গোপন করিবে না। কেবল পারিবে না সে, উপযাচিকা হইয়া পরিচয় দিতে। বক্ষের স্বাগত স্পন্দনকে উপেক্ষা করিয়াও, তাই রাখুর প্রশ্নকে পূর্ণ দেখিতে দুইবার সে প্রতিপ্রশ্ন করিল, মুখ ফিরাইল—তবু তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"পুরুষ মানুষ, বলতে ভয় করছ কেন? আমি তোমাকে ভালবেসেছি কি না জিজ্ঞাসা করতে চাও?

"না চারু!"

"বিশ্বাস করেছ?"

"করেছি।"

"মাথা ঠিক রেখে বলছ তো?"

রাখু মাথায় হাত দিল।

"দেখো, মাথা নেড়ে চেড়ে বেশ করে' দেখো—মাথা ঠিক আছে কি না। আমার এইরকম তিনখানা বাড়ী, প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি; অলঙ্কার, আসবাব, নগদে আরও ত্রিশ হাজার—"

"তোমার এত ঐশ্বর্য্য!"

"এ কি তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য, আর এক ঐশ্বর্য্যের কথা শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে।"

"সেটা কি চারু ?"

"মাণিক দেখেছ ?"

"গল্পে শুনেছি।"

"সেই মাণিক, সাত রাজার ধন—বুঝেছ ? বুদ্ধির দোষে হারিয়েছিলুম বহুকাল আগে,—আজ যেমন তোমার এ বাড়ীতে পায়ের ধুলো পড়েছে, অমনি অন্ধকারে সেটি আমার পায়ে ঠেকে গেছে। এই সম্পত্তি তোমাকে কি অমনি অমনি দিতে যাচ্ছি গা, সেই মাণিকটি ফিরে পেয়েছি বলে দিতে যাচ্ছি।"

রাখু অবাক্ হইয়া চারুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, চারুও কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে তার মুখ হইতে আর একটা কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইল। পরিচিত হইবার জন্য আর তার এক মুহূর্ত্তের বিলম্বও সহ্য হইতেছে না। কিন্তু এ মূর্খ ব্রাহ্মণ কথার ঘরে একেবারে কুলুপ দিয়া দাঁড়াইল। এখনও কি সে তাহাকে চিনিতে পারিল না ?

এমনি সময়ে ঘড়ীতে আধ ঘণ্টা বাজিল।

"ওমা! সাড়ে তিনটে বাজলো! তা' হ'লে ত রাত আর নেই বললেই হয়। তুমি বস, আমি তামাক পাঠিয়ে দিই।"

"পাঠিয়ে দিই মানে কি! তুমি কি আসবে না ?

"না এসে কোন্ চুলোয় যাব ? তবে বোধ হয় তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তুমি ত একটু পরেই চলে' যাবে ?"

"যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ থাকতে পারবে না ?"

"যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ থাকতে পারবে না ?

"তোমার ফিরতে কত দেরী হবে, না জানলে কেমন করে বলব ?"

"কখন ফিরতে পারবো না জানলে আমিই বা কেমন করে' বলব ?"

"এক ঘণ্টা ?"

"ঘণ্টা হ'তে পারে, দিনও হ'তে পারে মাসও হ'তে পারে, বছরও হ'তে পারে।"

"আর একটা জন্মও হ'তে পারে।"

"তা হ'তেই বা আশ্চর্য্য কি ?"

"তুমি ফিরে এস।"

"তুমি থাকবে ?"

"তোমাকে যে অনেক কথা বলব মনে করেছিলুম, তার ত কিছুই বলা হ'ল না!"

"আর ব'লে দরকার কি? বলবার সময় ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল।"

এই সময় প্রবল বাতাসে দ্বারটা সহসা পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

"ও রাখী, এখনও বিষম ঝড়।"

"কি বললে?"

দমকা বাতাসে মনটাও যে তার উড়িয়া গিয়াছে এটা রাখু বুঝিতে পারে নাই। অন্যমনে মুখ হইতে পত্নীর নাম বাহির হইতেই সে এমন অপ্রতিভের মত হইয়া গেল যে ক্ষণেকের জন্য তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"রাখী কে গো?"

"তাই ত চারু, আজ যে ঝড়ের রাত সেটা যে তুমি একেবারেই ভুলিয়ে দিয়েছিলে!"

চারু কবাট বন্ধ করিতে করিতে বলিল—

"সে ত আমিও ভুলেছিলুম গো, এখন যে বাইরের ঝড় ঘরে ঢুকলো,—রাখী কে?"

"তুমি ফিরে এস, এসে শুনো।"

"আমার কাছে মিথ্যে কইলে। তবে নাকি তোমার স্ত্রী নেই?"

"ভ্যালা বিপদ, তুমি আগে ফিরেই এস না গো।"

"সে আমার সতীন নাকি?"

"না চারু ও কথা বলতে নেই। তোমাতে সধবার চিহ্ন দেখছি।"

চারু বামহস্তের আয়তি-চিহ্ন চুম্বন করিতে করিতে বলিল—

"ওমা, এটার কথা যে মনেই ছিল না। তা আমি এটার সম্পর্ক কি রেখেছি?"

"তুমি রাখতে না বললেও ত সম্পর্ক যাবে না, ওটা বিধাতার দেওয়া।"

অতি উল্লাসে চারু বলিয়া উঠিল—

"সত্যি বলছ?"

"কেন চারু, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাস করছ? হিঁদুর মেয়ে—হাতে যখন চিহ্ন রেখেছ, তখন এটা কি জান না?"

"আমি যদি এখন সোয়ামীর কাছে যেতে চাই—"

"স্বামী নেবে কি না, বলতে চাচ্ছ?"

"নেবে না?"

"তা আমি কেমন করে' বলব?"

"আমি যদি তোমার স্ত্রী হতুম ?"

রাখু পাগলের দৃষ্টিতে চারুর মুখের পানে চাহিয়াই চক্ষু নামাইল।

"ভয় কি ঠাকুর বল না।"

রাখু ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চারু স্থিরনেত্রে অবনত মুখ স্বামীর পানে তাকাইয়া তার সারা দেহটা যেন অন্তরিন্দ্রিয়ের নীরবতায় যোগ দিতে নিথর হইয়া গিয়াছে। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হাত দিয়া চোখ মুখ মুছিয়া আবার যেই রাখু মুখ তুলিল, অমনি চারু বলিল—

"তামাক পাঠিয়ে দিই।"

—বলিয়াই এমন ক্ষিপ্রতার সহিত সে গৃহত্যাগ করিল যে, রাখু তাহাকে ফিরাইয়া, যে কথা বলিবার জন্য বুক বাঁধিতেছিল, সে কথা ঠোঁটের কাছে আনিতেও সে সময় পাইল না।

(ক্রমশঃ)

কৃপা-দান।

[কবিতা]

[শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘটক, এম্‌-এ

(কীর্ত্তনের সুর)

(১)

আমি শুষ্ক ক্লিষ্ট তরু,—আছিনু দাঁড়ায়ে শীর্ণ এ-মূরতি নিয়ে,
তুমি ঝটিকায় ভেঙ্গে,—সাজালে তাহায় নবীন পল্লব দিয়ে।

(২)

আমি দরিদ্র ভিখারী,—লালসা-অধীর, যত পাই তত লোভ!
তুমি অজানা-ধনের ভাণ্ডার দেখায়ে মিটালে দারিদ্র্য ক্ষোভ।

(৩)

আমি নয়ন থাকিতে অন্ধ যে পথিক,—কেবলি আঁধার দেখি,
তুমি অভিনব আঁখি ফুটায়ে দেখালে—আঁধারে আলোক যে-কি!

(৪)

আমি নিকটে তোমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘুরিলাম কত দেশ,
তুমি "সাথেই" রয়েছ,—জানায়ে আমার করালে ভ্রমণ শেষ।

(৫)

মোর যা ছিল আজিকে লইয়ে দেখালে,—তবু মোর কত আছে;
মোর স্মৃতি কেড়ে নিলে!—তুমি যা-দিয়েছ ভুলে যদি যাই পাছে।

(৬)

আমি আছিনু "অঙ্গার",—"কালী" ঘোচেনিকো "জলে ধুয়ে শতবার",
তুমি অনল পরশ,—"কৃপাদান" দিয়ে জ্বালালে "কালিমা" তার।

নির্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

নবম পরিচ্ছেদ।

হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর হইতেই পুলীসের আনাগোনা একটু ঘন ঘন আরম্ভ হইয়াছিল—সাজা কমাইবার প্রলোভনে যদি কেহ কোন নূতন কথা বলিয়া দেয়। আমাদের ধরা পড়িবার পরই নানা সূত্রে এতকথা বাহির হইয়া গিয়াছিল যে পুলীসের জানিবার আর বোধ হয় বেশী কিছু বাকি ছিল না। কিন্তু তথাপি পুলীস একবার নাড়া চাড়া দিয়া দেখিল আরও কিছু সংগ্রহ করা যায় কি না। নির্জ্জন কারাবাসের সময় মানুষের মন অপরের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য যে কিরূপ অস্থির হইয়া উঠে, পুলীসেরা তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে। দুই এক মাস যদি কাহারও সহিত কথা কহিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে মানুষের টিকটিকি, আরসুলার সহিতই কথা কহিতে ইচ্ছা হয়—পুলীস ত তবু মানুষ! কতকগুলা বাজে কথা কহিতে গেলে তাহার সহিত দুই একটা গোপনীয় কথাও বাহির হইবার সম্ভাবনা। আর ২০।৩০ জন লোকের নিকট ঘুরিলে অন্ততঃ চার পাঁচ জনের নিকট হইতে এইরূপ এক আধটা কাজের কথা পাওয়া যায়। পুলীসের তাহাই ভরসা।

কথা বাহির হইবার আরও একটা কারণ এই যে, নামে 'গুপ্ত সমিতি' হইলেও কতকটা অভিজ্ঞতা ও কতকটা অর্থের অভাবে আমাদের কার্য্যপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইউরোপীয় গুপ্তসমিতিগুলির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষের অধীনে থাকে, এবং এক বিভাগের লোক অন্য বিভাগের লোকের সহিত বিনা প্রয়োজনে পরিচিত হইবার অবসর পায় না। সমিতির অধ্যক্ষদের এই চেষ্টা থাকে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কর্ম্ম ভিন্ন অপরের কর্ম্ম না জানিতে পারে। এইরূপ নিয়ম থাকায় এক আধজনের দুর্ব্বলতায় সমস্ত কাজ নষ্ট হইতে পায় না। নানা কারণে সেরূপ ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হইয়া উঠে নাই, আর তাহার উপর আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ গল্প করিবার প্রবৃত্তি ত আছেই। আমাদের দেশে প্রত্যেক সমিতির ভিতর হইতে যে দুই এক জন করিয়া সরকারী সাক্ষী বাহির হইয়াছিল কার্য্যপ্রণালীর শিথিলতাই তাহার প্রধান কারণ। দলাদলি ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ফলেও অনেক সময় অনেক সমিতির গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। যে জাতি বহুদিন শক্তির আস্বাদন পায় নাই, তাহাদের নেতারা যে প্রথম প্রথম ক্ষমতা লোলুপ হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। আর নেতাদিগের মধ্যে অযথা প্রভুত্ব প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলে অনুচরদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও অসন্তুষ্টি অনিবার্য্য।

একটা সুবিধার কথা এই যে গল্প করিবার প্রবৃত্তি শুধু আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। ইউরোপীয় প্রহরীরাও প্রায় সমস্ত দিন জেলের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। তাহাদের মধ্যেও বেশ একটু দলাদলি ছিল। একদল অপর দলকে জব্দ করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরও সাহায্যপ্রার্থী হইত; এবং তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে জেলের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইত।

কিছু দিন এইরূপ থাকিবার পর শুনিলাম যে Civil Surgeon আমাদের আন্দামানে পাঠাইবার জন্য পরীক্ষা করিতে আসিবেন। যথা সময়ে Civil Surgeon আসিয়া পেট টিপিয়া, চোখ দেখিয়া সাত জনের কালাপানী পারের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সুধীর ও আমি তখন রক্তআমাশয়ে ভুগিতেছিলাম বলিয়া আমাদের আরও কিছু দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

সাধারণ কয়েদীর পক্ষে নিয়ম এই যে একবার রোগের জন্য আন্দামান যাওয়া বন্ধ থাকিলে আরও তিন মাস অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু আমাদের

বেলা সে আইন খাটিল না। সরকার বাহাদুরের আদেশ ক্রমে আমাদের ছয় সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কারাগৃহ হইতে একবার দেশকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। একদিন ভোরবেলা আমাদের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া আমাদের একখানা গাড়ীতে চড়ান হইল। দুই পাশে দুইজন সার্জেণ্ট বসিল, আর গাড়ী খিদিরপুর ডকের দিকে ছুটিল।

জাহাজে উঠাইয়া দিয়া একজন সার্জ্জেণ্ট বিদ্রূপ করিয়া বলিল—Now say, my native land farewell.' আমরা হাসিয়া বলিলাম—'Au revoir. বলিলাম বটে, কিন্তু ফিরিবার আশাটা নিতান্তই জবরদস্তি মনে হইতে লাগিল।

রাজনৈতিক কয়েদী আমরা শুধু দুই জন মাত্র ছিলাম—সুধীর ও আমি। জাহাজের খোলের মধ্যে একটা কামরায় আমরা ছিলাম, অপর কামরায় অন্যান্য কয়েদী ছিল। জাহাজের একজন বাচ্ছা কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের ফটো তুলিয়া লইল। বিলাতের কোন্ কাগজে সে এই সমস্ত ফটো ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। কথাটা শুনিবামাত্র আমি পাগড়ীটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইলাম। সস্তাদরে যদি একটা ছোট খাট বড়লোক হইয়া পড়া যায় ত মন্দ কি।

তিন দিন তিন রাত সেই জাহাজের খোলের মধ্যে চিঁড়া চিবাইতে চিবাইতে যাইতে হইবে দেখিয়া, সুধীর ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে একটা হাতীর মত জোয়ান—তিন মুঠা চিঁড়া চিবাইয়া তাহার কি হইবে? পুলিসের একজন পাঞ্জাবী মুসলমান হাওলদার বলিল—"বাবু, যদি আমাদের হাতে ভাত খাও, ত দিতে পারি।" মুসলমানদের মধ্যে সহানুভূতিও আছে, আর ভাত খাওয়াইয়া হিন্দুর জাত মারিবার ইচ্ছাও একটু একটু আছে। আমরা বলিলাম—"খুব ভাল কথা। আমাদের জাত এত পাকা যে, 'কোন লোকের হাতের ভাত খাইলেও তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে না।" সেখানে শিখ হাওলদারও ছিল তাহারা ভাবিল পেটের জ্বালায় আমরা পরকালটা একেবারে নষ্ট করিতে বসিয়াছি। তাই তাহারাও আমাদের ভাত দিতে চাহিল। আমরা নির্ব্বিবাদে উভয়দলের রান্না ভাত খাইয়া পেটের জ্বালাও থামাইলাম ও আপনাদের উদারতাও সপ্রমাণ করিলাম। শিখেরা ভাবিল—"বাঙ্গালী বাবুরা বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু উহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান একেবারে নাই।" যাই হোক, ধর্ম্ম বাঁচিল কি মরিল তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু দুটি ভাত খাইয়া সে যাত্রা প্রাণটা বাঁচিয়া

গেল। জাহাজে আমাদের নোয়াখালী জেলার অনেকগুলি বাঙ্গালী মুসলমান মাল্লাও ছিল, তাহাদের হাতে রান্না ভাত ও কুমড়ার ছকা যেন অমৃতোপম মনে হইল।

যাই হোক, কোনও রূপে তিন দিন জাহাজে কাটাইয়া চতুর্থ দিনে পোর্ট ব্লেয়ারে হাজির হইলাম। দূর হইতে জায়গাটি বড়ই রমণীয় মনে হইল। সারি সারি নারিকেল গাছ, আর তাহার মাঝে মাঝে সাহেবদের বাংলোগুলি যেন একখানি ফ্রেমে বাঁধান ছবির মত। ভিতরের কথা তখন কে জানিত?

দূরে একটা প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ী দেখাইয়া দিয়া একজন সিপাহী বলিল—"ঐ কালাপানীর জেল, ঐখানে তোমাদের থাকিতে হইবে।"

জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিল ডাক্তার আসিয়া সকলকে পরীক্ষা করিয়া গেল। তাহার পর ডাঙ্গায় নামিয়া আমরা বিছানা মাথায় করিয়া বেড়ী বাজাইতে বাজাইতে জেলের দিকে রওনা হইলাম।

জেলের মধ্যে ঢুকিবামাত্র একজন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আমাদের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"So, here you are at last Well, you see that block yonder It is there that we tame lions. You will meet your friends there but mind you don't talk."

(এই যে এসেছ! ঐ দেখছো বাড়ীটা, ঐখানে আমরা সিংহদের পোষ মানাই। ওখানে তোমার বন্ধুদের দেখতে পাবে, কিন্তু খবরদার, কথা ক'য়ো না)।

আমরাও শ্বেতাঙ্গটীকে একবার চক্ষু দিয়া মাপিয়া লইলাম। লম্বায় ৫ ফুট, আর চওড়ায় প্রায় ৩ ফুট। মোট কথা একটী প্রকাণ্ড কোলা ব্যাঙকে কোট পেণ্টুলান পরাইয়া মাথায় টুপি পরাইয়া দিলে যেরূপ দেখায়, অনেকটা সেই রকম। তখন জানিতাম না যে ইনিই মহামহিম শ্রীমান্ ব্যারী, জেলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাঁহার বুলডগের মত মুখখানি দেখিলে মনে হয় যে কয়েদী তাড়াইতে যাঁহাদের জন্ম, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান নির্জ্জনে বসিয়া ইঁহাকে কালাপানি জেলে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্যই গড়িয়াছিলেন। ইঁহাকে দেখিলেই Uncle Tom's Cabinএর লেগ্রিকে মনে পড়ে।

ভবিষ্যতে ইঁহার সহিত ভাল করিয়া পরিচিত হইবার অবসর পাইয়াছিলাম, কেন না প্রায় এগার বৎসর ইঁহার অধীনে এই জেলে বাস করিতে হইয়াছিল।

ইনি রোমান ক্যাথলিক আইরিস। সারা বৎসর কয়েদী ঠাঙ্গাইয়া যে পাপের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চড়িত, তাহা যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে গির্জ্জায় গিয়া পাদরী সাহেবের পদপ্রান্তে নামাইয়া দিয়া আসিতেন। বৎসরের মধ্যে ঐ এক-দিন তিনি শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ধরিতেন, সে দিন কোন কয়েদীকে তাড়না করিতেন না; আর বাকি ৩৬৪ দিন মূর্ত্তিমান যমের মত কয়েদী তাড়াইয়া বেড়াইতেন।

কয়েদীদের স্বভাবের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি যে দুর্দ্দান্ত লোক-দিগের প্রতি তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়, এবং এইরূপ লোকদিগেরই সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। ব্যারী সাহেবের নিকট প্রহার খাইবার পর অনেক কয়েদীকে বলিতে শুনিয়াছি—"শালা বড় মরদ হৈ।' যাহারা ভাল মানুষ তাহারা কয়েদীদের মতে স্ত্রী জাতীয়। কয়েদীরা কোন কুকার্য্য করিয়া ভগবানের নাম করিয়া ক্ষমা চাহিলে ব্যারী বলিতেন—"জেলখানা আমার রাজ্য, এটা ভগবানের এলাকাভুক্ত নহে। ৩০ বৎসর ধরিয়া আমি পোর্ট-ব্লেয়ারে আছি, একদিনও এখানে ভগবানকে আসিতে দেখি নাই।"—ব্যারী সাহেবের মুখের কথা হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

জেলে ঢুকিলে প্রথমেই নজরে পড়ে বহু জাতির সমাবেশ। বাঙ্গালী, হিন্দু-স্থানী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বর্ম্মী, মাদ্রাজী সব মিশিয়া খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান, বর্ম্মীও যথেষ্ট। ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় হিন্দুর এক চতুর্থাংশ কিন্তু জেলখানায় হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান কি করিয়া হইল তাহা স্থির করিতে গেলে উভয় জাতির একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মদেশে লোকসংখ্যা মোট এক কোটি, অর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গালীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ; কিন্তু এখানে বাঙ্গালী অপেক্ষা ব্রহ্মদেশীয় লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। খুন, মারামারি করিতে ব্রহ্মদেশীয় লোক বিশেষ মজবুদ। অল্পদিন মাত্র তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়াছে সুতরাং ভারতবর্ষের লোকের মত একেবারে শিষ্ট শান্ত হইয়া যায় নাই। হিন্দুস্থান ব্যতীত অন্যদেশের উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুব কম। শিক্ষা-প্রচারের আধিক্য বশতঃই হোক বা প্রকৃতির নিরীহতা বশতঃই হোক মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ একেবারে নাই বলিলেই চলে। আমরা যে সময় উপস্থিত হইলাম তখন জেলখানার মধ্যে পাঠানের প্রাধান্য খুব বেশী। সব জাতিকে একত্র রাখার ফলে যে দুর্ব্বল জাতিদের উপর অযথা অত্যাচার যথেষ্ট হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

দিন কত থাকিতে থাকিতেই দেখিলাম যে জেলখানায় দুর্ব্বলের পক্ষে সুবিচার পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-সাবুদ দিবার বুকের পাটা কয়েদীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। পরের জন্য নিজের ঘাড়ে বিপদ কে টানিয়া আনিতে যাইবে? যে যার নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাইতেই ব্যস্ত। যাহারা খোসামোদ করিতে সিদ্ধহস্ত, মিথ্যা কথা যাহারা জলের মত বলিয়া যাইতে পারে তাহারাই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ভালমানুষ এবং তাহারাই প্রভুদিগের প্রসাদ লাভে সমর্থ। আর যাহারা ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করিয়া অপরের জন্য লড়াই করিতে যায়, তাহাদের অদৃষ্টে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঘটে, মিথ্যা মোকর্দ্দমার ফাঁদে পড়িয়া তাহারা অযথা সাজা খাইয়া মরে। ফলে জেলখানায় যত কয়েদী আসে, তাহার মধ্যে একজনও যে জেল খাটার ফলে সচ্চরিত্র হইয়া যায় তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বাস্তবিকই কয়েদীদের ভাল করিয়া তুলিবার চেষ্টা সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষদের মোটেই নাই বলিলে চলে। অসচ্চরিত্র লোকদিগকে সচ্চরিত্র করিয়া তোলাতেই যে জেলখানার সার্থকতা, সে ধারণাও তাঁহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েদী তাঁহাদের কাছে কাজ করিবার যন্ত্র বিশেষ, আর যে অফিসার কয়েদী ঠেঙ্গাইয়া যত বেশী কাজ আদায় করিতে পারে সে তত কাজের লোক, তাহার পদোন্নতি তত দ্রুত।

আর একটা মজার কথা এই যে, সে উল্টা বাজার দেশে মুড়ি মিছরী সব একদর—সব রকম অপরাধের জন্য দণ্ডিত কয়েদীই প্রায় এক রকম ব্যবহার পায়। কঠোর বা লঘু পরিশ্রমের সঙ্গে সব সময় অপরাধের গুরুত্বের বা লঘুত্বের বড় একটা সম্বন্ধ থাকে না। যে সময় কোথাও নারিকেল ছোবড়ার তার (coir) পাঠাইবার দরকার হয় সে সময় সকলকেই ছোবড়া কুটিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়, আর যখন নারিকেল বা সরিষার তেলের আবশ্যক হয় তখন একটু মোটাসোটা সকলকেই ধরিয়া ঘানিগাছে জুড়িয়া দেওয়া হয়। সবটাই ব্যবসাদারী কাণ্ড। কয়েদী সরকার বাহাদুরের গোলাম, আপনাদের দেহের রক্ত জল করিয়া সরকারী কোষাগার পূর্ণ করাতেই তাহাদের অস্তিত্বের সার্থকতা।

অপরাধের তারতম্য অনুসারে কয়েদীকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রথা সরকারী পুঁথিতে আছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিয়া উঠে না। কিসে জেলের আয় বৃদ্ধি হয়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চুণো পুঁটি অফিসার পর্য্যন্ত সকলেরই সেই দিকে দৃষ্টি। কয়েদী মরুক আর বাঁচুক, কে

তাহার খবর রাখে? ভারতবর্ষে লোকের অভাবও নাই আর মাসে মাসে জাহাজ বোঝাই করিয়া দরকার মত কয়েদী সরবরাহ করিবার জন্ত বিলাতী বিচারকেরও অভাব নাই।

একবার একটি পাগলকে জেলখানায় দেখিয়াছিলাম। বেচারীর বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়, জেলখানায় সে ঝাড়ুদারের কাজ করিত। তাহার নিজের বাডীর সম্বন্ধেও তাহার ধারণা অতি অস্পষ্ট, কেন যে সে সাজা পাইয়া কালাপানিতে আসিয়াছে তাহাও ভাল করিয়া বুঝিত না। এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা ক ভাই?" সে উত্তর করিল—"সাত।" তাহাদের নাম করিতে বলায় সে আঙ্গুলের গাঁট গণিয়া পাঁচ জনের নাম করিল। বাকি দুই জনেব নাম করিতে বলায় উত্তর দিল—"ভুলে গেছি।" তাহার খাওয়া পরার বড় একটা ঠিকানা থাকিত না, কখনও আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা সারা দিন রাস্তা পরিষ্কার করিয়া বেড়াইত। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে লোকটার মাথা খারাপ। তাহাকে পাগলা গারদে না দিয়া কোন্ সুবিচারক যে তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। এরূপ দৃষ্টান্ত জেলখানায় অনেক পাওয়া যায়।

তবে মাঝে মাঝে দুই একজন এমন ওস্তাদও মিলে যাহারা কাজের ভয়ে পাগল সাজে। একজন বাঙ্গালীকে ঐরূপ দেখিয়াছিলাম। একদিন বেগতিক বুঝিয়া সে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া গান জুড়িয়া দিল। চোখে চূণের সামান্ত গুঁড়া লাগাইয়া চোখ দুটা লাল করিয়া লইল, আব আবল তাবল বকিতে আরম্ভ করিল। ভাত খাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। প্রহরীরা তাহাকে জেলারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। জেলার গোটা দুই কলা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে কলা দুটো খাইয়া পরে খোসাগুলাও মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। জেলার স্থির করিলেন লোকটা সত্য সত্যই পাগল; তা না হইলে খোসা চিবাইতে যাইবে কেন? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁরে কলার খোসা চিবুতে গেলি কেন?" সে বলিল—"কি করি বাবু, জেলার বেটাকে ত বোকা বানাতে হবে! একটু কষ্ট না করলে কি আর পাগল হওয়া চলে?"

তৃতীয় দৃষ্টি

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

দম্‌কা ঝড়ের হাওয়া।
নিবিয়ে দিল ঘরের বাতি
চোখে চোখে চাওয়া।
এলিয়ে দিল ঘরের আগল
ঝিলিক্‌ মারা পাগল বাদল
তাই চোখে নয় সবার প্রাণে
দৃষ্টি এবার পাওয়া।
চোখের ভিতর যে চোখ আছে
সবার ভালে সবার কাছে
সেই খানেতে দৃষ্টি রেখে
জীবন আমার বাওয়া।

"ঋগ্‌বেদের সময় ভারত"।

২

বেদে ভূ-তত্ত্ব ও বৈদিক জনপদ সমূহের স্থিতি নির্দ্দেশ।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইতেছে ভূ-তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা 'ইলা' ও অন্যান্য জনপদ সমূহের স্থিতি নির্ণয়। ইহা ছাড়াও 'ইলার' স্থিতি নির্দ্দেশ করিবার আর একটী উপায় আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মহাভারতের শাকদ্বীপ আর ইলাবৃত একই স্থানের বিভিন্ন নাম। কেন না শাকদ্বীপেও মেরুপর্ব্বত অবস্থিত আছে, এবং উহাতে দেব, ঋষি ও স্বকর্ম্মনিরত বহু ব্রাহ্মণের বাস। আর ইন্দ্রই সেখানকার রাজা। ঐ শাকদ্বীপে মঙ্গ, মানস, মশক ও মন্দগ, এই চারিটী লোকসম্মত দেশ আছে। এই মঙ্গদেশই বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়ার প্রাচীন নাম। মানস হইতেছে আধুনিক মানচুরিয়া। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ১১ অধ্যায়)

ভূ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বেদ হইতে তথ্য বাহির করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আসিয়া মহাদেশ একটী মহান্ ভূমিখণ্ড, আর ভূ-তত্ববিদেরা এখনও পর্য্যন্ত ইহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই। ভূ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আপনাদের সুবিধানুযায়ী পৃথিবীর জন্ম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত কালকে পাঁচ মহাযুগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—(১) অতি প্রাচীন (Archaean), (২) প্রাথমিক (primary or paleaozoic), (৩) দ্বিতীয়ক (Secondary or Mesozoic), (৪) তৃতীয়ক (Tertiary), এবং (৫) আধুনিক (Quaternary) মহাযুগ। আবার প্রত্যেক মহাযুগকে কয়েকটী যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে দ্বিতীয়ক ও তৃতীয়ক মহাযুগের অন্তর্গত যুগ-বিভাগ গুলি জানিলেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়ক (Secondary or mesozoic) মহাযুগ

(১) Triassic ([illegible]সিক্)

(২) Jurassic (জুরাসিক্)

(৩) Certeceous (সার্টে সিউস্)

এবং তৃতীয়ক (Tertiary) মহাযুগ

(১) Eocene (অয়োসিন্), (২) Oligocene (অলিগোসিন্) (৩) Miocene (মায়োসিন্), (৪) Pliocene (প্লায়োসিন্) (৫) Pliestocene (প্লিষ্টোসিন্)।

ভূ-তত্বের আলোচানায় দেখা যায় যে প্রাথমিক মহাযুগের পূর্ব্বে সমস্ত আশিয়া মহাজনপদ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে দ্বিতীয়ক যুগের শেষ ভাগে উত্তর পূর্ব্ব আশিয়ার অনেকটা ভূমি স্থলে পরিণত হইয়াছিল। দক্ষিণ সাইবেরিয়ার কতক অংশ, সমস্ত মঙ্গোলিয়া, মানচুরিয়া ও চীনের কতক অংশ এবং চীনীয়-তুর্কিস্থানের উত্তরাংশ এই ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিম্নে Encyclopaedia (Britanica Edition) হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, "There is positive evidence that much of north and east of Asia has been land since the Palacozoic or Primary era......The Triassic deposits of the Yerkhoyansk range show that this land did not extend to the Bering sea, while the marine deposits of Japan on the east, the western Tian-

shan on the west and Tibet on the south give us some idea of its limits in other directions" (P. 768, Vol. 2). এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভূ-তত্ত্ববিদেরা এখনও অসংশয়ে বলিতে সক্ষম নহেন যে এই ভূমিখণ্ডের বিস্তৃতি কতখানি, আর তাঁহারা ইহার যথার্থ সীমা নির্দ্দেশও করিতে পারেন নাই। যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশই মতবাদ মাত্র। ঐ সকল মতবাদ এখনও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই।

এই সময়ে অন্যান্য সমস্ত স্থানই জলমগ্ন ছিল। কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ স্থলে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু অসংশয়ে বলা যায় না এই ভূমিখণ্ড মঙ্গোলিয়া ভূমিখণ্ডের ঠিক সমসাময়িক কিনা। এই দুই ভূমিখণ্ড প্রাচীনত্বে এক হইলেও আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত ইহার কোনও বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ এই দুই স্থানের মধ্যে সাগরের এত বেশী ব্যবধান ছিল যে সেই প্রাচীন কালে মঙ্গোলিয়া নিবাসী দেবগণের পক্ষে এই দ্বিতীয় স্থানের অস্তিত্বজ্ঞান থাকা অসম্ভব। তত্রাচ মঙ্গোলিয়া ভূমিখণ্ডই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়।

হিমালয়-পার্ব্বত্য প্রদেশ ও উত্তর ভারতের কতক অংশ প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পূর্ব্ব আফগানিস্থান (গান্ধার) ও বল্ক প্রদেশ (বহ্লিকদেশ) ইহারই অন্তর্গত ছিল। হিমালয় প্রদেশ Eocene (আয়োসিন্) যুগে উত্থিত হয়, আর উত্তর ভারতের পশ্চিমাংশ তৃতীয়ক মহাযুগের মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করে। আফগানিস্থানের পশ্চিমাংশ ও পারস্যদেশ আধুনিক (Quaternary) যুগের প্রথম ভাগে স্থলে পরিণত হয়। বেলুচিস্থান আরও পরবর্ত্তী যুগের। এই সম্বন্ধে Encyclopaedia হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, "Persia consists of a central region covered by Quaternary deposits and bordered on the north, west and south by a raised rim composed of older rocks These older rocks form the isolated ranges which rise through the Quaternary deposits of the central area" আবার, 'The Miocene deposits generally lie at the foot of the chains, or in the valley...... Pliocene deposits cover a considerable area near the coast. Both in the Elburz range and near Baluchistan frontier there are numerous recent volcanoes. Some of these seem to be

extinct but several continue to emit vapour and gases. (P. 190 bc, Vol. 21).

আবার সাইবেরিয়ার উত্তর অর্দ্ধাংশ আধুনিক (Quaternary) মহাযুগের প্রথমভাগে কিম্বা আরও পরে স্থলে পরিণত হয়। কারণ যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইহা তৃতীয়ক মহাযুগ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিল। "This vast tract, only a few dozen feet above the sea, most probably was covered by the sea during the post-pliocene (Pleistocene) period. It stretches from the Aral-caspian depression to the low-lands of the Tobal, Irtysh, and Ob, and thence towards the Yenisei and Lena." (P. 11d.—Vol. 25).

এইবার আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে বেদে এই সকল বিষয়ের কি প্রমাণ আছে। বেদে আমরা স্বঃ (ইলা, গ্নো, বা যজ্ঞ), ভূ (ভারত, পৃথিবী), ভুব (অন্তরীক্ষ, সমুদ্র, আপ), ও দিব্, এই চারিটী জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাই। 'স্ব' ও 'ভূ' কোন্ কোন্ দেশ তাহা মোটামুটি পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি। যদিও পুরাণ প্রণেতারা ও অনেক ভাষ্যকারের ভ্রমবশতঃ 'অন্তরীক্ষকে' শূন্য আকাশ বলিয়াছেন, তথাপি বেদে ও ব্রাহ্মণে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে অন্তরীক্ষ একটি জনপদ ও মনুষ্যের বাসস্থান। আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাই যে 'অন্তরীক্ষ' ভুবর্লোকের আর একটী নাম (ভুব ইতি অন্তরীক্ষম্)। সায়ণও স্বকীয়ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে 'পৃথিবী'র ও 'দ্যোর' মধ্যস্থলে যে লোক তাহাই 'অন্তরীক্ষ' (১৬৭ পৃ, ও ৬২৪ পৃ, প্রথমখণ্ড অথর্ব্ববেদ)। 'অন্তরীক্ষের' অর্থ যে 'সমুদ্র' তাঁহাও সায়ণ বলিয়াছেন (১৮।৩০।১, ঋক্)। 'অন্তরীক্ষ' আবার তিনটী (ত্রিরন্তরিক্ষম্, ৫।৫৩।৪, তৈঃ ব্র)—যথা, (১) অলোগস্থান, (২) অর্য্যায়ণ (Iran), (৩) অসুরীয় জনপদ (প্রাচীন আসিরিয়া)। আবার ভারত হইতে ইলায় যাইবার জন্য পুরাকালে অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া সুন্দর সুন্দর পথ নির্ম্মিত ছিল। ঋগ্‌বেদে (১১।৩৫।১) আমরা দেখিতে পাই যে অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া সবিতৃদেব নির্ম্মিত যে সকল পথ আছে, তাহা অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত ধূলি পরিশূন্য। অন্তরীক্ষের আর একটা নাম পৃশ্নি (১।৬৬।৩, ঋক্, সায়ণ শিষ্য)। শ্রীর সায়ণ বলিতেছেন, পৃশ্নি ইন্দ্র সৈনিক মরুদ্‌গণের মাতৃভূমি (১০।২৩।১, ঋক্)।

ইলায় উত্তরে যে দেশ তাহারই নাম দিব্। দিব্ চারিটী যথা—সত্যলোক

অহর্লোক, রাত্রিলোক, ও সংবৎসর লোক। অনেক ভাষ্যকারেরা এই সত্য-লোকের অর্থ সত্য কথন, আর অহ, রাত্রি ও সংবৎসর জনপদদিগকে কালপদ-বাচ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পরন্তু সত্য অর্থে যদি এখানে সত্যকথন বুঝায়, এবং অহ, রাত্রি ও সংবৎসর যদি কালপদবাচ্যই হয়, তাহা হইলে তাহাদের একে একে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থানের কথা 'বেদে' লিখিত থাকিবে কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না (১।১৯০।১০, ও ২।১৯০।১০, ঋক্)। ইহারা যে জনপদ তাহা ঋগ্বেদে ও অনেক ব্রাহ্মণগ্রন্থে বেশ স্পষ্ট করিয়াই লিখিত আছে। ঋত ও সত্যের এক অর্থ সত্যকথন। ইহাদের আর এক অর্থ সত্যলোক। যথা,— ঋগ্বেদে যাহারা সত্যলোকে বাস করিয়া থাকে তাহারা সত্যলোকবাসী (৫।৪০।৪) —ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪৯৫ পৃ ও ৪৯৬ পৃ)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় আছে যে পরস্পর বিবদমান দেবতারা অহর্লোক ও অসুরেরা রাত্রিলোকে আশ্রয় করিলেন। আবার, অসুরেরা ভ্রাতৃব্য দেবগণকে অহর্জনপদ প্রদান করিলেন (৬০৯ পৃ ঐ)। সংবৎসর দেবতাদিগের অধিকৃত একটী দেশ, উহা অসুরেরা জয় করিয়াছিলেন। পরে দেবতারা তাহাঁদিগকে পরাজয় করিয়া পুনরায় অধিকার করেন (৯৯ পৃ, কৃষ্ণযজু)। দ্বাদশ মাসে এক সম্বৎসর হয়, ইহা ভিন্ন আরও একটী সম্বৎসর আছে। উহা দেবতাদের একটি পুরী (৩১৬ পৃ, তৈঃ ব্র)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও আছে যে বারমাসে এক সংবৎসর, আর প্রজাপতি চন্দ্রের (আকাশের চাঁদ নহে, এই চন্দ্র প্রজাপতি চন্দ্র-বংশের আদি পুরুষ) একটি আয়তনের নামও সংবৎসর (৮০ পৃ)।

এইবার আমরা দেখিব কোন্ স্থান কত প্রাচীন, আর কোন্ স্থানই বা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন।' ঋগ্বেদে (১।৫৫।৪) বিবৃত আছে যে মহতী 'দ্যো' ও 'পৃথিবী' জগতের সকল জনপদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা বরীয়সী। আর এক স্থলে, এই দ্যাবা পৃথিবী অতি বিস্তৃত বাসস্থান ও ইহারা সকলের অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল (৮।৬৫।১০)। ইহা হইতে বুঝা গেল যে 'দ্যো' ও পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভূমি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে যে ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর? ঋগ্‌বেদের একজন ঋষিই এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন, 'দ্যো ও পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌টী পূর্ব্বে উৎপন্ন, আর কোন্ স্থানই বা পরে উৎপন্ন হইয়াছিল? (১।১৮৫।১ম, সায়ণ ভাষ্য)। পিতা (পিতৃভূমি দ্যো) সকল স্থানের মধ্যে প্রাচীনতম' (৩।৭৩।৯, ঋক্)। আর আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধের এক স্থলে দেখিয়াছি যে, যে জলরাশি প্রথমে সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিল সে আপন মহিমায়

'যক্ষ' জনপদকে জন্মপ্রদান করিল। তাহা হইলে দেখাগেল ইলা, স্তো, বাঁ যক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম।

প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় পৃথিবী, বা ভারত (উত্তর ভারতের কতক অংশ, কারণ অতি পুরাকালে ভারতের অন্যান্য অংশ জলমগ্ন ছিল), আর অন্তরীক্ষ তৃতীয়। আমরা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই যে পুরাকালে কেবলমাত্র দ্যাবা পৃথিবী ছিল, তখন উহাদের মধ্যে অন্তরীক্ষ জনপদ ছিল না (১৬ পৃষ্ঠা—সায়ণ ভাষ্য)। তৎপরেই পশ্চিম মহাসাগর গর্ভে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষের উৎপত্তি হয় (১।১৯।১০, ঋক)। এই অন্তরীক্ষে বরুণ রাজত্ব করিতেন (৫।৮৫।৫, তৈঃ, ব্র)। আর এই বরুণই পার্সিদের 'অহুরমজ্‌দা'। পুরাণ প্রণেতারা সমুদ্র জনপদকে সাগর ভাবিয়া বরুণকে জলদেবতায় পরিণত করিয়াছেন। অসুরেরা (বৃত্র ও বল) ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্তরীক্ষে উপনিবেশ স্থাপন করে (১৩।৬।৮ম, ৮।১৪।৮, ও ৭।৬।১ম, ঋক্)। বৃত্র পারস্যে 'আয্যায়ণ' (পরে আইরাণ বা ইরাণ) জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। বৃত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'বল' অসুরীয় (পরে assiryan) সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বলই আসিরিয়ার বেল বা বিলুস্। *

অন্তরীক্ষ সৃষ্টি হইবার সময়েই সত্য ও রাত্রিলোক স্থলে পরিণত হয় (১।১৯০।১০, ঋক)। তারপরই সংবৎসর ও অহর্লোক সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয় (২।১৯০।১০, ঋক)।

অতএব ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে ইলাই মঙ্গোলিয়া ভূমি খণ্ড, পৃথিবীই ভারতবর্ষ, অন্তরীক্ষ পারস্য ও তুর্কি, এবং দিব্ সাইবেরিয়ার অধিকাংশ প্রদেশ। আমরা ঋগবেদে (১।১০।২ ও ১০।৪৫।১) আরও দেখিতে পাই যে অগ্নি প্রথমে স্তোতে, পরে ভারতে ও তৎপরে অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হয়। ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে আর্য্যমানব প্রথমে স্তোতে বাস করিতেন, পরে ভারতে আসেন, এবং ভারত হইতে অন্তরীক্ষে গমন করেন।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আর্য্যেরা তাঁহাদের ভারতের বাসস্থানকে কেন 'দেবনির্ম্মিত-দেশ' বলিয়াছেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া সমালোচনা শেষ করিব।

---

* পার্সিদের জেন্দ আভেস্তা পড়িলেই বুঝা যায় ইহা দেবদ্রোহী অসুরের প্রণীত। তাহাদের অর্য্যানেম্ বৈজো আমাদের 'আর্য্যাণ বর্ত্ত' (আর্য্যাবর্ত্ত) ছাড়া আর কিছুই নহে। আরও দেখা যায় যে আভেস্তার লেখক অঙ্গরামৌনকে (Angra Mauna) অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এই অঙ্গরামৌন বেদের অঙ্গিরস্ মুনি। বেদে এক স্থলে দেখা যায় যে অসুরেরা (বিলু ও তাহার অনুচরেরা) অঙ্গিরাগণের গাভী প্রায়ই হরণ করিয়া লইয়া যাইত (৫।৬।১ম ঋক্)।

অশান্তি।

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

তবু ঝরিল না প্রাণ।
একে একে জীবনের বসন্ত, নিদাঘ,
বরষা, শরৎ ঋতু স্নিগ্ধ শ্যামরাগ
লয়ে হ'ল অবসান,
তবু ঝরিল না প্রাণ।
হিমের কুয়াসা আজ চৌদিকে আঁধার
ঘিরেছে—দেখি না পথ—সবি একাকার—
ভয়েতে আকুল প্রাণ,
তবু ঝরিল না প্রাণ।
শিথিল জীবন বৃন্ত পীত জরাতুর
ঝরিয়া পড়িতে চায় মৃত্যু নহে দূর,—
ওই এসেছে আহ্বান—
তবু ঝরেনাক প্রাণ।
নাহি রূপ নাহি গন্ধ নাহি কোনো কাজ
এসেছে অতিথি নব পরি নব সাজ,
ছাড়িতে চাহি যে স্থান—
তবু-ঝরে নাত প্রাণ।

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ।

সহজিয়া।

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।]

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৭

কিন্তু আমার এই বিফল পূজার পূর্ণ ফলও যে একজন নিজে বয়ে এনে দিচ্ছে, তার কথা যেন বলতে না ভুলি। সে কে? সে দয়াময়ী হাসিদেবী—বিশ্বের হাসির প্রতীক নয়, একেবারে জমাট প্রতিমা, বিশ্বলক্ষ্মীর মূর্ত্তি বিগ্রহ! এ যে কেন এমনি ভাবে আমার মায়ের আড়াল হতে আমাকে ঘিরে ফেল্‌লে তা যে বুঝতে পারছি নে। তা কি কেউ তোমরা বুঝিয়ে দেবে? আমার স্বর্গগত মালিকের মহা বৈরাগীর সংসারে এমন লক্ষ্মীর পদ্মাল্পারটি কি করে ফুটলো কে ফোটালে? কার জন্যে ফোটালে?

কার জন্যে ফোটালে? আমারি জন্যে—আমারই জন্য যার আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেই ফোটালে, যার বিশ্বমানসে প্রত্যেকের জন্য সবের, সবারই জন্যে প্রত্যেকের জন্ম হয় তারই এই কারসাজী। কিন্তু কারসাজী ধরা পড়ে যাচ্ছে। এইটেই সেই চিরন্তনী বোকা মেয়ে বুঝি বুঝছে না।

বুঝছে না? তাই বা কেমন করে হবে? সে যদি না বোঝে ত' এই হাসিই বা কি করে সব বুঝে ফেলে। আমার কি চাই, কোন্ সময় কোন্ মুহূর্ত্তে কি দরকার তা সবই কি করে এ বুঝলে? আমার ঘরখানা কি করে ঠিক এমনি ভাবে মন ভুলান হয়ে উঠ্‌ল। এমন সব ছবি—এমন ফুলের অর্ঘ্য, এমন বিচিত্র মালা, এমন সব রঙ্গিন খেলনায় কেন আমার ঘরখানা ভরে উঠল!

আবার ঐ অত শোভার সম্ভারের মাঝখানে এমন একটা ভিখারীর ছবিকে এমনি ভাবে শ্বেত পাথরের হোয়াট্‌নটের ওপর গোলাপ আর পদ্মের মালার ফ্রেমে কেন সে বসিয়ে দিয়েছে? এই এত রূপের, এত আলোর মাঝখানে ঐ ভিক্ষাপাত্র হাতে জগদেক-ভিখারী বুদ্ধদেবকে কেন সে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে? সে কি প্রায় প্রথম দর্শন হতেই টের পায়নি? সে কি না জেনেও জানে নি?

যে অমনি করে তাদেরই দ্বারে এই হতভাগা কামুকটা পতিত মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে ?

সে টের পেয়েছে ভাই, অনেক আগেই টের পেয়েছে, কারণ সে সবারই সব খোঁজ রাখে, যার কাছে কিছুই হারায় না সে সর্ব্বনাশী সর্ব্বলোলুপাই যে এই মানুষটির প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে ঢুকে এর অন্তর বাহির সবটুকুকে তাতিয়ে রাঙিয়ে ভরিয়ে ভরিয়ে তুলছে।

কিন্তু আমি কবে এবং কি করে এ কথা জানতে পারলাম ? সে একটা গোপন কথা—তবু বলতে হবে ? আচ্ছা বলছি। আমার মধ্যে যে একটুও আড়াল রাখতে দেবে না তোমরা, তা জানি, আমার সব অহংকার যে তোমরা ধুলোয় মিশিয়ে দেবে তা আগেই বুঝতে পেরেছি। তবে শোনো—

আমার একখানা ফটোগ্রাফ ছিল, ঠিক আমার নয় আমাদের তিন জনের। আমার যিনি সেই যোগীগুরু—মন্ত্রগুরু জ্ঞানগুরু তিনি, আর আমার হিমালয়ের সেই বন্ধু সাথী সখা এবং কর্ম্মগুরু সেই তুবিগ্নানন্দ স্বামী. আর এই অধম মানুষটার তখনকার চেহারার ফটোগ্রাফ আমার গুরুদেবের এক শিষ্য তুলে আমাদের তিন জনকে দিয়েছিলেন। আমি তা যত্ন করে ঝোলায় রেখেছিলাম, এবং এখনো ওটা রেখেছি। কেন ? তা কি বলতে হবে। এই শরীরটার ওপর, এই বিকশিত আমিটার ওপর চিরদিনই আমার বোধ হয় লোভ ছিল। তাই রেখেছিলাম— ফেলিনি।

কিন্তু ফটোগ্রাফখানা বেরুল কি করে, তা ঠিক বুঝাতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমার জিনিষপত্র ঘাঁটা মার যেমন একটা কাজ হয়েছিল, বোধ হয় হাসিদেবীরও একটা কাজ হয়েছিল। আমি যখন ষ্টেটের কাজে বাইরে থাকতাম, তখন এই দুটি নারী-হৃদয় আমাকে নিয়ে কি যে করত তার সঠিক খবর আমি দিতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে মা আমার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া যা কিছু বলবার সবই বলে ফেলেছিলেন। এবং সেই আমার যেটুকু অংশ ধরা পড়েছিল তা নিশ্চয়ই এই অদ্ভুত নারীর মনে এমন একটা আকর্ষণ করেছিল যাতে এই সেবাপরায়ণাকে আমার জন্ত অনেক সময় ভাবিয়ে তুলত।

সেই ভাবনাকে মূল করে এই ফটোখানার ওপর সেদিন মার সঙ্গে তাঁর তর্ক হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র কাছারী হ'তে ফিরে মার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে দেখে তাঁদের তর্ক থেমে গেল। হাসি তাড়াতাড়ি ফটোখানি লুকালে।

মা কিন্তু সে লুকোচুরী রাখতে দিলেন না—ফটোখানা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, 'প্রিয়, তোর বাক্সে এ কাদের ফটো রে ?'

আমি চমকে বল্লাম, 'কৈ দেখি।' ফটোখানা হাতে পেয়েই আমার হাত কাঁপতে লাগল—আমি বল্লাম, 'কেন বল ত ? এদের কি তোমরা চেন নাকি ?'

মা বল্লেন, 'আমি ত' একজনকেও চিনতে পারছি নে, তবে এই মানুষটার মুখ যেন চেনা চেনা মনে হচ্চে।'

'কার মত মনে হচ্চে ?'

'যেন তোরই মত।'

আমার মুখটা তখন কি রকম হয়েছিল বলতে পারি না কিন্তু বুকের মধ্যে যে একটা তোলপাড় চলছিল সেটা গোপন করব না। আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম, 'হলেই বা আমার মত, আমিই যে তা ত জোর করে বলতে পার না।'

মা দেখে দেখে বল্লেন, 'না, তা ঠিক বলা যায় না।'

আমি হাঁফ ছেড়ে বল্লাম, 'ও আমার তিনটি চেনা লোকের ছবি। কিন্তু এটা তোমরা পেলে কোথায় ?'

মা এইবার ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, 'তোর বাক্সর মধ্যেই পেয়েছি। বাক্স গোছাতে গিয়ে—'

আমি একবার হাসির মুখেরদিকে চাইলাম তারপর বল্লাম, 'তা বেশ করেছ, তাতে আর এত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে কেন ? এখন দাও ওখানা রেখে দিই—ওদের তোমরা চেন না, কি করে চিনবে ?'

এইবার হাসি কথা কইলে, বল্লে, 'আমি কিন্তু ওর মধ্যে দু জনকে অন্ততঃ ধরতে পেরেছি বলে মনে হয়।'

আমি প্রাণপণ বলে জোর করে বল্লাম, 'আপনি ত' আর কালিদাস নন যে বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী ভানুমতীর তিনটা হ'তে বনের বাঘ ভালুকের কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবেন। আপনাদের বাড়ীতে বহুদিন হ'তে সন্ন্যাসী মহারাজরা যাতায়াত করছেন, হয়তো কারুর সঙ্গে এদের মুখের সাদৃশ্য আছে। তাই বলে এরাই যে তারা তার কোনো মানে নেই, অন্ততঃ একটার বিষয় আমি ঠিক জানি যে কখনো তাকে দেখেন নি।'

হাসি বল্লে, 'কোন্‌টার বিষয় শুনি ?' আমি আমার চেহারাটা দেখিয়ে বল্লাম 'অন্ততঃ একে কখেনো দেখেন নি।'

'কি করে জানলেন ?' আমি জেরায় পড়ে জব্দ হবার মত হলাম, তবু

সাহসে ভর করে বল্লাম 'আমার ইনি খুব চেনা লোক, ইনি কখনো এখানে আসেন নি তা জানি।'

হাসি হাসিহীন মুখে উজ্জ্বল চোখে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর বল্লে, 'ঠিক জানেন আসেন নি?'

আমি বল্লাম, 'ঠিক জানি, ইনি, ঠিক ইনিই, কখনো আসেন নি। আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না—'

আমার কথা শেষ হ'তে না দিয়ে হাসি বল্লে, 'বিশ্বাস করা না করা ত' আমার হাত নয়। যাক, ও নিয়ে তর্ক করবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই আর একটী লোককে যে আমি দেখেছি এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, 'সে কি। কবে দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন?'

'এইখানে, ঘণ্টা দুই আগে।'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। [illegible] ঘাটাখানা যে কি জোরে কাঁপতে লাগল তা বলতে পারিনে। [illegible] মধ্যে সামলে নিয়ে বল্লাম, 'ইনি এইখানেই আছেন, আর [illegible] আশ্চর্য্য।'

হাসি এইবার হেসে উঠলেন, [illegible] ঠিক হাসির মত শুনিয়েছিল তা যেন মনে হল না। [illegible] অনেক খোঁজই রাখেন না, যাক আপনার এক [illegible] দেখা করতে চান ত' বড় বাগানে গিয়ে দেখা করে আসবেন।

মা এতক্ষণ চুপ করে এই প্রসঙ্গ [illegible] না। কি যে তাঁর মনে হচ্ছিল জানি না, কিন্তু আমি [illegible] পড়েছি তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি [illegible]। সে তো খুব ভালকথা, আজই আমায় নিয়ে চল না মা [illegible]। [illegible] যখন সময় পাবে যাবে এখন, এখন ওর জলখাবারটা এনে দিই, [illegible]।'

হাসি কিন্তু দাঁড়াল না, [illegible] আমায় খুঁজছে, তার সন্নিসী পুজোর সময় উত্তীর্ণ হ[illegible], [illegible] আপনাকে নিয়ে যাব।'

হাসি চলে গেল—মাও [illegible] অবাক হয়ে যে পথে ঐ অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান করলে [illegible] ভাবতে লাগলাম।

(ক্রমশঃ)

উপাসনা।

উর্দ্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য

অনেক দিন হইতে দেশে কেবলই একটা কলহ বিবাদ চলিয়া আসিতেছে—আমাদিগকে কোন্ সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মায়ের ভাষা ছাড়া কোন ভিন্ন জাতির ভাষাকে যদি আপনার করিয়া লওয়া সম্ভব হইত তবে আমি দেশবাসীকে কহিতাম, তোমরা উর্দ্দু বাঙ্গালা সব ভুলিয়া আরবীকে মাতৃভাষায় পরিণত করিয়া লও। কিন্তু তাহা যে একেবারেই অসম্ভব। এক আত্মার পক্ষে অন্য শরীরে প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, কোন জাতির পক্ষে নিজেদের গৃহের ভাষা ভুলিয়া ভিন্ন দেশের ভাষাকে আপনার করিয়া লওয়াও তেমনই অসম্ভব।

কল্পনা করুন, যদি সমস্ত বিশ্বের মোসলমান জাতির ভাষা আরবী হইত, তাহা হইলে এসলামের বিরাট দেহে যে শক্তি সঞ্চিত হইত তাহার সম্মুখে কি কেহ দাঁড়াইতে পারিত? দুঃখের বিষয় এই কল্পনা কখনও কার্য্যে পরিণত হইবার নয়।

শিশু বয়স হইতে কত সুখ ও দুঃখের কথা, কত স্নেহ মায়ার প্রকাশ, কত স্মৃতি, কত প্রার্থনা, কত পরিচিত প্রাণ, কত হাসি, কত হারাণ কণ্ঠস্বর যে ভাষার সহিত জড়াইয়া আছে, তাহা কি ভোলা যায়? তাহা ভুলিলে আমার যে কিছুই থাকে না। আমি ভিখারী হইতে পারি, দুঃখ-অশ্রুর কঠিন ভারে চূর্ণ হইতে আপত্তি নাই। আমি মাতৃহারা অনাথ বালক হইতে পারি—কিন্তু আমার শেষ সম্বল—ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার ভাষা চুরি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিও না।

দুঃখের দাবদাহে যখন আমার বক্ষ পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন আমি মাতৃভাষায় সান্ত্বনার গীত গাই, যখন প্রবাসে দুঃখ-ক্লেশের মাঝে সংসারকে নিতান্তই অনাত্মীয় বলিয়া মনে হয়—তখন দিগন্তের বাতাস আমার আমারি ভাষায় কত প্রীতির কথা বলিয়া যায়। আমার হারান প্রিয়তমার মুখখানি কতবার নিশীথে আমার বাতায়ন পাশে আসিয়া, আমারি ভাষায় আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যায়। প্রকৃতির শ্যাম মাধুরী, বিশ্ব জোড়া আলোক, বাতাসের হাসি, শ্রাবণের বর্ষাধারা, কালমেঘের অসীম আবেগ কাহার ভাষায় অনন্তের সঙ্গীত শোনায়?

আমার ভাষা কাড়িয়া লইয়া আমাকে দরিদ্র করিও না।

মাতৃভাষাকে কেমন করিয়া ভুলিব? এমন অসম্ভব প্রস্তাব করিয়া আমার

জীবনকে অসাড় ও শক্তিহীন করিয়া দিতে চায়—কে? বিদেশী ভাষায় কাঁদিবার জন্ম কে আমাকে উপদেশ দেয়?

মাতৃভাষার সাহায্যে মানুষের কল্যাণ যত দ্রুত হয় এমন আর কিছুতে হয় না। বিদেশী ভাষায় হুকারজনক অসরলতা ছাড়িয়া মাতৃভাষার ভিতর দিয়া সহজ ও সরল করিয়া দেশবাসীকে মহত্ব ও জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ কর, দেখিবে কত সহজে সে তোমাকে সাড়া দেয়।

গৃহের পার্শ্বে উর্দ্দুর কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী মোসলমানের হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি জাগে না। সে তাহাতে যথার্থ আনন্দ ও শান্তিলাভ করে না। বহু লোককে উর্দ্দুর জয়গান গাহিতে শুনিয়াছি,—তাঁহারা বলেন—উর্দ্দুর ভিতর এসলামের যে সম্পদ রহিয়াছে বাঙ্গালায় তাহা নাই। এতদিন বাঙ্গালী মোসলমান বাঙ্গালা ভাষার সেবা করে নাই। বহু সাধকের সাধনা সে পায় নাই—তাহার এ দীনতার জন্ম সে নিজে দায়ী নহে।

উর্দ্দুর ভিতর এসলামের অনেক সম্পদ রহিয়াছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সে সম্পদ লৌহ কীলকাবদ্ধ হীরক স্তূপের মত নিরর্থক হইয়া আছে। সে সম্পদে মানুষের কোন কল্যাণ হইয়াছে কিনা জানি না। অনুবাদ ও প্রাণহীনতার নির্দ্দয় চাপে সারা উর্দ্দু সাহিত্যটা একটা মরু মাঠের মত অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। উহাতে একটু জল পাওয়া যায় না। উহাতে ঈশ প্রেমের যথেষ্ট ছড়াছড়ি আছে,—কিন্তু স্নেহ সহানুভূতির ক্ষীণ পরশ নাই। উহাতে দাসজীবনের অবনত মাথা আছে,—স্বাধীন চিত্তের সবল সহজ প্রীতি গন্ধ নাই।

যাঁহারা উর্দ্দু বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস চিত্তের প্রসারতা ও দৃষ্টির খুব অভাব। উর্দ্দু সাহিত্য নিজের প্রিয়তমাকে লইয়া নির্জ্জনে প্রেমালাপ বা কাঁদাকাঁদি করিলেও উহা মানব হৃদয়ের ব্যথা বেদনার কোন খবর রাখে না। মানুষকে সূক্ষ্মভাবে ভাবের স্পর্শ দিয়া আঘাত করিবার সার্থকতা স্বীকার করে না—ইট সুরকীর কথা না ভাবিয়া ইমারত গড়িবার দুরাশা সে রাখে। যে মানব হৃদয় লইয়া জাতির বিরাট হৃদয় গঠিত—তাহাকে সে একেবারেই বাদ দেয়।

কলিকাতার নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোক উর্দ্দুভাষী—ইহাদের স্বভাব প্রকৃতি হিংস্র জন্তুরই সমান। উর্দ্দু সাহিত্যে যদি এমন কোন শক্তি না থাকে যাহার স্পর্শে আসিলে মানুষের আত্মবোধ জন্মে, সে তাহার জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে, তবে সে সাহিত্যের সার্থকতা কোথায়? শুধু

নিম্ন শ্রেণী বলিয়া কথা নহে, উর্দ্দু ভাষী উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেও সাধারণতঃ স্নেহ-সহানুভূতি ও কোমল স্বভাবের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। জীবনের উচ্চ রকমের সার্থকতার কোন খবর ইহারা রাখেন না, দুই একজন আত্মীয়, মাতা পিতা ও পত্নী ছাড়া ইহারা সকলের প্রতিই নিষ্ঠুর। অথচ ইহাঁরা এসলামের মুক্তি চান। মুক্ত এসলামের স্বরূপ ইহাঁদের কাছে কেমন, তাহা তাঁহারাই জানেন—হয়ত কতকগুলি দালান কোঠা, ভিন্ন জাতীয় মানুষের আভূমি নত মাথা—বালাখানার পরাধীন দাস দাসীর সেবা।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা।

নারায়ণের নিকষমণি।

ব্যক্তি ও সমাজ। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী বি, এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বি, প্র, ভাণ্ডার গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। মূল্য ছয় আনা রাজবন্দীরূপে আবদ্ধ থাকিবার সময় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের গতি ও স্থিতি সম্বন্ধে যে প্রশ্নগুলি লেখকের মনে উদিত হইয়াছিল সেইগুলি স্ত্রীকে পত্র লিখিবার ছলে এই পুস্তকখানির মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ, স্বীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র, সহধর্ম্মিণীর আদর্শ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। লেখকের প্রকৃতি অনেকটা রক্ষণশীল, গতি অপেক্ষা স্থিতির দিকেই তাঁহার স্বাভাবিক টান অধিক। সুতরাং সামাজিক ব্যাপারে পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করিয়াও তিনি অনেক সময় পুরাতন আদর্শকে সনাতন নাম দিয়া নূতন রূপে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে এই ভাবটী বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে নাকি স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন-হৃদয়, শুধু ভিন্ন দেহ। লেখকের মতে "তাই স্বামী দুষ্ট হইলেও স্ত্রী প্রার্থনা করে জন্ম জন্মান্তরে তোমাকেই যেন স্বামী পাই।" সত্যই কি তাহাই হয়? যুক্তিগুলি নব বিবাহিত যুবক ভিন্ন অপর কাহারও মুখে শোভা পায় না।

কিন্তু স্থানে স্থানে একদেশদর্শিতাদুষ্ট হইলেও পুস্তকখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। লেখকের ভাষা সরল ও মার্জ্জিত, এবং প্রত্যেক প্রবন্ধেই তাঁহার সমাজের প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

জর্ম্মনির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। প্রাপ্তিস্থান ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

পুস্তকখানি Evolution of German Statecraft নামে Contemporary Review পত্রিকায় যে প্রবন্ধ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয় তাহার বঙ্গানুবাদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জর্ম্মানী ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কিরূপ শিক্ষা ও ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া জর্ম্মানী এক 'নেশনে' পরিণত হইয়া বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া জগতকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছিল এই পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। মূল প্রবন্ধ ইংরাজের লিখিত, সুতরাং তাহাতে কতকটা ইংরাজ-জাতি-সুলভ সঙ্কীর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বাংলা অনুবাদটিও সেই কারণে এক-দেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। জর্ম্মানীর রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বক্রগতি জর্ম্মানীর অধঃপাতের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইংরেজ বা ফরাসী জাতির জীবনেও কি সেই বক্রগতি নাই?

পুরুষকার

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম, এ, বি, টি প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান অল-ইণ্ডিয়া পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড, ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৵০ আনা।

নিষ্ফল অদৃষ্টবাদের চাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া আমাদের দেশের যুবকেরা যাহাতে আত্মনির্ভরশীল ও অধ্যবসায়ী হইয়া উঠে, সেই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তিকা-খানি রচিত।

এই সাধু উদ্দেশ্যের আমরা সফলতা কামনা করি।

পথের সাথী

শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত, প্রকাশক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় পয়সা।

পুস্তিকাখানি স্বামী স্বরূপানন্দের কতকগুলি উপদেশের সমষ্টি। উপদেশগুলি সজীব, বিদ্যুদগর্ভ, অসাড় প্রাণে সাড়া আনিয়া দেয়।

"ছোট বড়, উচ্চ নীচ, সকলকে লইয়া দেশ। ইহাদের কাহাকেও বাদ দিয়া তুমি দেশকে তুলিতে পার না। ছোটকে বাদ দিলে বড় ছোট হইয়া যাইবে, বড়কে বাদ দিলে ছোট ছোটই রহিবে। দেশ উঠিবে না।"

"আমরা প্রেম পাই না ; কেবল প্রেম দেই না বলিয়া। * * আমাদের যদি প্রেমই থাকিত, ঘরে ঘরে দশটা করিয়া উনান জ্বলিত না, বিশটা করিয়া জাতি হইত না, ধর্ম্ম কর্ম্ম—সব ভাতের হাঁড়িতে যাইয়া প্রবেশ করিত না।"

"এক একটা করিয়া বিপদের পাথর দিয়া যে বিরাট, বিস্তৃত মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহারই মধ্যে কীর্ত্তি দেবতার প্রতিষ্ঠা।"

"পরকে ভাল বাসিয়াছ কি? নিজের কথা ভুলিয়া যাইয়া মুখের গ্রাস ক্ষুধিতেরে তুলিয়া দিয়াছ কি? একটা ছাগ শিশুকে বাঁচাইতে চাহিয়া আপনার শির যূপকাঠে পাতিয়াছ কি? যদি করিয়া থাক, উপাসনায় তোমার কিসের প্রয়োজন?"

এই জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে আশা করি পুস্তিকাখানি সকলের নিকট আদৃত হইবে।

খুকুর জন্ম।

(শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়)

কামনা-বাসনা-রূপে হৃদয়ে লুকায়ে ছিলি
আনন্দ মুরতি ল'য়ে খুকু হ'য়ে দেখা দিলি।
সন্ধ্যার সে মেঘমাঝে এঁকেছিনু ছবি তোর
জাগিত মা তোর তৃষা রজনী হইলে ভোর।
সাগরের ঢেউমাঝে দেখেছিনু তোর মুখ
জীবনে সাধনা মোর তুই মোর সব সুখ।
বিশ্বের মঙ্গল রাশি তুই মোর মা আমার
তুই মোর ব্রতপূজা বস্তু ধ্যান ধারণার।
আঁখি তোর আনে প্রাণে বিশ্বের বারতা রাশি
স্বর্গসুধা ঢালে প্রাণে তোর ক্ষুদ্র কল হাসি।
অমৃত সমান মাগো কোমল পরশ তোর
শব্দে ফুটে কত ভাষা শুনিয়া আপনা ভোর।
সুখে তুই সুখরবি দুখে তৃপ্তি সান্ত্বনার
নারীত্বের সার্থকতা বিধাতার উপহার।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] [ভাদ্র, ১৩২৮ সাল।

সত্য ও সৌন্দর্য্যবোধ

[অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার]

ফরাসী দার্শনিক বার্গস্ বলেন যে আমাদের সত্যোপলব্ধি দুই প্রকারে হইয়া থাকে,—এক জ্ঞান অথবা যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা আর অনুভূতির সাহায্যে।• জ্ঞানের দ্বারা যে সত্যোপলব্ধি হইতেছে তাহার বিশালতা মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, জ্ঞানগরিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া তাহার মনে হয় জ্ঞানই জীবনের সার। সামান্য একটী বালুকণার মধ্যে এত অসংখ্য সত্য নিহিত আছে যে ইহাও তাহার ধারণার অতীত হইয়া পড়ে। যে দিকেই তাকায় সে দেখিতে পায় কত শাস্ত্র ও বিজ্ঞান জ্ঞানের ধারা প্রশস্ত করিয়া চলিয়াছে,—দিনের পর দিন তত্ত্বের সহিত তত্ত্ব সংযোজিত হইয়া সৃষ্টির বিশালতা বাড়াইয়া দিতেছে। একদিকে যেমন জ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব বিস্তারে তাহার মন অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠে,—আর একদিকে তেমনই মানুষের জ্ঞানকে মানুষের চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়া সে নিজেকে এত ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে যে জীবনে মরণে কোথাও যেন সোয়াস্তি পায় না,—এই নিখিলবিশ্বে আশ্রয়হীন প্রবাসীর মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সেইজন্য আজ বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য জগতে হৃদয়ের এত শূন্যতা, এত হাহাকার দ্বিধা ও অসন্তোষ। জর্ম্মান কবি গায়টে তাঁহার রচিত ফাউষ্ট্-চরিত্রে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতেরই প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন। বিপুল

• কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় "সাহিত্যে অনুভূতি" নামক প্রবন্ধ দেখুন

তাহার ঐশ্বর্য্য, অফুরন্ত তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার, অমেয় তাহার শক্তি,—যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষার, যাহা কিছু কামনার সবই তাহার হস্তগত,—তবুও,—তাহার অন্তরাত্মা চির-ক্ষুধিত, সে সমস্ত জগৎ পাইতে গিয়া নিজেকে হারাইতে বসিয়াছে। যদি কেবল জ্ঞানের চর্চ্চায় অথবা কর্ম্মের উল্লাসে সুখ ও শান্তি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আজিকালিকার পাশ্চাত্য মনীষিদিগের রচনার মর্ম্মস্থলে এমন হতাশের শ্বাস ও বুকফাটা দুঃখ গুমরিয়া উঠিত না। ইউরোপ তাহার মনের গভীর অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণাকে এবং প্রয়াসের ব্যর্থতাকে ভুলিবার জন্ম অহমিকার তাণ্ডবনৃত্যে জগৎটা দলিত মথিত করিয়া তুলিয়াছে,—কিন্তু এই নটরাজের নর্ত্তনে মাধুর্য্য যতখানি দেখা যায় ভীষণত্ব ও ক্ষুব্ধ বেদনা তার চেয়ে ঢের বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, হৃদয়হীন জ্ঞান ভাঙ্গিতে পারে, গড়িতে পারে না; সংহার করে, সৃষ্টি করে না। বরং সৃষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সে যে নূতন সংসার পাতাইতে চায় তাহাতে প্রাণের আনন্দ বড় থাকে না, রক্তমাংসের মানুষ সেখানে শান্তি পায় না। জ্ঞানের সহিত মানব-মনের এইরূপ একটী দ্বন্দ্ব আছে বলিয়া, শিল্প ও সাহিত্যের প্রয়োজন, কারণ উহারা অনুভূতির সাহায্যে এই দ্বন্দ্বকে ঘুচাইতে চেষ্টা করে, হৃদয়ের সহিত জ্ঞানের পার্থক্য লোপ করিয়া ইহাকে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলে। জ্ঞান যখন সমস্ত পৃথিবীকে আমাদের পদতল হইতে সরাইয়া নিরবলম্ব মহাশূন্যে আমাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিতে চায়, শিল্পী তখন এই জীবধাত্রী ধরণীর সহিত আমাদিগকে আবার স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া দেন,—জ্ঞানকে ভাবের দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া সৃষ্টির লীলার সহিত তাহাকে একাত্মবোধ করান্। নিয়মের অন্ধ আবর্ত্ত, কার্য্যকারণ পরম্পরার নিষ্ঠুর তাড়না হইতে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া তিনি একটী স্নেহপূর্ণ কুটীর রচিত করেন, চির-পিপাসার্ত্ত মানবাত্মার জন্য প্রেমের উৎস খুলিয়া দেন, তখনই আমরা ভুলিয়া যাই যে আমাদের আবাসের চতুর্দ্দিকে উত্তপ্ত বালুকারাশি প্রমত্ত ঝটিকায় আলোড়িত হইতেছে!

জ্ঞানচর্চ্চার একটী স্বাভাবিক পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি যাঁহাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানচর্চ্চা সহজ। কি পদ্ধতিতে জ্ঞানানুশীলন করিতে হইবে ইহা জানিবার শিখিবার বিষয় এবং জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। অল্পাশ্রের

কতকগুলি মূলসূত্র জানা থাকিলে যেমন তাহাদের সাহায্যে অসংখ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় এবং ইহাতে যেমন বিশেষ প্রতিভার অথবা মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয় না,—তেমনই জ্ঞানের সূত্র যাঁহাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে, নূতন তত্ত্ব-আবিষ্কার তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে। কেবলমাত্র জ্ঞান-চর্চ্চার দিক হইতে দেখিলে, রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ড অথবা মহাত্মা পেরিক্লিসের সময়ের এথেন্স যে খুব উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল একথা বলা যায় না, কিন্তু ঐ সব ঐতিহাসিক যুগের বিশেষত্ব এই যে তখনকার সমাজে জ্ঞানের স্পন্দন সর্ব্বত্রই কমবেশী পরিমাণে অনুভূত হইয়াছিল,—তাঁহারা স্বতঃই জ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে যোগ করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন। জ্ঞানকে কেবল অনু-শীলনের বিষয় কবিয়া ফেলিলে তাহাতে কেমন যেন একটা জড়ত্ব আসিয়া পড়ে,—মানুষের সমগ্র সত্তা তাহাতে উদ্বোধিত হয় না এবং এইরূপ জ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিতে পারে না। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞানানু-শীলন যেরূপভাবে চলিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যেন মানবের মন জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার যন্ত্রবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জ্ঞানের সীমা কোথায় এবং কিসের জন্য, কাহার জন্য যে এই জ্ঞান,—এ কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই। টাকা করিবার নেশা যখন মানুষকে পাইয়া বসে, তখন অঙ্কের পর অঙ্ক ফেলিয়া তাহার যেমন সুখ,—লক্ষ ছাড়াইয়া নিযুত, নিযুত ছাড়াইয়া কোটি হইয়া যায় তবু তাহার সঞ্চয় প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না—এ টাকার কতটুকু যে ভোগে লাগিতে পারে নেশার ঝোঁকে সে কথা সে একবার ভাবিয়া দেখে না—এ যেন শুধু একটা রেষারেষি পাল্লাপাল্লির ব্যাপার হইয়া পড়ে,—তেমনই জ্ঞানের নেশা যখন কোনও সমাজকে পাইয়া বসে তখন জ্ঞানই মুখ্য, জীবন গৌণ হইয়া দাঁড়ায়—জ্ঞানের চাপ প্রকাণ্ড একটা জড়স্তূপের ন্যায় মানুষের মনকে নিষ্পেষিত করিতে থাকে, জীবনের সুখশান্তি বিনষ্ট করিয়া দেয়।

জ্ঞানের সহিত যদি আনন্দের যোগ না থাকে, তাহা যদি আমাদের জীবনে ভাব-তরঙ্গ উত্থিত করিয়া প্রাণের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারে তাহা হইলে এইরূপ জ্ঞানের স্বভাব ধর্ম্মই এই যে ইহা কর্ম্ম জগতে সাফল্য লাভ করিতে চায়। বৈজ্ঞানিক সত্যের সেই জন্য কর্ম্মের সহিত একটা নিগূঢ় যোগ আছে—বিজ্ঞানের সার্থকতা কর্ম্মে। সাহিত্যও একহিসাবে আমাদিগকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে বটে; কিন্তু সে কর্ম্ম স্বভাবোচিত, আনন্দ নিঃসৃত,—মানুষের সঙ্গে মানুষের অথবা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে সরল স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহারই সহিত বিশেষ

ভাবে সম্পর্কিত। বৈজ্ঞানিক সত্য একদিকে যেমন নির্ব্বিকার আর একদিকে তেমনই ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্বদ্ধ আমাদের সংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। সেই জন্য ভিতরকার মানুষের সঙ্গে,—আমাদের অন্তরতম প্রকৃতির সহিত,—বিজ্ঞানের যোগ অতি ক্ষীণ বৈজ্ঞানিক জগতের কর্ম্মে উৎকর্ষ লাভ চিত্তের শুদ্ধি, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি অথবা ভাবের কমণীয়তা জ্ঞাপিত করে না। আমাদের বাহ্য-প্রকৃতিকে,—জীবনের বহিরঙ্গকেই বিজ্ঞান মার্জ্জিত করিতে চাহিয়াছে—কিন্তু সেই পরিমাণে মানুষের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করে নাই। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মের কোনও শেষ দেখিতে পাওয়া যায় না কারণ জড় শক্তির অসংখ্য যোগাযোগের উপরই ইহার ভিত্তি। কর্ম্মের জটিলতা যত বাড়িতে থাকে ইহা ততই যেন মানুষকে আরও বেশী কর্ম্মে নিয়োজিত করে,—সমস্ত জীবনটাকে একটা প্রকাণ্ড কলকারখানায় পরিণত করিয়া তবে ছাড়ে। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মের ফাঁসে যদি মানুষ একবার নিজেকে ধরা দেয় তবে তাহা হইতে যতই মুক্ত হইবার চেষ্টা করে, যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কর্ম্ম কমাইতে চায়,—ততই যেন তাহাতে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ে কর্ম্মকাণ্ডের যে বিশাল যজ্ঞ আরব্ধ হয় তাহাতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ আহুতি প্রদান করিয়া নিজেকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করে।

সাহিত্য ও শিল্পের প্রধান একটী কাজ এই নীরস জ্ঞান, এই কর্ম্মের জঞ্জাল হইতে মানুষকে রক্ষা করা। আমরা যে জ্ঞানের কারা রচিত করিয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি, শিল্প বা সাহিত্য তাহাকে দু চারিটী গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া বাহিরের বাতাস ও আলো আসিবার পথ খুলিয়া দেয়,—এই যে চিরকল্লোলিত জীবনের স্রোত, অবারিত শূন্যতলপথে সৃষ্টির এই যে অনাদি আবেগ ধারা জল স্থল গগন পূর্ণ করিয়া এই যে অভিনব সৌন্দর্য্যের কত বিচিত্র বিকাশ, ইহাদের সহিত আমাদের নিত্য নূতন পরিচয় করাইয়া দেয়। কর্ম্মজীবনের সংকীর্ণতার মধ্যে একটী অজানিত পুলক, একটী দূরাগত মুক্তির স্বাদ্ বহিয়া আনে। বাস্তবের প্রকাশকে জ্ঞানের দিক হইতে না দেখিয়া, হৃদয়ের দিক হইতে, সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্তি-হিসাবে দেখিতে চেষ্টা করে। এই হিসাবে ভুলভ্রান্তি থাকিলে তাহার বেশী কিছু আসে যায় না কারণ সাহিত্যের জ্ঞানকে ত আর কর্ম্মের নিক্তিতে "ওজন" করিয়া লইতে হইবে না,—তাহার সার্থকতা কর্ম্মে নহে, আনন্দে। জ্ঞানের যে অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে যত আনন্দ দান করিতে পারে সেই জ্ঞানই সাহিত্যকে তত পরিপূর্ণ করিয়া দেয়।

সমুজোচ্ছ্বসিত আনন্দ শিল্প ও সাহিত্য সমস্ত জ্ঞানের কূল প্লাবিত করিয়া কর্ম্ম-জীবনের কাঠিন্য ও শুষ্কতার মধ্যে রসের সঞ্চার করে। যে জ্ঞানের সহিত আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধ,—গরজের দায়,—তাহাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত করিয়া তুলে ;—তাহার ভিতর একটা স্পন্দমান যে আনন্দের রেখা তাহাকে দীপ্তি-প্রদান করিতেছে, যাহার সহিত আমাদের সাংসারিক সুখসাচ্ছন্দ্যের কোনও প্রকাশ্য যোগ নাই,—সেইটিকেই বিশেষভাবে প্রতিফলিত করিতে চায়। সাহিত্যে আমরা জ্ঞানের যে পরিচয় পাই—তাহা তাহার সরল নগ্ন মূর্ত্তি, ব্যবহারিকজীবনের প্রয়োজন অপ্রয়োজন, সুবিধা অসুবিধা ইহার সৌন্দর্য্য বিকৃত করিয়া তুলে না,– কিম্বা কর্ম্ম সৃষ্টি করিবার অত্যগ্র আকাঙ্ক্ষা ইহাকে শত সহস্র-ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলে না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এত জটিল, কঠিন নীরস হইয়া পড়িতেছে কারণ ইহার চুলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলেই কর্ম্মজগতে বিভ্রাট উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন সহজ সরলভাবে, প্রাণের উৎসারিত আনন্দে,—আমরা জ্ঞানকে দেখিতে পাই, তখন তাহা আপনিই সাহিত্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে। আবার যদি জ্ঞান অলীক ঔৎসুক্যে চালিত হইয়া নূতনত্বের প্রলোভনে নিজের সীমার এবং পথের নির্দ্দেশ না করিয়া মনে করে, চলাতেই বুঝি একটা সার্থকতা আছে, তাহা হইলে জ্ঞানের এই জটিলতার মধ্যে, যুক্তিবুদ্ধির এই বিড়ম্বনার ভিতর সাহিত্য তাহার দিব্যদৃষ্টি লইয়া একটী সহজ পথ আবিষ্কার করে,—সে পথের সুবিধা এই যে তাহাতে আর কিছু না হউক মানুষের মনে তৃপ্তি ও শান্তি দেয়, জ্ঞানের অহেতুক বিক্ষোভ হইতে তাহাকে রক্ষা করে। দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই সাহিত্যের মধ্যে আসিতে পারে, যেখানে শুধু বাস্তব তত্ত্বের আলোচনা নাই অর্থাৎ সত্যের সহিত প্রাণের অনুভূতি আছে। আমাদের উদ্ভাবিত প্রায় সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানই সাহিত্যে ক্রমশঃ স্থান পাইতেছে এবং তাহাকে ব্যাপ্তি প্রদান করিতেছে। কিন্তু সাহিত্যে আসিলেই সে জ্ঞান ভিন্নাকৃতি হইয়া একটী অখণ্ড মূর্ত্তিতে দেখা দেয়,—অন্তরের সম্পূর্ণতা তাঁহাতে প্রতিফলিত হয়। যখন এইরূপ সম্পূর্ণভাবে আমরা জ্ঞানকে উপলব্ধি করি অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতির কেবলমাত্র একটা দিক নহে, যখন তাহা সমগ্র অন্তরাত্মাকে ভরিয়া দেয়, তখনই সেই জ্ঞানের ভিতর সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হয়, তখনই আমরা অনুভব করি—সত্য ও সুন্দর এক। সত্যমাত্রই সুন্দর একথা বলিতে পারি না, কিন্তু তেমন শিল্পীর হাতে পড়িলে, তাঁহার অন্তরের "জ্বালায়" নির্ব্বাসিত হইলে, প্রত্যেক সত্যই সুন্দর হইতে পারে।

জ্ঞানের প্রকৃতিই এই যেন সে অচল, স্থির,—জড়জগতের চাঞ্চল্য এবং প্রাণের সদা প্রবাহিত গতি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে, গতির মধ্যে স্থিতি, ঝটিকার মধ্যে শান্তি, পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ব্যাপ্তি দেখিতে চায়। সেই জন্য জ্ঞানের' জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের জগৎ হইতে ভিন্ন। আমাদের চক্ষের সম্মুখে যাহা চিরসঞ্চালিত, প্রাণ পূর্ণ, গতিমান,—জ্ঞানের নিকট তাহা স্থির অচঞ্চল গুণের সমষ্টি। আমরা নিজের প্রাণের ভিতর যে অবারিত গতি অনুভব করিতেছি তাহার সহিত ইহার যেন কোনও যোগ নাই,—এ নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার যোগী,—নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত,—আমাদের ঘরকন্নার সামান্য সুখদুঃখের সহিত, আমাদের আবেগ বিহ্বল হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। জ্ঞানের এই অস্বাভাবিক স্থৈর্য্য, এই প্রশান্ত নির্লিপ্ত ভাব আমাদের হৃদয় পীড়িত করে তাই সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে ভুলাইয়া এই তাপস কুমারকে আমাদের সংসারেতে লইয়া আসেন, —অমনই আনন্দের ধারা বর্ষিত হইয়া জগৎ আবার নূতন রূপে আমাদের নিকট ধরা দেয়। আমাদের মধ্যে এমন একটা প্রেরণা আছে, যাহাতে শুধু জ্ঞানে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে দেয় না। সেই জন্য প্লেটো তাঁহার দর্শনতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া সাহিত্য-রচনা করিতে বসেন,—বেদান্তদর্শন হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হইয়া হৃদয়ের জিনিষ হইয়া যায় আর বর্ত্তমান যুগের ব্যর্গস সাহিত্যিক কি দার্শনিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাস্তবিক সেই একই প্রেরণা যাহা আমাদের মনকে জ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহাই আবার জ্ঞান হইতে অনুভূতির দিকে আমাদিগকে সঞ্চারিত করিতেছে। কারণ দেখিতে গেলে আমাদের জ্ঞান যাহা বাস্তবের বহিঃপ্রকাশের উপর স্থাপিত তাহাও'ত একেবারে নিশ্চল, স্থির নহে। ইহারও গতি আছে, ইহা ক্রমশঃই ব্যাপকতর হইয়া চলিয়াছে কিম্বা গভীরতর হইয়া অনুভূতিতে মিশিয়া যাইতেছে। আজ যাহা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কাল তাহা জগৎ ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যায়। জড ও শক্তির দেহ ও চৈতন্যের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির জ্ঞান ও অনুভূতির ব্যবধান ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। এবং এই ব্যবধানকে তিরোহিত করিয়া সাম্যে পরিণতি লাভ করানই সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য।

সত্য—শুভ্র, নিরঞ্জন, অমূর্ত্ত, রূপরসশব্দ গন্ধ স্পর্শহীন। মানবের জ্ঞানে তাহার সব চেয়ে নির্ম্মল প্রকাশ অঙ্কশাস্ত্রে এবং অন্যান্য মানবীয় শাস্ত্র যতই ইহার সান্নিধ্যে গমন করে, যতই অঙ্কশাস্ত্রের

যত হইয়া পড়ে, ততই আমাদের জ্ঞানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সত্যকে শব্দে আবদ্ধ করা যায় না, বাক্যের দ্বারা ইহার স্বরূপ বিবর্ত্তিত হয় না। আমাদের বস্তুজ্ঞান যেমন একদিকে রূপ হারাইয়া অরূপের মধ্যে যাইতেছে,—বৈজ্ঞানিক সত্য ক্রমশঃই—অঙ্কে, কেবলমাত্র সাঙ্কেতিক চিহ্নে পরিণত হইতেছে, এবং তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত বিজ্ঞান আপনাকে অসম্পূর্ণ বিবেচনা করে,—আর একদিকে তেমনই অরূপ এই যে সত্য, রূপের পর রূপের মধ্য দিয়া, স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে। সত্যের এই বহির্মুখী যাত্রা,—জ্ঞানের দিকে বিকাশই বি-জ্ঞান, আর তাহার অন্তর্মুখী যাত্রা, ভিতরের দিকে বিকাশ,—হৃদয়ের সহিত সমীকরণই সাহিত্য। বাস্তবিক, বিজ্ঞান ও সাহিত্য পরস্পর-বিরোধী নহে,—একই সত্যের দুই প্রকাশ। অথবা ধর্ম্মের ভাষায় বলা যইতে পারে,—বিজ্ঞান নিরাকার চৈতন্যের উপাসনা করে, সাহিত্য সাকার চৈতন্যের উপাসক। বৈজ্ঞানিক সত্য,—চৈতন্য-স্বরূপ, জ্ঞানে বোধ্য,—সাহিত্যের সত্য,—ভাবের আনন্দে রূপে পরিণত।

আমরা যাহা অন্তরের মধ্যে হৃদয়ের ভিতর যত গভীরভাবে অনুভব করি, তাহা তত রূপবান হইয়া উঠে। আসক্তিই সৌন্দর্য্যের মূলাধার। আসক্তিবিহীন ধর্ম্মেই নিরাকার উপাসনা সম্ভব কারণ প্রেম ত কখন আধার ছাড়া হয় না এবং ভালবাসিলেই যে ভাল দেখিতে হয়। অঙ্কশাস্ত্রের মত একেবারে নির্ব্বিকার সত্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না এবং তাহাকে আমরা রূপও দিতে পারি না। সাহিত্যে যে সত্যের অনুভূতি আমরা পাই তাহা একদিক দিয়া না একদিক দিয়া রূপের সহিত সংযোজিত,—সমষ্টির চেয়ে ব্যষ্টি লইয়া সাহিত্য ব্যস্ত এবং ইহা সমষ্টিকে ও ব্যষ্টির মধ্যে দিয়া উপলব্ধি করিতে চায়, মানব-মনের নিগূঢ় সত্য ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার মধ্যে ফুটাইয়া তুলে। প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি সত্য আকারহীন বাষ্পের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে এবং সাহিত্যিক তাঁহার প্রাণশক্তি দ্বারা সেগুলিকে আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করিতে পারে না। যে শক্তিপুঞ্জ প্রকৃতির মূলে থাকিয়া তাহাকে রূপবান প্রাণবান করিয়া দিয়াছে তাহাদের নিজের ত কোনও রূপ নাই। এই যে অরূপকে রূপদান ইহাই সৃষ্টির লীলা এবং তজ্জন্যই সাহিত্যিক স্রষ্টা। বাহ্যজগতে যেমন এই লীলা প্রতিমুহূর্ত্তে কত বিচিত্র রূপে ও বর্ণে কত গন্ধ ও স্পর্শে আপনার মহিমা প্রকাশিত করিতেছে,—অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিয়া দিতেছে,—অন্তর্জগতেও তেমনই এই লীলাভিনয় কত অশরীরি সত্যকে ও মূর্ত্তিবিহীন প্রজ্ঞাকে ভাবের

রূপ দিয়া সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বলিয়া বোধ হয় যে কোন অজানিত রাজ্য হইতে এই মুহূর্ত্তে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমানার মধ্যে আইসে, মানসনেত্রে দেখা দেয়,—পর মুহূর্ত্তেই তাহা কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়ের বাহিরে জ্ঞানের আলোকে মিশিয়া যায়। কাব্যে ভাব ও রূপের এমন অভেদাত্মযোগ, যে একটাকে আর একটা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে আমরা পারি না এবং এই দুইয়ের সংঘাতে চিত্ত আন্দোলিত হইয়া আপনার স্থিতি খুঁজিয়া পায় না,—বাস্তব হইতে চ্যুত হইয়া কল্পনা-প্রবাহে ভাসিয়া যায়। এমন কি গদ্যেও ভাব ও রূপ যে কেমন উঁকি ঝুঁকি মারিয়া চলে তাহা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক পড়িলেই বুঝা যায়। সাহিত্যে উপমা ইত্যাদি—এক কথায় তাহাদিগকে অলঙ্কার বলা যাইতে পারে,—বাস্তবিক তাহারা ঠিক অলঙ্কার নহে,—তাহাদিগকে ইচ্ছা করিলেই খসান' কিম্বা পরাণ' যায় না। তাহারা অনুভূতির রূপে অভিব্যক্তি ভাবের সহিত তাহাদের যোগ, বাহিরের নহে, অন্তরের। জড়জগতে যেমন কোনও শক্তির প্রকাশের সময় সৃষ্টি হয় ও আলো বিকীর্ণ হয় তেমনই ভাব ও রূপ উভয়েই একই অনুভূতির যুগপৎ প্রকাশ,—বাহিরের দিকে ইহা রূপে, ভিতরের দিকে ইহা ভাবে অভিব্যক্তিলাভ করিতে চায়। সেইজন্য আলঙ্কারিকদিগের প্রাচুর্য্য ঘটিলে, রচনার অবনতি হইতে থাকে, কারণ শিল্পসৃষ্টি শুধু অলঙ্কার সংযোজনা নহে।

অনেক সময়ে গদ্যে যাহা নিতান্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, পদ্যে তাহা অপরূপ সৌন্দর্য্যধারণ ও নির্ম্মল আনন্দ প্রদান করিতে পারে। এই আনন্দ কেবল ভাবেও নহে ভাষাতেও নহে,—ভাব ও রূপের সংস্পর্শে চিত্তের যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়, একটি হইতে আর একটিতে যাওয়াতে মনের যে গতি আরব্ধ হয়,—ইহা মুখ্যতঃ তাহারই উপর নির্ভর করে। এই জন্য কাব্য-সমালোচনায় এত মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। কেহ কেবল ভাবের দিক হইতে, কেহ আবার শুধু রূপের দিক হইতে কবিতা বুঝিতে চেষ্টা করেন। একদল ইহাকে টানিয়া টানিয়া আধ্যাত্মিকতার চরম সীমায় গিয়া পৌঁছেন, আর একদল ইহার অন্তরকে বিলুপ্ত করিয়া রূপের মধ্যেই ইহাকে ধরিতে চেষ্টা করেন, উভয়েই ভুলিয়া যান যে প্রাণের অভিব্যক্তি রূপে, এবং রূপের সার্থকতা-প্রাণে। কাব্যে যে একটি অনির্ব্বচনীয়তা আছে, ভাবের যে তড়িৎগতি ইহাতে খেলিয়া বেড়ায়, তাহাকে ব্যাখ্যায় অথবা সমালোচনায় ঠিক বুঝা যায় না কারণ মনের গতি কথায় ধরা পড়ে না।

গীতিকবিতাতে এই গতির দিক্‌টা যেমন সহজে স্ফুট হয়, অন্য কবিতায় তাহা হইতে পারে না। গীতিকাব্যে বহুমুখী গতি অথবা ভাবের জটিলতা নাই, কাজেই প্রাণের মূল সুরটি আপনিই ধরা দেয়। গীতি-কবিতা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন মূর্ত্তিমান জীবন, নিষ্কলঙ্ক গতি। কবি তাঁহার ভাবের শুভ্র গতি ভাষায় নিরোধ করিয়া প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গীত যেমন বিভিন্ন সুরলয়ের মধ্য দিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় মাধুর্য্য বিতরণ করিতে থাকে, এই নিরন্তর গতিই যেমন তাহার শ্রুতিমাধুর্য্যের প্রাণ, এবং ইহাকে স্থিতিমান করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চাহিলে তাহা সঙ্গীত নহে,—শব্দ-বিজ্ঞান,—কাব্যেরও তেমনই একটি আভ্যন্তরিক গতি আছে, যাহার স্বরূপ সহৃদয় পাঠক ছাড়া আর কাহারও কাছে ব্যক্ত হয় না। কবিতা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। কিন্তু অলক্ষ্যে হৃদয়ের সুর বদ্‌লাইয়া যায়, রাগে বর্ণে জীবন ভরিয়া উঠে। কবি তাঁহার ভাবের পশরা লইয়া হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যিনি একবার হৃদয় খুলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি আর তাহা ফিরাইয়া দিতে পারেন না। চিরকালের জন্য ইহা তাহার জীবন-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া যায়। এই খানেই কবিতা ও শিল্পকলার সঙ্গে জ্ঞানের প্রভেদ।

(ক্রমশঃ)

এই ক্লান্ত গোধূলিতে

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১)

এই ক্লান্ত গোধূলিতে কি চাস্ হৃদয়,
রূপ রস-গন্ধ গান কোন্ বিনিময় ?
পশ্চিম আকাশে ওই ওড়ে স্বর্ণ-রেণু
দূরে বাজে গৃহে-ফেরা রাখালের বেণু,
তরুতলে তরুছায়া দীর্ঘ হ'য়ে নামে
মুখর তরঙ্গগীতি শ্রান্তির আরামে

মৃদুতর হ'য়ে আসে ; পূরবীর সুরে
দিগন্ত ঘিরিয়া ওই দূরে দূরে দূরে
নামে গাঢ় সান্ধ্য ছায়া ; ঘন কলরবে
আপন কুলায় ছোটে বিহঙ্গম সবে
এর মাঝে ওরে হিয়া কি চাহিস্ দান
কোন্ আকাঙ্ক্ষায় তুই কি গাহিবি গান ?
কিছু নয় কিছু নয় কহিছে হৃদয়—
শুধু শূন্যে চেয়ে থাকা রিক্ততা সঞ্চয় ।

(২)

এই শান্ত সন্ধ্যাবেলা কি চাহিস্ মন
শব্দ স্পর্শ প্রেম প্রীতি কোন্ পরশন ?
নিবিড় নীলিমা ওই সুনীল আকাশে
ঘনতর হ'য়ে আসে, সুধীর বাতাসে
দূরে ফেরা অপ্সরীর নূপুর-গুঞ্জন
দিগন্তের কোলে কোলে করে সঞ্চরণ
নিবিড় স্বপ্নরাশি , এক দুই করি'
আকাশের বক্ষ ওঠে তারকায় ভরি,
লক্ষ কোটি জোনাকিরা পলে পলে পলে
কোন্ রত্ন সম্পাদিয়া ঘুরি ফিরি চলে
এর মাঝে ওরে মন কি চাহিস দান
কোন্ আকাঙ্ক্ষায় তুই কি গাহিবি গান ?
কহে মন—আর কিছু আর কিছু নয়
শুধু শূন্যে আঁখি তুলি স্বপন সঞ্চয় ।

(৩)

এই মৌনে নিশিথিনী ওরে মর্ম্ম মোর
আজি তোর বক্ষতলে কোন্ স্বপ্ন ঘোর ?
নিবিড় রহস্য-বেগে অঞ্চলের মাঝে
অনন্তগগনব্যাপী কোন্ সুর বাজে
অচঞ্চল অচপল ; দিনান্তের স্মৃতি
ডুবে গেল কোথা , কোন সমাধির গীতি

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করিল মহান্‌
নিবিড় মৌনতা ঘিরি', বিরাট শয়নে
নভস্থলে কার পাতা ঝিকি ঝিকি ঝিকি
লক্ষ কোটি তারা জলে কার কথা লিখি
দৃপ্ত মোহে, এর মাঝে ওরে মর্ম্ম মোর
আজি তোর বক্ষস্থলে কোন্‌ স্বপ্ন ঘোর?
মর্ম্ম কহে স্বপ্ন মোর স্বপ্ন এবে মোর
বক্ষে শুধু খুলি' রাখি অসীমের দোর।

চিঠির গুচ্ছ

দুই দফা

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

(৩)

নরেশ,

তোমার চিঠির শেষ দিকটা প'ড়ে সত্যই বিস্মিত হলুম। নারীর প্রাপ্য অধিকার তাকে কে দেবে? তোমার দেশের পুরুষ? যার নিজেরই কোন বিষয়ে অধিকার নেই কাঙ্গালের প্রবৃত্তি নিয়ে যে বিশ্বে বড় হতে চায়, আপনাকে শতরকম বন্ধনে বেঁধে ফেলে জীবনের আদর্শ ক্ষুদ্র হতে সে ক্ষুদ্রতর করে ফেলেচে, সে সেকি কখনো পারে অন্যকে মুক্তিদান করতে?

ভিক্ষা করে নারী স্বাধিকার লাভ করবে না তাকে, যখনই হোক জোর করেই নিতে হবে। এই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হয়ে গেল, এই দীর্ঘকাল ধরে বাংলার নারীরা কি সমাজের পরিবারের প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রত্যেকটি দিন শতরকমে তাদের দৈন্যের কথা, বেদনার কথা জানায় নি? কি তোমরা করেচ? স্বামীহীনা নারী যখন পরিবারের গলগ্রহ স্বরূপ হয়ে তাচ্ছিল্য, অবমানায় ক্ষুব্ধ হয়ে নারীচিত্তের মাধুর্য্য বর্জ্জন করে জীবনটাকে একটা দুর্ব্বহ বোঝা বলে মনে করে, তখন তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের একটা

ভুয়ো আদর্শ খাড়া করে তার রক্ত-মাংসে গড়া শরীরের দাবী অগ্রাহ্য করে এসেচ—নির্য্যাতিত হয়ে রোগে ভুগে যখন অকালে তারা প্রাণত্যাগ করচে; তখন সধবা-অবস্থায় মৃত্যুতে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে বলে উল্লাসে নৃত্য করেচ—অশিক্ষায়, কুসংস্কারে তারা যতই নীচে নেমে যাচ্ছে—ততই তোমরা জোর গলায় গার্গী, লীলাবতী, সীতা সাবিত্রীর আদর্শ প্রচার করছ।

তোমরা ত তাদের চাইতে উন্নত শ্রেণীর জীব—চোখ ঘুরিয়ে তাদের ওপর কর্ত্তৃত্ব করতে তোমরা না কি ভগবানের পরোয়ানা একেবারে হাতে নিয়েই জন্মগ্রহণ করেচ, তোমরা তাদের শুধু অভিভাবক নয়, তাদের ইহকালের সম্বল পরকালের গতি, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতে পার যে, তাদের দুখ বেদনার কথা স্থির ভাবে চিন্তা করে তোমরা তা বিদূরিত করতে এতটুকু চেষ্টা কখনো করেচ? তোমরা তা করনি, অধিকন্তু যারা চেয়েচেন শত্রুজ্ঞানে তাদের তোমরা পরিহার করেছ।

তুমি ভাবছ পুরুষ আগে মুক্ত হোক, তারপর নারীকেও সে আপনার পাশে টেনে নেবে। তা হয় না, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মাতৃ-দুগ্ধের সঙ্গে দেহের রক্তমাংসে মিশে না গেলে—জীবনের জড়তা ঘোচে না। তুমি শক্তিক্ষয়ের আশঙ্কা করছ, এই জন্তই যে,তোমার ভিতরে শক্তি সঞ্চারিত হচ্চে না—বাইরের কর্ম্ম প্রেরণা জাত আকস্মিক একটা শক্তি তোমার মাঝে চাঞ্চল্য এনে দিয়েচে মাত্র। মায়ের দান ব্যতীত সে দেহের অথবা মনের শক্তিলাভ যে অসম্ভব। এ কথা ত প্রাণীতত্ত্ববিদগণই বলে থাকেন। বহু প্রমাণ প্রয়োগে তাঁরা এ সত্য নির্ণয় করেচেন।

আমি অনেক কিছু ভাঙতে চাই, একথা সত্য, কিন্তু আমার কার্য্য পদ্ধতিটা তুমি ঠিক ঠিক ধরতে পারনি। তুমি ভাবচ, যে নারীর অধিকার তাকে দেবার জন্ত আমি দেশের পুরুষদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেব; না—আমি তা মোটেও করব না, সে সম্বন্ধে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমাদের মেয়েরা নিজেদের শক্তির পরিচয় যে কখনো পায়নি, তাইত ভয়ে সঙ্কোচে সরমে সর্ব্বদাই জড়-সড় হয়ে এক কোণে পড়ে থাকে। তাদের মনের এই দৈন্তই আমি ঘুচাতে চাই—যদি তা না পারি, তা হলে তোমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছু এসে যাবে না। আপনাদের মুক্তি তারা আপনারাই আনতে পারবে। শুধু তাই নয়, তোমাদেরও মুক্তির আনন্দ বুঝতে সক্ষম হবে।

আর একটা কথা, তুমি নিশ্চতই লক্ষ্য করেছ যে আমাদের মেয়েরা স্নেহময়ী বটেই অধিকন্তু স্নেহের আতিশয্যে পীড়িত! তোমরা এই আতিশয্যের গৌরব কর—আমি কিন্তু ব্যথা পাই। বলতে পার, এ আতিশয্য কেন! আমার মনে হয় দুনিয়ার সব কাজে ওদের বঞ্চিত রেখেচ বলেই তাদের অন্তরে নিহিত সেবার আকাঙ্ক্ষাটা তৃপ্ত হতে পারচে না—আর তার জন্যই তাদের যা কিছু দেবার সব স্নেহের আকারে ঢেলে দিচ্চে, নিজেদের হৃদয় একেবারে খালি করে। অতিরিক্ত স্নেহদানের আকাঙ্ক্ষা একটা মানসিক ব্যাধি।

বিজ্ঞেরা অনেক সময় বলে থাকেন, নারীর উন্নতি করতে যারা চায়, তারা নারীর সত্যিকার আসন কোথায় হওয়া উচিত তা বোঝে না। সমাজে নারীর স্থান নির্ণয় করবার অধিকার পুরুষের নেই—নারী নিজেই তার আসন যথা স্থানে স্থাপন করবে, নইলে সে সত্যিকার আসন হবে না।

নারী যাতে তাই করতে পারে, তার জন্য তার মনকে মুক্ত করে দিতে হবে, তার বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হবে, তার যে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, সে কথা তাকে বুঝতে হবে।

নারীর প্রতি তোমার সমাজ যে অবিচার করচে, তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই, অত্যাচারীর দল ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিকূল আচরণ করবে সন্দেহ নেই—কিন্তু নির্য্যাতিত যারা হচ্চে, তাদের অন্তরে যখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে, তখন তোমরা কি কামান দেগে তাদের বিনাশ কব্‌তে পারবে?

তারপর, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের জন্য যাঁরা চেষ্টা করচেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমার কথাটা আগে থেকেই তোমায় জানিয়ে রাখি। হাতের মাথায় যখন যা কিছু পাচ্ছেন, তাই নিয়েই আন্দোলন সুরু করেচেন বলে তাদের চেষ্টা বিফল না হলেও এই জন্যই বিফল হবে যে, তাঁরা শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন চাইচেন, দেশের লোকের মনের পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টা না করে। দেশের লোক তৈরি না হলে, শাসন ভরি প্রাপ্ত হলেও দুঃখ দৈন্য ঘুচবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

নীহারকে আমার নিকট হতে দূরে রাখাই যে উচিত নয়, একথা তুমি স্বীকার করেচ। কেবল আমার পরিবারের শান্তিভঙ্গ হবার আশঙ্কা করেই আমাকে একেবারে চেপে যেতে উপদেশ দিয়েচ। আমি অবশ্য ঝগড়া করতে চাইনি কখনো, কিন্তু আমার ওপর যে অবিচার করা হচ্চে সে কথাটা আমি

বলব না কেন ? এত অল্পেই যে পরিবারের শান্তিভঙ্গ হবার আশঙ্কা, সে শান্তির মূল্য কি ?

নীহারের চিঠি নিয়মিতই পাচ্ছি। কনক যে একেবারেই চুপ! তোমরা ভাল আছ ত'? তোমারই মোহিত।

(৭)

স্নেহের ঠাকুর পো,

অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি। এত শিগ্‌গীর আমাদের দূরে ঠেলে ফেলবে, তা আমি কখনো মনে করিনি। অবশ্য নীহারের চিঠিতে আমাদের খবর তুমি পাচ্চ—এবং সে চিঠি রোজই যাচ্ছে বলে আমাদের সম্বন্ধে তেমন চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

আমি দু'চার দিনের মধ্যে একবার বাপের বাড়ী যাব—মাস খানেক থাকতে পারি। সংসারের সমস্ত কাজের ভার নীহারের ওপর পড়বে—ছেলে মানুষ এত সব পারলে হয়। কিন্তু কি করব! আমাকে যেতে হবেই। তোমাদের সংসারে এসে ছুটি ত বড় পাইনি, তাই বুড়ো বয়সেও মায়ের কাছে যাব বলে বেশ আনন্দ পাচ্ছি।

তোমার কাছে নিশ্চিতই এ খবরটা খুব ভাল লাগবে না, কারণ, নীহারের সঙ্গে তোমার মিলন, এতে করে অনেকটা দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। তুমি হ'চ্চ মুক্ত প্রেমের পক্ষপাতী একেবারে সাহেবী মেজাজের লোক। এমন অবস্থায় নীহারকে এখানে রেখেই হয়ত আমি অন্যায় করেচি, তাতে আবার নানা রকমের ফন্দী খাটিয়ে তাকে আরও অনেকদিনের জন্য দূরে রেখে তোমার বিরক্তি-ভাজন হয়েচি—কাজেই চিঠি না লিখে তুমি আমায় শাস্তি দিচ্ছ দেখে আমি বিস্মিত হইনি।

না, ঠাকুরপো, রাগ করোনা। আমি সত্যিই তোমার অন্তরের বেদনা বুঝতে পেরেচি। বিবাহিত জীবনের প্রথম সময়ের কথা যদিও প্রায় ভুলে গেছি —তবুও মনে পড়ে একদিনের বিচ্ছেদ কি ব্যথাই বুকে জমিয়ে তুলত। আর এখনো যে ব্যথা পাইনে তা নয়। কিন্তু কেবল নিজের কথা ভাবলেই যে চলে না—অন্যের দাবীও যে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই'ত সয়ে থাকতে হয়। আমি কিন্তু নীহারকে শীঘ্রই তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করছিলুম। বাবা-মা কাশী যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার—তাই দেরি হয়ে যাবে।

আজ ক'দিন মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে। তুমি জান যে, আমি নিয়মিতভাবে আমার একটী অন্য সহচরীর কাছে পত্র লিখে থাকি। বিয়ের আগে আমরা দুজনে প্রায় সব সময়েই এক সঙ্গে থাকতুম। তাদের আর আমাদের বাড়ী ঠিক পাশাপাশি। তার নাম হচ্ছে গৌরী, তাঁও তুমি জান, কারণ, তোমাকে দিয়েই আমি চিঠি ডাকে পাঠাতুম।

গৌরীর বিয়ে হবার পর বছরই তার বাপ মারা যান। গৌরীর স্বামী ফরিদপুরে কাজ করতেন—বিয়ের অল্প পরেই গৌরীকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে যান্। সে পনের বছর আগেকার কথা। গৌরীর স্বামী অনেকটা তোমাদের ধরণের লোক ছিলেন, তাই তাকে বেশ লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন —বেশ সুখেই তাদের দিন চলে যাচ্ছিল।

গেছে বছর একরাত্রিতে জলে-পড়া একটি লোককে উদ্ধার করতে গৌরীর স্বামী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সংজ্ঞাহীন সেই লোকটিকে জল হতে উঠিয়ে তার চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য, ভিজে জামা-কাপড় পরেই নদীপাড়ের সেই ঠাণ্ডায় অনেকটা সময় অপেক্ষা করেন। ফলে দু'দিন পরেই তার নিউমোনিয়া হয়, আর তাতেই অভাগী গৌরীর সর্ব্বনাশ করে দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে রেখে তিনি মারা যান।

গৌরী কি যে বিপদে পড়েছিল, তা কাউকে বোঝান যায় না। স্বামীকুলে তার আপন বলতে কেউ ছিল না। স্বামীর অসুখের সময় ভাইদের জানিয়েছিল, তারাও কেউ গিয়েছিল না। বিদেশে অসহায় অবস্থায় কতগুলি ছেলে মেয়ে নিয়ে একাই বা সে কি করে থাকে আর এতগুলি প্রাণীর আহার্য্যই বা কেমন করে জোটে?

গৌরীর একটি ছোট ভাই কলকাতায় কলেজে পড়ত। সে খবর পেয়ে গৌরীকে আর তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাড়ী রেখে আসে। গৌরীর জ্যেষ্ঠ দু'ভাই কিন্তু বিধবা ভগ্নী এবং তার ছেলে মেয়েদের একটা বোঝা রূপেই মনে করলেন। তাদের সংসারে অভাব বেশী নাই; তবুও গৌরীর শোকতপ্ত চিত্ত তারা ভ্রাতৃস্নেহ ঢেলে শীতল করবার চেষ্টা করলেন না। দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাই আর ভাই-বউদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে উঠতে লাগল। সংসারের সমস্ত কাজ গৌরী স্বেচ্ছায় এবং হাসিমুখেই করত। ভ্রাতৃগৃহে এসে গৌরীর এমন অনেকদিন গেছে, যখন খেতে বসে সামনের ভাতে চোখের জল ফেলে তাকে উঠে যেতে হয়েচে।

এতদিন এ সব কথা আমি জানতুম না। স্বামীকে হারাবার পর গৌরী আর আমায় কাছে চিঠি লেখে নি। আমার ছোট বোন চারু বাড়ী গিয়ে গৌরীর খবর আমায় পাঠিয়েচে। তারপর গৌরীকে আমি দু'তিন খানা চিঠি লিখি, কিন্তু একখানারও জবাব পাইনি। চারুর কাছে সন্ধান নিয়ে জানলুম যে আমার চিঠি গৌরীর হাতে পড়ে নি। বাইরের লোকের মুখের দু'টো কথায় যে, গৌরী একটু সান্ত্বনা পাবে, তার ভাই দুটি তাও সইতে পারেন না—অথচ একই মায়ের সন্তান তারা!

তোমার দাদাকে সেদিন গৌরীর ইতিহাস বল্লুম। এ রকম আজকাল ঘরে ঘরেই হচ্চে বলে' পাশ ফিরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার ব্যথাটা তাতে আরও বেড়ে উঠল। বিধবার দুঃখে এ দেশের আপন বা পর কারও প্রাণ কাঁদে না, কেউ এদের দিকে ফিরে চায় না তবুও সংসারে এদের সকলের মন যুগিয়ে চলতে হবে।

তুমি যখন আমাদের সমাজের মেয়েদের দুরবস্থার কথা বলতে, তখন আমি জানতুম—ভাবতুম ওহচ্চে হাল ফ্যাসান, সাহেব সাজবারই বাসনা। এখন কিন্তু বুঝতে পারচি, ওটা হেসে ওড়াবার কথা নয়। একটা কিছু করা আবশ্যক, যাতে মেয়েদের জীবনটা এমন দুর্ব্বহ না হয়ে ওঠে।

সহমরণ প্রথা বড় ভাল ছিল, ঠাকুরপো। স্বামীকে হারিয়ে অবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এমন জলে পুড়ে ছাই হতে হোত না—এক সঙ্গে সব শেষ হয়ে যেত।

এ সব কথা তোমায় কেন লিখচি জান? বেদনার কথা মানুষ তাকেই জানায়, যে সহানুভূতি দেখিয়ে বুকের ব্যথা কমাতে পারে। তোমার দাদার কাছে সে জিনিষটা ত পেলুমই না অধিকন্তু তাঁর নির্ম্মমতার পরিচয় পেয়ে আরও ব্যথিত হলুম। গৌরীর প্রতি তার আপন জনের অবিচার এতই স্বাভাবিক, এমনই উপেক্ষনীয় যে, তার জন্য সমাজের কারো এতটুকু ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হওয়াটাই অস্বাভাবিক!

আজ ঠাকুরপো, তোমায় আমি দু'হাত তুলে এই আশীর্ব্বাদই করচি যে, বাংলার নারীদের দুঃখ দূর করবার যে ব্রত তুমি নিয়েচ, তা সার্থক হোক। তোমাদের চেষ্টায় ও যত্নে বাংলার গৌরীর দল আর বৃদ্ধি না পেয়ে দিন দিনই যেন কমে যায়।

মিনি আমার সঙ্গেই যাবে—খোকা থাকবে তার কাকীমার কাছে। এখানকার সকলেই ভাল আছেন। নীহারের জন্য তুমি বেশি চিন্তিত হয়োনা

তাকে সাধ্যমত যত্ন করতে আমি বিরত হব না। তার নিজের সুন্দর স্বভাবের কথা ছেড়ে দিলেও সে যে তোমার স্ত্রী এইটেই কি তাকে ভালোবাসবার আমার যথেষ্ট কারণ নয়?

এ চিঠির জবাব আমাদের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ো। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার বউদি।

(৮)

প্রিয়তমে এভি,

কর্ত্তব্য পালন করা যত সোজা ভেবেছিলুম, এখন দেখচি তা নয়। মনের মাঝে কোন ব্যথা না নিয়ে পারতুম যদি কর্ত্তব্যের বোঝা বইতে, তা হলে বেশ হোত—কিন্তু এ যে কেমন নিজেকে শুকিয়ে মারা, আপন বুকে নির্ম্মম আঘাত করা। স্বামীর নিকট হতে দূরে রয়েচি বলেই যে, সব কিছু কঠোর বলে মনে হচ্চে, তা নয়। হয় ত দিনগুলি সে জন্য অনেকটা অস্বাভাবিক দীর্ঘ বলে মনে হচ্চে—বড় একঘেয়ে, সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য বিহীন, সুতরাং আনন্দের লেশ-মাত্র পরিচয় তাতে পাচ্ছিনে—কিন্তু ওই এক কারণই সব নয়। আরও কি যেন আছে, যা আমার সঙ্গে মোটেও খাপ খাচ্চে না।

এ বাড়ীতে দাসদাসী যথেষ্টই আছে—নিজেকে এমন কিছু করতে হয় না; তবু সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি তাঁদের মাকুর মত এধার ওধার ঘুরচি—নয় ত দীর্ঘ দুপুরের সবটা সময় সমবেত পুরঙ্গনাদের মজলিশে ঘোমটায় নাক-মুখ ঢেকে বসে থেকে কাটিয়ে দিচ্ছি। যদি কখনো কোন ছলে গিয়ে নিজের ঘরে বসে বই খুলে দু পাতা উল্টিয়েচি, অমনি বিবাহিতা, অবিবাহিতা একপাল মেয়ে ঘরে ঢুকে 'বিবি-বউদি' 'বিবি-বউদি' বলে আমায় অস্থির করে তুলেচে। বিরক্ত হয়ে আমি আবার মজলিশেই ফিরে গেছি।

সত্যি ভাই, বলত, এ রকম করে কি থাকা যায়? এরা যে আমার কাছে কি চায়, তাই-ই এতদিন আমি আবিস্কার করতে পারিনি।

আমার জা-টি কিন্তু বড় ভাল লোক। তাঁর সকল সময়েই নজর রয়েচে আমার সুখ সুবিধার দিকে। তাতেই আরও আমি বিব্রত হয়ে পড়েচি। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গ যে আমি পছন্দ করি নে, তা কিন্তু তাদের ঘৃণা করে নয়। তাদের সঙ্গে বাইরের গল্প করতে নেহাৎ মন্দ লাগে না; কিন্তু তারা যে তাতেও তুষ্ট নয়। তাদের দাবীগুলো

একবার শোন—তারা আমার স্বামীর চিঠি দেখবে, তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমার স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে হবে, বিয়ের রাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে আমার কি সব কথা হয়েছিল, তাই তাদের বলতে হবে—এই রকম আরও কত কি। এরা সব আমার চাইতে অনেক ছোট, এত ছোট যে, এদের মাঝে সব চাইতে বড় যে, তার বয়সও চৌদ্দ বছরের বেশি হবে না।

এখন, বলত, এদের মাঝে আর আমাতে এমন কি ভাবের ঐক্য থাকতে পারে, যাতে আমি প্রাণ খুলে এদের সঙ্গে মিশতে পারি, দু'টো কথা বলে আরাম পাই। মিশতে পারি নে বলেই এরা সব আমায় বিবি-বউদি বলে ডাকে। ও কথাটা একটা গাল নয় বলেই আমার দুঃখ হয় না, কিন্তু দুঃখ হয় এই জন্তই যে, এই সব দুধের মেয়েদের সঙ্গে আমি 'প্রেমের কথা' বলিনে শুনেই, এদের মা-খুড়ীরাও আমার প্রতি অবিচার স্থুরু করেচেন।

কিন্তু, তাঁরা যাই করুন আর যাই বলুন, এদের দাবী আমি মেটাতে পারব না, সারাজীবন সঙ্গীহীন হয়ে থাকলেও না।

আমার জা' যেদিন আমায় ডেকে চুপি চুপি বল্লেন—"ওরা যা শুনতে চায়, জানতে চায়, তা ওদের বলিস—নইলে ওরা দুঃখিতা হবে, আর লোকেও তোর নিন্দা করবে।

আমি বল্লুম—"দিদি, ওরা যে কত ছোট।"

"হোলই-বা" বলে তিনি হেসে চলে গেলেন।

সেই অবধি আমি ভারি অশান্তি বোধ করচি। এতদিন বাহির হতেই মেয়েদের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করেচি, এবার ভিতরে এসে দেখচি, অবস্থা কত শোচনীয়। হয় ত তোমার কথাই ঠিক, এভি। খুব প্রবল একটা আলোড়নে সব ওলট পালট না করে দিলে, যে অমঙ্গল একবার শিকড় গজিয়ে বসেচে, তা আর দূর করা যাবে না। মানুষ যে নিজেকে এমন করে ভুলতে পারে, তা আমার আগে জানা ছিল না। আশে পাশে যাদের দেখচি, যাদের সঙ্গে কথা কইচি, চলচি, ফিরচি—তাদের কারো মাসে প্রাণ নেই—সব যেন পুতুল, কলে কাজ করচে। এদের চাইবার কিছু নেই—বাড়বার আকাঙ্ক্ষা নেই। এরা শোকে জলচে, ব্যথায় নুয়ে পড়চে, তাচ্ছিল্যে শুকিয়ে যাচ্চে, তবুও এদের চৈতন্ত নেই। এদের মুক্তি যে কবে, কেমন করে হবে, তা কে বলতে পারে?

যতই ভেবেচি, সংসারে ঢুকেচি বলেই ব্যক্তিত্ব ভুলব না—কিন্তু, জোর করে

যে, সব ভুলিয়ে গুলিয়ে দিচ্চে। চারিদিকে বাধা পড়ে প্রাণ আমার মুক্তির জন্তই হাঁপিয়ে উঠেচে। এমন করে কর্ত্তব্য পালন করতে আর আমার ভাল লাগে না।

আমাদের মেয়েদের উন্নতির সব চাইতে বড় বিঘ্ন দেখচি, তাদের শিক্ষার অভাব। শিক্ষাই মানুষের মনকে বাহির হতে টেনে এনে অন্তর্নিবিষ্ট করে। মেয়েরা যে নিজেদের কথা ভাব্বে, নিজেদের শক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হবে—সে কিসের প্রেরণায়?

শিক্ষিত গৃহস্থের মেয়েরা অক্ষর জ্ঞান হবার পরই ইস্কুলের সীমা মাড়ায় না কারণ, দশ বছর হতে না হতেই বিয়ের সাড়া পড়ে যায়। তখন হতেই পিতা মাতা পাত্রান্বেষণে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, মেয়েকে ঘরের বাইরে যেতে দিতে চান না।

বাঙালীর মেয়েদের শিক্ষা বলতে এখনো কেবল ততটুকু ভাষা জ্ঞানই বুঝায়, যাতে করে তারা শুধু চিঠি পত্র লিখতেই সক্ষম হয়। ডাক কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করতে পারলেই হোল, এখন তা' পাঠ্যই হোক, আর অপাঠ্যই হোক।

বাঙালী যুবকেরাও বিবাহের পর বালিকা পত্নীদের নিকট হতে এই ধরণের চিঠি পেয়ে নিশ্চিতই খুব খুসী হন, নইলে তারাই পারতেন মেয়েদের শিক্ষার দুরবস্থা ঘুচাতে। অবশ্য সবাই যে তুষ্ট নন, তার পরিচয় আজকাল মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, বিদ্রোহের খবর মাঝে মাঝে কাণে এসে পৌঁছে—কিন্তু সেখানে সমাজ আবার তার দণ্ড তুলে শাসনে প্রবৃত্ত হয়। এই সব দেখে শুনে, আমি মোটেও বুঝতে পারচি নে, কি করে কাজের সুবিধা হবে।

স্বামী লিখচেন যে, মেয়েদের অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কি করে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা যাবে?

সকল দেশেই এক একটা বড় পরিবর্ত্তনের সময় এমন কতগুলি পুরুষ নারী জন্ম গ্রহণ করেচে, যারা প্রচলিত বিধি নিয়ম অগ্রাহ্য করেই তাদের উচ্ছেদ সাধন করেছে। আমাদের দেশে তেমন নর নারীর সংখ্যা না বাড়লে পরিবর্ত্তন আনা যাবে না। এ সম্বন্ধে তোমার মত জানতে উৎসুক রইলুম।

স্বামীর চিঠি প্রায় রোজই পাচ্ছি—ভালই আছেন। তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা তোমায় জানাতে লিখেচেন। তোমাদের বিস্তারিত খবর লিখো। ইতি,

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী

নীহার।

নীরবে

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

আমি আর কব না কথা।
এবার আমায় দাওগো তোমার
শান্ত নীরবতা।
যেমন তরু স্তব্ধ ভাবে,
সন্ধ্যা রবি অস্ত যাবে
শান্ত মধুর সুনীরবে
সন্ধ্যা আস্‌বে যথা,
দাওগো এবার আমার বুকে
তেমনি নীববতা।

আর লাগেনা ভাল আমার
হাটের কোলাহল,
নীরবে হোক বেচা কেনা
যেটুক কর্ম্মফল।
এবার আমার গোপন বঁধুর
দেখ্‌ব স্বরূপ মৌন মধুর,
নেত্রে শুধুই ফুটবে বিধুর
কিরণ সুনির্ম্মল,
আর লাগেনা ভাল আমার
হাটের কোলাহল।

কেনা বেচা সাঙ্গ,—সে যে
কোন্ সুদূরের কথা!
গুম্‌রে মরুক বুকে এবার
সাগর গম্ভীরতা!

সকল দিকের বাঁধন খুলে,
তোমার দিকেই চোখটী তুলে'
আপন মনে করবে সে ভোগ
আপন মধুরতা,
দাওগো এবার একতারাটীর
ভুলিয়ে বাজে কথা।

কণ্ঠ আমার কুণ্ঠিত যে
কেবল কথা ক'য়ে,
এবার, কেবল ব্যথা করবে জমা
কথার কৃপণ হ'য়ে।
তোমার চরণ তলে ব'সে যবে
কথা বলার সময় হ'বে,
সেদিন তোমায় শোনাবে গো
মিশিয়ে তালে লয়ে,
সেই লগনের অপেক্ষাতে
রইব মগন হ'যে।

শাঙ্কর দর্শন কি স্ব-বিরোধি ?

[অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর]

আমাদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে যে সকল শিক্ষনীয় বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বের স্থান অতি নগণ্য। এজন্য প্রচলিত শিক্ষা-যন্ত্রের হাতে-গড়া শিক্ষিত সাধারণের মনে ভারতীয় দর্শনাদি সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার থাকা খুব অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যাঁহারা বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, যাঁহারা দর্শন—ন্যায়—বিজ্ঞানাদির অধ্যাপনা দ্বারা জ্ঞান-দানকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বদেশের তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে কোনরূপ গুরুতর ভুল-ভ্রান্তির পরিচয় পাইলে বড়ই ক্ষোভের

কারণ হয়। অধ্যাপক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ লিখিত বিং ফাল্গুন সংখ্যক 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত "সর্ব্ব-ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদ— স্পিনোজা ও শঙ্কর" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া এই কথাটীই মনে হইতেছে। উক্ত প্রবন্ধে ধীরেন্দ্র বাবু শঙ্করের দার্শনিক তত্ত্বের কিরূপ মর্ম্মগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন এবং ঐ তত্ত্বালোচনায় কিরূপ বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াছেন তার নমুনা লেখকের অনমুকরণীয় ভাষায় দিতেছি।

ধীরেন্দ্র বাবু বলেন:—(১) "মায়া কি পদার্থ তার ব্যাখ্যা নাই এবং ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া এই মায়া বা অবিদ্যা স্পর্শে শঙ্করের ব্রহ্মাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইয়াছে। একদিকে জগৎ ব্যাখ্যায় ব্রহ্মাতিরিক্ত 'কিছুর' প্রয়োজন হইতেছে, অন্যদিকে এই 'কিছু' অবোধ্য (irrational) সুতরাং জগৎ কারণের একত্ব, অনন্তত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব সকলই ব্যাহত হইতেছে।* * * ইহা (শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব) বহুকে অস্বীকার করিয়া বহুর বাহিরে এক কল্পিত, abstract একত্ব।"

(২) "আর জীব। সে তো ব্রহ্মই: তবে যে পরিমাণে সে 'আমি ব্রহ্মত্ব' প্রমাণ করিবার জন্য সকল ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে, সেই পরিমাণেই প্রমাণ হইতেছে সে ব্রহ্ম নহে।"

(৩) "আর ব্রহ্ম। যে জীব তাহা হইতে আসিয়াছে সেই জীবের মধ্যে তাঁর স্থান নাই, তাহা হইতে তিনি চির-বিচ্ছিন্ন। জীবত্ব যখন কাটিল তখন ত কেবল ব্রহ্ম। আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম—মধ্যখানে একটা বিকট স্বপ্ন। স্বপ্নের কারণ মায়াফল ভক্ষণ জনিত বদ্ হজমি।"

উপরি উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি আধুনিক জড়বাদের সুরসাল ফল-ভক্ষণ হেতু শাঙ্কর দর্শনের বদ্‌হজমির ফল কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ধীরেন্দ্র বাবু শঙ্করের দর্শন হইতে আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁর সঙ্গে স্বীয় কল্পনা মিশাইয়া উক্ত দর্শনের যে ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা রস-সাহিত্যের হিসাবে কৌতুক-প্রিয় এক শ্রেণী পাঠকের নিকট খুব উপভোগ্য হইবে। যাহা হউক প্রশ্ন হইতেছে:—

(১) শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব ও মায়াবাদ কি প্রকৃতই পরস্পর বিরুদ্ধ? (২) শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব কি সত্য সত্যই এক কল্পিত abstract একত্ব? (৩) শঙ্করের ব্যাখ্যাত জগৎ-কারণ কি জগতের বাহিরে অবস্থিত এবং জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত? (৪) শঙ্করের মায়াবাদ কি অবোধ্য irrational?

(৫) সাধন-ভজন দ্বারা কি সত্য সত্যই জীব-ব্রহ্মের এক-স্বরূপত্ব অপ্রমাণিত হয় ?

শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত মূল সিদ্ধান্তগুলির একটু আলোচনা করিলেই উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যাইবে। শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব কি ? তাহা নিগুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, একমাত্র, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। এই ত গেল ঐ সম্বন্ধে 'না'র দিক। তার 'হাঁ'র দিক, তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই বেদান্ত বাক্য দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সৎ চিৎ,আনন্দ এই তিনটী কথা ব্রহ্মের বিশেষণ নহে, অথবা তাঁহার মধ্যে কোনরূপ স্বগতভেদ সূচনা করিতেছে না। যাহা সৎ বা অস্তিত্ব-স্বরূপ তাহাই স্বপ্রকাশ অতএব চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ, এবং যাহা স্বয়ং প্রকাশ তাহাই আনন্দ। অতএব সৎ = চিৎ = আনন্দ = ব্রহ্ম অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্ব।

ব্রহ্ম একমাত্র সৎ অতএব তিনি অনন্ত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, ভূমা। তিনি পারমার্থিক সৎ, তাঁহার সত্তার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, কোনকালে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় কোন অবস্থায় বাধা নাই, কারণ, তিনি অজ, অনাদি, বিক্রিয়া-রহিত। এক অদ্বিতীয়, অনন্ত, অবিক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী সত্তা স্বীকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বহু নামরূপে প্রতিভাত জগতের প্রকৃত অস্তিত্বও অস্বীকার করা হইল। তাই শঙ্কর প্রমাণ করিয়াছেন আমরা যাহাকে বাহ্য জড় জগৎ বলি, কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতরূপ দেহ বলি এবং সুখ-দুঃখ সংকল্প-বিকল্পাদি দেহ-ধর্ম্ম বলি, তাহার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। পারমার্থিক সৎ তাহাই যাহা কোনও কালে, কোনও দেশে, কোনও অবস্থায় বাধিত হয় না, যাহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বাধ (persistent)। বস্তুর এই নির্ব্বাধতা, স্বরূপের অব্যভিচার শঙ্করের মতে সত্তার লক্ষণ বা নিরুক্তি (definition), এবং এইরূপ বস্তু ব্যতীত অপরাপর সমস্তই মিথ্যা—এই কথাটী শাঙ্কর দর্শন বুঝিতে হইলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

উপরোক্ত অর্থে এই দৃশ্যমান জগৎ সৎ নহে, কারণ ইহার পরিণাম আছে, অবস্থান্তর আছে। সুষুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থায় ইহা সাময়িক ভাবে বাধিত হইয়া থাকে, এবং মুক্তাবস্থায় ইহা নিঃশেষে বাধিত হয়। কিন্তু প্রাকৃত জীবের পক্ষে, যাহার পরমার্থ তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি হয় নাই তাহার পক্ষে জগৎ একান্ত অসৎ নহে, অপরন্তু, তাহার পক্ষে জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। কারণ, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে তাহার প্রাত্যহিক জীবনের

ব্যবহার চলিতেছে। তাই জগতের আপেক্ষিক, প্রাতিভাসিক সত্তা আছে—'বন্ধ্যা-পুত্র' বা কবন্ধের শিরের মত এই জগৎ তুচ্ছ উদ্ভট কল্পনামাত্র নহে। আবার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের যে পরিমাণে বাধ আছে সেই পরিমাণে জগতের বাধ হয় না। জাগরণ মাত্র স্বপ্নদৃশ্য অন্তর্হিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মাবিসতি পর্য্যন্ত জগৎ-সত্তা নির্ব্বাধ। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে স্বপ্ন-দৃশ্যের ও বিষয়-জগতের মধ্যে সত্তা বিষয়ে যে পার্থক্য তাহা প্রকারগত নহে, কিন্তু পরিমাণগত। স্বপ্ন যতকাল স্থায়ী স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থনিচয়ও ততকালই সত্য। আবার, জাগরণান্তে স্বপ্ন-দৃশ্যের ন্যায় ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানলাভের পর অবিদ্যাকৃত নাম-রূপে অভিব্যক্ত এই জগৎ-প্রপঞ্চ অদৃশ্য অসৎ হইয়া যায়—তখন একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব ব্রহ্মই স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হন। স্বপ্ন-দৃশ্য ও জাগ্রদৃষ্ট বিষয়-জগতের এই সাদৃশ্য,—ইহাদের সত্তা যে আপেক্ষিক কিন্তু পারমার্থিক নহে—ইহা শঙ্করাচার্য্য "ব্রহ্মসূত্রের" এবং উপনিষদের ভাষ্যে বহুস্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা:—যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্ব-প্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ফল-লক্ষণেষু ব্যবহারেষু অনৃত বুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে, বিকারানেব ত্বহং মমেতি অবিদ্যায়া আত্মাত্মীয় ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা।"—ব্রহ্ম-সূত্র ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ১৪শ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য। পুনশ্চ—"জাগ্রদ্বোধাপেক্ষন্ত তদনৃতত্বং, ন স্বতঃ। তথা স্বপ্ন-বোধাপেক্ষঞ্চ জাগ্রদ্দৃষ্ট বিষয়া নৃতত্বং ন স্বতঃ। * * * প্রাক সদাত্ম-প্রতিবোধাৎ স্ববিষয়েঽপি সর্ব্বং সত্যমেব স্বপ্ন দৃশ্যা ইবেতি।"—অর্থাৎ স্বপ্ন-দৃশ্য স্বপ্নাবস্থায় সত্য, কিন্তু জাগরণের পর জাগ্রৎ-জ্ঞানের সঙ্গে তুলনায় তাহা অসত্য। সেইরূপ জাগ্রদৃষ্ট বিষয় সকল স্বভাবতঃ অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থায় সত্য, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তৎকালীন জ্ঞানের সঙ্গে তুলনায় অসত্য।" * * অতএব সৎ ব্রহ্মাত্মৈক স্ব বোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্তই স্বপ্ন-দৃশ্যের ন্যায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে সত্যই।—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।৫।৪ শাঙ্কর ভাষ্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে প্রকৃত অদ্বৈত-বাদীর পক্ষে জগৎ মিথ্যা, এবং সেই হেতু অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, অতএব মায়াবাদের কল্পনাও (Theory) তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, অর্থহীন। জগৎ সৃষ্ট্যাদির সমস্যা ততক্ষণ—যতক্ষণ অদ্বৈত তত্ত্বাববোধের অভাববশতঃ জগতকে সৎ বলিয়া প্রতীতি থাকে। অতএব সুস্পষ্ট দেখা গেল যে প্রাকৃত অজ্ঞজনের পক্ষে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগতের সত্তা আছে ইহা

অস্বীকার করিয়াই শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ দ্বারা ঐ জগতের উৎপত্ত্যাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং সেই পরমার্থতঃ সৎ, এক অদ্বিতীয় নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার কোনরূপ সংশ্রব নাই, এবং সেই জন্য "মায়া স্পর্শে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব" অশুদ্ধ হইয়াছে—এই উক্তি সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। সেইরূপ নিগুর্ণ ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কি, তিনি জগতের বাহিরে কি জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট,—এই সকল প্রশ্ন, 'বন্ধ্যার পুত্রবত্তা, অগ্নির শৈত্য, জলের উষ্ণত্ব প্রভৃতির আলোচনার ন্যায় হাস্য জনক।

অতএব এই দাড়াইল যে যতক্ষণ জগতের অস্তিত্ববোধ ততক্ষণই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ কি এই প্রশ্ন। তাই শঙ্কর ব্রহ্ম সূত্রের ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ২য় ও ৩য় সূত্রের ভাষ্যে এই বহু-কর্তৃ-ভোক্তৃ বিশিষ্ট, অচিন্ত্য রচনা নিয়ত কার্য্য কারণ যুক্ত জগতের কারণ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম ইহা স্বীকার করিয়াছেন। আবার এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কারণ ব্যতিরেকে জগতের যে ব্যাখ্যা অসম্ভব—সাংখ্যের অচেতন প্রধান, বৈশেষিক প্রভৃতির পরমাণু সমূহ যে জগতের কারণ হইতে পারে না, বৌদ্ধের শূন্যবাদও যে জগৎ প্রপঞ্চের সুমীমাংসা দিতে পারে না—এই সকল বিষয় শঙ্কর এই সকল মতবাদ খণ্ডনচ্ছলে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব দেখিতেছি জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া শঙ্কর যখন ইহার সৃষ্ট্যাদির কারণ নির্ণয় করিতে গিয়াছেন তখন তিনি যে ব্রহ্মকে নিগুর্ণ নিরুপাধি বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন সেই পারমার্থিক একমাত্র সৎ-ব্রহ্মকেই সর্ব্বশক্তিত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাই (যেমন উপনিষৎ সমূহে তেমনি) শঙ্কর-দর্শনে নিগুর্ণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম—ব্রহ্মের এই দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা দ্বারা ইহা প্রমাণ হইবে না যে শঙ্কর দুইটী পৃথক্ ব্রহ্ম বস্তু স্বীকার করিতেছেন। তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ—তাঁহাতে জগতের কর্তৃত্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি আরোপ করা যায় না। কারণ, তত্ত্বতঃ জগতের সত্তা নাই—ব্রহ্মই একমাত্র অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী সত্তা। কিন্তু যতক্ষণ অবিদ্যাবশতঃ জগতের অস্তিত্ব বোধ ততক্ষণ সেই নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেই আমরা ঈশ্বরত্ব নিয়ন্তৃত্বাদি উপাধির আরোপ করিয়া থাকি। "ব্রহ্মসূত্র" ২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এই কথাই বিশদ করিয়াছেন। "তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধি পরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ব-

শক্তিযুক্ত, ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্ত 'সর্বোপাধি-স্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্য—' সর্বজ্ঞত্বাদি ব্যবহার উপপদ্যতে" -অর্থাৎ এই সকল অবিদ্যাকৃত উপাধি ভেদকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব উক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আত্মার সকল উপাধি দূরীকৃত হইলে, পরমার্থতঃ তাহাতে নিয়ন্তৃত্ব, সর্বজ্ঞত্বাদি ব্যবহার উপপন্ন হয় না।

অতএব জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বরকে স্বীকার করিতে হয়। এই সগুণ ব্রহ্মই তাঁর মায়া-শক্তি দ্বারা জগৎ-প্রপঞ্চরূপে অর্থাৎ নাম-রূপে ব্যাকৃত বলিয়া অবিদ্যাভিভূত জীবের নিকট প্রতিভাত হন তাই, এই মায়াকেই জগৎ-প্রপঞ্চকের হেতু, ইহার বীজ-স্বরূপ বলা যায়। তাই "অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিঃ অব্যক্ত শব্দ নির্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া—মায়াময়ী মহাসুপ্তি যস্যাং স্বরূপ প্রতিবোধ রহিতাঃ শেরতে সংসারিনঃ জীবাঃ" বলিয়া শঙ্কর মায়ার বর্ণনা করিয়াছেন। এই মায়াশক্তি ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় সত্তা নহে - তাহা ঈশ্বরাশ্রিতা। এখানেই প্রধানবাদী সাংখ্যদের সঙ্গে ঈশ্বর কারণ-বাদীদের পার্থক্য। মায়াধীশ ও মায়া পৃথক নহে। কারণ, শক্তি শক্তিমান হইতে ভিন্ন নহে, আবার মায়াপ্রসূত জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য এবং সাংখ্যাদি সৎ-কার্য্যবাদিগণ স্বীকার করেন কার্য্য কারণে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। তাই জগৎও ঈশ্বরাতিরিক্ত নহে। তাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং তৎ সৃষ্টা তদেবানু প্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য জগতের ও ঈশ্বরের অনন্যত্ব এবং জগতের ঈশ্বরাত্মত্ব উপদেশ করিতেছেন।

মায়াকে রামানুজ ব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণী শক্তি বলেন, কারণ রামানুজের মতে জড় জগৎ ও জীব নিত্য সত্য, ব্রহ্মেরই দুই প্রকার বা শরীর-স্বরূপ। কিন্তু শঙ্করের মতে জগৎ এবং উপাধি বিশিষ্ট জীব সৎ নহে। তাই তাঁহার মতে এই মায়া "অবিদ্যাত্মিকা—ইহা তত্ত্বতঃ কিছু সৃষ্টি করে না। কিন্তু তার আবরণী শক্তি দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে। একমাত্র অনন্ত সৎকে বহুনাম-রূপে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া আমাদের ভ্রান্তি উৎপাদন করে। তাই মায়াকে—অঘটন ঘটন পটিয়সী বলা হয়। স্পষ্টালোকের অভাবে রজ্জু যেমন আমাদের নিকট সর্প বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ মায়া বা অবিদ্যা প্রভাবে জ্ঞান আবৃত হওয়ায় একমাত্র সৎ ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতিভাত হন। অতএব জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই ঈশ্বর অর্থাৎ মায়োপহিত ব্রহ্ম।

প্রশ্ন হতে পারে, আচ্ছা, মায়া ত বিদ্যার অভাব মাত্র নহে, ইহাকে আবরণী বীজ-শক্তি বলা হইয়াছে; তবে ইহার সত্তা আছে, এবং মায়া সত্তাবতী হইলে তাহার কারণ কি? এবং তাহার বিনাশই বা হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন—মায়া "অব্যক্ত শব্দ নির্দ্দেশ্যা" অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়া ইহাকে সৎ কিম্বা অসৎ কথা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। আবার, মায়া অনাদি,—একমাত্র সৎ ব্রহ্ম হইতে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ তিনি অবিক্রিয়। কিন্তু অনাদি হইলেও মায়া অনন্ত নহে, ব্রহ্ম-জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত জীবের পক্ষে মায়া নিবৃত্ত হইয়া যায়। তাই এখানেও দেখা যাইতেছে যে মায়ার অনাদিত্ব স্বীকার সত্ত্বেও মায়ার অ[illegible] তাহা সৎ নহে, অতএব শঙ্করের মায়াবাদ একদিকে ব্রহ্ম এবং অপরদিকে মায়া নামক দ্বিতীয় সদ্বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে, এই উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক। অতএব মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব কোনও রূপে ব্যাহত হয় না। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মকে একমাত্র পারমার্থিক সৎ বলিয়া স্বীকার করিলে এবং জগতের ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক, আপেক্ষিক সত্তা অস্বীকার না করিলে সদসৎ শব্দ দ্বারা অনির্ব্বাচ্য অনাদি মায়া শক্তির কল্পনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। মায়া অনাদি অথচ সান্ত, ইহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎ বলাও চলে না অতএব উহা অবোধ্য যদি এই কথা বলিতে চাও, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। যাহা 'অনির্ব্বাচ্য' তাহা সুবোধ্য হইতে পারে না। [illegible] পারমার্থিক সত্তা ও জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিলে এবং এতদুভয়ের সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধ-শক্তি মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। অতএব মায়াবাদ irrational বা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে।

শঙ্করের অদ্বৈত্য তত্ত্ব এক কল্পিত (abstract) [illegible] কিনা এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বের আলোচনা হইতেই পাওয়া যাইবে। [illegible] অর্থাৎ চিরন্তনত্ব, ধ্রুবত্বই প্রকৃত সত্তার লক্ষণ। তাই চিৎ-স্বরূপ নির্গুণ, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ, ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু,—অপরাপর নামরূপ বিশিষ্ট সমস্তই অবস্তু। কিন্তু যাহারা অমার্জ্জিত-বুদ্ধি, স্থূলদর্শী তাহারা [illegible] বহুধা বিভক্ত জড়, ও তদ্ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদিকেই সত্য বলিয়া জানে, এবং অখণ্ড চিৎকে কল্পিত মনে করে। তাহারা অবিদ্যা বশতঃ বুঝিতে পারে না এই বহুরূপের প্রতীতি এক অরূপের অস্বীকার বা নাস্তিক্য বুদ্ধির (Negation এর) ফলমাত্র। তাই তত্ত্বদর্শী উপদেষ্টা যখন সদ্বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য 'নেতি নেতি' বলিয়া

অসত্যের নিরাকরণ করেন তখন স্বভাবতঃই জড়বাদীর এই ধারণা জন্মে যে তিনি সমস্ত সৎ পদার্থের নিরাকরণ করিয়া এক কল্পিত অ-পদার্থের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কিন্তু যদি কখনও জ্ঞানাঞ্জন-স্পর্শে আমাদের চক্ষুর আবরণটী অপসারিত হয় তখন রাহুমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় একমাত্র স্বয়ং জ্যোতিঃ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখিতে পাইব। বস্তুতঃ অদ্বৈত তত্ত্বকে কল্পনা (abstraction) বলিয়া—যে ভ্রান্তি তাহা সূর্য্যের পৃথিবী প্রদক্ষিণরূপ দৃষ্টি-বিভ্রমের সঙ্গে তুলনীয়।

তারপর, জীব-ব্রহ্মের অনন্যত্বের বিরুদ্ধে ধীরেন্দ্র বাবুর যুক্তি এই যে, "যে পরিমাণ সে (অর্থাৎ জীব) আপনার 'আমি ব্রহ্মত্ব' প্রমাণ করিবার' জন্য সকল ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে, সেই পরিমাণেই প্রমাণ হইতেছে, সে ব্রহ্ম নহে।"—জিজ্ঞাসা করি, ধীরেন্দ্র বাবুর এই প্রহেলিকাময়ী উক্তিটী কি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল? তিনি কি 'সকল ছাড়িয়া' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ত্যাগের দ্বারা জীবের অ-ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়? যাঁহাদিগকে সভ্য জগৎ প্রকৃত ত্যাগী ও জ্ঞানী বলিয়া—যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানিয়া আসিতেছে সেই উপনিষদের ঋষিগণের সাক্ষ্যই গ্রহণ করিব, না, আমারই মত অবিদ্যার দাস অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধ উক্তি মাত্রকে সত্য বলিয়া মাথা পাতিয়া লইব? "ত্যাগে নৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়—ইহাই ঋষির সাক্ষ্য। এই অমৃতত্ব কি?—যো বৈ ভূমা তদমৃতমাথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং—যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, অবিনাশী, যাহা অল্প তাহাই মর্ত্ত্য বা মরণশীল। এই 'ভূমা' কি, 'অল্প'ই বা কি?—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পং"—যাহাতে পদার্থান্তরের দর্শন-শ্রবণ ও প্রতীতি থাকে না অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম স্বরূপের প্রতীতি থাকে তাহাই—ভূমা, অনন্ত। আর যেথায় পদার্থান্তরের দর্শনাদি রহিয়াছে তাহাই অল্প অর্থাৎ সান্ত, পরিমিত।

"সাধন ভজন" দ্বারা ধীরেন্দ্র বাবু ঠিক কি বোঝেন খুলিয়া বলেন নাই। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন প্রকৃত অদ্বৈত-বাদীর পক্ষে উপাস্য উপাসকের কোন ভেদ নাই—অদ্বৈত-তত্ত্বের সাধক সদলবলে কোনরূপ বাহ্যিক পূজোপকরণ কিম্বা পুষ্পিত বাক্যাবলী, কিম্বা ভক্তিশতদলের অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উপাস্যের কৃপা লাভের চেষ্টা করেন না। পক্ষান্তরে তিনি

লোকহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ও শমদমাদি সাধন সম্পদের ফলে চিত্তস্থৈর্য্য লাভের পর নির্জ্জনে "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোঽহম্" প্রভৃতি অদ্বৈত-তত্ত্ব-মূলক বেদান্ত মন্ত্রের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ সাধন দ্বারা সর্ব্বোপাধি নির্মুক্ত আত্ম-স্বরূপ লাভ করেন। উপাধি-বিশিষ্ট-জীবের 'এই ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞানই অদ্বৈত-বাদীর মোক্ষ প্রাপ্তি। এই মোক্ষ যে কাল্পনিক নহে তার প্রমাণও লব্ধ-তত্ত্ব-জ্ঞান ঋষিগণের মুখে শুনিতে পাই—"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্।" "ব্রহ্মবেদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে শঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হইলও, আমরা যেমন দেখিয়াছি—প্রাকৃত জনের পক্ষে তিনি সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তেমনি, তিনি সগুণ ব্রহ্মের কোন উপাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না। বস্তুতঃ, শঙ্করের দার্শনিক তত্ত্ব কোনরূপ সাধন-প্রণালীকে অনাবশ্যক বলিয়া বর্জ্জন করে নাই,—অধিকারও যোগ্যতা ভেদে প্রতীকোপাসনা, ঈশ্বরোদ্দেশে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ, ভক্তিমূলক উপাসনা সমস্তেরই তিনি প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তবে তাঁহার মতে এই সকল নিম্নতর সাধন প্রণালী দ্বারা পারত্রিক ভোগ অথবা ক্রম মুক্তি লাভ হইতে পারে কিন্তু একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞান সাধন দ্বারাই মানুষ জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে। এখানেই অদ্বৈত দর্শনের বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতা—ইহা একদিকে, নিত্যবুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মকে একমাত্র সৎ পদার্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ একত্ব এবং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত অসত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে, অপরদিকে, অদ্বৈতবাদ মায়া মুগ্ধজীব কি উপায়ে আপনার স্বরূপ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

আজ আমরা পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাবে আত্ম-কেন্দ্র-চ্যুত হইয়া মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষিগণ অদ্বৈত দর্শনের এই পরম ঐক্য-তত্ত্ব, অপূর্ব্ব সমন্বয়, দেখিতে পাইয়া সবিস্ময় শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যাকে অভিনন্দন করিতেছেন—"It (The true Vedanta Philosophy) rests chiefly on the tremendous synthesis of the subject and object, the identification of cause and effect, of the "I" and the "It" This constitutes the unique character of the Vedanta, unique as compared with every other philosophy

of the world which has not been influenced by it directly or indirectly. If we have once grasped that synthesis, we know the Vedanta. And all its other teaching flows naturally from this one fundamental doctrine'.—Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy

আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যতকাল আমরা মূঢ়তা বশে অসৎকে সৎ, হেয়কে উপাদেয়, প্রেয়কে শ্রেয়, ভোগকে পরমার্থ, মৃত্যুকে অমৃত মনে করিয়া ভূমাকে ত্যাগ করিয়া অল্পকে আশ্রয় করিব ততকাল আমাদের সম্বন্ধে, "আগে ব্রহ্ম, পরেও ব্রহ্ম, মধ্যখানে এক বিকট স্বপ্ন" এই কথা বলাও চলিবে না ;—ততকাল আমাদের আদি-অন্ত-মধ্যে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্রই এক আদ্যন্তবিহীন বিরাট দুঃস্বপ্ন বাজব করিয়া দুঃসহ দুঃখদাহে আমাদের অন্তরাত্মাকে জ্বালিতে থাকিবে। কারণ, মায়াকে অলীক বলিয়া আমরা যতই পরিহাস করি না কেন তাহার দুঃখদায়িনী শক্তি কিরূপ নিদারুণ ভাবে সত্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন।

বর্ষার গান

[শ্রীননিগোপাল ঘোষ]

(১)

ওগো নবীন মেঘা !
নেমে এস মোর বুকের পরে
গুরু গরজিয়া।
জেগে উঠুক হৃদয় খানি
শুনি তোমার ব্যাকুল বাণী
দূর ক'রে দাও সকল গ্লানি
ঘন বরষিয়া।
ওগো নবীন মেঘা।

(২)

তোমার হাতের বজ্রখানি
হান আমার শিরে,
তোমার চোখের আগুন দিয়ে
রাখো আমায় ঘিরে।
শক্ত ক'রে—সবল ক'রে
মনের কালো ময়লা দূরে,
বের ক'রে দাও মাঠের পরে,
সব কেড়ে নিয়া,
ওগো নবীন দেয়া!

(৩)

জুড়াও ধরার সকল জ্বালা
সরস প্রেমের স্পর্শে,
ফুটাও সবার প্রাণের মাঝে
মধুর তরুণ হর্ষে,
এস আমার নিবিড় কালো,
তোমায় আমি বাস্‌বো ভালো,
দেখাও মোরে অচিন্ আলো,
আজি চমকিয়া,
সেই আলোকে চিন্‌বো আমি
পারাপারের খেয়া,
ওগো নবীন দেয়া!

পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৭

সেই তুমুল ঝড়ের ভিতরেও সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া, বৃদ্ধ গঙ্গারাম গোস্বামী তানপুরাটি বাঁধিয়া বৈঠকখানাতে বসিয়া সবেমাত্র ভোরাই সুরের আলাপটি ধরিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বাড়ীর বহির্দ্বারের কবাটে ঘা পড়িল। আঘাতটা এত জোরে যে, ঝড়ের শব্দকেও অতিক্রম করিয়া, তাহার আলাপকেও চাপিয়া শব্দ বৃদ্ধের কর্ণে প্রবেশ করিল। তানপুরা রাখিয়া বৃদ্ধ কাণ পাতিয়া বসিলেন।

আঘাত-শব্দের শেষে ডাক উঠিল—যথাসম্ভব উচ্চ নারীকণ্ঠ। শব্দ করুণতায় তাঁর ভোরের রাগিনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল। কোনও স্ত্রীলোককে ঝড়ে বিপন্ন অনুমান করিয়া, বৃদ্ধ আসন হইতে উঠিয়া দ্বারের কবাট খুলিতে চলিলেন। দ্বারে হাত না দিতেই বাহির হইতে আবার ডাক উঠিল—

"দাদামশাই! দাদামশাই!"

বৃদ্ধের বিস্ময়ের একেবারে অবধি রহিল না।

"কে রে চারু?"

"দয়া করে' একবার দোরটা খুলুন।"

বৃদ্ধ দ্বার খুলিতেই, চারু ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াই তাঁর পদতলে লুণ্ঠিতবৎ পতিত হইল—একটিও কথা কহিল না।

"সত্যিই তুই। এই অসময়ে দুর্য্যোগে!—ব্যাপার কিরে চারু?"

চারু সেইরূপই মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া।

"কি হয়েছে বল। আরে গেল, অমন করে' পড়ে' রইলি কেন? চারু, চারু!"

বারবার ডাকিয়াও যখন বৃদ্ধ চারুর মুখ হইতে কথা বাহির করিতে পারিলেন না, তখন নিজে উপবিষ্ট হইয়া হাত ধরিয়া তাকে বসাইলেন। দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গে তার বৃষ্টির জল এখনও ঢেউ খেলিতেছে।

আর কোনও কথা না কহিয়া, তিনি তাহাকে উঠাইয়া সর্ব্বাগ্রে ঘরের মধ্যে আসিতে আদেশ করিলেন।

"আগে আমাকে রক্ষা করবেন বলুন।"

"এখানে আমি কোনও কথা বলব না। আগে ঘরে আয়।"

বলিয়াই তিনি চারুকে কবাট বন্ধ করিতে বলিলেন। সে নড়িল না দেখিয়া, নিজেই তিনি দুয়ার বন্ধ করিয়া তার হাত ধরিয়া ঘরে আনিলেন এবং যে আসনে বসিয়া তিনি তানপুরায় সুর দিতেছিলেন, তাহার পার্শ্বে চারুকে দাঁড় করাইয়া, নিকটের একটা আল্‌না হইতে নিজের একখানা শাদা পাড় ধুতি আনিয়া বলিলেন—

"আগে ভিজে কাপড়খানা ছেড়ে ফেল দেখি।"

"কাপড়ের দরকার নেই দাদামশাই, আমি গঙ্গাস্নান করতে চলেছি।"

"এই দুর্য্যোগে, এত ভোরে। তুই কি রোজই এমনি সময়ে গঙ্গাস্নান করে' থাকিস নাকি?"

"না দাদা।"

"তবে?"

"কদাচ গঙ্গাস্নান করি। এর আগে কবে করেছি মনে নেই।"

"তবে হঠাৎ আজ এ খেয়ালটা হ'ল কেন? আজ তো বিশেষ কোন যোগেরও দিন নয়।"

হতভাগী চারু এই কথাতেই তার স্বভাবে ফিরিল, তাহার গভীর দুঃখ, গোঁসাইজীকে জানাইবার কি ছিল, ভুলিয়া গেল। হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

"আপনার ও পুরোণো পাঁজিতে নেই, আমার এই নূতন পাঁজিতে যোগ লিখেছে। দাদামশাই! এখন পাঁজির পাতাটা যাতে ছিঁড়ে না যায়, সেইটি আপনাকে করতে হবে, করতেই হবে।"

বলিতে বলিতে হাস্যময়ী আবার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আবার তার মাথায় হাত দিলেন।

চারু বলিতে লাগিল—অশ্রুপুরিত কণ্ঠে—

"নইলে, এই যে গঙ্গায় চলেছি, আর ফিরবো না।"

তখনও ঘরে যথেষ্ট অন্ধকার,—বৃদ্ধ চারুর মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিন্তু বুঝিতেছিলেন, মেয়েটা কোনও একটা বিপদে পড়িয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। সে অভাগী যে কি, তার ব্যবসায়ে কত যে উৎপাতের অস্তিত্ব

সম্ভাবনা গোস্বামী মহাশয়ের জানা থাকিলেও এই দুর্দ্দিনে এরূপ অসময়ে কোনও একটা প্রতিকারের প্রত্যাশায় তাঁহার গৃহে এমন ব্যাকুলভাবে চারুর আশ্রয় লইতে আসাটা অতি বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া তাঁর বোধ হইল। কারণটা একান্ত দুর্ব্বোধ্য হইলেও চারুর ব্যাকুলতা বৃদ্ধকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি একটু উচ্ছ্বাসের সহিতই বলিয়া উঠিলেন।

"আরে গেল, অমন ব্যাকুল হ'লে কি হবে, কি হয়েছে আমাকে বল্।"

"আমাকে রক্ষা করুন।"

"কি হ'য়েছে না বুঝলে কি রক্ষা করবো?"

"আমাকে আশ্রয় দিতে হবে।"

"পথে কেউ কি তোর উপর অত্যাচার করতে এসেছে?"

"সারাপথের ভিতর একটা শিয়াল কুকুর পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি।"

"তাতো না পাবারই কথা। এ দুর্য্যোগে কি কোন প্রাণী বেরুতে পারে? তবে—ঘরে কেউ কি তোর উপর অত্যাচার করেছে?"

কি বলিতে গিয়া বলিতে অশক্ত চারু উত্তর করিল

"হুঁ।"

এই উত্তরেই যাহা বুঝিবার বুঝিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, একটু বিরক্তেরই মত

"তা আমি কি করে' রক্ষা করবো? তোর যা হীন ব্যবসা, তাতে কত বেটা পাষণ্ড তোর ঘরে ঢুকে অত্যাচার করবে, আমি কি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব? তোকে ভালবাসি বলে' কি, তোর ঐ নরকের ব্যবসাকেও ভালবাসি? যা বেটি, চলে যা। ধ্যানটি সবে মাত্র জমে আসছে, এমন সময় এসে বাধা দিলি। দিনটেই আমার আজ দেখছি মাটী হ'য়ে গেল।"

বলিয়া বৃদ্ধ চারুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কাপড়খানা আবার আল্‌নায় তুলিতে চলিলেন।

এই স্নিগ্ধ উদার তিরস্কারে চারুর মনকে যে প্রফুল্ল করিয়াছেন, তাহা গোস্বামী মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই। তিরস্কার করিয়াই কিন্তু তাঁহার মন কেমন একটা মৃদু বিষণ্ণতায় নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনাকেই আপনি তিরস্কার করিয়া উঠিল। কি জানি কোন্ শুভক্ষণে এই অভাগিনী পতিতা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে পিতৃস্নেহ লাভ করিয়াছিল। সে ভালবাসা কেমন, কত, কি জন্য, উভয়ের মধ্যে কেহই বিচারে জানিতে সাহস না করিলেও মাঝে মাঝে এ উহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। বহুদিন চারু না আসিলে

ব্রাহ্মণ নিজে গিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিতেন। এইরূপ মাঝে মাঝে আসিবার ফলে অতি অল্পদিনের ভিতরেই চারু সহরের মধ্যে বিশিষ্টা গায়িকা বলিয়া পরিচিতা হইয়াছে।

সেই স্নেহের তিরস্কার চারুকে প্রফুল্ল করিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের হৃদয়কে পীড়িত করিতে তাঁর মনের তিরস্কারে যোগ দিল। কাপড় আল্‌নায় রাখিতে তাঁর হাত অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল। ভিজা কাপড পরিয়া থাকিলে চারুর যদি অসুখ করে? যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া তার গাহিবার শক্তির হানি হয়? অভাগিনীর লোক মুগ্ধ করিবার একমাত্র উপায়—তাঁর কাছে আশ্রয় লইতে আসিয়া সে সম্বলহারা হইবে? তখন হাত, মন—ক্রমে চোখ সকলে একসঙ্গে তাঁকে বুঝাইয়া দিল—"মেয়েটাকে হঠাৎ এতটা তিরস্কার করা তোমার ভাল হয় নাই। মিষ্টবাক্যে তাকে বলিলেই ত হইত, আমি বৃদ্ধ মানুষ, ঐ সব ঝঞ্ঝাটের ভিতর আমার থাকা উচিত নয়।"

কি জন্য চারু আশ্রয় মাগিতেছে, তাও ত ব্রাহ্মণের জানা হয় নাই। বুঝিলেন—মনগড়া একটা কারণ নির্ণয় করিয়া চারুকে তিরস্কার করাটা তাঁহারই অন্যায় হইয়াছে।

কাপড়টা কাঁধে রাখিয়া গোস্বামী মহাশয় মুখ ফিরাইলেন।

বাহিরের ঝড় এখানেও তার বিপুল উল্লাস লইয়া খেলা করিতেছিল। সুতরাং মুখ ফিরাইয়া যখন তিনি চারুকে দেখিতে পাইলেন না, তখন সে চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া বেশ একটু ব্যাকুলভাবেই ডাকিয়া উঠিলেন—

"চারু।"

দুষ্ট চারু উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার সিক্ত বস্ত্রের সঞ্চালন-শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, সে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিয়াও, মমতার লীলাপ্রিয়তায়, শুনিয়াও যেন শুনিতে পান নাই,—একটু আদরের সহিত তিনি বলিলেন,

"কি ভাই, রাগ করে' চলে' গেলি?"

"না দাদা, দাঁড়িয়ে আছি।"

গোঁসাইজী আর কোনও কথা না কহিয়া প্রথমে আলো জ্বালিলেন। জ্বালিতেই দেখিলেন, এক পা হাঁটুর উপর ধরিয়া অন্যহাতে দেওয়ালের কোণ আশ্রয় করিয়া, মেঝের দিকে মুখ,—দোরটির পার্শ্বে চারু এক অপূর্ব্ব অবস্থানে

দাঁড়াইয়া আছে। সে নীরব, কিন্তু তার ছোট চরণতল যে তাঁর কাছে অঙ্গুলি সঙ্কেতে কত কি আবেদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

এরূপভাবে আলোক সেবিত একটা সুন্দর মেয়ের দাঁড়ানো দেখা বৃদ্ধের এ বয়স পর্য্যন্ত ঘটে নাই। দেখিবামাত্র গোঁসাইজী কেমন একপ্রকার ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

"হাঁ ভাই, তোর পায়ে কি আঘাত লেগেছে?"

"বড্ডো লেগেছে, বৃষ্টিতে রাস্তা ধুয়ে গেছে, পাথরগুলো সব খোঁচার মতন হয়েছে, পায়ের তলা একেবারে ক্ষতবিক্ষত।—তাই দাঁড়িয়ে ভাবছি, এ পা নিয়ে মা গঙ্গার কাছে কেমন করে' যাই। গেলেই নিস্তার পাই, তাও বুঝি আমার ঘটে উঠলো না।"

"তুই কি আমার কথায় রাগ করলি?"

"করলুম বই কি। তবে আমারও বলবার একটা ভুলে তোমার এই কথাগুলো শুনতে হ'ল। আশ্রয় চাওয়ার কথা বলাটা আমার কোনও মতে ভাল হয় নি। আশ্রয় আমি ত পেয়েছি। সেকি আজ? তবে নতুন ক'রে তোমার কাছে তা চাইতে গেলুম কেন?"

"কাপড়খানা পর।"

"তবে ওরকম করে' তুমি আমাকে তিরস্কার করলে কেন? তুমি নিজের দয়ায় উপযাচক হ'য়ে এ অভাগিনীকে আশ্রয় দিয়েছ, আমি কি, আমার ব্যবসা কি জেনেও দিয়েছ।"

"আগে কাপড় ছাড়্, তারপর আমাকে তিরস্কার কর্।"

"নইলে আমার মত হীন বেশ্যা তোমার চরণ ধুলোর ওপর মাথা রাখতে ভরসা করে?"

"আরে মর্, কাপড় ছাড়্, নইলে তোর সঙ্গে আর আমি কথা কইব না।"

বলিয়াই চাকর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া বৃদ্ধ তার গায়ের আঁচল উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

"এইখানা পরে' যা বলবার বল্, আমি বসে' বসে' শুনি। এই ঠাণ্ডায় গলায় যদি একবার সর্দ্দি জমে' যায়, তাহ'লে ও বীণার সুর আর কোনও কালে তোর গলা থেকে বেরুবে না।"

কিছুমাত্রও সঙ্কুচিত না হইয়া মুক্তাবগুণ্ঠিতা ভূপতিতাঞ্চলা এই যুবতী দাদার

হাত হইতে বস্ত্র গ্রহণ করিয়া যখন তাঁহারই সম্মুখে পরিবার উদ্যোগ করিল, তখন তাহার পাড় নেই দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—

"ও দাদা, এ কি কাপড়। এ আমি কেমন করে' পরবো?"

"আ মর্, তোর আবার সধবা বিধবা কি?"

চারু উত্তর না করিয়া বাম হস্তটা দাদার চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

তার বামহস্তের আয়তি-চিহ্ন দেখিয়া যেমন ব্রাহ্মণ মুখের পানে চাহিলেন, অমনি গল্‌গল্‌ করিয়া চারুর চোখ হইতে জল ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিছু বুঝিতে না পারিলেও বৃদ্ধও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতেই চারু বলিতে লাগিল—

"বাবা পাষণ্ডদের অত্যাচার হ'লে রক্ষা কর বলে' তোমার কাছে আসব কেন? তার অষুধ তোমার নাতনীর কাছে আছে। যে বশীকরণ-মন্ত্র তুমি আমাকে শিখিয়েছ, তাতে সাপের মত খলও যে, সেও মাথা হেঁট করে' আমার পায়ের কাছে বসে' আপনাকে ধন্য মনে করে। আমি পাষণ্ডের ভয়ে এই দুর্য্যোগে জ্বালাতন করতে আসিনি—দেবতার উৎপাতে এসেছি। দাদা, সে যে মন্ত্রে বশ মানলে না। আরো বারো বৎসর পরে—"

বলিতে বলিতে আবার চারুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ চারুকে হাত ধরিয়া বসাইলেন, আপনিও তার পার্শ্বে বসিলেন। চারুর এই রহিয়া রহিয়া ব্যাকুলতা বৃদ্ধের পক্ষে কেমন একটা যেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুধু চাহিয়া থাকার বিষয় হইয়া পড়িল।

হৃদয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ রোধ করিয়া চারু আবার বলিতে লাগিল—

"দাদা, এক যুগ পরে—আমি জানতুম মরে গেছে সে—আজ ঝড়ে আমার ঘরে উড়ে পড়েছে।"

ব্রাহ্মণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না, কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া চারু কথা বলিতেছে; কিন্তু ব্যাপারটা এতই অসম্ভব যে, বুঝিয়াও তিনি তাহা বুঝিতে সাহস করিলেন না। তিনি নিমেষের মধ্যে একবার চারুর মাথাটা দেখিয়া লইলেন। দেখিবামাত্র তার সংশয় অনেকটা যেন দূর হইল। তিনি পূর্ব্বে চারুর মাথায় আর কখনও তো সিঁদুর দেখেন নাই।

"তোর মাথায় কি আগে সিঁদুর ছিল?"

চারু মুখ-টেপা হাসির সঙ্গে মাথা নাড়িল।

"তোর হাতখানা আর একবার দেখা দি কি?"

দুইটা হাতেই পরস্পরে বাঁধিয়া, কোলের উপর রাখিয়া চারু দাদামশাইএর দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। কোন্ হাত তিনি দেখিতে চাহিতেছেন জিজ্ঞাসা না করিলেও, সে বাঁ হাতটা আবার তুলিয়া দেখাইল।

"এটাও তবে আজই পরেছিস্ বল্?"

চারুর মুখে হাসির রেখা বেশ একটু উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল—

"ভাগ্যিস দাদামশাই, ঘর-প্রতিষ্ঠার জন্য একটা সিঁদুর চুব্ড়ি আনিয়েছিলুম!"

ব্রাহ্মণ চারুর কাপড়খানা এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই, এইবারে দেখিলেন।

"তাই ত রে, দিব্যি কুলবধূটি সেজেছিস যে—আমরাই মাথাটা যে ঘুরিয়ে দিলি!"

"তবু এখনও ঘোমটা দিই নি দাদা।"

"একখানা সরু লাল প্বাড় কাপড় আছে, এনে দিই?"

ব্রাহ্মণের বারবারের অনুরোধ আর চারু উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। তদণ্ডে শুভ্র বস্ত্র পরিয়া আসন-প্রান্তে উপবিষ্ট হইল।

এইবারে গোঁসাইজী চারুর কাছে সে রাত্রির ইতিহাস শুনিতে চাহিলেন।

(১৮)

সন্ধ্যায় বাড়ীর বারান্দায় স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইতে তাহার ঘরে স্বামীকে রাখিয়া আসা পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, গানে ও সঙ্গতে উভয়ের ভিতর যেরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, চারু আনুপূর্ব্বিক তাহার 'দাদা'কে শুনাইয়া কথা শেষ করিল।

শুনিয়া ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণের জন্য কথা কহিতে পারিলেন না। এমন আশ্চর্য্য মিলন-কাহিনী আখ্যায়িকারূপে পুরাণের অন্তর্গত হইলেই বুঝি তাঁর মনঃপূত হইত। স্তম্ভিতের-মত বসিয়া, এক একবার কেবল তিনি সম্মুখস্থ তানপুরার তারে ধীরে অঙ্গুলির আঘাত করিতে লাগিলেন। ঘটনাটা তাঁর কাছে এতই বিচিত্র বোধ হইতেছে যে, একটা যে কোনও করুণ সুরে কাহিনীটাকে বাঁধিতে পারিলেই যেন এই গায়ক চূড়ামণির কাছে তার যোগ্য সম্মান প্রাপ্তি হয়!

ঘটনাটা বলিয়া চারুও কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়াছে। সে রাত্রির ব্যাপারটা বলিবার সময়ে আরও কত যে তার পূর্ব্বজীবনের তীব্রকাহিনী তাঁর কথার ভিতর দিয়া গোপনে তার মর্ম্মে আঘাত করিয়া গিয়াছে, কথা বলিবার

সময়ে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। এখন কথাশেষে, সেগুলা ফিরিয়া অতি তীব্র জ্বালায় তার মর্ম্ম আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। সে বৃদ্ধের মুখের দিক হইতে চোখ নামাইয়া নীরবে সেই জ্বালা ভোগ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ নীরব রহিয়া অবশেষে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন কি করতে চাস্?"

"চাই ত অনেক রকম করতে, কিন্তু দাদা, আমার কি কিছু করবার আর অধিকার আছে?"

"তোর স্বামী—তুই ঠিক বুঝেছিস?"

"আমার নেশা-মাখা চোখ মনে করে' কি সন্দেহ করছেন?"

"সে তোকে চিন্‌তে পারলে না?"

"চিনবো চিনবো করছে, কিন্তু চিনতে সাহস করছে না।"

"আর তারে ধরবার দরকার কি চারু?"

"ধরবো না?"

"আমার তো মনে হয় ধরা উচিত নয়।"

"উচিত নয়?"

"তার সমাজ আছে।"

"সে ভয় আমি বড় করি না, দাদা। তার সমাজ আছে, আমার টাকা আছে। সমাজের কথা ছেড়ে আর কিছু বলবার থাকে ত বল।"

"সে হয় ত আর একটি বিবাহ করেছে।"

"না।"

"জেনেছিস?"

"সে আমায় বলে নি, আমি বুঝেছি। শুধু তাই বুঝছি নয়, এটাও বুঝেছি—সে আপনারই মত একটি সাধু।"

"তা কি করে' বুঝলি?"

"তুমি ত আর আমার মত বেশ্যা হ'তে পার নি দাদামশাই, তুমি কেমন করে' বুঝবে? লোকের চোখ দেখে দেখে এ চোখ এত সায়েস্তা হ'য়ে গেছে যে, কারও মুখ-চোখের পানে চাইলেই তার ভিতরের খবরটা বলতে পারি। যাকে দেখলে বেশ্যার বুক কেঁপে ওঠে, সে সাধু না হয়ে যায় না।"

"তবে ত আরও গোলের কথা কইলি।"

"এই ত সবই আপনাকে বললুম। এখন কি করবো বলুন।"

"গঙ্গায় ডুবে মরবি, আর কি করবি।"

"তাতো করবো মনে করেছিলুম, কিন্তু তাকে ঘরে রেখে চলে এসেছি। আমি ম'লে পাছে খুনের দায়ে তার হাতে হাতকড়ি পড়ে, সেইজন্ত মরতে সাহস হ'ল না।"

ব্রাহ্মণ এমন বিষম সমস্তায় পড়িয়াছেন যে, চারুকে বলিবার কথা আর যেন তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। চারু কিন্তু তাঁর মুখ হইতে যা-হোক একটা কিছু শুনিবার জন্ত জেদ ধরিল—

"সকাল হ'য়ে এল দাদা,—সত্যি করে' বল, এখন আমার কি করা উচিত।"

"আমি যে কিছু বলতে পারছি না চারু!"

"তবে আপনার আশ্রয় চাওয়াটা আমার মিছে হ'ল?"

"এতকাল নরকের ব্যবসা করে' পাকা হ'য়ে গেছিস, আমি কোন্ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তোকে দিয়ে তার জাতটা নষ্ট করতে বলবো? পাপ তোর এতই অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে, দু'দিন পরেই আবার তুই যে বেশ্যা, সেই বেশ্যাই হবি। ঠিক থাকতে পারবি না।"

"পারবো না?"

"তুইই বল্ না—পারবি কি না।"

"পারবো দাদা!"

এক মুহূর্ত্তের জন্তও চিন্তা না করিয়া, তাঁর কথার এইরূপ উত্তরে চারুর উপর গোস্বামী মহাশয়ের ক্রোধ হইল। উষ্মা-কর্কশ কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"ও ঝোঁকের মুখের কথা। তুই বললেই আমি বিশ্বাস করবো?"

বলিয়াই তীব্র ভাষায় চারুকে তিনি এমন গোটা কতক গালি দিলেন যে, সেরূপ বাক্য চারু তাঁহার মুখ হইতে আর কখনও শুনে নাই।

কথাটা শুনিয়া চারু ক্রোধ অথবা দুঃখের বিন্দুমাত্রও লক্ষণ ত দেখালই না, বরং গালি শুনিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

তিরস্কার করিয়াই ব্রাহ্মণের চিত্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল, বিশেষতঃ তিরস্কারের উত্তরে চারুর হাসি শুনিয়া তিনি অপ্রতিভ হইলেন। যে হাসি স্ত্রীজাতির সাধারণ ভাবের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ-চিহ্ন, এ তা নয়। এটা একটা অভাগিনীর অনন্ত বিষাদ-পিষ্ট মাদকতা মাখানো রূঢ়া হাসি।

"তা হ'লে গঙ্গায় ডুবে মরাই দেখছি আমার কর্ত্তব্য।"

গোঁসাইজী এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া অতি ধীরভাবে চারুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমরা কি ?"

"'কি' কি ? আমাদের জাতের কথা জিজ্ঞাসা করছেন ? আমার স্বামী ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণ কেন, আমাদের দেশের ভাল কুলীন—তাঁর উপাধি চাটুজ্জে।"

"তা হ'লে ভাই, তোমাকে গাল দিয়ে আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি।

"আমাকে গাল দিয়ে ?"

আবার চারু হাসিয়া উঠিল।

"কেন ? আমি ত হীন চণ্ডালিনী,—তাই বা বলতে আমার সাহস কই ? চণ্ডালেরও ত তবু একটা জাতের বাঁধন আছে, আমার তাও নেই।"

"জাতের ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে বেশ ত আছিস চারু। কেন আর সে বামুনের ছেলেটাকে নরকে ডোবাবি ?"

"সে ইচ্ছা থাকলে, আজই তাকে ডুবিয়ে দিতে পারতুম। না দাদা, আমি নিজেই নরক থেকে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিলুম, আর সেই-জন্যই আপনার শরণাগত হ'তে এসেছিলুম।"

আর কোনও কিছু না বলিয়া চারু ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

"চলছিস্ নাকি ?"

"কি করবো ? আত্মীয় বলতে, আশ্রয় বলতে, এ অভাগীর এ পৃথিবীতে ছিলেন ত একমাত্র আপনি—।"

কথা শেষ করিতে না দিয়া বৃদ্ধ চারুকে বলিলেন—

"তাতো বুঝেছি, কিন্তু এখনও তো বুঝতে পারছ না চারু, আমাকে কি করতে হবে। তোকে ঘরে নিতে কি তোর স্বামীকে অনুরোধ করবো ?"

"আর কিছু করতে হবে না, আপনি আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' আপনার সরস্বতীর সঙ্গে আলাপ করুন। আমি আসি।"

"বাড়ী যাবি নাকি ?"

"সেখানে এখন আর কেমন করে' যাব ? রেতের অন্ধকারে কোনও এক রকম করে' এ পোড়ামুখ তাঁকে দেখিয়েছি। দিনে দেখাতে আর সাহস হচ্ছে কই ?"

বলিয়াই চারু চলিল।

"তবে কি গঙ্গায় ডুবতে চল্‌লি নাকি ?"

দোরের কাছে চারু উপস্থিত হইয়াছিল, 'দাদা'র কথা শুনিয়া সে মুখ ফিরাইয়াই বলিল—

"আর কেন পিছে ডাকেন দাদা ? আপনাকে আমি কোনও দিন মানুষ দেখি নি। চিরদিন যা দেখেছি, আজও আমি দেখ্‌ছি তাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দাদামশাই, যখন নরকে পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছিলুম, তখন নারায়ণ আমাকে ভালবাসতো, আর যখন সেই নরক থেকে ওঠবার জন্য কাতর হ'য়ে আমি হাত তুললুম, তখন নারায়ণ আমার উপর বিরূপ হ'ল।"

"আরে মর্‌ যাচ্ছিস কোথা ?"

চারু উত্তর ত দিলই না, মুখও ফিরাইল না।

"তোর স্বামীর যে বিপদ হবে।"

একটু বিরক্তির ভাবে মুখ ফিরাইয়া চারু বলিয়া উঠিল—

"হবে কি না হবে, এর পরে কে জানতে আসছে। হয় ত কি করবো, সহরে এত স্থান থাকতে বেশ্যার দোরে সে আশ্রয় নিতে দাঁড়িয়েছিল কেন ?"

চারু ঘর ছাড়িয়া ঝড়ের মধ্যে আবার প্রবেশ করিতে চলিল। বৃদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, চলিতে চলিতে চারু অন্ততঃ আর একবার মুখ ফিরাইবে। অনুমানটা মিথ্যা হইল দেখিয়া তানপুরা ছাড়িয়া তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

(১৯)

ঘরের বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, চারু বহির্দ্বারের কপাট খুলিয়া পথে নামিতেছে। সত্য সত্যই কি তবে সে মরিবার সঙ্কল্পে চলিয়াছে, না চরিত্রহীনার স্বভাবগত ছলনায় সে তাঁহাকে মরিবার ভয় দেখাইতেছে ?

শেষটা তাঁর মনে লাগিলেও, যখন চারু পথে পড়িয়া অদৃশ্য হইল, তখন ব্রাহ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাহিরের দরজায় আসিয়া মুখ বাড়াইলেন। অনেকটা প্রকোপের হ্রাস হইলেও, তখনও বেশ প্রবল ভাবেরই ঝড়। বাহিরে উষার আলোর অনেকটা বিকাশ হইলেও, তখনও সেই সরু গলি পথজোড়া অন্ধকার। দুই একটা গ্যাসের আলো—যারা এখনও পর্য্যন্ত প্রাণপণে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল—অন্ধকার-টাকে এক একবার হাসাইতেছিল মাত্র। সেই হাসির বিকাশ-মুখে একবার মাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, চারু গলির প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে।

গোঁসাইজীও পথে নামিলেন, দ্বিতীয়বারের আলোক স্ফুরণে যখন চারুকে আর দেখিতে পাইলেন না, তখন বিশেষ ব্যাকুল ভাবেই তার অনুসরণ করিলেন ;—বার্দ্ধক্যের সহায় একগাছা লাঠি লইবারও তাঁর অবসর রহিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁর কাপড় জলে যেন ডুবিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, হতভাগা মেয়েটাও তাঁর মত স্নান করিতেছে।

গলির মুখে আসিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সত্য সত্যই চারু গঙ্গার পথে চলিয়াছে। এতক্ষণ পরে তিনি বুঝিলেন, চারু তার দাদাকে আশ্রয়ের কথা লইয়া তামাসা করিতে আসে নাই, সত্যই আশ্রয়লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। সে আশ্রয় কিরূপ, আর চাহিলেও এ সমাজ বহিষ্কৃতাকে কিরূপভাবে তিনি তা দিতে সমর্থ, সেটা না বুঝিতে পারিলেও তিনি অভাগিনীর মানসিক অবস্থা অনুমান করিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, বহুকাল পরে নিজের পাপ-লীলার কেন্দ্রে স্বামীর অভবনীয় আবির্ভাব এ পতি-ত্যাগিনীর এতকালের ব্যর্থ জীবনটাকে এমন একটা তীব্র রহস্যের ইঙ্গিত করিয়াছে যে, সে আর তাহা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না। স্বামীর পাদস্পর্শে অভাগিনীর সমস্ত পাপের উপার্জ্জন দাবানলের মত উত্তপ্ত হইয়াছে। সে উত্তাপে তার বিলাসের যত্নে সেবিত অতি আদরের দেহ প্রতি পরমাণুতে দগ্ধ হইতেছে। গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন বুঝি অন্য কোনও উপায়ে তার সে জ্বালা জুড়াইবার উপায় নাই।

চারুকে ফিরাইতে তাঁর ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, আশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধে যাহা ভাবিবার পরে ভাবা যাইবে, আপাততঃ মেয়েটাকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৌতূহলও উদ্দীপ্ত হইল। সত্য সত্যই কি চারু আত্মহত্যা করিতে সাহস করিবে? ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করিতে গিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। চারুর কার্য্য এখনও যেন অভিনয় বলিয়া তাঁর ইচ্ছা হইতেছে। আপনার অস্তিত্বের কোনও আভাস না দিয়া তিনি তাঁর অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

আহিরীটোলায় গোঁসাইজীর বাসা, গঙ্গাতীর হইতে তা অধিক দূর ছিল না। সুতরাং গঙ্গাতীরে পৌঁছিতে চারুর বড় বিলম্ব হইল না। দুইটি বৃদ্ধা অনাথিনী স্ত্রীলোক মাত্র পথের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছিল। এক চারুর 'দাদামশাই' ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ সে দুর্য্যোগে তখনও ঘর হইতে বাহির হয় নাই।

বৃদ্ধারা পুরীযাত্রীদের প্রসঙ্গ লইয়া পথ চলিতেছিল। বোধ হয়, তাহাদের পরিচিত অথবা আত্মীয় কেহ জাহাজে চড়িয়া তীর্থে গিয়াছে। সেই জাহাজ হয় ত সাগরের মাঝে ঝড়ে পড়িয়াছে। পড়িলে কি যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, সেই কথাবার্ত্তায় তাহারা তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল। সে জন্য সে পথে চারুর নীরব অনুসরণে গোসাইজীর কোনও বাধা হইল না। তিনি সে পল্লীতে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই একরকম পরিচিত।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারু একবার নদীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধাদের কথা শুনিয়া একবার সে মুখ ফিরাইল। আর একটু বেশী ফিরিলেই সে গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইত। দেখিতে পাইত—বৃদ্ধ যষ্ঠিতে ভর না দিয়াও যুবকের উদ্যমে পথ চলিতেছেন। দেখিলে বোধ হয়, আর সে অগ্রসর হইত না। তা হইলে তার কার্য্যকলাপও বুঝি বৃদ্ধের চক্ষে চিরদিনের জন্য অভিনয়-রূপেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত। কোন শুভগ্রহের কৃপায় সেটা হইল না।

চারু দাঁড়াইতে বৃদ্ধও দাঁড়াইলেন। দূর হইতেই দেখিলেন, বৃদ্ধারা চারুর সঙ্গে কি যেন কথা কহিতেছে। দেখিলেন, তারা কথা কহিয়া ঘাটে নামিয়া গেল, চারু দাঁড়াইয়া রহিল। এইবারে বুঝিলেন, অভিনয় নয় সত্যই চারু আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়াছে, সঙ্কল্পে বাধা পাইয়া সে দাঁড়াইয়াছে। হয় সে বৃদ্ধাদের উঠিয়া আসার অপেক্ষা করিবে, নয় সে অন্য ঘাটে যাইবে। বৃদ্ধের শেষ অনুমানটাই ঠিক হইল, চারু সে ঘাট ছাড়িয়া অন্য ঘাটে চলিল।

আবার যেমন সে চোখের অন্তরাল হইল, অমনি যৌবনাবশিষ্ট সমস্ত শক্তি আরোপ করিয়া ভগবৎস্মরণে গোস্বামী মহাশয় চারুকে রক্ষার সঙ্কল্পে ছুটিয়া চলিলেন।

বাঁধা ঘাট হইতে অনেক দূরে, আঘাটায়, যেখানে কতকগুলা বড় বড় কাছিতে-বাঁধা নৌকা তুফানের তোলাফেলায় থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, চারু সেইখানে আসিয়া সর্ব্বনিম্ন তীরভূমিতে দাঁড়াইল। দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় তুফান তার বিপুল উল্লাসের শেষ উচ্ছাস পুষ্পাঞ্জলির সৌরভের মত এই স্বাগতা গায়িকার দু'টি পায়ে মৃদু পরশে যেন মাখাইয়া দিল। অমনি সে শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে—"ফিরে এস।"

মরিবার জন্য ত প্রথমে সে ঘর হইতে বাহির হয় নাই। তা হইলে গোসাঁইজীর কাছে না যাইয়া প্রথমেই একেবারে গঙ্গাতীরে আসিতে পারিত।

পরিচয় দিবার জন্ত উতলা হইলেও, দিবার যখন সুযোগ উপস্থিত হইল, তখন নিরপরাধ স্বামীকে পরিত্যাগের পর তার দীর্ঘ পাপ-জীবনের কার্য্যগুলা এক সঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া এমন ভীষণভাবে তার বুকটাকে আক্রমণ করিল যে, অভাগিনী ঘরের বাহিরে আসিয়া আর সেখানে ঢুকিতে সাহস করিল না। বিশেষতঃ পুনঃ সাক্ষাতে স্বামীর মুখ হইতে কি কথা যে বাহির হইবে, তাহার ব্যবহারে সেটা সে একেবারেই বুঝিতে পারিল না। পারিল না কেন, তাহার মন এমন একটা নিরাশার কথা তাহাকে শুনাইতে লাগিল যে, বুঝিতে গিয়া স্বামীর সৌম্য দৃষ্টি তাহার কাছে এক বিভীষিকার বস্তু হইয়া পড়িল।

অথচ তার পুরুষোচিত রূপ, তার কথা, গুণ, সর্ব্বোপরি তার আত্মরক্ষার পবিত্র চেষ্টা চারুকে এতই মুগ্ধ করিয়াছে যে, যদি সে স্বামীর মুখ হইতে চির-পরিত্যাগের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে এই গঙ্গার গর্ভে আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন এ পৃথিবীর আর কোনও স্থানে দাঁড়াইয়া সে শান্তি পাইবে না। তাই স্বামীকে প্রতীক্ষায় বসাইয়া সে গোঁসাইজীর কাছে পতির পুনঃপ্রাপ্তির উপায় জানিতে আসিয়াছিল। শুধু উপায় জানা কেন, আসিয়াছিল তাহাকে ধরিয়া দিবার সাহায্য ভিক্ষা করিতে।

কিন্তু গোঁসাইজীর কথায় এবারে তার মনে যথার্থই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে।

তার ভবিষ্যৎ চরিত্র-বলের উপর একান্ত অবিশ্বাসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে যে কঠোর তিরস্কার শুনাইয়াছে, এক মৃত্যুর চিরনীরবতা ভিন্ন সে কথার দ্বিতীয় উত্তর নাই।

মরিতে কৃতসঙ্কল্প, এতক্ষণ বুঝি তার দেহাত্মজ্ঞান সুপ্ত ছিল,—সঙ্কল্পের প্রেরণায় সে যে কলের পুতুলের মত চলিয়া আসিয়াছে। পদতলে পথের পাথরের তীব্র বেধ, মাথার উপরে বৃষ্টির ধারা সর্ব্বদেহে প্রবল শীতল বায়ুর আক্রমণ—এতক্ষণ কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু গঙ্গাজল-তরঙ্গ তার চরণ স্পর্শ করিবামাত্র যেমনি তার চৈতন্ত ফিরিল, অমনি সে যেন শুনিতে পাইল—"ফিরে এস।"

"ফিরে এস।"—কে যেন পরপার হইতে বলিতেছে। বিষম বিস্ময়ে সে সম্মুখের নদীপরিসরের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। বৃষ্টিধারা ভেদ করিয়া তার সিক্ত চক্ষু কেবল একটা অসীমতার আকার দেখিল মাত্র।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থানে সে দাঁড়াইয়াছে। জীবন তার পিছনে, মৃত্যু

সম্মুখে। তাকে আলিঙ্গন করিতে তার ভয় নাই। তার মৃত্যুর পিছন হইতে, ফিরিয়া আসিতে কে তাহাকে অনুরোধ করিল?

"ফিরে এস" কথার শেষে আর একটা আগ্রহসূচক আবেদন তার অন্তরা-কাশে ভাসিয়া—"আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি এক যুগ ধরিয়া,—তুমি ফিরে এস।"

"ফিরে এস।" তাই ত তার স্বামী যে তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছিল। "ঘণ্টা হ'ক, দিন হ'ক, মাস হ'ক বছর হ'ক—একটা জন্মই হ'ক, তুমি ফিরে এস। অনেক কথা তোমাকে যে বলিবার রহিল।" সে না ফিরিলে যে তার বলা হইবে না। তাই কি তার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ বাক্য ঝড়ে চড়িয়া চারুর আগে আসিয়া নদীপারে তাহার অপেক্ষা করিতেছে?

"ফিরে এস, ফিরে এস। তবে সত্য সত্যই যদি তাকে ফিরিতে হয়, সে কোথায় ফিরিবে—তার অসংখ্য ভুলের কাহিনীভরা বাসাঘরে, না অনন্ত বিস্মৃতির নিদ্রাপোরা পরপারে?

এবার তার মনে হইল, সত্যই যেন পরপারে এক শান্তিপূর্ণ গৃহে তার বাস ছিল, কেমন একটা ভুল করিয়া কিছুদিনের জন্ম এপারে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। এ পারের যাতনা ভরা সুখের তাড়নায় অস্থির হইয়া যেমন সে তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি সেই ঘরখানির শান্তি-শীতল প্রাণ পুনর্মিলন ব্যাকুলতায় তাহাকে ফিরিবার জন্য যেন অনুরোধ করিতেছে—"ফিরে এস। হ'ক না ফিরিতে একটা দীর্ঘ জন্ম, আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া, ওগো তুমি ফিরে এস।"

আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে ক্ষণেকের জন্ম আত্মঘাতীর একটা যে মত্ততা আসে, তাই বুঝি চারুর আসিয়াছিল, নহিলে সে অন্ততঃ একবার পিছনের দিকে চাহিত; তখন "ফিরে এস" কে বলিল অনুমান করিতে শুধু সম্মুখে চাহিয়া তাহাকে এমন একটা আকাশভেদী কল্পনার সাহায্য লইতে হইত না। তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, তাহাকে আত্মঘাত হইতে রক্ষা করিতে দাদামশাই সেই গড়ানো পিছল পথে তাহাকে ধরিবার জন্ম তাঁর জরাক্লিষ্ট শরীরকে উত্যক্ত করিতেছেন।

কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অভাগিনী যখন গঙ্গার কোলের দিকেই অগ্রসর হওয়া স্থির করিল এবং অনন্ত দীর্ঘ পথের শেষে ঘর খানিতে ফিরিবার অপেক্ষায় বসা তার চিরপরিত্যক্ত প্রিয়ের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত

হইবার সাহসটাকে অঞ্চলরূপে কোমরে বাঁধিতে লাগিল। অমনি সে শুনিতে পাইল—

"চারু বড পড়ে' গেছি রে।"

বিপুল চমকে একটু অস্ফুট শব্দ করিয়া চারু মুখ ফিরাইল। গভীব নিদ্রার সহসা অবসানের মত শূন্য দৃষ্টিতে সে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া রহিল।

"আমায় তোল ভাই, কোমরে লেগেছে—আমি উঠ্‌তে পারছি না।"

মৃত্যুর সঙ্কল্প চারু ভুলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া সে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

"কি দাদা, আমি মরতে পারি কি না, দেখতে এসেছ?"

চারুর সাহায্যে দাঁড়াইয়াই গোঁসাইজী বলিয়া উঠিলেন—

"না রে, তুই বেঁচে থাকতে পারবি কি না, তাই বুঝতে এসেছি। আমাকে ঘরে নিয়ে চল্।"

"এমন লেগেছে, নিজে ঘরে ফিরতে পারবেন না?"

"এ গঙ্গাতীরে সে কথা কেমন করে' বলবো? তবে তোর কাঁধে ভর দিয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয়েছে।"

"কোথায়?"

"আপাততঃ ঐ জলে, তারপর ঘরে।"

"গেলে কি আর ফিরতে পারবো?"

"আর ফিরতে দেব কেন?"

"কোথায় থাকবো?"

"আমার ঘরে।"

"কতক্ষণের জন্য?"

"ক্ষণ কেন ভাই, তুই যদি চিরদিনের জন্য আমার কাছে থাকতে চাস—।"

"দাদামশাই, এ গঙ্গাতীর—ঝোঁকের মুখে আমার কথা মনে করে' একটু আগে আমাকে তিরস্কার করেছ'—বুঝে' বল।"

"সত্তরের ওপর বয়স, আমি ঝোঁকে বলিনি চারু।"

তুমি যে বলেছ, আমি খাঁটি থাকতে পারবো না।"

"এখন বলছি—পারবি।"

"দাদা, কোমরে কি তোমার বড় লেগেছে?"

"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছিস?"

"তুমি আমার হাতটা ধরতে, আমি একটা ডুব দিয়ে নিতুম। বড় তুফান ভয়, হচ্ছে—পাছে ভেসে যাই।"

"চল্।"

চারুকে স্নানের সাহায্য করিতে গোঁসাইজী প্রথমে তাহার সাহায্যে নিজে স্নান সারিয়া লইলেন। চারু বলিল—

"দাদা, এইবারে আমার হাতটা ধরুন।"

আকাশ পূর্ব্ব হইতেই একটু একটু পরিষ্কার হইতে সুরু করিতেছে। মাঝে মাঝে অরুণ দেখা দিবার মত হইতেছে।

"আ-মর্, ব্যস্ত হ'স কেন, দাঁড়া—আগে হাত বার করি।"

বলিয়াই পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিয়া মধুর গম্ভীরধ্বনিতে এই গায়ক শ্রেষ্ঠ যেন গাহিয়া উঠিলেন—

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং (ইত্যাদি)

দ্বিতীয় প্রণামান্তে গঙ্গা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া চারুর মাথায় প্রক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যবতী অভাগীর সমস্ত চিত্তবৃত্তি নীরব হইয়া গেল। সে কাঠের পুতুলের মত নিদ্রিতদৃষ্টি গুরুর চরণপানে উপর নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার পর যে সব কথা, তাহা আধুনিক বস্তু তান্ত্রিকের শ্রুতিসুখকর হইবে না বুঝিয়া, বলিতে আমরা নিরস্ত হইলাম। আসল কথা—ব্রাহ্মণ চারুকে স্নান করাইয়া সেই গঙ্গাতীরে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তাহাকে দীক্ষিতা করিলেন।

গুরুর মুখনিঃসৃত অভয়বাণী বালিকাকে যখন বুঝাইয়া দিল, তাহার পূর্ব্ব জীবনের জ্ঞাতাজ্ঞাত সমস্ত অপরাধ আজ গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া গিয়াছে, তখন তার দেহের প্রতি ধমনীতে রক্তবিন্দুগুলা যেন পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। পুলকাশ্রু নিক্ষেপ করিতে করিতে আবেগভরা কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—

"দাদা, আমার সব পাপ ধুয়ে গেল?"

"যদি সনাতন ধর্ম্ম সত্য হয়, আর তোর সঙ্কল্প সত্য হয়।"

"গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা—আমার সঙ্কল্প সত্য।"

"তবে চল মা সরস্বতী, পুত্রকন্যাহীনের ঘরের নিষ্ঠুর শূন্যটাকে মমতার কোলাহলে ডুবিয়ে দে।"

বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিতে অবশিষ্ট জীবনের যষ্টিস্বরূপ করিবার জন্যই যেন চারুর স্কন্ধে ভর দিলেন।

তীরভূমি হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চারু একবার গোসাইজীকে জিজ্ঞাসা করিল—

"এবার থেকে আপনাকে কি বলে' ডাকবো ?"

"তোমার সঙ্কল্প যখন সত্য, তখন এই গঙ্গাজলে নারায়ণ তোমাতে আমাতে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে' দিলেন, তাও সত্য। তোমাকে তামাসা করবার সম্পর্ক আজ থেকে শেষ হয়ে গেল মা সরস্বতী।"

চারু বুঝিল, বারবী নরকে ডুবিয়া চারু হইয়াছিল, আজ আবার পতিতপাবনী গঙ্গায় ডুবিয়া সে স্বর্গে উঠিয়া সরস্বতী হইল। সে বলিল—

"বাবা, আজ থেকে আমাকে তোমার ঘরে দাসী করে' রাখ।"

"সে যা করবার ঘরে গিয়ে ঠিক করা যাবে।"

উপরে উঠিতেই চারু দেখিল, এইবারে দুই একটি করিয়া লোক পথে চলাচল করিতেছে। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে বহুকাল পরে সে আবার দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিল।

ক্রমশঃ।

রুধির-রঙে ফোটা

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী]

(১)

রুধির-রঙে উঠ্‌লো যে গাছ ফুটি,
তোমারি প্রভাত আলোর রবির চুমায়
ভরিয়ে দিও তাহার অধর দুটী
তোমার রসে তোমার অমলার ধারা
ভাঙ্গে যেন তাহার গোপন কারা।
সবুজ হ'য়ে উঠ্‌বে যখন হিয়া
তোমার তপন বুকের মাঝে নিয়া,
মলিন ক'রে দিও,
সাঁঝ-নীলিমায় গোপন ব্যথাটুকু
শূন্য ক'রে নিঙড়ে ধুয়ে নিও

(২)

যে ফুল ফুটে উঠ্‌বে আমার গাছে,
গন্ধ তাদের সকল টুকুই তুমি
লুফে নিও তোমার নিজের কাছে।
এদের হাসির সকল মধু আলায়
ঢেকে দিও তোমার জোছন মালায়।
জমাট বাঁধা শিশির আঁখি-কোণে
ধুয়ে দিও বাদল-বরিষণে।
অনিল-পরশ ছায়
শান্তি দিও বুকের মাঝে টেনে
রৌদ্র-সহা মলিন কালো কায়!

(৩)

যে সব গীতি গাইবে পাখী ডালে,
পৌঁছে দিও কান্না হাসির মাঝে
তোমার গোপন সুরের তালে তালে
তোমার হাওয়া-আলোর সকল খেলা
হারিয়ে দেবে আমার গাছের মেলা।
লাজ-ভরা তার সকল দেহই যেন
তোমার বুকে নতিয়ে পড়ে হেন'
বুঝ্‌তে দিও তারে—
তোমার মুখের একটু হাসির দাগ,
তোমার আপন একটু আঁখি-ধারে।

অন্তরের পাগল

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

যখন গম্ভীর হয়ে দেশের ভাবনায় মাথাটাকে ব্যাথিয়ে তুলি—বড় কিছু পাই না, পারিও না। চেয়ে দেখি কেবল ঘন কালো—নিকষ কালো—গহন আঁধার, কেবল নিরাশা। সে তিমির ঘন কাদম্ব দুর্ভেদ্যবৎ। এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের আকুলতা চঞ্চল আবেগ মদিরময়ী উত্তেজনা—সবই তার তুলনায় অতি হীন! একটী খদ্যোতদ্যুতি যেমন সারা অমানিশির আঁধারের কাছে কিছুই নয়—একটা আমি আমার দেশের অধঃপতনের কাছে কিছুই নই। কেমন যেন হৃদয়বৃত্তি আড়ষ্ট হয়ে যায়, কি যেন অস্পষ্ট অলক্ষিত নিষেধ শুনি—কে যেন মানা করে। অই ত মাথার উপর দিয়ে ষোড়শ বৎসর কত ঝড় বয়ে গিয়েছে, কত ঝটিকা উড়েচে কত মটকা ভাঙ ভাঙ হয়েচে কত অশনি সম্পাত করকা বৃষ্টি চলে গেল। হায় রে! এক দিনের মতও পারলুম কই ওই মত্ত মাতাল উতলা পবনের সঙ্গে কোলাকুলি কর্ত্তে, ওই এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল বৃষ্টির মাঝে তারই বিন্দুগুলির মত আপনাকে ভেঙে ছড়িয়ে উড়িয়ে দিতে। সে ত হ'ল না।

কিন্তু আমার যে চরম তাই, যদিও জন্মাবধি নিবিড় বিষণ্ণতা মাতৃগর্ভের মতই আমায় ঘিরে রেখেছে? যদিও আপনার মধ্যে আপন স্বভাবের প্রেরণা যারে স্তরে স্তরে জমা কচ্চে তার মধ্যে অশান্তি উন্মত্ততার উপাদান এতটুকুও নেই, তার এতটুকুও একটী তরঙ্গ তোলবার মত আলোড়ন সৃষ্টির ক্ষমতা হবে না, সে ফেনিয়ে না উঠে ঘনিয়ে উঠ্ছে—ফুটিয়ে তুলচে একটা নীথর ঘনায়িত ভাব যার ধূম পুঞ্জের অভ্যন্তরে স্বচ্ছতা দানা বেঁধে আমার সমগ্র দৃষ্টিশক্তিকে একাগ্র সম্পাতে আকর্ষণ করে রেখে দিনে দিনে পুষ্ট হয়ে উঠ্‌চে,—তবুও কিন্তু আমার চরম ওই ঝড়ের মধ্যে ওই বৃষ্টির মধ্যে। অবশ্য কেমন করে—কি স্বর্ত্তে তা আমার অন্তর্য্যামী জানান নি।

অহেতু বলছি না। এই দেখে বলি যে আমার মধ্যে যে জিনিষটা কোনও যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না, কোনও ভাবনা চিন্তায়ই হার মানে না, সেইই আমায় বড় করে আমার প্রবেশের জন্য বিশ্বহৃদয়ের দ্বার খুলে দেয়। আর যিনি হৃদয়ের দুরু দুরু কম্পিত স্পন্দিত ধমনীগুলির মধ্যে ব'সে একটা নিজস্ব আমির জন্য হিতোপদেশ দিতে আসেন তাঁর গলার সাড়া পেলেই আমার অন্তরলোকের

অন্তর-সভা ভেঙ্গে যায়। বিশ্বের কোনও দুয়ার খোলা পাই না। আপনাকে খুঁজেও পাই না।

অথচ এ ঝড় বৃষ্টি তা নয় যা বয়ে গিয়েচে, কেমন তাও জানি না। কেবল জানি সে এলে তার ঘূর্ণিপাকে উড়ে আমি হুহু করে চলে যাব!

এই যে বিষণ্ণচিত্তে বসে সম্মুখের গহন ঘন আঁধিয়ারা চিরে চিরে ঝলকে ওঠা বিজলি চমক দেখচি, শুনচি সন্ধ্যার দৌড়ে যাওয়ার পায়ের শব্দ বৃষ্টির ঝুপ্-ঝাপ্, সবে মিলে মিশে জড়ো হওয়া অশ্রান্ত কল্লোল—এর সন্নিবেশ যেখানে নীবিড় হয়েচে সেখানে তাড়া করার মত আওয়াজ শোনাচ্চে যেন—হা—হা—হা—এমনি একটা উত্তেজিত রব।

কিন্তু বড় ফাঁকা ফাঁকা সে রব। বাধিয়ে তুলে যেন নিবেট করে ফেলেচি মাথাটাকে, তাকে সে ঘুরিয়ে দিতে পারে না। সে মাথা কেবল সাড়া নিচ্চে আর একজায়গার অনুভবের যেখানে আকাশের আঁধারের ধমনগুল মধ্যবর্ত্তী দানা বাঁধা পৃথিবীর মত অস্পষ্ট ভাবমণ্ডলের আবছা কুয়াসার ধোঁয়ায় স্বচ্ছ আর একটা কি দানা বেঁধে উঠেচে। মাথা সাড়া দিয়ে জানচ্ছে ও হা হা হা -ওর মধ্যে এতটুকু জোর নেই। ওই ঝড়ে একটানা স্রোত এতটুকু নেই—আছে দমকা। দীর্ঘশ্বাসের মত দমকা। ও কিছু নয়। ও বারিপাত ও কাকেও উপ্‌চে ভাসিয়ে দিতে পার্ব্বে না —ও ফোঁটা ফোটার কাজ নয়। সাগরকে নেচে উঠে মত্ত লহরে এখানে ছুটে আসতে হবে। হা হা হা। যা শুনচো কান পেতে শোনো সেটা একটা অশ্রান্ত হাহাকার।

তাই ত বলচি কিছুই হল না। গম্ভীর হয়ে দেশের ব্যথা ভাবতে গিয়ে কিছু পাই না, পারিও না। গম্ভীর হয়ে কিছুই কর্ত্তে পারলুম না। যত কাজ করেচি যত কাজ না করেচি সবই বৃথায় গেছে। ওই সম্মুখের আঁধার আর অন্তরের গুঞ্জন এ ছাড়া আর কিছুই সত্য করে পেলুম না।

অশান্ত হৃদয় না বুঝে ভাবনা চিন্তার তোয়াক্কা না রেখে মেতে ওঠার মধ্যে সহসা পাড়ি দেওয়ার মধ্যে কোনও কূল কিনারার ভরসা ত দেখলুম না। আবার শান্ত হয়ে বুঝে ভেবে যে কোনও পরিণাম টেনে আনবার সম্ভাবনা আছে তাও দেখচি না।

আমার কাজের মানুষ রোখের মানুষ সে ক্ষয়ে দম আটকে লুটিয়ে পড়েচে, আমার জ্ঞানের মানুষ পাথর, গবেষণার মানুষ নির্ব্বাক। আজ তবে এ প্রহরে কার আসর সাজাব? শিল্পি কুশলী কলাবিৎ সকলেই যে দিশেহারা!

—তবে ডেকে তোল পাগলকে। উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন পদ্ধতিহারা, অকাজের পাগলকে আজ খোঁজ কর। চল পথে বাহির হই,—এ রণযাত্রাও নয় শোভা যাত্রাও নয় এ একেবারেই হেলাফেলা ছেলেখেলা। এর হিসাব নিকাশ কেন নেই। এ দুনিয়ার সঙ্গে প্রকৃতির স্পষ্ট বোঝাপড়া যে ওর কাজ অকাজ সবই সমান, দুয়েতেই বেগার খাটা,—চল ভাই আনন্দ বাজারে মজা লুটি।

এই বার শোন ত কান পেতে অন্তরে বাহিরে কি বোল উঠেছে?

কোথাও কোন উত্তেজনা শুনতে পাচ্ছি না—হাহাকার কোথাও নেই। কি আছে? ওই যে চারিদিক মাতিয়ে দিয়ে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্চে—ও ত হাস্যধ্বনি। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

হয়েচে এইবার হয়েচে। ওরে হওয়ার দুদিক মিলিয়েই ত দেখলুম। ভাল মন্দ সবই ফাঁকি। হবি ত হওয়ার অতীত হ, পাগল হয়ে পড। কিসের দেশ কিসের কাজ কিসের উন্নতি। সবই ধোঁকার টাটি। আনন্দে মেতে যা পাগল হয়ে নেচে নেচে মজা লোট।

*　　*　　*　　*　　*

এই যে জাতি আমাদের জাতি-গোড়ামীর বর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ সংবৃত করিয়া নাকি শত শত শত্রুর কবল এড়াইয়া এতদিন টে কিয়া আসিতেছে কে বলে এ জাতির উন্নতি চাই? বিশ্বের দরিদ্র জাতিগুলি প্রাণের ভয়ে ছটফট করিতে করিতে পৃথিবী তোলপাড করিয়া মরে ব্রিটিশারকে প্রপ্যাব করিতে হয়, জার্ম্মাণকে কালচার করিতে হয় কাহাকেও বাণিজ্য করিতে হয় কাহাকেও স্বাধীনতা লাভ করিতে হয় (দোহাই। আইরিস, পোল প্রভৃতি হতভাগা জাতিগুলাকে লক্ষ্য করিতেছি, সোনার ভারতের কাহাকেও নহে) উন্নতি না করিলে তাহাদের বাঁচিবার উপায় নাই,—তাহারাই উন্নতি করুক। বাঙ্গালীর উন্নতি। ধোপের পর ধোপ টেঁকিয়া বরং উত্তরোত্তর ধোপদস্ত লেফাফা দুরস্ত হইয়া এ জাতি এমন বাঁচিয়া রহিয়াছে, এ জাতির উন্নতি। যে বলে সে হয় ধর্ম্মদ্রোহী নয় ত সমাজদ্রোহী নয় ত অন্ততঃ বাঙ্গদ্রোহী। বাঁচিবার জন্যই উন্নতি, আমরা ধর্ম্মরূ বরীয়াদের উপর খাড়া বসিয়া টেঁকিয়াই বাঁচি। আমাদের সত্তা স্বতন্ত্র। আমরা উন্নতিশীল নহি। বরং—নাম না দিলে অচল হয়ত, বুলিতে পার,—আমরা রক্ষণশীল।

আমরা কাপুরুষ দুর্ব্বল এ কথা সত্য নহে। বরং আমরা এমন অসমসাহসী যে আমাদের জীবনের সমস্ত সংবাদ ঠিক ঠিক পাইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের

মানুষেরা -আঁৎকিয়া আমাদের ভয়ে বাসাতেই মরিয়া থাকিত। এত ভয় পাইত যে প্লেগকেও সভ্যজাতিতে অত ভয় পায় না। ইংরাজিতে একটা কথা আছে Adventurer সে পোড়াজাতে নাকি হাজারে একজন পুরুষ তাহাই হইয়া থাকে আর তাহারাই জুটিয়া পুটিয়া ব্রিটীশ জাতিটাকে বিশ্বজয়ী করিয়া তুলিয়াছে। এ জাতি মধ্যে যে হাজারে নয় শত নিরানব্বুই তাহাই এ কথা যে দিন কোনও প্রচারক পৃথিবীতে প্রচার করিবেন সে দিন বসুন্ধরার কি মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহা বিধাতাই জানেন।

আমার কথাটা অবিশ্বাস যোগ্য বলিতেই পার না—মাত্র বলিতে পার বুঝিতে পারিতেছি না। সোজা কথা বুঝাইয়া দিতেছি। তবে জানিও শাস্ত্রবৎ অশাস্ত্র শ্রবণেও তর্ক চলে না। কারণ তর্কে হারিয়া গেলেই মূর্খ প্রমাণিত হইবে। তখন—মূর্খস্ত—জানত ?

কাপ্তেন স্কট উত্তর মেরু আবিষ্কারে ছুটিলেন, অজস্র অর্থব্যয় লোকক্ষয় আত্মপ্রাণ আহুতি, কিন্তু কেন ? আমার ত মনে হয় আর কোনও উদ্দেশ্যই ইহাতে নাই কেবল একটা মানসিক অনুভূতিময়ী চমৎকার উত্তেজনা লাভ। মনুষ্যজাতির লাভালাভ ব্যবসা হিসাব তাঁহার মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই খতায় নাই। এমনি কেহ আফ্রিকার নীবিড় অরণ্যে পশিয়াছেন, কেহ হিমলায় উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ জল প্রপাত ডিঙ্গাইয়াছেন। ভাবটা এই কাজের ফল যাহাই হউক এতবড় কাজটা যা শুনিলে লোকের দাঁতে দাঁত লাগিবে করিয়া ত ফেলি! এই ত চলিত কথায় Adventure। যতই জিনিষটা আজগুবি খেয়ালের ভিত্তিতে রচিত হইবে বাহাদুরীর মাত্রা ততই। যাহাই হউক, ওসব দেশে এমন লোক হাজারে একজন।

আর এ জাতে বিভিন্ন বয়সে যেমন কতকগুলি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নরদেহ মাত্রে থাকে তেমনি প্রতিজনে এক এক বয়সের এক একটা Adventure। নমুনা স্বরূপ জন্মটাই আগে ধরি। গর্ভধারিণীর মুখে তখনও স্তনন্ধয়ত্ব পরিস্ফুট, আত্মীয় স্বজনের লজ্জায় মুখ পুড়িয়া যাইবার কথা—কিন্তু শুনিয়া লোকের দাঁতে দাঁত লাগা চাই ত-তাঁহারা লঘু গুরু নির্ব্বিশেষে আনন্দে উন্মত্ত, কি ? না আমাদের খুকি এখনি সবে বার উৎরেই সন্তানের মুখ দেখ্চে। মড়া বহিবার খাটিয়াটী কেবল আনা নাই নয় ত গৃহস্থের আর সকলই জোগাড় আছে। শুভ লগ্ন এলো অমনি যমে মানুষে টানাটানি। শুভধ্যায়ানী অন্তঃপুরিকারা ক্ষণে শঙ্খ ক্ষণে সানাই দুই-ই ফুঁকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এমনি একটা ঝড় বৃষ্টির

মধ্যে জন্মেই ত অবতার, সে তবু আধ্যাত্মিক হিসাবে অকর্ম্মণ্য জড় জগতের ঝড় বৃষ্টি। এই সুক্ষ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে জন্মে বর্ষে বর্ষে কত না শিশুর অবতার লগ্ন লাগচে,—ক্ষণ জন্মা পুরুষের অভাব আছে কি? তার পর ভালয় ভালয় যদি প্রসূতি সন্তান দুজন হল ভালই, নয় ত শুধু নবজাত অবতার সূতিকাগার হতে বার হলেন,—অভিভাবকে ডাক্তারে মাসকাবারি বন্দোবস্ত। বাল্যলীলা —নন্দের মন্দিরে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে। বাঙ্গালী বাল্যাবস্থায় কেমন করে শিক্ষিত হন এই পাগলাম হিসাবে সে আলোচনা নিস্প্রয়োজন, তবে চোখের ওপর যেটা দেখা যায়—দিনে দিনে তাঁরা শশিকলার মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকেন। আর বেশ জল্ জলে চোখে পড়ে, তাঁদের শিক্ষাদানের দোহাই দিয়ে অনেক বাবু প্রতিপালিত হন, গাড়ী ঘোড়া চড়েন, দু পয়সা জমিয়ে যান। এমনি কর্ত্তে কর্ত্তে অনেক জামাজোড়া কেতাব খাতা ঘুগিয়ে একদিন সাক্ষাৎকার লাভ হয় যে কাল যে বালক ছিল আজ আর সে তা নেই। ডিগ্রের বাহবায় তার মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়েচে, কপালে অনেকগুলো বলি চিহ্ন পড়ে গেছে। সে মানুষ হল কিনা হল বয়ে গেল, দেখা যায় সে বয়স্থ হয়েচে। যৌবন—যৌবনটা জীবনের মধু বসন্ত, পনেরো আনাই সেই মধুর ঝাঁঝে মিনিটাবি। উন্মুখ প্রবৃত্তি যেখানে বাধা পাবে সেইখানেই বিষিয়ে আছেন। বাপ স্বার্থপর অথবা স্ত্রৈণ, মা শত্রু, ভায়েরা ভাগিদার। স্ত্রী পছন্দ মত চাল চলন কর্ত্তে পারেন তবেই, নতুবা ইঙ্গবঙ্গ ভাষায় যত গালাগাল আছে একাধারে সব। জীবন লক্ষ্যহীন কাজকর্ম্ম সাফল্যহীন কথা বার্ত্তা অসংলগ্ন, কোন ও স্বাধীন অভিমত না থাকার যা ফল। পরিণত কাল—টেঁকিয়া থাকার তপস্যায় জীর্ণদেহ রুদ্ধশ্বাস, চল্লিশের এ পারেই অন্তিমের কাছাকাছি, —পশ্চাতেও এক অকর্ম্মার রেজিমেণ্ট। এমনি জন্ম লালন পালন শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্রের উপর যাহাদের জীবনের ভিত্তি গাড়িবার প্রথা তাহাদের কল্পনায় গাইস্থের স্বর্গসুখের চারিতালা প্রাসাদের প্লাণ কামড়াইয়া পড়িয়া থাক। একি কম অসমসাহসিকের কাজ? কত দুর্গম পথে পাড়ি জমান? এমন আজগুবি খেয়ালে কোন জাত মজিতে পারে? এ জাত স্বচ্ছন্দে পুরুষাণুনামে এই প্রবাহে গা ভাষাইতেছে। দেখাও দেখি এতবড় বুকের পাটা ওয়ালা দোসরা জাত?

আমরা অলস দরিদ্র এমনও নাকি একটা অপবাদ আছে।—মূর্খে তাহা দিয়াছে। এতটুকু পর্য্যবেক্ষণ শক্তি থাকিলে এ কথা কেহ মুখে আনিতে পারে না। তার উপর স্বজাতি প্রীতি আমাদের মত কোনও জাতির নাই। অপরাপর

জাতি তাহারা ত নিজের জাতিটাকে বাড়াইবার জন্য জগৎ জোড়া করিবার জন্য কেবল একটু ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করে। আমরা যা করি যতখানি করি সে অলৌকিক। ওই যে পোষ্য প্রতিপালন ক্ষমতা একটা জন্মিবার পূর্ব্বেই আমরা পরম বৈরাগ্যের সহিত অমন চার পাঁচ ছয়টীকে পৃথিবীতে আনিয়া ফেলি, জাতির মু খ চাহিয়া জনসংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া দিই এ আর কোন জাতির লোক পাবে? আমরা অলস? অলসের কি এই রীতি। দুঃখের জগদ্দল বোঝাটাকে পরম মমতার সঙ্গে ঘাড়ে করিয়া আমাদের মত কাহারা ধান্ধায় ফিরিতে পারে? আর মুহুর্ত্তের জন্যও কামাই নাই, ধান্ধায় অবিরত ফিরিতেছি? এর নাম কি আলস্য? যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকিত বুঝিতে আমাদের দুঃখ দারিদ্র প্রসূত নহে। আরও আমাদের এই বিরাট মন কতখানি রোমান্সে ভরা। ধান্ধায় গলদ ঘর্ম্ম সহসা একদিন দেখিতে পাই, সারাজীবনের সুখভোগ উপার্জ্জন সঞ্চয়ের ফলে দেহ পুষ্টি স্বস্তি ও মিতাচারের অভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অবস্থার উপযুক্ত ব্যবসা কোনও দিনই করিয়া তুলিতে পারি নাই—সঙ্গতির মধ্যে জন্মিয়াছে ঋণ, আপনার দিক হইতে আর কোনও ভরসা নাই, কেহ এখন মুখের দিকে না চাহিলে চলে না অথচ পশ্চাতে আপনার হাতে গড়িয়া খাড়া করিয়াছি যাহাদের তাহারা এখনও আমারি অণুজিবী। লজ্জা আসেনা ধিক্কার আসে না অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার সময়ও থাকে না—ফন্দি আঁটিতে থাকি দুঃখের ধান্দায় হাড়িকাটে কেমন করিয়া তাহাদের গলা আটিয়া দিয়া যাইব অর্থাৎ ব্যবস্থা করিয়া যাইব।

এ জাতির জন্য কাঁদিবার—ক্রুদ্ধ হইবার কি আছে? কবে কল্পনা প্রবণ শৈশবে কাহার কাছে শুনিয়া ভুল শিখিয়াছি, সেই চক্ষে এইখানকার অবস্থা দেখিয়া অধীর হইয়া উঠে। ওগো। পরের মাপ কাটিতে আমায় মাপিলে মাপে কেমন করিয়া সমান হইব? ছোট কি বড় দেখিলে আশ্চর্য্য হও কেন? এ জাতির গৃহ প্রাঙ্গন ভরিয়া ম্লানমুখ কঙ্কালসার পুতলাগুলি দেখিয়া তোমার হৃদয়ের করুণা তাহাতে করুণ রস ঢালিয়া দিতেছে। যিনি চিত্রকার তিনি জানেন এ আলেখ্য তাঁহার কল্পনা বস্তু বিভৎস রস।

আপন আবেগে উচ্ছসিত হয়ে তোমার কল্পনাবেগ হৃদয়ে যা জমায় সে আর একখানি নূতন ছবি আকিয়ে তুলতে। তোমার রস সেখানেই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে। ওই শোন অন্তরের পাগল হিঃ হিঃ শব্দে হেসে তারই পট নির্দ্দেশ করচে। মা শুচ।

অনাদৃতা

[কাজী নজরুল ইসলাম]

ওরে অভিমানিনী !
এমন ক'রে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি।
পথ ভুলে তুই আমার ঘরে দুদিন এসেছিলি,
সকল সহা ! সকল সয়ে কেবল হেসেছিলি।
হেলায় বিদায় দিনু যারে
ভেবেছিনু ভুলবো তারে হায় !
আহা ভোলা কি তা যায় ?
ওরে হারা-মণি। এখন কাঁদি দিবস-যামিনী॥
অভাগীরে ! হাসতে এসে কাঁদিয়ে গেলি,
নিজেও শেষে বিদায় নিলি কেঁদে,
ব্যথা দেওয়ার ছলে নিজেই সইলি ব্যথা রে,
বুকে সেই কথাটাই কাঁটার মত বেঁধে !
যাবার দিনে গোপন ব্যথা বিদায়-বাঁশীর সুরে
কইতে গিয়ে উঠলো দু' চোখ নয়ন-জলে পুরে !
না কওয়া তোর সেই সে বাণী,
সেই হাসি ম্লান সেই মু'খানি হায়
আজো খুঁজি সকল ঠাঁই !
তোরে যাবার দিনে কেঁদে কেন ফিরিয়ে আনি নি ?
ওরে অভিমানিনী !!

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

দশম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলা ভাষায় "উঠ্‌তে লাথি, বস্‌তে ঝাঁটা" বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহার অর্থ যে কি তাহা জেলখানায় দুই চারি দিন থাকিতে থাকিতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম। একে ত আমাদের পরস্পরের সহিত কথা কহিবার জো নাই; তাহার উপর যেখানে আমাদের রাখা হইয়াছে সেখানে শুধু মাদ্রাজী আর ব্রহ্মদেশীয় লোক। কাহারও কথার এক বর্ণও বুঝিবার উপায় নাই। সারাদিন ঠক্ ঠক্ করিয়া নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়া যাও আর সন্ধ্যার সময় একটা অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে কম্বল জড়াইয়া পড়িয়া থাক। পূরা কাজ করিয়া উঠিতে পারিতাম না বলিয়া গালাগালি ও দাঁত খিচুনি প্রায়ই খাইতে হইত। কিন্তু উপায় নাই। একদিন সন্ধ্যাব সময় গালাগালি খাইয়া মুখটী চুণ করিয়া কুঠরীর মধ্যে বসিয়া আছি এমন সময় একজন পাঠান প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল— "বাবু কি হয়েছে?" আমি গালাগালি খাওয়ার কথা বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া সে বলিল—"দেখ, বাবু, আমি প্রায় পাঁচ বৎসর এই জেলে আছি। গালাগালি খেয়ে যারা মন গুমরে বসে থাকে তারা হয় পাগল হয়ে যায়, নয় ত মারামারি করে ফাঁসি যায়। ও সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলাই ভাল। খোদাতালার হুকুমে এমন দিন চিরকাল থাকবে না।"

চুপ করিয়া গালাগালি সহ্য করার অভ্যাস কস্মিন্‌কালেও ছিল না, কিন্তু পাঠানের মুখে খোদাতালার নাম সে রাত্রিতে বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। মানুষ যখন সব আশ্রয় হারাইয়া দিশেহারা হইয়া পড়ে তখন অগতির গতিকে তাহার মনে পড়ে। সেই জন্যই জেলখানায় দেখিতে পাই যাহারা দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড তাহারাও এক এক গাছা মালা লইয়া মাঝে মাঝে নাম জপ করে। আগে এ সব দেখিয়া বড় হাসি পাইত, তাহার পর মনে হইল ইহাতে হাসিবার কি আছে? আর্ত্তভক্তও ত ভগবানেব ভক্তের মধ্যে গণ্য।

কিন্তু দুঃখের মাত্রা দিন দিন যেন অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত নূতন সুপারিন্টেনডেণ্ট আসিয়া যখন আমাদের ঘানিতে জুড়িয়া তেল পিষাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন তখন মনের মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ঝপ্ করিয়া ফাঁসিকাঠে

পড়া সহজ; কিন্তু দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া মরা তত সোজা নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন মানে ২৫ বৎসর; তাহার পরও খালাস পাওয়া সরকার বাহাদুরের ইচ্ছাধীন। মনে হইতে লাগিল যে এইরূপ কর্ম্মভোগ না করিয়া একগাছা দড়ি লাগাইয়া না হয় ঝুলিয়া পড়ি—কিন্তু সাহসে কুলাইল না। মরার জন্য যতটা দুঃসাহসের দরকার আমার বোধ হয় ততটা ছিল না। কাজে কাজেই যথাসাধ্য ঘানি পিষিয়া সরকারের তেলের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলাম। একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘানি ঘুরাইয়াও ৩০ পাউণ্ড তেল পুরা করিতে পারিলাম না। হাত পা এমনি অবশ হইয়া গিয়াছে যে মনে হইতেছিল বুঝি বা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাই। তাহার উপর সমস্ত দিন প্রহরীদের কাছে কাজের জন্য গালি খাইয়াছি। সন্ধ্যাবেলা আমাকে জেলারের নিকট লইয়া গেল। জেলার ত সুশ্রাব্য ভাষায় আমার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পশ্চাদ্দেশে বেত লাইবার ভয় দেখাইলেন। ফিরিয়া আসিয়া যখন ভাত খাইতে বসিলাম তখন খাইব কি, দুঃখ ও অভিমানে পেট ফুলিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছে। একজন হিন্দু প্রহরীর মনে একটু দয়া হইল, সে বলিল—"বাবুলোক তকলিফমে হৈ, খানা জাস্তি দেও।" কথাগুলা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবার প্রবৃত্তি হইল। নিজের গলাটা নিজের হাতে চাপিয়া ধরিলাম। এ সময় লাথি ঝাঁটা সহ্য করা যায়, কিন্তু সহানুভূতি সহ্য হয় না।

রবিবারেও কর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। নীচে হইতে বালতি বালতি জল উঠাইয়া দোতালা ও তেতালার বারান্দা নারিকেল ছোবড়া দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে হইত। একদিন ঐরূপ পরিষ্কার করিবার সময় দেখিলাম উল্লাসকর কিছু দূরে কাজ করিতেছে। কথা কহিবার হুকুম নাই, তবু কথা কহিবার বড় সাধ হইল। দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া উল্লাসের কাছাকাছি গিয়া তাহাকে ডাকিবামাত্র আমার পিঠের উপর গুম্ করিয়া একটা বিষম কিল পড়িল। পিছনে মুখ ফিরাইবা মাত্র গালে আর এক ঘুসি। মূর্ত্তিমান যমদূতসদৃশ পাঠান প্রহরী মহম্মদ সা এইরূপে সরকারী হুকুম তামিল ও জেলের শান্তিরক্ষা করিতেছেন।

সেবার কিছু দিন এইরূপে কাটাইয়া ঘানির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। কিন্তু জেলার নাছোড়বান্দা। দিন কতক পরেই আবার ঘানিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু আমি তখন মোরিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছি। একেবারে

সাফ জবাব দিয়া বসিলাম—"আমি ঘানি পিষিব না, তুমি যা করিতে পার কর।" জেলার-ত অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। একটা কুঠরীতে বন্ধ রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে হাতকড়ি, বেড়ী ও কঞ্জি (penal diet) র ব্যবস্থা হইল। শেষে শরীর যখন নিতান্তই ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল তখন আবার ছোবড়া পিটিবার অধিকার পাইলাম। কিন্তু ছোবড়া পিটিয়াই কি শান্তি আছে? প্রহরীরা বিশেষতঃ পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমানেরা স্থির করিয়া লইয়াছিল যে আমাদের দাবাইতে পারিলেই কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। কাজেই তাহারা সর্ব্বদা আমাদের বিপদে ফেলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকিত। ছোটখাট খুটিনাটি লইয়া যে কত জনকে বিপদে পড়িতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। একদিন কুঠরীর মধ্যে পায়ে বেড়ী দিয়া শুষ্ক ছোবড়া পিটিতেছি। দারুণ গ্রীষ্মে ও কঠোর পরিশ্রমে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঘামের স্রোত ছুটিয়াছে ছোবড়া পিটিবার মুগুর মাঝে মাঝে লাফাইয়া লাফাইয়া আমারই মাথা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কুঠরীর বাহিরে একজন পাঞ্জাবী মুসলমান প্রহরীকে দেখিয়া ছোবড়াগুলা ভিজাইবার জন্য একটু জল চাহিলাম। সে একেবারে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল—"না, না, হবে না, ঐ শুক্‌নো ছোবড়াই পিট্‌তে হবে।" আমারও মেজাজটা বড় সুবিধার ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জল না হয় নাই দেবে, কিন্তু অত দন্ত বিচ্ছেদ করছ কেন?" প্রহরী রুখিয়া দাঁড়াইল "কেয়া, গোস্তাফি করতা?" আমি দেখিলাম এখন আর হটিয়া যাওয়া চলে না। বলিলাম—"কেন, তুমি নবাবজাদা নাকি?" বলিবা মাত্র প্রহরী জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া আমার গলার হাঁসুলি ধরিয়া এমনি টান মারিল যে জানালার লোহার গরাদের উপর আমার মাথা ঠুকিয়া গেল। রাগটা এত প্রচণ্ড হইয়া উঠিল যে লোকটা যদি কুঠরীর ভিতরে থাকিত তাহা হইলে হয়ত তাহার মাথায় মুগুর বসাইয়া দিতাম। কিছু একটা না করিলেই নয়, কিন্তু করিবই বা কি? শেষে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া এমনি কামড় বসাইয়া দিলাম যে তাহার হাত কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। হাত লইয়া সে জেলারের কাছে নালিশ করিতে ছুটিল কিন্তু রাস্তার মাঝখানে আমাদের বন্ধু একজন হিন্দু পেটি-অফিসর (pcatty officer) তাহাকে কতকটা ভাল কথা বলিয়া কতকটা ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আসিল। প্রহরীদের সঙ্গে আরও দু একবার এইরূপ ঝগড়া হইয়াছে কিন্তু দেখিয়াছি যাহাদের নিকট তাহারা হারিয়া যায় তাহাদেরই ভক্ত হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের

উপর নির্য্যাতন সব জায়গায়ই হয়, আর সে নির্য্যাতন পাঠানেরাই বেশী করে। কিন্তু পাঠানদের সহস্র দোষ সত্বেও একটা গুণ দেখিয়াছি যে যাহাকে একবার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, নিজের মাথায় বিপদ্ লইয়াও তাহার সাহায্য করে। তাহাদের মধ্যে নৃশংসতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহাদের মনের দৃঢ়তা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে অধিক। ধর্ম্মঘটের সময় জেলার আমাদের দাবাইবার জন্য আমাদের উপর পাঠান প্রহরী লাগাইয়া দিত কিন্তু পাঠান অনেক সময় বিশেষ ভাবে আমাদের বন্ধু হইয়া উঠিত। জেলে দলাদলির অন্ত নাই। প্রবল দলকে আপনাদের স্বপক্ষে রাখিয়া আমরা আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতাম।

হিন্দু মুসলমানের ভেদটা জেলখানার মধ্যে মাঝে মাঝে তীব্র হইয়া উঠিত। স্বধর্ম্মীদের উপর টানটা মুসলমানদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটু বেশী, সেইজন্য জেলের মধ্যে কর্ত্তৃত্বের জায়গা গুলা যাহাতে মুসলমানদের হাতেই থাকে এজন্য তাহারা সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। অধিকন্তু নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা হিন্দুকে মুসলমান করিতে পারিলেও ছাড়িত না। কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারার খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাঁটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহেস্তে যে খোদাতালা তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে। আর কালাপানির আর্ত্তভক্তদের মধ্যে মোল্লারও অসদ্ভাব নাই। কাজে কাজেই হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মধ্বজীদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া ঝগড়ি চলিত। একজন হিন্দুর বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ছেলে যদি ঘানি পিষিতে যায় তাহা হইলে পাঁচ সাতজন মোল্লা মিলিয়া তাহাকে নানারূপ বিপদে ফেলিবার ষড়যন্ত্র করে আর সে যদি মুসলমান হয় তাহা হইলে যে কিরূপ পরমসুখে দিন কাটাইতে পারিবে সে সম্বন্ধে নানারূপ প্রলোভন দেখায়। মুসলমানদের মত আর্য্যসমাজীরাও জেলের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকে, এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুকে আর্য্যসমাজভুক্ত করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সেরূপ কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তাহারা দল হইতে বাহির করিয়া দিতেই জানে, নূতন কাহাকেও দলে টানিয়া লইবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। এই দলাদলির ফলে আর কিছু হোক আর নাই হোক হিন্দুর টিকি ও মুসলমানের দাড়ী সেইখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহারা দেশে কস্মিনকালেও টিকি রাখে না তাহারাও কালাপানিতে গিয়া হাত দেড়েক টিকি গজাইয়া বসে আর মুসলমানেরা ছুলিয়া ছুলিয়া "আলীর

সহিত হনুমানের যুদ্ধ" "শিবের সহিত মহম্মদের লড়াই" "সোণাভান বিবির কেচ্ছা" প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যান পাঠ করিয়া পরকালের পথের সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যায়। আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকার হাত হইতেই নির্ব্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া 'মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদ্গতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙ্গালী। রাজনৈতিক কয়েদী মাত্রেরই শেষে সাধারণ নাম হইয়া উঠিল—বাঙ্গালী।

দুঃখের কথা, লজ্জার কথাও বটে যে দলাদলিটা শুধু সাধারণ কয়েদীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যেও দলাদলির অভাব ছিল না। আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দলাদলির বেশ পুষ্টি হইতে লাগিল। যাঁহারা টলষ্টয়ের (Tolsto)) এর Re urrecti n নামক গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে সে পুস্তকখানিতে বিপ্লবপন্থীদিগের মনস্তত্ত্বের কিরূপ সুন্দর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা যে কত সত্য তাহা নিজেদের দলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে পারিলাম। বাস্তবিকই সাধারণ বিপ্লবপন্থীরা নিজেদের একটু বড় করিয়াই দেখে। একটু অহঙ্কার ও আত্ম-বিশ্বাসের মাত্রা বেশী করিয়া থাকে বলিয়াই হয়ত তাহারা কাজে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তাহাদের চরিত্রে যতখানি তীব্রতা থাকে ততখানি গভীরতা থাকে না। তাহারা সাধারণতঃ কল্পনাপ্রবণ ও একদেশ-দর্শী, এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই neurotic। রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যে নূতন ছেলে আসিলেই আমি সন্ধান লইতাম যে তাহাদের পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে তিন পুরুষের মধ্যে কেহ বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন কি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বায়ুরোগের ইতিহাস পাইতাম। পুরাতন বন্ধুবর্গ হয়ত কথাটা শুনিয়া আমার উপর চটিয়া যাইবেন, কিন্তু ক্রোধের সেরূপ অপব্যয় করিবার কোনও কারণ নাই, কারণ আমিও তাহাদের দলভুক্ত এবং আমার পিতামহী বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন।

বিপ্লবপন্থীদিগের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব জেলের বাহিরে কাজকর্ম্মের উত্তেজনায় অনেক সময় চাপা পড়িয়া থাকে, কিন্তু জেলের ভিতর অনুরূপ উত্তেজনার অভাবে তাহা নানারূপ নিরর্থক দলাদলির রূপ ধরিয়া দেখা দেয়। কোন্ দল বেশী কাজ করিয়াছে, কোন্ দল ফাঁকি দিয়াছে; কোন্ নেতা

সাচ্চা আর কোন্ নেতা ঝুটা—এরূপ গবেষণার আর অন্ত ছিল না। এবং প্রায় প্রত্যেক দলই আপনাকে 'আদি ও অকৃত্রিম' বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিত। এই প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টার সহিত প্রাদেশিক ঈর্ষা মিশিয়া ব্যাপারটাকে বেশ বীভৎস করিয়া তুলিত। জাতীয় সম্মিলন ও ভাবতীয় একতার দোহাই দিয়া কত অদ্ভুত জিনিষ যে পাচার করিবার চেষ্টা হইত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মারাঠী নেতারা মাঝে মাঝে প্রমাণ করিতে বসিতেন যে যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গানে সপ্তকোটী কণ্ঠের কথা আছে, ত্রিশ কোটী কণ্ঠের কথা নাই, এবং যেহেতু বাঙ্গালী কবি লিখিয়াছেন "বঙ্গ আমার, জননী আমার" সেই হেতু বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ অতি সঙ্কীর্ণ। একজন পাঞ্জাবী আর্য্য-সমাজী নেতা তাঁহার বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার করিবার আর কোন রাস্তা না পাইয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিবাব জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন সেহেতু তিনি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক॥ এরূপ যুক্তিব পাগলা-গারদ ভিন্ন আর অন্য উত্তব নাই। মারাঠী নেতাদের মনে এই বাঙ্গালী বিদ্বেষের ভাবটা কিছু বেশী প্রবল বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে যদি একতা স্থাপিত করিতে হয় তাহা হইলে তাহা মারাঠার নেতৃত্বেই হওয়া উচিত—ইহাই যেন তাঁহাদের মনোগত ভাব। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীবা গোঁয়ার, বাঙ্গালী বাকাবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্ব্বল ও ভীরু—একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মত মানুষ—নানা যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত।

এই সমস্ত অন্তরবিরোধের ফলে বহুদিন ধরিয়া ধর্ম্মঘট বিশেষ ফলদায়ী হয় নাই। শেষে যখন ইন্দুভূষণ জেলের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল, উল্লাসকর পাগল হইয়া গেল সেই সময় কিছু দিনের জন্য অন্তরবিরোধ ভুলিয়া আমরা একজোটে কাজ করিতে পারিয়াছিলাম। নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে নিজেরা ধর্ম্মঘটে যোগ দিতেন না, দূর হইতে অপরকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মঘট বহুবার ভাঙ্গিয়া গেলেও শেষে সরকার বাহাদুরের আমাদের সঙ্গে একটা রফা করিতে হইয়াছিল।

তুমি যদি রও কাছে

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ।]

(গান)

(সিন্ধু বারোয়াঁ—ঝাঁপতাল)

সব দুখ মোর হবে শতদল
তুমি যদি রও কাছে।
জীবনের ভার কুসুমের হার
তুমি যদি রও কাছে!
আকাশের চাঁদ হাতে পাব আমি
তুমি যদি রও কাছে।
গোলাপের বন বুকে র'বে মোর
তুমি যদি রও কাছে।
মিটিবে গো তৃষা সুধা সরোবরে
তুমি যদি রও কাছে!
ডুবিব অতল অমৃতের হ্রদে
তুমি যদি রও কাছে।
পর্ণ কুটিরে রাজা হয়ে র'ব
তুমি যদি রও কাছে।
স্বরগ নামিবে এ ধরণীতলে
তুমি যদি রও কাছে॥

নর-নারায়ণ।

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

ভারত ভগবানের পাদপীঠ, এখানে তাঁর রাজীব চরণ যুগে যুগে কতবারই না পড়েছে, কত বারই না সে এই দেশে চোদ্দপোয়া মানুষের আধারে আপনার রূপ জাগিয়ে জগত আলোয় আলো করেছে। আমাদের দেশ মাতা তাই জগন্মাতা মহামায়ার প্রতিমা, বিশ্বপতিকে সন্তানরূপে বার বার কোলে ধরে মা আমার শক্তিরূপিণী আদ্যাশক্তি। তোমরা বলতে পার তবে এই আদ্যাশক্তির চরণে আজ শৃঙ্খল কেন? বলতে পার কি, আপন জননীকে বেঁধে ভগবানের একি লীলা? যার শুধু বঙ্গজোড়া প্রাণময়ীরূপ দেখেই বঙ্কিমচন্দ্র গেয়েছিলেন—

সপ্ত কোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্ত কোটী ভুজৈ ধৃত খরকরবালে —

সে মায়ের ভারতব্যাপী বিগ্রহের পদযুগে মানুষের দেওয়া তুচ্ছ লোহার শিকল।

তোমরা বুঝে রাখো যে সুরাসুর সংগ্রামে মা আজ বন্দিনী, তাই মা এমন ভাবে শৃঙ্খলিতা। এ সংগ্রাম মানুষের অন্তর-রাজ্য ভরে যুগ যুগান্তর আগে হয়েছিল, এবং এ যুদ্ধে সেই দিন মানুষের পরাভব যে দিন ভারতের মানুষ তার নিজের জীবনে দেবতার ভোগ্য অমৃত অসুরের হাতে দিয়ে ফেলেছিল। ভগবান যদি তোমার আমার ঘটে জাগেন আর এই দু'খানি চোখ মেলে ভাগবত দৃষ্টি যদি জগতকে একবার চেয়ে দেখে, তা হলে মানুষ বুঝতে পারে তার আত্মার বুকে কোথায় দেবতা আর কোথায় দানব। তখন সে বুঝতে পারে কেমন করে মানুষ এই গোপন দেবাসুর যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে করে আপন বিশ্বময় মুক্তস্বরূপ হারিয়েছে, ভগবানের অনন্ত সত্যধন জ্যোতির্ঘন অঙ্কের মাঝে থেকেও ভগবানের আসুরী মায়ার হাতে কেমন করে আত্মসমর্পণ করে সে এই অহঙ্কারের দীন জড়পিণ্ড মানুষ হয়ে গেছে। তোমায় আমার সেই পরাজয়ের বেদনাই না মায়ের পায়ে শিকল হয়ে এমন নিদারুণ ভাবে আজ দেখা দেয়, আবার তোমার আমার সেই অন্তর নগরেই অসুর যে দিন দেবতার পায়ে পরাজয় পাবে, সেই দিনই ভাই তোমারও মুক্তি আর সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও মুক্তি। মানুষকে তার দীনতা থেকে অহঙ্কারের স্বার্থভরা বেদনা থেকে মুক্ত করতেই

ভগবতী বিশ্বমাতার এ বন্ধন স্বীকার, কারণ সন্তানের সত্তায়ই তো মায়ের বিগ্রহ। তুমি অন্তরে ধাঁ হও মা যে তারই প্রতিমা হয়ে বাহিরে রূপ নেয়। সন্তানকে জাগাতেই মায়ের চরণে শৃঙ্খল এমন করে যুগে যুগে বেজে ওঠে, এবারও সেই লীলা, এবারও ভগবানের জ্যোতি ভারত ভরে নেমে মানুষকে বুঝিয়ে দেবে মুক্তি কি ধন।

ঋকও সামবেদের যুগে ভগবান একবার মানুষে নেমেছিলেন, তখন বৈকুণ্ঠ আর এই রূপ রসের জগতকে কোলে করে তাঁর সোণার জ্যোতি সকল অনৃতকে সত্যময় করে দেখিয়ে সকল দ্বন্দ্বই মিটিয়েছিল। তার পর মানুষ সামঞ্জস্য হারাতে হারাতে উপনিষদের যুগে জ্ঞানের মাঝে আবার একবার সে সত্যকে ধরেছিল, বটে কিন্তু ভগবানের সে আবির্ভাব মানুষের আত্মার সকল ধাম ভরে অধঃ ঊর্দ্ধে রূপান্তর এনে তেমন করে আর হয় নাই; তবু সে জ্যোতি বড় কম নয়, তখনও মানুষ ছোটকে সান্তকে নিখিলের মাঝে, সকল খণ্ড সত্যকে অনন্ত সত্যের ছন্দে অমৃত করেই পেয়েছিল। তখনও জগত সে মানুষের চোখে সত্য বর্ণ সত্য গন্ধ সত্য রূপ সত্য নাম। তারপর পুরাণের যুগ। তখন আর মানুষের অতিমানব সত্তা নাই, ভগবানের পূর্ণ হৈম জ্যোতি নিবে ম্লান হয়ে এসেছে, বিজ্ঞান সূর্য্যের জ্যোতি তখন পশ্চিম গগনের মেঘের গায়ে অস্তাচল চূড়ায় সোণার স্বপ্ন গড়ছে, তাই মানুষ তখন একত্বকে গৌণ করে ভগবানের বহুভঙ্গিমতা (multiplicity) তাঁর বিভূতি, তার সম্পদ, তার ঐশ্বর্য্যের পাগল। মানুষের সাধনা তখন সূক্ষ্মের স্তরে (psychic); সত্য-জ্ঞান-আনন্দ তখন নাম রূপের আধ-আধার আধ-আলোর গোধূলি রচনা করছে। বেদের যুগে ভগবান প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানে, উপনিষদের যুগে জ্ঞানে, পুরাণের যুগে মনে এবং তার পর বৈষ্ণব যুগে হৃদয়ের ভাব ও প্রাণের তরঙ্গ মিলিয়ে তাঁর জন্ম প্রেম-সাধনা।

তাই দেখো ভগবান মানুষের অন্তর রাজ্যের সকল ধামই একে একে যুগে যুগে উজ্জ্বল করেছেন, খণ্ড ভাবে মানুষ দেবতা হতে শিখেছে। তাই এবার সমন্বয়ের যুগ, এবার অধো ঊর্দ্ধ উদ্ভাসিত করে পূর্ণ মানুষকে সকল সত্যে সকল অঙ্গে সকল ধামে পূর্ণ দেবতায় রূপান্তর করে ভগবান নামবেন, যত যুগ কেটে গেছে, তাদের তুলনায় এবার তাই পূর্ণ রাস! কিন্তু এই শেষ নয়, নিখিল রসের ঠাকুরের কি শেষ আছে, অনন্তে বিগ্রহ ধারণ কি কখন ফুরাতে পারে? দেহ প্রাণ মন নিয়ে এই তিন লোক পরিপূর্ণ করে ভগবান হয়েও মানুষ থামবে না; হয়তো এই প্রকাশকেই ধরবার আধার গড়তে, মর্ত্যের

দুয়ারের পর দুয়ার খুলে সকল কক্ষে প্রদীপ দিতে, সমস্ত জীবন সে আলোয় তুলে ধরে রূপান্তর করতে—ভগবানকে এমন করে মানুষের আত্মরাজ্যের পূর্ণ অধীশ্বর করতে কত যুগই কেটে যাবে। নূতন উর্দ্ধমূল জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে সমস্ত মানব জাতিকে সে নব বৈকুণ্ঠে নবীন রূপান্তরে তুলে নিয়ে তবে আনন্দ নগরে আবার জাগাবার বড় আয়োজন।

এ যুগের জন্যে এই ঢের, মানুষ ত্রিলোক জয়ী হয়ে, মনের পারে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যদি সেই প্রাণে মনে ভাগবত কর্ম্ম করতে পারে, এই জ্ঞানমুক্তের জগত যদি বিজ্ঞানমুক্ত হয় তা' হলে সে নব অভিব্যক্তি মানুষের সভ্যতা মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম রাষ্ট্র সমাজ সাহিত্যে কলা সকল জীবনে কি ওলট পালটই না নিয়ে আসবে। একবার তা ভেবে দেখো যা এখন খণ্ড আছে তা পূর্ণ হবে, যা এখন দীন আছে তা শুদ্ধ হবে, যা এখন মিথ্যা আছে তা বড় সত্যের মাঝে আপন ক্ষুদ্র সত্য খুঁজে পেয়ে বেদনা না এনে জীবনের আনন্দই ভরে তুলবে।

মানুষের ইতিহাস রাজা মহারাজা সম্রাট সেনাপতির জীবনী নয়, মানুষের ইতিহাস পররাজ্য বিজয়—পরধন লুণ্ঠনের বিবরণ নয়, মানুষের ইতিহাস মানুষের মাঝে ভগবান জাগবার ইতিহাস। সমস্ত জগতের ইতিহাস একত্র করে নতুন চোখে জ্ঞানের সাগরে ডুব দিয়ে একবার পড়ে দেখো, দেখতে পাবে, নানা দেশ নানা জাতির জীবনের দলগুলি ফুটতে ফুটতে চলেছে একটি সহস্রদল পদ্ম রচনা করে। মানুষ আপনাকে মাধুরী থেকে নূতন মাধুরীতে সত্য থেকে নূতন সত্যে বৃহৎ হতে বৃহত্তর—বহুধা বিশ্বতোমুখ করে নিয়ে চলেছে।

মানুষ তার ক্ষুদ্র জীবনকে অনন্ত না করে ছাড়বে না, ছোট ছোট সকল সত্য সকল বেদনার সুখকে এক মহাসত্যে এক শিবসুন্দর আনন্দে সার্থক না করে বিরত হবে না। তোমরা মানব জলধির তীরে বসে ঢেউ গুণে গুণে অমন করে মহামূল্য জীবন খুইও না, ও ঢেউয়ের অনন্ত পাথার গুণে শেষ করতে কখন পারবে না। মানুষের পরিধি ভেঙে গণ্ডীর বাঁধন মুছে দিয়ে তার চোদ্দপোয়া আধারে একবার অনন্ত-ভুবন-দোলা গরিমা দেখবার চেষ্টা করো, তখন দেখবে যে ঢেউ গুণে উঠতে পারছিলে না তার অফুরন্ত জলভঙ্গ তোমারই বুকে নিঃশেষে গুটিয়ে এসেছে, তখন দেখবে মানব সূর্য্যের স্বর্ণমণ্ডল আকাশ ছেয়ে কেবলি বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, উদয়াচলের নীল কোলে এই এক মুহূর্ত্ত আগে যাকে থালার মত দেখেছিলে এই পর

মুহূর্ত্তেই তাই বুঝি দিঙমণ্ডল বাপে ফেলবার উপক্রম করে। এ ভাগবত আকাশেরও অবধি নাই আর তার বুকের মাঝে উদিত এ মানব সূর্য্যেরও প্রকাশ ফুরিয়েও ফুরাতে চায় না। যুগ আসে যুগ যায় মানুষকে সার্থক করে, ভুবনের পর ভুবন মহাশূন্যে ভেসে ওঠে এই নরনারায়ণ বিগ্রহে কি এক অসাধ্য সাধনের মানসে। সেই অসাধ্য সাধনের নাম ভগবানের বোধন, তারই বিগ্রহ নর, তারই উপাদান নারায়ণ, তাই তোমাদের জাতীয়তা বল, ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল,—সব।

মাঝখানে

(শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক)

সংসার পিছে ডাকে নিশিদিন
আয় আয় হেথা কোলে,
আমারে পাগল করিয়া তুলেছে
কত গানে মধুবোলে।
সন্ন্যাস মোরে কত আশা দিয়ে
সুমুখ ধরিয়া টানে,
কত বিরাগীর আঁখি ঝরা গান
গেয়ে ফিরে দুটি কানে।
শুধু কেঁদে মরি, পারি না বুঝিতে
কোন্ দিকে এবে যাই,
ফুকারিয়া উঠি এদুটি পথের
মাঝখানে কিছু নাই,
ভাই বোন মোরে ডাকে, এস এস
আমাদের মাঝে হেথা।
আমারে ঘিরিয়া ভক্ত কেবলি
গেয়ে ফিরে প্রেম গাঁথা।
আমি মাঝখানে দাঁড়ায়ে শুধাই
উভয়ের পানে চাই,
ফুকারিয়া উঠি, - এদুটি দলের
মাঝখানে কিছু নাই?

সুখের ঘর গড়া

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত)

দ্বাদশ অধ্যায়

সেদিন মহালয়ার ছুটী। শরৎ প্রভাতের সোনালী আলোতে ঘাট বাট-মাঠ যেন সদ্য স্নান করিয়া অপূর্ব্ব লাবণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। বেলা তখন সাতটা হইবে। শেওড়াফলির ষ্টেশনে তারকেশ্বরের গাড়ীর একটা মধ্যম শ্রেণীর কামরার দরজার কাছে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া ভবানীপ্রসাদ গাড়ীর ভিতরে উপবিষ্ট তর্ক-সিদ্ধান্তের ভাগিনেয় পঞ্চাননের সঙ্গে গল্প করিতেছে। ট্রেণ ছাড়িতে এখনো একটু দেরী আছে। হাবড়া হইতে একটা ডাউনট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ট্রেণ এক রকম ভর্ত্তি। যাহারা দেরীতে আসিতেছে তাহারাই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে গাড়ীর কামরায় কামরায় উঁকি মারিয়া অগ্রপশ্চাৎ ছুটাছুটী করিতেছে। যাহারা আরামে আগে হইতে স্থান করিয়া বসিয়াছে তাহারা প্লাটফরমের উপর ধাবমান আরোহীদের ব্যতিব্যস্ততা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করিতেছে। কেহ যদি কোনো কামরায় উঠিবার ভাব দেখাইতেছে অমনি জানালার পাশে উপবিষ্ট লোকেরা দরজা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ভিড়ের আপত্তি তুলিয়া স্থানাভাব জানাইয়া দিতেছে, তথাপি যে জোর করিয়া ঢুকিতে চাহিতেছে তাহাকে খুব মুরুব্বীআনা স্বরে "কোন ক্লাসের টীকিট"? জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। পাঁচ দশ মিনিটের জন্য যে স্থানের মায়া তাহাতে যেন তারই চিরজীবনের মৌরসী-সত্ব আছে এমনি ভাব দেখাইয়া ঝগড়া বাধাইতেছে।

ডাউনট্রেণ আসিল। তারকেশ্বর লাইনের যারা যাত্রী তাহারা ছুটাছুটী করিয়া গাড়ীতে উঠিতে আরম্ভ করিল। পুনর্ব্বার সেই অভিনয়। বিজয়ও এই গাড়ীতে বাড়ী যাইতেছে। একটা বুড়ী নিজ অবহ জীবনভারের চেয়ে এক দুর্ব্বহ বোঝা লইয়া, দুর্ব্বল হাতে একটী ৮।৯ বছরের মেয়েকে টানিতে টানিতে ভিড়ের চাপে ও গোলমালে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া বিজয়কে সম্মুখে দেখিয়া কাতরভাবে বলিল—"বাবা এটা হরিপালের গাড়ী?"

বি। হাঁ তুমি কোথা নাম্‌বে? হরিপালে?

বু। হাঁ বাবা, দেও বাবা গাড়ীতে তুলে—

'এস' বলিয়া বুড়ীর হাত ধরিয়া বিজয় যেখানে ভবানী ও পঞ্চু গল্প করিতেছিল

সেই গাড়ীর কাছে আসিল। উঁকি মারিয়া দেখিল গাড়ীতে স্থান আছে। বিজয় বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার কি থার্ড ক্লাসের টিকিট ?'

বু। হ্যাঁ বাবা।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সমস্ত গাড়ীতেই ভিড ঠাসা। তিল ধারণের স্থান নাই। গাড়ী খুঁজিবারও সময় নাই। বিজয়ের ভাবিবার অবসর নাই। বিজয় মুহূর্ত্তের জন্য অনিশ্চিত হইল। পঞ্চুর সঙ্গে বিজয়ের মুখ চেনা-চিনি ছিল। সে বলিল "আপনি তো হরিপালেই নামিবেন ? আসুন এই গাড়ীতে ওদের নিয়ে

বি। ওদের যে থার্ডক্লাসের টীকিট ?

ভ। তা হোক্ ওঠান ওদের—

একজন মধ্যবয়সী আরোহী ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—'উঠান তো বল্লেন মশাই ? বসবে কোথা ? জায়গা কই ?- তার কথায় কান না দিয়া বিজয় অপরিচিত ভবানীর আশ্বাসে গাড়ীতে বুড়ীকে তুলিল। ভবানীও উঠিল। বুড়ী ভাবিতেছিল রেলের কর্ত্তৃপক্ষরা তাকে যদি নামাইয়া দেয় বা জরিমানা লয় ? ভবানী তার মনভাব বুঝিয়া বলিল—আমার সেকণ্ডক্লাসের টীকিট আছে তোমার ভয় নেই।"

বি। ওরা যে দুজন ?

ভ। সে আটকাবে না।

আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া বিজয় বুড়ীর জন্য স্থান খুঁজিতে লাগিল।

আপত্তিকারী সেই আরোহীটী যাইবেন গোটা কয়েক ষ্টেশন দূরে। ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টার ব্যাপার। কিন্তু তিনি পোঁটলা পুঁটলী, ঝুড়ি, ব্যাগ, ছাতা-লাঠী, ছিপ প্রভৃতি নিজস্ব তৈজস-সম্ভার একখানা বেঞ্চের আধখানা জুড়িয়া সাজা-ইয়াছেন, বাকী আধখানায় পারিপাটী রকমের একটা শয্যা রচনা করিয়া তামাকু সজ্জায় মন দিয়াছেন। এ যেন এই গাড়ীতেই জীবনের বাকীকয়টা দিনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বুড়ীকে লইয়া বিজয় সে গাড়ীতে উঠিবে শুনিয়া আগেই যাত্রী মহোদয় আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তার পর বিজয় যখন এ বেঞ্চে স্থান না পাইয়া সম্মুখের বেঞ্চের দিকে নজর দিল তখন যাত্রীপুঙ্গব পা দুটা ছড়াইয়া দিয়া বাকী স্থান পূরণ করিয়া কলিকা হইতে চোখ তুলিয়া অত্যন্ত ব্যাজার কণ্ঠে বলিলেন —এখানে জায়গা কোথা মশাই ?

বি। এই যে এতটা ? একটু পা গুড়িয়ে বসুন—আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো ?

যাত্রী। আপনার গরজ। তুললেন কেন?

বি। যাবো কোথা বলুন? ভিড যে—। জিনিষ গুলো বাঙ্কে রাখুন না—

যা। মন্দ কথা নয়, আপনি কেন বাঙ্কে বসুন না?

বি। মানুষ বসবার জায়গায় জিনিষ পুত্র রাখবার তো নিয়ম নেই?

গতিক দেখিয়া বুড়ী বলিল "থাক বাবা আমি নীচেই বসছি, বস্ তুমি—আর কতক্ষণই বা বাবা। কাস, থুথু, হুকার জল সিক্ত গাড়ীর মেঝেতে বুড়ি বসিতে গেল। পঙ্কু উঠিয়া বলিল—"সবলে পাইবে বস্ন তর্কে বহুদূর" বুঝেছেন বিজয়বাবু? অনুনয় বিনয়ের কাজ নয়"—বলিয়াই বুড়িকে ধরিয়া পঙ্কু যাত্রীপুঙ্গবের পাশে বসাইল। এবং তার তৈজসপত্রগুলা টান মারিয়া বাঙ্কে তুলিয়া দিয়া বিজয়কে বলিল—"বসুন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, দেশ বুঝে আচার—অত ভালমানষি কেন? ভবানী হাসিতেছিল, বলিল "এইতো কথা। দেখছিলাম মজা"—যাত্রীপুঙ্গবের ক্রোধে কণ্ঠ বন্ধ হইয়া গেল। উঠিয়া পড়িয়া সতেজে বলিল—আমার জিনিস সব যে টেনে ফেলে দিলেন?

প। দিইনি ফেলে, যথাস্থানে রেখে দিয়েছি তামাক খান, ঠাণ্ডা হন, অকারণ গরম হবেন না, এখানে পানিপাঁড়ে মেলে না—

যা। আ- আমি ভাড়া দিইনি?

ভ। একজনের দিয়েছেন। সমস্ত বেঞ্চটা রিজার্ভ করেন নি তো? আপনার বোচকা বুচকির চেয়ে এই বুড়ো মানুষটার আরামের প্রয়োজন বেশী—

প। মশাই মাল গাড়ীতে আপনার যাওয়া উচিত ছিল - আধমণ ফ্রির বদলে দেড়মণ চালিয়ে নিয়েছেন দেখছি যে?

যা। সে কথায় আপনার কি মশাই?

প। আমার নয় বলেই আর কিছু করতে পারলাম না, গার্ড সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছি—

ভ। মহাশয় যাবেন কোথা?

যাত্রী মহাশয় রাগিয়া বলিলেন "তোমার সে খোঁজে কাজ কি বাপু—তুমি কি জেলার ফৌজদার?" পাশেরই একজন বলিল—"তে"—

ভ। ও হরি। আমি ভেবেছিলাম রামেশ্বর সেতুবন্ধ! যে রকম আয়োজনের বিরাটপর্ব। গাড়ী শুদ্ধ ছেলেবুড়া হাসিয়া উঠিল। যাত্রী বেচারী দেখিল তিনজন সহুরে কালেজী নবযুবা ২২।২৪।২৬ এমনি সব সোমত্ত বয়সের।

বিশেষ পঞ্চুর ষণ্ডা গোণ্ডা জোয়ান আড়েবহরে বিপুল দেহখানা ভাবিবার বস্তু বটে।

প। মহাশয়ের নিবাস কি এই গাড়ীতেই? কতদিন থাকা হয়েছে?

পাশের কামরা শুদ্ধ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। যাত্রী দেখিল উত্তর দিলেও গ্রহ, না দিলেও গ্রহ। অগত্যা ভাবিয়া ও মনে মনে রাগিয়া বলিল "আপনারা ভদ্রলোক তো?"

প। এতক্ষণ ছিলাম, সঙ্গদোষে মশাই ধাত বদ্‌লে গেছে—

বিজয় ও ভবানী হাসিয়া চোখ টিপিল—পঞ্চু চুপ করিল। যাত্রী বেচারীর কল্‌কের আগুন ধরিল না কিন্তু মেজাজের আগুন খুব ধোঁয়াইয়া উঠিয়াছিল। বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। কেবল বুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "এই মাগী সরে বস্, যে গায়ে গন্ধ তোর। আচ্ছা গ্রহ বটে, বেশী ভাড়া দিয়েও নিস্তার নেই"—

প। দেখ্‌লেন ভবানীবাবু আমার কথার হাতে হাতে প্রমাণ? পাঁচ মিনিটের জন্যে আমরা গরীব লোকের গন্ধ সহ্য করতে পারিনি আমরা দরিদ্রের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দি—আপনি বলেন গরীবকে বুকে টেনে না দিলে তাদের জন্য—

ভ। (হাসিয়া) আমার হার বটে। ভাল কথা একদেশের লোক অথচ জানা-শুনো নাই এ ভারি লজ্জার কথা (বলিয়া ভবানী বিজয়ের দিকে তাকাইলেন)

পঞ্চু ভবানীর মনোভাব বুঝিয়া বিজয়ের সঙ্গে ভবানীকে পরিচিত করিয়া দিল। ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'বিজয়বাবু, ইনি আমাদের জমীদার রায় মহাশয়ের ভাইপো, heir apparent, crown prince-'

ভ। থাক্ থাক্ খুব হয়েছে ওবল্লে গাল দেওয়া হয় পঞ্চু।

প। আর ইনি লোকনাথ বাবুর ছেলে, ভোলাবাবুর ভাইপো, মুখুজ্যে পাড়ায় বাড়ী লোকনাথ বাবুর—হৌসের মুচ্ছুদ্দী ছিলেন তা ছাড়া নিজেও একজন মারচেণ্ট ছিলেন।—

বি। একই গ্রামে বাড়ী এই পর্য্যন্ত। জন্মে অবধি দেশে একাদিক্রমে একমাস থাকিনি, আর মোট অবস্থিতি ছ মাসেরও বেশী নয় বোধ হয়—

ভ। তা হলে আর চেনা হবে কি করে?

বি। ছুটীতে বাড়ী যাচ্ছি আমার মা ও ভগিনীরা ওখানে আছেন, তাঁদের গ্রাম বেশ লেগেছে—

ভ। আপনার ?

বি। খুব ভাল লেগেছে ; মনে হচ্চে ঐ খানে গিয়ে বাস করি—

ভ। করলেই হয়—

বি। চাকরী বাকরী যে হয়েছে পরম বাধা—

প। ওটা মিথ্যা ওজর। বাসস্থান কর্ম্মস্থান আলাদা করা যায় না ?

বি। তা আর যায় না (ভবানীকে) আপনি কলকাতার ?

ভ। আমি পড়ি, এবার আমার ফিফ্‌থ ইয়ার—

প। বিজয় বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর খুব চটেছেন তাই বিদ্যাজননীকে ছেড়ে লক্ষ্মীকে বাণিজ্যের মধ্যে খুঁজতে বেরিয়েছেন—(বিজয়কে) হাঁসছেন যে—ঠিক্‌না ?

বি। আমি অন্যকথা ভাবছি—এক গাঁয়ের লোক আমরা আমাদেরই বাপ-খুড়োরা পরস্পরকে পাতানো খুড়ো জ্যাঠা মামা মেসো বলে ডাকাডাকি করতেন আর আমরা তাঁদেরই ছেলেপুলে আজ পরস্পরকে বাবু 'আজ্ঞে পরাজ্ঞে'—বলে আলাপ করে ভব্যতা রক্ষে করছি ! হয় তো আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক কিছু আছেই অথচ দুজনে কিছু জানিনি ।—

ভ। ভয়ানক ঠিক কথা বিজয়বাবু বাস্তবিকই বটে। আচ্ছা এখন হতে তুমি আমি আরম্ভ করা যাক—

প। সে আমাদের দুজনে, আপনার বেলায় প্রয়োজ্য নয়। কেননা আপনি হলেন 'হুজুর জমিদার প্রবলপ্রতাপ' আবার পঞ্চ শ্রীযুক্ত। —

তিনজনই খুব হাসিল। সেই ধূমপায়ী যাত্রী পুঙ্গব আড়চোখে আড়চোখে ভবানীকে দেখিল।

ভ। দেখ পঞ্চু, আমাকে লজ্জা দিওনা, বিশেষ এই সভার মাঝে আমিতো বলিছি তাই পদ্মপত্রে জলের মত জমীদারের ভাইপো হয়েও ঐ বাড়ীতে থাকি মাত্র। আমার প্রবল প্রতাপের কিছু পরিচয় পেয়েছ ভাই ? আমাকেও তুমি ঐ বলে দুষবে ? স্কুলের ভাবটা কি ভুলে গেলে ?

প। আচ্ছা গাঁয়ের বাইরে তাই বলা যাবে। খাস মহালের চৌহদ্দীর মধ্যে নয় ভাই। তাহলে তোমার খুড়ো শ্রীযুত রতনরায় মহাশয় আমাকে কোতল করে বস্‌বেন ? বল্‌বেন ব্যাটা টীকিধারী ভিখারী ভট্টাচার্য্যির আস্‌পর্দ্ধা দেখ।

এই বলিয়া পঞ্চু সহাস্যে নিজের টীকিটাকে সাদরে সগর্ব্বে টানিয়া খাড়া করিয়া দেখাইল—

ভ। আরে রামো! এত বড় টীকি কবে হলো? সে কালেতো ছিলনা? বাস্তবিকই একটা আস্ত anachronism! নয় কি বিজয় বাবু—

প। Sufferance is the badge of our tribe!

বি। কেন? এর মানে কি?

প। নয় কি? এর জন্মে আমাদের কত বিদ্রূপ ঠাট্টা সইতে হয়?

যাত্রীপুঙ্গব ভবানীকে প্রবল প্রতাপ রতনরায়ের ভাইপো এবং ভবিষ্য জমীদার জানিয়া যেন কেমন হইয়া গেল! সে সভয় নেত্রে তার দিকে তাকাইয়া রহিল। কারণ হইতেছে যাত্রী মহাশয় রতন রায়ের মাছমারী মহালের নতুন ছোট নায়েব। সারেংপুর হইতে নিয়োগপত্র পাইয়া বেচারী কাজে জয়েন্ করিতে যাইতেছে। পথে এই ফ্যাসাদ। নিজের বেফাঁস উক্তি ও বেসামাল মেজাজের কথা ভাবিয়া বেচারী কোঁচকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। নানা ভবিষ্য ভয়ে তার আত্মাপুরুষ উদ্বিগ্ন হইল!

এমন সময় গাড়ী—ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। একজন মিঞা সাহেব বদনা ও বুচকী লইয়া পঞ্চদেব গাড়ীতে উঠিল। তাহার পরনে একটা লালছিটের লুঙ্গী মাথায় জরীকাজ করা টুপি, গায়ে একটা বেগুনি রং এর কুর্ত্তি। মেহেদি রঙ্গে রঞ্জিত পাকা দাড়ী। মিঞা সাহেব স্থানাভাব দেখিয়া এ দিক ওদিক তাকাইতেছে, এমন সময় ভবানীপ্রসাদ বুড়ীকে সরিতে বলিয়া তাহার ও যাত্রীমহাশয়ের মধ্যস্থ স্থানে আগন্তুককে. বসিতে বলিল। যাত্রীবেচারী দ্বিরুক্তি না করিয়া বিছানা গুটাইয়া কোণে গিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। মিঞা সাহেব বসিলেন।

প। বুড়ীর গায়ের গন্ধ ঘুচ্‌লো বটে কিন্তু প্যাঁজের গন্ধ জুটলো। খোঁচা খাইয়াও যাত্রী পুঙ্গব নিরুত্তর। বন্ধুত্রয় কিছু বিস্মিত হইল। খানিক পরে নায়েব যাত্রী জিজ্ঞাসা করিল সাহেব আপনার কোন ক্লাসের টীকিট্?'

সা। যে কেলাসে উঠিছি বাবু!

বন্ধুরা উত্তর শুনিয়া মুচকি হাসি হাসিল। যাত্রী বেচারী দমিয়া গেল। কোনো মতে পেচক মূর্ত্তি ধরিয়া কোণ ঘেসিয়া বসিয়া সে তার হিন্দুত্ব বাঁচাইয়া অকষ্টবক্ষে বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি

(শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)

আধুনিক যুগের যন্ত্রপাতি কল-কারখানা আমাদের অনেক উপকার ঢের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সাথে মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিস নষ্ট করিয়া দিতেছে যাহার অভাব আর কিছু দিয়াই পূরণ হইতে পারে না। কাজকর্ম্ম করিতে হইলেই মানুষ লইতেছে যন্ত্রের সহায়, অর্থাৎ মানুষ ব্যবহার করিতেছে না নিজের হাত পা চোখ কাণ অথবা ব্যবহার করিতেছে ততটুকু যতটুকু দরকার যন্ত্রটাকে চালাইবার জন্য। ফলে মানুষের অঙ্গের ইন্দ্রিয়ের আছে যে সব স্বাভাবিক ক্ষমতা তাহা ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না, অনভ্যাসের অথবা বিপরীত অভ্যাসের দরুণ সে সব শুকাইয়া মরিয়া যাইতেছে। সিষ্টার নিবেদিতা এক জায়গায় বলিয়াছেন যে ইউরোপীয়েরা খাওয়ার সময় যে কাঁটা চামচ ব্যবহার করে সে জন্য তাহাদের আঙুলে দেখা যায় কেমন একটা কাঠ কাঠ আড়ষ্ট ভাব, একটা ফূর্ত্তির—expressionএর—অভাব, আর ভারতবর্ষের লোকেরা যে হাত লাগাইয়া খায় সেজন্য তাহাদের আঙুলগুলিকে বোধ হয় কেমন সজীব, সেখানে পর্ব্বে পর্ব্বে ধরা দিয়াছে খেলিয়া উঠিয়াছে যেন একটা ভাবের সজীব প্রকাশ। কথাটি যতই কবিত্বময় হউক না, ইহার মধ্যে যে কোনই সত্য নাই তাহা একেবারে বলা চলে না। আজকাল ইস্কুলের ছেলেদের দেখি প্রত্যেকের চাই এক-একটা "ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট বক্স"—একটি সোজা লাইন আঁকিতে গেলে তাহাদের দরকার হয় "রুল" "সেট্‌ স্কোয়ার", শুধু-হাতে কি রকমে যে নির্দ্দোষ সরল রেখা টানা যায়, পরিষ্কার বৃত্ত আঁকা যায়, তাহা আমাদের ছেলেরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। কুমারেরা পুতুল গড়ে, স্বর্ণকারেরা গহনা তৈয়ার করে, তাঁতীরা সুতা কাটে কাপড় বোনে কেমন সহজে আঙুল খেলাইয়া চোখের নিরীখ দিয়া; সে জায়গায় আধুনিক শিল্পীর দরকার কত থার্ম্মোমিটার, ব্যারোমিটার, মাপজোপ করিবার জন্য আরও কত কি যন্ত্রপাতি। কিন্তু এই আজকালও কাঠের উপর চীনা মিস্ত্রীর হাতের কাজ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই, তার পাশে কলের কাজ আমাদের চোখে ধরে না। কত দিক দিয়া যে যন্ত্রপাতি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে

অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর পুস্তকাদি তৈয়ার করিবার প্রচার করিবার বিপুল সুবিধা আমাদের হইয়াছে। আগে একখানি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে কত সময় ও কত প্রয়াস দরকার হইত, আর এখন ব্যাপারটি কত সহজ কত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে; আগে যেখানে একখানি গ্রন্থ অতিকষ্টে পাওয়া যাইত, এখন সেখানে সহস্রখানি—আবার তাহাও কত রকম চেহারায়—হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়। ছাপার হরফ উপকার করিয়াছে আমাদের ঢের, কিন্তু তাহা একটা জিনিষকে তাড়াইয়া দিয়াছে—যাহাতে বাহিরের স্থূল উপকার থাকুক বা না থাকুক, ছিল মানুষের অন্তরের রসায়ন। সুন্দর হস্তলিপি (caligraphy) বলিয়া যে একটি বিদ্যা বা কলা ছিল, আধুনিক কালের লেখার দৌরাত্ম্যে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আগে এক একখানি গ্রন্থ গ্রন্থমাত্র ছিল না, তাহা ছিল এক একখানি চিত্রসংগ্রহ বা ছবির 'এল্‌বাম্'। আজ কিন্তু পদে পদে আমাদিগকে যন্ত্রের সহায়ে, যন্ত্রের কৃপায় চলিতে হইতেছে, যন্ত্র যদি পরীক্ষা করিয়া মাপিয়া ঠিকঠাক করিয়া না দিল, তবে আর আমাদের চলা হইল না। যন্ত্র-বিহনে আমরা অসহায় জড়পিণ্ড—দারুভূতো মুরারি।

কল-কারখানার প্রাদুর্ভাবে সমাজে যে অসামঞ্জস্য যে নূতন নূতন ধরণের অন্যায় অত্যাচার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, মানুষের স্বাস্থ্য কিরূপে নষ্ট হইতেছে, নৈতিক অবনতি কিরূপে ঘটিতেছে—সে সব কথা বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা বিষয়টি দেখিতে চাই আরও একটু ভিতরের দিক হইতে, আমরা বলিব আরও গভীরতর একটা অনিষ্টের কথা। মানুষের প্রকৃতিটাই যে বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির প্রবৃত্তির—অন্তঃ-করণের, বহিঃকরণের—উল্লাস যে স্তিমিত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের ধার যে মরিয়া যাইতেছে, জমাট আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে, প্রাণের সলিল সচ্ছল স্বচ্ছন্দ গতির পরিবর্ত্তে যে দেখা দিয়াছে জড়ের ধরিয়া বাঁধিয়া চলা—ইহাই ত মূল সমস্যা ইন্দ্রিয়ের আছে একটা সহজ শক্তি তীক্ষ্ণ অনুভূতি অটুট সন্ধান, সে কথাটা আজ আর আমাদের বিশ্বাসের মধ্যেই প্রায় আসে না। সজাগ ইন্দ্রিয় যে কতখানি অব্যর্থভাবে চলে, জিনিষের উপর অবলীলাক্রমে কতখানি দখল আনিয়া দেয়, তাহা আমরা আর কল্পনাও করিতে পারি না। বৈদিক ঋষিরা তাই ইন্দ্রিয়দিগকে বলিতেন দেবতা; কিন্তু 'আলোকের যুগে' আমরা আর দেবতার ভোগ দেই না, দেবতাকে মানিই না। দেবতা আজ নাই, আছে শুধু শালগ্রাম

—কর্ম্মের, ব্যবহারের অভাবে হাত পা সব পেটের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে অথবা বিকর্ম্মের, অপব্যবহারের ফলে ভোঁতা হইয়া ঠুঁটো হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু কলে জিনিষ যে তাড়াতাড়ি হয়, মোট পরিশ্রমের লাঘব হয়, আমরা সময়ের মূল্য যে বড় বেশী বুঝিয়াছি আর আমাদের প্রয়োজনও যে হয় বিস্তর দ্রব্যসম্ভার কাজেই কল ছাড়া উপায় নাই। উপায় থাকুক বা নাই থাকুক, ইহা স্পষ্ট দেখিতেছি যে তাড়া-হুড়া করিয়া জিনেষের উপর জিনিষ আমরা স্তূপ করিতেছি বটে, কিন্তু সুন্দর জিনিষ খুব কমই পাইতেছি। সৌন্দর্য্য জিনিষটি যে প্রাণের রং, প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রেমস্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যে জিনিষ গড়ি নাই তাহাতে সৌন্দর্য্য পাইব কিরূপে? তবুও সুন্দর জিনিষ পাই বা না পাই, তাহাও না হয় না দেখিলাম, কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি হইতেছে মানুষের নিজেরই—তাহার ইন্দ্রিয় তাহার প্রাণ নির্জীব অক্ষম অসহায় হইয়া পড়িতেছে। আস্তে আস্তে যন্ত্রের উপর আমরা এতখানি নির্ভর করিয়া ফেলিয়াছি যে নিজের অঙ্গের নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর সহজে আমাদের ভরসা হয় না, সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয় পাছে ভুল করিয়া ফেলি, প্রতি নিমেষে কলকাঠি হাতড়াইয়া বেড়াই, তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া তাহার সাথে মিলাইয়া মিলাইয়া চলিতে চাই। কিন্তু এ প্রশ্নটা মনে উঠে না, এই কলকাঠি যন্ত্রপাতি কাহার বিভূতি কাহার ঐশ্বর্য্য, কে উহাদিগকে গোড়ায় সৃষ্টি করিল? ইন্দ্রিয় অন্ধ নয়, জড় নয়—সে কেবল ভুল করিয়া বেড়ায় না। ইন্দ্রিয় আত্মস্থ পুরুষেরই মত—সে জানে কোথায় কোন্ ভাবে কি করিতে হইবে। সাহসে ভর করিয়া যদি ইন্দ্রিয়কে মুক্ত করিয়া দিতে পারি তাহার সহজ পথে অবাধে চলিতে, তবে অবিলম্বেই প্রমাণ পাইব ইন্দ্রিয়ের আছে কি অদ্ভুত প্রতিভা। সেই মানুষই বাস্তবিক ততখানি প্রতিভাবান্ যিনি যতখানি যন্ত্রপাতির অত্যাচারের হাত এড়াইতে পারিয়াছেন, আপন ইন্দ্রিয়কেই সজাগ শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন। তাজমহল কি যন্ত্রপাতি দিয়া তৈয়ার হইয়াছিল, একটি বৌদ্ধবিহারে কতগুলি ক্রেন কতগুলি ইঞ্জিন আর কতগুলি কি লাগিয়াছিল তাহা কেহ জানে না, তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্" তৈয়ারী করিতে আজকালকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা যত বিপুল যত রকমারি সাজসরঞ্জাম্ লাগাইতেছে তাহার শতাংশের একাংশও সেখানে লাগে নাই।

যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া, যন্ত্র ব্যবহার করিতে জানে বলিয়া মানুষ, মানুষ—সত্য কথা, কিন্তু যন্ত্র ততক্ষণই মঙ্গলকর যতক্ষণ সে যন্ত্রমাত্র। কিন্তু

আমরা দেখিতেছি যন্ত্রটা সব সময় আর যন্ত্র থাকে না, সে হইয়া উঠে যন্ত্রী ; মানুষ যন্ত্রের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়া হইয়া পড়ে যন্ত্রেরই অঙ্গ। এ অবস্থায়, মানুষের সে সজাগ কর্তৃত্ব, সচেতন শক্তিপ্রয়োগ আর থাকে না, মানুষ অনুভব করে না যে সেই জিনিষকে সৃষ্টি করিতেছে, নিয়মিত করিতেছে। সে কাজ করে বটে, কিন্তু বোধ হয় যেন তাহাকে দিয়া কাজ করান হইতেছে মাত্র—সে চলিতেছে না, চালিত হইতেছে। সে কর্তা নহে, করণ মাত্র। সে হারাইয়া বসে নিজত্ববোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মবোধ। মানুষ আর যন্ত্রকে চালায় না, যন্ত্রই চালায় মানুষকে। আধুনিক যুগেও আমাদের জগদীশচন্দ্র জড়-বিজ্ঞানেরই ক্ষেত্রে এমন সফল হইয়াছেন, তার কারণ তাঁহার মধ্যে আছে যন্ত্রের নয়, একটা যন্ত্রীর ভাব—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হইয়াছেন এইজন্য যে তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব সব এমন সহজ সাধাসাধি যন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগদীশচন্দ্রের মধ্যে আছে একটা সজাগ নিরালম্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতি, উহাই তাঁহার যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলির মধ্যেও এমন সরলতা সরসতা—পর্য্যন্ত আনিয়া দিয়াছে। (প্রবাসী—শ্রাবণ)

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

তার পর একদিন এক সময়েই আমার দুই গুরুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—একজন আমার আত্মতত্ত্বের গুরু, আর একজন আমার পরতত্ত্বের গুরু। একজন আমায় পরম একত্বের আস্বাদ পাইয়ে দিয়েছে আর একজন আমায় পরমানন্দের জন্য ডাক দিয়েছে এবং এখানে নিয়ে এসেছে। আমি আবার এক সঙ্গে এই দুই তত্ত্বের দুই গুরুকেই একই নিঃশ্বাসে কাছে পেলাম। কেমন করে ? বলছি—

আমি হাসির কথা শুনে সেই রাত্রেই বড় বাগানে যাব মনে করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। তাই খুব সকালে উঠেই, মুখ হাত ধুয়ে সাধু দর্শনের উপযুক্ত বেশে বড় বাগানে চলে গেলাম। আশা ছিল এত ভোরে নিশ্চয়ই আর কেউ সেখানে যায় নি। আমি বাগানের গেট্ ঠেলে প্রবেশ করে আগে দেখে নিলাম,

যে দিক থেকে মেয়েদের আসার সম্ভাবনা সে দিকটায় কাউকে দেখা যাচ্ছে কিনা। কাউকে দেখতে পেলাম না—ভরসা হল কেউ নেই। সাহসে ভর করে এগুতে লাগলাম। কিন্তু বেশী দূর যেতে না যেতেই দেখি বাগানের মধ্যেই সন্ন্যাসী ঠাকুর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন—যেন পাথরের মূর্ত্তি। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে—কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। বৈরাগ্য কি এত সুন্দর। ব্রহ্মচর্য্য কি এত জ্যোতিষ্মান।

এরই মধ্যে কি আমায় খুঁজছে কেউ? এই এমন আগুনের মধ্যে কি আমার মত পতঙ্গের অস্তিত্ব থাকতে পারে? যিনি এর মধ্যে আমায় খুঁজছেন তাঁর না জানি কিসের চোখ। তিনি জানি আমায় কি চোখে দেখেছিলেন।

আমি দেখতে দেখতে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সন্ন্যাসী ফিরেও চাইলেন না তখন ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের কাছে গোটাদুই ফুল রেখে প্রণাম করতেই তিনি ফিরে না চেয়েই বল্লেন, 'কোন্ হো বাচ্ছা?' কি জানি কেন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'ময় ভুখা হুঁ'। সন্ন্যাসী দূর আকাশ হতে চমকে চোখ নামিয়ে বল্লেন, 'ক্যা বোলা?'

'একি। কে তুমি? তুমি সত্যানন্দ না? তুমি এখানে এ বেশে?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বন্ধু আমায় অমনি জড়িয়ে ধরলেন। অমনি আমার ভক্তির বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে প্রেমের জোয়ার ঠেলে এল। আমি কেঁদে ফেল্লাম। তুরিয়ানন্দও কেঁদে ফেল্লেন,—তাঁর সন্ন্যাসীগিরির একটুও অবশিষ্ট রইল না।

তখন আমরা দু'জনে বাগানের এক কোণে পালিয়ে গেলাম—পাছে এই মিলন আর কেউ দেখে। যেখানে দুটো কামিনী গাছে আর জুঁই গাছে জড়াজড়ি করে ফুলে ফুল, রঙে রঙ, গন্ধে গন্ধ মিশিয়ে উদার বাতাসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তাদেরই আড়ালে বসে কত কথাই না কইতে লাগলাম। কি কথা? নাইবা তা বল্লাম, তাতে তোমাদের কিছু আসবে যাবে না। তবে এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, আমরা দুজনে অনেক কথা বল্লাম বটে, কিন্তু আমি যে এখানকার কে কেবল সেই কথাটাই এর কাছে ভাঙ্গলাম না। কেন জান? এইজন্যে, যে আমার তুরিয়ানন্দ যেন আর সেই তুরীয়াও নেই বলে মনে হয়েছিল। তাই ভাঙ্গতে পারলাম না। দেখলাম আমার পরম মায়াবিনী যেন তাঁর কোমল মায়ায় এই পরম সন্ন্যাসীর মনটাকেও বেশ আচ্ছন্ন করে এনেছেন। যেন এই মহাত্যাগীর বৈশাখী আকাশে আষাঢ়ের প্রথম মেঘ সঞ্চার

হয়েছে।' আমি তাই সানন্দে বল্লাম, 'দেখলে ভাই এই রসের দেশে রসের আকাশ বাতাসের মধ্যে এসে পড়ে তোমারও মনটা ভিজে উঠেছে।"

তুরিয়ানন্দ চমকে উঠে বল্লেন, 'তাই নাকি? তা হবে, বিষয়ের সংস্পর্শে এলে বিষয়ের ছাপ পড়বে বৈ কি। কিন্তু ভাই এইটাই কি তোমার ধারণা হয়েছে যে সন্ন্যাসীর মনটা একেবারে সাহারার মতই শুষ্ক? যারা সর্ব্বদা রসের সাগরে ডুবে থাকে তাদের মন বাইরে বজ্রের মত কঠোর মনে হলেও আসলে ফুলের চেয়ে নরমই।'

আমি হেসে বল্লাম, 'তাই নাকি। এ মত পরিবর্ত্তন কবে হ'তে হ'ল? যাক ভাই, আর তর্ক নয়, এখন দুটো নিজের কথা বল শুনি।

তুরিয়ানন্দ খুব জোরে হেসে উঠলেন, 'আমার আবার কথা। কোনো কথা নেই ভাই, তার চেয়ে তোমার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা আরও বল— আমি তাই শুনি। তুমি এখানে কেন, তাই আবার ভাল করে বুঝিয়ে বল।'

আমি কথা আরম্ভ করেছি, এমন সময় হঠাৎ তুরিয়ানন্দকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আমিও চমকে ফিরে চাইলাম। তারপর কি দেখলাম। সেই প্রভাতের সমস্ত জমাট শোভা আমাদের পাশে ফুলের থালা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কি দেখলাম। মানুষ এত সুন্দর। ধন্য আমি যে এই রূপরাশি দেখতে পেলাম। ধন্য আলো। ধন্য বায়ু। ধন্য আকাশ। আর ধন্য সেই ফুলের বনের মধুর গন্ধ! সবাই তাকে ঘিরে ধন্য হল।

মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সেই ফুলের থালাটা সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে, নতজানু হয়ে বস্‌ল। তার পর ধীরে ধীরে একটা ফুল নিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে দিয়ে প্রণাম করলে। তার সন্ন্যাসী ছাড়া জগতে আর কেউ যে থাকতে পারে তাই যেন তার মনে হয়নি। সন্ন্যাসী কোনো কথা কইলেন না। মূর্ত্তি শেষে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, 'আপনি এখানে, আমি অনেকক্ষণ আপনার আসনের কাছে অপেক্ষা করছিলাম।'

সমস্ত প্রভাতের আকাশটা যেন গানের সুরের মত বেজে উঠ্‌ল। আমি সেই স্বররাশি দুই কান দিয়ে পান করলাম, উঠে সম্মান দেখাবার সময়ই পেলাম না। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম, যেন সমস্ত জগতের যত রূপ, যত মাধুর্য্য ছিল, যত মন্ত্র-তন্ত্র, জপ-তপ ছিল, সমস্তই ভক্তি হয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নেমে এসেছে। যেন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত পূজাই আবার দিকে দিকে, লোকে লোকে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী বল্লেন, 'এই এঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। ইনি আমার অনেক দিনের বন্ধু।'

উর্ম্মিলা দেবী এইবার চমকে উঠে আমার দিকে চাহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বৃক্ষান্তরালে সরে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম, 'স্বামীজি, এখন আমি তবে যাই, এঁরা যে এখন আসবেন তা জানতাম না! আমি যাই।"

তুরিয়ানন্দ ব্যস্ত হয়ে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন, 'না না—তুমি যাবে কেন? উনি উর্ম্মিলা দেবী, ওঁকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই। আর তুমিও এঁকে দেখে লজ্জিত হয়ো না—ইনি আমারই স্বজন।'

উর্ম্মিলাদেবী এগিয়ে এসে আমাকেও প্রণাম করলেন, একখানি শরৎ-প্রভাতের পথভোলা মেঘ হঠাৎ ভুলে বুঝি আমার কাছে নুয়ে এল, ছুঁয়ে গেল—বিন্দু বিন্দু বর্ষেও বুঝি গেল। আমি সে প্রণামের মধ্যে ঢুকে কোথায় কোন দ্যুলোকের আলোকের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

উর্ম্মিলাদেবী নত বদনে বল্লেন, 'আমি ওঁকে চিনি, উনি আমাদের প্রিয়বাবু ম্যানেজার। আসুন আপনারা, আসন পেতে রেখেছি, এখনি এঁর মা আসবেন, হাসি আসবে, আমার মাও আসবেন।'

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না, বল্লাম, 'এখন আমি যাই আর এক সময় আসব। তখন সব কথা হবে।'

সন্ন্যাসী তবু আমার হাত ছাড়লেন না।

উর্ম্মিলাদেবী তখন রাণীর মত গৌরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'সাধুর ইচ্ছার কাছে সংসারের কর্ত্তব্য অনেক ছোটো, এখন আপনার যাওয়া হবে না।'

আঃ বাঁচালে। দেবি, সাধুর ইচ্ছাই হোক, আর যাঁরই ইচ্ছা হোক, তোমার ইচ্ছাই আমার সব। আমার সমস্ত অস্তিত্বই যে এখন তোমার। এই যে এঁর ইচ্ছাকে অবলম্বন করে আমাকে তুমি চাইলে, এই আমার পরম লাভ। তুমি এতদিন পরে তোমার ইচ্ছা আমায় নিজমুখে জানিয়েছ—আমি ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম! তোমার এই ইচ্ছাটুকুর জন্যই যে আমি এই এতকাল ধরে বেঁচে আছি।

সন্ন্যাসী আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর আসনেই বসাতে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি মাটীতে বসলাম। তুরিয়ানন্দ বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বল্লেন, 'ভাই, এমনি করেই কি আজ হতে তোমায় আমায় পার্থক্য রেখে চলতে হবে?'

আমি বল্লাম, 'যার যেখানে স্থান তার পক্ষে সেই স্থানই শ্রেষ্ঠ। সেই স্থানের অপমান করলে তার নিজেরই অপমান হবে, আমার মাটীতেই স্থান, আমি এই মাটীর অপমান করতে পারব না।'

সন্ন্যাসী নিজের আসনে গিয়া বসিলেন। উর্ম্মিলা দেবী তাঁর ফুলের সাজি হতে ফুলগুলি তুলে আসনের সামনে সাজিয়ে রেখে দিয়ে, আবার একবার প্রণাম করলেন। তারপর বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বুঝলাম আমার উপর তাঁর সঙ্কোচ ভাব দূর হয় নি। তাই এই অবসরে মৃদুস্বরে বল্লাম,—'ভাই, আমি এখন এঁদের চাকর। এঁদের সামনে বেশী সম্মান দেখালে আমাকেও বিপদে ফেলবে, এঁদেরও মুস্কিলে ফেলবে। আর একটা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আমার সম্বন্ধে কোনো কথা এঁদের বল না। কেন ঐ কথা বলছি পরে বলব, এখন নয়। তুমি কেবল এইটুকু অনুরোধ রেখো যে, এই যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর কথা বলে আজন্ম সাধুসেবিকা এঁদের মনে অকারণে আমার ওপর একটা ঘৃণা জন্মিয়ে দিও না। এঁদের চাকরী করি, তবু চাকরের যা সম্মান তা হ'তে এঁরা আমায় বঞ্চিত করেন নি। কিন্তু আমার পূর্ব্বের কথা শুনলে এঁরা হয় ত ঘৃণা করবেন। সে ঘৃণা সহ্য করা কঠিন হবে।

তুরিয়ানন্দ বল্লেন, 'যোগভ্রষ্ট! কে বল্লে তুমি যোগভ্রষ্ট! তুমি আপন যোগে ত ঠিকই আছ। তোমার মধ্যে সেই প্রথম দর্শনের সময়ও যে নারীত্বের আভাষ পেয়েছিলাম, তাই ত' এখন পূর্ণত্বের দিকে চলেছে দেখছি। আমার দিকটাই যে একমাত্র যোগের দিক তা যে আর মানতে পারছি না। মনে হচ্ছে তোমার দিকটাও ত হ'তে পারে।'

আমি কথা শেষ করবার জন্ত বল্লাম, 'তা যা হয় হোক, এখন তুমি কিছু বলতে পাবে না। আমি চল্লাম। দেখো তুমি এখন আমার বিষয় সম্পূর্ণ নীরব থেকো। আমার এই অনুরোধটী রেখো ভাই, দোহাই।'

আমি চলে এলাম—কিন্তু কেমন যেন হয়ে এলাম। পাগল হয়ে? হবে।

(ক্রমশঃ)

[স্বরাজ—কাহার রাজ ? বা, কোন্ রাজ ?]

[শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল]

(১)

যিনি যাহাই বলুন না কেন, দেশের লোকে যে কি চান, ইহা এখনও বলা যায় না। কংগ্রেস স্বরাজের সুর তুলিয়াছেন। তাই স্বরাজ কথাটা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, এই স্বরাজ বস্তুটা যে কি, ইহা অতি অল্প লোকেই এখনও ভাল করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা নাকি, অনেক স্থলেই স্বরাজ কি, এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কন্‌গ্রেস-কমিটির সহকারী-সম্পাদকের মুখে শুনিয়াছি যে, নানা স্থান হইতে, কন্‌গ্রেসের প্রচারকগণ, এই প্রশ্নের একটা সদুত্তর চাহিয়াছেন।

যদি সত্য সত্যই দেশের লোকে স্বরাজ কি বস্তু ইহা না বুঝেন, তাহা হইলে, এই স্বরাজের নামে তাঁরা এমনভাবে মাতিয়া উঠিতেছেন কেন ? ইহার উত্তর সহজ। নানা কারণে, দেশের লোক একবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। পেটে অন্ন নাই। গায়ে বস্ত্র নাই। রোগে ঔষধ নাই। পথে ঘাটে ইজ্জত নাই। মানুষ যাহা লইয়া বাঁচিয়া থাকে, যাহাতে জীবন-ধারণ সম্ভব ও সার্থক হয়, তার অভাব পড়িয়া গিয়াছে। এ অভাব কখন্, কিসে দূর হইবে, তারও কোনও পথ দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিতে, বক্তাগণ, আর সংবাদপত্রে লেখকেরা, সকলেই প্রায় একবাক্যে কহিতেছেন যে, আমাদের স্বরাজ নাই বলিয়া এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। স্বরাজ পাইলেই, এ দুঃখ দুর্গতি ঘুচিয়া যাইবে। সুতরাং, স্বরাজ এমন একটা কিছু, যাহা লাভ হইলে পরে, ক্ষুধার অন্ন, শীতের বস্ত্র, বর্ষার আচ্ছাদন, আর সংসার-পথে ইজ্জত রাখিবার উপায় হইবে। লোকে এইমাত্র বুঝিতেছে। আর, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, ইহাই যথেষ্ট। স্বরাজের নামে, তাহাদের অন্তরে একটা অভিনব আশার সঞ্চার হইতেছে। এই জন্যই তাঁহারা, স্বরাজ যে কি বস্তু, ইহা না বুঝিয়া এবং না জানিয়াও, এই স্বরাজের আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

স্বরাজের নামে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছেন, ইহা একদিকে শুভলক্ষণ বটে। কিন্তু এরূপ উৎসাহ, এরূপভাবে, কেবল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে ধরিয়া বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃত বস্তু আশ্রয় দিয়া, এ উৎসাহ ও আশাকে কেবল বাঁচাইয়া রাখা নয়, কিন্তু যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ না করিতে পারিলে, পরিণাম বিষময় হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী।

হতাশ রোগীর যে অবস্থা, দেশের সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ জব্যাব দিলে, রোগমুক্তির যখন আর আশা বুদ্ধি বিবেচনায় মানুষ খুঁজিয়া পায় না, তখন তন্ত্র-মন্ত্র টোট্‌কা-ফুট্‌কা, যে-যা-বলে, তাই আঁকড়াইয়া ধরে। আমাদের লোকেরা তাহাই করিতেছেন।

উকিল মোক্তারেরা যদি নিজেদের ব্যবসায় ছাড়েন, তবেই স্বরাজ পাইব, বা স্বরাজের পথে অগ্রসর হইব। বস্‌। অমনি একদল স্বরাজ সেবক উকিল মোক্তারদের পিছনে লাগিয়া গেলেন। অনেক উকিল মোক্তারও দেখিলেন যে, দেশের লোকে যখন অমন করিয়া চাহিতেছেন, তখন, কিছু দিনের জন্য, ব্যবসা'টা না হয় নাই বা করা গেল। তাঁরাও ব্যবসা স্থগিত রাখিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজের দেওয়া উপাধি ছাড়িলে স্বরাজ লাভের পথ প্রশস্ত হইবে। সুতরাং দেশের লোকে উপাধিধারীদের পিছনে লাগিয়া গেলেন। উপাধি-ধারীদেরও কেহ কেহ উপাধি ছাড়িলেন। যাঁরা ছাড়িলেন না বা ছাড়িতে পারিলেন না, তাঁরা, কোথাও বা একরূপ সমাজচ্যুত, আর দেশের সর্ব্বত্রই লোক-চক্ষে হেয় হইতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজ সরকারের 'সংসৃষ্ট স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পড়ুয়া বাহির করিয়া আনিতে পারিলেই, এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ-লাভ হইতে পারিবে। সুতরাং এ চেষ্টাও চারিদিকে হইতে লাগিল। বহু পড়ুয়া স্কুল কলেজ ছাড়িয়া আসিল। অনেকে আসিল, ভাল পড়া হইবে এই লোভে পড়িয়া, কেহ কেহ আসিল, পড়া চুলোয় যাক্‌, দেশ যাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, এমন কাজে জীবন উৎসর্গ করিবার সংকল্প লইয়া।

চরকা কাটিতে শিখিলে ও ঘরে ঘরে চরকা চালাইতে পারিলেই স্বরাজ-লাভ হইবে। একথা শুনিয়া, চারিদিকে 'চরকা' 'চরকা' ডাক পড়িল। ছেলেরা কলম ছাড়িয়া চরকা ধরিল। যে সকল লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া, তাস পিটিয়া বা দাবা ঠেলিয়া দিন কাটাইতেছিল, অথবা যাহারা কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইতেছিল, তারা জীবনের একটা লক্ষ্য ও কর্ম্ম পাইল ভাবিয়া চরকা ঘুরাইতে লাগিল।

তারপর আদেশ হইল—এককোটী লোককে কন্‌গ্রেসের সভ্য করিতে পারিলে, আর এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই স্বরাজ-লাভ হইবে। অমনি লোকে তার চেষ্টায় লাগিয়া গেল।

কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিল না—এ সকলের একটি বা পাঁচটি বা সকলগুলিতে মিলিয়া যাহা লাভ হইতে পারে, তাহাকে স্বরাজ বলিব কেন?

আর এ সামান্য প্রশ্নটা লোকের মনে উঠিল না এইজন্য, যে, তাঁহাদের অনেকেই স্বরাজ বস্তুটা যে কি, ইহা তলাইয়া বুঝিতে ও ধরিতে চেষ্টা করেন নাই। সাধ্য নির্ণয় হইলে পরে, লোকে স্বভাবতঃই সাধনার সফলতা বা নিষ্ফলতার সম্ভাবনা বিচার করিয়া থাকে। বিচার করিবার অধিকার, তখন তাহাদের জন্মে। যেখানে সাধ্য নির্ণয় হয় নাই, সেখানে লোকে সাধনার বিচার করিবে কি করিয়া, তাহা জানে না ও বুঝিতে পারে না। এখানে চোখ বুজিয়া চলা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে এটি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপথে যাঁরা একটা নিরবচ্ছিন্ন, আরাম, আনন্দ বা শান্তির অন্বেষণে ছুটিয়া হয়রাণ হয়েন, তাঁদের জীবনে এরূপ প্রায়ই ঘটে যে, তাঁরা, প্রাণের জ্বালায় যে যা-বলে তাহাই করিতে যান্। ইঁহাদের প্রাণের জ্বালাটা, অতি বড় বস্তু বলিয়া, সত্য। এই জ্বালা নিবারণের ইচ্ছাটা, স্বাভাবিক বলিয়া, অত্যন্ত আন্তরিক সন্দেহ নাই। কিন্তু তারপরে যাহা কিছু সকলই অবাধৌতিক; সকলই হাতুড়িয়া, অন্ধকারের ঢিলছুড়া। দশটার মধ্যে কখনও বা আকস্মিক ঘটনা যোগে, একটা লাগিয়া যায়, অধিকাংশ সময়, কোনটাই বা লাগে না। তবু যে ইহারা যা শুনেন তাই ধরিতে যান, ইহার অর্থ এই যে, ইঁহাদের প্রাণের জ্বালা বড় বেশী। অত জ্বালা যন্ত্রণার মাঝখানে কোন্ উপায়টাতে আরামের সম্ভাবনা কতটা, এ সকল বিচারের অবসর ও শক্তি তাঁহাদের থাকে না।

আমাদের বর্ত্তমান "স্বদেশী" বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাহাই ঘটিতেছে। লোকের জ্বালা বড় বেশী। অত জ্বালা যন্ত্রণার মাঝখানে, তাহাদের বিচার যুক্ত করিবার অবস্থাও নয়, অবসরও নাই, প্রবৃত্তিরও অভাব সুতরাং, যাহা বলা যায়, তাঁহারা তাই করিতে প্রস্তুত। ত্রিতাপ-জ্বালায় ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠেন, দেশের জনসাধারণে সেইরূপ নানা দুঃখকষ্টে অধীর ও হতাশ হইয়া, অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন।

এ অবস্থাটা বড় ভাল। কিন্তু দেশের লোকে যে পরিমাণে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন এবং অবিচারে 'নেতৃবর্গের' নির্দ্দেশ নিষ্ঠা-সহকারে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই পরিমাণে এই সকল নেতার দায়িত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। যে, বিচার-বিবেচনা না করিয়া, কোনও দিন আমার উপদেশ বা অনুরোধ গ্রহণ করিবে না, জানি, তাহাকে, মনে যখন যে খেয়াল আসে, তাহাই বলিতে পারি।

আমি যেটা নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়া কষিয়া দিলাম না বা দিতে পারিলাম না, জানি যে, সে তাহা তাহার নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়া খুব করিয়া কষিয়া লইবে। যাহা সত্য, যাহা সম্ভব, যাহা সঙ্গত, তাহাই গ্রহণ করিবে, যাহা মিথ্যা বা সত্যাভাস মাত্র, যাহা অসম্ভব বা অসঙ্গত, তাহা সে আপনিই ছাঁকিয়া, ছাটিয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু যে আমার কথা বেদ-বাক্যের মতন মানিয়া চলিবে জানি বা বুঝি, তাহাকে এরূপ খাম-খেয়ালি-ভাবে উপদেশ দেওয়া যায় কি? সে যখন আমার কথা কষিয়া দেখিবে না, তখন তাহাকে সে কথা কহিবার আগে, আমাকে ভাল করিয়া কষিয়া দেখিতে হয়। না করিলে—"অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ"—অন্ধ যেমন অন্ধকে চালায়, আমিও তাহাকে সেই রূপই চালাইব না কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জন্যই একবার একজন ধর্ম্ম-প্রচারককে কহিয়াছিলেন—"আমার ভুলভ্রান্তি যাই হউক না কেন--ঈশ্বরের নিকটে সে জন্য আমি তোমা অপেক্ষা কম শাস্তি পাইব। আমি নিজেই কুপথে চলিয়াছি। তোমরা আবও দশজনকে ভুল পথে চালাইতেছ। তাদের দণ্ডের ভাগীও তোমাদের হইতে হইবে।"

২

নেতারা যাহাই উপদেশ করিতেছেন, সরলপ্রাণ জনসাধারণ বিনা-বিচারে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া, নেতৃত্বের দায়িত্ব শতগুণ বাড়িয়া পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বের বিপদও ঘনাইয়া আসিতেছে। যদি জনসাধারণে ক্রমে ইহা বুঝেন ও দেখেন যে, তাঁহারা যার জন্য, অমন ভাবে নেতাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, সর্ব্বস্ব-পণ করিয়া ছুটিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া গেল না এবং যখন তাঁহারা এটি বুঝিবেন যে, অজ্ঞতা বা অনবধানতা বশতঃ নেতৃগণ তাঁহাদের বিপথে বা কুপথে চালাইয়া আনিয়াছেন, তখন, কেবল নেতাদেরই নেতৃত্ব যাইবে, তাহা নহে, যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা এতটা সময়, শক্তি এবং অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার উপরে পর্য্যন্ত লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে। আবার যে সহজে দেশহিত-কল্পে এমনভাবে লোকের সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ সম্ভাবনা থাকিবে না।

সকল সাধনাই যে সিদ্ধিলাভ করে তাহা নহে। আমাদের বর্ত্তমান স্বরাজ-সাধনাই যে আমরা যতটা আশু-সিদ্ধির আশা করিতেছি, ততটা সত্বরে সিদ্ধিলাভ

করিবে, ইহা না-ও বা হইতে পারে। সিদ্ধিলাভ যে হবে না, এমন ভাবি না হবে নিশ্চয়, ইহাই বিশ্বাস করি। এবিশ্বাস না থাকিলে সাধনায় নিষ্ঠা-সম্ভবে না। তবুও, সিদ্ধি ত আর আমাদের হাতে নয়। সিদ্ধিদাতা, বিধাতা। তাঁর সকল কামনা ও সকল কর্ম্মই বিশ্বতোমুখী, বিশ্বের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিশ্ব-বিধানে যখন যে সাধনার সিদ্ধিলাভ আবশ্যক হয়, তিনি তখনই তাহাকে সিদ্ধিদান করেন। সুতরাং আমি যতটা শীঘ্র, বা যে আকারে আমার ইষ্টলাভ হউক, চাহিতেছি, বা হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে, ততটা সত্বর বা সেই আকারে যে তাহা লাভ হইবেই, এমন কথা একেবারে ঠিক করিয়া বলা যায় কি? সুতরাং, স্বরাজ-সাধনার সিদ্ধিও বিধাতার হাতে, আমাদের হাতে নয়। তাঁর ইচ্ছা যখন হইবে, তখনই সিদ্ধি পাইব। এখনই যে পাইব, এমন ত কথা নাই।

কিন্তু সিদ্ধিলাভ হউক বা না হউক, সাধকের শ্রদ্ধা যদি "কোমল" শ্রদ্ধা না হয়—অর্থাৎ, এ শ্রদ্ধা যদি শাস্ত্র (অর্থাৎ, অতীতের অভিজ্ঞতা) এবং যুক্তি (অর্থাৎ, মানব-চিন্তার নিত্য-সূত্র) সঙ্গত হয়, শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা যদি এই শ্রদ্ধা পরিমার্জ্জিত হইয়া, সাধ্যবস্তু সাধকের অন্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহা হইলে, সিদ্ধিলাভ যতই দূরে যাউক না কেন, সাধন কালে যতই বাধা বিপত্তি উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে শ্রদ্ধাও বিচলিত হয় না, সাধনাও শিথিল হয় না।

কিন্তু সাধক যেখানে যুক্তি-বিচার না করিয়া, কিম্বা যুক্তি বিচারের অবকাশ না পাইয়া, অথবা যুক্তি-বিচার করিয়া পথ চলিতে গেলে যে কাল-বিলম্ব অনিবার্য্য, কিম্বা শ্রম-স্বীকার আবশ্যক, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, গুরুর অনধিগত-অর্থ উপদেশের অনুসরণ করেন, সেখানে, সম্ভাবিত সিদ্ধিলাভ না হইলে, নিরাশ্বাসের নাস্তিক্য দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন। তখন সাধ্য সম্বন্ধে হতাশ্বাস এবং গুরু সম্বন্ধে অনাস্থা জন্মিয়া, তাঁহার সকল সাধনের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেয়। আমাদের বর্ত্তমান স্বরাজ-সাধনার গুরুগণ এই মোটা কথাটা কি দেখেন না, বা, ভাবিয়া বুঝিবার অবসর পান না?

(৩)

লোকে একটা কিছু চাহিতেছে। লোকের একটা গভীর, দুর্ব্বিসহ অভাব-বোধ হইতেছে। এই অভাবটা কেবল অন্নবস্ত্রের নয়। অন্নবস্ত্রের অনটন ত

আছে-ই ; এ অনটন একেবারে নূতনও নয়। এ অনটন যাদের এখনও শূন্তের কোঠায় গিয়া দাঁড়ায় নাই, তারাও একটা যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এই একটা কিছু যে কি, সকলের আগে নিজে ইহা পরিষ্কার করিয়া ধরিতে হইবে ; পরে জনসাধারণকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া, সাধ্য-বস্তুকে তাহাদের চক্ষের উপরে উজ্জ্বলরূপে ধরিতে হইবে। যতদিন না ইহা হইতেছে, ততদিন এই স্বরাজ-সাধনা সিদ্ধি-পথে কিছুতেই অগ্রসর হইবে না।

পাঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফতের উপরে অবিচার, এই দুইটি বিষয়ের উপরে আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। মুসলমানেরা খিলাফৎ-সমস্যা সকলে বুঝুন্ আর নাই বুঝুন, তাঁদের ধর্ম্মের উপরে একটা গুরুতর আঘাত পড়িয়াছে, ইহা বুঝেন। এই জন্য অনেক মুসলমান খিলাফতের নামে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁদের প্রেরণা ধর্ম্মের, স্বাদেশিকতার নহে। একথাটা অস্বীকার করা কঠিন। সুতরাং, মুসলমান-সমাজের সঙ্গে যতই সহানুভূতি করি না কেন, এই প্রেরণার দ্বারা যে আমাদের হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া ভারতের নূতন জাতি গড়িয়া উঠিবে, এমন কল্পনা করা যায় না। সাধারণ লোকে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই এখনও এই নূতন জাতিটা যে কি, ইহার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি, ইহা বুঝেন না।। সুতরাং, তাঁহারা, স্বরাজ-টাকে যে কি, ইহাও ভাল করিয়া এখনও ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

আর এই স্বাদেশিকতার প্রকৃতি এখনও সকলে বুঝেন নাই বলিয়া, স্বরাজ সম্বন্ধে নানা লোকে নানারূপ কল্পনা করিতেছেন। এমন হিন্দু স্বদেশ-ভক্তের কথা জানি, যাঁহারা সত্যই, ভারতের নূতন যুগে, পুনরায় একটা হিন্দু-রাজ্যের আশায় বসিয়া আছেন। কবে আবার হিন্দু, সসাগরা ভারতের একছত্র অধীশ্বর হইবে, ইঁহারা সেই চিন্তাই করিয়া থাকেন। স্বরাজ বলিতে ইঁহারা হিন্দুরাজ বুঝেন। এই "স্বরাজ"-রাষ্ট্রপতি হইবেন, হিন্দু। এই স্বরাজ্যে, প্রজা হিন্দু-ধর্ম্ম পালন করিবে। হিন্দু-রাষ্ট্রে, হিন্দুসম্রাটের অধীনে, পুনরায় ভারতে "সনাতন" বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, হইবে, আবার হিন্দু-আচার প্রবর্ত্তিত হইবে ; হিন্দু সাধনার প্রকট-মূর্ত্তি স্বরূপে, ভারতের সমাজ, বিশ্ব সমাজে আপনার উচ্চ-আসন অধিকার করিয়া বসিবে।

সেইরূপ, এমন মুসলমানও আছেন, যাঁহারা মোস্‌লেম-সমাজের লুপ্ত বৈভব, হৃত-গৌরব, নষ্ট-প্রতাপ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায়, ভারতে পুনরায় মুসল-

স্থানের রাষ্ট্রীয়-আধিপত্য দেখিতে চাহেন। ইঁহারা স্বরাজ বলিতে মুসলমান-রাজ বুঝেন। রুম্ হইতে চীন-সীমান্ত পর্য্যন্ত এখনও মোস্‌লেম-সমাজ বিস্তারিত রহিয়াছে। কিন্তু, এ সকল মোসলেম-রাজ্য দুর্ব্বল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে। ভারতবর্ষে যদি আবার একটা মুসলমান প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে, সমগ্র মোস্‌লেম-সমাজকে সখ্য-বদ্ধ করিয়া, একটা বিরাট সর্ব্ব-মোস্‌লেম-সংঘ বা Pan-Islamic federation গড়িয়া তোলা একেবারে অসাধ্য হইবে না। কিছু দিন হইতে আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত মুসলমানদিগের অন্তরে এই ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, ইঁহারা যে ভারতে একটা মোস্‌লেম-রাজ প্রতিষ্ঠা হউক, এরূপ ইচ্ছা করিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। এ সকল মুসলমানই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা মুসলমান আগে ভারতবাসী পরে—Muslims first, Indians next। অর্থাৎ, মুসলমান-সমাজের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহার উপরে। এ সকল কথা আমার কল্পিত নহে। স্বদেশী-আন্দোলনের আরম্ভ হইতেই, ভারতের সর্ব্বত্র এমন বহুতর লোকের সঙ্গে আলাপ, পরিচয় এবং আত্মীয়তা জন্মিয়াছে, যাঁহারা এদেশে আবার একটা হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। ইহা তাঁহাদের নিজেদের মুখেই শুনিয়াছি এবং এই কথা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্কও করিয়াছি। আর মুসলমান নেতৃবর্গের কথায় এবং আচরণে, কখনও বা তাঁহারা প্যান-ইসলামের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহা বুঝিয়াছি যে, তাঁহাদের সকলের না হউক, অন্ততঃ অনেকেরই ভারতে স্বরাজ্যের লক্ষ্য, ইংরাজ-রাজ্যের স্থলে, আবার একটা মোস্‌লেম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখা।

তারপর, হিন্দু-মুসলমানের কথা ছাড়িয়া, দেশে যে সকল দেশীয় রাজা আছেন, তাঁহাদের দিকে চাহিয়াও এ কথা বলা যায় না যে, "হিন্দুমুসলমান মিলিয়া ভারতে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে" তাহার প্রকৃতি যাহা, সেই প্রকৃতির অনুযায়ী যেরূপ রাজ, সেই-রূপ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই, দেশের এই বর্ত্তমান অশান্তি জাগিয়াছে। এ সকল দেশীয় রাজ্যেও, ইংরাজই প্রকৃত রাজা, দেশীয় রাজারা স্বল্পবিস্তর সাক্ষীগোপাল হইয়া আছেন। স্বরাজ বলিতে ইঁহারা যদি কিছু বস্তু বুঝেন, তাহা হইলে নিজেদের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা-তন্ত্র শাসন-শক্তিই বুঝিয়া থাকেন।

সর্ব্বশেষে, ইংরাজ যাঁহাদের হাত হইতে মোগলের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া,

বর্ত্তমান ব্রিটীশ রাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—পশ্চিমে শিখ ও দক্ষিণে মাহারাষ্ট্রী—ইহারাও যে একেবারে সে পূর্ব্ব আশা বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাই বা বলি কি করিয়া? সুযোগ পাইলে যে, ইঁহারা নিজেদের ভাঙ্গা-স্বপ্ন আবার গড়িয়া উঠুক, ইহা চাহিবেন না, মানব-প্রকৃতির বিচারে এরূপ বলা যায় না।

আর এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই ধাঁধা লাগে, আমরা যে "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার ও আস্ফালন করিতেছি, সে স্বরাজ কার "রাজ"?

সাধ্য নির্ণয় না হইলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে কি?

নব্যভারত

রূপান্তর

শুধু ভক্ত ত যথেষ্টই আছে, চাই সত্যের মানুষ, যোগের মানুষ, নূতন যুগের মানুষ, যাহারা আপনার ভিতরেই দিব্যভাবের প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাইয়াছে, উৎসর্গ যাহাদের কোনও প্রতীক বা প্রতিমূর্ত্তির চরণে নয়—একেবারে অনন্তের কাছে, সত্তার অনিবার্য্য আবেগেই যাহাদের জীবনে সাধনা দিনে দিনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে—এরূপ মানুষের ভিতর দিয়াই ভাগবত মহিমা জগতে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয়—উহাদেরই উৎসর্গ সত্য এবং ভাগবত—এরূপ নিখুঁত উৎসর্গের মানুষ লইয়াই জগতে বিরাট ও অলৌকিক সৃষ্টি সম্ভব হইয়া উঠে। মনে রাখিতে হইবে, যোগ-জীবনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে সকলকেই—এ পরিবর্ত্তন একদিনের কার্য্যও নয়, একদিনে হইবারও নয়—গোল এই পরিবর্ত্তনের পন্থা ও প্রক্রিয়াগুলি লইয়াই—অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তনই কত কঠোর ও দুরায়ত্ত, তিল তিল করিয়া মানুষ-ভাবগুলির পরিশোধন ও রূপান্তর পূর্ব্বক দিব্য ভাবগুলির স্ফূরণ করিয়া তুলিতে হয়, যোগের দর্শন ও কথা বড় মধুর, সাধনা কঠিন, বুদ্ধি (intellect), ভাব (emotion), ইচ্ছা (will)—তিনটী ত উৎসর্গ করিতেই হইবে, কিন্তু ঐখানেই পরিসমাপ্তি নহে, বুদ্ধি, ভাব, ইচ্ছার আমূল উৎসর্গ-শেষে প্রাণ—(vital being)এর উৎসর্গ চাই—উৎসর্গ পূর্ণ হইলেই বিজ্ঞানময় কোষের খেলা খুলিতে আরম্ভ হইবে। এই বিজ্ঞান প্রকাশ না হইলে (vital being) উৎসর্গ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, অন্তঃকরণকে যোগময় করিবার সাধনা বরং সহজ, অনেকেই অনায়াসে লইতে পারে, কিন্তু এই প্রাণের গ্রন্থীপর্ব্বে আসিয়াই বিষম ঠেকাঠেকি বাধিয়া যায়—কর্মক্ষেত্রে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সাধকগণের ভিতরেও অশান্তি ও গণ্ডগোল

ফুটিয়া উঠে—এ অবস্থায়, একজনের সাধন অবস্থার সহিত আর একজনের সাধনাবস্থার প্রায়ই মিল দেখা যায় না—ভিতরে একটা নিগূঢ় সূক্ষ্মসূত্র অনুভবে থাকিলেও, সে অনুভূতি খুবই সূক্ষ্ম, কারণেরই আভাস-তরঙ্গ; বাহিরে তাহার রেখাটিকে টানিতে গেলেই পদে পদে কুণ্ঠা ও সংঘর্ষই সৃষ্টি হয়, প্রতীকার বিজ্ঞানের সম্যক ও সর্ব্বাঙ্গীন পরিস্ফুরণ—তাহার জন্যই চাই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পে প্রাণের আত্মাহুতি।

অগ্নিতাপেই প্রাণের শুদ্ধি বিধান হইবে। এই প্রাণক্ষেত্র (vital plane) এ শুদ্ধি আসিলে বাকীটুকুর জন্য বিশেষ সংগ্রাম করিতে হয় না। আমাদের সাধারণ প্রাণক্ষেত্র বড় ক্ষুদ্র, বড় সঙ্কীর্ণ, সামান্য ভোগে সেই জন্য সে চঞ্চল হইয়া উঠে, ছোট ছোট ব্যাপারে কামড়াকামড়ি লাগাইয়া দেয়, এই প্রাণশক্তি পুষ্ট হইলেও আবার বিপদ আছে, যেমন ইউরোপের জীবনে ঘটিয়াছে। আত্মস্বার্থ আত্মভোগের জন্য জগতের বুকে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে, vital ভোগের হাত এড়াইয়া উঠিতেই হইবে, ভোগ সমস্যার চরম নিষ্পত্তির উপায়ই হইতেছে প্রাণকে উপরে তুলিয়া দিব্য প্রাণে (divine vitality) প্রতিষ্ঠিত হওয়া। "ভোগঃ যোগায়তে" মন্ত্র শুনিবামাত্র যদি vital ভোগের কথাই বুঝিয়া লই, বিষম ভুলেই পড়িতে হইবে—ত্যাগ ভোগ লইয়া অনেক কিছু গোলমাল হইয়া গিয়াছে, উপরের ভোগ, উহা বিরাট অসীম, সমস্ত হীনবৃত্তি এখানে একেবারে তলাইয়া যায়, এইখানে আসিয়া শান্তি না পাইলে পূর্ণ সমতা সম্ভব হইবে না, অগাধ সমতার উপরেই আসল দিব্য ভোগের প্রতিষ্ঠা। এই উপরের ভোগ না আসা পর্য্যন্ত বাহিরের ভোগে প্রাণের শুদ্ধি আসে না, আসিবে একটা অবসাদ (Exha ustion)—অবসাদশৈথিল্য শুদ্ধিও নয়, সংযমও নয়। এই কথায় আবার নিগ্রহ বৈরাগ্যের কথা বুঝিলেও ঘোরতর ভুলেই পড়িতে হইবে—ভূয়ঃ এব তে তমঃ—সত্য সমাধান ত্যাগেও নাই, ভোগেও নাই , যোগে, উৎসর্গেই প্রাণ-শক্তি নির্ম্মল ও উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিবে। ভোগ্য বিষয় ও ভোগবৃত্তি সবটুকু কালী-শক্তিকে অর্পণ (offer) করিয়া করিয়া গেলে, ক্ষিপ্রবেগে কালী সমস্ত অশুদ্ধতা-গুলি গ্রাস করিয়া ফেলেন, নীচের মাধ্যাকর্ষণ হইতে সাধকের প্রাণকে উদ্ধার করিয়া উপরের এক দিব্য আকর্ষণের মধ্যে তুলিয়া ধরেন—ভগবান যখন প্রাণের শাসনরশ্মি স্বহস্তে ধরেন, তখনই আসে দিব্য আত্মসংযম, প্রাণের অশুদ্ধ ভোগাধি-কারকে উপরের আনন্দে ডুবাইয়াই তিনি সাধকের জীবনে রূপান্তর transformation বিধান করেন।

কাম, কাঞ্চন কিছুই নিছক মিথ্যাবস্তু নয়। ভিতরে একটা নিগূঢ় সত্যই উহারা লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই গূঢ় সত্যটিকেই উদ্ধার করিয়া ধরিতে হইবে। প্রাণ নিজের ধর্ম্মে যখন এই তৃপ্তি খুঁজিতে যায় তখনই তাহা ভুল হয়, প্রাণের মূল স্বভাবটিকেই ত আমূল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, মানুষ এই রহস্যটুকু জানে না। লালসার রিরংসার তাড়নাকেই সার সর্ব্বস্ব ভাবিয়া মোহোন্মত্ত হইয়া যায়, মন বুদ্ধির নির্ণীত সামাজিক বিধি নিষেধের নিগড়ে বাঁধিয়াও যে সংযত ভোগতর্পণ, তাহাতেও আসল ও চরম নিষ্পত্তি কিছুই হয় না—মানুষের সমাজনীতি বিবাহবন্ধন, যৌন নিয়ম—এ সব শাসনবৃত্তির একটা প্রয়োজন নাই তাহা নহে, কথা এই, ইহাতে মানুষের প্রাণের আসল মুক্তি ত নাই—পশু যে সেই পশুই রহিয়া গেল কেবল তাহাকে আষ্টে পৃষ্টে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিলেই সব হইল না—বরং তাহাতে কিছুই হইল না বলিতে হইবে। কঠোর ত্যাগপন্থী নীতিবাদী প্রাণকে নিপীড়ন, নির্য্যাতন, হত্যা করিতে উৎসুক—সমাজ তান্ত্রিক ততখানি অসমসাহসিক নয় বলিয়া একটা আপোষেরই (compromise) পক্ষপাতী—কিন্তু আপোষ বা সন্ধি সমাজ জীবনে আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে—শাসনে সংযমে মানুষের আসল স্বভাব পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছুই হয় নাই, হিংস্র বন্য পশু একটু মার্জ্জিত ও সভ্যভব্য (refined, cultured) গৃহ পশুটি সাজিয়াছে মাত্র—প্রাণে মূল ধর্ম্ম সমানই আছে, মন বুদ্ধির সরমে প্রাণ একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে—এইটুকু মাত্র।

আর এক পথ আবিষ্কৃত করিয়াছিল, ভারতের তান্ত্রিক সাধক। তান্ত্রিক গোড়া হইতে সন্ধি করিতে গররাজি হইয়াছে—প্রাণ, তুমি ভোগ চাও, আচ্ছা ভোগই গ্রহণ কর,—যত ইচ্ছা, যত সাধ, প্রাণ পূরিয়া সাধ মিটাইয়া ভোগ করিবার অধিকার দিলাম—ভোগই যোগায়তে—ভয় লজ্জা কুণ্ঠা জলাঞ্জলি দিয়া পূজার উপচার সংগ্রহে তান্ত্রিক ভোগরাণীর তর্পণে অগ্রসর হইয়াছিলেন—উৎকৃষ্ট ভোজ্য পানীয়, উৎকৃষ্ট আরাম বিলাস, উৎকৃষ্ট রমণী—বীরতান্ত্রিক কোথাও বিমুখ হয় নাই—তন্ত্রের শক্তিসাধক সিদ্ধকাম হইয়াছিল কি না, কে জানে,—ভিতরের আসল লক্ষ্য ছিল প্রাকৃত ভোগের পূর্ণতর্পণে ভাগবত ভোগ-ধর্ম্মটিকেই—মুক্ত ভোগ, দিব্য ভুক্তিকেই উদ্ধার করিয়া তোলা। মন বুদ্ধির সরম কাটাইয়া প্রাণের উদ্দাম ভোগের মধ্যে একটা মস্ত ইঙ্গিত লুকাইয়া আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রাণের আপনার গভীর ভিতরে তাহার মূল স্বভাবের

সত্য উদ্ধার—সে বোধ হয় একেবারেই হয় না, হইবার নয়, তাই ভারতের তান্ত্রিক সাধনারও চরম পরিণাম কুশলপ্রদ হয় নাই।

প্রকৃতির সাধারণ যে স্তর, তাহাকেই ঠাকুর বলিয়াছিলেন কামরাধা; মানুষের সাধারণ জীবনে যে প্রাণশক্তির খেলা, উহা এই কামরাধারই ভোগ, ইহাই আদি ও মূল, কারণ এই আদি রসেই ত রসলীলার প্রতিষ্ঠা। এখানে সাধক প্রাণ-প্রকৃতির সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিয়াছে, বলিতেছে পুরুষ ভোগ করিতেছে প্রকৃতিকে, কিন্তু আসলে প্রকৃতি, প্রাণ-শক্তিই ভোগ করিতেছে প্রকৃতির বস্তু রাজিকে (object), পুরুষ সুপ্ত, মায়াচ্ছন্ন, প্রকৃতি কর্তৃক প্রকৃতিরই ভোগ—উহা ভোগ নয়—ব্যভিচার। এই ব্যভিচারকেই মোহোন্মত্ত মানুষ ভোগ বলিয়া আত্মপ্রতারণা করে। কৌশলী যোগী প্রাণ-বৃত্তি হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লন, প্রাণ-বৃত্তিটি একটা উপায়, যন্ত্র, (means or instrument) মাত্র—যোগী যন্ত্রের সহিত identification আত্ম-অধ্যাস করেন না, পরন্তু অন্তরের সূক্ষ্ম প্রদেশে উঠিয়া শক্তির, প্রকৃতিরই সহিত আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন, হৃৎকমলে ভাবময়ী মায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, পূজা করেন, ইহাই কালী সাধনা, তন্ত্রের শুদ্ধ মাতৃসাধনা—অথবা আরও নিগূঢ়তর যোগাবলম্বনে স্বয়ং কালীরূপা আপনাকে অনুভব করিয়া, প্রেমরাধারূপে ঊর্দ্ধস্থ বিজ্ঞানময় আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানে রত হয়েন। ইহাই বৈষ্ণব জগতের সখী সাধনা মাধুর্য্য সাধনার মূল মন্ত্র—সাধক এখানে প্রকৃতিভাবের ভাবুক—প্রেমিকা রাধিকার সহচরী সখী, অথবা শ্রীরাধিকা স্বয়ং-ই।

লীলার ক্ষেত্র—প্রাণ ও হৃদয়। প্রাণে কামনার খেলা, প্রেমের পবিত্র মধুর লীলা হৃদয়েই অনুভব করিতে হয়—হৃদয়ই রাসমঞ্চ, রাধাকৃষ্ণের লীলাকুঞ্জ—প্রেমের শ্রীবৃন্দাবনধাম। এই বৃন্দাবনে আনন্দের ডাক (call of Ananda) মুরলী কণ্ঠে নিত্যই পরিশ্রুত—ভক্ত প্রেমিক তাহা গূঢ়কর্ণে শ্রবণ করেন, আকুল হৃদয়ে বীণাবাদকের সন্ধানে গোপন অভিসার করেন, শ্যামসুন্দর মদনমোহনরূপ সূক্ষ্ম নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া অপূর্ব্ব পুলকে উল্লসিত হন, অপরূপ লীলারঙ্গে মত্ত হইয়া শ্রীভগবানের তুষ্টি বিধান করেন। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ—এ বাঁশী সত্য, বাঁশীর অশ্রান্ত করুণ প্রাণমন উদাস-করা পাগল করা ডাক ও সত্য—কারণ বাঁশীর বাদক যিনি তিনি যে সত্যেরও সত্য, বিজ্ঞানময় পরম পুরুষ, বিজ্ঞানেরও ঊর্দ্ধে যে পরম তুরীয় ধাম, গোলক—

সেই আনন্দলোক হইতেই দূরাগত এই মোহনসঙ্গীতচ্ছন্দ তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে—হৃদ্‌মঞ্চে যুগে যুগে চির নূতন রূপে রসে গোপ গোপিকাকে প্রেমলীলায় মাতাইয়া তুলিতেছে। প্রেমের তাপে বিরহের জ্বাল দিয়া দিয়াই ভোগকে তপঃশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। আসক্তি যখন সম্পূর্ণ অগ্নিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, রস যখন সাধনার জ্বালে হইয়া উঠিয়াছে ঘনঘনীভূত, একটুও তারল্য তাহাতে আর নাই, গভীরগূঢ়, অমৃততুল্য অপূর্ব্ব রসায়ন ও সত্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখনই পাইয়াছি—নিকষিত হেমতুল্য দেবদুর্ল্লভ নিত্য প্রেম—নিত্য রাধায় প্রতিষ্ঠা তখনই জীবনে ধ্রুব ও সার্থক। সেই-ই আসল ও প্রকৃত রূপান্তর।

—প্রবর্ত্তক

নারায়ণের নিকষমণি

রূপম্

"রূপম্" দ্বিতীয় বৎসরে পড়েছে, এবৎসরের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পেলাম। "রূপম্" অজন্তা যুগের বাণীর আশীষ নিয়ে বেঁচে থাক ও আমাদের অন্ধ চোখের কাছে খাঁটি ভারতের গোপন মর্ম্মটুকু শিল্প কলার দিক দিয়ে খুলে খুলে দেখাক তা'তে দেশের আত্মা যদি আবার ডুব দিয়ে শক্তির মূলে কখন আবার যায় আর নতুন ঋষি প্রেরণায় ভারতের জীবন সত্য ধ্যানের কল্পলোক দেখে পাথরে কুঁদে ও রঙের তুলিতে রচে দেখায়।

কলাজ্ঞান হারা দেশে চিত্র-কলার কথা বলাই বিড়ম্বনা, এদেশে গভীর কথার শ্রোতা দু'চারটি মাত্র আছে, বিশেষতঃ চিত্রকলার সম্বন্ধে। সবাই চিত্র মানে বোঝে ফটোগ্রাফ অর্থাৎ প্রকৃতির নিখুঁৎ নকল। প্রকৃতি রাণীর সৃষ্টি সম্পদের কেউ নকল করতে পারে কি না জানিনে, করলেও তা বোধ হয় নকল ছাড়া আসল খুব কমই হয়। কবিতা যেমন ঘটনার বর্ণন মাত্র নয়, বস্তুর মাঝে কবি যেমন ভাবকে ধরে দেখায়, অনন্তকে রূপ দেয়, সকল মাধুরীর আধার ও আশ্রয় সেই জগত বঁধুর অঙ্গখানি অবগুণ্ঠন টেনে চকিতের জন্য দেখিয়ে তার ব্যক্ত মাধুরীর আর কূল রাখে না, শেষ রাখে না; চিত্রকলার কবিও তেমনি। রূপ ও রেখা তার হাতের অক্ষর মাত্র সেই অক্ষরে সে ভাবের মূক অমর প্রাণকে মুখর করে,

রূপের পেছনে যে সত্য ফুটি ফুটি করছে, মানুষের মুখে গাছের পাতায় মন্দিরের চূড়ার কারু মহত্বে তাই ফুটিয়ে তোলে।

মানুষের অন্তর ধামের জ্ঞান-লোক বা ভাব-লোক থেকে প্রেরণা পেয়ে যে চিত্র, যে সাহিত্য, যে ভাস্কর-কলা হয় তা' নিকৃষ্ট থাকের জিনিষ, প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কবি বা শিল্পী নিজের ভিতরে ভাগবত ধামের দুয়ার খুলে সেখান থেকে সৃষ্টি করে অনুপমকে রূপ দেয়। চিত্রকলা জীবনের নকল করে না, জীবন গড়ে, জীবনের অর্থ বিষাদ করে তোলে না, জীবনকে নিবিড় করে সার্থক করে। সে হিসাবে চিত্র বা ভাস্কর কলা বা কবির কবিত্বও ব্রহ্মবিদ্যা। আমাদের দেশে সেই কলার কবি ছিল এবং এই নব জাগরণের শুভ ঊষায় তারা আবার এসেছে। নন্দলাল তাদের একজন। এবার রূপমের প্রথম সংখ্যায় নন্দলালের অনেকগুলি ছবি আছে, যথা, গোড়ায় প্রচ্ছদের পরই শিবের শান্ত ধ্যান স্তিমিত রূপ এবং তারপর শিবের শোক, "শিবের বিষপান," "শিব তাণ্ডব" "নীরবতার কবি" এই কয়টি ছবি আছে। এ ছবিগুলির মাঝে যে গরীমা, মহত্ব, শান্তি ও জ্ঞান বিধৃত দেবত্ব দেখান হয়েছে তা' যুরোপে বা অন্য কোন দেশের চিত্রকরের চিত্রে নেই। মাইকেল এঞ্জেলো যে মহত্ব আঁকতেন তা প্রাণের ও জড় দেহের গরীমা। পাশাপাশি রবি বর্ম্মার অনুকরণে আঁকা বিশ্বনাথের ছবি দেখানয় ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ যেন উপমায় উজ্জ্বল ও প্রকট হয়ে উঠেছে। রবি বর্ম্মার শিষ্যের আঁকা এ ছবি যেন যাত্রার সাজা শিব। দেবত্ব বা মহত্ব তো নাই-ই, শান্তি বা ধ্যান মগ্নতাও নাই বরং প্রাণহীন দীনতা ও ক্ষুদ্র মানবত্বার প্রতিচ্ছবি।

অবনীন্দ্রনাথের "মহাকালের মন্দিরে" অনুপম বস্তু। নন্দলালে যা' আছে তা ছাড়া অবনীন্দ্রে কবিপ্রতিভা আরও বহুভঙ্গিম ও ব্যাপক, অবনীন্দ্র ঠিক নন্দলালেরই গুরু। তারই পাশে ধুরন্ধরের আঁকা "নাচওয়ালী"র চিত্র বড় বীভৎস দেখিয়েছে। সমরেন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধেও কয়েকটি ছবিতে দেখিয়েছেন যে, কি করে য়ুরোপের ভাব ভারতীয় চিত্রে ঢোকে। এই প্রবন্ধে পঞ্চম ছবিটির দোলায় ও তার পিছনের রূপ দু'টিতে কোন য়ুরোপীয় ভাব আমরা পাই নাই, তবে দোলার সামনে দাঁড়ান প্রথম রূপটিতে কিছু আছে।

এ সংখ্যায় James Cousin এর "Four degrees of art"– "কলার চারটি তারতম্য" সব চেয়ে উপাদেয় প্রবন্ধ, অসীতকুমার হালদারের ধারা-বাহিক প্রবন্ধের এ অংশটুকু চিত্রকলার আঁকবার বিষয় আধুনিক হবে কি

পৌরাণিক হবে তাই নিয়ে লেখা। শ্রীঅরবিন্দের Renaissance of India থেকে রূপম্-এর এ সংখ্যার শেষাংশে কিছু উদ্ধৃত করা হয়েছে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের "রাসলীলায় প্রাণের গতি রাসের ভাব মগ্নতায়ও বেশ মধুর নর্ত্তনে রূপ নিয়েছে, প্রতি সখীই আপন পাশে এক একটি কৃষ্ণরূপ পেয়েছে প্রতিজনেই ভাবছে"একা আমারই বুঝি রাস-সঙ্গী কৃষ্ণ,এমন ভাগ্য বুঝি আর কারু হয় নি।" সমস্ত ছবিটিতে নৃত্যের গতি মুখর না হয়েও দুলছে, আনন্দ শান্তির মাঝেই মাতিয়েছে, সব ব্যাপারটাই যেন ধ্যান জগতের আনন্দ নিথরতায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছে। তবু এ ছবি নন্দলালের বা অবনীন্দ্রের হাতে পড়লে না জানি কি হ'তো। অবনীন্দ্রের "কাজরীর" গভীরতা অনুপম বর্ণসম্পদ ও নৃত্য মাধুরী এ ছবিখানিতে এসেও আসে নি, তার কারণ নূতন চিত্রকরেরা ভারতীয় কলার বাহিরের নৈপুণ্য ও বিশেষত্ব বজায় রাখতে একটু সজ্ঞানে ব্যস্ত। নূতন ভারতীয় চিত্রকলা ভবনের নবীন চিত্রকরদের মধ্যে আর একটি ভাব ঢুকেছে সেটি হচ্ছে বস্তুতন্ত্রতা বা realism। রিয়্যালিজম পাশ্চাত্যের কলার প্রাণ, ছোট ছোট প্রতিভার শিল্পীরা তাঁদের চিত্রে বেশি বেশি বস্তুতন্ত্র হ'লে সেই সূত্রে বিদেশী প্রভাব ধীরে ধীরে কলার প্রাণঘাত ঘটাতে পারে। বস্তুতন্ত্রতা নিয়েও ভারতের কবি থাকা অবনীন্দ্রের মত আর কারু পারা সহজ নয়। ক্ষিতীন্দ্রের ছবিতে বস্তুতন্ত্রতা নেই বটে, কিন্তু তাঁর technique বা শিল্পনৈপুণ্য ও mannerism বা ভঙ্গী সহজ লীলায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়েও হয় না, একটু কষ্টকল্পিততায় সুচারু দেখায়। চিত্রের আত্মা সাজগোজ বসন ভূষণে ঢাকা পড়ে যায়।

বিপরীত

[শ্রীমতীলীলা দেবী]

কালোর চাইতে সুন্দর আর অরির চাইতে প্রিয়,
তৃণের চাইতে বড় কেবা—সে যে বিশ্বে অতুলনীয়।
অম্লের চেয়ে মধুর কি আছে, বিপদের চেয়ে হিত,
ত্যাগের চাইতে ভোগ কই, আর হারার চাইতে জিৎ!
দুরন্ত ঐ শিশুর চাইতে, সুনন্দ কোথা আর?
কলঙ্ক চেয়ে যশ পাই তাই হাসে চাঁদ অনিবার।
বিরহের চেয়ে নিবীড় মিলন মিলনের মাঝে নাই;
বন্ধুর মত শত্রু কোথায়—চির বন্ধন তাই।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩২৮ সাল।

আগমনী

[শ্রীকালিদাস রায়]

এস মা নবনী-হৃদয়া জননী মণিমঞ্জুষা করে,
হরষ ধারায় সরস করিয়া এস মা বরষ পরে॥
এস শারদ গগন মগন করিয়া শুচি জ্যোছনার বানে
বন-প্রান্তরে হরিত অরুণ ঘন তরুণিমা দানে।
এস প্রকটিয়া তারাপুঞ্জ—
এস গুঞ্জনে ভরি' কুঞ্জ—
কল কূজনে ভরিয়া নমেরুকুলায়, রঞ্জিয়া জলধরে॥

এস পয়স্বিনীর আপীন ভরিয়া মধুর গোরস রসে,
নিঃস্বের গৃহ শস্তে ভরিয়া, বিশ্ব ভরিয়া যশে।
এস পুষ্প ভরিয়া গন্ধে—
চারু মঞ্জুতা মকরন্দে—
এস হ্রদ-সরোবর ভরি কোকনদে কুমুদে ইন্দীবরে॥

এস নদনদী ভরি মীন-বৈভবে, কান্তার ভরি কাশে—
তরুলতা ভরি ফল-গৌরবে, তড়াগ ভরিয়া হাঁসে।
ভরি' শালি-সম্পদে ক্ষেত্র—
স্নেহ করুণায় ভরি নেত্র—
এস মুখরিত করি গিরিকন্দর নির্ঝর ঝরঝরে॥

এস শিশুর আস্ত হাস্তে ভরিয়া, লাস্তে আঙিনা ভরি,
নব স্বাস্থ্যে ভরিয়া শীর্ণ অঙ্গ জীর্ণ জড়তা হরি'।
মাগো বিতরি' অন্ন-স্তন্য—
কর সন্তানগণে ধন্য—
এস বিশ্বভরা সন্তাপহরা বঙ্গের ঘরে ঘরে॥

সত্য ও সৌন্দর্য্য বোধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শুক্ল সন্ধ্যায় যে সত্য ও সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, ভাবের পর ভাবের রূপ দিয়া প্রাণের যে গতি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা ত শেষে ব্যাকুল হৃদয়ের অশ্রুবর্ষণে, নির্ব্বাক অন্তরের সৌম্য সমাধিতে লয় পাইয়া গিয়াছে,—জ্ঞানের কথায়, সত্যালোচনায় ইহাতে ধরিবার বুঝিবার কি আছে? যে নিভৃত আনন্দ ইহাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, গতির দিকে ছাড়া তাহার সম্যক উপভোগ আর কেমন করিয়া হইতে পারে? কোনও একটী উৎকৃষ্ট কবিতার প্রত্যেক অংশ খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইলেও তাহার এই আভ্যন্তরিক গতিটা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। মানব-মনের যে সূক্ষ্ম গতি, প্রাণের যে অব্যাহত স্ফূর্ত্তি ভাবার মধ্য দিয়া রূপে, রূপের মধ্য দিয়া ভাবে স্বতঃই প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে সঙ্গীতে, ছন্দে মুর্ত্তিমান করিয়া তোলা কাব্য-রচনারই অনুরূপ। কবির মনের স্বচ্ছন্দ গতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সংস্কার হইতে স্খলিত হইয়া নিজের বেগেই ধাবিত হয়, সত্য এবং তথ্য ইহাকে সংযত করিলেও রুদ্ধ করিতে পারে না। কবিতার এইরূপ একটী অন্তর্গূঢ় স্বাভাবিকত্ব আছে। এবং ভাবের গভীরতা অথবা প্রজ্ঞালব্ধ দৃষ্টি যতই থাকুক না কেন, কবি যদি তাঁহার কবিতায় ভাব-ব্যঞ্জনার স্বাভাবিক গতিটা ফুটাইয়া তুলিতে না পারেন, তাঁহার মনের গতি যদি—তাঁহার কাব্যে স্বতঃ স্ফুরিত না হয় তাহা হইলে তাঁহার কবিতায় সৃষ্টির আনন্দ পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক

জীবনের আড়ষ্ট ভাব কবিতায় নাই, জ্ঞানার্জ্জনের কষ্টসাধ্য চেষ্টা হইতে ইহা সম্ভূত নহে, কল্পনার উদ্দাম চাঞ্চল্য ইহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দেয়। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা আজি কালি এত যে সমাদৃত—তাহা তাঁহার তত্ত্বালোচনার জন্য নহে। যুক্তির আলোকে এ সব তত্ত্ব এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারে না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এত মর্ম্মস্পর্শী কারণ সমস্ত তত্ত্ব ভেদ করিয়া প্রকৃতির মূলে চিন্ময় শক্তির যে সাক্ষাৎ অনুভূতি তাঁহার হইয়াছে—তাহার সরল সুন্দর স্বাভাবিক ভাব ব্যঞ্জনা আমরা পাই তাঁহার কাব্যে। বাহিরের সামান্য সামান্য ঘটনাগুলি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য সত্য ও সৌন্দর্য্যরূপ ধারণ করে, তাঁহার এক একটী কবিতায় ভাবের গতির মধ্যে যেন তাহা ধরা পড়িয়াছে এবং জগতের চঞ্চল প্রকাশের ভিতর দিয়া অধ্যাত্ম চেতনার প্রসারিত সৌন্দর্য্য ক্ষণেকের জন্য প্রতিভাত হইতেছে। সেই একই কারণে রবীন্দ্রনাথও বড়, তিনি মরমী কবি বলিয়া নহে,—তাঁহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনার জন্য নহে,—কারণ ইহারাও আধ্যাত্মিকই হউক আর আধিভৌতিকই হউক বাস্তব তত্ত্বের আলোচনা,—তিনি বড়, কারণ তাঁহার কবিতায় সমস্ত তত্ত্ব ও সত্যের ভিতর দিয়া তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্য স্পর্শ করিয়াছেন। সাহিত্যে তত্ত্ব ও সত্য মিথ্যা, ভাব ও সৌন্দর্য্যই সত্য—সৌন্দর্য্যকে গভীরতা দিবার জন্যই সত্যের প্রয়োজন। আমাদের তত্ত্ব ও সত্য আজ আছে কাল নাই, ইহারা তখনই নিত্য যখন ভাবের সহিত বিজড়িত হইয়া সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত, সে কালের কত শত সত্য বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আজও ভারতের হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে।

সেইজন্য কোনও একটী উৎকৃষ্ট কবিতা গদ্যে পরিণত করিলে তাহার অন্তর-শ্রী থাকে না এবং অনুবাদে ইহার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইতে পারে না। প্রত্যেক অংশ সমগ্রের মধ্যে নিহিত, এবং সমগ্র ভাবটী প্রত্যেক অংশে প্রতিফলিত। কবিতা যেন নিয়তির নিগড়ে বাঁধা, সৃষ্টির রহস্যে ঢাকা, প্রাণের স্পন্দন হইতে কেমন করিয়া যে ইহা ভাষা, ভাব ও রূপের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। জোর করিয়া কবিতা লেখা চলে না। সত্য এবং তথ্যকে কল্পনায় ফলিত করিলেও তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য নহে, যদি প্রাণের অনুভূতি না থাকে, যদি মনের স্বচ্ছন্দ বিলাস আপন মাধুর্য্যে আপনি বিমোহিত না হয়। ইংরাজ-কবি পোপের ত সত্যের

কোনও খাঁটুতি ছিল না, কল্পনারও প্রাচুর্য্য ছিল—কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব আজ কোথায়? এবং তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গৃহীত হইত, আর তাঁহার আধুনিক আধ্যাত্মিক গবেষণা আমাদের হৃদয়ে এত নৈরাশ্যের সঞ্চার করিত না। যে গভীর অনুভূতি কবিকে পাগল করিয়া তুলে, তাহা সব সময়ে তাঁহার নিজের নিকটেই পরিস্ফুট হয় না। কস্তুরী মৃগের স্থায় নিজের সৌরভে নিজে মত্ত হইয়া কবির মন গতিমুক্ত হইয়া যায়। কত মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক, কত ছন্দোবন্ধে কত আকারে ও ইঙ্গিতে তিনি সেই সৌরভকে ধরিতে চেষ্টা করেন,—প্রাণের বেদনা কথায় আধফুট হইয়া প্রাণেতেই মিলাইয়া যায়, তাঁহার মনের তুষ্টি কিছুতেই হয় না, ব্যাকুলতা ব্যাকুলতাই রহিয়া যায়। সেই জন্য কবিতার যেন শেষ নাই, ইহার কথা বলিয়াও বলা হয় নাই। ইহা যে ভাবের রেখাপাত করিয়া চলে, তাহা ঈশ্বরের মধ্যে আলোকের স্পন্দনের মত প্রাণ হইতে প্রাণে চিরকালই স্পন্দিত হইতে থাকে। অনুভূতি মূলক * কবিতাকে জ্ঞানের দ্বারা বিশেষ সুস্পষ্ট করা যায় না; এবং সামাজিক নীতিবাদ্ তাহাতে খাটে না। এই শ্রেণীর কবিতা আমাদের দেশে সাধারণ পাঠকের নিকট এখন পর্য্যন্ত সুপরিচিত হয় নাই বলিয়া ইহা লইয়া এত বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। বাস্তবিক অনুভূতি মূলক কবিতা কোনও দেশেই শিক্ষিত সম্প্রদায় ছাড়া জনসাধারণের উপভোগ্য নহে। ইহা চন্দ্রালোকের স্বচ্ছ আবরণের মত বাস্তবের সুস্পষ্টতার উপর অলৌকিক কিরণ সম্পাতে অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে। কবির সত্য যতই তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে, যতই ইহা অনুভূতির বিষয় না হইয়া জ্ঞানের বলিয়া বোধ হয়,—কবি যখন তাঁহার বিষয়কে ভিতর হইতে না দেখিয়া বাহির হইতে দেখিবার চেষ্টা করেন, ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারের, স্থির নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের,—সমভূমিতে আনিয়া ফেলেন তৃতই তাঁহার কাব্য গদ্যের রূপান্তর হইয়া পড়ে। এমন কি যখন কোনও কবিতায় একটী সুনিশ্চিত মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তখনও সেই কাব্যের উৎকর্ষ উদ্দেশ্যের মহত্ত্বের উপর ততটা নির্ভর করে না, এই উদ্দেশ্যকে ঘেরিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে যে ভাবের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়, যতটা ইহা তাহার উপর নির্ভর করে। কোন

* Romantic Poetry অনুভূতিমূলক কবিতা। আমি আমার "সাহিত্যে অনুভূতি" নামক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি কেন ইহাকে বাঙ্গলায় অনুভূতিমূলক কবিতা বলা যাইতে পারে এবং কেন Classical Poetry কে আদর্শ প্রধান বলা উচিত।

কবির আদর্শ কত উচ্চ ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা অথবা সমালোচনার উত্তেজনা প্রায়শঃই নিরর্থক কারণ আদর্শের উচ্চতা সব সময়েই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক নহে। আদর্শ-হিসাবে রামায়ণ—'ওডেসি' অপেক্ষা বহু উচ্চ মনে করিলেও বাল্মিকী হোমার হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয় না কিম্বা কেবল আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া রবীন্দ্রনাথকে মাইকেল হইতে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। একদিকে যেমন উদ্দেশ্যবিহীন কবিতা শুধু কল্পনার খেয়াল,—পাগলের প্রলাপোক্তির মত বোধ হয় আর একদিকে তেমনই আদর্শকেই এক মাত্র মাপকাঠি ধরিয়া কাব্যের বিচার করিলে তাহাকে নীতি শাস্ত্রের সহিত একত্র করিয়া দেখিতে হয়। প্রকৃত কাব্য-সৃষ্টিতে একটা নির্লিপ্তভাব আছে,—ইহাতে ভোগ বিরক্তিরও অভাব পাওয়া যায়। জ্ঞান ও চেতনার সংঘাতে কবির মনে যে অনুভূতি প্রজ্ব লিত হয়, তাহার উপব তাঁহার যেন কোনও হাত নাই; সে নিজের ইন্ধন নিজেই জোগাড় করিয়া লয়। অধ্যাত্মসত্তার গভীরতার মধ্যে ভাষা ও ভাব তাহার সহিত আপনিই যুক্ত হয়। একটী কণাকে কেন্দ্র করিয়া স্ফটিক যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে গড়িয়া উঠে, তেমনই করিয়া সেই—অনুভূতির চতুর্দ্দিকে ভাব-সম্পদ সৃষ্ট হয়। সত্য ও সৌন্দর্য্যকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জ্ঞানের দ্বারা জমাট করিলে কাব্য রচিত হয় না।

আমার মনে হয় এই জন্য রবীন্দ্রনাথের আজিকালিকার কবিতায় জীবনী-শক্তির হ্রাস উপলব্ধি হইতেছে। যে প্রাণের বেগে, অনুভূতির খরস্রোতে একদিন তাঁহার কবিতা উথলিয়া উঠিয়া "আকুল পাগল পারা" জগৎ প্লাবিত করিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহার যেন আর সে শক্তি নাই,—এখন তাহার সার্থকতা জ্ঞানে ও তত্ত্বে। যেখানে তাঁহার কাব্যের মূলে অনুভূতি বিদ্যমান, সেখানে ভাষা ও কল্পনার সামঞ্জস্য, ভাব-ব্যঞ্জনার স্বাভাবিকত্ব একটী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা সমস্ত অস্পষ্টতা ও চাঞ্চল্য সংযত করিয়া তাঁহার কবিতাকে একটী দিব্যশ্রী প্রদান করিয়াছে। কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভা মুখ্যতঃ অনুভূতিমূলক, এবং তাঁহার কাব্যের ভাব ও ভাষা, রচনা-ভঙ্গী বা প্রকাশ-প্রণালী অনুভূতি-ব্যঞ্জক, অর্থাৎ অনুভূতির ধারা অনুসরণ করিয়া ইহারা স্বভাবতঃই স্ফুরিত হইয়াছে। কিন্তু যখন তিনি তাহা না বুঝিয়া জ্ঞানের কথা, দর্শন-তত্ত্ব সেই একই প্রণালীতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন, একথা ভুলিয়া যান যে জ্ঞানের প্রকৃতিই এই, যে ইহাকে স্পষ্ট, নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখিতে হয়,- ইহা যুক্তির কার্য্য কারণ পরম্পরার অপেক্ষা রাখে,—জ্ঞানকে কল্পনার আবছায়ায়

ফেলিলে অথবা রূপকের অস্পষ্টতায় ঘেরিলে তাহা অনুভূতিতে পরিণত হয় না,—তখন তাঁহার রচনাতে দুইটী পরস্পর-বিরোধী ভাবের উৎপত্তি হইয়া এমন একটী অস্বাভাবিকত্ব আসিয়া পড়ে যে পাঠকের মন স্বতঃই তাহা হইতে প্রত্যাকৃষ্ট হয়।' রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইলে যেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠে এবং সহজেই বোধগম্য, মূলে তাহাদিগকে তেমন স্পষ্ট ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভাব ও ভাষার মধ্যে এই অসামঞ্জস্য অনুবাদে অনেকটা ঢাকা পড়ে। কিন্তু তাঁহার অনুভূতিমূলক কবিতাগুলি অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হইলে, তাহাদের প্রায় সমস্ত সৌন্দর্য্যই নষ্ট হইয়া যায়, মূল ভাবটীর ছায়া মাত্র অবশিষ্ট থাকে,—জ্ঞানের কথা যত সহজে অনূদিত হইতে পারে, অনুভূতির কথা তত সহজে হয় না।

ভাবের সৌন্দর্য্য, প্রকাশের স্বাভাবিকত্বের উপর নির্ভর করে। এবং আমাদের দেশের অবস্থাই এমন যে আমাদের সাহিত্য-রচনার মধ্যে স্বতঃই যেন একটী প্রকাশের বিকৃতি আসিয়া পড়ে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যই যদিও মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ তাহা হইলেও এই প্রকাশের রীতি বহুল পরিমাণে পাঠক সমাজের রুচি ও আদর্শের দ্বারা নিয়মিত হয়। লেখক যে শুধু নিজের অন্তর্গূঢ় আনন্দের প্রাচুর্য্য হইতেই লিখেন তাহা নহে,—তাঁহাকে অনবরতই একটী কাল্পনিক পাঠককে তাহার মনের সম্মুখে শ্রোতা ও বিচারকরূপে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হয়। সাহিত্য রচনা একাধারে সৃষ্টি ও সমালোচনা। সাহিত্যিক স্রষ্টাও বটে, সমালোচকও বটে, যে অনুভূতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হ'ন,—ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাহাকেই আবার বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার কল্পিত পাঠকের রুচি ও আদর্শ অনুসারে একটু ভিন্ন আকারে গড়িয়া তুলিতে হয়। কবির অনুভূতির সম্পূর্ণতা কখনই কাব্যে প্রতিফলিত হইতে পারে না। সাহিত্যে আমরা যাহা পাই তাহার সমস্তটাই লেখকের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি নহে। কালের গতি দুই দিক দিয়া লেখককে চালিত করে। একদিকে যেমন তাঁহার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ এই গতির দ্বারা নিয়মিত হয়, আর একদিকে তেমনই এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে তাঁহার সমসাময়িক সমাজের জ্ঞান, রুচি ও অবস্থা একটী বিশেষ রীতির মধ্যে আনিয়া ফেলে। যেখানে এই দুইটীর মধ্যে যত সামঞ্জস্য আছে, সেখানে লেখকের রচনা তত স্বাভাবিক;—ততই আমাদের মনে হয় যেন স্বয়ং কাল লেখকের হইয়া তাঁহার

লেখনী চালনা করিয়াছেন, সাহিত্যের কথা কালের সাক্ষী-রূপ হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্ম এক এক যুগের সাহিত্য এক একটী বিশেষ রূপ ধারণ করে এবং কালের গতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাহিত্যকে ঠিক বুঝা যায় না। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে যে বিশৃঙ্খলতা ও অনেক সময়েই যে প্রকাশের বিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহার একটী কারণ এই যে, লেখকের নিকট এখন পর্য্যন্ত সেই কল্পিত পাঠকের মূর্ত্তিটী সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে তাঁহার পাঠকের রুচি ও আদর্শ কি? প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাতে আমাদের দেশে কোনও নূতন সভ্যতা অথবা আদর্শের সূচনা সর্ব্বজন সমাজে এখন পর্য্যন্ত সংক্রমিত হয় নাই।

সমগ্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা দীক্ষা অথবা চিন্তা প্রণালী যদি এক না হয়,—সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও আদর্শ প্রবর্ত্তিত থাকে,—তাহা হইলে সাহিত্য-রচনা সহজ স্বাভাবিক ও সরল হইতে পারে না। আবার ইহার উপর যদি লেখকের মনের অন্তরতম প্রদেশে জাতীয় জীবনের গৌরব-বোধ অথবা অতীতের প্রতি সভক্তি প্রণতি না থাকে,—যদি জীবনের দৈন্য তাঁহাকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলে যে তিনি নিজের মধ্যে নিজে সোয়াস্তি না পান,—তাঁহাকে অনবরতই অন্য দেশের সাহিত্য ও সভ্যতাকে বড় করিয়া দেখিতে হয়,—তাহা হইলে সেই কল্পিত পাঠক লেখকের মনের অগোচরে বিদেশী সমালোচকে পরিণত হইয়া যায়,—তখন তিনি বুঝিতে পারেন না ভিতরকার যে সূত্রটী তাঁহার সাহিত্য-চেষ্টা সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে,—তখন সে সাহিত্য কেন্দ্রভ্রষ্ট, অসংযত ও অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। এইরূপ সাহিত্য যে সবসময়েই বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ প্রয়াস-লব্ধ তাহা নহে, বরং ইহা তাহার উল্টাও হইতে পারে। ইহার মধ্যে কেমন যেন একটু উৎকট দেশীয়তার ভান আসিয়া পড়ে—দেশীয় বিশিষ্টতাগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া, সংযমের সীমা ছাড়াইয়া, ভণ্ডতাপন্নের রূপে বিদেশীর নিকট প্রতিভাত হইতে চায়, এইরূপ সাহিত্য ও শিল্পে সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না কারণ ইহা অন্তরের সরল অভিব্যক্তি নহে। এবং এই ভাবটী আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে ও শিল্পে যে দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের বিশিষ্টতা, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিদেশীর নিকট ফলাইবার একটী উগ্র আকাঙ্ক্ষা, একটু অভিনয়-প্রয়াস ইহাতে লক্ষিত হয়! যে অভিনব বেশে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগতে দেখা দিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার

আধুনিক সাহিত্যেরই প্রতিকৃতি। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যে তাঁহাকে মরমী কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—সেই গৌরবেই তাঁহার আত্ম-গৌরব অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। নিজের উপর অবিশ্বাস, আত্মার প্রতি উপেক্ষা সাহিত্যের কল্যাণকর হইতে পারে না। কিপলিং, মেটারলিঙ্ক্‌ অথবা টুরগেনেভের সমকক্ষ হইলেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের সার্থকতা হয় না, তিনি যে আমাদের অনেকের কাছেই নোবেল প্রাইজের বহু ঊর্দ্ধে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি তিনি অন্তরের সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া চির-মহিমান্বিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে জগতের নিকট যাইতে হইবে না, জগৎ আপনিই তাঁহার নিকটে আসিবে। সাধারণ লোকের পক্ষে না হউক, কবির পক্ষে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ— তাঁহার গৌরব মুখ্যতঃ স্বদেশে, বিদেশে নহে। অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথের আজি কালিকার রচনায় 'রস' পাওয়া যায় না। এ গুলিতে সত্যের গভীরতা আছে, কল্পনার কমণীয়তাও যে নাই তাহা নহে, কিন্তু ভাবের গতি নাই। তিনি সত্যের হেঁয়ালি রচনা করিতেছেন,—রূপকের সাজ পরাইয়া দিতেছেন,— অধ্যাত্মজীবনের মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, কিন্তু প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইতেছে না। তাঁহার সাহিত্য-জীবনে যেন পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়িয়াছে—নৈতিক ও মানসিক আড়ষ্টতা কাটাইয়া ভাবের মুক্ত প্রবাহে তিনি নিজেকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছেন না। যাঁহার অনুভূতি একদিন শুক্লসন্ধ্যার সৌন্দর্য্যে অশ্রুবিগলিত হইয়া পড়িয়াছিল, গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য্য সাক্ষী করিয়া যিনি তাঁহার প্রাণ প্রকৃতিকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, কত জন্মজন্মান্তরের গভীর চেতনা ভাষায় গুঞ্জরিয়া উঠিয়া তাঁহার জীবন-কুঞ্জ এক অজানিত রাগিনীতে ভরিয়া দিয়াছিল, সাগরের খোলা হাওয়া বহিয়াছিল,— আজ তাঁহাকে কিনা অধ্যাত্ম কবিতার অলীক মোহে মুগ্ধ হইয়া, বিদেশী পাঠকের সাময়িক চিত্তাকর্ষণের জন্য, বৈষ্ণব-কবিতার বিকৃত অনুকরণে অথবা মেটারলিঙ্কের পদাঙ্কানুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

যেদিন হইতে তিনি পশ্চিমে সমাদৃত হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার কবিত্বের উৎস শুকাইয়া আসিতেছে। অনুবাদে যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে তাহারই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। জ্ঞানের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া প্রাণের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার এখন কার কবিতাগুলি যত সহজে অনুবাদ করা চলে, আগেকার কবিতা তত সহজে অনুবাদ করা যায় না, কারণ সে গুলিতে ভাষা ও ভাবের সহিত প্রাণের যোগ আছে। বাস্তবিক

তিনি তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতা দিয়া পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত হয়েন নাই। যে সব কবিতায় পাশ্চাত্য ভাবেরই প্রতিধ্বনি, অথবা যাহাতে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার একটা বিকৃতি দেখা যায়,—সে গুলিই—সেখানে সমধিক প্রশংসিত হইয়াছে। যাঁহার অপূর্ব্ব অনুভূতি একদিন তাঁহাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনে লইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মানস-প্রতিমা নিত্য সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া অন্তরের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া দিয়াছিল, আজ তাঁহার প্রতিভা আত্মবিস্মৃত এবং পাশ্চাত্যাভিমুখে ধাবিত! আমাদের জাতীয় জীবনের এমনই অভিসম্পাত যে বর্ত্তমানের পাওনাটুকু চুকাইয়া লইতে গেলেই ভবিষ্যৎকে হারাইয়া বসিতে হয়। আমরা এখন যাহা দিয়া আমাদের প্রতিভার নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়াছি কালের সাক্ষী হয়ত তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিবে! পরের মুখের দিকে তাকাইয়া সাহিত্য-রচনা হয় না, কারণ ইহা অনুভূতির কথা, মরমের ব্যথা। সাগরের পরপারে যে সুদূরের সভ্যতা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল, আমাদের কণ্ঠস্বর তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই স্বাভাবিকত্ব হারাইয়া ফেলে। কারণ সাহিত্য আমাদের অন্তরতম সত্য, ইহাতে মৌলিকতা থাকিলে, ইহার স্বদেশে প্রতিষ্ঠাই সময়-সাপেক্ষ, বহুকাল চর্চ্চার পরে ইহার বিদেশে প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে হইলে চাই জ্ঞানের স্বচ্ছ দৃষ্টি, অধ্যাত্মচেতনার মেঘমুক্ত জ্যোতিঃ যাহাতে হৃদয়ে সমস্ত সত্য প্রতিভাত হইয়া ত্রিকোণাশ্রিত স্ফটিকের মধ্যে সূর্য্যরশ্মির মত বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় জগতের মন মোহিত করিতে পারে। সত্যানুভূতি যত বাড়িতে থাকে, আমাদের সমস্ত সত্তা স্পন্দিত করিয়া সাহিত্যও তত শব্দে ধ্বনিতে রণিত হইয়া, হৃদয়ের উচ্চস্বরগ্রামে প্রাণের মুক্ত মূর্চ্ছনায় মিলাইয়া যায়। তাই অনুভূতি ও ছন্দে ধর্ম্মে ও সঙ্গীতে সাহিত্যের উৎপত্তি। যে ওঙ্কারধ্বনি ভারতে একদিন উঠিয়াছিল, তাহা যেন এক বিরাট সত্যানুভূতির নির্ব্বাক স্পন্দন,—সাহিত্যের অন্তররূপ!

প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সাহিত্যের চিত্রকলা ও সঙ্গীতের সহিত যেন একটু অন্তরের যোগ আছে এবং ইহা একাধারে এই দুইটীর যত কাছে যাইতে পারে ততই উৎকর্ষলাভ করে। সাহিত্যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়া শব্দের সাহায্যে তাহাকে রূপে ফলাইবার চেষ্টা করা হয় এবং সে বিষয়ে ইহা চিত্রকলার অনুরূপ। এই রূপ-মাধুর্য্য সাহিত্যে যত থাকে তত তাহার চমৎকারিত্ব। আবার অপর পক্ষে সত্যানুভূতির গভীরতার দরুণ প্রাণের যে আবেগ,—ভাবের এই গতিকে ভাষার ঝঙ্কারে পরিণত করাও সাহিত্যের

একটী অংশ এ বিষয়ে ইহা সঙ্গীতেরই অনুরূপ জ্ঞান, চিত্রকলা ও সঙ্গীত, এই তিনের পবিত্র সঙ্গমই সাহিত্যের পুণ্যতীর্থ। এই তীর্থোদকে স্নাত হইলে সাহিত্যের যে নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা ফুটিয়া উঠে, তাহা যেন এক অব্যক্ত আদর্শের জ্যোতি সূচিত করে,—কোন দূর স্বর্গের আভাষে হৃদয়ে পুলক সঞ্চার হয়। একদিকে যেমন অমূর্ত্ত সত্যকে শব্দ-বিন্যাসে রূপে ফলাইতে হয়, মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত করিতে হয়, আর একদিকে তেমনই ভাষার ইঙ্গিতে ও ঝঙ্কারে সেইরূপকে লয় করিয়া প্রাণের আবেগে পরিণত করিতে হয়।

এইজন্য কোনও বিদেশীয় সাহিত্যের শিল্পহিসাবে চর্চ্চা এত কঠিন। বহুকাল হইতে ইংরাজী সাহিত্য আমাদের দেশে অধীত হইতেছে কিন্তু যে পর্য্যন্ত এ সাহিত্যকে আমরা রূপ দিতে না পারি, অথবা ইহাকে সঙ্গীতে, নাট্যে উপভোগ করা আমাদের পক্ষে যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এ সাহিত্যের ভিতরকার সঙ্গতি, অন্তরের স্বরূপ আমাদিগের নিকট সম্যক স্ফুট হইবে না, ইহা কেবল শুষ্কজ্ঞান রহিয়া যাইবে, আমাদের চিত্তকে সরস করিবে না। আমরা ইংরাজী কবিতা পড়ি এবং মনে করি বুঝি ব্যাখ্যা ও সমালোচনা দিয়া কবিত্বের মাধুর্য্য ধরা যায়। মিল্টনের কাব্য আমাদের নিকট বক্তৃতা, শেলীর সঙ্গীতের বিগলিত ধারা আমাদের নিকট শুধু অধ্যাত্মবিদ্যা। ইংরাজী সাহিত্য পড়িবার সময় ভাবের সঙ্গে সঙ্গীতের ও রূপের যে সূক্ষ্ম যোগ আছে তাহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আইসে না। বিদেশী রচনার উৎকর্ষ বুঝিতে গিয়া আমরা সমালোচকের গবেষণায় ব্যথিত হইয়া পড়ি, কারণ ভাষার যে অনুভূতি লইয়া সাহিত্য-সমালোচনা হইয়া থাকে, যে ভাব ও ছন্দোমাধুর্য্য ইহার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সংলিপ্ত, ইংরাজী ভাষার সেই অনুভূতি আমাদের অনেকেরই হয় না। এ ঠিক সাহিত্য-চর্চ্চা নহে, সাহিত্যের শরীর-বিজ্ঞানের চর্চ্চা। সেইজন্য আমাদের ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচনা এতই হাস্যাস্পদ ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত! ইংরাজী সাহিত্যের যে সমালোচনা বাঙ্গালীর নিকট হইতে বাহির হয় তাহাতে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনও প্রকাশ নাই, কতকগুলি পাশ্চাত্য সমালোচকের মতামত একত্রিত করিয়া আমরা আমাদের কৃতিত্ব জাহির করি। এইরূপ বিদ্যায় কি কেহ মানুষ হইতে পারে? ভাষা ত আমাদের পোষাক নহে,—যেমন ইচ্ছা ছাঁটিয়া লইব, যখন ইচ্ছা ছাড়িয়া দিব,—ইহা যে মানব-মনের, সমস্ত অধ্যাত্মজীবনের দেহ, রূপে অভিব্যক্তি। ইহার

ভিতরে যে প্রাণ, সেই প্রাণ যিনি ধরিতে না পারিয়াছেন, ইহার বাহিরে যে সত্য, সেই সত্যও তাঁহার নিকট পরিস্ফুট হইবে না,—এ কেবল ছায়াকে কায়া বলিয়া উপলব্ধি করিবার নিস্ফল প্রয়াস্।

ভাষার মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, বর্ণনার চমৎকারিত্ব, এবং শব্দের রণন মধুর মন্দ্রে ধ্বনিত করিবার শক্তি বাঙ্গলায় মাইকেলের যত আছে, বোধ হয় আর কাহারও তত নাই। মাইকেল কল্পনাকেই আবাহন করিয়াছিলেন, এবং কল্পনাদেবী তাঁহাকে আপন বরপুত্র করিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক কবিতায় যেন কেবল স্বপন বাতাসে বপন করিয়াছেন, তাঁহার বাঁসনা-বাঁধনে কিছুই ধরা পড়িতে চাহেনা,—তিনি এতই আবেগভরে প্রাণপণে ঝঙ্কার দেন যে তাঁহার বীণার তার বুঝি ছিঁড়িয়া যায়, তাঁহার আশার তরণী যেন কূল পায় না—রূপ অরূপের মধ্যে ডুবিয়া যায়। আর মাইকেল যখন একবার অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিয়া ফেলেন তখন সেইরূপের দিকটাই বিশিষ্ট করিয়া ফুটাইতে চান্, তাহাকে স্ফুটতর করিয়া কত ভাবেই যে দেখেন বলা যায় না। কিন্তু ভাষার যে ইঙ্গিতে ও ঝঙ্কারে রূপের সৌন্দর্য্যকে কেবল ক্ষণিকের প্রকাশ বলিয়া বোধ হয়,—সমস্তরূপের পশ্চাতে ভাবের যে গভীর ব্যাপ্তি,—তাহা বড় অনুভব করিতে পারেন না। সৌন্দর্য্যের স্বরূপ যে কি, মানুষ তাহা বুঝে না, বিশ্লেষণে তাহা দেখান যায় না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের আত্মানুভূতি থাকিবে, ততদিন আমরা সৌন্দর্য্যের ভিতরে একটা ভাবের আভাস্,—সত্যের একটা নির্ম্মল ভাতি,—সন্ধান করিয়া ফিরিব,—শুধু বাহ্যপ্রকাশ লইয়া আমাদের আত্মার তুষ্টি হইতে পারে না। মাইকেল এই বাহ্যপ্রকাশেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন,—কোনও নিগূঢ় সত্যের সন্ধানে যান নাই। বাল্মিকী কিম্বা হয়ত মিল্টনের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছেন,—তাহাকে রূপে ধরিতে তাঁহার এতই উল্লাস যে সেই মাদকতায়, রূপের সেই মোহে,—তাঁহার অধ্যাত্মচেতনা সম্যক জাগ্রত হয় নাই। মাইকেলের কল্পনাশক্তি, তাঁহার ভাষা কখনও মধুর কখনও গম্ভীর, তাঁহার চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা, দুকূল প্লাবিনী বর্ণনা,—এ সমস্ত বিষয়েই মেঘনাদবধ বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়, এবং তাহার গুরুগম্ভীর নির্ঘোষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরকালই ধ্বনিত হইবে। কিন্তু মাইকেলের কার্পণ্য তখনই অনুভূত হয়, যখনই আমরা জিজ্ঞাসা করি,—এ সব কিসের জন্ম? এই যে রণসজ্জার দুন্দুভিনাদ,—কালমেঘাবৃত অম্বরে বিজুলীচমকের মত বীরাঙ্গনার এই যে রুদ্রমূর্ত্তি এই যে সীতা-সরমার

করুণ কাহিনী,—দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র-সৈকতে মেঘনাদের অন্তিম শয্যায় হৃদয়াবরুদ্ধ শোকোচ্ছ্বাস,—একি কেবল কল্পনার মায়াময়ীচিকা? কোনও গভীর সত্যের-মধ্যে যদি সৌন্দর্য্যের প্রকাশ না হয়, কবি যদি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য-বোধ লইয়া ঋষিপদ-বাচ্য না হইতে পারেন, তবে তাঁহার কবিতার সার্থকতা কোথায়? সৌন্দর্য্যেরই এমন একটা মহীয়সী শক্তি আছে যে সে অজ্ঞাত স্বর্গের রাগে হৃদয় রাঙিয়া তুলে, মনের গুপ্তকোণে অশ্রুত দৈববাণী ভাষায় গুঞ্জরিয়া উঠে,—কিন্তু যে আভাসে ও ইঙ্গিতে, যে শিশির-স্নাত অমল শোভায় হৃদয় পুলকিত করে,—তাহা যেন জ্যোৎস্নার আধআলো জাগরণ, সত্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ তাহাতে না পড়িলে তাহার স্বরূপ প্রাণে পরিস্ফুট হয় না। ভাব ও সৌন্দর্য্য সত্য হইতে বিচ্যুত হইলে স্বপ্নলোকের সত্তাহীন মূর্ত্তির ন্যায় বোধ হয়, তাহাকে ধরিয়াও ধরা যায় না—ইন্দ্রিয়ের পুলকে প্রাণে দাগ পড়ে না।

গোপন কথা

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

কইব ভাবি কতই কথা, কাছে পেয়ে ব'ল্‌তে নারি কিছু,
কেঁদে মরি চোখের আড়াল হ'লে,
চাইতে গিয়ে মুখের পানে, হ'য়ে আসে নয়ন দুটি নীচু,—
কঠিন মোরে ভাবিস্‌নি তা ব'লে;
সুধান যবে হাতটি ধরে, 'মনোমত নইকি তোমার আমি,
যোগ্য তোমার নই কি আমি মোটে?'
সরম ধরে অধর চেপে, হয় না বলা 'আমি তোমার, স্বামি'!
নীরবে প্রাণ চরণ-তলে লোটে।
জানিস্ তোরা যতই রাগি, যতই করি ভারি গলার স্বর,
সবি আমার লোক-দেখানো—ছল,
নয়তো তাঁরে তোরা যখন ডাকিস্ ব'লে 'ওগো, দিদির বর'
হৃদয় বলে 'আবার ফিরে বল্',

দিসনিক' ভাই আঁড়ি ক'রে, কপট কোপের করি বলে তান,
তোদের কাছে নেইত কিছু ছাপা,
চতুরতায় যায় কি প্রাণের লুকিয়ে রাখা সবার বড় দান,
স্নেহের কাছে প্রেম কি থাকে চাপা ?

সুখের ঘর গড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তিন বন্ধুতে আবার আলাপ আরম্ভ করিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল 'আপনাদের কি আলোচনা হচ্ছিল ?'

প। আইন-ভঙ্গ করছেন। 'আপনাদের' না 'তোমাদের'? আলাপ হচ্ছিল গাঁয়ের প্রজাদের দুর্দ্দশা—জমীদারদের কর্ম্মচারীদের উৎপীড়ন বিনি খরচায় বিনি ক্লেশে গরীবের দুঃখ দূর করছিলাম আমরা অন্ততঃ আমি ভবানী সত্যই একটা হাতে কলমে কাজ করেছে—কি জান ? ওদের মাছমারী মহালে এক গুণধর নায়েব—কি নামহে ভবানী ? পতিতপাবন, হ্যাঁ ইনি খুব প্রবল প্রতাপে প্রভুর কাজ করছিলেন—দুচার ঘর প্রজার বাসোচ্ছেদ গৃহদাহ প্রভৃতি কাজে তাঁর প্রতাপের মাত্রা এতই বেড়ে ওঠে যে ভবানী বলে করে খুড়োকে দিয়ে তার জবাব করে দিয়েছে নতুন এক নায়েব আসছে—এসেছে না হে ?

ভ। আজকাল মধ্যেই আসবে—

প। ইনি আবার কেমন হবেন তা জানিনি। তুমি তাকে চেন ?

ভ। শুনিছি খুব দক্ষ,তবে কিসে দক্ষ কাজে কলমে দেখলে বোঝা যাবে—

যাত্রী মহোদয় ওরফে এই নূতন নায়েব বাবু ক্রমশঃই হিমাঙ্গ হইতেছিলেন। বিবর্ণমুখ খানা ব্যাচারী জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে ধানের ক্ষেত ও নীল আকাশের দিকে ঘুরাইয়া রাখিল। কল্কিকার আগুন কলিকায় নিবিয়া গেল।

প। দেখ ভবানী তুমি এবার হতে মাঝে মাঝে incognito হয়ে মহালে বেড়াতে যেও বাস্তবিক তোমারও তো ভাই কর্ত্তব্য সেটা—

ভ। নিশ্চয় ! তবে কি জান—থাক্ সে কথা—

গাড়ী যাত্রীপুরের গন্তব্য ষ্টেশনে আসিল। ব্যাচারী তাড়াতাড়ি বোঁচকাবুচকি লইয়া নামিতে ব্যস্ত হইল। বন্ধুরা ধরাধরি করিয়া জিনিষ গুলা নামাইয়া দিল। পঞ্চু বলিল "মহাশয় আবার আসছেন কবে? /

নায়েব বাবু উত্তর না দিয়া ভিঁড়ে মিশিয়া গেলেন। ঘামদিয়া তার জর ছাড়িল কিন্তু দুর্ভাবনার ভূত ছাড়িল না। যাত্রা করিবার সময় কাছারী বাড়ীর চালে টীক্‌টীকি ডাকিয়াছিল ও বুড়া গোমস্তা হাঁচিয়াছিল সেটা তার মনে পড়িল।

ভ। (বিজয়কে) আপনি ক'দিন দেশে থাকবেন?

বি। হয় দুদিন; না হয়ে একেবারেই থেকে যাব—

ভ। তার মানে?

বি। একটা কারণ ঘটেছে, মোট কথা হয়তো চাকরী করবো না—দেশে চাষ বাস করলে কেমন হয়?

প। অনভ্যাসের ফোঁটা হলে কপাল চড়্ চড়্ করবে -

বি। চেষ্টা করা মন্দ কি? অভ্যাস হতে কতক্ষণ?

প। চাষ করতে হলে ভিতরে বাইরে চাষা হতে হবে। চাষা মানে uncultured boor নয় কৃষক কৃষিজীবি –

বি। বাঙ্গালী মধ্যবিৎরা তো হাজার বছরের চাষী, দুপুরুষেই না হয় চাকরে বাবু হয়েছে—চাষী বলতে আমি বলছি genlteman farmer নয় কি ভবানী বাবু?

ভ। বটেই তো—?

পঞ্চু হঠাৎ সুর সহকারে গান হাকিল :—

আদম যখন ঠেলতো লাঙ্গল ইভ্ ঘোরাতো চরকা
বংশ গুমর যার যা যত ঐ খানেতেই ফাঁকা
বাবা ঐ খানেতেই ফাঁকা—

বি। বাঃ পঞ্চু বাবু আপনার খাসা গলাতো?

প। গদলী বল-সাধু ভাষা বলবে।

ভ। গদলী কি?

প। কলা যদি কদলী হয় তবে গলা কেন গদলী হবে না?.

বন্ধুরা এমনি করিয়া হাসি খুসি আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাইতে লাগিল। গাড়ী আসিয়া হরিপালে থামিল। বন্ধুরা নামিয়া গেলেন। বুড়ী ও তার

নাৎনিটীকে বিজয় সাবধানে নামাইয়া দিল। টিকিট দেবার সময় ভবানী ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া বুড়ীর ও তার নাৎনির উপরি দেনা ভাড়া মিটাইয়া দিতে গেল। ষ্টেশন মাষ্টার ভবানীকে চিনিত। সম্ভ্রমের সহিত বলিল "না না ও কেন? এমন কত যাচ্ছে, আসছে- যেতে দেন।"

ভ। না মাষ্টার মশাই -তা হয় না, একটা পয়সায় আমি গরীব হয়ে যাব না, আর রেলকোম্পানী যে বড় লোক হয়ে যাবে তাও হবে না। তবে কথা হচ্চে যে আইন বাঁচিয়ে চললে—

প। সব দিক রক্ষা হয়—এস এখন।

মাষ্টার মহাশয় অগত্যা একটা রসিদ দিয়া এক্‌সেস্ ভাড়া লইলেন।

ভবানীর জন্য পালকী ও লোকজন লইয়া নিবারণ বকসী নামে একজন কর্ম্মচারী ষ্টেশনে হাজির ছিল। ভবানী পালকীতে উঠিল না, পঙ্কুর দিকে তাকাইয়া বলিল "এই তো ক্রোশ দেড়েক—চল তিন জনে হেঁটে যাই কি বল—বিজয় বাবু?

বি। আমাদের তো অপসন নাই যেতে হবেই—আপনি পারবেন? (হাসিয়া)

ভ। কেন আমি কি কোমলাঙ্গিনী পর্দ্দানশিনী? বড় লোকের বাড়ীর ছেলে হওয়া কি হারাম। তারা যে না লোকের দোষ নেই--চলুন বেশ খোলামাঠে পাকা ধানের গন্ধ আসছে—হু হু বাতাস, বাঃ কি সুন্দর।

এই বলিয়া তিন বন্ধু মাথায় চাদর জড়াইয়া চলিতে উপক্রম করিবেন, এমন সময় নিবারণ বকসী হুজুরের কোমলপদ পল্লবের ভবিষ্য অবস্থা কল্পনা করিয়া সভয় সকাতর কণ্ঠে বলিল :—

"আপনি কেন হেঁটে যাবেন? পাল্কী তো আছে বৌ রাণী মা (নয়নতারা) আমায় বকবেন যে?—"

ভ। না বকবেন না আমি হেঁটেই যাব, তোমরা দয়াময়ীর বাজারে গিয়ে অপেক্ষা কর না পারি তখন পাল্কীতে চাপবো—

নিবারণ অগত্যা কিছু কিছু পাল্কী লইয়া চলিল। তিন বন্ধু মাঠে গিয়া পড়িল। ধান জমির আল ভাঙ্গিয়া কিছু কিছু চলিতে লাগিল। ভবানী কথা পাড়িল—

কলকাতায় ধোঁয়া-ধুলো ভরা বাতাসে আর গ্রামের এই ভরভরে হালকা বাতাসে কত তফাৎ তা নিশ্বাস টেনেই বোঝা যাচ্ছে নয় কি?

বি। তা আর বলতে? কিছু দিন থাকলেই বেশ বোঝা যায় যে—

প। পিলে লিভারের সঙ্গে পল্লী বাতাসের কি নিবিড় ঘনিষ্ট আত্মীয়তা! বিজয় ও ভবানী খুব হাসিয়া উঠিল।

ভ। কবি যখন গান তৈরি কল্লেন—

পল্লী আমার জননী আমার। আমার জন্ম-জন্মের দেশ।

প। একি মা তোমার মলিন বসন পিঁচুটী নয়ন রুক্ষ কেশ?

ভ। পঙ্কুর মত কুসন্তান আর দুটী নাই নিজের দেশ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ! আচ্ছা, কবি ও কথা লিখে কি অতি স্তুতি করেছেন বল্‌তে চাও?

প। যে কবি লিখেছিলেন তিনি কখনো পাড়া গাঁয়ে পা দেন নি আর তিনি কলকেতার তেতালার ছাতে বিলাতী ফুলের টবের পাশে বসে চাঁদনি রাতে ওটা লিখেছিলেন—তিনি মিছে কথা লিখেছেন—দাদা যে থাকে সম্বৎসর পাড়া গাঁয়ে—

ভ। আমিতো ছিলাম—

প। তোমার কথা ছেড়ে দাও নবনী ভোজন করে ফুলেল তেল মেখে দুগ্ধফেন বিছানায় শুয়ে রুইমাছের মস্তকভোজন করে অমনি থাকতে পারে তো? তা ক'জন পারে? যাচ্ছ তো বিজয় বাবু দেখবে, এইতো মড়কেশ্বরী দেবীর busy season ঘরে কেমন উৎসব লেগে গেছে! সে কালের গল্পে শোনা যায় রাজা মাত্রেরই একটী ছদ্মবেশ ধরা রাক্ষসী রাণী থাকতো। সে দিনে মনমোহিনী রাত এলেই হাতীশালের হাতি ঘোড়া সালের ঘোড়া খেতো। এই ম্যালেরিয়াটী আমাদের সেই রকমের রাক্ষসী রাণী ছমাস দেশের মাটীর ভিতর লুকিয়ে থাকে ছমাস বেরিয়ে এসে চামুণ্ডা বেশে শ্মশান লীলা লাগিয়ে দেয় তখন দেশময় মংারই কি একটী নেশা চেপে যায়!—

বলিতে বলিতে পঙ্কুর উজ্জল চোখ দুটা যেন জলে ভরিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর তীব্র হইতে গম্ভীর হইয়া পড়িল। ভবানী ও বিজয় পঙ্কুর কথার সত্যতা বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিল। বিজয়ের এমন অভিজ্ঞতা নাই তবে কল্পনায় সে সে-চিত্র আঁকিতে পারিল।

পঙ্কু চুপ করিলে, আর কেহ কোনো কথা কহিল না। নিজে নিজে নিজ্ অন্তরের সেই বর্ণনার সত্য ছবি আঁকিতেই ব্যস্ত। অসাবধানে চলিতে চলিতে ভবানীর পা আল হইতে পিছলাইয়া মুচড়াইয়া গেল। পিছনে বিজয় ছিল ধরিয়া না ফেলিলে ভবানী পাশেই সজলধানিবনে পড়িয়া যাইত। পঙ্কু বলিল খুব লেগেছে?

ভ। না

প। বলেইছিতো দাদা অনভ্যেসের ফোঁটা। (উচ্চস্বরে) ও বক্শী মশাই পাল্কী আনতে বলো।

বক্শী ব্যস্ত হইয়া কাহারদের ডাক দিয়া পাল্কী আনিতে হুকুম করিল। নিকটে একটা বট গাছ তলায় পঞ্চু ভবানীকে বসাইয়া তার পায়ের সেবা আরম্ভ করিল। ভবানীর বড লজ্জা হইল। আধ ক্রোশ না আসিতে আসিতে এমন রসভঙ্গ হইবে সে ভাবে নাই। বাধ্য হইয়া সে পাল্কীতে চাপিয়া আগে যাইতে বাধ্য হইল। ভবানী পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল "একেবারে গিয়ে নেউগী ঘাটে নামবো, তোমরা সেই খেনে এস—"।

বিজয় ও পঞ্চু সরকারী সড়কে উঠিল। মাটীর রাস্তা খুব চওড়া। গরুর গাড়ীর যাতায়াতে স্থানে স্থানে চাকার চাপে কাটিয়া গভীর গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। দুধারে ধানের ক্ষেত, যতদূর চোখ যায় ততদূর কাঁচাপাকা ধানেভরা। তারি বুকে দূরে কাছে ছায়াশীতল বনবেষ্টিত ছোট ছোট গ্রামগুলি সমুদ্রের উপর ছড়ানো দ্বীপখণ্ডের মত দেখাইতেছিল। দুইবন্ধুতে কথা চলিল।

প। ব্যাচারী বড় অপ্রস্তুতে পড়ে গেছে—

বি। লেগেওছে খুব বোধ হয়।

প। সভ্যমানুষের কিন্তু লাগার চেয়ে লজ্জাটাই বেশী কষ্ট কর—

বি। জমীদারের ছেলের মত তো চাল চলন নয় ?

প। এইটেই আমাদের এখন পরম সান্ত্বনা ও আশ্বাসের কথা।

বি। কেন ?

প। জনের পর রিচার্ড-রাজত্ব যে জন্যে কামনা করেছিল লোকে—

বি। আপনার সঙ্গে আলাপ হলো, কিন্তু কেউ যদি আপনার পরিচয় আমার কাছে চায় তা দিতে পারিব না—আমি কি অজ্ঞ। সহরে আজন্ম বাস করে কুনো হয়ে গিইছি। দেশের এমন সব রত্নদের পরিচয় জানিনি! সত্যি, বড় লজ্জার কথা—

প। (হাসিয়া) খুব জহরী তো আপনি। আমি যে রত্ন তা জেনে ফেলেছেন ? তবে পরিচয় শুনুন,—"আমি শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা, পিতা ঈশ্বর গোপীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উপস্থিত নিবাস চেন্তলা গ্রামে মাতুলালয়ে, মাতুল শ্রীহরকালী তর্কসিদ্ধান্ত, ভিক্টোরিয়া টোলের ন্যায়ের অধ্যাপক। মদীয় জননী দেবী জীবিতা। শর্ম্মা দেশের টোলে প্রায় অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত অষ্টাধ্যায়ী পাণিণি

সঙ্গে কুস্তি কসরৎ করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে কৈশোরে রাজধানীতে গিয়ে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালাভ করতে আরম্ভ করেন। এখনও তাই চলছে; সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী বিদ্যাও লাভ হচ্ছে। সত্যি ভাই আমার ঝোঁক না হলে আমাকে জন্মটা কাল ব্যাকরণের লোহার কড়াই চিবিয়ে মরতে হতো! খুব বেঁচে গেছি, ভাই—ভাব দেখি একবার, ৮ বছর ধরে 'সহর্ষেঘঃ স্তভিঃতুচ্চ চাকে-টপ্' এই-ই করছি! এদিকে বাঙ্গলায় লিখছি সপরিবার সহ, কুশল সংবাদ প্রাপ্তি হইয়া, গঙ্গাতীর!—

বি। আপনার মামা বুঝি ইংরাজী পড়ার খুব পক্ষে?

প। খুব! বলেন,—'জ্ঞান আবার দিশি বিলিতি কি? জ্ঞান হাওয়া জলের মত; খাঁটী হলেই হলো, যাতে মানুষের মন বাড়বে, যে জ্ঞানে জীবনে কাজ দেবে তাই অর্জ্জন করতে হবে; তিনি দুঃখ করেন—কতকগুলো বাজে অকেজো কথার চালাকি শিখে জীবনটা নষ্ট করলাম! ছেলে পুলে যেন ও ভুল না করে। তাইতো মশাই বেঁচে গেছি।

বি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের দর্শন ও কাব্য সম্পদ খুবই সুভোগ্য।

প। তা কে ভোগ করতে মানা করেছে? শাঁস খেতে হবে বলে ছাল ছোবড়া চিবোনা থেকে আরম্ভ করতে হবে তার কি কথা আছে?

হঠাৎ উভয়ের কথা থামিল। অদূরে একটা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া মুস্কিলে পড়িয়াছে। গাড়ীর চাকা মাটীতে পুঁতিয়া গিয়াছে। গাড়ীতে ধানের বস্তা ঠাসা বোঝাই। একটা গরু নন্‌কোঅপারেশন ব্রত লইয়া জোয়াল হইতে ঘাড় সরাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চাষী গাড়োয়ান বোঝাই বস্তার উচ্চাসন হইতে প্রাণপণে তাহাকে ঠেঙ্গাইতেছে। এবং তাহার জীব-কৌলিন্যের একমাত্র সনাতন চিহ্নস্বরূপ ল্যাজটিতে ঘনঘন নির্ম্মম মোচড় দিয়া চতুষ্পদ ব্যাচারীর ঊর্দ্ধপুরুষ ও অন্তঃপুরিকাদের সহিত নানারূপ নিকট সম্বন্ধ পাতাইয়া তিরস্কার তাড়না করিতেছে; কিন্তু গো বেচারী প্যাসিভ রেজিষ্টান্সের চরম ধৈর্য্য দেখাইয়া বাঙ্গালীকে লজ্জা দিতেছে। সে অনড় এবং অচল।

বন্ধুদ্বয় দূর হইতে অবলাজন্তুর প্রতি এই উৎপীড়ন দৃশ্য দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইল। পল্টু তাহার বিপুল মাংসল দেহখানা সঞ্চালিত করিয়া প্রথমে গাড়োয়ানকে বলিল—"তুমি কি রকম লোক হে? ব্যাচারীজন্তু পারছে না, আর তুমি তাকে নির্দ্দয়ভাবে মারছ? নিজে চাকা ঠেল না?"

গাড়োয়ান প্রথমটা ধতমত খাইয়া কথায় কাণ না দিয়া প্রহার চালাইতে লাগিল। পঞ্চু তার ছড়িটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে টান দিয়া নামাইল ; এবং বিজয়কে যোগ দিতে বলিয়া চাকা ঠেলিতে আরম্ভ করিল। দুইজনের সমবেত চেষ্টায় চাকা উঠিল। চাষা তখন গরুকে জোয়ালে ঠিক করিয়া গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল। গাড়োয়ান একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিদ্বারা সাহায্যকারী বাবুদের খাতির করিয়া বিনা বাক্যে গাড়ী চালাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দুই জনে দয়াময়ীর বাজার পার হইয়া চলিল। বেলা তখন ১১টা হইবে।

অশ্রু

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

আঁখিবারি,—আঁখিবারি, ওরে আঁখিবারি।
কেমন লগনে তোরে কি ভাবি বিধাতা রে,
সৃজিয়া সাজায়ে দিল আঁখে সারি সারি।
দুখে সুখে মিশাইয়া
করুণা মাখায়ে দিয়া,
নিভৃতে বসিয়া তোরে শান্তি মাঝে ভারি
গড়েছিল এক মনে ওরে আঁখি-বারি।

ওরে আঁখি-বারি ওরে শান্তির কণিকা,
হৃদিমাঝে চূর্ণকরা দুখ-ধূলিকায়
ঢেলে দিয় সুশীতল পীযূষ রেণুকা,
উদ্দাম সিন্ধুর প্রায়
হিয়া মাঝে, শান্তি-ছায়
ধৌত করি' রেখে যাস্ দুখ—কুহেলিকা।
ওরে আঁখি-বারি তুই শান্তির কণিকা।

নয়নে উথলি' থাক্ ছল ছল ছলে
হিয়া হ'তে কাড়ি' নিয়া দুখের বীজাণু
গগনে ছড়ায়ে দিস্ পবন হিল্লোলে,
তোহার তরুণ গায়
দুখ যে তরলি' যায়
গলিয়া মিশিয়া তোর তপত পবলে
সমাহিত হয় যত দুখের কল্লোলে।

উঠরে ফুটিয়া মোর আঁখি তারকায়
শতে শতে বিন্দু বিন্দু ওরে আঁখি-বারি,
দুখ যে লাগিয়া আছে আমার হিয়ায়
প্রক্ষালি' সে দুখ রাশি
ফুটায়ে শান্তির হাসি
রজনী বিগতে ফুটা স্নিগধ উষায়
ওরে আঁখি-বারি সুখ-রশ্মির রেখায়।

গঙ্গ দুটী বহি মোর ওরে আঁখি ধারা
মন্দাকিনী-স্রোত সম আয় বেগে নামি'
প্রলেপি হৃদয়ে যত জ্বালা রুদ্ধ-করা।
স্নিগ্ধ শান্ত সমাহিত
প্রীত শীত রুদ্ধ চিত
তোহার প্রভাবে হবে রুদ্ধ হৃদি-কারা।
ওরে ও কল্যাণ-ময় ওরে অশ্রু-ধারা।

জগৎজুড়ে ইঙ্গিত

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ.]

আজ কাল মানুষ জড়বাদের মায়া কাটিয়ে উঠে যে এক নতুন সত্যময় জগতের সম্মুখীন, সেকথা নানাদিক দিয়ে প্রকট হয়ে উঠছে। য়ুরোপের জড়বিজ্ঞান এখন শুধু জড় বা শক্তিরই কথা বলে না, আরও অনেক দূর যায়। জগতটা যে এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের প্রকাশ, তা' একরকম অভ্রান্ত বিশ্বাসে দাঁড়িয়েছে। বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা সূক্ষ্ম জগতের অনেক ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষায় লেগেছেন। মানুষ যে জড়ের গণ্ডীতে এতটুকু দীন হয়ে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ভোগের ক্ষুদ্রতায় নিঃশক্তি হয়ে পড়ছিল, এবার বুঝি সে স্রোত ফিরলো। অনন্তের ব্যক্ত স্বরূপের প্রতি পরমাণুটির বুকেও অনন্তই বিরাজিত, পূর্ব্বেও যে পূর্ণেই মূর্ত্তিমান তা' একবার বুঝতে পারলে মানুষের দেবজীবন ফিরে আসবে, তার সভ্যতার ভিত বিশাল সত্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নতুন রূপ নতুন ঋদ্ধি ও বিচিত্রতায় ভরে উঠবে।

য়ুরোপ বাহির থেকে খুঁজে খুঁজে অন্তরের রাজ্যে এগিয়ে চলে, য়ুরোপের মনের গতি—প্রকৃতির ধারাই এই রকম। তাই সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের সত্য ধরতে সহজেই তাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়। কিন্তু সে ভুল অচল হয়ে তাদের জীবন পঙ্গু করতে পারে না, ভুল কেটে যায়, কারণ তাদের জ্ঞানের সংযম ও সত্য পিপাসা Scientific spirit অসীম। যোগ শক্তিতে (spiritual powers) তারা বহির্ম্মুখী জাতি বলেই বড় দীন, এ শক্তি আমাদের দেশে অনেক আধারে স্বভাবতঃই আছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের সত্য আবিষ্কারের প্রেরণা আমাদের মধ্যে নাই। এই দুইটি একাধারে যার মধ্যে প্রকাশ পাবে সেই মানুষই পরা বিজ্ঞান জগতের সত্যের ছন্দে বাহিরকে বেঁধে দেবে।

ফ্রান্সের (Le Martia) লা মার্ত্যা কাগজে এই সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছে তা আমরা হুবহু অনুবাদ করে দিলাম।

"দিনে চল্লিশবার করে বলো, যে আমি সব রকমে ক্রমশঃ ভাল হয়ে যাচ্ছি, তা' হলেই তুমি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হবে।" এই হচ্ছে নান্সি সহরের ফরাসী ডাক্তার মুসিয়ে ফুএর শাস্ত্র। এই বিধান অনুসারে সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন। মুশিয়ে ফুএ একজন অদ্ভুত মানুষ, ফ্রান্স, ইংলণ্ড

এমন কি এমেরিকা থেকে যে সব রোগী তাঁর কাছে আসে তাঁদের তিনি চিকিৎসাই মাত্র করেন না, তিনি করেন তার চেয়েও অনেক বড় একটি ব্যাপার; এক মুহূর্তেই তিনি তাদেরই নিজের নিজের রোগের ডাক্তার বানিয়ে ফেলেন। এই সৌম্য শুভ্রকেশ উজ্জ্বলকান্তি বৃদ্ধ তাঁর চিকিৎসা প্রণালী আমাদের কাছে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাঁর আশার অন্ত নাই। "আমি বিশ বৎসর থেকে এই যে auto-suggestion অভ্যাস করছি," এ সত্যটির বল অভাবনীয়। আমি যে ব্যাধি বা পীড়ার চিকিৎসক সে ধারণা তোমরা মনে আদৌ করো না, পীড়ার চিকিৎসক বলে কোন জিনিষই জগতে নেই। লোককে আমি auto-suggestion দিয়ে নিজেই নিজের সব রকম ব্যাধীর চিকিৎসা করতে শেখাই। কিন্তু অনুগ্রহ করে সব কথার গোড়ায় আমাকে একটি বিশেষ সত্যের ওপর তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দাও। লোকে কিন্তু এ সত্য এখনও তেমন স্বীকার করতে চায় না। লোকে যাই-ই বলুক না কেন, ইচ্ছাশক্তি (will power) আমাদের চালায় না, চালায় কল্পনা শক্তি (imagination)। আমাদের মধ্যে দু'টি সত্তা আছে, একটি সচেতন (conscient)—যেটি হচ্ছে আমাদের ইচ্ছাশক্তির নিয়ামক; আর একটি হচ্ছে অচেতন (inconscient) যেটি আমাদের কল্পনাশক্তিকে চালায়। এখন এই দুইটির মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব হয় তবে কল্পনা শক্তি চিরদিন জয়ী হয়। মাটির উপর যদি একখানা দশ মিটার (metre) লম্বা ও ২৫ মিলিমিটার চৌড়া তক্তা পাতা যায়, তা' হলে তার উপর দিয়ে সহজেই তোমরা স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পার। এখন মনে কর যে তক্তাখানা একটা বিরাট গহ্বরের উপর পাতা আছে; তা' হলে তোমরা আর একপাও অগ্রসর হ'তে পারবে না। এর অর্থ তোমাদের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে তোমাদের কল্পনাশক্তি। তুমি চাও কিন্তু পার না। লোকে ইচ্ছা-শক্তির চর্চার কথাই প্রায় বলে থাকে কিন্তু আমার মনে হয় কল্পনা শক্তিকে কি রকমে কি ভাবে চালাতে হয় তাই জানা বেশী দরকার। মনে রেখো আমাদের ভিতরের অচেতন সত্তাটিই আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে চালায়। সুতরাং যদি ঠিক ঠিক কল্পনা করা যায়, যে, আমাদের প্লীহাটি অথবা পাকস্থলীটি তাদের কাজ ভাল রকম করছে তবে সেই কল্পনার জোরে নিশ্চয়ই তাদের কাজ তারা ভাল রকম করবে। এটা ধ্রুব সত্য।"

auto-suggestionএর শক্তি দেখাবার জন্যে মুশিয়ে কুএ তাঁর রোগীদের কাছে এই সহজ পরীক্ষাটি করেন। তিনি তাদের জোর করে মুঠো বন্ধ করে

হাত লম্বা করে দিতে বলেন, তারপর বলেন, "ভাব, মুঠো আমি খুলতে চাই কিন্তু পারি নে।" রোগী শ্রদ্ধা সহকারে এই কথা ভাবে আর সত্য সত্যই আঙুল খুলতে পারে না। মুশিয়ে ফুয়ে তখন আবার বলেন "ভাব,এখন পারি।" রোগী তৎক্ষণাৎ সহজেই মুঠো খোলে। তাঁর উপদেশ এই যে "auto-suggestion অভ্যাস খুব সহজ জিনিষ, রোজ সকালে ও বিকেলে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করবে আর মনকে একাগ্র করবে। পর পর কুড়িবার মনে মনে বলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দড়িতে কুড়িটা গেরো গুণে যাবে (mechanically), যে, "রোজ রোজ আমি সব রকমে ক্রমে ভাল হয়ে উঠছি।"

মুশিয়ে ফুয়ে অবশ্য স্বীকার করেন যে তিনি সব রকম রোগ সারাতে পারেন না। কিন্তু তাঁর রোগীরা যে সব রোগ নিজেরাই সারিয়েছে তা' খুব অদ্ভুত রকম ব্যাপার। কয়েকজন দুরারোগ্য দুষ্ট ব্রণ (cancer) আরোগ্য করেছে, দু'জন যুবতী মেয়ের স্যাড়া মাথায় নতুন করে চুল গজিয়েছে। এক জন মহিলা এই auto-suggestion দিয়েই তাঁর দাঁত তুলে ফেলেছেন, অথচ কোনই কষ্ট পান নি আর কয়েক second এর মধ্যেই রক্তস্রাবও বন্ধ করতে পেরেছিলেন। অনিদ্রা রোগে এ ওষুধের মার নেই। সময়ে সময়ে আমার এখানে বাস্তবিক ভেল্কির কাণ্ডই (miracle) ঘটে। একজন বৃদ্ধা চাষীর মেয়ে কত বৎসর ধরে হাঁটতে অপারগ ছিল। তাকে নাকি সহরে গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। ফিরে কিন্তু সে হেঁটে নিজ গ্রামে চলে গেছে।" মুশিয়ে ফুয়ে এই ভেল্কির ব্যাখ্যা এই ভাবে দেন, "মেয়েটির সত্যি সত্যিই পক্ষাঘাত হয়েছিল, পরে তার অজ্ঞাতেই রোগটা সেরে যায়। কিন্তু অভ্যাসের ফলে সে মনে করতো, যে, তার পক্ষাঘাত তখনও আছে। সেই জন্যেই auto-suggestion এমন সহজে ও অবিলম্বে কার্য্যকরী হতে পেরেছিল।" auto-suggestion এর উপর মুশিয়ে ফুয়ের অসীম বিশ্বাস। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করছেন যে এর দ্বারা মৃত্যুকে জয় না করতে পারলেও বার্দ্ধক্যকে অবশ্যই জয় করা যাবে। নিজের ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভ করা যাবে এবং শুধু তাই নয়, মা যেমন চাইবে সন্তানও ঠিক তেমনই মানসিক ও শারীরিক গুণ নিয়ে জন্মাবে। কিন্তু যদি "দেখি পারি কিনা" এ কথা বললে চলবে না, বলতে হবে; "সন্তান নিশ্চয় এই রকমই হবে।"

তাঁর হাজার হাজার শিষ্যরা মুশিয়ে ফুয়েকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু তিনি সরল ভাবেই বলেন যে তিনি সামান্য নগণ্য মানুষ।

মুশিয়ে ফুয়ে যে তত্ত্বকে কল্পনাশক্তি নাম দিয়েছেন তা' প্রকৃতপক্ষে Faith বা বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ফুয়ের শক্তি আছে কিন্তু জ্ঞান খুব বিরাট নয়, তাই তিনি ব্যাপারটি তলিয়ে বুঝতে গিয়ে বড় গোল বাধিয়েছেন। ভোগ পাগল বহির্ম্মুখ মানুষের এই স্বভাব, বুদ্ধি ও মনের গণ্ডীর মাঝে সে সব তত্ত্বের রহস্য খুঁজে মরে। বিশ্বাসে অসম্ভব সম্ভব করে, কারণ মানুষের হৃদয়ের শক্তি এই বিশ্বাস্ তার সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অনন্তের মাঝে তার সত্তার দুয়ার খুলে দেয়। "আমি এতটুকু" "এই আমার সীমাবদ্ধ শরীর" "এই এই আমার সামর্থ্য, তার বেশী নেই" এই রকম সব জড়বুদ্ধি আমাদের সত্তার সকল ধামের সংযোগ ছিন্ন করে রাখে। মানুষ একবার সংস্কার মুক্ত হতে পারলেই শক্তি জ্ঞান আনন্দ শান্তি সবই তার অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে বইতে পায়, বিশ্বের জ্ঞান ও শক্তি অন্তরে স্বতঃই আসে। যোগ মানে মানুষের মন বুদ্ধির সংস্কার ভাঙা ও অনন্তের মাঝে মানুষকে মুক্ত ও বিধৃত করা। এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস খণ্ডভাবে তাই করে, কিন্তু শক্তিমান ফুয়ের সঞ্চিত বিশ্বাসের তরঙ্গ দুর্ব্বল রোগীর চিত্তে সঞ্চারিত হয়েই তারা এত সহজে বল পায়, ফুয়ের মত শক্তিমানের কাছে না গেলে আপন ঘরে বসে রোগীকে বহু আয়াসে বহু সাধনায় শক্তি সঞ্চয় করে তারপর সাফল্য পেতে হবে।

ফুয়ের পাশ্চাত্য মন কিন্তু এ কথা মানতে চায় না, যে, এক মানুষ থেকে অপর মানুষে শক্তি বা তত্ত্ব-সঞ্চারিত হতে পারে। তাই পক্ষাঘাত গ্রস্থা রোগিনীর বিষয়ে তাঁর অমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা। বিশ্বাসের বল অনেক, কিন্তু তার সঙ্গে জ্ঞান না খুললে সে বিশ্বাস বৃহৎ জীবনে কার্য্যকরী হয় না, পঙ্গু হয়ে থাকে এবং অশুদ্ধ আধারে মনের বাসনাময় মানুষে সহজেই জগতের অহিতকর হতে পারে।

পশ্চাত্য মনের সত্য অনুসন্ধিৎসার ফলে জড় ও সূক্ষ্ম জগতের অনেক সত্যের প্রকাশ ক্রমে হচ্ছে, কিন্তু যোগশক্তির অভাবে পরা জ্ঞান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তার গতি বড় এলোমেলো ও হাস্যকর। দি ফোরামের (The Forum) ১৯২১ সালের মার্চ্চের সংখ্যায় রিচার্ড এল্ গার্ণার (Richard L. Garner) কল্পনায় ভাবী মানুষের যা' ছবি এঁকেছেন তা' এমনি সত্যমিথ্যার এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি। তিনি বলেন, "আহার কমে গিয়ে মানুষের গলনালী ক্ষীণ হয়ে যাবে। প্যালিওলিথিক যুগে মানুষ এখনকার চেয়ে ঢের সহজে নিজের খাদ্য পাক করতো। এখন আহার যেমন জটিল ও ভোগাবহুল ব্যাপার রোগও তেমনি

বেড়েছে। খোসা নারিক বাদামে দেহ পোষণের সার ঘনীভূত ভাবে আছে; এই সব দেখে মানুষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে একটি গুলি বা বড়িতে সার একত্র করে আজ কাল কৃত্রিম খাদ্য তৈয়ারী করছে। এখনই desiccated soups ও নানা রকম মাংস ও দুগ্ধ-সার পাওয়া যায়, এক রকম আগেই হজম করা predigested সহজপাচ্য খাবারও বাজারে দেখা দিয়েছে, এখন তা' রোগীতে খায়, পরে সুস্থ মানুষেরই তাই আহার হবে। ভবিষ্যতের মানব জাতির মধ্যে উৎসবে নিমন্ত্রণে ভূরিভোজনের ঘটা থাকবে না, যে ঘরে নিমন্ত্রিতরা বসবে সেই ঘরে ফুলের তোড়া থেকে সুধার সার (ambrosial proteides) সুগন্ধে বাতাস ভরে রাখবে। মানুষের স্নায়ু স্পর্শ করে এই সুধাসার আনন্দে সকলকে মত্ত করবে সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি সাধনও করবে, নূতন দৈহিকশক্তি সম্পন্ন শক্তিমান মানুষ সেই সার দেহে আকর্ষণ করে নেবে।

কথা বলতে গিয়ে শ্রোতার কানের কাছে শব্দে ঝড় না তুলে সে যুগে মানুষ telepathy বা ভাব সঞ্চার শক্তিতে বহুদূরের মানুষের সঙ্গেও সচ্ছন্দে কথা বলবে। শরীরের বহু রোগ জয় হয়ে যাবে, আহার সহজ হওয়ায় প্রাণ শক্তির অপচয় স্বতঃই নিবারণ হবে। দূরস্পর্শ ও দূরশ্রুতির মত অনেক শক্তিই মানুষ অর্জ্জন করে দেহে ও মনে সুন্দর ও শক্তিমান হ'য়ে উঠবে। আকাশবাণী ও দিব্যগীত তার নূতন কর্ণে সদাই বাজবে, বহু নূতন বর্ণ ইন্দ্রধনুর শোভায় জেগে চোখের তৃপ্তি সাধন করবে। নিমন্ত্রিত মানবমণ্ডলী পুষ্পাবৃত চক্ষে সুধাসার গ্রহণ করিতে করিতে এইরূপ দিব্যগীত ও দিব্য জ্যোতির বর্ণ ধনুতে আনন্দ পাবে।"

গার্ণারের এই স্বপ্ন-জগত অধিকাংশই কল্পনার আতিশয্য ও খেয়ালের গাঁজাখুরি ব্যাপার। মানুষে অনন্ত শক্তি লীন আছে তা সত্য, হয় সবই, কিন্তু সত্য দেহ কিম্বা জীবনকে পঙ্গু করে না, আরও পূর্ণ করে। শুধু রোগ কেন মৃত্যু অবধি মানুষ জয় করতে পারে। অরবিন্দ—বলেন, "রোগ যখন বাহির থেকে আসে তখন প্রথমে তাকে সূক্ষ্ম ও প্রাণ শরীরেই ধরা যায় ও সে অবস্থায় তা সহজেই নিবারিত হতে পারে। মানুষ স্থূল দেহের জ্ঞান ছাড়া আর সমস্তই হারিয়ে রোগের আক্রমণের কাছে অসহায় হয়ে আছে।" যে বৈজ্ঞানিক এডিশন বিতারা খবর, টেলিফোন, ইত্যাদির আবিষ্কর্ত্তা তাঁরা তিন পুরুষে মিতাহারী ও দীর্ঘজীবি ছিলেন। মিতাহারের ফলে তাহার ঠাকুরদাদা ১২০ বৎসর অবধি সবল সুস্থ কর্ম্মঠ দেহে বেঁচে থেকে জীবনের সব সাধ পূর্ণ হওয়ায় দেহ ধারণে বিরক্তির জন্য সহজে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

জগত ভরে এইভাবে মানুষের অভিব্যক্তি তার অজ্ঞাতেই মানুষকে যে অভিসারের পথে বের করে তার চরণ দু'টিকে যে কুঞ্জ অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে তা' আত্ম-রতির অভিসার, সে কুঞ্জও তার গহন আনন্দময় আত্মলোকের কুঞ্জ। মানুষ এবার আপনাকে নিঃশেষ করে পাবে, নিজের স্বরূপের সহজ বিভূতির মাঝে অটল আসন নেবে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞানে তা' উজ্জল, স্বভাবের আনন্দে তা' বিপুল বিস্ময়, শক্তির শান্ত পূর্ণতায় তা' অবলীলায় সৃষ্টিমুখর।

এ যুগান্তরের আভাস জগতভরেই এসেছে। সকল দেশেই এই বাণী বহন করে আত্ম-জ্ঞানী সাধক চক্র গড়ে ভাগবত আসন রচনায় রত। জার্ম্মাণীতে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট-অন-মেনের কাছে ড্রাম্‌ষ্টাডে (Darmstadt near Frankfrot-on-Main) কাউণ্ট কৈসারলিং (Count Keyserling) তাঁর জ্ঞান-পীঠ বা School of wisdom খুলে বসেছেন। তাঁর প্রভাব জার্ম্মাণীতে এখনি প্রবল হয়ে উঠে নব-জার্ম্মণী নির্ম্মাণের কাজে বহু তরুণ স্ত্রী পুরুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। ঐহিক ভোগী কৈসারলিং এখন কবি ও দার্শনিক, তাঁর প্লেটো কনফিউসিয়স বুদ্ধ ও ক্যাণ্টের ভাব থেকে আহরিত নতুন সত্য তরুণ জার্ম্মণীর নিকট জীবনের নতুন ভিত্তি, নতুন ছন্দ এনে দিতে চায়। গত যুদ্ধে বহু রাজ্য ও সম্পদ হারিয়ে আজ সে দেশের তরুণেরা জড়বাদ ও পশুশক্তির ওপর আস্থা হারিয়েছে এবং আত্মার অন্তলোকে আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবনের সন্ধানে বেরিয়েছে।

চীন দেশেও জেন (Zen) সম্প্রদায়ের এক শক্তিমান যোগী কঠোর তপস্যা করে আজ এই অধ্যাত্ম সভ্যতার নতুন ভিত দেবার জন্য প্রচার ও সাধনা আরম্ভ করেছেন, তারও চারিদিকে চীনের চিন্তাশীল যুবক ও নারীরা একত্র হচ্ছে। চীনের ভবিষ্যত যে এই দলের হাতে তা' ক্রমশঃই জগতে প্রকাশ হবে; এখন নীরব নির্ম্মাণের যোগমগ্ন অবস্থা চলেছে।

ভগবানের নবজাত নির্ম্মাণের ভাগবত মানুষ গড়ার বহু ইঙ্গিত বহুদিক থেকেই নিত্যই আসছে, চারিদিকে এতকালের অসাধ্য যা' তাই অলৌকিক ব্যাপারে সিদ্ধ হয়ে শক্তির ব্যাপক রাজ্য মানবনেত্রের কাছে খুলে যাচ্ছে। সুকারি (Tsukeari) জাপানী যোগী, তাঁরও মুশিয়ে ফুয়ের মত অলৌকিক বিশ্বাসের বল আছে। তাঁর ব্যবস্থা মতে চলে ২৫১৩ জন মেয়ের মধ্যে ১৯০৮ জন ইচ্ছাশক্তির বলে পুত্র সন্তানের মা হয়েছে। সুকারী বলেন, অন্তঃসত্ত্বা হবার দেড় মাস পর থেকে নিত্য গর্ভিণীকে মনে মনে খুব বিশ্বাসের জোরে ভাবতে হবে, যে, "আমি পুত্র সন্তান কোলে পাব।" তা' হ'লেই মায়ের

মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এ সকলই মানুষের অমানুষ শক্তির ইঙ্গিত। মানুষ মন বুদ্ধির চেয়েও ঢের বড় বড় শক্তিতে শক্তিমান, সে খণ্ড নয়, ক্ষুদ্র নয়।

মানব জাতি বহুবার বহুদেশে পশুর প্রাণপ্রবণ জীবন ছাড়িয়ে হৃদয়ের ও মনের অনুশীলনে জ্ঞানের সভ্যতা গড়েছে। বিবেক বিচার ও জ্ঞানেতে উঠেই মানুষ প্রকৃত মানুষ এই উঁচু ভূমি থেকেই প্রাণ ও দেহের পশুপ্রবৃত্তি ও অন্ধ-জীবন অতিক্রম ও আয়ত্ব করা যায়। দেহ থেকে বুদ্ধি ও জ্ঞান অবধি ওঠা নামাই মাত্র এত দিনের মানব ইতিহাস। শুধুই যে আমরা এই জ্ঞান গর্ব্বের জীবন ভিত গড়েছি তা' নয়, অনেকবারই গড়ে গড়ে হারিয়েছি। তার নিদর্শন ভূগর্ভ থেকে কত জায়গায়ই না আমাদের চোখের সামনে ব্যক্ত হয়ে পড়ছে।

Martres-de-Vayre জেলার Clermont Ferrand থেকে ২৫ মাইল দূরে আঠার শতাব্দির আগেকার রোমান গল জাতির কবর বেরিয়েছে। তা'-যখন প্রথম খোলা হয় তখন তার মধ্যে সুন্দরী যুবতীর রূপলাবণ্য দেহ বসন ভূষণ পাদুকায় সাজান ও নিখুঁৎ অবস্থায় পাওয়া যায়। এতকালেরও কোমল মাংসের লালিমাও তার নষ্ট হয় নি। বাহিরের বাতাস ও সূর্য্যতাপের সংস্পর্শে কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই সে অনুপম দেহ ধূলা হয়ে কঙ্কালাবশেষ রেখে ঝরে যায়। কাছে কোথাও কার্বনিক এসিডের উৎস থাকায় এ সকল শরীর এমন নিখুঁৎ ভাবে কাল প্রভাব কাটিয়েও টিঁকে ছিল। সেই যুগের গলদের তৈয়ারী জুতার কারুকার্য্য নাকি অতি অনুপম, সমাধীতে যে সব ফুলদান, চুবড়ি, বাসন-পত্র পাওয়া গেছে তা'তে বেশ বোঝা যায় যে, মানুষ কত যুগেই না আমাদেরই মত উন্নত ছিল। তাই বলি মানবের জ্ঞানগর্ব্বিত এ মানস সভ্যতা বহু পুরাতন। মনেরও উপরে মানুষের আর এক বৃহত্তর সত্ত্বা আছে, যুগে যুগে সাধকেরা যোগবলে সেই ভূমিতে উঠে জীবনকে রূপান্তর করবার প্রয়াস করেছেন। যুগে যুগে সেই ভাগবত ভূমি হতে জ্ঞান আনন্দ ও শক্তির জ্যোতি নামিয়ে এনে সাধকেরা বহু ভঙ্গিম মানব সত্তার এক এক ধাম আলোয় আলো করে গেছেন, এ সকলই ছিল নব-মানব গড়বার প্রেরণা, মানুষকে তার পূর্ণ বৈচিত্রে সকল সত্ত্বায় রূপান্তর করে ভাগবত জীবনে সার্থক করবারই ক্রম ইতিহাস। এ যুগে সকল অতীত যুগের সেই অভিব্যক্তি ও রূপান্তরকে একই আধারে সামঞ্জস্য দিয়ে ভগবান মানুষকে দেবতা করেই গড়বেন। জগতকে সে বাণী শুনতে হবে, আজ হোক কাল হোক সত্যের যুগ প্রেরণা সফল না হয়ে ফিরবে না।

বাঁধনহারা

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

আজকে আমার হৃদয়-বীণে
 মীড় টেনেছে তারে তারে,
হৃদয়-বীণার সুরে সুরে
 মন নেচেছে বারে বারে।
বাঁধনটুটে প্রাণ জেগেছে
 ভুল ভেঙেছে ভয় ভেগেছে
মুক্তি এসে ডাক দিয়েছে
 আমার প্রাণের দ্বারে দ্বারে।
এতদিনের ঘুমের আবেশ
 কাট্‌ল আজি নয়ন হ'তে,
মুক্তি পেলাম ব্যর্থ কাজের
 অলসরাজের এ দাস খতে।
হঠাৎ আজি নয়ন খুলে
উঠ্‌ল পরাণ হর্ষে দুলে
বাহির হ'লাম সকল ভুলে
 যাত্রী নবীন জীবন পথে।
দুর্ব্বলতা কাঁদে কোথায়
 অত্যাচারের পাষাণ বুকে,
দুঃখীদীনের রক্ত ধারা
 শোষণ করে করাল মুখে।
ভা'য়ে ভা'য়ে করছে হেলা
খেলছে সদাই মরণ খেলা
হিংসাদ্বেষের পঙ্ক-মেলা
 স্বার্থ-শকুন হাসছে সুখে।

পিষ্ট দুখে ক্লিষ্ট যা'রা
তা'দের বোঝা বইব শিরে,
তা'দের পায়ে লুটিয়ে দেব
অর্ঘ্য দিব হৃদয়টীরে ,
স্নান করায়ে নয়ন জলে ;
বিজয়মালা দিব গলে।
পরাজয়ের মর্ম্মতলে
জয়শ্রীটি আসবে ফিরে,
সমাজের এই বন্দীশালের
সকল শিকল খুলতে হ'বে
মরণের ভয় ভুলেরে আজ
জীবন দোলায় দুলতে হ'বে,
পিছের কথা মিছে গাওয়া
সামনে কেবল এগিয়ে যাওয়া
কাঁদন-ভরা ভিক্ষা চাওয়া
সকলি আজ ভুলতে হ'বে :
প্রাণের ধারা বাঁধন-হারা
ছুটবে জগৎপ্লাবন করে'
আলোর গানে প্রেমের তানে
সকল আঁধার দিবে ভরে'।
মায়ের মুখে ফুটবে হাসি
প্রাণে প্রাণে বাজবে বাঁশী
জীবন-মরণ পাশাপাশি
চলবে হাতে হাতে ধরে'।

খেয়ানী

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(১)

হরি খেয়া দিত

ছোট নদী, অগাধ জল তাহাতে প্রখর স্রোত। নদীর অনতি দূরে পল্লীতে হরি থাকিত। সে সেই সকালে বৈঠা আর লগী লইয়া নৌকায় যাইত, দুপুরে ঘরে আসিয়া রান্নাবান্না করিয়া আহার করিত, আবার নৌকায় গিয়া বসিত। এই তার কাজ। হরি একলা মানুষ,—কোন দায় চিন্তা তার ছিল না। দিনমানে নৌকায় বসিয়া মানুষজন পার করাই তাহার কর্ম্ম ছিল। খেয়া দিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই হরির দিন গুজরাণ হইত। পয়সা জমাইবার চিন্তা তাহার ছিল না। পয়সা জমাইবার কথা উঠিলেই হরি গান ধরিত—

যখন ছিলাম মা'র উদরে
অন্ধকার ঘোর কারাগারে—(হায় রে)
তখন, আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে
কে আমায় বাঁচালে—

সুতরাং কেহ হরিকে আর সে প্রশ্ন করিত না। কেহ জিজ্ঞাসা করিত,—"ছ'মাস ছ'মাস বেয়ারাম হয়ে যদি পড়ে থাক"—হরি গায়িত,—

"এই হরিনাম নিদান ঔষধি
এতে, হরে কালভয় হবি পার, ভবজলধি।"

হরি খেয়া দিত, কেহ তাহাকে কড়ি দিত, কেহ পয়সা, আধ্‌লা দিত, কেহ ধান চাউলের বার্ষিক চুক্তি করিত। কেহ কেহ কড়ির কড়ার করিয়া পার হইত, পরে কড়ি দিত না, আবার আসিত, আবার পার হইত এবং কড়ি দিতে ভুলিয়া যাইত। এই দলের মধ্যে ভদ্রলোকেরই আধিক্য। দেশের ভদ্রলোকেরা যাহা পরিপাক করিতে পারেন, সাধারণে তাহা পারে না।

হরি অক্ষমের নিকট পয়সা লইত না। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব বা ভিক্ষুকের নিকট কখনো কড়ি চাহিত না। ইহারা পয়সা সাধিলে সসম্ভ্রমে জিভ কাটিত।

হরির বয়স চল্লিশের কিছু উপরে। তাহার বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, ভাবে ঢলঢল সরল মুখখানি, স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত আবৃত সুবিন্যস্ত কোঁকড়ান কেশদাম,

দেখিলে হরিকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। তাহার সরল সুমিষ্ট কথায় সবাই মুগ্ধ হইত। হরির সুমিষ্ট গলা ছিল,—অনেক সময়ই গান করিত, যে শুনিত, সেই আরো শুনিবার জন্ম দাঁড়াইত। হরি তাহা লক্ষ্য করিত না, হয় ত একটা বেশ জমাট গান—মধ্যখানেই শেষ করিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত। হাসিটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল।

হরি কাহাকেও উঁচু কথা কহিত না। পান বা তামাকের নেশা তাহার ছিল না। হরির কোন শত্রু ছিল একথা কেহ বলে না। সে সুখ দুঃখেরও ধার বড় ধারিত না। বাজে কথায়, বাজে দরবারে, তাহাকে কদাচিত পাওয়া যাইত। সমাজের বিচার, পঞ্চায়েতী কারবার, নিষ্কর্ম্মার তর্ক, গাঁয়ের সই সালিশীর ছায়ায়ও হরি পা দিত না। সে নৌকায় বসিয়া গান গায়িত,—

বাহাত্তর বছরের পাড়ি,
বেলা আছে দণ্ড চারি,
কেমনে হইবে পার (মন আমার)

কখনো বা বৈঠায় মাথা রাখিয়া অলস বিহ্বলে গায়িত,—

দিন যাবে দিন রবে না,
দীনের দিন যাইবে হরি,
রবে কেবল ঘোষণা।

কোনদিন বা হরি ভরসার সুরে গায়িত—

এ ভব সাগর, হবে বালুচর
হাটিয়া হইব পার (নামের গুণে)।

(২)

মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণদাস বাবাজী হরির নৌকায় পার হইয়া যাইতেন। বাবাজীর উপর হরির অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি নৌকায় আসিলে হরি নিজের আঁচল দিয়া খানিকটা জায়গা ঝাড়িয়া তাঁহাকে বসাইত। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিত,—"প্রভু একটু দয়া করতে হচ্ছে।" বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া সুললিত কণ্ঠে কৃষ্ণ নাম বিতরণ করিতেন,—হরি হাঁ করিয়া শুনিত। তাহার চক্ষু দিয়া ঝরঝর ধারে জল পড়িত। কোনদিন বাবাজী গায়িতেন,—

"তারা, কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল।

দিয়া, মায়া বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে

. .

দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।"

জীবন চক্রবর্ত্তী নৌকায় ছিলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, কি বাবাজী "হরি ছেড়ে যে তারা বুলি—"

সহাস্যে বাবাজী কহিলেন—সবই এক রে বাবা—সবই এক। মহাপুরুষ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বলে গেছেন—

"কালী কৃষ্ণ শিব রাম সবাই আমার এলোকেশী
মন করো না দ্বেষাদ্বেষী
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।"

ভেদজ্ঞান ছেড়ে দাও বাবা!

বাবাজী গান ধরিলেন—

দূরে যাবে সব ভেদাভেদ
ঘুচে যাবে মনের খেদ
শত শত শত বেদ, তা'রা আমার নিরাকারা।"

চক্রবর্ত্তী কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

(৩)

বাগদীদের অনেকই ছিল গরীব। তারা হাট বাজারে দোকান লইয়া যাইত। পাড়ার বৌঝিদের মধ্যে যাদের বয়স একটু বেশী তারা বেসাতি লইয়া গাঁয়ে যাইত। এ রীতি এখনো এ দেশে আছে। তখন একটু বেশী ছিল। বেশী রকম ঠেকায় পড়িলে সোমত্ত মেয়েরাও গাঁ করিত। তখন দেশে আইনের কড়াকড় না থাকিলেও মানুষের দেহে প্রচুর শক্তি ছিল, দৃষ্টি সরল ছিল, ধর্ম্মের দিকে একটিবার চাহিয়া সকলেই কাজ করিত। তখন পাপের শাসন ছিল বেজায় কড়া আর ধর্ম্ম ছিলেন সহস্র চক্ষু। মানুষ ছোট বড় সবাই ধর্ম্ম আর পাপ দুটার ভয়ে তটস্থ থাকিত। রাস্তা ঘাটে মেয়েদের মর্য্যাদা সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

তখন মেয়েরা আবশ্যক মত গাঁয়ের হাটেও বেসাতি লইয়া যাইত। একধারে একটু পাশ কাটিয়া একটু জড় সড় হইয়া তাহারা বসিত। সেখানে ক্রেতারা প্রয়োজন মত যাইত ভিড় করিত না। সকলেই একটু সমীহ করিয়া চলিত।

যে সব মেয়েরা বেসাতি লইয়া ওপারে যাইত, তারা একটু সকাল সকাল আহারাদি করিয়া দিনমানের জন্ম বাহির হইত। হরি তাহাদিগকে পার করিয়া দিত। আপন জ্ঞাতি গোষ্ঠী স্বজনের নিকট সে পারের কড়ি লইত না।

মেয়েরা সন্ধার আগেই ফিরিয়া আসিত। হরি তাহাদিগকে পার করিয়া আনিত। পটলি আসিত সকলের পরে, সে তার আয়ীকে সঙ্গে লইয়া যাইত প্রহরী-স্বরূপ। তার ভরা যৌবন ফুটন্ত চাঁপার রূপ তাহার একাকী যাওয়া ভাল বোধ হইত না। বুড়ী বেশী হাটিতে মজবুত ছিল না, কাজেই গাঁ ঘুরিয়া আসিতে পটলির বিলম্ব হইয়া যাইত। সন্ধ্যার সূর্য্য যখন আধখানা নদীর ঐ পশ্চিমের মাথায় ডুবিয়া যাইত, তখন পটলি নদীর তীরে দাঁড়াইয়া মধুর কণ্ঠে গায়িত—

"হরি, দিন ত গেল সন্ধ্যা হলো—
পার কর আমারে—"

হরি পটলিকে পার করিয়া আনিত। পটলি নৌকায় পশরা নামাইয়া গায়িত—

"আমি দীন ভিখারী, নাই গো কড়ি
দেখ ঝোলা ঝেড়ে।"

হরি স্মিতমুখে কহিত, পটলি, তোরা যে আমার নায়ে পার হয়ে দুটা পয়সা করিস্ এই আমার পুণ্যি। এই আমার বাপ দাদার আশীর্ব্বাদ। আমি কড়ি চাই না—দরকার কি? তারপর গুণ্ গুণ্ স্বরে গাইল—

"সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।"

পাড়ে আসিয়া পটলি হাত মুখ ধুইত। হরি নৌকা বাঁধিয়া লগী বৈঠা ঘাড়ে তুলিয়া দাঁড়াইত। পটলি ছিল তার শেষ পারের যাত্রী। পটলিকে সন্ধ্যাবেলা একাকী নদীর ঘাটে ফেলিয়া যাওয়া হরি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিত না। কারণ তাহার শুনা ছিল "সন্ধ্যার বাতাসে ভর করিয়া নানা দুষ্ট জিন পরী ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই-ইত ভদ্রলোকের মেয়েদের হিষ্টিরিয়ার বেরাম হয়।"

হরি পথে গায়িত—

"তারা কোন অপরাধে এদীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল।

(৪)

পাড়ার গণেশ আসিয়া ডাকিল— 'হরিদা—ও হরিদা—কি কর—"বলিতে বলিতে সে আঙ্গিনায় উঠিয়া আসিল।

হরি তখন তুলসী তলায় ধূপ দীপ দিয়া একমনে নাম জপিতে ছিল,—কোন উত্তর দিল না। গণেশ আসিয়া তুলসী তলায় গড় করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিল।

আপন কার্য্য শেষ করিয়া হরি গণেশকে লইয়া ঘরে গিয়া বসিল।

গণেশ কহিল "এখন কি করবে দাদা ?"

"কি আর করব—তুমি বস খানিকটা গল্প গুজব করি বা কীর্ত্তন গাই। রামায়ণটাও পড়তে পারি। তার পর যদি মন বোচে চাট্টি চাল চড়াব—আর মালসী গাইব।"

"আচ্ছা দাদা, তুমি নিত্যি দিন রেঁধে খাও—একটা বিয়ে কর না কেন ?"

"দরকার কি ?"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গণেশ কহিল—"বল কি দাদা, বিয়ের দরকার নাই ?—আশ্চর্য্য করে দিয়েছ কিন্তু। আচ্ছা একটীবার ভেবে দেখেছ ?"

"ভাবি নি—ভাববার মতন কারণও পড়ে নি।"

"আশ্চর্য্য কথা বটে—কোন দিন এটা ভাব নি ?"

"একবার ভেবেছিলাম পনর বচ্ছর আগে—যখন মা ছিলেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে একবার কথাটা মনে উঠেছিল। সহসা মা চলে গেলেন,—কথাটাও পাথর চাপা রইল। আর মনেও উঠে নি।"

"যাক্—একটীবার ভেবে দেখ না কেন ?"

"কেন ভাই। সখ করে জীবন ভরা একটা নীরস গোলামীর চেয়ে স্বাধীন বন বিহঙ্গের মত গেয়ে দিন কাটিয়ে দিই—এটা কি বেশীবাঞ্ছনীয় নয় ?"

"এই গোলামী স্বীকার ক'রেই ত দুনিয়ার জীব বিয়ে করে আসছে—তাই রীতি।"

"তা দেখেই আমার হুঁস হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা দাদা, বিয়ে না কর—দেখে শুনে একটা কণ্ঠি বদল টদল করে নাওনা।—রাঁধা বাড়ার হেঙ্গামাটা একটু বাঁচবে।" গণেশ অনুকূল উত্তরের ভরসায় আশ্বস্ত ভাবে হরির মুখ চাহিল।

হরি তেমনই সরল উত্তর দিল—"ভায়া তোমার মতলব এই—যে একটা মুখবাঁধা বোঝা ঘাড়ে রাখ্‌তেই হবে—তা সেটা সোনায় ভর্ত্তিই হউক আর মাটী ভরাই হোক—এই ত ?"

"তবে মেয়ে মানুষ জন্মায় কেন ?"

'অত ভাবি নি দাদা। আমি আমার বিবেচনায় যা আসে— তেমনই ভাবে কাজ করি—যুক্তি তর্কের ধারেও যাই না ; কারণ সেটা আমার ধাতে সয় না।"

"আচ্ছা দাদা, তোমার রামচন্দ্রজী ত সীতাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন।" বিজয়ী বীরের মত গণেশ হরির মুখে দৃষ্টি সংযোগ করিল।

হরি দিব্যি সহজ স্বরে কহিল—"তাই ত প্রভুর আমার জীবনভরা চক্ষের জল শুকাল না। তাঁর জীবনে কি দুঃখের ওর ছিল রে ভাই ?"

গণেশ হতাশ ভাবে কহিল—"নিত্যি দিন রাঁধা, দুঃখু হয় না ?"

গণেশের কথা শুনিয়া হরি হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—"মেয়েরাও ত রাঁধে।"

গণেশ দুই ঘাট চড়াইয়া কহিল—"মেয়েদের ত সয়—ওইই ত ওদের কাজ। কথায় বলে মেয়ে জন্ম।"

হরি ততক্ষণ গান ধরিয়াছে—

"দিয়ে মায়াবেড়ী পদে ফেলেছ বিপদে"

গণেশ মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

(৫)

নিঝুম দুপুর বেলা, মাঠে মানুষ নাই। পশুপক্ষী পাতার আড়ে চুপ—বাহিরে রৌদ্র অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। এ হেন সময় হরি ভাত চড়াইয়া গান ধরিয়াছে—

"প্রাতঃকালে উঠি কতই যে মা খাটী
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল—".

দুয়ারে দাঁড়াইয়া পটলি জিজ্ঞাসা করিল—"কি গেরস্ত, এখনো খাও নাই ?"

"এই হলো আর কি।"

পটলি সহানুভূতির স্বরে কহিল, এই ভয়ানক গরম, সাম্‌নে আগুন—বাইরে মাটীপোড়া রোদ—এত কষ্ট কি পুরুষের সয় ?"

হরি বিস্ময়ের সহিত কহিল—"বলিস্ কি পটলি—আজ খুব গরম বুঝি,—ইস্ সত্যিই ত গা-ময়, ঘাম ঝরুছে।—তা এ সময় রাঁধতে পুরুষের যা কষ্ট মেয়েদেরও ঠিক তেমনি হয়,—না ?" এই বলিয়া হরি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পটুলির নিটোল গাল দুখানি রাঙা হইয়া উঠিল। সে সামলাইয়া লইয়া কহিল, মেয়েদের ওসব সয়। কারণ মেয়েদের ত এই কাজ। হরি ততক্ষণ ভাতে কাঠি দিয়া ভাত টিপিতে টিপিতে গান ধরিয়াছে,—

"আর, বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই

ফণী ধরে খাই হলাহল।"

পটুলি দরজার পাশে পিঠ ঠেকাইয়া এক দৃষ্টিতে হরির ভাতরাঁধা দেখিতেছিল।

হরি একখানা কাল পাথরের থালায় ভাতগুলি ঢালিয়া লইল। পটুলি গালে হাত দিয়া কহিল, "একি করেছ,—মাথা না মুণ্ডু। কতকগুলা পুড়ে গেছে কতক গলে গেছে, আর কতকগুলা আধা চাউল। এ নাকি মানুষে খায়?"

প্রসন্ন দৃষ্টিতে পটলির মুখের দিকে চাহিয়া সহজ স্বরে হরি কহিল—"পেটে আগুন থাকলে সব হজম হয় পটুলি। আর আমার নিত্যি দিন খেয়ে এ রকমটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।"

"তরকারী কি রাঁধবে!"

"আজ একটু নুন আর তেল মেখেই এইগুলো উঠাব।"

আবার সেই হাসি হাসিয়া হরি বাম হস্তে তেলের তাড়ি নামাইয়া লইল।

পটুলি কহিল "তুমি বারান্দায় বাতাসে একটু বসো, আমি এক লহমার মধ্যে খানিকটা তরকারী রেঁধে দিই।" পটুলি দু পা অগ্রসর হইয়া আসিল।

হরি ততক্ষণ ভাতের উপর টাটকা তেল খানিকটা ঢালিয়া নুন লঙ্কা মাখিতে আরম্ভ করিল এবং আনন্দিত মনে বিল্ব প্রমাণ গ্রাস মুখে তুলিয়া দিল।

পটুলি বিরক্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

(৬)

তখনো ফরসা হয় নাই। হরি বিছানায় শুইয়া "রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায়" ইত্যাদি আবৃত্তি করিতেছিল। সহসা বাহিরে পটুলি খুব তাড়ার কণ্ঠে ডাকিল—"ও গেরস্ত, গেরস্ত—ওঠো দিকিন শীগ্‌গীর।"

"কে, পটুলি?"—রঘুনাথায় নাথায়—

"আরে ওঠোই শীগ্‌গীর! জমিদার বাবুদের বাড়ীর ছোট বউর বায়না আছে, এক্ষুণি যেতে হবে—ওঠো শীগ্‌গীর!

"উঠি—দাঁড়া—" "রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং" পাঠ করিয়া হরি ধীরে সুস্থে দরজা খুলিল। পটুলি ততক্ষণ গুণ্‌গুণ্ স্বরে গাইতে ছিল—

"তুমি পারের কর্ত্তা জেনে বার্ত্তা
ডাকি হে তোমারে।"

"কি পটুলি এত ভোরে বেসাতি মাথায় চল্লি কোন দিকে ?"

"রায় বাবুদের ছোট বউ যাবেন বাপের বাড়ী। তাঁর ফরমাসি জিনিষগুলি আজই দেবার কথা—তিনি তাড়া দিয়েছেন—তাই।"

"তিন মাইল পথ এই সকাল বেলা যাবি, তোর ঝি কোথা রে ?"

"সে খেয়া ঘাটে গিয়ে বসে আছে, চল গীগ্‌গীর।"

হরি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া তুলসী তলা লেপিয়া ফেলিল। তারপর একটু ধুপ জ্বালাইয়া তুলসী প্রণাম করিয়া লগী বৈঠা ঘাড়ে লইল। পটুলি আগে আগে গুণগুণ গাইতে গাইতে চলিল—"বড় দয়ার আধার সে কর্ণধার পারের কড়ি চায় না।"

হরি খাইতে বসিয়াছে—দুপুর উৎরে যায়—সহসা পটুলি আসিয়া দাওয়ায় উঠিল। ভিজা কাপড়,—অঞ্চল কোমরে জড়ানো। পিঠে দীর্ঘ কেশদাম বাহিয়া জল ঝরিতেছে। পটুলি কাঁপিতেছিল।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র হইয়া হরি জিজ্ঞাসা করিল, পটুলি নৌকা ও-পাড়ে যে—"তুই এলি কি করে ?"

"সাঁতার কেটে এসেছি।"

ভয়ে বিস্ময়ে হরির গলা অবধি কাঠ হইয়া গেল। স্ফীত নদী সাঁতারে পার হইতে সাহস করে, হরি ছাড়া তেমন ব্যক্তি ত এ তল্লাটে কেউ নাই। "পটুলি ভাগ্যিস্ ডুবে মরিস্ নি।"

ডুবে মরার পথেই গিয়েছিলাম। প্রায় আধমাইল ভাঁটিতে উঠেছি। মর্লেও দুঃখ যেতো না। তোমাকে বলতে বেঁচে এসেছি।"

"এর অর্থ কি পটুলি ! হয়েছে কি ?"

"আমি বাঘের মুখে পড়েছিলাম। দিন রাতের কর্ত্তা, ধর্ম্মের মালীক ঠাকুর আমায় রক্ষা করেছেন। তুমি এখন বিবাহ কর—

"ব্যাপার খানা কি পটুলি বাঘ কোথায়।" হরির হাত ভাতেই সংযুক্ত রহিল। তাহার খাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

"শোন। আজ ক'দিন থেকে রায়দের বাড়ীর ঝি মেথার মা আমার জিনিস পত্রের ঘনঘন ফরমাস দেয়"। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝি নি। ছোটবাবু এসে আমার সামনে দাঁড়ান, দর কসাকসি করেন। আজ ছোটবাবুকে দেখিনি।

মেঘার মা অনেক বলেকয়ে আমায় তার বাড়ী নিয়ে যায়। সেখানে বলে ছোটবাবু নাকি আমার জন্য"—পটলি আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল সে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরির চক্ষু গরম হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "তারপর তারপর"—

চক্ষু মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় পটলি কহিল "আমি ভাবলাম বড়লোকের বাড়ীর কথা—বিপদ ঘটতে বেশী সময় লাগবে না। তাই তাড়াতাড়ি মেঘার মার বাড়ী ছেড়ে চলে এলাম। কদমতলার জঙ্গলের ধারে এসে দেখি ছোটবাবুর ঘোড়া নিয়ে একজন দাঁড়ালো। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি সেই পথ ছেড়ে সাহাপুরের পথ ধরলাম। হঠাৎ চেয়ে দিখি জঙ্গলের ধারে ছোটবাবু আর দুটা পেয়াদা। বাবুর হাতে বন্দুক। আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাচ্ছেন। পেয়াদা দুটা আমার দিকে আসতে লাগল। আমি তখনি প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে নদীতীরে এসেছি। আমার জ্ঞান ছিল না। জানি না কোথায় সেই বেসাতি কোথায় বুড়ীটা।"

হরি গর্জন করিয়া কহিল "দেশে এ পাপও ঢুকেছে—উচ্ছন্ন যাবেরে সব উচ্ছন্ন যাবে। এ পাপ ত হুনিয়া সয় না। হাঁ—তারপর?"

"তারপর নদীতে পড়ে সাঁতার কেটে এসেছি। ভাবলাম তোমায় ব'লে এর বিচার করাব। আমি জানি তুমি লাঠী ধরলে এ দেশে এমন লেঠেল নাই যে এসে সামনে দাঁড়ায়। তুমি যাও—ইতরের বিচার কর।"

হরি উঠিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্ক ভাবে পাতের ভাতগুলি কুকুরের সামনে ফেলিয়া দিয়া আঁচাইতে গেল। একাকী কি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল মধ্যে মধ্যে "ছোটবাবু বড় পাপ—সাবধান" শোনা গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া—লগী বৈঠা লইয়া হরি নৌকায় গেল। তাহার মেজাজ ক্রমে একটু নরম হইয়া আসিল। অপরাহ্ন হরি বৈঠায় মাথা রাখিয়া অলস কণ্ঠে গাহিল,

"হরি তুমি বিচারের মালাক
আমি শুধু দেখব লীলাখেলা।"

পরদিন পটলী যখন জিজ্ঞাসা করিল—"কি করলে তবে ঐ পশুটার বিচারের?"

"কি আর করব?"

"একদিন রাতে কেন ওর বাড়ী লুটকরে মাথা ভেঙ্গে দাও না। না হয় যেমন তোমার মতলব ঠাহর হয় তাই কর।"

"আমি কেন পটলি বিচার করে নিজে আর একজনের বিচারের অধীন হতে যাব? বিচার কর্ত্তা ভগবান ছোটবাবুর বিচার কর্ব্বেন—তিনি অতবড় রাজ্যেশ্বর—রাবণের পর্য্যন্ত বিচার করেছিলেন।"

(৭)

পাড়ায় গুরুদেব আসিয়াছেন। বিকাল বেলায় বাগ্দীরা মেয়ে পুরুষে জমায়েৎ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে কত কাহিনী শুনে। রাম রাবণের কথা, রাধাকৃষ্ণের বৃত্তান্ত, অভিমন্যুর বীরত্ব—কত গল্প তাহারা শুনিয়া আনন্দ ও পুণ্য লাভ করে। বাগ্দীরা প্রায় সবাই নিরক্ষর। দুই একজন মাত্র ছেলে বেলায় বাবাজী ঠাকুরের আখড়ায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে হরিই ছিল সেরা পড়ো। সে রামায়ণ পর্য্যন্ত সুরকরিয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু নদী পার হইতে লোকের দুঃখ দেখিয়া হরি প্রায় সারাদিন নৌকায় কাটাইত। কাজেই তাহার মুখে রামায়ণ শোনা কদাচিৎ ভাগ্যে ঘটিত, গুরুদেব আসায় পাড়ার পিপাসু নরনারী কত পুণ্যকাহিনী শুনিতে পাইতেছে। তাহাদের আনন্দের আর অন্ত নাই।

সেদিন সকালবেলা পরাণমণ্ডলের আঙ্গিনায় সকলেই গুরুদেবের "ছিচরণ" দর্শন করিতে সমবেত হইয়াছে। পুরুষরা গুরুদেবের সম্মুখে ঘাসের উপর বসিয়াছে, মেয়েরা কেহ রোয়াকে, কেহ বেড়ার সামনে বা পাশে দাঁড়াইয়া আছে। এদের তেমন আব্রুর আটকা নাই। ঘরের মেয়েরা পুরুষদের অনতিদূরেই বসিয়া পুণ্যকথা শুনিবার জন্য আকিঞ্চন করিতেছে।

এমন সময় হরি ভূমিষ্ট হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

"কে, হরি। এসো এসো বসো, তা ঘর সংসার করেছ—না তেমনই আছ?'

নাথু সর্দ্দার কহিল আজ্ঞে কর্ত্তা ঐ আমাগোর দুঃখ। গাঁয়ের মাঝে ঐ একটা মানুষ, তার কি দুর্ম্মতি হলো, বিয়েথা কর্লে না, তবে কর্ত্তা, ধূলো দিয়েছেন আপনাগোর আজ্ঞা কেউ না শুনে ত পার্ব্বে না—"

গুরুঠাকুর হরিকে ঘর সংসার করিতে আদেশ দিলেন, ভাল পাত্রী দেখার ভার পাড়ার "মাথা উচা" সর্দ্দারগণ গ্রহণ করিল। কিন্তু হরি যোড় হাতে মিনতির সুরে কহিল "দোহাই কর্ত্তার শ্রীচরণের। আমি বেশ আছি, আমার সুখ

শান্তি নষ্ট কর্‌বার আজ্ঞা কর্‌বেন না। আমায় দুঃখের বোঝা বইবার মুটে বানাবেন না। আমি বিয়ে কর্ত্তে পার্‌ব না স্পষ্ট বলে দিলাম কর্ত্তা দোহাই।”

পাড়ার মেয়ে পুরুষ অনেকেই হৈ চৈ করিয়া উঠিল। আ সর্ব্বনাশ গুরুবাক্য।

হরি সকলকেই মিনতি জানাইল। গুরুর পায়ে কত নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ তাহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিল না। ঠাকুর আজ্ঞা করিলেন “চতুর্থ দিনে বিবাহের লগ্ন আছে, তোমরা মেয়ে দেখ, আমি বিবাহ দিয়ে তবে যাব।” সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

হরি অগত্যা রুখিয়া দাঁড়াইল। সে দৃঢ়স্বরে কহিল “সেকি কথা। আমার স্বাধীনতার ভার তোমরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছ কেন গো। আমি স্বয়ং রামচন্দ্রজীর হুকুমেও আমার কথার অন্যথা কর্‌তে রাজী নই—”

গুরুদেব কয়েকধাপ নামিয়া হরিকে বিবাহের আবশ্যকতা বুঝাইতে লাগিলেন। এমন সময় পাড়ার একদল মেয়ে বৌ ঝি আসিয়া ঠাকুরের পায়ে গড় করিয়া তফাৎ দাঁড়াইল। এই দলে ছিল পটলি।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন এই বিধবা মেয়েটী কার রে—

ভোলা যোড় হাতে নিবেদন করিল—“কর্ত্তা এটী পরাণমণ্ডলের মেয়ে। দশ বছরে নগাঁয়ের সাধু সর্দ্দারের ছেলে মাধুর সাথে ওর বিয়ে হয়, ছুমাস না যেতে যেতেই তার কপাল পুড়ে গেল। আজ আট বছর ধরে মেয়েটা—আঃ কি কষ্ট কর্ত্তা। মেয়েটা কন্তি বদলও কর্লে না আবার বিয়েও কর্লে না—”

গুরুজী আনন্দে কহিলেন, বেশ এক কাজ কর। দেখে শুনে মেয়েটীর বিয়ে দাও। তোমাদের ত বিধবার বিয়ে হচ্ছেই। আহা মেয়ে ত নয় যেন মা দুর্গা। রাজার ঘরে জন্মালে ঠিক হতো। আয় ত মা আমার কাছে—”

পটলি আবার আসিয়া গুরুদেবের পায়ে প্রণিপাত করিল। গুরুজী তাহাব মাথায় হাত দিয়া কহিলেন “মা ভগবানের কৃপায় তোর দুঃখ দূর হোক আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—”

পটলি নতমুখে দাঁড়াইয়া কাপড়ের যে স্থানটা হাতে উঠিল—তাহাই পাকাইতে লাগিল।

গুরুজী সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “ওহে একটা কাজ কেন কর না —হরির সঙ্গেই ত পটলির সম্বন্ধ হতে পারে। বাঃ বেশ হবে। সোণায় সোহাগা—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ! যেমন বর তেমনি মেয়ে।”

পটুলির মুখ কাণ লাল হইয়া উঠিল। সে ধীর পদক্ষেপে কোথায় সরিয়া গেল। উপস্থিত জনগণ একবাক্যে গুরুজীর প্রস্তাব সমর্থন করিল। পরাণ মণ্ডলকে গুরুজী মত জিজ্ঞাসা করিলেন। পরাণ জোড়হাতে কহিল "—কর্ত্তা, হরি আমার ছেলের মত! তাকে মেয়ে দিতে আর কথা কি? আপনি দিন করুন,—আমি হরিকে মেয়ে দিব। কেমন হরি -"

হরি যে কোন সময় উদ্দেশে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহ জানে না।

(৮)

সেদিন সবাই নিত্যকার মত বেসাতি লইয়া গ্রামে গেল। গেল না কেবল পটুলি। তার মনটা আজ ভাল ছিল না, সে তার সুইয়ের ঘরে মটকা মারিয়া পড়িয়া রহিল।

গুরুদেব বাড়ী ফিরিবার পথে হরির নৌকায় অনেকক্ষণ বসিলেন। হরিকে বিবাহ করার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন। কহিলেন,—"বাপু, তোমরা শিষ্য—তোমরাই আমাদের ভরসা। তোমরাই আমাদের সম্পত্তি তোমরা বিয়ে কর্লে দুটা পয়সা আমাদের হয়—তোমাদের বংশ থাকলে আমাদের আশা—বুঝলে বাপু—"

হরি মাথা নোয়াইয়া নৌকা বাহিতেছিল। তাহার মুখ অপ্রসন্ন। ঠাকুরজী অপর পারে গিয়াও নৌকায় বসিয়া হরিকে বৃথা সাধ্য সাধনা করিতেছেন। এমন সময় কৃষ্ণদাস বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গান ধরিলেন—

"বৃন্দাবনের ধুলোয় কবে গড়াগড়ি দিব—
ব্রজের রজে লেপি অঙ্গ
যমের আশা করব ভঙ্গ
শ্যাম ত্রিভঙ্গে দিবানিশি মহানন্দে নেহারিব।"

হরি কহিল—কর্ত্তা ও পারে লোক দাঁড়াইয়া—ওঁকে পার কর্ত্তে হবে।

অগত্যা গুরুজী নামিয়া গেলেন। হরি যেন অন্ধকার কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্তির আনন্দে নিশ্বাস ফেলিল।

বাবাজী নৌকায় উঠিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"পরে হবে রে ঘোর অন্ধকার
আয় কে যাবি ভব নদীর পার—

ওরে দিন থাকিতে চল সে পথে
করিগে পারের যোগাড়”

হরি কথা কহিল না—বাবাজী পার হইয়া গেলেন।

পটুলি দুই চার বার জল লইতে আসিয়াছিল, বড় অন্তমনস্ক। কাহারো সহিত কথাটীও কহে নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিল,—হরি আজ দুপুরে বাড়ী যায় নাই,—রাঁধাবাড়া হয় নাই,—সুতরাং আহারাদিও ঘটে নাই। পটুলির গা জ্বালা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় হরি বাড়ী গিয়া তুলসীতলার কাজ সারিয়া দীপ নিবাইল। পটুলি তাহার সই তুফানীর ঘরে বসিয়া দেখিল হরির ঘরে আলো নেই। তখন সে সইকে ধরিয়া পড়িল—“সই, মানুষটা সারাদিন উপোসী—বোধ হয় কিছু খাবে না। তুই যা কিছু খাবার দিয়ে আয় না।”

তুফানী সকালবেলার ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল,—সে পটুলির গাল টিপিয়া দিয়া কহিল—“ইস্ ভারী দরদ দেখছি যে। কথায় বলে যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।”

পটুলি তুফানীকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল—“তুই মর্ - পাঁদী।”

“তাতে তোর লাভ লোকসান কি? আর আমি মলে তোর মনের ঠাকুরকে খাবার দিয়ে আস্‌বে কে?”

“যাঃ—”

“যাব—যাব—যাব—ত্রিসত্যি কর্লাম। বাপরে—একটু তর সইছে না। যাব ত, কিন্তু ওবে খাবে তার প্রমাণ? খাবারই বা কি নিয়ে যাব?”

“তোর ঘরে চিড়ে টিড়ে নেই কি”

“হাঁ, চিড়ে আছে আর একছড়া মোটা কলা আছে—তাই নিয়ে যাই। কিন্তু খাবে কি?”

“গিয়ে বলিস—“ওগো তোমার তুলসী দেবতার মানস এনেছি—নিবেদন করে দাও।” নিবেদন হয়ে গেলে বলো “প্রসাদ লও,—সে ফেল্‌তে পারবে না।”

তুফানী কলসী হইতে চিড়া বাহির করিতে করিতে কহিল” তোর এত বুদ্ধিও যোগায়? আচ্ছা সই চল্ না, তুইও যাবি।”

“না, আমি ওদের বাড়ী রাতকাল কেন যাব? তুই যা। আমায় হয় ত এক্ষুণি মা ডাক্‌বে।”

তুফানী সের তিনেক চিড়া আর গণ্ডা পাঁচেক কলা লইয়া হরির আঙিনায় গিয়া ডাকিল—"দাদা ও দাদা— ঘুমিয়েছ না কি ?"

"কে রে—তুফানী ?" হরির স্বর একটু ভার ভার।

"হাঁ দাদা, প্রদীপটা জ্বাল ত দেখি।"

"কেন রে ?"

"আর কেন ? আজ তোমার তুলসী তলায় কিছু মানত ছিল,—সেটা ভুলেই গেছিলাম। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখ্‌লাম কি—ইস্‌ এখনো গা কাঁটা দিয়ে উঠে—"

হরি চক্‌মকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া বাহিরে আসিল। তুফাণী তুলসী তলায় চিড়া কলা রাখিয়া উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

হরি নিবেদন করিলে তুফাণী এক চিম্‌টী চিড়া কপালে ছোঁয়াইয়া কহিল "দাদা, তুমি তুলসীর প্রসাদ গ্রহণ কর,—আমি চল্লাম।"

"তুফাণী—তুফাণী—"তুফাণী তত্‌ক্ষণ ঘরে চলিয়া গিয়াছে। পটুলিও ঘরে গিয়া নিশ্চিন্তে শয়ন করিল।

(৯)

পরদিনও বেলা আড়াই প্রহর উৎরে গেল, হরি ঘাটে নৌকায় বসিয়া ভাঙ্গা সুরে টানিতেছে—

"আর কি ছার মায়া কাঞ্চন কায়া ত রবে না"

পটুলি দু'দিন বেসাতি নিয়া গাঁয় যায় নাই,—তার শরীর নাকি ভাল নয়। কিন্তু দশবার ঘাটে জল নিতে আসিয়াছে। হরির মধুর কণ্ঠ আজ ধরা ধরা— শুনিয়া পটুলির কষ্ট হইল। খানিক এদিক সেদিক করিয়া দু একবার কাশিয়া পটুলি কহিল—"বলি আজ কি খাওয়া দাওয়া নাই,—বেলা যে যায়।"

"বেলা যায় ?—অ্যাঁ—কি বল্‌লি পটলি বেলা যায় ? এতক্ষণ আমায় হুঁস ছিল না - তুই বড় সময় মত এসেছিস্‌—হাঁ আমিও তৈরি হয়ে নি—বেলা যায় এ খেয়াল ত আমার ছিল না—। এখুনি যাচ্ছি—কি করতে পারি দেখি গিয়ে !"

পটুলি কথাগুলা শুনিয়া অপ্রসন্ন মুখে চলিয়া গেল। হরি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল,—যাহারা পারে গিয়াছে, তাহাদের আবার আনিতে হইবে ত ?

পটুলি সন্ধ্যা বেলায় জল নিতে আসিয়া শুনিল, হরি গলা ছাড়িয়া গাহিতেছিল—

"দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন,
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন"

পটুলি কলসীতে জল লইতে লইতে কহিল,—"বাড়ী যাবে না ?"

"হাঁ—যাব—" হরি ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া তীরে উঠিল। পটলি আগে আগে যাইতেছিল—সে শুনিতে পাইল হরি উচ্চ কণ্ঠে গাহিতেছ,—

"আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে না দেখ তায়—
ভুলিয়ে মোহমায়ায়—হারায়েছ—তত্ত্বজ্ঞান।"

পটলি আঙুল মটকাইয়া আপন মনে কহিতে লাগিল ঐ মড়া বাবাজীটা এই সব বাজে গান শিখায়। যত কুজ্ঞান—ঐ মড়ারই পরামর্শ।

রাত্রিতে হরি পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ী বেড়াইয়া গল্প করিয়া আসিল। গণেশ কহিল—"হরিদা আজ ত তোমার সেই হাসিটা দেখ্‌ছি না।" হরি কোন উত্তর দিল না।

পরদিন সকালে সকলেই শুনিল হরি গৃহত্যাগ করিয়াছে। তাহার দরজার বেড়ায় একখণ্ড কাগজ পাওয়া গেল, মোটা মোটা হরপে লিখিয়া হরি তাহার যা কিছু গুরুদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছে।

পটুলি তুফানীর বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল দেখিয়া তুফানী বড় উপদ্রব আরম্ভ করিল। পটলি ঠোঁট উল্টাইয়া ভাঙ্গাস্বরে কহিল মড়া বৃন্দাবনে গেছে ঠিক। আর যেন কারো সেখানো যাবার সাধ হ'তে নাই। মড়া যাবি ত আর যে যে যেতে চায় তাদের নিয়েই যা—

ক্রমে প্রকাশ পাইল হরি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছে। শুনিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী গান ধরিলেন,—

"আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
যারা, পিছে এল আগে গেল, আমি রৈলাম পড়ে।"

(১০)

কৃষ্ণদাস বাবাজী আর গুরুজীর সঙ্গে গাঁয়ের অনেক স্ত্রী পুরুষ বৃন্দাবনে চলিয়াছে। নকড়ি, ভোলা, পরাণ, সাধুর মা, গুর্ম্মি, তুফানী,—পটুলি সবাই বৃন্দাবনের পথে। কৃষ্ণদাস বাবাজী মনের আনন্দে মধুর হরি নামকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন। রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অসংখ্য যাত্রী বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছে।

যমুনার তীরে তীরে অগণিত চটী নির্ম্মিত হইয়াছে। যাত্রীরা—সেই সকল চটীতে বাসা করিয়া রহিয়াছে। স্নান, দান, গান, গল্প কোলাহলের অবধি নাই।

বিকাল বেলা পটুলি আর তুফানী এই সকল চটীর যাত্রীদিগের মধ্যে বেড়াইতেছিল। তুফানী নানা গল্প হাস্য পরিহাস করিয়া পটলিকে মধ্যে মধ্যে চিম্‌টী কাটা কথাও বলিতেছিল। পটুলি একটু চিন্তান্বিতা একটু গম্ভীর। তুফানী কহিল—"সে বৃন্দাবনে কোথাও আছে, এসেছে আট দশদিন আগে,—"

"ওগো ওদিকে যেওনা—ওলাউঠা গো—নিশ্চয় ওলাউঠা! আহা কোন্ অভাগীর পুত গো, না জানি কোন অভাগীর সোয়ামী! অমন সোনার বরণ যেন কেমন হয়ে গেছে!—সঙ্গে কেউ নেই গো—"

পটুলি কাণ পাতিয়া কথাগুলা শুনিল। তার বুকের হাড়গুলি যেন খড়্ খড়্ করিয়া নড়িয়া উঠিল—দম আট্‌কিয়া আসিল। তার ইচ্ছা হইল,—তুফানীর সঙ্গ ছাড়িয়া একবার লোকটাকে দেখিয়া আসে।

সেই জনসমুদ্রের মধ্যে পটুলির আশাপূর্ণ হতে বিলম্ব হইল না। সে কোমরে আঁচল জড়াইয়া—আকুল আগ্রহে সেই কলেরাক্রান্ত রোগীর চটীতে প্রবেশ করিল। তখন রোগী অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া আছে, পটুলি বাহুবেষ্টনে আপন বুক বাঁধিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল হরি।

বড় যোগাড় যন্ত্র করিয়া পটুলি গুটী ত্রিশেক টাকা সঙ্গে আনিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া একটা খাটুলী আর একজন চিকিৎসক সংগ্রহ করিয়া আনিল। তারপর অনন্যকর্ম্মা হইয়া রোগীর শুশ্রূষা আরম্ভ করিয়া দিল।

এদিকে চটীতে চটীতে কলেরা লাগিল। কে কার সন্ধান লয়। পটলি রোগীর ঘরে বসিয়া আছে। পরাণ বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে না পাইয়া আছাড় পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর সকলে দেশে যাত্রা করিল। তুফানী দেশে গিয়া কহিল—যে ভয়ানক মারী লেগেছিল ওর মধ্যেই পটুলি মরে গেছে।

হরি আরোগ্য লাভ করিল। কে তাহাকে যমের দুয়ার হইতে টানিয়া আনিয়াছে,—তাহা সে জানিল না। কে তাহাকে বৃন্দাবনে, এই কোঠায় এই বিছানায় আনিয়াছে, কে তাহাকে পথ্য দিতেছে—কিছুই জানিল না। একটা কথা শুধু তাহার মনে পড়ে,—কে যেন তাহার মরণশয্যার পাশে বসিয়া মধুর কণ্ঠে কহিত "শ্যাম ত্রিভঙ্গ না দেখে তুমি মরবে না।" সেই কণ্ঠ যেন পটলির।

(১১)

"বাবাজী! ও বাবাজী!"

"কা'কে ডাকছেন?"

"আপনাকে।"

"আমাকে? আমি ত বাবাজী নই – তাই উত্তর দিতে গৌণ করেছি। মাফ করবেন। কেন ডাক্‌ছেন আমাকে?"

"এই পার্শ্বের ঘরে একটী মেয়ে মানুষ রুগ্না - সে আপনাকে একটীবার দেখ্‌তে চায়।"

"আমাকে? আপনি ভুল করছেন বাবু।"

"ভুল করিনি গো—ভুল করিনি। উনি আপনাকেই ডাকছেন। আসুন একটীবার – লোকটা মরতে যাচ্ছে"—

"শ্রীহরি শ্রীহরি—দেখুন মহাশয়, আমায় মাপ করুন আমি যেতে পার্ব্ব না—আমায় ক্ষমা করবেন।"

"সাধু পুরুষ, আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু শ্যাম ত্রিভঙ্গ তোমায় ক্ষমা করবেন না। পথে চটীতে যখন বিসূচিকায় মৃত্যুর দুয়ারে গিয়েছিলে, তখন কে অনিদ্রায় অনাহারে, দিন রাত্রি তোমার শুশ্রূষা করেছিল? কার অর্থে তোমার ঔষধ পথ্য চলেছিল? কার অর্থে মানুষ তোমায় মাথায় করে এখানে এনে রেখেছে? কার অর্থে এখানে তোমার খরচ চল্‌ছে? সাধু পুরুষ, অনিয়মের সঙ্গে যুদ্ধ করে সপ্তাহ পরে সেই করুণারূপিনী মা আমার মৃত্যু শয্যায়! আজ তুমি তাকে একটী বার দেখা দিতেও রাজী নও, আশ্চর্য্য। তোমার এক এক খানা হাড় খুলে দিলেও তাঁর ঋণ শোধ হবে না। আজ দুদিন শ্যাম ত্রিভঙ্গ দেখে জীবন সার্থক করছ কার প্রসাদে? আমি তোমার চিকিৎসা করেছিলাম, বুঝেছিলাম করুণাময়ী মা তোমার কেউ হবেন। পরে জানলাম তিনি তোমার কেউ নন। আমার চোখের ঠুলি খুলে গেল। ত্রিশ বৎসর চিকিৎসা করেছি,—অর্থ উপার্জ্জন ঢের করেছি,—এ পুণ্য দৃশ্য দেখে আমি নূতন মানুষ হয়ে তাকে মা বলে ডেকে পবিত্র হয়ে গেছি। আজ দু সপ্তাহ যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেও মাকে বাঁচাতে পারলাম না। আজ দু সপ্তাহ প্রতি মুহূর্ত্ত মা তোমার সংবাদ শুনছেন। তুমি নিজে হেঁটে গোবিন্দজী দর্শন করেছ শুনে মা হেসে এক আনন্দের নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তার পর হতেই তাঁর জীবনী শক্তি কমে আসছে। সাধু পুরুষ—সেই মাকে দেখা দিতে তোমার আপত্তি?—"

হরি কুণ্ঠিত হইয়া যোড়হাতে কহিল, "অপরাধ করেছি মহাশয়, চলুন তাঁকে দেখে আসি।"

"আপনি আমার জীবন দিয়েছেন আমার জীবনের সাধ পূর্ণ করেছেন, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি—একটীবার চক্ষু—"

রুগ্না চক্ষু মেলিল, তারপর মৃদুস্বরে কহিল "তোমার পা তুলে আমার মাথায় ঠেকাও—"

হরি জিভকাটিয়া কহিল, এমন আদেশ করবেন না। আপনি হয়ত আমায় জানেন না। আমি জাতিতে বাগ্দী।

"আমায় চিন্‌লেনা আমি পটুলি। দাও আমার মাথায় তোমার পা, তুমি আমার উপাস্য দেবতা—দাও তোমার চরণামৃত—একবিন্দু, প্রাণ শীতল করি।"

'পটুলি। তুই আমার জীবন দানকরে আজ নিজে মর্‌তে পড়েছিস্। একটু থাক্—আমার ঘরে গোবিন্দজীর নির্ম্মাল্য, চরণামৃত আছে এনে দিচ্ছি।"

পটুলি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। খানিক পরে হরি চরণামৃত আনিল পটলির মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে দিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল "পটুলি এমন অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহে তোর অন্তর পরিপূর্ণ ছিল? পটলি অন্ধের জননীর মত তুই যে চিরদিনই আমায় সজাগ পাহারা দিয়ে আস্‌ছিস্ তা আজ বুঝতে পেরেছি। মার কথা মনে বড় পড়ে না। আজ মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তোকে মা বলে ডাক্‌ছি মা—মা—"

পটুলি চক্ষু মুদিয়া শুনিল—তারপর কহিল "দাও গোবিন্দজীর চরণামৃত আমার মুখে। খেয়ানী হরি, আজীবন সকাল সন্ধ্যায় খেয়া নৌকায় নদী পার করে দিয়েছো, আজো আমায় পার করে দিচ্ছ। আজীবন তোমার অনুসরণ করে চলেছি! গুরু তুমি আমার। গুরু, আজ বড় আনন্দ বড় শান্তি। এখন নামগান একবার শোনাও যা পথের শেষপর্য্যন্ত নিয়ে পৌছিয়ে দেয়।"

হরি পটুলির শয্যাপ্রান্তে বসিয়া প্রেমানন্দে গাইল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপালগোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।

চিকিৎসক হরিকে ডাকিয়া কহিল, "উঠুন, মা চলেগেছেন।" সম্মুখের পথদিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন—

"এই হরিনাম নিদান ঔষধি
এতে হরে কালভয়, হবি পার ভব জলধি।"

পূর্ণতা

[শ্রীমতী লীলা দেবী]

ঝ'রে গেছে ফুল,ধ'রেছে বৃন্তে ফল
শিখর হইতে নেমেছে নদীতে ঢল
কুসুমের প্রেম, ফল-রসে ভরপুর,
বিলাস হলো যে মঙ্গল সুমধুর।
অধীর নির্ঝর শান্ত, তটিনীতে
মায়ের মুরতি চটুলা নটিনীতে।
ভালবাসা আজ চাহেনাকো সম্ভোগ
তুমি যদি আমি—কেমনে কাহাতে যোগ ?
শ্যাম ভেবে ভেবে রাধা হ'য়ে গেছে শ্যাম
প্রেমের মাঝারে হারা হ'য়ে গেছে কাম।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মঘটের ফলে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের যে রফা হইল তাহার মোট কথা এই যে আমাদের ১৪ বৎসর কালাপানির জেলে বন্ধ থাকিতে হইবে। চৌদ্দ বৎসরের পর আমাদের জেলের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে আর তখন আমাদিগকে কয়েদীর মত পরিশ্রম করিতে হইবে না। জেলখানার ভিতরেও আমরা বাহিরের কয়েদীর মত নিজের নিজের আহার রাঁধিয়া খাইতে পারিব ও বাহিরের কয়েদীর মত পোষাক পরিতে পারিব অর্থাৎ জাঙ্গিয়া, টুপি ও হাতকাটা কুর্ত্তা না পরিয়া কাপড় ও হাতাওয়ালা কুর্ত্তা পরিতে পাইব আর মাথায় একটা চার হাত লম্বা কাপড়ের পাগড়ী জড়াইবার অধিকারও পাইব। অধিকন্তু ১০ বৎসর যদি আমরা ভাল ব্যবহার করি অর্থাৎ ধর্ম্মঘটে

যোগ না দিই বা জেলের কর্ত্তাদের সহিত ঝগড়া না করি তাহা হইলে ১০ বৎসর কয়েদ খাটিবার পর সরকার বাহাদুর বিবেচনা করিবেন আমাদের আরও অধিক সুখে রাখিতে পারেন কি না। জাঙ্গিয়া ছাড়িয়া ৮ হাতি মোটা কাপড় পরিয়া বা মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া আমাদের সুখের মাত্রা যে কি বাড়িয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে নিজের হাতে রাঁধিবার অধিকার পাইয়া প্রত্যহ কচুপাতা সিদ্ধ খাইবার দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পরিশ্রমের হাতও এড়াইলাম। বারীন্দ্রকে বেতের কারখানার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল, হেমচন্দ্রকে পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ করা হইল আর আমি হইলাম ঘানি-ঘরের মোড়ল। প্রাতঃকালে ১০ হইতে ১২ টার মধ্যে রন্ধন ও আহারাদি শেষ করিয়া লইবার কথা, কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সারিয়া লওয়া অসম্ভব দেখিয়া আমরা সাধারণ ভাণ্ডারা (পাকশালা) হইতে ভাত ও ডাল লইতাম, শুধু তরকারিটা নিজেদের মনোমত রাঁধিয়া লইতাম। রন্ধন বিদ্যায় হেমচন্দ্রের ওস্তাদ বলিয়া নাম-ডাক ছিল। প্রকৃতপক্ষে মাংস, পোলাও প্রভৃতি নবাবী খানা তিনি বেশ রাঁধিতে পারিতেন, তবে সোজাসুজি তরকারি রাঁধিতে যে আমাদের চেয়ে বেশী পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একদিন একটা মোচা পাইয়া বহুকাল পরে মোচার ঘণ্ট খাইবার সাধ হইল। কিন্তু কি করিয়া রাঁধিতে হয় তাহা ত জানি না। মোচার ঘণ্ট রাঁধিবার জন্য যে প্রকাণ্ড কনফারেন্স বসিল তাহাতে রন্ধন প্রণালী সম্বন্ধে কাহারও সহিত কাহারও মত মিলিল না। বারীন্দ্র বলিল—"আমার দিদিমা হাটখোলার দত্ত বাড়ীর মেয়ে এবং পাকা রাঁধুনী, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" হেমচন্দ্র বলিল—"আমি ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী রান্না শিখে এসেছি, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" আমাদের সব স্বদেশী কাজেই যখন বিদেশী ডিপ্লোমার আদর অধিক তখন আমরা স্থির করিলাম যে মোচার ঘণ্ট রান্নাটা হেমদাদার পরামর্শ মতই হওয়া উচিত। আমি গম্ভীর ভাবে রাঁধিতে বসিলাম, হেমদা কাছে বসিয়া আরও গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কড়ার উপর তেল চড়াইয়া যখন হেমদা পেঁয়াজের ফোড়ন দিয়া মোচা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন তখন তাঁহার রন্ধন বিদ্যার ডিপ্লোমা সম্বন্ধে আমারও একটু সন্দেহ হইল। মোচার ঘণ্টে পেঁয়াজের ফোড়ন কি রে বাবা? এযে বেজায় ফরাসী কাণ্ড! কিন্তু কথা কহিবার উপায় নাই। চুপ করিয়া তাহাই করিলাম। মোচার ঘণ্ট রান্না হইয়া যখন কড়া হইতে নামিল তখন

আর তাহাকে মোচার ঘণ্ট বলিয়া চিনিবার জো নাই। দিব্য তোফা কাল রং আর চমৎকার পেঁয়াজের গন্ধ। খাইবার সময় হাসির ধুম পড়িয়া গেল। বারীন্দ্র বলিল—"হাঁ, দাদা একটা ফরাসী chef-de-cuisine বটে।" দিদিমা আমার এমনটা রাঁধিতে পারতেন না।" হেমদা হটিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"ঐ ত তোমাদের রোগ। তোমরা সবাই দিদিমা-পন্থী। দিদিমা যা করে গেছেন তা আর বদ্‌লোতে চাও না।" মোচার ঘণ্ট যে দিন রন্ধনের গুণে মোচার কাবাব হইয়া দাঁড়াইল, তাহার দিন কতক পরে একবার স্বক্ত রাঁধিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু স্বক্ত রাঁধিবার সময় কি কি মসলা দিতে হয় সে বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়া গেল। হেমদা' বলিলেন যে তরকারীর মধ্যে এক আউন্স কুইনাইন মিক্সচার ফেলিয়া দিলেই তাহা স্বক্ত হইয়া যায়। আমাদের দেশের যে সমস্ত নবীনা গৃহিণীরা পাঁচখণ্ড পাকপ্রণালী কোলে করিয়া রাঁধিতে বসেন তাঁহারা-স্বক্ত রাঁধিবার এই অভিনব-প্রণালীটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে তাঁহারা একাধারে আহার ও পথ্যের আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারিবেন। দাদারও জয় জয়কার পড়িয়া যাইবে।

রাঁধিবার জন্য আমরা জেল হইতে কিছু কিছু তরকারী লইতাম, তবে তাহার মধ্যে চুবড়ী আলু ও কচুই প্রধান। কাজে কাজেই বাজার হইতে মাঝে মাঝে অন্য তরকারী আনাইয়া লইতে হইত। সরকার বাহাদুরের নিয়মানুযায়ী আমরা মাসিক বেতন পাইতাম বারো আনা। আমরা শারীরিক দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের প্রত্যেককে বারো আউন্স করিয়া দুধ দিয়া তাহার আংশিক মূল্য স্বরূপ মাসিক আট আনা কাটিয়া লইতেন। বাকি চার আনার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিছুদিন পরে জেলের মধ্যে একটা ছাপাখানা স্থাপিত করিয়া বারীন্দ্রের উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয় আর হেমচন্দ্রকে বই-বাঁধাই বিভাগের অধ্যক্ষ করিয়া দেওয়া হয়। সেই সময় সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব উঁহাদের প্রত্যেককে মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া ভাতা দিবার জন্য চিফ-কমিশনারের অনুমতি চান। পাঁচ টাকার নাম শুনিয়াই চিফ-কমিশনার লাফাইয়া উঠিলেন। কয়েদীর মাসিক ভাতা পাঁচ-টাকা! আরে বাপ! তাহা হইলে ইংরেজ রাজ যে ফতুর হইয়া যাইবে! অনেক লেখালিখির পর মাসিক একটাকা করিয়া বরাদ্দ হইল। যথা লাভ!

ক্রমে ক্রমে আমাদের রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট পুদিনার ক্ষেত দেখা দিল; তাহার পর দুই-চারিটা লঙ্কা গাছ, এক আধটা বেগুন গাছ ও একটা কুমড়া গাছও আসিয়া জুটিল। এ সমস্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া জেলার মাঝে মাঝে তাড়া করিয়া আসিত; কিন্তু সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের মনের এক কোণে আমাদের উপর একটু দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি এ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াও দেখিতেন না। জেলারের প্রতিবাদের উত্তরে বলিতেন—'এরা যখন চুপ চাপ করে আছে, তখন এদের আর পিছু লেগো না।' এরূপ দয়া প্রকাশের কারণও ঘটিয়াছিল কর্তৃপক্ষের আটঘাট বন্ধ রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দেশের খবরের কাগজে তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাহাতে তাঁহাদের মেজাজটা প্রথম প্রথম বিলক্ষণই উগ্র হইয়া উঠিত; কিন্তু শেষে অনেকবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাঁহারাও শিখিয়াছিলেন যে কয়েদীকেও বেশী ঘাঁটাইয়া লাভ নাই।

মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হইবার প্রবলতর কারণ জর্ম্মানীর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ। যুদ্ধ বাধিবার অল্পদিনের মধ্যে কর্ত্তাদের মুখ যেন শুকাইয়া গেল। কয়েদীদের তাড়া করিবার প্রবৃত্তি আর বড় বেশী রহিল না। অষ্ট্রীয়ার রাজপুত্রের হত্যাকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্যারী নগরীর ১০ মাইলের মধ্যে জর্ম্মান্ সৈন্যের আগমন সংবাদ সবই আমরা জেলের ভিতরে বসিয়া পাইতেছিলাম। শেষে যখন এমডেন আসিয়া মাদ্রাজের উপর গোলা ফেলিয়া চলিয়া গেল তখন ব্যাপারটা আর সাধারণ কয়েদীর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইল না। ইংরেজের বাণিজ্য ব্যাপারের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে তাহা কয়েদীদেরও বুঝিতে বাকি রহিল না। আগে পিপা পিপা নারিকেল ও সরিসার তৈল পোর্টব্লেয়ার হইতে রপ্তানী হইত, এখন সে সমস্তই গুদামে পচিতে লাগিল। জেলে ঘানি চালান বন্ধ হইয়া গেল। শেষে কয়েদীর নিকট হইতে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ (war loan) করা হইতে লাগিল তখন পোর্টব্লেয়ারে গুজব রটিয়া গেল যে, ইংরাজের দফা এবার রফা হইয়া গিয়াছে। জেলের দলাদলি ভাঙ্গিয়া গিয়া শত্রুমিত্র সবাই মিলিয়া জর্ম্মানীর জয় কামনা করিয়া ঘন ঘন মালা জপিতে আরম্ভ করিল। জর্ম্মানীর বাদসা নাকি হুকুম দিয়াছে যে সব কয়েদীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সাহেবদের আরদালীরা আসিয়া খবর দিতে লাগিল যে আজ সাহেব সংবাদ পত্র পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে, কাল সাহেব না খাইয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল

ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝাঁকে ঝাঁকে ভবিষ্যদ্বক্তা জুটিয়া গেল। কেহ বলিল পীরসাহেব স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে ১৯১৪ সালে ইংরেজের ভরা ডুবিবে, কেহ বলিল এ কথা ত কেতাবে স্পষ্টই লেখা আছে। মোটের উপর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই একই আলোচনা চলিতে লাগিল।

কয়েদীদের মনের ভাব শেষে কর্ত্তৃপক্ষেরও অগোচর রহিল না। ইংরেজ যে যুদ্ধে হারিতেছে না একথা প্রমাণ করিবার জন্য জেলের সুপারিন্টেনডেন্ট আমাদিগকে বিলাতের টাইমস পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণ পড়িতে দিতেন। কিন্তু টাইম্‌সের কথা বিশ্বাস করাও ক্রমে দায় হইয়া উঠিল। টাইম্‌সের মতে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য প্রত্যহ যত মাইল করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, মাস কতক পরে তাহা যোগ দিয়া দেখা গেল যে তাহা সত্য হইলে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যের জর্ম্মানী পার হইয়া পোলান্দে গিয়া উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল, অথচ, পোলাণ্ড ত দূরের কথা, রাইন নদীর কাছাকাছি হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। সাধারণ কয়েদীরা ইংরাজের স্বপক্ষে কোন কথা কহিলে একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিত। কর্ত্তারা যে মিথ্যা খবর ছাপাইয়া তাহাদের পট্টি দিতেছে এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ মাত্র ছিল না।

নূতন নূতন যে সমস্ত কয়েদী দেশ হইতে আসিতে লাগিল, তাহারা নানা-প্রকার অদ্ভুদ গুজব প্রচার করিয়া চাঞ্চল্য আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক দল আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল যে তাহারা বিশ্বস্তসূত্রে দেশ হইতে শুনিয়া আসিয়াছে যে এমডেন পোর্টব্লেয়ারের জেলখানা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজনৈতিক কয়েদীদের লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে সশরীরে সেখানে উপস্থিত দেখিয়াও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে গুজবটা মিথ্যা। তাহারা যে ভাল লোকের কাছে ও কথাটা শুনিয়াছে! শ্রুতির চেয়ে প্রত্যক্ষটা ত আর বড় প্রমাণ নয়।

ক্রমে পাঠান ও শিখ পল্টনের অনেক লোক বিদ্রোহের অপরাধে পোর্ট-ব্লেয়ারে আসিয়া পৌছিল। তাহাদের কেহ কেহ ফ্রান্স, কেহ বা মেসো-পোটোমিয়া হইতে আসিয়াছে। পাঠানদের মুখে মুখে এনভার বে'র দৈব শক্তি সম্বন্ধে যে সব চমৎকার গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল তাহা শুনিয়া কয়েদীদের বুক আশায় দশ হাত হইয়া উঠিল। এনভার বে তোপের সম্মুখে দাঁড়াইলে নাকি খোদার কোদ্রতে তোপের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তিনি আবার নাকি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া একদিন মুলতান সরিফে আসিয়া

অচিরে জগদ্ব্যাপী মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা দিয়া গিয়াছেন। জার্মানীর বাদশাও নাকি কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

এ সব কথার প্রতিবাদ করিয়া কয়েদীদের বিদ্বেষভাজন হওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও ফল নাই দেখিয়া আমরা চুপ করিয়া থাকিতাম। তবে যথাসম্ভব সত্য ব্যাপার জানিবার জন্য সংবাদ পত্র জোগাড় করিবার চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম। গদর দলের শিখেরা পোর্টব্লেয়ারে কয়েদ হইয়া আসিবার পর পাছে জেলের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, সেই ভয়ে জেলে পাহারা দিবার জন্য দেশী ও বিলাতী পল্টন আমদানি করা হইয়াছিল। বিলাতী পল্টনের মধ্যে আইরিশ অনেক ছিল। আর তাহারা যে ইংরেজের বিশেষ শুভার্থী ছিল তাহাও নয়। সুতরাং সংবাদপত্র সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব ছিল না। তা' ভিন্ন নূতন নূতন যে সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদী আসিতে লাগিল তাহাদের নিকট হইতেও দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিতাম। এমডেন ধরা পড়িবার পরে একটা গুজব শুনিয়াছিলাম যে ঐ জাহাজে যে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে পোর্টব্লেয়ারের একটা প্ল্যান ছিল, বোধ হয় ভবিষ্যতে কোনরূপ আক্রমণের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পোর্টব্লেয়ারে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল ও দুই চারিটা তোপেরও আমদানি করা হইয়াছিল।

পোর্টব্লেয়ারে মিলিটারী পুলিসের মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যাই অধিক, এবং তাহাদের মধ্যে শিখও যথেষ্ট। পাছে গদর দলের শিখেরা মিলিটারি পুলিসের সহিত কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায়, এই চিন্তায় পোর্টব্লেয়ারের কর্ত্তারা যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই ভয়ে জেলের ভিতরকার শিখদিগের উপর তাঁহাদের ব্যবহার বেশ একটু কঠোর হইয়া দাঁড়াইত। একে ত আমেরিকা প্রত্যাগত শিখদিগের রুটি ও মাংস খাওয়া অভ্যাস, জেলের খোরাক খাইয়া তাহাদের পেটই ভরে না, তাহার উপর মাথায় লম্বা লম্বা চুল ধুইবার জন্য সাবান বা সাজিমাটী কিছুই পায় না। শেষে যখন তাহাদের উপর ছোট ছোট অত্যাচার সুরু হইল তখন তাহাদের মধ্যে একজন (ছত্র সিং) ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। বেচারীকে তাহার ফলে দুই বৎসর কাল পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ধর্ম্মঘটও পুনরায় আরম্ভ হইল। কিন্তু যে সকল নেতারা শিখদিগকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উত্তেজিত করিলেন তাঁহারাই কার্য্যকালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শেষে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া

গেল। "যুদ্ধ থামিয়া গেলে আমাদের ভাগ্যবিধাতা আমাদের জন্য কোন নূতন ব্যবস্থা করেন কিনা তাহাই দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমশঃ।

অকরুণ পিয়া

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

আমার পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ঐ বাজে গো বিদায় বাঁশী।
পথ্-ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি॥
পথিক ব'লে পথের গেহ
বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,
তাই দেখে তার ঈর্ষাভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি॥
তখন মোদের কিশোর বয়েস যেদিন হঠাৎ টুট্‌লো বাঁধন্‌,
সেই হ'তে কার বিদায়-বেণুর জগৎ-জোড়া শুন্‌ছি কাঁদন্‌।
সেই কিশোরীর হারা-মায়া
ভুবন্‌ ভ'রে নিল কায়া,
দুলে আজো তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি'॥

মনস্তত্ত্বের দিক্‌

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কথা হচ্ছে—

পাশ্চাত্য দেশে যেখানে মুখের বুলি—Perish secrecy! Tear off veils! Banish all reserve between the sexes! সেখানেও কাজের ধারাটুকুর বেলায় মেলামেশা অবাধে চলে না। মেলামেশা বারণ নয় এই পর্য্যন্ত,—না চলবার কারণ যথেষ্ট আছে। সামাজিক বিধি ব্যবস্থা এমন ভাবে

সাজান যে ও জিনিষটা আছে স্থূল চোখে দেখায় মাত্র। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কার্য্যতঃ নেই। অবশ্য সমাজের নিম্নস্তরের কথা স্বতন্ত্র। সে কোন্ দেশেই বা নয়।' ইংলণ্ড জার্মাণী প্রভৃতি দেশের আভিজাত্য শ্রেণীর ঘরে ধরাবাঁধা আমাদের দেশে ভদ্র ঘরেরই মত।

— প্রাচ্যের ব্যবস্থাটা অনেকটা যেন পাশ্চাত্যের উল্টো। এ দেশের অবস্থাটা যেন কড়ায় কড়ী কাহণে কাণা। মুখের বুলির ভিতরে ছুঁচ গলে না বটে,— ব্যবস্থা এমন আঁট সাঁট। কাজের বেলায় কিন্তু হাতি গলে যায়,— অভ্যাস এত শিথিল। যাঁরা জিনিষটা বুঝতে চান তাঁদের unbiassed হয়ে এই কলিকাতারই গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া হিন্দু পরিবারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে বলতে পারি।

গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া ব্রাহ্মর উদাহরণটা সামাজিক অভিমত হিসাবে দিচ্চি না। symbol হিসাবেই দিচ্চি। খুব unbiassed হয়েই দিচ্চি। একেবারেই উদাহরণ মাত্র।

আমাদের দেশে ত বটেই, পৃথিবীর সকল দেশেই তাই,—মানুষ এতদিন যেন পূর্ব্বপুরুষের জমান টাকার মত পূর্ব্ব যুগের সঞ্চিত কর্ম্মে বাঁচছিল,—সে সঞ্চয় এইবার ফুরিয়েছে। এতদিন সত্য সত্যই কোনও দেশে মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবার কোনও দায় হাজির হয় নি। মেয়েরা অনেক দেশেই বাইরে এসেছে কর্ম্মে ভিড়েচে, হয় সখ নয় ভাবের প্রেরণা, যা হোক এই রকম একটা কিছুতে। এখনকার অবস্থা আর তা নয়। ঠিক আজিকার পৃথিবীতে যদি নিখিলেশকে বিমলার কাছে ঘরে বাইরের হিসাব দিতে হয়, সম্ভবতঃ তাকে বলতে হবে—ঘরে তুমি আমার জন্য যা করচ এ সামান্য কিছু, আমিও তোমার জন্য যা কর্চ্চি যৎসামান্য মাত্র। বাইরে তুমি এর চেয়ে অনেক কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে,—আমিও পার্ব্বি। আর পরস্পর তা না করলে আমরা বাঁচতেও পার্ব্ব না। দিনকাল এমন পড়চে।

সংসারটা মেয়ে পুরুষের লেন দেন নিয়ে বাণিজ্যের নিয়মেই চলচে এ কথা অস্বীকার করে তর্ক করা গায়ের জোর ফলানরই সামিল। বাণিজ্যে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের বলি বেণিয়া। ইংরাজ যে জাত বেণিয়া সে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝচি। সম্প্রতি সংবাদ এসেচে যে "বিলাতে নারী আর একটি নূতন অধিকার লাভ করিলেন। স্থির হইয়াছে, এখন হইতে তিন বৎসর পরে তাঁহারা বিলাতের সিবিল সার্ব্বিসে পুরুষের ন্যায় প্রবেশাধিকার পাইবেন।"

অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁরা সে দেশের পার্লামেন্টে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। আরো ঠিক হয়েছিল যে পুরোহিতের কাজ বিচারকের কাজ আর এই সিবিল সার্ব্বিস তিন ছাড়া অপর সকল কাজই তাঁরা কর্ত্তে পার্ব্বেন। সম্প্রতি সিবিল সার্ব্বিসও মঞ্জুর হয়ে গেল। কালে কালে ও দুটোও মঞ্জুর হবে না কে বলতে পারে? বেণের বুদ্ধি ঠকবার চিজ নয়। ইংরাজ জাতি ভাবোচ্ছ্বাসে কিছু চালাবার বান্দা নয়। ইংরেজের ঘরে যখন চলে গেল তখন বুঝতে হবে ওর ভিতর আব্দার নেই ধাপ্পা নেই আছে খাঁটি নিরেট যোগ্যতা। মেয়েরা উপযুক্ত সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ থাকতে এ মঞ্জুর হবার কথা নয়, সন্দেহ মিটেই তবে মঞ্জুর হয়েচে। আরো একটা কথা আছে। যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েচে, হলেই বা। যোগ্যকে তার উপযুক্ত আসন দিতে সংসার কি হাত ধুয়ে বসে আছে নাকি? কাজের সঙ্গে কাজের একটা বেতন আছে। কাজটা করা যত শক্তই হোক সে লোভটা ছাড়া আরো শক্ত। বেণের লোভও খুব অতিরিক্ত। এই লোভের সঙ্গে সেখানে কি রকমে মিটমাট হল? বেণিয়া কি সেখানে আপনার জাতিধর্ম্ম ছেড়ে হঠাৎ সুবিচারের অবতার হয়ে উঠেচে। আমাদের ঘরে পুরুষদের কথাটা নিয়ে একটু ভাবতে অনুরোধ করি। মনে থাকে যেন movement এবং agitation এর ক্ষেত্রে এতদিন তাঁরা রূপক হিসাবে মেমসাহেবদের সতীন ছিলেন। কর্ত্তাটী সুবিচারের কলার কাঁদি কি না তাঁরা ত জানেনই।

সত্য কথা এই এখানেও ব্যবসার কার্য্য নির্ব্বাহ (Transaction) হয়ে গেছে।

কেমন, না অর্থটা যদি সম্পদ হয় কর্ম্মও একটা সম্পদ। অর্থের মত তারও একটা হিসাব পদ্ধতি (economy) আছে। তারই নীতি অনুসারে সেখানে প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যে মেয়েদের কর্ম্মক্ষমতা এই সব কাজে লাগালে Nation এর কর্ম্মক্ষমতা আরো অনেক ফুলিয়ে যাবে। যোগ্যতায় গ্রেটব্রিটেন উচিয়ে উঠবে।

এ ব্যাপারটা হঠাৎ এমন পরিষ্কার হয়ে উঠলই বা কেন? হঠাৎ হয় নি। বাইরের বায়ুমণ্ডল উষ্ণতায় ৫০° ডিগ্রি হতে ৪০° ডিগ্রিতে নেমে পড়ে শরীরকে ঐ ১০° ডিগ্রির উপযুক্ত বেশী তাপ সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন করে নিতে হয়। এই জ্ঞান ও এই ব্যবস্থা ঠিক এমনি করেই হয়েচে, হঠাৎ হয় নি। ব্যাপার এমনটা দাঁড়িয়ে পড়েচে যে বাইরের জগৎ ডিগ্রি কতক বেকে নির্ম্মম হয়ে গ্রেটব্রিটেনকে চেপে ধরেচে। সেই ডিগ্রিকতকের উপযুক্ত যোগ্যতা সঙ্গে উৎপন্ন করে না নিতে পারলে গ্রেটব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে না।

বিলাতের এই সংবাদটুকু আমি উদ্ধৃত করেছি বাংলা সংবাদপত্র দৈনিক বসুমতী হতে। তার কারণ কাগজটীর মন্তব্যটুকু আমার কাজে লাগবে। মন্তব্য- এই যে অধিকার টুকুকে নারীর ন্যায্য অধিকার বলে স্বীকার করা হয়েচে। আনন্দের সংবাদ বলেও স্বীকার করা হয়েচে। অবশ্য ভারতের নারীর এতখানি অধিকার ন্যায্য কিনা সে সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, সে উল্লেখের প্রয়োজনও বুঝি না। এ অধিকার লাভে উপযুক্ত হলে নারীর এ অধিকার লাভ ন্যায্য আর পুরুষের পক্ষেও সেটা আনন্দের সংবাদ এ স্বীকৃতিটুকুও আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। এমন সংবাদ ভারতের নারীকে যোগ্যতা উপার্জ্জনে উৎসাহ দিতে পারে। আমি দৈনিক বসুমতীকে এইটুকুর জন্যই ধন্যবাদ দিচ্ছি। প্যাটেল-বিল প্রভৃতি ব্যাপারের সময় প্রতিবাদ পক্ষেই দৈনিক বসুমতীর স্থান, সেটা রক্ষণশীলতার পরিচয়—আবার circulation 16000 Daily এটাও লোক প্রিয়তার পরিচয়। সুতরাং রক্ষণশীল সমাজের অনেকেরই কল্যাণ কর্ম্মে নারীর যোগ্যতা উপার্জ্জন চেষ্টা মতের অনুকূল দাঁড়াইয়াছে বসুমতীর মন্তব্যে আমার এইটাই যেন মনে হল।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের সঞ্চিত কর্ম্ম ফুরিয়েছে—বাঁচতে হলে এখন প্রত্যেক জাতিকে নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় কর্ত্তে হবে, গ্রেটব্রিটেন উপস্থিত এটা বুঝেচে এর ব্যবস্থা কচে—মেয়েদের নূতন অধিকার দান সেই সঙ্গেই হয়ে গেছে। ভারতবর্ষেরও সঞ্চিত কর্ম্ম ফুরিয়েছে তা সত্য—নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় কর্ত্তে হবে তাও প্রত্যক্ষ—এখন বোঝা আর ব্যবস্থা করা এইখানটাতেই নাকি ঠেকে গেছে। আমরা বুঝ্‌ছি—বুঝে ত এখনও কিছু ঠাহর কর্ত্তে পারি নি সেটা কি? ব্যবস্থা বড় সোজা ব্যাপার নয়। একবার কবে ব্যবস্থা হয়েছিল সে কত মুনি ঋষি এসে তবে।

গ্রেটব্রিটেনের বোঝা এখনও শেষ হয় নি, কিন্তু ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। বোঝার ভুলের দরুণ ব্যবস্থার ভুল হয়ে গেলেই যে জাত যাবে এমন ভয় তারা করে না। বলে তখন ঠিক বুঝলে ব্যবস্থাটাও না হয় নূতন করে ঠিক করে নোব।

ব্যবস্থা ত হয়ে গেল যে মেয়েরা ঐ সব কাজ কর্বে—কেন?—না তাদের বুদ্ধি ও বৃত্তিতে চমৎকার ওসব কাজ কুলিয়ে গেছে। এখন ও সব কাজ কর্ত্তে হলে ত মেয়েদের অবাধে মেলামেশা কর্ত্তে হবে। পুরুষে পুরুষে যেমন মেয়ে পুরুষেও তেমনি একটা অবাধ অক্ষুণ্ণ স্বাচ্ছন্দ নিয়ে আসতে হবে। মেয়ে পুরুষ উভয়েরই বৃত্তিতে বুদ্ধিতে ওটাত বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বে চমৎকার কুলিয়ে

যায় নি। সে রকম মন হলে আজ পর্য্যন্তও সামাজিক বিধিব্যবস্থা কার্য্যতঃ মেয়ে পুরুষে অবাধ মিলনের অন্তরায় খাড়া রেখেছে কেন? ভবিষ্যতের জন্য কর্ম্ম সঞ্চয়ার্থ যে সব ব্যবস্থার প্রচলন কর্ত্তে হয় তাতে অবাধ মিলন অনিবার্য্য হয়ে পড়ে—আবার অবাধ মিলন চালাতে গেলে তার উপযুক্ত একটা মনস্তত্ব না হলেও নয়। প্রাণের দায় ঠেকেচে। বিধি ব্যবস্থা চাইই। আবার সেই দায়কে সর্ব্বস্ব করে মনস্তত্বের উপযোগীতা অস্বীকার করলেও চলে না। সে ভাবে চলতে গেলে সমাজের জোট এমন পাকিয়ে যাবে এমন সব সমস্যার উদয় হবে যে সে সব সামলান অসম্ভব বল্লেই হয়।

এই যেমন আলোচনা করচি এমন আলোচনা সেখানে হয় নি। সেখানে নূতন কিছু চালিয়ে দেওয়া হয়েচে আর সেই নূতন কিছু চলবার জন্যে নূতন কিছু শেখাবার ব্যবস্থা হচ্চে। মনে কেমন একটা জোর, হবেই। হা হুতোশি ভাব একবারেই নয়। খোঁচ খাঁচ যা দেখচে বীরদম্ভে বলচে—ও বেঁক কুঁদের মুখে সিধা হবেই। এই সমস্ত কারণে Sex-instruction এখন বিলাতী আসর জমাচ্চে মন্দ নয়। সেখানে London University Conference on Education বসলেও তাতে এ আলোচনা দূষ্য নয়। সে আবার আধ্যাত্মিক আলোচনা হলে বাঁচতুম। সম্প্রতি নাকি একটা প্রবল আলোচনায় স্থির হচ্ছিল—early education in Sex-biology and sex-psychology was the child's best and only safeguard. অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান ছেলেদের খুব অল্পবয়স থেকে শিখিয়ে রাখলে তাদের বিপদের ভয় সবচেয়ে কেটে থাকে।

অর্থাৎ এ বিষয়ে নিজের ভালমন্দ আর দুনিয়ার কাণ্ড কারখানা জেনে ছেলে মেয়ে ঝানু হয়ে থাক। মানুষের ইচ্ছাটার স্বাভাবিক গতি ত ভালরই দিকে। সব জিনিষ অবাধে জানিয়ে রাখলে অবাধে ছেড়ে দিতে দোষ কি?

আমরা কিন্তু এ ব্যবস্থায় কিছুতেই রুচি প্রকাশ কর্ত্তে পার্ব্ব না। ছেলে মেয়ে গুলোকে এঁচোড়ে পাকিয়ে তুললে তাদের মন্দথেকে রক্ষা করা হবে এ যুক্তি পরিপাক করা আমাদের কর্ম্ম নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আর একরকম বলে। সে যাই হউক, তাঁদের ও কথাটাও তাঁদের দেশে নূতন নয় তাঁদেরও বোঝার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এই দিকে আছে। মানুষের ইচ্ছার স্বাভাবিক গতি ভালর দিকে। এই জ্ঞানের ওপর তারা মানুষকে অবাধে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। মানুষও সেখানে খুব সতর্ক, কোন্‌টা কি বুঝে বুঝে আ পনার

পায়ের ওপর ভর করে এগোয়ও বৈকি। মন্দকে তারা ভয় করে না, আমরা যে ভাবে ঘৃণা করি তাদের ঘৃণাটাও ঠিক সে ভাবের নয়। তারা সাহসের সঙ্গে জোর করে মন্দকে নিংড়ে তার থেকে ভালকে বারকরে নেয়। তাদের মনস্তত্ত্ব আর আমাদের মনস্তত্ত্বে তফাৎ আছে।

—দেখ না কেন আমরা জানি না কি অতি নিকৃষ্ট জাতির সুখ পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মানন্দেরই আভাষ। কিন্তু কি তাই বলে বলচি যে নিকৃষ্ট সুখকেই মেনে নাও সেই ক্রমশঃ উৎকৃষ্টে উঠবে। ঠিক ঠিক জেনেও বুঝে চলবার চেষ্টা থাকলে ঐ ভালর দিকে ইচ্ছার যে স্বাভাবিক গতি আছে সে আভাষকে প্রকাশ পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবেই। আমরা ত তা বলি না, আমরা বলি শেষ যখন উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্টের ভিতর দিয়েই উৎকৃষ্টে পৌছাতে হবে এমনও কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই তখন কিসের জন্ম আমরা নিকৃষ্টকে স্পর্শ কর্ত্তে যাব। তাকে এড়িয়ে কি উৎকৃষ্টে হাজির হওয়া যায় না? আবার নিকৃষ্ট যখন আছে তাকে এড়িয়ে চলবার মুখে হঠাৎ তার সামনে পড়বারও সম্ভাবনা আছে।

আমরা নিকৃষ্টকে এড়িয়ে চলি তাই এত ধরা বাঁধা—সে হঠাৎ এসে পড়লে চেপে যাই, চুপে চুপে তাকে ঝেড়ে ফেলি তাই গেরোর মুখেও ফাঁস রাখতে হয়। ওরা নিকৃষ্টকে ধরেই তার ভিতর দিয়ে উৎকৃষ্টে পৌছাতে চায়—তাই নিকৃষ্ট যাতে নিকৃষ্টই দাঁড়িয়ে না পড়ে তার জন্তে ওদের দিনরাত নিকৃষ্টকে ঠেলতে হচ্ছে। আমাদের ধরাবাঁধা নিয়মে আছে আবার নিয়মের অনবরত ব্যতিক্রমও আছে। ওদের নিয়মে ধরাবাঁধা নেই কিন্তু কাজে দিনরাত ধব্ ধব্ চলেচে। এই জন্তে আমাদের মুখের কঠোরতা কাজের বেলায় শৈথিল্য দাঁড়িয়ে যায়। ওদেরও মুখের উদারতা কাজের সময় বেহদ্দ সঙ্কীর্ণতা হয়ে পড়ে। মনের স্তরে দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পর স্নেহ করি ঘৃণা করি কিন্তু মনের উপরের যে স্তর—সেখানে উভয়েই একস্থানে দাঁড়িয়ে আছি।

মন একই মানুষের যখন আজ এক, কাল আর হয় অথচ মানুষ সেই মানুষই থাকে তখন মন ছাড়া যে আমাদের মধ্যে আর একটা কিছু আছে—তার ওপরে আর একটা স্তর আছে সে আর বোধ করি বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নাই। জিনিষটা কি না বুঝলেও জিনিষটা যে আছে তা বেশ বোঝা যায়। যে মেয়ে পুরুষের মিলন নিয়ে পৃথিবীতে এত ধরাবাঁধা এই মনের স্তর ছাড়িয়ে উঠলে সেই মেয়ে পুরুষের মধ্যে অবাধ মিলন ত তুচ্ছ কথা—অভেদ মিলনও

মানিয়ে যায়। মনের স্তরের ওপরের যে জ্ঞানদৃষ্টি তাকেই বলে দূরদর্শন ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

বিলাতে মেয়েদের যতখানি অধিকার দেওয়া হল তাতে তাদের আর্থিক স্বাবলম্বন আসবে নিশ্চয় সুতরাং একটা বড় নিকৃষ্টের সম্ভাবনাকে সে বন্ধনমুক্ত কর্ল,—আমাদের মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে ভাবলে আমরা তাইই মনে করি বটে কিন্তু তাদের মন দিয়ে তারা নিকৃষ্টের সম্ভাবনাটাকে উৎকৃষ্টের দিকে অগ্রসর হওয়াই মনে কর্চে। জানচে বটে যে নিকৃষ্ট জুড়ে বসবার চেষ্টা কর্লে তাকে খুব বড় ধাক্কাই দিতে হবে, সে ধাক্কা দেওয়াও তাদের স্বধর্ম সিদ্ধ। আর যদি প্রয়োজন হয় তার জন্য যা উপকরণ সেও তাদের হাতের কাছে আসবেই। তখন তারা মরবে না বা অধঃপাতেও যাবে না।

বাহিরের জগতের নির্মমতা আমাদের Freezing-point একেবারে নাকি 32. Fahrenheit এ চেপে ধরেচে। এই ইঙ্গিপিয়ান মমিবৎ অবস্থাতেও আমাদের স্নায়ুজাল আন্দোলিত হতে আরম্ভ করেচে। ডিগ্রিকতক যোগ্যতা না উৎপন্ন কর্লে আর চলচে না। অর্থ সম্পদ ত বহুদিন হতেই অনর্থ বলে মাটিতে গেড়ে বসেচি তার ওপর দিয়ে এখন বিলেতী exchange এর আদরের জল গড়িয়ে আমাদের মান মর্য্যাদা সব ধুয়ে নিয়ে চলেচে। দেহে প্রাণটুকু যতক্ষণ ধুক্ ধুক্ কর্চে কর্ম্ম সম্পদ হারাতে হারাতেও যেটুকু বজায় আছে সেটুকুর হিসাব কর্ত্তে বসে ক্ষমতার পরিমাণ গতাবার সময় মেয়েদের দরকার পড়বে কি না কে বলতে পারে? কেন না যোগ্যতা উৎপন্ন কর্ব্বার সময় আমরা যে আমাদের মনস্তত্ত্ব সঙ্গত পদ্ধতি ছেড়ে অন্যপথ বাছতে যাব তাতো মনে হয় না। অমঙ্গলকে এড়িয়ে চলবার মত অযোগ্যতার হেতু যত কিছু বুঝবো সে গুলোকে কেটে ছেঁটে উড়িয়ে দেবার উৎসাহই আমাদের প্রবল হবে। চলতে চলতে নিকৃষ্টের সঙ্গে মারামারি আমাদের অভ্যাসেই নেই। পথ আগে নিরঙ্কুশ করে নিয়ে তারপর অযোগ্যতাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে থাকলেই যোগ্যতা আসবে, এমনি ধারা সনাতন যুক্তি ছাড়া নূতন কিছুই আমরা ভাবতে পারব না।

মেয়েদের মধ্যে যদি অযোগ্যতার হেতু থাকে তাদের ডাক নিশ্চয়ই পড়বে! নিকৃষ্টকে ঠেকিয়ে রেখে অযোগ্যতাকে উড়িয়ে দেবার কড়া তাগাদা— মেয়েদের উপলক্ষ্য করে বেশ একটা সমস্যা নিয়ে আসবে। তখন সেই সমস্যার কারা সমাধান কর্ব্বে—মেয়েরা নিজেরা করে নেবে না পুরুষরা করে দেবে—

নূতন কতকগুলো অধিকার মেয়েরা পাবে কি মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা আরো কতকগুলো বেশী অধিকার পাবে—এসব চোখ চেয়ে দেখবার। বুঝে ত সব হবে।

আমাদের দেশে মেয়েরা কোথাও মেশে না, কিছু করে না, কিছু যে পারে তাও সর্ব্ববাদী সম্মত নয়—তারা জানেও না কিছু। সবগুলোই অযোগ্যতার হেতু, সুতরাং তাদের এই সমস্ত গুণ নির্ব্বিবাদে যেমন ছিল তা অতঃপর থাকতে পাবে না। পথ নিরঙ্কুশ কর্ব্বার জন্য কেবলি কেটে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হবে। আবার মেয়েরা যদি হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে মর্দ্দানি দেখিয়ে পুরুষের মুখাপেক্ষা ছেড়ে দেয়, সত্যই যদি এজলাসে মেজেষ্টর হয়ে বসে অথবা দারোগা হয়ে তদন্তে যায়, বৃদ্ধের কিশোরী বধূ তাঁর মুখের বিগত যৌবনের অলৌকিক রূপবৃত্তান্ত অবিশ্বাস কর্ত্তে আরম্ভ করে অথবা কেরাণীর স্ত্রী তিনি সাতটা সাহেবকে ভেড়া করে রেখেচেন সে কথা হেসে উড়িয়ে দিতে থাকে, তা হলেও নিকৃষ্ট এসে পড়ে, এগুলোকে যেমন করে হোক এড়িয়ে যেতেই হবে।

জেঠাই মা দিদি মা বরং কিঞ্চিৎ লজ্জাশীলা হয়ে আধ ঘোমটা টানা অবস্থায় সভা সমিতিতে রীতিমত একপাশে বসে সাহেবদের যেমন করে হোক বুঝিয়ে দেবেন রাজনৈতিক আন্দোলন মেয়েরাই সজাগ রেখেচে, কলকাতার হাট বাজার প্রভৃতির এক একটা অন্তঃপুর তৈরী হয়ে বিলাতী ও বিদেশী শিল্পের সঙ্গে স্বদেশে বিদেশে প্রবল বেগে প্রতিযোগীতা চলবে, কোলের ছেলেটীকে কোলে করে আর তিন চারটীর গোলমাল থামিয়ে প্রকাণ্ড সংসারের হেনস্থেল ঠেলতে ঠেলতে বৌ ঠাকরুণ একটা রাষ্ট্রীয় সমিতির শাখা গঠন করে ফেলবেন, টুনি পুচি খেদি খোকাকে ধরে মায়ের কাজকর্ম্মে যোগাড় দিয়ে পুতুলের বাক্স বগলে নিয়েই বারোটা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত বুড়ো পণ্ডিতের স্কুলে হাজিরা দিয়ে ন দশ বছর বয়সের মধ্যেই সাক্ষাৎ সরস্বতী হয়ে উঠবে ঠিক এমনিটা কে এসে করে দিতে পারে তার অপেক্ষায় পথচেয়ে বসে থাকি অথবা কেমন করে হতে পারে সেই আলোচনায় মাসিক পত্রিকা বোঝাই করে ফেলা যে রাস্তা ধরতে চাইচে তাতে চলে আর আমরা কি কর্ত্তে পারি?

আমাদের বর্ত্তমান মনস্তত্বে এইত ব্যাপার? মনের স্তর ছাপিয়ে ওপরে ওঠা আমার তপস্যা। হয়ত বোঝা ভুলও হতে পারে তা যদি হয় তবে এ প্রবন্ধকে কৌতুক বলে ধরে নেবেন। তবে নিবেদন অতি সকাতরেই, জানবেন—আপনাদের মনটা আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন।

রাজা-সন্ন্যাসী

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

তুমি যে আসিয়াছিলে বসন্তের ছুরন্ত পবনে
কেলি দীর্ঘশ্বাস,
প্রাণের দারুণ ব্যথা জানাইল অশান্ত স্বননে
সমস্ত আকাশ ,
মুহুর্মুহু দিকে দিকে ছড়াইয়া তপ্ত পথধূলি,
আকুলিয়া প্রাণ,
আসন্ন বৈশাখী মাঝে মিলনের বসন্ত-বিলাস,
করি অবসান,
তুমি যে আসিলে দ্বারে রুদ্ররূপে সন্ন্যাসীর বেশে
হে নব অতিথি,
গৈরিক উত্তরী তব অকস্মাৎ বিত্রথ পরাণে
জাগাইল ভীতি ;—

তোমার অভয়শঙ্খ বারম্বার অম্বুদ-নিনাদে
গৃহাঙ্গন তলে
আহ্বান করিয়া নিল একে একে সর্ব্বহারা প্রাণ
আপনার বলে,
তোমার পিঙ্গলজটা ভস্মমাখা সর্ব্বদেহে দিল
মেঘের আভাস,
অঙ্গে বিচ্ছুরিত তেজ যেন কাল-বৈশাখীর বুকে
বিদ্যুৎ-বিলাস,
কণ্ঠে-তব হাড়মালা দীনতার আতিশয্যে ঢুলি,
হে রুদ্র ভৈরব,
দুর্ব্বল আঁখির আগে খুলে দিল আপন গৌরবে
অচিন্ত্য বৈভব !

তোমার নয়ন হ'তে দিব্য দৃষ্টি মেলিয়া চকিতে
করি সাবধানী,
বিলাস-বধির কর্ণে শুনাইলে ওগো মহাপ্রাণ,
কি উদাত্ত বাণী,
ধূলিম্লান জীবনের স্তরে স্তরে ফুটাইয়া ফুল
করুণ ইঙ্গিতে,
হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্র ভরি দিলে শুধু আত্মভোলা
মধুর সঙ্গীতে,
মোহাবিষ্ট পরাণের অন্ধকূপে হে সাগ্নিক ঋষি,
তব মন্ত্র-শিখা
বিশ্বহিত সাধনার মহাযজ্ঞে জ্বালি দিল আজ
হোমবহ্নি-শিখা !

তখন বুঝিনি আছে শূন্য এই হৃদয়ের মাঝে
তব প্রয়োজন,
রচি নাই অর্ঘ্য তাই করি নাই তোমারে বরিতে
কোন আয়োজন।
শত জন্ম বসে বসে গেঁথেছি যে বরমাল্যখানি
আছে তাহা আছে,
কারে ত পারিনি দিতে বসন্তের আনন্দ-হিল্লোলে
যে এসেছে কাছে,
আমার এ শুষ্ক মালা আচম্বিতে পুষ্পে পুষ্পে
উঠিবে বিকাশি
তুমি যদি পর গলে তব মহা-মহিমায় শুধু
হে রাজা-সন্ন্যাসী।

চিঠির গুচ্ছ

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত]

দুই দফা

(৯)

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে নীহার,

তোমার অবস্থা জেনে বড়ই ব্যথা পেলুম। সত্যই ত ও দমন করা বড়ই শক্ত, বিশেষতঃ তোমার আমার মত লোকের জীবনটাকে একটু বড় করে দেখতে চায়। তোমাদের সমাজের মেয়েরা ছেলেবেলা হতেই ওই ধরণে অভ্যস্ত হয়ে যায় বলেই তেমন কোন অসুবিধা বোধ কেউ করে না। এ কথা পূর্ব্বে তোমায় বলেছি।

এখন কথা হচ্চে এই যে, তোমাদের সমাজের মেয়েদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে? আমার মনে হয় সব চাইতে আবশ্যকীয় বিষয় হচ্চে শিক্ষার প্রসার। এই শিক্ষাপ্রচার করে পুরুষের সহায়তা তোমাদের আবশ্যক, অথচ পুরুষ যদি তোমাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না করে, তা' হলে তোমরা কি করবে? অজ্ঞানতার অন্ধকারের মাঝে চুপটি করে বসে থেকে জীবন কাটিয়ে দেবে? তা' যদি কর, তা হলে আত্মহত্যার সমান-ই পাপে তোমরা লিপ্ত থাকবে।

তোমাদের পুরুষেরা যদি তোমাদের মুক্ত করে দিতে না চায়, তা' হলে তোমার মত শিক্ষিতা মেয়েদের নিয়ে একটা দল গড়তে হবে, যারা আপনাদের ছোট-খাট দাবী-দাওয়া বিসর্জ্জন করে চিত্তের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে দেশের ভগ্নীদের দুঃখ দূর করবার জন্য। তারা নিজেদের উপবাসী রেখেও মুক্তির বাণী প্রচার করবে, যার উদাত্ত-স্বর গৃহপ্রাচীর ভেদ করে অন্তঃপুরে আবদ্ধ নারী-দের প্রাণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে—তাদের টেনে নিয়ে আসবে, আলোর মাঝে, আনন্দের মাঝে, জীবনের সত্য পথের-ই উপর।

তোমাদের এই প্রচেষ্টা, বিদ্রোহের সামিল বলেই, তোমাদের সমাজ ঘোষণা করবে—পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ করচ বলে তোমাদের উদ্দেশে গালি

বর্ষিত হবে। কিন্তু শান্তির ঘুম-পাড়ান গানে তোমরা মুগ্ধ হয়োনা।—ও শান্তির যে কোনই মূল্য নেই, তা আগে তোমায় একবার বলেছি।

আমাদের দেশকে ত তোমরা স্বাধীনতার লীলাভূমি বলেই জান। কিন্তু আমাদের দেশের লোকই কি পরের ওপর আধিপত্য স্থাপন করবার বাসনা ত্যাগ করতে পেরেচে? দাসজাতিকে মুক্ত করে দিয়েচে বলে ব্রিটিশ পুরুষ যখন বিশ্বে আপনার ন্যায়পরায়নতার পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল তখনো আপনার দেশের নারীকে চেপে দাবিয়ে রাখতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেছিল না। নারীর বড় হবার পূর্ণ হবার, আকাঙ্ক্ষা কোন মতে সইতে না পেরে তাদের নির্যাতনই করেছিল। তাই বাধ্য হয়ে অনেক নারীকে পুরুষের আধিপত্য অগ্রাহ্য করতে হয়েছিল। অবিরাম সংগ্রামে তারা সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করেছিল। আপনাদের শক্তি প্রয়োগে তারা পুরুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, নারী উপেক্ষার সামগ্রী নয়,—খেলবার পুতুল নয় - বিশ্বে তার স্থান ঠিক পুরুষেরই পার্শ্বে।

সত্যের কাছে অসত্যকে চিরদিনই মাথা নোয়াতে হয়—পুরুষের পৌরুষ-গর্ব্বও তাই টিকল না,—সে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। পুরুষ তোমাদের গতির বিঘ্ন ঘটালে তোমাদেরও এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে

বিবাহের পর প্রথম যে চিঠিখানা তুমি আমায় লিখেছিলে, তাতে তুমি আমায় জানিয়েছিলে যে, তোমার ব্যক্তিত্ব তুমি কখনো বর্জ্জন করবে না। কিন্তু আজ তোমার অজ্ঞাতসারে সে ব্যক্তিত্ব যে চাপা পড়েচে, তা কি বুঝতে পারনি? আজ যে নিজেকে শুকিয়ে মারবার কথা তুমি লিখেচ, ওটা কি তোমার দৈন্যের পরিচায়ক নয়? কেন তুমি আমাকে জানাতে সঙ্কোচ বোধ কচ্চ যে, জীবন তোমার দুর্ব্বহ হয়ে উঠেচে?

অত্যাচার যারা করে, তারা যেমন নিজেদের অন্তর দেবতাকে অগ্রাহ্য করে, তেমনি অত্যাচার যারা সয়, তারাও সেই দেবতার অবমাননা করে। এ দুটোই মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে থাকে। তুমি নিজে যে সত্য উপলব্ধি করেচ, কিসের আশায়, কোন প্রলোভনে তা বর্জ্জন করে নিজেকে ছোট করে রাখবে? নিজেকে ছোট করে রাখাকে আমি মনের দাসত্ব বলি। ও ভাব পরিহার করতে না পারলে অন্যকে ত মুক্ত করতে পারবেই না, নিজেকে পর্য্যন্ত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলবে।

পরিবারের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য রয়েচে, তা যদি দ্বিধাহীন হয়ে পালন

করতে পারতে, মিশতে যদি সক্ষম হতে কচি-কচি মেয়েদের সঙ্গে ঠিক সম-বয়সীর প্রাণ নিয়ে, মন খুলে যদি যোগ দিতে পারতে অন্তঃপুরের মহিলা মজলিশে—তা' হলে আমি আজ তোমার কাণে বিদ্রোহের মন্ত্র জপে দিতুম না, কারণ সেইটেই বুঝতুম তোমার সত্যিকার স্থান। কিন্তু তা' না হয়ে তুমি যখন জানিয়েচ যে তোমার বুকে ব্যথা পেয়েচ, তোমার অন্তরের করুণ আর্ত্তনাদ যখন আমার কাণে এসেও পৌঁছিয়েচে, তখন আমি মনে করচি, ওখানে তোমাকে বেশীদিন রাখলে তোমাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করা হবে। যে-টা তোমার কাছে মিথ্যা, জোর করে সে-টা চালাতে চাইলে তোমার জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।

বিয়ে করেচ বলেই কেন তুমি অ-কেজো হয়ে যাবে? যে সব মেয়েরা তোমার কাছে এসে সমবেত হয় তাদেরই শিক্ষিতা করে তোল—তাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টভাবে মিশতে চেষ্টা কর। তাদের যা বলবার আছে তা' বলে নিঃশেষ করতে দাও। ও সম্বন্ধে আলোচনা না করে তারা থাকতে পারে না—আর কিছুই যে তারা পায়নি! তাদের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হলে, ক্রমে তারা তোমায় তাদের ব্যথার কথাও জানাবে, তখন তুমি যদি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাও, তা' হলেই তাদের হৃদয় জয় করতে পারবে। তাদের অভাব আছে অনেক, বুকে সঞ্চিত রয়েচে প্রচুর বেদনা—সে-সব ভুলতে তারা তোমারই সাহায্য চাইবে। এমনি করে শেষটায় দেখো তোমার কাজের আর অন্ত থাকবে না এবং সে কাজ সুন্দর ভাবে করতে পারলে তোমাদের নারীর অবস্থা অনেকটা উন্নত হবে।

সত্যিই ভাই, আমার বড় ইচ্ছা করে তোমাদের দেশের এই সব বাল-বধূদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করি—তাদের হাব-ভাব চাল-চলন নিশ্চতই দেখবার ও জানবার বিষয়।

তোমাদের দেশের যুবকদের সম্বন্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। আমি শুধু বিস্মিত হই এই ভেবে যে, পুতুলের মত পত্নী পেয়ে কি করে তারা তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে? যৌবন কি পূর্ণতার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তাদের চিত্ত নাচিয়ে তোলেনি? সকল রকম বন্ধনের প্রতি কি তাদের আন্তরিক ঘৃণা নেই? এ-সকলের যদি অভাব থাকে, তা' হলে তোমাদের নারীর অবস্থার চাইতে পুরুষের অবস্থা কোন মতেই উন্নত বলা যায় না। প্রাণের স্পন্দন যদি থেমে যায়, তা' হলে সমাজদেহের সর্ব্বাঙ্গ পচে উঠবেই।

ফ্যানি চলে গেছে। তাকে বিদায় দেবার দিন যে পার্টি দেওয়া হয়েছিল, তাতে যোগ দিয়ে তেমন আমোদ পাইনি।

বাগানের উত্তর কোণের সেই কুঞ্জটা, যেখানে নিরালা বসে তোমাতে আমাতে কত রকমের কথা হোত, সেটা এখন একেবারে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে রয়েছে—কেউ সে-দিকে যায় না।

আমি মাঝে মাঝে একা গিয়ে সেখানে বসি, সেখানকার গাছগুলো আর ফুলগুলো যেন হাওয়ায় তোমার খবর পেয়ে চুপি চুপি আমায় বলে দেয়। তাদের স্পর্শে আমি আরাম পাই, পুলকিত হই।

আর একটা খবর আছে; সেই যে শুকনো লম্বা পাইন গাছটা, কোনমতে তার কঙ্কাল খাড়া করে করে দাঁড়িয়ে ছিল—যাবার আগের দিন দুপুর বেলায় সেটাকে দেখিয়ে তুমি বলেছিলে—“বুকে এক রাশি আগুন নিয়েও বাইরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেই বেঁচে আছে—” তারও, শুনে তুমি খুসী হবে, দগ্ধ-দেহের সমস্ত কদর্য্যতা দূর হয়ে গেছে ফুলেভরা কতগুলি লতার আলিঙ্গনে। আজ তার বুক দিয়ে আর নৈরাশ্যের হা-হুতাশ বেরুচ্ছে না—আজ সেও হেসে হেসে কত ভাবে ভঙ্গিতে বাতাসের কানে কানে কত কথাই কয়। একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বুড়োর এই রঙ্গ দেখি। তোমারই—এলি।

(১০)

স্নেহের ঠাকুর-পো,

সাত বছর পরে বাপের বাড়ী এসেছি, তাই নিয়ম-কানুন ভুলে গিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত কেবল মা আর ভাই-বোনদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমার চিঠির জবাব দিতে সেই জন্যই দেরী হয়ে গেল। নীহারের একা থাকতে হবে শুনে কনক স্বেচ্ছায় কলকাতায় চলে এসেছে। কাজেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। তুমি নরেশকে অত ভালবাস বলেই নীহারকে কনক এমন আপন করে নিয়েছে? নীহারের এতটুকু অসুবিধা যেন কনকের বুকে শেল-বেঁধা বেদনার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে!

এখানে এসে তিন দিন গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। তাদের বাড়ী বসে তার দুঃখ-বেদনার কথা কিছুই শুনতে পারিনি—কারণ, তার ভাই-বউরা কড়া পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। কাল গৌরী নিজেই এসেছিল—এর জন্য গঞ্জনা সইতে হবে জেনেও। তিনটে ঘণ্টা একসঙ্গেই ছিলুম—কেমন করে যে সময় কেটে গেল, তা বুঝতেই পারলুম না।

ঠাকুরপো, নারীর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করচ, কিন্তু কত গভীর, কি মর্ম্মদাহী সে দুঃখ তা কি কখনো উপলব্ধি করেচ ? গৌরীর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হ'তে লাগল, সে যেন তার বুকটা চিরে আমার সামনে ধরেচে— আমি যেন স্পষ্ট করে দেখলুম তার সমস্তটা যায়গা, লাঞ্ছনা আর নির্য্যাতনের নিষ্ঠুর খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আমি তখনই বুঝতে পারলুম, তার মুখখানি কেন সব সময়েই ছাই-এর মত সাদা হয়ে থাকে—কেনই বা তার ওষ্ঠের বর্ণ নীল আর কেনই বা থেকে থেকে তা কেঁপে ওঠে—তার বুকটা কেন যখন তখন ফুলে ওঠে, আর চোখেই বা অষ্টপ্রহর জল জমে থাকে কেন। সবই আমি এক সঙ্গে বুঝে ফেল্লুম। শুধু বৈধব্যের বেদনা নয় ঠাকুর-পো, তার মনুষ্যত্বের প্রতি নির্ম্মম অবিচারই তাকে এমন ধারা জীবনে মরা করে রেখেচে। এখানে এসে সে তার কোলের ছেলেটাকে যমের হাতে তুলে দিয়েচে। দুনিয়ায় এসে সে বেচারা কেবল তাচ্ছিল্যই পেয়েছিল, তাই যমের আগ্রহ দেখে, তার কাছে সুখে থাকবে মনে করেই, গৌরী তাকে দিয়ে ফেলে স্থির হয়েচে।

এতটুকু কোলের শিশু, তাই দুধ তার রোজই লাগত। গৌরী একবেলা দু গ্রাস যা মুখে দিত, তার ফলে শেষ এই সন্তানটির খিধে মিটাবার মত দুধ সে নিজে যোগাতে পারত না। সংসারের গো-দুগ্ধের যতটুকু অংশ সে পেত, তাও অতি সামান্য। শেষটায় তাও বন্ধ হয়ে গেল—বুড়ো ছেলেকে আদর করে দুধ খাওয়ালে তার অসুখ হবে, ভাতই তার পক্ষে প্রশস্ত খাদ্য। ভাইদের উপর তার যে কোনই দাবী নেই, তা গৌরী জানত, তাই চুপটি করেই থাকত। কিন্তু শিশুর শরীরে আহারের এই অনিয়ম সইবে কেন?—তার যকৃৎ নষ্ট হয়ে গেল। শিশুর রোগ যখন ক্রমেই বৃদ্ধিপেতে লাগল, তখন গৌরী একদিন অভিমান ছেড়ে বল্লে—"একটীবার ডাক্তার দেখালে হয় না ?"

তার মধ্যমভ্রাতা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সে জবাব দিলে—"অত বড়মানুষী আমাদের এখানে চলবে না, ছেলে মেয়ের অসুখে ডাক্তার কি করবে ?"

মায়ের প্রাণ, তোমরা বোঝনা ঠাকুর পো, এতে কি করে ওঠে। পাতা লতা যে যা বলত, গৌরী তারই রস করে ছেলেকে খাওয়াত, ভাবত তাতেই ছেলে ভাল হয়ে উঠবে। তারই জন্য আবার লাঞ্ছনাও সইতে হোত।

তারপরের কথা, ঠাকুরপো, কাউকেও বলা যায় না। ছেলেটির যখন শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, তখনো গৌরী বল্লে—"দাদা, কি হবে ?" সে প্রশ্নের কোন জবাবই পেলেনা। তারপর সবই ফুরিয়ে গেল।

এই সব দেখেশুনে আমরা যে কত অসহায়। তা না ভেবে থাকতে পারিনে। নারীর বৈধব্য কখন উপস্থিত হবে, তা কে বলতে পারে? আর স্বামীর মৃত্যুর পরই সংসারের সকলে তার সঙ্গে এমনধারা অস্বাভাবিক ব্যবহার করলে পরিজনের শান্তির জন্য সে হৃদয় খালি করে স্নেহ বিলিয়ে দেবে কেন? আর কেনই বা অন্তরের ব্যাথা বুকে চেপে রেখে সে হাসিমুখে সকলের সেবা করবে?

সত্যি ঠাকুরপো, এইসব কথা যখন মনে করি, তখন তোমাদের প্রতি যে মমতা আছে, তা দূরে চলে যায়। কেন তোমাদের আপন মনে করব? এক মায়ের পেটের ভাই যদি এমনধারা পর হয়ে যায়, নাড়ীর টানই যদি এত সহজে ছিঁড়ে যায়, তা'হলে কেন সবার সুখ-সুবিধার জন্য আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত খেটে মরব? তোমরা খেতে দাও, পরতে দাও বলেই কি এত জোর? সে দিন তোমরা অন্নিই দাও?

গৌরীর জীবনের একটি ঘটনা, যা তোমায় বল্লুম সেইটেই, একমাত্র ব্যথার কথা নয়, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে কত অবিচারই সইতে হচ্ছে। সে সব এমনি নির্ম্মম যে, গৌরীর দশবছরের ছেলেটিকেও ক্লিষ্ট করে ফেলে। রাত্রিকালে মাকে জড়িয়ে ধরে সেও ফুলে ফুলে কাঁদে। গৌরী তাকে শান্ত করতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলে। মা আর ছেলের মিলিত উষ্ণ অশ্রুধারা কি একদিন গলিত গৈরিক প্রস্রবণের মত দেশ সমাজ সব পুড়িয়ে দেবে না?

নীহারের চিঠি পেয়েচি। সে লিখেচে, তার কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। কনক আর সে নাকি সারারাত গল্প করেই কাটিয়ে দেয়। আমরা ভাল আছি। তোমাদের খবর লিখো।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার—বৌদিদি।

(১১)

নরেশ,

অনেকদিন তোমায় চিঠি লিখিনি। কনকের চিঠি চতুর্পাঠাদন হ'ল পেয়েচি। সে ভালই আছে তুমি অবশ্য তা জান।

কনকের চিঠিতে অনেক কথাই জানলুম যা এতদিন আমার অজ্ঞাত ছিল। নীহার যে কলকাতায় থেকে মোটেও আরাম পাচ্ছে না, তা সে নিজে আমায় কোনদিন জানায় নি, তবে তার কোথাও যে ব্যথা জমে উঠছিল, তার

চিঠি পড়ে আমি তা বুঝতে পারতুম, যদিও যে বেদনায় কারণটা ঠিক ঠিক ধরতে পারিনি। কনক আমায় তা জানিয়েছে। চোখে আঙুল দিয়ে সে আমায় দেখিয়েছে যে, নীহারের প্রতি কি অবিচার আমি করছি।

তোমার মনে থাকতে পারে একদিন আমি বলেছিলুম, পাত্রী নির্ব্বাচনে সুবুদ্ধির পরিচয় তোমরা দাওনি। নীহারকে যে ভাবে আমার অভিভাবকেরা চালাতে চাইছেন, তাতে করে তাকে পীড়ন করাই হচ্ছে; যদিও আদর যত্নের এতটুকুও ত্রুটি কিছু হচ্ছে না। তাঁরা যে রকম বউ চান, তার জন্য কর্শিয়াং-এর কনভেণ্টে যাবার কোন প্রয়োজনই ত ছিল না। বাঙালীর ঘরে ঘরে অনেক মোমের পুতুল আছে, যা কিনতে দামত লাগেই না, অধিকন্তু মোটা হাতে দক্ষিণাও পাওয়া যায়। সেই রকম একটি খুঁজেপেতে নিয়ে এলে, অতি সহজেই সে সংসারের নিয়ম কানুনের সঙ্গে বনিয়ে চলে একেবারে পাকা গিন্নী হয়ে উঠতে পারত।

শুধু গালি দিলে অথবা দুর্ব্যবহার করলেই যে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়, তা নয়,—তার ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করলেই অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষিতা মেয়েদের বধূর আসনে বসাতে যারা ইচ্ছুক, তাদের দেখতে হ'বে যাতে তাদের চিত্তবৃত্তি সম্যক বিকশিত হবার সুযোগ পায়, পরিবারের জমাখরচের খাতা লিখতে শিক্ষিতা বধূর কোন আবশ্যক নেই।

আমি কালই দাদাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছি যে, নীহারকে আমি এখানে নিয়ে আসতে চাই। এ নিয়ে বেশ একটা গোলযোগ বেধে উঠতে পারে, কিন্তু তাই বলে নীহারের জীবন আমি ব্যর্থ করে দিতে পারিনে।

আমি জানি তুমি আমার কাজের সমর্থন করবে না। বেশী একটু ছিদ্রান্বেষী যারা, তারা এর মাঝে নানা কদর্য্যভাবের আরোপ করতেও বিরত হবে না, কিন্তু এও আমি জানি যে বিবাহ বলি নয়, নতুন জীবনের সূত্রপাত। তাই জেনে বুঝে আমি নীহারের জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিতে চাইনে। সংসারের কাজ চলা অনেক পরের কথা আগে নীহারের বাঁচা চাই।

এখানে এসেও নীহার যদি আনন্দ না পায়, তাকে আমি সেইখানেই পাঠিয়ে দেব যেখানে গিয়ে সে আরাম পাবে, তার জীবনকে পূর্ণতর করে গড়তে সক্ষম হবে। তার সঙ্গ হতে বঞ্চিত হলে, ব্যথা আমার খুবই লাগবে সন্দেহ নেই; কিন্তু সে বেদনা আমি সয়ে থাকতে পারব।

তুমি বলবে আমার এই সঙ্কল্প অত্যন্ত অস্বাভাবিক—কিন্তু যেখানে থেকে সে আনন্দ পাবে না জোর করে সেখানে আবদ্ধ রাখাই কি স্বাভাবিক?

• • • • • •

ওপরের ওই কথাগুলি লিখে ফেলে চুপটি করে খানিকটা সময় বসেছিলুম। কি ভাবছিলুম, জান? ভাবছিলুম তোমার সামাজিক অনুশাসনের শক্তির কথা। বাসরে কি প্রবল তার প্রতাপ! আমি যে তা একেবারে অগ্রাহ্য করতে চাই, তবুও আমার মাঝে এত সঙ্কোচ এনে দেয় যে, তা দূর করতে আমায় জোরের সঙ্গে উপরের কথাগুলো লিখতে হয়েচে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে, আমি অন্যায় কাজ করতেই প্রবৃত্ত হয়েছি। যাক্ নীহারকে আমি এখানে আনবই।

বউদির সেই গৌরীদেবীর করুণ কাহিনী তোমায় আগে জানিয়েচি। সম্প্রতি বউদির একখানা চিঠি পেয়ে তাঁর অবস্থা বিশদভাবে জানতে পারলুম। তোমার সমাজের কি এই সব বিধবাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নেই—ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দেওয়া ছাড়া? ধর্মের কাজ করবার ছলে কি ঘুমিয়ে থাকাও প্রশংসনীয়?

তুমি বলবে গৌরী দেবীর ইতিহাস একটা ব্যতিক্রম মাত্র। ওর উপর এতটা জোর দেওয়া সঙ্গত নয়। আমি কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে মোটেই রাজী নই। আমি বলতে চাই, এরূপ অত্যাচার ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হ'চ্চে বলেই, 'ও কিছু নয়' বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি। দাদা ওই কথা বলেই বউদিকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

বিধবাদের সম্বন্ধে কলেজে পড়বার সময়, তোমাতে আমাতে খুব আলোচনা হোত। তুমি বলতে, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করে সমাজ এই কথাটাই আমাদের বুঝিয়ে অথবা শিখিয়ে দিতে চায় যে, তুনিয়ায় যৌন সম্বন্ধটাই সব চাইতে বড় নয়—ও সম্বন্ধ ঘুচে গেলেও পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন আছে। বাংলার বিধবারা ওই সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করচে। জানিনা, এ মত তুমি এখনও পোষণ কর কিনা।

আমি কিন্তু আগের মত এখনও বলব যে, যৌন সম্বন্ধটা সব চাইতে বড় না হলেও—ওর শক্তি খুবই বড় এবং ওকে উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। প্রাণী-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, আত্মরক্ষা ও বংশ বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রাণী মাত্রেরই আছে। মানুষ যে প্রাণী সে কথা অস্বীকার করা যাবে না—যদিও আমরা

প্রাণী কিনা, প্রাণের পরিচয় পাইনে বলে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার বিশেষ কারণ আছে। আমরা জড়ের সামিলই হয়ে পড়েছি, তাই আমরা মনে করতে পারি যে, পতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নারীর প্রাণ-পদার্থটাও পাথরে পরিণত হয়—না হওয়াটাই অস্বাভাবিক, গুরুতর অপরাধ।

বাসনা-কামনা প্রভৃতি বর্জ্জন করতে শুধু বিধবাদেরই উপদেশ দাও কেন? তা'রা ত তোমাদের মতে অবলা—তাদের ত কেবল পরের গলগ্রহ করেই রেখেচ, এমন অবস্থায় সংযমে শক্তিশালিনী হয়ে, তারা তোমাদের কতটুকুই বা হিতসাধন করবে? আর নারীকে কি কাজ করবার অধিকার কিছু তোমরা দিয়েচ?

তোমরা, পুরুষেরা, যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে, বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত রয়েচে, তারা কেন সংযমে শক্তিমান হয়ে বিশ্ব-মানবের মুক্তিদান করতে যত্নবান হও না? তাহলে কাজ ত অনেক সহজ-সাধ্য হয়ে ওঠে।

তোমরা তা পার না এবং পার না বলেই সংযমের সবটা বোঝা বিধবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দায় এড়িয়ে বসেচ—আর নিজেদের বেলায় বিবাহটা করেচ পুত্রার্থং।

একটা গল্প তোমায় বলিনি—আজ মনে পড়ে গেল। প্রথম চাকরী পেয়ে যখন লাহোরে আসছিলুম, সেই সময়ের কথা। তোমরা ত হওড়া ষ্টেশনে আমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলে। ট্রেণ ছেড়ে দিলে মনটা ভারি খারাপ বোধ হচ্ছিল—অমর যে তুর্গিনেভের গল্প-কাব্য তাতেও মন বসছিল না। বইখানা হাতে করে বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিলুম। পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি ভদ্রলোকের কাশির আওয়াজে ফিরে চেয়ে দেখলুম যে বাতাস পেয়ে তার লম্বা পাকা দাড়ি, তাকে ভারি বিব্রত করে তুলেচে। আমি ফিরতেই তিনি উদ্ধত দাড়ী-গুচ্ছ বাঁ হাতে গুছিয়ে নিয়ে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"মশাই, কোথায় যাবেন?" জবাব দিতেই তার প্রশ্নের বান ছুটল। শেষটায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"বিবাহ হয়েছে?"

আমার একটু ভয় হোল। এতদিন ফাঁকি দিয়ে অবশেষে দেশ ছেড়ে যাবার পথে একটা ঘটক এসে তেড়ে ধরল। একটু অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে আমি বল্লুম—"আপাততঃ ও দিকে খেয়াল নেই—বেশ আছি।"

ভদ্রলোকের চোখ-দুটো যেন জ্বলে উঠল। তিনি আমার ডানহাতের

পাতা ধরে খুব খানিকটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বল্লেন—"এই ত চাই—ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া জীবনে কি সিদ্ধিলাভ করা যায়?"

আমি একটু স্তম্ভিত হয়ে তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি এমন একটি বক্তৃতা জুড়ে দিলেন, যা শুনলে তোমরা তাঁকে অতি সম্মানের সঙ্গে নিয়ে তোমাদের ধর্ম্মসভার আসনে বসাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতে।

গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌঁছিলে আমি কিছু খাবার কিনতে নেমে পড়লুম। ফিরে গিয়ে দেখি সেই ব্রহ্মচর্য্যের পাণ্ডাকে ঘিরে জনকত নতুন যাত্রী বসেছেন—তাঁর বক্তৃতা তখনো থামেনি। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার গুলো পুরে রেখে আমি আবার যখন তুর্গিনেভ খুলে বসলুম, তখন ভদ্রলোকটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে দেখিয়ে বল্লেন -"এই দেখচেন একজন কলেজের অধ্যাপক—এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নি এবং করবেনও না। এঁর মত সংযমী, ত্যাগী শত শত যুবক না হলে আমাদের দেশের দৈন্য ঘুচবে না—হিন্দুর সেই গৌরবের দিন আর কখনো ফিরে আসবে না।"

তিনি থামতেই আমি বল্লুম—"আপনি ভুল বুঝেচেন—বিয়ে কখনো করব না, এমন কথা ত আমি বলিনি।"

তবুও নিষ্কৃতি নেই। তিনি অম্নি জবাব দিলেন—"তা কি আমি বুঝিনি? বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, নইলে আপনার পূর্ব্বপুরুষদের যে পিণ্ডলোপ হবে। আপনার চরিত্রে এইটেই শিখবার বিষয় যে লালসার বশবর্ত্তী হয়ে আপনি বিবাহ করবেন না—করবেন কর্ত্তব্যের অনুরোধে।"

তাঁর বক্তৃতা সমানই চলতে লাগল। আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা যে আগাগোড়া ভুল তা আমি তাঁকে বোঝাবার জন্য দু'একবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তা' তাঁর কাণেই পৌঁছিল না; অগত্যা আমি নিরস্ত হলুম।

তিনি অপর একটি ভদ্রলোককে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লেন—"মশাই, ত্রিশ বৎসর যাবত স্কুলে শিক্ষাদান করবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেবার চেষ্টা সব সময়েই করেচি, কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব মশাই, কত ছেলে পাশ করে বেরিয়ে কত উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েচে—কিন্তু মানুষ হলো না একটিও। হবে কি করে মশাই?—ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।"

যাঁকে এ সব বলা হচ্ছিল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন -"আপনার যাওয়া হচ্চে কোথায়?"

"আজ্ঞে, রাণীগঞ্জে

"রাণীগঞ্জে কোথায় যাবেন বলুন ত ?" অপর একজনে জানতে চাইলেন।

"হরনাথ চাটুজ্জের বাড়ী।"

"বটে! তিনি আর আমি যে এক আফিসেই চাকরী করি। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি ?"

"আজ্ঞে আমি তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেচি।"

"বটে, বটে।" রাণীগঞ্জের ভদ্রলোকটি কিছুকাল চুপ করে থেকে বক্তা মহাশয়ের আপাদ মস্তক বার বার করে দেখতে লাগলেন। তারপর সহসা বলে ফেল্লেন—"আপনার এটি দ্বিতীয় পক্ষ না ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বলেন কি মশাই, ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে এতটা বক্তৃতা করলেন আপনি।" পার্শ্বের আর একটি ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে বল্লেন।

বক্তাটি তাঁর লম্বা দাঁড়ীর মধ্যে হস্তচালনা কর্‌তে কর্‌তে বল্লেন—"বলেচিইত মশাই, লালসার জন্য বিবাহ, আর পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধে বিবাহ, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের—"

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে রাণীগঞ্জের ভদ্রলোকটি বল্লেন—"কিন্তু শুনেচি মশাই, প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়েও আপনার আছে ?"

"আজ্ঞে, দুটি কন্যার বিবাহ দিয়ে অব্যাহতি পেয়েচি। একটিমাত্র ছেলে, যদি কোন অমঙ্গল হয়, তা'হলে পূর্ব্বপুরুষদের পিণ্ডলোপ হবে না ? আপনারাই বিচার করুন, একটি মাত্র গুঁড়ো বইত নয়—তার ভরসায় কি থাকা যায় ?" সকলে হো হো করে হেসে উঠল। আমি বইপড়ায় মন দিলুম। ট্রেণ কখন রাণীগঞ্জ পিছনে ফেলে এসেছিল, তা টেরও পেয়েছিলুম না।

তুমি ভাবচ তোমাকে চটাবার জন্যই আমি এই গল্প লিখলুম। তা কিন্তু মনে করোনা—আমি নিজে দেখেচি, শুনেচি।

আশা করি ভাল আছ। তোমাদেরই—মোহিত।

(১২)

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে এভি,

ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা, এভি। স্বামী আমার কি লজ্জায়ই না ফেলেচেন। তিনি তাঁর দাদাকে লিখেচেন যে আমাকে তিনি লাহোর নিয়ে যেতে চান।

তুমি বলবে, বেশ করেচেন। তুমি বোঝনা, তোমাদের সমাজ অন্য ধরণের— আমাদের অভিভাবকেরা একে বিষম বেয়াদবী বলে মনে করেন। আমি আজ শ্বশুরের মুখের দিকে চাইতে পারচিনে।

এ সব অনর্থের মূল হচ্চে কনক—স্বামীর বন্ধু-পত্নী। এমন একটা কাজ করে ফেলেচে আমাকে না জানিয়ে। আগে বুঝতে পারলে আমি তাকে আমার অন্তরের ব্যথার কথা বলতুম না। আমার মোটেই মনে হয়নি যে, সে স্বামীকে জানাবে। আমার এখানে একা থাকতে কষ্ট হবে বলে, সে বর্দ্ধমান হতে এসেছিল। এখন দেখচি তার না আসাই ছিল ভাল। এর জন্ম তাকে আমি সহজে ক্ষমা করতে পারচিনে। আজ সারাদিন তার সঙ্গে আমি কথা কইনি— কেবল একটু আগে রাগ করে তার ঠোঁট দুটো চেপে ধ'রছিলুম —এমন লাল হয়ে উঠেছিল যে, আমার ভয় হচ্ছিল পাছে আমার হাতশুদ্ধ রাঙিয়ে দেয়। সে কিন্তু তবুও আমার গলা জড়িয়েই দাঁড়িয়ে রইল। আর কঠোর হতে পারলুম না—বুকে চেপে ধরলুম। কিন্তু কি কাণ্ডই সে ঘটিয়েচে।

দিদিই বা শুনে কি মনে করবেন। সাত বছর পর একটি মাসের জন্ম বাপের বাড়ী গিয়েছেন, আর তাতেই এত সব। কনককে দিয়ে আমি চিঠি লিখিয়ে ছেড়েচি যে, এসব তারই দুষ্ট বুদ্ধির ফল—আমিও তাই লিখেচি।

আর কনকের-ই বা কি দোষ? সে আমায় খুব বেশী ভালবাসে বলেই না আমার ব্যথায় ব্যথিতা হয়েচে এবং তারই জন্ম স্বামীকেও জানিয়েচে। সে কি করে বুঝবে যে, এতেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার ওপর তাগিদ ওয়ারেন্ট জারি করে বসবেন, তাঁর স্ত্রীকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবার জন্ম। স্ত্রীটি যেন তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি। আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন বোধ করলেন না।

এই দেখনা ব্যাপার! নারীর অধিকারের জন্ম যারা মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাফিয়ে বেড়ায়, তারা নিজেরাই নারীর মর্য্যাদা বোঝে না। এদের কথা বিশ্বাস করে, এদের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে চল্লে, শেষটায় কি ভয়ানক পরিণতি হবে বলত?

তোমার কথাই ঠিক, এভি। পুরুষের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আমাদের লাভ নেই। পুরুষের চোখ দিয়ে আমরা নিজেদের অভাব দেখতে চাইব না। আমাদের বুকের ব্যথা তারা কি করে জানবে, বুঝবে? আমাদের অন্তর দেবতারই আদেশে আমরা পরিচালিত হব।

আমি আজ স্বামীকে লিখে দিয়েচি যে, আমি লাহোর যাবনা। সঙ্কল্প করেচি, এখানে থেকেই, যে সব মেয়েরা প্রায় রোজই আমার কাছে আসে, তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করব। আমার শোবার ঘরটাকে একেবারে ক্লাসরুমের মত করে সাজিয়ে ফেলেচি—মেয়েরা এসে দেখে অবাক হয়ে যাবে।

বুড়ো পাইন গাছটার নব-যৌবন প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে সত্যিই বড় খুসী হয়েচি। আকাশে বাতাসে সে জীবনের আনন্দ-সংবাদ পেয়েছিল বলেইত নৈরাশ্যের জড়তাকে দূরে রাখতে পেরেছিল। আজ যে তরুণ-ব্রততীর সংস্পর্শে সে আনন্দে মেতে উঠেচে, তার কারণ হচ্ছে, বার্দ্ধক্যের ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছিলনা। জীবনের গূঢ় রহস্য ওর যেন জানা ছিল।

আমি ভাবি মানুষের সঙ্গে এদের কি আশ্চর্য্য পার্থক্য। মানুষ কেবল জড়তাকেই খুঁজে বেড়ায়, দুঃখ-দৈন্যকে বড় করে দেখে দেখে নিজেকেই ছোট করে ফেলে, মৃত্যুকে সর্ব্বদাই আসন্ন জেনে অতি সহজেই তাকে বরণ করে নেয়—অথচ এই মানুষই নাকি ভূমার পরিচয় পেয়েচে—বিশ্বের মূল সত্য উপলব্ধি করেচে।

আমি কত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হতে দেখেচি, কত শীর্ণা স্রোতস্বিনীর বুকে তরঙ্গের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেচি, ছিন্ন মেঘ-খণ্ডের চটুল নৃত্য-ভঙ্গিতে বিস্মিত মুগ্ধ হয়েচি—কিন্তু কখনো পক্ককেশ লোকের অধরে হাসির মাধুরী দেখিনি, কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টিতে তেজের পরিচয় পাইনি, শুকনো বক্ষপঞ্জরের ভিতর জীবনের রাগিনী শুনিনি। পক্ষান্তরে উপলব্ধি করেচি, বাইরে বিরাট সাজ-সজ্জার ভিতরে দারুণ দৈন্য, মোহন আঁখি-তারকায় বেদনার ব্যঞ্জনা, স্ফীত বক্ষের মাঝে নৈরাশ্যের হাহারব।

তুমি যাই বল এভি, আমার বিশ্বাস, মানুষ প্রাণকে খুঁজে পায়নি। যদি পেত, তা' হলে এত সহজে ও-পদার্থকে তারা হারিয়ে বোসত না—ও-কে বেশ করে, আরামের সঙ্গে, ও-র সবটুকু আনন্দ নিংড়ে উপভোগ করে তবে ছাড়ত।

আমরা, মানুষেরা, কিছুতেই তা পারচিনে। আঘাতের ব্যথা ভুলতে আমাদের বড্ড বেশী সময় লাগে। অনেক সময় আঘাত-জনিত ক্ষতটাকে বাড়িয়ে তুলেই আমরা নিজেদের মৃত্যুকে কাছে টেনে আনি, আর মৃত্যু যতদিন না এসে পড়ে, ততদিন জীবনের আনন্দকে দূরে রাখবারই চেষ্টা করি। জীবনের এই নিরানন্দই আমাদের বুকের মাঝে নৈরাশ্য জমিয়ে তোলে—তাই অ-কার্য

যে যৌবন চলে যায় তাকে আর ফিরে পাইনে। জীবনে নব বসন্ত এসে আর কখনো আমাদের পুলকিত উন্মত্ত করে তোলেনা, অন্তরের শুকনো বুকে কোকিল দোয়েল সুরের ঢেউ খেলিয়ে দেয় না।

এ'সব কথা যে আজই কেবল আমার মনে হচ্চে, তা নয়—ছুটির দিনে নিস্তব্ধ দুপুরে জানালার ধারে বসে যখন বুড়ো পাইন গাছটা আর তার জ্ঞাতি-গোষ্টিদের দিকে চেয়ে দেখতুম, তখন আমার কেবল এই-সব কথাই মনে হোত।

বাড়ীতে, শুনচি, আমাকে লাহোর পাঠাবার কথা নিয়ে খুবই আলোচনা চলচে। দেখি কি হয়। খুব লম্বা চিঠি দিয়ো। ইতি

তোমারই—নীহার।

নারায়ণের-পঞ্চপ্রদীপ

সপ্তজিহ্বা

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

চতুর্থ অধ্যায়

(ত্রিবেণীর কথা)

১

সরস্বতী

হাসির আমার এ কি হল! সে এই মাস-খানেকের মধ্যে এমন হয়ে গেল কেন? মা ভাবছেন, দিদিমা কাঁদছেন, এমন কি বোধ হচ্ছে যেন বাড়ীশুদ্ধ সবাই ভাবছে যে এই সারা গ্রামখানার হাসিখানি এমন হয়ে একটা ছোট্ট ঘরের কোণে মিলিয়ে যাচ্ছে কেন? এমন কি এই হতভাগিনী বাকশক্তিহীন মানুষটাও যে মূক দৃষ্টিতে জানাচ্ছে যে তার করুণাময়ী হঠাৎ তার প্রতি এমন অকরুণ হয়ে উঠল কেন? কেবল ঘরের কোণে বসে একটা ছবি নিয়েই ভাবছে, না হয় তুলি বুলুচ্ছে, না হয় হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে।

ছবিখানাও দেখছি—একটী ভিখারীর মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কত ফুল, কত পোঁড়া, কত হীরে মাণিকের রাশি হেলা ফেলা করে সাজান। কিন্তু তার মাঝখানে গৈরিক বসনে ভিক্ষাপাত্র হাতে একজন ভিখারী। এ যেন সেই তার পূর্ব্বের আঁকা বুদ্ধদেবের ছবিখানার নতুন সংস্করণ। সেই বুদ্ধের ছবিখানা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে, আর দেখতে পাই নে। কিন্তু তার স্থানে এ কার মূর্ত্তি সে আঁকছে। এ মুখখানার সঙ্গে যাঁর সাদৃশ্য রয়েছে তাঁকে এমন সন্ন্যাসীর বেশে সাজিয়ে দেবার কি কারণ যে আছে তাও ত' খুঁজে পাই নি। প্রিয় বাবুর চেহারার মধ্যে কোন স্থানেও ত' সন্ন্যাসীর লক্ষণ আমি দেখতে পাই নি। তবে আমি তাঁকে অধিকাংশ সময় দূর হ'তে না হয়, আড়াল থেকে দেখিছি, তাই জোর করে বলতে পারি নে বটে, কিন্তু কৈ আর কাউকেও ত' এ রকমের কোনো কথা বলতে শুনিনি। তবে শুনিছি বটে ইনি খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান লোক। তাই বলে এঁর মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাব কি করে হাসি দেখলে?

প্রিয়ব্রত বাবু যে খুব ভাল লোক তাত' সবারই মুখে শুনছি। শুনছি তিনি আসাতে গ্রামের শ্রী ফিরে গেছে। সারা দেশের লোক এঁর প্রশংসা করছে—সমস্ত গ্রামের হেন কাজ নেই যাতে নাকি এঁর হাত নেই। গ্রামের দুঃখী দরিদ্ররাও নাকি বেশ দু'পয়সা রোজগার করে এঁর সাহায্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় করে নিচ্ছে। তবু কেউ ত' বলেনা যে ইনি সন্ন্যাসী। যা বলেন বটে, যে ম্যানেজার বাবু খুব ধার্ম্মিক, শুদ্ধাচারী, স্বল্পভাষী, স্বল্পব্যয়ী মানুষ। বিষয় বুদ্ধিও শুনেছি তাঁর যথেষ্ট আছে—বিষয়ের আয়ও বেড়েছে। কিন্তু কেউ ত তাঁকে কৈ সন্ন্যাসী বলে না, বা সন্ন্যাসী বলে ভুল করে না? তবে সেই বিষয়ী মানুষটির মধ্যে এই অদ্ভুত মেয়ে মানুষটী সন্ন্যাসীকে কোথায় দেখতে পেলে?

সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী—কেবল দেখেছিলাম সেই এক দিন, আর দেখছি এই এতকাল পরে আমার ঘরের দ্বারেরই কাছে। জানি না আমার কি সৌভাগ্য যে আমাদের সেই কতদিনের হারানো চাঁদ আবার আমারই অদৃষ্টে দয়া করে উদয় হয়েছেন, দয়া করে ধরা দিতে এসেছেন।

ধরা দিতে? হায় রে মেয়ে মানুষের প্রাণ! এ কথা কেমন করে, কোন্ সাহসে তুই বল্লি? কৈ তিনি ধরা দিলেন? সেই যেমন প্রথম ধরা দিতে এসে ধরা না দিয়ে সরে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি করেই ত' আজও কাছে

এসে ধরা দিয়ে আত্মস্থ হয়ে বসে আছেন। এখন যে ইনি আরও দূরে—বহু দূরে কোন সপ্তর্ষি লোকের ধ্রুবতারার মধ্যে লীন হয়ে আছেন। আমার যোগী যে ধ্রুবলোক হতে নামতেই পারেন না। না—না—নেমে কাজ নেই। তুমি অমনি ধ্রুবলোকেই থাক, আমিও এই অধ্রুবের জগৎ হতে তোমার ঐ দুটী বিশাল কোমল নয়নের মধ্য দিয়ে আমার ধ্রুব ভক্তিকে সেই লোকে পাঠিয়ে দিই।

কিন্তু হাসিই বা এ কি করে বসল? হাসি এ কোন্ অপরিচিতকে এনে আমাদের দুই বোনের মাঝখানে দাঁড় করালে। একে কে চায়? আমি? কৈ একদিনও ত' এঁর শুভাশুভ কোন কর্ম্মের দিকে ফিরে চাইবার কোনো অবসর পাই নি, তবে কেন আমার এত কাছে, আমার হাসির হাসিটুকুর অন্তরে এঁর স্থান হল? হাসি এ কি করে বসল?

তাকে মানা করবার জো নেই। মানা করলে বলে, 'আমার বাবা ক্রিশ্চান হয়ে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি ঘরে থেকেই ক্রিশ্চান। আমি তোমাদের এই সব বাজে লোকাচার মানি নে।' সে বাস্তবিকই কোন দিন কোন মিথ্যে সংকোচ রাখে নি, যখন যেখানে যাবার দরকার বোধ করেছে সেখানে গিয়েছে, যে কাজ করবার দরকার বোধ করেছে তাই করেছে। কেউ তাকে বাধা দেয় নি, দিতে পারে নি সে তার হাসির জোরে সমস্ত বাধাই উড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাকে কে ঠেকাবে? আমি? আমার সে সময় কৈ? ইচ্ছে কৈ? শক্তি কৈ? আমার সমস্ত শক্তিই যে এক জায়গায় আটকে গিয়ে শিবের জটায় গঙ্গার মত পাক খাচ্ছে। কোন্ ভগীরথ তাকে আরাধনা করে নামিয়ে আন্‌বে?

•

আজ প্রভাতে আমার সন্ন্যাসীর পাশে এ কাকে দেখে এলাম। এ কে—এ কে—এ কে গো। একে দেখলাম যেন আমার হোমাগ্নির পাশে শান্তিজলের কলসের মত চুপ করে শেষের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে! কে ইনি যাকে আমার সন্ন্যাসী এত আগ্রহে নিজের বুকের মধ্যেই টেনে নিচ্ছিলেন? কে তুমি এত দিন আপনাকে এমন ভাবে গোপন করে রেখেছ? তোমায় ত' চিনতে পারলাম না। তুমি আমাদের দাসত্ব করতে এসেছ, কিন্তু তোমার ঐ দাস ভাবের আবরণের মধ্যে যে মহাপ্রভুত্বের আভাস হঠাৎ বিদ্যুতের মত ঝলক মারলে তা কি সত্য, না তাও একটা মিথ্যা আলেয়ার আলো? যদি ঐ

আলেয়া হয় তা হলে অভাগিনী হাসি মরেছে, আর যদি আলেয়া না হয়ে ধ্রুব জ্যোতিঃ হয় তা হলে ? তা হলেও না জানি তার কি হবে ?

যা ভয় করছি, যদি তাই হয় ; তা হলেও ত তুমি সহজলভ্য নও। হে অপরিচিত, হে আবৃত জ্যোতিঃ, তোমার সত্য মূর্ত্তি প্রকাশ ক'র, নইলে যে আমরা ভয়ে মরি। নইলে অভাগিনী হাসির হাসি যে আর দেখতে পাব না।

কথা কও—কথা কও ! আজ আমার শুধু কথা শুনবার ইচ্ছে করছে—কথা কও ! হে চিরমৌন, আর কত কাল এমনি ভাবে শুধু একটী কথার আশায় বসিয়ে রাখবে, কথা কও। এত কথার জগতে, এত কোলাহলের হাটে, শুধু সেই একটী কথাই কি কেবল শুনতে পাব না। আর সবই শুনতে পাব কেবল সে একটী কথা হ'তে তুমি আমায় বঞ্চিত রাখবে ? প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা সন্ধ্যা হ'তে প্রভাত—এমনি করে কত রাত্রি, কত দিন কেটে গেল, কত কথা তুমি কইলে, কেবল সেই একটী কথা হ'তেই বঞ্চিত রাখলে ! বঞ্চিত রাখবে বলেই কি আগে হ'তে এই বাক্যহারা মেয়েটীকে আমাদের মাঝে রেখে দিয়েছ ? তাই সেই প্রথম দর্শনের দিনই তোমার চিরমৌন ভাষার প্রতিনিধি করে এই যাকে পাঠিয়েছ তাকে বুঝি কথা কহাতে পারলাম না।

কিন্তু আমিও ছাড়ব না, আমি একেও কথা কহাব। একেও একদিন তোমার সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেখাব যে আমি কহাতে জানি, মৌনতার মধ্যে মুখরতার জন্ম দিতে পারি। চির স্তব্ধ আকাশেও ধ্বনি জাগাতে পারি। ব্যথা আমার কথা কইবে এবং সেই সঙ্গে তুমিও কইবে—নিশ্চয়ই কইবে। যে কথার জন্য আমি আমার জন্ম হ'তে প্রতীক্ষা করে আছি, যে কথার জন্য আমার জনক ঋষি সারা জীবন অপেক্ষা করে গেছেন, সে কথা যে চিরদিন অকথিত থাকবে এ হ'তেই পারে না। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হ'তে পারে না—তাঁরই আশা আমার মধ্যে অনন্ত হয়ে জেগে আছে। সেই অমর আত্মার অমর আশা অমর সাফল্যকে টেনে আনবেই। আমি তার সূচনা দেখতে পেয়েছি।

* * * * *

আমার 'ব্যথা' আমার হাসির ব্যথা, এই মুখর সংসারের মৌন মূক 'ব্যথা'ও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন তার মৌনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি জেগে উঠেছে। কেন উঠেছে তাও ধরতে পেরেছি, কারণ তার হাসি আর তাকে তেমন করে প্রাণভরা হাসি দিয়ে বাঁচিয়ে তুলছে না। কিন্তু তাঁর

চোখে এত দিন পরে জল দেখতে আরম্ভ করিছি—সে কেঁদেছে। আমি তাকে ভাষা শেখাবার বিফল চেষ্টায় যতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, সে ততই মৌন অশ্রুভরা চোখে তার হাসির জন্য মিনতি জানাতে আরম্ভ করেছে। যদি এই মৌন ভাষা স্ফুট হয় এই এত দিনকার চেষ্টার ফল দেখা দেয়, যদি সে হঠাৎ তার স্ফুট ভাষা খুঁজে পায়, তা হলে কি সে যার মৌনতার প্রতিনিধি, সে কথা কইবে না?

কিন্তু তুমি ত' কথা কইতে পার, তোমার বন্ধুর কাছে ত' দূর হ'তে দেখলাম কত কথাই না কইছ। কেবল আমিই বঞ্চিত থাকব? আমার কাছে কি কেবল শুষ্ক উজ্জ্বল তত্ত্বকথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবার নেই তোমার? যে কথা বলবার জন্য তোমার সমস্ত দেহ মন আত্মা ছটফট করছে—হ্যাঁ করছে, নিশ্চয় করছে—সেই কথাটাই কেবল বাদ থেকে যাবে? তুমি কি মনে করেছ আমার কেবল কাণ দুটোই আছে, চোখ নেই, মন নেই, আর কোনো ইন্দ্রিয় নেই? আমি যে তোমার কতখানি দেখে নিয়েছি, তাই যে তুমি ধরতে পারছ না। তোমার যোগযুক্ত মন যেখানেই যুক্ত থাক, তোমার মনের মন যে কোথায় ধীরে ধীরে যুক্ত হচ্ছে তা তোমার চোখে পড়ছে না, এইটেই আশ্চর্য্য।

কিন্তু আমার যোগীর এই ভোগী বন্ধুটিকে কেমন যেন একটু ভয় করছে। কি যে কথা হয় এঁদের মধ্যে তা যে কোন দিন সাহস করে আড়াল থেকে শুনতে পারলাম না। আড়াল থেকে শোনা। ছি ছি, তা কেমন করে পারব? তা যেদিন পারব সেদিন কি আর আমার সন্ন্যাসীর কাছে আমার চির-প্রার্থিত রঘুনাথজীর কাছে যেতে পারব না? না—না, তা পারব না। যদি চিরদিন এই দু'জনের পরিচয় গোপন থাকে, তবু তা পারব না।

কিন্তু এক একদিন ইচ্ছা হয় প্রিয়ব্রত বাবুর মার কাছ থেকে, আর যদি সম্ভব হয় অবিনাশ বাবু উকিলের কাছ থেকে, এঁর পরিচয় আদায় করতে যাই। কিন্তু পারি না যে। কে যেন বাধা দেয়। তাই হাসির কাছেও এ কথা পাড়তে পারি না। লজ্জা করে—লজ্জা! আমার আবার এ উৎপাত কোথা হতে জুটল। যে কোন দিন কোন লজ্জা ভয়ের ধার ধারেনি, তার আবার লজ্জা!

কিন্তু তবু সেই লজ্জাও ত' আমার মধ্যে লুকিয়ে এসেছিল। এত দিনকার অব্যবহারেও ত' সে মরে নি।

বুঝি কিছুই মরে না, এই অমরতার জগতে কিছুই মরে না। কালে সবই ফুটে ওঠে, সময় হলে সবই আবার ফুলে পাতায় সজীব হয়ে ওঠে। ওরে মন! ভয় নেই, সময়ের অপেক্ষা কর্, তোর সাধনাও সফল হবে। (ক্রমশঃ)

(উপাসনা, শ্রাবণ।)

তুমি

[শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।]

তুমি শান্তি আমার তাপিত পরাণে
শয়নে স্বপন সুখ।
তুমি হৃদয়-কুসুমে স্নিগ্ধ মধুর
অমিয়-সুরভি টুক।
তুমি মলয় আমার প্রখর নিদাঘে
মধুমাসে পিকবর।
তুমি তরুণ তপন প্রভাতে আমার
সন্ধ্যায় সুধাকর॥
তুমি জ্যোছনা আমার আঁধার হৃদয়ে
অন্ধের হাতে নড়ি।
তুমি নিরাশ জীবনে আশাটী আমার
অকূল পাথারে তরী॥
তুমি হৃদয় সাগরে লহরী আমার,
বিষাদের মাঝে হাসি।
তুমি সুপ্ত জীবনে বাঁশরী আমার
নিয়ত জাগাও আসি'॥
তুমি ক্লান্ত হৃদয়ে আরাম আমার
প্রেমের মধুর স্মৃতি।
তুমি উদাস জীবন-প্রান্তরে মোর
অন্তর-ভরা গীতি॥

আগমনী

[রচনা—শ্রীকালিদাস রায়].

সুর ও স্বরলিপি

[শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা] .

ভৈরবী—জলদ্ একতালা

II {দা র্সা র্সা । র্ণা র্সা ণা I দা ণা দা । পা দা পা ।
এ স মা ন ব নী হৃ দ য়া জ ন নী

। দা জ্ঞা জ্ঞা । -ঋা সা সা I দা -ণা সা । সা -া -া ।
ম ণি ম এ জু যা- ক ০ ০ রে ০ ০

। সা সা সা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা মা । মা মা মা ।
হ র ষ ধা রা য় স র স ক রি য়া

। জ্ঞা মা পা । দা দা ণা I দা -ণা -র্সা । র্সা -া -া} II
এ স মা ব র ষ প ০ ০ রে ০ ০

{স সা II ণা সা সা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I মা মা মা । মা মা মা ।
(১) এ স শা ০ র দ গ গ ন ম গ ন ক রি য়া
(৫) এ স প য় স্বি নী ০ র আ পী ন ০ ভ রি য়া
(৯) এ স ন দ ন দী ভ রি ঊর্মী ০ নং বৈ ভ বে
(১৩) এ স শি শু র আ ০ স্য হা ০ স্যে ভ রি য়া

। জ্ঞা মা পা । পা পা দা I মা -পা -মা । দা -া -া ।
(১ক) শু চি জ্যো ছ না র বা ০ ০ নে ০ ০
(৫ক) ম ধু র গো র স র ০ ০ সে ০ ০
(৯ক) ফাঁদ্ তা র ভ ০ রি কা ০ ০ শে ০ ০
(১৩ক) মা ০ স্নে আ তি শা য ০ ০ য্যি ০ ০

পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২০

চারুর এত ঐশ্বর্য্যের সম্মুখে রাখুর দারিদ্র্য তাহাকে এমন জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছিল যে, চারুর সঙ্গে অতগুলা কথাবার্ত্তার পরেও তাহাকে রাখী অনুমান করিতে তাহার সাহস হইল না। চারু ফিরিয়া আসিলে, দেখিতে সে অবিকল রাখীর মত, কেবল এই কথা বলিবার জন্য আপনাকে রাখু সাহসী করিতে লাগিল।

কিন্তু সত্য সত্যই চারু যদি রাখী হয়? এক রাত্রির দেখা-শুনায় একটা স্ত্রীলোকের এতই কি সে আপনার হইয়া গেল যে, তার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপায়ন এত আগ্রহের সহিত তার সম্মুখে উপস্থিত করিতে সে ছুটিয়া আসিল? একবার সে মনে করিয়া দেখিল, সত্য সত্যই এই ঐশ্বর্য্যময়ী যদি তার স্ত্রী রাখীই হয়?

সেই যুগ পূর্ব্বের বাল-দম্পতির ভিতরে যৌনসম্বন্ধ না থাকিলেও, সুতরাং সম্বন্ধের অপব্যবহারে পত্নীর উপর ঈর্ষার কোনও কারণ না থাকিলেও চারুকে রাখী মনে করিতে কেমন তার একটা কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তার দারিদ্র্য চারুর নিবেদিত সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে অধিক প্রীতিকর বোধ হইল।

যাহা বিশ্বাস করিবার নয়, তাহা বিশ্বাস করিয়া আত্মপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ করিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতা। রাখু আবার সোফায় হেলান দিয়া মুদ্রিত চক্ষে তার চিরনির্ম্মম দুরবস্থা নিঙাড়িয়া যেটুকু মধু সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহাতেই এমন তার তৃপ্তি আসিল যে, চারুর ঘরের সৌন্দর্য্য আর তার দৃষ্টিকে মধুরতায় আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তৃপ্তির গাঢতায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

"ওরে বিশে, আ মর্ এখনও পড়ে' পড়ে' ঘুমুচ্ছিস? সকাল হয়েছে, উঠে পড়্!"

রাখু এমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যে, ঝির কথা তার কাণে না গেলে আরও

কতক্ষণ পরে যে তার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। ঘুম ভাঙ্গিতেই সে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া বসিল। উঠিবামাত্র সে বুঝিতে পারিল—রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে।

তখন ঘরের দোর খুলিয়া বাহির না হইয়াই সে ডাকিল—

"চারু!"

চারুকে ডাকিতে ঝি আসিল। সে উপস্থিত হইয়াই বলিল—

"হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন। আমি গড়গড়ায় জল ফিরিয়ে তামাক ঠিক করে' রেখেছি।"

"চারু?"

"গঙ্গাস্নানে গিয়েছে।"

"কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ—তখন বেশ ঘোর ছিল।"

বলিয়া সে গাড়ু হাতে লইয়া তার মুখ প্রক্ষালনের সাহায্য করিতে আসিল।

করুণ গীতে রাত্রির স্বপ্নবৎ জাগরণটাকে ঘুমন্ত করিবার জন্য প্রভাতী আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার রাখুকে দেখা দিয়া চলিয়া গেল।

"আমাকে তুলে' দিলে না কেন?"

"দিদিমণি ঘুম ভাঙ্গাতে নিষেধ করে' গেছে।"

আলোকের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রাখুর মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ঘুমিয়ে পড়াটা তার বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অন্য অন্য দিন অতি প্রত্যুষেই সে শয্যাত্যাগ করে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সে গঙ্গাস্নান করিতে যায়। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া একখানি নামাবলী গায়ে গঙ্গাজলেই সে তার নিত্যকর্ম্ম পূজাহ্নিক সারিয়া লয়, তারপর বাসায় আসিয়া সিক্ত বস্ত্র রক্ষা করিয়া যজমানদের বাড়ীতে পূজায় বাহির হয়। অত প্রাতঃকালে বাহির হইয়াও পূজা সারিয়া তার বাসায় ফিরিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়।

পূর্ব্বদিনে পূজার জন্য একজন প্রতিনিধি রাখিয়া রাখু শ্রাদ্ধবাড়ীতে গিয়াছিল। আজ ত আর সে ব্যক্তি তাহার অবর্ত্তমানে কাজ করিবে না। রাখু এইবারে আপনাকে বিপন্ন বোধ করিল।

"ঝি, তামাক খাবার দেরী সইবে না, ঐ দোরের কাছে আমি কাল কাপড় চাদর রেখেছি, এনে দাও—এখনি আমাকে যেতে হবে।"

"সেকি দিদিমণির ফেরবার অপেক্ষা কর্‌বেন না ?"

"অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই।"

"তা কি হয় ?"

"আমার বিশেষ কাজ আছে।"

"কি এমন কাজ ? সে আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।"

"না ঝি, আমি এখনি যাব। তোমার দিদিমণি এলে বলো, পারি ত আমি আর একদিন এসে তার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি কাপড়খানা এনে দাও।"

"তাইত, আমাকে যে তার কাছে মুখনাড়া খেতে হবে, ঠাকুরমশাই।"

"থাকতে পারলে আমি থাকতুম ঝি, আমাকে পাঁচ যজমানের বাড়ী পূজো করতে হয়।"

ঝি মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিতনেত্রে একবার রাখুর মুখের পানে চাহিল। এ ত ট্যানাপরা লক্ষপতি নয়—সত্য সত্যই গরীব ব্রাহ্মণ। সে ভূমিষ্ট হইয়া রাখুকে প্রণাম করিল—বুঝিল, সত্য সত্যই ঝড়ে বিপন্ন হইয়া নারায়ণ গতরাত্রে বেশ্যার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিল। উঠিয়া সে আর কোন কথা না কহিয়া রাখুর কাপড় আনিতে গেল।

"কই বাবাঠাকুর, কাপড় যে দেখতে পাচ্ছি না।"

তার কথায় প্রত্যয় না করিয়া রাখু নিজে বারান্দায় গিয়া দেখিল, কাপড় নাই। কাপড় খুঁজিতে সে পূর্ব্বোক্ত ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সেখানে তার পরিধেয় ত দেখিলই না, যে গরদখানা সে ছাড়িয়াছিল, সেখানাও সে দেখিতে পাইল না।

"তাইত ঝি, আমি যে বিষম বিপদে পড়লুম।"

ঝি বলিল—"আপনি ততক্ষণ তামাক খান, আমি কাপড় খুঁজে দেখি।"

"তুমি গড়গড়া এই ঘরে এনে দাও।"

"কেন, ঐ ঘরে সোফার উপরে বসুন।"

তখন-পর্য্যন্ত-পাতা সেই গালিচার উপরে বসিয়া রাখু বলিল—

"না।"

ঝি তামাক দিয়া কাপড় খুঁজিতে গেল। চারিদিক খুঁজিয়া যখন উপর নীচে কোথাও সে দেখিতে পাইল না, তখন কলতলায় শেষ অনুসন্ধানে সে দেখিতে পাইল, ব্রাহ্মণের সেই মলিন বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত হইয়া সেখানে পড়িয়া

আছে। তুলিয়া পরীক্ষা করিতে সে দেখিল—দিদিমণির অলক্তক-রঞ্জিত পদচিহ্ন তাহাতে পূর্ণভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে। সে-কাপড় সে ব্রাহ্মণের কাছে আনিতে সাহস করিল না। রাখুর কাছে ফিরিয়া ঝি মিথ্যা বলিল—

"কাপড় পেলুম না। দিদিমণি অন্ধকারে মাড়িয়েছিল বলে' গঙ্গায় বোধ হয় কাচতে নিয়ে গেছে।"

রাখু প্রমাদ গণিল। একবার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে চাহিল। দেখিবা-মাত্রই বুঝিল, রাত্রিকালের দীপালোকে অন্যমনস্কের চোখে কাপড়ের সৌন্দর্য্য সে সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। এ কাপড় পরিয়া কেমন করিয়া সে পথে বাহির হইবে? শুধু-পায়ে-পথ-চলা বামুনের এই কি-জানি-কত-টাকা মূল্যের বিচিত্র পরিধেয় দেখিয়া যদি পথের মাঝে কেহ তাহাকে কাপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করে! যদি এ চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পরিচিত লোকের সুমুখে পড়ে?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসার কথা তার মনে উঠে নাই। মনে মনে সারা পথ চলিয়া পথের শেষে বাসার কাছে যেমন সে উপস্থিত হইল, অমনি সে যেন দেখিতে পাইল, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া বাসার সঙ্গীসকল এমন কি গৃহস্বামী পর্য্যন্ত তাহার চলিবার পথের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তার এই বিচিত্র পাড়-ওয়ালা কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আছে। বাড়ীর গিন্নী বাহিরে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বৌগুলা কপাটের ফাঁক দিয়া উঁকি দিতেছে।

সে সকল চাহনির ভিতরে কত প্রশ্ন, প্রতি প্রশ্নের ভিতরে কত রহস্য, প্রতি রহস্যের মাথায় চড়িয়া কত বিদ্রূপের হাসি। সেগুলা স্থানটাকে যেন এক বিষাক্ত কোলাহলে পূর্ণ করিয়া তাহার সমস্ত যজমানদের শুনাইবার জন্য আকাশ-মার্গে উড়িতেছে।

চিন্তার প্রহারেই রাখু ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

"ঝি আমাকে যে একখানা কাপড় দিতে হবে?"

"কি রকম কাপড়?"

"থান হ'লেই ভাল হয়।"

"মাসী থাকলে থান কাপড় মিলতে পারতো। তা পোড়া মাসী যে গুরুকেও বিশ্বাস করে না। সে সমস্ত কাপড় সিন্দুকে পূরে চলে গেছে।"

"তোমার কাছেও কি আমার পরবার মত একখানা কাপড় নেই?"

"আমার ব্যবহার করা কাপড় তোমাকে কেমন করে দেবো ঠাকুর-মশাই?"

রাখু সেই পট্টবস্ত্র পরিয়াই যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। সিঁড়ির দিকে দুইপদ যাইতেই ঝি বলিল—

"একান্তই যদি তোমার না গেলে চলবে না, তবে আর একটু দাঁড়াও। আমি আর একবার খুঁজে দেখি। কলতলায় কাদামাখা একখানি কাপড় দেখেছি।"

বলিয়া সে আবার নীচে চলিয়া গেল এবং রাখুর কাপড় চাদর যথাসম্ভব জল-কাচা করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

"তুমি আমাকে বাঁচালে ঝি।"

বলিয়া ঝিকে কাপড় দিবার অবসর না দিয়া নিজেই তাহার হাত হইতে বস্ত্র যেন কাড়িয়া লইল।

"তুমি ত বাঁচলে ঠাকুর, আমাকে যেন গাল খাইয়ে মেরে ফেলো না। কখন আবার আসবে বল।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আবার যেমনি রাখু ভিখারী-বেশী হইল, তখন সে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিতে ঝিকে বলিল :—

"এখানে আর কি আমার আসা উচিত গা?"

ঝি দেখিল, দিদিমনির দেওয়া সেই দামী বেনারসী, ব্রাহ্মণের গায়ে জড়ান ময়লা কাপড় চাদরের পায়ে পড়িয়া যেন অতি দীনভাবে তাদের কাছে পবিত্রতা ভিক্ষা করিতেছে। সে বলিল—

"যদি ধর্ম্ম বজায় রাখতে চাও বাবা, তা' হলে তোমায় আর আসতে বলতে পারি না।"

"ঠিক বলেছ মা, এদিকে ত আসবই না—শুধু তাই নয়, এ কলকাতাতেও আর থাকবো না।"

"আবাগী পূর্ব্ব জন্মে কি পুণ্যি করেছিল।"

বলিয়া ঝি রাখুর চরণে আবার প্রণত হইল।

স্বর্ণাবৃত ঐশ্বর্য্যের বোঝা মন হইতে ফেলিয়া আবার রাখু পথে তার চির-সুহৃৎ দারিদ্র্যের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বাসায় ফিরিয়া চলিল।

২১

সারা পথের ভিতর আর কেহ কারুর সঙ্গে কথা কহিল না। অবগুণ্ঠনবতী চারু অগ্রে, আর পূর্ব্বমত তাহারই স্কন্ধে হাত রাখিয়া তার গুরু পশ্চাতে। তাঁর

গৃহ-প্রবেশের সাহায্য করিতে চারু যখন অবগুণ্ঠন ঈষন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল তখন গোঁসাইজী বলিলেন—"তোমাকে একটা কথা এই সময় বলা কর্ত্তব্য বলে' বলে রাখি।"

"বলুন।"

"শুনে বুঝে তার উত্তর দাও।"

গোঁসাইজীর কথার গুরুগাম্ভীর্য্যে চারু কোন কথা কহিতে পারিল না।

"চুপ্ করে রইলে কেন সরস্বতী।"

"বলুন।"

"সেই বেশ্যাটা গঙ্গায় ডুবে মরেছে, মনে কর।—মনে করেছ।"

"করেছি।"

"তা হ'লে তার স্বামীর কি হবে না হবে, সে আবাগী আর জান্তে আসছে না, কি বল? চুপ্ করলে চলবে না, শীঘ্র বল, গলি দিয়ে লোকজন চল্তে আরম্ভ করেছে, এরপর কথা কবার আর সুবিধা হবে না।"

"বাড়ীর ভিতর গিয়ে বল্লে চল্বে না?"

"না, বললে তোমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাব।"

গোঁসাইজীর কথা কোথায় গিয়া কি ভাবে দাঁড়াইবে, বুঝিতে না পারিয়া যা'হোক একটা উত্তর দেওয়ার মত করিয়া চারু বলিল—

"যখন মরে গেছে, তখন সে আবাগী আর কেমন করে জানতে আসবে!"

"তা'হলে সেই নিরীহ পাড়াগেঁয়ে বামুন যদি সেই বেশ্যাটার খুনের দায়ে বাঁধা পড়ে, তাকে কে রক্ষা করবে সরস্বতী?"

"ভগবান।"

"বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"সত্যি সত্যি, কোমরটায় মন্দ লাগেনিরে।"

চারু প্রথমে বৃদ্ধকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের সাহায্য করিল। পরে নিজে প্রবেশ করিল। বুঝিল, বুঝি জগতের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য লুকাইতে সে গুরুগৃহে প্রবেশ করিতেছে। মনে করিতেই তাহার মাথাটা কেমন আপনা আপনি ঘুরিয়া গেল। সে দোরের উপর উঠিয়াই গুরুর দেহের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না, একহস্তে চারুকে ধরিয়া অন্য হস্তে

বহির্দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তারপর চারু তাঁহাকে আবার ঘরে লইয়া যাইতে যেমন তাঁহার হাত নিজ স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিল, অমনি সে গুরুর মুখ হইতে শুনিল কি করুণামাখা কোমল স্বর!—

"হাঁ মা, এ বুড়ো ছেলের ভার নেওয়াটা কি তোর ভাল লাগছে না?"

"ওকথা আর বলবেন না বাবা, বল্‌লে আমি মরে যাব।"

"তাই বল, আমার শেষ বয়সের যষ্ঠি, তোর কথা শুনে আশ্বাস পাই।" বলিয়াই গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন "দামোদর, আরে মর— এখনও ঘুমুচ্ছিস্ নাকি—দামু!"

ভৃত্যের পরিবর্তে তাঁহার গলার আওয়াজ শুনিবামাত্র বাড়ীর ভিতর হইতে গোঁসাই-গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

আরও অনেক কথা ব্রাহ্মণী বলিতে যাইতেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাঁর আর বলা হইল না।

"সঙ্গে মেয়েটি কে?"

"কাছে এসে দেখো।"

"কে গো, চারু? তুই এমন সময় কোথা থেকে উপস্থিত হলি?"

গোঁসাইজীকে ছাড়িয়া চারু গুরুপত্নীর পদতলে প্রণত হইল। গোঁসাই-গিন্নি চারুকে সে সময়ে দেখিয়াই যে বিস্মিত হইলেন, এমন নহে। তাহার নীরবতা, তাহার মুখ চোখের ভাব বিশেষতঃ পশ্চাতে অবনত মস্তকে চারুর পানে চোখ রাখিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দণ্ডায়মান স্বামীর কেমন এক রকম নূতন-তর মধুর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এমন একটা গভীর বিস্ময় তাঁহাকে মুহূর্তে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, যে যদ্যপি গোঁসাইজী ভৃত্য দামুকে আবার ডাকিয়া স্থানের নীরবতা না ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না।

"দামোদর কি বাড়ীতে নেই গিন্নি?"

"থাকলে কি সে উত্তর দিত না। তিনটে দোর হাট করা খোলা, অথচ তুমি নেই, সে ব্যাকুল হয়ে তোমাকে খুঁজতে গেছে। আমিও এতক্ষণ পথের পানে চেয়ে দোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।"

"ভালই হয়েছে, এখন তুমি আমি ছাড়া আর এখানে কারো থাকবার প্রয়োজন নেই। মেয়েটাকে চিনতে পারছ ব্রাহ্মণী?"

"আমার চোখে ছানি পড়েছে না ভীমরতি হয়েছে—আজ এমন দুর্য্যোগে, এমন অসময়ে ওঁর কাছে কি জন্ত এসেছিলি ভাই চারু ?"

"ভুল করেছ গো ব্রাহ্মণী, ও চারু নয়।"

চারু এখন দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণকন্তা স্বামীর এ কথার পর থতমত খাওয়ার মত চারুর মুখের দিকে চাহিলেন।

ব্রাহ্মণ এবারে চারুকে বলিলেন—

"কি গো মা, তুই কি চারু ?"

চারু গোঁসাই-গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গোঁসাইজীর কথার উত্তর দিতে পারিল না।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন:—

"সেই পাপিষ্ঠা বেশ্যা আজ গঙ্গায় ডুবে মরেছে। আমি তাকে তুলতে গিয়ে গঙ্গাগর্ভ থেকে এই কন্তারত্নটী কুড়িয়ে পেয়েছি। কাঠামো দেখে ভয় পেয়ো না। আচার্য্য গোস্বামীর কুলবধূ। তোমার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে স্মরণ কর। তিনি কাঠামো দেখে ভয় পান নি, জাতির নীচতা দেখে ভীত হন নি, সমাজের যে স্তরেই হোক না কেন, যে লক্ষণযুক্ত রত্ন দেখেছিলেন, সেখান থেকেই তাকে তুলে এনে নিজের পরিবারভুক্ত করেছিলেন। চারু নয়, গঙ্গার ভিতর থেকে সেই মরা অভাগীর মূর্ত্তি ধরে মা-সরস্বতী কূলে উঠেছে। উঠেছে কন্তা হতে,—তোমাকে আমাকে কৃতার্থ করতে।"

বলিয়া ব্রাহ্মণ চারুর চিবুক ধরিয়া পত্নীর দিকে তার মুখ তুলিয়া বলিলেন—

"নাও চুমো খেয়ে মাকে আমার ঘরে নিয়ে যাও।"

ব্রাহ্মণ কন্তা স্বামীর কথার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আবরণের অর্থ বুঝিতে ত পারিলেনই না; চারুকে লইয়া কি যে করিবেন, তাহাও বুঝিতে না পারিয়া তিনি কেবল তাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া গোঁসাইজী বলিলেন—

"নিতে সঙ্কোচ হচ্ছে ব্রাহ্মণী ?"

"না মা, সত্যই কি চারু—"

"চারু নয় গো, সরস্বতী"

"সত্যই কি মা সরস্বতী, তুই বুড়ো-বুড়ীর ঘর আলো করে থাকতে এসেছিস্ ?"

"আমাকে থাকতে দেবে মা ?"

চারুর চিবুক করস্পর্শে চুম্বিত করিয়া দুটী হাতে তাহাকে বেড়িয়া গঙ্গা-নারায়ণ-পত্নী তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন।

ঘরে লইয়া যখন ব্রাহ্মণ-কন্যা চারুর মুখ হইতে সমস্ত ইতিহাস শুনিলেন, তখন তাহার গলা দুই হাতে জড়াইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"এস মা, তোমার ঘরে যেখানে যা আছে, সব বুঝে পড়ে নেবে এসো। বুড়ো তোমাকে সরস্বতী বল্‌লে কেন, আমি বলবো গঙ্গা। আমাকে মা বলে ডাকতে উথলে আমার কোলে এসেছ ?"

এক মুহূর্ত্তে একটা বার বছর ধরে ভুল করা মেয়ে এক সাধুদম্পতীর কৃপায় তাঁহাদের পরিবার-ভুক্ত হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

নারায়ণের নিকষমণি।

ইন্দ্রাণী উপকথা।—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১।•।

বাংলা সাহিত্যে একখানা আসল সৃষ্টি, খাঁটি প্রতিভার দান। সুরেশ-চন্দ্রের এক একটি গল্প, এক একটি সজীব ভাবমূর্ত্তি—চলনের চাতুর্য্যে, বলনের বৈদগ্ধ্যে, একটা অনাস্বাদিতের ব্যঞ্জনায় তাহা ভরপুর। সুরেশচন্দ্র সেই একজন শিল্পী যিনি তাঁর যাদুবিদ্যায় আমাদিগকে যেন আবার ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন বহুদিনের হারান অথচ গোপনে নিত্য অনুভূত একটা জগতের মাঝে, আমরা পাই এমন একটা জগৎ যাহা শৈশবের জগতের মত তরুণ সবুজ কল্পনাময়, হাস্যময়, সেই সাথেই আবার যাহার মধ্যে মিশিয়া আছে কি একটা সত্যিকার জ্ঞানের নিরেট জগৎ, প্রৌঢ়ত্বের দৃঢ় উপলব্ধ তত্ত্বরাজ্য।

মানুষ আজকাল যেমন স্থূলচক্ষু হইয়াছে, এমন বোধ হয় সে কোন দিনই ছিল না। তাহার শিল্পে সাহিত্যে তাই দেখিতে পাই বেশীর ভাগ বাহিরের জীবনের কথা, সাধারণ ইন্দ্রিয়-সৃষ্ট জগতের কথা। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে, ব্যবহারের জগতের মধ্যে যে সব শক্তির বা সত্যের খেলা চলিয়াছে হুবহু তাহাকে ফলাইয়া বা কল্পনায় তাহাকে রঙাইয়া দেখাই বহু শিল্পীর ধর্ম্ম হইয়াছে। এই ঘোর বাস্তবিকতা যতই কেন আমাদের প্রয়োজনের বা লাভের বস্তু হউক

না, প্রাণ সময়ে সময়ে সত্যই ইহাতে হাঁপাইয়া উঠে। আমরা চাই আলোর হাসির অপ্রয়োজনের অসম্ভবের কথা। কিন্তু নিছক রূপকথার যে সহজ ছেলেমানুষী তাহাতে বাস্তবিকই আমাদের তৃপ্তি হইতে পারে না, এমন কঠিন যুক্তির যুগে আমাদের মনের ছাঁচে সে রকম সৃষ্টি ধরা পড়িবেই না। তাছাড়া রূপকথা বা উপকথার গল্প—আরব্যউপন্যাস হউক আর ঠাকুরমার গল্প হউক—তলাইয়া দেখিলে, বাস্তবিকতারই রূপান্তর মাত্র, বাস্তবিকতাকে একটু টানিয়া বাড়াইয়া বলা মাত্র।

সুরেশচন্দ্র তত্ত্বের সঙ্গে কল্পনা মিশাইয়া একটা তৃতীয় লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিয়াছেন একটা কামলোকের চিত্র, মানুষ যেখানে মানুষই আছে কিন্তু এই স্থূলদেহের খোলস ফেলিয়া দিয়া আছে নিবিড় গোপন মৌলিক কতকগুলি আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা লইয়া, ইহাদের অবাধ লীলায় ও চরিতার্থতা, অন্ততঃ চরিতার্থতার সম্ভাবনা লইয়া। ইহা একটা সূক্ষ্ম জগৎ, বাস্তব অবাস্তবের কঠিন ব্যবধান যেখানে নাই—সূক্ষ্মের ভাবের শক্তি যেখানে স্থূল উপকরণ লইয়া যথেচ্ছ খেলিতে পারে—ছবির মানুষে যে প্রাণশক্তি নিথর জমাট তাহাই আর এক প্রাণের টানে দুলিয়া উঠিতে পারে, ছবির মানুষ জীবন্ত মানুষকে অনুসরণ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে (ইরাণী উপকথা), অন্তরে আমার যে মানুষ ভাবে মূর্ত্ত, ভাবের শক্তিতে বাহিরেও তাহা ভিন্ন মানুষকে ধরিয়া রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে পারে (একটি অসম্ভব গল্প)। মানুষের কামলোকের মুক্তসত্তা, পার্থিবলোকের বদ্ধ রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে পড়িয়া কেমন ব্যহত হইতেছে, ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, এই নিবিড় দ্বন্দ্ব বা ট্রাজেডিটিও আমাদের শিল্পী কেমন করুণ অথচ কোমল মৃদুল অবলেপে—আঁকিয়া দিয়াছেন (একটি সত্য গল্প, একটি আষাঢ়ে গল্প)। এই সূক্ষ্ম কামলোকেরই একটা নিছক তত্ত্ব ইহলোকের আবরণে আবেষ্টনে মুড়িয়া, রূপকে ঢালিয়া তিনি দিয়াছেন তাঁহার "ছোট উপকথায়।

জড়ের কঠিনের নিয়মের সত্যকে ভাঙিয়া যিনি নীচের টানা স্রোতের মুক্তগতির খোঁজ পাইয়াছেন, যাঁহার অনুভবে জাগিয়াছে মিলের যতি অপেক্ষা ছন্দের সুর, তাঁহার মধ্যে পাইব যে একটা অনির্দ্দেশ্যের রেশ, শেষ-না-হওয়ার জের তাহাও খুব স্বাভাবিক। অন্তরীক্ষবাসী শিল্পীর দৃষ্টি যেন আরও উপরে কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে—তাই সুরেশচন্দ্রের প্রত্যেক আখ্যায়িকা আমাদিগকে লইয়া ছাড়িয়া দেয় এমন একটি যায়গায় যেখানে গল্প শেষ

হইলেও কথা শেষ হয় নাই। "সমুদ্রের ডাকে" মানুষের এই রকম একটি কামনা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, যাহা লক্ষ্যহীন অর্থাৎ কামনাহীন কামনা, অহেতুক কামনা—কাম লোকের চরম কথা, মানুষের মানবীয় কামনা যেখানে নাই, বিশ্বসৃষ্টির তরঙ্গে তরঙ্গীভূত হইয়া যাওয়াই যেখানে মানুষের চূড়ান্ত সার্থকতা।

আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত খুবই পরিচিত। অতীন্দ্রিয় আত্মার কথাও যথেষ্ট জানি। কিন্তু সুরেশচন্দ্র বলিয়াছেন, আমাদিগকে জানাইয়াছেন একটা অন্তর্ব্বর্ত্তী লোকের তথ্য, একটা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব (psychic sensibility)। সুরেশ চন্দ্রের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে উঠিয়াছে পাশ্চাত্যের একজন শিল্পীর কথা। Oscar Wideএর The House of Pomegranates, The Picture of Dorian Grey প্রাণের অনুরূপ ধাত, দৃষ্টির অনুরূপ ভঙ্গী দেখাইয়াছে। শুধু তাই নয়, রচনা-প্রণালীর সম্বন্ধেও একটা সাদৃশ্য যে পাওয়া যায় না তাহা নয়, যাহাকে বলে jewelled style ফরাসী সাহিত্যের যাহা অতি সুলভ ও সহজ বস্তু, ইংরাজীতে তাহা চমৎকার ভাবে দিয়াছেন Oscar Wilde—বাংলায় সুরেশ চন্দ্র সেই ভঙ্গীমায় দেখাইয়াছেন তাঁহার কৃতিত্ব।

বীরবলের টিপ্পনী।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কৃত—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস। প্রিণ্টার ও প্রকাশক সুরেশ চন্দ্র মজুমদার –দাম আট আনা।

সেদিন ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ "সত্যের আহ্বান" নাম দিয়ে এক বক্তৃতা পড়েছেন—বক্তৃতাটা কতকটা রাজনীতির আর কতকটা চিরন্তন রীতির। ঐ বক্তৃতায় কবি বাঙালীকে কতকগুলো ছাপছাপ কথা শুনিয়েছেন। ঐ বক্তৃতার দিন চারি পর এক বন্ধুর মুখে, ওর একটা টিপ্পনী শোনা গেল। টিপ্পনীর ভাষা হচ্ছে—কবি মানুষ কবিতা নিয়ে থাকুন রাজনীতিতে তার কথা বলার কি প্রয়োজন—আর তার ভাব হচ্ছে কবি বা সাহিত্যিকের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে অনধিকার চর্চ্চা করা।

আমাদের কিন্তু ধারণা উল্টো। সাহিত্যিকের অধিকার কলম চালানো। এবং তা কোন্ বিষয়ের ওপর তার কোন সীমা নেই। প্রাচীন মিশরের "মমি" থেকে আরম্ভ করে আধুনিক Mount Everest এর expedition পর্য্যন্ত যে কোন বিষয়ে সাহিত্যিকের কথা বলবার অধিকার আছে। এ দুয়ের মধ্যে অবশ্য রাজনীতি সমাজনীতি বাদ পড়ে না। এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার মর্জ্জির উপরে এবং সে কথায় যদি ভাব ও রস থাকে তবে তা সাহিত্য হবে আর তা যদি না থাকে তবে তা waste paper besket এ যাবে। দেশের লোকে তা শোনে শুনুক না শোনে না শুনুক। তাই বলে সাহিত্যিকের কলমকে পাঠকরা ধরে রাখতে পারে না—কেন না সাহিত্যিকের মনটা ও মর্জ্জিটা তার নিজস্ব জিনিস।

ওপরে এত কথা বলবার মানে "বীরবলের টিপ্পনী" হচ্ছে অধিকাংশই আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ওপরে টীকা ও ভাষ্য, স্থানে স্থানে

অবশ্য নূতন সূত্রও আছে—অথচ প্রমথবাবুর নাম আমরা কোন রাজনৈতিক আড্ডার খাতায়ই দেখ্‌তে পাই নে। তবুও যে আমরা এ বই খানিকে অনধিকার চর্চ্চা বল্‌ছি নে তার কারণ আমাদের ঐ উপরিউক্ত মনোভাব। আর প্রমথবাবু যে একজন সাহিত্যিক এ বিষয়ে অন্ততঃ সাহিত্যিকদের মহলে দু'মত নেই।

বীরবলের লিখবার ষ্টাইল বাংলা সাহিত্যে একটা একেবারে নতুন জিনিস। বীরবলের কথায় সায় না দিলেও তাঁর লেখায় যে একটা রস আছে তা কারো অস্বীকার করবার উপায় নেই। অবশ্য নিতান্ত অরসিকের সম্বন্ধে আলাদা কথা। বীরবল দেশের মডারেট ও extremistদের এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন— "যাঁরা নিজেদের মডারেট বলেন তাঁদের বাক্য প্রধানত করুণরসাত্মক, আর যাঁরা নিজেদের extremist বলেন তাঁদের বাক্য বীররসাত্মক। এরূপ হবারই কথা, কেন না, মডারেটরা উদ্ধারের সেরা উপায় বের করেছেন ব্যুরোক্রাসির সঙ্গে গলাগলি করা, আর extremistরা সেরা উপায় স্থির করেছেন ব্যুরোক্রাসিকে, গালাগালি করা।" উপরের ঐ কথার ভঙ্গী দেখে কেউ স্থির না করেন যে বীরবল একজন পলিটিক্যাল নাস্তিক। আসলে তাঁর আস্তিক্য দু'দিকেই। কেননা ওর পরেই বলছেন—"পলিটিক্সএ উভয় রীতির যে কোনই সার্থকতা নেই, এমন কথা আমি বলি নে" তবে তিনি যে কথাটা বল্‌তে চান্ সেটা হচ্ছে এই যে "নাকি-করুণ' ও খেঁকি-বীর এ দু'ই আমার কানে সমান বেসুরো লাগে।"

বীরবলের লেখার একটা বিশেষ ধর্ম্ম হচ্ছে ঠাট্টা করতে করতে দু'ঠাট্টার মাঝখান দিয়ে কতগুলো সত্য কথা বলে নেওয়া। এ বইখানাতেও তার প্রচুর প্রমাণ আছে। সাহিত্য ও পলিটিক্সের বিচার করতে গিয়ে তিনি বলছেন—"সাহিত্যের ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মন গড়ে তোলা আর পলিটিক্সের কাজ লোকের মত গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য মন ও মত এক বস্তু নয়। * * *। এবং * * যে ক্ষেত্রে প্রথমটার যত অভাব সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টার তত প্রভাব।"

রাজনৈতিক হৈচৈতে যে সব ভিতরের কথা চাপা পড়ে যায় ভিতরের সেই সব অনেক কথা এই টিপ্পনীতে টেনে বের করা হয়েছে—কোথাও রহস্যের আবরণে কোথাও বা সহজ সোজা ইঙ্গিতে। যিনিই এটা হাতে নেবেন তিনিই দেখবেন যে এই সওয়া শ' পৃষ্ঠার বইখানি বিদ্রূপ ও কৌতুক, satire ও সত্য কথা, ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতায় মিলে একটা পরম উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। আমাদের বিশ্বাস এ বই যিনি পড়বেন তাঁর মূল্য ও মজুরি দু'ই পুষিয়ে যাবে। হাতে কাউ স্বরূপ থেকে যাবে দেশের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয়।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]　　　　[কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল

বর্ত্তমান সমস্যা

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

জগৎটা যে বড়ই খাপছাড়া—out of joints হইয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে আজকাল বোধ হয় আর দুই মত নাই। কোথাকার কি যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খিল ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে, সব গোলমাল এলোমেলো অবস্থায়। মানুষের জীবন কোন দিনই একেবারে নির্দ্দোষ ছিল কি না সন্দেহ, অনেক খানেই হয়ত জোড়াতালি চাপাচুপি রফারফি ছিল, তবুও মোটের উপর একটা বেশ দৃঢ় বাঁধন নিবিড় শৃঙ্খলা পাওয়া যাইত। কিন্তু এমন স্পষ্ট বেসুরা বেতালা অবস্থায় মানুষ বোধ হয় এই প্রথম পড়িয়াছে। সুখ সে হয়ত কোন দিনই পায় নাই, আজ কিন্তু সে স্বস্তিকে পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগে অ-ধাতস্থ লোকের (unstable mind বা neurotics) সাদা কথায়, পাগলের—যেমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এমন কোন দিনই ছিল না। শেষ পাগলামীর যুগ গিয়াছে, ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের যুগ। কিন্তু তখন পাগলদেবতার কৃপা হইয়াছিল বিশেষভাবে ফরাসী দেশের উপর—আজ কাল সমস্ত জগৎ ভরিয়া তাহার ওলট-পালট চলিতেছে।

বলা যাইতে পারে, নূতন সৃষ্টির নূতন সৃজনের এই হইতেছে পূর্ব্বাভাস। কিন্তু তাই মনে করিয়া ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। গাছ বা পাথর বা পশু নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মানুষের ধর্ম্ম হইতেছে সজ্ঞানে সৃষ্টির কাজে সহায়তা করা—

এইটি সে যতখানি করিতে পারিবে ততখানিই তাহার সার্থকতা। সুতরাং আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, এই সঙ্কটাবস্থায় কি করা মানুষের উচিত, কি না করিলে হয়ত নূতন সৃষ্টির নূতন শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে জগতে ঘটিবে শুধু প্রলয় আত্যন্তিক বিনাশ।

জগতের কলটা বিগড়াইয়া গিয়াছে—এটাকে সারিতে হইবে। অনেকে তাই নজর দিয়াছেন, নেহাৎই কলকব্জার দিকে, বাঁধন গুলি আঁটিয়া দাও, পেরেকগুলি কসিয়া দাও, ভাঙ্গা মরিচা ধরা পুরান যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তে নূতন যন্ত্রপাতি বসাও। অর্থাৎ আইন কানুন করিয়া বিধি নিষেধ দিয়া বাহিরের কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার কর, নূতন ব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলিয়া দাও। সুশৃঙ্খলার, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সভা সমিতি কর, কর্ত্তব্যের নিয়মাবলী বাঁধিয়া দাও, কার্য্যের ভাগ বাটরা কর, দায় ও দাবির যথাযথ পরিমাণটা মাপিয়া জুখিয়া ঠিক করিয়া ফেল। তাই সমাজের মানুষ-জীবনের কত রকম ছক আঁকিয়া system তৈয়ার করিয়া যে সম্মুখে ধরা হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ চৌদ্দটি সূত্রে জগতের দিবাযুগের চমৎকার একটি প্লান করিয়া দিলেন। বোলশেভিকেরা তাহাদের ব্যবস্থাপকদের নির্দ্দেশ অনুসারে ভয়ানক জোরে মানুষকে নূতন একটা যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া ঢালাই করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। আমাদের দেশেও বলা হইতেছে, একটা গবর্ণমেণ্ট বা শাসন যন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই ভারতবর্ষের সকল গোলমাল সকল সমস্যা চুকিয়া যাইবে।

কিন্তু এ কথাটা বুঝা কি এতই কঠিন, সব নিয়মাবলীই যে চোথা কাগজের টুকরা a scrap of paper? আইনকানুনের এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ শক্তি নাই, যাহার বলে সে আপনা আপনিই কার্য্যে পরিণত হইয়া যাইবে, জোর জবরদস্তি করিলেও ব্যবস্থা অনুসারে যে অবস্থা হইবে, হইলেও যে টিকিয়া থাকিবে এমন নিশ্চয়তা কিছুমাত্র নাই। লেফাফা মাফিক যতই থাকুক না কেন, মানুষের কাজ হইবে তাহার ভিতরটা যেমন সেই অনুসারে। ভিতরের প্রয়োজন অনুসারে মানুষ যন্ত্র গড়িয়া লইবে, বাহির হইতে দেওয়া কোন যন্ত্র সে ব্যবহার করিতে চাহিবে না, চাহিলেও পারিবে না। ভিতরটা যাহার দস্যু ভাবাপন্ন, সে-মানুষের হাতে সাধুর দণ্ডকমণ্ডলু তুলিয়া দিলে কি হইবে? কমণ্ডলুতে সে বিষ গুলিবে, দণ্ড দিয়া মাথা ফাটাইবে।

জগৎটা, মানুষের জীবনটা রুগ্ন পীড়িত। সুতরাং প্রতিকার চাই জগতের

কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে নয়, বাহিরের জীবনে নয়, প্রতিকার চাই মানুষের নিজের অন্তরে। মানুষকে ভিতরে ভিতরে শুদ্ধি ও স্বাস্থ্য পাইতে হইবে, তবেই বাহিরে শুদ্ধি ও স্বাস্থ্য দেখা দিবে। তাই অনেক মহাপুরুষ কবি শিল্পী বলিতেছেন, মনটাকে আগে বদলাও—মনো পূর্ব্বঙ্গমা ধর্ম্মা—সকল ধর্ম্মের আগে আগে চলিয়াছে মন, মনের গড়ন যেমন ধর্ম্মেরও গড়ন তেমনি হইয়া উঠে। কর্ম্মের পরিবর্ত্তনের আগে চাই ভাবের পরিবর্ত্তন, ভাবের পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে কর্ম্মের পরিবর্ত্তন—মনের, ভাবের পরিবর্ত্তনের পরে কর্ম্মের পরিবর্ত্তন সহজ, পূর্ব্বে একেবারে অসাধ্য।

এখন, এই মনের বা ভাবের পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? মানুষের ধারণা হইবে অন্য রকমের, তাহার চিন্তা চলিবে নূতন স্রোতে। মানুষ কেবল নিজের কথা ভাবিবে না, ভাবিবে দেশের দশের কথা, মানুষ কেবল স্বার্থ দেখিবে না, লাভ দেখিবে না, দেখিবে পরার্থ, দেখিবে কল্যাণ, মানুষ খুঁজিবে আদর্শ, উচ্চতর উদারতর সত্য। মানুষের চিন্তা জগতে পরিবর্ত্তন চাই, তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে, সেখানে ফুটিয়া উঠিবে স্থূলজগতের পাশব প্রকৃতির ছবি নয়, পরন্তু একটা সূক্ষ্মজগতের একটা দিব্য প্রকৃতির আলো। [illegible] ইহাকেই যথেষ্ট বিবেচনা করিলে বিষম ভুল হইবে। এই ভুল [illegible] পদে পদে করিয়াছি ও করিতেছি—ইহার সংশোধন চাই।

আধুনিক যুগে জর্ম্মাণ দেশ চিন্তাশক্তির যেমন পরিচয় পাইয়াছে, আদর্শের প্রাদুর্ভাব সেখানে যেমন হইয়াছে, এমন কোথাও আর হয় নাই [illegible] ত তাহার শিক্ষা দীক্ষায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু এই ইউরোপের [illegible] যুদ্ধের সময় জর্ম্মণীর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। মনের পরিবর্ত্তনে চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় না, চিত্তের উপর একটা ভাসা ভাসা জলুস দিয়া থাকিতে পারে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চাপে তাহা উপিয়া যায়, স্বভাবের স্বরূপ তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। চিত্তের সংস্কারের বিরুদ্ধে মনের ভাব বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে না, বরং সাক্ষাতে না হউক লুকাইয়া মন চিত্তের নানা কুমন্ত্রণা বহিয়া চলে, রকম ফের দিয়া চিত্তেরই খোরাক জুটাইতে থাকে। Intellectualism [illegible] এরা, ধর্ম্মপ্রচারকেরা এই কথাটায় তেমন আমল দেন নাই বলিয়াই তাহারা মানুষের প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করেন নাই।

বুদ্ধির বিকৃতি তত দোষের নয়, যত দোষের হইতেছে চিত্তের বিকৃতি। বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সাথে বিশেষ [illegible]

শুদ্ধ করিতে হইবে চিত্তকে। অর্থাৎ আদর্শকে, সত্যকে, মঙ্গলকে শুধু বুঝিলে চলিবে না, স্বীকার করিলে চলিবে না, তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহাতে অনুরক্ত হইতে হইবে—তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রেমের রসে সত্যকে যতদিন অভিসিক্ত করা হয় নাই, আনন্দে যতদিন আদর্শ সজীব সবুজ হইয়া উঠে নাই, ততদিন সে সত্য সে আদর্শ সুন্দর হয় নাই, স্বভাবের মুখ ফিরাইতে পারে নাই, জীবন গতির মধ্যে নূতন টান বসাইতে পারে নাই। বুঝিয়াছি যাহা তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, মস্তিষ্কে যাহা নীরস, চিত্তে তাহাকে সরস করিয়া ধরিতে হইবে -নতুবা তাহা কার্য্যোপযোগী হইবে না, নতুবা পরিশেষে দেখিব -

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে।

এখানেও তবুও শেষ নয়। মনের ভাব প্রথমে দরকার, তারপর মনের ভাবকে চিত্তের ভাবুকতায় পরিণত করিতে হইবে, তবুও কিন্তু সত্য স্থির জাগ্রত নিবেট অটুট হইয়া দেখা দেয় না। আমাদিগকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে—চিত্তের পরে প্রাণে অথবা ঠিক করিয়া বলিতে গেলে শরীর-ঘেঁসা প্রাণের স্তরে পৌঁছিতে হইবে। জগতে কত আন্দোলন– movement হইয়াছে, ধর্ম্মের আন্দোলন সমাজের আন্দোলন, কিন্তু কিছুই ত তেমন স্থায়ী হয় নাই। মনের ভাব বা চিন্তামাত্র লইয়া নয়, চিত্তের (ও প্রাণের উপরের স্তরের) আবেগ লইয়াই ত কত মহান্ আদর্শ জগতে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে, কোনটা একেবারে বিফল হয় নাই, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নবজীবনের পলিমাটি ফেলিয়া গিয়াছে, সত্য কথা, কিন্তু প্রয়াসের তুলনায় ফল, আশার তুলনায় লাভ, উচ্ছ্বাসের তুলনায় বস্তু কতটুকু পাওয়া গিয়াছে? লোক যে জগতের মানব জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রদ্ধালু হইতে পারে না, আস্তিক হইতে পারে না, তাহার কারণই এইখানে।

বস্তুতঃ জগতে শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে কোন শক্তি, পরিণামে কাহার জয় অবধারিত? প্রকৃতিং যান্তিভূতানি—এই প্রকৃতির অন্য নাম প্রাণের ধর্ম্ম। চিত্ত হইতেছে অসীম সজীব, সকল জিনিষের বীজ সেখানে, সকল জিনিষের রস সেখানে। কিন্তু জিনিষ যে বিশেষ রূপ পাইতেছে, যে নিয়মে গড়িয়া উঠিতেছে চলিতেছে, যে ভঙ্গীতে কার্য্যে ফলিত হইতেছে তাহা সব দিতেছে প্রাণের শক্তি। হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবম। চিত্ত রঙ

দিতে পারে কিন্তু আকার দিতেছে প্রাণ। চিত্তের সংস্কারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু এই সংস্কারের মূলে রহিয়াছে যে আদি মৌলিকশক্তি তাহা প্রাণের শক্তি। সত্যকে বুঝিবার সত্যকে ভালবাসিবার আগে সত্যকে পাওয়া চাই। কোথায় সত্য? মানুষের কাছে নিবিড়তম নিকটতম সত্যতম সত্য হইতেছে প্রাণের সত্য। প্রাণের প্রকৃতির যে প্রতিমা তাহার উপরই মানুষ অনুরক্ত, মানুষ তাহাকেই ভাল বুঝে, কার্য্যে অন্ততঃ তাহাকেই ফলাইয়া চলে।

প্রাণাত্মা এব উদেতি প্রাণেহস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং

স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি।

ইউরোপীয় চিন্তা জগতেও আজ কাল এই প্রাণের কথাটাই খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তর্কবুদ্ধির বন্ধ্যাত্ব, ভাবালুতার পঙ্গুত্ব দেখিয়া সেখানকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন :আসল সত্য হইতেছে Vital plane এর সত্য Physico-biological law—সৃষ্টির মধ্যে বিবর্ত্তন, মানুষের মধ্যে রূপান্তর চলিতেছে এই প্রাণের ধর্ম্মকে ধরিয়া, ঘিরিয়া। এই ধর্ম্ম অটুট অব্যর্থ, ইহাকে কাটাইয়া চলিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ, মানুষের স্বভাব গড়িয়া উঠিয়াছে ইহারই নিয়ম অনুসারে। মানুষের হৃদয়, মানুষের মন এই বস্তুটিরই ফুল লতা পাতা, এখানে যে সব প্রেরণা আছে তাহাদেরই সার্থকতার বহু বিচিত্র উপায়, এই সত্যটির সহিত মনের হৃদয়ের যে কল্পনার যে অনুরাগের সঙ্গতি তাঁহারাই তত শক্তিমান, তত ফলপ্রদ আর যে সব জিনিষ ইহার সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত বা ইহার পরিপন্থী তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে না। মানুষের স্থূল শরীরটিও এই প্রাণেরই বাহন, প্রাণের ধর্ম্মের ফল বা পরিণতি, জাগ্রত মূর্ত্তি মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের প্রতিষ্ঠানাদিও গড়িয়া উঠিয়াছে সেই প্রাণেরই ধর্ম্ম অনুসারে মানুষের যে মৌলিক প্রকৃতি তাহাই চরিতার্থতার জন্য। সমাজ যে একটা বিশেষ রূপে বাঁধা পড়িয়াছে, মানুষ যে একটা বিশেষ ধরণে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে একটা বিশেষ প্রণালীতে আদান প্রদান চলিতেছে—এ সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে মানুষের, প্রকৃতির প্রাণ শক্তির প্রয়োজন বা দাবি অনুসারে।

সুতরাং পৃথিবীতে স্বর্গ বানাইব, সমাজকে নন্দনে আর মানুষকে নন্দনের পারিজাতে পরিণত করিব অথবা এই রকম আরও যে কত কত utopia বা স্বপ্নের রাজ্য মানুষের মনে ও চিত্তে খেলিয়া উঠিতেছে তাহা সত্য হইতে পারে,

বাস্তব হইতে পারে একমাত্র তখনই যখন মানুষের প্রাণে তদনুযায়ী রূপান্তর ঘটিয়াছে বা ঘটাইতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহা কি কখন সম্ভব?

সমস্যার ব্যাসকূট প্রাণের রূপান্তর। কারণ, সকল রূপান্তরের, বিশেষতঃ স্থূল বাস্তব ভৌতিক রূপান্তরের কেন্দ্র হইতেছে এই প্রাণশক্তি। প্রাণে একরকম গ্রন্থী পড়িয়াছে, তাই জগতের সমাজের মানুষের চেহারা এই রকম হইয়াছে, চেহারা আর একরকম করিতে হইলে এই গ্রন্থী খুলিয়া আর রকম গ্রন্থী দিতে হইবে। কিন্তু প্রাণের ত যথা ইচ্ছা রূপ দেওয়া যাইতে পারে না, যেমনটি ভাল লাগে যেমনটি পছন্দ হয় তেমন করিয়া প্রাণকে ঢালাই করিতে পারি না—প্রাণ যে চলিয়াছে নিজের তোড়ে নিজের জোরে, দু দিন হয়ত তাহাকে এখানে ওখানে বাঁধা দিয়া রাখিতে পারি, খাল কাটিয়া এদিক ওদিক করিয়া দিতে পারি, কিন্তু ভরা বর্ষার কীর্ত্তিনাশার মত সে একদিন সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া আপন পথ করিয়া লইয়া চলিবে, তাহার ত কোন সন্দেহই নাই।

তাই ত অনেক মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, অনেক ধর্ম্মও শিক্ষা দিয়াছে, জগতের সমস্ত মানুষের বা সমাজের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়, ইহজগতের নিয়ম অনুসারেই ইহজগৎ চিরকাল চলিবে। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে ব্যক্তিগত মুক্তি অর্থাৎ নিয়ম বদলানের চেষ্টা নয়, নিয়মের অতীত হইয়া চলিয়া যাওয়া। বহুর, রূপের, সম্বন্ধের খেলা যেখানে সেখানেই হইয়াছে প্রাণের, মায়ার, অবিদ্যার প্রতিষ্ঠা—এ সকলের শেষ ঐকান্তিক নিবৃত্তি যেখানে সেই শান্ত এক অদ্বৈত সত্তায় নির্ব্বাণ লাভ করাই মানুষের বিদ্যা সিদ্ধি, পরম পুরুষার্থ। জগৎকে স্বর্গ বানান যায় না, যদি চাও স্বর্গে উঠিয়া যাইতে পার।

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য কোন উপায় নাই। কিন্তু আশার কথাও আছে। মানুষের মনে চিত্তে যে সব সোণার স্বপ্ন ফলিয়া উঠে, যুগে যুগে উঠিতেছে ও মানুষ বার বার বিফল হইয়াও চেষ্টা করিতেছে তাহাকে বাস্তব করিয়া তুলিতে—প্রাণের মধ্যে যদি ইহার কোনই শিকড় না থাকিবে, তবে তাহা আদৌ গজাইয়া উঠে কেন? মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা ঐ অসম্ভবের জন্যই ক্রমাগত চলিতে চাহিতেছে কেন? শুধু তাই নয়, এমন মহাপুরুষও অনেক আছেন যাঁহাদের কণ্ঠে শুনিতে পাই সত্যের অটুট বারতা—

বেদাহমেতং পুরুষং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

যাঁহারা আপন সত্যদৃষ্টি সত্যসৃষ্টির উপর ভর করিয়া, নির্ভয়ে বলিতে

পরিয়াছেন যে প্রাণের তামসরূপের পশ্চাতে আছে একটা দিব্যরূপ, এই তামস-রূপকে সরাইয়া বাস্তব জীবনে সেই দিব্যরূপকে ফলাইয়া ধরা যায়, প্রাণের-রূপান্তর দুঃসাধ্য ক্ষুরস্য ধারাইব নিশিতা দুরত্যয়া—হইলেও, একান্ত অসাধ্য নয়।

প্রাণের রূপান্তর অসম্ভব বোধ হইয়াছে এই জন্য যে প্রাণকে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছি মনের ও চিত্ত বেগের ধারায়, বুদ্ধির ও নীতির নিয়ম প্রাণের উপর চাপাইতে চাহিয়াছি। কিন্তু আধারের, অন্তঃকরণের, এ পারের সকল স্তরের কেন্দ্র হইতেছে প্রাণশক্তি, এ পারের কোন শক্তিই প্রাণশক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, নৈতিক বৃত্তিকে, ভাবুকতার বৃত্তিকে সমস্তই প্রাণময় পুরুষের ঈশ্বরত্ব আজ না হউক কাল স্বীকার করিতে হইবে—আজও স্বীকার করিতেছে তবে গৌণভাবে, ভিন্ন রকমে। প্রাণময় পুরুষের প্রভু কে, ঈশ্বর কে? কাহার নিকট এই অসুর স্বেচ্ছায় বলিদান করিতে পারে? এমন কোন ধর্ম্ম আছে কি না, যাহার নিকট প্রাণের ধর্ম্ম হার মানে—এজন্য নয় যে সেখানে প্রাণ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না, কিন্তু এই জন্য যে প্রাণ সেখানে পায় গভীরতর প্রাণ, প্রাণের ধর্ম্ম সেখানে আরও একটা উদারতর ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া যায়?

এক দিকে নিশ্চল ভেদাভেদ রহিত সত্তা—একংসৎ—অক্ষর ব্রহ্ম, ও আর এক দিকে এই চঞ্চল ভেদাত্মক প্রাণময় জগৎ। এই উভয়ের মাঝখানে আছে একটা সত্যের শুধু সত্যের বা সৎএর প্রতিষ্ঠান নয়, সত্যের ও ঋতের অর্থাৎ সত্যধর্ম্মের, চিন্ময় শক্তির বৃহৎ লোক—ইহার নাম উপনিষদে দেওয়া হইয়াছে বিজ্ঞানময় লোক, এখানেই আছে ধর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্মের প্রকৃত বিধান, প্রকৃতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। প্রাণময়পুরুষ মনোময় ও অন্নময় পুরুষকে লইয়া এই বিজ্ঞানময় পুরুষেরই একটা বিকৃত স্বভাব ফলাইতেছে. প্রাণময় পুরুষ নিজের ধর্ম্ম অনুসারে চলিতেছে, অজ্ঞানের বশে আপন অন্তর্যামী বিজ্ঞানময় পুরুষকে অগ্রাহ্য করিয়া অস্বীকার করিয়াই যেন চলিতেছে, কিন্তু তবুও প্রভুর শক্তি সে অহরহ অনুভব করিতেছে। উপরের, ওপারের এই যে সত্য ধর্ম্ম তাহা প্রাণে পূর্ণ প্রকটিত হইতে পারে, প্রাণ যদি শান্ত হইয়া তাহাকে আসিতে পথ দেয়, তাহার ভঙ্গী অনুসারে চলিবার প্রবৃত্তি তাহার থাকে। এই অধ্যাত্ম-পুরুষের চিন্ময় তপোময় ধর্ম্মই একমাত্র প্রাণের ধর্ম্মকে পরিবর্দ্ধিত রূপান্তরিত করিতে পারে, মানুষের মনকে চিত্তকে দেহকে একটা নূতন কাঠাম দিতে পারে, স্বভাবের ভাব পরিবর্ত্তন

করিয়া সমাজের মূর্ত্তিও অন্য রকম করিয়া দিতে পারে। সমাজের স্থায়ী পরিবর্ত্তন, এই এক রূপান্তর ছাড়া আর কোন পথে সম্ভব নহে। প্রাণকে আর কোন শক্তি দিয়া গড়িতে বা চালাইতে পারা যায় না।

আজ যে মনুষ্য সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, মানুষের প্রাণে—মনে, চিত্তে দেহে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই ঐ উপরের লোক হইতে অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের অবতরণের চাপ। মানুষের সমস্যা আজ তাই ইহাকে অভ্যর্থনা করিবার, ধারণ করিবার সাধনা।

লীলা

[শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু, বি-এ]

বসে আছি আপন মনে
স্তব্ধ বিজন হৃদয়-তীরে
তোমারি তরঙ্গ এসে
সেথায় পরশ করে ধীরে।
তরী তোমার দুলে দুলে
নেচে বেড়ায় কূলে কূলে,
গানটি তোমার উঠে জাগি
আমারি বুক চিরে চিরে।

উদয়-রবির প্রথম কিরণ
আজি আমার পড়লো মাথে
উঠলো হেসে বসুন্ধরা
ওগো, তারি সাথে সাথে।
এম্নি প্রেমে এম্নি গানে
বন্ধু, তোমার আলোর বানে
উজল কোরে তুলো আমার
বিদায়-দিনের সন্ধ্যাটিরে।

সমাজসংস্কারের ভূমিকা

(শ্রীঅক্রূমান দাশগুপ্ত)

আজকাল আমরা সকলেই বুঝিতে পেরেছি যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ক্রমশঃই জটিল হ'তে জটিলতর হয়ে চলেছে। কিন্তু এই জটিল সমাজের গ্রন্থিগুলি মোচন করে সমাজকে শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হ'লে যতটা চেষ্টা করা ও যত্ন লওয়া দরকার ততটা আমরা করছি কিনা বিশেষ সন্দেহ। সমাজের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখতে হ'লে যে সমস্যা গুলি আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সেগুলিকে সত্যের আলোতে পরীক্ষা করে যথাযথ সমাধান করতে হবে। নচেৎ সমাজের অশেষ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী যে সমাজসৌধ এতদিনের সাধনার ফলে গড়ে তোলা হয়েছে তার পতন একেবারে অনিবার্য্য।

গত আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে "চয়ন" বিভাগে উদ্ধৃত শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্ বি মহাশয়ের "স্বাস্থ্যর অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামে প্রবন্ধটী পড়লেই উপলব্ধি হবে যে আজ কোন্ সমস্যাটা আমাদের প্রবল হয়ে পড়েছে। বাংলার ২৩টী জেলার অধিবাসীর জন্মমৃত্যুহারের যে তালিকা সেখানে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যাবে বাঙ্গালীকে যে "Dying race" বলা হয় সে একটুও অত্যুক্তি নয়। মৃত্যুর হার জন্মের হারের চাইতে এ ভাবে বেড়ে চললে, কিম্বা বর্ত্তমান অবস্থাটার "ভাল'র দিকে পরিবর্ত্তন না ঘটলে বাংলা শীঘ্রই শ্মশানে পরিণত হবে। কি উপায়ে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে ধ্বংসের করাল গ্রাস হ'তে রক্ষা করা যায় এইটাই আজ আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে এপ্রকারেরই একটা অবস্থা সমস্ত জাতীয় জীবনে এসে পড়েছিল, আর আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাটীরমত একটা সমস্যা বিপুল আন্দোলন ও প্রভূত গবেষণার সৃষ্টি করেছিল। কি উপায়ে একটা জাতি এই বিশ্বব্যাপী জীবনযুদ্ধে আত্মরক্ষা করে উন্নতির পথে ধাবমান হতে পারে—এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে তখনকার বড় বড় দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ আলোচনার ফলেই দেশে একটা নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছিল ইংরাজীতে একে Eugenics বলা হয়। ইংলণ্ডে Sir Francis Galton এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

বর্ত্তমান যুগে জীবনযুদ্ধটা অত্যন্ত সঙ্কটময় ও ভীষণ হয়ে পড়েছে। ব্যক্তির পক্ষে কিম্বা জাতির পক্ষে আত্মরক্ষা করে অগ্রসর হওয়া কতটা কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ সে অনুভব করতে কিম্বা এবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে আমরা কেহই বাদ পড়ি নাই। এ বিশাল জগৎজোড়া প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে জাতির কোন্ সম্পত্তিটা সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হবে এ-প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে জেগে উঠে। এর উত্তর পণ্ডিত Ruskin এর ভাষায় পাই "There is no wealth but life" জনবলই জাতির একমাত্র সম্পত্তি। তবেই বর্ত্তমান যুগে একটা জাতির জয়ী হতে হলে তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক আর সব চাইতে বেশী কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিরূপ সম্পত্তি একটা স্থায়ী রকমেব "ব্যাঙ্ক" থাকা চাইই। কি উপায় অবলম্বন করলে পর একটা জাতিতে অধিক সংখ্যক কার্য্যদক্ষ শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ সন্তানের উৎপত্তি ও রক্ষা হতে পারে সেই উপায় নির্দ্ধারণ ও তত্ত্বান্বেষণ Eugenist দের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালী জাতির—বর্ত্তমান অবস্থায় এই "সুপ্রজনন" বিজ্ঞানের আলোচনা হওয়া খুবই দরকার—কেন না আমাদের যে জন সম্পত্তির "ব্যাঙ্ক" ছিল সেখান থেকে ক্রমাগত ব্যয়ের উৎসবই চলছে, জমার ঘরে একটা কাণা কড়িও পড়ে নাই। মিথ্যা লজ্জায় থেকে এড়াতে না পেরে এই কল্যাণকর নববিজ্ঞানটার আলোচনার আবশ্যকতা বোধ হয় আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। এই প্রাণঘাতিনী লজ্জা আমাদের ছাড়্তেই হবে—কারণ বেঁচে থাকা ত আমাদের চাইই এইটাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এমন কি নীতির দিক হতেও।

তারপর এই বিশিষ্ট কারণের সঙ্গে আরও কতকগুলি ছোট খাট রকমের কারণ জড়িত আছে যার জন্ত এবিষয়ের আলোচনা খুব আবশ্যক বলে মনে হয়। গত ইউরোপের মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে ভীষণ "অর্থসঙ্কট" ও "অন্নসমস্যা" এসে পড়েছে। এই সমস্যার সমাধান আমরা নানাজনে নানাভাবে করছি। জাতীয় শিল্প বিস্তার, চাকরীর মোহ ত্যাগ করে ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন প্রভৃতি উপায়ে এই অন্নকষ্ট ও অর্থাভাব দূর হইতে পারে মহাত্মা প্রফুল্লচন্দ্র এ কথা আমাদের বরাবর বলে আসছেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের দেশের যুবক সমাজ 'মহাত্মা রায়"এর প্রদর্শিত সু-পথটী নানাবাধাবিঘ্ন সঙ্কুল ও আয়াসসাধ্য মনে করে গ্রহণ করতে পারছেন না। বিভিন্ন উপায়ে এই প্রশ্নের সমাধানে আজ তারা প্রবৃত্ত হয়েছেন। বর্ত্তমান আর্থিক অনাটনকালে "বিবাহ না করা" কিম্বা কোন উপায়ে বংশ

বিস্তারের পথ অবরুদ্ধ করা প্রভৃতি কিম্বা তাদের মধ্যে একটা মস্ত আলোচনার ব্যাপার হয়ে পড়েছে। ঐগুলি আমার মনগড়া কথা নয় একটু চেষ্টা করলেই এর সত্যতার প্রমাণ সকলেই পেতে পাবেন। এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু বলব না যতটুকু বলেছি ততটুকু বলবার তাৎপর্য্য এই যে, আজ যে বিষয়টার অবতারণা আমি করতে যাচ্ছি, তাকে কেহ যেন অনাবশ্যক বলে উড়িয়ে না দেন।

আমার এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় বলতে বিবাহ-সংস্কার। সুপ্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে এখান থেকেই আরম্ভ করতে হবে। বিবাহ বন্ধনের মধ্যেই নারী ও পুরুষের যৌন সম্মিলনের ফলেই মুখ্যভাবে ব্যক্তির ও গৌণতঃ জাতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য কি এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের শাস্ত্রকার বলে গেছেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" পাশ্চাত্য দেশের সমাজতত্ত্ববিদগণ বলেছেন "The function of marriage is to maintain the species"। সংসারে সন্তান উৎপাদনের দ্বারা সমাজস্থিতির জন্যই স্বামী-স্ত্রীরূপে পুরুষ ও নারীজাতির যৌন সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমাদের আর্য উক্তির সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতদের উক্তির বেশ সঙ্গতি আছে। একটা কথা এখানে মনে স্বভাবতঃই জেগে উঠে যে, আমাদের বিবাহসংস্কারের মধ্যে এই কি সম্পূর্ণ সত্য? সত্যকে পূর্ণভাবে পেতে হলে আমাদের কর্ত্তব্য ও ভাবের সমস্ত দুয়ারগুলি খুলে তাকে ধ্যান করতে হবে, তা না হলে আমরা সত্যের সাক্ষাৎ লাভ পাব না, আর যদিই বা পাই তবে হয় সে আংশিক সত্য কিম্বা সত্যের বিকৃতমূর্ত্তি। মানুষের কর্ত্তব্য ধারা অনেক, তার মধ্যে বিশিষ্ট ও প্রধান দুইটী মানুষের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, যার উদ্দেশ্য আত্মচরিতার্থতা (Self-realisation) আর সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য—যার উদ্দেশ্য সমাজের কিম্বা মানবজাতির কল্যাণসাধন। কোন কার্য্যকে বিচার করতে হলে কিম্বা প্রকৃত কর্ত্তব্য অবধারণ করতে হলে ব্যক্তি ও সমাজ এই দুই দিক হতে তাকে দেখতে হবে। উপরের উদ্ধৃত দুইটী বচনকে বিচারের এই মাপদণ্ডে পরীক্ষা করলেই তাদের দোষগুণ ধরতে পারা যাবে। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রজাসৃষ্টি, এ কথাটা সমাজের কল্যাণের দিক হতে সত্য হলেও ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে আত্মচরিতার্থতার পক্ষে এ সংস্কারটার উপযোগিতা কত সে খবর আমাদের না দেওয়াতে অর্দ্ধেক সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরের দুইটী বাক্যই সমাজতত্ত্ববিদের বাক্য। সমাজতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব আমাদের জীবনের সকল

ব্যাপারকেই সমাজের পক্ষ হ'তে বা জীবদেহের দিক হ'তে বিচার করে, তাই তাদের প্রচারিত কথা একটা পূর্ণ সত্যের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে না কেবল Half truths হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ববিদ্ ভুলে যান যে, মানুষের পক্ষে সমাজের কল্যাণ-চিন্তার সঙ্গে আরও একটা চিন্তার বিষয় আছে যার কেন্দ্র "আমিতে" সংস্থিত। জীবতত্ত্ববিদ্‌ও ভুলে যান যে মানুষের দেহাতিরিক্ত একটা পদার্থ আছে যাকে বলে "মন"। অপর পক্ষে আর একদল লোক আছেন যাঁরা "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের" (Individualism) পক্ষপাতী। তাঁরা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে ভিন্ন করে দেখতে চেষ্টা করেন—ব্যক্তির ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও অনভিলাষ, ভালবাসা কিম্বা ঘৃণা, সুখ কিম্বা দুঃখ ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত সত্য মনে করেন এবং সমাজের কল্যাণ চিন্তা মনে স্থান দিয়ে ব্যক্তিত্বের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করতে চান না। এদের প্রচারিত সত্যও Half-truth

এখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সম্বন্ধে কিছু বলব। ইউরোপে কিছু কাল পূর্ব্ব হ'তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ চলেছে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল আত্মপ্রকাশ দেখতে পাওয়া গেছে দাম্পত্য বন্ধনের শিথিলতায়। এতদিন পর্য্যন্ত যে বিবাহ বন্ধন একটী নারী ও একটী পুরুষকে পরস্পর পরস্পরের সহচরভাবে একাগ্রতায় সমপ্রাণতায় সম্মিলিত করে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিত সেই বিবাহ-সংস্কারই আজকাল তাদের মধ্যে কর্ত্তব্যের ও চিন্তার একমুখীনতার সৃষ্টি করতে পারছে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল প্লাবনে জাতি ও সমাজের সঙ্গে—ব্যক্তির সম্বন্ধে মিলন-ক্ষেত্র আর চোখে পড়ছে না। বিবাহবন্ধনের দ্বারা নারী ও পুরুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয় কি না, আর কি প্রকারে এই দাম্পত্য সম্বন্ধকে সমাজের মঙ্গলের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে আত্মচরিতার্থতা আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, এর যাথার্থ অবধারণের জন্য পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্ম-মন্দিরে, রঙ্গমঞ্চে, মাসিক পত্রিকায়, উপন্যাসে আলোচনার প্রবাহ চলেছে। আমাদের দেশেও নারী জাতির ব্যক্তিত্ববোধের চিহ্ন আর নানাপ্রকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিত্বের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটা উদ্যম ও আয়োজন আমরা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। তবে কি না এই ভাবটা যতটা ব্যাপকরূপে ও শক্তির সঙ্গে ও-দেশে জেগে উঠেছে আমাদের দেশে ততটা হয় নাই। এখনও হয় নাই বলে যে কোনও দিন হবে না এমন ধারণা করাটা কিন্তু আমাদের ভুল হবে। এই যে ভারতবর্ষ এতদিন পর্য্যন্ত

চারিদিকে একটা সংস্কার ও আচারের প্রাকার তুলে ভাবের স্বাতন্ত্র্য ও কর্মক্ষেত্রের বিশিষ্টতা রক্ষা করে এসেছিল সে প্রাকার ত অনেক দিন হ'ল ভাঙতে আরম্ভ হয়েছে। এই কয়েক বছরের মধ্যেই পাশ্চাত্য-চিন্তা ও কর্মের ঢেউ আমাদের জীবনের আদর্শের মূলে এত জোরে এসে আপতিত হয়েছে যে আমরা কেহ কেহ এক নবযুগের আগমন আশায় আবাহন-গীতি-মুখর হয়ে উঠেছি। আবার কেহ কেহ সনাতন সমাজের উপর দক্ষযজ্ঞের পুনরভিনয় দেখবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। এই স্বাতন্ত্র্যের প্রথম আত্মপ্রকাশের উৎকট প্রাবল্যে ও উত্তেজনায় আমাদের দেশেও যে দাম্পত্য-বন্ধন শিথিল হ'তে পারে এ আশঙ্কা বোধ হয় অন্যায় ও অমূলক হবে না। এই আশঙ্কা জন্যই ব্যক্তির ব্যক্তি হিসাবে আত্মচরিতার্থতার আদর্শ ও সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের কল্যাণ-চিন্তার আদর্শ এই দুই আদর্শের সমন্বয়ীভূত এক নূতন শাশ্বত আদর্শের উপর দাম্পত্য-বন্ধনের প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রয়াসী হয়েছি।

পূর্ব্বেই বলেছি ইউরোপে এ যুগটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের মূল সুরটা যে এই হবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। তাই আজকাল সমাজতত্ত্ববিদের সঙ্গে সাহিত্যিকের একটা বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। এ বিবাদের মূলে উভয়েরই সত্যকে লাভ করবার পূর্ণ যাথার্থ দৃষ্টির অভাব, কেহই পূর্ণ সত্যটার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে পারেন নাই, সত্যের একদিককার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন মাত্র। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘাত-ফলে নারী ও পুরুষের সম্বন্ধের যে তত্ত্বগুলি পরিস্ফুট হয়েছে সে তত্ত্বগুলিই এখন দেখা যাক্।

আজকাল আমাদের দেশী সাহিত্য সমালোচনাক্ষেত্রে ইবসেনের নাম প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এই নরওয়েদেশীয় বিখ্যাত নাট্যকার তার সুপ্রসিদ্ধ "A Doll's House" নামে নাটকে দাম্পত্যবন্ধনকে সাহিত্যের আলোচনার বিষয় করে তুলেছিলেন। তিনি প্রচার করলেন—"যে স্বামী স্ত্রীর কর্মজীবনের পরিধি প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা ও ভাবজীবনের স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন সহ্য করতে পারবেন না ও নানা প্রকারে তার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা প্রতিহত করতে প্রয়াসী হবেন, সেই স্বামীকে পরিত্যাগ করবার অধিকার ন্যায়ত স্ত্রীর আছেই।"

ইবসেন স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যধিক সহানুভূতিবশতঃ এ কথা বললে পর

তার প্রত্যুত্তর এসেছিল পুরুষজাতির পক্ষ হতে, Scandinaviaর খ্যাতনামা Strindberg এর নাটক হতে "বিবাহবন্ধন পুরুষজাতির পক্ষে ক্ষতিকর। বিবাহের দ্বারা পুরুষের পুরুষোচিত গুণগুলির পূর্ণ বিকাশ সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। নারীজাতি তার সুখের জন্য পুরুষকে আপনার দাসে রূপান্তরিত করে আর পুরুষ নারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বলি দিয়ে আত্মসংকোচ করতে বাধ্য হয়।"

সুপ্রসিদ্ধ বার্ণর্ড শ তাঁর Man and Superman নাটকে Strindbergএর মতেরই পোষকতা করেছেন। ইবসেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই সময়ের অনেক নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক বিবাহের সাফল্য ও বিফলতা মাপ করতে বসেছিলেন স্বামীস্ত্রীর মিলনজনিত সুখানুভূতির মানদণ্ডে।

Ibsen নারীর পক্ষেই বলুন আর Strindberg পুরুষের পক্ষেই বলুন তাদের শিক্ষার মূলে রয়েছে প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উৎকট স্বানুভূতি। সত্য দ্রষ্টার স্থির ও সৌম্যমূর্ত্তি তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না, যা পাই সে শুধু সুতীব্র উত্তেজনা বা বিদ্রোহের রূঢ় বল।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মত প্রচারে ইংলণ্ডসমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কি ভীষণ বিদ্রোহবহ্নি জ্বলে উঠেছে যেমন ঘরে তেমনি বাইরে H. G. Wells এর Ann Veronica উপন্যাস খানায় তার একটা উজ্জ্বল চিত্র আমরা দেখতে পাই।

"সংসারে উন্নতি করবার নারীর একটী মাত্র পথ সে শুধু এই পুরুষজাতটাকে তুষ্ট করে। পুরুষরাও ভেবে বসে আছেন জগতে যে নারীর সৃষ্টি হয়েছে সে শুধু তাদের সুখের জন্য। মাতৃত্বই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল।"

উপন্যাস খানা সম্পূর্ণ নারী ও পুরুষের প্রবল দ্বন্দ্বের কথায় পরিপূর্ণ। নারীর বিদ্রোহ-ধ্বনিতে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-বাক্যে মুখরিত। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাহিত্য স্বাধীনতা-প্রয়াসী মানবের অন্তর্গূঢ় বেদনার অপার চিত্তবিক্ষোভের চিত্র; জ্ঞানের গভীর আলোকপাতে সে চিত্র, চিরকালের সম্পদ হয়ে উঠে নাই। জীবনের ধ্রুবসত্যের দিকে চোখ রেখে এঁরা চলেন নাই তাই জীবনের বৈষম্য-বিরোধগুলি নিয়েই এদের কারবার চালাতে হয়েছে। "ঋষি টলষ্টয়" এর সঙ্গে তুলনা করলেই একথাগুলি অনেকটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ রুষজাতীয় জীবনের পক্ষে এক নূতন প্রভাত

এক নূতন চিন্তার জাগরণের অকাশিখায়, পুরাতন প্রথা ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উন্মত্ত চীৎকার-ধ্বনির মধ্যে জাতির নবজীবন লাভ ব্যক্ত হয়েছিল। Herzen, Ogaryof প্রভৃতি এই বিদ্রোহ উৎসবের পুরোহিত হয়ে অজ্ঞানতা ও সমাজের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। প্রথমেই পুরাতন আদর্শ ও ভাবকে তাঁরা ভ্রমাত্মক ও কুসংস্কারজাত বলে ঘোষণা করলেন। অন্যান্য সংস্কারগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহসংস্কার সম্বন্ধেও সন্দেহ এসে উপস্থিত হল। ফ্রান্সে George Sandএর প্রথম বয়সে লিখিত উপন্যাসগুলির মত নারীপুরুষের যৌন-সম্বন্ধ নিয়ে রুস সাহিত্যে অনেক উপন্যাস লেখা চলতে লাগল। বিপ্লববাদীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, চারিদিকে এই যে পুঞ্জীয়মান অন্যায় ও অত্যাচার সমাজের প্রথার দোহাই দিয়ে সংঘটিত হচ্ছে, একে দূর করতে হলে আরও বেশী রকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধের বিকাশ একান্ত আবশ্যক। এই ভাব থেকেই তখন দেশে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা পুরুষ ও নারীর কি সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারেই সমান অধিকার ও যৌন-সম্মিলনের কতকটা অবাধ গতি প্রচারিত হতে আরম্ভ হল। অন্যান্য সকল দেশের মত এই যৌন সম্বন্ধ নির্দ্ধারণের আবর্ত্তে পড়ে রুসের অনেক মঙ্গলময় প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গিয়েছিল। যৌন ব্যাপারে যে-স্বাধীনতা এই নব্যতন্ত্রীরা দাবী করছিলেন, সে স্বাধীনতাকে কোন্ পথে পরিচালিত করতে হবে, ব্যবহারিক জীবনে তাকে কি ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যায় সে তাঁরা নির্ণয় করতে পারছিলেন না। Tolstoi তখন দর্শকভাবে ব্যাপারটা দেখছিলেন আর এই স্বাধীনতা যে ক্রমশঃই উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হবে এ তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। মানব জাতির মঙ্গলকামী ঋষি প্রচার করলেন "যে দিন আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রকৃতি পশুধর্ম্মটাকে দূর করে দিতে পারবে, সে দিনই আমাদের যথার্থ-স্বাধীনতা লাভ হবে। প্রত্যেক মানুষকেই ভাল করে বুঝতে হবে তার জীবনে কর্ম্ম ও চিন্তার পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করবার পথ কোথায়— দাম্পত্য জীবনে না কৌমার্য্য ব্রতে? বিবাহিত কি অবিবাহিত সকল জীবনেরই পরিণতি পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শটাকে লাভ করা (The ideal of perfect purity)।

অনেকেই বলে থাকেন যে টলষ্টয় বিবাহ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন আর তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করলে জাতি শীঘ্রই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হবে। একথা সম্পূর্ণ ভুল। ১৮৮৫ খৃঃ What then we must do নামে তাঁর যে বইখানা

প্রকাশিত হয় তার শেষভাগে তিনি নারীজাতির নিকট এই আবেদন জানান যে তাঁরা যেন সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনের কষ্ট সহ্য করতে ভীত না হন। ১৮৯০ খৃঃ প্রকাশিত Kreutzer Sonata নামে উপন্যাস খানিতে তাঁর প্রভূত অভিজ্ঞতা ও সাধনার ফল পবিত্রতার সুমহান্ আদর্শ পবিত্র চিন্তা ও পবিত্র কর্ম্মের মধ্যে আত্মসমর্পণ লোক সমাজে উপস্থিত করেন। কৌমার্য্য ব্রতই সকল লোকের অবলম্বনীয় এমন কথা তিনি বলেন নাই, কৌমার্য্য জীবন যাপন জীবনের আদর্শ নয়, আদর্শ প্রাপ্তির একটা পথ মাত্র। প্রাপ্তিটাই সত্য, উপায় চিরকালই উপায়, সত্যকে ছেড়ে সত্যপ্রাপ্তির একটা উপায়কে যথার্থ বলে আঁকড়িয়ে ধরবার জন্যই মধ্যযুগে (madiwal period) রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা এতটা অধঃপতিত হয়েছিল ; মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ব্যভিচারজাত সহস্র সহস্র শিশুর অস্থিতে মঠ কণ্টকিত হয়েছিল টলষ্টয় এ সমস্তই অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে পবিত্র কৌমার্য্য জীবন যাপন খুব কম লোকেরই সাধ্যায়ত্ত, বিবাহ সংস্কারের পথ ধরেই সাধারণ লোককে পবিত্রতার আদর্শটা লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। মানুষের পক্ষে এ পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় জেনেও যে এই আদর্শটা তিনি সমাজের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন তার কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে আদর্শ এমন একটা সত্য হবে যেটা দেশ ও কাল-ধর্ম্মের অতীত, যেটা সময়ের কুহেলিজালে উজ্জ্বলতা না হারিয়ে ধ্রুবতারার মত মানুষকে গন্তব্যের পথে ইঙ্গিত করবে।

টলষ্টয়ের এ উপদেশটি ব্যক্তির কল্যাণ কামনায় উচ্চারিত হলেও সমাজের মূল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর কোনই বিরোধ নাই। স্থির, শান্ত, গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি জীবনের মধ্যে একটা মহান আদর্শ ধরতে পেরেছেন জীবনকে একটা প্রকাণ্ড নৈতিক ক্ষেত্রের উপর সংস্থাপিত করেছেন। এই খানেই টলষ্টয়ের সাহিত্য সাধনার সার্থকতা। এই খানেই টলষ্টয় সত্যদ্রষ্টা।

এই জগতে যাঁরা সত্যদ্রষ্টা বলে বরণীয় হয়েছেন যাঁদের শিক্ষা বিশ্বমানবের কল্যাণকল্পে উচ্চারিত হয়েছে তারা সকলেই জীবনকে এক বিশাল সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবনের সকল ব্যাপারই তাঁরা সত্যের আলোকে দেখতে চেষ্টা করতেন। তাঁরা সাধনার ফলেই হউক কিম্বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলেই হউক সত্যের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করবার একটা বিশিষ্ট শক্তি সম্পদে ধনী ছিলেন, একে ইংরাজীতে Idealism ও বাংলায় "অধ্যাত্ম দৃষ্টি" বলা যায়। এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি না থাকলে পর সত্যানুসন্ধিৎসুর সত্যলাভ হয়

না, শিল্পীর চেষ্টা চরম সাফল্যে সুন্দর ও সার্থক হয় না সাহিত্যিকের সৃষ্টি বস্তু-হীন ছায়ায় কিম্বা প্রাণহীন দেহে পর্য্যবসিত হয়।

বিবাহসংস্কারকে এই Idealismএর আলোকে বা আধ্যাত্ম দৃষ্টির সাহায্যে দেখতে হবে তবেই আমরা এর অন্তর্নিহিত সত্যের সাক্ষাৎ পাব। যারা বলেছেন যে বিবাহের সার্থকতা মাপতে হবে স্বামী স্ত্রীর মিলন জাত সুখানুভূতির তুলাদণ্ডে তাদের এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি ছিল না। তাঁরা প্রথমেই যেটা পেয়েছিলেন সেটাকেই চরম বলে মেনে নিয়েছেন তাকে ছাড়িয়ে অতিক্রম করে যাবার শক্তি তাঁদের হয় না তাই তাঁদের এই আদর্শচ্যুতি। এই কার্য্যে আমি সুখ পাই অতএব এ আমার করণীয়, এই কর্ম্মে আমার দুঃখ অতএব ত্যাজ্য, এ হল পশুর Philosophy আর পশুর ethics, আর মানুষের হলেও সে অতি আদিম যুগের, যখন মানব আর পশুতে বেশী তফাৎ ছিল না, যখন সুখ-লালসাই মানবের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক ছিল। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একটা নূতন জ্ঞানের উদ্ভব হল যেটা আমাদের কর্ত্তব্য বোধ। এই নূতন জ্ঞানটা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাসে এক প্রকাণ্ড আবিষ্কার। সুখবোধের সঙ্গে এর তফাৎ এই সুখ সম্পূর্ণ "ব্যক্তিগত" বর্ত্তমান ও অস্থায়ী কিন্তু কর্ত্তব্য বোধের ইতিহাসটা অনেক বড়-এটা ব্যক্তিগত হয়েও সমষ্টির, বর্ত্তমান হলেও অতীতের সঙ্গে সংবদ্ধ, ও ভবিষ্যতে দৃষ্টি-প্রসারী, অস্থায়ী হলেও চিরন্তনের ধারা। দাম্পত্যবন্ধনকে এই কর্ত্তব্য বোধের ভূমির উপর গড়ে তোলা যায় বটে কিন্তু তাতে করেও—হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের চিরকালের বিরোধের শান্তি হবে না এই ভয়। আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে, সুখ হতে এই যে কর্ত্তব্যে এসে উপস্থিত হয়েছি এইটাই আমাদের খুব বড় লাভ—তবুও এখানে থামলে চলবে না। জীবনের সকল কাজেই সুখ ও দুঃখ জড়িত আছে—এ থাকবেই যতদিন আমাদের অহংজ্ঞান থাকবে (Ego) কিন্তু থাকলেও এ আমাদের Immediate নয়, গৌণ।

বিবাহসংস্কারটাকে Idealismএর আলোকপাতে দেখতে হবে। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান যুগের একজন শক্তিমতী নারী Eugenist Allen Key তার ব্যবহারিক জ্ঞান ও অধ্যাত্মদৃষ্টির মিলনে একটা প্রকাণ্ড সত্যের উপর দাম্পত্যবন্ধনকে স্থাপন করতে পেরেছেন। ১৯১১ সালে ডাক্তার হ্যাভেলক ইলিস্ লিখিত একটী অবতরণিকা যুক্ত হয়ে এঁর "Love and marriage" নামে গ্রন্থখানি ইংরাজিভাষায় প্রকাশিত হয়।

এই "প্রেম ও পরিণয়" পুস্তকখানায় Allen Key প্রচার করলেন প্রেমই যৌনসম্বন্ধের নৈতিক ভিত্তি, অতএব বিবাহসংস্কারের মূলের কথা। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর দাম্পত্যবন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করলে মানুষের হৃদয়টাকে অবহেলা করা হয়। Allen Key প্রেমকেই পরিণয়ের মূলভিত্তি নির্দ্দেশ করলেও এই প্রেমের মধ্যেই তিনি কর্ত্তব্যবোধেরও ইঙ্গিত করেছেন। কর্ত্তব্যজ্ঞানই তাঁর প্রেমের ভিতর সহজ হয়ে ধরা দিয়েছে। তাই তাঁর প্রেমের ধর্ম্মকে আমরা প্রেম ও কর্ত্তব্য এই দুইএর সম্মিলনক্ষেত্র বলতে পারি। এই প্রেমের ধর্ম্মকে তিনি নাম দিয়েছেন Religion of life। এই ধর্ম্মাচরণে সমাজের মঙ্গল ও ব্যক্তির আত্মচরিতার্থতা এই দুই আদর্শের সামঞ্জস্যস্থাপন সম্ভব হয়। বিবাহসংস্কার দ্বারা মানবজীবনকে পবিত্র সুন্দর, মহৎ ও সুখী করেই প্রেমের সার্থকতালাভ হবে আর বিশ্বমানবের হিতের জন্য সমাজের কল্যাণের জন্য সন্তানজনন পালন ও শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যের মধ্যে কর্ত্তব্যবোধ বিকশিত হয়ে উঠবে। Allen Keyর প্রেম কেবল যৌন সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা নয়; এ হল "Complete expression of the Community between two Personalities চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় (প্রবাসী আষাঢ়, মহিলামজলিস্) "দুই ব্যক্তির সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস পরিপূরক সম্মিলন।" এই প্রেমের দুইটী দিক আছে psychological (মনের দিক) ও physiological (দৈহিক), একেবারে ইন্দ্রিয় সংযোগ বিরহিত বিশিষ্ট মনোবৃত্তি (Plaonic) নয়—কিম্বা কেবল ইন্দ্রিয়সম্ভোগ সংস্পৃষ্টও (Sensual) নয়—এ এমন একটা ভাব যেখানে George Sand এর কথায়, neither the Soul betrays the sense nor the senses the soul, "ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মা প্রতারিত হয় না বা আত্মার দ্বারা ইন্দ্রিয়ও বঞ্চিত হয় না।" (চারুবাবুর অনুবাদ) তবেই দেখতে পাচ্ছি যে Allenkeyর এই প্রেম কেবলমাত্র একটা বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি নয়, এই মনোবৃত্তির আংশিকলীলা যা কতকগুলি কার্য্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয় সে গুলিও এর অন্তর্গত। এর সঙ্গে আরও একটা ভাব আছে যাকে বিপিনবাবু বলেছেন "আদি রস" (নারায়ণ, আষাঢ়, ১৩২৪)—যে রসের বশে ভালবাসার ধর্ম্ম "আত্মদান, আত্মসাৎ, আত্মবিস্তৃতি ও আত্মবিস্মৃতি" প্রভৃতি একাত্মতালাভের প্রয়াস যৌনসঙ্গমে ও প্রজাসৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করে। তবেই প্রেমের ত্রিধারায়—আনন্দলাভের প্রয়াসে যৌনলীলায় সন্তানজননে, কর্ত্তব্যের ধর্ম্মে তার পালন ও শিক্ষাদান

প্রভৃতি কর্ম্মে আর ভালবাসায় (Allen Keyর প্রেম হতে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্য)। আত্মজীবনে সত্য ও সুন্দরের সম্মিলন সাধনে, একটী মানবের ভাব ও কর্ম্মজীবনের পূর্ণপরিণতি, আত্মচরিতার্থতা ও সমাজের কল্যাণ সম্পাদন এই দুই আদর্শের বিকাশ সংঘটিত হয়।

এলেন কীর বিবাহসংস্কারের এই প্রেমের আদর্শ বাস্তবিকই ঐ সংস্কার সম্বন্ধে যথার্থ আদর্শ—আর এ যে একটা বিশাল অধ্যাত্মদৃষ্টি ও নৈতিকজ্ঞানের ফল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই প্রেমধর্ম্মের উপর বিবাহসংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা আছে নিশ্চয়ই চিন্তার দিক হতে, সেইটা আমরা বিশেষ করে উপলব্ধি করব,—যখন কিনা এই তত্ত্বের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান চিন্তাবীর Henri Bergsonর Creative Evolution তত্ত্বটীর সুসামঞ্জস্য অনুধাবন করতে পারব। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর অভিব্যক্তিবাদ Darwin এর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হতে Bergsonএর চেতনার অন্তর্নিহিত স্বতঃপ্রসারিণী শক্তির লীলা পর্য্যন্ত সমগ্র তত্ত্বটী প্রকাশ করবার স্থান এ নয়, কেননা এত বড় একটা চিন্তার প্রবাহ অনুসরণ অল্পসময়ে ও অল্পকথায় একেবারেই অসম্ভব। তবে প্রাণের সঙ্গে মনের অথবা চেতনার একত্বকে প্রতিপন্ন সত্য বলে গ্রহণ করে আমরা প্রাণজগতে জীবের ক্রমিক বিকাশের পর্য্যায়ের সঙ্গে মনোজগতে চেতনার বিকাশধারাকে এক অখণ্ড করে দেখে অভিব্যক্তিবাদে প্রেমের যথার্থস্থান অবধারণ করব মনে করেছি।

Darwinএর অভিব্যক্তিবাদ কেবল মাত্র জীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনের ক্রমিক পরিণতির ধারাটা তিনি স্বীয় তত্ত্বদ্বারা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই—এ হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণ। তাঁর মতানুসারে আদিম amoeba হতে বর্ত্তমান মানবদেহ পর্য্যন্ত সমস্তই এক উপাদানে গঠিত। একই জীবকোষ (Germ cell) সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। মনের (Mind) উৎপত্তি নির্ণয় করতে এসে Darwin বললেন যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ধর্ম্মদ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবকোষের নিয়ত অসংযত ভাবে নানারূপে প্রকাশ ফলে (Chance Variations) মস্তিষ্কের সৃষ্টি আর সঙ্গে সঙ্গে মন অথবা চেতনার উদ্ভব সম্ভাবিত হয়েছে। এই মত সম্বন্ধে আমাদের প্রথম আপত্তি এই যে, যেখানে প্রাণ আছে, সেখানেই কোন না কোন রূপে মনের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, চেতনা অভিব্যক্তির সব নির্ব্বিশেষে সকল জীবকোষের মধ্যেই কিছু না কিছু সংক্রামিত হয়েছেই। দ্বিতীয়তঃ—

জীবকোষের নানারূপে আপনাকে প্রকাশ পরম্পরা স্বীকার করে এই ঘটনাকে মস্তিষ্ক ও মনের উৎপত্তির বিশিষ্ট কারণ ধরলে মানুষের ইতিহাস একেবারে একটা "Chapter of accidents" হয়ে পড়ে।

Bergson প্রচার করলেন যে, অভিব্যক্তিবাদ জীবন ও মন এই দুই ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ বিশ্বে জীবন ও চেতনা একই তত্ত্ব। এই চেতনাই ক্রমাগত নিজকে অতিক্রম করে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র। চেতনার সেই অন্তর্নিহিত শক্তিই Bergsonর Elan Vital ও কবি Shelleyর "The one Spirit's plastic stress" (Adonais) জীবকোষকে নানা-রূপ পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে মানবদেহ ও মানব মনে বহন করে এনেছে। সৃষ্টির প্রেরণার মূলেই চেতনা অথবা মন, জীবকোষ উপকরণ মাত্র। চেতনার বিকাশের ধারা তিনটী "Vegetable torpor (জড়স্বভাবত্ব) Instinct (সংস্কার) আর Intelligence (বুদ্ধি)। এই চেতনাই নিজের ধর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে অবশেষে মানব মনে Intelligence রূপে বিকসিত হয়ে উঠেছে।

এখন প্রেমের বিকাশ-তত্ত্ব। বর্ত্তমান কালের একদল দার্শনিক নীট্‌সে ও তাঁর শিষ্যবর্গ প্রেম ও অন্যান্য কোমল মনোবৃত্তিগুলিকে দৌর্ব্বল্য আর অবনতির কারণ বলে নির্দ্দেশ করেছেন। নীট্‌সে Darwin এর শিষ্য Darwin এর Natural selection তত্ত্বটীর একটা দিক মাত্র উপলব্ধি করে তিনি যে এক ভুল সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রকৃতির যৌনলীলার মাধুর্য্য ও প্রজারক্ষার জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি তিনি একেবারেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁর চোখে পড়েছিল শুধু প্রকৃতির ধ্বংস-কারিণী শক্তি ("Nature red in tooth and clow") আর সেই শক্তির অনন্ত বিনাশলীলা। যে Natural selectionএর তত্ত্বের জোরে নীটসে জগৎ থেকে সকল রূপ ও সকল মধুরতা লোপ করে দিয়ে এক ভীষণ হিংসা কামক্রোধ প্রভৃতির কুৎসিততাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেই তত্ত্বকেই অবলম্বন করে জীবতত্ত্বের (Biology) সাহায্যে আমরা বিশ্বময় সৃষ্টি ও স্থিতি ব্যাপারে এক বিশাল নীতি ("organic morality") ও প্রেমের অনির্ব্বচনীয় লীলা প্রত্যক্ষ করব।

জীব জগতের প্রজনন ও জীব-শিশু রক্ষণ ব্যাপারটা একটু মনের সঙ্গে দেখলে পরেই আমরা জানতে পারি যে বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে বেয়ে

জীব যতই স্তর হতে উচ্চ স্তরান্তরে উন্নীত হচ্ছে ততই জীবশিশুর আপনা হতে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতাটা কমে যায়; এই ভাবেই মানবশিশুর নিজেকে রক্ষা করবার জন্য অক্ষমতা যত অধিক ও দীর্ঘকাল ব্যাপী এমন আর কোন জীবশিশুতেই লক্ষিত হয় না। প্রকৃতির রাজ্যে এই যে স্তর ভেদে জীব-শিশুদের রক্ষার জন্য একটা সুন্দর সুবিহিত ব্যবস্থা আছে, এই দেখেই সেখানে "organic morality" জৈবিক নীতি নামে একটা শক্তির ক্রিয়া স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। অসহায় মানব শিশু যে রক্ষা পায়, তার নিশ্চয়ই একটা "Survival value" আছে। পিতৃমাতৃস্নেহ ভালবাসা ও যত্ন এই গুলিই শিশুকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে সহায়তা করে থাকে। এই প্রেমই মানবশিশুর Survival value। ঐ ভাবে জীবকোষের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ স্তরের সঙ্গে প্রাণী জগতে প্রেম বিকাশের স্তরটাও সমান পদক্ষেপে চলেছে।

জীবিত থাকাই জীবনের ধর্ম — এর চেতনার—সৃজনীশক্তির প্রেরণায় জীবন ক্রমশঃই এক অবস্থা হতে অবস্থান্তরে উন্নত হবার প্রয়াসী। জীবনের এই গতি ও সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, তার থেকেই প্রেমের উৎপত্তি। অভি-ব্যক্তিবাদে প্রেমের স্থান কোথায়—নীচের কয়েকটী কথায় তা বুঝতে পারা যাবে "No love, no intellect, No morals, no man" ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধের এক জায়গায় কবি Shellyর নাম করেছি। একজন বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক বলেছেন যে শেলী গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে Bergsonএর অভি-ব্যক্তিবাদের (Creative Evolution) তত্ত্বটা পূর্ব্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। বিখ্যাত Adonais কাব্যের কবি গেয়েছেন :—

"The one Spirit's plastic stress sweeps through the dull, dense world, compelling there.

All new successions to the forms they wear." Bergsonএর Elan Vital বা চেতনার সৃষ্টি করবার প্রেরণা ও Shelleyর Plastic stress একই শক্তি, Bergson যেমন চেতনার এই প্রেরণাকেই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বলেছেন, তেমনি Shelley এই plastic stressকেই রূপপর্য্যায়ের প্রেরক-শক্তি বলে নির্দ্দেশ করেছেন। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতিতে বা "জীবন দেবতায়" যেমন Darwin প্রভৃতি অভিব্যক্তিবাদীর তত্ত্বগুলি নানাভাবের আলো ছায়াপাতে ইসারা ও ইঙ্গিতে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তেমনি Bergsonর তত্ত্বটাও Shelleyর উপরের উদ্ধৃত লাইন কয়টীতে কবির ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

শেলী প্রেমের কবি। বিশ্বের অন্তস্তলে যে প্রেমরাশি সদা সঞ্চিত আর নানারূপে শব্দ স্পর্শ প্রভৃতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের মধ্য দিয়ে যে প্রেম স্বতঃই নিত্য উৎসারিত, সেই প্রেম তাঁহার কাব্যে রসমূর্ত্তিমায় প্রতিভাত হয়েছে। শেলীর The one spirit হ'ল প্রেম ধর্ম। আর আমরা পূর্ব্বেই বলেছি অভিব্যক্তিবাদের প্রেম Elan Vitalএরই বিকাশ। মানবস্তরে এসে এই চেতনার সৃষ্টি করবার প্রেরণাশক্তি Elan Vital প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে দাম্পত্যে প্রেমে ও রক্ষণকার্য্যে পিতৃমাতৃ স্নেহে অভিব্যক্ত হয়েছে। Bergsonর নিম্নলিখিত কথাগুলি হতে উপরের তত্ত্বটীর একটা ইঙ্গিত যেন আমরা পেতে পারি বলে মনে হয়।

"At times, however, in a fleeting vision the invisible breath that bears them (the things or individuals) is materialised before our eyes. We have this sudden illumination before certain forms of maternal love so striking and in most animals so touching, observable in the solicitude of the plant for the seed. This love, in which some have seen the mystery of life may possibly deliver us life's secret."

বিংশ শতাব্দীর একটা প্রকাণ্ড গৌরবের জিনিষ এই অভিব্যক্তিবাদ Bergsonর Creative Evolution। এই তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের বিবাহ সংস্কারের প্রেমের আদর্শ তত্ত্বটীর সঙ্গতি কি প্রকারে দেখান যেতে পারে তার একটা চিন্তার সূত্র আমরা এখন খুঁজে পেয়েছি বোধ হয়। এখন নরনারীর সম্মুখে একটা মহান্ আদর্শ স্থাপন করে সমাজ ও ব্যক্তিকে "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" উপলব্ধি করবার প্রকৃত সহায়তা করেছেন যে এই মহীয়সী নারী (Allen Key) তাঁকে আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই সৌভ্রাত্য বিদ্যা সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ শেষ করলাম।

মুক্তি-গাথা

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

কোটি বন্ধনের মাঝে খেলায়ে চাতুরী,
ওগো চিরশিশু, তুমি খেল লুকোচুরী
এ ভুবনে নিশিদিন, ফেলি যবনিকা
তারি পরে কাটি মিথ্যা বন্ধনের লিখা
আমারে ছলিতে চাও, করি মোক্ষকামী
করিবারে চাও দূর মোরে অন্তর্যামী
তোমার সান্নিধ্য হ'তে, তুমি নিশিদিন
যেথায় খেলিছ সুখে বিরামবিহীন
মাখি ধূলিরাশি দেহে, বিক্ষুব্ধ ব্যথায়
দুখে দুখে আনন্দেতে আমিও সেথায়
খেলিবারে চাই প্রভু—তব সৃষ্টিমাঝে
মোর আশেপাশে মোর ক্ষুদ্রতম কাজে
লক্ষ স্থানে তুমি যেগো আছ ধরা দিয়া
সে কথা কেমনে আমি যাব পাশরিয়া।

২

তোমার অজ্ঞাতে আমি করিনিত কিছু
তাই যেন মনে রয়; মরীচিকা পিছু
ছুটিয়াছি সে ত প্রভু, তোমারি ইঙ্গিতে।
সকলি ভরেছ তুমি তোমারি সঙ্গীতে,
তাইত বুঝেছি কিছু শ্রেয় প্রেয় নাই
এ নিখিল বিশ্বে মোর, যেঁই দিকে চাই
তোমার ভঙ্গিমাখানি এমনি দুর্ব্বার
ফুটি উঠে ধীরে ধীরে নয়নে আমার
সব অন্তরালে, তাই বিজনে নির্জ্জনে
পাতিনি আসন তব, সব সৃষ্টি সনে

তোমারে সহস্র করি সহস্র মুরতি
জীবন-মন্দিরে মোর চাহিছু আরতি
তোমার সে রূপ হতে বঞ্চিতে আমায়
নাহি সাধ, তাই আমি আছি এ ধরায়।

৩

বন্ধনের মাঝে কভু বন্ধ নহি আমি
সেই শিক্ষা যেন মোরে দিও অন্তর্যামী
জন্ম হতে জন্মান্তরে, তব বিশ্বমেলা
যেন মোর জীবনেতে তুলি চিরখেলা
রাখে মোরে চিরশিশু করি; বিশ্বমাঝে
সকলি তোমার, গুপ্ত রহি সব কাজে
ফুটায়ে রেখেছ এই বিশ্বের কমল
তাই এ ভুবনে সব হরষ বিহ্বল।
আমি ত চাহিনা মোর আঁখিদুটি মুদি'
ইন্দ্রিয়ের অন্তরের বাতায়ন রুধি
বিশ্বের আলোক এই ঢাকিয়া আঁধারে
মিথ্যার মাঝার দিয়া লভিতে তোমারে;—
সত্যময় প্রভু তুমি তব এ ভুবন
তারি রূপ ধরি করে গৌরব সৃজন।

৪

তোমারে দেখেছি কবে কোন্ তরুতলে,
কোন্ স্রোতস্বিনী তীরে কৌমুদীর গায়,
প্রাবৃট পরশ তৃপ্ত মঞ্জু তৃণদলে
সিন্ধুর তরঙ্গমাঝে দক্ষিণের বায়।
তোমারে পেয়েছি মোর দুখ অশ্রুজালে
তোমারে ছুঁয়েছে মোর সুখাম্বিত পান,
তোমারে হেরেছি আমি উষার আড়ালে,
আবার সন্ধ্যার মাঝে রক্তিম বয়ান।
তুমি উঠেছিলে হাসি যবে এ ধরায়
আমি এসেছিনু নামি; রয়েছ গোপন

আমার মরণ মাঝে, উষায় সন্ধ্যায়
প্রতি পলে হেরিতেছি তোমার স্বপন।
আমার কামনা মাঝে তব তৃপ্তি জাগে,
আমি ভালবাসি ধরা তব অনুরাগে।

চিঠির গুচ্ছ।

শ্রীশচান্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(শেষ দফা)

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে এ৺৬,

তপ্তখোলা হতে নাবিয়ে একেবারে জ্বলন্ত চুলীর মাঝে এসে পড়েচি, এতি। ভালোত কিছুই লাগেনা। তুমি ভাবচ, বড়ই অদ্ভুত এ কথা—একেবারে অশ্রুতপূর্ব্ব। তা'হবে। আমিও কখনো শুনিনি। স্বামীর সঙ্গ নারীকে সুখ দিতে পারেনা… আর এমন যে স্বামী! কিন্তু সত্যই বলচি ভাই, আমার এখানে আর একটি দিনও থাকতে ইচ্ছে করে না। যতদিন দিদি তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে ছিলেন, ততদিন বেশ আনন্দেই কেটেচে। দিনগুলো কেমন করে, কোথা দিয়ে চলে গিয়ে যে দুটো মাস অতীতের কোলে মিলিয়ে দিয়ে গেল, তা' টেরও পেলুম না। দশদিন হল তারা চলে গিয়েছেন, এ বাড়ীর সকল আনন্দ, সমস্ত আকর্ষণ একেবারে নষ্ট করে।

উঃ এই কর্ম্মবিহীন দিনগুলোর কি বুকজাঁতা বোঝা! কিছুতেই তা ঠেলে ফেলা যায় না। একেবারে শ্বাসরোধ করবার উপক্রম করেচে। কলকাতায় থাকতে যে সব কাজের অভিযোগ করেচি, এখন সেই সব কাজ করতে পেলেই যেন বেঁচে যাই।

স্বামীত খেয়ে উঠে কলেজে বেরিয়ে যান। বারান্দার উপর যতক্ষণ দেখা যায়, তাঁর দিকে চেয়ে থাকি—তারপর ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ি। ঝিটা এসে

তার ভাঙা হিন্দীতে যখন খাবার জন্ত তাগিদ সুরু করে দেয়, তখন বিরক্ত হয়ে উঠে যাই। খাওয়া হলে আবার সেই শুয়ে থাকা।

কলকাতায় বই পড়বার ফুরসুত্‌ পেতুম না, কিন্তু এখানে এসে সেগুলো স্পর্শ করতেও ইচ্ছে হয় না। কখনো যদি বা একখানা টেনে নিয়ে বসেচি—ধৈর্য্যধরে দু-এক পাতার বেশী পড়তে পারিনি। এই বই আর এখন হাত দিয়ে ছুঁইনা। গ্লাসকেসের ভিতর হতে সেগুলো তাদের সোনালু চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকে… .. তা' যেন আরও অসহ্য। আমি তাই কাঁচের ওপরকার ধুলো ঝেড়েও ফেলিনে।

স্বামী ফিরে এলে কতটা সময় বেশ কাটে—তারপরই কিন্তু সেই এক ঘেয়ে ব্যাপার। একদিন তিনি বল্লেন—"সমস্তটা দিন বন্দিনীর মত এমনধারা আবদ্ধ থাকলে শেষটায় একটা অসুখ করবে।"

আমি জবাব দিলুম—"কাল থেকে তা' হলে মাঠেই চরতে যাব।"

"তা কেন? আমার সহযোগী অধ্যাপকরা সকলেই বিবাহিত, তাদের বাড়ীগুলো ঘুরে বেড়াতে পার"—বলে তিনি আমার দিকে চাইলেন।

শুনে আমার গা জলে গেল। আমি বল্লুম—"তোমার বন্ধুপত্নীরা আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্ত কিছুমাত্র ব্যাকুল নন। একথা বুঝতে পেরেও বেহায়ার মত তাদের গায়ে পড়ে আলাপ করতে হবে? সে আমি পারব না।"

"না, না—তা আমি বলচিনে" বলে তিনি আমার হাত দুখানি তার মুঠোর ভিতর চেপে ধরলেন, তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"কিন্তু তোমার এই একঘেয়ে জীবনে কি করে বৈচিত্র্য আনা যাবে।" আমি এখানে আনন্দ পাচ্ছিনে বলে বেদনায় তিনি ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তার মুখ চোখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারলুম। মনে মনে ভাবলুম, আমাকে খুসি হতেই হবে। .....কেন পারবনা? এর চাইতে বেশী সুখ-সম্ভার ক'জনার ভাগ্যে জোটে?

আমি তাঁর কাঁধের উপর দু'খানি হাত রেখে, বল্লুম—"একটা কিছু খেলার ব্যবস্থা করলে ভাল হয় না?"

আমার মুখে এই প্রস্তাব শুনে তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তা তখনই যেন ঘুচে গেল। তিনি হেসে বল্লেন—"খাসা হয়, কিন্তু কি খেলার ব্যবস্থা করব?"

"টেনিস বেশ চলবে।"

"আমি যে জানিনে" ব'লে তিনি হেসে ফেল্লেন।

'দু-দিনেই তোমায় আমি পাকা খেলোয়াড় করে ছেড়ে দেবো।"

সপ্তাহের মধ্যেই খেলার জায়গা এবং সর্বসরঞ্জাম ঠিক হয়ে গেল। লেখাপড়ায় কৃতিত্ব লাভ করলেও স্বামী কিন্তু খেলাটাকে সহজে আয়ত্ত করতে পারলেন না। দিনকত বেশ আমোদেই কাটালুম। খেলার পর শরীরটা গরম হয়ে উঠলে দুজনা বরাবর রাস্তায় বেড়িয়ে একেবারে রাবীর তীরে গিয়ে ফুলবোনা ঘাসের কার্পেটের উপর বসে আকাশের গায়ে আর রাবীর জলে আলো আঁধারের খেলা দেখতুম।

একদিন ফেরবার পথে আমি বল্লুম—"চল, তোমার কোন বন্ধুপত্নীর সঙ্গে আলাপ করে আসি।"

"না, তার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কথাই সত্যি—আমাদের তাঁরা পছন্দ করেন না। বন্ধুরা আমার মাঝে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কিছু খুঁজে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েচেন। অধ্যাপক মহলে আমাদের টেনিস খেলা নিয়ে খুব হাসাহাসি হচ্ছিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তোমায় খুব লজ্জা পেতে হয়েচে, না?"

"সত্যই নীরব, দেশের শিক্ষিত লোকেদের ওরূপ ব্যবহার, লজ্জা হবারই কথা। তুমি নিজে বুঝতে পারচ কি না জানিনা, আমি কিন্তু লক্ষ্য করেচি যে, এই একমাসের নিয়মিত পরিশ্রমে তোমার শরীর অনেকটা ভাল হয়েচে। আমি নিজে কোনদিন শারীরিক পরিশ্রম করিনি, কোনরকম খেলাতে কখনই মন দিইনি। তাই হয়ত চলবার বেলায় মাজাটা আমার নুয়ে পড়ত, এখন কিন্তু চলতে আমার কষ্ট হয় না মোটেই"—বলে প্রমাণ দেবার জন্যই যেন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

সত্যই খেলার ঝোঁকে সারাটা দুপুর মত্ত হয়ে থাকতুম। কখন স্বামী আসবেন, কখন খেলা সুরু হবে—আর কখনই বা রাবীর তীরে মুক্ত আকাশের তলে গিয়ে বসব—এই সবই ভাবতুম। তিনিও কলেজ থেকে ফিরে এসেই বেয়ারাকে খেলার আয়োজন করতে আদেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করে নিতেন এবং জলখাবার ব্যাপারটা সংক্ষেপে সেরে নেবার জন্য দু'তিন খানা করে লুচি একসঙ্গে মুখে গুঁজে দিতেন—আর চা-এর বাটিটা এক চুমুকেই খালি করে ফেলতেন। আমি একা একা হেসে আকুল হতুম—একেবারে ছেলে মানুষটি।

খেলার দিকে আমার খুব ঝোঁক হবার একটা কারণ এই ছিল যে, আমি রোজই জিততুম। আমি খুব মুরুব্বিয়ানা চালে তাঁকে উৎসাহ দিতুম আর

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে পরাজয় মেনে নিতুম, কিন্তু তিনিও ক্রমে নিজের কৌশলে জয়লাভ করতে লাগলেন—সমস্ত শক্তি ও কৌশল নিয়োগেও আমি আর তাঁকে পরাজিত করতে পারতুম না। সেইটেই একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। একদিন বল্লুম—"আর ভাল লাগে না—খেলাও একঘেয়ে হয়ে গেছে।" স্বামীর মুখে আবার বিষাদের চিহ্ন ফুটে উঠল।

সপ্তাহ কেটে গেল একেবারে বিনাকাজে। একদিন সকালে এসে চাকরটা বাজারের টাকা চাইলে। আমি বল্লুম—"চ', আমিও যাব।" সে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি তাকে ধমকে বল্লুম—"নীচে যা, আমি আসচি।" স্বামী পড়ার ঘরে হয়ত নোট লিখছিলেন—আমার কথা শুনতে পেয়ে বল্লেন—"কোথায় যাচ্ছ ?"

"চল আজ বাজার করে আসি। কি ছাই ভস্ম সব কিনে আনে, পয়সাও যায় অথচ খাওয়া ভাল হয় না।"

"বেশত, চলনা' বলে তিনি বেয়ারাকে গাড়ী ডাকতে আদেশ করলেন। আমি বল্লুম "গাড়ী কি হবে, হেঁটেই যাব।"

"সে-যে-অনেক দূর।"

"বাবীর চাইতে ত নয়।" খেলা ছেড়ে দিয়ে অবধি আর বাবীর তীরে বেড়াতে যাইনি। নীচে নেমে এসে, খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম ঘাসগুলো লম্বা হয়ে উঠেচে। বেয়ারাকে ডেকে বল্লুম "ঘাস কেটে মাঠ ঠিক কর।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন –"আজ আবার খেলতে হবে না কি ?"

আমি বল্লুম—"হুঁ।"

কিছুদিনের জন্য খেলা আর বাজারে যাওয়া, দৈনন্দিন কাজেই পরিণত হোল।

কিন্তু এত করেও যখন মনটাকে নিরানন্দের জড়তা হতে মুক্ত রাখতে পারলুম না, তখন সব-ই ছেড়ে দিলুম। আজ খেলার মাঠের ঘাস গুলো আধ হাত লম্বা হয়ে বেড়ে উঠছে, চাকর তার বাজার চুরি বাড়িয়ে দিয়েচে—স্বামীর মুখে আবার বিষাদের ছায়া ফুটে উঠেচে। আর আমিও একেবারে জড় হয়ে গেছি। স্বামী আমায় প্রফুল্ল রাখবার জন্য কতরকম চেষ্টা করচেন—কত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা, রাশি রাশি সুপাঠ্য বই। এত আদর, এত ভাল বাসা ····· আমার বুক ফেটে কান্নাপায়, এভি—প্রাণ আমার শুকিয়ে মরে গেছে।

এমন কেন হোল, এভি। একি বিবাহের পরিণাম ··· ? কিন্তু বিবাহ ত

আমার চিত্তের স্বাধীনতা হরণ করে নি, স্বামীত্ব দাবীর জোর একটিবারও আমার ওপর চালাতে চান নি ?· এখানে যে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, তবুও, বলতে পার এত্তি, তবুও আমার অন্তরে এমন দৈন্য, এমন অশান্তি কেন বেড়ে উঠছে ?

তোমারই—নীহার।

(২)

প্রিয়তমে,

কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে, তোমার চিঠি পড়চি—দু'তিনবার নীচের নামটা ভাল করে দেখে নিলুম। সত্যি করেই লিখেচ ?· পরিহাস করনি ত ? তোমার চিঠি যে হৃদয়-গলা কান্নার-সুরের মত এসে আমার বুক ফুলিয়ে দিচ্চে।

সত্যিই জীবন তোমার কাছে একটা দুর্ব্বহ বোঝা বলে মনে হচ্ছে ?·· কেন ? কিসের অভাব তোমার ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচিনে।

তোমার এ-অবস্থা বিবাহেরই ফল কি-না জানতে চেয়েচ। ও-ব্যাপারের সঙ্গে আমার যে পরিচয় নেই। না, না—তা নয়। ও ধারণা ভুল—আগা-গোড়া সব ভুল। এ সিদ্ধান্তে কেমন করে উপনীত হলুম, শুনবে ?

দেওয়ালে টাঙান তোমার ফটোগ্রাফ খানা যেমন স্পষ্ট দেখচি, তেমনি তোমার হৃদয়-খানি আমি দেখতে পাচ্চি আমার হাতে রেশমে-বাধা তোমার লেখা পত্র-গুচ্ছের পাতায় পাতায়।

কি তোমার হয়েচে ? কিছু-ইত না · তোমাকে যে অনেক কিছু করতে হবে। বাংলার মেয়েদের যে মুক্তির বাণী শোনাতে চায়, তাকে এত অল্পে, এমন তুচ্ছ ব্যাপারে বিচলিত হলে চলবে কেন ?

একটা ক্ষণিক অবসাদ এসেচে বইত নয়। অচিরেই তা অপসারিত হবে। আমরা ত নদীর তীরে দাঁড়িয়ে শুধু ঢেউ গুণেই সময় কাটিয়ে দিচ্চি—তুমিই যে নারীর বাত্যালোড়িত কর্ম্ম-তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েচ তোমার কৌশলে, নৈপুণ্যে ও সাফল্যে যে ভয়-ত্রস্তা, সতত-সঙ্কুচিতা নারী চিত্তে শক্তি এনে দেবে। কিছু হচ্চে না বলে তুমি আক্ষেপ করচ, কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার করা-কাজের ভিতরকার সত্যটুকু মানুষের মনে অঙ্কিত হয়ে উঠচে—তাকে আর অগ্রাহ্য করা চলবে না।

টেনিস্ খেলা, বাজার করা প্রভৃতির মূল্য যেখানে বেশী নেই, যেখানে সকলেই ও-সব করে থাকে, অথবা ও-সব কিছু না করলেই যে জীবনের কিছু পাওয়া

যায় না, তাও নয়। তোমার সমাজের নারীরা যে ওই করেই মুক্ত হবে, তাও আমি বলচিনে। তবুও তোমার টেনিস খেলা, বাজার করা আমি প্রশংসা না করে এই জন্যই থাকতে পারচিনে যে, তোমার সমাজ ও-গুলিকে মস্তবড় অপকর্ম্ম বলে ঘোষণা করেচে—তবুও তুমি সে-গুলো করতে দ্বিধা বোধ করচ না। যতখানি শক্তি অন্তরে সংগ্রহ করে তুমি সে-গুলি অনুষ্ঠিত করচ, সেই শক্তিকেই আমি পূজা করি। ওই শক্তিই তোমাকে বল দেবে সকল রকম বন্ধন ছিঁড়তে, সমস্ত অবিচার দূর করতে। এ হচ্চে শুধু ভাবের দিক হতে তোমার কাজকে সমর্থন করা—শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক হতেও ওর মূল্য তোমাদের কাছে বড় কম নয়।

তোমাদের কাজগুলো যদি এই-দিক হতে ভেবে দেখ, তা'হলে কিছু করচিনে বলে অনুতপ্ত হতে হবে না। ভবিষ্যত-জাতি গড়বার কতবড় একটা দায়িত্ব ভগবান নারীকে দান করেচেন, সমাজ তা'হতে তাকে বঞ্চিত রাখবে?

জীবনের বৈচিত্র্য মানে এ নয় যে, তাকে তারই জন্য সারাদিন ছুটো ছুটি করে বেড়াতে হবে। প্রাণকে এমন ধারা তৈরি করা চাই, যাতে করে চারিদিক হইতে আনন্দ কুড়িয়ে নিজের ভাণ্ডার সব সময় সে পূর্ণ রাখতে পারে। পাইন গাছটা সম্বন্ধে একদিন তুমিই না এই কথা বলেছিলে?

কল্পনায় একটা অশান্তির জাল বুনে নিয়ে মাকড়সার মত তার মধ্যে নিজকে আবদ্ধ রেখে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি মানুষের মনে কেন আসবে, ভাই? ভগবানের কৃপায় এমন কিছু দুর্দ্দান্ত অভাব তোমায় পীড়ন করচে না, যার ফলে তোমার জীবনের আনন্দ এর মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে। অসঙ্কোচে তাই-ই করে যাও, যা সত্যরূপে তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। আজ এই পর্য্যন্তই রইল। ইতি

তোমারই—এভি।

(৩)

স্নেহের ঠাকুর পো,

কি যে লিখেচ, ভাল করে বুঝতে পারলুম না। জানই ত আমি মূর্খ—আভাসে ইঙ্গিতে কিছুই বুঝি না। নীহারের চিঠিরও ওই একই ভাব। তোমাদের দুটিকে নিয়ে মুস্কিলেই পড়েচি। নীহারের বুকে কিসের ব্যথা

জমে উঠেচে? তার কারণই বা কি? তুমি কি এখনো তাকে কেবল নারীর কর্ত্তব্যই শেখাচ্ছ?

শুনলুম তাকে দিয়ে না-কি টেনিস খেলাচ্ছ, হাট-বাজার করাচ্ছ। সে গুলোও কি নারীর কর্ত্তব্য? যাক্। যাতে তোমরা সুখ পাও তাই-ই কর, আমি তাতেই খুসী।—কিন্তু ব্যথার কথা কেন? কিসের অভাব তোমাদের? টাকা কড়িতে যদি না কুলোয় লিখো, পাঠিয়ে দেব। নীহার ছেলেমেয়েদের একজনকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে লিখেচে—সে না-কি আর একা থাকতে পারচে না। মিণ্টু ত শুনেই নেচে বেড়াচ্ছে, সে লাহোর যাবেই—আর খোকাও বাহানা ধরেচে। লোক পেলে আমি ওদের দু'জনকেই পাঠিয়ে দেব।

ভাল কথা, গৌরীর একখানা চিঠি পেয়েচি। তার ওখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠচে, অথচ মাথা রাখবার দ্বিতীয় স্থানটুকু নেই। বেচারা কি যে করবে, এ যে বেঁধে মারা। সে লিখেচে—"দিনরাত এই তাচ্ছিল্য সয়ে নির্যাতন ভোগ করে আমি থাকতে পারতুম সবই অগ্রাহ্য করে, যদি না ছেলেমেয়েগুলো এত কষ্ট পেত। নিজের আমার কিসের দুঃখ? আমার সবই তো পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। মানুষ যে এমন করে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে—তা আগে কখনো ভাবিনি।'

"এর জন্ম দোষ দেব কাকে? বাংলায় আমি একা এমন নই—হাজার হাজার রয়েচে। তারা অনেকেই আমার চাইতেও বেশী যন্ত্রণা পাচ্ছে··· কিন্তু অদৃষ্টের দোহাই মেনে বুকের ব্যথা বুকেই চেপে রাখচে।"

"আমি কিন্তু অদৃষ্টের ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে শান্তি পাইনে। আমার অন্তরে একটা প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। সে আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আমার এ অবস্থার জন্ম মানুষই বেশী দায়ী, আর সে মানুষ হচ্চে আমারই আত্মীয় স্বজন সকলে। তারা সবাই মিলে যে অস্বাভাবিক নিয়ম করেচে, তাই ত আজ বাধা দিচ্ছে আমাকে এই অনল কুণ্ডের বাইরে ছুটে যেতে। কি চমৎকার বিধান এই-সব মানুষদের। বেঁধে মারবে, ক্ষতস্থানে নুন ছিটিয়ে দেবে, তবুও ছেড়ে দেবে না।"

"ফরিদপুর থাকতে একদিন দেখেছিলুম যে কতগুলি সাঁওতাল মাটি কেটে রাস্তা বাঁধছিল—তাদের দলে মেয়ে লোকও অনেক ছিল। মেয়েরা সন্তানদের কাপড় দিয়ে বেঁধে পিঠে করে নিয়েই মাটি টানচে। স্বামীকে তাই দেখিয়ে আমি বল্লুম—'আহা, কি কষ্ট বেচারীদের।'

তিনি উত্তর করলেন—"চমৎকার পদ্ধতি। নারীকে এরা একেবারে অসহায় করে রাখে না। দু'মুঠো অন্নের জন্য ওই মেয়েদের আর পরের গলগ্রহ থাকতে হবে না।"

"সে-দিন সে কথা শুনে হেসেছিলুম, কিন্তু আজ সত্যিই ভাবচি প্রকৃত সুখী তারাই। ওই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আমরাও খাটি—তবুও ত কিছু করে উঠতে পারিনে। এরা যদি আমায় পীড়ন না করে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিত, তা' হলেও যেন বাঁচতুম। কোনরকমে হয়ত সন্তান ক'টিকে খাইয়ে বাঁচাতে পারতুম।"

"ছেলে মেয়ে ক'টি একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্চে। শুধু যে খাদ্যের অভাবে তাদের দেহ অপুষ্ট থেকে যাচ্চে, তা' নয়—যে অত্যাচার সইচে, যে রকম জঘন্য প্রকৃতির লোকের সঙ্গে থাকতে হচ্চে, তাতে করে তাদের মনের দৈন্যও বেড়ে উঠচে। এ অবস্থায় থাকতে হলে এদের একটিও মানুষ হবে না। সমস্ত দুঃখ কষ্টের চাইতে সেই চিন্তাই আমায় বেশী ক্লিষ্ট করে ফেলেচে।"

এমন আরো কত কি সে লিখেচে। নরেশের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো, তার জন্য কিছু করা যায় কিনা। আমরা ভাল আছি। তোমাদের বিশদ খবর জানিয়ো। ইতি।

তোমার—বৌদি।

(৪)

স্নেহের মোহিত,

চিঠি লিখে লিখে জবাব না পেয়ে কনক কিন্তু নীহারের ওপর ভারি চটে গেছে। সেই রাগের ঝাল ঝাড়বার জন্য, তোমার কাছেও চিঠি লেখা সে ছেড়ে দিয়েচে। কিন্তু তুমি আমায় যে চিঠিগুলো লেখ, তার প্রত্যেকখানি না পড়ে সে থাকতে পারে না—আর তাতে তোমাদের দাম্পত্য-জীবনের সব কথা জেনে সে বেচারা ম্রিয়মান হয়ে পড়েচে। অবসর সময়ে কেবল তোমাদের কথা বলে আমায় শুদ্ধ ব্যস্ত করে তুলেচে।

ওদিকে আবার কলকাতা হতে তোমার বউদি, কনকের মারফত, একটা কিছু উপায় বাৎলে দিতে আমায় বারবার অনুরোধ করচেন। তাঁর বিশ্বাস, তোমার সুখ-দুঃখের সোণার আর রূপোর কাঠি দুটো আমার হাতের সামনেই রয়েচে—একটু কষ্ট করে সে দুটোকে যায়গা মাফিক বসিয়ে দিতে পারলেই তোমাকে সুখী করতে পারি।

বাস্তবপক্ষে তোমাদের অবস্থাটা বাইরের দিক হতে আমাদের কাছে বড়ই শঙ্কাজনক বলে মনে হচ্ছে। তোমার চিঠিগুলি পড়ে আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছি—কিন্তু মগজে কিছুই যোগাচ্ছে না।

তোমায় আগে একবার লিখেছিলাম যে, কর্ম্মের একটা উদ্দাম প্রেরণা দেশের তরুণ-তরুণীদের বুকে চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে। তার ফলে জীবনের কোন অবস্থার মধ্যেই তারা আজ শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না। ছাত্র ছাত্রীরা পড়বার শ্লোক আওড়াতে বসে, তার মাঝে জীবনের নতুন রাগিণীর আলাপ শুনতে না পেয়ে, তোতার মত মুখস্থ করেই যাচ্ছে—যুবক যুবতী তাদের আরব্ধ কাজের মাঝে আনন্দের লেশমাত্র অস্তিত্ব দেখতে না পেয়ে, পেটের দায়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাজ চালাচ্ছে। পড়ার অবসরে, কাজের ফাঁকে হঠাৎ যখন তাদের অন্তরের আনন্দ সঙ্গীত বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে রিণ রিণিয়ে বেজে ওঠে, তখন-ই তারা বই ছুঁড়ে ফেলে, কাজের বোঝা ঠেলে রেখে মুক্ত হয়ে ছুটে যেতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। দু'চার জন কারও তাই—কোনদিকে না তাকিয়ে একেবারে ছুটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সবাই কিছু তা পারে না—দো-টানার ভিতর পড়ে জীবনের আনন্দকে একেবারে হারিয়ে বসে।

এদের জীবন সার্থক করতে হ'লে এদের পড়বার ও করবার এমন বিষয় নির্ব্বাচন করতে হবে, যার বোঝা হবে হাল্কা আর যার সঙ্গে সাথী থাকবে তাদের জীবনের আনন্দ।

নীহার যে দো-টানায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্চে, তাতে করে তার মনের কাদা সব তলিয়ে যাবে—আর মাতৃত্বের স্বর্ণ সরোজ শতদল মেলে ফুটে উঠে সৌন্দর্য্যে সৌরভে তার দেহমন মাতিয়ে দেবে। এমনি একটা পরিবর্ত্তন যতদিন না তার ওপর কাজ করচে, ততদিন সবাই মিলে চেষ্টা করেও তাকে সুখের সন্ধান বলে দিতে পারবে না।

ভাল কথা। তোমাদের গৌরীদেবী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক সপ্তাহ হ'ল এখানে এসেছেন। আমাদের এখানে নতুন ধরণের একটা বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েচে—আমিই তার সম্পাদক। একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হওয়ায় আমি তোমার বউদিকে লিখি যে, গৌরীদেবী সে কাজ গ্রহণ করবেন কি না। জবাব স্বরূপ গৌরীদেবীর আবেদন এসে হাজির হল। আমরা তাঁকেই নিয়োগ করলাম। তিনি তাঁর ভাইদের মতের বিরুদ্ধেই এ কাজ গ্রহণ করচেন। এখানে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা ইস্কুল হতেই করা হয়েচে,

আর মাইনেও আপাততঃ চল্লিশ টাকা স্থির হয়েচে। ছেলে মেয়েদের নিজে তিনি একরকম মন্দ থাকবেন না। কনকের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েচে— তিনিও তার "দিদি"। কাজেই মাঝ থেকে আমিও খানিকটা অপ্রত্যাশিত স্নেহ কুড়িয়ে পাচ্ছি—সে জিনিষটা বড়ই উপভোগ্য।

গৌরীদেবীর এই নতুন জীবনে লক্ষ্য করে দেখবার অনেক কিছুই আমি পেয়েচি। হিন্দু বিধবা গৃহকোণেই অভ্যস্থা—নতুন সমাজে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কাজে ব্রতী হয়ে একটা সঙ্কোচে আড়ষ্ট থাকবেন, এইরূপ আশঙ্কাই করেছিলাম; কিন্তু তাঁর সহজ সপ্রতিভ ভাব দেখে সত্যিই আমি বিস্মিত হয়েচি। তাঁর প্রতি যত লোকের যেমন অবিচার এতদিন অবাধে চলে এসেচে, তেমন অনেক ক্ষেত্রেই হতে দেখা যায় না—অথচ দীর্ঘ দিনের এই নিষ্ঠুর অত্যাচার তাঁকে জীবনে-মরা করতে পারে নি। হাসিমুখে কর্ত্তব্য কাজ করে প্রাণভরা তৃপ্তিলাভে তুষ্ট হচ্চেন—প্রগল্‌ভতা বা কোনরকম আতিশয্য তাঁর কাছেও ঘেঁসতে পারচে না।

হাঁ, আর একটা কথা। তুমি অনেকবার অনুযোগ দিয়েচ যে, কনকের কথা চিঠিতে আমি কিছুই লিখিনি। আমার কিন্তু মনে হয় তার সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, তার চাইতে কিছু কম তুমি জান না। একটা কথা শুধু অসঙ্কোচে আমি বলতে পারি যে, পরস্পরকে আশ্রয় করে আমরা দু'টি প্রাণী বেশ আরামেই আছি। আর সে আরামের নেশা আমাদের দু'জনাকে এমনই মশগুল করে রেখেচে যে, একটি দিনের তরেও আমরা পরখ করে দেখতে প্রবৃত্ত হইনি আমাদের স্বাভাবিক অধিকার কোথাও খর্ব্ব হয়েচে কি-না।

বাংলার তরুণীরা সব কনকের মত হলে বাঙালীর দুঃখ ঘুচবে কি-না বলতে পারিনে—তবে কনককে অন্যরকম করে গড়তে চাইলে তার জীবনটাকে যে নষ্ট করে দেওয়া হবে সেটা নিশ্চিত। কেমন আছ লিখো। ইতি।

তোমারই

নরেশ।

সমাপ্ত।

দুর্গোৎসব

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

কোথা হ'তে আজ, নিখিল ভাসাল
এ নব হরষ বরষা?
যৌবন ভরা শ্যামলা প্রকৃতি
সে প্লাবনে যেন বিবশা।
আজি, একি এ মহান্ দৃশ্য,
কার গুণ গাথা গাহে বিশ্ব,
পূর্ণাতটিনী আজি গো কাহার
চরণ পরশ-সরসা।
কাহারে পূজিতে অর্ঘ্য সাজায়ে
পূজারিণী-ধরা বিবশা।
অনলে ওই যে আপনা সঁপিয়া
অগুরু বিলায় সুরভি,
কাহার কণ্ঠে মাল্য হইতে
ঝরিছে গরবী করবী।
আজ, কুসুমে নব সুগন্ধ
মরি, ভুবনে একি আনন্দ।
বন্দনা রচে মধুর ছন্দে
ওগো মা! তোমারি সুকবি
দিকে দিকে আজ নব জাগরণ
ধূপ ধূমে নব সুরভি।
মাগো, শিহরে পুলকে কদম্ব মরি।
স্মরিয়া ও পদ লাবণি।
অশ্রুতে ভাসি' শিরীষ শেফালি
নীরবে চুমিছে অবনী।
একি এ দীপ্ত আকাশে,
ভোর, আগমনী বাজে বাতাসে,

কোন্ অপ্সরী খুলিল গো তরী
আজিকে সলিল বিলাসে ?
কি মন্ত্রে আজি জাগিয়া ভাবত
চাহিছে ব্যাকুল চাহনি !
নিখিল ভাসাল মাগো, তোরি রাঙ্গা
পদ নখ-কণ-লাবণি !

মায়াবাদ ও অদ্বৈত তত্ত্ব

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী]

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন কব ভাদ্রের নারায়ণে আমার সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য আমাব ভ্রান্তি দেখানই তাঁহাব উদ্দেশ্য। তিনি যে সব প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমি আমার কথাব সমর্থন লাভ করিয়া সুখী হইয়াছি। আব সকলকে সে সুখেব ভাগী কবিতে হইলে তলাইয়া বিচার করিতে হইবে। কিন্তু বিচারগৃহেব প্রবেশ দ্বাবে এক গাদা fallacyতে আমি ঠেকিয়া-পড়িলাম। সেগুলি সরাইতে হইবে।

প্রথম, Argumentum ad populum আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির উপব ত দেশের লোক হাড়ে চটিয়া রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের মতটা প্রচলিত শিক্ষার কুফল বলিয়া প্রচার কবিয়া দিলে অতি সুলভে যে একটা এক তরফা ডিক্রি নির্ব্বিচারে বা অবিচারে পাওয়া যায় উপেন্দ্রবাবু এ প্রলোভনটা সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তা তিনি যতই সাধনভজনশীল ত্যাগী ও জড়বুদ্ধিবিহীন হউন না কেন। বিচারের শেষে কথাগুলি বলিলে না হয় একটা সার্থকতা পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রথমেই ইহার অবতারণা পাঠকবর্গকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। উপেন্দ্রবাবু ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বভাণ্ডারকে এত শূন্যগর্ভ মনে করিলেন কেন যে বিশেষ কোন অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ গ্রহণ না করিলেই আর কিছু গ্রহণ করিবার থাকিত না ? শঙ্করের মায়াবাদ কি সে ভাণ্ডারের শতরত্নের একটী রত্ন নহে ? দেশে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্ব

হইতেই সেই ভাণ্ডারে মায়াবাদের শত-প্রতিবাদ সঞ্চিত হইয়া নাই কি? বঙ্গদেশ মায়াবাদ ধার করিয়াছিল। মায়াবাদের জন্মস্থানে ইহার তীব্র প্রতিবাদাত্মকবাদ সকল পাশাপাশি বিবাদ করিতেছে নাকি? সমালোচক মহাশয় কি খবর রাখেন যে দাক্ষিণাত্যে দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর জল স্পর্শ করে না! যাঁহারা বলিয়াছিলেন "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বুদ্ধমেব তৎ" তাঁহাদের মাথাও কি ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল? উপেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এই বাঙ্গালাতেই সাতদিন বেদান্তের মায়াবাদী ব্যাখ্যা করিয়া কোন সাড়া না পাইয়া সার্ব্বভৌম যখন বলিলেন,

"তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি॥"

ইহার উত্তরে

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সংশয়চ্ছেদিবাক্যে চৈতন্যদেব উত্তর দিলেন,

"জীবনিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥"

তারপর আরও আছে

"আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥" (চৈঃ চঃ)

আমরাই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কল্পনা শব্দটাকে বড় করিয়া দিলাম। আশা করি উপেন্দ্রবাবুও বোধ হয় এখন আর সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না যে তাঁর 'নেতি' শাস্ত্র গ্রহণ করিতে না পারিলেই তাহা জড়বাদীর ধারণামাত্র হয়, অথবা চৈতন্যদেবও পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাবে আত্মকেন্দ্রচ্যুত হইয়া মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও যে মানুষ শ্রদ্ধাহীন হয় না তার প্রমাণ ত উপেন্দ্রবাবু নিজেই। তবে এ স্ববিরোধ তিনি করিলেন কেন? আমারও বিশ্বাস ও বন্ধুরাও তাই বলিয়া দিলেন যে, তিনি কোন অ-ইংরাজী টোলের অধ্যাপক নন। অথবা অনুমানেরও প্রয়োজন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণই বর্ত্তমান। তিনি বিলাত আপিল করিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজীপড়ো-হইলেই যে শ্রদ্ধাহীন হইতে হয়, তিনি নিজেই তাঁর সেকথার প্রতিবাদ!

দ্বিতীয় fallacy এ ই বিলাত আপিল। আমি এ কথা বলিনা, যে আমাদের আলোচনায় স্বমতপোষক কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের যুক্তি আমরা ব্যবহার করিব না। কিন্তু এ আপিল তা নয়। ইহা স্বমতের স্বপক্ষি বিলাতীপণ্ডিতের প্রশংসাপত্র। যুক্তি নয়। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর একখানা সার্টিফিকেটের জায়গায় যদি আমি পাঁচখানা নিন্দাপত্র প্রকাশ করি, তাহলে কি তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া গৃহে ফিরিবেন? তা যখন নয়, তখন ইহার নাম দিলাম আমি বিলাত আপিল fallacy। এক শ্রেণীর পাঠকের অজ্ঞতাকে আলোচনা বাণিজ্যের মূল ধন করা হয় বলিয়া ইহাকে Argumentum ad ignoratim বলাও চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটে ফল ফলিয়াছে বিপরীত। তিনি স্বমত পোষক বলিয়া মোক্ষমূলের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নজির তাঁহারই বিরুদ্ধ পক্ষ স্থাপন করিতেছে। 'তৃতীয় fallacy হইয়াছে সুতরাং সোজাসুজি Ignoratio elenchi. আমি "জড়বুদ্ধি" বশতঃ বুঝিতেই পারিলাম না উপেন্দ্রবাবু এ উক্তি উদ্ধার করিলেন কেন? * পণ্ডিত প্রবর মোক্ষমূলের প্রশংসা করিয়াছেন The true Vedanta Philosophy'র বেদান্ত ফিলসফি মাত্রেরই নয়। আমরা দেখিয়াছি চৈতন্যদেব নিজেকে বেদান্তবাদী বলিয়াও শঙ্কর বেদান্তকে নাস্তিকতাদোষে দুষ্ট করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোনটা True vedânta? একটা অবশ্যই false. কোনটা true, তা পণ্ডিতবর স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, যে বেদান্তে Subject ও object এর সমন্বয় আছে। 'কার্য্যকারণ' এবং 'অহং ইদং' এর একত্ব আছে। সমালোচক মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই যে মোক্ষমূল'র যাহাকে বলেন True Vedanta তাহা তাঁহার মায়াবাদ বিধ্বংসী। এই জন্যই ত বলিয়াছি ignoratio clenchi. মোক্ষমূলর স্তুতি বা করিলেন কার গ্রহণ বা করে কে? সে কালের সেই শীতলাবাহীরও এই ভ্রম ঘটিয়াছিল। শঙ্কর বেদান্তে Subject সৎ object অসৎ। অহং' এর স্থাপনা আছে, ইদং নিরাকৃত। মায়াবাদের ব্রহ্ম কার্য্যও নহেন কারণও নহেন। একটা হাঁ, একটা 'না', অথবা দুইটাই না একত্র যোগ করিলে একটা tremendous' শূন্য পাওয়া যাইবে না কি? Synthesis হল উত্তম্। সাধে কি শ্রীচৈতন্যমায়াবাদকে নাস্তিক্যবাদ বলিয়াছেন। তবে সে কথা পরে। আচার্য্য

* It (The true Vedanta Philosophy) rests chiefly on the tremendous Synthesis of the subject and object, the identification of cause and effect of the "I" and the "It" উপেন্দ্র বাবুধৃত মোক্ষমূলর বচনের কিয়দংশ।

শঙ্কর আরম্ভও করিয়াছেন একে লইয়া শেষও করিয়াছেন একে, দুই কোথায় যে Synthesis হইবে? তার উপর Synthesis আরোপ করিতে গেলে তাঁর সেই মোহনীয় বুদ্ধিমত্তার উপর যে একটা tremendous কটাক্ষ করা হয় তাকি উপেন্দ্রবাবু একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই? তবে তিনি নিজে যে একটা সমন্বয় গড়িয়াছেন তাহা কতটা তাঁর নিজেরই মতের সঙ্গে সুসঙ্গত ও যুক্তিসহ তাহা যথাস্থানে বিচার করা যাইবে। চতুর্থ fallacy তাঁর তিনি এক জায়গায় ধমক দিয়া বলিয়াছেন, জগন্মান্য ঋষিদিগের কথা না মানিয়া অবিদ্যার দাস তোমার কথা মানিব? আমি যেন এরূপ ধৃষ্টতার কাজ বাস্তবিকই করিয়াছি। যাহারা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র আমি তাঁহাদের উপরে আপনাকে স্থাপন করিতে চাহিতেছি এই ভাব শ্রোতৃবর্গের মনে উদ্রেক করিয়া দিতে পারিলে সহজেই যে আমার উপর তাঁর জয়লাভের আশা আছে এই অভিসন্ধি তাঁর "বিদ্যার" ঠ্যাসা খাইনা মনের এক কোণে যাইয়া লুক্কায়িত যে নাই সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না, উপেন্দ্রবাবু মনে রাখিবেন, এ দেশের বামাচারী তান্ত্রিকগণও উপনিষদের ঋষির দোহাই দিয়াই আপনাদের অনাচারগুলি চালাইয়া দিয়াছিল। উপনিষদ্ ত বেওয়ারিশ মাল। এ দেশের বিরুদ্ধ সম্প্রদায় সকলে একই শ্লোককে আপনাদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা বা কু-ব্যাখ্যা করিয়া চিরদিন শ্রুতির সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের হুবহু দ্বৈতবাদ পক্ষীয় ব্যাখ্যাও বহুদিন হইল চলিয়া আসিতেছে। সকল সম্প্রদায় ইহাকে মহাবাক্যও বলে না ("তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য'—চৈঃ চঃ) মায়াবাদীর ব্যাখ্যাই কি সকলে স্বীকার করে? চৈতন্যদেবের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন—

"মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥ (চৈঃ চঃ)

এখন উপেন্দ্র বাবু বুঝুন, তিনি যে ভাষ্যাঞ্জন স্পর্শে রাহুমুক্ত করিয়া পূর্ণচন্দ্র দেখার বাক্যচ্ছটা বিস্তার করিয়াছেন, চৈতন্যদেব সেই ভাষ্যকে সূর্য্যের

আবরক মনে করেন। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন যুক্তি ছাড়িয়া authorityর উপর নির্ভর একান্ত নিরাপদ নহে। তিনি যে "সচ্চিদানন্দ" শব্দের তিন অংশে একার্থ আরোপ করিয়া স্বগত ভেদও নিরসন করতঃ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত তত্ত্ব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন বৈষ্ণব বেদান্ত কিন্তু সেই স্থানে তিনে এক, একে তিন, রূপ দ্বৈতাদ্বৈত প্রমাণ করেন—

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥
সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥ (চৈঃ চঃ)

সুতরাং উপনিষদ্‌কে স্বমতোপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিলেই হইবে, সে ব্যাখা যুক্তিযুক্ত কি না তাহাই প্রধানভাবে দেখিতে হইবে। কেবল যে প্রাচীনেরাই মায়াবাদী ব্যাখ্যা স্বকপোল কল্পিত বলিয়া দোষ দিয়াছেন, তা নয়। নবীনেরাও এই অপবাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘোষ, যাঁহার শ্রৌতশাস্ত্রে প্রবেশ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং যাহার কোন দর্শনটোলের বিশেষ মতামতের বিপক্ষতা বা পক্ষপাতিতা করিবার কোন গরজ বা বালাইও নাই, জুলাই মাসের Modern Reviewতে "Jivatman in the Brahma Sutras" এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলেন,—"If primality and finality be attributed to the Sutras, Sankara's Commentary will, we admit, appear in some places as forced and artificial But if the Upanishads be accepted as primal and final, we must, in many places, charge Badrayana and Sankara (both ?) with misrepresentations. The Vaishnava Theologians could not accept the absolute monism of the Upanishads and so had to depend upon Badrayana. 'If he did not suit them they would fall back upon some other resources.' সুতরাং বেওয়ারীশ মাল উপনিষদ ও তাহার ব্যাখ্যা লইয়া সম্প্রদায় সকলের মধ্যে যখন এমনি কাড়াকাড়ি (Scramble) তখন প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রুতি ব্যাক্যের ধমক্ আজ কালকার দিনে কতটা সময়োপযোগী তা বলা কঠিন। তবে ধমক্

দিবার যোগ্যতা উপেন্দ্র বাবুর কত এবং আমার প্রতি ধমকটা কিরূপ ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত তা যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমালোচনা অতি অপ্রীতিকর কার্য্য, তা যদি আবার কোন পূজ্যপাদ ব্যক্তির সমালোচনা হয়। প্রাচীন কালের যাহাদের স্মৃতি মানুষ ধরিয়া রাখিয়াছে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর আসিয়াছিলেন বৌদ্ধ-নাস্তিকতা দলনের জন্য। একদিকে দ্বৈতবাদী সাংখ্য অন্যদিকে শূন্যবাদী বৌদ্ধ—এ দু'এর সঙ্গে বিবাদে, অদ্বৈত তত্ত্বের উপর যে বিশেষ জোর (Emphasis) দিতে হইয়াছিল, অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেই ঝোঁকটাকে ধরিয়া রাখিতে গেলে জগদ্বিবর্ত্তনের বিরুদ্ধ মুখে চলিতে হয়। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর যে আসনে বসিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহাকে সেই আসনেই বসাইয়া রাখিলে তাঁহার মধ্য হইতে জীবন বাহির করিয়া লইয়া তাঁহার কাষ্ঠমূর্ত্তির পূজা করা হইবে। মৃত গ্রহণ করে না, যেমন তেমনই থাকে। না হয় নষ্ট হইয়া যায়। জীবিতই গ্রহণ করিতে ভয় পায় না। সে নূতন গ্রহণ করিয়া আবেষ্টনের উপযোগী হয় ও দিন দিন বড় হইয়া উঠে। আমরা মধ্যযুগে যাইয়া শঙ্করের পূজা করিব কেন? তাঁর দর্শনের উপর নূতন রং ফলাইয়া যুগোপযোগী করিতে পারি না কি? তাহাতেই উহার প্রাণের পরিচয় পাইব। নতুবা পুরাতন পুতুল কেহ গ্রহণ করিবে না। তবে এ কথাও ঠিক্ এই বিংশ শতাব্দীতেও দশম শতাব্দীর লোক বিচরণ করিতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের পরিবর্ত্তনে নূতন তত্ত্বের (Data) আবির্ভাব হয়। তাহা স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি যে systemএর নাই তাহা মৃত, জীবন্ত মানুষ বেশী দিন তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে Rationalismএর সঙ্গে বিবাদ করিতে যাইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এক রকম Agnosticismএর আশ্রয় লইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই Rationalismকেই আত্মরক্ষার বর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতেছেন। তাই বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর খৃষ্টান পাদ্রী এখন নাই তা কে সাহস করিয়া বলিবে? মহাত্মা গান্ধী বলেন, শঙ্কর ও চৈতন্য উভয়েরই প্রভাব দেশের উপর অসীম। অথচ একজন আর একজনকে বলিয়াছেন নাস্তিক। শুষ্ক তান্ত্রিক আচারে দেশ যখন মরুভূমি, ভক্তির বন্যা আসিয়া সব ভাসাইয়া দিল, আত্মা তৃপ্ত হইল। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যাহা চাই, পাইলাম।

অন্ত কোনদিকের বিচার উঠিল না—সে দিকে দৃষ্টি এখনও যে পড়ে নাই অবস্থার বিবর্ত্তনে নূতন সমস্যার আবির্ভাবে আমরা যে ঐ-টুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা কোথায় ? দেশের লোক যখন না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, খাইতে পাইবে সে আশাও করিতে পারিতেছে না, তখন মহাত্মা বলিলেন—আমার অনুসরণ কর, খাইতে পাইবে। অমনি সে কথা কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। দলে দলে লোক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল, কোথায় যাইতেছে ভাবিলও না। অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দাও, ও-ডাক কাণেও পৌছিবে না। তখনকার কাজ সে সময়কার জন্যই অক্ষয় হইয়া রহিল। যুগ পরিবর্ত্তনে মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা আসে, তার যে নূতন অভাব উপস্থিত হয় তদনুসারে প্রয়োজন হইলে ডাকের উপকরণ ও প্রকরণ দুই-ই বদলাইতে না পারিলে সাড়া চিরদিনই মিলিবে না। বুদ্ধের ডাকে একদিন যে সাড়া মিলিয়াছিল, আজ তা আছে কি ? মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে nationalismএর ডাকে য়ুরোপের জাতি সকল মাতিয়া উঠিত আজ তাহাতে ভাটা ধরিয়াছে। তাই বলিয়া এ সকলের কি স্থায়ী মূল্য নাই ? আছে যদি ইহাদিগকে নবতর উচ্চতর synthesisএর অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পার। মানুষ তার মতের অনেক উপরে উঠিতে পারে। আমরা আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি বটে কিন্তু আচার্য্যের কাছে ধর্ম্ম বা সত্যের ঋণ যে অপরিশোধ্য, যাহা ইতিপূর্ব্বে স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ আর করিব না। মাত্র এই কথা বলিয়া বিচার প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়া লই যে আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি কাহারও অপেক্ষায় পশ্চাৎ পদ তাহা স্বীকার করি না, অন্ধভক্তিকে আমি শ্রদ্ধা মনে করি না, অশ্রদ্ধাই মনে করি। তবে যদি ভাষার ধরণে (styleএ) কোন দোষ ঘটিয়া থাকে তবে করযোড়ে পাঠকগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি—মানুষ আপনার ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না।

বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উপেন্দ্র বাবু বিগত ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার একটী অতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ—শঙ্কর ও স্পিনোজা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিচার করিবার পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সারিয়াছেন। সুতরাং টিপ্পনি নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি যে পাঁচটি পূর্ব্ব পক্ষ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিলেই চলিবে।

(১) অদ্বৈততত্ত্ব ও মায়াবাদ যে পরস্পর বিরুদ্ধ সে কথার উত্তর উপেন্দ্র-

বাবুই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মায়া কেবলমাত্র বিদ্যার অভাব নয়, কিন্তু আবরণী বীজশক্তি—তাঁহার এই স্বীকারোক্তি অদ্বৈতত্ব বিনাশ করিতেছে। মায়ার যখন সত্তা আছে, সে সত্তা ব্রহ্মের অন্তর্ভূত হইলে স্বগতভেদ আসে, বাহিরে হইলে দ্বৈত হয় ও ব্রহ্মের অনন্তত্বে ব্যাঘাত ঘটায়। এই মাত্র বলিলেন, মায়া কেবলমাত্র বিদ্যার অভাব নহে। সে নিশ্বাস শেষ না হইতেই সুর ধরিলেন, উহা 'সৎ' নহে। আবার সে নিশ্বাসও পড়িল না, বলিয়া উঠিলেন, "সদসৎ শব্দ দ্বারা অনির্বাচ্য মায়াশক্তি।" শক্তি শব্দদ্বারা বাচ্য যখন তখন 'অনির্বাচ্য'ও 'অসৎ' না হইয়াই যায় না? এমন না হইলে কি দর্শন শাস্ত্র গড়া যায়? একবার বাঁগ্‌বাজারের সুরষিকেরা তর্ক বিতর্কের পর মীমাংসা করিয়াছিল, "আছেরা কি গরু না যে জলে আগুন লাগ্‌লে তারা গাছে উঠবে?" উপেন্দ্রবাবু বলেন, অনাদি "মায়ার অন্ত আছে বলিয়া তাহা সৎ নহে। অতএব মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব কোনও রূপে ব্যাহত হয় না।" সমালোচক মহাশয় নিজের যুক্তিটিও তলাইয়া দেখেন নাই। এই যুক্তিটিতে অনাদিকাল হইতে 'অন্ত' না হওয়া পর্য্যন্ত মায়াকে 'সৎ' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, এবং যতদিন না 'অন্ত' হয় ততদিন ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বকে ব্যাহত করিতে তাহার কোন বাধা রহিল না। কোন সময়ে তার 'অন্ত' হইবে—এই উক্তিই প্রমাণ করিতেছে যে মায়া আছে অর্থাৎ 'সৎ'। যা নাই তার সম্বন্ধে সে অনন্ত নয় এই কথা খাটে না। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ইহার পারমার্থিক সত্তাই স্বীকার করিতেছ। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয় নশ্বর। চৈতন্যদেবও এই কথাই বলিয়াছেন—"জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয়।" এ সত্তা ব্যবহারিক বলিতে পারিবে না। কেন না ব্যবহারিক ভাবে সংসারবৃক্ষের 'অন্ত' নাই। লক্ষ লক্ষ অমুক্ত জীবের জন্য মায়াশক্তির কার্য্য অনন্ত কাল চলিবে। তাই জন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন, "এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" কথাটা আরও একটু বিশদ্ করিয়া বলি।—ব্যবহারিক সত্তার 'অন্ত' নাই, মায়ার 'অন্ত' আছে, সুতরাং মায়া ব্যবহারিক সত্তা নহে। মায়া হয় ব্যবহারিক, না হয় পারমার্থিক, কিন্তু মায়া ব্যবহারিক নয়, সুতরাং মায়া পারমার্থিক। ইহাকেই বলে, উল্টা সমঝ্‌লি, রাম। বলি, যার অস্তিত্বই নাই তা লইয়া এত বিব্রত কেন? মুখে যতই বলা হউক না কেন যে এই জগৎব্যাখ্যা কেবল ভ্রান্ত জীবের জন্য, পরমার্থতঃ কিছু নয়। কিন্তু পরমার্থতত্ত্বও ত জীবই জানিতে চায়। তাই, তার জ্ঞানের কাছে যা সত্য বলিয়া প্রকাশিত হয় তাকে মিথ্যা বলিলে, থাকে

কল পরমার্থ সত্তা তার সত্যতার প্রমাণ করিবে কিসের জোরে? তারও দাঁড়াবার স্থান থাকবে না—সে abstract হয়ে যাবে।" সুতরাং জগৎকে একেবারে নাস্তির উপর বসান চলিল না। অথচ একদিক্ রাখ্তে গেলে অন্যদিক্ থাকে না। সুতরাং পর পর সৎ ও অসৎ বলিতে বলিতে ডিগ্‌বাজী খাঁইয়া চলিতে হইতেছে। এ বিপদ যে উপেন্দ্র বাবুর নিজের তা নয়। আচার্য্য শঙ্করকেই বাধ্য হইয়া মায়া সম্বন্ধে নানাস্থানে নানামত দিতে হইয়াছে। (ক) সৎ কি অসৎ তাহা নিরূপন করা যায় না (মুঃ ভাঃ ১।৪।৩; ২।১।১৪) (খ) ইহা নিত্য নিবৃত্তা (নৃসিংহ উত্তর তাপনীয় ভাষ্য, ৯ম খণ্ড) (গ) সা চ মায়া ন বিদ্যতে (গৌরপাদীয় কারিকার ভাষ্য, ৬।৫৮) এই দুর্দ্দৈবের কারণ যা সকল Dogmatic Philosophyতেই ঘটিয়াছে। জ্ঞানের জন্য ব্রহ্ম ও জগৎ দুই-ই চাই। শঙ্কর পূর্ব্ব হইতেই এই দুইকে দুই স্বতন্ত্র কোটিতে স্থাপন করিলেন। এই দুইএর সামঞ্জস্য ছাড়া জ্ঞানতৃপ্ত হয় না। অথচ দুইটাকে দুই প্রকৃতি দিয়া ভাগ করা হইয়াছে—সামঞ্জস্য চলে না। তাই ধর পাকড়। ডেকার্টেরও তাই হইয়াছিল। হাঙ্গামার পর হাঙ্গামা আসিল, Spinoza এক করিলেন, কিন্তু কত খুঁৎ রহিয়া গেল। প্রচীন Neo-platonistগণ এই ব্যবধান দূর করিবার জন্য Emanationএর পর Emanation বাহির করিলেন, ব্যবধান গেল না। স্ববিরোধের উপর স্ববিরোধই কেবল পুঞ্জীকৃত হইল। আমাদেরও বাসুদেব, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, বাহির হইলেন, কিন্তু ব্যবধান ঘুঁচিয়াছে কি? উপেন্দ্র বাবুও হালে পাণি না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে বসে পড়ে নাকে কাঁদিয়া দার্শনিক জগতের বালানাং ক্রন্দনং বলম্—বলেছেন, একটা অবোধ্য অনিবার্য্য মায়া না হ'লে কিছু বুঝা যায় না—সমন্বয় হয় না। খুব বুঝাতে এসেছেন কিন্তু। সমন্বয় কিসের? উপেন্দ্র বাবু না এই একটুখানি পূর্ব্বে 'নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কি' এই প্রশ্নের সম্ভাবনাতেই হেসে একেবারে কুটিপাটি হয়েছিলেন। তিনি না বলেছেন, এরূপ সম্বন্ধের প্রশ্ন "বন্ধ্যার পুত্রবত্তা" প্রভৃতির ন্যায় হাস্য জনক! তবে কোন্ মুখে বলিলেন 'ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা ও জগতের (ব্যবহারিক?) সত্তা স্বীকার করিলে এবং এতদুভয়ের সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধশক্তি মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য।" যেন মায়াবাদ ছাড়া জগতে আর দর্শন শাস্ত্র রচিত হয় নাই। কে বলিয়াছিল, আগে ব্রহ্মকে সৎ ও জগৎকে অসৎ বলিয়া আরম্ভ কর এবং পরে তাদের সামঞ্জস্যের জন্য একটা গোঁজামিল

খুঁজিয়া হয়রাণ হও—এ যে স্বখাত সলিলে ডুবে' মরি, শ্যামা। সমন্বয় কি একটা সম্বন্ধ নয়, উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সংস্থাপন ছাড়া কি সমন্বয় সম্ভব? তবে, যে সম্বন্ধের নামেই হেসে গড়াগড়ি, সেই সম্বন্ধের জন্য এখন এত দৌড়াদৌড়ি কেন? না হইলেই হবে না। এই কথাগুলি লিখিতে যাইয়া উপেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই মনে মনে খুব হেসে ছিলেন? কেন না, ইহার মধ্যে স্ববিরোধের একান্ত ভাব। ইহারই নাম দর্শনশাস্ত্র, ইহারই নাম ভারতীয় দর্শনতত্ত্বের মর্ম্মাভিব্যক্তিভাব পরিচয়। পরিচয় আছে কিন্তু আরও অনেকদূর পর্য্যন্ত দুই বস্তুর মধ্যে সমন্বয় করিতে হইলে সমন্বয়কারী তৃতীয় বস্তুর Tertium quid চাই যাহাকে উভয়ের গুণান্বিত হইতে হইবে, অথচ উভয়কেই অতিক্রম করিতে হইবে। 'এপার' 'ওপার'এর সমন্বয়কারী সেতুকে উভয় পারব্যাপীই হইতে হয়! সুতরাং মায়া সদসদাত্মিকা কেন তা নিতান্তই অবোধ্য নয়। ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় বাধা খাড়া করিয়া তাহার যখন নিদর্শন দরকার হইল তখন খৃষ্টীয় শাস্ত্র একাধারে দেবমানবধর্ম্মী পুত্রের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সমন্বয়কারী যে দুইএর অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ তাহা আদিতে স্পষ্ট না হইলেও logical consequence রূপে পরে শ্রেষ্ঠ হইয়াই দাঁড়ায়। তাই, আজ যীশু ঈশ্বরকে স্থানচ্যুত করিয়া সৃষ্টির জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। আমাদের দেশেও ত ঠিক তাহাই হইল। শঙ্কর শিষ্য সুরেশ্বর তৈত্তিরীয় বার্ত্তিকে বলিয়াছেন যাঁহাকে জানিলে সকল ভয় দূর হয় সেই ব্রহ্ম কিন্তু মায়ার ভয়ে ভীত (তৈঃ বাঃ, ২।৬৯—৭২) আর মায়াবাদী পৌরাণিক—তার হাতে মায়া নানারূপে নানা আকারে সকলের উপরে উঠিয়া বসিয়াছেন, মহাব্রহ্মও তার বাচ্চা। "ছিল হাতি হ'ল তুণ কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল।" জগৎকে ছাঁটিয়া ব্রহ্ম স্থাপন করিতে গেলে পরিণাম ফল ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না।

(২) শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব কি সত্য সত্যই এক কল্পিত abstract একত্ব? বহু হইতে এককে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা সত্য সত্যই abstract এক। ও বহু আপেক্ষিক সত্য। বহুর ধারণাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে এক শূন্যে পরিণত হয়। উপেন্দ্র বাবু ত আমাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাঁকে একটা প্রশ্ন করিতে পারি কি? তিনি কি 'নেতি নেতি' পথে 'বিষয় জগতের 'সর্ব্ব' নিঃশেষ করিয়া দেখিয়াছেন পরিণামে কি পাওয়া যায়? আমি তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, এ পথে যুগে যুগে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের পরিণাম যাহা হইয়াছে উপেন্দ্র বাবুরও তাহাই হইবে—পূর্ণানন্দ মিলিবে না,

মিলিবে অমাবস্যার অন্ধকার। এত জোর করিয়া বলিতেছি. এই জন্ত যে অজ্ঞাতসারে তিনি প্রতিপক্ষকে সাহায্য করিয়াছেন—আমি তাঁরই সায় পাইয়াছি। তিনি বলেন, অবস্তুতঃ জগতের সত্তা নাই, ব্রহ্মই একমাত্র অনন্ত সর্ব্বব্যাপীসত্তা। জিজ্ঞাস্য এই জগতের যদি সত্তা না থাকে তবে জগৎব্যাপীর সত্তাটা থাকে কি ব্যাপিয়া? 'সর্ব্ব'র যে পথে গতি সর্ব্বব্যাপীকেও সেই পথে মহাপ্রস্থান করিতে হয়, নাস্ত পন্থা। সর্ব্ব যদি মিথ্যা হয় সর্ব্বব্যাপী সত্য হইবেন কোন লজিক্ অনুসারে। সকল abstract thinkingএরই পরিণতি এই, উপেন্দ্রবাবুর একার দোষ নয়। শঙ্করোত্তর মায়াবাদে মায়াবাদের যা logical consequence) 'সচ্চিদানন্দ' শূন্যে পরিণত হইয়াছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্ত নাস্তিকতার অপবাদ দিয়াছেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া মায়াবাদের যে নিন্দা তাহা ভিত্তিহীন নহে। "Vision of the one in the many" ইহাতেই একের মূল্য। এই দৃষ্টিই জগৎ আজ সকল বিভাগে খুঁজিতেছে— শূন্যগর্ভ একের দৃষ্টি নহে। বহুকে 'নস্যাৎ' করিলে একের কোন মূল্য থাকে না—এক তখন হয় শূন্য। বহুকে অস্বীকার করিয়া উপেন্দ্রবাবু তাঁর একককে শূন্যই করিয়াছেন। সন্ন্যাসীকে খাইবার জন্য ভক্ত একটী বাধাকপি দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী একটী একটী পাতা ফেলিয়া দিয়া 'নেতি' মার্গে কপি খুঁজিয়া হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন 'কপি মিলা নেই'। মায়াবাদীও সন্ন্যাসী। বাস্তবিক, এই abstraction আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ।

(৩) আমি বলিয়াছি মায়াবাদে জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই। জগতের অন্ত কারণ "আছে কি না, এ প্রশ্ন আমার সঙ্গে বিচারে অপ্রাসঙ্গিক। যদিও আমার মতই তিনি পুনঃ পুনঃ সমর্থন করিয়াছেন তবুও শেষকালে যে আবার সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে বিভ্রাটের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(৪) শঙ্করের মায়াবাদ কি অবোধ্য irrational? হাঁ কি না বিচার করিতে যাইয়া উপেন্দ্রবাবু নিজেই ত হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেরূপ হতাশভাবে বলিয়াছেন "সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধশক্তি মায়াবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য" তাহার অর্থ কি এই নহে যে, ওটা কিছু বুঝা যায় না তাই দিয়া আর কিছু বুঝাইতে যাওয়াটা কি খুবই Rational? যা নিজে সৎ কি অসৎ তাই বুঝা যায় না সেই Principle দিয়া জগৎ সৎ কি

অসৎ তাহার সত্তা বুঝাইতে যাওয়া কেবল Irrational তাহা নহে, আজগুবীও বটে। তাঁর এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যুক্তি বলে না বুঝাইয়াই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না এমন তত্ত্ব কি আছে ? আমি যদি বলি, ব্রহ্ম এক নির্ব্বিশেষ স্বগত-ভেদ-হীন সত্ত্বা হইয়াও এই বহুত্বপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিয়া আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন ইহাতে ব্রহ্মের একত্ব নষ্ট হইল। আমি বলি "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তির অসাধ্য কি আছে ?" "আপনার বেলায় মহাপ্রসাদ অন্যের বেলায় ভাত" বলিলে চলিবে কেন ? নিজেই অনির্ব্বাচ্য নাম দিয়াছেন তার পর বলছেন অনির্ব্বাচ্য যখন তখন ত অবোধ্য বটেই। Question begging epithetটা একটা যুক্তি নয়। কে বলেছিল অনির্ব্বাচ্য মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করতে ? উপেন্দ্রবাবু বলেনি, মানুষের বোধ শক্তি ঐ রকমই করে। জিজ্ঞাসা করি, এই বহুনিন্দিত মানববুদ্ধি ছাড়া আর কোন বুদ্ধি ধার মিলে কি যাহা দিয়া দর্শনশাস্ত্র গড়িতে হইবে ? মুনি ঋষি হইতে চুণাপুঁঠি আমরা পর্য্যন্ত সকলকেই এই দুর্বৃত্ত বোধশক্তিটার উপরই নির্ভর করিতে হয়। মানববুদ্ধির নিন্দা "যে ডালে বাসা সেই ডাল কাটার" সামিল। শেষে যদিও তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন অবোধ্য বলিতে চাও আপত্তি নাই কিন্তু কোট বজায় রাখিবার জন্য সমাধান করিলেন অতএব মায়াবাদ irrational নয়। কি যুক্তি বলে ? "জুতা মেরেছে মেরেছে কিন্তু অপমান ত করে নাই" ইতি ন্যায়াৎ বোধ হয়।

(৫) সাধন ভজন দ্বারা কি সত্য সত্যই জীব ব্রহ্মের এক-স্বরূপত্ব অপ্রমাণিত হয় ? আমি বলিয়াছি, মানুষ যখন কিছু ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে—তখন কিরূপে বলিবে যে সে ব্রহ্ম। যে ব্রহ্ম জানে সেই ব্রহ্ম এই ত যুক্তি ? যখন জানে নাই, জানিবার জন্য প্রয়াস করিতেছে মাত্র—তার এই সাধন-ভজন কি প্রমাণ করিতেছে না যে সে ব্রহ্ম নয় ? আমার এই মহাপাপের জন্ত আমার ঘাড়ে উপনিষদের ঋষিদিগকে চাপাইয়া দিয়া আমাকে নরকে পাঠাইবার চেষ্টা হইয়াছে। জান না "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" ইহা ঋষিবাক্য ? অবিদ্যার দাস, তুমি তা জানবে কি করে ? ও হরি। আমি কখন বল্লাম ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না ? আমি না বলেছি যে ত্যাগ করে সে ব্রহ্ম নয়। উপেনবাবু গড়েছেন এক tremendous ignoratio elenchi. "এখান থেকে মারলাম ছুরি লাগল কলাগাছে, হাটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাপ"। মনে পড়ছে এইরূপ এক বিপত্তির

সম্মুখীন হইয়াই আচার্য্যশঙ্কর বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"অহোহনুমান কৌশলং দর্শিতমপুচ্ছশৃঙ্গেস্তার্কিকবলীবর্দ্দৈঃ"।

আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম মাঝখানে মায়ার স্বপ্ন, এটা যে আমার স্বকপোল কল্পিত নয় তা উপেন্দ্র বাবু নিজেই নানা শাস্ত্র হতে প্রমাণ করে দিয়েছেন। যুক্তিও যে কম দিয়েছেন তা নয়। আচার্য্যশঙ্কর ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" এই কঠশ্রুতির ভাষ্যে আরম্ভ করিয়াছেন ব্রহ্ম লইয়াই। কিন্তু সংসার বৃক্ষটা যার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অতি সুন্দর কবিত্ব বর্ণনা আছে তাহা অবিদ্যা বীজ প্রভব। বিদ্যার আবির্ভাবে বাজীকরের বাজীর ন্যায় মিলাইয়া যায়। পরে যদি শূন্য না থাকে তবে ব্রহ্ম ছাড়া আর কি থাকিবে? লাভ ক্ষতি কার কিছু নয়। মায়াবাদী বলিবেন, জীবের মুক্তি। মুক্তি ত হয় বিদ্যার আবির্ভাবে। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কাছে বিদ্যা আসিবে না—পরমাত্মাপি সংসারমায়া ন সংস্পৃশ্যতে। অবিদ্যা দ্বারাও বিদ্যা লাভ হয় না। উপেন্দ্র বাবু বলেন শ্রুতিবাক্যের শ্রবণ মনন কর। পূর্ব্বোক্ত কঠভাষ্যে আচার্য্যশঙ্কর বলিয়া রাখিয়াছেন, শ্রুতিও ঐ সংসার বৃক্ষের পত্র—শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় বিদ্যোপদেশ পলাশঃ—সুতরাং অবিদ্যার ফল। মায়াবাদের দিক্ হইতে সে পত্র চর্ব্বণে কি ফল হইবে? দাঁড়াইতেছে, যে মুক্ত নয় তার আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই। উপেন্দ্র ধীরেন্দ্রই যে কেবল অবিদ্যার দাস তাহা নহে, উপনিষদের ঋষিরাও সুতরাং অবিদ্যার উপরে নহেন। উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়েই অবিদ্যার অধিকারে। অবিদ্যা অতিক্রম না করিলে অবিদ্যাকে অবিদ্যা বলিয়া জানিবার উপায় নাই। অতিক্রম করিলে ত নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-ব্রহ্ম—যেখানে বিদ্যা অবিদ্যার ভেদ নাই। সেখান হইতেও কোন উপদেশ আসিবে না, সুতরাং যেখানে আছেন সেই-খানেই থাকুন। বুঝিলেন উপেন্দ্র বাবু, a Consistent Mayavad must be speechless।

এখন উপেন্দ্র বাবুর চিন্তার ধারার একটু পরিচয় দিয়া উপসংহার করি। একস্থানে বলিয়াছেন সুখদুঃখাদি দেহ ধর্ম্ম অসৎ অমার্জ্জিত বুদ্ধি স্থূলদর্শীরাই দেহ ধর্ম্ম সুখদুঃখাদিকে সত্য বলিয়া জানে। কিন্তু শেষ করিয়াছেন, "মায়াকে অলীক বলিয়া আমরা যতই পরিহাস করি না কেন তাহার দুঃখদায়িনী শক্তি কি নিদারুণভাবে সত্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন।" মায়াকে অলীক তিনিই বলিয়াছেন, আবার সে দু

আক্ষেপও তিনিই করিতেছেন। সুখ দুঃখকে তিনিই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আবার তিনিই তাহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইহাকেই abnormal Psychology ওয়ালারা বলেন Mental Dissociations উপেন্দ্র বাবু কার উপর গোসা করে এ নিদারুণ সত্যটা একেবারে বাইরে নিয়ে এলেন? আশা করি ইহা আধুনিক জড়বাদের সুরসাল ফল ভক্ষণ হেতু বদহজমির উদ্গার নহে। আর বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই, পাছে Psychopathology আসিয়া পড়ে। অতদূর যাব না। যদি উপেন্দ্র বাবু অনুগ্রহ করেন—সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্— তবে আবার পাঠকের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিব। এখন বিদায়।

বিচারক

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী]

(১)

আমি যদি মা হ'তাম মা,
তুমি যদি ছেলে,
খুঁজে সারা হ'তাম না মা,
বাইরে তুমি গেলে।
ধুলো ঝেড়ে মুছিয়ে নিয়ে
জামা কাপড় পরিয়ে দিয়ে,
অমন ক'রে দুধ গিলিয়ে
দিতাম নাক ঠেলে,
আমি যদি মা হ'তাম মা,
তুমি যদি ছেলে।

(২)

তুমি যদি খেলতে যেতে
ধুলো-বালির ঘরে,
মালুই, সরা, চিতের পাতা
এনে দিতাম করে।

বিষ্টি ধরে কচুর পাতায়
আন্‌তে দিতাম ভিজে মাথায়,
উঠতে দিতাম গাছের শাখায়
খেলার খাবার তরে,
তুমি যদি খেলতে যেতে
ধুলো বালির ঘরে।

(৩)

দুপুর বেলা খেল্‌তে যদি
রোদের মাঝে গিয়ে
যেতাম না মা আন্‌তে টেনে
কোলের মাঝে নিয়ে।
চুমো খেয়ে হাত বুলায়ে
দিতাম না'ক তোমার গায়ে
দিতাম না ঘুম তোমার কায়ে
ঘুমপাড়ানী দিয়ে,
দুপুর বেলা খেল্‌তে যদি
রোদের মাঝে গিয়ে।

(৪)

তুমি যদি থাক্‌তে প'ড়ে
একটু অসুখ ক'রে
কেঁদে সারা হ'তাম না মা,
তুলসী-তলায় প'ড়ে।
হ'ত নাক মানত করি
সাধাসাধি ওষুধ ধরি
ব'লে দিতাম,—পালাও হরি,
আমি খোকায় ধ'রে,
তুমি যদি থাক্‌তে প'ড়ে
একটু অসুখ ক'রে।

সুখের ঘর গড়া

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

দয়াময়ীর বাজারে পৌছিলে ভবানীর পাল্কী নামানো হইল। এইখানে সহযাত্রী বন্ধুদের সহিত মিলিত হইবার কথা কিন্তু এখানে আসিয়া ভবানী শুনিলেন বাজারের লোকেদের মধ্যে কলেরা দেখা দিয়াছে। দুই চারিজন ইতিমধ্যে মারাও গিয়াছে। এই বাজারের মালিক ভবানীপ্রসাদের খুড়া; একজন কর্ম্মচারী এখানে তোলা (টোল্) আদায় করিবার জন্ম মোতায়েন থাকিত। তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভবানী শুনিলেন যে সে ব্যাচারীও ঐ রোগে আক্রান্ত। শুনিয়া ভবানী বড় কাতর হইলেন। বিশ্রাম করা বন্ধ রাখিয়া তাহাকে দেখিতে চলিলেন, বেহারাদের ডাক দিলেন।

সভয়ে বলিল "না হুজুর রোগ বড় খারাপ গিয়ে কাজনি—আপনি বাড়ী যান আমি না হয় খোঁজ নিয়ে যাচ্ছি"। ভবানী বলিলেন "তোমার প্রাণের ভয় হয় তুমি থাক আমার কাজে কথায় প্রতিবাদ করনা—"

আর কোন কথা না বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে গেল।

পূর্ব্বকথানুসারে বিজয় ও পঙ্কু দয়াময়ীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভবানীকে তথায় দেখিতে না পাইয়া উভয়ে ভাবিল হয় ভবানী চলিয়া গিয়াছে না হয় আসিয়া পৌছে নাই। ঘাটের দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল এক বাবু পাল্কী চাপিয়া উত্তর মুখে গিয়াছে। সিদ্ধান্ত করিল পায়ের যন্ত্রণা বশতঃ ভবানী বোধ হয় অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। উভয়ে আর অপেক্ষা না করিয়া—গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিল।

বিজয়দের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যে পথ সেই পথ দিয়া আরো আধপোয়া আন্দাজ রাস্তা দূরে তর্কসিদ্ধান্তের বাটী। বাড়ীর কাছে আসিয়া বিজয় পঙ্কুকে বলিল—"আমাদের এখানে একটু বসে জিরিয়ে তারপর বাড়ী গেলে হয় না?" পঙ্কু এটিকেট অনুমোদিত মিথ্যা বিনয় বা কৃত্রিম ওজর এ সবের বড় ধার ধারিত না, সঙ্গে সঙ্গে সহর্ষে বলিল "সেটা আর এত অসম্ভব কি? বেশতো চলুন।" উভয়ে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিল। তখন বেলা এগারটা। রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর। বিজয় পঙ্কুকে বসাইবার জন্য একটা আসন আনিতে বাড়ীতে ঢুকিল।

বিজয় মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া পঙ্কুর কথা বলিল— মা বলিলেন "তর্ক-সিদ্ধান্তের ভাগে? তা বাইরে বসালি কেন? ঘরে নিয়ে আয় না?" বিজয় বাহিরে গেল। মঙ্গেশ্বরী ছেলে ও বন্ধুর জন্তে জল খাবার সাজাইতে বসিলেন। কিরণ মাকে সাহায্য করিতে গেল। নলিনী ও তরু কলিকাতা হইতে আনিত দ্রব্যাদি দেখিতে লাগিয়া গেল। খানিক পরে নলিনী আসিয়া বিজয়কে চুপি চুপি বলিল "পঙ্কু দাদাকে নিয়ে এস বাড়ীর ভিতরে।" পঙ্কু বলিল "মাপ করবেন বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবেন না— যা হয় এখানেই আমুন—মেয়েদের মধ্যে বসে আড়ষ্ট হয়ে চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে জলযোগ করা—মাপ্ করবেন মশাই উৎকণ্ঠার সময় ঘাব্‌ড়ে যাব—এখানেই আমুন—"। বিজয় দ্বিরুক্তি না করিয়া নলিনীকে বলিল "তোতে আর তরুতে দুজনের জলখাবার নিয়ে আয় আমরা যাব না"।

তরু নলিনী জলখাবার আনিয়া ধরিয়া দিল। কিন্তু যাকে বলে "যায়গা করে জলখাবার দেওয়া" তা হইল না দেখিয়া বিজয় দুইবোনকে ডাকিয়া বলিলেন "বোকা মেয়েরা এই বুঝি গেরস্থ বিদ্যে শেখা হচ্চে, যায়গা না করে খাবার ধরে দিলি যে? আচ্ছা, বুদ্ধি। যা নলি আসন আন্‌গে" বলিতে বলিতে বি য় নিজেও ছুটীয়া বাড়ীর ভিতর গেল, তরুকে বলিয়া গেল দাঁড়া হাতে করে, মাটীতে নামাসনি, আসছি—"।

একে অপরিচিত যুবা, তাতে আবার দাদার বন্ধু, তার উপর সেথা তৃতীয় ব্যক্তিও কেহ নাই, দাদার আদেশ যতক্ষণ না সে আসে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তরু লজ্জায় কাট হইয়া গেল, বেচারী পাথরের মুর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া মুহূর্ত্তকে যুগের মাপে মাপিতে লাগিল। পাথরের মুর্ত্তির একটা রক্ষা, তা লজ্জায় লাল হয় না আর ঘামেনা, তরু কিন্তু লজ্জায় রাঙ্গিতে ও ঘামে ভিজিতে লাগিল। পঙ্কু ব্যাটা ছেলে, সদা সপ্রতিভ, তার উপর বয়স দোষ যাকে বলে রোম্যান্‌টিক্ সে তরুর দিকে সভ্যভাবে তাকাইয়া এক নজর দেখিয়া লইল; দেখিল খাসা সুগঠনা একটি সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু ভারি শঙ্কটেই পড়িয়াছে ব্যাচারী। পঙ্কু স্বভাবতঃই রহস্য প্রিয়, তরুর এই কঠিন অবস্থার কমিক্ দিকটা তার নজরে পড়িল; শুইয়াছিল উঠিয়া হাসি চাপিয়া বলিল "দাদাতো তোমাকে ভারি মুস্কিলে ফেলে গেছে দেখছি রাখ তুমি ওইখানে নামিয়ে, আচ্ছা শাস্তিতো বটে।" এমনি ভাবে সম্বোধিত হইয়া তরু চমকাইয়া অনিচ্ছা স্বত্বে একবার পঙ্কুর দিকে চাহিয়া তখনি চোখ ফিরাইয়া লইল, পঙ্কুর সমবেদনার উক্তির ফলে তরু আরও লাল হইয়া উঠিল, আর নাকের ডগা ও চোখের কোণ আরো ঘামিয়া উঠিল।

সে একবার দাদার পথের দিকে তাকাইল। পর মুহূর্ত্তেই নলিনী একটা আসন আনিয়া সেইখানে পাতিয়া দিল, নলিনী পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, পঙ্কুকে সে চেনে, এবং পঙ্কুদা বলিয়া ডাকে, তার সম্মুখে তরুকে তদবস্থায় দেখিয়া সেও হাসিয়া বলিল 'কিলো এখনো ধরে দাঁড়িয়ে আছিস্?'

পঙ্কু হাসিয়া বলিল—"বা ধরে থাক্‌বে না তো কি? ছেড়ে দেবে? তা হলে যে সব পড়ে যাবে'রে—"। পাথরের তরু সত্যিই তো পাথরের নয়,—সরস উত্তর শুনিয়া সে ফিক্ করিয়া, হাসিয়া জল খাবার নামাইয়া দিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া একেবারে পড়বি তো পড় দিদির ঘাড়ে। কিরণ চমকাইয়া গিয়া বলিল "কিলো হল কি? জুজু নাকি?" "দুর্—যা ও—জানিনি" বলিয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া বসিল। পঙ্কু বিজয়ের বিলম্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল 'হাঁ। নলি তোর দাদা কোথা?'

ন। দাদা ডাব কাটছে।

প। ও মেয়েটী বিজয় বাবুর বোন্? ও কে তো দেখিনি? নাম কি?

ন। হাঁ,-ওর নাম তরু-এই তো ছয় সাত মাস হলো ওঁরা এসেছে। বিজয় মুখ কাটা দুটা ডাব লইয়া আসিয়া উপস্থিত। দেরী হয়ে গেছে বলিয়া পঙ্কুকে ডাব একটা আগাইয়া দিল।

এমন সময় বাহিরে রাস্তার উপর পাল্কী বেহারার শব্দ হইল। নলিনী পাল্কী বেহারার শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল, কাদের বউ বা বর একটা কিছু আসিতেছে এই সে ভাবিয়া ছিল। তরুকেও একটা জোরে ডাক দিল "তরিদি বউ দেখবি আয়—" তরু বাহিরে দরজা দিয়া ছুটিয়া আসিল। দুই বোনে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বউ দেখিবার আশায় দাঁড়াইয়া রহিল। পঙ্কু বলিল "বোধ হয় ভবানী আসছে—" সম্ভব ভাবিয়া বিজয় বাহিরে গেল। সত্যই ভবানী। পাল্কীর ভিতর হইতে বিজয়কে দেখিয়া ভবানী পাল্কী থামাইয়া নামিয়া পড়িল। দুই ভগ্নীতে বউ বা বরের কোনটার একটাও নয় দেখিয়া, হতাশ হইল। ভাবে বুঝিল দাদারই আর একজন বন্ধু। তরু নলীর হাত ধরিয়া টানিয়া অন্দর অভিমুখে চলিয়া গেল। নলিনীর কৌতূহল বেশী, সে নবাগতকে চিনিল। জমিদারের ভাইপো তাদের বাড়ী আসিয়াছে দেখিয়া নলিনী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কারণ সেটা যে একেবারেই অসম্ভব ঘটনা।

নলিনীর বিস্ময় ও সম্ভ্রম পূর্ণ অপলক চাহনি দেখিয়া তরু ভাবিল নবাগত

কেউ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হবেন, সে নলিনীর কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল—'উনি কে নলি ?'

ন। তোর বর ভরি দি—!

তরু। যা তুই ভারি অসভ্য—

ন। আচ্ছা না, না, তোর নয় আমার—

তরু। (হাসিয়া) বটে ! দাঁড়া দিদিকে কাকীমাকে বলছি—

ন। না ভাই বলিস্‌নি তোকেই দেবো।

তরু। যাঃ তোরা ভারি অসভ্য-পাড়া গেঁয়ে কি না—

ন। (হাসিয়া) সহুরেরা বুঝি জলখাবার দিতে গিয়ে বর যোগাড় করে—

তরু। (সভয়ে) না ভাই তুমি বড় অসভ্য, ছিঃ, দাঁড়াও দিদিকে বল্‌ছি—

ন। না ভাই না ভাই ! তা হলে আ-আ-আড়ি—

বিজয় ডাকিল 'নলি' 'তরু'। ডাক শুনিয়া দুই বোনে ছুটিয়া বাহির দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। বৈটকখানার ঘরের কাছে আসিয়া নলিনী বলিল "কেন দাদা ?—" "আর একটা আসন নিয়ে আয়—"। নলিনী চলিয়া গেল।

ভবানীকে বিজয় হাত ধরিয়া বসাইতে গেল।

ভ। ছোঁবেন না আমাকে ?

বি। কেন ?

প। অস্পৃশ্য হলে কি করে-হে ?

ভ। কলেরা রুগী ছুঁয়ে আসছি—

উভয়ে। সে কি ? কোথা ?

ভবানী সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। বিজয় শুনিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। আর জেদ না করিয়া বলিল 'তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ডাবটা খান ?'

ভ। না এখন খাওয়াই উচিত নয়—স্নান করে কাপড় ছেড়ে তবে ওসব—

প। পায়ের ব্যথাটা কেমন ?

ভ। তেমনি, কমেছে একটু—আসি তবে বিজয় বাবু—এখন আলাপ হয়েছে রোজ আস্‌বো।

বি। আমিই যাব, আপনাকে আস্‌তে হবে কেন ?

প। (বিজয়কে) কেন মশাই ? জমিদারের শ্রীচরণ কি হাঁটে না ?

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না—না তার জন্তে নয়—"তবে—"

প। তবে কিনা শ্রীচরণ এখন ব্যথা পীড়িত।

তিনজনেই হাসিল। ভবানী বিলম্ব না করিয়া পাল্কীতে গিয়া উঠিবে। এমন সময় বিজয় বলিল একটা অনুরোধ আছে রাখবেন ?

ভ। কি শুনি না এত সকাতর নিবেদন কেন ?

বি। দু জনকেই এ অনুরোধ।

প। ব্যাপার তাহলে গুরুতর! কি মশাই ?

বি। কাল মধ্যাহ্নে আপনাদের দুজনের গরীবের বাড়ীতে নেমন্তন্ন, আমার খুড়তুতো বোনের ভাত কাল—

প। বেশতো অতি উত্তম! ব্রাহ্মণ বটু কলাবের নেমন্তন্ন পেলে স্বর্গের লোভ ছাড়তে পারে—

ভ। বেশতো ভালইতো আজ খেতে পারলাম না, কাল এসে খাবো—

এই বলিয়া ভবানী যাত্রা করিল। পঙ্কুও জলখাওয়া শেষ করিয়া উঠিল। বন্ধুদের বিদায় করিয়া দিয়া বিজয় বাড়ীর ভিতর মায়ের কাছে গিয়া বলিল—

বি। মা তোমাকে আর কাকাকে না বলে একটা কাজ করেছি—

মা। কি করেছ ?

বি। জমীদারের ভাইপো ভবানী বাবু আর সিদ্ধান্ত মশাইএর ভাগ্নে পঙ্কু বাবুকে কাল খেতে নেমন্তন্ন করিছি।

মা। তাই ভাল! তা বেশ করেছ এর জন্য আর এত কাতরতা কেন ? তা জমীদারের ছেলে এ বাড়ী আসবে ?

বি। কেন ? তিনি তেমন লোক নন্। ভারি অমায়িক নিরহঙ্কার—

মা। তার জন্যে নয়—

বি। তবে—

মা। পরে সব কথা বলবো এখন নেয়ে খাবি দাবি চল্।

বিজয় স্নানাহার করিয়া মা কাকী ও ভগিনীদের সহিত আলাপ করিতে বসিল কথোপকথনের ছলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একটু যেন দমিয়া গিয়া বলিল—"আমি যে আবার ওই জমীদারেরই ভাইপোকে নেমন্তন্ন করলাম ?" কিরণ বলিল—"তিনিওতো জানেন না ব্যাপার সব, বাড়ীতে নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন শুনলে হয়তো আর আসবেন না—"। বিজয়ের মা বলিল,—"না আসবার তো কারণ দেখিনি, এতো বন্ধুতে বন্ধুতে মিতালীর নেমন্তন্ন, সামাজিক নয়!" সহু বলিল।—"তা হলেও সামাজিকের দিনে তো—তবে একটা কথা দিদি শুনিছি ছেলেটী মানুষ নাকি বড় ভাল—জমীদারের ভাইপো, ওই পর্য্যন্ত

. কোনো হাঙ্গাম হুজ্জুতে নেই, খাসা ছেলে। কতলোক এই দলাদলিতে তাকে জড়াতে চেয়েছে, কিন্তু গাঁয় একটা কিছু গোল বেঁধেছেতো অমনি কলকাতা চলে যায়—"। বিজয় বলিল আমিও এই এক আধ ঘণ্টার আলাপে যা পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হয় এ ভদ্রলোকের হাতে যখন জমীদারী পড়বে তখন গাঁয়ের ভাগ্যি বদ্‌লে যাবে—"। সদু চাপা স্বরে বলিল—"যদি পড়ে।" সকলেই কথা শুনিয়া উৎসুক নেত্রে সদুর মুখের দিকে তাকাইল—সদু বুঝিল এ সব কথার উল্লেখ করাটা ভাল হয় নাই। সে আর কোন কথা কহিল না। বিজয় জেদ ধরিল শুনিবে। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন সদু কোন কারণে সে কথার আলোচনা পছন্দ করেনা, কাজেই বুদ্ধি করিয়া কথা ঘুরাইয়া দিলেন। বলিলেন "তুই এসেছিস্ বাবা, একটু যেন ভরসা পেলাম, কাজটায় হাত দিয়ে অবধি আথান্তরে পড়িছি তোমার কাকাতো ভয়েই সারা, গাঁয়ের জমীদার দল যদি তাঁকে এক ঘরে করে—শুনছি বাউনরা নাকি জোট বেঁধেছে খেতে আসবেনা।" বিজয় দমিয়া গিয়া বলিল "তুমিই কেন এ ঝন্‌ঝাট্ বাঁধাতে গেলে মা—"। মা বলিল "ঝন্‌ঝাট আবার কি? আমি আমার দেওরঝির ভাত দিচ্ছি, বাউন খাওয়াচ্ছি কে করে না তা?" বিজয় বলিল—"মেয়েছেলের আবার ভাত কেন?" বলিয়া হাসিয়া খুড়ীর দিকে তাকাইল খুড়ীর মনের ভাব বুঝিতে। খুড়ী বলিল "সত্যি বাবা দিদির সব আলাদা কাণ্ড"। যজ্ঞেশ্বরী কৃত্রিম কোপে বলিলেন "কেন গা ছেলে? মেয়ে ছেলে ছেলে নয় না? তোরাই কুলের প্রদীপ ওরা বুঝি—"বিজয় বলিল "মহাজন মা মহাজন ওই দেখনা দুটী মহাজন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছেন" বলিয়া নলিনী ও তরুর দিকে সহাস্যে তাকাইল। যজ্ঞেশ্বরী দুই কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমু খাইয়া বলিলেন "হোক্। তোর কি? তোরও যখন মহাজন আস্‌বে ঘরে তখন দেখবি মহাজনের মূল্য কত।" মা জ্যাঠাইমার স্নেহসিক্ত আদরে দুই বোন মুখ টিপিয়া হাসিল।

কথা বার্ত্তা শেষ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিজয় বাড়ীর বাহির হইবে এমন সময় পঞ্চু আসিয়া তাহাকে ডাক দিল উভয় বন্ধুতে তখন সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইল। মতলব ছিল ভবানীপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করা। পথে বিজয়ের মুখে পঞ্চুও সব কথা শুনিয়া বলিল "তাতে কি? গ্রামের এ নিত্যক্রিয়া এতে করে আমাদের বন্ধু সম্মিলনে কোন বাধা নাই"। বিজয় ভরসা পাইল নিশ্চিন্ত হইল। উভয়ে তখন জমীদার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বরাত্রিতে যজ্ঞেশ্বরীর চিত্ত একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিল। একটা সামান্য সাধারণ অথচ বড় সাধের গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা যে অকারণে এমন অশান্তির হেতু হইয়া উঠিবে যজ্ঞেশ্বরী তা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। কোথা হইতে তুচ্ছ একটা খুঁৎ ধরিয়া গ্রামের মাতব্বর মুরুব্বীরা যে তাঁর সহিত শত্রুতা আচরণ করিতে বসিল, এবং কেনই বা বসিল, এর নিগুঢ় মর্ম্ম যজ্ঞেশ্বরীর মনে ও সহজ সরল বুদ্ধিতে ধরা পড়িল না। হাজার হউক মেয়ে মানুষ, গৃহস্থ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, তাহাদের পরম বল বাড়ীর পুরুষরা, যজ্ঞেশ্বরী তাঁহার ভীরু দুর্ব্বলহৃদয় দেবরটির নিকট সে সাহায্যের ভরসা করিতে পারিলেন না, তার উপর কথায় বলে খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলা সত্ত্বেও খোঁড়ার পা খানাতে পড়ে, যজ্ঞেশ্বরী গ্রামের হালচাল চিনিয়া খুবই সাবধানে চলিতেছিলেন তবু এত এক আপদ বিভ্রাট। সেদিন অনন্ত তর্কসিদ্ধান্তের নিকট আন্তরিক উৎসাহ ও আশ্বাস পাইয়া তবু কতকটা মনে ভরসা জাগিয়াছিল। কেবল একটা কথাই তাহাকে বেঁধা কাঁটার মত অস্বস্তি দিতে লাগিল—সে হইতেছে দেবরের সপরিবারে গৃহত্যাগ কল্পনা। কুচক্রীর কুচক্রে পড়িয়া এই নিরুপদ্রব দেবর গো-বেচারাটি গার্হস্থ্য অশান্তিতে পড়িবে এই তার বিষম ভাবনা অথচ কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইয়াও তাহার অনুরোধ সত্ত্বেও উৎসব বন্ধ করা যায় না। রাত পোহাইলে শুভকাজটি নির্ব্বিবাদে যাতে সমাধা হয় ঠাকুরের কাছে এই নিবেদন জানাইয়া যজ্ঞেশ্বরী চোখ বুজিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি পরম উৎসাহে কাজ আরম্ভ করিলেন। সখের অন্নপ্রাশন হইলেও হিন্দুর নৈমিত্তিক ক্রিয়ার সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান এমন ভাবে জড়িত যে কোনোনা কোনো ভাবে দেবার্চ্চনা না করিলে কোন সংস্কার ক্রিয়াই বিধিবিহিত হয় না। অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ নামে একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দুমাত্রকেই করিতে হয়। এ বাড়ীর কুলপুরোহিত মাণিক চাটুয্যে। এজন্য তাহাকে সময়ে খবর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক মাণিকরাম যজমান বাড়ীতে যথা সময়ে উপস্থিত হইল না দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরী বড় ভাবিত হইলেন। এদিকে বেলা বাড়িয়া চলিল; খুকীর মুখে ভাত না দিলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর্ব্ব আরম্ভ হইবে না। ব্রাহ্মণরা আসিবে না বলিয়া ভয় দেখাইলেও দু'চার জনও যদি আসে এবং

কন্যার ভোজনে বিলম্ব দেখিয়া গোলমাল বাঁধায় এই ভয়ে যজ্ঞেশ্বরী বিজয়কে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা বিজু, বাউন তো এল না, একবার দেখ্না চাটুয্যে মশাইকে,—যদি তিনি বাড়ী না থাকেন তবে সিদ্ধান্ত মশাইয়ের কাছে গিয়ে একটা বিহিত করে আয়—"। বিজয় বিলম্ব না করিয়া বরাবর তর্কসিদ্ধান্তের বাড়ী আগেই গেল, পথে খুড়ার সঙ্গে দেখা হইল, ভোলানাথ শুনিল বিজয় পুরোহিতের সন্ধানে যাইতেছে। সে বলিল—"এইমাত্র মাণিক দা'র সঙ্গে দেখা হল, সে জমীদার বাড়ী কি কাজে গেল, বল্লে ঘণ্টা দুই দেরী হবে—"। বিজয় চটিয়া গিয়া বলিল—"দু ঘণ্টা অপেক্ষা মানুষ করতে পারে? খুকীটার যে পিত্তি বেরিয়ে যাবে? তার পেটে একটু দুধ পড়েনি শুধু মাই খেয়ে আছে—মা কাকীমার যেমন কীর্ত্তি কচি ছেলের ওপর ধর্ম্ম কলাচ্ছেন্! আমি সিদ্ধান্ত মশাইকে ডেকে আনিগে।" পুরুতকে পুরুতের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া গোলমালকে আরো জটীলতর ভাবে পাকাইয়া তোলার যে সম্ভাবনা বেশী তা ভোলানাথ বুঝিল ও ভাইপোকে বুঝাইল। বিজয় কোন কেয়ার না করিয়া চলিয়া গেল। ভোলানাথ ভাজ ও ভাইপোর এইসব একগুঁয়েপনায় মনে মনে বিরক্ত হইয়া "যা ইচ্ছে করগে সব" বলিয়া বিরক্তভাবে বাড়ী ফিরিল।

সিদ্ধান্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া বিজয় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল পাশের কুটারী হইতে একটী কিশোরী কোমলকণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃত শিবস্তোত্রধ্বনি শুনিল। বিশুদ্ধ উচ্চারণের ছন্দ বোধে এবং ললিত কণ্ঠের মাধুর্য্যে বিজয় মোহিত হইয়া স্থিরভাবে শুনিতে লাগিল। হঠাৎ ছন্দ কাটিয়া গেল, সঙ্গে একটা পরিচিত যুবা-পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। শেষোক্ত কণ্ঠস্বর বালিকার উচ্চারণ শুধরাইয়া দিতেছে—"ম—হেশ মীশ—" ইত্যাদি বালিকাও তদনুকরণে হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রায় পুনরুচ্চারণ করিল—।

বিজয় তখন ভরসা পাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল—"পঙ্কু বাবু আছেন।" পঙ্কু ও উমা দুজনেই থামিয়া গেল। পঙ্কু বিজয়ের কণ্ঠ চিনিয়া আগাইয়া আসিল—উমা—পালাইতে উদ্যত। পঙ্কু তাহাকে থাম্ যাস্নি বলিয়া নিরস্ত করিয়া বিজয়কে সম্বর্দ্ধনা করিল—"পঙ্কু বাবু নেই কেহ পঙ্কু ভটচাজ্জি আছেন বটে—তার পর অসময়ে কি মনে করে বন্ধু?" বিজয় ঘরে ঢুকিল। উমা অপরিচিত যুবাকে দেখিয়া পলাইতে উদ্যত পঙ্কু ডাকিয়া বলিল—'যাচ্ছিস্ যে অসভ্য মেয়ে।'

তিরস্কার শুনিয়া সে সভয়ে সলজ্জ চাহনি মাটীতে বদ্ধ করিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিজয় হাসিয়া বলিল—"কি হচ্ছিল? ওই বোন নাকি?

পঞ্চু। মাষ্টারী মশাই মাষ্টারী—সে দিন একটা শিবস্তোত্র শিখিয়ে গেছি আজ তাকে ভুলে পুড়িয়ে খেয়ে বসে আছে—ঝিণ্ডভজার স্কুলে পড়ে এই হয়েছে। অপরিচিত যুবাপুরুষের কাছে নিজের অকর্ম্মণ্যতার নিন্দাঘটিত তিরস্কারে উমা যেন নিবিয়া গেল। লজ্জায় তার অলক্তাভ কপোল ও কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল—সে ঘামিতে লাগিল।

বিজয়। কেন মশাই নিন্দে করছেন—যতটুকু আবৃত্তি শুনিছি তা অতি চমৎকার লাগ্‌লো, আমি এমন মধুর কণ্ঠ আর উচ্চারণ শুদ্ধ মেয়েছেলের মুখে শুনিনি—তা সত্য বল্‌ছি।

যে অপরিচিত এমন করিয়া প্রশংসা করে এত অকৃত্রিম আবেগে, তাকে প্রশংসিত ব্যক্তি না দেখিয়া থাকিতে পারে না—প্রশংসাকারী যদি অজানা সুদর্শন যুবাপুরুষ হয় আর প্রশংসিত যদি কুমারী কিশোরী হয় তবুও না। উমা তার অচঞ্চল দেহ যষ্টিটাকে স্থির নিবদ্ধ রাখিয়া শুধু কালো বাঁকা চোখের চঞ্চল তারকা দুটীকে অপাঙ্গে ফিরাইয়া নিমেষের তরে বিজয়কে দেখিয়া লইল। বিজয়ও মুগ্ধনেত্রে তাহাকে সম্ভ্রম সহকারে দেখিতেছিল। উমাকে চল্‌তি মতে সুন্দরী বলা যায় না কেন না তার রং দুধে আল্‌তাও ছিল না, গড়নও অপ্সরা কিন্নরীর মত নিখুঁৎ ছিল না, তবু যা ছিল তাহার উপর নেশার চোখের রং পড়িলে তাকে সুন্দরী না বলিয়া কেহ থাকিতে পারে না। স্নানান্তে সে একটা চেলির কাপড় পরিয়া, কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া, কপালে চন্দনের টিপ পরিয়া ফুলের সাজি হাতে শিব পূজা করিতে যাইতেছিল এমন সময় পঞ্চুর পরীক্ষা। "কেমন শিবস্তোত্র মুখস্থ হয়েছে দেখি।" হাঙ্গাম বটে। ঠিক এই বেশে এই অবস্থায় যখন শুচি দেহ সজ্জাকে লজ্জা দিয়া তাহার ভিতরের গুণপনা স্তোত্র আবৃত্তির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে বিজয় তাহাকে দেখিল। এই রকম একটা শুভলগ্নে কিশোর কিশোরীর দৃষ্টি বিনিময় হইলেই হৃদয় বিনিময় হয়—তা রূপ দু'জনের যেমন হোক—এই লগ্ন উপস্থিত না হইলেও অপর্য্যাপ্ত দেহ সৌন্দর্য্য বা চিত্ত মাধুর্য্য কোন মতেই দ্রষ্টার মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য ঘটাইতে পারে না।

বিজয় বলিল—"ওকে ছেড়ে দেন না?—"

প। নাঃ—একবার আমাদের দুজনের সামনে ও আবৃত্তি করুক তারপর ছুটী—

বি। কেন বিড়ম্বনা আর? না হয় একটু ভুল হ'ল—

প। না মশাই। শিবস্তোত্র ভুল উচ্চারণ হলে ভারি বিপদ—বিশেষ আইবুড়ো মেয়ে—

যুগপৎ বিজয় ও উমার দৃষ্টি পঙ্কুর মুখের উপর পড়িল। পঙ্কু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল—"বিপদ কি জানেন—শিব চটলে ওর শিবের মত বুড়ো বর ঘটিয়ে দিতে পারে—।' বলিয়া পঙ্কু মৃদু হাস্য করিল।

বিজয় উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—"শিব এমন কুকীর্ত্তি করবেন কেন?

প। বলা যায় কি মশাই। ভাং সিদ্ধি খেকো মেজাজ—নিজেই তো ওই কাজ করে বসেছিলেন।

বি। হ্যাঁ, এক উমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল—এ উমার ভাগ্যে—না সে ভয় নেই, দেবতাদের দিন গিয়েছে—"

এর পর কোনো মেয়ের এমনি ভাবে ওইরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব? পাথরের মেয়ে হইলেও ছুটিয়া পলায়। গুরুবাক্য অমান্য মান্য বোধাবোধ কিছুতেই থাকে না—

বাড়ীর ভিতর উমাকে সেভাবে ছুটিতে দেখিয়া তাহার মাসী জিজ্ঞাসা করিল - কিলা উমি অমন করে ছুটছিস যে?' উমা কতকটা আপনমনে কতকটা উত্তরচ্ছলে বলিল—'দাদা কি দুষ্ট মাসীমা—' বলিয়া দুষ্টামির হেতু বা প্রকার ব্যাখ্যা না করিয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিল।

উমার পলায়ন দেখিয়া বিজয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সে ভাব চাপিয়া বলিল—"খাসা মেয়েটীর গলার সুর আর উচ্চারণ বোধ—"। পঙ্কু সে কথায় কাণ না দিয়া বলিল—"তারপর কি মনে করে বলুন তো?" বিজয় তাহার আগমন হেতু জানাইল। পঙ্কু শুনিয়া বলিল—"তার আর কি বেশতো চলুন না?" অন্য সময় হইলে পঙ্কু হয়তো ওজর আপত্তি করিয়া ইতস্ততঃ করিত কিন্তু সে দিনের সেই তরুণী দর্শনের মোহ তাহাকে টানিয়া আনিল। পথে আসিতে আসিতে পঙ্কু এ ও তা কত কথাই কহিতে লাগিল। বিজয় মধ্যে মধ্যে স্থানে অস্থানে 'হুঁ' 'হাঁ' 'না' বলিয়া উত্তর সারিয়া দিল। পঙ্কু বন্ধুর আলাপকুণ্ঠার হেতু হয়তো আন্দাজ করিয়াছিল।

পঙ্কুকে লইয়া বিজয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিল এবং মাকে ডাকিয়া বলিল—

"এই নাও মা, এক আনাড়ী পুরুৎঠাকুর এনে হাজির তো করলাম—"। যজ্ঞেশ্বরী বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এইত ঠিকই এনেছিস্—আনাড়ী কেন? হাঁ বাবা পূজা করতে জানন্য?" পঙ্কু বলিল "জানি বৈকি মা? তবে চালকলা বাঁধতে এখনো তৈরি হয়ে উঠিনি।" বিজয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তরু ও নলিনীও আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল দাদা কাকে না কাকে ধরিয়া আনিয়াছে। পঙ্কুকে দেখিয়া তরু লজ্জাকুণ্ঠিত হইয়া পলাইয়া গেল।

পঙ্কু পূজায় বসিল। যজ্ঞেশ্বরী আয়োজন উপকরণ পুষ্প চন্দন প্রভৃতি সব দেখাইয়া দিয়া তরুকে ডাকিয়া বলিলেন—"তবি এই খানে থাক্ তোবা যা দরকার হয় যোগাড় করে দিবি—তরু অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "আমি তো কিছু জানিনি মা—"। মা বলিল "শিখতে হবে না ওসব? কেবল ফ্যাসন করে চুল বাঁধা আর সুতো পশমের ছাদ্দ করাই শিখবি?" মঠ বলিল "থাক্না দিদি নলি যাগ না।" যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন—"না ওকেই যেতে হবে, বাড়া খেড়ে মেয়ে সব বিবিয়ানাই শিখতে মজবুৎ হবে?" তরু আব কি করিবে? মাকে সে চেনে, বিনা বাক্য ব্যয়ে নলির হাতটায় একটা টান দিয়া, দুজনে গিয়া ঘরে ঢুকিল। নলিনী পঙ্কুকে দেখিয়াছে, স্বগ্রামবাসীতো বটেই, তাছাড়া এক পাড়ারই বাসিন্দা, শৈশব হইতে তাহাকে দেখিতেছে, তার লজ্জা করিবার কোনো হেতু নাই, করিলওনা, সে বেশ সপ্রতিভভাবে কথা কহিতে লাগিল। তরু একটা কাজের অছিলা করিয়া একপাশে সঙ্কুচিত হইয়া চোখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। একেবারে নির্ব্বাক। পঙ্কু পূজায় বসিল। দুই একবার তাহার প্রবল লোভ হইয়াছিল সেদিনের সেই নীরবভাষিনী লজ্জাকুঞ্চিতা কিশোরীটিকে আর একবার দেখে। প্রথম দিন সে তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া দু একটা রহস্য রঙ্গ করিয়াছিল। আজ আর তাহা পারিল না। বেশ বুঝিল তার একটা ভাবান্তর হইয়াছে। ঠাকুর পূজা করিতে আসিয়া এরূপ ভাবান্তরের পরিচয় দিতে তার বড় লজ্জা বোধ হইল। তবু মানুষের মন, প্রকৃতি প্রবলা, সে একটা দরকারী দ্রব্যের অছিলা করিয়া দুই বোনকে ডাকিয়া বলিল দূর্ব্বা চন্দন কই নলিনী? দুই জনেই চাহিল। তরু চোখে চোখ পড়িতেই চোখ নামাইয়া লইল। নলি বলিল—"বা পঙ্কু দা সুমুখেই রয়েছে দেখতে পাওনি?" দেখিতে পায় নাই বা দেখে নাই একথা যে মিথ্যা তা পঙ্কু জানিত তবু নিজের চোখের দোষ না মানিয়া সে বলিল ও হরি! এই বুঝি দূর্ব্বা এ যে ঘাস। নলিনী বলিল

তরুদিদি তুলেছে আমি জানিনি। তরু ভারি মুস্কিলে পড়িল। দূর্ব্বা ও ঘাস যে একজাতিয় তৃণ নয়,উহাদের মধ্যে একটা ভেদ আছে এ সে জানিত না, জানিবেই বা কি করিয়া? সে নিজের অজ্ঞতা ও অপটুতার আভাষ এমনি করিয়া ওই ব্যক্তিটার কাছ হইতে পাইয়া ভারি অপ্রস্তুত হইল। নলিনী তার সে,অবস্থা দেখিয়া একটু হাসিয়া নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে বলিল "তুমি থামো পঞ্চুদা আমি এনে দিচ্ছি ভাল দূর্ব্বো।" এই বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইল, তরুও সেই ওজরে তার সঙ্গে পলাইয়া লজ্জা বাঁচাইবার মতলবে উঠিয়া যেমনি যাইবে অমনি তার অঞ্চলের বাতাসে ঘৃত প্রদীপ নিবিয়া গেল। পঞ্চু লক্ষ্য করিতেছিল সে বলিল "বেশ দীপ নিবিয়ে দিলে?" বিড়ম্বনা আর কাকে বলে? ব্যাচারী যেন কাঁঠালের আঠায় জড়াইয়া গেল। সে দেশালাই লইয়া দীপ জ্বালিতে বসিল। দীপ জ্বালিয়া কম্পিত অঙ্গুলি যোগে সলিতাটা অকারণে উস্কাইয়া দিতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরী দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পঞ্চু তখন চোখ বুজিয়া ন্যাস করিতেছিল। তরু অপাঙ্গে তাহাকে মুদিত নয়ন দেখিয়া উঠিয়া পড়িয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া বাহিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নলিনী দূর্ব্বা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "এই নাও দূর্ব্বা কত নেবে পঞ্চু দা।" পঞ্চুদার ধ্যান ভাঙ্গিল চোখ মেলিয়া দেখিল দীপ ধারিণীর নিষ্ক্রান্তা, দূর্ব্বাদায়িনী প্রবিষ্টা। কোনো মতে সে পূজা সারিয়া উঠিল। বিগ্রহশিলার অন্তরস্থ চিন্ময়রূপী সর্ব্বজ্ঞ এই দুইটি প্রভাত শিশিরের মত ফুল্ল ও পবিত্র তরুণ হৃদয়ের মধ্যে নিজের অনন্তলীলার প্রথমোন্মেষ দেখিয়া হাসিয়া প্রসন্নচিত্তে পঞ্চুর পূজা লইলেন। তারপর নান্দী মুখের হাঙ্গাম সারিয়া পঞ্চু বাহির হইয়া আসিল। রিক্ত হস্তে তাকে ঘরে ফিরিতে প্রস্তুত দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন—"ও কি নৈবিদ্য উপকরণ ও সব নিয়ে যাও বাবা—?" পঞ্চু বলিল—"না মা ওতে আমার অধিকার নেই। মাণিক কাকা ও সব নিয়ে যাবেন বা সেখানেই পাঠিয়ে দেবেন। এসব তাঁরই প্রাপ্য।" যজ্ঞেশ্বরী ও সদু তখন প্রণাম করিয়া দক্ষিণা দিতে গেল। পঞ্চু লাফাইয়া সরিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ও কি করছেন সর্ব্বনাশ। কি মহাপাতক। আপনি মার বয়সী আমি ছেলের মত করছেন কি আপনারা।" যজ্ঞেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন "সে অন্ত সময়, এ সময় তুমি পুরোহিত দেবতার পূজারী তোমার এখন ব্রহ্মার মান।" "না খুড়ীমা ওসব বুঝিনি রেখে দেন শাস্ত্র মাস্ত্র অত বাড়াবাড়ীতে নেই— মহাভারত—।" এই বলিয়া সে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া যজ্ঞেশ্বরীর পায়ের

ধুলো লইয়া ছুটিয়া পালাইবে, এমন সময় দেখে মাণিকরাম স্বয়ং উপস্থিত। তার মুখে চোখে ও ঠোঁটের কোনে বিরক্তির আভাষ। মাণিক চাপা ব্যঙ্গ স্বরে বলিল "পুজো করলে বাবাজী তুমি আর আমি নেব্বা চালকলা? তা কি হয় হে—"।

প। তোমার প্রাপ্য তুমি নেবে, আমি তো এ বাড়ীর পুরুৎ নই, তোমার বিলম্ব দেখে এঁরা ব্যস্ত হন তাই কাজ সেরে দিয়ে গেলাম। বাউন বাউনের সাহায্য করে না কি? খুড়োর বুঝি ভয় হয়েছে আমরা যজমান ভাঙ্গালাম?

মা। ভাঙ্গালেই হেলো বাবাজী! তোমরা হলে কালেজে পড়া পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়ের ভাগ্নে আর আমরা টুলো বাউন। আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম কি আর যজমানের মন উঠবে?

পঙ্কু প্রত্যুত্তর না দিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

মাণিক একটু এদিক ওদিক তাকাইয়া ভোলানাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তা হলে ভোলা দা—তবে কি তর্কসিদ্ধান্ত মশাই এবার হতে এ বাড়ীর যজমানি আরম্ভ কল্লেন?" ভোলার উত্তর দিবার আগেই যজ্ঞেশ্বরী সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—"কাকে কি বলছ ঠাকুর? অতবড় একজন মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কি দায় দুঃখে আমার বাড়ী যজমানি করতে আসবেন? চালকলা কুড়োবার ব্যবসাদার আলাদা ধাতের—।" যজ্ঞেশ্বরীর দেখিয়া শুনিয়া মেজাজ তিক্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর সহ্য করতে পারিলেন না। মাণিক মুখের মত উত্তর পাইয়া নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন—"না মন্দ বিভ্রাট নয়—"।

ভোলানাথ দূরে বসিয়া নূতন হুঁকার জল সংস্কার করিতেছিল—মুখ না ফিরাইয়া বলিল 'জানি এই রকমটা হবে।' যজ্ঞেশ্বরী শুনিয়া বলিলেন "কি হবে জানতে?" "এই আমার ছাদ্দ—" বলিয়া একটু চুপ করিয়া চাপা কণ্ঠে বলিল—"জানিইতো, মেক্কোমুষের আন্ বলতে টান্ সয় না—একেতো বাউনরা রেগে আছে একটা অছিলে পেলে হয়—যাগ্গে কথায় কাজনি—" বলিয়া সে রান্না বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় ভোলানাথ ভোর হইতেই বিমনা হইয়া আছে। পাছে কথা কাটা-কাটিতে কার্য্য বিভ্রাট ঘটে সেই ভয়ে তিনি চুপ করিয়া গেলেন। মনে মনে কেবল নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন যে, কেন এ নোংরা কাজে হাত দিতে গেলেন। লজ্জাও হইল এ সময় হঠাৎ উষ্ণ মেজাজের পরিচয় দিয়া ফেলিলেন।

ক্রমশঃ

হারা-মণি

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

এমন করে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালী ?
কে রে ও তুই কে রে, আহা ব্যথার সুরে রে, এমন্ চেনা স্বরে রে,—
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের পরে রে —
এ কোন্ পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি ?
কোন্ জননীর দুলালরে তুই কোন্ অভাগীর হারা-মণি,
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে
আহা ছল ছল কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া সারাখনই
উছ্‌লে যেন পিছল ননী রে।
মুখ-ভরা তোর ঝর্ণা-হাসি
শিউলি সম রাশি রাশি
আমার মলিন ঘরের বুকে মুখে লুটায় আসি রে।
বুক জোড়া তোর ক্ষুব্ধ স্নেহ দ্বারে দ্বারে কর হেনে যে যায়,—
কেউ কি তোরে ডাক দিল না ? ডাক্‌লো যারা তাদের কেন
দলে এলি পায় ?
কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন থম্‌কে দাঁড়ালি ?
এমন চম্‌কে আমায় চমক লাগালি ?
এই কিরে তোর চেনা গৃহ, এই কিরে তোর চাওয়া স্নেহ হায় ?
তাই কি আমার দুখের কুটীর হাসির, গানের রঙে রাঙালি ?
হে মোর স্নেহের কাঙালী !!
এ-সুর যেন বড়ই চেনা, এ-স্বর যেন আমার বাছার,
কখন সে যে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছিনু হয়না মনে রে,—
না চিনেই আজ তোকে চিনি আমারি সেই বুকের মাণিক
পথ ভুলে তুই পালিয়েছিলি সে কোন্ ক্ষণে সে কোন্ বনে রে !
দুষ্টু ওরে, চপল ওরে, অভিমানী শিশু !
মনে কি তোর পড়েনা তার কিছু ?
সেই অবধি যাদু কত শত জনম ধরে
দেশ-বিদেশে ঘুরে' ঘুরে' রে

আমি মা-হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের মা হয়ে বাপ খুঁজছি তোরে
দেখা দিলি আজকে তোরে রে!
উঠছে বুকে হাহা ধ্বনি
আয় বুকে মোর হারা-মণি,
আমি কত জনম দেখিনি যে ঐ মু-খানি রে!
পেটে-ধরা নাই বা হলি, চোখে-ধরার মায়াও নহে এ,
তোকে পেতেই জন্ম জন্ম এমন ক'রে বিশ্ব-মায়ের কাঁদ পেতেছি যে!
আচম্‌কা আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা স্নেহে হঠাৎ জাগালি,
আহা গৃহ-হারা বাছা আমার রে।
চিন্‌লি কি তুই হারা-মায়ে চিন্‌লি কি তুই আজ?
ওরে আজকে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয়-নিশান চাইকি টাঙালি?
হে মোর স্নেহের কাঙালী!!

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজনৈতিক মতামত লইয়া মাঝে মাঝে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত আমাদের তর্ক-বিতর্ক হইত। বলা বাহুল্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মহিমা প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোক ও রাজপুরুষের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে হারিয়া খাওয়াই ভদ্রসঙ্গত, কিন্তু সে কথা জানিয়াও আমরা মাঝে মাঝে দুই চারিটা অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলিতাম। যেখানে গায়ের ঝাল মিটাইবার উপায় নাই, সেখানে জিহ্বা সঞ্চালন ভিন্ন আর কি করা যায়?

রুসিয়ায় তখন বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, একদিন জেলার আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে তোমাদের সঙ্গে অতক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক করেন, তা'র কি কারণ বলিয়া মনে হয়?"

আমি বলিলাম—"কি জানি, সাহেব? স্বজাতির গুণগান করা ছাড়া আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে ত বলিতে পারি না।"

জেলার বলিলেন—"এ কথা বোধ হয় জান যে ছয় মাস অন্তর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে তোমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক একখানি করিয়া রিপোর্ট যায়। তোমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যে মতামত প্রকাশ কর তিনি সেগুলি নোট করিয়া রাখেন, আর তাহার উপর নির্ভর করিয়াই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। চারিদিকে যেরূপ হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ যদি হারে, ত ল্যাঠা চুকিয়া গেল; আর যদি জয়ী হয় ত আনন্দের প্রথম ধাক্কায় তোমাদের ছাড়িয়াও দিতে পারে। ইংরেজ রাজত্বটা যে কি, তাহা আমি আইরিশ, সুতরাং ভাল করিয়া বুঝি। জেলখানার ভিতর সব সময় পেটের কথা মুখে আনিয়া লাভ নাই।"

ভাবিয়া দেখিলাম, কথাগুলো ত ঠিক। জেলখানাটা ঠিক বক্তৃতা দিবার জায়গা নয়। শত্রুর মুখ হইতেও উপদেশ শাস্ত্রমতে গ্রাহ্য, সুতরাং জিহ্বাটা সেই সময় হইতে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া ফেলিলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাঝে মাঝে যুদ্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। জার্ম্মাণী যে কি ভীষণ রকম পাজি তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। আমরাও এক বাক্যে জার্ম্মাণীর পাজিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে, মরিবার পর জার্ম্মাণী নিশ্চয় নরকে যাইবে। দেবলোকে ইংরাজের পার্শ্বে স্থান পাইবার তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই!

ইংরাজচরিত্রে একটা কেমন সঙ্কীর্ণতা আছে—সে কোন জিনিষের নিজের দিক ছাড়া পরের দিক সহজে দেখিতে পায় না। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী যে চিরদিনই ইংরেজের আশ্রয়েই থাকিতে চায়, এ কথা বিশ্বাস করিবার জন্য ইংরেজের প্রাণ একেবারে লালায়িত। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব যে আদর্শ শাসনযন্ত্রের খুব কাছাকাছি এ বিষয়ে তাঁহাদের বড় একটা সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ বিশ্বাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের শেষ পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না! যুদ্ধের সময় ত বেচারা প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিলেন, কয়েদীর খরচ কমাইয়া সরকারী তহবিলে অনেক টাকা জমা দিলেন, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর নিজের একমাত্র শিশু কন্যাকে বিলাতে রাখিয়া আসিবার জন্য যখন ছয় মাসের ছুটী চাহিলেন তখন ছুটী আর মিলিল না। আবেদনের পর আবেদনের যখন কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন— "All governments are bad. I am an anarchist" শেষে চটিয়া গিয়া তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—"The gods of Simla

are incorrigible"। কিছুদিন পূর্ব্বে মণ্টেগু সাহেবের রিফর্ম বিলের খসড়ায় যখন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে একেবারে সর্ব্বময় প্রভু করিয়া খাড়া করা হইয়াছিল, তখন ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"তাহাতে কোন দোষ হইবে না। The government of India are sensible people." নিজের লেজে পা না পড়িলে কেহ পরের দুঃখ বুঝিতে পারে না।

যাক্—এ দিকে যুদ্ধ ত শেষ হইয়া গেল। যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন ছাড়া পাইবার আশা ভরসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম, তখন দুঃখের মাঝখানে দিন একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর আবার কয়েদী ছাড়িবার কথা উঠিল। তখন আশা ও আশঙ্কায় দিন কাটান ভার হইয়া উঠিল। একদিন সংবাদ আসিল যে, যে সমস্ত যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পিনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী নয় তাহারা জেলখানায় যদি সাত বৎসর কাটাইয়া থাকে ত তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমাদের সাত বৎসর ছাড়িয়া দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে সুতরাং প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, যে সমস্ত কয়েদীর মুক্তির জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে নাম পাঠান হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের নামও গিয়াছে, এখন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলেই না কি আমরা নাচিতে নাচিতে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।

এ পর্য্যন্ত কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পোর্টব্লেয়ার হইতে বাঁচিয়া ফিরে নাই। ১৮৫৮ সালে যাহারা সিপাহি বিপ্লবের পর পোর্টব্লেয়ার গিয়াছিল তাহাদের সকলকেই সেখানে একে একে মরিতে হইয়াছে। থিবর সহিত যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্রহ্মদেশীয় কয়েদী আসিয়াছিল তাহারাও কেহ ছাড়া পায় নাই। আজ আমাদের জন্য যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে একথা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা করি কি? প্রাণ যে ফুলিয়া ফুলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে।

ক্রমে জর্ম্মণীর সহিত সন্ধিপত্র-স্বাক্ষরিত হইল। ইংলণ্ডের বিজয় উৎসব ফুরাইয়া গেল। কিন্তু কই, কয়েদি ত ছাড়িল না। যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর হইতেই দিন গণনা আরম্ভ করা গিয়াছে, দিন গণিতে গণিতে সপ্তাহ, সপ্তাহ গণিতে গণিতে মাস, ক্রমে মাস গণিতে গণিতে বৎসর ফুরাইয়া গেল, কিন্তু বিড়ালের

ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল না। খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে বিজয় উৎসব হইবে সুতরাং মনের কোণে একটু আশাও রহিয়া গেল।

তারপরে যখন বিজয় উৎসব ফুরাইয়া গেল তখন মনটা ছটফট করিতে আরম্ভ করিল—খবর বুঝি এই আসে, এই আসে। শেষে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে খবরও একদিন আসিল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আমাদের আফিসে ডাকাইয়া শুনাইয়া দিলেন যে সরকার বাহাদুর কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে বৎসরে একমাস করিয়া মাফ দিয়াছেন।—ব্যোম ভোলানাথ! এত দিনের আশা এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল।

তখন দেখিলাম যে পোর্ট ব্লেয়ারে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটান ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। তাই যদি করিতে হয় ত ভূতের বেগার আর খেটে মরি কেন? চিফ কমিশনারের নিকট আবেদন করিলাম যে সমস্ত মাফ লইয়া যখন আমাদের ১৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তখন সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের জেলের কাজকর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দেওয়া হোক। কিন্তু সে আবেদন পত্র যে চিফ কমিশনারের দপ্তরে গিয়া কোথায় ধামা চাপা পড়িয়া গেল তাহার আর কোন উত্তরই পাওয়া গেল না।

এই সময় জেল কমিটি পোর্টব্লেয়ারে আসিবার কথা ছিল। আমি স্থির করিলাম যে আমাদের যা কিছু বক্তব্য সমস্ত জেল কমিটির নিকট গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া বলিয়া দিয়া তাহার পর কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িব। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? জেল কমিটি চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আসিয়া আমাদের সংবাদ শুনাইয়া দিলেন যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাদের আলিপুর জেলে পাঠাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন, সেখান হইতে আমাদের মুক্তি দেওয়া হইবে।

অল্পদিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের মতিগতি কি করিয়া পরিবর্ত্তিত হইল সে রহস্য উদ্ঘাটন করিবার কৌতূহল মনের মধ্যেই চাপা পড়িয়া রহিল। লম্বা হইয়া মেজের উপর পড়িয়া ফুর্ত্তিতে কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহ বা গান জুড়িয়া দিল। একজন বিজ্ঞ বন্ধু সকলকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"একটু স্থির হও, দাদারা, এ বাড়ীতে কলার করতে এসে না আঁচানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই। শেষে মাঝ দরিয়ায় না জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।"

জাহাজে চড়িবার আর দুই দিন বাকী। রাত্রে চোখে নিদ্রা নাই, আহারে প্রবৃত্তি নাই। কল্পনার শত চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। বহুদিন বিস্মৃত সুপরিচিত মুখগুলি আবার মনের মধ্যে ফুটিতেছে। যাহাদের সহিত ইহকালের সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার স্নেহের শতডোরে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুই দিন কাটিয়া গেল। দল বাঁধিয়া সেলুলার জেল হইতে বাহির হইলাম। তখনও কাহারও কাহারও পায়ে বেড়ী বাজিতেছে। জেলের বাহির হইয়াই শিখেরা আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওয়া গুরুজী কি ফতে।" তাহার পর গান আরম্ভ হইল।—

"ধন্য ধন্য পিতা দশমেশ গুরু
জিন চিড়িয়োঁসে বাজ তোড়ায়ে -"

(হে পিতঃ, হে দশম গুরু। চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে তুমি ধন্য।)

আজ আবার চটক দিয়া বাজ শিকার করিবার দিন আসিয়াছে তাই ঐ সঙ্গীতের তালে তালে আমাদের প্রাণও নাচিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম—"হে ভারতের ভাবী গুরু, হে ভগবানের মূর্ত্তপ্রকাশ, সমুদ্র পার হইতে তোমার দীন ভক্তের প্রণাম গ্রহণ কর।"

তাহার পর জাহাজে চড়িয়া একবার পোর্টব্লেয়ারের দিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। Wordsworthএর কবিতা মনে পড়িল—

"What man has made of man"

জাহাজ তিন দিন ধরিয়া ছুটিয়াছে, মনটা তাহার আগে আগে ছুটিয়াছে। ঐ সাগর দ্বীপে বাতি জ্বলিতেছে, ঐ রূপনারায়ণের মোহনা! আজই খিদিরপুরের ঘাটে জাহাজ গিয়া পৌঁছিবে।

নাঃ—জাহাজ ত কৈ ডুবিল না। এ যে সত্য, সত্যই ঘাটে আসিয়া লাগিল। পুলীশ প্রহরী আমাদের সঙ্গে লইয়া আলিপুরের জেলের দিকে চলিল।

আবার আলিপুরের জেল—কিন্তু সে চেহারা আর নাই। আমাদের শুভাগমন বার্ত্তা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে গেল। আমাদের কাছে যা কিছু জিনিষ পত্র ছিল প্রহরীরা আসিয়া তাহা বুঝিয়া লইল। বড় বিশেষ কিছু ছিলও না। পোর্টব্লেয়ার হইতে আসিবার সময় বইটই সমস্ত নূতন

নূতন ছেলেদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম দেশে ফিরিয়া আর মা সরস্বতীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা হইবে না। চুপ করিয়া শুধু দুটি ভাত খাইব আর পড়িয়া থাকিব।

ঘণ্টা খানেক জেলে থাকিবার পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন শনিবার। আমরা ভাবিয়াছিলাম সেদিন ও তাহার পরদিন বুঝি আমাদের জেলেই থাকিতে হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা বোধ হয় আজই বাহিরে যাইতে চাও? কলিকাতায় তোমাদের থাকিবার জায়গা আছে?" বাহিরে যাইবার নাম শুনিয়া আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। মুখে বলিলাম—"জায়গা যথেষ্ট আছে, আর মনে মনে বলিলাম—"জায়গা না পাই রাস্তায় শুয়ে থাকবো, একবার ছেড়ে ত দাও।"

সে রাত্রে হেমচন্দ্র, বারীন্দ্র ও আমি ছাড়া পাইলাম। কিন্তু যাই কোথায়? শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশের বাড়ী গিয়া দেখিলাম তিনি বাড়ী নাই; তখন সেখান হইতে ফিরিয়া হেমচন্দ্রের বন্ধু হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের বাড়ীতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। হেমচন্দ্র ও বারীন্দ্র সে রাত্রে সেইখানেই রহিয়া গেল আর আমি চন্দননগরে বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলাম। ভাবিলাম রাত ১০॥০ টার সময় হাবড়ার ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিব।

কিন্তু বাহির হইয়া দেখিলাম যে কলিকাতার রাস্তাঘাট সব ভুলিয়া গিয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। ভবানীপুরে ফিরিয়া যাইবার আর প্রবৃত্তি হইল না। শ্যামবাজারে শ্বশুর বাড়ী—ভাবিলাম সেইখানে গিয়া রাতটা কাটাইয়া দিব। শ্যামবাজারে যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর দরজা বন্ধ। দুই চারিবার কড়া নাড়িয়া যখন কোন সাড়া পাইলাম না, তখন ভাবিলাম "কুচ পরোয়া নেহি; আজ রাতটা কলিকাতার রাস্তায় না হয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব।" প্রাণে একটা নূতন রকম আনন্দের দেখা দিল। আজ বার বৎসর পরে খোলা রাস্তায় ছাড়া পাইয়াছি। সঙ্গে জেলার নাই, পেটি অফিসার নাই, একটা ওয়ার্ডার পর্য্যন্ত নাই। অতীতের বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে, নূতন বন্ধন এখনও দেখাদেয় নাই। আজ সংসারে বাস্তবিকই আমি একা। কিন্তু এই একাকিত্ববোধের সঙ্গে কোন বিষাদের কালিমা জড়িত নাই, বরং একটা শান্ত আনন্দ উহার তালে তালে ফুটিয়া উঠিতেছে।

শ্যামবাজার হইতে সার্কুলার রোড ধরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। বার বৎসর জুতা পরা অভ্যাস নাই, সুতরাং আজ নূতন জুতায় পা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। জুতা খুলিয়া বগলে পুরিয়া চলিতে লাগিলাম। বগলে পুঁটুলী দেখিয়া রাস্তায় এক পাহারাওয়ালা ধরিয়া বসিল—কোথা হইতে আসিতেছি কোথায় যাইব ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার মনে হইল সত্য কথা বলিয়া দিই যে আমি কালাপানির ফেরত আসামী, তাহা হইলে আর কিছু না হোক, থানায় একটু মাথা গুঁজিবার জায়গা পাওয়া যাইবে। তাহার পর ভাবিলাম আর সত্যনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি করিয়া কাজ নাই। একবার সত্য কথা বলিতে গিয়া ত বার বৎসর কালাপানি ঘুরিয়া আসিলাম। শেষে বলিলাম—"আমি কালীঘাট হইতে আসিতেছি, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইব।" কনষ্টেবল সাহেব আমার বগলের পুঁটুলি পরীক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি উড়ে?" বড় কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"হাঁ"। তখন তাঁহার নিকট হইতে যাইবার অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে একটা দীর্ঘ সেলাম দিয়া আবার রওনা হইলাম। সেই রাত্রে রাত একটার সময় গাড়ী চড়িয়া যখন শ্যামনগরের ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম, তখন রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া যখন নিজেদের পাড়ার ঘাটে আসিয়া নামিলাম, তখন রাত প্রায় তিনটা, রাস্তা-ঘাট একেবারে জনশূন্য, টিম টিম করিয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। জানালায় ধাক্কা মারিয়া ভায়াদের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে একটা জানালা খুলিয়া গেল আর ভিতর হইতে হর্ষোদ্বেগ-চঞ্চল একটী সুপরিচিত বামা-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"তুমি কে?" সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জানালা খুলিয়া মা ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহার আশা সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছে, সে যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, এ-কথা বিশ্বাস করিতে যেন কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে একটা ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। এক পাল ছেলে আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে আমার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কারা এরা? ইহাদের কাহাকেও যে চিনি না। একটি ছোট ছেলে একটু দূরে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল—"এই

আপনার ছেলে।" যাহাকে দেড়-বৎসরের রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে আজ তের-বৎসরের হইয়াছে।

আবার নূতন করিয়া সংসারের খেলা-ঘর পাতিয়া বসিলাম।

ওগো খেয়াপারের কর্ণধার! এবার কোন্ কূলে পাড়ি দিবে?

স্বরাজ

[শ্রীমতী লীলা দেবী]

প্রাণের মাঝে যে প্রেম জাগে ফুরায় না তা ফুরায় না,
চোখেই শুধু যে প্রেম জালা জুড়ায় না তা জুড়ায় না।
সবার সুখে যে সুখ শোভে শেষ নাই তার মরণেও,
নিজের যে সুখ, অলীকতায় হারায় মেঘের বরণেও।
সবার লাগি বিলায় যে ধন বিভব যে তার অফুরণ,
নিজের তরে রাখলে পরে অভাব চিরই অপূরণ।
আপন জনেই বাস্‌লে ভালো মৃত্যু আসে অনৃত,
ভুবনকে যে বাসে ভালো প্রিয় যে তার অমৃত।
ছড়িয়ে দে'ভাই, ছড়িয়ে দে'ভাই, নিজের ক'রে রাখিস্‌নে,
কাঙ্গাল হ'য়ে হ'না রাজা,—স্ব—রাজকে আর ডাকিস্‌নে!!

আইরিস জাতি-শিল্পীর একজন

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

"The Nation & The Athenæum" কাগজের যে মাসের সংখ্যায় আয়র্লণ্ডের "টলষ্টয়", কবি ও দেশনেতা জর্জ্জ রাসেলের (George Russell) জীবন-কথা বেরিয়েছে। আইরিশ জাতির জীবনবেদ যে কয়জন বাণীর বরপুত্র মিলে উদ্ধার করেচেন কবি জর্জ্জ রাসেল তার একজন। তিনি (A,E.) এ, ই এই ছদ্ম নামে কবিতা লিখে মরা আয়র্লণ্ডে জীবনের সাড়া ও আইরিশ কাল্‌চারের লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলেন। "He belongs to no party, he is not a leader of revolt, he has no political follwing."—"এ, ইর কোন নিজের দল নাই, তিনি যে কোন বিশেষ বিপ্লবের নেতা তা নন; তাঁর পেছনে তাঁর মতে সায় দেবার পঙ্গপালও নেই।" অথচ আজ আয়র্লণ্ডের জাগরণের দিনে এ, ইকে ভক্তি না করে এমন মানুষ ওদেশে নেই বললেই হয়,—"Just because he is so far removed from all extremes, except the extremes of passionate love for his country and persistent reasonableness about it, "মতের ও দলাদলির কচকচি থেকে এমনতর মুক্ত মানুষ বলেই তাঁর ওপর দেশবাসীর এত শ্রদ্ধা, তিনি অসীম দেশপ্রেমের আধার হয়েও বুদ্ধিতে কতই না ধীর; কতই না সাবধানী"।

জর্জ্জ রাসেল বক্তৃতা দিয়ে হট্টগোল বাধাবার ধার বড একটা ধারেন না, কিন্তু ডাবলিনে মার্কিন ধর্ম্মঘটের সময়ে তাঁর একটি বক্তৃতায়ই দেশ টলে উঠেছিল। রাসেল কবি, চিত্রশিল্পী, ভাবুক অথচ পাকা অর্থনীতিবিৎ ও কাজের মানুষ। আইরিশ জীবনের গভীর সত্য তলিয়ে দেখে তাঁর ছবিতে কবিতায় এই আত্মহারা জাতীর আত্মধন ও আত্মবল খুঁজে পেয়েছেন ও তাঁরই স্পর্শে আয়র্লণ্ড আজ স্বজেয়। শুধু কি তাই? কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এই কবি-কর্ম্মী সমস্ত দেশ জুড়ে দুধ মাখম ক্ষীর নবনীর ব্যবসায় (creameries) গড়ে তুলে অন্নহীন চাষার ঘরে শ্রী ফিরিয়েছিলেন, তার ফলে দেশের যে শ্রীবৃদ্ধি, যে শক্তিলাভ ঘটেছিল তা' সমস্তটা বিপ্লব যুগ ধরে পুলিশ ও পল্টন লেলিয়ে ইংরাজরাজ ভেঙে ভেঙেও নিঃশেষ করে উঠতে পারেনি। আপন জীবনে সত্যদর্শন ও কর্ম্মপটুতা এক আধারে অপূর্ব্ব

অনুপমতায় ফুটিয়ে এই অসাধারণ মানুষ" দেখিয়েছেন, যে, কবি ও কর্ম্মী একই আধারে কি,করে হয়, ইংরাজ সাহিত্যিক John Masefield বলেন মানুষ দুই রকমের আছে, শক্তির মানুষ ও আনন্দের মানুষ "capable of energy and those capable of ecstasy. But to A. E. belongs the joy of both. By energy he has sought to save his country; by ecstasy he continually saves himself" এ, ই নিজে আনন্দ ও শক্তির সমান আধার; তার অন্তরের শক্তিতে তিনি দেশকে মৃত্যুথেকে বাঁচিয়েছেন এবং সেই অন্তরের আনন্দ ধারায় স্নান কচে তিনি নিজে অমর।

এ. ইর আকৃতি দেখেই বোঝা যায় তাঁর শক্তি বহুমুখী, সে আধারে যেন সবই সম্ভব। সেই দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ শ্মশ্রু ও কেশে ঢাকা প্রকাণ্ড মাথা, সমস্ত দেহখানির গাম্ভীর্য্য ও সংযম, সে নীল আকর্ণ চক্ষের তেজ ও করুণা, সব কিছু যেন কেবলি এই কথাই বুঝিয়ে দেয়, যে, এ মানুষে অনেক বিপরীত ব্যাপারই কেমন করে যেন সামঞ্জস্য পেয়েছে; এ মানুষ যেন রুদ্রের তেজ ও দেবতার করুণায় গড়া। আয়র্লণ্ডে গত ছয় মাসের ব্রিটিশ অত্যাচারের সম্বন্ধে টাইমস্ কাগজে তাঁর পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে অর্থনীতির কি গভীর জ্ঞান, কত ক্রোধ অথচ কত সহিষ্ণুতা মাখান! যখন ডাবলিন, কর্ক, লিমারিক, গ্যালওয়ে, ট্রলিতে পুলিশ ও পল্টনের পৈশাচিক উৎপীড়নে ইংরাজের মাথাও হেঁট হয়েছিল, তখন এ, ই শান্ত ধৈর্য্যে বলেছিলেন, "প্রত্যেক মানুষের মাঝে এমন কোন দেব অংশ লুকান আছে যা'তে আঘাত দিলে সে আধারেও দয়া ধর্ম্ম জাগে; মানুষে সেই দেবতা খুঁজে বার করাই হলো আসল কাজ।" সেই পাশব উৎপীড়নের কাল-সন্ধ্যায় যে মানুষ এমন কথা ভাবতে ও বলতে পারে সে আবার বিপ্লববাদী! জর্জ্জ রাসেল আলষ্টারম্যান; কবি রুডিয়ার্ড কিপ্লিং আলষ্টারকে গালাগালি দিয়ে কবিতা লেখায় তার উত্তরে এই তিনি লেখেন, "তুমি এই দেশের সম্বন্ধে মূর্খ, আর আমার সারা জীবন দিয়ে আমি আলষ্টারকে চিনি, এবং তাই থেকে আমি বলছি তুমি তোমার প্রতিভার এই অপব্যবহারে আয়র্লণ্ডের বিশেষ ক্ষতি করতে প্রয়াস পেয়েছ। পথে মারামারি দেখে যেমন গুণ্ডা পক্ষাপক্ষ বিচার না করে শুধু গুণ্ডামীর উত্তেজনার লোভে একটা যাহোক দলে যোগ দেয়, তোমারও এ ব্যবহার ঠিক সেই রকম। জগত তোমার কথা শোনে, আর, তুমি কিনা জগতের কানে বিষাক্ত অজ্ঞানের বাণী ঢেলে দিলে! ভগবান তোমার হাতে বাণীর হাতের বীণা তুলে দিয়েছিলেন, তুমি সে বীণা চিরদিন শক্তে

পক্ষ হয়ে দুর্ব্বলের অহিতে বাজিয়েছ। তুমি আপন শক্তি দিয়ে তাকেই ব্যথায় জর্জ্জর করেছ, যে জগতে দুঃখী ও দুর্ব্বল কিন্তু ভগবান যার বল ও ভরসা, তুমি আঘাত করেছ করুণা, সত্য, ন্যায় ও স্বর্গের বিরুদ্ধে, তাই ভগবানও তাঁর দিব্য দর্শনের জ্যোতি তোমার হৃদয় থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তাই তোমার এ কবিতা তুচ্ছ পয়ারে সংবাদপত্রে খেলা কথা ছাড়া আর কিছুই হয় নি। তোমার কবির আসন ভগবানের আদেশে ঘুচে গেছে।"

এ, ইর প্রকৃতিতে শক্তি ও আনন্দের খেলা যেন ছায়াবাজির মতই ঘুরে ফিরে হয়। Imaginations and Reveries নামে তাঁর নতুন বইখানির ভূমিকায় রাসেল এই কথাই নিজে বলেছেন, "কলা শিল্পের আনন্দে ডুবে থেকেও আমি যেন সুখ পাইনি। কিসে যেন আমায় ভাঙা আইরিস জীবন গড়ে তুলতে জোর করে সেই কাজে টেনে নিয়ে গেছে। যতক্ষণ না আইরিশদের সঙ্গে জুটে আয়র্লণ্ডের জীবন নতুন করে গড়তে কাজে না নেমেছি ততক্ষণ আমার বিবেক জ্ঞান যেন আমায় এই প্রেরণা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রেখেছিল, ক্রমাগত এই পথেই ঠেলেছিল। এই দেশের মাটিতে আমার জন্ম, তাইতে আমায় দেশ প্রেমিক করেছে, কিন্তু যে পরমসত্ত্বা ভগবানের অংশ এই দেহে বর্ত্তমান সে ক্রমাগতই বুকের মাঝে যেন বলেছে, অনন্তের রাজনীতিই তোমার জীবনবেদ, সকল জাতির মানুষ যার সন্তান সেই বিশ্বরাজ তোমার রাজা। কোন একটা আন্দোলন জাগাতে গেলে গোঁড়া না হয়ে উপায় নেই। আমার প্রকৃতিতে শক্তিই গড়েছে কিন্তু জ্ঞান কালাপাহাড় হয়ে যেন ক্রমাগত ভেঙেছে।"

জর্জ্জ রাসেলের এই "Imaginations & Reveries" ১৯১৮ সাল অবধি গত পঁচিশ বৎসরের আইরিশ জীবনের অন্তর ও বাহিরের ইতিহাস। "We are shown once more the material value of those poets, scholars, essayists who began to iufuse a new spirit into their nation about thirty years ago—the men who rescued old history and legend, the founders of the Gaoelic League, the creators of the Irish Drama, the singers of lyrics most beautiful in the world, and the originators of Sinn Fein." এই বইখানি পড়লে চোখের সামনে আবার যেন দেখতে পাই তাঁদেরই, যে কবি ও চিন্তাশীল লেখকেরা ত্রিশ বছর আগে এই মরা আইরিশ জাতির মধ্যে জীবন সঞ্চার কর

ছিলেন, যাঁরা লুপ্ত আইরিশ ইতিহাস ও পুরাণ পুনরুদ্ধারের দুরূহ জীবন-ব্রত করেছিলেন, যাঁরা গেলিক লিগের প্রতিষ্ঠাতা ও সিনফিনের মূল।

আইরিশ দেশমাতার অন্তরের মহিমা দেখাতে গিয়ে, রাসেল স্তুতিও করেছেন, আবার দেশের মেকি লেখকদের নিন্দারও ত্রুটী করেন নি। কৃষি-যৌথ কারবারে দেশকে শ্রীবৃদ্ধিতে বড় করেও এ কবিপ্রাণ যেন সুখ পায়নি—"I hate to hear of stagnant societies who think because they have made butter well that they have crowned their parochial generation with a halo of glory" "পূর্ণ জীবনে পঙ্গুর মত এই সব কৃষি সমবায় সমিতি ভাল মাখম তৈয়ারী করেই যখন ভাবে যে গ্রাম্য জীবন তারা যশের আলোয় সার্থক করেছে, তখন আমার মনে ঘৃণার উদয় হয়।" জর্জ্জ রাসেল এ কথা বলতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এত বড়, বিধাতা একটি গাছের মাঝে কত রূপ কত রস কত বর্ণগন্ধের ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, কিন্তু বিশ্বকবির প্রাণ তাই গড়ে যদি সুখ পেত তা'হলে এ বসুধা এমন অনুপম করে তুলতো কে বল দেখি? সেই অমৃতত্বের আস্বাদ বুক ভরে পেয়ে জর্জ্জ রাসেল কর্ম্ম করেও কর্ম্মের অতীত। তাই তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন, "the end of life is not comfort, but devine being" "জীবনের অর্থ ঐহিক সুখ নয়, ভাগবত সত্ত্বাই জীবন।"

মহানৃত্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়]

সতীর মরণে ব্যথিত ভুবন,
স্তম্ভিত মহাকাল,
ম্লান হ'য়ে গেল সুদূর আকাশে
রবির কিরণজাল।
স্পর্শ-সুভগ বাতাস ভরিল
ভৈরব কালানলে,
মূর্চ্ছিত-তনু দিগ্‌বধূগণ
পড়িল সাগর-জলে।

লক্ষ্য বিহীন রবি শশি তারা
মরণ-বিষাণ-গানে,
ছুটে উচ্ছল অতল-সলিল
তাণ্ডব সেই তানে,
পাণ্ডুর নভে ছুটে ধূমকেতু—
বজ্রের বিভীষিকা,
ধরণীর গায় কে মাখালে, হায়,
শোণিতের ললাটিকা!

বিদ্যুত-হাসি ধ্বংস-আহবে
ফুটিছে ভীষণ হয়ে,
ত্রিভুবন বুঝি ভেঙ্গে খসে পড়ে
পাতাল-গর্ভে গিয়ে।
বাসুকীর ঘুম ভাঙ্গিল আজি কি,
তাই কি নৃত্য আজ?
টুটিল আজি কি প্রকৃতির চির
শান্ত মধুর সাজ?

৪

গগন পবন ভরিয়া উঠিল
প্রলয়ের 'হাহা'-রবে,
ভূতপ্রেত আর দানব যক্ষ
যোগ দেয় সে আহবে।
বিশ্বভুবন শৃঙ্খলা-হারা,—
কোথা বিষ্ণুর জ্ঞান!—
সতীর মরণে ভেঙ্গেছে আজিকে
মহেশের মহাধ্যান!

৫

তাই বুঝি সেই ধ্যান-প্রশান্ত
দুইটী নয়ন দিয়া
তাপসীর তাপ-গৈরিক-জ্বালা
বেয়ে চলে ফাটি হিয়া?
চারু জটাভার স্রস্ত শিথিল,
কোথায় বাঘের ছাল!
কোথা সে তৃপ্ত দুখের গর্ব্ব
ফণী-বিভূষণ-মাল?

৬

ত্রিশূল-শিখরে চারু সতীদেহ—
মধুমালতীর মালা,
পাষাণ কাটিয়া ধারা হয়ে ছুটে
মহেশের মহাজ্বালা।
ক্ষেপা নটেশের প্রতিপাদক্ষেপে
সারা ত্রিভুবন কাঁপে,
প্রলয়ের কোলে ডুবিবে সকলি
দক্ষের মহাপাপে।

৭

তাথৈ তাথৈ প্রলয়োঙ্কারে
রুদ্র-বিনাশ-বাণী,

স্বরগ-দুয়ারে স্তব্ধ দেবতা
করে সবে কানাকানি।
শক্তি যে ছিল ধ্যানের আসনে
জীবনের নিঃশ্বাস,—
বিচ্ছেদে তার ব্যর্থ সকলি—
কোথা মিলে আশ্বাস ?

৮

ধ্যানের সঙ্গে মিশেছিল কি সে
শান্তি-আশীষ সম ?
ভুবনে ভুবনে ছিল কি ভরিয়া
তরুণ স্বপ্ন কম ?
নয়নে ছিল কি অমৃত-বর্ত্তি
হৃদয়ের রসায়ন,
শ্মশানচারীর সংসার-দেবী—
দেবতার উপায়ন ?

৯

ত্রিলোচন শিব হে মহাজ্ঞান।
ফুরাল শ্মশান-লীলা ?
শেষ হল তব দুঃখ-সাধন—
জীবনের প্রেম-খেলা
জীর্ণ গলিত শব দেহ—তবু
বেঁধেছ বুকের মাঝে,
নৃত্য-দোদুল অঙ্গে অঙ্গে
ঘোর উল্লাস রাজে।

১০

প্রেম বিনা বুঝি জ্ঞান নাই,
জ্ঞানের অভাবে লয় ?
তাই কি জাগালে সতীর মরণে
ধ্বংসের মহাভয় ?

একপল যারে ছাড়োনি জীবনে
মরণেও তারে নিয়ে—
উদার বিশ্বে ছুটিয়া চলিলে
ধ্বংসের গান গেয়ে ?

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

যমুনা

হ্যাঁ—ভারী চালাকী, না ?—জগৎশুদ্ধ লোকের বুদ্ধি আছে কেবল আমারই নেই—না ? আমি মোটে হাসি, আর সবাই দেব দেবী, ঋষি মহর্ষি ছাই ভস্ম কত কি ! আমার সঙ্গে কথা কইবার সময় কারুরই সমিহ করার দরকার নেই, লজ্জা করার দরকার নেই, যা ইচ্ছে বল্লেই হ'ল, যেমন করে ইচ্ছে হুকুম করলেই হল। আর আমি হইছি খেঁকী কুকুর, কাজও নেই অবসরও নেই। কেবল তু করে ডাকলেই ছুটে যাব। 'এঁর খোজ নাও,' 'ঐ কাজটা করবার জন্ম হুকুম নিয়ে এস,' 'এই ব্যাপারে যাতে এষ্টেট থেকে টাকা বেরোয় তার জন্ম দয়া করে বল'—আমি বুঝি তোমার আর সংসারের মধ্যেকার টেলিগ্রাফের তার ? না আমি তা নই।

কেন তা হব ? আমি চিরদিন স্বাধীন, কেন আমি তোমার ছলভরা হুকুম মেনে চলব ? দেখাও যেন কতই পরের হুকুমে চলছ, পরের দরকারে খাটছ, কিন্তু আমি তোমার মুখের কাপড় উঠিয়ে দেখে নিয়েছি—তা তুমি যতই তোমার ফটোই গোপন কর, আর যতই চাপকান চোগা লাগিয়ে আর্দালি সেজে বেড়াও। আমি তোমায় চিনিছি মশায় চিনিছি। ও সব চালাকী আর যার কাছে হয় কর গিয়ে, আমার কাছে ওসব চলবে না।

আমি ত' আর কোনো রকম চশমা চোখে দিয়ে বসে নেই, যে কাছে কিছুই দেখতে পাব না, শুধু দূরের দিকে চেয়ে দূর দেখবার আশায় বসে থাকব—আর নিকটের যা কিছু হাত ফসকে পালিয়ে যাবে ? ও গো মশায় তা হবে না—আমার কাছে তা হবে না। আমি ধর্ম্ম মানিনে, কর্ম্ম মানিনে, শাস্ত্র মানিনে, মন্ত্র মানিনে। আমি শুধু মানি এই আমার বাইরের চোখ—

দুটোকে আর আমার অন্তরের চোখকে। এই তিনটেতে যা ধরা পড়বে তাই আমার কাছে সত্য, বাদ বাকি সমস্তই মিথ্যে মায়া ভোজবাজী।

ঐ যে দিদির সন্ন্যাসী ম'শায় আজ কতদিন হতে নাসাগ্র-বদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে আছেন, মনে করছেন যে ও'র ঐ চোখ দুটো যে মাঝে মাঝে ইদিক-উদিক নড়ছে, এ বুঝি কেউ দেখতে পায়নি। হায় রে বোকা মানুষগুলো। বিশেষতঃ ঐ সব একাগ্র মানুষগুলো! ওরা যতই একাগ্র ওরা ততই যে বোকা—ততই যে অন্ধ, এটা ওরাই সবচেয়ে কম জানে। ঐ যে আমার দিদিটী যিনি মনে করেছিলেন যে পরীক্ষা না করে কাউকে তিনি তাঁর অন্তরের মধ্যে, বিশ্বাসের মধ্যে, স্থান দেবেন না, তিনি যে আজ একাগ্র বিশ্বাসে ঐ সন্ন্যাসীকেই আশ্রয় করেছেন, এটাই ও'র চোখে পড়ছে না। এমনি অন্ধ এই সব যোগী মানুষগুলো।

কিন্তু সবারই যোগ ভাঙছে! আমি ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি সবাই বিয়োগের মধ্যে দিয়ে গুণে পৌঁছচ্ছেন এবং শেষে ভাগে পৌঁছে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে বিলিয়ে দিতে পথ পাবেন না, এও আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

আর তুমি—তুমি যে কেঁচে গণ্ডুস্ করতে এসেছ, তুমি মনে করেছ যে বুঝি তোমার অন্তরের সন্ন্যাসীটা বুঝি তোমায় ছেড়েছে—তোমার বৈরাগ্যের ভূত বুঝি তোমার ঘাড় থেকে নেমেছে? নামেনি মশায় নামেনি—

কিন্তু সেইটেই ত' দুঃখ কেন সে ভূত ছাড়ছে না তোমায়? কি চাও তুমি? কাকে চাও তুমি? কি মহা সত্য তোমার কাছে এখনো অপ্রকাশিত আছে? ওগো তোমার মনের ঝুলির মধ্যে এখনো কোন মহাভিক্ষা এ সংসার এ জগৎ দেয় নি? যে সত্যের লোভে তুমি তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, কৃচ্ছ বৈরাগ্য সব ছেড়ে দাসত্বের মিথ্যাকে অবলম্বন করেছ? সে কথা কি বলবে না—কখনো বলবে না, কাউকে বলবে না?

কিন্তু না বললেও ত' আমি ছাড়ব না। আমিও তোমারই চার পাশে ভ্রমরের মত ঘুরব, দেখি তোমার মুদিত মন-পদ্মের গোপন মধুটুকু চুরী করতে পারি কিনা। আমিও ছাড়ব না, এমনি করে আমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার মনের দ্বারে আঘাত ক'রব। দেখি সে দুয়ার কতদিন বন্ধ থাকে।

ব্যথাকে দেখিনে বলে, পিসীমা আমায় বকছিলেন, কিন্তু ব্যথাকে নিয়ে দিদিভ' দেখছি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তা হলে আর আমার দরকার কি? সংসারের কাজ?- সেও ত' বেশ চলছে, কৈ কারুর পাতে কিছু পড়ে নষ্টও হচ্ছে না'—আর কেউ কিছু পেলেনা বলে কান্নাকাটিও ত' করছে না। যে সত্য-সত্যই কান্নাকাটী করছে, সে যদি তার এই ছাব্বিশ বছরের একটানা দুর্ভিক্ষ দুদিনের জন্মে মেটাবার চেষ্টা করে, তা হলেই এত কথা উঠবে? সংসারের এ কেমন বিচার!

না আমি এতদিন ধরে পেরেছি—আর যদি না পারি? তাতে তোমাদের এত কলরব কেন উঠবে? পাঁচজন কাণাকানি করছে? করুক গে, কবে সে কাণাকানিতে তোমরা কাণ দিয়েছ? তোমরা যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত একটা সংসার গড়ে তুলেছ, এই যে তোমাদের ভারতছাড়া এই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ছাড়া বাড়ীটা, এই মনু-যাজ্ঞবল্কের দেশের বুকের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছ এর জন্ম কার মুখের দিকে তোমরা চেয়েছ? কবে চেয়েছ? কখন না।—তবে এই বাড়ীরই একজন হয়ে আমিই বা কার মুখ চেয়ে নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখব?

না —তোমরা যখন কোনো নিয়ম মান নি, তখন আমিই বা মানব কেন? তোমরা যখন একটা ছায়ার পেছনে ছুটছ, তখন আমিই বা ছুটব না কেন?

ছায়া! মিথ্যে! মরীচিকা! হোক মরীচিকা তবু আমি যাব। সেই দিকেই যাব।

মিথ্যে নয় এ সংসারে কোন্‌টা? সারা সংসারই যে মায়ার পেছনে ছুটছে। আমিই কেবল চুপ করে থাকব? এ কেমন বিচার তোমাদের?

মিথ্যে নয় গো ম'শায়রা মিথ্যে নয়। এ যদি মিথ্যে হয় তা হলে গাছে ফুল ফোটাও মিথ্যে, আকাশে চাঁদ ওঠাও মিথ্যে, প্রভাতে সূর্য্য ওঠাও মিথ্যে, জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সবই মিথ্যে।

মনে মনে সবাই জানে—কিছুই মিথ্যে নয়, তবু জোর করে বলবে মিথ্যে—মায়া—ভেল্কি—ভোজবাজী। এই মিথ্যের ধুয়োটাকে কোন্ মিথ্যেবাদী জগতে এনেছিল? তাকে যদি হাতের গোড়ায় পেতাম তা হলে তার মাথাটা ধরে দেয়ালে ঠুকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, এই মিথ্যের আঘাতটা কেমন লাগছে?

কিন্তু তোমার আবার এ কি নূতন হুজুগ উঠল? তুমিও আবার কাজ-কর্ম ফেলে মাঝে মাঝে ঐ মিথ্যের বাজা সন্ন্যাসীগুটীর কাছে ধন্না দিতে আরম্ভ করলে কেন? আমার যে ভয় করছে।

ভয়? হ্যাঁ ভয় বৈ কি। নিজের কাছে গোপন করে দরকার কি? হ্যাঁ আমার ভয় করছে। তুমি অমন করে আজ আমার ঐ বুদ্ধদেবের ছবিখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন? কি দেখছিলে ঐ অপটু হাতের অসম্পূর্ণ শিল্পটার মধ্যে? তোমার ঐ অমন সুন্দর উজ্জ্বল চোখদুটো আজ অমন মরার মত আমার দিকে চাইলে কেন? আজ কেন কোনো আদেশ আমি পেলাম না? কেন আজ তোমার কথার মধ্যে তোমাকে পেলাম না! কোন্ দূর বন-বনান্তরে তুমি আজ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছ? তোমায় যে আজ কিছুতেই সেখান থেকে তুলে আনতে পারলাম না? কেন পারলাম না? কি আমাতে আজ ছিল না? কোন্ বস্তুর অভাবে আজ তোমায় আমার দিকে ফেরাতে পারলাম না? কি নেই আমাতে, তুমি যদি অমনি করে মুখ ফেরাও তা হলে সমস্ত জগৎ যে মুখ ফেরাবে—তা হলে কি নিয়ে থাকবো? আমি যে এখন সব হারিয়ে বসে আছি। শুধু একটী আশায় আমি যে সব আশা ত্যাগ করেছি। এখন মুখ ফেরাও—উঃ! না, তা যে ভাবতেও পারি নে।

* * *

আমি ত' আশা করাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। দিদি যেদিন সব ছেড়ে আশা-কেই আশ্রয় করল, সেইদিন হ'তে আমি সব ধরে আশাকেই ছেড়েছিলাম, কিন্তু তুমিই ত আশাকে জাগিয়ে দিয়েছ প্রভু। ওগো আমার না চেয়ে পাওয়া ধন, ওগো আমার অকালের মেঘ, আজ যদি তুমি আবার আকাশে মিলিয়ে যাও, তাহ'লে কি করে বাঁচব? না—না—তা পারব না, আমি তা পারব না। তোমায় ফিরতেই হবে। তুমি যখন এসেছ, যখন এ জীবনাকাশে আপনি এসে উদয় হয়েছ, তখন তুমি আমারই। তোমায় আর আমি গোপন হতে দেব না, কিছুতেই নয়। আমার যা কিছু আছে সব দিয়ে তোমায় আমার আকাশে বেঁধে রাখব। একবিন্দু জলও যদি ঐ মেঘ হতে না পড়ে যদি ক্রমাগত বিদ্যুৎ আর গর্জ্জনই শুনতে হয়, যদি বজ্রাঘাতও নেমে আসে, তবু এ মেঘ আর মিলুতে পাবে না। এ মেঘে আমি আমার সমস্ত কেকা দিয়ে সমস্ত কলাপের বিস্তার করে, সমস্ত কদম্ব ফুটিয়ে ধরে রাখবই রাখব।

কিন্তু এত যে জোর করে কাল ঐ কথাগুলো লিখিছি এ জোর আমার থাকছে কৈ? মনে হচ্ছে যেন কোন অজানা দিক্‌ হ'তে কেমনধারা যেন হাওয়া বইছে। আমার মেঘমালাও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার নয়নে যে গভীর ছায়া দেখে এলাম, এ ছায়া কিসের? কার এ ছায়া? এ ছায়া কোথায় ছিল এতদিন?

কি জানি কোথায় ছিল—কিন্তু ছায়া যে জেগে উঠেছে, বাতাস যে লেগেছে আমার মেঘে! কোন্ দিগন্ত হ'তে অজানা আলো এসে আমার মেঘকে রাঙিয়ে তুলছে, দুলিয়ে তুলছে, ফুলিয়ে তুলছে? কিন্তু বর্ষণ হবে কোন্ দিকে, কোন উষর দেশে, কোন মরুপ্রান্তরে? কদম বনের ঘনপাতার ওপরে না শুকনো নদীর বালুর চরে? কোথায় এ মেঘ সরে চল!

মন যে আমার কেঁপে উঠ্‌ছে—দূরে কি আবার চাতক ডাকছে নাকি? কোথায় গেল আমার কেকা, কোথায় আমার কলাপ। আনো—আনো—সব আন—বাদ্য আন, নৃত্য আন, আন গান, আন ফুল, আন হাসি, আন বাঁশী যা কিছু আছে সব আন—মেঘকে আমার বাঁধতেই হবে। [উপাসনা, ভাদ্র]।

নারায়ণের-নিকষ মণি

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তি তত্ত্বসার—শ্রীরাধানাথ কাবাসী প্রণীত—১ম খণ্ড—৯৬০ পৃষ্ঠা—মূল্য ২।০ টাকা। ইহা দ্বারা বৈষ্ণব জগতের একটী অভাব দূরীকৃত হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মে এরূপ ধরণের পুস্তক আর একখানিও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা গ্রন্থকারের এক অভিনব সৃষ্টি। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব গণের জন সাধনোপযোগী নিত্য পাঠ্য, নিত্য স্মরনীয় ও নিত্য কীর্ত্তনীয় অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এই পুস্তক বটতলা বা অন্যান্য স্থানের বৈষ্ণব গ্রন্থের ন্যায় ভ্রম পরিপূর্ণ নহে। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। তিনি বিপুল পরিশ্রম করিয়া পূজ্যপাদ মহাজনগণের গ্রন্থ সমূহ হইতে রত্ন সকল সংগ্রহ করিয়া একত্রীভূত করিয়াছেন। প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, মনঃশিক্ষা পাষণ্ড দলন, সূচক, পাণ্ডব গীতা, রাসগীতা, জন্মোপবাস ব্রত কথা, রাসপঞ্চা-ধ্যায়ী, বহু সংখ্যক অষ্টক স্তোত্র, ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র, দোহাবলী, বৈষ্ণবাভিধান ইত্যাদি অনেক বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান হিতসাধন মণ্ডলী, খাস্তকুড়িয়া, ২৪ পরগণা ও বল্লভ এণ্ড কোং ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্যামবাজার, কলিকাতা।

আর্ত্ত

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ভগবান ভগবান।
আর্ত্ত পীড়িত দুর্ব্বল ভীত—
দুঃস্বরে কর ত্রাণ,
কণ্টক বনে বঞ্চক মনে
লয়ে যায় বারে বার,
গ্লানি আর গ্লানি ঘরে তুলে আনি
কঙ্কর ভারে ভার,
বুকে তুঁষ জ্বালি, গায়ে মাখি কালি
চরণে ক্ষতের রেখা,
চরণ চলে না, নয়ন গলে না
একি ভাগ্যের লেখা।
মোহ-মদিরায় প্রাণ যায় যায়
তবুও দীর্ণ প্রাণ,
বুক চিরে চিরে, চিৎকারি ফিরে
জাগায় জীর্ণ জ্ঞান।

ভগবান ভগবান।
পারিনাক আর বহিতে এ ভার
জীবনের অবসান,
পলে পলে মরি অন্তর ভরি
উঠে মরণের ব্যথা,
কেমনে ভুলিব চরণে দলিব
গত জীবনের কথা।
কালানল সম মনানল মম
তুলি লেলিহান শিখা;
ললাটে আমার লিখিল হাজার
মসি-কলঙ্ক লিখা,

কার মুখ চাব সান্ত্বনা পাব
কে এমন গরীয়ান,
পরশে তাহার জীবন আমার
ফিরে পাবে হৃত মান?

ভগবান ভগবান!
কোথা পথ আছে শুধু আগে পাছে
গর্জ্জিছে অপমান!
আঁধার আঁধার পথ দেখা ভার
স্বন স্বন বহে বায়,—
নীরবতা মাঝে বড় বুকে বাজে
কেঁপে কেঁপে ওঠে স্নায়ু,
প্রতি পায় পায় কঙ্কর ঘায়
রক্তের ধারা ছোটে,
পায়ের তলায় মাটি সরে যায়,
দুর্ব্বল দেহ লোটে।
আপনার হাতে রজনী ও প্রাতে
হলাহল করি পান
কেবল যাতনা নাহি সান্ত্বনা
গেল—জ্বলে গেল প্রাণ!

ভগবান ভগবান!
আজি চাহি তব দুর্জ্জয় নব
ভৈরব অবদান,
এস সম্মুখে দাও এই বুকে
তব অস্ত্রের জ্বালা,
তোমার গলার ওই ফণিহার
কার কণ্ঠের মালা,
শেষ করি মোর যন্ত্রণা ঘোর
সারা জীবনের গ্লানি,

তোমার হাতের দিবস রাতের
বেদনারে বড মানি।
দাও দাও বুকে সব হাসিমুখে
তব বজ্রের দান
চাহি নিষ্ঠুর, এই ভয়াতুর
জীবনের অবসান।
ভগবান,—ভগবান।

জিউজিৎসু

[শ্রীহেম সেন]

অনেকেই জানতে চাচ্চেন "জিউজিৎসুটা" কি? ইহা একটা জাপানী বিদ্যা। আড়াই হাজার বছরের অধিক কাল থেকে জাপানে এই বিদ্যার চর্চ্চা হয়ে আসচে।

জিউজিৎসুর উদ্দেশ্য শরীরকে সুস্থ সবল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে, আকস্মিক অথবা অন্য রকমের লৌকিক বিপদ আপদে আত্মরক্ষার এমন কতকগুলি কৌশল শিক্ষা দেওয়া, যাতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায়ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাহারই শক্তি এবং স্বাভাবিক বা ইচ্ছাকৃত অঙ্গসঞ্চালনের এবং শরীরের ভারকেন্দ্রের চ্যুতির উপর অতি সামান্য শক্তি কৌশল প্রয়োগ করিয়া, এমন অবস্থায় লইয়া যাওয়া, যেখানে বা যে অবস্থায়, সে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয়ে যাবে, কিছু করবার শক্তি তার আদৌ থাকবে না। জিউজিৎসুর অনেক কৌশল এমনি দেখ্‌তে কিছুই নয়, মনে হয় বুঝি একজন নিজে ইচ্ছা করেই অন্যের কাছে ধরা দিয়ে থাকে, এবং ঐ অবস্থায় গিয়ে, ইচ্ছা করেই নট নড়ন্ চড়ন্ হয়ে থাকে। কিন্তু একবার পরখ করেই বোঝা যাবে যে ঐ অবস্থায় কেহ স্বইচ্ছায় যেতে চায় না; এবং ঐ অবস্থায় গিয়ে পড়লে কিরকম ভীষণ অকর্ম্মণ্য দশা হয় তাও আর আয়াস করে বুঝ্‌তে হয় না। কখনও একেবারে কোণ ঠাসা অবস্থায় পড়লেও এমনি অদ্ভুত কৌশল সে প্রয়োগ করে শক্তিশালী আক্রমণকারীকে এমনই নিঃশক্তি ও ভিভূত করা চলে, যে ফল দেখে বাস্তবিকই নিজেও আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

কুস্তী সকলে শিখতে পারে না। কুস্তী শিখতে ভাল স্বাস্থ্য এবং যথেষ্ট শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। তা'ছাড়া সকলের পক্ষে কুস্তীটা উপযোগীও নয়। কুস্তীতে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম হয়। যেখানে সেখানে তা শেখাও যায় না। জিউজিৎসুতে কখনও গুরুতর পরিশ্রমের সম্ভাবনা নাই, বিশেষ বিশেষ খাদ্য পেয়েরও প্রয়োজন হয় না। জিউজিৎসু কুস্তী নয়।

জিউজিৎসু দুর্ব্বল ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে শিখতে পারেন। শরীরটাকে জিউজিৎসু শিক্ষার উপযোগী করবার জন্য যে প্রাথমিক ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা আছে তাহা শরীরের পক্ষে মহোপকারী। এই ব্যায়াম প্রণালী সর্ব্বত্র অভ্যাস করা চলে। শিশু হইতে বয়স্ক পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ সবাই ইহা অভ্যাস করিয়া, শরীরকে স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারিবে। ইহা ভিতরে ভিতরে এমনই একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয় যে কখনও আলস্য জন্মিতে পারে না। আলস্যকে আমরা সাধারণতঃ, একটা স্বভাবদোষ বলে ধরে নিলেও উহা যথার্থতঃ শারীরিক রোগ বিশেষ। ঐ প্রাথমিক ব্যায়াম প্রণালীটার অভ্যাসে শরীরের সকল মাংসপেশী, স্নায়ু এবং সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সকল সুস্থ ও সবল হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে বলে, অর্শ ও অজীর্ণদোষমূলক নানা রোগ এবং সকল রকমের স্নায়বিক বিকারজনিত রোগের হাত থেকে সহজেই আত্মরক্ষা করা যায়। ইহা অভ্যাস আরম্ভ করে কয়েক দিনের মধ্যে শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। এই ব্যায়ামাভ্যাসেও আনন্দ আছে।

আমাদের জাতকে ভিতরে বাহিরে সুস্থ, সবল ও প্রবল করে তুলতে জিউজিৎসুও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। আমাদের স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, শিশু সকলেরই ইহা শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক বিদ্যাপীঠে বা বিদ্যামন্দিরে এই নির্দ্দোষ, আনন্দদায়ক, মহোপকারী, সহজ ব্যায়াম প্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

জিউজিৎসু অভ্যাস করতে কোন যন্ত্রপাতি বা উপকরণের আবশ্যক হয় না কিন্তু শরীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের দরকার হয়।

জাপানে স্কুল সমূহে প্রত্যেক বালক বালিকাকে জিউ জিৎসু শেখান হয়। জাপানে স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেককে জিউ-জিৎসু শিখতে হয়। বর্ত্তমান জাপান-সম্রাট যখন যুবরাজ, তখন তাঁকেও সাধারণ ব্যায়ামাগারে জিউ জিৎসু শিখতে হয়েছিল। মোটের উপর, জাপানীদের মত এমন সুস্থ আর কোন্ জাত? আর কোন্ জাতের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং বিকার জনিত রোগ এত বিরল

ইহার মূল কারণ জিউ জিৎসু শিক্ষা? (Jiu-Jitsu) জিউ-জিৎসু ভাল করে শিখ্তে অন্ততঃ চারি বৎসর সময় লাগে। তবে অল্পকালের মধ্যেই (যেমন তিন চারি মাসে) বাছিয়া বাছিয়া অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি কৌশল শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি তত্ত্ব শিখাইয়া দেওয়া যায় যাহাতে নিয়মিত অভ্যাসে যথেষ্ট সুফল লাভ হইবে।

শুধু হাতের ভিন্ন আর দুই রকম জিউ-জিৎসু আছে, সচরাচর সেগুলির কোন প্রয়োজন হইবে না।

শুধু হাতেরটাই শ্রেষ্ঠ। জিউ-জিৎসু এমনই অদ্ভুত একটি বিদ্যা যে ইহার সম্বন্ধে সকল কথা পত্রে লেখা অসম্ভব।

অমর্কের বিদায়।

[শ্রীঅমর্ক]

দৈত্যপতি আমায় দিয়ে
　　চলবেনা এ পাঠশালা।
থাকলো পড়ে' বেত্র রজ্জু
　　থাকলো তোমার আটচালা।
　খালি পড়ে' থাকবে জেনো,
　সমারোহে এবার যেন
খুলে দিও তায় শিশুপাল-
　বধ নাটকের নাটশালা।
যে নাম শুনে শ্রবণ রুধে
　　দারুণ ক্রোধে কাঁপতে থাকো
সে মধুর নাম গলা টিপে
　　বন্ধ করতে পারব নাকো।
　কেবল আপন তোষামোদী
　শুনতে এত ব্যাকুল যদি
দেশের যত ভাট জুটিয়ে
　　না হয় খোলো ভাটশালা॥

অহঙ্কারে মত্ত তুমি
ভাবছ নিজে অমর বুঝি,
বিশ্বে তারই নেইক মরণ
এক হরিনাম যাহার পুঁজি
রুদ্রদেবের প্রখর নখর
ছিঁড়বে ভোগায়তন জঠর
সুরকি হয়ে উড়বে তোমার
বালাখানা আট-তালা।

শিল্প ও স্বদেশী *

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

স্বদেশী যুগে স্বদেশীর শিল্পের মর্য্যাদা ও শিল্পের আদর্শ আমরা ঠিক বুঝি নাই স্বদেশীর শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ প্রকৃত দেশের অন্তরাত্মা সচেতন হয়েছে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি ধীরে ধীরে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার-কল্পে দেশে শিল্পীও গড়ে উঠছে। তাই বড় আশা হয়, আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর মোহ নিদ্রা সত্য সত্যই টুটেছে, আমরা আবার লুপ্ত রত্নের সন্ধানে উদ্যোগী হয়েছি। আমাদের হৃদয় এবার যথার্থ পথের সন্ধান পেয়েছে, তাই আর সেদিনকার সে অগ্নিময়ী জ্বালা নেই, তৎপরিবর্ত্তে আছে শান্ত, সুদৃঢ়, নির্ভীক কর্ত্তব্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ! যদি অকস্মিক কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা পৃথিবীবক্ষঃ হ'তে অপসারিত হয়, তাহলে ঐ প্রজ্বলিত আলোকস্তম্ভই মনে হয় পুনরায় নবীন সভ্যতার পথ প্রদর্শক হবে।

দীর্ঘ শতাব্দীর অবহেলায় আমরা যা হারিয়েছি তা কেবল ভারতের শিল্প

* কুমার স্বামীর Art & Swadeshi শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে লিখিত। লেখক।

ভারতের শিল্পী পর্য্যন্ত ইহাই আমাদের Double loss both physical and spiritual (Havell)। যে ভারত শতবর্ষ পূর্ব্বে সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল, আজ সেই ভারত হতশ্রী। ভারতের শিল্প অবহেলায় নষ্ট প্রায় হয়েছে। প্রধানতঃ আমাদেরই আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে আমাদেরই মোহাবিষ্টতার ফলে। সস্তা বলে ভারতীয় জিনিষ বাজারে চালাবার চেষ্টা ভারতবর্ষ কোনদিন করেনি। ভারতের মুসলিন, ভারতের সামগ্রী যেদিন রোমে যেত সেদিন তার আদর ছিল সৌন্দর্য্যেরই জন্য, সস্তা বলে নয়। মুসলমান দিগ্বিজয়ী বীরগণ ভারত লুণ্ঠন করে ভারতের শিল্প নিয়ে যায়নি, ভারতের শিল্পীও স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিল। সস্তার (cheapness) পরিবর্ত্তে সুন্দর বলে (Beautiful) সব সামগ্রী দেওয়া নেওয়ার করার প্রয়োজন তা বুঝতে হবে। সস্তাই কোন দ্রব্যের একমাত্র গুণ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে Industry without art is Brutality,—প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে কোন ভারতবাসী একথা যেন কোনদিন না ভুলে যায়। সুন্দর কি ? চক্‌চকে যা, ক্ষণভঙ্গুর যা, তা সুন্দর নয়—সৌন্দর্য্যের জ্ঞান নেই যার, সেই ওরূপ সৌন্দর্য্যে ভোলে—কাঁচের বাসনের কারুকার্য্য খাগড়াই বাসনের কারুকার্য্যের সমতুল্য হয় না। যার প্রকৃত সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অভাব সে আবার ফ্যাসান্‌" বলে যা তা অনুকরণ করে, এখানে বিচার বুদ্ধির সম্পূর্ণ অভাব, বিলাতী অথবা তাহার অনুকরণে দেশী 'এসেন্স' উচ্চমূল্যে ব্যবহার করা চলে, অথচ আতর ব্যবহার করা চলে না! সুন্দর কি ? দীর্ঘকাল স্থায়ী, ব্যবহারোপযোগী, হিতকারী এবং যা আমাদের সঙ্গে প্রকৃত খাপ খায়, তাই সুন্দর। মূল্যের তারতম্য কোন দ্রব্যের মাত্র দোষগুণের পরিচায়ক নয়। স্বদেশীয় শিল্পোন্নতি স্বদেশবাসীর পূর্ণসহানুভূতি ও যত্নে পুনর্ব্বার গড়ে উঠতে পারে। যাঁরা স্বদেশীর শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধে 'সস্তা হওয়া চাই' বলে এখনও ওজর আপত্তি তোলেন ও ক্ষমতার অভাবে শিল্পের উন্নতি করতে পারেন না বলেন, তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য তাঁরা ক্ষমতা অর্জ্জনের কতটুকু চেষ্টা করেন আর কেনই বা কলেজী পড়া ও কেরানীবৃত্তি করবার মোহ ছাড়তে পাবেন না।

শত বর্ষ আমরা কেবল স্বদেশী বর্জ্জন ও বিদেশী গ্রহণ মন্ত্রে যে দীক্ষা গ্রহণ করেছি সে বিষবৃক্ষের বিষফল একেবারে ত্যাগ করতে পারব কেন ? মানুষ খেয়ালে আজ যে কাজ করে বসে, কাল চোখ বুজে তা ভোলবার যত চেষ্টাই করুক না কেন, কর্ম্মফল একদিন না একদিন পূর্ণ হয়ে সুদখোর মহা-

জনের মত তার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে! আমরাও উনবিংশ শতাব্দীর মোহভঙ্গের পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের ব্রত গ্রহণ করে ছিলাম—কিন্তু সহসা স্বদেশী ব্রতের মর্ম দেশবাসী উপলব্ধি করতে না পারায় (অথবা দেশের sentimentalism টুকু চতুর ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ে ভাঙিয়ে নেবার ফলে) "স্বদেশী" নাম নিয়ে 'এলুমিনিয়মের বাসন' থেকে মিলের কাপড় পর্য্যন্ত স্বদেশে প্রস্তুত করতে যত 'লিমিটেড কোম্পানী' হয়েছে ততই তার সেবার কিনতে দেশের লোক সঞ্চিত অর্থ অকাতরে ঢেলে দিয়েছে—ঐ বিদেশীরই মত ফ্যাক্টরী করে, দেশের দরিদ্রকে ক্রীতদাস wage-slavs করে প্রচুর ডিভিডেন্ট লাভ করবার উদ্দেশ্যই তার মূল প্রেরণা ছিল এবং এখনও যে নাই একথা বলা চলে না। এর নাম যদি 'স্বদেশীর ব্রত গ্রহণ' হয় আর নির্ব্বিচারে 'বিদেশী সভ্যতা' গ্রহণ যদি 'বিদেশী বর্জ্জন' হয়, তবে আমাদের Boycott এর আন্দোলন যথার্থই হাস্যকর এবং সে "স্বদেশীর" দীক্ষা গ্রহণ বিফল হয়েছে। এলুমিনিয়মের ব্যবসায়ীর উচ্চ ডিভিডেন্ট লাভ দেখে আর স্বদেশী মিলের উন্নতি দেখে যদি স্বদেশীর উন্নতি বুঝতে হয়, তাহ'লে সে উন্নতিতে আমাদের হৃদয় আরও হীন হয়ে পড়েছে এবং সেই ভাবে স্বদেশীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবং সেই জন্যই মনে হয়, যে কারণেই হ'ক দেশের যতগুলি যৌথ কারবার ফেল্ হয়েছে সেগুলি দেশের মাটীতে কোনমতে টিকে থাকতে না পারাতেই বিনষ্ট হয়েছে—তাহাতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের জনসাধারণ দরিদ্র ও মৃতকল্প হলেও ইউরোপীয় ফ্যাক্টরীর অনুকরণে আজও ক্রীতদাস হয়ে ওঠেনি। তারা মানুষ, মানুষের ডাকে আবার সাড়া দিয়েছে, চাবুকের শাসন তারা গ্রাহ্য করেনি।

আমরা তো কোন দিন বৃহৎ ভাবে চেষ্টা করিনি স্বদেশের তাঁতের উন্নতি কেমন করে হয়, কাঁসার বাসন ব্যবসায়ীর জাত-ব্যবসায় কেমন করে রক্ষা হয়, নির্ব্বিচারে 'বিদেশী গ্রহণের' ফলে আজ প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে, তাই নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যও হারিয়ে বসেছি—দেশে আর শিশুর খাদ্য গোদুগ্ধ মেলে না, শিশুরা 'মেলিন্স ফুড' উচ্চমূল্যে কিনতে হয়, উচ্চমূল্যে বসন-ভূষণ সবই কিনতে হয়—নইলে 'ভদ্রতা' রক্ষা হয় না। প্রতিকারের প্রশ্ন উঠলে তাঁরা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন আর প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের কথায় তাঁরা উপহাস করেন।

আমার মূল বক্তব্য এই যে, স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে এমন কি 'নির্ব্বিচারে

। গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ভাল নয় অর্থাৎ আমাদের যেটুকু গ্রহণ ও বর্জ্জনের ক্ষমতা সেইটুকু বিচার করে নিতে হবে। নির্ব্বিচারে 'স্বদেশী স্বদেশী' করে একটা উন্মাদনায় মেতে স্বদেশীর উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে। 'মিলের' পরিবর্তে চরকা ও তাঁত যদি গত পনর বৎসর ধরে চলত আমাদের বস্ত্রাভাব নিশ্চয়ই ঘুচত। আমাদের বস্ত্রাভাবই পূর্ব্বাপেক্ষা [illegible] হয়েছে [illegible] নয়, আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়েছে, তাই আজ যাঁরা বক্তৃতার তোড়ে মুখে বলেন, "বিলিতী কাপড় পরা অপেক্ষা উলঙ্গ থাকা ভাল" তার উত্তরে তাঁদের স্বয়ং সে ত্যাগের আদর্শটুকু [illegible] করতে বলি না, আমার এই আক্ষেপ হয় "দেশের সৈন্যের জোর আজ কোথায়?"

স্বদেশীর জোয়ার-ভাটা আমাদের জীবন-নদীতে [illegible] বার [illegible], কিন্তু এবার এ ভাবের জোয়ারে তর্ক করে বিচার করে নৌকা [illegible] হবে। নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকলেও নিস্তার নেই কর্ম্ম করতে হবে, কিন্তু তার [illegible] পথের সন্ধান সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই।

অতএব আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করতে হবে। "No lovely things can be produced in conditions that are themselves unlovely" আমাদের বর্ত্তমান সব নগর Birmingham কি Parisএর suburb বলে নাকি অনেকের ধারণা হয়, সুতরাং এরূপ ধারণার পরিবর্ত্তে যাহাতে বারাণসী অথবা যে কোন হিন্দু নগরীর আদর্শে পুনরায় ভারতীয় নগরের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা সর্ব্বাগ্রে [illegible] সেদিন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়না হ'তে একটী ডেপুটেশন [ভার]তবর্ষে এসেছিল—তারা চায় শিক্ষিত ভারতবর্ষকে সে দেশে নিয়ে যেতে; সেই ডাক পেয়ে শত শত ইংরাজ শিক্ষিত যুবক স্বদেশ ছেড়ে সে দেশে যাবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে আবেদন করেছেন। তাতে East and Westএর মিলন হয়েছে বলে যাঁরা উৎফুল্ল হ'তে চান, তাঁদের 'কবির স্বপ্ন' ভাঙতে আমি ইচ্ছুক নই। আমাদের একটা আত্মনির্ভরতার একান্ত অভাব এতে প্রকাশ হয়ে পড়ছে নাকি? কিন্তু আমার বিশ্বাস, দেশের মধ্যে নূতন নূতন Settlement গড়বার ডাক পড়লে আমরা প্রকৃত [illegible] সন্ধান পাব। ভুলে বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তার [illegible] হারিয়েছে, ভারতবর্ষের তার সাধনা, অধ্যবসায় ভুলেছে, সেই ভুল আবার বিংশ শতাব্দীতেও করব কি? আমরা স্বহস্তে পূর্ব্বপুরুষদের সযত্নে রোপিত বিষবৃক্ষের

ফল পেড়ে সেই বীজ কি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য পুনরায় রোপণ করে যাব? অতীত ভারতকে আদর্শ করে তার জ্ঞানবিকাশের ঐশ্বর্য্য যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েও অবজ্ঞা আজ হারিয়ে বসে আছি, তাই পুনরুদ্ধার করবার উপায় [illegible] ভারতকে আমাদের স্পষ্ট করে দেখিয়ে যেতে হবে। জগৎকে নিমন্ত্রণ [illegible], বর্ত্তমান ভারত একমুঠো অন্নের কাঙাল, একখণ্ড বস্ত্রের অভাবে লজ্জাহানা—অতিথি সৎকার ভারত করতে জানে কি না, হৃদয়খানি অতিথির বন্ধদ্বার দেখেই আশা করি বুঝতে পারবেন। 'ভুখা ভারতের বিশ্বের ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা প্রলাপ মাত্র। যদি তা অস্বীকার কর, বল, 'বিশ্বকে দেবার মত ভারতের এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে,' তা হ'লে স্পষ্ট [illegible] আছে', 'বিশ্বের বিরুদ্ধ ভারত আজ বিদ্রোহ করবে, এক লাঞ্ছিত প্রাচীন জাতি কেন তার সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যার লব্ধ মূর্ত্ত সঞ্জীবনী জগৎকে ঘরে ডেকে এনে অতিথি সৎকার বলে বিলিয়ে দেবে? কোন্ অধিকারে তারা উপনিষদ নিতে আসবে? সেখানে তো তাদের Lewis gun, rifle-এর অধিকার নেই। তবে সমস্ত ভারত অতিথিকে কি প্রত্যাখ্যান করবে? ভারতের কবি কি সমস্ত ভারতের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন? তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত আকাশতলে অতিথিসৎকার করুন—ভারতকে আর নূতন লাঞ্ছনা যেন না দেন।

আমাদের বর্ত্তমান হীনাবস্থার জন্য দায়ী আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও আমাদের আত্মশক্তির উপর অনাস্থা, অতএব আমাদের শিক্ষা নূতন আদর্শে গড়ে তুলতে হবে, আমাদের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মোহ যতদিন থাকবে আমাদের শিল্পবাণিজ্যের পুনর্গঠন ততদিন অসম্ভব থাকবে।

আমাদের শিল্পোন্নতির ইতিহাস বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল। সমাজের যে অবস্থায় তা সম্ভব হয়েছিল সে অবস্থা সত্য সত্যই আর নাই। কিন্তু ফ্যাক্টরী গড়ে এদেশে শিল্পোন্নতি করা চলবে না, [illegible] পনর বৎসরের যৌথ-কারবারের ইতিহাস তার [illegible] কারণ। এযুগে কেমন করে নূতন ভারতীয় নাগরিক জীবন ও সামাজিক [illegible] পুনর্গঠিত করা যায়, আমাদের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা [illegible] বিষয় — স্বরাজ বা স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবন সেই নব জীবনকে রক্ষা করবারই [illegible] উপায় মাত্র। প্রশ্নটা আমাদের [illegible] চিন্তার বিষয় দ্বিতীয়টা [illegible] নয়, [illegible] কারণ প্রকৃত পক্ষে যখন আমরা প্রথমটা লাভ করব দ্বিতীয়টা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতা আপনা আপনি আসবে।